মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ষষ্ঠ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

⚠⚠ সতর্কতা: এই বইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির সাহায্যে অনুবাদ করা হয়েছে

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (৬ খণ্ড)

(এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি)

লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অরজিনাল বই ডাউনলোড : link

বিনীত সতর্কতা: এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি, তাই এতে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আকিদা বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল বই যাচাই করার অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ রইল। এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার পাঠকের নিজের। যদি যাচাই করে বা বুঝে-শুনে পড়া সম্ভব না হয়, তবে বইটি না পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

https://t.me/BoierSomahar

□□ পাঠকের প্রতি সতর্কতা

এই অনুবাদটি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এর শব্দচয়ন, বাক্য গঠন কিংবা ভাবানুবাদে অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অসংগতি থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

বইটি পড়া শুরু করার আগে দয়া করে মনে এই বিষয়টি গেঁথে নিন যে— "আমি বইটি কেবল জানার ও শেখার উদ্দেশ্যে পড়ছি। পড়ার সময় কোনো কথায় সন্দেহ বা খটকা লাগলে, তা আমি যাচাই না করে গ্রহণ করব না।"

বিশেষ করে আকিদা, ফতোয়া বা স্পর্শকাতর কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই অনুবাদের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করবেন না। যেকোনো আমল বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে অবশ্যই মূল বই মিলিয়ে দেখবেন অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হবেন।

এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া যেকোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার একান্তই পাঠকের। তাই বিনীত অনুরোধ, নিজে যাচাই-বাছাই করে পড়ার মানসিকতা থাকলেই কেবল বইটি অধ্যয়ন করবেন।

https://t.me/BoierSomahar

ষষ্ঠ খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামি সালতানাতসমূহ

- দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামি সালতানাতসমূহ: গজনভি সালতানাত, ঘুরি সালতানাত, দাস বংশ
- খিলজি, তুঘলক, লোদি, সায়্যিদ, মুঘল সালতানাত: প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত
- মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক অবদান

অভিমত

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক ইসকান্দার সাহেব

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

প্রচেষ্টা

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান দামাত বারাকাতুহুম

পরিচালক, ইদারা উলূমুল কুরআন, হাসান আবদাল

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের অধিভুক্ত

আল-মানহাল পাবলিশার্স

https://t.me/BoierSomahar

ষষ্ঠ খণ্ড

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী সালতানাতসমূহ

- দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী সালতানাতসমূহ: গজনভী সালতানাত, ঘুরি সালতানাত
- দাস বংশ, খিলজি, তুঘলক, লোদি, সাদাত
- মুঘল সাম্রাজ্য: প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত
- মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংস্কৃতিক অবদান

প্রচেষ্টায়:

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মদ্দাজিল্লুহুম

পরিচালক, ইদারা উলূমুল কুরআন, হাসান আবদাল,

অধিভুক্ত: বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান

প্রকাশক:

আল-মানহাল

ব্লক এ-১, গুলশান-ই-জওহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

https://t.me/BoierSomahar

সকল স্বত্ব প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত।

তারীখে আইম্মায়ে মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রচেষ্টা:

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)

পরিচালক, ইদারা উলূমুল কুরআন, হাসান আবদাল,

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের অধিভুক্ত।

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২৫

আলহামদুলিল্লাহ! কিতাবটির সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও যদি কোনো ভুল নজরে আসে বা কোনো উপকারী পরামর্শ থাকে তবে অবশ্যই অবহিত করবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের সাহায্যকারী ও সহায় হোন।

জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

ইদারা তুন নূর

দোকান নং ২-৩, আনোয়ার স্টেশন জামশেদ রোড, জামে মসজিদ নূরীর বিপরীতে, লাইন করাচি।

০২১-৩৪৯১৪৫৯৬, ০৩২৪-২৮৫৫০০০

idaratunnoor@gmail.com

প্রকাশক আল-মানহাল

দোকান নং ২-৩, আনোয়ার স্টেশন জামশেদ রোড, জামে মসজিদ নূরীর বিপরীতে, লাইন করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

admin@almanhalpublisher.com

https://t.me/BoierSomahar

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৩৯

চিহ্ন ও সংকেত এবং তথ্যসূত্র পর্যালোচনার নির্দেশিকা ৪৩

ইসলামের পূর্বে উপমহাদেশ ৪৪

উপমহাদেশের ভূগোল ৪৪

উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমানা ৪৪

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৪৫

উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৪৫

সেকেন্দারের আক্রমণ ৪৭

মুহাম্মদ বিন কাসিম থেকে চতুর্থ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত ৪৯

প্রথম অধ্যায়: ভারতের বিজেতা গজনভি ও ঘুরি ৫১

গজনভি সালতানাত ৫২

আমির সবুক্তগিন ৫২

অবলা প্রাণীর দোয়া ৫২

রাজা জয়পালের সাথে প্রথম যুদ্ধ, লঘমানের লড়াই ৫৩

জয়পালের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ - ভারতের সীমান্তে গজনভি বাহিনীর আক্রমণ ৫৪

লঘমানের দ্বিতীয় যুদ্ধ ৫৪

বিজিত অঞ্চলসমূহে ইসলামি দাওয়াতের ব্যবস্থা ৫৪

আমির সবুক্তগিনের ইন্তেকাল ৫৫

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আমির সবুক্তগিনের সীরাত ৫৫

ইসমাইল বিন সবুক্তগিন ৫৬

সুলতান মাহমুদ গজনভি, ইয়ামিনুদ্দৌলা ৫৭

ইতিহাসের প্রথম সুলতান ৫৭

ওলামা ও সাহিত্যিকদের বাগান ৫৮

মাশায়েখদের প্রতি ভক্তি ৫৮

পিতার শাসনামলে সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ ৫৮

নূহ বিন মনসুর ও সবুক্তগিনের চুক্তি ৫৮

সামানি ষড়যন্ত্রকারী আমিরদের সাথে গজনভিদের যুদ্ধ ৫৯

নিজ শাসনামলে সামানিদের সাথে সুলতান মাহমুদের সংঘাত ৫৯

মনসুর সামানির বিরুদ্ধে তার আমিরদের বিদ্রোহ ৬০

সামানিদের সাথে সুলতান মাহমুদের যুদ্ধ ৬০

খেলাফত দরবার থেকে ইয়ামিনুদ্দৌলা উপাধি লাভ ৬০

ইলিক খান, সামানি ও মাহমুদ গজনভি ৬০

https://t.me/BoierSomahar

সংক্ষিপ্ত সামানিদের সমাপ্তি ৬১

কারাখানিদের খোরাসান দখলের চেষ্টা ও পশ্চাদপসরণ ৬১

কারাখানি বাহিনীর সাথে সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভয়াবহ যুদ্ধ ৬১

ইলক খানের মৃত্যু ৬২

সুলতান মাহমুদ গজনভী কর্তৃক কারাখানিদের বিতাড়ন ৬২

সেলজুকদের খোরাসানে স্থানান্তর ৬২

ঘোরিদের সাথে সংঘর্ষ ৬৩

ভারত অভিযানসমূহ ৬৪

ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরি শতকের ভারত ৬৪

উত্তর-পশ্চিম ভারত ৬৪

উত্তর ভারত ৬৫

মধ্য ভারত ৬৫

পশ্চিম ভারত ৬৫

পূর্ব ভারত (বিহার, বাংলা) ৬৫

দক্ষিণ ভারত ৬৬

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসমূহ, রাজনৈতিক বিভাজন ৬৬

সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত অভিযানসমূহ ৬৭

প্রথম ভারত অভিযান, সীমান্ত যুদ্ধ ৬৭

দ্বিতীয় ভারত অভিযান, পেশোয়ার ৬৭

তৃতীয় ভারত অভিযান, ভাটিয়া দুর্গ ৬৮

চতুর্থ ভারত অভিযান, মুলতান ৬৯

বলখে ইলক খানের সাথে যুদ্ধ ৭০

পঞ্চম ভারত অভিযান, সুখপালের বিদ্রোহ ৭০

ষষ্ঠ ভারত অভিযান, পেশোয়ার যুদ্ধ ৭০

কাংড়ার যুদ্ধ ৭১

ঘোর দখল ৭২

সপ্তম ভারত অভিযান, মুলতান ৭২

অষ্টম ভারত অভিযান, থানেশ্বর ৭৩

নবম ভারত অভিযান, নন্দনা ৭৩

দশম ভারত অভিযান, কাশ্মীর ৭৪

খোয়ারিজম সফর ৭৪

একাদশ ভারত অভিযান, কনৌজ ৭৫

যমুনা নদীর ওপারে ৭৫

মিরাট ও বুলন্দশহর বিজয় ৭৫

মহাবন ও কুলচান্দের সাথে যুদ্ধ ৭৬

মথুরার মন্দিরসমূহ ৭৬

কনৌজ বিজয় ৭৭

মুঞ্জ (ব্রহ্মা দুর্গ) ৭৭

আসনি দুর্গ ও চন্দপাল ৭৮

রাজা চন্দর রায়ের পশ্চাদ্ধাবন ও খোদাদাদ হাতি ৭৮

খলিফাকে জহুরি পাখির উপহার ৭৯

দ্বাদশ ভারত অভিযান, কালিঞ্জর ৭৯

ত্রয়োদশ ভারত অভিযান, কিরাত, নারদিন ৮০

চতুর্দশ ভারত অভিযান, লোহকোট, লাহোর ৮১

পঞ্চদশ ভারত অভিযান, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর ৮২

ষোড়শ ভারত অভিযান... সোমনাথ বিজয় ৮৩

সপ্তদশ ভারত অভিযান, জাট গোত্রসমূহ ৮৫

শেষ অভিযানসমূহ ৮৫

পরকালের সফর ৮৫

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান মাহমুদ গজনভীর হামলার উদ্দেশ্য ৮৬

সুলতান কেন পুরো হিন্দুস্তানে শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি? ৮৯

সুলতান মাহমুদের কারনামাসমূহ ৯০

সুলতানের চরিত্রহনন এবং এর বাস্তবতা ৯১

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সুলতান মাহমুদ গজনভীর চরিত্র ৯৪

আল্লামা ইবনে খালদুনের অভিমত ৯৪

ইবনুল আসীরের বর্ণনা ৯৪

হাফেজ ইবনে কাসীরের অভিমত ৯৪

হাফেজ যাহাবী রহ. এবং কাজী মিনহাজুস সিরাজ রহ.-এর অভিমত ৯৫

ডক্টর তারা চাঁদের বর্ণনা ৯৫

সুলতান মাহমুদ গজনভী লেন পুলের দৃষ্টিতে ৯৫

সুলতান সম্পর্কে স্যার এলফিনস্টোনের অভিমত ৯৬

সুলতান মাহমুদের সীরাতের কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা ৯৭

দরবারে নববীতে ইলম অন্বেষণকারীর সম্মান, সুসংবাদ ৯৭

আমাকে ডাক দাও ৯৭

উন্নয়নমূলক কাজ—বিজ্ঞান ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ৯৮

গজনভী দরবারের কয়েকজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির পরিচয় ৯৯

হাকিম উনসুরি ৯৯

দাকিকি ৯৯

ফেরদৌসী ৯৯

উস্তাদ আসাদি তুসি ১০০

হাসান মায়মান্দি ১০০

আবু রায়হান মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-বিরুনি ১০০

সুলতান মাহমুদ গজনভীর উত্তরসূরিগণ ১০১

সুলতান মুহাম্মদ বিন মাহমুদ গজনভী ১০২

সুলতান মাসউদ বিন মাহমুদ গজনভী ১০৩

খুজদার, মাকরান এবং হিরস্তির বিজয় ১০৩

সুলতান এবং জাদুকরনি ১০৪

তুর্কান-ই-গুজ-এর সাথে যুদ্ধ—জোরজান ও তাবারস্তান দখল ১০৪

হাসি এবং সরসুতির বিজয় ১০৪

আহমদ নিয়ালতিগিনের বিদ্রোহ ১০৫

সেলজুকদের হামলা ১০৫

সেলজুকদের কাছে পরাজয় এবং লাহোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত ১০৫

হিন্দুস্তান সফর, উজিরের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান ১০৬

সিন্ধু নদের তীরে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ১০৬

অন্ধ শাহজাদা মুহাম্মদের সিংহাসন আরোহণ ১০৭

সুলতান মাসউদের গ্রেফতারি ও মৃত্যু ১০৭

সুলতান মাসউদের সীরাতের উজ্জ্বল দিক ১০৭

সুলতান মাসউদের দরবারের ওলামা ও গুণীজন ১০৮

সুলতান মুহাম্মদ—পুনরায় ১০৯

শাহজাদা মওদুদ কর্তৃক সুলতান মুহাম্মদকে হুমকি ১০৯

সুলতান মওদুদ বিন মাসউদ ১১০

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান মুহাম্মদ ও তাঁর সন্তানদের হত্যা ১১০

নেক কাজ কাজে আসা ১১০

মওদুদ-এর লাহোরের দিকে সৈন্য পরিচালনা ১১০

শাহজাদা মজদুদ-এর মৃত্যু ১১১

লাহোরে হিন্দুদের আক্রমণ এবং মুসলমানদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ১১১

মওদুদ-এর মৃত্যু ১১১

মাসউদ বিন মওদুদ (মাসউদ সানি) ১১২

সুলতান আবুল হাসান আলী বিন মাসউদ, বাহাউদ্দৌলা ১১২

সুলতান আব্দুর রশীদ বিন মাহমুদ ১১৩

নগরকোট পুনরুদ্ধার ১১৩

সেলজুকদের সাথে যুদ্ধ এবং তুঘরিলের কর্মকাণ্ড ১১৩

তুঘরিলের বিদ্রোহ ১১৪

সুলতান আব্দুর রশীদের করুণ পরিণতি ১১৪

তুঘরিল (চল্লিশ দিনের বিদ্রোহী শাসন) ১১৫

তোশ তগিন কারখির পত্র এবং তুঘরিলের শিরশ্ছেদ ১১৫

সুলতান ফররুখজাদ বিন মাসউদ ১১৬

বিপদগ্রস্ত কৃষকদের কর মওকুফ ১১৬

সেলজুকদের ওপর বিজয় ১১৬

সেলজুকদের সাথে বন্দি বিনিময় এবং সন্ধি ১১৭

সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সাথে একাকী মোকাবিলা ১১৭

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ১১৭

সুলতান ইব্রাহিম বিন মাসউদ, জহিরুদ্দৌলা ১১৮

কালামে পাকের কিতাবত ১১৮

রাজনৈতিক কৌশলে মালিক শাহ সেলজুকিকে পিছু হটানো ১১৮

হিন্দুস্তানে বিজয়সমূহ ১১৯

দুর্গ জয় এবং ইসলামের প্রচার ১১৯

সুলতান ইব্রাহিমের গুণাবলি ১২০

সন্তান-সন্ততির আধিক্য ১২০

সুলতান মাসউদ বিন ইব্রাহিম, আলাউদ্দৌলা (মাসউদ সালেস) ১২১

সুলতান আরসালান শাহ বিন মাসউদ, সুলতানুদ্দৌলা ১২২

আরসালান শাহের অযৌক্তিক কঠোরতা ১২২

মলিকার বিচক্ষণতা এবং সুলতান সঞ্জরের সৈন্য পরিচালনা ১২২

গজনীর ওপর আরসালান শাহের পুনরায় দখল এবং পরিণতি ১২৩

সুলতান বাহরাম শাহ বিন মাসউদ, মুইজ্জুদ্দৌলা ১২৪

মুহাম্মদ বাহলিমের সুলতান বাহরামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ১২৪

ঘোরি গোত্রের সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং পুনরায় তিক্ততা ১২৪

সাইফুদ্দিন ঘোরির আক্রমণ ১২৫

গজনীবাসীদের সাইফুদ্দিনের সাথে প্রতারণা ১২৫

আলাউদ্দিন হুসাইন কর্তৃক সুলতান বাহরামকে হুমকি ১২৫

হাতির মোকাবিলায় খুরমিল ১২৬

ঘোরিদের অনন্য প্রতিরক্ষামূলক পোশাক ১২৬

বাহরাম শাহের পুত্রের মৃত্যু, পরাজয় এবং পশ্চাদপসরণ ১২৬

বাহরাম শাহের মৃত্যু ১২৭

https://t.me/BoierSomahar

বহরাম শাহের শাসনামলের ওপর এক নজর ১২৭

সুলতান খসরু শাহ, জহিরুদ্দৌলা ১২৮

যখন গজনিকে অগ্নিদগ্ধ করা হলো ১২৮

নারীদের ওপর নির্যাতন ১২৮

গজনির ধ্বংসের ওপর আলাউদ্দিন হোসেনের আনন্দসূচক কবিতা ১২৯

গজনির সাদাতদের ওপর জঘন্যতম নির্যাতন ১২৯

গজনভি আমলের ইমারতসমূহ ধ্বংস ১৩০

সাদাতদের রক্ত ১৩০

খসরু শাহের শেষ আশাও শেষ ১৩০

গজনভি সুলতানদের পর গজনি শহরের অবস্থা ১৩১

সুলতান খসরু মালিক ১৩১

শিহাবুদ্দিন ঘুরি এবং খসরু মালিক ১৩১

খসরু মালিকের গ্রেফতারি - গজনভি বংশের সমাপ্তি ১৩২

গজনভি শাসকদের তালিকা ১৩৩

ঘুরি সালতানাত ১৩৫

ঘোর অঞ্চল, এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ভূখণ্ড ১৩৫

ঘুরি বংশের পটভূমি ১৩৬

ইজ্জুদ্দিন হাসানের অদ্ভুত কাহিনী ১৩৭

আওলাদে সাম, হাফত আখতার ১৩৮

মালিকুল জিবাল, কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ (বহরাম শাহের জামাতা) ১৩৯

সাইফুদ্দিন সুরি ১৪০

বাহাউদ্দিন সাম ১৪০

আলাউদ্দিন হোসেন জাহানসোজ ১৪১

গিয়াসুদ্দিন এবং শিহাবুদ্দিন: দুর্গ রক্ষা থেকে কারাবরণ পর্যন্ত ১৪১

সুলতান সাঞ্জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যুদ্ধ এবং গ্রেফতারি ১৪২

আলাউদ্দিন হোসেনের মুক্তি ১৪২

সাইফুদ্দিন ঘুরি বিন আলাউদ্দিন ১৪৩

বাতিনিয়া এবং কারামিতাদের বিরুদ্ধে অভিযান ১৪৩

সাইফুদ্দিন ঘুরির পরিণতি ১৪৩

সুলতান গিয়াসুদ্দিন ঘুরি ১৪৫

বাদশাহত কীভাবে পেলেন? ১৪৫

এক প্রাণ দুই দেহ ১৪৬

সালতানাত রক্ষার জন্য গিয়াসুদ্দিন ঘুরির অভিযানসমূহ ১৪৬

গিয়াসুদ্দিন এবং শিহাবুদ্দিন ঘুরির ধর্মীয় প্রবণতা ১৪৬

গিয়াসুদ্দিন ঘুরির গুণাবলি ১৪৭

খাওয়ারিজম শাহী সরকারের সাথে দ্বন্দ্ব ১৪৮

সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের সাথে যুদ্ধসমূহ ১৪৯

গজনি থেকে ঘুজ গোত্রসমূহের বহিষ্কার ১৪৯

গজনি থেকে খসরু মালিকের আমিরদের উচ্ছেদ ১৪৯

সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরির হিন্দুস্তানের প্রতিনিধিত্ব ১৫০

শিহাবুদ্দিনকে সুলতানি প্রতিনিধিত্ব প্রদান ১৫০

গজনি দ্বিতীয় রাজধানী ১৫০

শিহাবুদ্দিন ঘুরির প্রাথমিক কার্যক্রমসমূহ ১৫১

শিহাব উদ্দিন ঘুরীর ভারত বিজয় ১৫১

১. উচ্চ সিন্ধু, মুলতান, উচ ১৫১

২. গুজরাটে ভীম দেবের সাথে যুদ্ধ ও পরাজয় ১৫১

৩. যুদ্ধের নতুন নকশা: পেশোয়ার বিজয় ১৫২

৪. লাহোর সফর ১৫২

৫. নিম্ন সিন্ধু অভিযান ১৫২

৬. শিয়ালকোট নির্মাণ ১৫২

৭. লাহোর অভিযান ১৫৩

৮. ভাতিন্ডা দখল - তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১৫৩

৯. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫

পৃথ্বীরাজের গ্রেফতারি ও পরিণতি ১৫৭

শিহাব উদ্দিনের প্রত্যাবর্তন, কুতুব উদ্দিন আইবেকের প্রতিনিধিত্ব ১৫৭

১০. গাহড়বাল সালতানাত: চান্দোয়ারের যুদ্ধ, বেনারস বিজয় ১৫৭

১১. বায়ানা ও গোয়ালিয়র অভিযান ১৫৮

বিহার ও বাংলা বিজয় ১৫৯

সুলতান শিহাব উদ্দিন ঘুরীর শাসনকাল ১৬০

খাওয়ারিজমীয়দের কাছে পরাজয় ১৬০

খোখরদের সাথে যুদ্ধ ১৬১

ভারতের শেষ সফর - শিহাব উদ্দিন ঘুরীর তাবলিগী তৎপরতা ১৬১

শিহাব উদ্দিন ঘুরীর শাহাদাত ১৬২

সুলতান শিহাব উদ্দিন ঘুরীর সীরাত ১৬২

শিহাব উদ্দিন ঘুরীর অবদান - ইসলামী ভারতের মহান দুর্গ ১৬৩

ভারতে ঘুরী বিজয়ীদের সফলতার কারণসমূহ ১৬৪

১. সংখ্যাগরিষ্ঠের সামরিক প্রশিক্ষণহীনতা ১৬৪

২. শ্রম বিভাজনের সমস্যা ১৬৪

৩. সামাজিক স্থবিরতা ১৬৪

৪. মুসলমানদের প্রতি জনসমর্থন ১৬৪

৫. ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব ১৬৫

৬. লক্ষ্যের অভাব ১৬৫

৭. হিন্দুদের সেকেলে সামরিক ব্যবস্থা ১৬৫

ভারতে প্রাথমিক ইসলামী বিজয়ের প্রভাবসমূহ ১৬৬

সংযুক্ত রাষ্ট্র ১৬৬

সেকেলে সামন্ততন্ত্রের অবসান ১৬৬

উন্নত প্রশাসনিক কাঠামো ১৬৬

সুলতানদের শিক্ষিত হওয়া ১৬৭

বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ১৬৭

সবার জন্য নগর জীবন ১৬৭

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী গঠন ১৬৭

দেশজুড়ে সরকারি ভাষার ঐক্য ১৬৮

নির্মাণশৈলীর উন্নতি ১৬৮

ঘুরী শাসকদের তালিকা ১৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: গজনভী ও ঘুরী সুলতানদের সমসাময়িক উপমহাদেশের প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ ১৭০

আবু রায়হান আল-বিরুনী ১৭১

সালার মাসউদ গাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৭৩

হযরত সৈয়দ আলী হুজভিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৭৬

সুলতান সখী সরওয়ার রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৭৮

তৃতীয় অধ্যায়

দাস বংশ, খিলজি, তুঘলক, সাদাত এবং লোদী ১৮০

দিল্লির সুলতানদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৮১

দাস বংশ ১৮২

তোমার দাসরাই রাজত্ব করেছে ১৮৩

গজনীতে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ১৮৪

মাহমুদ বিন গিয়াসউদ্দিন ঘুরী, উত্তরাধিকারের পদপ্রার্থী ১৮৪

সুলতানের শাহাদাতের পর তাজউদ্দীন ইয়ালদুজের রাজনৈতিক ভূমিকা ১৮৪

গজনীর সিংহাসনে আলাউদ্দিন ১৮৫

গজনীতে বিশৃঙ্খলা ১৮৫

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক ১৮৭

দাসত্বে বদান্যতার চরম সীমা ১৮৭

যুদ্ধে বন্দিত্ব এবং প্রভুর অনুগ্রহ ১৮৮

আইবেকের ওপর শিহাবুদ্দিন ঘুরীর আস্থা ১৮৮

ভারতে আইবেকের প্রতিনিধিত্ব ও বিজয়সমূহ ১৮৯

হাসিতে জাটওয়ান রাজপুতের সাথে যুদ্ধ ১৮৯

মিরাট বিজয় ১৯০

দিল্লি বিজয় ১৯০

চান্দাওয়ারের যুদ্ধ ১৯১

সাদা হাতি ১৯১

বাদায়ুন ও কালপুরের অভিযান ১৯২

হরি রায়ের অবাধ্যতা ১৯২

রণথম্ভোর অবরোধ, আজমিরের যুদ্ধ, আইবেকের গজনী সফর ১৯৩

হরি রায়ের পরিণতি, আজমিরে মুসলিম শাসক নিয়োগ ১৯৩

আজমিরে মেহর রাজপুতদের আক্রমণ ব্যর্থ ১৯৩

গুজরাট আক্রমণ: ৫৯৩ হিজরি - গজনীর দ্বিতীয় সফর ১৯৪

বাদায়ুন ও কনৌজ ১৯৫

কালিঞ্জর ও পার্শ্ববর্তী দুর্গসমূহ ১৯৫

গজনীর তৃতীয় সফর: খোয়ারিজম যুদ্ধ ও আন্দখুইয়ের যুদ্ধ ১৯৫

মালিক বাহাউদ্দিন তুঘরিলের কীর্তিসমূহ ১৯৬

মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির কাহিনী ১৯৮

বিহারে অতর্কিত আক্রমণসমূহ ১৯৮

বিহার বিজয় ১৯৯

হাতির সাথে মোকাবিলা ২০০

বাংলা বিজয় ২০০

খিলজিদের কেন্দ্র লখনৌতি - দেবকোট ২০১

তিব্বত বিজয়ের পরিকল্পনা ২০২

বর্ধনকোট ও ব্রহ্মপুত্র নদ ২০২

পাথরের বিশাল খিলানযুক্ত সেতু ২০২

কামরূপ রাজ্যের রাজা ২০৩

বাঁশের বাহিনীর সাথে মোকাবিলা ২০৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

একটি বিশাল শহরের সংবাদ ২০৪

প্রত্যাবর্তন সফর এবং খাদ্য সংকট ২০৪

বিশাল খিলানযুক্ত সেতু ধ্বংস ২০৪

মুসলিমদের ঘিরে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা ২০৫

ইসলামি বাহিনীর ধ্বংস ২০৫

সম্ভবত সুলতান গাজীর ওপর বিপদ নেমে এসেছে! ২০৫

তিরস্কার ও অভিশাপ ২০৫

খিলজি সেনাপতির করুণ পরিণতি ২০৬

ভারতে আইবেকের স্বায়ত্তশাসন এবং সমস্যা ও অভিযানসমূহ ২০৭

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর উত্তরাধিকার সমস্যা ২০৭

কুতুবুদ্দিন আইবেকের পরীক্ষা ২০৭

নিজের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা ২০৮

শহীদ সুলতানের উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে শাসনের সনদ ২০৮

তাজুদ্দিন ইয়ালদোজের সাথে সংঘর্ষ ২০৮

স্থানীয় আমিরদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ২০৯

কুতুবুদ্দিন আইবেকের ইন্তেকাল ২০৯

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের রাজনৈতিক ভূমিকার ওপর এক নজর ২১০

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের গুণাবলি ২১১

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের স্থাপত্যসমূহ ২১২

কাসরে সপেদ (সাদা প্রাসাদ) ২১২

কুতুব মিনার ২১৩

মসজিদে কুওয়াতুল ইসলাম ২১৩

মসজিদে কুওয়াতুল ইসলামের ওপর আল্লামা ইকবালের কবিতা ২১৩

কুতুবুদ্দিন আইবেকের প্রতি হাফিজ জলন্ধরীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ২১৪

আরাম শাহ বিন কুতুবুদ্দিন আইবেক ২১৫

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ২১৬

একজন আল্লাহর অলির নসিহত ২১৬

আউলিয়াদের মজলিস এবং তুর্কি বালক ২১৬

গজনীর বাজারে গোলাম বালক ২১৭

আইবেকের পৃষ্ঠপোষকতায় ইলতুতমিশ ২১৮

জানবাজি রাখা কৃতিত্ব এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি ২১৮

দিল্লিতে ইলতুতমিশের সিংহাসন আরোহণ ২১৯

বাইয়াতের শরয়ি মর্যাদা এবং স্বাধীনতার সনদ ২১৯

প্রথম পর্যায়: বিদ্রোহী ও বিরোধীদের দমন ২২০

আমিরদের বিদ্রোহ ও পরাজয় ২২০

লাহোরে ইয়ালদোজের শাসন ২২০

তাজুদ্দিন ইয়ালদোজ গজনী থেকে বিতাড়িত ২২১

নাসিরুদ্দিন কাবাচার লাহোর দখল ২২১

লাহোরে ইয়ালদোজের দখল, ইলতুতমিশের সাথে যুদ্ধ এবং পরিণতি ২২১

নাসিরুদ্দিন কাবাচার লাহোর দখল, ইলতুতমিশের সাথে যুদ্ধসমূহ ২২২

দ্বিতীয় পর্যায়: মঙ্গোল আক্রমণ থেকে সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ ২২৩

সুলতান জালালুদ্দিনের প্রতি সুলতান ইলতুতমিশের বার্তা ২২৩

সুলতান ইলতুতমিশের কৌশলের তিনটি দিক ২২৪

জলালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ এবং কুবচা-এর দ্বন্দ্ব ২২৪

সুলতান ইলতুতমিশ এবং সুলতান জলালুদ্দিনের মধ্যে উত্তেজনা ও সন্ধি ২২৪

তৃতীয় পর্ব: সম্প্রসারণ ও বিজয় ২২৫

বাংলা ও বিহারের অবস্থা ২২৫

সুলতান ইলতুতমিশের লখনৌতি (পশ্চিমবঙ্গ) দখল ২২৬

রণথম্ভোর বিজয় ২২৭

কো-শিবালিক অভিযান ২২৭

নাসিরুদ্দিন কুবচার সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ ২২৭

পাঞ্জাব বিজয় ২২৭

সিন্ধু অন্তর্ভুক্তি ২২৮

কনৌজ বিজয় ২২৯

দরবারে খিলাফতে সমাদর ২২৯

যুবরাজের মৃত্যু এবং বিহার অভিযান ২২৯

ঘাতক হামলা ২২৯

গোয়ালিয়র অভিযান ২৩০

শাহজাদী রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা ২৩০

মালওয়া বিজয় এবং মূর্তিশালা ধ্বংস ২৩১

গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা নুসরাত উদ্দিন তাইসি ২৩২

কালিঞ্জর আক্রমণ ২৩২

সুলতান ইলতুতমিশের শেষ সফর ও মৃত্যু ২৩৩

সুলতান ইলতুতমিশের শাসন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক ২৩৪

নির্মাণ কাজ ২৩৪

কালো ও লাল পতাকা ২৩৪

রাজনীতি ও ন্যায়বিচারের পদ্ধতি ২৩৪

ওয়াজ ও নসিহতের মজলিস ২৩৫

কাজী হামিদ নাগোরি এবং সামা-এর মাসআলা ২৩৫

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রহ.)-এর জানাজা এবং ইলতুতমিশের তাকওয়া ২৩৭

সন্তান ও উত্তরাধিকারী ২৩৭

ছেলেরা ও নাতিরা ২৩৮

উমারা-ই-চিহিলগান ২৩৯

১. মালিক তাজউদ্দিন সঞ্জর কুজলুক খান ২৩৯

২. কবির খান আইয়াজ ২৩৯

৩. মালিক নুসরাত উদ্দিন তাইসি ২৩৯

৪. ইজ্জুদ্দিন তুঘরিল খান তুঘরিল ২৪০

৫. মালিক কামারুদ্দিন ইলতগিন, ইখতিয়ার উদ্দিন ২৪০

৬. আমির হাজিব ইলতগিন, ইখতিয়ার উদ্দিন ২৪০

৭. মালিক আলতুনিয়া ইখতিয়ার উদ্দিন ২৪০

৮. বলবন কবির, মালিক ইজ্জুদ্দিন কিশলু খান ২৪০

৯. বলবন সগির, বাহাউদ্দিন উলুগ খান (সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন) ২৪১

১০. মালিক নুসরাত উদ্দিন শের খান ২৪১

১১. কিশলু খান আমির হাজিব, সাইফ উদ্দিন আইবক ২৪২

১২. সাইফ উদ্দিন আইবক ওয়ালি-ই-উচ ২৪২

১৩. ইগান তত, সাইফ উদ্দিন আইবক ২৪৩

১৪. বিত খান, সাইফ উদ্দিন আইবক খিতায়ি ২৪৩

(১৫) আরসালান খান খাওয়ারিজমি, তাজউদ্দীন সানজার ২৪৩

(১৬) মালিক ইজ্জউদ্দীন তুগান খান তুগরিল ২৪৪

(১৭) তামার খান কিরান ২৪৪

রুকনউদ্দীন ফিরোজ শাহ বিন ইলতুতমিশ ২৪৫

নতুন বাদশাহর বিলাসিতা ২৪৫

তুর্কান খাতুনের জুলুম-অত্যাচার ২৪৬

রুকনউদ্দীনের নিষ্ঠুরতা। শাহজাদা কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুদণ্ড ২৪৬

সালতানাতের আমিরদের বিদ্রোহ ২৪৬

যুদ্ধের মেঘ। রাষ্ট্রের অভিজাতদের হত্যা করা হলো ২৪৭

তুর্কান খাতুন ও শাহজাদী রাজিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব ২৪৭

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভায় শাহজাদী রাজিয়ার ভাষণ ২৪৮

রুকনউদ্দীনের গ্রেপ্তার ২৪৮

রাজিয়া সুলতান বিনতে ইলতুতমিশ ২৪৯

রাজিয়ার সিংহাসন আরোহণ ২৫০

রুকনউদ্দীনের পরিণতি ২৫০

রাজিয়ার কর্মকাণ্ড ২৫১

কারামিতা-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ২৫২

কারামিতা সংক্রান্ত ব্যতিক্রম ২৫২

ধর্মীয় সহনশীলতা ২৫৩

বিদ্রোহের প্রথম পর্যায় ২৫৪

সুলতানার সামরিক পোশাক ২৫৫

সালতানাতের স্থিতিশীলতার যুগ ২৫৬

নতুন বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা ২৫৬

রথনপুর ফ্রন্ট ২৫৭

গোয়ালিয়র বিজয় ২৫৭

জনকল্যাণ এবং ন্যায়বিচার ২৫৭

নারীদের অধিকার ২৫৭

উলামা ও মাশায়েখদের প্রতি ভক্তি, ইলমি আলোচনা এবং দ্বীনি আত্মমর্যাদা ২৫৮

ধর্মীয় খিদমত ২৫৮

গবেষণা ও সংকলন পরিষদ ২৫৯

خانقاهوں (খানকাহ) গুলোর সাথে সহযোগিতা ২৫৯

মাদরাসা নির্মাণ ও উন্নয়ন ২৫৯

দ্বীনি পরিবেশ ২৫৯

বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায় ২৫৯

লাহোরে বিদ্রোহ ২৬০

ভাতিন্ডার যুদ্ধ। রাজিয়ার গ্রেপ্তার ২৬০

বিদ্রোহের প্রধান হোতা আইতিগিনের আধিপত্য ও উত্থান ২৬১

আইতিগিনের শিক্ষণীয় পরিণতি। বাহরাম শাহর প্রকৃত ক্ষমতা শুরু ২৬২

মালিক আলতুনিয়ার অনুশোচনা। রাজিয়া সুলতানের সাথে বিবাহ ২৬২

রাজিয়ার দিল্লি অভিযান এবং করুণ পরিণতি ২৬৩

রাজিয়ার কবর ২৬৪

মাজারে ইলতুতমিশ ২৬৪

রিজিয়ার চরিত্রের ওপর একটি মন্তব্য ২৬৪

রিজিয়ার ওপর মিথ্যা অপবাদ ও তার বাস্তবতা ২৬৪

চিন্তা ও ভাবনার স্থান ২৬৫

মুইজউদ্দীন বাহরাম শাহ বিন ইলতুতমিশ ২৬৬

একজন মজজুব, বাদশাহর বুদ্ধির ওপর সওয়ার ২৬৬

লাহোরে মঙ্গোলদের আক্রমণ। দ্বীনদার মুহাম্মদ ও মালিক কারাকুশের বীরত্ব ২৬৬

বাহরাম শাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ২৬৮

সুলতান আলাউদ্দীন মাসউদ বিন রুকনউদ্দীন ২৭০

পদমর্যাদা বণ্টন ২৭১

শাহজাদাদের মুক্তি ২৭১

হিন্দুদের আক্রমণ ২৭১

মঙ্গোলদের আক্রমণ ও বলবান সগীরের কীর্তিসমূহ ২৭২

আলাউদ্দীন মাসউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ২৭৩

সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ ২৭৪

নাসিরউদ্দীন মাহমুদের রাজনীতির ধরন ২৭৪

বিশৃঙ্খলাকারীদের দমনের অভিযানসমূহ ২৭৫

শাহজাদা জালালউদ্দীনের অসন্তোষ ২৭৫

সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদের সাথে বলবানের কন্যার বিবাহ ২৭৬

যখন বলবান সগীর 'উলুগ খাঁ' হলেন ২৭৬

ইজ্জউদ্দীন বলবানের ব্যর্থতাসমূহ ২৭৬

গোয়ালিয়র ও মালব অভিযান ২৭৭

উলুগ খাঁ (বলবান সগীর)-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জোট ও তার পতন ২৭৮

আরও একটি বিদ্রোহ ২৭৯

নাসিরউদ্দীন মাহমুদ পাঞ্জাবে ২৭৯

ইমাদউদ্দীন রায়হানের বরখাস্ত। বলবান সগীর পুনরায় নায়েবে সালতানাত ২৮০

সুলতানের মাতার সাথে কতলুগ খাঁর বিবাহ ও নতুন সমস্যাবলি ২৮০

অযোধ্যায় কতলুগ খাঁর বিদ্রোহ ২৮১

কতলুগ খাঁ ও বলবান কবীরের ব্যর্থ আঁতাত ২৮১

মঙ্গোলদের আক্রমণ ২৮২

বাগদাদের পতন। দিল্লির দরবারে মঙ্গোল দূত অভিভূত ২৮২

মেওয়াত অভিযান ২৮৩

সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদের মৃত্যু। জীবন ও চরিত্রের ওপর এক দৃষ্টি ২৮৩

কাজী মিনহাজুস সিরাজ ও তাবাকাতে নাসিরি ২৮৪

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবান ২৮৫

নতুন ব্যবস্থা ও রাজনীতির নতুন ধরন ২৮৫

মেওয়াত ২৮৬

দোয়াব ২৮৭

অযোধ্যার মহাসড়ক ২৮৭

কাটিহার (রোহিলখন্ড) ২৮৭

লবণ পর্বতমালা (কোহিস্তানে নমক) ২৮৮

লাহোর সফর ২৮৮

শাহজাদা মাহমুদ, বুগরা খাঁ, শাহজাদা মুহাম্মদ খাঁ এবং মঙ্গোলদের প্রতিরোধ ২৮৮

উমারা-ই-চেহেলগানের অবসান ২৮৯

জাগিরদারদের জবাবদিহিতা ২৯০

https://t.me/BoierSomahar

সম্প্রসারণের পরিবর্তে সুসংহতকরণ ২৯০

তাতারীদের সাথে যুদ্ধ ২৯১

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ২৯২

লখনৌতিতে তুঘরিলের বিদ্রোহ এবং সুলতান ২৯২

বলবনের দীর্ঘতম অভিযান ২৯২

যুবরাজ মুহাম্মদ খানের গুণাবলী ২৯৫

মঙ্গোল যুদ্ধের পূর্বে সুলতান বলবন কর্তৃক শাহজাদা মুহাম্মদ খানকে নসিহত ২৯৬

মঙ্গোলদের সাথে শাহজাদা মুহাম্মদ খানের যুদ্ধসমূহ ২৯৭

মঙ্গোলদের দ্বিতীয় আক্রমণ এবং শাহজাদা মুহাম্মদ খানের বীরত্ব ২৯৭

শাহজাদা মুহাম্মদ খানের শাহাদাত ২৯৯

সুলতান বলবনের শেষ দিনগুলো ২৯৯

মজলুমদের দীর্ঘশ্বাস ৩০০

বুগরা খানের প্রতি আশা ও নিরাশা ৩০০

বুগরা খানের যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল ধারণা ৩০১

সুলতানের ইন্তেকাল ৩০২

সুলতান বলবনের রাজনৈতিক পদ্ধতির ওপর এক নজর ৩০৩

সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন ও প্রশিক্ষণ ৩০৩

সৈন্য সংখ্যা ও বেতন বৃদ্ধি ৩০৩

অধীনস্থদের সাথে যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা ৩০৪

শিকারের বেশে সামরিক মহড়া ৩০৪

গোপনীয়তা রক্ষা ৩০৪

সৈন্যবাহিনীর যাত্রা ও অবস্থানের সময় দুর্বলদের প্রতি খেয়াল রাখা ৩০৪

সৈনিকদের পরিচয় ৩০৪

রাজনৈতিক সংস্কার ৩০৫

পদমর্যাদার জন্য শরীফ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্বাচন ৩০৫

পদস্থ কর্মকর্তাদের তদারকি ৩০৫

অমুসলিমদের উচ্চপদে নিয়োগে সতর্কতা ৩০৫

দুশ্চরিত্র ও নিচ মানসিকতার লোকদের থেকে পরিহার ৩০৫

বিদ্রোহী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতি কঠোরতা ৩০৬

বলবনের রাজনীতির কিছু অনন্য দিক ৩০৬

ইসলামী খিলাফতের প্রতি সম্মান ৩০৭

ন্যায় ও ইনসাফ ৩০৭

ইনসাফের মূর্ত প্রতীক, কাজী ইমাদুল মুলক ৩০৮

রাজকীয় আদব ও শান-শওকত ৩০৮

দরবারের দৃশ্য ৩০৯

শান-শওকতের দৃশ্য ৩০৯

উৎসব ও মাহফিলের দৃশ্য ৩১০

শিকারের শখ ৩১০

পারস্যের প্রাচীন সম্রাটদের দ্বারা প্রভাবিত ৩১১

আত্মপ্রদর্শন ও শান-শওকতের কাফফারা ৩১১

রাজনীতির শিক্ষা ৩১২

শাহজাদা বুগরা খানকে নসিহত ৩১২

নসিহতসমূহের সারসংক্ষেপ ৩১৩

দীনদারী ৩১৩

সালাত ও নফলের গুরুত্ব ৩১৪

উলামা ও মাশায়েখদের সাথে সম্পর্ক ৩১৪

মাজার যিয়ারত ও জানাজায় অংশগ্রহণ ৩১৪

ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ ৩১৪

ভুল সংশোধন ৩১৪

বলবন সম্পর্কে আল্লামা বারনী রহ.-এর অভিমত ৩১৫

মানবিক সমতা এবং বংশমর্যাদার প্রভাব ৩১৫

পরবর্তী যুগের ওপর সুলতান বলবনের সংস্কারের প্রভাব ৩১৬

সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ ৩১৭

ফখরুদ্দিন কোতয়ালের ষড়যন্ত্র ৩১৭

শাহজাদা 'কায় খসরু'র পলায়ন এবং শাহজাদা কায়কোবাদের সিংহাসন আরোহণ ৩১৭

পদমর্যাদা বণ্টন ৩১৮

মালিক নিজামুদ্দিনের উত্থান ও আধিপত্য ৩১৮

কায়কোবাদের বিলাসিতা ও মত্ততা ৩১৮

শাহজাদা 'কায় খসরু'র ইতিবৃত্ত ৩১৯

সুলতান কায়কোবাদের সাথে 'কায় খসরু'র পত্রালাপ ৩২০

মালিক নিজামুদ্দিন যেভাবে 'কায় খসরু'কে হত্যা করাল ৩২০

উজির খাজা খাতিরের অবমাননা - নওমুসলিম মঙ্গোল কর্মকর্তাদের ওপর জুলুম ৩২১

নিজামুদ্দিনের চাল এবং অন্যান্য আমিরদের ওপর অত্যাচার ৩২১

নিজামুদ্দিনকে ফখরুদ্দিন কোতয়ালের নসিহত ৩২২

নিজের ছেলে সুলতান কায়কোবাদের সাথে বুগরা খানের সাক্ষাতের প্রচেষ্টা ৩২৩

পিতা ও পুত্রের মধ্যে পত্রালাপ ৩২৪

পিতা ও পুত্র মুখোমুখি ৩২৫

সন্তানের প্রতি বুগরা খানের উপদেশ ও নসিহত ৩২৫

বুগরা খানের প্রত্যাবর্তন এবং শেষ নসিহত ৩২৭

কায়কোবাদের তওবা ভঙ্গ ৩২৮

নিজামুদ্দিনের পতন ৩২৮

নতুন পদবণ্টন ৩২৯

কায়কোবাদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত: সিংহাসনে তিন বছরের শিশু ৩২৯

মালিক কাচ্ছানের ষড়যন্ত্র - খিলজি সরদার মালিক ফিরোজের প্রতিরোধ ৩৩০

মালিক কাচ্ছানের ইতি - শিশু বাদশা মালিক ফিরোজ খিলজির হাতে ৩৩০

শামসুদ্দিন কায়ুমারস ৩৩১

কায়কোবাদ হত্যা - দাস বংশের অবসান ৩৩১

দাস বংশের পতনের কারণসমূহ ৩৩২

১. তুর্কি আমীর-ই-চাহেলগানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ৩৩২

২. অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ৩৩২

৩. সালতানাতের মৌলিক কাঠামোতে দুর্বলতা ৩৩২

৪. কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অভাব ৩৩২

৫. দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরসূরি ৩৩২

৬. আর্থিক স্থিতিশীলতার অভাব ৩৩৩

https://t.me/BoierSomahar

সামরিক ব্যবস্থায় দুর্বলতা এবং অভিজাতদের ওপর নির্ভরতা ৩৩৩

আমির ও সরদারদের মধ্যে গোত্রীয় দলাদলি ৩৩৩

খিলজি বংশ ৩৩৪

সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি ৩৩৫

খিলজি কারা ছিলেন? ৩৩৫

জালালুদ্দিন খিলজি - এক নতুন যুগের সূচনা ৩৩৫

পদবী বণ্টন ৩৩৬

সুলতানের দিল্লি আগমন এবং কুশক-ই-লালে প্রবেশ ৩৩৭

মালিক ছাজ্জুর বিদ্রোহ - সুলতানের কোমলতা ও সদাচরণ ৩৩৮

ঠগ ও লুটেরাদের সাথে আচরণ ৩৪০

সুলতানের বিরুদ্ধে আমিরদের জোট ৩৪০

সিদি মওলার ঘটনা ৩৪১

রাজপুতানা অভিযান ৩৪৩

তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৩৪৩

মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ ৩৪৪

“মান্দাওয়ার” অভিযান ৩৪৫

দেওগিরি বিজয় ৩৪৫

আলী গুরশাস্পের ষড়যন্ত্র - সুলতানকে হত্যা ৩৪৮

সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির চরিত্রের ওপর এক নজর ৩৫২

ক্ষমা ও উদারতা ৩৫২

নির্মাণশৈলীর শখ ৩৫৩

জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ৩৫৩

জুলুমের পরিণাম ৩৫৩

রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম (কদর খান) ৩৫৫

মলিকার ভুল সিদ্ধান্ত - রুকনুদ্দিন ইব্রাহিমের সিংহাসন আরোহণ ৩৫৫

আলী গুরশাস্পের আক্রমণ এবং রাজনৈতিক অনুগ্রহ ৩৫৫

সময় হাত থেকে বেরিয়ে গেছে ৩৫৬

রুকনুদ্দিন ইব্রাহিমের পলায়ন ৩৫৬

সুলতান علاؤ الدين খিলজি ৩৫৭

আলাউদ্দিনের ব্যক্তিত্ব ৩৫৭

নতুন পদমর্যাদা প্রদান ৩৫৮

আলাউদ্দিন খিলজির সম্মুখীন অভিযানসমূহ ৩৫৯

জালালুদ্দিন খিলজির পরিবারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ৩৬০

কোষাগার শক্তিশালী করা ৩৬০

সাম্রাজ্য বিস্তার ৩৬২

গুজরাট বিজয় ৩৬২

নওমুসলিম মঙ্গোলদের বিদ্রোহ এবং নুসরাত খানের জুলুম ৩৬৩

রণথম্ভোর অভিযান - সুলতানের ওপর প্রাণঘাতী হামলা ৩৬৪

আলমাস বেগের মৃত্যু ৩৬৫

হাজি মওলার বিদ্রোহ ৩৬৫

চিতোর বিজয় ৩৬৬

রানি পদ্মাবতীর সাহসিকতা ৩৬৭

গুজরাট পুনরুদ্ধার, আল্প খানের শাসনভার ৩৬৮

মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধসমূহ ৩৭০

মঙ্গোলদের প্রথম আক্রমণ - জলন্ধরের যুদ্ধ ৩৭০

সেহওয়ানের যুদ্ধ ৩৭১

মঙ্গোলদের দ্বিতীয় আক্রমণ: দিল্লির বাইরে “খেলি”-র যুদ্ধ ৩৭১

মঙ্গোলদের তৃতীয় আক্রমণ: দিল্লির কাছে পরিখা যুদ্ধ ৩৭৩

নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৩৭৪

আলাউদ্দিনের পথভ্রষ্টতা এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন ৩৭৪

মঙ্গোলদের চতুর্থ আক্রমণ: বরন (বুলন্দশহর)-এর যুদ্ধ ৩৭৭

মঙ্গোলদের পঞ্চম আক্রমণ: আমরোহা-র যুদ্ধ ৩৭৭

গুজরাটে মঙ্গোলদের আক্রমণ ৩৭৮

মঙ্গোলদের ষষ্ঠ আক্রমণ ৩৭৮

দক্ষিণ ভারত বিজয় ৩৮০

ওয়ারাঙ্গাল অভিযান ৩৮০

মালব ও উজ্জয়িনী বিজয় ৩৮১

দেবগিরি পুনর্দখল ৩৮১

দক্ষিণ ভারতে আরও আক্রমণ: ওয়ারাঙ্গাল বিজয় ৩৮২

ধোর সমুদ্র ও মাবার বিজয় ৩৮৩

শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ৩৮৩

বিদ্রোহ দমনে কঠোর পদক্ষেপ ৩৮৪

কাজী মুগীসের সাথে কথোপকথন ৩৮৬

আলাউদ্দিন খিলজির শেষ বছরগুলো এবং তার পতন ৩৯০

মালিক কাফুর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত অভিযানে ৩৯০

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত সম্পর্কে আলাউদ্দিনের কৌশল ৩৯০

নওমুসলিম মঙ্গোলদের গণহত্যা ৩৯১

একটি পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীর গণহত্যা ৩৯২

আলাউদ্দিনের ছেলেরা কেন বখে গেল? ৩৯২

যুবরাজ খিজির খান ও দেবল দেবীর প্রেম কাহিনী ৩৯৩

আলাউদ্দিনের মেজাজের উগ্রতা বৃদ্ধি ৩৯৩

মালিক কাফুর ও রাজপরিবারের দ্বন্দ্ব ৩৯৪

আলাউদ্দিনের অসুস্থতা ৩৯৪

খিজির খানের উত্তরাধিকার বাতিল: আল্প খানের হত্যাকাণ্ড ৩৯৫

খিজির খানকে কারারুদ্ধ করা ৩৯৬

আলাউদ্দিনের মৃত্যু ৩৯৬

আলাউদ্দিনের চরিত্র ও শাসনের ওপর এক নজর ৩৯৭

আলাউদ্দিনের কীর্তিসমূহ ৩৯৭

স্থাপত্য কীর্তিসমূহ ৩৯৭

শান্তি ও স্থিতিশীলতা ৩৯৮

প্রথিতযশা উলামা ও মাশায়েখদের আধিক্য ৩৯৮

আলাউদ্দিন খিলজি সম্পর্কে আল্লামা বারনির মন্তব্য ৩৯৯

আলাউদ্দিন খিলজি ও পদ্মাবত উপাখ্যান ৩৯৯

শিহাবুদ্দিন উমর ৪০১

কাফুরের নিমকহারামি ও শাহজাদাদের ওপর জুলুম ৪০১

শাহজাদা মুবারককে হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ ৪০২

কাফুরের পরিণতি ৪০২

https://t.me/BoierSomahar

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খলজি ৪০৩

মুবারক শাহের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ ৪০৩

মুবারক শাহের খসরু খান ও হুসামুদ্দিনের সাথে প্রণয় ৪০৪

গুজরাটের বিদ্রোহ এবং নতুন ব্যবস্থা ৪০৫

দেওগিরি সফর ৪০৫

নির্দোষ লোকদের হত্যা করা হয়েছে ৪০৬

ভাইদেরও হত্যা করিয়েছেন ৪০৬

বিদ্রোহের সন্দেহে দুই নায়েবকে হত্যা করা হয়েছে ৪০৭

বিদ্রোহের শাস্তি, মাত্র একটি চড় ৪০৭

কিছু চমৎকার ভাষণ ৪০৭

দেওগিরি কুতুবাবাদে পরিণত হলো ৪০৮

মুবারক শাহের অশুভ কর্মকাণ্ড ৪০৮

হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর অবমাননা ৪০৯

খসরু খানের বিজয় ও ষড়যন্ত্রসমূহ ৪১০

মা'বারে খসরু খানের বিদ্রোহী আচরণ ৪১০

খসরু খানের ষড়যন্ত্র ফাঁস এবং বাদশাহকে অবহিতকরণ ৪১০

খসরু খান বাদশাহকে প্রতারিত করতে সফল ৪১১

খসরুর ওপর মুবারক শাহের অন্ধ বিশ্বাস ৪১১

শাহী মহলের চাবিও খসরুর হাতে অর্পণ ৪১১

বাদশাহর ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রস্তুতি - কাজী খানের বাদশাহকে সতর্কীকরণ ৪১২

অদ্ভুত নেশা ও মত্ততার রাতে প্রাণঘাতী হামলা ৪১৩

আলাউদ্দিন খলজির সন্তানদের এই পরিণতি কেন হলো? ৪১৪

খসরু খান ৪১৫

খসরু খানের সিংহাসন আরোহণ ৪১৫

উমারাদের নীরবতা - শাহজাদীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত ৪১৫

আলাই শাহজাদাদের হত্যা করা হয়েছে ৪১৬

নতুন পদমর্যাদা ও দায়িত্বসমূহ ৪১৬

হিন্দুদের ওপর কোষাগার বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৪১৬

ইসলামি নিদর্শনের অবক্ষয় ৪১৭

গাজী মালিকের প্রস্তুতি, গোপন যোগাযোগ ৪১৮

মালিক জুনার দিল্লি থেকে পলায়ন ৪১৮

সিন্ধু ও পাঞ্জাবের উমারাদের সাথে গাজী মালিকের ঐক্য ৪১৯

গাজী মালিকের দিল্লির দিকে অগ্রসর হওয়া ৪২০

সরস্তির যুদ্ধ ৪২০

দিল্লির যুদ্ধ ৪২১

খলজি শাসনের পতনের কারণসমূহ ৪২২

১. আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর দুর্বল উত্তরাধিকারী ৪২২

২. দরবারি ষড়যন্ত্র এবং উমারাদের অসন্তোষ ৪২৩

৩. বর্ণবাদ এবং অ-তুর্কি উমারাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ৪২৩

৪. কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এবং প্রাদেশিক বিদ্রোহসমূহ ৪২৩

৫. অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ ৪২৩

৬. জনসমর্থনের অভাব ৪২৩

৭. খোজাদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ৪২৪

https://t.me/BoierSomahar

তুঘলক বংশ ৪২৫

তুঘলক কারা ছিলেন? ৪২৬

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ৪২৭

গাজী মালিকের দিল্লিতে প্রবেশ ৪২৭

বিনয় ও নম্রতা, বাদশাহিতে অস্বীকৃতি ৪২৭

বাহরাম আইবাকে বাদশাহির প্রস্তাব ৪২৮

যখন গাজী মালিক সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক হলেন ৪২৮

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক - শাসন ও চরিত্র ৪২৯

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ৪২৯

পদমর্যাদা গঠন ৪৩০

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য ৪৩১

মজবুত প্রতিরক্ষা ৪৩১

অর্থনৈতিক সংস্কার ৪৩১

গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ ৪৩২

মঙ্গোলদের একটি ব্যর্থ আক্রমণ ৪৩২

দাক্ষিণাত্য ও তেলেঙ্গানার প্রথম অভিযান ৪৩২

তেলেঙ্গানায় দ্বিতীয় আক্রমণ ও বিজয় ৪৩৪

বাংলা বিজয় - লখনৌতি ও সোনারগাঁওকে নতুন করে দিল্লির সাথে অন্তর্ভুক্তি ৪৩৫

দিল্লি থেকে অন্তর্ভুক্তি ৪৩৫

তিরহুত দুর্গ জয় ৪৩৬

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যু ৪৩৬

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর তারিখ ৪৩৬

সংস্কার ও কীর্তিসমূহ ৪৩৭

ঐতিহাসিক ফেরেশতার দৃষ্টিতে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ৪৩৮

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক ৪৪০

ঘটনাবলির বিন্যাস ৪৪১

নতুন নিয়োগসমূহ ৪৪১

দৌলতাবাদ (কুব্বাতুল ইসলাম) ৪৪২

ছবির অন্য পিঠ ৪৪২

রাজধানী কি পরিবর্তন করা হয়েছিল? ৪৪৩

দৌলতাবাদ যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি তড়িঘড়ি করে নেওয়া হয়েছিল? ৪৪৪

দৌলতাবাদ যাওয়ার সুযোগ-সুবিধা ৪৪৪

দৌলতাবাদের জনবসতির ওপর গুরুত্বারোপ ৪৪৫

মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ ৪৪৫

দক্ষিণ ভারতে গুরশাস্পের বিদ্রোহ ও দমন ৪৪৫

কন্ধানা বিজয় ৪৪৭

কিশলু খানের বিদ্রোহ ৪৪৭

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের বিদ্রোহ ৪৪৯

দিল্লিতে সাময়িক দুই বছরের অবস্থান ৪৪৯

মঙ্গোলদের আক্রমণ ৪৪৯

দোয়াবে গণহত্যা ৪৫০

দক্ষিণ ভারতের ওপর নতুন কর ৪৫০

প্রথম দুর্ভিক্ষ ৪৫১

সেচ কাজের জন্য অনুদান ৪৫১

দুর্ভিক্ষের অবসান - দৌলতাবাদ থেকে ফেরার সিদ্ধান্ত এবং নতুন নিয়োগসমূহ ৪৫১

সুলতানের মাতা ও উজিরের দিল্লি আগমন ৪৫২

রাজধানী দৌলতাবাদ থেকে পুনরায় দিল্লি ৪৫২

দূরবর্তী লক্ষ্য, ব্যর্থ অভিযান ৪৫৩

ইরাক ও মধ্য এশিয়া বিজয়ের পরিকল্পনা ৪৫৩

চীন বিজয়ের স্বপ্ন - অগণিত পুঁজি নষ্ট ৪৫৪

বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা ৪৫৫

বাংলায় বিদ্রোহ ৪৫৫

দক্ষিণ ভারতে সৈয়দ আহসানের বিদ্রোহ ৪৫৬

সুলতানের দিল্লি থেকে গুজরাট যাত্রা ৪৫৭

লাহোরে বিদ্রোহ ৪৫৭

মহামারীর কারণে সুলতানের ওয়ারাঙ্গল অভিযান ব্যর্থ ৪৫৮

পুনরায় দুর্ভিক্ষ ৪৫৯

শাহু লোধির দমন ৪৬০

দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা - সুলতানের পদক্ষেপসমূহ ৪৬০

সুনাম ও সামানার দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের শহরে পুনর্বাসন ৪৬১

সর্গদুয়ারিতে অবস্থান ৪৬১

আইনুল মুলকের বিদ্রোহ ৪৬২

ট্যাক্স মওকুফ, ইনসাফের আদালত ৪৬৫

দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি - মাজার সালার মাসউদ গাজী রহ.-এ উপস্থিতি ৪৬৬

সুলতানের দিল্লি প্রত্যাবর্তন ৪৬৬

শেখ শাহাবুদ্দিন বিন আহমদ জামের হত্যাকাণ্ড ৪৬৬

ইবনে বতুতার ওপর অসন্তুষ্টি ৪৬৭

সুলতানের সম্ভল যাত্রা ৪৬৮

চীন সম্রাটের দূতদল ৪৬৮

আব্বাসীয় খলিফার দূতের অভ্যর্থনা ৪৬৯

বিদ্রোহের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা ৪৭০

উত্তর পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ৪৭০

নিজাম মাইনের বিদ্রোহ ৪৭০

গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহসমূহ ৪৭০

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ নায়কের বিদ্রোহ ৪৭১

বিদরে (দাক্ষিণাত্য) নসরতের বিদ্রোহ ৪৭১

আমিরানে সাদাহ ও আলী শাহের বিদ্রোহ ৪৭১

দাক্ষিণাত্যের নতুন ব্যবস্থা ৪৭২

নওমুসলিমরা গুরুত্বপূর্ণ পদে ৪৭২

গুজরাটে আফগান ও আমিরানে সাদাহর বিদ্রোহ ৪৭৩

সুলতানের গুজরাট সফর ৪৭৪

আল্লামা বারানি ও সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের কথোপকথন ৪৭৫

গুজরাটের শাসক আজিজ খাম্মার নিহত ৪৭৬

বিদ্রোহীদের ওপর সুলতানের বিজয় ৪৭৬

দৌলতাবাদেও আমিরানে সাদাহর বিদ্রোহ ৪৭৭

আমিরানে সাদাহর সাথে ভরুচের যুদ্ধ ৪৭৭

মালিক তাগির বিদ্রোহ ৪৭৮

সুলতান ও আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানির কথোপকথন ৪৭৮

গুজরাটে অবস্থান ৪৮০

মালিক তাগির পশ্চাদ্ধাবন - কর্নাল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত ৪৮০

সুলতানের অসুস্থতা এবং দিল্লি থেকে রাজকীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আগমন ৪৮১

শেষ অভিযান ও পরকালের সফর ৪৮১

https://t.me/BoierSomahar

ফিরোজ শাহ তুঘলকের উত্তরাধিকার - একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত ৪৮২

পতনের কারণসমূহ ৪৮৩

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের চরিত্রের ওপর এক নজর ৪৮৪

প্রকোপ বা ক্রোধোন্মত্ততা ৪৮৫

হাতির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ভয়াবহ পদ্ধতি ৪৮৫

একজন কারামতধারী বুজুর্গের হত্যাকাণ্ড ৪৮৬

ফরগানার অধিপতির হত্যাকাণ্ড ৪৮৬

দুইজন নির্দোষ যুবকের হত্যাকাণ্ড ৪৮৬

একটি বাক্যের কারণে তিনজন আলিমকে মৃত্যুদণ্ড ৪৮৭

সুফিয়ায়ে কিরামকে দমন ও পিষ্ট করার প্রচেষ্টা ৪৮৮

শাহ রুকন-ই-আলম রহমতুল্লাহি আলাইহির নাতির সাথে অমানবিক আচরণ ৪৮৮

নিষ্ঠুর আদেশের এক অদ্ভুত কাহিনী ৪৮৯

আলিম ও মাশায়েখদের থেকে সেবা গ্রহণ করে তাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো ৪৮৯

সিন্ধুর দুইজন ফকীহ থেকে না করা অপরাধের জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় ৪৯০

খতীবুল খুতাবা চাবুকের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন ৪৯১

নিজের জুলুমের মধ্যে আলিমদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা ৪৯১

শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ-ই-দেহলি রহমতুল্লাহি আলাইহির অবমাননা ৪৯১

মুহাম্মদ তুঘলকের জুলুমের ওপর মন্তব্য ৪৯২

সুলতানের ধর্মীয় প্রবণতা ও চিন্তাধারা ৪৯২

সুলতানের মস্তিষ্কে যুক্তিনির্ভর বিদ্যার (মাকুলাত) প্রভাব ৪৯২

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের অদ্ভুত ও বিচিত্র চিন্তাভাবনা ৪৯৩

সুলতান কি বেদ্বীন নাকি দ্বীনদার? ৪৯৪

কিছু ব্যর্থ পরিকল্পনা ৪৯৫

প্রতীকী মুদ্রা ৪৯৫

আমীর-ই-কোহি আইনসমূহ ৪৯৬

দৌলতাবাদ সমস্যা এবং কিছু বিবেচ্য দিক ৪৯৭

দিল্লির সমস্ত জনসংখ্যাকে স্থানান্তরিত করা হয়নি ৪৯৭

দৌলতাবাদের বিস্তৃতি দিল্লির সমান হওয়া অসম্ভব ছিল ৪৯৮

জনসংখ্যা স্থানান্তরের অর্থ ৪৯৯

দিল্লিতে বাইরে থেকে লোক এনে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল ৫০০

ইবনে বতুতার সাক্ষ্য ৫০০

দৌলতাবাদ, কুব্বাতুল ইসলাম-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে পারেনি ৫০১

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আবেগীয় দিকের প্রাধান্য ৫০৩

দৌলতাবাদে জোরপূর্বক হিজরত করানোর সুফল ৫০৩

কীর্তিগাথা, শান-শওকত এবং ইতিবাচক গুণাবলি ৫০৫

রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নির্বাচন এবং পারস্পরিক আস্থা ৫০৫

দরবারের শান-শওকত ৫০৬

ইলমি মজলিস, মেহমানদারি, শিকার ৫০৭

ডাক ব্যবস্থার দ্রুতগতি ৫০৮

সাধারণ জীবনযাপন - জনগণের সাথে দূরত্ব কম ৫০৮

বংশীয় আমীরদের প্রতি ঘৃণা, বিদেশী শরীফদের প্রতি ভালোবাসা ৫০৮

অমুসলিমদের প্রতি কোমলতা ৫০৯

সুখ-সমৃদ্ধি ৫১০

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

গোয়েন্দা ব্যবস্থার ক্ষিপ্রতা ..... পৃষ্ঠা ৫১০

মদ নিষিদ্ধ, পান সাধারণ ..... পৃষ্ঠা ৫১০

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহের মাজার নির্মাণ ..... পৃষ্ঠা ৫১০

বদান্যতার চরম সীমা ..... পৃষ্ঠা ৫১১

ন্যায় ও বিচার ..... পৃষ্ঠা ৫১২

অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তা ও মেধার ক্ষিপ্রতা ..... পৃষ্ঠা ৫১২

শেষ কথা ..... পৃষ্ঠা ৫১৩

ফিরোজ শাহ তুঘলক ..... পৃষ্ঠা ৫১৫

সিংহাসন আরোহণ কীভাবে হলো? ..... পৃষ্ঠা ৫১৫

প্রথম সমস্যা, খাজা জাহান আহমদ আয়াজের বিদ্রোহ ..... পৃষ্ঠা ৫১৭

একটি অপ্রত্যাশিত যুগের সূচনা ..... পৃষ্ঠা ৫১৮

সুলতান ফিরোজ শাহের আমীরগণ ..... পৃষ্ঠা ৫১৮

মালিক মকবুল - মালিক বশীর ..... পৃষ্ঠা ৫১৯

মালিক তাতার খান ..... পৃষ্ঠা ৫১৯

অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমীর ..... পৃষ্ঠা ৫১৯

চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ..... পৃষ্ঠা ৫২০

প্রথম পদক্ষেপ, আইন পরিবর্তন ..... পৃষ্ঠা ৫২০

দ্বিতীয় পদক্ষেপ, ঋণ মওকুফ ..... পৃষ্ঠা ৫২১

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, মজলুমদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ..... পৃষ্ঠা ৫২১

চতুর্থ পদক্ষেপ, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত ..... পৃষ্ঠা ৫২১

নতুন রাজধানী ফিরোজাবাদ নির্মাণ ..... পৃষ্ঠা ৫২১

জনসাধারণের সাথে মেলামেশা এবং তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ ..... পৃষ্ঠা ৫২২

শাহজাদী খুদাওয়ান্দজাদার ষড়যন্ত্র এবং সুলতানের মহানুভবতা ..... পৃষ্ঠা ৫২৩

ফিরোজ শাহের অভিযানসমূহ ..... পৃষ্ঠা ৫২৫

বাংলার প্রথম অভিযান ..... পৃষ্ঠা ৫২৫

আব্বাসীয় খলিফার পক্ষ থেকে সালতানাতের সনদ ..... পৃষ্ঠা ৫২৬

মঙ্গোলদের আক্রমণ ..... পৃষ্ঠা ৫২৬

বাংলার দ্বিতীয় অভিযান ..... পৃষ্ঠা ৫২৬

জাজনগরের (উড়িষ্যা) অভিযান ..... পৃষ্ঠা ৫২৭

নগরকোটের অভিযান ..... পৃষ্ঠা ৫২৮

ঠাট্টার প্রথম অভিযান ..... পৃষ্ঠা ৫২৮

ঠাট্টা থেকে গুজরাট পর্যন্ত প্রাণঘাতী সফর ..... পৃষ্ঠা ৫২৯

ঠাট্টার দ্বিতীয় অভিযান ..... পৃষ্ঠা ৫৩০

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কার ও কীর্তিসমূহ ..... পৃষ্ঠা ৫৩১

জনকল্যাণমূলক কাজ ..... পৃষ্ঠা ৫৩১

আইন ও দণ্ডবিধিতে সংস্কার ..... পৃষ্ঠা ৫৩১

অবৈধ কর বিলুপ্তি ..... পৃষ্ঠা ৫৩২

ন্যায় ও বিচার ..... পৃষ্ঠা ৫৩২

দেওয়ান-ই-খয়রাত (মেয়েদের বিয়ের সহায়তাকারী বিভাগ) ..... পৃষ্ঠা ৫৩২

উলামা, কুররা এবং হাফেজদের জন্য ভাতা ..... পৃষ্ঠা ৫৩২

দরিদ্র ও নিঃস্বদের জন্য বাজেট ..... পৃষ্ঠা ৫৩৩

বন্দীদের প্রতি দয়া ..... পৃষ্ঠা ৫৩৩

সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন ..... পৃষ্ঠা ৫৩৩

কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতি ..... পৃষ্ঠা ৫৩৩

কৃষি ও উদ্যানপালন ..... পৃষ্ঠা ৫৩৩

জলসেচ ..... পৃষ্ঠা ৫৩৪

অর্থনৈতিক উন্নতিতে দাসদের ব্যবহার ..... পৃষ্ঠা ৫৩৪

শিল্প ও কারুশিল্প ..... পৃষ্ঠা ৫৩৫

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ ..... পৃষ্ঠা ৫৩৬

সস্তা দর ও সমৃদ্ধি ..... পৃষ্ঠা ৫৩৬

নতুন মুদ্রা প্রচলন ৫৩৬

নির্মাণশৈলীর কৃতিত্ব ৫৩৭

ধর্মীয় স্থাপনা ৫৩৭

জাতীয় ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ৫৩৭

বসতি ও শহর নির্মাণ এবং আবাদকরণ ৫৩৭

শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের প্রকল্পসমূহ ৫৩৭

দিল্লিতে সম্প্রসারণ ও নির্মাণ কাজ ৫৩৮

হাসপাতালসমূহ ৫৩৮

খানকাহ ও মুসাফিরখানা ৫৩৮

মসজিদ নির্মাণ, মেরামত ও আবাদকরণ ৫৩৮

নির্মাণ কাজে শৃঙ্খলা ৫৩৯

অশোকের স্তম্ভ ৫৩৯

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জোয়ার ৫৪০

মাদরাসা-ই-ফিরোজ শাহী ৫৪০

ফাতাওয়া-ই-তাতারখানিয়া ৫৪১

ইতিহাস গ্রন্থের কাজ ৫৪১

প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ৫৪১

ক্রীতদাসদের গুণী ব্যক্তিতে রূপান্তর ৫৪১

তাস ঘড়িয়াল (জলঘড়ি) ৫৪২

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ৫৪২

জাদুঘর ৫৪২

শরয়ী বিধান কার্যকর করা ৫৪২

রাফেজীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ৫৪৩

আবাহিয়া নামক শয়তানি ফেরকার দমন ৫৪৩

তৌহিনে রিসালাতের শাস্তি ৫৪৪

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারের মৃত্যুদণ্ড ৫৪৪

খোদা হওয়ার দাবিদারের পরিণতি ৫৪৪

মাজারসমূহে কুসংস্কার প্রতিরোধ ৫৪৪

নতুন মন্দির নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা ৫৪৬

সোনা-রূপার ব্যবহার নিষিদ্ধ ৫৪৫

প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ ৫৪৫

ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া ৫৪৫

ইসলাম প্রচার ৫৪৬

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন - নতুন প্রশাসনিক বিন্যাস ৫৪৬

ফিরোজ শাহ তুঘলকের শেষ কয়েক বছর ৫৪৭

উজির মালিক মকবুল খাজা জাহানের মৃত্যু ৫৪৭

জাফর খানের মৃত্যু - গুজরাটে বিদ্রোহ ৫৪৭

শাহজাদা ফতেহ খানের মৃত্যু ৫৪৭

হিন্দু চৌধুরী ও রাজপুতদের বিদ্রোহ ৫৪৮

খান জাহান সানি ও শাহজাদা মুহাম্মদ খানের দ্বন্দ্ব ৫৪৯

পিতার সাথে সাক্ষাতের জন্য শাহজাদার অদ্ভুত কৌশল ৫৪৯

উজির খান জাহান সানির পলায়ন ৫৫০

ভারপ্রাপ্ত শাসক: মুহাম্মদ খান, (সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ) ৫৫০

উজির খান জাহান সানির শিক্ষণীয় পরিণতি ৫৫০

দিল্লি থেকে গুজরাট সালতানাতের বিচ্ছিন্নতা ৫৫০

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বশীরের বিশ্বাসঘাতকতা ৫৫১

মালিক-ই-ফিরোজীর বিদ্রোহ ৫৫১

ইন্তেকাল ৫৫২

একটি দুর্বলতা ৫৫২

https://t.me/BoierSomahar

ফিরোজ শাহের উত্তরসূরি এবং অরাজকতা ৫৫৩

ফিরোজ শাহের পর সালতানাতের পতনের প্রধান কারণসমূহ ৫৫৩

অরাজকতার নেতিবাচক প্রভাব ৫৫৪

তুঘলক শাহ সানি, গিয়াসউদ্দিন (ইবনে ফতেহ খান বিন ফিরোজ শাহ তুঘলক) ৫৫৫

আবু বকর শাহ (বিন জাফর খান বিন ফিরোজ শাহ তুঘলক) ৫৫৬

মুহাম্মদ খান - নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (বিন ফিরোজ শাহ তুঘলক) ৫৫৮

আলাউদ্দিন সিকান্দার শাহ (বিন মুহাম্মদ শাহ) ৫৬০

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (বিন মুহাম্মদ শাহ) ৫৬১

সরকারি বিন্যাস ৫৬১

দিল্লির নতুন কৌশল এবং সালতানাতে শরকিয়া ৫৬২

জৌনপুর প্রতিষ্ঠা ৫৬২

পাঞ্জাবে সারং খানের বিজয়সমূহ ৫৬২

সাদাত খান এবং দিল্লির নায়েবে সালতানাতের যুদ্ধ ৫৬২

নুসরাত খান (ফিরোজাবাদে সমান্তরাল সরকার) ৫৬৪

সাদাত খান হত্যা - শাহজাদা নুসরাতের উত্থান ৫৬৪

ফিরোজাবাদ ও দিল্লির মধ্যে তিন বছরের যুদ্ধ ৫৬৪

সারং খানের উত্থান ৫৬৫

সারং খানের পরাজয় ৫৬৫

ইকবাল মল্লুর উত্থান - শাহজাদা নুসরাতের শাসনের অবসান ৫৬৫

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ অসহায় - ইকবাল মল্লুর ক্ষমতা ৫৬৬

ইকবাল মল্লুর আক্রমণ - তাতার খানের গুজরাটে প্রত্যাবর্তন ৫৬৬

তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণ ৫৬৭

তৈমুরের পরিকল্পনা ৫৬৭

শাহজাদা পীর মুহাম্মদের উচ আক্রমণ ৫৬৭

শাহজাদা পীর মুহাম্মদ মুলতান ঘেরাও করলেন ৫৬৮

তৈমুরি বাহিনীর যাত্রা - আফগানিস্তানে লুটতরাজ ৫৬৮

ইয়াজদির বর্ণিত আরও কিছু বিবরণ ৫৬৯

তুলম্বায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ধ্বংসযজ্ঞ ৫৬৯

নুসরাত খোখরের আক্রমণ - শাহনওয়াজে শস্য ভস্মীভূত ৫৬৯

নাতি ও দাদা একত্রিত হলেন ৫৭০

দিপালপুর ও পাকপত্তনের অবস্থা - তৈমুরের দ্রুতগতি ৫৭০

ভাটনের অবরোধ ৫৭১

রাজস্থান থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত ৫৭২

দিল্লির কাছে ৫৭২

যমুনার ওপারে, লোনি দুর্গের ধ্বংসযজ্ঞ ৫৭৩

তৈমুর ফিরোজাবাদে ৫৭৩

ইকবাল খান মল্লুর আক্রমণ ও পিছু হটা ৫৭৩

https://t.me/BoierSomahar

বন্দীদের গণহত্যা ৫৭৩

দিল্লির সামনে চূড়ান্ত যুদ্ধ ৫৭৪

দিল্লি অবরোধ - প্রাণভিক্ষার ঘোষণা ৫৭৪

শান্তি ও শৃঙ্খলার সাময়িক বিরতি - খিজির খানের আগমন ৫৭৫

দিল্লিতে কেয়ামত ৫৭৫

তৈমুরের দরবারি ঐতিহাসিক ইয়াজদির বর্ণনা ৫৭৬

উল্লিখিত বর্ণনার ওপর মন্তব্য ৫৭৭

দিল্লিতে মহামারি ৫৭৭

তৈমুরের প্রত্যাবর্তন - মিরাটের ধ্বংসলীলা ৫৭৮

দোয়াব থেকে শিবালিক পর্বত পর্যন্ত ব্যাপক লুটতরাজ ৫৭৮

কাশ্মীরের সুলতান সিকান্দারের অনাগ্রহ ৫৭৯

জম্মুর রাজার ইসলাম গ্রহণ ৫৭৯

শাইখা খোখরের মামলা ৫৭৯

খিজির খানের পুনরায় উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্ব ৫৮০

তৈমুর, সিন্ধু নদ থেকে সমরকন্দ পর্যন্ত ৫৮০

তৈমুরি আক্রমণের পর উপমহাদেশের অবস্থা ৫৮১

তৈমুরি ঐতিহাসিকদের মিথ্যা দাবি ৫৮১

নৈরাজ্যের তীব্রতা ৫৮৩

সালতানাতের খণ্ড-বিখণ্ডের দৃশ্যপট ৫৮৩

শাহজাদা নুসরাত খানের দিল্লি দখল ও পলায়ন ৫৮৪

ইকবাল মল্লুর উত্থান ৫৮৪

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (পুনরায়) ৫৮৫

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ও ইকবাল মল্লুর মধ্যে শত্রুতা ৫৮৫

ইকবাল মল্লুর পরিণতি ৫৮৫

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ আবারও দিল্লির সিংহাসনে ৫৮৬

তৈমুরের শেষ অভিযানসমূহ, মৃত্যু এবং শাহ রুখ মির্জার শাসনকাল ৫৮৬

দৌলত খান দাবির ও খিজির খানের দ্বন্দ্ব ৫৮৬

দিল্লিতে খিজির খানের আক্রমণসমূহ ৫৮৭

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তুঘলকের মৃত্যু ৫৮৭

দৌলত খান দাবির ৫৮৮

তুঘলক শাসন আমলের প্রশাসনিক ও তামাদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের ওপর এক নজর ৫৮৯

তুঘলক বংশের পতনের কারণসমূহ ৫৯১

১. মুহাম্মদ তুঘলকের অস্থিতিশীল নীতিসমূহ ৫৯১

২. রাজধানী স্থানান্তর ৫৯১

৩. প্রতীকী মুদ্রা ৫৯১

৪. দোয়াবে কর বৃদ্ধি ৫৯১

৫. হিমাচল (হিমালয়) এবং ইরান ও খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা ৫৯১

৬. ফিরোজ শাহ তুঘলকের কিছু অনুপযুক্ত পদক্ষেপ ৫৯২

৭. জায়গিরদারি প্রথার পুনর্বহাল ৫৯২

৮. পদের বংশপরম্পরা ৫৯২

৯. ক্রীতদাসের অতিরিক্ত সংখ্যা ৫৯২

১০. স্বাধীন রাজ্যগুলোর উত্থান ৫৯২

১১. আর্থিক অস্থিতিশীলতা ৫৯২

১২. দুর্বল উত্তরসূরি ৫৯২

১৩. তৈমুরের আক্রমণ ৫৯৩

https://t.me/BoierSomahar

সৈয়দ খানদান (খানওয়াদা-এ খিজরিয়া) ৫৯৪
খিজর খান ৫৯৫
দৌলত খান দবীর ও খিজর খানের দ্বন্দ্ব ৫৯৫
খিজর খানের শাসনের সূচনা ৫৯৬
নতুন প্রশাসনিক বিন্যাস ৫৯৬
সৈয়দ হওয়ার কাহিনী কেন প্রচার করা হলো? ৫৯৬
বিদ্রোহ ও অভিযানসমূহ ৫৯৭
খিজর খানের মৃত্যু ৫৯৭
মুবারক শাহ (বিন খিজর খান) ৫৯৮
ধারাবাহিক অভিযানসমূহ ৫৯৮
মুবারক শাহের হত্যাকাণ্ড ৬০০
মুবারকাবাদ শহর ৬০১
তারিখ-ই-মুবারক শাহী ৬০১
মুবারক শাহের শাসনামলের ওপর এক নজর ৬০১
মুহাম্মদ শাহ (বিন ফরিদ খান বিন খিজর খান) ৬০২
সরওয়ারুল মুলকের উত্থান ও পতন ৬০২
মুহাম্মদ শাহের দ্বিতীয়বার রাজ্যাভিষেক ও পদবন্টন ৬০৩
দিল্লি ও সিরহিন্দের আফগানদের মধ্যে সংঘর্ষ ৬০৩
বাহলুল লোধির সিরহিন্দ দখল ও দিল্লির শাহের সাথে চুক্তি ৬০৪
মালবের শাসক মাহমুদ খান খিলজির দিল্লি আক্রমণ ৬০৫
বাহলুল লোধি দিল্লির শাহের সাহায্যকারী ৬০৫
বাহলুল লোধির দিল্লির শাহের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ৬০৬

মুহাম্মদ শাহের মৃত্যু ৬০৬
আলাউদ্দিন আলম শাহ ৬০৭
তওয়াইফুল মুলুকি ৬০৭
উজিরের প্রতি বাদশাহর অসন্তুষ্টি ৬০৮
বাদশাহর বদায়ূনে স্থায়ী অবস্থান ৬০৮
উজির হামিদ খানের গ্রেফতারি, মুক্তি ও দিল্লির ওপর দখল ৬০৯
বাদশাহর উদাসীনতা ও আত্মবিস্মৃতি ৬০৯
যখন হামিদ খান দিল্লির সিংহাসন বাহলুলকে অর্পণ করলেন ৬০৯
আলাউদ্দিন আলম শাহের মৃত্যু ৬১০
খিজর খান বংশের শাসন কেন ব্যর্থ হলো? ৬১১
১ কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতা ও তৈমুরের আক্রমণ ৬১১
২ দুর্বল নেতৃত্ব ও অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ৬১১
৩ আর্থিক দুরবস্থা ও অর্থনৈতিক চাপ ৬১১
৪ বিদ্রোহ ও আঞ্চলিক সরদারদের উত্থান ৬১১
৫ বাহ্যিক বিপদ ও লোধি বংশের উত্থান ৬১২
লোধি খানদান ৬১৩
লোধিদের পরিচিতি ৬১৪
লোধি বংশের কাহিনী ৬১৪
বাহলুল লোধি ৬১৬
হামিদ খানের অপসারণ ৬১৬

বাহ

লুলের শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৬১৬

বহলুলের আমীর ও সহচরবৃন্দ ৬১৭
বহলুল লোদীর গুণাবলি ৬১৮
সালতানাতের উজির হামিদ খানের বিরুদ্ধে অদ্ভুত কৌশল ৬১৮
জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধসমূহ ৬২০
প্রথম যুদ্ধ, দিল্লির লড়াই ৬২০
অন্যান্য বিজয়সমূহ ৬২২
দ্বিতীয় যুদ্ধ, ইটাওয়ার লড়াই ৬২২
তৃতীয় যুদ্ধ, শামসাবাদের লড়াই, মাহমুদ শারকির মৃত্যু ৬২৩
চতুর্থ যুদ্ধ এবং চার বছরের সন্ধি ৬২৩
পঞ্চম যুদ্ধ এবং তিন বছরের সন্ধি ৬২৪
ষষ্ঠ যুদ্ধ, ভাতওয়ারার লড়াই ৬২৪
সপ্তম যুদ্ধ ৬২৫
অষ্টম যুদ্ধ: সুনিয়ারন থেকে কালপি পর্যন্ত লড়াইসমূহ ৬২৫
রাজপুতদের বশীভূতকরণ এবং মালব আক্রমণ ৬২৭
ধোলপুর ৬২৭
আলাহপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ৬২৭
গোয়ালিয়র ৬২৭
নতুন নিয়োগসমূহ ৬২৮
মৃত্যু ৬২৮
বহলুল লোদীর সীরাতের ওপর এক নজর ৬২৯
দোয়ার ইহতিমাম ৬২৯
ব্যয়বহুল প্রথার ওপর নিষেধাজ্ঞা ৬২৯
রসিকতা ও ক্ষমাশীলতা ৬৩০
বহলুল লোদীর আমলের রাজনৈতিক উদ্ভাবনসমূহের ওপর এক নজর ৬৩০
সরলতা ও অনাড়ম্বরতা ৬৩০
সতর্কতা ও চতুরতা ৬৩১
বহলুল লোদী কি শরীয়তের ওপর পুরোপুরি পাবন্দ ছিলেন? ৬৩১
আমীরদের সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ ৬৩১
শাহী ফৌজের পরিবর্তে গোত্রীয় ফৌজ ৬৩২
সিকান্দার লোদী ৬৩৩
সিকান্দার লোদীর গুণাবলি ৬৩৪
প্রতিপক্ষ শাহজাদাদের সাথে যুদ্ধসমূহ ৬৩৪
১ আলম খান ৬৩৪
২ ঈসা খান লোদী ৬৩৪
৩ বারবক শাহ ৬৩৫
৪ শাহজাদা আজম হুমায়ুন ৬৩৫
তাতার খান লোদী ৬৩৫
গোয়ালিয়র, রাজা মান সিং ৬৩৬
সুলতান আশরাফ ৬৩৬
জৌনপুর ও বিহারের অভিযানসমূহ ৬৩৬
চোগা রাজপুতের বিদ্রোহ ৬৩৬
সুলতান হোসেন শারকির পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের সাহায্য ৬৩৮
বারবক শাহের গ্রেফতারি ৬৩৯
বিহারে হোসেন শাহ শারকির সাথে যুদ্ধসমূহ ৬৩৯
রায় ভীড়ের সাথে দ্বন্দ্ব ৬৩৯
সুলতানি ফৌজের ধ্বংস ৬৪০

হুসাইন শাহ শরকির সাথে শেষ যুদ্ধ ৬৪০

রেওয়ার ওপর আক্রমণ ৬৪১

সম্ভলে চার বছর অবস্থান। হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ৬৪২

রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ ৬৪২

আগ্রা শহর নির্মাণ ৬৪৩

ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা ৬৪৪

গোয়ালিয়রের দ্বিতীয় অভিযান ৬৪৪

নরওয়ার দুর্গ অবরোধ ৬৪৪

“ভাদোরিয়া” রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ। হাত কান্ত দুর্গ বিজয় ৬৪৫

মালওয়ার সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ৬৪৫

চান্দেরি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ৬৪৭

শিওপুর দুর্গে আক্রমণ ৬৪৭

সিকান্দার লোদীর মৃত্যু ৬৪৮

সিকান্দার লোদী—একজন শাসক হিসেবে ৬৪৮

সীরাত ও চরিত্র ৬৫০

সময়সূচী ৬৫০

জ্ঞান ও সাহিত্যিক রুচি ৬৫০

মুসলমানদের কল্যাণকামনা ৬৫১

নির্মাণ, জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক সাফল্যসমূহ ৬৫১

ওয়াকফ, সদকা ও খয়রাত ৬৫১

শরীয়ত বিরোধী প্রথা বন্ধ ৬৫২

হিন্দুদের সাথে আচরণ ৬৫২

হিন্দুদের শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ ৬৫২

ন্যায়বিচার ও ইনসাফ ৬৫৩

গুপ্তধন ৬৫৩

আমলের জবাব দিতে হবে ৬৫৩

আজ আদালত শেষ হবে না ৬৫৩

ওয়ালাল ৬৫৪

শরীয়ত বিরোধী কিছু কাজ ৬৫৫

ইব্রাহিম লোদী ৬৫৬

শাহজাদা জালাল খানের সাথে সালতানাত বিভক্তির চুক্তি ৬৫৬

দরিয়া খান লোদীর আগমন এবং চুক্তি বাতিলের প্রস্তুতি ৬৫৭

চুক্তি বাতিলের ধূর্ত কৌশলসমূহ ৬৫৭

ইব্রাহিম খান লোদীর পুনরায় রাজ্যাভিষেক ৬৫৭

উভয় পক্ষের রাজনৈতিক চালবাজি। কাল্পিতে ইব্রাহিমের সেনাবাহিনীর আক্রমণ ৬৫৭

জালাল খানের আগ্রা অভিযান এবং আলোচনা ৬৫৮

জালাল খানের পরিণতি ৬৫৮

সালতানাতের আমিরদের সাথে ইব্রাহিম লোদীর দুর্ব্যবহার ৬৫৯

একজন প্রখ্যাত তলোয়ারবাজ মিয়াঁ হুসাইনের কাহিনী ৬৫৯

গোয়ালিয়র ফ্রন্ট এবং আজম সারওয়ানির গ্রেফতারি ৬৬১

আজম সারওয়ানির সাহস ও আনুগত্য ৬৬১

اسلام خان کی بغاوت (ইসলাম খানের বিদ্রোহ) ৬৬২

اسلام خان کا انجام (ইসলাম খানের পরিণতি) ৬৬৩

বিহারে দরিয়া খান লোহানির বিদ্রোহ ৬৬৩

পাঞ্জাবে দৌলত খান লোদীর বিদ্রোহ ৬৬৩

মুঘল শাহজাদা বাবরের আবির্ভাব ৬৬৪

https://t.me/BoierSomahar

বাবরকে আক্রমণের আমন্ত্রণ ৬৬৪

লোদী আফগান শাসনের অবসানের ওপর একটি পর্যালোচনা ৬৬৫

দিল্লি সুলতানদের যুগে উপমহাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ৬৬৬

দিল্লি সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা ৬৬৯

সুলতান ৬৬৯

কেন্দ্রীয় বিভাগ ও কর্মকর্তাবৃন্দ ৬৬৯

১. দিওয়ান-ই-ওয়াজারাত ৬৬৯

২. দিওয়ান-ই-আদল ৬৬৯

৩. দিওয়ান-ই-আরজ ৬৭০

৪. দিওয়ান-ই-ইনশা ৬৭০

৫. দিওয়ান-ই-বারিদ (ডাক বিভাগ) ৬৭০

৬. জানদার ৬৭০

৭. আমির-ই-হাজিব (বারবক) ৬৭০

৮. ওয়াকিল-ই-দার (ওয়াকিলদার) ৬৭০

প্রাদেশিক পদসমূহ ৬৭০

উলায়াত ৬৭০

শিক বা পরগনা ৬৭০

মুহাসসিল: (কালেক্টর) ৬৭১

শিকদার: (ডেপুটি কমিশনার) ৬৭১

কাজী ৬৭১

সাহিব-ই-দিওয়ান ৬৭১

কোতোয়াল ৬৭১

সাহিব-ই-বারিদ ৬৭১

সদর ৬৭২

গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থা ৬৭২

দিহ (গ্রাম) ৬৭২

মুকাদ্দাম ৬৭২

পাটোয়ারি ৬৭২

চৌধুরী ৬৭২

পঞ্চায়েত ৬৭৩

দিল্লি সুলতানদের ইকতা ব্যবস্থা ৬৭৩

মুদ্রা, সেগুলোর মান ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ৬৭৪

দিল্লির রাজাদের তালিকা ৬৭৬

দাস বংশ ৬৭৬

খিলজি বংশ ৬৭৭

তুঘলক বংশ ৬৭৮

সৈয়দ বংশ ৬৭৯

লোদী আফগান ৬৭৯

চতুর্থ অধ্যায়: দিল্লি সালতানাত যুগের প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ ৬৮০

দিল্লির রাজাদের সমসাময়িক ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ৬৮১

ইমাম হাসান সাগানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৮৩

খাজা গরিব নেওয়াজ, মঈনুদ্দিন চিশতী আজমিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৮৫

শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৮৯

শেখ সদরুদ্দিন আরিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯০

কাজী মুহাম্মদ বিন আতা, হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯১

https://t.me/BoierSomahar

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার উশি কাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯২

বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯৫

শেখ আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবের কলিয়ারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭০১

শেখ শামসুদ্দিন তুর্ক পানিপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭০৩

সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭০৫

আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭১৩

আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কবিতা ৭১৬

উর্দু ভাষার ভিত্তিতে খানকাহে নিজামি এবং আমীর খসরুর ভূমিকা ৭১৭

শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগে দিল্লি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭১৯

মাওলানা ফখরুদ্দিন জরাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭২৪

বু আলী শাহ কলন্দর পানিপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭২৬

শাহ রুকনে আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭২৭

লাল শাহবাজ কলন্দর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৩১

শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৩৪

সৈয়দ জালালুদ্দিন সুরখ বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৩৭

জালালুদ্দিন জাহানিয়া জাহান গশত রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৩৯

সদরুদ্দিন সৈয়দ রাজেন কাত্তাল ৭৪১

পঞ্চম অধ্যায়

দিল্লি সালতানাতের পতন যুগে প্রতিষ্ঠিত উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলিম সালতানাতসমূহ ৭৪২

উপমহাদেশে একাধিক মুসলিম সরকার ৭৪৩

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য ৭৪৪

(১) কাশ্মীর সালতানাত ৭৪৬

কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস ৭৪৭

সহদেব-এর শাসন ৭৪৮

সদরুদ্দিন রিনচান, প্রথম মুসলিম শাসক ৭৪৯

উদয়ন দেব ৭৪৯

কোটা রানী ৭৫০

শাহ মির্জা শামসুদ্দিন (শাহ মিরি বংশ) ৭৫১

সুলতান জমশিদ ৭৫২

সুলতান আলাউদ্দিন ৭৫২

শিহাবুদ্দিন শাহ কাশ্মীরি ৭৫৩

কুতুবুদ্দিন শাহ কাশ্মীরি ৭৫৩

সিকান্দার বিন কুতুবুদ্দিন কাশ্মীরি ৭৫৪

সুলতান আলী শাহ ৭৫৫

সুলতান জয়নুল আবেদিন ৭৫৬

হায়দার খান ৭৫৭

হাসান শাহ ৭৫৮

শিয়া চক সরদারদের উত্থান ৭৫৯

মুহাম্মদ শাহ এবং ফাতাহ শাহ ৭৫৯

শামসুদ্দিন, ইসমাইল শাহ, ইব্রাহিম শাহ সানি ৭৬০

নাজুক শাহ ৭৬০

ইসমাইল শাহ সানি, হাবিব শাহ ৭৬১

কাশ্মীরে শাহ মিরি সুলতানদের প্রভাব ৭৬৩

চক বংশের শাসন ৭৬৪

কাশ্মীরের সুলতানদের তালিকা - শাহ মিরি বংশ ৭৬৫

চক বংশ ৭৬৭

(২) বাংলা সালতানাত ৭৬৮

বাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্রসমূহ ৭৭০

খলজিদের শাসন ৭৭০

বাংলা - দিল্লি সালতানাতের অধীনে ৭৭০

খলজিদের স্বায়ত্তশাসন - পুনরায় ৭৭১

বাংলা দিল্লি সালতানাতের অধীনে: পুনরায় ৭৭১

বাংলায় বংশানুক্রমিক শাসন: বলবন শাহজাদাদের যুগ ৭৭১

বাংলা - তুঘলক সুলতানদের অধীনে ৭৭২

বা সোনারগাঁও ৭৭২

লখনৌতি ৭৭৩

সাতগাঁও ৭৭৩

বাংলার স্বায়ত্তশাসন ৭৭৪

ইলিয়াসি বংশের শাসন ৭৭৪

হাজি ইলিয়াস, শামসুদ্দিন ৭৭৪

সিকান্দার শাহ আউয়াল ৭৭৫

গিয়াসউদ্দিন আজম ৭৭৫

রাজা গণেশ ৭৭৫

নও-মুসলিমদের শাসন ৭৭৬

জালালউদ্দিন ৭৭৬

আহমদ শাহ ৭৭৭

ইলিয়াসিদের পুনরায় শাসন ৭৭৭

নাসির শাহ ৭৭৭

বারবক শাহ বিন নাসির ৭৭৭

ইউসুফ শাহ বিন বারবক শাহ ৭৭৭

ফাতহ শাহ ৭৭৮

হাবশিদের যুগ ৭৭৮

সুলতান শাহজাদা বারবক: কয়েক মাস ৭৭৮

মালিক আন্দিল, সাইফুদ্দিন ফিরোজ ৭৭৮

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিন ফাতহ খান ৭৭৮

মুজাফফর শাহ (বদর দিওয়ানা): কয়েক মাস ৭৭৮

হুসাইনি বংশ ৭৭৯

সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসাইনি ৭৭৯

নসিব শাহ ৭৭৯

মুঘল ও আফগান সুরিদের শাসন ৭৮০

বাংলার তৃতীয়বার স্বায়ত্তশাসন ৭৮০

বাংলা মুঘলদের অধীনে ৭৮০

বাংলার সুলতানদের ইলমি, আদবি, তামিঁরাতি ও সাকাফাতি খিদমত ৭৮১

খলজিদের কীর্তিসমূহ ৭৮১

ইলিয়াসি সুলতানদের যুগ ৭৮১

বাংলার শাসকদের তালিকা ৭৮৩

বাংলার শাহগণ ৭৮৫

দৌলতে ইলিয়াসিয়া ৭৮৬

গণেশের সন্তানদের যুগ ৭৮৬

ইলিয়াসিদের পুনরায় ক্ষমতা লাভ ৭৮৭

হাবশিদের শাসন ৭৮৭

সৈয়দ হোসেন শাহের পরিবার ৭৮৮

আফগান সুরি পরিবার ৭৮৮

কররানি পরিবার ৭৮৯

(৩) শারকি সালতানাত জৌনপুর ৭৯০

জৌনপুরের ময়দান: রুহানি, ইলম ও আজমত ৭৯০

মালিক সারওয়ার ৭৯১

মুবারক শাহ ৭৯১

https://t.me/BoierSomahar

ইব্রাহিম শাহ শারকি ৭৯২

মাহমুদ শাহ শারকি ৭৯৩

মুহাম্মদ শাহ ৭৯৪

হুসাইন শাহ শারকি ৭৯৪

'শিরাজ-ই-হিন্দ' জৌনপুর: এক নজরে ৭৯৫

জৌনপুরের শারকি সুলতানদের মানচিত্র ৭৯৬

(৪) মালব সালতানাত ৭৯৭

মালবের মালভূমি: সজীবতা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ৭৯৭

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৭৯৮

মালবের ঘুরি সুলতানগণ ৭৯৮

দিলাওয়ার খান ৭৯৮

হুশং শাহ ৭৯৯

মুহাম্মদ গজনী খান ৭৯৯

মালবের খিলজি সুলতানগণ ৮০০

মাহমুদ খিলজি ৮০০

গিয়াসুদ্দিন খিলজি ৮০১

নাসিরুদ্দিন খিলজি ৮০২

মাহমুদ সানি ৮০২

পতনের কারণসমূহ ৮০৩

মালবের সুলতানদের কীর্তিসমূহ ৮০৩

মালবের সুলতানদের মানচিত্র ৮০৫

ঘুরিদের শাসন ৮০৫

খিলজিদের শাসন ৮০৫

(৫) গুজরাট সালতানাত ৮০৭

গুজরাট: সমুদ্রবেষ্টিত ও উপকূলীয় এলাকা ৮০৭

সমমনা ৮০৭

মুজাফফর শাহ ৮০৮

আহমদ শাহ ৮০৮

আহমেদাবাদের ভিত্তি ৮০৮

মুহাম্মদ শাহ বিন আহমদ শাহ ৮০৯

কুতুবুদ্দিন আহমদ শাহ সানি ৮০৯

মাহমুদ শাহ ৮০৯

মুজাফফর শাহ হালিম ৮১২

বাহাদুর শাহ ৮১৩

পতনের যুগ ৮১৩

মুঘলদের দখল ৮১৪

গুজরাট সালতানাতের ইসলামি সংস্কৃতি ৮১৫

বৈচিত্র্যের লক্ষণ ৮১৫

গুজরাটের সুলতানদের তালিকা ৮১৭

(৬) খানদেশ রাজ্য - বুরহানপুর ৮১৯

খানদেশের ফারুকি বংশের শাসন ৮১৯

মালিক রাজা ৮২০

নাসির খান ৮২০

মীরান আদিল খান আউয়াল ৮২১

মীরান মুবারক খান আউয়াল ৮২১

মীরান আদিল খান সানি ৮২১

দাউদ খান বিন মুবারক খান ৮২১

আদিল খান সালেস ৮২২

মীরান মুহাম্মদ শাহ ৮২২

মীরান মুবারক শাহ সানি ৮২৩

মীরান মুহাম্মদ বিন মুবারক ৮২৩

হাসান খান ফারুকি ৮২৩

https://t.me/BoierSomahar

রাজা আলী খান বিন মুবারক ৮২৪

বাহাদুর খান বিন রাজা আলী খান ৮২৪

খানদেশ রাজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য ৮২৪

খানদেশ রাজ্যের শাসকদের তালিকা ৮২৬

(৭) বাহমানী সালতানাত - দাক্ষিণাত্য ৮২৮

দাক্ষিণাত্যের শিলাসমূহ: দৃঢ়তা, বৈচিত্র্য ও মর্যাদা ৮২৮

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের যুগে দাক্ষিণাত্য ৮২৯

আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ গাঙ্গুই ৮২৯

রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৮২৯

হাসান বাহমানীর রাজধানী ও রাজ্যের চতুঃসীমা ৮৩০

আলাউদ্দিন হাসানের উত্তরসূরিগণ ৮৩০

দাক্ষিণাত্য সালতানাতের উত্থান-পতনের ওপর এক নজর ৮৩৬

স্থাপত্য কীর্তি ৮৩৬

ইলমি জৌলুস ৮৩৭

দাক্ষিণাত্যের সমাজ ও সংস্কৃতি ৮৩৭

দাক্ষিণাত্যের বাহমানী রাজাদের মানচিত্র ৮৩৯

(৮) দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য ৮৪১

(প্রথম) আদিল শাহী শাসন - বিজাপুর ৮৪২

ইউসুফ আদিল শাহ ৮৪২

ইসমাইল আদিল শাহ ৮৪৩

মালু আদিল শাহ ৮৪৪

ইব্রাহিম আদিল শাহ ৮৪৪

আলী আদিল শাহ ৮৪৫

ইব্রাহিম আদিল শাহ দ্বিতীয় ৮৪৬

বিজাপুর সালতানাতের স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহ ৮৪৬

সাংস্কৃতিক কীর্তি ৮৪৭

শাসকদের তালিকা ৮৪৮

(দ্বিতীয়) নিজাম শাহী শাসন - আহমদনগর ৮৪৯

আহমদ নিজামুল মুলক বাহরি ৮৪৯

বুরহান বিন نظام শাহ ৮৫০

হুসাইন বিন বুরহান ৮৫১

মুরতাজা বিন হুসাইন ৮৫১

মীরান হুসাইন বিন মুরতাজা ৮৫১

ইসমাইল বিন বুরহান বিন হুসাইন ৮৫১

বুরহান দ্বিতীয় ৮৫২

ইব্রাহিম বিন বুরহান শাহ ৮৫২

আহমদ দ্বিতীয় ৮৫২

বাহাদুর শাহ ৮৫৩

বিবি চাঁদ সুলতান ৮৫৩

মুরতাজা সানি বিন শাহ কুলি বিন বুরহান আউয়াল ৮৫৩

মালিক আম্বর হাবশী ৮৫৩

নিজাম শাহী শাসনের ওপর এক নজর ৮৫৪

তহজিবী ও সাংস্কৃতিক কীর্তি ৮৫৪

শাসকদের তালিকা ৮৫৫

(তৃতীয়) কুতুব শাহী শাসন - গোলকুন্ডা (তেলেঙ্গানা) ৮৫৭

সুলতান কুলি কুতুবুল মুলক ৮৫৭

জামশিদ কুলি কুতুব শাহ ৮৫৭

সুবহান কুলি কুতুব শাহ ৮৫৮

ইব্রাহিম কুলি কুতুব শাহ ৮৫৮

মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ ৮৫৮

https://t.me/BoierSomahar

কুতুব শাহী সালতানাতের নির্মাণ ও সাংস্কৃতিক কীর্তিসমূহ ৮৫৮

সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৮৫৯

শাসকগণের তালিকা ৮৬১

(চতুর্থ) ইমাদ শাহী সরকার - বেরার ৮৬২

ইমাদ শাহী বেরারের শাসকগণের তালিকা ৮৬৪

(পঞ্চম) বারিদ শাহী সরকার - বিদার ৮৬৫

কাসিম বারিদ ৮৬৫

আমীর বারিদ ৮৬৫

আলী বারিদ শাহ ৮৬৬

ইব্রাহিম বারিদ ৮৬৬

দ্বিতীয় কাসিম বারিদ ৮৬৬

ইবনে কাসিম বারিদ ৮৬৬

মির্জা আলী বারিদ ৮৬৭

দ্বিতীয় আমীর বারিদ ৮৬৭

বিদার সালতানাতের ওপর এক নজর ৮৬৭

সাহিত্যিক ও ইলমি কীর্তিসমূহ ৮৬৮

শাসকগণের তালিকা ৮৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়: মুঘল শাসনের পূর্বে উপমহাদেশের অন্যান্য জনপদে সক্রিয় প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ ৮৭০

দিল্লির পতনের পর হিন্দুস্তানের অন্যান্য জনপদের উলামা ও মাশায়েখ ৮৭১

কাশ্মীরের মাশায়েখ ৮৭৫

প্রথম পর্যায়: ইসলামের সূচনা এবং ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন ৮৭৫

দ্বিতীয় যুগ: সুফিবাদী দাওয়াতের উত্থান ৮৭৬

তৃতীয় যুগ: স্থিতিশীলতা ও প্রসারের সময়কাল ৮৭৭

শিয়া মতবাদের উত্থান, চাকদের আধিপত্য এবং আহলে সুন্নাতের জন্য প্রতিকূলতা ৮৭৯

কাশ্মীরের কয়েকজন প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ ৮৮০

মাওলানা জামাল উদ্দিন কাশ্মীরি রহ. ৮৮০

শেখ হিলাল উদ্দিন কাশ্মীরি নকশবন্দী রহ. ৮৮০

শেখ মুহাম্মদ বিন হাসান বায়হাকী রহ. ৮৮১

শেখ মনসুর বিন মুহাম্মদ কাশ্মীরি রহ. ৮৮১

শেখ নূর উদ্দিন কাশ্মীরি নকশবন্দী রহ. ৮৮১

শেখ দাউদ বিন হাসান কাশ্মীরি রহ. ৮৮১

মাওলানা রাযী উদ্দিন কাশ্মীরি রহ. ৮৮২

মোল্লা শাগরাফ আল-কানায়ী রহ. ৮৮২

শেখ হামজা মাখদুম রহ., সুলতানুল আরেফীন ৮৮২

শেখ ইয়াকুব সরফী কাশ্মীরি রহ. ৮৮৩

বাবা দাউদ খাকী রহ. ৮৮৪

বিহার ও বাংলার উলামা ও মাশায়েখ ৮৮৫

শেখ জালাল তাবরিজি রহ. ৮৮৫

মাওলানা শরফ উদ্দিন আবু তাওয়ামা রহ. ৮৮৫

শেখ শরফ উদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরী রহ. ৮৮৬

শেখ সিরাজ উদ্দিন উসমান আওধী রহ. ৮৮৮

শেখ আলাউল হক পান্ডবী রহ. ৮৮৮

হযরত নূরুল হক কুতুব আলম রহ. ৮৮৯

শেখ নূরুল হক কুতুব আলম রহ.-এর সাহেবজাদাগণ ৮৯৩

https://t.me/BoierSomahar

শেখ নূরুল হক কুতুব আলম রহ.-এর খলিফাগণ ৮৯৩

পূর্ববঙ্গের বরেণ্য গাজী সুফিগণ ৮৯৪

হযরত শেখ জালাল সিলহটি রহ. ৮৯৪

শেখ সফিউদ্দিন রহ. ৮৯৫

পীর রাহি রহ. ৮৯৫

জাফর খাঁ শহীদ ৮৯৬

বাবা আদম শহীদ ৮৯৬

শাহ ইসমাইল গাজী রহ. ৮৯৬

জৌনপুরের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ ৮৯৮

সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি রহ. ৮৯৮

কাজী শাহাবুদ্দিন দৌলত آبادی রহ. ৮৯৯

মাখদুম খাজা আবুল ফাতাহ সোনপুরী ৯০০

খাজা ঈসা তাজউদ্দীন জৌনপুরী চিশতী রহ. ৯০০

মোল্লা খাজা উসমান সালেহ রহ. ৯০০

কাজী নিজামুদ্দিন কায়লানি রহ. ৯০০

শেখ ওয়াজিউদ্দিন আশরাফ ওরফে শেখ ফরিদ রহ. ৯০১

মাখদুম রুকনুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ. ৯০১

মাখদুম শেখ মুহাম্মদ রহ. ৯০১

খাজা হামজা চিশতী রহ. ৯০২

মালওয়ার বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ ৯০৩

শেখ কামালুদ্দিন মালভি রহ. ৯০৩

শেখ সালামুল্লাহ মান্ডভি রহ. ৯০৪

শেখ ফাজিল হাকিম শাহাবুদ্দিন কিরমানি ৯০৪

শেখ আব্দুল্লাহ শাত্তারি রহ. ৯০৪

শেখ আহমদ বিন নিয়ামতউল্লাহ চান্দেরি রহ. ৯০৪

শেখ আল্লাহদাদ বিন হামিদ মান্ডভি ৯০৫

শেখ বোরহান উদ্দিন গুজরাটি রহ. ৯০৫

শেখ মিয়াঁ মঞ্জু গুজরাটি রহ. ৯০৫

গুজরাটের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ ৯০৬

রায়হান বাওয়ার রহ. ৯০৬

কারামতিদের প্রচেষ্টা ৯০৭

শেখ উসমান বিন দাউদ, ওরফে হুসামুদ্দিন মুলতানি রহ. ৯০৮

কাজী আব্দুল মুকতাদির শরীহি কান্দি রহ. ৯০৯

সৈয়দ হোসেন খং সওয়ার রহ. এবং অন্যান্য মাশায়েখ ৯০৯

শেখ আহমদ বিন আব্দুল্লাহ কণ্ঠু, শেখ বখশ রহ. ৯১০

কুতুব আলম সৈয়দ বোরহান উদ্দিন রহ. ৯১২

শেখ আব্দুল লতিফ গুজরাটি রহ. ৯১৩

মেমন ইসলামের নতুন দাঈগণ ৯১৩

গুজরাটের প্রখ্যাত উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসগণ ৯১৫

শেখ কামালুদ্দিন রহ. ৯১৫

শেখ রজিউদ্দিন উসমান গঞ্জে ইলম রহ. ৯১৫

মওলানা ইয়াকুব পাত্তানি রহ. ৯১৫

কাজী ইসমাইল আসফাহানি রহ. ৯১৫

শেখ উসমান হুসাইনি গুজরাটি রহ. ৯১৫

কাজী ইমাদউদ্দিন গুজরাটি রহ. ৯১৬

শেখ গাউসউদ্দিন গুজরাটি রহ. ৯১৬

শেখ বাহাউদ্দিন গুজরাটি রহ. ৯১৬

কাজী সদরুদ্দিন লাহোরি রহ. ৯১৬

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

সৈয়দ শেখ আবদুল্লাহ হাযরামি সুম আহমাদাবাদী রহ. ৯১৬

শেখ আব্দুল মালিক গুজরাটি রহ. ৯১৬

শেখ মুহাম্মদ বিন তাহের পাত্তানি রহ. ৯১৬

দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত মাশায়েখ ৯১৮

উপকূলীয় অঞ্চলের গাযী আউলিয়াগণ ৯১৮

সৈয়দ নযর ওয়ালী রহ. ৯১৮

সৈয়দ ইব্রাহিম শহীদ রহ. ৯১৯

বাবা ফখরুদ্দিন রহ. ৯১৯

সৈয়দ আব্দুল কাদির সানি নাগোরি রহ. ৯২০

খাজা আলাউদ্দিন হুসাইনি চিশতী রহ. ৯২০

দাক্ষিণাত্যের গাযী আউলিয়াগণ ৯২০

হাজী রুমি রহ. ৯২০

সুফি সরমস্ত রহ. ৯২০

সৈয়দ হুসামুদ্দিন তেগ বেরহনা রহ. ৯২১

বাবা শরফুদ্দিন রহ. ও বাবা শাহাবুদ্দিন রহ. ৯২১

পীর জমনা বিজাপুরী ৯২১

সৈয়দ আলী শহীদ ৯২২

পীর মুজরি রহ. ৯২২

অন্যান্য কয়েকজন মাশায়েখ ৯২২

পরবর্তী যুগের দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত মাশায়েখ ৯২৩

শেখ মুনতাখাব উদ্দিন হানসাভী রহ. ৯২৩

শেখ বুরহানুদ্দিন গরীব রহ. ৯২৩

শেখ আইনুদ্দিন বিজাপুরী রহ. ৯২৪

সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইনি বন্দা নেওয়াজ গেসুদরাজ রহ. ৯২৪

মাওলানা শামসুদ্দিন খুরাসানি ধারাসুনি রহ. ৯২৬

কাজী ইব্রাহিম বিন ফাতহুল্লাহ মুলতানি রহ. ৯২৬

সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরী ও মাহদাবিয়া ফেরকা ৯২৭

সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর আবির্ভাব ৯২৯

মাহদী হওয়ার দাবি ও তার প্রতিক্রিয়া ৯৩০

এই আন্দোলনের প্রভাব ৯৩২

সৈয়দ মুহাম্মদের উত্তরসূরিগণ ৯৩৪

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ৯৩৫

মৃত্যুর ধ্যান (মুরাকাবায়ে মউত) ৯৩৫

মাটির নিচে তো আমরা একাই থাকব ৯৪১

গ্রন্থপঞ্জি ৯৪৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ভূমিকা

ইতিহাস একটি সমুদ্র এবং ইতিহাসবিদগণ এর ডুবুরি। তাঁরা বর্তমান সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন না, বরং পানির অতল গভীরে গিয়ে অতীতের সেই মুক্তাগুলো সন্ধান করেন যা বইয়ের ঝিনুকগুলোতে লুকিয়ে থাকে। ঐতিহাসিক তথ্যের মূল্য খাঁটি মুক্তার চেয়ে কম নয়। ডুবুরি মুক্তা তৈরি করে না, বরং তা আহরণ করে। যে তৈরি করে সে ডুবুরি নয়, বরং জালিয়াত। একইভাবে, ইতিহাসবিদের কাজ ইতিহাস তৈরি করা নয়, বরং ইতিহাসকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা। ইতিহাসের একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে লেখকের প্রচেষ্টাও এটাই ছিল যে, তিনি ঐতিহাসিক সত্যগুলোকে সামনে নিয়ে আসবেন এবং ইতিহাস বিকৃতকারী বিশ্বাসঘাতক উপাদানগুলোর মুখোশ উন্মোচন করবেন।

আলহামদুলিল্লাহ, এই নিয়ত ও সংকল্পের সাথে 'তারিখে উম্মতে মুসলিমা'-এর পাঁচটি বিশাল খণ্ড পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হয়েছে। এখন এই ষষ্ঠ খণ্ডটি আপনাদের হাতে রয়েছে, যা পাক-ভারত উপমহাদেশের ইসলামী ইতিহাস এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগতির জন্য সংকলন করা হয়েছে। ইচ্ছা ছিল যে আমরা এই খণ্ডে উপমহাদেশের ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করব এবং এর জন্য লেখক প্রায় আটশ পৃষ্ঠার একটি অনুমান করেছিলেন যে, চারশ পৃষ্ঠায় গজনভী সুলতান থেকে শুরু করে লোদী আফগানদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হবে, আর অবশিষ্ট চারশ পৃষ্ঠায় মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা চলে আসবে। কিন্তু লেখক যখন এই কাজ শুরু করলেন এবং ইতিহাসের মূল ও প্রাচীন উৎসগুলো সংগ্রহ করে তাতে হিন্দুস্তানের ইতিহাসের সফর শুরু করলেন, তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে: চমৎকারভাবে হৃদয়ের আঁচল টেনে ধরে যে প্রাণ এখানেই আছে।

কোথাও বিজয়, সফলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ত্যাগ ও কুরবানির এমন সব দৃশ্য যে শিরা-উপশিরায় উদ্দীপনার ঢেউ উঠতে শুরু করে, কোথাও দ্বীনের বুজুর্গদের আত্মনিবেদন, ইখলাস, বিনয়, দ্বীনের দাওয়াত এবং সৃষ্টির সেবার এমন সব দৃষ্টান্ত যে নিজের ঈমানী অবস্থা তুচ্ছ মনে হতে থাকে এবং কোথাও কিছু হতভাগ্য, পাষাণহৃদয়, জালেম ও ফাসেকদের এমন সব কর্মকাণ্ড যে অবলীলায় ইকবালের এই চরণের কথা মুখে চলে আসে:

এরাই সেই মুসলমান যাদের দেখে ইহুদিরাও লজ্জিত হবে।

সংক্ষেপে, বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের জন্য দশটি পৃষ্ঠা রাখা হয়েছিল, তা বিশ থেকে ত্রিশ পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে পড়ল এবং তাও তখন যখন লেখক কলম-রূপী ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছিলেন এবং সংক্ষেপ করার খাতিরে অনেক কিছু বাদ দিয়ে কলমের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, অন্যথায় বিষয়টি আরও বেড়ে যেত। এই সময়ে আমি প্রায় বারো থেকে ষোলো ঘণ্টা কাজ করে গেছি। ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রায় সব রূপ থেকেই দূরে থেকেছি। আনন্দ-বেদনার অনুষ্ঠান, শোক প্রকাশ, অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা, সাক্ষাৎ এবং সফরও অনেকটা বাদ পড়ে গেছে। একে এক প্রকারের ইলমী এতেকাফ মনে করে নিন যাতে জরুরি অবস্থা ছাড়া কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। কখনো কোনো রোগ বা ব্যাধি...

https://t.me/BoierSomahar

ঘেরাও করল তখন দয়ালু চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার জন্যও সময় বের করতে পারিনি, কেবল তখনই (গিয়েছি) যখন যন্ত্রণায় বেহাল হয়ে যেতাম। মোটকথা, এমন নিমগ্নতা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করার ফলে দিন তো দূরের কথা, সপ্তাহ ও মাস অতিবাহিত হওয়ারও কোনো খবর ছিল না, এমনকি সেই তারিখ চলে এল যখন পাণ্ডুলিপি সম্পন্ন করে প্রকাশকের নিকট হস্তান্তর করার কথা ছিল। কিন্তু এখন যখন কাজটির দিকে তাকালাম, দেখা গেল তা অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে, অর্থাৎ আমরা জহিরুদ্দিন বাবরের হাতে ইব্রাহিম লোদির পরাজয় পর্যন্ত পৌঁছেছি। ভারত উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের পুরো কাজ এখনও বাকি ছিল।

এখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আমি যদি মুঘল সাম্রাজ্যের কাজ শুরু করতাম তবে জানি না আরও কত সময় লাগত। তাই সিদ্ধান্ত হলো যে, যতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে আপাতত সেটুকুই প্রকাশ করা হোক। এই কাজটুকুও একটি বিশাল খণ্ডের সমান, অর্থাৎ কমবেশি নয়শ পৃষ্ঠার ওপর مشتمل (সমন্বিত), যা সুলতান মাহমুদ গজনভির উপমহাদেশে আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয়ে বাবরের হাতে ইব্রাহিম লোদির সেই পরাজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়েছে যেখানে একটি যুগের সমাপ্তি এবং একটি নতুন যুগের সূচনা।

পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, তারা যেন অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য দোয়া করেন যা ইনশাআল্লাহ তারীখে উম্মতে মুসলিমা-র সপ্তম খণ্ড হবে। সেই সাথে লেখকের সুস্থতা ও কল্যাণের জন্যও দোয়া করতে থাকবেন।

হিন্দুস্তানে মুসলিম সুলতানদের আগমন ইতিহাসের এমন এক মুহূর্ত যেখানে অতীতের ঝাপসা জানালাগুলো খুলে যায়। এই মুহূর্তের সূচনা হয় সেই ধূলিকণা থেকে যা একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদ গজনভির সাথে আগত মুজাহিদদের ঘোড়ার খুর থেকে উড়েছিল এবং তাকবিরের ধ্বনি হিন্দুস্তানের মাটিকে শত বছরের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল।

এখানে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয় যা কেবল বিজয় ও পরাজয়ের গল্প নয়, বরং উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ও বিস্তারের কাহিনীও বটে। ঘুরিরা এই ভূখণ্ডে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এরপর দাস বংশের শাসনামলে এখানে ইসলামি ব্যবস্থা শিকড় গাড়তে শুরু করে। খিলজি, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদি বংশ ছিল এই কাহিনীরই ধারাবাহিকতা যার যোগসূত্র ইতিহাসের প্রাচীন উৎসগুলোতে ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে প্রতিটি বংশের ইতিহাস নিজ নিজ স্থানে উত্থান ও পতনের এক স্বতন্ত্র কাহিনী যার প্রতিটি পাতায় শিক্ষা ও উপদেশের বহু দিক রয়েছে। “যেমন কর্ম তেমন ফল” এর চিরন্তন নীতি সব জায়গায় সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় “মাকাফাতে আমল” (কর্মফল) এর ব্যবস্থা প্রতিটি ব্যক্তি ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। এটি সেই নীতি যা পূর্ববর্তী নবীগণ এবং বিগত আসমানি কিতাবসমূহেও পেশ করা হয়েছে এবং যা কুরআন মাজিদ ও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আফসোস যে, বান্দারা বারবার তা ভুলে যায় এবং পুনরায় সেই সব অপরাধের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে যা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় দিক থেকেই মারাত্মক প্রমাণিত হয়।

উপমহাদেশের ইতিহাস কেবল সুলতানদের প্রাসাদ, দুর্গ এবং যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এই ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র সেই...

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

দ্বীনি কেন্দ্রগুলোতে স্পন্দিত হতো যা উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে এজাম এবং বুজুর্গানে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদেরই বদৌলতে সিংহাসন ও মুকুটের যুদ্ধের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মারেফাতের প্রদীপও জ্বলছিল এবং মধ্য এশিয়া থেকে শত শত আউলিয়া আল্লাহ ও উলামায়ে ইসলাম হিজরত করে দাওয়াত ও তাবলিগ এবং ইলমের সেচ প্রদানের জন্য উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবতরণ করছিলেন।

এঁরা ছিলেন সেই নক্ষত্র যারা ভালোবাসা, নৈতিকতা এবং জ্ঞানের আলো দিয়ে এই দেশের হৃদয় জয় করেছিলেন। এঁরা ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব যারা ইসলামের প্রকৃত রুহকে এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়েছিলেন এবং এখানে প্রকৃত মানবতার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। যদি এই মহান ব্যক্তিগণ না থাকতেন, তবে এই ইতিহাস কেবল যুদ্ধ, বিদ্রোহ, ক্ষমতার লড়াই এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের একটি প্রাণহীন সমষ্টি হতো। তাই লেখকের পূর্ণ চেষ্টা ছিল পাঠকদের এই বুজুর্গানে দ্বীনের মাকাম ও মর্যাদা, তাঁদের চিন্তা ও ব্যাকুলতা এবং তাঁদের দাওয়াত ও মেহনতের সাথে পরিচিত করানো, যাতে আমরা জানতে পারি যে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি একটি দাওয়াতি, ঈমানি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনও শুরু থেকেই এই ভূখণ্ডের শিকড়ে ও গভীরে প্রবহমান ছিল এবং এরই উজ্জ্বলতায় আজ এই অঞ্চলের মুসলমানরা সারা বিশ্বে এক বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই অংশের বিন্যাস নিম্নরূপ হবে:

- প্রথম অধ্যায়: ভারতের বিজেতাগণ, গজনভি এবং ঘুরি
- দ্বিতীয় অধ্যায়: গজনভি ও ঘুরি সুলতানদের সমসাময়িক উপমহাদেশের উলামা ও মাশায়েখ
- তৃতীয় অধ্যায়: দিল্লির সুলতানগণ (দাস বংশ, খিলজি, তুঘলক, সৈয়দ এবং লোদি)
- চতুর্থ অধ্যায়: দিল্লি সালতানাত আমলের প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ
- পঞ্চম অধ্যায়: দিল্লি সালতানাতের পতন যুগে প্রতিষ্ঠিত উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলিম সালতানাত
- ষষ্ঠ অধ্যায়: মুঘল শাসনের পূর্বে উপমহাদেশের অন্যান্য জনপদে সক্রিয় প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ

লেখক তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা-এর এই অংশে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী মেহনত ও কঠোর পরিশ্রমে কোনো ত্রুটি রাখেননি, তা সত্ত্বেও এই অনুভূতি বিদ্যমান যে হক আদায় হয়নি। একটি অনেক বড় বাধা ছিল বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা। পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের মূল ও প্রাচীন উৎসগুলো প্রায় সবই ফার্সি ভাষায়, যার বাজার আমাদের এখানে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এমনকি গ্রন্থাগারগুলোতেও ফার্সি বই খুব কম রাখা হয়। গবেষকদের একেকটি বইয়ের জন্য অনেক দ্বারে দ্বারে ঘুরতে ও হয়রান হতে হয়, এরপরও যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবেই কাঙ্ক্ষিত রত্ন হাতে আসে। এই কারণেই উপমহাদেশের ইতিহাসের এমন অনেক প্রাচীন ফার্সি উৎস রয়েছে যা চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যা-ই হোক, যদি জীবন সায় দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার তৌফিক সহায় হয়, তবে ভবিষ্যতে আমরা এই কাজটিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করব।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

যেকোনো গবেষণামূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করা সবচেয়ে মৌলিক ধাপ, যা ছাড়া এক কদমও চলা সম্ভব নয়। আমি ইদারা আল-মানহাল-এর ব্যবস্থাপকদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যারা আমাকে প্রয়োজনীয় বই সরবরাহে সহযোগিতা করেছেন। আমি প্রিয় হারিস আলী ডোগার (করাচি) এবং ভাই আবু হুরায়রা (জামিয়া আল-রশীদ)-এর প্রতিও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, এই কাজের সময় যখনই আমি কোনো বই খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তারা প্রথম সুযোগেই তা খুঁজে আমাকে সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই সকল সহযোগীকে তাদের শান অনুযায়ী উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা-এর এই অংশটি আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এর সম্পর্ক সরাসরি সেই ভূখণ্ডের সাথে যেখানে আমরা বসবাস করি। এই অঞ্চলটি অত্যন্ত চমৎকার, বিস্ময়কর, শিক্ষণীয় এবং উপদেশমূলক ইতিহাসের অধিকারী, যার আন্দাজ পরবর্তী পাতাগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমেই হবে এবং এটি পাঠ করে ও বুঝে আমরা আমাদের বর্তমান সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে সুন্দর করার যোগ্য হতে পারি।

উপমহাদেশের ইতিহাস বোঝার জন্য এখানকার শহর ও স্থানগুলোর ব্যাখ্যাও অত্যন্ত জরুরি। তাই লেখক চেষ্টা করেছেন যে, যেসব স্থান পাঠকদের কাছে অপরিচিত হতে পারে, টীকায় সেগুলোর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোক। আমার বিশ্বাস যে, এই বইটি ইতিহাসের অনুরাগী, শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের জন্য সমানভাবে একটি ইলমি ভাণ্ডার হিসেবে প্রমাণিত হবে। ইনশাআল্লাহ এর পরবর্তী খণ্ড খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে যা সুলতান জহিরুদ্দিন বাবর থেকে বাহাদুর শাহ জাফরের যুগ পর্যন্ত আমাদের সামনে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা এই অধম বান্দার এই মেহনত কবুল করে একে সওয়াব ও নাজাতের মাধ্যম বানান এবং পাঠকদের ইলম, আমল ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক করুন।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

ইদারা উলূম আল-কুরআন, তহসিল হাসান আবদাল, জেলা অ্যাটক

২ জমাদিউল উলা ১৪৪৭ হিজরি

মোতাবেক ২৫ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

রোজ শনিবার, দুপুর ২টা ৫৫ মিনিট

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

চিহ্ন, সংকেত এবং উদ্ধৃতি দেখার জন্য নির্দেশিকা

- ম ..... মুতাওয়াফ্ফী - মুতাওয়াফ্ফী (মৃত্যুর তারিখ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।)
- তর ..... তরজমা (জীবনবৃত্তান্ত)
- ১২২/৩ ..... খণ্ড নম্বর তিন, পৃষ্ঠা নম্বর ১২২ (/ চিহ্নের ডান দিকে খণ্ড নম্বর, বাম দিকে পৃষ্ঠা নম্বর)
- স ..... পৃষ্ঠা নম্বর .....
- ৪ স ৩০০ ..... খণ্ড নম্বর চার, পৃষ্ঠা নম্বর তিনশ (স-এর ডান দিকে খণ্ড, বাম দিকে পৃষ্ঠা)
- হ ..... হাদিস নম্বর, বর্ণনা নম্বর
- ত ..... মুদ্রণকারী/প্রকাশক
- ত ..... তাহকীক। অর্থাৎ এই বইটি অমুক গবেষকের গবেষণা ও সংশোধনের সাথে প্রকাশিত হয়েছে।
- **..... (শেষে) টীকা চলমান। (শুরুতে) টীকা পূর্ববর্তী অংশ থেকে যুক্ত।**

সতর্কবার্তা ১: অনেক স্থানে একসাথে দুই বা ততোধিক কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সাধারণত এটি এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যাতে পাঠকদের কাছে যেটি সহজলভ্য হয়, তারা সেটি দেখে নিতে পারেন। তবে কখনো কখনো এই প্রয়োজনেও একাধিক উদ্ধৃতি একসাথে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ঘটনার অংশবিশেষ একটি উৎসে এবং কিছু অংশ অন্য উৎসে রয়েছে। তাই যদি রেফারেন্স দেখার সময় পাঠকরা কোনো একটি উৎসে পুরো ঘটনাটি মূল পাঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না পান, তবে বাকি উৎসগুলোও দেখে নেওয়া উচিত। ইনশাআল্লাহ সামান্য প্রচেষ্টায় পুরো ঘটনাটি একই রূপে সামনে চলে আসবে।

সতর্কবার্তা ২: কিতাবসমূহের উদ্ধৃতির জন্য তাহকীককৃত এবং প্রচলিত পাণ্ডুলিপিগুলো সামনে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। “কুতুবিয়াত” থেকে জানা যাবে কোন প্রেসের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠকরা সেই প্রেসের পাণ্ডুলিপি দেখলে ইনশাআল্লাহ কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি পেয়ে যাবেন। তবে কখনো কখনো একই প্রেসের কোনো কিতাবের নতুন সংস্করণে দুই-চার পৃষ্ঠার কমবেশি হয়ে থাকে, তাই পাঠকদের উচিত উদ্ধৃত পৃষ্ঠায় কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি না পেলে দুই-চার পৃষ্ঠা আগে-পিছেও দেখে নেওয়া।

সতর্কবার্তা ৩: তারিখ-ই ফিরিশতা-এর উদ্ধৃতিসমূহে যেখানে “তারিখ-ই ফিরিশতা ফারসি” লেখা থাকবে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো “আঞ্জুমান-ই আসার ও মাফাখির-ই ফারহাঙ্গি ইরান”-এর মুদ্রিত নতুন সংস্করণ। যেখানে “তারিখ-ই ফিরিশতা বোম্বে” লেখা থাকবে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো সেই পুরাতন পাণ্ডুলিপি যা মেজর জেনারেল জন ব্রিগস ১৮৩১ সালে বোম্বে গভর্নমেন্ট কলেজ প্রেস থেকে প্রকাশ করেছিলেন। লেখক কোনো একক প্রকাশকের প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ পাননি, তাই বাধ্য হয়ে এই দুই পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে। তবে অধিকাংশ উপাদান নতুন সংস্করণ থেকেই নেওয়া হয়েছে।

https://t.me/BoierSomahar

ইসলামের পূর্বে উপমহাদেশ

উপমহাদেশের ভূগোল

পাক-ভারত উপমহাদেশ একটি বিশাল এবং বিশিষ্ট ভূখণ্ড যা এশিয়ার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এটি একটি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক একক যা নিজস্ব এক অনন্য মর্যাদা রাখে। উপমহাদেশে মূলত সাতটি দেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ। ভৌগোলিকভাবে আফগানিস্তান এবং মিয়ানমারের কিছু অংশকেও কখনো কখনো বর্ধিত উপমহাদেশের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।
উপমহাদেশ কেবল এক টুকরো জমি নয়, বরং প্রকৃতির এক মহান অনন্য সৃষ্টি, যাকে প্রকৃত চিত্রকর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে খোদাই করেছেন। এটি এমন একটি বই যার প্রতিটি পাতা ইতিহাসের হাজার হাজার কাহিনীর আমানতদার।

উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমানা:

- উত্তর সীমানা: উপমহাদেশের উত্তরে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়, কারাকোরাম এবং হিন্দুকুশ অবস্থিত, যা একে মধ্য এশিয়া থেকে প্রাকৃতিকভাবে আলাদা করে দেয়।

- এখানে হিমালয় পর্বতমালা কোনো প্রাকৃতিক প্রহরীর মতো অটল দাঁড়িয়ে আছে। এর আকাশচুম্বী বরফাবৃত শৃঙ্গগুলো পুরো অঞ্চলকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রদান করে। এই পাহাড়গুলো যেন পৃথিবীর কপালে ঝুমুর, যেখান থেকে নির্গত নদীগুলো, যেমন সিন্ধু ও গঙ্গা, তাদের ঢেউয়ে লক্ষ কোটি জীবনদায়ী সুধা নিয়ে পাঞ্জাব, সিন্ধু, দোয়াব এবং পূর্ব ভারতের সমভূমির দিকে প্রবাহিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ একর উর্বর জমিকে সিক্ত করে। এই সমভূমিগুলো যেন এক সবুজ মখমলি গালিচা, যেখানে সোনালী ধানের শীষের মতো ফসল দোল খায় এবং কৃষকদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়।

- পূর্ব সীমানা: পূর্বে উপমহাদেশের সীমানা মূলত মিয়ানমার (বার্মা) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

- পশ্চিম সীমানা: উপমহাদেশের পশ্চিম সীমান্তে থর মরুভূমি ভাঁজ পড়া হলুদ চাদরের মতো বিছিয়ে আছে, যেখানে বালিয়াড়িগুলো সময়ের আবর্তনের মতো নিজেদের স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। অন্যদিকে কচ্ছের রণের জলাভূমি এখানে সিন্ধুকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রদান করে। এই দিকেই সুলাইমান পর্বতমালা পশ্চিম এশিয়ার আক্রমণকারীদের পথে দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর বেলুচিস্তানের উচ্চভূমি একে পারস্য থেকে পৃথক করে।

দক্ষিণ সীমা: দক্ষিণে এটি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর এর সীমানাকে সামুদ্রিক রূপ দান করে। এই উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ভারত মহাসাগরের বাতাসের সাথে আলিঙ্গনরত, যেখানে সমুদ্রের ঢেউ কোনো ক্লান্ত পথিকের মতো উপকূলে আছড়ে পড়ে এবং বালুকা রাশিকে চুম্বন করে ফিরে যায়। উপকূলীয় অঞ্চলের ডানে ও বামে আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর যেন দুই দ্বারপাল, যারা উপমহাদেশের এই মহান সাম্রাজ্যের সুরক্ষায় নিয়োজিত।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য:

উপমহাদেশে হিমালয় অঞ্চল ভূমিকম্প এবং ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল। উত্তরের বিশাল সমভূমি, যা ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি নামে পরিচিত, বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের পানি ব্যবস্থা মূলত এই তিনটি নদীর ওপর নির্ভরশীল, যাদের বিশালতা আরও অনেক উপনদীর কাছে ঋণী।

দক্ষিণ দিকে উপকূল থেকে কিছুটা দূরে আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি একটি বিশাল ঢালের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে, যার পাথরে প্রাচীন সভ্যতার প্রতিধ্বনি এবং ইতিহাসের গল্পগুলো জমে আছে। এর সীমানা পূর্ব ও পশ্চিমে ঘাট (Ghats) পর্বতমালা দ্বারা নির্ধারিত।

এই অঞ্চলের জলবায়ুর ওপর মৌসুমি বায়ুর গভীর প্রভাব রয়েছে। এই বায়ু বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এই অঞ্চলে পানি সরবরাহের একটি বড় উৎস।

উপমহাদেশের ঋতু কোনো মহান শিল্পীর শ্রেষ্ঠ ছবির মতো রঙিন। মৌসুমি বৃষ্টি আকাশ থেকে মুক্তা হয়ে ঝরে পড়ে এবং মাটির তৃষ্ণা মেটায়।

এর উত্তরে সুউচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলগুলো অত্যন্ত শীতল, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং তুষারপাত দেখার জন্য পর্যটকরা দলে দলে আসে।

এর বিপরীতে পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচণ্ড গরম পড়ে। পূর্ব অঞ্চল বিশেষ করে বাংলায় অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ থাকে।

এই পুরো অঞ্চলটি তার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সাথে সাতরঙা সংমিশ্রণের মতো যা একে অপরের সাথে মিশে আছে, এবং এই বৈচিত্র্য থেকেই এখানকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্ম হয়। এটি প্রকৃতির একটি উপহার যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস মিলে অসংখ্য সুন্দর দৃশ্য তৈরি করেছে।

উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা:

উপমহাদেশের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এখান থেকে প্রাপ্ত মানব সভ্যতার নিদর্শনগুলো অন্তত পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। মধ্য ভারতের উর্বর অঞ্চলে চাষাবাদকারী প্রাচীন জাতিগুলোকে...

“দ্রাবিড়” বলা হতো। সেই সময়ের কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বিদ্যমান নেই। তবে প্রাচীন শিলালিপি এবং হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থগুলো থেকে খ্রিস্টপূর্ব দুই থেকে দেড় হাজার বছরের ইতিহাসের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এখানে কৃষি পেশার মানুষ বসবাস করত। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত সিলমোহরগুলোতে দেবী-দেবতাদের ছবি থেকে জানা যায় যে, এই লোকেরা মূর্তিপূজক ছিল। এই সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে ভূমিকম্প বা বন্যার কারণে হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যায়।

খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়া থেকে আর্য উপজাতিরা এখানে আসে। তারা গবাদি পশুর খাদ্যের অভাবের কারণে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়ে ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছিল। তারা স্থানীয় লোকদের ওপর বিজয়ী হয়ে এখানে নিজেদের শাসন ও বসতি স্থাপন করে এবং বিরোধীদের ব্যাপক গণহত্যার পর অসংখ্য মানুষকে দাসে পরিণত করে।

আর্যরা সিন্ধু নদের উপত্যকাকে নিজেদের স্বদেশ বানায়নি, বরং আরও সামনে এগিয়ে মধ্য ভারতের গঙ্গা-যমুনা উপত্যকাকে পছন্দ করে এবং সেখানেই নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। তারা মূর্তিপূজার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতীয়দের কাছ থেকে গ্রহণ করে, অন্যদিকে স্থানীয় জনগোষ্ঠী আর্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান শেখে। তাদের ধর্মীয় নেতারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করে এবং দেবতাদের নৈবেদ্যর নামে মন্দিরগুলোকে নিজেদের জন্য স্থায়ী আয়ের উৎস বানিয়ে নেয়। দেশের প্রতিরক্ষার কঠিন কাজ আর্য সর্দারদের ওপর ন্যস্ত হয়, যারা “ক্ষত্রিয়” নামে পরিচিত হয়। উৎপাদনের বিষয়টি সেই স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেই থাকতে দেওয়া হয় যারা আগে থেকেই কৃষক, কারিগর বা ব্যবসায়ী ছিল। তাদেরকে “বৈশ্য” বলা হতে থাকে। দাসে পরিণত করা স্থানীয় লোকদের “শূদ্র” (নীচ লোক) নাম দিয়ে তাদেরকে জন্মগত পাপী ও অপবিত্র সাব্যস্ত করা হয়। এরপর বর্ণপ্রথার এই ব্যবস্থাকে মনু নামক এক ব্রাহ্মণ একটি বিধিবদ্ধ রূপ দান করেন। তিনি ধর্মীয় ও শাসক শ্রেণীর জন্য “ধর্মশাস্ত্র” তৈরি করেন, যা মনুশাস্ত্র নামেও পরিচিত। এতে সমাজকে চারটি শ্রেণীতে: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (ক্ষত্রী) বৈশ্য এবং শূদ্রে বিভক্ত করে তাদের জন্য বিস্তারিত নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা হয়। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণদের আধিপত্য চিরস্থায়ী করা।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ বর্ণপ্রথার এই গোলকধাঁধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই নতুন ব্যবস্থাটি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বৌদ্ধধর্ম মূলত দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ, যাকে গৌতম বুদ্ধ নামে স্মরণ করা হয়। তিনি কপিলাবস্তুর রাজার পুত্র এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তার জন্ম “৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে” হয়েছিল। ২৯ বছর বয়সে তার ঝোঁক ধর্মের দিকে চলে যায় এবং তিনি লোকালয় ছেড়ে নির্জনতা অবলম্বন করেন। তিনি হিন্দুধর্মে বর্ণপ্রথার অমানবিক সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ মানুষের কষ্টে ব্যথিত ছিলেন, তাই তিনি চিন্তা-ভাবনার পর একটি নতুন নৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করেন যেখানে সকল মানুষ সমান ছিল। দুই শতাব্দী পর বুদ্ধের অনুসারীরা তার মূর্তিপূজা শুরু করে এবং মূর্তিপূজা ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে কুফর ও শিরককে প্রসারিত করে এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেয় যা “গান্ধার সভ্যতা” নামে পরিচিত হয়, যার নিদর্শন তক্ষশীলা ও সোয়াত উপত্যকায় বিদ্যমান।

“৫৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে” পাটনার একটি শহর বৈশালীতে মহাবীর নামক এক জ্ঞানীর জন্ম হয়, যিনি ব্রাহ্মণদের ধর্মীয়...

একচেটিয়া আধিপত্যে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি একটি নতুন ধর্ম পেশ করেন যা 'জৈন ধর্ম' নামে পরিচিত হয়। এই ধর্ম আত্মনিগ্রহ, দুনিয়া ত্যাগ এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতার শিক্ষা দিত। এতে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার অনুমতিও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বৈরাগ্যবাদ এবং মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার ওপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থা।

সেকান্দারের আক্রমণ:

৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পশ্চিমে গ্রীক শাসক সেকান্দার আজম (আলেকজান্ডার)-এর আবির্ভাব ঘটে, যিনি মিশর ও সিরিয়া জয় করে ইরানের ওপর আক্রমণ করেন এবং ইরানি সম্রাট 'দারা'কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে নিজের সাম্রাজ্যকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করেন। এরপর তিনি মধ্য এশিয়া এবং বর্তমান আফগানিস্তানের এলাকাগুলো নিজের অধীনে আনেন এবং '৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে' কাবুল জয় করে উপমহাদেশের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে যান। তাঁর আক্রমণের একটি বড় কারণ ছিল উপমহাদেশের সেই ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধি যার কাহিনী তিনি শুনেছিলেন। পাঞ্জাবের ঝিলাম নামক স্থানে সেকান্দারকে রাজা পুরুর (পোরাস) অসাধারণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। রাভি ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী বনাঞ্চলেও তিনি ব্যাপক জানমালের ক্ষতির শিকার হন, যার ফলে তিনি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। নিজ দেশে পৌঁছানোর আগেই ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অসুস্থতার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। সেকান্দারের আক্রমণের ফলে ইউরোপীয়রা উপমহাদেশের পথঘাট সম্পর্কে পরিচিত হয় এবং এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। এই আক্রমণের ফলে উপমহাদেশ রাজনৈতিক সংকটের শিকার হয়, তবে অন্যদিকে এর সুবিধা এই হয়েছিল যে উপমহাদেশ ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা হয়।

সেকান্দার তাঁর বিজিত এলাকাগুলোতে প্রতিনিধি শাসক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রস্থানের পর পুরো উপমহাদেশে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে নন্দ বংশের এক রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একটি নতুন সরকার গঠনের সুযোগ পেয়ে যান। তিনি পাঞ্জাব থেকে খাইবার পাস পর্যন্ত এলাকা জয় করার পর বিহার ও পাটনার দিকে অগ্রসর হন এবং পাটলিপুত্র থেকে নন্দ বংশকে উচ্ছেদ করে একটি অত্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যার রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। এই সাম্রাজ্য '৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ' থেকে '১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ' পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৬ বছর টিকে ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাফল্যে তাঁর মন্ত্রী চাণক্যের পরামর্শের বড় ভূমিকা ছিল, যিনি তক্ষশীলার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা তাঁর বই 'অর্থশাস্ত্র'-এ বর্ণিত আছে, যাকে ব্রাহ্মণ্য রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

'২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে' চন্দ্রগুপ্তের নাতি অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শুধু পুরো উপমহাদেশই নয় বরং পূর্ব ও মধ্য আফগানিস্তান পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। এরপর তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করে এই ধর্মের প্রচারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি স্থানে স্থানে বুদ্ধের মূর্তি ও স্তূপ নির্মাণ করান। অশোক ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

'১৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে' চীনা তুর্কিস্তান (মধ্য চীন) থেকে ইউয়েঝি উপজাতিদের উত্থান ঘটে। তারা সিনকিয়াং থেকে শুরু করে পেশোয়ার, সোয়াত এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত দখল করে নেয়। তাদের পর চীনের আরেকটি উপজাতি 'চিউনি' এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল শাসন করে। ১২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে কুশান বংশের একজন বিখ্যাত সম্রাট কনিষ্ক আজমের শাসন ছিল, যিনি পেশোয়ারকে রাজধানী করে শুধু কাশ্মীরই জয় করেননি বরং পামির মালভূমি অতিক্রম করে চীনের প্রদেশ খোটান,

ইয়াকান্দ এবং কাশগরকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। তিনি পেশোয়ারে একটি বিশাল 'স্তূপ' (বৌদ্ধ উপাসনালয়) নির্মাণ করান। এই যুগে রেশম পথের মাধ্যমে উপমহাদেশ এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ছিল। কনিষ্কের পর গান্ধার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং এটি ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে যায়।

উপমহাদেশে বৌদ্ধধর্মের উত্থান কয়েক শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল। ৩২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মগধের (বর্তমান বিহার ও পাটনা) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এই পৈতৃক রাজ্যকে সম্প্রসারিত করে গঙ্গা-যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই বংশের রাজপুত্র 'চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য' শাসক হন। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার বন্ধ করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচলন করেন। এভাবে হিন্দুধর্ম এবং বর্ণপ্রথা পুনরায় শিকড় গেড়ে বসে।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য এশিয়ার 'শ্বেত হুনরা' গুপ্ত সাম্রাজ্যেরও অবসান ঘটায়। ৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হুনদের আধিপত্য বজায় ছিল। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা হর্ষ উপমহাদেশের দিগন্তে আবির্ভূত হন, যিনি কনৌজ, বাংলা, উড়িষ্যা, মালব, সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং নেপালকে পদানত করে উত্তর ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর রাজপুতরা উত্তর ভারতে বেশ কিছু স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে এই ভূখণ্ড পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়। এখানে কনৌজ, দিল্লি, তামিলনাড়ু, বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতে আলাদা আলাদা অনেক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]

---

(১) উৎস: (১) তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা, বৈজনাথ পুরী এম.এ., মুদ্রিত: নওল কিশোর প্রেস লখনউ, ১৯৪৭ খ্রি.

(২) কাদীম তারিখ-ই-হিন্দ: ভিনসেন্ট এ. স্মিথ, অনুবাদক: মৌলভী জামিলুর রহমান, মুদ্রিত: জামিয়া ওসমানিয়া দাক্ষিণাত্য, ১৯৩২ খ্রি.

(৩) তারিখ-ই-তামাদ্দুন-ই-হিন্দ: মুহাম্মদ মুজিব, মুদ্রিত: জাতীয় উর্দু ভাষা উন্নয়ন পরিষদ নয়াদিল্লি, ১৯৯৯ খ্রি.

(৪) আয়না-ই-তারিখ: প্রফেসর বি.এন. ভার্মা, মুদ্রিত: রাম প্রসাদ অ্যান্ড ব্রাদার্স, আগ্রা, ১৯৩৩ খ্রি.

(৫) তারিখ-ই-হিন্দ: রোমিলা থাপার, মুদ্রিত: মারকাজ-ই-তাহকিকাত-ই-রায়ানা, ইসফাহান

(৬) কাদীম হিন্দুস্তান কি তারিখ: রমা শঙ্কর ত্রিপাঠী, অনুবাদক: সৈয়দ সাখি হাসান নকভি, মুদ্রিত: জাতীয় উর্দু ভাষা উন্নয়ন পরিষদ নয়াদিল্লি

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — ষষ্ঠ খণ্ড

মুহাম্মদ বিন কাসিম থেকে চতুর্থ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত

উপমহাদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। বাণিজ্য ছিল তাদের প্রাচীন পেশা, যার জন্য তারা বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত। এই কারণেই তারা দক্ষিণ ভারতের উপকূলে আসত এবং এখান থেকে মালামাল নৌকার মাধ্যমে সিরিয়া ও মিশর পর্যন্ত নিয়ে যেত। ইসলামি যুগে উপমহাদেশে আরব বণিকদের যাতায়াত আরও বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

অতঃপর বনু মারওয়ানের খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আমলে সিন্ধু উপকূলের কাছ দিয়ে অতিক্রমকারী আরবদের একটি সামুদ্রিক কাফেলা জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, যাদের সিন্ধুর শাসক রাজা দাহিরের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। এই ঘটনাটি সিন্ধুতে মুসলমানদের অভিযানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যার বর্ণনা আপনারা বনু উমাইয়া খলিফাদের ইতিহাসে (তৃতীয় খণ্ড) পড়েছেন। সেখানে বলা হয়েছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম ৯৩ হিজরি (৭১২ খ্রিস্টাব্দ) সালে রাজা দাহিরকে পরাজিত করে তার রাজধানীসহ (যা সিন্ধু, মুলতান, রাজস্থান এবং গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) উমাইয়া খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

এভাবেই উপমহাদেশে সেই মুসলিম শাসনের সূচনা হয় যার ধারাবাহিকতা বিভিন্ন রূপে সাড়ে এগারো শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অর্থাৎ রমজান ৯৩ হিজরি (জুলাই ৭১২ খ্রিস্টাব্দ) সালে সিন্ধু বিজয় থেকে শুরু হওয়া এই উপাখ্যান সফর ১২৭৪ হিজরি (সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে বাহাদুর শাহ জাফরের বন্দিত্বের মাধ্যমে শেষ হয়। হিজরি সন অনুযায়ী এই মোট সময়কাল “১১৮১” বছর এবং খ্রিস্টীয় সন অনুযায়ী “১১৪৬” বছর হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর এখানে ১৩২ হিজরি পর্যন্ত বনু উমাইয়ার পক্ষ থেকে অনেক প্রতিনিধি আসেন, যাদের মধ্যে আমর বিন মুসলিম, তামিম বিন জায়েদ, জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান এবং হাকাম বিন আওয়ানা ছাড়াও মুহাম্মদ বিন কাসিমের পুত্র আমর বিন মুহাম্মদ উল্লেখযোগ্য।

১৩২ হিজরি (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) সালে উমাইয়া সাম্রাজ্য আব্বাসীয় বিপ্লবের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়, যার পর সিন্ধুর শাসনভারও আব্বাসীয় খলিফারা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রতিনিধিরা এখানে শাসন করতে থাকেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে হিশাম বিন আমর, দাউদ বিন ইয়াজিদ মুহাল্লাবি, ইমরান বিন মুসা এবং আনবাসা বিন ইসহাক বিখ্যাত। তবে তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর আমলে সিন্ধুর আরব পরিবারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য দেখা দেয়, আমিররা বারবার বিদ্রোহ করতে শুরু করেন এবং শাসনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

সুযোগ বুঝে ২৪০ হিজরি (৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে এখানে একজন আরব সরদার উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারি একটি স্বাধীন সরকার গঠন করেন যা “হাব্বারি সাম্রাজ্য” নামে পরিচিত হয়। এরপর আব্দুল্লাহ বিন উমর, মুসা বিন উমর এবং উমর বিন আব্দুল্লাহ তার উত্তরসূরি হন।

২৯০ হিজরি (৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে মুলতান এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বনু সামাহ নামক একটি পরিবারের পৃথক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সিন্ধু রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বনু সামাহর মাত্র একজন শাসক মুনাব্বিহ বিন আসাদের নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এখানে ইসমাইলি শিয়াদের একটি দল কারামতিদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে, এমনকি ৩৬৭ হিজরি (৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে একজন কারামতি প্রধান জলাম বিন শায়বান বনু সামাহকে উৎখাত করে এখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিশরের বনু উবাইদের খুতবা ও মুদ্রা চালু করেন। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে এই পরিবারের প্রধান ছিলেন আবুল ফাতাহ দাউদ। এটি সেই সময় ছিল যখন সুলতান মাহমুদ গজনভি এখানে পা রেখেছিলেন। [১]

অস্তিত্বের বাগানে উম্মতসমূহ ফলবানও আছে
আবার ফলবঞ্চিতও আছে, শরৎ-আক্রান্তও আছে
শত শত গাছ আছে, জীর্ণশীর্ণও আছে, সতেজও আছে
শত শত বাগানের গর্ভে এখনও লুকায়িতও আছে
ইসলামের মাহফিল হলো ফলপ্রসূ হওয়ার নমুনা
এটি শত শত শতাব্দীর বাগান পরিচর্যার ফল
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা, পঞ্চম খণ্ড, অধ্যায়: বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর মুসলিম শাসন।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

হিন্দুস্তানের বিজেতাগণ

গজনভি ও ঘুরি

৩৬২ হিজরি থেকে ৬০২ হিজরি

(৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ)

মোট সময়কাল: চান্দ্র বর্ষ অনুযায়ী: ২৪৬ বছর। সৌর বর্ষ অনুযায়ী: ২২৯ বছর।

https://t.me/BoierSomahar

গজনবী সালতানাত

৩৬৬ হিজরি থেকে ৫৮২ হিজরি (৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)

শাসনের সময়কাল: হিজরি: ২১৬ বছর - খ্রিষ্টাব্দ: ২০৯ বছর

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন শুধু উপমহাদেশ নয় বরং পুরো ইসলামি বিশ্ব ধর্মীয় বিভেদ ও রাজনৈতিক পতনের শিকার ছিল, আল্লাহর রহমতে খোরাসানে গজনবী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে যা ইসলামের সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য অসামান্য অবদান রেখেছিল।

আমির সবুক্তগিন

৩৬৬ হিজরি (৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ৩৮৭ হিজরি (৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ)

এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মধ্য এশিয়ার সামানি বংশের একজন অধীনস্থ সর্দার আলপ্তগিন। যখন সামানি রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন আলপ্তগিন ৩৫১ হিজরিতে (৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ) নিজের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যা গজনী থেকে নিশাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর কর্মকর্তাদের মধ্যে সবুক্তগিন নামে একজন গোলাম ছিলেন যাকে তিনি তুর্কিস্তানের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন। শীঘ্রই সবুক্তগিন নিজের যোগ্যতা ও বীরত্বের মাধ্যমে আলপ্তগিনের পূর্ণ আস্থা অর্জন করে নেন, এমনকি আলপ্তগিন নিজের কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। ৩৬৬ হিজরিতে (৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) আলপ্তগিন ১৫ বছর শাসন করার পর মৃত্যুবরণ করলে সবুক্তগিন গজনীর শাসক হন। [১]

নির্বাক প্রাণীর দোয়া:

ঐতিহাসিকগণ সবুক্তগিনের উন্নতি ও শাসন সম্পর্কে এই অদ্ভুত কাহিনী লিখেছেন যে, সবুক্তগিন শিকার করতে খুব পছন্দ করতেন। একদিন শিকারের সময় তিনি একটি হরিণী দেখতে পান যা তার বাচ্চার সাথে ঘাস খাচ্ছিল, সবুক্তগিন তার পেছনে ঘোড়া ছোটালেন। হরিণীটি নাগালে না আসলেও সবুক্তগিন তার বাচ্চাকে ধরে ফেললেন এবং ঘোড়ার জিনের সাথে বেঁধে শহরের দিকে

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ২২৬, ২২৭; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬০, ৬১

রওনা হলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি ফিরে তাকিয়ে দেখলেন যে, হরিণীটি মাতৃত্বের টানে বাধ্য হয়ে পেছনে পেছনে আসছে।

সবুক্তগিনের মন নরম হয়ে গেল এবং তিনি বাচ্চাটিকে মুক্ত করে দিলেন। সেটি লাফাতে লাফাতে তার মায়ের সাথে গিয়ে মিশল। হরিণীটি তার বাচ্চার সাথে জঙ্গলের দিকে যাওয়ার সময় বারবার ফিরে আমির সবুক্তগিনের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন সে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং দোয়া করছে। সেই রাতেই আমির স্বপ্নে হুজুর রহমতে দো আলম ﷺ-এর জিয়ারত লাভ করলেন। তিনি ﷺ বললেন: “সবুক্তগিন! তুমি একটি অবলা প্রাণীর প্রতি দয়া করেছ, তোমার এই আমল আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত কবুল হয়েছে। তোমার উচিত এই পথই অবলম্বন করা এবং দয়া কখনো ত্যাগ না করা।”

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে হৃদয়ের ব্যথার (সহমর্মিতার) জন্য
নতুবা ইবাদতের জন্য ফেরেশতারা (কারুবিয়ান) কম ছিল না
(মীর দর্দ)

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই সবুক্তগিন উন্নতি করতে করতে সালতানাতের মসনদে আরোহণ করেন। [১]

রাজা জয়পালের সাথে প্রথম যুদ্ধ, লঘমানের লড়াই:

সবুক্তগিন ক্ষমতা গ্রহণ করেই নাসিরুদ্দিন (দীনের সাহায্যকারী) উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজেকে এর যোগ্য হিসেবেও প্রমাণ করেন। তিনি একটি শক্তিশালী ইসলামী হুকুমত কায়েম করার প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং খুব দ্রুত দক্ষিণ আফগানিস্তান জয় করে বেলুচিস্তানের খুজদার পর্যন্ত পৌঁছে যান।

সেই দিনগুলোতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর রাজা জয়পাল বিন সতপালের শাসন ছিল, তার সালতানাতকে ‘ওয়াইহিন্দ’ বলা হতো যার সীমানা একদিকে সিরহিন্দ থেকে মুলতান এবং অন্যদিকে কাশ্মীর থেকে পেশোয়ার এমনকি লঘমান [২] পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এদিকে সবুক্তগিনের বিজয়ের পরিধিও গজনি থেকে লঘমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটি দেখে জয়পালের ঘুম হারাম হয়ে যায় এবং তিনি ভাতিন্ডায় অবস্থান করে সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। শীঘ্রই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র সংঘাত শুরু হয়ে যায়।

অবশেষে জয়পাল হাতিসহ এক বিশাল লস্কর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং ওদিক থেকে সবুক্তগিনও সসৈন্যে এগিয়ে এলেন। ৩৭৬ হিজরি (৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে লঘমানের শেষ সীমানায় যা পেশোয়ারের নিকটবর্তী ছিল, উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বেশ কয়েক দিন ধরে লড়াই চলতে থাকে কিন্তু কেউ জয়ী হতে পারছিল না। এই সময়ে শীত বেড়ে যায় এবং ভারতীয় লস্করের শিরায় রক্ত জমতে শুরু করে। রাজা জয়পাল ঘাবড়ে গেলেন যে এই অবস্থায় চূড়ান্ত যুদ্ধের অর্থ হবে পরাজয়। তাই তিনি আমির সবুক্তগিনের দরবারে দূত পাঠিয়ে সন্ধির আবেদন করেন। অবশেষে স্থির হলো যে জয়পাল পঞ্চাশটি হাতি এবং দশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করবেন এবং আমিরের অনুগত থাকবেন। এই লড়াইয়ে শাহজাদা মাহমুদ গজনভিও শরিক ছিলেন যার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তিনি জয়পালের সাথে সন্ধির বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু সবুক্তগিন তার সহজাত দয়াশীলতার কারণে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে দেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৭

[২] লঘমান কাবুলের পূর্বে কাবুল নদীর তীরে একটি উপত্যকা যেখান দিয়ে পেশোয়ার থেকে কাবুলের বিখ্যাত রাস্তাটি গিয়েছে।

চুক্তির নিশ্চয়তার জন্য সবুক্তগীন কয়েকজন হিন্দু সর্দারকে জিম্মি হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং সেনাবাহিনী ফিরে গেল। [১]

জয়পালের চুক্তিভঙ্গ। ভারতের সীমান্তে গজনভী বাহিনীর আক্রমণ:

কিছুদিন পর যখন আমীরের দূতগণ জয়পালের কাছ থেকে নির্ধারিত অর্থ নিতে পৌঁছালেন, তখন তিনি তাদের জিম্মি করে ফেললেন এবং বললেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জিম্মিদের ফিরিয়ে দেওয়া না হবে, আমি এদের বন্দি করে রাখব। জয়পালের দরবারের খত্রীরা তাকে বারণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তুর্কিদের সাথে চুক্তিভঙ্গ করা মানে ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানানো, কিন্তু জয়পাল তা মানেননি এবং এভাবে চুক্তি ভেঙে তিনি এক নতুন যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করলেন।

এ পর্যন্ত সবুক্তগীন নিজের দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু এখন চুক্তিভঙ্গের খবর পেয়ে তিনি তার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা জয়পালের সীমান্তে প্রবেশ করে এবং তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যতটা সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে জয়পালের দেশে ক্রমাগত ছোট ছোট আক্রমণ শুরু হয়ে গেল, যার ফলে সেখানে এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। [২]

লঘমানের দ্বিতীয় যুদ্ধ:

জয়পাল এখন এক বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। তিনি দিল্লি, আজমির, কালিঞ্জর এবং কনৌজের রাজপুত শাসকদেরও সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠালেন। এভাবে এক লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল বাহিনী বন্যার মতো অগ্রসর হয়ে পেশোয়ার ছাড়িয়ে লঘমান পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

সবুক্তগীনও গজনী থেকে অগ্রসর হয়ে এখানে পৌঁছেছিলেন। তিনি একটি পাহাড়ে উঠে শত্রুর আধিক্য পর্যবেক্ষণ করলেন, কিন্তু সিংহ কি কখনো ছাগলের আধিক্য দেখে ভয় পায়? তিনি এক অদ্ভুত রণকৌশল অবলম্বন করলেন এবং নিজের বাহিনীকে পাঁচশ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পর্যায়ক্রমে শত্রুর মোকাবিলায় পাঠাতে শুরু করলেন। একটি দল ক্লান্ত হতে শুরু করলেই তারা পিছিয়ে আসত এবং একটি সতেজ দল তাদের জায়গা নিত। হিন্দুরা সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

যখন আমীরের নির্দেশে মুসলমানরা একযোগে আক্রমণ করে শত্রুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী নীলাব পর্যন্ত তাদের তাড়া করে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। [৩]

বিজিত অঞ্চলসমূহে ইসলামি দাওয়াতের ব্যবস্থা:

আমীর সবুক্তগীন এই বিজয়ের পর এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। খিলজি ও আফগান গোত্রের লোক যারা যাযাবর বা মরুচারী ছিল, তাদের বিপুল সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হলো এবং দশ হাজার সদস্যের একটি বাহিনী গঠন করে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনে পেশোয়ারে মোতায়েন করা হলো। এভাবে এই অঞ্চলগুলোতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো এবং সেখানে মসজিদসমূহ নির্মাণ করা হলো।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬৩, ৬৪

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬৫, ৬৬

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬৫, ৬৬

এবং ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু হয়ে গেল। [১]

আমীর সবুক্তগিনের মৃত্যু:

৫৬ বছর বয়সে আমীর সবুক্তগিন ২০ বছর শাসনের পর শাবান ৩৮৭ হিজরী (আগস্ট ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) এ ইন্তেকাল করেন। তিনি বলখে নির্মাণ কাজ তদারকি করছিলেন যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তিনি গজনীর উদ্দেশ্যে রওনা হন কিন্তু পথেই মারা যান। তার মরদেহ গজনীতে এনে দাফন করা হয়। তার জীবন ছিল উত্তম নেতৃত্ব, জিহাদের জযবা এবং প্রজাপালনের এক চমৎকার নমুনা। [২]

আমীর সবুক্তগিনের সীরাত, ওলামাদের দৃষ্টিতে:

আমীর সবুক্তগিন সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল আসীর আল-জাযারি (রহ.) লিখেছেন: "তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, কল্যাণকামী, জিহাদপ্রিয়, সঠিক আকিদার অধিকারী, অত্যন্ত মুরুওয়াত সম্পন্ন, ওয়াদা রক্ষাকারী এবং আমানতদার। নিঃসন্দেহে এই কারণেই আল্লাহ তাআলা তার বংশে বরকত দান করেছিলেন এবং তার রাজ্যের সময়কাল সামানি সাম্রাজ্য ও সেলজুক সাম্রাজ্যের অবসানের পরেও অব্যাহত ছিল।" [৩]

কাজী মিনহাজুস সিরাজের বর্ণনা হলো: "আমীর সবুক্তগিন ছিলেন বুদ্ধিমান এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সাহসী ও ধর্মপ্রাণ। ওয়াদা রক্ষায় তিনি ছিলেন অটল এবং সত্যবাদী। মানুষের সম্পদের প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না। প্রজাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তার আমির ও সঙ্গীদের মধ্যে যারা তার মতো গুণাবলী অর্জন করেছিল, আল্লাহ তাআলা তাদেরও সম্মান ও বরকত দান করেছিলেন।" [৪]

কখনো মুছে যেতে পারে না সেই মুসলমান ব্যক্তি, যার
আযানের মাধ্যমে প্রকাশ পায় কলিম ও খলিল-এর রহস্য।
তার ভূমি সীমাহীন, তার দিগন্ত দিগন্তহীন,
তার সমুদ্রের ঢেউ হলো দজলা, দানিউব ও নীল।
তার যুগ অদ্ভুত, তার কাহিনীগুলো অনন্য,
প্রাচীন যুগকে সে দিয়েছে বিদায়ের পয়গাম।
সে রুচিবানদের সাকি, অনুরাগের ময়দানের অশ্বারোহী,
তার শরাব স্বচ্ছ, তার তলোয়ার খাঁটি।
সে এক সিপাহি, যার বর্ম হলো 'লা ইলাহা',
তলোয়ারের ছায়ায় তার আশ্রয় হলো 'লা ইলাহা'।
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৫, ২৬

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬৯, ৭০; আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৮৭; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২২৬ থেকে ২২৮

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৮৭

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২২৮

ইসমাইল বিন সবুক্তগিন

৩৮৭ হিজরি থেকে ৩৮৮ হিজরি

(৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)

সবুক্তগিন মৃত্যুর পূর্বে জরুরি অবস্থায় তাঁর ছোট ছেলে ইসমাইলের জন্য উত্তরাধিকারের অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, কারণ বড় ছেলে শত শত মাইল দূরে নিশাপুরে ছিলেন। তাই পিতার মৃত্যুর পর ইসমাইল বাদশাহ হন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির এবং অনভিজ্ঞ, যার ফলে লশকর বা সেনাবাহিনীর আমিরগণ তাঁর ওপর প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের খেয়ালখুশি মতো রাজকোষ থেকে অঢেল সম্পদ খরচ করতে শুরু করেন। ইসমাইল তাঁদের বাধা দিতে পারেননি। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, কিছুদিনের মধ্যেই রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল।

সেই দিনগুলোতে মাহমুদ গজনভি নিশাপুরে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ইসমাইলকে পত্র পাঠিয়ে তাঁকে অবহিত করেন যে, সালতানাতগুলোর নিয়ম এটাই যে বড় ছেলেই উত্তরাধিকারী হয়। মরহুম পিতা তোমাকে সিংহাসনে এই জন্য বসিয়েছিলেন যে আমি সেই সময় উপস্থিত ছিলাম না। মাহমুদ গজনভি ইসমাইলকে প্ররোচিত করেন যেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে এমন একটি চুক্তি করে নেন যাতে গজনী এবং নিশাপুর একটি ফেডারেশনের অধীনে চলে আসে, কিন্তু ইসমাইল তা মানেননি। দূতদের মাধ্যমে আলোচনার কয়েক দফা চললেও তা ব্যর্থ হয়।

এই সময়ে গজনভি রাষ্ট্রের কিছু একনিষ্ঠ আমির মাহমুদ গজনভির সাথে পত্রবিনিময় করে তাঁকে গজনীর সিংহাসন গ্রহণ করার এবং দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর পরামর্শ দিয়ে নিজেদের আনুগত্য পেশ করেছিলেন। ফলে মাহমুদ গজনভি লশকর নিয়ে গজনীর নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে যান। ইসমাইল তাঁর সহযোগী আমিরদের বাহিনী নিয়ে মোকাবিলায় আসেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হন এবং বন্দি হন। মাহমুদ গজনভি তাঁকে কোনো শাস্তি দেননি বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে নায়েব হিসেবে পুনরায় গজনীর সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং নিজে বলখের দিকে চলে যান। এভাবে ইসমাইলের সাত মাসের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে এবং এখান থেকেই সুলতান মাহমুদ গজনভির গৌরবময় শাসনের যুগ শুরু হয়। এই সময় ৩৮৮ হিজরি শুরু হয়ে গিয়েছিল, যদিও ইবনে আসির (রহ.) ঘটনাবলিকে একত্রে জমা করার জন্য একে ৩৮৭ হিজরির অধীনে উল্লেখ করেছেন। [১]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৮৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি, পৃষ্ঠা ৭২ থেকে ৭৪।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (ষষ্ঠ খণ্ড)

সুলতান মাহমুদ গজনভি, ইয়ামিন উদ-দৌলা

৩৮৮ হিজরি থেকে ৪২১ হিজরি

(৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান মাহমুদ গজনভির জন্ম ১০ মহরম ৩৫৭ হিজরি (২৯ আগস্ট ৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে হয়েছিল। সেই রাতে সুলতানের পিতা সবুক্তগিন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার ঘর থেকে একটি চারাগাছ গজাল এবং তা দেখতে দেখতে একটি বিশাল ও ছায়াদানকারী বৃক্ষে পরিণত হলো, যার শাখা-প্রশাখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এমনকি পুরো পৃথিবী এর ছায়াতলে চলে এল। সবুক্তগিন জাগ্রত হয়ে এই স্বপ্নের কথা ভাবছিলেন, এমন সময় তাকে পুত্রের জন্মের সংবাদ দেওয়া হলো। সবুক্তগিন ভাবলেন এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো এই যে, এই শিশুটি বিশ্বের একজন অনেক বড় শাসক হবে। ইতিহাস সাক্ষী যে, তারপর ঠিক তেমনই হয়েছিল। [১]

ইতিহাসের প্রথম সুলতান:

মাহমুদ গজনভির সিংহাসন আরোহণ ৩৮৮ হিজরি (৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে হয়েছিল। সেই সময় সুলতানের বয়স ছিল ৩১ বছর। তিনি ছিলেন সাহস ও বীরত্ব, রাজনীতি ও প্রজ্ঞা এবং ন্যায় ও ইনসাফের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি ৩৩ বছর জিহাদে অতিবাহিত করেন এবং হিন্দুস্তানে ১৭টি জিহাদি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি নিজের নামের সাথে একটি অনন্য উপাধি ‘সুলতান’ যুক্ত করেন।

আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি (রহ.) বলেন:
“মাহমুদ ছিলেন প্রথম শাসক যিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তার আগে এই উপাধি কোনো শাসকের ছিল না।” [২]

প্রফেসর বি. এন. বর্মা লেখেন: “মাহমুদ প্রকৃতপক্ষে একজন অত্যন্ত সাহসী এবং জ্ঞানানুরাগী মানুষ ছিলেন। বড় বড় কবিরা তার দরবারে উপস্থিত থাকতেন। ফেরদৌসির মতো কবি তার কবিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২২৮।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৮৭।

[৩] আয়না-ই-তারিখ, হিন্দুস্তানের ইতিহাস: পৃষ্ঠা ১০৯, প্রকাশক প্রসাদ অ্যান্ড ব্রাদার্স, আগ্রা, প্রকাশিত: ১৯৩৩।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

উলামা ও সাহিত্যিকদের বাগান:

সুলতান মাহমুদ গজনভীর যৌবনকাল থেকেই নির্মাণ কাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। একবার তিনি গজনীতে একটি অত্যন্ত সুন্দর বাগান তৈরি করান এবং তাতে অত্যন্ত মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এরপর এর উদ্বোধনের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁর পিতা এই উপলক্ষে তাঁকে বললেন: "হে বৎস! এই বাগান ও অট্টালিকাও অত্যন্ত পছন্দনীয় ও চমৎকার জিনিস, কিন্তু এটি তো তোমার অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে যে কেউ তৈরি করতে পারে। রাজা ও রাজপুত্রদের এমন অট্টালিকা নির্মাণ করা উচিত যার কোনো নজির কেউ তৈরি করতে পারবে না।" সৌভাগ্যবান পুত্র মাথা নত করে জিজ্ঞেস করলেন: "এমন অট্টালিকা কোনটি হতে পারে?" সুলতান বললেন: "সেই অট্টালিকা হলো ইলম ও ফযিলতের অধিকারীদের (জ্ঞানী ও গুণীজনদের) পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁদের হৃদয়ে নিজের ঘর তৈরি করা। এটিই সেই অট্টালিকা যার আলোচনা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।" [১]

সৌভাগ্যবান পুত্র এই উপদেশের ওপর অক্ষরে অক্ষরে আমল করেন এবং এটাই ছিল কারণ যে সুলতান মাহমুদ গজনভীর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

মাশায়েখদের প্রতি ভক্তি:

সুলতানের আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি গভীর ভক্তি ছিল। মহান সূফী শেখ আবুল হাসান খারকানী (রহ.)-এর সাথে তাঁর বিনম্র সম্পর্ক ছিল। সুলতান একবার তাঁর গোলাম আয়াজের সাথে গোলামদের মতো পোশাক পরে শেখের খানকায় উপস্থিত হন এবং শেখ তাঁকে নিজের খিরকা (কুর্তা) দান করেন। [২]

সুলতান মাহমুদের তাঁর পিতার আমলের অভিযানসমূহ:

সুলতান মাহমুদ গজনভীর পিতা সবুক্তগিনের সময়ে গজনভী রাষ্ট্রকে অত্যন্ত শক্তিশালী দুই মুসলিম প্রতিবেশীর মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল মধ্য এশিয়ার সামানি শাসকগোষ্ঠী, যাদের শাসন খোরাসান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাদের রাজধানী ছিল বুখারা। অন্যটি ছিল কারখানি তুর্কি, যাদের কিছু শাহজাদা চীনা তুর্কিস্তানে এবং কিছু সমরকন্দে শাসন করছিল। সবুক্তগিন ও মাহমুদ গজনভীর সময়ে সামানি বংশে নূহ বিন মনসুর এবং এরপর মনসুর বিন নূহ বিখ্যাত শাসক ছিলেন, অন্যদিকে কারখানিদের মধ্যে হারুন বুগরা খান এবং তাঁর উত্তরসূরি ইলিক খান আহমদ খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই উভয় পক্ষই সামানিদের কেন্দ্র বুখারা দখলের জন্য আক্রমণ করতে থাকে, কিন্তু নূহ বিন মনসুরের দৃঢ়তার কারণে তারা সফল হতে পারেনি। [৩]

নূহ বিন মনসুর ও সবুক্তগিনের চুক্তি:

তবে নূহ বিন মনসুরের পাল্লা তখন খুব দুর্বল হয়ে পড়ে যখন তাঁর দুই গুরুত্বপূর্ণ আমির ফায়েক ও আবু আলী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং

---

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭

[২] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৯

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৮২-৩৮৩

এভাবে খোরাসান তার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। ফলে নূহ সবুক্তগিনের সাথে এই মর্মে চুক্তি করলেন যে, তিনি যদি তাকে সাহায্য করে বিদ্রোহীদের নির্মূল করে দেন, তবে বিনিময়ে খোরাসান তার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেওয়া হবে। সবুক্তগিন তার পুত্র মাহমুদ গজনভির সাথে ৩৮৪ হিজরিতে এই অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিদ্রোহীদের নির্মূল করেন, যার ফলে খোরাসান সবুক্তগিনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সবুক্তগিন মাহমুদ গজনভিকে সেখানকার সুবাদার বানিয়ে খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে মোতায়েন করেন। [১]

সামানি ষড়যন্ত্রকারী আমিরদের সাথে গজনভিদের যুদ্ধ:

কিন্তু ৩৮৫ হিজরিতে আবু আলী এবং ফায়েক মিলে খোরাসান দখলের নতুন প্রচেষ্টা চালায় এবং মাহমুদ গজনভির কাছে সৈন্যের স্বল্পতার সুযোগ নিয়ে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করে। তবে শীঘ্রই সবুক্তগিন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে খোরাসানে পৌঁছে যান এবং জমাদিউল আখিরা ৩৮৫ হিজরিতে তুসের কাছে বিদ্রোহী আমিরদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। এই সময়ে মাহমুদ গজনভিও সাহায্য নিয়ে পৌঁছে যান। অবশেষে ফায়েক এবং আবু আলী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। [২]

সুলতান মাহমুদের নিজ শাসনকালে সামানিদের সাথে দ্বন্দ্ব

রজব ৩৮৭ হিজরিতে আমির নূহ বিন মনসুরের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার অনভিজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন শহরে স্বায়ত্তশাসিত আমিররা দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোরাসানের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। [৩]

এদিকে শাবান ৩৮৭ হিজরিতে গজনির আমির সবুক্তগিনের মৃত্যু হয় এবং ৩৮৮ হিজরিতে মাহমুদ গজনভিকে নিশাপুর ছেড়ে তার ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমতা নেওয়ার জন্য গজনীতে আসতে হয়। তার অনুপস্থিতিতে সামানি আমিররা অনেক এলাকা দখল করে নেয়। এটি দেখে মাহমুদ গজনভি মনসুর সামানিকে লিখলেন: “আমরা সামানি রাষ্ট্রের অনুগত এবং কৃতজ্ঞ হিসেবে চলে আসছি, এখন সামানি রাষ্ট্রেরও উচিত খোরাসানকে গজনভি রাষ্ট্রের অধীনে দেওয়ার চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করা।” মনসুর জবাবে লিখলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে অপারগ। মাহমুদ এই জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। শীঘ্রই তিনি কোনো বাধা ছাড়াই খোরাসানের কেন্দ্র নিশাপুর দখল করে নেন। আমির মনসুর সামানি এই সংবাদ পেয়ে বুখারা থেকে নিশাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। [৪]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৩৮৪ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৩৮৫ হিজরি

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৩৮৭ হিজরি

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৩৮৮ হিজরি

মনসুর সামানির বিরুদ্ধে তার আমিরদের বিদ্রোহ:

মনসুর সামানি অগ্রসর হতে হতে ৩৮৯ হিজরিতে সারাখস পর্যন্ত পৌঁছে যান, অন্যদিকে মাহমুদ গজনভি সতর্কতাস্বরূপ নিশাপুর ত্যাগ করে মুরগাব নদীর তীরে তাবু গেড়েছিলেন যাতে পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

এই সময়ে বকতোজুন নামক এক খোরাসানি আমির অন্য এক ষড়যন্ত্রকারী আমির ফায়িককে সাথে নিয়ে আমির মনসুর বিন নুহ-এর তখত উল্টে দেওয়ার এবং তার অল্পবয়স্ক ভাই আব্দুল মালিককে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। আরও কিছু আমিরকেও রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে সাথে নেওয়া হয়েছিল। আমির মনসুর বিন নুহ সারাখসে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ তাকে বন্দি করে অন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার স্থলে আব্দুল মালিককে সিংহাসনে বসানো হয়। মনসুরের শাসনকাল ছিল মাত্র এক বছর সাত মাস। [১]

সুলতান মাহমুদের সাথে সামানিদের যুদ্ধ:

সুলতান মাহমুদ গজনভি যখন এই পরিস্থিতির কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি বকতোজুন ও ফায়িককে তাদের প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্য কঠোর তিরস্কার করেন। এরপর সুলতান সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি সামানি রাষ্ট্রকে এই বিশ্বাসঘাতক ও পুতুল আব্দুল মালিকের হাতে থাকতে দেবেন না। তিনি বাহিনীকে সামানিদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। ওদিকে বকতোজুন ও ফায়িকও তার দিকে অগ্রসর হয়। ৩৮৯ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসে মার্ভের বাইরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে সুলতান মাহমুদ বিজয় লাভ করেন এবং সমগ্র খোরাসান গজনভি রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। [২]

খিলাফত দরবার থেকে ইয়ামিনুদ দাওলা উপাধি লাভ:

৩৯০ হিজরিতে (৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান যখন হেরাত জয় করেন, তখন বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ সুলতানকে 'امين الملت و يمين الدولة' (আমিনুল মিল্লাত ওয়া ইয়ামিনুদ দাওলা) উপাধিতে ভূষিত করেন। সুলতান বাগদাদের দুর্বল হয়ে পড়া আব্বাসীয় খিলাফতকে সমর্থন দেন এবং সেখানে জেঁকে বসা বুয়াইহি আমিরদের অবৈধ আধিপত্য অনেকাংশে কমিয়ে দেন। [৩]

ইলিক খান, সামানি ও মাহমুদ গজনভি:

ওদিকে ইলিক খান ৩৮৯ হিজরির জিলকদ মাসে বুখারা দখল করে আব্দুল মালিক ও তার পুরো পরিবারকে বন্দি করেন। পরের বছর এই পরিবারের এক শাহজাদা মুনতাসির ইলিক খানের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে বুখারায় পুনরায় নিজের শাসন কায়েম করেন এবং কিছুকাল পর খোরাসান আক্রমণ করে সেখান থেকে সুলতান মাহমুদের ভাই মনসুরকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু যখন সুলতান মাহমুদ গজনভি নিজে সেখানে পৌঁছালেন, তখন তার মোকাবিলা করার সাহস মুনতাসিরের হলো না। সুলতান মাহমুদ একজন উদারমনা বিজয়ীর মতো তাকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাকে অনুমতি দেন যে তিনি রে এবং এর দক্ষিণের ইরানি অধিকৃত অঞ্চলগুলো, যা অরাজকতার শিকার,

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৮৯ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৮৯ হিজরি

[৩] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ৩৯০ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৯০ হিজরি

...দখলদার হয়ে যায়।

কিন্তু কিছুকাল পর মুনতাসির রে (Ray) দখলের লোভে পুনরায় খোরাসান দখলের চেষ্টা শুরু করেন, যার ফলে সুলতান মাহমুদ তাকে বিতাড়িত করার জন্য একটি বিশাল বাহিনী পাঠান। এই বাহিনী ৩৯১ হিজরির জিলকদ মাসে নিশাপুরের কাছে মুনতাসিরকে পিছু হটতে বাধ্য করে। তিনি কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যান, কিন্তু শীঘ্রই পুনরায় বাহিনী গঠন করে নতুন এলাকা দখলের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তবে ৩৯২ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে মনসুর বিন সবুক্তগিনের হাতে তিনি এমন এক শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন যে, তার সমস্ত বড় বড় আমির ও অফিসাররা বন্দি হন এবং তিনি নিজে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যান। [১]

মুনতাসির সামানির পরিণতি:

মুনতাসির মধ্য এশিয়ায় পৌঁছে সেলজুকদের সাথে নিয়ে ইলিক খানকে পিছু হটতে বাধ্য করতে সফল হন, কিন্তু শীঘ্রই ইলিক খান পূর্ব তুর্কিস্তানে গিয়ে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন। যেহেতু সেই দিনগুলোতে মুনতাসিরের সমর্থক সেলজুক গোত্রগুলো তাদের নিজ নিজ গ্রামে চলে গিয়েছিল, তাই তাকে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে হয়। এই সময়ে তিনি এমন এক এলাকায় পৌঁছে যান যেখানে বাসিন্দারা সুলতান মাহমুদের পক্ষ থেকে মুনতাসিরকে ধরার নির্দেশ পেয়েছিল। ফলে সেই লোকেরা মুনতাসিরকে হত্যা করে ফেলে। এই ঘটনাটি ৩৯৫ হিজরির শেষের দিকের। এর মাধ্যমেই সামানি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। [২]

কারাখানিদের খোরাসান দখলের চেষ্টা ও পশ্চাদপসরণ:

সুলতান মাহমুদ গজনভি ৩৯৬ হিজরিতে জিহাদের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানে ছিলেন, এই সুযোগে ইলিক খান একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তার বাহিনী খোরাসানের দিকে পাঠিয়ে দেন। তার ভাই জাফর তগিন বলখ এবং সেনাপতি সুবাশি তগিন হেরাত দখল করে নেন। সুলতান বিষয়টি জানতে পেরে হিন্দুস্তানের রাজাদের সাথে সন্ধি করে দ্রুত ফিরে আসেন। তার অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে কারাখানিরা আমু দরিয়া পার হয়ে চলে যায়। নদী পার হওয়ার সময় সুবাশি তগিনকে আল-সেলজুকের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, যাদেরকে পিছু হটিয়ে তিনি বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। যা-ই হোক, খোরাসান থেকে ইলিক খানের দখল শেষ হয়ে যায়। [৩]

কারাখানি বাহিনীর সাথে সুলতান মাহমুদ গজনভির ভয়াবহ যুদ্ধ:

৩৯৭ হিজরিতে ইলিক খান পূর্ব তুর্কিস্তানের শাহজাদাদের সাথে নিয়ে এক বিশাল বাহিনীসহ সুলতান মাহমুদ গজনভির এলাকায় আক্রমণ করেন। সুলতান মাহমুদ তাদের অগ্রযাত্রার খবর শোনামাত্রই হিন্দুস্তানি, খলজি, আফগান, তুর্কানে গুয এবং সেলজুক গোত্রগুলোকে একত্রিত করেন এবং দ্রুত তার উত্তর সীমান্তে বলখে পৌঁছে যান। প্রথম দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে কিন্তু উভয় পক্ষের পাল্লা সমান ছিল। পরের দিন পুনরায় অত্যন্ত তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। সুলতান মাহমুদ এই সময়ে একটি টিলার ওপর চড়ে সওয়ারি থেকে...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৩৮৯ হিজরি থেকে ৩৯২ হিজরি।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: পৃষ্ঠা ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, সন ৩৮৯ হিজরি, ৩৯০ হিজরি, ৩৯২ হিজরি।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৩৯৬ হিজরি।

নেমে আসলেন এবং মাটিতে মুখ ঘষে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করলেন। এরপর নিজের হাতিতে সওয়ার হয়ে ইলিক খানের বাহিনীর ওপর এমনভাবে আক্রমণ করলেন যে, সারির পর সারি উল্টে গেল এবং তুর্কিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো। সুলতানের সৈন্যরা আমু দরিয়া পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করল এবং বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল লাভ করল। [১]

ইলিক খানের মৃত্যু:

৪০৩ হিজরিতে ইলিক খান আবারও সুলতান মাহমুদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য খোরাসানে সৈন্য অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু বাহিনী রওনা হওয়ার আগেই ইলিক খানের শেষ সময় ঘনিয়ে এল। [২]

তার মৃত্যুর পর তোগান খান পূর্ব ও পশ্চিম তুর্কিস্তানের বাদশাহ হলেন। তিনি সুলতান মাহমুদের সাথে সন্ধি করে নিলেন। তিনি তার পত্রে লিখেছিলেন:

“ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, আপনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থাকুন আর আমি তুর্কিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকি। আমরা একে অপরের সাথে লড়াই করা ছেড়ে দিই।”

সুলতানের কাছে এই প্রস্তাব পছন্দ হলো এবং এভাবে পূর্ব তুর্কিস্তান ও গজনভি সাম্রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধের সিলসিলা শেষ হলো এবং উভয় শাসক নিজ নিজ সীমান্তে জিহাদের জন্য মনোনিবেশ করলেন। [৩]

সুলতান মাহমুদ গজনভি কারখানিদের বিতাড়িত করলেন:

৪০৮ হিজরিতে তোগান খানের মৃত্যুর পর তার ভাই আরসালান খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তার ভাই কদর খান, যিনি মধ্য এশিয়ার সুবাদার ছিলেন, তার আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। কদর খান আরসালান খানের আক্রমণ থেকে বাঁচতে সুলতান মাহমুদ গজনভির সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং সুলতান তাকে সাহায্যও করেন। কিন্তু কিছুকাল পর কদর খান ও আরসালান খান একে অপরের শাসন মেনে নিয়ে সুলতান মাহমুদ গজনভির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেন এবং আমু দরিয়া পার হয়ে সৈন্য অভিযান চালালেন। সুলতান তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন এবং তাদের নদীর ওপারে ঠেলে দিলেন। এই হুড়োহুড়িতে আক্রমণকারীদের অসংখ্য সৈন্য নদীতে ডুবে মারা গেল। কয়েক দিন পর খাওয়ারিজমের শাসক সুলতান মাহমুদকে বিজয়ের মুবারকবাদ পাঠালে সুলতান দূতের কাছে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা এত দ্রুত আমাদের বিজয়ের খবর কীভাবে পেলে?” সে উত্তর দিল: “আমু দরিয়ার স্রোতে কারখানিদের এত বেশি টুপি ভেসে আসছিল যে, তা দেখেই আমরা আপনার বিজয়ের খবর পেয়ে গেছি।” [৪]

সেলজুকদের খোরাসানে হিজরত:

৪১৫ হিজরিতে সুলতান মাহমুদ যখন আলী তিগিনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বুখারা জয় করলেন, তখন কদর খান আমু দরিয়া...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩৯৭

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪০৩

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪০৩

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪০৮

তারিখ-এ-উম্মাতে মুসলিমা

...তীরে সুলতান মাহমুদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। কদর খানই সুলতান মাহমুদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সেলজুকদের শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তাদের একটি বড় অংশকে মধ্য এশিয়া থেকে খোরাসানে স্থানান্তরিত করা হোক। সুলতান মাহমুদ এর ওপর আমল করেন, কিন্তু এভাবে সেলজুকরা খোরাসানে পা রাখার সুযোগ পেয়ে যায়। [১]

ঘোরীদের সাথে সংঘর্ষ:

ঘোর-এর দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকা মধ্য আফগানিস্তানে অবস্থিত, যেখানে প্রাচীনকাল থেকেই লড়াকু গোত্রগুলো বসবাস করত। সুলতান মাহমুদ গজনভীর সময় পর্যন্ত এখানে ইসলাম পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি। কিছু সরদার ছাড়া অধিকাংশ লোকই কাফের ছিল এবং লুটতরাজ ও ফিতনা-ফাসাদে অভ্যস্ত ছিল। যারা মুসলমান ছিল, তারা কেবল কালিমা পড়েছিল এবং দ্বীন সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। এই সময়ে তাদের সরদার ছিল মুহাম্মদ বিন সুরি, যে বড় শক্তির অধিকারী হয়ে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল।

সুলতান মাহমুদ গজনভী ৪০১ হিজরিতে তাঁর সেনাপতি আলতুন তাশ এবং আরসালান হাজিবকে ঘোরীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞ অফিসাররাও এখানকার উপত্যকাগুলোতে পা জমাতে এবং ঘোরীদের পিছু হটাতে পারলেন না। অবশেষে সুলতান মাহমুদ গজনভী নিজে সৈন্য নিয়ে সাহায্যে এগিয়ে এলেন। ঘোরী গোত্রগুলো পিছু হটে মুহাম্মদ বিন সুরির কাছে 'আহঙ্গারান' দুর্গে একত্রিত হলো। অবশেষে মুহাম্মদ বিন সুরি দশ হাজার যোদ্ধার সাথে 'আহঙ্গারান' থেকে বেরিয়ে গজনভী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সুলতান মাহমুদের নির্দেশে বাহিনী পিছু হটার ভান করল এবং এরপর পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুদের ঘিরে ফেলল। এভাবে ঘোরীরা পরাজিত হলো। মুহাম্মদ বিন সুরিও বন্দী হলেন, কিন্তু বন্দীত্বের অপমান থেকে বাঁচতে তিনি বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন।

সুলতান মাহমুদ গজনভী এই এলাকায় ইসলামের নিদর্শনসমূহ (শাআইরে ইসলাম) চালু করেন এবং সেখানে উলামা ও দাঈদের নিয়োগ দেন যাতে তারা মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তাদের শরয়ী মাসআলা শিক্ষা দেন। [২]

এই সূক্ষ্ম বিষয়টি মিল্লাতে বায়যার ইতিহাস থেকে স্পষ্ট
যে, এশিয়া ভূখণ্ডের জাতিসমূহের পাহারাদার তুমি
সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার ও সাহসিকতার পাঠ পুনরায় গ্রহণ করো
তোমাকে দিয়েই পৃথিবীর নেতৃত্বের কাজ নেওয়া হবে।
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: খণ্ড ৮, পৃ: ৭; তারিখ-এ-দাওলাতে আল-ই-সেলজুক লিল ইমাদ আল-ইসফাহানি: পৃ: ৫; তাবকাতে নাসিরি: পৃ: ৩৩৭, ৩৪৭, ইরান।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪০১ হিজরির ঘটনাবলি।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

হিন্দুস্তানের অভিযানসমূহ

সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই সুলতান মাহমুদ হিন্দুস্তানে ইসলাম প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। শৈশব থেকেই সুলতানের হিন্দুস্তানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার শখ ছিল। সেখানকার মুসলমানদের দুর্বলতা এবং হিন্দু রাজাদের জুলুম-অত্যাচারে জনগণের দুর্দশার কথা তার জন্য কষ্টের কারণ ছিল। শৈশবেই তিনি সংকল্প করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা যদি তাকে শাসন ক্ষমতা দান করেন, তবে তিনি হিন্দুস্তানের মাটিতে মুসলমানদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। গজনীর শাসনভার গ্রহণ করার সাথে সাথেই সুলতান মাহমুদ গজনভী এই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকার করেছিলেন, তবে এর আগে বর্তমান সরকারকে এতটাই শক্তিশালী করা প্রয়োজন ছিল যাতে তা হিন্দুস্তানের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে দ্বিধাহীনভাবে মোকাবিলা করতে পারে। ফলে সুলতান প্রথমে সেই এলাকাগুলোকে পদানত করেন যা গজনভী সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারত। এই অভিযানগুলোর সময় সুলতান অল্প সময়ের মধ্যে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়ার এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেন, যার বিবরণ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। [১]

ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরি শতাব্দীর হিন্দুস্তান

হিন্দুস্তানের বিজয়সমূহ উল্লেখ করার আগে এটি সমীচীন হবে যে, আমরা সেই সময়ের হিন্দুস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান বোঝার চেষ্টা করি। মনে রাখতে হবে যে, সেই সময়ের হিন্দুস্তানের ভৌগোলিক মানচিত্র আজকের চেয়ে বেশ আলাদা ছিল। সেই যুগে সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্যিক পথগুলো শহরগুলোর গুরুত্ব নির্ধারণ করত। আমরা সেই সময়ের হিন্দুস্তানের বিভিন্ন ভৌগোলিক অংশ এবং তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি:

উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্তান:

(১) ওহিন্দ: সিন্ধু নদের এই উপকূলীয় শহরটি ব্রাহ্মণ শাহী সাম্রাজ্য বিহিন্দের রাজধানী ছিল, যাকে বর্তমানে হুন্ড বলা হয়।

(২) নন্দনাহ: পাঞ্জাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং বিহিন্দ সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র ছিল যা কোহিস্তানে নামক (লবণ পর্বতমালা, জেলা ঝিলাম)-এ অবস্থিত ছিল।

(৩) পেশোয়ার: প্রথমে হিন্দুদের এবং পরবর্তীতে হিন্দুস্তানের নতুন ইসলামী সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। একে পুরশুর বা ফরশুর বলা হতো।

(৪) মুলতান: পাঞ্জাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর। প্রাথমিক মুসলিম যুগে এটি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র ছিল।

---

[১] আল-মুনতাজাম লি-ইবনিল জাওযী, সন ৩৯০ হিজরি। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সন ৩৯০ হিজরি।

(৫) লাহোর: পাঞ্জাবের এই শহরটি প্রথমে হিন্দুস্তান সালতানাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। পরে এটি গজনভি সুলতানদের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে থাকে।

উত্তর ভারত:

- (১) দিল্লি: এটি এই যুগে প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন শহর ছিল যা পরবর্তীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। সে সময় এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা তোমর বংশের শাসন ছিল। পরবর্তীতে চৌহান রাজপুতরা এটি দখল করে নেয়।
- (২) কনৌজ: এটি একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর ছিল যা কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর ভারতে ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ছিল।
- (৩) বেনারস (বারাণসী): এটি হিন্দুদের একটি ধর্মীয় স্থান ছিল। পরবর্তীতে এটি গাহড়বাল বংশের রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।
- (৪) আজমির: এটি রাজপুতদের কেন্দ্র ছিল। ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী এই শহরটিকে দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

মধ্য ভারত:

- (১) "খাজুরাহো": এটি চন্দেল্লা রাজপুতদের রাজধানী ছিল।
- (২) কালিঞ্জর: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিল যা চন্দেল্লা রাজপুতদের অধীনে ছিল এবং এর দৃঢ়তার জন্য বিখ্যাত ছিল।
- (৩) গোয়ালিয়র: এটি চন্দেল্লা বংশের অত্যন্ত সুদৃঢ় একটি দুর্গ ছিল যা প্রত্যেক বিজয়ীর জন্য পরীক্ষার বিষয় হয়ে থাকত।
- (৪) চান্দেরি: এটিও মধ্য ভারতের একটি প্রাচীরবেষ্টিত শহর ছিল।
- (৫) রতনপুর: এটি রাজপুতদের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দুর্গ ছিল।

মধ্য ভারতে আরও কিছু শহর ছিল যা তাদের স্থাপত্যশৈলী এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের জন্য পরিচিত।

পশ্চিম ভারত:

- (১) আনহিলওয়ারা (পাটান): এটি গুজরাটে চালুক্য (সোলাঙ্কি) বংশের গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল।
- (২) দেবগিরি (দৌলতাবাদ): এটি দাক্ষিণাত্যের "যাদব সালতানাতের" রাজধানী ছিল এবং পরবর্তীতে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।
- (৩) কাথিয়াবাড়: এটি এর বিখ্যাত বন্দর এবং সোমনাথ মন্দিরের কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক শহর হিসেবে গণ্য হতো।

পূর্ব ভারত (বিহার, বাংলা):

- (১) নালন্দা: এটি বিহারে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর জন্য বিখ্যাত ছিল। এটি পঞ্চম শতাব্দী ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- (২) ওদন্তপুরী: বিহারে অবস্থিত এই শহরটিও বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা কেন্দ্র ছিল যা অষ্টম শতাব্দী ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- (৩) নদিয়া: এটি বাংলার সেন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।
- (৪) লখনৌতি (গৌড়): এটি বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল যা হোসেন বংশের অধীনে ছিল।
- (৫) জগন্নাথ পুরী: এটি উড়িষ্যায় হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল।
- (৬) জাজনগর: এটি উড়িষ্যার রাজধানী কেন্দ্র ছিল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দক্ষিণ ভারত:

- (১) দোয়ারাসমুদ্রম: (বর্তমান কর্ণাটক) হোয়সালা সালতানাতের রাজধানী এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্র ছিল।
- (২) মাদুরাই: (বর্তমান তামিলনাড়ু) পান্ড্য সালতানাতের রাজধানী ছিল।
- (৩) ওয়ারঙ্গল: (বর্তমান তেলেঙ্গানা) "কাকাতিয়া" সালতানাতের রাজধানী ছিল।
- (৪) কাঞ্চীপুরম: দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন এবং ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল।

এই শহরগুলো সেই যুগে রাজনৈতিক শক্তি, বাণিজ্যিক তৎপরতা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল।

হিন্দুস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহ, রাজনৈতিক বিভাজন:
মাহমুদ গজনভীর আক্রমণের (দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত) সময় এবং তার কিছুকাল আগে হিন্দুস্তানে অনেক শক্তিশালী সালতানাত বিদ্যমান ছিল যারা বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন করত। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ:

- (১) ওয়াইহিন্দ: এটি "ব্রাহ্মণ শাহী" বংশের সালতানাত ছিল যা আফগানিস্তানের কিছু এলাকা থেকে বর্তমান খাইবার পাখতুনখোয়া, কাশ্মীর এবং পূর্ব পাঞ্জাবের শহর "সরহিন্দ" পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সালতানাতই সর্বপ্রথম মুসলমানদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ হিন্দু রাজা রাজপুত ছিলেন কিন্তু কিছু অন্য বংশের লোকও ছিলেন। তাদের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ শাহী বংশও ছিল।
- (২) গাড়োয়াল সালতানাত: এটি উত্তর ভারত, বিশেষ করে দোয়াব (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) এবং বিহারের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কনৌজ, বেনারস এবং অযোধ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও গাড়োয়াল বংশের উত্থান মাহমুদ গজনভীর আক্রমণের কিছুকাল পরে হয়েছিল, যখন তারা প্রতিহারদের পতনের পর কনৌজে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু মাহমুদের আক্রমণের সময় এই এলাকায় অনেক ছোট ছোট আঞ্চলিক শক্তি বিদ্যমান ছিল যারা আগে প্রতিহারদের অধীনে ছিল।
- (৩) চন্দেল্লা সালতানাত: চন্দেল্লা রাজপুতদের এই শাসন মধ্য ভারত (বুন্দেলখন্ড, মধ্যপ্রদেশ) এবং দোয়াবের কিছু এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। কালিঞ্জর এবং গোয়ালিয়র তাদের শক্তিশালী দুর্গ ছিল।
- (৪) চৌহান বংশ: বর্তমান রাজস্থানের এলাকা, বিশেষ করে আজমির এবং দিল্লির আশেপাশে এই বংশের শাসন ছিল। দিল্লি পরবর্তীতে তাদের অধীনে আসে।
- (৫) চালুক্য (সোলাঙ্কি) সালতানাত: এই বংশের শাসন গুজরাট থেকে রাজস্থানের দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চালুক্য বংশের কেন্দ্র ছিল "আনহিলওয়ারা" (পত্তন)। সোমনাথ (কাঠিয়াওয়াড়) তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল। মাহমুদ গজনভীর সোমনাথ অভিযানে গুজরাটের চালুক্য শাসক ভীমদেব প্রথম যুদ্ধ করেছিলেন।
- (৬) কারামতি: কারামতি সম্প্রদায়ের শাসন সেই সময় মুলতান, উচ এবং এর আশপাশের সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সুলতান মাহমুদ গজনভীর হিন্দুস্তান অভিযানসমূহ

অভ্যন্তরীণ অভিযানসমূহ থেকে অবসর পেয়ে সুলতান ইসলামের প্রচার ও প্রসারের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে হিন্দুস্তানে সামরিক অভিযানের এক দীর্ঘ ধারা শুরু করেন। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে সুলতান গজনী থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হতেন এবং নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে হিন্দুস্তানের মৃদু শীতকালীন সমতল ভূমিতে পৌঁছে যেতেন। প্রায় তিন মাস অভিযানের পর গজনী বা মধ্য এশিয়ায় ফিরে আসতেন। এভাবে সুলতান হিন্দুস্তানে সতেরোটি বড় অভিযান পরিচালনা করেন, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পেশ করা হলো।

প্রথম হিন্দুস্তান অভিযান, সীমান্ত যুদ্ধ: ৩৯০ হিজরি

হিন্দুস্তান সালতানাতের রাজা জয়পাল সবুক্তগিনের সময় থেকে নির্ধারিত কর (খরাজ) দেওয়া বন্ধ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সুলতান জয়পালের কাছ থেকে কয়েকটি সীমান্ত দুর্গ (যা বর্তমান পাক-আফগান সীমান্তের কাছাকাছি ছিল) ছিনিয়ে নেন। সম্ভবত এই আক্রমণ ৩৯০ হিজরির শেষ দিকে বা ৩৯১ হিজরির শুরুতে হয়েছিল। এর মর্যাদা ছিল একটি যুদ্ধ ঘোষণার মতো যে, হিন্দুস্তান সালতানাত পূর্ববর্তী চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং এখন আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছি। [১]

দ্বিতীয় হিন্দুস্তান অভিযান, পেশোয়ার: ৩৯১ হিজরি

শাওয়াল ৩৯১ হিজরিতে (আগস্ট ১০০০ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান মাহমুদ গজনভী দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে পেশোয়ারের ময়দানে রাজা জয়পালের ৫০ হাজার সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করেন, যাতে তিনশ যুদ্ধ হাতিও ছিল। ৮ মহরম ৩৯২ হিজরিতে (২৮ নভেম্বর ১০০১ খ্রিস্টাব্দ) এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। রাজা জয়পাল তার পরিবারের পনেরো জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিসহ গ্রেফতার হন, অন্যদিকে তার বাহিনীর পাঁচ হাজার সৈন্য নিহত হয়। জয়পালের বন্দী আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে দামী মুক্তার মালা পাওয়া যায়, স্বয়ং জয়পালের কাছ থেকে যে মালাটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তার মূল্য ছিল এক লক্ষ আশি হাজার দিনার।

হিন্দুস্তান সালতানাতের এই পরাজয়ের সাথে সাথেই পাঞ্জাবে প্রতিরোধের দেয়াল ভেঙে পড়েছিল, তাই সুলতান অনায়াসেই ভাতিন্ডা পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করেন এবং এই পুরো এলাকা নিজের দখলে নিয়ে বসন্তকালে ফিরে যান। নিজের সালতানাত হাতছাড়া হতে দেখে রাজা জয়পাল সুলতানের করদ রাজ্যে পরিণত হওয়া মেনে নেন। তাই সুলতান মাহমুদ গজনভী তার সাথে সদাচরণ করেন, তার বারবার চুক্তি ভঙ্গ করা উপেক্ষা করেন এবং তাকে সমস্ত হিন্দু বন্দীসহ মুক্তি দেন।

জয়পাল ফিরে গিয়ে তার পুত্র আনন্দপালের হাতে শাসনভার তুলে দেন। যেহেতু তার জাতির মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, যে রাজা দুইবার পরাজিত হয় বা বন্দী হয়, সে শাসনের যোগ্য থাকে না এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবল আত্মাহুতির মাধ্যমেই হতে পারে। তাই জয়পাল আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। আনন্দপাল সুলতানের সাথে সন্ধি করেন। [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা: ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৭

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৭, ৩৯২ হিজরি; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮০

https://t.me/BoierSomahar

তৃতীয় হিন্দুস্তান অভিযান, ভাটিয়া দুর্গ: ৩৯৫ হিজরি

আনন্দপাল অনুগত হওয়া সত্ত্বেও গজনভী সালতানাত হিন্দুস্তান থেকে পূর্ণ কর পাচ্ছিল না। কারণ মুলতানের কাছে অবস্থিত ভাটিয়া রাজ্যের শাসক বিজয় রায় কর আদায় করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং সেই সাথে পাঞ্জাবে নিযুক্ত সুলতানের অফিসারদের উত্যক্ত করছিলেন। এছাড়া আনন্দপালও তলে তলে তার সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন, যিনি সুলতানের সাথে সন্ধি করেছিলেন।

অবশেষে সুলতান বিজয় রায়কে শাস্তি দেওয়ার জন্য সামরিক অভিযান জরুরি মনে করলেন এবং ৩৯৫ হিজরিতে (১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে) 'ভাটিয়া' (ভাটিন্ডা)-র দিকে অগ্রসর হলেন। আনন্দপালের সাথে সন্ধির কারণে দক্ষিণ পাঞ্জাব পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার ছিল। তাই লস্কর সহজেই নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল। এই দুর্গের চারপাশে একটি গভীর ও প্রশস্ত পরিখা ছিল যা অতিক্রম করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ছিল। সুলতান যাই হোক একে অবরোধ করলেন। চার দিন পর্যন্ত অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকল। চতুর্থ দিন সুলতান ঘোষণা করলেন:

"আজ হামলা সুলতানি হবে। (সুলতান নিজে শামিল হবেন) ছোট-বড়, অফিসার ও অধস্তন, যুবক ও বৃদ্ধ সবাই শরিক হও।"

মুসলমানদের প্রস্তুতি দেখে বিজয় রায় বুঝতে পারলেন যে আজ শেষ লড়াই। তিনি নিজের মন্দিরে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দেবতাদের কাছে সাহায্য চাইলেন। তারপর পূর্ণ শক্তি ও শান-শওকতের সাথে ময়দানে বেরিয়ে এলেন। সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকল এবং উভয় পক্ষই পূর্ণ শক্তিতে ময়দানে অটল রইল।

সুলতান যখন এটি দেখলেন, তখন আল্লাহ তাআলার দরবারে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলা দিয়ে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করলেন। তারপর নিজের বিশেষ বাহিনী নিয়ে শত্রুর মূল কেন্দ্রে অত্যন্ত জোরালো আক্রমণ করলেন, যার ফলে শত্রুর পা উপড়ে গেল এবং সমস্ত কাতার তছনছ হয়ে গেল। বিজয় রায় পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিলেন। সুলতান পরিখা ভরাট করার নির্দেশ দিলেন। ফলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক দিক থেকে মাটি, পাথর ও কাঠ দিয়ে তা ভরাট করে দেওয়া হলো।

বিজয় রায় যখন এই দৃশ্য দেখলেন, তখন সেনাবাহিনীকে শহর রক্ষার নির্দেশ দিয়ে নিজে তার ঘনিষ্ঠদের নিয়ে একটি গোপন পথে পালিয়ে গেলেন এবং সিন্ধু নদের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। সুলতানের সৈন্যরা তার পিছু নিল এবং অবশেষে তাকে ঘিরে ফেলল। যখন তিনি এই পরিস্থিতি দেখলেন, তখন গ্রেফতারি থেকে বাঁচতে নিজের বুকে খঞ্জর চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন। সৈন্যরা তার মাথা কেটে সুলতানের কাছে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে সুলতান দুর্গ দখল করে নিয়েছিলেন। এখান থেকে গনিমতের মালে ২৮০টি হাতি এবং অসংখ্য সোনা-রূপা ও জহরত পাওয়া গেল। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৮১

স্থান পরিচিতি: সাধারণত ভাটিয়া বা ভাটিয়া দুর্গের সমার্থক হিসেবে পাঞ্জাবের শহর "ভাটিন্ডা"-কে গণ্য করা হয়, যা মুলতান থেকে প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু লেখকের মতে ভাটিন্ডাকে ভাটিয়া মনে করা সঠিক নয়, কারণ এখানকার রাজা পালিয়ে গিয়ে সিন্ধু নদের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফিরিশতা লিখেছেন: "তিনি সিন্ধু নদের তীরবর্তী জঙ্গলসমূহের কোনো একটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন" (পৃ. ৮২)। গুরদিজি (মৃত্যু ৪৪৩ হিজরি) লিখেছেন: "তিনি তার অনুসারীদের একটি দল নিয়ে সিন্ধু নদের তীরের দিকে চলে যান।" (যাইনুল আখবার: পৃ. ৪৫৪)। ভাটিন্ডা থেকে পালিয়ে সিন্ধু নদের তীরে আশ্রয় নেওয়া যুক্তিহীন, কারণ মাঝখানে শতদ্রু ও চেনাব নদী পড়ে এবং সিন্ধু নদের নিকটতম তীরের সাথে ভাটিন্ডা থেকে দূরত্ব প্রায় ৪২৫ কিলোমিটার। প্রকৃতপক্ষে কিছু উৎসে এই দুর্গের নাম "ভালটনা" লেখা...

চতুর্থ অভিযান হিন্দ, মুলতান: ৩৯৬ হিজরি

মুলতান বিশ্ব মুসলিমের মাঝে বিভ্রান্তি ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী কারমাতি শিয়া আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইতিপূর্বে এখানকার শাসক ছিলেন শেখ হামিদ লোদী, যিনি সুলতান মাহমুদ গজনভীর সাথে আনুগত্যের চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু এখন তার পৌত্র আবুল ফাতাহ দাউদ বিন নাসির সিংহাসনে আসীন ছিলেন, যিনি বাতেনি কারমাতি ফেরকার সমমনা ছিলেন। ফলে তিনি ইসলামের বিপরীতে একটি বিকল্প দ্বীন প্রবর্তনের জন্য জোরেশোরে কাজ করছিলেন।

ভাটিয়া বিজয়ের সময় মুলতানের পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে অতিক্রমকালে সুলতান কারমাতিদের ফিতনা সৃষ্টির বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তবে সে সময় সুলতান ধৈর্য ধারণ করেন এবং কয়েক মাস বিরতির পর ৩৯৬ হিজরিতে (১০০৬ খ্রিষ্টাব্দ) পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুলতানের দিকে যাত্রা করেন।

কারমাতিরা সুলতানের সংকল্পের খবর পেয়ে গিয়েছিল। তারা ওয়াইহিন্দের রাজা আনন্দপালের সাহায্য চাইল, যার সাথে সুলতান মাহমুদ গজনভীর সন্ধি ছিল। ফলে আনন্দপাল লাহোর থেকে পেশোয়ার পৌঁছে সুলতানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তবে সুলতান পৌঁছানো মাত্রই তার বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। আনন্দপাল পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল, সুলতান তার পিছু ধাওয়া করে চেনাব নদীর তীরে ‘সোহদরা’ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। আনন্দপাল আতঙ্কিত হয়ে কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে গেল।

সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল মুলতান জয় করা, তাই তিনি ভাতিন্ডা হয়ে ঘুরে মুলতান পৌঁছালেন এবং শহরটি অবরোধ করলেন। এক সপ্তাহ পর আবুল ফাতাহ দাউদ নতি স্বীকার করে সুলতানের সাথে সন্ধি করলেন এবং অঙ্গীকার করলেন যে, তিনি বাতেনি কারমাতি ধর্মের পরিবর্তে ইসলাম ও শরিয়ত জারি করবেন এবং গজনভী সালতানাতকে প্রতি বছর বিশ হাজার লাল দিরহাম (আশরাফি) খেরাজ প্রদান করবেন [১]।

যেহেতু আনন্দপালের পলায়নের পর ‘ওয়াইহিন্দ’-এর রাজসিংহাসন খালি ছিল, তাই সুলতান রাজা পালের নাতি...

সাম্প্রতিক সময়ের কিছু ঐতিহাসিক ধ্বনিগত সাদৃশ্যের কারণে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন যে এটি ভাতিন্ডা। প্রাচীন মূল উৎস যেমন: ‘জয়নুল আখবার’ এবং একইভাবে ‘তারিখে ফেরেশতা’-তে একে ‘ভাটিয়া’ বলা হয়েছে। ‘ভাটিয়া’ শব্দটি ‘ভাহিয়া’-র বিকৃত রূপ হতে পারে। এই দুর্গটি চোলিস্তানের কাছে ছিল অথবা যেমনটি ‘জয়নুল আখবার’-এ সুলতান এই অভিযানে চোলিস্তানের উল্লেখ করেছেন। - এবং ‘আন তারিখ ওয়াশ শস্তান’ (পৃষ্ঠা ২৫২) থেকে, এখানে গাশী ‘ভাটিয়া’-র টীকায় লিখেছেন যে এটি মূলত ‘ভাট’ বা ‘ভাট্টিয়ান’ সম্প্রদায়ের এলাকা ছিল যারা সিন্ধুর উপরিভাগে বসবাস করত, এই শব্দটিই আরবিতে ‘ভাটিয়া’ হয়ে গেছে।

লেখক আরজ করছেন যে, এই সম্প্রদায়ের আসল নাম ছিল ‘ভাটি’ যা পরবর্তীতে ভাট্টি হয়েছে। সুতরাং ‘ভাটিয়া’ স্পষ্টতই ভাটি সম্প্রদায়ের দিকে ইঙ্গিত করে এবং এ থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে বিজি রাও ভাটি রাজপুত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেখানে এর দুর্গের কথা, সেটি সিন্ধুর সিন্ধু নদের পূর্বে দেড়শ কিলোমিটারের বেশি দূরে নয়, যেখান থেকে সিন্ধু নদের বনভূমিতে পৌঁছানো সহজ ছিল। কাচ্চা এমন একটি বনভূমি এলাকা যা ডাকাতদের আস্তানা হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলে রহিম ইয়ার খানে এখনও প্রচুর সংখ্যায় ভাট্টি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এটা সম্ভব যে এটি ‘বিজয় রাও’-এর কেল্লা ‘দারাউর’ যা চোলিস্তানে অবস্থিত এবং সিন্ধু নদ ও কাচ্চা থেকে এর দূরত্ব প্রায় একশ দশ কিলোমিটার। একটি মত এমনও আছে যে এই কেল্লাটি ‘মিঠানকোট’ যা রাজস্থানে ভাটি রাজপুতদের কেন্দ্র হতে পারে, কিন্তু সিন্ধু নদ থেকে এর দূরত্ব অনেক বেশি অর্থাৎ প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। তাই এই সম্ভাবনা ক্ষীণ।

[১] তারিখে ফেরেশতা: ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫, ৮৪।

...পালকে, যে বাহ্যত মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তাকে সেখানকার নতুন রাজা নিযুক্ত করলেন। [১]

বলখে ইলক খানের সাথে যুদ্ধ:

এই সময়ে হেরাতের ওপর তুর্কিস্তানি সরদার ইলক খানের আক্রমণের কারণে সুলতানকে অবিলম্বে ফিরে যেতে হয়। বলখের কাছে ইলক খান এবং চীনা তুর্কিস্তানের বাদশাহ কদর খানের সম্মিলিত পঙ্গপাল সদৃশ বাহিনীর সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়, যার শেষ মুহূর্তে সুলতান অত্যন্ত আবেগঘন দোয়া করেন এবং নিজে একটি হাতির ওপর সওয়ার হয়ে শত্রুর পতাকাবাহীর ওপর আক্রমণ করেন। অবশেষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর শত্রুদের কাতারগুলো তছনছ হয়ে যায়। [২]

পঞ্চম ভারত অভিযান, সুখ পালের বিদ্রোহ:

সুলতান হিন্দুস্তানে রাজা সুখ পাল নামক এক নওমুসলিমকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন, যে ছিল রাজা জয়পালের নাতি। সুলতানের অনুপস্থিতিতে সে মুরতাদ হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। সুলতান এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাথে হিন্দুস্তানের দিকে রওনা হন এবং সেখানে অবস্থানরত নিজের আমিরদের আগেভাগেই নির্দেশ পাঠিয়ে দেন যেন তারা সুখ পালকে বন্দি করে। পরিশেষে সুখ পালকে গ্রেফতার করে সুলতানের সামনে পেশ করা হয়। সুলতান তার কাছ থেকে চার লক্ষ দিরহাম জরিমানা আদায় করেন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেন। [৩] সুলতান তার পরিবর্তে ওই অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে নিজের একজন বিশ্বস্ত আমিরকে নিযুক্ত করেন। এই সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে উপমহাদেশের বিজিত এলাকাগুলো হিন্দুদের দখলে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

ষষ্ঠ ভারত অভিযান, পেশোয়ার যুদ্ধ, ৩৯৯ হিজরি

এই সময়ে রাজা আনন্দ পাল আশেপাশের সমস্ত রাজাদের ধর্মের দোহাই দিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছিল। তার এই উস্কানির ফলে দিল্লি, কনৌজ, আজমির, উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর এবং গোয়ালিয়রের রাজারা নিজেদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের খোখররাও এই জোটে শামিল ছিল। মূর্তিপূজকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এমন পর্যায়ে ছিল যে, তাদের মহিলারা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে নিজেদের পুরুষদের অস্ত্র কিনতে এবং যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছিল।

এই বাহিনী সুলতানের সমস্ত অধিকৃত এলাকা ছিনিয়ে নিতে নিতে পাঞ্জাব অতিক্রম করে ৩৯৯ হিজরি (১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ) সালে পেশোয়ার পর্যন্ত চলে আসে। সুলতানও সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে অগ্রসর হয়ে রণক্ষেত্রে পৌঁছে যান। পেশোয়ারের বাইরে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে উভয় বাহিনী কিছু দূরত্বে অবস্থান নেয়। সুলতান দেখতে পান যে, হিন্দুরা এবার মরণপণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত এবং তাদের সংখ্যা অগণিত। তাই নিজের ডানে ও বামের পার্শ্বদেশ সুরক্ষিত রাখতে তিনি শিবিরের চারপাশে পরিখা খনন করান এবং বাঁধের ওপর সৈন্য মোতায়েন করেন। তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যাতে প্রতিপক্ষ ডান বা বাম দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। [৪]

---

[১] তারিখ ফিরিশতা: ফারসি: পৃ. ৮৭

[২] তারিখ ফিরিশতা: ফারসি: পৃ. ৮৬ থেকে ৮৭

[৩] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৮৭

[৪] ইবনুল আসির আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৯

হিন্দুরাও তাদের সৈন্যশিবিরকে পরিখা ও বাঁধের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে রেখেছিল, তাই মুসলমানরাও তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারছিল না। এর পাশাপাশি হিন্দু বাহিনীতে প্রতিদিন সাহায্য আসছিল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা যুদ্ধে বিলম্ব এই কারণেই করছিল যাতে নিজেদের সংখ্যা সর্বোচ্চ বৃদ্ধি করে একযোগে সুলতানের বাহিনীকে পিষে ফেলতে পারে।

এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো। অবশেষে একদিন সুলতান এই বিবাদের মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এক হাজার অশ্বারোহী তীরন্দাজকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা প্রতিপক্ষের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করে যাতে তারা তাদের পরিখার বেষ্টনী থেকে বের হতে বাধ্য হয়। এই অশ্বারোহীদের কাছে তীরের পাশাপাশি নাফতা আগুনের পিচকারিও ছিল। [১]

এই কৌশল সফল হলো এবং মুসলমানদের তীরন্দাজি ও অগ্নিসংযোগে উত্তেজিত হয়ে হিন্দুদের দলগুলো সৈন্যশিবির থেকে বের হতে শুরু করল। মুসলিম অশ্বারোহীরা পিছু হটতে হটতে তাদের নিজেদের সৈন্যশিবিরের কাছে নিয়ে এল এবং এখন প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

আনন্দপালও নিজের হাতির ওপর সওয়ার হয়ে নিজের বাহিনীর সাহস বাড়াতে বাইরে বেরিয়ে এল এবং যুদ্ধের উত্তাপ আরও বেড়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ খোখর গোত্রের ত্রিশ হাজার উপজাতীয়, যারা খালি মাথা ও খালি পা ছিল এবং শুধুমাত্র কুঠার দ্বারা সজ্জিত ছিল, অত্যন্ত জোশের সাথে সুলতানের সৈন্যশিবিরের ওপর ডান ও বাম উভয় দিক থেকে চড়াও হলো। যদিও সুলতান সৈন্যশিবির রক্ষার জন্য পূর্ণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু খোখররা একটি স্রোতের মতো রক্ষীবাহিনীকে ঠেলে সৈন্যশিবিরে ঢুকে পড়ল। এই আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিন-চার হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন।

সুলতান এটি দেখে সৈন্যদের পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। তিনি ইচ্ছা করছিলেন যে আজ শুধু আত্মরক্ষার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ স্থগিত করে দেবেন, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যপট বদলে গেল। হলো এই যে, অগ্নিদাহ্য পিচকারি নিক্ষেপকারী মুজাহিদদের একটি আক্রমণে আনন্দপালের হাতি ঘাবড়ে গেল এবং নিজের বাহিনীকে পদদলিত করে পেছনের দিকে পালিয়ে গেল।

এটি দেখে বাকি হিন্দু রাজা-মহারাজারা মনে করলেন যে তারা পরাজিত হয়েছেন, ফলে সবাই এমন ঘাবড়ে গেলেন যে নিজেদের সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন। সুলতানের অফিসাররা এখন একটি চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেলেন। বনু তায়্যি গোত্রের আবদুল্লাহ তায়্যি পাঁচ-ছয় হাজার আরব মুজাহিদকে নিয়ে এবং আরসালান জাযিব দশ হাজার তুর্কি, আফগান ও খিলজিদের নিয়ে দুই দিন পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তাদের নির্মূল করতে কোনো ত্রুটি রাখলেন না। প্রায় বিশ হাজার লাশ ফেললেন এবং ত্রিশটি হাতিও ধরে নিয়ে এলেন। [২]

কাংড়ার যুদ্ধ:

আনন্দপালের পতাকাতলে সমবেত হওয়া সমস্ত হিন্দু রাজাদের সাথে এখন সুলতানের প্রকাশ্য যুদ্ধ ছিল এবং পূর্বের সমস্ত চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই সুলতান উত্তর ভারতের দিকে মুখ করলেন এবং হিমালয় পর্বতের পাদদেশে কাংড়ায় পৌঁছে এখানে...

---

[১] এই পিচকারি এক প্রকার পাইপ ছিল যাতে 'নাফতা' অর্থাৎ পেট্রোলের মতো অগ্নিদাহ্য তরল পদার্থ থাকত। পিচকারির মাধ্যমে এটি শত্রুর ওপর নিক্ষেপ করা হতো।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৮, ৮৯।

এর কেন্দ্র "নগরকোট" ঘেরাও করা হয়েছিল যা হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থান ছিল। একে এর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে "কিল্লা ভীম"ও বলা হতো। এটি তার প্রাচীন মন্দিরের কারণে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল এবং শত শত বছর ধরে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজারা এখানে সোনা, রূপা এবং জহরত উপঢৌকন হিসেবে পাঠাতেন, যার ফলে এই মন্দিরের ভাণ্ডার সমগ্র হিন্দুস্তানের রাজকীয় ভাণ্ডারের চেয়েও বেশি সমৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যেহেতু হিন্দুদের সামরিক শক্তি আগেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই সুলতানি বাহিনী যখন এখানে পৌঁছাল, তখন দুর্গে ব্রাহ্মণ, মন্দিরের খাদেম, পূজারী এবং দর্শনার্থী ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুলতান যখন দুর্গ ঘেরাও করলেন, তখন তিন দিন পর তারা দুর্গের দরজা খুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। এভাবে শহরটি সহজেই মুসলমানদের দখলে চলে এল।

এখান থেকে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে সুলতানের হাতে যে সম্পদ এল, তাতে ছিল সাত লক্ষ লাল আশরাফি, সাতশ মণ সোনা ও রূপার পাত্র এবং অন্যান্য বিস্ময়কর জিনিস যাতে মণকে মণ হীরা, জহরত, মুক্তা এবং ইয়াকুত ছিল। এই সম্পদ কোনো বড় দেশের রাজভাণ্ডারের চেয়েও বেশি ছিল। গজনীতে পৌঁছে সুলতান তিন দিন পর্যন্ত এই গনিমতের মালের প্রদর্শনী করেন এবং দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে অঢেল সম্পদ বিতরণ করেন। [১]

ঘোর দখল:

৪০০ হিজরি (১০১০ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান মধ্য আফগানিস্তানের এলাকা "ঘোর" এর দিকে অভিযান পরিচালনা করেন, যা তার দুর্গম গিরিপথগুলোর কারণে কারো পক্ষে জয় করা সম্ভব ছিল না। এখানে সুরি গোত্রের সরদার মুহাম্মদ বিন সুরির পরিবার শাসন করছিল। সুলতান কঠোর সামরিক অভিযানের পর অবশেষে এই এলাকা জয় করেন। সুরি সরদার মুহাম্মদ গ্রেপ্তার হন এবং অপমানের ভয়ে নিজের আংটিতে লুকানো বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন। [২]

সপ্তম অভিযান হিন্দুস্তান, মুলতান: ৪০০ হিজরি

সুলতান যখন "ঘোর" অভিযান শেষ করে ফিরছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে মুলতানে কারামাতি নেতা আবু আল-ফাতুহ দাউদ বিন নসর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

আবু আল-ফাতুহ এর বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই সুলতান "গজনী" থেকে হিন্দুস্তানের দিকে রওনা হলেন। এটি ৪০০ হিজরি (১০১০ খ্রিষ্টাব্দ) সালের ঘটনা। সুলতান মুলতানকে এমনভাবে ঘেরাও করলেন যাতে আবু আল-ফাতুহ এর পালানোর কোনো পথ না থাকে। এরপর গজনভি বাহিনী এক প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে শহরে প্রবেশ করল। কারামাতিদের বেছে বেছে হত্যা করা হলো। আবু আল-ফাতুহ জীবিত ধরা পড়ল। তাকে ঘোরের দুর্গে বন্দি করা হলো যেখানে সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। কারামাতিরা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছিল, তাই সুলতান তাদের প্রতি কোনো দয়া প্রদর্শন করেননি, যার ফলে এই উপমহাদেশে এই ফেরকার...

---

(১) তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৮-৯০; জয়নুল আখবার, আল-গারদিজি: পৃষ্ঠা ২৫৬

(২) তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯০-৯১

প্রভাব খুব কমই রয়ে গিয়েছিল। [১]

অষ্টম ভারত অভিযান, থানেসর: ৪০২ হিজরি

৪০২ হিজরিতে (১০১১ খ্রি.) সুলতান যমুনা ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত থানেসর আক্রমণের সংকল্প করেন। [২] থানেসর ছিল হিন্দুদের পবিত্রতম স্থান। এখানকার প্রাচীনতম মন্দিরের সবচেয়ে বড় মূর্তিটিকে 'জগ সোম' (چکر سوامی - চক্র স্বামী) বলা হতো এবং হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী এই মূর্তিটি প্রথম মানুষ সৃষ্টির সাথেই অস্তিত্ব লাভ করেছিল। থানেসর আক্রমণের জন্য সুলতানকে তাঁর প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী আনন্দপালের রাজ্য 'ওয়াইহিন্দ' অতিক্রম করতে হয়েছিল, যিনি সুলতানের সাথে সন্ধি করে কোহিস্তানে লবণ (লবণ পর্বতমালা) থেকে শিবালিক পাহাড় পর্যন্ত শাসন করছিলেন এবং 'নন্দনা' (ঝিলাম জেলা) ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি সুলতানকে যাতায়াতের সুবিধার পাশাপাশি পথপ্রদর্শনের জন্য দুই হাজার অশ্বারোহীও সরবরাহ করেন।

সুলতানের আগমনের খবর শুনে মধ্য ভারতের সমস্ত ছোট-বড় শাসকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। সরস্বতী নদীর তীরে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে হিন্দুরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সুলতান তলোয়ারের জোরে থানেসর দখল করে সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং বড় মূর্তি 'জগ সোম'-কে গজনীতে পাঠিয়ে রাজপথে ফেলে রাখার নির্দেশ দেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, থানেসর বিজয়ের পর সুলতান আরও অগ্রসর হয়ে দিল্লিও জয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সালতানাতের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা পরামর্শ দেন যে, প্রথমে পুরো পাঞ্জাব জয় করে নেওয়া উচিত, তাহলে দিল্লিও সহজে জয় করা যাবে। সুলতান এই পরামর্শ গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, দিল্লির দিকে অগ্রসর হওয়ার আর সুযোগ মেলেনি। [৩]

নবম ভারত অভিযান, নন্দনা: ৪০৪ হিজরি

সুলতানের প্রত্যাবর্তনের পর 'ওয়াইহিন্দ'-এর শাসক আনন্দপাল মারা যান এবং তাঁর উত্তরসূরি ত্রিলোচনপাল সুলতানের সাথে সন্ধি ছিন্ন করেন। অবশেষে সুলতান ৪০৪ হিজরিতে (১০১৩ খ্রি.) 'ওয়াইহিন্দ' রাজ্যকে পুরোপুরি পদানত করার জন্য এর তৎকালীন শেষ কেন্দ্র 'নন্দনা' আক্রমণ করেন, যা 'কোহ বাল নাথ'-এ অবস্থিত ছিল। [৪]

ত্রিলোচনপাল নন্দনা দুর্গের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁর পুত্র ভীমপালের ওপর অর্পণ করেন এবং নিজে কাশ্মীরের দিকে চলে যান। সুলতান দুর্গটি কঠোরভাবে অবরোধ করেন, কেবল তীরন্দাজরাই তাদের নৈপুণ্য দেখাতে শুরু করেনি বরং সুলতানের নির্দেশে দুর্গের ভিত্তিতে সুড়ঙ্গ খনন করা হতে থাকে যাতে প্রাচীর ধসিয়ে দেওয়া যায়। ভীমপাল যখন এই পরিস্থিতি দেখলেন, তখন তিনি নিরাপত্তা প্রার্থনা করে দুর্গের...

---

[১] তারিখ ফেরেশতা: ফারসি: ১ খণ্ড, পৃ. ৯২; জয়নুল আখবার, লেখক- গারদিজি: পৃ. ২৫৬, ২৫৭।

[২] থানেসর ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র জেলায় অবস্থিত। এটি দিল্লির উত্তরে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দূরে। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে 'কাইথাল' অবস্থিত।

[৩] তারিখ ফেরেশতা ফারসি: ১ খণ্ড, পৃ. ৯২, ৯৩; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮, তাবা দারুল ফিকর।

[৪] কোহ বাল নাথ-এর বর্তমান জনপ্রিয় নাম 'টিলা জোগিয়ান'। এছাড়া একে 'টিলা গোরক্ষনাথ'ও বলা হয়ে থাকে। এটি কোহিস্তানে লবণ (লবণ পর্বতমালা)-এ অবস্থিত এবং পাকিস্তানি পাঞ্জাবের শহর 'ঝিলাম' থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে।

দরজা খুলে দিল। দুর্গের মালামাল ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেওয়া হলো এবং এখানে সারঘ নামক একজন অফিসারকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হলো।

এর পর সুলতান ত্রিলোচন পালকে ধাওয়া করে কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি সুলতানের আগমনের খবর শুনে কাশ্মীর থেকেও পালিয়ে গেলেন এবং পূর্ব পাঞ্জাবে তাঁর সাম্রাজ্যের শেষ সীমানা 'শিওয়ালিক' পর্বতমালায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

এই সময়ে সুলতান কাশ্মীরের আশপাশের সমস্ত দুর্গাধিপতি ও রাজাদের বশীভূত করে নিলেন। এখন পশ্চিম পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে হিন্দুধর্ম পরাজিত হয়েছিল, তাই মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করল। [১]

সুলতান নির্দেশ দিলেন যে, এখানে প্রতিটি বিজিত শহরে একটি করে জামে মসজিদ নির্মাণ করা হোক। সুলতানের নির্দেশে এখানে মুবাল্লিগ, দায়ী এবং উলামাদের নিয়োগ দেওয়া হলো যাতে নও-মুসলিমদের ইসলামের শিক্ষা প্রদান করা যায়। [২]

ভারতের দশম অভিযান, কাশ্মীর: ৪০৬ হিজরি

৪০৬ হিজরি (১০১৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান পুনরায় কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ 'লোহকোট' [৩] অবরোধ করলেন যা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে এই অবরোধ চলতে থাকে। তবে একদিকে তুষারপাত ও শীতের তীব্রতা সুলতানি লশকরের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠল। অন্যদিকে অবরুদ্ধরা কোথাও থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য ও রসদ পেয়ে গেল, যার অর্থ ছিল তারা আরও কয়েক সপ্তাহ বা মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল।

অবশেষে সুলতানকে এই অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে ফিরে আসতে হলো। ফেরার পথে পথপ্রদর্শকরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল এবং বাহিনী এমন সব উপত্যকায় প্রবেশ করল যা ছিল পাহাড়ি ঢল বা বন্যার পথ। এখানে বাহিনী বন্যা কবলিত উপত্যকায় আটকে গেল এবং হাজার হাজার সৈন্য পানিতে ডুবে প্রাণ হারাল। সুলতান অতি কষ্টে সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে রক্ষা পেলেন। এটিই ছিল সুলতানের একমাত্র অভিযান যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। [৪]

খাওয়ারিজম সফর:

এই অভিযান থেকে ফেরার কয়েক সপ্তাহ পর সুলতানকে উত্তরের দীর্ঘ সফর করে খাওয়ারিজম যেতে হলো, যেখানকার শাসক আবুল আব্বাস মামুন সুলতান মাহমুদ গজনভির ভগ্নিপতি ছিলেন। ৪০৭ হিজরি (১০১৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করেছিল, যার ফলে খাওয়ারিজমে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। নিজের ভগ্নিপতির হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে এবং খাওয়ারিজমকে রাজনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার করতে সুলতান খাওয়ারিজমে অভিযান পরিচালনা করেন এবং একে পদানত করে নিজের অনুগত সেনাপতি আলতুন তাশকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৯৮, ৯৯

[২] জাইনুল আখবার: পৃ. ২৫৮

[৩] তাবাকাত-ই-আকবরী আরবি (পৃ. ৩১)-তে একে 'কোহকোট' বলা হয়েছে। কিছু আধুনিক গবেষকের মৌখিক মতামত যা আমার কাছে পৌঁছেছে, সেই অনুযায়ী এই দুর্গটি কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কোটলি এলাকার কাছে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালায় অবস্থিত ছিল। এই জায়গার নাম ছিল লোহারকোট এবং এই দুর্গটি তার মজবুত কাঠামোর কারণে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল এবং এর চারপাশের পাহাড়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একে অপরাজেয় করে তুলেছিল। এক মতানুসারে এটি বর্তমান রাওয়াল কোটের আশেপাশে ছিল।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৯৮

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৯৮

একাদশ হিন্দু অভিযান, কনৌজ: ৪০৯ হিজরি

কনৌজ উত্তর ভারতের মূর্তিপূজার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। এটি ভারতের রাজধানীও ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম এটি আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিন্তু খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক তাকে ফিরিয়ে আনেন। এরপর থেকে মাহমুদ গজনভির সময় পর্যন্ত কোনো বিদেশি আক্রমণকারী কনৌজ পর্যন্ত পৌঁছানোর সাহস করেনি। গজনভি থেকে কনৌজ পর্যন্ত তিন মাসের পথ ছিল যাতে সিন্ধু, ঝিলাম, চেনাব, রাভি, শতদ্রু, বিয়াস এবং যমুনার মতো সাতটি বড় নদী বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুলতান এটি জয়ের দৃঢ় সংকল্প করে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন যা এক লক্ষ অশ্বারোহী এবং তুর্কিস্তান থেকে আসা বিশ হাজার মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। [১]

এই বাহিনী দ্রুত গন্তব্য অতিক্রম করে কাশ্মীরের সীমান্তের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কাশ্মীরের রাজা উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলতানের আদেশে তিনি বাহিনীর অগ্রবর্তী দলে অন্তর্ভুক্ত হন। [২]

যমুনা নদী পার:

২০ রজব ৪০৯ হিজরি (৩ ডিসেম্বর ১০২১ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলামী বাহিনী যমুনা নদী পার হয়ে দোয়াবে প্রবেশ করে। [৩]

মিরাট ও বুলন্দশহর বিজয়:

সুলতানি বাহিনী মিরাট ও বরণ (বুলন্দশহর)-এর দিকে অগ্রসর হয় যেখানে রাজার নাম ছিল “হরদত্ত” (হরি দত্ত)। তিনি এই শহরগুলোর রক্ষার দায়িত্ব তার আত্মীয়দের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে কোনো দূরবর্তী অঞ্চলে পালিয়ে যান। তার আত্মীয়রা সুলতানের মোকাবিলা করা নিরর্থক মনে করে, মিরাট ও বরণবাসীরা দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা এবং তিনটি হাতি পেশ করে নিরাপত্তা লাভ করে। [৪]

---

[১] ইবনে আসির এই বিজয়গুলোকে ৪০৭ হিজরির অধীনে উল্লেখ করেছেন যেখানে ফেরেশতা এগুলোর সাল ৪০৯ হিজরি উল্লেখ করেছেন।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৭০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা: ১০০। কাশ্মীরের রাজার ইসলাম গ্রহণের কথা ইবনে আসির উল্লেখ করেছেন। ফেরেশতা কেবল অনুগত হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৭০।

দ্রষ্টব্য: সুলতানের এই অভিযানে যুদ্ধগুলোর ক্রমবিন্যাসে অগ্র-পশ্চাৎ নিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। নমুনা লক্ষ্য করুন:

আবু সাঈদ গারদিজি (জাইনুল আখবার: ২৬০) এবং নিজাম বখশি হারভি (তাবাকাত-ই-আকবরী আরবি: পৃষ্ঠা: ২৯, ৩০)-এর ক্রম: কনৌজ, বরণ, মহাবন, মথুরা।

ফেরেশতার ক্রম: কাশ্মীর, কনৌজ, মিরাট, যমুনা তীরের মহাবন, কেল্লা চন্দ কা, কেল্লা মথুরা, মুঞ্জ, কেল্লা চন্দ পাল, চন্দ্র রায়ের পশ্চাদ্ধাবন।

বনে আসির: কাশ্মীর, কেল্লা হুদাব, কেল্লা গুল চন্দ মহাবন, মথুরা, কনৌজ, কেল্লা ব্রাহ্মণা, আসি (আসওয়ানি), কেল্লা চন্দ পাল, কেল্লা শারওয়াহ, চন্দ্র রায়।

লেখক ভৌগোলিক পরিস্থিতি সামনে রেখে ইবনে আসিরের ক্রম গ্রহণ করেছেন। কাশ্মীর থেকে সরাসরি কনৌজে বিনা বাধায় আক্রমণ হওয়া যুক্তিবহির্ভূত। অবশ্যই দোয়াবে প্রতিরোধ হয়ে থাকবে। মিরাট ও বরণ যেগুলোকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক কনৌজের পর আত্মসমর্পণ করা বলেন, সেগুলো কনৌজের উত্তরে অবস্থিত এবং সুলতানকে অবশ্যই সেখান দিয়ে অতিক্রম করে কনৌজ পৌঁছাতে হতো, তাই সেগুলোর বিজয়কে অগ্রগণ্য মানা উচিত। এরপর সুলতানের জন্য দোয়াবের অন্যান্য শক্তিশালী কেল্লাগুলোকে প্রতিরোধমুক্ত করা জরুরি ছিল। সুতরাং মহাবন যা যমুনার পূর্ব তীরে ছিল, তা জয় করা হয় এবং সেখান থেকেই যমুনা পার হয়ে মথুরার ধনরত্ন বোঝাই করা হয়। এরপর কনৌজে আক্রমণ হয়, এরপর আসওয়ানি, মুঞ্জ এবং শারওয়াহ ইত্যাদির কেল্লাগুলো যা কনৌজের দক্ষিণে ছিল, সেগুলো জয় করা হয়।

[৪] (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা: ১০০; জাইনুল আখবার: পৃষ্ঠা: ২৬০; আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৭০) দ্রষ্টব্য: ইবনে আসির এই কেল্লাকেই “হুদাব” বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: এই রাজার নাম জাইনুল আখবার (আবু সাঈদ গারদিজি মৃত্যু ৪৪৩ হিজরি)-এ যা প্রাচীনতম উৎস, “হরদত্ত” লিপিবদ্ধ আছে যেখানে তারিখ-ই-ফেরেশতায় “হরওয়াত” লিপিবদ্ধ আছে। ফেরেশতার মতে হরি দত্ত মিরাটের শাসক ছিলেন যেখানে গারদিজির মতে তিনি বরণ (বুলন্দশহর)-এর শাসক ছিলেন। সমন্বয় করলে এটাই দাঁড়ায় যে এই উভয় শহর যাদের পারস্পরিক দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার, এই রাজার রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তিনি এই উভয়কে তার আত্মীয়দের হাতে সঁপে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরেশতা...

মহাবন ও কুলচন্দের সাথে যুদ্ধ:

এখান থেকে লস্কর রাজা কুলচন্দের দুর্গ "মহাবন"-এর দিকে অগ্রসর হলো যা ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছিল। রাজা তার লস্করকে হাতিসহ জঙ্গলের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিলেন যাতে সুলতানকে সেখানেই আটকে দেওয়া যায়, কিন্তু সুলতান বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। এক অংশ প্রতিপক্ষ বাহিনীকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখল, আর সুলতান বাকি বাহিনীকে নিয়ে অন্য একটি পথ দিয়ে সেই জঙ্গল অতিক্রম করে দুর্গে পৌঁছে গেলেন। কুলচন্দ এই অবস্থা দেখে মোকাবিলায় বেরিয়ে এল। তীব্র যুদ্ধের পর সে পরাজিত হলো এবং তার লস্কর পিছু হটে পেছনে অবস্থিত যমুনা নদীতে পড়তে লাগল। এভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু সেখানে নিহত হলো। [১]

কুলচন্দ যখন নিশ্চিত পরাজয় দেখল, তখন নিজের হাতিতে চড়ে যমুনা নদী পার হতে লাগল। সুলতানি বাহিনী ধাওয়া করলে সে বন্দি হওয়ার ভয়ে প্রথমে নিজের রানি ও সন্তানদের হত্যা করল এবং তারপর নিজের বুকে খঞ্জর বসিয়ে আত্মহত্যা করল। [২]

মথুরার মন্দিরসমূহ:

৮ শাবান ৪০৯ হিজরিতে সুলতান "মথুরা"-র সামনে পৌঁছে গেলেন যা যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। [৩] এটি হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল যাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মনে করা হতো। সুলতানকে এখানে কোনো প্রকার প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। এখানে যমুনার তীরে মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি এক হাজার সুন্দর আকাশচুম্বী অট্টালিকা ছিল (যেখানে সম্ভবত "যাত্রা"-র জন্য আগতরা অবস্থান করত)। শহরের ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির ছিল, আর ঠিক নদীর তীরে একটি কেন্দ্রীয় মন্দির ছিল যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও আকাশচুম্বী ছিল। ঐতিহাসিক ফেরেশতা সুলতানের বিজয়পত্রের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, এই মন্দিরের মতো চমৎকার ইমারত এক লক্ষ লাল দিনার খরচ করে দুইশ বছরেও তৈরি করা কঠিন ছিল।

এতে প্রচুর মূর্তি ছিল। কেন্দ্রীয় পাঁচটি মূর্তি ছিল খাঁটি সোনার এবং হীরা ও ইয়াকুত দ্বারা খচিত ছিল, যার মধ্যে একটি একটি ইয়াকুতের দাম ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার। দুইশটি মূর্তি ছিল রুপার। এ ছাড়া এখানে পূজারিরা প্রচুর সোনা জমা করে রেখেছিল যার ওজন ইবনুল আসিরের মতে ছয় লক্ষ ৯০ হাজার তিনশ মিসকাল (দুই হাজার ৩৯৯ কিলোগ্রাম) ছিল।

(যিনি মুঘল আমলের ঐতিহাসিক ছিলেন) এখানকার মুদ্রাকে দিরহাম হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং লিখেছেন: "সে হাজার দিরহাম যা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রুপি হবে" অর্থাৎ এগুলো আড়াই লক্ষ রুপির সমান ছিল। অর্থাৎ মুঘল আমলের ভারতীয় মুদ্রা যা রুপি নামে পরিচিত ছিল, মানে দিরহামের তুলনায় এত কম ছিল যে এক দিরহামের বিনিময়ে পঁচিশ রুপি হতো।

দ্রষ্টব্য: ইবনুল আসির "হুদেব দুর্গ" বিজয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এখানকার রাজা মোকাবিলা অসম্ভব দেখে দশ হাজার ব্যক্তিসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল-কামিল ফিত তারিখ: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৭) কিন্তু হরি দত্তের ইসলাম গ্রহণের এই বর্ণনাটি শায, যার অন্য কোনো উৎস থেকে সত্যতা নিশ্চিত হয় না।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১০০

দ্রষ্টব্য: মহাবন দুর্গটিকে "মহাওন"-ও বলা হয়েছে। ইবনুল আসির দুর্গ এবং এর নিকটবর্তী নদীর নাম উল্লেখ করেননি। এই নামগুলো ফেরেশতা লিখেছেন। এই দুর্গটি যমুনা নদীর পূর্ব তীরে দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে ১৯০ কিলোমিটার দূরে মথুরার কাছে ছিল। দুর্গের নিকটবর্তী জনপদটির নাম এখনো এটাই।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১০১

[৩] যয়নুল আখবার: পৃষ্ঠা ২৬১

সুলতান এই সমস্ত জিনিস গনিমতের মালের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন, আর বাকি সব কিছু অগ্নিদগ্ধ করে দিলেন। “মথুরা”-র অন্যান্য মূর্তিশালাগুলোরও একই দশা করা হলো। শুধুমাত্র রূপার টুকরোগুলোর ওজনই ছিল একশ উটের বোঝার সমান। [১]

কনৌজ বিজয়:

এখন সুলতানি লশকর কনৌজ শহরের সামনে পৌঁছে গেল, যা গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। [২] এই নদী হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এতে “ইশনান” (গোসল) করলে মানুষ সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। [৩]

এখানে “প্রতিহার” বংশের রাজা রাজপাল রাজত্ব করতেন। এই শহরের প্রাচীর ছিল অত্যন্ত বিশাল ও বিস্তৃত, যার মধ্যে নদীর তীরে সাতটি মজবুত দুর্গ ছিল। হিন্দুদের দাবি ছিল যে, এই শহরের মূর্তিশালাগুলো চার হাজার বছরের পুরনো। সুলতান যখন এখানে পৌঁছালেন, তখন রাজ্যের রাজা “রাজপাল” পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে কোনো প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই সুলতান কনৌজ শহর এবং এর সাতটি দুর্গ জয় করে নিলেন। এখানে জায়গায় জায়গায় উপাসনালয় ছিল যেগুলোর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। [৪] সেগুলোর সব ধ্বংস করে দেওয়া হলো। [৫]

মুনহাজ (ব্রহ্মা দুর্গ):

সুলতান এখন মুনহাজের দিকে যাত্রা করলেন এবং শহরটি কঠোরভাবে অবরোধ করলেন যা পনেরো দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। স্থানীয় বাহিনী দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করল, কিন্তু যখন দেখল যে পরাজয় অনিবার্য, তখন অনেক লোক দুর্গের উঁচু প্রাচীর থেকে ঝাঁপ দিয়ে...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি): খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০১; আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৭০। দ্রষ্টব্য: ইবনে আল-আসির এই জায়গার নাম “মাহরাতুল হিন্দ” বলেছেন এবং শুধুমাত্র একটি বড় মূর্তিশালার কথা উল্লেখ করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, “মথুরা”-র মতো হিন্দুদের পবিত্র স্থানকে যেভাবে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই জয় করা হয়েছিল, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে নিকটবর্তী সমস্ত সামরিক কেন্দ্রগুলো জয় করার পর এখানে অভিযান চালানো হয়েছিল, তাই এখানে কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি।
দ্রষ্টব্য: ইবনে আল-আসির এখান থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণের পরিমাণ ৯৩,০০,৩০০ মিসকাল বলেছেন, যেখানে ফিরিশতা এই পরিমাণ ৯৮,৩০০ মিসকাল বলেছেন। উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। হয় এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোনো একটি ভুল, অথবা উভয়ের মিসকালের ওজনে পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবত ফিরিশতা শুধুমাত্র পাঁচটি বড় স্বর্ণমূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। “বুত-ই-রাফিরে মওদা সুলতান শিকাস্ত, নাওয়াদ-ও-হাশত হাজার-ও-সে-সাদ মিসকাল তালা হাসিল শুদ” (সুলতান কর্তৃক ভাঙা মূর্তিগুলো থেকে ৯৮,৩০০ মিসকাল স্বর্ণ অর্জিত হয়েছিল)। যেখানে ইবনে আল-আসির মথুরা থেকে প্রাপ্ত সমস্ত স্বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। “ওয়া কানা ফিহা মিনাল জাহাবি সিত্তা মিআতা আলফ ওয়া তিসউনা আলফা ওয়া সালাসা মিআতা মিসকাল।”
[২] জয়নুল আখবার: পৃষ্ঠা ২৬১।
[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৭০।
[৪] ইবনে আল-আসির লিখেছেন “ক্বরিব মিন আশারা আলাফ বায়তে সানাম” অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার মূর্তিশালা। মনে হয় যে এত বড় সংখ্যায় ইমারত একটি শহর বা সাতটি দুর্গে হতে পারে না। সম্ভবত “বায়তে সানাম” দ্বারা সেই মূর্তিগুলো বোঝানো হয়েছে যা দলবদ্ধভাবে রাখা হয়েছিল এবং যার প্রতিটি ছিল একটি উপাসনালয় বা মন্দিরের মতো। ওয়াল্লাহু আলাম।
[৫] তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি): খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৯, ১০০; আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৭০। ফিরিশতা হাবিবুস সিয়ার-এর বরাতে লিখেছেন যে রাজপাল সুলতানের খিদমতে হাজির হয়ে সপরিবারে মুসলমান হয়েছিলেন। “ওয়া বারওয়ায়েতে হাবিবুস সিয়ার ইসলাম নিজ আওর্দ।” (তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০০)। কিন্তু আমার কাছে হাবিবুস সিয়ার-এর বর্ণনায় এই অভিযানের বিবরণে এমন কিছু পাওয়া যায়নি। দেখুন খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮১।
দ্রষ্টব্য: ইবনে আল-আসির এবং অন্যান্য উৎসে কনৌজের রাজার নাম রাজপালই বর্ণিত হয়েছে। ফিরিশতা এই রাজার নাম “রায় কোরা” লিখেছেন। লেখকের মতে “কোরা” আসলে “কনৌজ”-এরই পরিবর্তিত রূপ। এটি কোনো নাম নয় বরং সেই নামই যা ইবনে আল-আসির বর্ণনা করেছেন।

এবং অনেকে নিজের স্ত্রী-সন্তানসহ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল। বাকি সৈন্যরা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল এবং লড়াই করতে করতে অধিকাংশ নিহত হলো, খুব কম লোকই বেঁচে ফিরতে পারল। [১]

কেল্লা আসনি এবং চন্দপাল:

এর পর সুলতান কেল্লা আসি (আসনি)-র দিকে অগ্রসর হলেন যেখানে রাজা চন্দপাল (চন্দেল হোর) উপস্থিত ছিলেন। চন্দপাল মোকাবিলা করা অসম্ভব দেখে নিজের প্রাণ বাঁচালেন। তিনি সুলতানের আগমনের আগেই নিজের ধনভাণ্ডার এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে পাহাড়ি এলাকার দিকে চলে গেলেন। সুলতান কেল্লা দখল করে সেখানে প্রচুর পরিমাণে শস্য ও রসদ লাভ করলেন। [২]

রাজা চন্দরায়ের পশ্চাদ্ধাবন এবং খোদাদাদ হাতি:

সুলতান এর পর রাজা চন্দরায়কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দক্ষিণের দিকে আরও অগ্রসর হলেন এবং তাঁর কেল্লা 'শরওয়া' পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। [৩]

সুলতানের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে তিনিও ধনভাণ্ডার ও পরিবারসহ পাহাড়ি এলাকার দিকে পালিয়ে গেলেন। এই রাজার কাছে অত্যন্ত উন্নত জাতের একটি হাতি ছিল যার উদাহরণ পুরো হিন্দুস্তানে ছিল না। সুলতান মাহমুদ গজনভি বহুবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই হাতিটি যেকোনো মূল্যে রাজার কাছ থেকে কিনে নেবেন কিন্তু রাজা রাজি হচ্ছিলেন না।

যখন রাজা পালিয়ে গেলেন তখন বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাতিটিও মাহুত ছাড়াই বেরিয়ে পড়ল এবং রাতের বেলা সুলতানের খাস তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সুলতান এই নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং এই হাতির নাম রাখলেন 'খোদাদাদ'। [৪]

এই অভিযানে যে রূপার মুদ্রা অর্জিত হয়েছিল তা বিশটি বস্তায় ছিল যার মধ্যে প্রতিটি বস্তায় দশ লক্ষ দিরহাম ছিল। বন্দীদের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার এবং হাতির সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশ'র বেশি। [৫]

---

[১] তারিখ ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১০২; আল-কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড ৭, পৃ. ৪০৭।

নোট: ইবনুল আসির একে কেল্লা ব্রাহ্মা এবং ফেরেশতা একে 'মুনজ' বলেছেন। তারিখ ফেরেশতার টীকাকার আহমদ বিন নসরুল্লাহ সিহলি থাট্টভী-র 'তারিখ আলফি' থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে কেল্লার নাম 'মুনজ' ছিল এবং একে কেল্লা ব্রাহ্মাও বলা হতো। (তারিখ ফেরেশতা: পৃ. ১০২, পাদটীকা)। মুবিন রশিদ লিখেছেন যে এই কেল্লা কনৌজি ব্রাহ্মণদের কেন্দ্র ছিল যার ধ্বংসাবশেষ কানপুর থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। (সুলতান মাহমুদ গজনভি: পৃ. ৬২)

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড ৭, পৃ. ৪০৭; তারিখ ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১০২।

নোট: ইবনুল আসির এর নাম 'আসি' বলেছেন। ফেরেশতা এর নাম উল্লেখ করেননি এবং শুধু কেল্লা চন্দপাল বলে অভিহিত করেছেন। মুবিন রশিদের মতে আসনি (আসওয়ানি) নামক এই কেল্লা গঙ্গা নদীর তীরে বর্তমান শেখপুর থেকে দশ মাইল (১৭ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং একে রাজা আসনি কুমার নির্মাণ করেছিলেন। (সুলতান মাহমুদ গজনভি: পৃ. ৬২)

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড ৭, পৃ. ৪০৭।

নোট: চন্দরায়ের কেল্লার নাম ইবনুল আসির 'শরওয়া' বলেছেন। বাকি ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে নীরব। এই নামে কোনো শহর বা কেল্লা এখন আর নেই। যেহেতু এই বংশের শাসন কনৌজের দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড (উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের সঙ্গমস্থলে) ছিল, তাই সম্ভবত এই কেল্লা সেখানেই কোথাও অবস্থিত ছিল।

[৪] তারিখ ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৯৯ থেকে ১০৩।

[৫] জয়নুল আখবার: পৃ. ২৬১।

খলিফাকে বিষ শনাক্তকারী পাখির উপহার:

সুলতানের এই অভিযান অত্যন্ত সফল ছিল, বিশাল এলাকা এবং বড় বড় দুর্লভ বস্তু হস্তগত হয়েছিল। একটি অদ্ভুত পাথর পাওয়া গিয়েছিল যা গভীর থেকে গভীরতর ক্ষতের ওপর রাখা হলে রাতারাতি সেই ক্ষত সেরে যেত। এমন একটি পাখিও পাওয়া গিয়েছিল যা বিষ চিনতে পারত। যদি এর আশেপাশে কোনো বিষাক্ত জিনিস থাকত তবে সেটি অস্থির হয়ে চোখের পানি ফেলতে শুরু করত। সুলতান এই পাখিটি উপহার হিসেবে তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা আল-কাদির বিল্লাহর দরবারে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। সাথে নিজের বিজয়ের বিবরণ সম্বলিত একটি 'ফাতহনামা'ও প্রেরণ করেন যা খলিফা একটি বড় অনুষ্ঠানে সবাইকে পড়ে শোনান। সুলতানের এই বিজয়ে মুসলিম বিশ্বে আনন্দ ও খুশির জোয়ার বয়ে যায়।

সুলতান বিজয়ের শুকরিয়া স্বরূপ 'আরুস-ই-ফালাক' নামে একটি চমৎকার মসজিদ নির্মাণ করেন, সাথে একটি বড় মাদরাসাও খোলেন যেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। হাজার হাজার বই সম্বলিত একটি বিশাল কুতুবখানাও তৈরি করা হয়। [১]

দ্বাদশ ভারত অভিযান, কালঞ্জর:

মধ্য ভারতের কালঞ্জরের রাজা 'নন্দ' (বিদ্যাপতি), যিনি চন্দেল্লা বংশের ছিলেন, কনৌজের শাসক রাজ্যপালের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন যে তিনি সুলতান মাহমুদের সাথে মোকাবিলা না করেই পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের শহর তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাই কালঞ্জরের রাজা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কনৌজ আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন।

সুলতান যখন এই খবর পেলেন তখন তিনি ভারতের দিকে কুচ করার নির্দেশ দিলেন। পথিমধ্যে সংবাদবাহক জানাল যে রাজা নন্দ (বিদ্যাপতি) কনৌজ আক্রমণ করে রাজ্যপালকে হত্যা করেছেন। সুলতান এতে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন তবে অভিযান অব্যাহত থাকল। যখন লস্কর যমুনা নদীর তীরে পৌঁছাল তখন দেখা গেল অপর তীরে ব্রাহ্মণ শাহী সালতানাতের উত্তরাধিকারী ত্রিলোচন পাল নিজের বাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নন্দ (বিদ্যাপতি) প্রেরিত একটি সাহায্যকারী দলও তার সাথে ছিল।

ত্রিলোচন পাল যেকোনো মূল্যে সুলতানের কাছে লাহোরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। এদিকে সুলতানি বাহিনী নদী পার হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল কিন্তু সুলতানের নির্দেশ ছাড়া কারো নদীতে নামার অনুমতি ছিল না কারণ এর প্রশস্ততা অনেক বেশি এবং স্রোত অত্যন্ত তীব্র ছিল। এমন সময় সুলতানের আটজন মামলুক অফিসার নিজেদের ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সাথে শুধু নদীই পার হলেন না বরং পূর্ণ শক্তি দিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ত্রিলোচন পাল সামান্য প্রতিরোধের পর পালিয়ে গেলেন। এই মামলুক অফিসাররা অনেক দূর পর্যন্ত তাকে তাড়া করলেন এবং এরই মধ্যে একটি শহরে প্রবেশ করে সেখান থেকে গনিমত সংগ্রহ করলেন এবং সেখানকার মূর্তিশালাগুলো ধ্বংস করে দিলেন।

এখন পুরো সুলতানি লস্কর নদী পার হয়ে গেল এবং 'কালঞ্জর' অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। কালঞ্জরের রাজা নন্দ (বিদ্যাপতি) যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১০৪, ১০৫।

সুলতানের মোকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে এল। তার লস্করে ৩৬ হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ হাজার পদাতিক ছিল, কিন্তু তার আসল শক্তি ছিল ৬৪০টি হাতি, যা যেকোনো বড় থেকে বড় বাহিনীকে আতঙ্কিত করে দিতে পারত। হাতির এত বড় সংখ্যা এখন পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে সামনে আসেনি। এদিকে সুলতানের কাছে এবার সৈন্য সংখ্যা বেশ কম ছিল। এই পরিস্থিতিতে সুলতান সমঝোতার দিকে পা বাড়ালেন এবং রাজাকে বার্তা পাঠালেন: "ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তিতে থাকবে।"

রাজা কঠোরভাবে জবাব পাঠালেন: "যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো কথা শোনার যোগ্য নয়।"

সুলতান যুদ্ধের নকশা তৈরি করার জন্য একটি উঁচু জায়গায় চড়ে শত্রুর শিবিরের দৃশ্য অবলোকন করলেন, তখন তিনি দূর পর্যন্ত তাবু, পর্দা, পদাতিক, অশ্বারোহী এবং হাতি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। সুলতান কিছুটা দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনা বোধ করলেন যে, এত বড় শক্তির জন্য তিনি কেন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসেননি। তখন তিনি অনেক দোয়া করলেন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে বিজয় ও সাহায্যের ভিক্ষা চাইলেন। এই ব্যাকুল দোয়াগুলো কবুল হলো। সেই রাতেই প্রতিপক্ষের ওপর মুসলমানদের প্রভাব ছেয়ে গেল এবং রাজা নন্দা (বিদ্যাপতি) অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেল।

সুলতান পরের দিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই খুব ভোরে নিজের দূতকে নদীর ওপারে পাঠালেন। তখন জানা গেল যে শত্রুর শিবির খালি পড়ে আছে। সুলতানের আদেশে শিবিরের ওপর দখল নেওয়া হলো। সেখান থেকে প্রচুর গনিমতের মাল অর্জিত হলো।

রাজা পালিয়ে যাওয়ার সময় কিছু হাতি সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে বেশিরভাগ হাতিকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুলতানের বাহিনী ফেরার পথে জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় এই হাতিগুলো পেয়ে গেল, যাদের সংখ্যা ছিল '৫৮০'।

এই সাফল্যের পর সুলতান আর সামনে অগ্রসর হওয়া উপযুক্ত মনে করলেন না, কারণ পাঞ্জাবের পেছনের জেলাগুলো নিরাপদ ছিল না এবং শত্রু সময় পেলে সেখানে অবরোধ সৃষ্টি করতে পারত। [১]

ত্রয়োদশ হিন্দুস্তান অভিযান, কিরাত, নারদিন:

কিছুকাল পর সুলতান জানতে পারলেন যে, হিন্দুস্তানের সীমান্তে 'কিরাত' এবং 'নারদিন' নামক এলাকাগুলোতে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে, যেখানে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা মূর্তিপূজারিই ছিল। [২]

এটি অত্যন্ত শীতল এলাকা ছিল এবং এখানে প্রচুর ফল উৎপন্ন হতো। এখানকার লোকেরা সিংহদের (মূর্তি বানিয়ে সেগুলোকে)

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫ থেকে ১০৭; জয়নুল আখবার: পৃষ্ঠা ২৬১, ২৬২।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭।

দ্রষ্টব্য: কিরাত-কে কীরাত, কুরিয়াত এবং কবীরত-ও লেখা হয়েছে, একইভাবে নারদিন-কে নারদী এবং নূর-ও বলা হয়েছে। 'কিরাত' সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত হলো এর দ্বারা 'সোয়াত' উদ্দেশ্য। ফেরেশতা বলেন যে, দৃশ্যত 'কিরাত' হিন্দুস্তান ও তুর্কিস্তানের সীমান্তের মাঝে অবস্থিত ছিল। (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭)। নারদিন সম্পর্কেও তীব্র মতভেদ রয়েছে, কিছু লোক বাজোর এবং কিছু লোক চিত্রাল ও কাফিরিস্তান উদ্দেশ্য নেন। সম্ভব যে এটি 'নারান' হতে পারে যা কাঘানের সাথে অবস্থিত এবং পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের একটি বিখ্যাত বিনোদন ও পর্যটন কেন্দ্র। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে জয়নুল আখবার-এর টীকাকার 'কিতাবুল হিন্দ'-এর কিছু বিষয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, কিরাত ও নারদিন আফগানিস্তানের 'কুনার' প্রদেশে হওয়া উচিত। (পৃষ্ঠা ২৯১)

পূজা করত। [১]

মোটকথা, সুলতান এখানকার জন্য একটি বিশেষ বাহিনী প্রস্তুত করেন যাতে কামার, ছুতার এবং পাথর খোদাইকারীদের একটি বড় সংখ্যাকেও সাথে নেওয়া হয়েছিল যাতে তারা পথগুলো সমান করতে পারে এবং গাছ ও পাহাড় কেটে পরিষ্কার করতে পারে। [২]

এই অভিযান ৪১১ হিজরিতে সংঘটিত হয়। প্রথমে কিরাত আক্রমণ করা হয়। এখানকার শাসক অনুগত হয়ে সুলতানের নিকট উপস্থিত হন। সুলতান তাকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনা জানান। তিনি তার অনেক দেশবাসীসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলতান তাদের জন্য আলেম ও দাঈ নিযুক্ত করেন যারা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। [৩]

'নারদিন'-এর লোকদেরও ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ফলে এখান থেকেই সুলতান তার সেনাপতি হাজিব আলী বিন ইল আরসলানকে 'নারদিন'-এর দিকে পাঠান, যিনি এই স্থানটি জয় করেন এবং সেখানে অবস্থিত একটি বিশাল মূর্তিশালা ভেঙে ফেলেন। সেই মূর্তিশালায় খোদাই করা পাথর থেকে জানা যায় যে, এই ভবনগুলো চল্লিশ হাজার বছরের প্রাচীন। সুলতান সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং আলী বিন কদরকে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে ফিরে আসেন। [৪]

চতুর্দশ ভারত অভিযান, লোহকোট, লাহোর:

৪১২ হিজরিতে (১০২১ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান মাহমুদ গজনভি পুনরায় কাশ্মীরে অভিযান চালান এবং এক মাস পর্যন্ত 'লোহকোট' অবরোধ করে রাখেন, কিন্তু এবারও এই অপরাজেয় দুর্গ জয় করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে সুলতান লাহোরের দিকে যাত্রা করেন যেখানে ত্রিলোচন পাল অবস্থান করছিলেন।

---

[১] জাইনুল আখবার: পৃষ্ঠা ২৬৩...

দ্রষ্টব্য: ঐতিহাসিক গারদিজির বর্ণিত এই চিহ্নটি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাদের মধ্যে সিংহের মূর্তির প্রচলন অনেক ছিল কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা সেগুলোর পূজা করত না, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে সেগুলোকে সম্মান করত।

[২] জাইনুল আখবার: পৃষ্ঠা ২৬৩, ২৬৪...

দ্রষ্টব্য: স্পষ্টতই প্রতিটি অভিযানের পূর্বে পথ এবং গন্তব্য সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল তথ্য সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছিল। এবার সফরটি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির একটি অঞ্চলে যেখানে কোথাও অত্যন্ত সুউচ্চ, দুর্গম ও পাথুরে পথ ছিল এবং কোথাও বৃক্ষের আধিক্য পথ রোধ করতে পারত। এছাড়া এই অঞ্চলগুলোতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলনের কারণে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে ছোট-বড় ধাতব ও পাথরের মূর্তি বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া এখানে মার্বেল পাথরের পাহাড় অনেক ছিল এবং বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতেও এই খোদাইয়ের কাজ প্রচুর পরিমাণে হয়েছিল। সুতরাং এই কারিগরদের কোথাও পাথর ও গাছ কেটে পথ তৈরি করতে হতো, কোথাও পাহাড়ের মার্বেল কাটতে হতো এবং কোথাও ভবন, মূর্তিশালা ও মূর্তিগুলো থেকে মূল্যবান ধাতু ও পাথর সতর্কতার সাথে খোদাই করে বের করতে হতো।

[৩] জাইনুল আখবার: পৃষ্ঠা ২৬৩

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১০৭, ১০৮; জাইনুল আখবার: পৃষ্ঠা ২৬৩, ২৬৪; তাবাকাত-ই-আকবারি আরবি: পৃষ্ঠা ৩১

দ্রষ্টব্য: লেখক আরজ করছেন যে, এই ভবনগুলো বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন ছিল কিন্তু যেহেতু সেই ভাষাগুলো তাদের লিপি সহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই সেগুলো পড়তে গিয়ে মানুষের ভুল হয়ে থাকতে পারে অথবা কেউ ভুল তথ্য দিয়ে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই ভবনগুলো সুলতান মাহমুদ গজনভির প্রায় বারোশ বছর আগের ছিল অর্থাৎ এগুলোর সম্পর্ক ছিল সেই যুগের সাথে যখন ভারতে বৌদ্ধ শাসকদের রাজত্ব ছিল। এই ধরনের শিলালিপিগুলো বেশিরভাগই অশোকের যুগে স্থাপন করা হয়েছিল।

নোট: ইবনুল আসির এই অভিযানকে ৪০৪ হিজরির অধীনে বর্ণনা করেছেন এবং এই স্থানটিকে ভারতের মধ্যভাগ (ওয়াসাতুল বিলাদ মিনাল হিন্দ) বলে উল্লেখ করেছেন। এই উভয় কথা সঠিক নয়। তবে ইবনুল আসির একটি অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছেন যে, সুলতানি বাহিনী দুই মাসের সফর করে এই স্থানে পৌঁছেছিল। দুর্গম পাহাড়ের এই সফরে দুই মাস সময় লাগা যুক্তিযুক্ত।

সুলতানি বাহিনী আশেপাশের এলাকায় অতর্কিত আক্রমণ চালায় যার ফলে ত্রিলোচন পাল ভীত হয়ে পালিয়ে যায় এবং আজমিরের রাজার কাছে আশ্রয় নেয়। এরপর সুলতান কোনো বাধা ছাড়াই লাহোর জয় করেন।

এখন পর্যন্ত সুলতান তার বিজিত এলাকাগুলোতে শুধুমাত্র "দেশ বিজয়"-এর কাজ করেছিলেন এবং হিন্দুস্তানের কোনো এলাকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি। এমনকি লাহোর ও মুলতান ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম প্রতিনিধি বা সুবেদারও নিযুক্ত করেননি। বরং সুলতানের নীতি ছিল এই যে, যারা প্রতিরোধ করবে তাদের শহরগুলো জয় করে তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস করে দেওয়া হবে, আর যারা সন্ধি ও আনুগত্য প্রকাশ করবে তাদের পূর্ববর্তী রাজাদের সম্মান ও মর্যাদার সাথে বহাল রাখা হবে। তবে এখন সুলতানের চিন্তায় "সাম্রাজ্য পরিচালনার" সূচনা হয়েছিল, তাই সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন যে অন্তত সিন্ধু ও পাঞ্জাবের এলাকাগুলোকে গজনী সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করা উচিত।

তাই ফিরে যাওয়ার আগে সুলতান লাহোরের শাসনভার একজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তার হাতে অর্পণ করেন। একইভাবে পাঞ্জাবের অন্যান্য দুর্গ ও জেলাগুলোতেও আমানতদার, বিশ্বস্ত ও যোগ্য শাসক নিযুক্ত করেন। [১]

পনেরোতম অভিযান: হিন্দুস্তান, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর:

কালিঞ্জর তখনও রাজা নন্দ (বিদ্যাধর)-এর দখলে ছিল এবং তার অবাধ্যতা বজায় ছিল। তাই ৪১৩ হিজরি (১০২২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান পুনরায় হিন্দুস্তান সফর করেন এবং প্রথমে গোয়ালিয়র অবরোধ করেন। কিন্তু এটি জয় করার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছিল না কারণ এর প্রাচীর অত্যন্ত মজবুত পাথর দিয়ে তৈরি ছিল, যার ওপর অবরোধের যন্ত্রপাতির কোনো প্রভাব পড়ছিল না।

সুলতান মাহমুদ গজনভী হিন্দুস্তানের স্থবিরতা ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় আঘাত হেনেছিলেন। এখন এই শেষ অভিযানগুলোতে তিনি যুদ্ধের চেয়ে সন্ধি ও আলোচনার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং হিন্দুস্তানি রাজারাও সুলতানের দয়া ও করুণার প্রতি আস্থাশীল হচ্ছিলেন এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ দিচ্ছিলেন। অথচ এর কয়েক শতাব্দী আগে তাদের অবস্থা এমন ছিল যে তারা পরাজয় দেখে পরিবার-পরিজনকে হত্যা করে নিজেরা আত্মহত্যা করত।

তাই এই ফ্রন্টে মাত্র চার দিন পর রাজা আলোচনার দক্ষ দূতদের মাধ্যমে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান যা সুলতান গ্রহণ করেন। রাজা আনুগত্য প্রকাশ করে ৩৫টি হাতি সুলতানকে উপহার দেন। [২]

এরপর সুলতান কালিঞ্জর অবরোধ করেন। এই দুর্গটি একটি উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত ছিল এবং এর গঠন এমন ছিল যে এটি ভাঙা, খনন করা বা সুড়ঙ্গ করা সম্ভব ছিল না। এভাবেই বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। অন্যদিকে রাজা নন্দ (বিদ্যাধর) গোয়ালিয়রের রাজার কাছ থেকে সুলতানের...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১০৮।

আশ্চর্যের বিষয় হলো ফেরেশতা লাহোরের শাসকের নাম উল্লেখ না করে শুধু "একজন বিশ্বস্ত আমীর" বলেছেন। অথচ প্রসিদ্ধ হলো সুলতান মাহমুদ গজনভী লাহোরে তার প্রিয় গোলাম আইয়াজকে শাসক নিযুক্ত করেছিলেন, যদিও এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি ভিন্ন কথা যে লাহোরবাসীদের দাবি হলো আইয়াজ কাশ্মীরি বংশোদ্ভূত গোলাম এবং লাহোরের প্রথম মুসলিম সুবেদার ছিলেন। তার কবর চক রং মহল, তকসালি মান্ডি লাহোরে অবস্থিত।

[২] জয়নুল আখবার: পৃষ্ঠা ২৬৩; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১০৮।

সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। ফলে সুলতানের অপরাজেয় বাহিনীকে দুর্গের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখে রাজা সন্ধির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ফলে তিনি দূত পাঠিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। স্থির হলো যে, রাজা বার্ষিক জিজিয়া প্রদান করবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তিনশ হাতি পেশ করবেন। এরপর রাজা সুলতানের সৈন্যদের দক্ষতা ও সাহসিকতা পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, সমস্ত হাতিকে মাহুত ছাড়াই কেল্লার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

যখন হাতিদের এই স্রোত কেল্লা থেকে বাইরে এলো, তখন সুলতানের সৈন্যরা বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে বরং অত্যন্ত নির্ভীকতার সাথে সেগুলোর ওপর সওয়ার হয়ে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন। রাজা অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশংসা ও ধন্যবাদের শব্দ বেরিয়ে এলো। তিনি একজন কবিও ছিলেন, তাই সুলতানের প্রশংসায় হিন্দি ভাষায় অত্যন্ত উঁচু মানের কিছু কবিতা লিখে ফেললেন। এই কবিতাগুলো সুলতানের কাছে পৌঁছালে তিনি খুশি হয়ে 'কালিঞ্জর' সহ পনেরোটি দুর্গ রাজাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং সেই সাথে অনেক মূল্যবান সম্পদ ও উপহারও প্রদান করে ফিরে আসার পথ ধরলেন।

এই অভিযান থেকে ফেরার পর সুলতান তাঁর সেই সৈন্য ও হাতিদের গণনা করালেন যেগুলো কেন্দ্রে উপস্থিত ছিল। অশ্বারোহীদের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার এবং হাতির সংখ্যা ছিল ১৩০০। এছাড়া বিজিত প্রদেশগুলোতে অবস্থানরত বাহিনী তো ছিলই।

ষোড়শ ভারত অভিযান... সোমনাথ বিজয়:

৪১৫ হিজরি (১০২৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান মাহমুদ গজনভীর সৌভাগ্যের সূর্য মধ্যগগনে ছিল। এই বছর সুলতান মধ্য এশিয়ায় আলী তগিন নামক এক বিদ্রোহী সর্দারের ফিতনা দমন করেছিলেন। এদিকে ভারতের বড় বড় দুর্গ ও শহরগুলো বিজিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুদের মনে পাহাড়ের মতো এক জাদু আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। সুলতান যখন তাঁর উপদেষ্টাদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কিছু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জানালেন যে, পশ্চিম ভারতের গুজরাট প্রদেশের সমুদ্রতীরে একটি চমৎকার মন্দির রয়েছে যাকে "সোমনাথ" বলা হয়। এটি সমস্ত মূর্তির রাজা হিসেবে পরিচিত। ব্রাহ্মণরা বলে যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের আত্মা সোমনাথের দরবারে উপস্থিত হয় এবং তিনিই তাদের 'নতুন জন্ম' দান করেন। ব্রাহ্মণরা এই দাবিও করে যে, এখন পর্যন্ত যেসব মূর্তিশালা মুসলমানদের হাতে ধ্বংস হয়েছে, সেগুলোর ওপর সোমনাথ অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই মুসলমানরা সেগুলোকে ধ্বংস করতে সফল হয়েছে। অন্যথায় সোমনাথ এক মুহূর্তেই মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করে দিতে পারেন।

হিন্দুদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য এবং কেল্লাটি ধূলিসাৎ করার জন্য সুলতান মাহমুদ গজনভি শাবান ৪১৬ হিজরি (১০২৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গুজরাটের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। ইসলামী লস্কর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মুলতান, রাজস্থান ও আজমিরের পথ পাড়ি দিয়ে মাত্র চার মাসে গুজরাটে পৌঁছে যায়।

সোমনাথ সরস্বতী নদী থেকে তিন মাইল দূরত্বে ছিল যা কাথিয়াওয়ারের সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। সমুদ্র ও মন্দিরের মাঝখানে...

---

[১] জয়নুল আখবার: পৃ. ২৬৩, ২৬৪; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১০৮, ১০৯।

দ্রষ্টব্য: কালিঞ্জরের রাজার দেওয়া হাতির সংখ্যার ব্যাপারে প্রাচীন ঐতিহাসিক গারদিজি ৩০০ বলেছেন, যেখানে ফেরেশতা ১০০ উল্লেখ করেছেন।

সোমনাথ শহরটি জনবসতিপূর্ণ ছিল। মন্দিরের বাইরের প্রাচীরটি একটি আলাদা শহরের প্রাচীরের মতো অত্যন্ত উঁচু ও মজবুত ছিল। এই বিশাল প্রাঙ্গণে সোমনাথের দুর্গও ছিল এবং এর নিরাপত্তার জন্য একটি স্থায়ী সেনাবাহিনীও ছিল। মন্দিরের সিঁড়িগুলো সমুদ্রের পানিতে নেমে গিয়েছিল। যখন ঢেউগুলো সিঁড়িতে আছড়ে পড়ত, তখন হিন্দুরা মনে করত যে এগুলোও দেবতার ইবাদত করছে।

মন্দিরের ভেতরের অংশে সেই মূর্তিটি ছিল যার পূজা করা হতো। এই কক্ষের ছাদ ছাপ্পান্নটি (৫৬) স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। রাতের বেলাতেও এখানে কোনো প্রদীপ বা লণ্ঠনের ব্যবস্থা করা হতো না, বরং আলোর জন্য সেই মণি-মুক্তা ও হীরাই যথেষ্ট ছিল যা ছাদের ঝাড়বাতিগুলোতে লাগানো ছিল। মূর্তিপূজার সময় একটি বিশাল ঘণ্টা বাজানো হতো, সেই ঘণ্টার শিকলের ওজন ছিল দুইশ মণ এবং সেটি সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। মূর্তির স্নানের (গোসল) জন্য গঙ্গা নদী থেকে অসংখ্য বালতি পানি অনবরত আসতে থাকত, যদিও গঙ্গা এখান থেকে আঠারোশ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে ছিল। পূজার সময় তিনশ গায়ক তাদের শিল্প প্রদর্শন করত। সেই সাথে সোমনাথের নর্তকীদের নাচ দেখে উপস্থিতদের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ত। জ্যোৎস্না রাতে যখন সমুদ্রের পানি উত্তাল হয়ে উপরে উঠত, তখন সোমনাথের পূজারিরা একেও মূর্তির অলৌকিক ক্ষমতা মনে করে আনন্দিত হতো। চন্দ্রগ্রহণের সময় পুরো গুজরাট এখানে ভেঙে পড়ত এবং এক লাখের বেশি মানুষ একই সময়ে সোমনাথের ইবাদতের জন্য সমবেত হতো।

সুলতানের আগমনের খবর শুনে সোলাঙ্কি বংশের বড় রাজা ভীমদেবসহ আশেপাশের সাতাশজন রাজা সোমনাথের নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৪ই জিলকদ ৪১৬ হিজরি (৬ই জানুয়ারি ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে মুসলমানরা সোমনাথের প্রাচীরের সামনে পৌঁছালে শহরের দেয়ালের ওপর উত্তেজিত পূজারিরা চিৎকার করে বলছিল:

“আমাদের উপাস্য সোমনাথ নিজেই তোমাদের এখানে টেনে এনেছে যাতে তোমাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।”

তিন দিন ধরে সোমনাথের প্রাচীরের বাইরে হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন মূর্তিপূজারিদের প্লাবন মুওয়াহহিদীনদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এমন সময় সুলতান মাহমুদ গজনভি শেখ আবুল হাসান খারকানি (রহ.)-এর দেওয়া খিরকা হাতে নিলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর কাছে বিজয়ের প্রার্থনা করলেন। দেখতে দেখতে ঘন কালো মেঘ ছেয়ে গেল এবং বজ্রপাতের শব্দে হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। এদিকে সুলতান তুফানি আক্রমণ চালালেন এবং সোমনাথের পূজারিদের পা টলে গেল। এখন মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করল এবং মন্দিরে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হলো। যখন ইসলামী বাহিনী মন্দিরের মাঝখানে পৌঁছে গেল, তখন প্রতিপক্ষ সৈন্যদের সাহস ভেঙে পড়ল এবং তারা পালিয়ে গেল।

বিজয়ের পর সুলতান মাহমুদ গজনভি গিয়ে সোমনাথের মূর্তিটি দেখলেন। পূজারিদের দাবি ছিল যে সেখানে পৌঁছামাত্রই সুলতান ভস্ম হয়ে যাবেন, কিন্তু যখন তা হলো না, তখন তারা সুলতানের কাছে আবেদন করল যে চাওয়া মাত্রই সম্পদ নিয়ে মূর্তিকে অক্ষত থাকতে দেওয়া হোক।

সুলতান উত্তর দিলেন: “আমি যদি তোমাদের কথা মেনে চলি, তবে দুনিয়া আমাকে ‘মাহমুদ বুত-ফরোশ’ নামে মনে রাখবে, অথচ আমি পছন্দ করি যে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাকে ‘মাহমুদ বুত-শিকান’ নামে ডাকা হোক।” সুলতান সোমনাথকে ভেঙে...

মূর্তিপূজার এই কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দিলেন। এভাবে মূর্তিপূজকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেল। [১]

দ্রুত গজনি ফিরে যাওয়ার জন্য সুলতান পথ পরিবর্তন করলেন এবং সিন্ধুর দিকে যাত্রা করলেন। এই সময়ে পথপ্রদর্শক হিসেবে থাকা এক স্থানীয় হিন্দু সৈন্যদলকে চোলিস্তানের পানিশূন্য ও তৃণহীন মরুভূমিতে নিয়ে গেল, যেখানে তৃষ্ণায় পুরো বাহিনী মৃত্যুর মুখে পতিত হলো। তখন সেই হিন্দু পথপ্রদর্শক ঘোষণা করল যে, সে সোমনাথের পূজারি এবং মুসলমানদেরকে জেনেশুনে এখানে নিয়ে এসেছে যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

সুলতান তাকে হত্যা করালেন। সেই রাতেই মরুভূমির উত্তরে এক অদ্ভুত আলো দেখা গেল। সুলতানের নির্দেশে বাহিনী সেদিকে অগ্রসর হলো। সূর্যোদয়ের সময় সিন্ধু নদের তীর সামনে চলে এল এবং বাহিনী তৃষ্ণা নিবারণ করল। গজনভি বাহিনী মুলতান হয়ে সফর ৪১৭ হিজরি (এপ্রিল ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দ) এ রাজধানীতে ফিরে পৌঁছাল। [২]

সপ্তদশ ভারত অভিযান, জাট উপজাতি: ৪১৮ হিজরি

সোমনাথ থেকে ফেরার পথে সিন্ধু নদের তীরে জাট উপজাতিদের আক্রমণে ইসলামি বাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। মহররম ৪১৮ হিজরি (মার্চ ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ) এ সুলতান তাদের দমন করেন। মুলতান পৌঁছে সুলতান চৌদ্দশ নৌকা তৈরি করালেন যেগুলোর সামনে সুচালো লোহার শলাকা লাগানো ছিল। জাটরা চার হাজার নৌকায় চড়ে মোকাবিলা করতে এল। কিন্তু তাদের নৌকাগুলো মুসলমানদের নৌকার কাছে আসতেই লোহার শলাকার সাথে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যেত। হাজার হাজার জাট ডুবে এবং হাজার হাজার স্থলে নিহত হলো। এটি ছিল ভারতে সুলতানের শেষ অভিযান। [৩]

আখেরি অভিযানসমূহ:

সুলতানের শেষ অভিযানসমূহ ৪১৮ হিজরি (১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ) এর শেষের দিকে সেলজুক উপজাতি এবং কারামাতিদের বিরুদ্ধে শুরু হয়। সেলজুক উপজাতিরা আমু দরিয়া পার হয়ে আশপাশে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছিল এবং সুলতানের কোনো প্রতিনিধিই তাদের দমনে সফল হতে পারছিলেন না। অবশেষে সুলতান মাহমুদ গজনভি নিজে গিয়ে তাদের দমন করেন। এর পাশাপাশি সুলতান খোরাসানের উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে ‘রে’ দখল করে নেন যেখানে কারামাতি এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট ফেরকার অনুসারীরা তাদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করছিল। সুলতান ‘রে’ দখলের পর সেখানকার সকল ধর্মহীন ও জিন্দিকদের হত্যা করেন। [৪]

সফর-ই-আখেরাত:

সুলতান মাহমুদ গজনভিকে বছরের পর বছর অক্লান্ত অভিযান ক্লান্ত ও অসুস্থ করে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে রোগটি গুরুতর রূপ ধারণ করল। অবশেষে ২৩ রবিউস সানি ৪২১ হিজরি (২৯ এপ্রিল ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ) রাতে সুলতান নীরবে নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানালেন। দাফন সেই রাতেই গজনির কসরে ফিরোজে সম্পন্ন হলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১১০ থেকে ১১৮; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪১৬ হিজরি; তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৬, পৃ. ২৬৭ থেকে ২৮৯, ত. দারুল ফিকর।

[২] মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি রচিত তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ২২৯, ২৩০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১২০, ১২১।

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৪, পৃ. ৩৯২, ত. দারুল ফিকর; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১২২; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪১৮ হিজরি।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ১২২, ১২৩।

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ১২৪।

সুলতান মাহমুদ গজনভীর আক্রমণের উদ্দেশ্য

অনেক প্রাচ্যবিদ, অধিকাংশ হিন্দু ঐতিহাসিক এবং একইভাবে অনেক বেশি সেক্যুলার ও লিবারেল বলে পরিচিতদের মতে সুলতান মাহমুদ গজনভীর আক্রমণের উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচার করা ছিল না এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ন্যায় ও ইনসাফের কোনো ব্যবস্থা প্রদান করাও ছিল না বরং তার উদ্দেশ্য ছিল নিছক লুণ্ঠন। এই লোকেরা এই যুক্তি দেয় যে যদি তাকে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করতে হতো তবে তিনি এখানে নিজের হুকুমত কায়েম করতেন কিন্তু তিনি লাহোর বা মুলতানের আগে কোনো মুসলিম শাসক নিযুক্ত করেননি বরং এর বিপরীতে তিনি প্রতি বছর এই দেশের শ্রেষ্ঠ ও সম্পদশালী শহরগুলোকে একে একে লুণ্ঠন করে সেই সমস্ত সম্পদ গজনী রাষ্ট্রে জমা করতে থাকেন। সুতরাং হিন্দুস্তানে আক্রমণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ভালো ছিল না।

লেখক এ ব্যাপারে আরজ করছেন যে নিয়তের হাল আল্লাহই ভালো জানেন, সুতরাং এই বিষয়টি তাঁর ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমাদের উচিত তথ্যের আলোকে সভ্যতাসমূহের ব্যাপক অধ্যয়নের সাথে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। যদি আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো বিষয়টি দেখি তবে এই কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে সুলতান মাহমুদ গজনভী যা করেছেন তা ছিল দুই সভ্যতার সংঘাতের অনিবার্য ফল। গজনভী সালতানাতের জায়গায় অন্য কোনো সুসংগঠিত ও সভ্য সালতানাত হলেও এমনই করত। তথ্যসমূহ পেশ করা হলো:

- (১) আসলে এই মোকাবিলা নিছক একজন মুসলিম শাসক এবং কয়েকজন রাজপুত শাসকের মধ্যে ছিল না বরং সভ্যতাসমূহের মধ্যে ছিল। এক দিকে ছিল মুসলিম সভ্যতা যা অত্যন্ত উন্নত, কর্মতৎপর ও গতিশীল ছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নদী নিজের বক্ষে ধারণ করে ছিল। অন্যদিকে ছিল হিন্দুস্তানি সভ্যতা যা শত শত বছর ধরে স্থবিরতার শিকার ছিল এবং নিজের সময়ের চেয়ে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গিয়েছিল। এই সভ্যতার কেন্দ্র মহারাজাদের চেয়েও বেশি চালাক ও ধূর্ত পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল যারা অমানবিক ও বিবেকবর্জিত বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে বংশীয় দাসত্বের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল যারা নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও একটি সুখী জীবনের স্বপ্নও দেখতে পারত না।

- (২) দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল যে হিন্দুস্তানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পাহারায় ছিল এবং ব্রাহ্মণ সমাজ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিক অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় চুক্তি, প্রথা, উপঢৌকন এবং অভিযানের মাধ্যমে অঢেল সম্পদ জমা করছিল। শত শত বছর ধরে বড় বড় মন্দির, তীর্থস্থান এবং পবিত্র বলে বিবেচিত স্থানগুলোতে সম্পদ কেবল এক দিক থেকেই আসছিল এবং তা বের হওয়ার কোনো পথ ছিল না। পূজারি ও ধর্মীয় নেতারা এই সম্পদকে কোথাও ইটের আকারে লুকিয়ে রাখত এবং কখনো সেগুলোকে সোনা ও রূপার ভারী মূর্তির রূপ দিত।

(৩) হিন্দুস্তানের সমাজ সেই সময় এতটাই প্রাচীন ছিল যে এখানে মুদ্রার প্রচলন খুব কম ছিল। সাধারণ মানুষ সাধারণত জিনিসের বদলে জিনিসের লেনদেন করত, যেখানে বিশেষ ব্যক্তিরা সোনা, রূপার টুকরো বা হীরা ও মুক্তার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য হাসিল করত। এই কারণে পূজারী ও পণ্ডিতরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাঁটি সোনা ও দামী মুক্তায় মালামাল হয়ে থাকত। এভাবে এই ভূখণ্ডে সম্পদ গুটিকয়েক হাতে জমা হতে থাকে। অতিরঞ্জিত হবে না যে, সেই সময়ের রাজা-মহারাজাদের সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ মন্দিরে লুকানো ছিল, যা চুরি হওয়ার ভয়ও ছিল না কারণ মানুষ দেবতাদের ভয় পেত এবং এমন চিন্তা করাকেও পাপ মনে করত।

(৪) নৈতিক অবস্থার দিক থেকে এই সময়ের উল্লেখ্য যে, হিন্দুস্তানের ইতিহাসে সম্ভবত এটিই ছিল সবচেয়ে নিম্নস্তর। যেহেতু ব্রাহ্মণরা পুরো সমাজকে নিজেদের "পবিত্র সৃষ্টি" হওয়ার বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল, তাই তারা জবাবদিহিতা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে মন্দিরের ভেতরে সব ধরণের নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিল। নিজেদের নফসের তৃপ্তির জন্য তারা এক নিপুণ শিল্প তৈরি করেছিল। তারা অল্পবয়সী মেয়ে ও কুমারীদের "দেবদাসী" নামে মন্দিরে ভর্তি করত। "দেবতাদের ইবাদত"-এর নামে তাদের দিয়ে নাচ-গান করিয়ে নিজেদের কামুক দৃষ্টিকে তৃপ্ত করত এবং অনেক সময় নির্জনে তাদের ইজ্জত নিয়েও ছিনিমিনি খেলত।

(৫) এই ব্রাহ্মণ নেতারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে দিত না কারণ কোনো একজন শক্তিশালী শাসক পুরো দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলে ধর্মীয় গদি ও মন্দিরের ওপর তাদের কর্তৃত্বের জন্য হুমকি হতে পারত। তাই প্রত্যেক বড় ব্রাহ্মণ কোনো না কোনো রাজা-মহারাজাকে "আশীর্বাদ" দিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে রাখত। এভাবে গৃহযুদ্ধে নিজেদের রাজাকে জেতানোর জন্য নতুন নতুন প্রথা উদ্ভাবন করা হতো এবং প্রতিটি প্রথার বিনিময়ে পণ্ডিত ও পূজারীরা স্তূপীকৃত সোনা পেত।

চিন্তাবিদদের মতে, যেকোনো দেশের উন্নতির জন্য দুটি বিষয় অত্যন্ত মৌলিক গুরুত্ব রাখে: এক, মানসিক উন্নতি; দ্বিতীয়, অর্থনৈতিক উন্নতি। মাহমুদ গজনভীর আগে হিন্দুস্তান উভয় দিক থেকে অত্যন্ত অনগ্রসর ছিল যার একমাত্র কারণ ছিল ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ব্যবস্থা যা বড় বড় স্তরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই শক্ত খোলস থেকে বের হওয়া হয়তো পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতেও সম্ভব হতো না যদি না এর ওপর কিছু আঘাত আসত।

সুলতান মাহমুদ গজনভীর আক্রমণগুলোর মর্যাদা ছিল ঠিক সেই আঘাতগুলোর মতো যা এই ব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। নিচে আমরা এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করব। এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই যে সুলতানের নিয়ত এই ফলগুলো অর্জন করা ছিল কি না অথবা তার কাছে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল। তবে বাস্তব সত্য এটাই ছিল:

(১) সুলতানের আক্রমণগুলো ঐতিহাসিক ও যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পাথরের প্রাণহীন মূর্তিগুলো, যাদেরকে একজন বিদেশী প্রকাশ্যে ভেঙে চুরমার করে হাজার মাইল দূরে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়, তা মানব সমাজের জন্য একেবারেই মূল্যহীন।

...বস্তুসমূহ। কতিপয় ধর্মীয় ঠিকাদারদের বানানো বুদ্ধি-বিবেচনা বিরোধী গল্পে বিশ্বাস করে এই মূর্তিগুলোকে নিজেদের স্রষ্টা ও মালিক মেনে নেওয়া মানবীয় মর্যাদার অবমাননা।

(২) মাহমুদ গজনভীর ক্রমাগত আক্রমণগুলো ব্রাহ্মণ সাম্রাজ্যের কখনো না নড়া অদৃশ্য সিংহাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পুরো দেশের মানুষ দেখল যে, মানুষের বুদ্ধি নিয়ে খেলা করা পণ্ডিত ও পূজারীদের হাতে কিছুই নেই। তাদের এই দাবি যে, তারা সরাসরি খোদার সাথে যোগাযোগ রাখে এবং তাঁর থেকে নিজেদের কথা মানিয়ে নেয়, তা নিছক প্রতারণা মাত্র; অন্যথায় তারা সুলতান মাহমুদ গজনভীকে কোনো একটি ময়দানেই চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করাত।

(৩) সুলতান অসংখ্য কারিগর ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিজের সাথে গজনীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে নিজ দেশ থেকে জোরপূর্বক স্থানান্তর কোনো আরামদায়ক বিষয় নয়, তবে এটাও দেখা উচিত যে, এর ফলে সভ্যতার মিলনের একটি নতুন রূপ অস্তিত্বে এসেছে। একদিকে এই দক্ষ ব্যক্তি ও কারিগররা উন্নত পারিশ্রমিকে কাজ করার যোগ্য হয়েছে এবং একটি অনগ্রসর সমাজের পরিবর্তে একটি উন্নত দেশের নাগরিক হয়েছে। অন্যদিকে তাদের দক্ষতা ও কারুকার্যের হিন্দুস্তানি ছাপ গজনী ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য ও মীনাকারিতে ফুটে উঠতে শুরু করে। তৃতীয়ত, তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও আদর্শিক প্রশিক্ষণও সাথে সাথে চলতে থাকে এবং তারা দ্বারে দ্বারে মাথা নত করার পরিবর্তে এক স্রষ্টা ও মালিকের সামনে সিজদাবনত হওয়ার প্রবক্তা হয়ে ওঠে।

(৪) হিন্দুস্তানের মতো বিশাল দেশের সম্পদের একটি বড় অংশ, বরং সম্ভবত অর্ধেকেরও বেশি অংশ মন্দিরে স্তূপ করে রাখা হয়েছিল। এই সম্পদ হিন্দুস্তান বা বিশ্বের অন্য কোনো দেশের মানুষের কোনো কাজে আসছিল না। সভ্যতার সংঘাতের অনিবার্য ফলাফল ছিল এই যে, যে জাতি এই সম্পদ থেকে ফায়দা হাসিল করতে অক্ষম, তারা তা থেকে বঞ্চিত হবে এবং সেই জাতি তা অর্জন করে নেবে যারা একে স্থবিরতা থেকে গতিশীলতায় নিয়ে আসবে; কেননা পুঁজি থেকে মুনাফা অর্জনের পুরো ব্যবস্থাই গতিশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই চারটি প্রভাব কমবেশি পুরো হিন্দুস্তানের ওপর পড়েছিল, যা সুলতানের সাফল্য প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

শেষ প্রভাবটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, এভাবে হিন্দুস্তানে গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণে হ্রাস ঘটেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সামষ্টিক বিবেক শেষ পর্যন্ত এই সম্পদ বাইরে যেতে দিল কেন? এর উত্তর এটাই যে, সাধারণ মানুষ এই ধনভাণ্ডার থেকে কোনো উপকারই পেত না। তাই তারা কখনো ভাবেনি যে কী ছিল? কত ছিল এবং কোথায় গেল? দ্বিতীয় কথা হলো, নিঃসন্দেহে সাময়িকভাবে হিন্দুস্তানের সংরক্ষিত ও স্থবির সম্পদে ঘাটতি এসেছিল, কিন্তু যখন এই সম্পদ একটি বিশাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হয়ে গেল যা পাঞ্জাব থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন মাত্র দুই শতাব্দী পর হিন্দুস্তান এর ব্যাপক সুফল পেতে শুরু করল। এই সম্পদই ছিল যা গজনভীদের থেকে ঘুরিরা লাভ করেছিল। এই সম্পদের ওপর ভিত্তি করেই দুই শতাব্দী পর সেই বিজয়ীরা এসেছিল যারা দিল্লিকে কেন্দ্র বানিয়ে এই দেশকে রাজনৈতিক ঐক্য দান করেছিল এবং উপমহাদেশকে নিজেদের দেশ ও ঘর বানিয়ে একে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সাজিয়েছিল ও গুছিয়েছিল যে, সারা বিশ্বে এই দেশের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির ধুম পড়ে গিয়েছিল।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সুলতান কেন পুরো হিন্দুস্তানে শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি?

নিশ্চিতভাবেই সুলতান পুরো হিন্দুস্তানে শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি, তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই এবং এর কারণে সুলতানের ওপর কোনো তিরস্কারও করা যায় না। বাস্তবতা হলো এই যে, কোনো নতুন সভ্যতার অধিকারী জাতি একটি জরাজীর্ণ সভ্যতাকে কয়েক বছরেই পরিবর্তন করতে পারে না, বরং এর জন্য অনেকগুলো ধাপ রয়েছে যা ধীরে ধীরে এবং বংশপরম্পরায় সম্পন্ন হয়। পাঞ্জাব ও সিন্ধু ছাড়া অবশিষ্ট হিন্দুস্তান তখনো ইসলামের সাথে এতটা পরিচিত ও অভ্যস্ত ছিল না যে, কেবল কয়েকটি সামরিক পরাজয় বরণ করে মুসলমানদের শাসন মেনে নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতো। এর আগে প্রয়োজন ছিল যে, হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা মুসলমান ও তাদের সভ্যতার সাথে পরিচিত ও অভ্যস্ত হতো এবং সংকীর্ণমনা নেতারা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনে যে উস্কানিমূলক ধারণাগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সেগুলোর নিরসন হতো।

এই কাজটি বাদশাহদের চেয়ে বেশি ছিল ধর্মপ্রচারক ও সূফিয়ায়ে কেরামের। সুলতানের হামলার মাধ্যমে এখান থেকে ভারী পাথরগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং গর্তগুলো ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল। এখন দাওয়াতের কাফেলাগুলো সামনে অগ্রসর হতে পারত। এটা স্পষ্ট যে, দাওয়াতের কাজ সামরিক অভিযানের মতো নয় যে কয়েক দিনে এলাকাগুলো পদানত করে নেওয়া যাবে। এই কাজ ছিল অন্তর জয় করার। পুরো হিন্দুস্তানের জমিন ছিল শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত। একে সিক্ত করার জন্য কয়েক প্রজন্মের পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল।

সিন্ধু ও পাঞ্জাবে ইসলাম এর তিনশ বছর আগেই এসেছিল, তাই সেখানকার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন এবং সুলতানের বিজয়ের প্রভাবও সেখানে ভিন্ন ছিল। সেখানে মন্দিরগুলোর আধিপত্যের শতাব্দী প্রাচীন ব্যবস্থা এই হামলার মাধ্যমেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম বহুগুণ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। মুসলিম জনবসতি স্থাপনের পাশাপাশি মসজিদের নির্মাণ কাজও বৃদ্ধি পেল।

যখন সমাজের কেন্দ্র মন্দিরের পরিবর্তে মসজিদ হয়ে গেল, তখন সাথে সাথে পুরো সমাজও বদলাতে শুরু করল। মসজিদে মন্দিরের মতো ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করার রেওয়াজ ছিল না, বরং এর বিপরীতে মসজিদে মানুষ অভাবীদের দান ও সদকা করত। পরবর্তীতে অনেক মসজিদ বাদশাহ ও ওয়াকফের অধীনে চলে আসে, কিন্তু কোনো মসজিদ কখনো মানুষকে গোলাম বানানোর কেন্দ্র হয়নি। কারণ মসজিদের কাজই ছিল মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর বন্দেগির দিকে নিয়ে আসা। প্রতিটি মসজিদ ছিল মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক।

ইকবালের ভাষায়:

এই একটি সেজদা যাকে তুমি বোঝা মনে করো
হাজারো সেজদা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়

সুলতান মাহমুদের কীর্তিসমূহ

মাহমুদ গজনভীর কীর্তি কেবল হিন্দুস্তান জয় করাই ছিল না, বরং সেখানে ইসলামের প্রসারের পথ সুগম করা এবং অন্যান্য ইসলামী ভূখণ্ডে ইসলামকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা সুলতানের মর্যাদাকে আরও বৃদ্ধি করে। মাহমুদ গজনভীর আবির্ভাব হয়েছিল চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে। সেই সময় খিলাফত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং আন্দালুস ছাড়া প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভ্রান্ত মতাবলম্বী দলগুলোর রাজনৈতিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আফ্রিকা, মিসর ও হিজাজে বনু উবাইদ-এর ইসমাইলি ফিরকার দখল ছিল। ইরাক ও ইরানে ইসনা আশারি বনু বুওয়াইহ এমনভাবে জেঁকে বসেছিল যে আব্বাসী খলিফা তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। বাহরাইন, নিশাপুর, সিন্ধু ও মুলতানে কারামতিদের দখল ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মাহমুদ গজনভী এক বিশাল ও বিস্তৃত ইসলামী হুকুমত কায়েম করে সারা বিশ্বে আহলে হকের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন, ইসলামের প্রকৃত রূপকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেন এবং ইসলামের কৃত্রিম ধারণা কেবল নিজের রাজ্যে প্রচলিত হতে না দিয়ে বরং সারা বিশ্বের সামনে 'কৃত্রিম ইসলাম'-এর পর্দা উন্মোচন করে দেন।

সুলতান তাঁর সালতানাতে আহলে সুন্নাতের পরিপন্থী সমস্ত ভ্রান্ত ফিরকা যেমন মুতাজিলা, জাহমিয়া, ইসনা আশারিয়া এবং কারামতিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং সেখানে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটান। তিনি বাগদাদে বনু বুওয়াইহ-এর অবৈধ আধিপত্যের ওপর আঘাত হানেন, যারা অনারব সাসানি আমলের শাহেনশাহি চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করছিল। এর বিপরীতে সুলতান আব্বাসী খিলাফতকে মজবুত করেন এবং নিজেকে খলিফার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জাহির করার পরিবর্তে খিলাফতের গোলাম হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি নিজের বিশাল সালতানাতকে আব্বাসী খিলাফতের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত হিসেবে গণ্য করতেন। সেই যুগে বাগদাদ খিলাফতের খুতবা, যা আনুগত্যের প্রতীক ছিল, তা কেবল কয়েকটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল; এমনকি হারমাইনেও ইসমাইলি ইমামের খুতবা পাঠ করা হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে সুলতান লক্ষ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকায় আব্বাসী খিলাফতের খুতবা চালু করে মুসলমানদের পুনরায় এক ঐক্যবিন্দুতে নিয়ে আসতে এবং ভুয়া ইমামদের প্রভাব খতম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সুলতান মিসরের ইসমাইলি প্রতিনিধি তাহিরতিকে, যে গজনভী সালতানাতে ইসমাইলি ইমামের বায়আত নিতে এসেছিল, তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করান। তাঁর খচ্চরটি কাজী আবু মনসুর আল-আজদীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন:

"এই পশুর ওপর একজন ধর্মত্যাগী (মুলহিদ) সওয়ার হতো, এখন উপযুক্ত যে এর ওপর একজন একত্ববাদী (মুওয়াহহিদ) সওয়ার হবে।" [১]

---

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: খণ্ড ২৯, পৃষ্ঠা ৭২, ত. তাদমুরী।

সুলতানের চরিত্রহনন এবং এর বাস্তবতা:

সুলতান মাহমুদ গজনভীর সাথে আয়াজের নাম এমন অবিচ্ছেদ্য ছিল না যেমনটি পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা উপস্থাপন করেছেন। বরং এই কীর্তিটি কয়েক শতাব্দী পরে গজল রচয়িতা কবিরা সম্পাদন করেছেন এবং তারা মনিব ও দাসের মধ্যকার প্রেম-ভালোবাসার ডজন ডজন গল্প তৈরি করে সারা বিশ্বে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, এখন একে একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই গল্পগুলোর মর্যাদা আনারকলি ও সেলিম অথবা পদ্মাবতী ও আলাউদ্দিন খিলজির নাটকের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

প্রকৃতপক্ষে সুলতানের সেই বিজয়সমূহ, যা মানুষের কষ্টার্জিত উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, সেগুলোকে ব্যবহার করে একদল সংকীর্ণমনা হিন্দু ঐতিহাসিক ইসলামের এই মহান সন্তানকে কলঙ্কিত করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিল। একদিকে সংকীর্ণমনা হিন্দু ঐতিহাসিকরা তাকে ডাকাত, জালেম ও জবরদখলকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, অন্যদিকে শিয়া কারমাতি ঝোঁকসম্পন্ন কিছু ঐতিহাসিকও এই চরিত্রহননে অংশ নিয়েছে। এই কারণেই কিছু ফারসি বা হিন্দি উৎসে আমরা স্থানে স্থানে সুলতানের নিন্দা দেখতে পাই। কোথাও সুলতানের বাহ্যিক অবয়বকে বসন্তের দাগযুক্ত ও কুৎসিত হিসেবে দেখানো হয়েছে, কোথাও তাকে ধন-সম্পদের লোভী, লালসাগ্রস্ত এবং অত্যন্ত কৃপণ বলা হয়েছে এবং অনেক মনগড়া গল্প বর্ণনা করে সুলতানের সমস্ত বিজয়কে রাজ্য জয় ও ধন-সম্পদের লালসার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরও যখন সুলতানের চরিত্রহননে মন ভরল না, তখন এই মুজাহিদ ব্যক্তিকে একজন মদ্যপ ও লম্পট মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত করা হলো যে সুন্দর বালকদের সাথে অবৈধ সম্পর্কের শৌখিন ছিল। এর উদাহরণ হিসেবে আয়াজকে উপস্থাপন করা হলো এবং সুলতানের সাথে তার সম্পর্ককে যৌনতার রঙ দেওয়া হলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই বিষয়ে একটি বিখ্যাত গল্প বারবার বলা হয় যে, “একবার মাহমুদ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মদ পান করে মাতাল হয়ে যান, এই অবস্থায় আয়াজের অলকগুচ্ছের (চুলের) ওপর তার নজর পড়লে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং তার গলায় হাত জড়িয়ে ধরেন। পরে যখন হুঁশ ফিরে আসে, তখন আয়াজকে তার অলকগুচ্ছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন।” এটি সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা গল্প। সুলতান মাহমুদ গজনভীর সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিক বা বর্ণনাকারীর কাছ থেকে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। দীর্ঘকাল পরে কিছু আড্ডাবাজ ফারসি কবি তাদের কবিতায় এই মনগড়া গল্পটি পেশ করেন। এরপর কিছু “গবেষক” এই কবিতাগুলোকে “সহিহ বর্ণনা”র মর্যাদা দিয়ে সুলতানকে নির্লজ্জভাবে মদ্যপ ও সমকামী হিসেবে প্রচার করে দেন। ফেরেশতাও কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই এটি নকল করেছেন। আফসোস, শত আফসোস।

এই সমস্ত বর্ণনা মূলত সংকীর্ণমনা লোকদের মনগড়া কাহিনী, যা পরবর্তীতে সাধারণ লেখকরাও যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রহণ করে নিয়েছেন। অথচ সুলতান মাহমুদ গজনভীর মতো বিজয়ীদের অবস্থা জানার জন্য আমাদের সেইসব ঐতিহাসিকদের ওপর নির্ভর করা উচিত যাদের আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা স্বীকৃত, যেমন বায়হাকি, হাফেজ জাহাবি, হাফেজ ইবনে কাসির এবং আল্লামা ইবনে খালদুন। এই মহোদয়গণ সুলতানের সীরাত ও চরিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে কোথাও এই আজেবাজে কথার উল্লেখ করেননি। যদি সুলতানের মধ্যে এই মন্দ দিকগুলো থাকত, তবে এই মহোদয়গণ সেগুলো লুকানোর চেষ্টা করতেন না, কারণ তারা বিভিন্ন স্থানে ভুল পথে চলা শাসকদের অপকর্মগুলো প্রকাশ করেছেন।

নিঃসন্দেহে সুলতান মাহমুদ গজনভীর গোলাম আয়াযের অস্তিত্ব প্রমাণিত, তবে সুলতান ও আয়াযের ঘটনাবলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিচ্ছা-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনাবলি দুই প্রকারের; এক প্রকার হলো যা আভিজাত্যের গণ্ডির ভেতরে, অর্থাৎ সুলতানের আয়াযের ওপর অত্যধিক আস্থা রাখা, সুলতানের ইশারায় আয়াযের চলা, মনের ইচ্ছা বুঝে নেওয়া, সুলতানের আদেশে মূল্যবান মুক্তা ভেঙে ফেলা, সুলতান কর্তৃক আয়াযকে বড় বড় পদমর্যাদা দান করা—এসবই হলো উপাখ্যান, ইতিহাস নয়। এগুলোর সম্পর্ক সাহিত্যের সাথে, ইতিহাসের সাথে নয়। দ্বিতীয় প্রকারের কাহিনীগুলো হলো যা আভিজাত্যের গণ্ডির বাইরে, অর্থাৎ মাহমুদ ও আয়াযের রোমান্টিক কাহিনী। এগুলোকে ইতিহাস তো দূরের কথা, সাহিত্যও বলা যায় না, বরং এর অবস্থান অশ্লীল রচনার পর্যায়ে।

প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের বইগুলোতে আয়াযের উল্লেখ নেই বললেই চলে। ইতিহাস বলতে আমার উদ্দেশ্য হলো সেই আসল ইতিহাস যা সুলতানের যুগে বা তার নিকটবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে। ওইসব ঐতিহাসিকদের বই আমার উদ্দেশ্য নয়, যাতে ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে সাথে সাহিত্যিক কাহিনীগুলোও ইচ্ছামতো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুলতানের নিকটবর্তী যুগের ইতিহাসসমূহ যা পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে লেখা হয়েছে সেগুলো হলো:

- তারিখ-ই-উতবি (তারিখ-ই-ইয়ামিনি)
- তারিখ-ই-বাইহাকি
- যয়নুল আখবার

তারিখ-ই-উতবি: এটি সুলতান মাহমুদ গজনভীর নিজস্ব দরবারির লেখা। এতে আয়ায সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

তারিখ-ই-বাইহাকি: এটি সুলতান মাহমুদ গজনভীর পুত্র সুলতান মাসউদের দরবারির লেখা। এতে আয়ায সম্পর্কে মাত্র তিনটি বাক্য পাওয়া যায়: (১) এই বইটি লেখানোর জন্য উৎসাহ প্রদানকারীদের মধ্যে আয়ায আবুল নাজমও রয়েছেন। (পৃষ্ঠা: ১) (২) গজনী থেকে আবুল নাজম আয়ায এবং অন্যান্য আমিরদের আগমনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। (পৃষ্ঠা: ৮৩) (৩) আয়াযের গণনা শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের মধ্যে হতো। (পৃষ্ঠা: ২৯১)

মোদ্দাকথা, তারিখ-ই-বাইহাকি থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আয়ায আবুল নাজম নামক কোনো ব্যক্তি গজনভী দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি কবে থেকে ছিলেন? কোন পদে ছিলেন? কী কী দায়িত্ব পালন করেছেন? কবে জন্মগ্রহণ করেছেন? কবে মারা গেছেন? সুলতান মাহমুদ গজনভীর সাথে কী সম্পর্ক ছিল? কিছুই উল্লেখ নেই।

যয়নুল আখবার: এটি সুলতান মাহমুদের উত্তরসূরিদের যুগে আবু সাঈদ গারদেযি (মৃত্যু ৪৩৩ হিজরি) লিখেছেন। এটি আয়ায সম্পর্কে তথ্য থেকে সম্পূর্ণ খালি।

যদি কেউ বলে যে, এই বইগুলো গজনভী সুলতান ও আমিরদের প্রভাবে লেখা হয়েছিল এবং একটি বই লেখানোর ক্ষেত্রে আয়ায নিজেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই এগুলোতে মাহমুদ ও আয়াযের রঙিন কাহিনী জোরপূর্বক বাদ দেওয়া হয়েছে; তবে আরজ এই যে, এমতাবস্থায় এই বইগুলো আয়াযের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ খালি কেন? চাপ প্রয়োগকারীরা এতে আয়াযের কাল্পনিক কীর্তিনামাসমূহ কেন অন্তর্ভুক্ত করাতে পারলেন না?

চলুন মেনে নিলাম যে, এই ঐতিহাসিকদের ওপর কোনো চাপ ছিল, তাহলে অন্যান্য দেশের ঐতিহাসিকদের ব্যাপারে কী বলবেন? তারা কেন নীরব থাকলেন? আমাদের কাছে ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর বাগদাদী ঐতিহাসিক ইবনুল জাওযীর আল-মুনতাযাম (৯ খণ্ড) এবং সপ্তম শতাব্দীর...

হিজরির ইরাকি ঐতিহাসিক ইবনে আসিরের আল-কামিল (১২ খণ্ড) এমনই এক ব্যাপক গ্রন্থ যাতে মাহমুদ গজনভির অবস্থা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সংকলন করা হয়েছে। কিন্তু এই কিতাবগুলোতে মাহমুদ গজনভির আইয়াজ নামক কোনো গোলাম বা অফিসারের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরিশেষে মাহমুদ গজনভির দেড়শ বা দুইশ বছর পর যখন গজনভি সালতানাত শেষ হয়ে গিয়েছিল, তখন এই ঐতিহাসিকদের ওপর কার চাপ থাকতে পারে?

বায়হাকির পর প্রথমবারের মতো আইয়াজের নাম যে ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় তা হলো তিনশ বছর পর আসা আবুল ফিদার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 'আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার'। এতে তিনি ৪২৯ হিজরির ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু এতটুকু বলেন: "এই বছর মাহমুদ বিন সবুক্তগিনের গোলাম আইয়াজ ইন্তেকাল করেন।" প্রশ্ন হলো, সেই বিখ্যাত ঘটনাবলি কী ছিল যা কোনো ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেননি? সম্ভবত ঐতিহাসিকের ইঙ্গিত কাব্যিক কাহিনীর দিকেই হবে।

এরপর আপনি অষ্টম হিজরি শতাব্দীর দুই বিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থ অর্থাৎ হাফেজ জাহাবির 'তারিখুল ইসলাম' এবং ইবনে কাসিরের 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' দেখে নিন। এই দুই ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের ঘটনার সাথে সাথে বিশেষ ব্যক্তিদেরও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, কিন্তু মাহমুদ গজনভির আইয়াজ নামক কোনো গোলামের নাম নেন না। ইবনে খালদুনের ইতিহাসেরও একই অবস্থা যে এতেও আইয়াজের কোনো উল্লেখ নেই।

এখন আমরা যদি ফারসি ইতিহাসগুলো দেখি তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 'তাবাকাত-ই-নাসিরি' এই উল্লেখ থেকে একেবারেই খালি। অবশ্য 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'-তে আইয়াজ সম্পর্কিত দুটি কাহিনী পাওয়া যায়। একটি হলো আইয়াজকে নিজের পোশাক ও মুকুট পরিয়ে হযরত আবুল হাসান খারাকানির কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য পাঠানো। দ্বিতীয়টি হলো আইয়াজকে তার চুল কাটার নির্দেশ দেওয়া। (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৯, ১৩৭) এই দ্বিতীয় কাহিনীটি কাব্যিক গল্প থেকেই নেওয়া হয়েছে। ইসামিও কিছু ভিত্তিহীন কাহিনীকে পদ্যে রূপান্তর করে এই বিষয়গুলোকে খ্যাতি দান করেছেন।

যেহেতু এই ধরনের কাহিনীর কোনো সনদ নেই, তাই এগুলোকে কারো বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না।

আরজ করার উদ্দেশ্য হলো মাহমুদ ও আইয়াজের ইতিহাসে বাস্তবতার চেয়ে কল্পকাহিনী এত বেশি যে বাস্তবতা যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এই কারণেই নবম হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা এগুলোকে নিজেদের ইতিহাসের অংশ করা পছন্দ করেননি। পরবর্তীতে যখন ইতিহাস চর্চায় ভালো-মন্দের সংমিশ্রণের (রুতব-ও-ইয়াবিস) যুগ শুরু হলো, তখন কিছু ঐতিহাসিক এই ধরনের কাহিনীগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোনো ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা নেই।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুলতান মাহমুদ গজনভীর চরিত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী সুলতান মাহমুদ গজনভীর পুরো জীবন জিহাদ, বিজয়, প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজে অতিবাহিত হয়েছিল। গজনীর এই মহান ব্যক্তি প্রথম যুগের মুজাহিদ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকদের চরিত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের বর্ণনা উদ্ধৃত করা হলো:

আল্লামা ইবনে খালদুন-এর অভিমত:

আল্লামা ইবনে খালদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“সুলতান মাহমুদ অত্যন্ত শানদার শাসক ছিলেন। অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর তাঁর আধিপত্য ছিল। তিনি উলামাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞানীরা তাঁর দরবারে আসতেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। প্রজাদের সাথে নম্র আচরণ ও দয়া করতেন। তিনি অধিক পরিমাণে জিহাদে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর বিজয়সমূহ সুপরিচিত।” [১]

ইবনুল আসীরের বর্ণনা:

আল্লামা ইবনুল আসীর আল-জাযারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনা হলো:

“মাহমুদ বুদ্ধিমান, দ্বীনদার এবং সচ্চরিত্রবান ছিলেন। তিনি ইলম ও মা’রিফাতের সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর জন্য অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিতাব রচনা করা হয়েছিল।” [২]

হাফিজ ইবনে কাসীরের অভিমত:

হাফিজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“মাহমুদ সমস্ত প্রজাদের সাথে ন্যায়ের আচরণ করেছেন। তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। তিনি হিন্দুস্তানসহ অনেক দেশ জয় করেছেন। সারা বিশ্বে তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সালতানাত ও রাষ্ট্র ছিল বিশাল এবং শাসনের মেয়াদ ছিল দীর্ঘ। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি হিন্দুস্তানে এত বেশি বিজয় লাভ করেছিলেন যা তাঁর আগে বা পরে আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। তিনি হিন্দুদের অনেক মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর চেহারা উজ্জ্বল করুন এবং তাঁর আখিরাত কল্যাণময় করুন। তিনি দ্বীনদারি ও পরহেজগারিতে চরম পর্যায়ে ছিলেন। তিনি উলামা ও মুহাদ্দিসদের ভালোবাসতেন। তাঁদের সাথে বসতেন এবং তাঁদের সম্মান করতেন।” [৩]

---

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৭৯, দারুল ফিকর।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪২১ হিজরি।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৩৩২, ৩৩৩, দারু হাজার থেকে প্রকাশিত, ৪২১ হিজরি।

হাফিজ যাহাবী রহ. এবং কাজী মিনহাজুস সিরাজ রহ.

হাফিজ যাহাবী রহ. বলেন: "মাহমুদের গুণাবলি অসংখ্য এবং তার জীবনী ছিল সর্বোত্তম।" [১]

ফারসি ঐতিহাসিক কাজী মিনহাজুস সিরাজ লিখেন: "আল্লাহ তাআলা এই বাদশাহকে যে সম্মান ও গুণাবলি দান করেছেন এবং যে উপায়-উপকরণ তাকে সরবরাহ করেছেন, তা তার পরবর্তী কোনো বাদশাহর ভাগ্যে জোটেনি।" [২]

ডক্টর তারা চাঁদের বক্তব্য:

নিরপেক্ষ হিন্দু লেখকগণও সুলতানের মহত্ত্ব স্বীকার করেন। ডক্টর তারা চাঁদের বক্তব্য হলো: "তিনি কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করেননি। শুধু তাই নয়, বরং তিনি অনেক হিন্দু কর্মকর্তা ও সৈনিককে নিজের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করেছিলেন যারা তার হয়ে মধ্য এশিয়া ও খোরাসানে যুদ্ধ করত।" [৩]

লেন পুলের দৃষ্টিতে সুলতান মাহমুদ গজনভি:

নিরপেক্ষ পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণও সুলতানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা। লেন পুল লিখেন: "মাহমুদের মধ্যে তার পিতার মতো ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধিমত্তা, তৎপরতা এবং বীরত্বের সমস্ত গুণ বিদ্যমান ছিল। এছাড়া তিনি কখনো অলস বসে থাকতেন না। তার চিন্তা-ভাবনা ছিল উচ্চমার্গের। মেজাজ ছিল তেজোদীপ্ত। তার মধ্যে ইসলামি উদ্দীপনা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। এই গুণটিই ছিল তার সমস্ত গুণাবলিকে সচল করার এবং সেগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চার করার মূল শক্তি। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মুসলমান। ইসলামবিদ্বেষী ও কাফিরদের সাথে যুদ্ধ থেকে যখনই অবসর পেতেন, তখন আত্মশুদ্ধির নিয়তে কুরআন মাজিদ লিখতেন। যেন তিনি জীবনের একটি মুহূর্তও বৃথা যেতে দিতেন না।"

খিলাফত দরবার থেকে তাকে গজনী ও খোরাসানের শাসনের সনদ প্রদান করা হয়েছিল। এই খুশিতে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রতি বছর হিন্দুস্তানের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবেন। তিনি সারাজীবন এই অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। মাহমুদ জালেম ছিলেন না। অকারণে রক্তপাত অপছন্দ করতেন। তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের অনুসারী ছিলেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ধারেকাছেও যেতেন না। তিনি যেভাবে মুসলমানদের মধ্যে সত্যবাদিতা, খোদাভীতি এবং মুমিনসুলভ উদ্দীপনার নমুনা ছিলেন, তেমনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কদর করার ক্ষেত্রেও ছিলেন অতুলনীয়। তার দরবার উলামা, ফুকাহা এবং গুণীজনদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। নেপোলিয়ন যদি বিজিত দেশগুলোর নামকরা শিল্পী ও কারিগরদের দিয়ে প্যারিস সাজানোর কাজ নিয়ে থাকতেন, তবে মাহমুদ তার চেয়েও অনেক বেশি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন এই যে, তিনি নিজের দরবারকে সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞ ও গুণীজনদের দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। [৪]

---

[১] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ২৯, পৃ. ৪৭, ত. তাদমুরি

[২] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ২৩০

[৩] মুখতাসার তারিখে হিন্দ: পৃ. ১২৭

[৪] Medieval India under Mohammedan Rule: P32

সুলতানের ওপর কৃপণতার অপবাদ দেওয়াও ভুল। এর খণ্ডনের জন্য এতটুকু দেখে নেওয়াই যথেষ্ট যে, সেই যুগে গজনীর দরবার উলামা ও গুণীজনদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। যদি সুলতানের পক্ষ থেকে কৃপণতার বিষয়টি থাকত, তবে উলামা, সাহিত্যিক ও কবিদের এত বড় সমাবেশ সেখানে একত্রিত হতো না। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সত্য যে, সুলতানের অপচয়ের প্রতি ঘৃণা এবং মিতব্যয়িতার অভ্যাস ছিল।

লেন পুল লিখেছেন:

“যদি মাহমুদকে ধন-সম্পদ সঞ্চয়কারী এবং লোভী বা লালসাগ্রস্ত বলা হয়, তবে আমাকে এটা বলতে বাধ্য হতে হবে যে, তিনি ধন-সম্পদ ও অর্থ ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, কোন সময়ে কতটুকু অর্থ ব্যয় করতে হবে। মাহমুদ মোটেও অসভ্য বা অশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মহান সৈনিক এবং অত্যন্ত সাহসী মানুষ। তিনি মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হতেন না। তাঁর ভেতর ও বাহির ছিল অভিন্ন। তিনি লোকদেখানো প্রদর্শন ও লৌকিকতা থেকে দূরে ছিলেন।” [১]

সুলতান সম্পর্কে স্যার এলফিনস্টোনের অভিমত:

সুলতান মাহমুদ গজনভী সম্পর্কে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও ইতিহাসবিদ স্যার মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন লিখেছেন:

“যখন মাহমুদের মৃত্যু হয়, তখন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।” [২]

“মাহমুদের গর্ব ও সম্মানের আসল কারণ ছিল এই যে, তিনি মুজাহিদ ও বিজয়ী হওয়ার মতো গুণাবলির পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তিনি গজনীতে একটি দারুল উলুম (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে বিভিন্ন ভাষার দুর্লভ বই এবং বিভিন্ন বস্তু ও উপাদানের একটি জাদুঘরও ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন; শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্ঞানীদের জন্য বার্ষিক প্রায় দশ হাজার পাউন্ড বৃত্তির অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। তাঁর রাজধানীতে জ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের এমন সমাবেশ ছিল যা এশিয়ার অন্য কোনো বাদশাহর দরবারে দেখা যায়নি।” [৩]

“সমস্ত ইতিহাসবিদ মাহমুদের দরবারের শান-শওকতের সাক্ষী। সম্পদ ব্যয়ের প্রজ্ঞা ও মহত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি ‘আরুসে সামাভী’ নামক একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যা সেই যুগে প্রাচ্যের এক বিস্ময় হিসেবে গণ্য হতো।” [৪]

“সম্ভবত এমন কোনো যুদ্ধ হয়নি যেখানে তিনি হাঁটু গেড়ে বসে দোয়া প্রার্থনা করেননি। তাঁকে নিষ্ঠুর মনে হয় না এবং তাঁর প্রতি কোনো অমানবিক শাস্তি আরোপের কথা জানা যায় না।” [৫]

---

[১] Medieval India under Mohammedan Rule: P.33

[২] (The History of India, Vol. I - p. 562)

[৩] (The History of India, Vol. I - p. 563, 564)

[৪] (The History of India, Vol. I - p. 567)

[৫] (The History of India, Vol. I - p. 570)

সুলতানের ওপর কৃপণতার অপবাদ দেওয়াও ভুল। এর খণ্ডনের জন্য এতটুকুই দেখে নেওয়া যথেষ্ট যে, সেই যুগে গজনীর দরবার উলামা ও ফযলাদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। যদি সুলতানের পক্ষ থেকে কৃপণতার বিষয় হতো, তবে উলামা, আদীব এবং কবিদের এত বড় সমাবেশ সেখানে একত্রিত হতো না। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই যে সুলতান অপব্যয় থেকে ঘৃণা করতেন এবং মিতব্যয়িতা তাঁর অভ্যাস ছিল।

লেন পুল লিখেছেন:

"যদি মাহমুদকে ধন-সম্পদ সঞ্চয়কারী এবং লোভী বা লালসাগ্রস্ত বলা হয়, তবে আমাকে বলতে বাধ্য হতে হবে যে, তিনি ধন-সম্পদ এবং অর্থ ব্যয়ের খাত সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে কোন স্থানে কত টাকা ব্যয় করা উচিত। মাহমুদ অসভ্য এবং অশিক্ষিত মোটেও ছিলেন না। তিনি একজন অত্যন্ত বড় সৈনিক এবং অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিলেন। তিনি মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম থেকে ক্লান্ত হতেন না। তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক সমান ছিল। তিনি লোকদেখানো প্রদর্শন এবং কৃত্রিমতা থেকে দূরে ছিলেন।" [১]

সুলতান সম্পর্কে স্যার এলফিনস্টোনের অভিমত:

সুলতান মাহমুদ গজনভী সম্পর্কে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ইতিহাসবিদ স্যার মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন লিখেছেন:

"যখন মাহমুদের ইন্তেকাল হলো, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর সময়ের সকল মহান শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" [২]

"মাহমুদের গর্ব ও সম্মানের আসল কারণ এই ছিল যে, তিনি একজন মুজাহিদ এবং বিজেতা হওয়ার মতো গুণাবলীর পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তিনি গজনীতে একটি দারুল উলুম (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে বিভিন্ন ভাষার দুর্লভ বই এবং বিভিন্ন বস্তুর একটি জাদুঘরও ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেন; শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বিদ্যানুরাগীদের জন্য তিনি প্রায় দশ হাজার পাউন্ড বার্ষিক বৃত্তির অর্থ নির্দিষ্ট করেন। তাঁর শাসনকেন্দ্রে জ্ঞানপিপাসুদের এমন সমাবেশ ছিল যা এশিয়ার অন্য কোনো বাদশাহর কাছে দেখা যায়নি।" [৩]

"সমস্ত ঐতিহাসিক মাহমুদের দরবারের শান-শওকতের সাক্ষী। ধন-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞা ও মহত্ত্ব ছিল অতুলনীয়। তিনি আরুস-ই-সামাভী নামক একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন যা সেই যুগে প্রাচ্যের বিস্ময় হিসেবে গণ্য হতো।" [৪]

"খুব কমই এমন কোনো যুদ্ধ হয়েছে যাতে তিনি নতজানু হয়ে দোয়া না চেয়েছেন। তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না এবং তাঁর পক্ষ থেকে অমানবিক শাস্তির কোনো নজির নেই।" [৫]

---

[১] Medieval India under Mohammedan Rule: P.33

[২] (The History of India, Vol. I- p. 562)

[৩] (The History of India, Vol. I- p. 563, 564)

[৪] (The History of India, Vol. I- p. 567)

[৫] (The History of India, Vol. I- p. 570)

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান মাহমুদের সীরাতের কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা

সুলতান মাহমুদ গজনভীর সীরাত অত্যন্ত উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়। এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক ঘটনা রয়েছে, যার মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে কয়েকটি পেশ করা হলো:

তালিবে ইলমের সম্মান, দরবারে নববী থেকে সুসংবাদ:

সুলতান মাহমুদ গজনভী উলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁদের খিদমত করাকে তিনি সৌভাগ্য মনে করতেন। এক রাতে তিনি কোনো এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন এক তালিবে ইলম একটি দোকানের প্রদীপের কাছে বসে অধ্যয়ন করছে। সুলতান তাঁর খাদেমকে নির্দেশ দিলেন যেন শাহী লণ্ঠনটি তালিবে ইলমের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সেই রাতেই সুলতান হুজুর আকরাম (সা.)-এর যিয়ারত লাভ করেন। তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: “হে সবুক্তগিনের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে হাশরের ময়দানেও তেমনি সম্মান দান করুন যেমন তুমি আমার একজন ওয়ারিশকে সম্মান করেছ।” [১]

আমাকে ডাক দিও:

সুলতানের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ইতিহাসের এক জীবন্ত বাস্তবতা। প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য সুলতানের অভ্যাস ছিল গজনীর অলিগলিতে টহল দেওয়া, যখন মানুষ শান্তিতে ঘুমাত। সুলতান কোনো মজলুমের ফরিয়াদ শুনেছেন অথচ কারো জুলুম বরদাশত করেছেন এমনটি কখনো হয়নি, সে যত বড় পদমর্যাদারই হোক না কেন।

একবার এক ব্যক্তি সুলতানের কাছে ফরিয়াদ করে বলল: “আপনার ভাগ্নে রাতে জোরপূর্বক আমার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং তারপর আমার স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করে।”

সুলতান এ কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন: “যখনই সেই হতভাগা তোমার ঘরে ঢুকবে, তুমি প্রাসাদের এই দেয়ালের কাছে এসে আমাকে ডাক দিও।”

তৃতীয় রাতে সুলতান তার ডাক শুনতে পেলেন: “হে বাদশাহ!” সুলতান জবাবে আওয়াজ দিলেন: “আমি আসছি।”

সুলতান তার ঘরে পৌঁছে নিজের চোখে সেই অফিসারের সাথে তার স্ত্রীকে দেখলেন। শিয়রে একটি মোমবাতি জ্বলছিল। সুলতান সেটি নিভিয়ে দিলেন এবং তলোয়ার বের করে এক কোপেই সেই হতভাগার শিরচ্ছেদ করলেন।

তারপর ফরিয়াদীকে বললেন: “হে আল্লাহর বান্দা! যদি এক ঢোক পানি থাকে তবে এখনই আমাকে দাও।”

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬

সে পেয়ালায় পানি হাজির করল। সুলতান পানি পান করে বিদায় নিতে লাগলেন, তখন ফরিয়াদী তাঁর আঁচল ধরে বলল: “আপনাকে আল্লাহর কসম! এটা তো বলে দিন যে, মোমবাতি নেভানো এবং শিরশ্ছেদ করে সাথে সাথে পানি চাওয়ার রহস্য কী?”

সুলতান বললেন: “মোমবাতি এই জন্য নিভিয়েছিলাম যাতে আমার ভাগ্নের প্রতি আমার দয়া না চলে আসে। পানি এই জন্য চেয়েছিলাম কারণ তোমার ফরিয়াদ শুনে আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, যতক্ষণ তোমাকে বিচার না পাইয়ে দেব ততক্ষণ কিছু খাব না এবং পানও করব না।” [১]

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড—জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা:

সুলতান সর্বদা একজন ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফকারী শাসক হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন এবং বিচার ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। প্রতিটি গ্রাম ও জনপদে কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। বাজারে ওজন ও পরিমাপের যন্ত্রপাতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো। সুলতানের স্থাপত্যশিল্পের প্রতিও অনুরাগ ছিল। গজনীতে নির্মিত ‘আরুসে ফালাক’ মসজিদ দীর্ঘকাল এর প্রমাণ দিয়ে আসছিল।

সুলতান সর্বদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। গজনভী দরবারে বড় বড় প্রখ্যাত আলেম উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আল-বিরুনী (মৃত্যু ৪৪০ হিজরি/১০৪৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর মতো অতুলনীয় পণ্ডিত, দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদও ছিলেন, যিনি হিন্দুস্তানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর প্রথম গ্রন্থ ‘কিতাবুল হিন্দ’ পেশ করেছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যার বিশেষজ্ঞ আল্লামা আবুল খায়ের মুহাম্মদও সুলতানের সহচরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁকে উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যায় প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। ঐতিহাসিক আবু নসর আল-উতবীও সুলতানের দরবারী ছিলেন, যিনি সুলতানের জীবনী নিয়ে প্রথম বই লিখেছিলেন যা ‘আল-ইয়ামিনী’ নামে পরিচিত। আবু নসর আল-ফারাবীর মতো যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের ইমামও সুলতান মাহমুদ গজনভীর সালতানাতে বসবাস করতেন, যিনি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানকে নতুন ছাঁচে ঢেলেছিলেন।

সুলতান মাহমুদের দরবারের সাথে ৪০০ আলেম যুক্ত ছিলেন। রাজকোষ থেকে প্রতি বছর ১২ লক্ষ দিরহাম এই আলেমদের পেছনে ব্যয় করা হতো। সুলতান তাঁর রাজ্যে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন। গজনীতে একটি চমৎকার গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আলেম ও শিক্ষার্থীরা আসতেন। সুলতানের নির্মিত গজনীর ‘দারুল উলুম’ মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। সুলতান মাহমুদের নিজস্ব জ্ঞানগত যোগ্যতাও ছিল অনেক উচ্চমানের। বলা হয় যে, ফিকহ ও হাদিসের ওপর সুলতানের কিছু রচনাও ছিল যা কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। [২]

সেই শিরাজী তুর্কি তাবরিজ ও কাবুলের হৃদয় হরণ করেছে
মৃদু বাতাস ফুলের সুবাস দিয়ে নিজের সফরসঙ্গী তৈরি করে
বিশ্ব শাসনের চেয়ে বিশ্ব দর্শন অনেক বেশি কঠিন কাজ
কলিজা রক্ত হলে তবেই অন্তশ্চক্ষুতে দৃষ্টির জন্ম হয়
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬, ১২৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৩৩৪, ৪২১ হিজরি, দারুল হিজর কর্তৃক মুদ্রিত।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৪, ১৩২ থেকে ১৩৯।

গজনী দরবারের কয়েকজন জ্ঞানী ও সাহিত্যিকের পরিচিতি

গজনী দরবারের সাথে পারস্যের অনেক বড় বড় নামকরা সাহিত্যিক ও কবি যুক্ত ছিলেন, যারা তাদের শিল্পের নৈপুণ্য প্রদর্শন করতেন এবং পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হতেন। তাদের কয়েকজনের উল্লেখ নিচে দেওয়া হলো:

হাকিম উনসুরি: মৃত্যু ৪৩১ হিজরি (১০৪০ খ্রিস্টাব্দ)

বলখ-এর অধিবাসী এই কবি কাসিদা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাকে ফারসি কবিতার উস্তাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুলতান মাহমুদ তাকে 'আমীরুশ শুয়ারা' উপাধি দিয়েছিলেন। তাকে 'মালিকুশ শুয়ারা'ও বলা হতো। তার অধিকাংশ কাব্য কাসিদা ও গজলের ওপর ভিত্তি করে রচিত, যা গজনী দরবারের শান-শওকত ও বিজয়সমূহ বর্ণনা করে এবং তা মুদ্রিত আকারে বিদ্যমান। [১]

দাকিকি:

সুলতান মাহমুদের যুগের একজন নামকরা কবি ছিলেন। সুলতান মাহমুদ তার মাধ্যমে ইরান ও খোরাসানের একটি ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস লেখাতে চেয়েছিলেন। দাকিকি এর সূচনা করেন এবং এক হাজার পঙক্তি লেখেন। কাজ চলাকালীন দাকিকি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এই কাজ ফেরদৌসী সম্পন্ন করেন। [২]

ফেরদৌসী: ৩২৪ থেকে ৪১১ হিজরি (৯৩৫ থেকে ১০২০ খ্রিস্টাব্দ)

আবুল কাসিম ফেরদৌসী তুস-এর অধিবাসী ছিলেন। দীর্ঘ সময় গজনী দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ৪১৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। এই ব্যক্তি কাব্যচর্চায় অনন্য ছিলেন। সুলতান মাহমুদের ফরমান অনুযায়ী তিনি 'শাহনামা' শিরোনামে ষাট হাজার পঙক্তি সম্বলিত প্রাচীন ইরান ও খোরাসানের একটি ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস লেখেন, যাতে ইতিহাসের সাথে 'পুরাণ' (Mythology)-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সাহিত্যকর্মটি আজও ফারসি সাহিত্যের প্রাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ফেরদৌসী এটি সম্পন্ন করতে ত্রিশ বছর সময় ব্যয় করেন। এর শেষ চার হাজার পঙক্তি তিনি তার উস্তাদ আসাদি-কে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। [৩]

---

[১] লুবাবুল আলবাব আউফি, অধ্যায় ৯, শুয়ারা-এ আলে সবুক্তগীন, পৃষ্ঠা ২৯ থেকে ৩৩; তারিখ-এ ফিরিশতা ফারসি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৭।

[২] তারিখ-এ ফিরিশতা ফারসি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৯।

[৩] লুবাবুল আলবাব আউফি, অধ্যায় ৯, শুয়ারা-এ আলে সবুক্তগীন, পৃষ্ঠা ৪৩।

ফায়দা: ইরানি বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর পুত্র 'কিউমার্স'-কে পৃথিবীর প্রথম বাদশাহ হওয়ার গৌরব প্রদান করা হয়। শাহনামায় সেখান থেকে কাহিনী শুরু করে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ আরবদের হাতে সাসানি সালতানাতের পতন পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাজ চার ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগে পৌরাণিক বাদশাহদের কাহিনী রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে আধা-পৌরাণিক বাদশাহদের ঘটনাবলী রয়েছে। তৃতীয় ভাগে সাসানি বাদশাহদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ ভাগে ইরান ও আরবদের যুদ্ধ এবং সাসানি সালতানাতের সমাপ্তি রয়েছে।

উস্তাদ আসাদী তূসী:

আসাদী তূসী সেই যুগের কবিদের উস্তাদ হিসেবে গণ্য হতেন। ফেরদৌসীও তাঁর ছাত্র ছিলেন। প্রথমে 'শাহনামা'র জন্য তাঁর নামই প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। ফেরদৌসীর শাহনামা যখন সমাপ্তির পর্যায়ে ছিল এবং ৫৬ হাজার শ্লোক সম্পন্ন হয়েছিল, তখন তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তাঁর বেঁচে থাকার কোনো আশা ছিল না। আসাদী তূসী আরজ করলেন: "শাহনামার কাজ বাকি আছে কিন্তু তা সম্পন্ন করা কারো সাধ্যের মধ্যে নেই।" উস্তাদ আসাদী বললেন: "বৎস! চিন্তা করো না, আমি যদি বেঁচে থাকি তবে তা সম্পন্ন করে দেব।" সংক্ষেপে, উস্তাদ আসাদী শাহনামার কাজ শুরু করলেন এবং পারস্যের রাজাদের ওপর আরবদের বিজয়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করলেন। এভাবে চার হাজার শ্লোক বৃদ্ধি পেল। ফেরদৌসী তখনও জীবিত ছিলেন যখন উস্তাদ এই কাজ সম্পন্ন করে তাঁকে দেখালেন। ফেরদৌসী তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর উস্তাদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলেন এবং অনেক কৃতজ্ঞ ও ঋণী হলেন। [১]

হাসান মায়মান্দি: মৃত্যু ৪২৪ হিজরি (১০৩২ খ্রিস্টাব্দ)

হাসান মায়মান্দিও এই যুগের এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁর আসল নাম আহমদ বিন হাসান মায়মান্দি, তবে তিনি সাধারণত হাসান মায়মান্দি বা আহমদ মায়মান্দি নামে পরিচিত। তাঁর সম্পর্ক কান্দাহারের নিকটবর্তী 'মায়মান্দ' জনপদের সাথে ছিল। তাঁর পিতা আমীর সবুক্তগীনের বন্ধু এবং তাঁর যুগে বুস্ত-এর গভর্নর ছিলেন। মায়মান্দি সুলতান মাহমুদ গজনভীর বাল্যবন্ধু এবং সেই সাথে তাঁর দুধভাইও ছিলেন। ৪০১ হিজরিতে সুলতান মাহমুদ গজনভী যখন তাঁর উজির আবুল আব্বাস ইসফারায়িনী-র ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরখাস্ত করেন, তখন মায়মান্দির উন্নতির পথ খুলে যায় এবং ৪০৪ হিজরিতে তিনি সালতানাতের উজির নিযুক্ত হন। তিনি আর্থিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো সুচারুভাবে পরিচালনা করে সালতানাতের ব্যয় হ্রাস করেন এবং আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটান। নিজের যোগ্যতার কারণে তিনি দশ বছর পর্যন্ত গজনভী সালতানাতের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৪১৬ হিজরিতে কোনো কারণে সুলতান মায়মান্দির ওপর আস্থাহীন হয়ে পড়েন। ফলে তাঁকে কালিঞ্জর দুর্গে বন্দি করা হয়। সুলতানের ইন্তেকালের পর সুলতান মাসউদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি ৪২১ হিজরিতে মায়মান্দিকে মুক্তি দেন এবং পরের বছর পুনরায় উজিরের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মায়মান্দি ৪২৪ হিজরিতে হেরাতে ইন্তেকাল করেন। ফারসি সাহিত্যের বইগুলোতে মায়মান্দির অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি এবং অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা পাওয়া যায়। [২]

আবু রায়হান মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-বিরুনী: মৃত্যু ৪৪০ হিজরি (১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান মাহমুদ গজনভীর দরবারের এই মহান পণ্ডিত তাঁর গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দ' এবং 'আল-কানুন আল-মাসউদী'-র কারণে পরিচিত। তিনি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক, ভূতত্ত্ববিদ এবং ভাষাবিদ ছিলেন। [৩]

---

[১] তারিখ ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৩৬

[২] তারিখ ফেরেশতা, তারিখ বায়হাকী, তাবাকাতে নাসিরী, আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড ৭ পৃ. ৩৩৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ১৭ পৃ. ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৬-এর সারসংক্ষেপ।

[৩] আল-বিরুনীর বিস্তারিত পরিচিতি এই অধ্যায়ের শেষে "গজনভী ও ঘুরী যুগের মনিষীগণ" শিরোনামে আসছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুলতান মাহমুদ গজনভীর উত্তরসূরিগণ

সুলতান মাহমুদ গজনভীর তিন পুত্র ছিল: মাসউদ, মুহাম্মদ এবং আব্দুর রশীদ। মাসউদ সবার বড়, অধিক বুদ্ধিমান এবং সাহসী ছিল, এজন্য সুলতান মাহমুদ প্রথমে তাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে মুহাম্মদকে উত্তরসূরি নিযুক্ত করেন।

সুলতানের এই দুই পুত্র একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে মাসউদ কয়েক ঘণ্টার বড় ছিল। যাই হোক, মুহাম্মদ নিজেকে তার সমানই মনে করত এবং এজন্য কখনো তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা আনুগত্য করত না।

সুলতান এই দুজনের সম্ভাব্য বিবাদ এড়ানোর জন্য মৃত্যুর পূর্বে নিজের সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি খাওয়ারিজম, ইরাক এবং ইরানের অঞ্চল বড় ছেলে মাসউদকে এবং গজনী, পাঞ্জাব ও খোরাসানের অঞ্চল মেজ ছেলে মুহাম্মদের নামে করে দিয়েছিলেন যাতে দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো মতবিরোধ না হয়। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৪০, ১৪১; তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৪, পৃ. ৪৯৭, দারুল ফিকর সংস্করণ।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান মুহাম্মদ বিন মাহমুদ গজনভি

৪২১ হিজরি (১০৩০ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান মাহমুদ গজনভির মৃত্যুর সময় শাহজাদা মুহাম্মদ বলখে ছিলেন। উজিরগণ তাকে সুলতানের মৃত্যুর সংবাদ দিলে তিনি গজনভি চলে আসেন এবং সুলতানের অসিয়ত অনুযায়ী সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহজাদা মাসউদ, যিনি সেই সময় ইসফাহানে ছিলেন, বড় হওয়ার কারণে গজনভিকে নিজের অধিকার মনে করতেন, ফলে তিনি ভাইয়ের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হন। প্রথমে তিনি রে, নিশাপুর এবং তাবারিস্তান দখল করেন এবং এরপর গজনভির দিকে মনোনিবেশ করেন। গজনভিতে সেনাবাহিনীর অধিকাংশ আমির তার সমর্থক ছিল, তাই সুলতান মুহাম্মদ নিরুপায় হয়ে পড়েন। শাওয়াল ৪২১ হিজরিতে সেনাবাহিনীর আমিরগণ তাকে গ্রেফতার করে মাসউদের হাতে তুলে দেন। মাসউদ তাকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তার শাসনকাল ৫০ দিনেরও কম ছিল। [১]

---

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫০০, প্রকাশনা: দারুল ফিকর; তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৪০ থেকে ১৪২; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৩১

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান মাসউদ বিন মাহমুদ গজনভি

৪২১ হিজরি থেকে ৪৩২ হিজরি

(১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৪১ খ্রিষ্টাব্দ)

শাহজাদা মুহাম্মদের গ্রেপ্তারের পর সুলতান মাসউদ জিলকদ ৪২১ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন যোদ্ধা সৈনিক ছিলেন। মিনহাজুস সিরাজ বলেন যে, তিনি এবং তাঁর ভাই মুহাম্মদ যমজ ছিলেন। মাসউদ অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। তাঁর গদার ওজন এত বেশি ছিল যে অন্য কেউ তা তুলতে পারত না এবং তাঁর ধনুক এত শক্ত ছিল যে অন্য কেউ তা টানতে পারত না। [১]

সুলতান মাসউদ ন্যায়বিচার ও দয়ার প্রবক্তা ছিলেন। সুলতান মাহমুদ গজনভি তাঁর যোগ্য উজির আহমদ বিন হাসান মায়মান্দিকে বন্দি করেছিলেন। সুলতান মাসউদ তাঁকে মুক্ত করে দেন এবং পুনরায় নিজের উজির নিযুক্ত করেন। [২]

খুজদার, মাকরান এবং সরসুতি বিজয়:

সুলতান মাসউদ সালতানাতের সীমানা বৃদ্ধি করতে গিয়ে অনেক এলাকা জয় করেন। সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বছর ৪২২ হিজরিতে বেলুচিস্তানে সামরিক অভিযান চালানো হয় এবং কেচ (খুজদার) ও মাকরান পদানত করা হয়। [৩]

৪২৫ হিজরিতে সুলতান নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের সরসুতি শহর পর্যন্ত যান। যার দুর্গ ছিল অত্যন্ত মজবুত। সুলতান মাহমুদ গজনভিও এটি জয় করতে সফল হননি। সুলতান মাসউদ এটি এমন কঠোরভাবে অবরোধ করেন যে রাজা বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়ে সন্ধি করতে রাজি হন। কিন্তু সন্ধির আলোচনা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই শহরে বসবাসরত কিছু মুসলিম ব্যবসায়ী সুলতানকে একটি পত্র লিখে এই সত্য জানান যে, রাজা সন্ধির জন্য নির্ধারিত অর্থ শহরের মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জমা করছেন। তারা পত্রে লিখেছিলেন যে, যদি মুসলিমরা আক্রমণ অব্যাহত রাখে তবে শহরটি জয় করা সম্ভব। এই পত্র তীরের...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৩২; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৩২, ১৩৩

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৩২, ১৩৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৭ খণ্ড, পৃ. ৪৯৪, ৪৯৬, ৪৯৭

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৩৪

সাথে বেঁধে সুলতানের তাঁবুতে ফেলে দেওয়া হলো।

ফলে সুলতান চূড়ান্ত হামলার নির্দেশ দিলেন। শহরের বাইরে পরিখা অনেক প্রশস্ত ছিল। সুলতানের নির্দেশে চারপাশের আখের ক্ষেত কেটে পরিখা ভরাট করা হলো। এভাবে হামলা করে শহর জয় করা হলো। সুলতান মুসলমানদের কাছ থেকে জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া অর্থ রাজার কাছ থেকে আদায় করে ব্যবসায়ীদের ফেরত দিলেন। এতে সুলতান অনেক দোয়া পেলেন। [১]

সুলতান ও জাদুকরনি:

সুলতান সরসতি দুর্গ জয় করে নক্সি দুর্গের অবরোধ করলেন, যা ছিল অত্যন্ত উঁচু ও সুদৃঢ় দুর্গ। সুলতান এর উচ্চতা দেখে ভাবছিলেন কীভাবে এটি জয় করা যায়। একদিন ওই দুর্গ থেকে এক জাদুকরনি বের হলো। সে হিন্দি ভাষায় কিছু পড়ে একটি ঝাড়ুতে ফুঁ দিল, তারপর ঝাড়ুটিকে ভিজিয়ে তার পানি মুসলমানদের বাহিনীর দিকে ছিটিয়ে দিল। এর পর সুলতানের মাথায় এমন ব্যথা শুরু হলো যে তিনি চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়লেন। ফলে দুর্গের অবরোধ ত্যাগ করে পিছু হটতে হলো। এর কিছুক্ষণ পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। [২]

তুর্কানে গুজের সাথে যুদ্ধ - জুরজান ও তবরস্তান দখল:

সুলতানকে হিন্দুস্তানের অভিযান থেকে দ্রুত ফিরে যেতে হলো কারণ খোরাসানে তুর্কানে গুজ নামক গোত্র বিদ্রোহ করেছিল। তুর্কানে গুজদের শিক্ষা দিয়ে সুলতান আরও অগ্রসর হয়ে জুরজান ও তবরস্তানও জয় করে নিলেন। [৩]

হাসি ও সোনপত বিজয়:

৪২৯ হিজরিতে সুলতান মাসউদ হিন্দুস্তানে সৈন্য পরিচালনা করে প্রথমে হাসি দুর্গ অবরোধ করেন, যা এর আগে কোনো মুসলিম বিজেতা জয় করতে পারেননি। সুলতান দশ দিন পর তা জয় করেন। [৪]

এরপর সোনপতকেও পদানত করতে সক্ষম হন। এই বিজয়াভিযানগুলোর পর তিনি তাঁর পুত্র শাহজাদা মাজদুদকে লাহোরের গভর্নর বানিয়ে গজনি চলে যান। [৫]

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৫।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৫।

ব্যাখ্যা: ইবনে আসির এই দুর্গের নাম 'নক্সি' লিখেছেন। আমি এই নামের কোনো দুর্গের হদিস পাইনি। আমার ধারণা এটি সম্ভবত 'হাসি'; যার অর্থ সরসতি (সরসা) থেকে ১১৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। এর দুর্গটি অজেয় বলা হতো, যা নিজের মজবুতীর জন্য অতুলনীয় ছিল, এর প্রাচীর ৫২ ফুট উঁচু এবং ৩২ ফুট চওড়া ছিল। এর অধীনে প্রায় ৮০টি ছোট দুর্গ ছিল। সুলতান দুই বছর পর পুনরায় অবরোধ করে এটি জয় করেছিলেন।

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৫।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫০... যদি সুলতান ৪২৫ হিজরির হামলায় জাদুকরনিওয়ালা দুর্গ 'নক্সি' জয় করে থাকেন, তবে সম্ভব যে এবার সুলতান জাদুর প্রভাব কাটানোর জন্য আমিলদের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫০।

আহমদ নিয়াল তগিনের বিদ্রোহ:

একদিকে সুলতান বিজয় লাভ করছিলেন কিন্তু অন্যদিকে সুলতানের অনুপস্থিতিতে হিন্দুস্তানে এক ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং সেখানে পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর আহমদ নিয়াল তগিন বিদ্রোহ করল।

আসলে সুলতান মাসউদ অনেক গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার পিতার মতো রাজনীতি সচেতন ছিলেন না। গজনভী সেনাবাহিনীতে অনেক হিন্দু সর্দার এবং অনেক হিন্দুস্তানি সৈন্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা তোষামোদির মাধ্যমে সুলতান মাসউদের আস্থা অর্জন করেছিল এবং তাকে ধীরে ধীরে তুর্কিদের থেকে বিমুখ করে তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

এটি দেখে তুর্কি আমীররা সুলতানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং পাঞ্জাবের তুর্কি সুবেদার আহমদ নিয়াল তগিন বিদ্রোহ করেন।

সুলতান তার মোকাবিলার জন্য একজন হিন্দু সর্দার "নাথ" কে সৈন্যদল দিয়ে পাঠালেন কিন্তু সে পরাজিত হলো।

তখন সুলতান দ্বিতীয় বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে তিলক রায় নামক এক হিন্দুকে নিযুক্ত করে পাঠালেন। অর্থাৎ তুর্কিদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানিদের ব্যবহার করলেন। তিলক রায় অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আহমদ নিয়াল তগিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং সে মনসুরা, ঠাট্টা এবং সিন্ধুর অভ্যন্তরের দিকে পালিয়ে গেল। তিলক রায় পলাতক সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলেন। যে সৈন্যই তার হাতে আসত, তিনি তার কান ও নাক কেটে দিতেন। যদিও এভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল কিন্তু তুর্কি সৈন্য ও কর্মকর্তাদের অনুভূতিতে চরম আঘাত লেগেছিল। [১]

সেলজুকদের আক্রমণ:

এই পরিস্থিতি তুর্কিদের সুলতানের প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ করে তুলল যার ফলে সালতানাত অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হতে শুরু করল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে খোরাসানে সেলজুক আমীররা শক্তি সঞ্চয় করল এবং সুলতান মাসউদের অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণ করে বেশ কিছু জেলা ছিনিয়ে নিল। [২]

সেলজুকদের কাছে শোচনীয় পরাজয় এবং লাহোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত:

সুলতান মাসউদ ৪৩২ হিজরি (১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সেলজুকদের নির্মূল করার জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মার্ভের ময়দানে তাদের মুখোমুখি হন কিন্তু ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা ছিল। এখানেও গজনভী বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং সুলতান অত্যন্ত কষ্টে মুষ্টিমেয় কিছু লোক নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হন। [৩]

এই পরাজয়ের পর সুলতান মাসউদ এতটাই বিমর্ষ হয়ে পড়েন যে তিনি অবিলম্বে লাহোর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যাতে শীতকাল সেখানে কাটিয়ে হিন্দুস্তানি সৈন্য সংগ্রহ করে বসন্তকালে সেলজুকদের মোকাবিলার জন্য ফিরে আসা যায়। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ১৩৯।

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৩২, ২৩৩; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ১৫১ থেকে ১৫৩।

[৩] (তারিখ-ই-বাইহাকি: পৃ. ৫৮৭ থেকে ৭০০) এই যুদ্ধগুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা চতুর্থ খণ্ড দেখুন।

[৪] রওজাতুস সাফা আরবি: খণ্ড ৪, পৃ. ১৬৩, ১৬৪, দারুল মাআরিফ বৈরুত; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান আজাদ বিলগ্রামি: পৃ. ৩২৬, ৩২৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা: পৃ. ১০৬।

হিন্দুস্তান সফর, উজিরের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান:

হিন্দুস্তানি উপদেষ্টারা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলেন, পক্ষান্তরে গজনির আমিরগণ তাকে নিরুৎসাহিত করার এবং বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুলতান মাসউদ তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করেন এবং পুরো পরিবারসহ গজনির সমস্ত ধন-সম্পদ ও ভাণ্ডার নিয়ে সফরের প্রস্তুতি নেন। শত শত উট ও হাতির পিঠে ধন-সম্পদ বোঝাই করা হলো এবং লাহোর অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। শাহজাদা মওদুদকে বলখের আমির নিযুক্ত করা হলো। শাহজাদা মাজদুদ, যিনি ওই দিনগুলোতে লাহোর থেকে এসেছিলেন, তাকে একটি লস্কর দিয়ে মুলতানের প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং সাথে সাথে উজিরকে লিখলেন: “তুমি পেশোয়ারে চলে এসো। আমরা শীতকাল মারগালাতে কাটাব।”

উজির সালতানাতের এই পরিকল্পনা বুঝতে পারলেন এবং সমস্ত লৌকিকতা পরিহার করে পরিষ্কার জবাব লিখে পাঠালেন: “হুজুর যদি এই দিকে তশরিফ আনেন, তবে পেছনে শত্রু মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মানুষের অন্তর আমাদের দিক থেকে এমনভাবে বিমুখ হয়ে গেছে যে তারা আমাদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত। যাই হোক, হুজুর যদি আমাদের মতো গোলামদের হুকুম দেন, তবে হিন্দুস্তানে শত্রুদের সাথে লড়াই করার জন্য আমরাই যথেষ্ট। হুজুরের তশরিফ আনার প্রয়োজন নেই। শীতকাল গজনিতে অতিবাহিত করুন। এখানে চিন্তার কোনো কারণ নেই। হুজুর যদি পরিবার-পরিজন, হারাম, খাদেম ও ধন-সম্পদ নিয়ে এই দিকে আসেন এবং বন্ধু ও শত্রুরা এর খবর পেয়ে যায়, তবে রাজবংশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। হিন্দুস্তানিদের ওপর এতটুকু আস্থা রাখা যায় না যে পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ তাদের ভূমিতে নিয়ে আসা হবে। আমি হিন্দুস্তানিদের আনুগত্যের ওপর মোটেও আস্থা রাখি না। যেসব গোলামের জিম্মায় ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে, তারা হয়তো সেই ধন-সম্পদ জঙ্গল ও বিজন প্রান্তরে নিয়ে যাবে; জঙ্গলে তারা ধন-সম্পদ লুট করবে না—এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। খোদা না করুন, হুজুর যদি হিন্দুস্তান রওনা হন, তবে প্রজাদের মনোবল ভেঙে যাবে। এই গোলাম নসিহত করেছে এবং হুজুরের কৃতজ্ঞতার হক আদায় করার চেষ্টা করেছে। বাকি হুজুরের ইচ্ছা।”

সুলতান মাসউদ উজিরের নসিহতকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিলেন না। তার ধারণা ছিল যে, গজনিতে সেলজুকদের মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা সম্ভব নয়, তাই হিন্দুস্তানে গিয়ে এমন একটি লস্কর তৈরি করা যাবে যা সেলজুকদের নির্মূল করার জন্য যথেষ্ট হবে। তাই তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন: “উজির ভীত হয়ে পড়েছে। তাকে লিখে দাও যে আমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই সঠিক কৌশল।” [১]

সিন্ধু নদের তীরে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ:

মোদ্দাকথা, সুলতান মাসউদ রাজধানী ও এর আশপাশের প্রদেশের শাসনভার সালতানাতের আমিরদের হাতে সোপর্দ করে লাহোর অভিমুখে রওনা হলেন। যাওয়ার সময় তিনি সতর্কতা হিসেবে তার অন্ধ ভাই শাহজাদা মুহাম্মদ (সাবেক সুলতান) এবং তার তিন ছেলে: আহমদ, আবদুর রহমান ও আবদুর রহিমকে নিজের সাথে হেফাজতে রাখলেন যাতে তারা পেছনে কোনো গোলযোগ সৃষ্টি করতে না পারে। উজির যা লিখেছিলেন তা-ই হলো। এই কাফেলা যখন সিন্ধু নদের তীরে পৌঁছাল, তখন প্রথমে সুলতানের খাস লোকজন, অভিজাতরা...

---

[১] তারীখে বায়হাকী: পৃ. ৩৭৬ থেকে ৩৮৭; তারীখে হিন্দুস্তান আয যাকউল্লাহ দেহলভী: খণ্ড ১, পৃ. ৩২৫।

...পরিবার-পরিজন ও রক্ষীদের সাথে নদী পার হয়ে গেলেন। বাকি সব লোক এবং রাজকীয় কোষাগার তখনও নদীর ওপারেই ছিল। এমন সময় কোষাগারের রক্ষী গোলামদের আমির আনুশ তিগিনের নিয়ত খারাপ হয়ে গেল। সে অন্যান্য আমির ও গোলামদের সাথে মিলিয়ে নিল এবং গজনির বিশাল কোষাগার লুট করে নিল। [১]

অন্ধ শাহজাদা মুহাম্মাদের সিংহাসন আরোহণ:

এরপর এই বিদ্রোহীরা অন্ধ শাহজাদা মুহাম্মাদের তাঁবুর দিকে গেল এবং তাকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসাতে লাগল। শাহজাদা মুহাম্মাদ অনেক ওজর পেশ করলেন কিন্তু বিদ্রোহীরা বলল: "আপনাকে বাদশাহ বানানোর জন্যই এই অপরাধ করা হয়েছে। এখন যদি আপনি বাদশাহি কবুল না করেন তবে আপনাকে হত্যা করে আমরা অন্য কাউকে সিংহাসনে বসিয়ে দেব।"

অবশেষে বাধ্য হয়ে অন্ধ শাহজাদাকে বাদশাহি কবুল করতে হলো কিন্তু তিনি পুরোপুরি অবাধ্য আমিরদের কব্জায় ছিলেন। ফলে তাদের কথা অনুযায়ী কয়েকদিন পর তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে সুলতান মাসউদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে পড়লেন। ওদিকে সুলতান মাসউদ নিজের পরিবার-পরিজন ও সামান্য সৈন্য নিয়ে নদীর ওপারে বিস্ময়াভিভূত অবস্থায় থেমে ছিলেন। যখন তিনি অবাধ্য আমিরদের অগ্রযাত্রার খবর পেলেন, তখন তিনি মারগালার পাহাড়ে অবস্থিত একটি সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন কিন্তু বিদ্রোহীরা শীঘ্রই এসে সরাইখানাটি ঘিরে ফেলল। [২]

সুলতান মাসউদের গ্রেফতারি ও মৃত্যু:

অবশেষে সুলতান মাসউদকে গ্রেফতার করে শাহজাদা মুহাম্মাদের সামনে আনা হলো। তিনি সুলতানকে বললেন: "আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তুমি যে জায়গায় থাকতে চাও, সেখানেই তোমাকে পরিবার-পরিজনসহ বসবাসের সুযোগ দেব।"

এভাবে সুলতান মাসউদকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সিন্ধু নদের তীরে গিরি দুর্গে নজরবন্দি করে রাখা হলো। যখন তিনি সেই দুর্গে পৌঁছালেন, তখন প্রয়োজনীয় খরচের জন্য কাছে কিছুই ছিল না। তিনি তার ভাইয়ের কাছে আবেদন পাঠালে একজন অফিসার সেখান থেকে পাঁচশ দিরহাম নিয়ে হাজির হলো। এই দিরহাম দেখে সুলতান মাসউদ অঝোরে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: "কয়েকদিন আগে আমার কাছে তিন হাজার উটের পিঠে বোঝাই করা কোষাগার ছিল।" সুলতানের এই অবস্থা দেখে সেই অফিসার নিজের পকেট থেকে আরও এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পর সুলতান মুহাম্মাদের উগ্র মেজাজি ছেলে আহমদ, পিতার অনুমতি ছাড়াই নিজ উদ্যোগে সুলতান মাসউদকে হত্যা করে ফেলল। [৩] সুলতান মাসউদের শাসনকাল ছিল নয় বছর কয়েক মাস। বয়স ছিল ৪৫ বছর। [৪]

সুলতান মাসউদের চরিত্রের কিছু উজ্জ্বল দিক:

সুলতান মাসউদ স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত সাহসী, হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন। নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের অনেক খেয়াল রাখতেন।

---

[১] রওজাতুস সাফা আরবি: পৃ. ১৬৩, ১৬৪, ত. আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ লিল কিতাব; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান আজ জাকাউল্লাহ দেহলভি: পৃ. ৩২৫, ৩২৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা: পৃ. ১০৬, ১০৭

[২] রওজাতুস সাফা আরবি: পৃ. ১৬৩, ১৬৪, ত. আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ লিল কিতাব; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান আজ জাকাউল্লাহ দেহলভি: পৃ. ৩২৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ১৫৫

[৩] রওজাতুস সাফা আরবি: পৃ. ১৬৪, ত. আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ লিল কিতাব; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান আজ জাকাউল্লাহ দেহলভি: পৃ. ৩২৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৫৫, ১৫৬

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৩৪

এবং সর্বদা তাদের ওপর সদকা ও খয়রাত করতে থাকতেন। একবার রমজান মাসের মাত্র একদিনে গরিবদের মাঝে এক লক্ষ দিরহাম খয়রাত করেছিলেন। তাঁর আমলে বিভিন্ন শহর ও জনপদে অসংখ্য মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

তিনি উলামা ও গুণীজনদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁদের সান্নিধ্য এবং সম্মান ও মর্যাদা প্রদানে অভ্যস্ত ছিলেন। আল-বিরুনী জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল এবং গণিতের ওপর 'আল-কানুন আল-মাসউদী' নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটি লিখেছিলেন যা সুলতানের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, এর জন্য সুলতান তাঁকে একটি হাতির ওজনের সমান রূপা পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন। [১]

সুলতান মাসউদের দরবারের উলামা ও গুণীজন:

•

আবুল ফজল বায়হাকী: ৩৮৫ হিজরি থেকে ৪৭০ হিজরি (৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দ): সুলতান মাসউদ গজনভীর দরবারের এই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক চিঠিপত্র বিভাগ (দিওয়ান-ই-রিসালাত)-এর প্রধান ছিলেন। তিনি একজন বাস্তববাদী ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থটি 'তারীখে বায়হাকী' নামে পরিচিত যা তিনি রোজনামচা বা ডায়েরির ঢঙে বর্ণনা করেছেন। গজনভী আমলের ইতিহাসের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

•

ফাররুখী সিস্তানী: মৃত্যু ৪২৯ হিজরি (মৃত্যু ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ): তিনি ফারসি ভাষার একজন মহান কাসিদা রচয়িতা কবি ছিলেন যিনি সিস্তানের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীতে সুলতান মাহমুদ গজনভী ও পরে সুলতান মাসউদের দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে গজনভী দরবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর কবিতায় সুলতান মাহমুদের বিজয়সমূহ, দরবারের শান-শওকত এবং বিভিন্ন অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায়। ফারসি ভাষাভাষীদের কাছে তাঁর সেই মর্যাদা রয়েছে যা আরবদের কাছে মুতানাব্বির রয়েছে।

ফাররুখীর কবিতা সাবলীলতা, প্রাঞ্জলতা এবং সুন্দর উপমা ও রূপকের জন্য সুপরিচিত। দরবারে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হতো এবং তিনি সুলতানের বিশেষ সহচরদের একজন ছিলেন। উনসুরীর দিওয়ান আজও বিদ্যমান রয়েছে, যাতে কাসিদা, গজল এবং রুবাইয়াত অন্তর্ভুক্ত আছে। তাঁর কাসিদাগুলো বিশেষভাবে তাঁর খ্যাতির কারণ হয়েছে। [২]

- আসজাদী মারওয়াজী: ৪৩২ হিজরি (১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ): মার্ভ (বর্তমান তুর্কমেনিস্তান)-এর অধিবাসী এই মহান কবি প্রথমে সুলতান মাহমুদ গজনভী এবং পরবর্তীতে সুলতান মাসউদ গজনভীর দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কালাম সাবলীলতা, প্রাঞ্জলতা এবং সুন্দর উপমা ও রূপকে সজ্জিত যা মূলত গজনভী সুলতানদের শান-শওকত এবং তাঁদের দানশীলতার প্রশংসায় রচিত। [৩]

---

[১] তারিখ ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৫৬

[২] লুবাবুল আলবাব, আওফী রচিত, নবম অধ্যায়, আলে সবুক্তগীন কবিগণ, পৃ. ৪৭ থেকে ৪৯

[৩] লুবাবুল আলবাব, আওফী রচিত, নবম অধ্যায়, আলে সবুক্তগীন কবিগণ, পৃ. ৫০ থেকে ৫২

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

সুলতান মুহাম্মদ - পুনরায়

৪৩২ হিজরি (১০৪০ খ্রিস্টাব্দ)

এখন সুলতান মুহাম্মদ পুনরায় বাদশাহ হয়েছিলেন, কিন্তু অন্ধ হওয়ার কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। তার উগ্র মেজাজি এবং উন্মাদ ছেলে শাহজাদা আহমদ সমস্ত ক্ষমতার মালিক হয়ে বসেছিলেন। অন্যদিকে পরিস্থিতি এমন ছিল যে, সালতানাতে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। পেশোয়ার, লাহোর এবং মুলতান ইত্যাদি এখন সুলতান মুহাম্মদের দখলে ছিল, কিন্তু তিনি সিন্ধু নদ পার হয়ে পুনরায় আফগানিস্তানে যেতে পারছিলেন না। কারণ গজনী, বলখ এবং খোরাসানের জেলাগুলোতে সুলতান মাসউদের সমর্থক আমিরগণ দখলদার হয়ে বসেছিলেন। মধ্য ভারতে সুলতান মাসউদের ছেলে শাহজাদা মাজদুদ সেনাবাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিলেন। [১]

শাহজাদা মওদুদ কর্তৃক সুলতান মুহাম্মদকে হুমকি:

সুলতান মুহাম্মদ তার উন্মাদ ছেলের হাতে ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অত্যন্ত শোকাহত ছিলেন। তিনি সুলতান মাসউদের ছেলে শাহজাদা মওদুদকে, যিনি বলখে অবস্থান করছিলেন, একটি ক্ষমাপত্র লিখেছিলেন যে, তোমার পিতার হত্যাকাণ্ডে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু শাহজাদা মওদুদ তা গ্রহণ করেননি এবং পিতার প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেন। তার ইচ্ছা ছিল অবিলম্বে মারগালার ওপর আক্রমণ করার যেখানে সুলতান মুহাম্মদ অবস্থান করছিলেন, কিন্তু তার উজির তাকে বাধা দেন এবং প্রথমে রাজধানীতে অবস্থানের গুরুত্ব বুঝিয়ে তাকে গজনীতে নিয়ে আসেন। [২]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৩৪; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৫৭; তারিখে ইবনে খালদুন: খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৫০৫, তবা দারে আল-ফিকর

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৩৫; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৫৭; তারিখে ইবনে খালদুন: খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৫০৫, তবা দারে আল-ফিকর

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

সুলতান মওদুদ বিন মাসউদ

৪৩২ হিজরি থেকে ৪৪১ হিজরি (১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৪৩২ হিজরি (১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ) এর শেষভাগে শাহজাদা মওদুদ বলখ থেকে গজনি পৌঁছালেন, যেখানে সালতানাতের আমিরগণ তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাকে সিংহাসনে বসালেন। অন্যদিকে অন্ধ সুলতান মুহাম্মদকে তার আমিরগণ প্ররোচিত করল যে তিনি যেন অগ্রসর হয়ে গজনি দখল করে নেন। ফলে তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সিন্ধু নদ পার হয়ে গজনির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

সুলতান মুহাম্মদ সপরিবারে নিহত:

এদিকে মওদুদও বাহিনী প্রস্তুত করে যাত্রা করলেন। এক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো যাতে সুলতান মুহাম্মদের বাহিনী পরাজিত হলো। তিনি তার পুত্রদের: আহমদ, আব্দুর রহমান, আব্দুর রহিম এবং অন্যান্য আমিরদের সাথে বন্দি হলেন। আব্দুর রহিম ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করা হলো [১]।

নেকি কাজে আসল:

আব্দুর রহিমকে এজন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে, যখন সুলতান মাসউদ বন্দি ছিলেন, তখন একদিন তিনি তার ভাই আব্দুর রহমানের সাথে চাচাকে দেখতে কারাগারে গিয়েছিলেন। সেই সময় আব্দুর রহমান উপহাসচ্ছলে চাচার মাথা থেকে টুপি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আব্দুর রহিম টুপিটি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পুনরায় চাচার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং আব্দুর রহমানকে এই অভদ্রতার জন্য খুব বকাঝকা ও গালিগালাজ করেছিলেন। শাহজাদা মওদুদ তার পিতার সাথে আব্দুর রহিমের এই সদাচরণের কথা জানতেন, তাই তাকে মুক্তি দিলেন [২]।

মওদুদ-এর লাহোরের দিকে সৈন্য চালনা:

মওদুদ এখন গজনভি সালতানাতের বাদশাহ ছিলেন। তিনি যদি ধৈর্য, সমঝোতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করতেন তবে গজনভি সালতানাত আবারও শক্তিশালী হতে পারত। কিন্তু তিনি শীঘ্রই তার ভাই শাহজাদা মজদুদ-এর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরলেন, যিনি হিন্দুস্তানের সুবেদার ছিলেন এবং

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৭, ১৫৮।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৮।

বিজয় অভিযান চালাতে চালাতে সে দিল্লির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। লাহোরের সুবাদার আয়াজ [১] তার সমর্থক ছিলেন এবং এই কারণে তার শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুলতান মওদুদ তার বিজয় অভিযানে শঙ্কিত হলেন যে, সে হয়তো হিন্দুস্তানের স্বাধীন শাসক হয়ে গজনির দিকে অগ্রসর হবে। ফলে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে লাহোরের দিকে রওয়ানা হলেন। [২]

শাহজাদা মাজদুদের মৃত্যু:

শাহজাদা মাজদুদ দিল্লির উপকণ্ঠে সংবাদ পেলেন যে, তার ভাই সুলতান মওদুদ তার বিরুদ্ধে লাহোরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ফলে তিনি দিল্লি থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ৬ জিলহজ ৪৩৩ হিজরিতে লাহোর পৌঁছে তিনি মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করেন। শীঘ্রই সুলতান মওদুদের বাহিনীও পৌঁছে যায়, কিন্তু শাহজাদা মাজদুদের বাহিনী এতটাই সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ছিল যে সুলতান মওদুদের বাহিনীর মধ্যে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা এমন ছিল যে সেনাবাহিনীর আমিররা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতেন, কিন্তু ঈদুল আজহার কারণে যুদ্ধ স্থগিত হয়ে যায় এবং ঠিক ১০ জিলহজ সকালে শাহজাদা মাজদুদকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ স্পষ্ট করতে পারেননি যে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল নাকি হত্যাকাণ্ড। [৩]

লাহোরে হিন্দুদের আক্রমণ এবং মুসলমানদের জোরালো প্রতিরোধ:

মাজদুদের মৃত্যু সুলতান মওদুদকে গজনি সালতানাতের একচ্ছত্র অধিপতি বানিয়ে দেয়। তবে গজনি বংশে চলমান দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ হিন্দুস্তানের রাজাদের নির্ভীক করে তুলেছিল, ফলে তারা ৪৩৫ হিজরিতে (১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) গজনি সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ শহর: হাসি, থানেশ্বর এবং নগরকোট পুনরায় দখল করে নেয়। নগরকোট হিন্দুদের কাছে পবিত্র শহর হিসেবে গণ্য হতো। তারা এখানে পুনরায় মন্দির নির্মাণ করে এবং মূর্তিপূজা শুরু করে। এরপর তারা লাহোরের দিকে অগ্রসর হয়। পাঞ্জাবে তখন গজনি সালতানাতের দুর্বলতার কারণে মুসলিম আমিরদের ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু যখন হিন্দু বাহিনীকে এই দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেল, তখন মুসলমানরা গাফলতের ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল এবং পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান মওদুদের নামে খুতবা জারি করে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়ল। এটি দেখে হিন্দুরা যুদ্ধ না করেই ফিরে গেল।

মওদুদের আমলে সেলজুক তুর্কিদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তারা খোরাসান ও পারস্যের সমস্ত এলাকা গজনি সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। [৪]

মওদুদের মৃত্যু:

২৪ রজব ৪৪১ হিজরিতে সুলতান মওদুদ ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৩৯ বছর। তিনি ৯ বছর শাসন করেন। সুলতান মাহমুদ গজনভির মহান...

---

[১] আয়াজ সুলতান মাহমুদ গজনভির বিশেষ গোলাম ও খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সুলতান মাহমুদের আমলে লাহোরের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন নাকি সুলতান মাসউদের আমলে, সে বিষয়ে আমি কোনো নির্ভরযোগ্য প্রাচীন উদ্ধৃতি পাইনি। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে সুলতান মাহমুদের পরেও তিনি উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। বলা হয় যে তিনি সুলতান মাসউদের পুত্র শাহজাদা মাজদুদের আতালিক ছিলেন। আবুল ফিদার বর্ণনা অনুযায়ী ৪৩৯ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৮, ১৫৯।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৮, ১৫৯।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৫৯ থেকে ১৬৩। সেলজুক ও গজনি সুলতানদের মধ্যকার এই যুদ্ধগুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য তারিখ উম্মতে মুসলিমা চতুর্থ খণ্ড দেখুন।

বিশাল সাম্রাজ্য তার নাতির আমলে সংকুচিত হয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। [১]

মাসউদ বিন মওদুদ (মাসউদ সানি)

সুলতান মওদুদের মৃত্যুর পর তার বিশেষ সহচর আলী বিন রবি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাদশাহর চার বছর বয়সী ছেলে মাসউদকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু অপর এক শীর্ষস্থানীয় আমির বাশ তিগিন তা মেনে নেননি এবং অন্যান্য আমিরদের সমর্থনে ছয় দিন পর এই শিশুকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেন এবং তার চাচা আবুল হাসান আলী (বিন মাসউদ বিন মাহমুদ গজনভি)-কে রাজমুকুট পরিয়ে দেন। [২]

সুলতান আবুল হাসান আলী বিন মাসউদ, বাহাউদ্দৌলা

৪৪১ হিজরি (১০৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

১লা শাবান ৪৪১ হিজরিতে আবুল হাসান আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। [৩]

তিনি একজন কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেন এবং সবার সাথে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করেন। কিন্তু গজনভি সাম্রাজ্যের কিছু শীর্ষস্থানীয় আমির, যাদের মধ্যে মায়মান্দি [৪] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তার সিংহাসন আরোহণ মেনে নেননি।

মায়মান্দি খাজা আবুল ফজল এবং সাম্রাজ্যের আরও কয়েকজন আমিরকে সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, সুলতান মাহমুদ গজনভির কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুর রশিদকে সিংহাসনে বসানো হবে। আব্দুর রশিদ সুলতান মওদুদের সময় থেকে বুস্ত ও আসফারাইনের মধ্যবর্তী একটি দুর্গে বন্দী ছিলেন। মায়মান্দি ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারী আমিররা মিলে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং তাকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে তার চারপাশে একটি বিশাল সেনাবাহিনী সমবেত হয়।

যখন এই বাহিনী গজনির দিকে রওনা হলো, তখন সুলতান আবুল হাসান আলী ঘাবড়ে গেলেন এবং কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই গজনি ত্যাগ করলেন। এভাবে আব্দুর রশিদের বাহিনী সহজেই গজনি দখল করে নেয়। আবুল হাসান আলীকে একটি দুর্গে বন্দী করা হয়। [৫]

আবুল হাসান আলীর শাসনকাল ছিল মাত্র দুই মাস। (অর্থাৎ ১লা শাবান থেকে রমজানের শেষভাগ বা ৪৪১ হিজরির শাওয়ালের শুরু পর্যন্ত।) [৬]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৬৫; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৩৫, ২৩৪।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৬৬, ১৬৫।

[৩] ২৪শে রজব ৪৪১ হিজরিতে সুলতান মওদুদের মৃত্যু হয়। এরপর ছয় দিন মাসউদ সানির শাসনকাল ছিল। সেই হিসেবে আলীর সিংহাসন আরোহণের তারিখ এটাই হয়।

[৪] এখানে মায়মান্দি বলতে আহমদ বিন হাসান মায়মান্দি (মৃ. ৪২৪ হি.)-কে বোঝানো হয়নি, বরং তার পুত্র আব্দুর রাজ্জাক বিন আহমদ বিন হাসান মায়মান্দিকে বোঝানো হয়েছে।

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৬৭, ১৬৬।

[৬] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৩৫।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

সুলতান আবদুর রশীদ বিন মাহমুদ

৪৪১ হিজরি থেকে ৪৪৪ হিজরি

(১০৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৫২ খ্রিস্টাব্দ)

আবদুর রশীদ বিন মাহমুদ গজনভি ৪৪১ হিজরির রমজান মাসের শেষ দিকে (ফেব্রুয়ারি ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। সালতানাতের আমিরগণ তার ব্যাপারে একমত হন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ও গম্ভীর যুবক ছিলেন, তবে সাহসিকতা ও হিম্মতের দিক থেকে কিছুটা কম ছিলেন। [১]

ফেরেশতা বলেন যে, আবদুর রশীদের বংশপরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে অগ্রগণ্য মত হলো তিনি সুলতান মাহমুদের পুত্র ছিলেন। [২]

নগরকোট পুনরুদ্ধার:

তার সিংহাসনে আরোহণের পর গজনির দরবারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে হারানো শহরগুলো ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ফলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং তোশ তগিন কারখিকে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে লাহোরের দিকে পাঠানো হয়, যেখান থেকে তিনি নগরকোটের দিকে অগ্রসর হন এবং ছয় দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তা জয় করেন। এভাবে গজনভি সালতানাত তার মর্যাদা কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করে। [৩]

সেলজুকদের সাথে যুদ্ধ এবং তুঘরিলের কীর্তিসমূহ:

এই সময়ে সেলজুকরা খোরাসানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং এখন তারা গজনভি সালতানাতকে পরাজিত করতে চাচ্ছিল। ফলে তাদের সর্দার চাগরি বেগ (দাউদ) এবং তার পুত্র আল্প আরসালান দুটি ভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ শুরু করেন। আল্প আরসালান তাখারস্তান (উত্তর আফগানিস্তান)-এর দিকে অগ্রসর হন এবং চাগরি বেগ সিস্তান (দক্ষিণ আফগানিস্তান)-এর দিকে এগোতে থাকেন।

আবদুর রশীদ সেলজুকদের সাথে যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত দক্ষ সেনাপতি তুঘরিলকে নির্বাচন করেন। তিনি সাবেক সুলতান মওদুদের ভগ্নিপতি ছিলেন।

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৩৫...

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৬৭

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৬৭; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৩৪

অর্থাৎ মওদুদ-এর বোন (সুলতান মাসউদ-এর কন্যা) তার স্ত্রী ছিলেন, এই কারণে তিনি সুলতান মওদুদ-এর যুগে দরবারের হাজিব ছিলেন।

তুঘরিল-এর আদি নিবাস ছিল গজনি, তবে তিনি দীর্ঘ সময় সেলজুকদের সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন এবং তাদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন।

সুলতান আবদুর রশিদ সিংহাসনে আরোহণ করলে তুঘরিল আবেদন করে সুলতানের কাছ থেকে সিস্তানের প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। ফলে তাকেই আল্প আরসালানকে প্রতিহত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

তিনি 'দাররা-ই খুমারা' [১]-তে আল্প আরসালানের মোকাবিলা করেন এবং তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। এরপর তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তার পিতা দাউদকে মোকাবিলা করতে রওনা হন, যিনি সিস্তানে প্রবেশ করে বুস্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। তুঘরিল-এর আগমনে তিনিও পিছু হটেন, কিন্তু তুঘরিল পিছু ধাওয়া করে তার ভাই 'বেগুর'কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। [২]

তুঘরিল-এর বিদ্রোহ:

এই বিজয়গুলো তুঘরিলকে অনেক সম্মান এনে দিয়েছিল। এছাড়া সিস্তানে এখন একটি বিশাল বাহিনী তার অনুগত ছিল। নিজের অবস্থান এত উচ্চ দেখে তার নিয়ত বদলে যায় এবং তিনি গজনি দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। শীঘ্রই তিনি একটি বাহিনী নিয়ে গজনির দিকে অগ্রসর হন। [৩]

সুলতান আবদুর রশিদ-এর করুণ পরিণতি:

সুলতান আবদুর রশিদ যদি দৃঢ় থাকতেন, তবে তুঘরিল-এর তাকে পরাভূত করার মতো সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু সুলতান সাহসিকতার অভাব দেখান এবং দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অবশেষে তুঘরিল দুর্গ জয় করে নেন এবং ২৯ রমজান ৪৪৩ হিজরিতে সুলতান আবদুর রশিদকে তার পরিবারের অন্য '৯' জন সদস্যসহ হত্যা করান। সুলতান আবদুর রশিদ-এর শাসনকাল ছিল দুই বছর। বয়স ছিল ত্রিশ বছর। [৪]

---

[১] দাররা-ই খুমারা বলতে সম্ভবত পুল-ই খুমরি বোঝানো হয়েছে, যা মধ্য আফগানিস্তানকে উত্তর আফগানিস্তানের সাথে সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ।

[২] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ২৩৫, ২৩৬.....

[৩] তারিখ-ই ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৬৭

[৪] তারিখ-ই ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৬৭, ১৬৮; তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ২৩৫, ২৩৬

দ্রষ্টব্য: যদিও মিনহাজ আবদুর রশিদ-এর শাসনকাল আড়াই বছর (দুই ও অর্ধেক বছর) উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি নিজেই তুঘরিল-এর শাসনের চল্লিশ দিন এবং এরপর ফররুখ জাদ-এর সিংহাসনে আরোহণের তারিখ ৯ জিলকদ ৪৪৩ হিজরি উল্লেখ করেছেন। এই হিসাব অনুযায়ী আবদুর রশিদ-এর শাসনকাল মাত্র দুই বছর হয় এবং তার হত্যার তারিখ ২৯ রমজান হয়। যদিও এটি কোথাও উল্লেখ নেই।

তুঘরিল

(চল্লিশ দিনের বিদ্রোহী শাসন)

তুঘরিল গজনীতে সিংহাসন আরোহণ করল। কিছুকাল আগে সেলজুকদের ওপর বিজয়ের কারণে সে অনেক সম্মান পেয়েছিল, কিন্তু সুলতান আবদুর রশীদের মতো একজন শরীফ মানুষকে হত্যা করে সে নিজের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। এ কারণে সবাই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং তার নাম "তুঘরিল নিমক হারাম" হয়ে যায়। একদিন তুঘরিলকে জিজ্ঞেস করা হলো: "তুমি কেন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলে?" সে বলতে লাগল: "যখন সুলতান আবদুর রশীদ আল্প আরসালানের সাথে মোকাবিলার জন্য আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় মুসাফাহা করছিলেন, তখন তার কণ্ঠের কম্পন তার হাড় থেকে উঠে আসছিল। আমি বুঝে গেলাম যে তিনি প্রাণের ভয়ে কাঁপছেন। আমি ভাবলাম এমন ভীরু লোক সালতানাতের যোগ্য নয়। তাই আমার ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগল।" [১]

তোশ তিগিন কারখির চিঠি এবং তুঘরিলের পতন:

দূর-দূরান্তের অধিকাংশ শহরের আমিররা তুঘরিলের বাদশাহত মেনে নেয়নি। তুঘরিল তার এই দুর্বল দিকটি সংশোধনের চেষ্টা শুরু করল এবং সালতানাতের আমিরদের কাছে চিঠি লিখে তাদের নিজের দিকে টানার চেষ্টা করতে লাগল। যখন এই ধরনের একটি চিঠি পেশোয়ারের সুবাদার তোশ তিগিন কারখির কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি ফিরতি বার্তা পাঠিয়ে তুঘরিলকে খুব তিরস্কার ও অভিশাপ দিলেন। এরপর তিনি সুলতান মাসউদের কন্যাকে (তুঘরিলের স্ত্রী) একটি চিঠি লিখলেন এবং তাকেও প্ররোচিত করলেন যাতে তিনি গজনভী বংশের বিনাশে উদ্যত তার স্বামীকে লাগাম পরান। একইভাবে সালতানাতের অন্যান্য আমিরদের কাছে চিঠি লিখে তাদেরও লজ্জা দিলেন। এই চিঠিগুলো পড়ে সমস্ত গজনভী আমিরদের আত্মমর্যাদা জেগে উঠল।

অবশেষে দরবারীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তুঘরিলকে সরানোর প্রস্তুতি নিল এবং একদিন প্রকাশ্য দরবারে তাকে হত্যা করল। তার মাথা কেটে গজনী শহরে প্রদর্শন করা হলো। তুঘরিলের শাসনকাল ছিল মাত্র চল্লিশ দিন। [২]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৩৬

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৬৮, ১৬৯; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৩৬, ২৩৭

সুলতান ফাররুখজাদ বিন মাসউদ

৪৪৪ হিজরি থেকে ৪৫০ হিজরি

(১০৫২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৫৯ খ্রিষ্টাব্দ)

এরপর সালতানাতের আমিরগণ সুলতান মাহমুদ গজনভির বংশধরদের মধ্য থেকে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁজতে শুরু করেন। অবশেষে নিম্নোক্ত তিন শাহজাদাকে পাওয়া যায়: শাহজাদা ফাররুখজাদ, শাহজাদা ইব্রাহিম শাহ, শাহজাদা শুজা। তারা বিভিন্ন প্রদেশে আত্মগোপন করে ছিলেন অথবা বন্দী ছিলেন। পরামর্শক্রমে সুলতান মাসউদের পুত্র ফাররুখজাদকে সিংহাসনে বসানো হয়। [১] এটি ৯ জিলকদ ৪৪৪ হিজরির ঘটনা। [২]

যেহেতু তুঘরিলের সরকারকে পতন ঘটাতে এবং নতুন সরকার গঠনে নুশ তগিন কারখির বড় ভূমিকা ছিল, তাই এই নতুন সুলতানের আমলে তিনি অনেক প্রতিপত্তি লাভ করেন। [৩]

বিপদগ্রস্ত কৃষকদের কর মওকুফ:

ফাররুখজাদ দানশীল ও দয়ালু শাসক ছিলেন। ঐ বছরগুলোতে জাবুলিস্তানে (জাবুল) কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, যার কারণ ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও করের বোঝা। ফাররুখজাদ এই সমস্ত কর মওকুফ করে দেন, যার ফলে মানুষ অনেক স্বস্তি পায়। [৪]

সেলজুকদের ওপর বিজয়:

ফাররুখজাদ একজন সাহসী সেনাপতি এবং দক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি সালতানাতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে এবং এর পতনোন্মুখ ইমারতকে মজবুত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, তবে তার বেশিরভাগ সময় সেলজুকদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং প্রাসাদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে কেটে যায়। প্রথম যুদ্ধে সেলজুকদের একজন সরদার দাউদ সেলজুকি সৈন্যবাহিনী নিয়ে গজনির ওপর চড়াও হন। সকাল সূর্যোদয় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৬৯

দ্রষ্টব্য: ফেরেশতা এখানে হামদুল্লাহ মুস্তাওফির একটি উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন যার মতে ফাররুখজাদ সুলতান আবদুর রশিদের পুত্র ছিলেন।

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৩৭

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৬৯

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৩৭

https://t.me/BoierSomahar

ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে, অবশেষে গজনভি বাহিনী বিজয়ী হয় এবং সেলজুকরা গজনী থেকে খোরাসানের দিকে পালিয়ে যায়। তাদের অনেক সর্দার বন্দী হয়। এই বিজয় গজনভি সালতানাতের ডুবন্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে। [১]

সেলজুকদের সাথে বন্দী বিনিময় ও সন্ধি:

কিছুকাল পর গজনভি বাহিনী সেলজুকদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য খোরাসানের দিকে অগ্রসর হয় এবং আবারও তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে দাউদ সেলজুকির সেনাপতি কলিসারক গ্রেপ্তার হয়।

দাউদ সেলজুকি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পুত্র আল্প আরসালানকে বাহিনী দিয়ে পাঠান। এই তৃতীয় যুদ্ধে সেলজুকরা বিজয়ী হয় এবং গজনভি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। সুলতান ফাররুখ জাদ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত করার জন্য পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোতে বন্দী হওয়া সেলজুক সৈন্য ও সর্দারদের কলিসারকসহ মুক্তি দেন। সেলজুকরা যখন এই সদাচরণের বহিঃপ্রকাশ দেখল, তখন তারাও বিনিময়ে গজনভি বন্দীদের মুক্তি দিল। [২]

সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সাথে একাকী মোকাবিলা:

ফাররুখ জাদ অত্যন্ত উচ্চ সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। একবার এক বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাকে হত্যার প্রস্তুতি নেয় এবং কয়েকজন গোলামকে এর জন্য প্রস্তুত করে। ফাররুখ জাদ গোসলের জন্য হামামে প্রবেশ করলে নিমকহারাম গোলামদের দলটি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফাররুখ জাদ কোনো দ্বিধা ছাড়াই তলোয়ার বের করে তাদের সাথে লড়তে শুরু করেন এবং দীর্ঘক্ষণ একাকী তাদের মোকাবিলা করেন। অবশেষে বাইরে রাজকীয় গোলামরা গোলযোগের আঁচ করতে পারে। তারা দৌড়ে ভেতরে আসে এবং সেই বিদ্রোহী গোলামদের খতম করে দেয়। [৩]

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি:

এই ঘটনার পর ফাররুখ জাদ দুনিয়ার সাজসজ্জা থেকে বিমুখ হয়ে যান এবং প্রায়ই মৃত্যুকে স্মরণ করতেন। কিছুকাল পর তিনি কোলঞ্জ রোগে আক্রান্ত হন, যা এতটাই তীব্র আকার ধারণ করে যে এর ফলে ৪৫১ হিজরি (১০৫৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে তার মৃত্যু হয়। তার শাসনের মেয়াদ ছিল ছয় বছর। বয়স ছিল ৩৪ বছর। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৬৯, ১৭০

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৭০

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৭০

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৭০; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৩৭; তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৩, পৃ. ৫০৭, ২০, দারুল ফিকর।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান ইব্রাহিম বিন মাসউদ, জহিরুদ্দৌলা

৪৫১ হিজরি থেকে ৪৯২ হিজরি

(১০৫৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)

গজনভি সালতানাত তার এক শতাব্দী পূর্ণ করতে চলেছিল এবং আগের মতো মজবুত ও বিস্তৃত ছিল না, কিন্তু এমন এক অত্যন্ত যোগ্য শাসক সিংহাসন সামলে এর জৌলুসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুলতান মাসউদের ছোট ছেলে ইব্রাহিম, যার জন্ম ৪২৪ হিজরিতে হয়েছিল। [১] (এই হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল প্রায় ২৭ বছর)।

পবিত্র কালাম লিখন:

শাসক হওয়ার পর তার আসল যোগ্যতা প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন একজন ইবাদতকারী, পরহেজগার এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। সেই সাথে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ ক্যালিগ্রাফার এবং প্রতি বছর নিজ হাতে পবিত্র কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি লিখে হারামাইন শরিফাইনে পাঠাতেন। [২]

রাজনৈতিক কৌশলে মালিক শাহ সেলজুকিকে পিছু হটানো:

তার আমলে মহান সেলজুক সুলতান মালিক শাহ সেলজুকি চরম উন্নতি লাভ করেছিলেন। মালিক শাহ সেলজুকি একবার গজনভি দখল করার ইচ্ছা করে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং এই অভিযানের পথে যেহেতু তিনি শিকারের খুব শৌখিন ছিলেন, তাই গজনভি থেকে কয়েক মঞ্জিল আগেই তিনি শিকারের জন্য থেমে যান। এই সময়ে তার সৈন্যরা একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। যখন বাদশাহ তাকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন সে জানাল যে আমি সুলতান ইব্রাহিমের গুপ্তচর এবং আপনার আমিরদের নামে আমার কাছে চিঠি রয়েছে।

---

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৪০

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৭১

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ফেরেশতা এখানে লিখেছেন: “কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন যে সুলতানের নিজ হাতে লেখা কিছু কুরআনের পাণ্ডুলিপি আজও মসজিদে নববীর কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে।” (ঐ) লেখক আরজ করছেন যে, সুলতান ইব্রাহিমের যুগ থেকে ফেরেশতা (মৃত্যু ১০৩০ হিজরি মোতাবেক ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং এখন ফেরেশতার যুগ থেকে আরও চার শতাব্দী পার হয়ে গেছে। তবুও যদি কোনো সাহসী গবেষক অনুসন্ধান করেন তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আজও মসজিদে নববীর মহান পাণ্ডুলিপি ভাণ্ডারে বা বিশ্বের অন্য কোনো প্রান্তে সুলতান ইব্রাহিমের লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেতে পারে।

মালিক শাহ সেই পত্রগুলো উদ্ধার করে সেলজুক আমিরদের সামনে পাঠ করালেন। সুলতান ইব্রাহিমের সেই বার্তায় লেখা ছিল:

"আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনারা মালিক শাহকে গজনির দিকে অভিযানে রাজি করিয়েছেন। যত দ্রুত সম্ভব গজনীতে পৌঁছান যাতে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা মালিক শাহর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমি আপনাদেরকে নির্ধারিত অর্থের দ্বিগুণ পুরস্কার দেব।"

মালিক শাহ এই পত্র পাঠ করে নিজের আমিরদের ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে তদন্ত করার পর প্রমাণিত হলো যে, তার কোনো আমিরের সাথে সুলতান ইব্রাহিমের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তখন মালিক শাহ বুঝতে পারলেন যে, এটি সুলতান ইব্রাহিমের একটি চাল ছিল যাতে যুদ্ধ এড়ানো যায়। মালিক শাহ এই ঘটনা স্মরণ করে বলতেন:

"যদিও সুলতান ইব্রাহিম এই চালটি এই কারণে চেলেছিলেন যাতে যুদ্ধ না হয়, কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে সেলজুকরা বিজয়ী হবে, কিন্তু যেহেতু তিনি এই চালের মাধ্যমে আমাকে সামরিক অভিযান থেকে বিরত রেখেছেন, তাই তিনিই বিজয়ী হিসেবে গণ্য হলেন।" এরপর সুলতান ইব্রাহিম পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখে সেলজুকদের সাথে সন্ধি করে নিলেন, ফলে তার এবং মালিক শাহর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রইল। [১]

হিন্দুস্তানে বিজয়সমূহ:

সুলতান ইব্রাহিমের বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল মুসলিম সরকারগুলোর সাথে সন্ধি এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও ইসলাম প্রচারের ওপর ভিত্তি করে। ফলে তিনি হিন্দুস্তানে নতুন জিহাদি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং এমন অনেক এলাকা জয় করেন যা এর আগে মুসলমানদের নাগালের বাইরে ছিল। ৪৭২ হিজরিতে তিনি নিজে লাহোর থেকে তিনশ মাইল দূরে 'আজোধন' (পত্তন)-এর দুর্গে এক বাহিনী নিয়ে পৌঁছান এবং তা জয় করেন। সেই সময়ে পাঞ্জাবের সবচেয়ে বড় দুর্গ ছিল 'রুপাল', যা একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল। এর একপাশে একটি নদী প্রবাহিত ছিল, অন্যদিকে ছিল বিপজ্জনক প্রাণী ও বিষধর সাপে ভরা জঙ্গল যেখানে সেনাবাহিনীর অবস্থানের কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু সুলতান ইব্রাহিম সেই জঙ্গল অতিক্রম করে এই বিশাল দুর্গটিও জয় করে নেন। [২]

দররা বিজয় এবং ইসলাম প্রচার:

সুলতান ইব্রাহিম ইসলাম প্রচারের খুব অনুরাগী ছিলেন। তিনি পাহাড়ি এলাকা 'দররা'ও জয় করেন এবং এখানে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেন। [৩] যদিও সেই সময়ে খুব বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়নি, তবে এখানে ইসলামের বীজ বপন হয়ে গিয়েছিল।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩।

দ্রষ্টব্য: রুপাল দুর্গের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয় যে, এটি সতদ্রু নদীর তীরে ছিল যেখানে সেই সময়ে প্রচুর জঙ্গল ছিল। যদিও এই এলাকায় কোনো পাহাড় নেই, তবে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত দুর্গ বলতে কোনো টিলার ওপর অবস্থিত দুর্গ বোঝানো হতে পারে। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এই শব্দটি 'রুদপাল' হিসেবে উল্লেখ আছে। হতে পারে এটি 'দিপালপুর'-এর প্রাচীন নাম অথবা এর আশেপাশের কোনো শহর।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩।

দ্রষ্টব্য: দররা সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি যে এটি কোন জায়গা। ধারণা করা হয় যে, এর দ্বারা কাশ্মীরের কোনো অঞ্চল বোঝানো হয়েছে।

সুলতান ইব্রাহিমের গুণাবলি:

সুলতান ইব্রাহিম গজনভি সালতানাতকে আবারও সুসংহত করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও শৃঙ্খলায় ভরপুর। তিনি একজন দানশীল, প্রজাবৎসল এবং দয়ালু শাসক ছিলেন। তিনি উলামায়ে দ্বীনকে অত্যন্ত কদর করতেন।

সেই সময়ের বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইউসুফ সাজাওয়ান্দী (রহ.) বছরে একবার তাঁর কাছে আসতেন এবং তাঁকে নির্ভীকভাবে ওয়াজ ও নসিহত করতেন এবং দ্বিধাহীনভাবে ভুল ধরিয়ে দিতেন। সুলতান এতে কখনো অসন্তুষ্ট হতেন না, বরং তিনি সর্বদা আল্লামার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং সর্বদা হাসিমুখে তাঁর নির্দেশনাসমূহ গ্রহণ করতেন। [১]

সন্তান-সন্ততির আধিক্য:

সুলতান ইব্রাহিম ৪১ বছর শাসন করার পর ৪৯২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। সুলতান বেশ কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল অনেক। তাঁর ৩৬ জন পুত্র ছিল। অন্যদিকে তাঁর ৪০ জন কন্যা ছিল, যাদের সকলের বিবাহ সাদাত এবং জ্ঞানী-গুণী পরিবারে হয়েছিল। [২]

ধুলোয় মিশে গেল কত শান-শওকতওয়ালা
গৃহহীন হয়ে গেল কত গৃহবাসী
নামিদামি কতজন হয়ে গেল চিহ্নহীন
জমিন গিলে খেল কত আকাশসম মানুষ
দুনিয়া মন লাগানোর জায়গা নয়
এটি শিক্ষার স্থান, তামাশার নয়
(খাজা মাজজুব)

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৭১

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৩৯, ২৪০

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান মাসউদ বিন ইবরাহিম, আলাউদ্দৌলা (মাসউদ তৃতীয়)

৪৯২ হিজরি থেকে ৫০৯ হিজরি

(১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১১৫ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান ইবরাহিমের পুত্র মাসউদের জন্ম ৪৫৩ হিজরিতে হয়েছিল। সিংহাসন আরোহণের সময় তার বয়স ছিল ২৯ বছর। তাজ ও তখত সামলানোর পর তিনি পিতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ওপর আমল করেন এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হননি। তিনি সুলতান সাঞ্জর সেলজুকির বোন 'মাহ-ই-ইরাকিয়া'-কে বিবাহ করে উভয় সালতানাতের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও উন্নত ও সুদৃঢ় করেন।

তিনি পাঞ্জাবে 'হাজিব তুগা'-কে সুবাদার নিযুক্ত করে জিহাদের নির্দেশ দেন, ফলে তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে মধ্য ভারতের সেইসব কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছে যান যেখানে সুলতান মাহমুদ গজনভি ছাড়া আর কেউ পৌঁছাতে পারেনি। এই অভিযানগুলোতে প্রচুর গনিমতের মাল হস্তগত হয়।

মাসউদ বিন ইবরাহিম সতেরো বছর পর্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করে ৫০৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার শরাফত ও দানশীলতার কারণে তাকে 'আল-করিম' বলে স্মরণ করা হতো। তার পর তার পুত্র আরসালান শাহ এবং বাহরাম শাহ একে একে সিংহাসনে আসীন হন। [১]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ২৩০; তারিখে ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ১৭৫, ১৭৬।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সুলতান আরসালান শাহ বিন মাসউদ, সুলতান আদ-দৌলা

৫০৯ হিজরি থেকে ৫১১ হিজরি

(১১১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

আরসালান শাহের জন্ম ৪৭৪ হিজরিতে হয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সংকীর্ণমনা, অযোগ্য এবং নির্দয় প্রমাণিত হন। তার শাসনকাল ছিল মাত্র তিন বছর, যাতে কোনো বিশেষ বিজয় বা উন্নতি হয়নি; বরং এই তিন বছরে সালতানাত বেশ কিছু আসমানি দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। গজনি দুর্যোগের কবলে ছিল। মুষলধারে বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণে শহরের অনেক বাজার ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। [১]

আরসালান শাহের অহেতুক কঠোরতা:

আরসালান শাহ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিজের ভাইদেরও নজরবন্দি করে ফেলেন। কেবল তার এক ভাই বাহরাম শাহ পালিয়ে বাঁচেন এবং আশ্রয় নিতে সুলতান সাঞ্জার সেলজুকির কাছে খোরাসানে চলে যান। আরসালান বেশ কিছু চিঠি লিখে সুলতান সাঞ্জারের কাছে দাবি জানান যেন তিনি বাহরামকে তার হাতে তুলে দেন। কিন্তু সুলতান সাঞ্জার বাহরামকে মজলুম মনে করতেন, তাই তিনি আরসালানের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। [২]

মালিকার বুদ্ধিমত্তা এবং সুলতান সাঞ্জারের সৈন্য অভিযান:

পরিশেষে আরসালান তার মা মালিকা “মাহদে ইরাকিয়া”-কে দুই লক্ষ দিনার দিয়ে সেলজুক দরবারে পাঠান যাতে তিনি সুলতান সাঞ্জারকে রাজি করাতে পারেন। কিন্তু মালিকা নিজেই আরসালান শাহের বোকামি ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলেন। ফলে তিনি গিয়ে সুলতান সাঞ্জারকে সমস্ত পরিস্থিতি খুলে বলেন এবং আরসালান শাহের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য জোর দেন। ফলশ্রুতিতে সুলতান সাঞ্জার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হন। ওদিকে গজনি থেকে আরসালান শাহ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে শহর থেকে তিন মাইল দূরে এসে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নেন। একশ ষাটটি যুদ্ধ-হাতিও তার সাথে ছিল। সংক্ষেপে, এখানে একটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে সেলজুকরা বিজয়ী হয়।

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ২৪১; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৭৬, ১৭৭

[২] তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৭৬

হলেন এবং আরসালান শাহ সিন্ধু নদের দিকে পালিয়ে গেলেন। সুলতান সাঞ্জর বাহরাম শাহকে গজনীতে সিংহাসনে বসালেন এবং চল্লিশ দিন গজনীতে অবস্থানের পর ফিরে গেলেন। [১]

আরসালান শাহের গজনী পুনরায় দখল এবং পরিণতি:

সাঞ্জর সেলজুকি চলে যাওয়ার কিছুকাল পর আরসালান শাহ পুনরায় তার বাহিনী নিয়ে গজনী দখলের জন্য অতর্কিত হাজির হলেন। বাহরাম শাহ মোকাবিলার শক্তি হারিয়ে বামিয়ানের দুর্গে অবস্থান নিলেন। আরসালান শাহ চেয়েছিলেন বামিয়ান দুর্গ জয় করে বাহরাম শাহের অধ্যায় শেষ করে দিতে, কিন্তু ইতিমধ্যে সুলতান সাঞ্জর সেলজুকি খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসলেন। এটি দেখে আরসালান ঘাবড়ে গেলেন এবং পালিয়ে গেলেন, তবে সেলজুকি বাহিনী ধাওয়া করে তাকে গ্রেফতার করে এবং বাহরাম শাহের হাতে সোপর্দ করে দেয়, যিনি তাকে হত্যা করান। তার শাসনকাল ছিল কম-বেশি দুই বছর। [২]

মাটির সাথে মিশে গেছে কত মানুষ
কত রাজা, দরবারী আর অধিপতি
তুমি যতই শক্তি দেখাও না কেন
মৃত্যু কত বলবানকে ধরাশায়ী করেছে
দুনিয়া মন বসানোর জায়গা নয়
এটি শিক্ষা গ্রহণের স্থান, তামাশা নয়
(খাজা মাজজুব)

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৭৬, ১৭৭

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৭৭

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান বাহরাম শাহ বিন মাসউদ, মুইযযুদ্দৌলা

৫১১ হিজরি থেকে ৫৫২ হিজরি

(১১১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)

বাহরাম শাহ ছিলেন একজন সুদর্শন, দানশীল এবং প্রজাবৎসল বাদশাহ। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি গজনভি সালতানাতের সেই এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য নিজে সৈন্য পরিচালনা করেন যা সিন্ধু নদের ওপারে হিন্দুস্তানে ছিল এবং সেখানে আরসালান শাহের সুবাদার মুহাম্মদ বাহলিম তখন পর্যন্ত দখলদার ছিল। এই অভিযানের ফলে ২৭ রমজান ৫১২ হিজরিতে মুহাম্মদ বাহলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেহেতু তিনি একজন পোড়খাওয়া, অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ জেনারেল ছিলেন, তাই সুলতান বাহরাম তার সাথে নম্র আচরণ করেন এবং তাকে মুক্ত করে নিজের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করেন [১]।

সুলতান বাহরামের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ বাহলিমের বিদ্রোহ:

সুলতান বাহরাম চলে যাওয়ার পর মুহাম্মদ বাহলিম অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি কোহ-ই-শিওয়ালিক (ভেরা)-এর কাছে ‘নাগৌর দুর্গ’ নির্মাণ করেন। তার দশজন পুত্র ছিল যাদেরকে তিনি হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরের সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং এভাবে নিজের ধারণায় একটি সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু যেহেতু এই সালতানাতের ভিত্তি ছিল অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং অকৃতজ্ঞতার ওপর, তাই এটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। এই সংবাদ শোনামাত্রই সুলতান বাহরাম পুনরায় সৈন্য পরিচালনা করতে বাধ্য হন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় যার পরিণতিতে অকৃতজ্ঞ মুহাম্মদ বাহলিম পরাজিত হন। তিনি রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে একটি জলাভূমিতে গিয়ে পড়েন যা তার কবরে পরিণত হয় [২]।

ঘোরি গোত্রের সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং পুনরায় উত্তেজনা:

বাহরাম শাহকে শেষ বছরগুলোতে ঘোরের ‘সুরি’ আমিরদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় যা গজনভি সালতানাতকে নাড়িয়ে দেয়...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৪২, ২৪৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৭৮, ১৭৯।

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৪২, ২৪৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৭৯, ১৮০।

স্থানের ব্যাখ্যা: নাগৌর বলতে রাজস্থানের শহর ‘নাগৌর’ বোঝানো হয়নি, বরং এখানে কোহ-ই-শিওয়ালিক (পাঞ্জাবের পাহাড়ি এলাকা)-এর একই নামের একটি দুর্গ বোঝানো হয়েছে যা জেলা ‘ভেরা’-এর সীমানায় ছিল। এখন পর্যন্ত এই এলাকায় এই নামের কোনো দুর্গের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দিয়া। ঘোর মধ্য আফগানিস্তানের একটি পাহাড়ি এলাকা ছিল এবং সুরি সরদাররা এখানে বসবাসের কারণে 'ঘোরি' নামেও পরিচিত ছিল। এখানে 'ফিরোজ কোহ' নামক একটি পাহাড় সুরি গোত্রের সরদারদের কেন্দ্র ছিল। গজনভি এবং ঘোরিদের মধ্যে শুরুতে সুসম্পর্ক ছিল, এমনকি বাহরাম শাহ ঘোরিদের সরদার কুতুবুদ্দিনকে নিজের জামাতা বানিয়েছিলেন। বিরোধ তখন শুরু হয় যখন কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ 'ঘোর'-এর উপত্যকায় নতুন দুর্গ নির্মাণ করে স্থায়ী রাজত্বের প্রস্তুতি শুরু করেন। যখন বাহরাম শাহ এই সব জানতে পারলেন, তখন তিনি কুতুবুদ্দিনের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে গজনীতে ডেকে এনে প্রথমে বন্দি ও পরে হত্যা করালেন। [১]

সাইফুদ্দিন ঘোরির আক্রমণ:

নিহত ব্যক্তির ভাই সাইফুদ্দিন এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উপজাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং গজনীর ওপর আক্রমণ করেন। বাহরাম শাহ এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারলেন না এবং একটি রণকৌশলের অধীনে 'কুররাম' [২]-এর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, যেখানে সংকীর্ণ গিরিপথের কারণে কোনো অশ্বারোহী বাহিনীর প্রবেশ সম্ভব ছিল না। [৩]

গজনীবাসীদের পক্ষ থেকে সাইফুদ্দিনের সাথে প্রতারণা:

এদিকে সাইফুদ্দিন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং গজনীবাসীদের সাথে নম্রতা ও দয়ার আচরণ করতে থাকলেন। গজনীর লোকেরা বাহ্যিকভাবে সাইফুদ্দিনের সমর্থনের দাবি করতে লাগল যাতে তাকে ধোঁকায় রাখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের রাজার প্রতি অনুগত ছিল। অবশেষে তুষারপাতের মৌসুম চলে এল এবং 'ঘোর'-এর সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। বাহরাম শাহ এই সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি সৈন্য নিয়ে দ্রুত গজনীর দিকে অগ্রসর হলেন। সাইফুদ্দিন মোকাবিলার জন্য বের হলেন কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই গজনীর আমিররা সাইফুদ্দিনকে ঘিরে ধরে আটক করে বাহরাম শাহের হাতে তুলে দিল। তিনি সাইফুদ্দিনের মুখ কালো করে তাকে একটি রুগ্ন গরুর ওপর বসিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করালেন এবং অপমান ও লাঞ্ছনার পর তাকে হত্যা করলেন। তার মাথা সুলতান সাঞ্জারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [৪]

আলাউদ্দিন হোসেনের পক্ষ থেকে সুলতান বাহরামকে হুমকি:

এই সংবাদ যখন নিহত ব্যক্তির ভাই আলাউদ্দিন হোসেনের কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি রাগে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তিনি সুলতান বাহরামের কাছে এই বার্তা পাঠালেন: "পৃথিবীতে সর্বদা এটাই হয়ে আসছে যে এক রাজা অন্যকে পরাজিত করে এবং তারপর বন্দি বা হত্যা করে, কিন্তু তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটের সাথে যে আচরণ করেছ, তা হয়তো অন্য কোনো রাজা করেনি। সময় তোমাকে এই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ অবশ্যই দেবে এবং এই শাস্তি আমার হাতেই মিলবে।" [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৮০, ১৯৮

[২] ইতিহাসে এই স্থানের নাম 'কারমান' লেখা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এটি গজনী ও হিন্দের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। কিছুকাল আগে একে 'কুররাম এজেন্সি' বলা হতো এবং এখন কুররাম জেলা বলা হয়। এটি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের একটি এলাকা যা আফগান সীমান্তের কাছে অবস্থিত।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৮০

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৮০, ১৮১

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৮১

হাতির মোকাবিলায় খুরমিল:

এর পর আলাউদ্দিন হুসাইন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাহরাম শাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। বাহরাম শাহ গজনভি তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধংদেহী হাতি এবং এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন। একই সাথে বাহরাম শাহ আলাউদ্দিনের কাছে এই বার্তা পাঠান: "নিজের এলাকায় ফিরে যাও, নিজের পূর্বপুরুষদের জায়গির নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, অন্যথায় আমি হাতি নিয়ে আসছি।" আলাউদ্দিন হুসাইন উত্তর দিলেন: "তুমি যদি হাতি (পিল) নিয়ে আসো, তবে আমি খুরমিল নিয়ে আসছি।" (তুমি হাতি আনলে আমি খুরমিল আনছি)। খুরমিল ছিল পালোয়ানদের একটি পরিবার, যার দুই ব্যক্তি: হুসাইন খুরমিল এবং বাঞ্জি খুরমিল সেই সময়ে তাদের শক্তিতে অতুলনীয় বলে গণ্য হতেন। [১]

আলাউদ্দিন হুসাইন তাঁদের উভয়কে ডেকে নির্দেশ দিলেন যে, আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেকে একটি করে হাতি ভূপাতিত করে দেখাবে। অবশেষে "কাত্তা বাজ" নামক উপত্যকায় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। যুদ্ধ শুরু হলে হুসাইন খুরমিল এবং বাঞ্জি খুরমিল একটি করে হাতির নিচে ঢুকে পড়লেন এবং তলোয়ার দিয়ে সেগুলোর পেট চিরে ফেললেন। হুসাইন খুরমিল এই বীরত্ব দেখিয়ে নিরাপদে ফিরে এলেন, কিন্তু বাঞ্জি খুরমিল যে হাতিটিকে হত্যা করেছিলেন, সেটি তাঁর ওপরই পড়ে যায় এবং এই পালোয়ান প্রাণ হারান। [২]

ঘুরিদের অনন্য সুরক্ষামূলক পোশাক:

ঘুরিরা এই যুদ্ধে "কারওয়াহ" [৩] নামক এক অনন্য ধরনের সুরক্ষামূলক আলখাল্লা পরিধান করেছিল, যা ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি করা হতো এবং এর দুই স্তরের মাঝে তুলার অত্যন্ত পুরু স্তর থাকত, যার ওপর কোনো তলোয়ার, তীর বা বল্লম কাজ করত না।

বাহরাম শাহের পুত্রের মৃত্যু, পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ:

সাধারণ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বাহরাম শাহের পুত্র দৌলত শাহ নিজের হাতি ছুটিয়ে তাঁর বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে সামনে এগিয়ে আসেন। আলাউদ্দিন হুসাইন "কারওয়াহ-পোশ" (কারওয়াহ পরিহিতদের) ডানে ও বামে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ফলে দৌলত শাহ এগিয়ে গিয়ে শত্রু বাহিনীর মাঝখানে পৌঁছে গেলেন। তখন আলাউদ্দিন হুসাইনের ইশারায় কারওয়াহ-পোশরা তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং হত্যা করে। [৪]

বাহরাম শাহ এই দৃশ্য দেখে "তাকনাবাদ"-এর নিকটবর্তী "জোশ-এ-আব-এ-গরম" নামক একটি জনপদের দিকে পিছিয়ে গেলেন। ঘুরি বাহিনী সেখানেও তাঁর পিছু নিল এবং তাঁকে দ্বিতীয়বার পিছু হটতে বাধ্য করল। বাহরাম শাহ এবার গজনীতে পৌঁছালেন এবং সেখান থেকে সমস্ত সামরিক শক্তি একত্রিত করে ময়দানে এসে আবারও প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হলেন।

---

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৪১

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৪২; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮১, ১৮২

[৩] মিনহাজ-উস-সিরাজ বর্ণনা করেন: এই লোকেরা কাঁচা ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে এমন একটি জিনিস তৈরি করত এবং এর উভয় পাশে অত্যন্ত বেশি তুলা ও মোটা কাপড় সেলাই করে চড়িয়ে দেওয়া হতো। এই অস্ত্রের নাম ছিল "কারওয়াহ"। যখন ঘুরির পদাতিক সৈন্যরা এটি তাদের কাঁধে রাখত, তখন এটি তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে ফেলত এবং যখন তারা সারিবদ্ধ হতো, তখন তাদের দেয়ালের মতো দেখাত এবং তুলার আধিক্যের কারণে কোনো অস্ত্রই এতে কাজ করত না। (তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৪৩)

[৪] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৪৩

কিন্তু ঘুরিদের জোশ ও উদ্দীপনার সামনে কোনো কিছুই টিকতে পারেনি এবং অবশেষে বাহরাম শাহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে গজনভিদের শান-শওকত ধুলোয় মিশে যায় এবং পরবর্তী কোনো শাসকই তা আর পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। [১]

বাহরাম শাহের মৃত্যু:

বাহরাম শাহ চরম হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় গজনীতে পৌঁছান। তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পরাজয়ের গ্লানি এবং পুত্রের হত্যার শোক বাদশাহকে জীবন্ত মৃতপ্রায় করে ফেলেছিল এবং কয়েক দিন পর ৫৫২ হিজরিতে তিনি গজনীতে মৃত্যুবরণ করেন। [২]

ধনীরাও থাকবে, তাওয়াক্কুলকারীরাও থাকবে
অনেক বুলবুলি আসবে, ফুলও থাকবে
যদি কাওয়ালি হয়, তবে কুল (খতম) ও হবে
অনেক ধুমধাম হবে, অনেক শোরগোলও হবে
আমাদের কী আসে যায় যদি কবরের ওপর মেলা বসে
মাটির নিচে তো আমরা একাই থাকব
(আকবর এলাহাবাদী)

বাহরাম শাহের শাসনামলের ওপর এক নজর:

বাহরাম শাহের শাসনামল ৪১ বছর স্থায়ী ছিল। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং নির্মাণ ও উন্নয়নের দিক থেকে এই দিনগুলো ছিল ঈর্ষণীয়। এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য অভাবনীয় উন্নতি লাভ করে। ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি হাকিম সানায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাহরাম শাহের যুগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার কবরও গজনীতে অবস্থিত। হিন্দুস্তানের বিখ্যাত সাহিত্য গ্রন্থ “কালিলা ওয়া দিমনা”-র প্রথম ফারসি অনুবাদও বাহরাম শাহের শাসনামলেই হয়েছিল। [৩]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৩৩

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৩৪; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৮২

দ্রষ্টব্য: ফেরেশতা সুলতান বাহরামের মৃত্যুর বছর ৫৪৭ হিজরি নির্ধারণ করেছেন।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৩

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান খসরু শাহ, জহিরুদ্দৌলা

৫৫২ হিজরি থেকে ৫৫৯ হিজরি (১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)

বাহরাম শাহের মৃত্যুর পর আমীরগণ তাঁর পুত্র খসরু শাহকে সিংহাসনে বসান, কিন্তু ঘুরি বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা মাথার ওপর ছিল। এমন পরিস্থিতিতে খসরু শাহ গোপনে তাঁর পরিবার-পরিজন এবং বিশেষ আমীরদের সাথে শহর থেকে বেরিয়ে লাহোরে চলে যান। তিনি গজনীকে চিরতরে ভুলে যান এবং লাহোরকে রাজধানী বানান। [১]

যখন গজনীকে অগ্নিদগ্ধ করা হলো:

আলাউদ্দিন হুসাইন যখন দেখলেন যে বাদশাহ রাজধানী ছেড়ে চলে গেছেন, তখন তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ করেন এবং গজনী শহরে প্রবেশ করেন। নিজের ভাইদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দেন যেন শহরে গণহত্যা চালিয়ে লুটতরাজ করা হয়। এরপর সাত দিন পর্যন্ত শহরে হত্যা ও লুণ্ঠনের বাজার গরম ছিল। শহরের জায়গায় জায়গায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় যার ধোঁয়া আকাশের সাথে কথা বলতে শুরু করে। চারদিকে আগুনের শিখা ও ধ্বংসলীলার রাজত্ব ছিল। তবে গজনীর সুলতানদের কিছু সুন্দর প্রাসাদ এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্ত ছিল যেখানে আলাউদ্দিন হুসাইন এবং তাঁর সঙ্গীরা অবস্থান করছিলেন। [২]

নারীদের ওপর জুলুম:

এই সময়ে কেউ আলাউদ্দিন হুসাইনকে বলে দেয় যে, যখন সাইফউদ্দিন ঘুরিকে গাধার ওপর বসিয়ে শহরে ঘোরানো হয়েছিল, তখন গজনীর নারীরাও দফ বাজিয়ে সেই মিছিলে শামিল হয়েছিল। এটি শোনামাত্রই আলাউদ্দিন হুসাইন নির্দেশ দেন যেন গজনীর নারীদেরও হত্যা করা হয়। ফলে অসংখ্য নারীকেও তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করা হলো। যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদের সন্তানদেরসহ বন্দী করা হলো। কিন্তু আলাউদ্দিন হুসাইনের প্রতিশোধের নেশা তখনও শান্ত হয়নি। তাঁর নির্দেশে সুলতান মাহমুদ গজনভী, সুলতান মাসউদ এবং সুলতান ইব্রাহিম ব্যতীত পূর্ববর্তী সকল গজনভী সুলতানদের কবর খুঁড়ে তাঁদের দেহাবশেষ পুড়িয়ে ফেলা হয়। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ১৮৪; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৩৩

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৩৩, ৩৩৪

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৩৪

যাদের কারণে জনপদগুলো আবাদ ছিল..... আজ সেই লোকেরা কোথায় কোথায় আবাদ?

সবুজ বাগানগুলো পুড়ছে..... দুঃখ কোথায় কোথায় আবাদ হয়েছে?

(আহমদ ফারাজ)

গজনীর ধ্বংসের ওপর আলাউদ্দিন হুসাইনের আনন্দদায়ক কবিতা:

সাত দিন ধরে গজনীতে আগুন জ্বলতে থাকে এবং আলাউদ্দিন হুসাইন সুউচ্চ প্রাসাদে বিলাসিতায় মত্ত থাকেন। তিনি নিজে ফারসি ভাষার কবি ছিলেন, তাই সেই মত্ত অবস্থায় এই কবিতাগুলো রচনা করেন এবং নির্দেশ অনুযায়ী গায়করা বাদ্যযন্ত্রের সাথে গেয়ে শোনাতে শুরু করেন:

علاؤ الدین حسین بن حسینم..... کہ باقی باد ملک جاودانم

(আমি আলাউদ্দিন হুসাইন বিন হুসাইন..... আমার রাজত্ব সর্বদা টিকে থাকবে।)

چو بر گلگونہ دولت نشینم..... یکی باشد زمین و آسمانم

(যখন আমি ক্ষমতার মসনদে বসলাম..... তখন জমিন ও আসমান এক হয়ে গেল।)

همہ عالم بگیرم چون سکندر..... بہر شہرے رہے دیگر نشانم

(আমি সিকান্দারের মতো সারা বিশ্ব জয় করেছি এবং প্রতিটি শহরে একজন নতুন শাসক বসিয়েছি।)

برآں بودم کہ با اوباش غزنین..... چوں رود نیل جوئے خوں برانم

(আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে গজনীর বদমাশদের রক্ত দিয়ে নীল নদের মতো রক্তের নদী বইয়ে দেব।)

সাত দিন পর হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ এবং অগ্নিসংযোগের খেলা শেষ হলে গজনীতে উল্লেখযোগ্য কোনো ইমারত অক্ষত ছিল না। অষ্টম দিনে আলাউদ্দিন হুসাইন সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং যারা বেঁচে ছিল, তাদের প্রাণভিক্ষা দেন। [১]

গজনীর সাদাতদের ওপর জঘন্যতম নির্যাতন:

এরপর আলাউদ্দিন হুসাইন তার সঙ্গীদের নিয়ে শোকের পোশাক পরে তার ভাইদের: কুতুবউদ্দিন মুহাম্মদ এবং সাইফউদ্দিনের কবরের কাছে আসেন। ফাতিহা পাঠ করেন এবং পরবর্তী সাত দিন পর্যন্ত কবরের ওপর কুরআন তিলাওয়াত করান। তারপর কবরগুলো খুলে লাশগুলো ঘোরে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন যাতে তাদের পৈতৃক কবরস্থানে দাফন করা যায়। নিজের দেশের উজির সৈয়দ মাজদুদ্দিনের লাশও বের করে ঘোরে পাঠিয়ে দেন। এরপর সেই সৈয়দের প্রতিশোধ নিতে গজনীর বেশ কয়েকজন সাদাতকে গ্রেপ্তার করা হয়। গজনীর মাটি দিয়ে একটি করে থলে ভর্তি করে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের এই অবস্থায় হাঁটিয়ে তিনি গজনী থেকে ফিরোজ কোহ পর্যন্ত নিয়ে যান। [২]

চোখ দিয়ে রক্ত ঝরতেই থাকল..... অশ্রুর কাফেলা চলতেই থাকল

সকাল হতেই নিভে গেল সব প্রদীপ..... হৃদয়ের ক্ষত সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বলতেই থাকল

(ফগান)

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৩৪৪, ৩৪৫

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৩৪৫..... দ্রষ্টব্য: মনে রাখা প্রয়োজন যে গজনী থেকে ফিরোজ কোহ পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিনশ কিলোমিটার এবং আজও এটি =

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

গজনভী আমলের ইমারতসমূহ ধ্বংস:

গজনি থেকে যাওয়ার সময় আলাউদ্দিন হুসাইন যেখানেই গজনভী সুলতানদের কোনো স্মৃতিবাহী ইমারত দেখতে পেতেন, তিনি তা ধ্বংস করে দিতেন। "বস্ত"-এ সুলতান মাহমুদ গজনভীর নির্মিত এমন সব বিশাল ইমারত ছিল যে দুনিয়াতে সেগুলোর নজির খুব কমই ছিল। আলাউদ্দিনের নির্দেশে সেগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। [১]

সাদাতদের রক্ত:

আলাউদ্দিন হুসাইন যখন পুনরায় ঘোরে পৌঁছালেন, তখন সেখানে সেই সাদাতদের হত্যা করালেন যাদেরকে সৈয়দ মাজদুদ্দিনের প্রতিশোধ নিতে গজনি থেকে ধরে এনেছিলেন। তাদের হত্যা করিয়ে তাদের রক্ত দিয়ে মাটি মেখে কাদা তৈরি করালেন। সেই সময় কুতুবউদ্দিন ঘৌরির নির্মিত দুর্গ "কেল্লা ফিরোজ কোহ"-এর বুরুজ নির্মাণের কাজ বাকি ছিল। ফলে আলাউদ্দিন হুসাইনের নির্দেশে সেই রক্তমাখা কাদা দিয়ে বেশ কিছু বুরুজ নির্মাণ করা হলো। এই সব অত্যাচারের কারণে আলাউদ্দিন ঘৌরিকে "জাহান সোজ" বলে স্মরণ করা হতে থাকে। [২]

খসরু শাহের শেষ আশাও শেষ:

এদিকে আলাউদ্দিন হুসাইনের প্রস্থানের পর খসরু শাহ ভাবলেন যে আরও একবার সুলতান সাঞ্জর সেলজুকির সাহায্য নেওয়া যাক। ফলে তিনি এই উদ্দেশ্যে খোরাসানের দিকে রওনা হলেন, কিন্তু পথিমধ্যে সংবাদ পেলেন যে সুলতান সাঞ্জর তুর্কান-এ-গুজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। ফলে খসরু শাহ হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। সাত বছর শাসন করার পর ৫৫৯ হিজরিতে (১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) খসরু শাহ লাহোরে ইন্তেকাল করেন। [৩]

গজনভী সুলতানদের পর গজনি শহরের অবস্থা:

গজনি শহর খসরু শাহের আমলে আলাউদ্দিন জাহান সোজের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এরপর আলাউদ্দিন সেখানে শাসন করার বা তা মেরামত করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। গজনভীরা এই শহর ছেড়ে যাওয়ার পর এর বসন্ত শরতে পরিণত হলো। এমন অবস্থায় এই শহরের অবশিষ্ট মানুষের ওপর আরও একটি বিপদ নেমে এল। তা হলো তুর্কান-এ-গুজ যারা মধ্য এশিয়ায় সুলতান সাঞ্জর সেলজুকের মতো বিজয়ীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, এখন তাদের লুটতরাজ গজনি এবং এর আশপাশের শহর ও জনপদ পর্যন্ত পৌঁছাতে শুরু করল। যখন তারা এই এলাকাগুলো প্রতিরোধহীন দেখতে পেল, তখন তারা গজনির ওপর পূর্ণ দখলদারিত্ব কায়েম করল। বারো বছর পর্যন্ত এই কবরস্থান সদৃশ শহরটি তাদের দখলে ছিল এবং যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা তাদের হাতে মাটির সাথে মিশে গেল। [৪]

- রাস্তা এতটাই দুর্গম যে তা অতিক্রম করতে বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় ব্যয় হতে পারে।

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৪৫

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৪৫; তারিখ-ই-ফিরিশতা: পৃ. ১৮৪

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৪৪, ৩৪৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ১৮৪, ১৮৫... দ্রষ্টব্য: মিনহাজ-উস-সিরাজ এবং ফিরিশতা উভয়ের মতে খসরু শাহের শাসনকাল ছিল সাত বছর, তবে ফিরিশতা খসরু শাহের সিংহাসনে আরোহণের বছর ৫৪৭ হিজরি এবং মৃত্যুর বছর ৫৫৫ হিজরি উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে মিনহাজ-উস-সিরাজ তার সিংহাসনে আরোহণের বছর ৫৫২ হিজরি বর্ণনা করেছেন এবং মৃত্যুর বছর উল্লেখ করেননি, তবে ক্ষমতার মেয়াদ সাত বছর ধরলে মৃত্যুর বছর ৫৫৯ হিজরি হয়। লেখক এটিই গ্রহণ করেছেন।

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৪৩

সুলতান খসরু মালিক

৫৫৯ হিজরি থেকে ৫৮২ হিজরি

(১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)

খসরু শাহের পর তাঁর পুত্র খসরু মালিক লাহোরে গজনভি সালতানাতের লাগাম ধরেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন পরিচালনা করেন। হিন্দুস্তানের অনেক এলাকা ইব্রাহিম শাহ ও বাহরাম শাহের আমলে জয় করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে হাতছাড়া হয়ে যায়। খসরু মালিক সেখানে সৈন্য অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেগুলো পুনরায় জয় করেন। [১]

শিহাবুদ্দিন ঘুরি ও খসরু মালিক:

কিন্তু ঘুরিদের বিপদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল যারা আফগানিস্তানের দিক থেকে বারবার আক্রমণ করছিল। ৫৭৬ হিজরিতে ঘুরি বিজেতা শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি পেশোয়ার ও মুলতান জয় করার পর লাহোরের দিকে অগ্রসর হন। খসরু মালিক বাধ্য হয়ে লাহোরের একটি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শিহাবুদ্দিন এই অভিযানে খসরু মালিকের পুত্র মালিক শাহকে বন্দি করে সাথে নিয়ে যান। [২]

৫৮০ হিজরিতে শিহাবুদ্দিন ঘুরি দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন। খসরু মালিক এবারও লাহোরের দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করেন। শিহাবুদ্দিন ঘুরি ফিরে যাওয়ার আগে শিয়ালকোটে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করান এবং সেখানে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সুবাদার নিযুক্ত করেন। শিহাবুদ্দিনের প্রত্যাবর্তনের পর খসরু মালিক শিয়ালকোটের সেই দুর্গে আক্রমণ করেন কিন্তু দুর্গবাসীরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং খসরু মালিককে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৮৫, ১৮৬

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৮৬; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৩৪, ৩৯৭

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৮৬, ১৮৭, তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৯৮

https://t.me/BoierSomahar

খসরু মালিকের গ্রেফতারি - গজনভি বংশের অবসান:

শিয়ালকোট দুর্গে খসরু মালিকের আক্রমণের খবর শুনে শাহাবুদ্দিন ঘুরি লাহোর দখলের চূড়ান্ত সংকল্প করেন, তবে এর জন্য তিনি রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেন। ৫৮২ হিজরিতে তিনি খসরু মালিকের পুত্র মালিক শাহকে মুক্ত করার ঘোষণা দেন এবং তাকে একটি কাফেলার সাথে লাহোরের দিকে রওনা করে দেন। খসরু মালিক যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং নিজের শাহজাদাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লোকলস্করসহ লাহোরের বাইরে এসে রাভি নদীর তীরে অবস্থান নিলেন।

এই সময়ের মধ্যে শাহাবুদ্দিন ঘুরি অন্য একটি পথে ২২ হাজার সৈন্য নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে খসরু মালিকের মাথার ওপর পৌঁছে গেলেন। একদিন সকালে যখন খসরু জেগে উঠলেন, তখন নিজেকে ঘুরি বাহিনীর কবলে দেখতে পেলেন। নিরুপায় হয়ে তিনি প্রাণের নিরাপত্তা চাইলেন। এভাবে ২৩ বছর শাসনের পর ৫৮২ হিজরিতে (১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। এর মাধ্যমেই গজনভি সালতানাত সোয়া দুইশ বছর পূর্ণ করে শেষ হয়ে যায়। খসরু মালিককে তার পুত্রসহ সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঘুরির কাছে ফিরোজ কোহ-তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি খসরু মালিককে ঘরজিস্তানের বলরওয়ান দুর্গে এবং তার পুত্রকে সিফরুদ দুর্গে বন্দি করে রাখেন। [১]

কিছুকাল পর ঘুরিদের সাথে খোয়ারিজমি শাহজাদা সুলতান শাহের যুদ্ধ শুরু হয়। অভিযোগ তোলা হয় যে, এতে গজনভি রাজপরিবারও জড়িত রয়েছে, ফলে পিতা ও পুত্রকে হত্যা করা হয়। এভাবেই গজনভিদের শেষ প্রদীপটিও নিভে যায়। [২]

যাদের প্রভাবে সম্রাটদের দরবারে ভূমিকম্প সৃষ্টি হতো
যাদের তলোয়ারে বিজলির বাসা ছিল
যাদের আবির্ভাব ছিল এক নতুন জগতের পয়গাম
যাদের অধৈর্য তলোয়ার প্রাচীন যুগকে গ্রাস করেছিল
যাদের ‘কুম’ (ওঠো) ধ্বনিতে মৃত পৃথিবী জীবিত হয়েছিল
মানুষ কুসংস্কারের জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়েছিল
যাদের গর্জনের স্বাদ এখনো কানে লেগে আছে
সেই তকবির কি এখন চিরতরে নীরব হয়ে গেছে?
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৩৯৮; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৮৬, ১৮৭।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৩৯৮, ৪৩৪।

দ্রষ্টব্য: মিনহাজুস সিরাজ এই দুর্ভাগা পিতা-পুত্রের হত্যাকাণ্ডকে ৫৮৭ হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন, যখন ঘুরিদের এবং সুলতান শাহের মধ্যে যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল।

উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস

গজনভী শাসকদের তালিকা

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ নাসিরুদ্দিন সবুক্তগিন ৩৬৬ হিজরি থেকে ৩৮৭ হিজরি (৯৭৭ খ্রি. থেকে ৯৯৭ খ্রি.) গজনীর প্রথম স্বাধীন শাসক, হিন্দুস্তানের সীমান্তে জিহাদ।

২ ইসমাইল ৩৮৭ হিজরি থেকে ৩৮৮ হিজরি (৯৯৭ খ্রি. থেকে ৯৯৮ খ্রি.)

৩ মাহমুদ গজনভী, ইয়ামিনুদ্দৌলা ৩৮৮ হিজরি থেকে ৪২১ হিজরি (৯৯৮ খ্রি. থেকে ১০৩০ খ্রি.) সালতানাতের সুদৃঢ়করণ, আদর্শ শাসন, হিন্দুস্তান বিজয়।

৪ মুহাম্মদ - প্রথমবার ৪২১ হিজরি (১০৩০ খ্রি. থেকে ১০৩১ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত শাসনকাল।

৫ মাসুদ গজনভী ৪২১ হিজরি থেকে ৪৩২ হিজরি (১০৩০ খ্রি. থেকে ১০৪১ খ্রি.) খোরাসান ও খাওয়ারিজমের ওপর পুনরায় সেলজুকদের দখল।

মুহাম্মদ - দ্বিতীয়বার ৪৩২ হিজরি (১০৪১ খ্রি.) পরিবারে ক্ষমতার লড়াই।

৬ মওদুদ ৪৩২ হিজরি থেকে ৪৪১ হিজরি (১০৪১ খ্রি. থেকে ১০৪৯ খ্রি.)

৭ মাসুদ সানি রজব ৪৪১ হিজরি (ডিসেম্বর ১০৪৯ খ্রি.) মাত্র ছয় দিন শাসন করেছেন। নাবালক শিশু।

৮ আবুল হাসান আলী, বাহাউদ্দৌলা শাবান, রমজান ৪৪১ হিজরি (১০৫০ খ্রি.) দুই মাসের শাসন।

৯ আব্দুর রশিদ রমজান ৪৪১ হিজরি থেকে রমজান ৪৪৩ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১০৫০ খ্রি. থেকে ফেব্রুয়ারি ১০৫২ খ্রি.) পশ্চিম ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে সেলজুকদের সাথে যুদ্ধ।

১০ তুঘরিল শাওয়াল ও জিলকদ ৪৪৩ হিজরি (ফেব্রুয়ারি, মার্চ ১০৫২ খ্রি.) তুঘরিল গজনভী পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিছু সময়ের জন্য শাসন করেন।

১১ ফারুখজাদ ৪৪৩ হিজরির শেষ থেকে ৪৫১ হিজরি (১০৫২ খ্রি. থেকে ১০৫৯ খ্রি.) গজনভী পরিবারের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার।

১২ ইব্রাহিম ৪৫১ হি. থেকে ৪৯২ হি. (১০৫৯ খ্রি. থেকে ১০৯৯ খ্রি.) সেলজুকদের সাথে সন্ধি - শান্তি ও শৃঙ্খলার অর্ধ শতাব্দী

১৩ মাসুদ সালিস ৪৯২ হি. থেকে ৫০৯ হি. (১০৯৯ খ্রি. থেকে ১১১৫ খ্রি.)

১৪ আরসালান শাহ ৫০৯ হি. থেকে ৫১১ হি. (১১১৫ খ্রি. থেকে ১১১৭ খ্রি.) সঞ্জর সেলজুকির কাছে পরাজয়

১৫ বাহরাম শাহ ৫১১ হি. থেকে ৫৫২ হি. (১১১৭ খ্রি. থেকে ১১৫৭ খ্রি.) সালতানাতের স্থায়িত্বের প্রচেষ্টা, ঘুরিদের সাথে মোকাবিলা, গজনির ধ্বংস এবং আফগানিস্তান থেকে গজনি পরিবারের উচ্ছেদ

১৬ খুসরো শাহ ৫৫২ হি. থেকে ৫৫৯ হি. (১১৫৭ খ্রি. থেকে ১১৬৩ খ্রি.) শুধুমাত্র পাঞ্জাবের ওপর শাসন

১৭ খুসরো মালিক ৫৫৯ হি. থেকে ৫৮২ হি. (১১৬৩ খ্রি. থেকে ১১৮৬ খ্রি.) শেষ গজনভি শাসক

https://t.me/BoierSomahar

ঘুরী সালতানাত

৫৭০ হিজরি থেকে ৬০২ হিজরি

(১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ)

ক্ষমতার মেয়াদ: হিজরি: ৩২ বছর। খ্রিষ্টাব্দ: ৩২ বছর।

এখন পর্যন্ত উপমহাদেশে মুসলমানদের যতগুলো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর কেন্দ্র উপমহাদেশের বাইরে ছিল। ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে ঘুরী বংশের বিজয়সমূহ এখানে একটি স্থায়ী ও স্বাধীন ইসলামী সরকারের ভিত্তি স্থাপন করে। ঘুরী বংশের মূল খ্যাতির কারণ এর দুইজন শাসক: গিয়াসউদ্দিন ঘুরী এবং শাহাবুদ্দিন ঘুরী। তবে তাদের আলোচনার পূর্বে তাদের এলাকা এবং তাদের পারিবারিক পটভূমি সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি।

ঘুরের এলাকা, এক অদ্ভুত ও বিচিত্র ভূমি:

মধ্য আফগানিস্তানের ঘুর এলাকা একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক অঞ্চল যা তার অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ঘুরী সালতানাতের সাথে সম্পর্কের কারণে পরিচিত। এই পাহাড়ি এলাকা হিন্দুকুশের পশ্চিম পর্বতশ্রেণীর অংশ। আবহাওয়ার কঠোরতা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতার কারণে এখানকার অধিবাসীরা কঠোর পরিশ্রম ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত। এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য একে আফগানিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। দুর্গম এবং পাহাড়ি গিরিপথের কারণে কোনো আক্রমণকারীর এখানে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে উঁচু চূড়া, গভীর উপত্যকা এবং সংকীর্ণ গিরিপথ পাওয়া যায় যা একে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা প্রদান করে কিন্তু সেই সাথে যাতায়াতকে কঠিন করে তোলে।

ঘোর এলাকাটি একটি আধা-অনুর্বর পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড়ি ঢাল এবং উঁচু এলাকাগুলো বেশিরভাগই পাথুরে। তবে বিশেষ করে উপত্যকাগুলোতে যেখানে নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে সজীবতা ও শস্যশ্যামলতা দেখা যায়।

এখানে সীমিত পরিসরে চাষাবাদ করা হয়, যার মধ্যে গম, ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্য অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি আফগানিস্তানের উর্বর উত্তর সমভূমির মতো বিশাল কৃষি অঞ্চল নয়। পাহাড়ি প্রকৃতি এবং পানির স্বল্পতার কারণে বড় পরিসরে চাষাবাদ সম্ভব হয় না। শীতকাল অত্যন্ত কঠোর হয়। শীতকালে এই এলাকা প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে, যেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে যায় এবং ভারী তুষারপাত হয়। অনেক রাস্তা তুষারপাতের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। গ্রীষ্মকাল তুলনামূলকভাবে শুষ্ক ও হালকা হয়, তবে দিনের বেলা তাপমাত্রা বেড়ে যায়। রাতগুলো সাধারণত ঠান্ডা থাকে। স্থানীয় কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি গবাদি পশু পালনও এখানকার অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভেড়া, ছাগল এবং অন্যান্য গবাদি পশু স্থানীয় জনগণের আয়ের উৎস।

ঘোরি বংশের পটভূমি

প্রাচীনকালে ঘোরে বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রের আলাদা আলাদা দুর্গ ছিল যা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল এবং প্রতিটি দুর্গ একজন স্বাধীন শাসকের মতো ছিল। হারুনুর রশিদের যুগে এখানকার নেতৃত্ব বনু নাহারানের হাতে ছিল। এর নাতি সুরি বিন মুহাম্মদ দৌলতে সাফারিয়ার ইয়াকুব বিন লাইসের সমসাময়িক ছিলেন। এই ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ঘোরি সুলতানগণ ‘সুরি’ নামে পরিচিত। ‘সুরি’ তাদের পারিবারিক বংশপরিচয়, আর ‘ঘোরি’ হলো আঞ্চলিক পরিচয়।

যখন সুলতান মাহমুদ গজনভির শাসনকাল এলো, তখন ঘোরি সরকারের এই বংশের নেতৃত্বে ছিলেন সরদার মুহাম্মদ বিন সুরি। সেই সময় পর্যন্ত এই জাতির মধ্যে ইসলাম পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি। যদিও তাদের কিছু সরদার মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই প্রাচীন কুফরি ধর্মের ওপর ছিল এবং লুটতরাজ তাদের পেশা ছিল। ফলে মুহাম্মদ বিন সুরি সুলতান মাহমুদ গজনভির আনুগত্য স্বীকার করেননি এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দি হয়ে আত্মহত্যা করেন।

সুলতান মাহমুদ ঘোরের শাসনভার তার ছেলে মুহাম্মদকে অর্পণ করেন। পরবর্তীতে তার ভাতিজা আব্বাস বিদ্রোহ করে ঘোর দখল করে নেয়, যে ছিল একজন জালেম ব্যক্তি। তার অত্যাচারে আল্লাহর সৃষ্টি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তার সাত বছরের শাসনকালে ঘোরে কোনো বৃষ্টি হয়নি। নিজের অহংকারের কারণে সে দৌলতে গজনভিয়ার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বন্দি হয়।

গজনভি সালতানাতের পক্ষ থেকে এখন ঘোরের শাসনভার আব্বাসের পুত্র মুহাম্মদকে সোপর্দ করা হয়। মুহাম্মদের পর তার পুত্র কুতুব...

---

[১] আজও ঘোরের প্রাদেশিক রাজধানী ফিরোজকোহ, যা আগে ‘চাগচারান’ নামে পরিচিত ছিল। এটি ঘোরের সবচেয়ে বড় শহর। এছাড়া দোলিনা, তুলাক, সাঘর, লাল ওয়া সারজাঙ্গাল, শাহরাক এবং পাসাবান্দ ছোট ছোট শহর ও গ্রাম এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকা আজও তার পাহাড়ি প্রকৃতি এবং কঠোর আবহাওয়ার কারণে অনগ্রসর। ঘোরি আমলের মতো আজও এখানকার জনগণের জীবিকা চাষাবাদ ও গবাদি পশু পালনের ওপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি জীবন ও আত্মনির্ভরশীলতা এখানকার মানুষের বৈশিষ্ট্য। এটি আফগানিস্তানের সবচেয়ে কম উন্নত ও দরিদ্র প্রদেশগুলোর একটি। যাতায়াতের মাধ্যম সীমিত এবং বেশিরভাগ রাস্তা কাঁচা বা মৌসুমি।

আল-দীন ঘোরের শাসক হলেন। একটি যুদ্ধে কোনো এক দুর্গ অবরোধের সময় চোখে তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

এই দুর্ঘটনার পর তাঁর পুত্র 'সাম' পালিয়ে নিজের পরিবারসহ সিন্ধু নদ পার হয়ে চলে যান। ফলে গজনভী শাসকরা 'ঘোর'-এর অধিকাংশ দুর্গ কোনো পরিশ্রম ছাড়াই নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। [১]

ইজ্জুদ্দীন হাসানের অদ্ভুত কাহিনী:

সাম কিছুকাল সিন্ধু নদের ওপারে অবস্থান করেন। এরপর স্বদেশের স্মৃতি কাতর করলে পরিবারসহ ফিরে আসার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর পুত্র ইজ্জুদ্দীন হাসানও তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁরা নৌকায় ভ্রমণ করছিলেন। একটি নৌকায় একটি সিংহও ছিল। সফর চলছিল, এমন সময় হঠাৎ ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয় এবং নৌকাগুলো উল্টে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সাম এবং তাঁর পুরো পরিবার ডুবে মারা যান।

কেবল তাঁর পুত্র ইজ্জুদ্দীন হাসান বেঁচে যান, যিনি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত নৌকার ভাঙা তক্তা ধরে ভাসছিলেন। সেই একই তক্তা সিংহটিও তার থাবা দিয়ে ধরে রেখেছিল। তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত এই যুবক এবং সেই সিংহটি ওই তক্তা আঁকড়ে ধরে ভেসে বেড়াতে থাকে। অবশেষে বন্যার পানি নামতে শুরু করে এবং তক্তাটি একটি বনের কিনারে গিয়ে ঠেকে। সিংহটি বনের দিকে চলে যায়, আর ইজ্জুদ্দীন হাসান অতি কষ্টে নিকটস্থ একটি জনপদে পৌঁছান এবং একটি দোকানের সামনে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। লোকজন তাঁকে চোর মনে করে কোতোয়ালকে খবর দেয়। সে কোনো তদন্ত ছাড়াই তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ফলে এই অসহায় ব্যক্তি সাত বছর পর্যন্ত কারাগারে বন্দি থাকেন।

সাত বছর পর ওই অঞ্চলের শাসক কোনো এক রোগ থেকে মুক্তি পেলে খুশিতে বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইজ্জুদ্দীন হাসানও মুক্ত হন এবং নিজ দেশের পথে রওনা হন, কিন্তু তখনও তাঁর কষ্টের দিন শেষ হয়নি। আফগানিস্তানের পাহাড়ে এক রাতে কিছু ডাকাত তাঁকে ধরে ফেলে এবং এই যুবক অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী দেখে তাঁকে তাদের সাথে ডাকাত হতে বাধ্য করতে থাকে।

পরদিন সকালে হঠাৎ সরকারি সৈন্যরা, যারা অনেকদিন ধরে ওই ডাকাতদের খুঁজছিল, সেখানে পৌঁছে যায় এবং তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে। তখন সুলতান ইব্রাহিম গজনভীর শাসনকাল ছিল। তাদের সবাইকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলো। সুলতান সবার শিরশ্ছেদ করার নির্দেশ দিলেন। ইজ্জুদ্দীন হাসানের পালা এলে এবং তাঁর চোখে পট্টি বাঁধা শুরু হলে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকালেন এবং ফরিয়াদ করলেন: "ইয়া আল্লাহ! আমার বিশ্বাস যে, তোমার কোনো কাজই ভুল হয় না। নিঃসন্দেহে তুমি জুলুম ও অবিচার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কিন্তু আমি জানি না যে, আমাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হচ্ছে?"

তাঁর এই আহাজারি শুনে জল্লাদ রাগান্বিত হলো এবং বিদ্রূপের সুরে বলল: "হে প্রতারক! তুই আল্লাহর বান্দাদের ওপর জুলুম এবং বাদশাহর অবাধ্যতা করেছিস। এরপরও নিজেকে নির্দোষ মনে করিস?"

ইজ্জুদ্দীন হাসান জবাবে নিজের কাহিনী শোনাতে শুরু করলে জল্লাদ অবাক হয়ে গেল। সে একজন আমিরের মাধ্যমে এই বিস্তারিত বিবরণ বাদশাহর কাছে পৌঁছাল। তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে তাঁকে নিজের দরবারে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং কিছুকাল...

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৩৪২ থেকে ৩৪৩; তারিখে ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ১৯৬ থেকে ১৯৭।

পর্যন্ত তার যোগ্যতার মূল্যায়ন করার পর তাকে দরবারের হাজিব নিযুক্ত করা হয় এবং নিজের পরিবারের এক মেয়ের সাথে তার বিয়েও করিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দিন দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। [১]

সামের সন্তানগণ, হাফত আখতার:

ইজ্জুদ্দিন হাসানের সাতজন পুত্র ছিল যারা বড় হয়ে নিজেদের যোগ্যতা, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের কারণে সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরে নিযুক্ত হন এবং উন্নতি করতে থাকেন। সুলতান ইব্রাহিমের উত্তরসূরি মাসউদ বিন ইব্রাহিমের শাসনামলে এই সাতজনই গজনভি সাম্রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাদের নাম ও পদমর্যাদা নিচে দেওয়া হলো:

- মালিক আলাউদ্দিন হুসাইন ফখরুদ্দিন মাসউদ (বামিয়ানের শাসক)
- কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ (সুলতান বাহরাম শাহ গজনভির জামাতা)
- শুজাউদ্দিন আলী (খুরাসানের শাসক, যৌবনেই মৃত্যুবরণ করেন)
- শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ খুরং (মাদিনের শাসক) [২]
- সাইফুদ্দিন সুরি (ঘোরের শাসক)
- বাহাউদ্দিন সাম (ঘোরের নায়েব শাসক)
- আলাউদ্দিন (ঘোরের সিপাহসালার) যিনি জাহানসোজ উপাধিতে পরিচিত হন।

সাম্রাজ্যে তাদের “হাফত আখতার” বলে স্মরণ করা হতো। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৯৬, ১৯৭

[২] মাদিন ঘোর প্রদেশের একটি জায়গির ছিল।

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৩৪, ৩৩৫; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৯৭, ১৯৮

https://t.me/BoierSomahar

মালিক আল-জিবাল, কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ (বাহরাম শাহের জামাতা)

হাফত আখতারের (সাত নক্ষত্র) মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যার মাধ্যমে ঘুরি শাসকদের ধারা শুরু হয়েছিল, তিনি ছিলেন কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ। নিজের যোগ্যতার কারণে তিনি সুলতান বাহরাম শাহ গজনভীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, এমনকি বাদশাহ তাকে নিজের জামাতা বানিয়ে নেন।

এরপর তিনি ঘুরের আমির নিযুক্ত হন। যেহেতু এটি একটি পাহাড়ি এলাকা ছিল, তাই তাকে 'মালিক আল-জিবাল' (পাহাড়ের অধিপতি) বলা হতে থাকে। তিনিই ঘুরের একটি পাহাড়ের চূড়ায় 'ফিরোজ কোহ' নামক এক বিশাল দুর্গ নির্মাণ করেন এবং একে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেন। গিয়াসুদ্দিন ঘুরির শাসনামল পর্যন্ত ঘুরিদের রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্র এটিই ছিল।

কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ এই দুর্গের চারদিকে ছয় মাইল পর্যন্ত একটি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং মধ্যবর্তী উপত্যকা ও টিলাগুলোকে নিজের ভ্রমণ ও শিকারের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন। এই সীমানার ভেতরে তিনি বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পয়েন্টে আলাদা আলাদা দুর্গও নির্মাণ করেছিলেন।

ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিরা সুলতান বাহরাম শাহের কান ভারী করল যে, কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদের উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা অর্জন করা এবং তিনি সুযোগ বুঝে গজনী দখল করে গজনভী বংশের অবসান ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সুলতান বাহরাম শাহ এতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ফলে তিনি কোনো এক বাহানায় কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদকে গজনীতে তলব করলেন এবং তারপর তাকে গ্রেপ্তার করে বন্দি করলেন। কিছুদিন পর সেখানে কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদকে বিষ প্রয়োগ করা হলো যার ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন। [১]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৩৫, ৩৩৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৯৮।

দ্রষ্টব্য: এটি মিনহাজ-উস-সিরাজের বর্ণনা যে, কুতুবুদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তবে ঐতিহাসিক ফেরেশতার বর্ণনা অনুযায়ী, কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ সত্যিই গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং সুলতান বাহরাম শাহের কাছে সঠিক তথ্যই পৌঁছেছিল। (তারিখ-ই-ফেরেশতা: পৃষ্ঠা ১৯৮)

https://t.me/BoierSomahar

সাইফ উদ্দিন সুরি

যখন কুতুব উদ্দিনকে গজনিতে ডেকে এনে বন্দি করা হলো, তখন সাইফ উদ্দিন সুরিও গজনিতে ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে ঘোরে পৌঁছাতে সক্ষম হন। এদিকে কুতুব উদ্দিনকে হত্যা করা হলো।

সাইফ উদ্দিন ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গজনির ওপর আক্রমণ করলেন এবং বাহরাম শাহকে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো। সাইফ উদ্দিন গজনিকে রাজধানী বানাতে পছন্দ করলেন এবং সেখানে নিজের সালতানাত ঘোষণা করলেন। ঘুরি বংশের মধ্যে সাইফ উদ্দিনই প্রথম আমির যিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন এবং একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে তিনি এই ভুলটি করলেন যে, গজনির জনগণকে নিজের সমর্থক মনে করে নিজের সরকারকে শক্তিশালী ভেবে বসলেন এবং নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ভাই বাহাউদ্দিনকে সৈন্যবাহিনীসহ ঘোরে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে বাহরাম শাহ শীতকালে সুযোগ বুঝে ফিরে এলেন এবং গজনির অধিবাসীদের সহায়তায় সাইফ উদ্দিনের তখত উল্টে দিলেন। সাইফ উদ্দিন এবং তাঁর উজির মাজদ উদ্দিনকে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে হত্যা করা হলো। [১]

বাহাউদ্দিন সাম

৫৪৪ হিজরি (১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

সাইফ উদ্দিনের পর হাফত আখতারের মধ্যে বাহাউদ্দিন সামই ছিলেন সবার বড়, তাই তাঁকেই ঘোরের সরদার ও শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হলো। (এই বাহাউদ্দিন সামেরই দুই ছেলে: গিয়াস উদ্দিন ঘুরি এবং শিহাব উদ্দিন ঘুরি প্রখ্যাত বাদশাহ হয়েছিলেন।)

তিনি তাঁর ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গজনির ওপর সৈন্য পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন, কিন্তু দুঃখ ও চিন্তার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং দিন দিন রোগ বাড়তে থাকল এবং তাতেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। [২]

---

[১] (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৯৮, ১৯৯) এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ববর্তী গজনভি শাসকদের শেষ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৩৭, ৩৩৮; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১৯৯

আলাউদ্দিন হুসাইন জাহান-সোজ

৫৪৪ হিজরি থেকে ৫৫৬ হিজরি

(১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

বাহাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার ভাই আলাউদ্দিন ঘোরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি তার ভাইয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ঘুরিদের সাথে নিয়ে গজনী সালতানাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। অবশেষে ঘুরিদের পাল্লা ভারী হয় এবং গজনভী শাসকরা গজনী ছাড়তে বাধ্য হন। আলাউদ্দিন হুসাইন গজনী দখলের পর শহরটিতে আগুন লাগিয়ে দেন এবং জুলুম ও অত্যাচারের চরম সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসে "জাহান-সোজ" উপাধি লাভ করেন। তিনি ঘোর পর্বতাঞ্চলে ফিরোজকোহ নামক একটি দুর্গ নির্মাণ সম্পন্ন করে সেটিকে নিজের সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। [১]

গিয়াসউদ্দিন ও শিহাবউদ্দিন: দুর্গ পরিচালনা থেকে কারাবরণ পর্যন্ত:

আলাউদ্দিন হুসাইন এখন মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের বিশাল এলাকা পদানত করেছিলেন। রাজ্যের বিস্তৃতি দেখে তিনি নতুন কিছু নিয়োগ দেন। সে অনুযায়ী তিনি তার ভাই বাহাউদ্দিনের দুই যোগ্য পুত্র গিয়াসউদ্দিন ও শিহাবউদ্দিনকে "বঞ্জিস্তান" এর কিছু দুর্গের শাসক নিযুক্ত করেন। এই দুই ভাই এখানকার শাসনভার গ্রহণ করে অত্যন্ত দয়া, নম্রতা ও অসাধারণ দানশীলতার পরিচয় দেন। কখনও কখনও তাদের দানশীলতার পরিমাণ নির্ধারিত করের চেয়েও বেশি হয়ে যেত যা ওইসব এলাকা থেকে আদায় করা হতো। তাদের এই গুণাবলির খ্যাতি শুনে চারপাশ থেকে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য এসে তাদের অধীনে চাকরিতে যোগ দিতে শুরু করে। আলাউদ্দিন হুসাইন তাদের এই দানশীলতা পছন্দ করেননি এবং হিংসুকদের অভিযোগের কারণে তাদের জনপ্রিয়তার ফলে তিনি সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হন। ফলে তিনি তাদের উভয়কে বন্দি করে "কিলআ-এ-ওয়াজিরিস্তান"-এ পাঠিয়ে দেন। [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৯; তবাকাত-ই-নাসিরি, পৃষ্ঠা ৩৩০ থেকে ৩৩৫। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ গজনভী শাসকদের শেষ যুগে অতিবাহিত হয়েছে।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৯; তবাকাত-ই-নাসিরি, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

স্থানের ব্যাখ্যা: "কিলআ-এ-ওয়াজিরিস্তান" এর অবস্থান কোথাও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি। হতে পারে এটি "ওয়াজিরিস্তান", যা আফগান সীমান্তের সাথে পাকিস্তানের একটি উপজাতীয় এলাকা।

সুলতান সাঞ্জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যুদ্ধ এবং বন্দিত্ব:

আলাউদ্দিন হুসাইনের অহংকার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, সে ঘুরিদের পৃষ্ঠপোষক, সেলজুকি সুলতান সাঞ্জারের আনুগত্য এবং সম্মান ও মর্যাদাকে পেছনে ফেলে দিয়েছিল। সেলজুকি কোষাগারে প্রদেয় অর্থের কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরং নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম মনে করে বলখ এবং হেরাতও দখল করে নিয়েছিল, যা সুলতান সাঞ্জারের এলাকা ছিল।

সুলতান সাঞ্জার যখন আলাউদ্দিন হুসাইনের এই কর্মকাণ্ডগুলো দেখলেন, তখন অতিষ্ঠ হয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযান চালালেন। ঘোর এবং হেরাতের মধ্যবর্তী "নাব" নামক জনপদের কাছে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো। যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আলাউদ্দিনের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছয় হাজার খিলজি, তুর্কি এবং গুয গোত্রের লোক সুলতান সাঞ্জারের সাথে গিয়ে যোগ দিল। ফলাফল এই হলো যে, আলাউদ্দিন হুসাইন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। তার বড় বড় আমির, অফিসার এবং অসংখ্য সৈন্য পালিয়ে যাওয়ার সময় পেছনের জলাভূমিতে ডুবে মারা গেল। আলাউদ্দিন হুসাইন নিজে বন্দি হলো। [১]

আলাউদ্দিন হুসাইনের মুক্তি:

সুলতান সাঞ্জার আলাউদ্দিন হুসাইনকে একজন সম্মানিত বন্দি হিসেবে কিছুকাল নিজের কাছে রাখলেন। তার কবিতা সুলতান সাঞ্জারের খুব পছন্দ ছিল। সুলতান সাঞ্জারের পায়ে একটি বড় তিল ছিল। একদিন আলাউদ্দিন হুসাইনের নজর সেটির ওপর পড়লে সে বলল:

হে সেই সত্তা যার দরবারের ধূলিকণা আমার মুকুট... আর তোমার গোলামির জিঞ্জির আমার অলঙ্কার

যখন আমি তোমার পায়ের তলার তিলকে চুম্বন করি... তখন সৌভাগ্য আমার কপালে চুম্বন করতে থাকে।

(হে সেই সত্তা যার দরবারের ধূলিকণা আমার সরদার এবং তোমার গোলামির জিঞ্জির আমার অলঙ্কার। যখন আমি তোমার তলার তিলকে চুম্বন করি তখন সৌভাগ্য আমার মাথাকে চুম্বন করতে থাকে।)

সুলতান সাঞ্জার অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে প্রচুর ধন-সম্পদ, ঘোড়া এবং গবাদি পশু দিয়ে পুনরায় ঘোরে পাঠিয়ে দিলেন এবং ছিনিয়ে নেওয়া এলাকাগুলো আবার তার নামে করে দিলেন।

ঘোরে ফিরে আসার পর সে আর বেশি সময় পায়নি এবং ৫৫১ হিজরি (১১৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে সে মৃত্যুবরণ করল। তার ঝুলিতে এটি ছাড়া আর কোনো "কীর্তি" নেই যে, সে গজনভি পরিবারকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দিয়েছিল। [২]

মৃত্যু কিসরাকেও ছাড়েনি, দারাকেও ছাড়েনি... এর কাছেই সেকান্দারের মতো বিজেতাও হেরেছে

প্রত্যেকে কী কী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদায় নিয়েছে... সব জাঁকজমক এখানেই পড়ে রয়ে গেছে

দুনিয়া মন বসানোর জায়গা নয়... এটি শিক্ষার জায়গা, তামাশা নয়

(খাজা মাজজুব)

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৪৬, ৩৪৭; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৯৯

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৪৭, ৩৪৮; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৯৯, ২০০

সাইফউদ্দিন ঘুরি বিন আলাউদ্দিন

৫৫১ হিজরি থেকে ৫৫৬ হিজরি

(১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

আলাউদ্দিন জাহান সোজের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাইফউদ্দিন ঘোরের শাসক হন। তিনি তার পিতার জুলুমের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করেন। তার পিতা তার অত্যন্ত যোগ্য দুই ভাতিজা: গিয়াসউদ্দিন এবং মুহাম্মদ বিন সাম (শিহাবুদ্দিন)-কে কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলেন। কিন্তু সাইফউদ্দিন ঘুরি ছিলেন কোমল স্বভাবের মানুষ। তিনি তার এই দুই চাচাতো ভাইকে কেবল মুক্তই করেননি, বরং তাদের যোগ্যতা দেখে তাদের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। [১]

বাতেনিয়া ও কারামিতাদের বিরুদ্ধে অভিযান:

এই সময়ে খোরাসান ও সিজিস্তানে কারামতি প্রচারক অর্থাৎ হাসান বিন সাব্বাহর বাতেনি দাঈদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। সাইফউদ্দিন ঘুরি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করান। এভাবে তিনি তার রাজ্যকে বিদআত ও গোমরাহির ঢেউ থেকে রক্ষা করেন। [২]

সাইফউদ্দিন ঘুরির পরিণতি:

একদিন সুলতান সাইফউদ্দিন ঘুরি তীরন্দাজির অনুশীলন করছিলেন। তিনি তার সেনাপতি ওয়ারমিশ বিন শিসের কাছে দুটি মূল্যবান বাজুবন্দ (কঙ্কণ) দেখতে পান যা তার নিজস্ব রাজকীয় হারাম ও কোষাগারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঘুরি সুলতানদের মধ্যে প্রথা ছিল যে, কোনো কর্মকর্তার সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাকে স্বর্ণ ও জহরত খচিত বাজুবন্দ উপহার দেওয়া হতো। ওয়ারমিশকেও এই বাজুবন্দ ঘুরি শাহজাদা মালিক নাসিরুদ্দিন হুসাইন দিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান সাইফউদ্দিন ঘুরির তা জানা ছিল না। তিনি যখন সেই কর্মকর্তাকে তার পারিবারিক বাজুবন্দ পরিহিত অবস্থায় দেখলেন, তখন তার বিস্ময় ও আত্মমর্যাদাবোধের সীমা রইল না।

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ: ৩৫১, ৩৫০; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ ২০০

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ: ৩৫১, ৩৫০

রাগে সুলতান দরমেশকে লক্ষ্যবস্তু থেকে তীর বের করে আনার নির্দেশ দিলেন এবং যখন সে পিঠ ফিরিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন সুলতান পেছন থেকে তীর ছুড়ে তাকে হত্যা করলেন।

দরমেশ বিন শিসের ভাই, আবুল আব্বাস শিস, যিনি সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন, এই ঘটনায় চরম শোক ও ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তিনি তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন।

এই সময়ে সুলতান সাঞ্জারের সালতানাত গুয গোত্রগুলোর হাতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এই বিদ্রোহী গোত্রগুলো প্রতিনিয়ত ঘুরি সালতানাতের সীমান্তে আক্রমণ করতে শুরু করে। তাদের দমনের জন্য সুলতান সাইফউদ্দিন ঘুরিকে সৈন্য পরিচালনা করতে হয়। এই অভিযানের সময় একদিন তিনি 'রুদবার-ই-মার্ভ' এলাকায় গুয গোত্রগুলোর সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং উভয় পক্ষ মুখোমুখি ছিল। এরই মধ্যে আবুল আব্বাস শিস, যিনি সেনাবাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন, পেছন থেকে এসে হঠাৎ সুলতান সাইফউদ্দিনের পাঁজরে বর্শা বিদ্ধ করেন। বর্শার আঘাতে সুলতান সাইফউদ্দিন পড়ে যান। ঠিক সেই মুহূর্তে, গুয গোত্রগুলো সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আক্রমণ করে বসে এবং সুলতানকে হত্যা করে। এই দুর্ঘটনার পর ঘুরি বাহিনীকে পিছু হটতে হয়। [১]

এই ঘটনাটি এই সত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, কীভাবে একজন শাসকের ব্যক্তিগত রাগ এবং প্রতিশোধের নেশা শেষ পর্যন্ত তার নিজের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে এবং তার সালতানাতের অস্তিত্বকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রত্যেকেই হৃদয়ে তুফান নিয়ে আছে, হে প্রিয়তম দেখো
মুখমণ্ডলের মশাল যেন নিভে না যায়, দেখো
প্রত্যেকেই প্রাণে আগুন নিয়ে আছে, হে সরকার দেখো
তোমার চপল শিরস্ত্রাণ যেন জ্বলে না ওঠে, দেখো [২]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৫১ থেকে ৩৫৩

[২] ফয়েজ আহমদ ফয়েজ

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান গিয়াস উদ্দিন ঘুরি

৫৫৭ হিজরি থেকে ৫৯৯ হিজরি

(১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ)

গিয়াস উদ্দিন ঘুরি এবং শিহাব উদ্দিন ঘুরি আপন দুই ভাই ছিলেন। গিয়াস উদ্দিন ঘুরি তিন বছরের বড় ছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, তাঁদের দুজনের নামই ছিল এক—মুহাম্মদ। মা বড় ছেলেকে 'হাবশি' এবং ছোট ছেলেকে 'জঙ্গি' বলে ডাকতেন। [১]

বাদশাহত কীভাবে পেলেন?

সুলতান সাইফ উদ্দিন যখন গুয গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযানে নিহত হন, তখন গিয়াস উদ্দিন ঘুরি সেই বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। সুলতানের হত্যার পর তিনিও বাহিনীর সাথে ফিরে আসেন। পথিমধ্যে সিপাহসালার আবু আব্বাস আমিরদের একত্রিত করে গিয়াস উদ্দিন ঘুরিকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে একমত করেন। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। গিয়াস উদ্দিন ঘুরি ফিরোজকোহ-তে এসে শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁকে সিংহাসনে বসানো সিপাহসালার আবু আব্বাস সেই সময় 'কিংমেকার'-এর মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং সবার ওপর তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

গিয়াস উদ্দিন ঘুরি এই পরিস্থিতিতে তাঁর ভাই শিহাব উদ্দিন ঘুরির সাথে পরামর্শ করেন এবং দুজনেই সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁদের হিতৈষী প্রাক্তন সুলতানের হত্যাকারীর সাথে যত দ্রুত সম্ভব বোঝাপড়া করা উচিত। তাই তাঁরা একজন তুর্কি তলোয়ারবাজকে প্রস্তুত করেন যে, দরবারে সুলতান গিয়াস উদ্দিন যখনই তাঁর পাগড়িতে হাত দেবেন, সে যেন হঠাৎ তলোয়ার চালিয়ে আবু আব্বাসকে হত্যা করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হয় এবং সেই তলোয়ারবাজ ভরা দরবারে সিপাহসালার আবু আব্বাসের মাথা উড়িয়ে দেয়। এরপর সালতানাতের সকল স্তম্ভ নতুন বাদশাহর পুরোপুরি অনুগত হয়ে যায়। [২]

---

[১] (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৫৩) দ্রষ্টব্য: মিনহাজ-ই-সিরাজ অনুযায়ী গিয়াস উদ্দিন ৪৩ বছর শাসন করেন এবং তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৬১) সুলতানের মৃত্যুর সাল ৫৯৯ হিজরি, এই হিসাব অনুযায়ী জন্মের সাল ৫৩৬ হিজরি হয় অর্থাৎ বাদশাহ হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী শিহাব উদ্দিন ঘুরির জন্মের সাল ৫৩৯ হিজরি হয় এবং যেহেতু মৃত্যুর সাল ৬০২ হিজরি, তাই বয়স ৬৩ বছর হয়। অর্থাৎ দুই ভাইয়ের বয়স সমান ছিল।

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৫৩ থেকে ৩৫৫।

এক প্রাণ দুই দেহ:

গিয়াসউদ্দিন তার ছোট ভাই শাহাবুদ্দিনকে প্রধান সেনাপতি ও সালতানাতের নায়েব নিযুক্ত করেন। মজার ব্যাপার হলো, সে সময় গিয়াসউদ্দিনের বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর এবং শাহাবুদ্দিনের বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। এই দুই তরুণ শাসক এমন অনুকরণীয় পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন যে বিশ্বকে অবাক করে দেন। গিয়াসউদ্দিন কেন্দ্রে থেকে সালতানাতের বিষয়াদি দেখাশোনা করতেন, আর শাহাবুদ্দিন ঘুরি বিজয় অভিযান ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে নিজের নাম উজ্জ্বল করেন। এভাবে এই সালতানাত দিন দিন উন্নতি করতে থাকে। এর মূল কারণ ছিল দুই ভাইয়ের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থা ও ঐক্য। ইতিহাসে শাসক ভাইদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐক্য ও সংহতির এমন উদাহরণ বিরল।

সালতানাত রক্ষায় গিয়াসউদ্দিন ঘুরির অভিযানসমূহ:

গিয়াসউদ্দিন ঘুরির রাজত্বের শুরুর দিকটা ছিল অত্যন্ত সংকটময়। সেলজুক সালতানাত তখন ঘুজ তুর্কিদের হাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং দুর্ধর্ষ গোত্রগুলো বারবার খোরাসানে লুটতরাজ চালাচ্ছিল। অন্যদিকে গজনভি সালতানাত তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। এভাবে পাঞ্জাব থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত এক বিশাল শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, যা পূরণ করা ঘুরি সুলতান নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেছিলেন।

এই কারণে গিয়াসউদ্দিন ঘুরি তার শাসনের শুরুর বছরগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী সালতানাতকে সুসংহত ও সম্প্রসারিত করতে ব্যয় করেন। এই সময়ে তিনি কোথাও যুদ্ধ করে আবার কোথাও আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও নেতাদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘুজ তুর্কিদের বিদ্রোহের তেজ কমতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তারা বশীভূত হয়। এভাবে মার্ভ থেকে গজনি এবং বলখ থেকে কান্দাহার পর্যন্ত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলো এক সুতোয় গেঁথে যায়।

কিন্তু এর পরপরই মধ্য এশিয়ায় একদিকে কারা খিতাই এবং অন্যদিকে খাওয়ারিজম শাহী সালতানাত দুটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গিয়াসউদ্দিন ঘুরি সালতানাতের টিকে থাকা ও স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এই দুই শক্তির মোকাবিলা করেন। কারা খিতাই ও খাওয়ারিজম শাহদের সাথে বেশ কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে কখনো এক পক্ষ আবার কখনো অন্য পক্ষ জয়ী হতো। ঘুরিদের এই যুদ্ধগুলোতে কিছু এলাকা হারাতেও হয়েছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সালতানাত শক্তিশালীই ছিল [১]।

গিয়াসউদ্দিন ও শাহাবুদ্দিন ঘুরির ধর্মীয় ঝোঁক:

গিয়াসউদ্দিন ঘুরি ও শাহাবুদ্দিন ঘুরি শাসনভার গ্রহণ করা পর্যন্ত ইলম ও ফজল দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার খুব একটা সুযোগ পাননি। তারা যে অঞ্চলে বাস করতেন, সেখানে বড় কোনো আলেম বা মাদ্রাসা ছিল না, তাই বাতিল ফেরকার লোকেরা স্থানীয় লোকদের বিভ্রান্ত করতে সফল হতো। সম্ভবত এমন কিছু প্রভাবের কারণেই এই দুই ভাই শুরুতে কারামিয়া ফেরকার মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। পরবর্তীতে যখন রাজধানী গজনীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানকার আহলে সুন্নাত...

---

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৫২ থেকে ৩৬১।

...প্রচুরতার কারণে উভয় ভাই তাদের মতাদর্শ সংশোধন করে নিয়েছিলেন। [১]

গিয়াস উদ্দিন ঘৌরীর গুণাবলী:

গিয়াস উদ্দিন ঘৌরী সম্পর্কে ইবনে খালদুন লিখেছেন:

"তিনি ছিলেন একজন মহান সম্রাট। তিনি নিজে যুদ্ধে কম অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সফল হতেন। তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গাম্ভীর্য লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল, দয়ালু, সঠিক আকিদাহ সম্পন্ন এবং অত্যধিক সদকা ও খয়রাতে অভ্যস্ত। তিনি খোরাসান ও অন্যান্য শহরে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। শাফেয়ীদের জন্য মাদ্রাসা কায়েম করেছিলেন। পথে পথে সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়নির্বাহের জন্য বড় বড় সম্পত্তি ওয়াকফ করেছিলেন। জনগণের ওপর থেকে পূর্বের আরোপিত ট্যাক্স ও শুল্ক বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাঁর যুগে কেউ কারো মালের ওপর হস্তক্ষেপ করত না। তিনি যে শহর দখল করতেন, সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। কোনো সৈনিকের সাধ্য ছিল না যে সে প্রজাদের ওপর সামান্যতম জুলুম করতে পারে। প্রতি বছর রাজকোষ থেকে উলামা ও ফুকাহাদের বৃত্তি ও অনুদান দিতেন। দরিদ্র, কবি এবং সাদাতদের (সৈয়দদের) মালামাল করে দিতেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, বাগ্মী এবং সুলেখক। তিনি কুরআন মাজীদ নিজ হাতে লিখতেন এবং এই পাণ্ডুলিপিগুলো তাঁর নির্মিত মাদ্রাসাগুলোতে ওয়াকফ করে দিতেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন কিন্তু গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, মাযহাবের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি অবলম্বন করা ধ্বংসাত্মক।" [২]

নীল আকাশের ওপারে মুসলমানের গন্তব্য

তারকারাজি যার পথের ধূলিকণা, তুমি সেই কাফেলা

তোমার কলিজার রক্ত লাল টিউলিপের কনের মেহেদি

তোমার বংশীয় সম্পর্ক ইব্রাহিমী, তুমিই বিশ্বের নির্মাতা

---

[১] তাবাকাতে নাসিরী: পৃষ্ঠা ৩৬২

ফায়দা: কারামিয়া ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন কারাম সিজিস্তানি (মৃত্যু ২৫৫ হিজরী)। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে কারামিয়াদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য ছিল, বিশেষ করে ঈমান এবং আল্লাহ তায়ালার সত্তা সম্পর্কে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কিত আকিদাহ ছিল এই যে, তাদের মতে ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকৃতির নাম, অন্তরে বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মুনাফিকরা যারা মুখে কালিমা পাঠ করত, দুনিয়াতে তারা মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। কারামিয়াদের আরেকটি চরম বিতর্কিত আকিদাহ ছিল এই যে, তাদের মতে আল্লাহ তায়ালা একটি দেহ (জিসম), তবে তিনি অন্যান্য দেহের মতো নন। তারা আল্লাহর জন্য দিক (জিহাত) ও সীমাও (হদ) স্বীকার করত এবং বলত যে তিনি আরশের ওপর বসে আছেন। এই আকিদাহ 'তাজসিম' (আল্লাহকে দেহধারী মনে করা)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আহলে সুন্নাত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। আহলে সুন্নাতের আকিদাহ হলো আল্লাহ তায়ালা দেহ, আকৃতি, দিক, সীমা এবং যে কোনো সৃষ্টির গুণাবলী থেকে পবিত্র। তিনি কোনো স্থান বা দিকের মুখাপেক্ষী নন। কারামিয়া ফেরকা খোরাসানে বেশ শক্তিশালী ছিল এবং কিছু শাসকও এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আশায়েরা ও মাতুরিদিয়ার মতো আহলে সুন্নাতের চিন্তাধারাগুলো তাদের আকিদাহর জোরালো প্রতিবাদ করেছে। ধীরে ধীরে এই ফেরকাটি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য শক্তিশালী আলেমদের প্রচেষ্টা ও সুন্নি শাসকদের উত্থানের কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

[২] তারিখে ইবনে খালদুন: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৩৭, ত দারুল ফিকর

খাওয়ারিজম শাহী সরকারের সাথে দ্বন্দ্ব

যে সময়ে ঘুরিরা বর্তমান আফগানিস্তানে সংগঠিত হয়ে গজনভি সুলতানদের পিছু হটতে বাধ্য করছিল, ঠিক সেই সময়ে মধ্য এশিয়ায় সেলজুক শাসনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিল খাওয়ারিজম শাহী রাজবংশ। সেলজুক শাসনের অবসান ঘটেছিল তুর্কিদের একটি গোত্র "তুর্কানে ঘুজ"-এর হাতে, যার বিস্তারিত বিবরণ সেলজুক সুলতানদের অবস্থা (চতুর্থ খণ্ড) প্রসঙ্গে অতিক্রান্ত হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে মধ্য এশিয়ার পূর্ব সীমান্তে অমুসলিম তুর্কিদের আরও একটি বিশাল গোত্র দখল জমিয়ে বসেছিল, যাদেরকে তুর্কানে খাতা (কারা খিতাই) বলা হতো। খাওয়ারিজমি সুলতানরা মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অনেকাংশে কমিয়ে আনেন এবং সেলজুকদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে একটি শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও সুসভ্য সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তাদের সীমান্ত ঘুরি সালতানাতের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। ফলে ঘুরি এবং খাওয়ারিজম শাহদের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ, গোপন ষড়যন্ত্র এবং প্রকাশ্য যুদ্ধের ধারাও শুরু হয়ে যায়।

এই দ্বন্দ্বের সূচনা মূলত তখন হয়েছিল যখন ৫৫৮ হিজরিতে (১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) খাওয়ারিজমি শাসক ইল আরসালানের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র আলাউদ্দিন তেকিশ রাজধানী উরগঞ্জ-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় গিয়াসউদ্দিন ঘুরির সিংহাসন আরোহণের প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তেকিশ গিয়াসউদ্দিন ঘুরির সাথে পারস্পরিক সীমান্ত সম্মানের চুক্তি করে শান্তি নিশ্চিত করেছিলেন।

কিন্তু তেকিশের ভাই সুলতান শাহ তার নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেন, ফলে তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের পথ সুগম হয়। সুলতান শাহ নিজের অবস্থান দুর্বল দেখে গিয়াসউদ্দিন ঘুরির কাছে চলে আসেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। গিয়াসউদ্দিন ঘুরি তার খরচের জন্য একটি জায়গির প্রদান করেন কিন্তু সামরিক সাহায্যের ব্যাপারে বিরত থাকেন কারণ সুলতান তেকিশের সাথে তখন সন্ধি চলছিল।

এটি দেখে সুলতান শাহ ঘূর থেকে তুর্কানে খাতার কাছে চলে যান এবং তাদের সাহায্য নিয়ে খোরাসানের একটি বড় অংশ তুর্কানে ঘুজের দখল থেকে মুক্ত করে নেন এবং মার্ভ-কে কেন্দ্র করে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি ঘুরি সালতানাতের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ শুরু করেন, যার প্রতিক্রিয়ায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঘুরি বামিয়ান ও সিস্তানের আমিরদের সাথে নিয়ে সুলতান শাহের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। মার্ভের কাছে মুরঘাব নদীর উপকূলীয় অঞ্চলে উভয় পক্ষ ছয় মাস পর্যন্ত মুখোমুখি অবস্থান করে এবং ছোটখাটো সংঘর্ষ চলতে থাকে। অবশেষে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় যাতে সুলতান শাহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং পিছু হটেন।

৫৮৯ হিজরিতে সুলতান শাহ, যিনি অসুস্থ ছিলেন, ওষুধ সেবনে অসতর্কতা অবলম্বন করেন এবং এরই প্রেক্ষিতে তার মৃত্যু হয়। এভাবে ঘুরিরা এই ফিতনা থেকে মুক্তি পায়। [১]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩০৩, ৩০৪

সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খ্‌ারেজম শাহের সাথে যুদ্ধসমূহ:

৫৯৬ হিজরিতে (১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) খ্‌ারেজম-এর বাদশাহ আলাউদ্দিন তেকিশের মৃত্যু হয় এবং তার তরুণ পুত্র আলাউদ্দিন মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মধ্য এশিয়াকে কারা-খিতাইদের ফিতনা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর জন্য তার প্রয়োজন ছিল ঘুরিদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের পশ্চাৎভাগ নিরাপদ রাখা। তাই তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঘুরিকে এই মর্মে বার্তা পাঠান যে, তিনি তাকে নিজের অভিভাবক ও পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিন যাতে তিনি অনুগত হিসেবে আশেপাশের দেশগুলো জয় করতে পারেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঘুরি এই বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ইতিবাচক উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু সুলতান শিহাবউদ্দিন ঘুরি এই বার্তাকে প্রতারণা মনে করেন এবং খোরাসানের ওপর সৈন্য পরিচালনা করে নাসা, মার্ভ, সারাখস, তুস এবং নিশাপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো খ্‌ারেজমিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। [১] এই কারণে সালতানাতে খ্‌ারেজম এবং ঘুরি সুলতানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতেও তাদের মধ্যে যুদ্ধ হতে থাকে।

গজনি থেকে ঘুজ গোত্রসমূহের বহিষ্কার:

গজনি সম্পর্কে আপনারা ইতিপূর্বেই পড়েছেন যে, খুসরো শাহ সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথেই ৫৫২ হিজরিতে গজনি ত্যাগ করেছিলেন। এর অল্পকাল পরেই আলাউদ্দিন জাহানসোজ একে ধ্বংস করে দেন। এরপর (সম্ভবত দুই বছর পর) তুর্কি ঘুজরা এই শহর দখল করে একে নিজেদের লুটতরাজ ও কর্মকাণ্ডের ঘাঁটিতে পরিণত করে এবং প্রায় বারো বছর পর্যন্ত তারা এখানে দখলদার হিসেবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। অবশেষে ৫৬৭ হিজরিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঘুরি এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে তুর্কি ঘুজদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং তাদের চিরতরে এই অঞ্চলগুলো থেকে বের করে দেন। (তবে ঘুরি বাহিনী সে সময় গজনিকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে ফিরে গিয়েছিল)। [২]

গজনি থেকে খুসরো মালিকের আমিরদের উচ্ছেদ:

এরপর লাহোরের গজনভি শাসক খুসরো মালিক কিছু আমিরকে পাঠিয়ে এখানে পুনরায় দুর্বল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় সুলতান গিয়াসউদ্দিন শিহাবউদ্দিনকে (দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানের প্রদেশ) গরমসিরের জেলা “তাকনাবাদ”-এ নিযুক্ত করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি গজনির উপকণ্ঠে দখলদার আমিরদের উত্যক্ত করতে থাকেন। পরিশেষে ৫৬৯ হিজরিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন নিজেই গজনির ওপর পূর্ণ আক্রমণ চালিয়ে খুসরো মালিকের আমিরদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেন এবং এই শহরটি তার ভাই শিহাবউদ্দিন ঘুরিকে অর্পণ করেন। [৩] [৪]

---

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৭, ৩০৮।

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৩... তুর্কি ঘুজদের গজনি দখল সম্ভবত ৫৫৫ হিজরিতে হয়েছিল, বারো বছর পর ৫৬৭ হিজরিতে তাদের উচ্ছেদ করা হয়।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২০০।

[৪] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৫।

মালহুজাহ: এখানে ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় মতভেদ রয়েছে। ফিরিশতার মতে, সুলতান ৫৬৭ হিজরিতে গজনিকে খুসরো মালিকের আমিরদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, যেখানে মিনহাজুস সিরাজ এবং সিরহিন্দির বর্ণনা অনুযায়ী গজনি তুর্কি ঘুজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সিরহিন্দির মতে এই ঘটনা ৫৬৯ হিজরির। (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৫) লেখকের মতে এই উক্তিগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যের রূপ এটাই যে, ৫৬৭ হিজরিতে গিয়াসউদ্দিন যে আক্রমণ করেছিলেন তাতে তুর্কি ঘুজদের বের করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ৫৬৯ হিজরিতে যে আক্রমণ হয় তাতে খুসরো মালিকের আমিরদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ওয়াল্লাহু আলাম।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর হিন্দুস্তানের নিয়াবত

গিয়াসউদ্দিন ঘুরীর শাসনকালের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য শিরোনাম হলো হিন্দুস্তানে ঘুরীদের বিজয়সমূহ, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর ভাই শাহাবুদ্দিন ঘুরী। শাহাবুদ্দিনের নাম ছিল মুহাম্মদ বিন বাহাউদ্দিন বিন সাম এবং উপাধি ছিল মুইজুদ্দিন। তবে ইতিহাসে এই মহান বীর শাহাবুদ্দিন ঘুরী নামেই খ্যাতি লাভ করেছেন।

শাহাবুদ্দিনকে সুলতানি নিয়াবত প্রদান:

গজনি দখলের পর গিয়াসউদ্দিন ঘুরী "ফিরোজকোহ"-তে ফিরে যান এবং শাহাবুদ্দিন ঘুরীকে কেবল গজনির শাসনভারই অর্পণ করেননি, বরং তাকে সাম্রাজ্যের নিয়াবতের সাথে সাথে সুলতান উপাধিও প্রদান করেন [১]।

সংক্ষেপে, গজনি এখন দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা লাভ করল। সেখানে রাজদরবার ও রাজসিংহাসনের ব্যবস্থা করা হলো এবং শাহাবুদ্দিন ঘুরীকে (নিজের সুলতানের অনুগত থেকে) সমস্ত রাজকীয় সম্মান প্রদান করা হলো। এই অসীম ক্ষমতার সাথে গজনিকে গজওয়ায়ে হিন্দের জন্য সামরিক কেন্দ্রে পরিণত করা হলো।

গজনি দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে:

গজনি এবং ফিরোজকোহ-এর মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। ফিরোজকোহ দুর্গটি "ঘুর"-এর এক দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি যতটা নিরাপদ ছিল, সেখান থেকে সংবাদ ও তথ্যের আদান-প্রদান, বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা ততটাই কঠিন ছিল।

এটি একটি রক্ষণাত্মক আশ্রয়স্থল তো ছিল, কিন্তু একটি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত ছিল না।

গজনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথে অবস্থিত ছিল যা হিন্দুস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ইরানকে একে অপরের সাথে যুক্ত করত। যদিও আলাউদ্দিন জাহান-সোজ একে চরমভাবে ধ্বংস করেছিলেন, তবুও এর ভৌগোলিক অবস্থান বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং সামরিক চলাচলের জন্য সর্বোত্তম ছিল। তাছাড়া, গজনি গজনভী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং পুনরায় একটি রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার যোগ্য ছিল।

কারণ এখানে তুলনামূলকভাবে পানি এবং খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত, তাই এখানে একটি বিশাল সেনাবাহিনী রাখা সহজ ছিল।

শাহাবুদ্দিন ঘুরী হিন্দুস্তানের নায়েবে সুলতান হিসেবে তিন দশক পর্যন্ত এই শহরকে নিজের কেন্দ্র হিসেবে ধরে রাখেন। এর পাশাপাশি ধীরে ধীরে এই শহরের পূর্বের ঐতিহাসিক জৌলুসও অনেকাংশে ফিরে আসে।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৫

শাহাবুদ্দিন ঘুরীর প্রাথমিক কার্যক্রম:

প্রথম বছর (৫৬৯ হিজরি) শাহাবুদ্দিন গজনীর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর ওপর পূর্ণ আধিপত্য অর্জন করেন এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে আনেন। এর পরের বছর ৫৭০ হিজরিতে তিনি সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ভারতের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত এলাকা "গারদিজ" জয় করেন। [১]

শাহাবুদ্দিন ঘুরীর ভারত বিজয়

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর ভারত বিজয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

১. উচ্চ সিন্ধু, মুলতান, উচ:

প্রায় দেড় শতাব্দী পূর্বে এখানে সুলতান মাহমুদ গজনভী সৈন্য পরিচালনা করে কারামাতিদের ওপর মারাত্মক আঘাত হেনেছিলেন এবং মুলতানকে তাদের থেকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সুলতানের মৃত্যুর পর এই লোকেরা পুনরায় নিজেদের সংগঠিত করে নেয় এবং ধীরে ধীরে মুলতান ও এর আশপাশের এলাকায় পুনরায় তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহাবুদ্দিন ঘুরী এই ফিতনা নির্মূল করার জন্য শাবান ৫৭১ হিজরিতে (ফেব্রুয়ারি ১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) উচ্চ সিন্ধুকে পদানত করেন এবং এরপর জিলকদ (মে) মাসে মুলতান আক্রমণ করেন এবং কারামাতিদের সমূলে উৎপাটন করে এই অঞ্চলকে তাদের থেকে মুক্ত করেন। এরপর ঘুরী বিজেতা "উচ" দখল করেন।

এরপর এই পুরো এলাকা আলী কারমাখ-এর ওপর ন্যস্ত করে ফিরে যান। যাওয়ার পূর্বে শাহাবুদ্দিন ঘুরী এখানে এমন মজবুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে এরপর কারামাতিরা এই এলাকায় পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। (এই কারণেই কারামাতিরা শাহাবুদ্দিন ঘুরীকে চরম ঘৃণা করত এবং এই কারণেই ৩০ বছর পর কারামাতিদের একটি শাখা বাতিনিয়া-এর অনুচররা শাহাবুদ্দিন ঘুরীকে শহীদ করে দেয়।) [২]

২. গুজরাটে ভীম দেবের সাথে যুদ্ধ ও পরাজয়:

৫৭৪ হিজরিতে (১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) শাহাবুদ্দিন ঘুরী দ্বিতীয়বার হিন্দুস্তানে পা রাখেন। লক্ষ্য ছিল গুজরাট আক্রমণ করে সুলতান মাহমুদ গজনভীর কীর্তিসমূহের পুনরাবৃত্তি করা। মুসলিম বাহিনী মুলতান ও উচ হয়ে রাজস্থানের...

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৫

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২০১, ২০২; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৬, ৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ফিরিশতা উচ বিজয়ের প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, শাহাবুদ্দিন ঘুরী উচের রানীর কাছে বার্তা পাঠিয়ে তার মাধ্যমে তার স্বামীকে হত্যা করান এবং শহর দখল করেন। এরপর রানীর মেয়েকে ইসলামে দীক্ষিত করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মা ও মেয়েকে গজনীতে পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনাটি পর্যালোচনার দাবি রাখে এবং আপাতদৃষ্টিতে সঠিক নয়। অন্য কোনো উৎস থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, সেই সময়ে উচে হিন্দু রাজাদের শাসন ছিল না বরং সম্ভবত মুলতানের মতো এটিও কারামাতিদের দখলে ছিল।

স্থান পরিচিতি: উচ (অজ): পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। এটি বাহাওয়ালপুর থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং পাঞ্জনাদ থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম সমাহিত আছেন যার কারণে একে "উচ শরীফ" বলা হয়।

মরুভূমি অতিক্রম করে গুজরাটে প্রবেশ করলেন এবং এর রাজধানী 'আনহিলওয়ারা' (পত্তন)-এর কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানকার রাজা ভীমদেব এক বিশাল বাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক হাতি নিয়ে মোকাবিলায় বেরিয়ে এলেন। 'আবু পর্বত'-এর কাছে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো। মুসলিম সৈন্যরা দীর্ঘ সফরের কারণে অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। অন্যদিকে শাহাবুদ্দিন এবং তুর্কি সেনা কর্মকর্তাদের জন্য কোনো হিন্দু রাজার সাথে যুদ্ধের এটিই ছিল প্রথম সুযোগ। পরিশেষে এই ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলিমরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো, শাহাবুদ্দিন ঘুরি এবং অবশিষ্ট সৈন্যরা কোনোমতে গুজরাট থেকে বেরিয়ে কোনো না কোনোভাবে গজনিতে ফিরে পৌঁছালেন। [১]

৪. যুদ্ধের নতুন নকশা: পেশোয়ার বিজয়:

এই পরাজয় থেকে শাহাবুদ্দিন ঘুরি অনেক কিছু শিখলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তিনি বুঝতে পারলেন তা হলো, পেছনে মজবুত দুর্গ এবং সাহায্যকারী বাহিনী না রেখে এত দীর্ঘ সফর করে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে শাহাবুদ্দিন ঘুরি হিন্দুস্তান আক্রমণের জন্য যুদ্ধের নকশা, রণকৌশল এবং অগ্রাধিকারগুলো পুরোপুরি বদলে দিলেন। এখন অগ্রাধিকার ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের সুরক্ষিত বড় শহরগুলো পর্যায়ক্রমে জয় করে যমুনার উপকূলীয় শহরগুলোতে আক্রমণ করা এবং দোয়াব অঞ্চল জয় করে পূর্ব ও মধ্য হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হওয়া। পেশোয়ার, লাহোর এবং ভাতিন্ডা ছিল এই নকশার প্রথম তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ফলে ঘুরি ৫৭৫ হিজরি (১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)-তে বগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত এবং এর আশপাশের অনেক জেলা দখল করে নিলেন। [২]

৫. লাহোর অভিযান:

৫৭৭ হিজরি (১১৮১ খ্রিষ্টাব্দ)-তে লাহোরের দিকে যাত্রা শুরু হলো যা গজনভিদের রাজধানী ছিল। এই সফরে শেষ গজনভি শাসক খসরু মালিকের সাথে আলোচনা হলো। খসরু মালিক সদিচ্ছার নিদর্শন হিসেবে নিজের ছেলেকে একটি হাতিসহ ঘুরি বিজেতার দরবারে পাঠালেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট ছিল যে এই পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ঘুরিদের গজনভি শাসকের কাছ থেকে লাহোর নিতেই হতো, তবেই তারা উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর ভারতে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ চালাতে পারতেন। [৩]

৬. নিম্ন সিন্ধু অভিযান:

৫৭৮ হিজরি (১১৮২ খ্রিষ্টাব্দ)-তে শাহাবুদ্দিন ঘুরি সিন্ধুর বিখ্যাত বন্দর দেবল আক্রমণ করেন এবং তা জয় করার পর অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। এখানকার প্রায় সকল হিন্দু শাসক আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং কর দিতে সম্মত হন। [৪]

৭. শিয়ালকোট নির্মাণ:

৫৮০ হিজরি (১১৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)-তে শাহাবুদ্দিন ঘুরি লাহোরে একটি পরীক্ষামূলক আক্রমণ করেন এবং আশপাশের এলাকায় অতর্কিত হামলা...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২০২; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৯

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৯; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২০২

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৯

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৯; ফেরেশতা একে ৫৭৬ হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু ৫৭৮ হিজরিই প্রচলিত।

অধিকৃত এলাকাগুলোতে পা রাখার পর এবং আরও সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য রাভি ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি অত্যন্ত মজবুত দুর্গ নির্মাণ করা হয় যা "শিয়ালকোট" নামে পরিচিত। শাহাবুদ্দিন ঘুরি প্রখ্যাত জেনারেল হুসাইন বিন খুরমিলকে এর গভর্নর নিযুক্ত করেন। উত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ বিজয়ের ক্ষেত্রে এই দুর্গের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শাহাবুদ্দিন ঘুরির প্রত্যাবর্তনের পর গজনভি শাসক খসরু মালিক তার সেনাবাহিনী ও খোখরদের দল নিয়ে এখানে আসেন। যেহেতু তিনি লাহোরের কাছে এই শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্রটিকে নিজের জন্য হুমকি মনে করতেন, তাই দীর্ঘ সময় ধরে এটি অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু এই দুর্গটি এতটাই মজবুত ছিল যে তিনি কিছুই করতে পারেননি এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এই নিষ্ফল অভিযান থেকে তিনি নিজেরই ক্ষতি করেন এবং ঘুরিদের লাহোর দখলের অজুহাত তৈরি করে দেন। [১]

৭. লাহোর অভিযান:

৫৮২ হিজরিতে (১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) শাহাবুদ্দিন ঘুরি লাহোর অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন এবং কোনো রক্তপাত ছাড়াই শেষ গজনভি শাসক খসরু মালিকের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন। শাহাবুদ্দিন ঘুরি লাহোরকেও আলী কারমাখের হাতে ন্যস্ত করেন, তবে বিচার বিভাগকে আলাদা রাখেন এবং সেখানে মাওলানা সিরাজউদ্দিনকে (কাজী মিনহাজুস সিরাজের পিতা) নিযুক্ত করেন। এখন পেশোয়ার থেকে লাহোর এবং শিয়ালকোট পর্যন্ত বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত এলাকা ঘুরিদের অধীনে ছিল, যেখানে বিভিন্ন স্থানে তাদের সামরিক ছাউনি স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর ভারতের শক্তিশালী হিন্দু রাজাদের সাথে যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। [২]

৮. ভাতিন্ডা দখল—তরাইনের প্রথম যুদ্ধ:

লাহোর থেকে দিল্লি যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম পথে "তাবারহিন্দ" (ভাতিন্ডা) নামক একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ অবস্থিত ছিল যা দিল্লি ও আজমিরের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের অধীনে ছিল। শাহাবুদ্দিন ঘুরির পরবর্তী লক্ষ্য ছিল এটিই।

৫৮৭ হিজরিতে (১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ) ঘুরি বাহিনী পশ্চিম পাঞ্জাব অতিক্রম করে পূর্ব পাঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং দেখতে দেখতেই ভাতিন্ডা দুর্গ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ঘুরি বুঝতে পেরেছিলেন যে এখান থেকে সামনে অত্যন্ত শক্তিশালী হিন্দু রাজাদের সাথে মোকাবিলা করতে হবে, তাই তিনি আরও অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে গজনীতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে গজনভি লস্কর ও হিন্দুস্তানে মোতায়েনকৃত সৈন্যদের মধ্য থেকে বারোশ সৈন্যকে এই দুর্গে থাকার নির্দেশ দেন। ফলে দুর্গের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তুলাকি পরিবারের মালিক বাহাউদ্দিন এবং মালিক জিয়াউদ্দিনের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং এই প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয় যে তারা অন্তত আট মাস এই দুর্গটি রক্ষা করবেন, যাতে এই সময়ের মধ্যে গজনী থেকে অতিরিক্ত সৈন্য এখানে আনা যায়। [৩]

পৃথ্বীরাজ চৌহান নিজের সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত দুর্গের ওপর ঘুরিদের এই দখলদারিত্বকে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে দেখেছিলেন এবং...

---

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৯৭, ৩৯৮

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৯৮

[৩] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৯৮, ৩৯৯; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৭

অন্যান্য স্থানীয় রাজাদের সাথে যোগাযোগ করে একটি সম্মিলিত বাহিনী প্রস্তুত করতে লাগলেন, যার নেতৃত্ব তিনি দিল্লিতে তাঁর প্রতিনিধি গোবিন্দ রায় এবং তাঁর এক অধীনস্থ শাসক 'রায় কোলা'-র হাতে অর্পণ করেন। অবশেষে এই পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনী ভাতিন্ডার দিকে অগ্রসর হতে লাগল, যাতে দুই লক্ষ অশ্বারোহী, তিন হাজার হাতি এবং অগণিত পদাতিক সৈন্য ছিল।

শাহাবুদ্দিন ঘুরি যখন গজনী ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন এই সংবাদ পেয়ে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে যুদ্ধের জন্য কোমর বেঁধে নিলেন এবং ভাতিন্ডায় শত্রুর অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই অগ্রসর হয়ে দিল্লি থেকে ১৫২ কিলোমিটার উত্তরে 'তরাউড়ি' (তরাইন) [১]-এর ময়দানে তাবু স্থাপন করলেন, যেখানে কোনো এক সময় সরস্বতী নদী [২] পাশ দিয়েই প্রবাহিত হতো।

ভয়াবহ যুদ্ধের পর ইসলামী লশকরের ডান ও বাম পার্শ্বের পা উপড়ে গেল (পিছু হটল)। কলব-এ মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য শাহাবুদ্দিন ঘুরির নেতৃত্বে দীর্ঘক্ষণ তিন দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকলেন।

এমন পরিস্থিতিতে এক আমির পরামর্শ দিলেন যে, নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে লাহোরের দিকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু শাহাবুদ্দিন ঘুরি পলায়নের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করলেন এবং মোকাবিলা জারি রাখলেন। এটি দেখে দিল্লির রাজা গোবিন্দ রায় তাঁর হাতি এবং বর্মধারী বাহিনীর সাথে এগিয়ে এলেন। শাহাবুদ্দিন ঘুরি তাকে দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে তার ওপর আক্রমণ করলেন এবং বর্শার আঘাতে তার হাতিকে জখম করে দিলেন। এরপর বর্শা গোবিন্দের মুখে আঘাত করলেন, যার আঘাতে তার দুটি দাঁত মুখের ভেতরে পড়ে গেল। গোবিন্দ রায়ও লক্ষ্য স্থির করে একটি বল্লম মারলেন যা ঘুরির বাহুতে বিঁধে গেল। যন্ত্রণার তীব্রতা সুলতানকে ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে দিল না। যদিও নিজের জ্ঞান হারাননি এবং ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কিন্তু ঘোড়সওয়ারি করার শক্তি ছিল না। সুলতানের এই অবস্থা দেখে অফিসারদের জ্ঞান লোপ পেল। তারা সুলতানকে বাঁচানোর কথা ভুলে গেলেন এবং প্রাণভয়ে ময়দান থেকে...

---

[১] তরাউড়ি (তরাইন) ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের কার্নাল জেলায় অবস্থিত, যা দিল্লি থেকে ১৫২ কিলোমিটার উত্তরে এবং কার্নাল থেকে দশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

[২] সরস্বতী নদী, যার উল্লেখ প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বিশেষ করে ঋগ্বেদে একটি মহান ও পবিত্র নদী হিসেবে এসেছে, বর্তমানে তা পূর্ণ প্রবাহমান অবস্থায় নেই। এটি একটি বিলুপ্ত নদী হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে সরস্বতীকে হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে আরব সাগরে পতিত হওয়া একটি শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী প্রবাহের নদী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সরস্বতী নদীর প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এর উপনদীগুলো: শতদ্রু ও যমুনা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে নিয়েছে, যার ফলে এই নদী শুকিয়ে গেছে।
সরস্বতী নদীর বর্তমান নাম সাধারণত ঘাগর-হাকড়া নদী ব্যবস্থা, এবং এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুষ্ক বা মৌসুমি নদী হিসেবে উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের অঞ্চলে পাওয়া যায়। প্রাচীন সরস্বতী নদী মূলত ঘাগর-হাকড়া নদী ব্যবস্থার অংশ ছিল। ঘাগর নদী আজও উত্তর ভারত, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থানের কিছু অংশে বর্ষাকালে প্রবাহিত হয়। হাকড়া হলো এই ঘাগর নদীর সেই সম্প্রসারিত অংশ যা পাকিস্তানে প্রবাহিত হয় এবং বর্তমানে বেশিরভাগ সময় শুষ্ক থাকে। এর চিহ্ন চোলিস্তান মরুভূমি (পাকিস্তান) এবং রাজস্থানে (ভারত) দেখা যায়। একে সাধারণত আজও ঘাগর-হাকড়া নদী ব্যবস্থাই বলা হয়। যদিও হরিয়ানা ও রাজস্থানের কিছু এলাকায় এখনও এর কিছু অংশকে স্থানীয়ভাবে সরস্বতী বলা হয়, তবে এটি একটি মৌসুমি নদী বা বর্ষাতি নালা। স্যাটেলাইট চিত্র এবং ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানের গবেষণায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ঘাগর-হাকড়া ব্যবস্থাটি সত্যিই একটি বিশাল নদীর অংশ ছিল যা হাজার হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে প্রবাহিত হতো। হরপ্পা সভ্যতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই শুষ্ক নদীর উপত্যকার কাছেই পাওয়া গেছে, যা এই সত্যকে নিশ্চিত করে যে এটি একটি উর্বর ও জনবহুল এলাকা ছিল।

পালিয়ে গেল। একজন খিলজি বালক পেছনে রয়ে গিয়েছিল এবং সে সুলতানকে ঘোড়ার ওপর টলমল করতে দেখেছিল। কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই সে বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল। এক হাত দিয়ে সুলতানকে সামলে নিল এবং অন্য হাত দিয়ে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এড় লাগিয়ে দিল। উন্নত জাতের ঘোড়া বাতাসের সাথে কথা বলতে লাগল এবং শত্রুদের ঘেরাও থেকে সুলতানকে বের করে নিয়ে গেল।

সুলতানের বাহিনী যা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, এক মঞ্জিল (প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার) দূরে গিয়ে কোনো এক নিরাপদ স্থানে একত্রিত হতে শুরু করেছিল। আমির ও কর্মকর্তারা নিজেদের মনে সুলতানের জন্য যেন ফাতেহা পড়ে নিয়েছিলেন। হঠাৎ তারা খিলজি বালককে সুলতানের ঘোড়ায় কোনো এক আহত ব্যক্তিকে সামলে নিয়ে আসতে দেখল। সবাই একত্রিত হলো এবং সুলতানকে জীবিত দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। সুলতানের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। প্রয়োজনীয় মলম-পট্টি এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুলতানকে একটি পালকিতে শুইয়ে দিয়ে অবিলম্বে ফিরতি সফর শুরু করা হলো, কারণ বিপদ খুব একটা দূরে ছিল না।

ওদিকে লশকরে ইসলামের প্রত্যাবর্তনের পর পৃথ্বীরাজ নির্ভয়ে ভাতিন্ডা অবরোধ করল। এখানে সুলতানের নায়েব জিয়াউদ্দিন তুকলি তেরো মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ থেকে প্রতিরোধ চালিয়ে যান, কিন্তু ধীরে ধীরে খাদ্যের মজুদ শেষ হয়ে এল। তখন জিয়াউদ্দিন নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় দুর্গের দরজা খুলে দিলেন। পৃথ্বীরাজ অবরুদ্ধদের পথ ছেড়ে দিল।

শাহাবুদ্দিন ঘুরি এই পরাজয়ে অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। রাজধানী ফিরে গিয়ে তিনি সেইসব আমিরদের কঠোর জবাবদিহিতার সম্মুখীন করেন যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এর পাশাপাশি এই মুজাহিদ এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতিতে এমনভাবে মগ্ন হলেন যে পেট ভরে খাওয়া এবং নরম বিছানায় ঘুমানোও ছেড়ে দিলেন। এক বছর পর্যন্ত নিজের পোশাকও পরিবর্তন করেননি।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ:

এক বছর পর শাহাবুদ্দিন ঘুরি ব্যাপক প্রস্তুতির সাথে হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করেন এবং লাহোর পৌঁছে পৃথ্বীরাজের কাছে ইসলামের দাওয়াতের পয়গাম পাঠান। কিন্তু সে কোনো ইতিবাচক উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে হিন্দুস্তানের সমস্ত রাজা ও মহারাজাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়। দেশ ও ধর্মের নামে দেড়শ হিন্দু রাজা তার চারপাশে একত্রিত হলো, যারা হাতে তিলক লাগিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতার কসম খেল যে তারা মুসলমানদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবে। এভাবে তিন লক্ষাধিক সৈন্য এবং তিন হাজার যুদ্ধংদেহী হাতি সম্বলিত লশকরে কুফফার যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ল।

১লা জমাদিউল আখিরাহ ৫৮৮ হিজরি (১৪ই জুন ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে আবারও সরস্বতী নদীর তীরে তরাইনের ময়দানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরি নিজের তাবু ঠিক সেই জায়গায় গাড়লেন যেখানে গতবার লাগিয়েছিলেন। রাজপুতদের সেনাপতি ছিল গোবিন্দ রায়। ডান পার্শ্বের বাহিনী 'রাওয়াল' নামক সরদারের কমান্ডে ছিল, আর বাম পার্শ্বের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল 'ভোলা' নামক সরদার। বাহিনীতে তিন হাজার হাতিও ছিল যা ইসলামি ফৌজে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারত।

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৮ থেকে ৪০০; তারিখে মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৮, ৯; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২০৩ থেকে ২০৫।

প্রতিপক্ষের শক্তি এবং পূর্ববর্তী যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় রেখে শিহাব উদ্দিন ঘুরি অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে যুদ্ধের নকশা তৈরি করেন। তাঁর সাথে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। তিনি একটি বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন এবং ঘুরির নিকটেই অবস্থান করছিলেন। খারবাক অগ্রবর্তী দলের কমান্ডার ছিলেন। হুসাইন খুরমিলকে অতর্কিত আক্রমণকারী দলের কমান্ড দেওয়া হয়েছিল। [১] এটি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত সেই দল ছিল যাদের তিন ক্রোশ (ছয় মাইল) পেছনে রাখা হয়েছিল যাতে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের শক্তির সঠিক আন্দাজ করতে না পারে এবং এই সংরক্ষিত শক্তিকে বিশেষ মুহূর্তে কাজে লাগানো যায়।

যুদ্ধের আগে সুলতান চল্লিশ হাজার দ্রুতগামী অশ্বারোহী নিলেন এবং তাদের দশ দশ হাজারের চারটি বাহিনীতে বিভক্ত করে দিলেন। তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো যেন তারা প্রতিপক্ষের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময়ে তাদের মধ্য থেকে একটি বাহিনী শত্রুর মোকাবিলা করবে। যখন শত্রু সেই দিকে আক্রমণ করবে, তখন বাকি তিন দিকের অশ্বারোহীরা শত্রুর ওপর তীরের বৃষ্টি শুরু করে দেবে। [২]

পরিশেষে এই বিন্যাস অনুযায়ী যুদ্ধ শুরু হলো। সর্বপ্রথম উভয় পক্ষের অগ্রবর্তী দলগুলো একদিকে গোবিন্দ রায় এবং অন্যদিকে খারবাকের নেতৃত্বে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। যখন গোবিন্দ হাতিগুলোকে সামনে এগিয়ে দিলেন, তখন খারবাক তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন যাদের নিখুঁত নিশানায় মুহূর্তের মধ্যে তিন-চারজন মাহুত আহত হলো এবং হাতিদের সারি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। অন্যদিকে সুলতানের দশ দশ হাজার সৈন্য নির্ধারিত বিন্যাস অনুযায়ী একে একে তিন দিক থেকে তীরের বর্ষণ করে প্রতিপক্ষকে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করতে লাগল। সুলতানের রণকৌশল রাজপুতদের সংখ্যাধিক্যকে অকেজো করে দিল এবং তাদের বিশাল বাহিনীর ব্যূহ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। [৩]

শত্রুকে যথেষ্ট পরিমাণে ছত্রভঙ্গ, দুর্বল ও ভীত করার পর সুলতান শেষ চাল চাললেন এবং বিভিন্ন দিকে প্রতিপক্ষের সাথে লড়াইরত দলগুলোকে লোকদেখানোভাবে ময়দান ছেড়ে পালানোর নির্দেশ দিলেন। ফলে এই দলগুলো দ্রুত পিছু হটতে শুরু করল। প্রতিপক্ষ তাদের হাতি ও ঘোড়া নিয়ে তাদের পিছু নিল এবং এভাবে তাদের সংখ্যাধিক্য আরও বেশি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এবার পিছু হটা মুসলমানরা ঘুরে দাঁড়াল। তারা মাহুতদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হাতিগুলোকে অকেজো করে দিল এবং শত্রুদের সারিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এটি ছিল যুদ্ধের শেষ পর্যায় যাতে এখন উভয় পক্ষের শক্তির ভারসাম্য সমান হয়ে গিয়েছিল।

সূর্যাস্তের সময় যখন যুদ্ধ পূর্ণ তীব্রতায় চলছিল, শিহাব উদ্দিন ঘুরি সংরক্ষিত সৈন্যদের মধ্য থেকে বারো হাজার অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে নিজে শত্রুর ওপর অত্যন্ত আক্রমণাত্মক হামলা চালালেন এবং তাদের সারিগুলো তছনছ করে দিলেন। বড় বড় হিন্দু রাজারা নিহত হলেন। মুসলমানদের বড় শত্রু “গোবিন্দ রায়”ও নিহত হলেন। তার কাটা মাথা সুলতানের সামনে আনা হলো। সুলতান তার মুখ খুললেন এবং যখন দেখলেন যে দুটি দাঁত ভাঙা, তখন নিশ্চিত হলেন যে এটি তারই মাথা। [৪]

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন, ইছামী: পৃ. ৭৭, ৭৮

[২] ফুতুহুস সালাতিন, ইছামী: পৃ. ৭৭, ৭৮

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ২০৫ থেকে ২০৯; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৯, ১০, ১১; তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ৩৯৯ থেকে ৪০৪

[৪] তারিখ-ই-মুবারক শাহী, ইয়াহইয়া সিরহিন্দি: পৃ. ৯

পৃথ্বীরাজের গ্রেফতারি ও পরিণতি:

পৃথ্বীরাজ যখন পরাজয় সামনে দেখলেন, তখন হাতি থেকে নেমে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিম দিকে (১১০ কিলোমিটার দূরে) অবস্থিত "সরস্বতী" (সরসা) দুর্গের দিকে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু মুজাহিদগণ তার পিছু নিয়েছিলেন। অবশেষে তাকে উক্ত এলাকার সীমানায় গ্রেফতার করা হয়। এখন মুসলমানদের মোকাবিলায় কোনো সৈন্য ছিল না, তাই খুব দ্রুত সরস্বতী দুর্গ এবং তারপর এর উত্তর-পূর্বে (পাতিয়ালার কাছে অবস্থিত) সামানা ও কুহরামও জয় করা হয়। সরস্বতী দুর্গ থেকে (১২০ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত "হাসি" দুর্গও জয় করা হয়। এরপর ইসলামের বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হয় যেখানে (হাসি থেকে ২৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) পৃথ্বীরাজের রাজধানী আজমির দখল করে নেওয়া হয়। [১]

শাহাবুদ্দিন ঘুরি তখন পৃথ্বীরাজকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে আজমিরের করদ রাজা হিসেবে বহাল রাখেন। [২]

এটি ভিন্ন কথা যে, কিছুকাল পর পৃথ্বীরাজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিদ্রোহ করেন, যার ফলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তবে শাসন ক্ষমতা তার পরিবারের কাছ থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি, বরং তার ছেলে গোবিন্দ রাজকে আজমিরের শাসক নিযুক্ত করা হয়। হাসান নিজামী লিখেছেন যে, পৃথ্বীরাজের এই ছেলেটি অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমান ও অনুগত ছিল এবং তাকে যোগ্যতা অনুযায়ী এই পদ দেওয়া হয়েছিল। [৩]

শাহাবুদ্দিনের প্রত্যাবর্তন, কুতুবুদ্দিন আইবেকের প্রতিনিধিত্ব:

এই ঐতিহাসিক অভিযানের পর শাহাবুদ্দিন শিবালিক পর্বতমালা (কুহিস্তান-ই-শিওয়ালিক) এর পথ ধরেন এবং এর কয়েকটি জেলা জয় করে ফিরে যান। এর আগে বিজিত এলাকাগুলোতে তার গোলাম কুতুবুদ্দিন আইবেকে নায়েব শাসক হিসেবে "কুহরাম"-এ রেখে যান, যিনি কয়েক মাসের মধ্যে দিল্লি ও মিরাট জয় করে এই সমস্ত এলাকায় ইসলামি শরিয়ত জারি করেন। [৪]

গাহড়বাল সালতানাত: চান্দোয়ারের যুদ্ধ, বেনারস বিজয়:

এই যুগে বেনারস ও এর আশপাশে একটি শক্তিশালী হিন্দু সালতানাত বিদ্যমান ছিল যাকে "গাহড়বাল" বংশ বলা হতো...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪০০; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১১; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২০৮, ২০৯।

[২] তাজুল মাআসির, হাসান নিজামী: পৃ. ৮১, মুদ্রিত: ফারসি গবেষণা কেন্দ্র, ইরান।

দ্রষ্টব্য: মিনহাজুস সিরাজের একটি বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, পৃথ্বীরাজকে তখনই হত্যা করা হয়েছিল: "পৃথ্বী রায় হাতির পিঠে ছিলেন, নিচে নামলেন এবং ঘোড়ায় চড়লেন, এবং পলায়নের সময় সরস্বতী সীমানায় ধরা পড়লেন এবং তাকে জাহান্নামে পাঠানো হলো।" (তাবাকাত: পৃ. ৪৪০)। কিন্তু তাজুল মাআসির, যা দিল্লি সুলতানদের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস এবং এর লেখক হাসান নিজামী শাহাবুদ্দিন ঘুরির সমসাময়িক ছিলেন, তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে পৃথ্বীরাজকে ক্ষমা করা হয়েছিল এবং তাকে আজমিরের করদ রাজা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও প্রফেসর খালিক নিজামীর মতে, পৃথ্বীরাজের শেষ দিনগুলোতে আবিষ্কৃত কিছু মুদ্রায় খোদাই করা শব্দ থেকেও জানা যায় যে, তার শেষ দিনগুলো (সম্ভবত কয়েক মাস) সুলতান ঘুরির করদ রাজা হিসেবে কেটেছিল। (জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ২৩৮)।

[৩] তাজুল মাআসির: পৃ. ৮৫।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২০৯; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০; তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ৪০১। স্থানের ব্যাখ্যা: শিবালিক পর্বতমালা বলতে সেই পর্বতশ্রেণীকে বোঝায় যা হরিয়ানা থেকে হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত। পাঞ্জাবের আম্বালা, হোশিয়ারপুর, পাঠানকোট ইত্যাদি এর বিখ্যাত শহর।

হয়। এটি রাজপুতদের অন্যতম শক্তিশালী একটি রাজবংশ ছিল এবং চৌহান রাজপুত যেমন পৃথ্বীরাজ চৌহান ইত্যাদির সাথে তাদের শত্রুতা ছিল। এই বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি দোয়াব এবং বিহারের বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বেনারস (বারাণসী) তাদের শাসনাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল এবং ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের মর্যাদা রাখত। কনৌজও তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল, অন্যদিকে ইটাওয়া এবং কোল (বর্তমান আলীগড়) এই সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। [১]

শিহাবুদ্দিন ঘুরি সংবাদ পেলেন যে, রাজা জয়চন্দ্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করছেন। তাই সুলতান আবারও হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করলেন। সুলতানের প্রখ্যাত সেনাপতি হুসাইন বিন খুরমীলও এই যুদ্ধে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে শরীক ছিলেন। এই বাহিনী 'কোল' (বর্তমান আলীগড়)-এর শক্তিশালী দুর্গ জয় করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হলো।

৫৯০ হিজরি (১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে 'চান্দাওয়ার'-এর ময়দানে যমুনা নদীর তীরে বেনারস ও কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের সাথে সংঘর্ষ হয়, যিনি তিন হাজার হাতি এবং অসংখ্য সৈন্য নিয়ে ময়দানে এসেছিলেন। যুদ্ধ বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে এবং উভয় পক্ষ থেকে তীব্র আক্রমণ চালানো হয়। যুদ্ধের চূড়ান্ত মোড় তখন আসে যখন একটি তীর রাজা জয়চন্দ্রের চোখে বিদ্ধ হয় এবং তিনি নিজের হাতি থেকে পড়ে যান। তার মৃত্যু বা গুরুতর আহত হওয়ার খবরে হিন্দুদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, যার ফলে ঘুরি বাহিনী বিজয় লাভ করে। প্রায় তিন হাজার হাতি মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধটি উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হয়। এই বিজয়ের ফলে পূর্বে বেনারসসহ অনেক এলাকা পর্যন্ত ইসলামী সালতানাত বিস্তৃত হয় এবং যমুনা ও গঙ্গার দোয়াবের অধিকাংশ এলাকা ঘুরিদের অধীনে চলে আসে এবং উত্তর ভারতে ঘুরি সালতানাতের ভিত্তি আরও মজবুত হয়। যদিও 'গহড়বাল সালতানাত' পুরোপুরি নির্মূল হয়নি এবং কনৌজসহ কিছু কেন্দ্র এই বংশের দখলেই ছিল। [২]

১১. বায়ানা ও গোয়ালিয়র অভিযান: ৫৯২ হিজরি (১১৯৬ খ্রিস্টাব্দ)

৫৯২ হিজরিতে শিহাবুদ্দিন ঘুরি আবারও হিন্দুস্তানের দিকে মুখ ফেরালেন। এবার লক্ষ্য ছিল মধ্য ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী যার কেন্দ্র ছিল 'বায়ানা' [৩], যেখানে 'ভাট্টি রাজপুত' শাসক 'কুমার পাল'-এর শাসন ছিল। শিহাবুদ্দিন ঘুরির আক্রমণে...

---

[১] গহড়বাল সালতানাত একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য রাজপুত সালতানাত ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রদেব, যিনি ১০৯০ খ্রিস্টাব্দের আগে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। গহড়বাল সালতানাত চন্দ্রার পৌত্র গোবিন্দ চন্দ্রের শাসনামলে (প্রায় ১১১৪ থেকে ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দ) চরম উন্নতি লাভ করে, যিনি নিজের সালতানাতকে যথেষ্ট বিস্তৃত করেছিলেন। যদিও প্রাথমিকভাবে এই বংশের কেন্দ্র ছিল কনৌজ, কিন্তু গোবিন্দ চন্দ্র নিজের রাজধানী কনৌজ থেকে বেনারসে (বারাণসী) স্থানান্তরিত করেন। এতে বেনারসের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। গহড়বাল শাসকদের অধিকাংশ শিলালিপিও বারাণসী থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। গহড়বাল শাসকরা হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তারা সংস্কৃত সাহিত্য ও মন্দির নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিহাবুদ্দিন ঘুরির হিন্দুস্তানে আগমনের সময় গহড়বাল সালতানাতের শাসক ছিলেন রাজা জয়চন্দ্র (Jayachandra), যার শাসনকাল ১১৭০ থেকে ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল।

[২] (তারিখে মুবারক শাহী: পৃ. ১১; তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৭৩; তাজুল মাআসির: পৃ. ১৫৪ থেকে ১৫৭; আল-ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ৯৩ থেকে ৯৬; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২০৯)

[৩] স্থানের ব্যাখ্যা: 'বায়ানা' ভারতীয় রাজ্য রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় দিল্লি থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

আত্মরক্ষার জন্য সে নিজের কেন্দ্র 'বিয়ানা' ছেড়ে 'থানকার' [১]-এর মজবুত দুর্গে মোরচাবন্দি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হতে হয়। 'থানকার'-এর সাথে সাথে সেই সালতানাতের শহর 'মান্দারগড়'-এর ওপরও দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহাবুদ্দিন ঘুরি এখানে বাহাউদ্দিন তুঘরিলকে শাসক নিযুক্ত করেন।

এরপর ঘুরি 'গোয়ালিয়র'-এর মজবুত দুর্গের দিকে অগ্রসর হন যেখানে 'পরিহার বংশের' রাজা 'সুলক্ষণ পাল'-এর শাসন ছিল। সে যুদ্ধ না করেই আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। [২]

বিহার ও বাংলা বিজয়: ৫৯৯ হিজরি (১২০২ খ্রিস্টাব্দ)

পূর্ব ভারতের এলাকাগুলো তখনও ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে ৫৯৯ হিজরিতে (১২০২ খ্রিস্টাব্দ) ঘুরি সেনাপতি মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি পূর্ব ভারতের দেশগুলোর (বিহার ও বাংলা) দিকে মনোনিবেশ করেন।

এই সাহসী অফিসার ৫৯৯ হিজরিতে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর সাথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে মাত্র দুইশত সৈন্যের মাধ্যমে বিহার দখল করেন। এরপর তিনি বাংলার দিকে অগ্রসর হন যেখানে তখন সেন বংশের শাসন ছিল যার রাজধানী ছিল 'নদিয়া' এবং রাজা লক্ষ্মণ সেন এখানকার শাসক ছিলেন। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি এত দ্রুত রাজধানীর দিকে সফর করেন যে তার অধিকাংশ সৈন্য পেছনে রয়ে যায়। যখন তিনি শহরে প্রবেশ করেন তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল এবং তার সাথে ছিল মাত্র আঠারোজন সৈন্য যাদেরকে লোকেরা বিদেশি সওদাগর মনে করে উপেক্ষা করেছিল। কোনো বাধা না দেখেই মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি সরাসরি রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করেন। প্রাসাদের রক্ষীরা পালিয়ে যায় এবং সেন বংশের শেষ শাসক লক্ষ্মণ সেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাজপ্রাসাদের পেছনের পথ দিয়ে পালিয়ে যান। এভাবে বাংলায় মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়। [৩]

স্থান নশ্বর, নিবাসী ক্ষণস্থায়ী, অনাদি তোমার, অনন্ত তোমার
খোদার শেষ পয়গাম তুমি, তুমিই চিরঞ্জীব
টিউলিপ-বধূর মেহেদি হলো তোমার কলিজার রক্ত
তোমার সম্পর্ক ইবরাহিমি, তুমিই বিশ্ব নির্মাতা
তোমার স্বভাব জীবনের সম্ভাবনাগুলোর আমানতদার
বিশ্বের সুপ্ত প্রতিভার যেন তুমিই পরীক্ষা
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] প্রাচীন উৎসগুলোতে 'থানকার' লেখা হয়েছে। বর্তমানে একে তানগড় বলা হয়। এটি রাজস্থানের করৌলি জেলায় বিয়ানা থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

[২] তাজুল মাআসির: পৃ. ১৯২-২০৫; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১১; তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ১৪৭; জামিউত তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ২৩৩।

[৩] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪২২-৪২৮; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান আজ মৌলভি জাকাউল্লাহ: পৃ. ১৫১-১৫৪। এই বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য কুতুবুদ্দিন আইবেকের যুগ দেখুন।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর শাসনকাল

৫৯৯ হিজরি থেকে ৬০২ হিজরি

(১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ)

৫৯৯ হিজরিতে (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঘুরীর ইন্তেকাল হয় এবং শাহাবুদ্দিন ঘুরী আনুষ্ঠানিকভাবে রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই মহান বীরের আসল নাম ছিল মুহাম্মদ বিন সাম এবং আসল উপাধি ছিল "মুইজুদ্দিন", তবে ইতিহাসে তিনি তাঁর দ্বিতীয় উপাধি "শাহাবুদ্দিন" নামেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। [১]

খাওয়ারিজমীয়দের কাছে পরাজয়: ৬০০ হিজরি (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ)

শাহাবুদ্দিন ঘুরীর সিংহাসন আরোহণের পর খাওয়ারিজমীয় সালতানাতের সাথে সীমান্ত বিরোধ পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে, যার ফলে শাহাবুদ্দিন ৬০০ হিজরিতে সসৈন্যে অভিযান চালিয়ে খাওয়ারিজমীয় সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং খাওয়ারিজমের রাজধানী "উরগঞ্জ" অবরোধ করেন। খাওয়ারিজমীয় বাহিনী শহরে পরিখা খনন করে অবস্থান নেয় এবং পেছন থেকে জাইহুন নদীর সেই খালের বাঁধ ভেঙে দেয় যার কাছে ঘুরী বাহিনী অবস্থান করছিল। এভাবে ঘুরী বাহিনী পানি ও কাদার মধ্যে মারাত্মকভাবে ফেঁসে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পিছু হটা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই সময়ে আরেকটি বিপদ নেমে আসে যে, খাওয়ারিজম শাহের মিত্র উসমান খান (সমরকন্দের শাসক) তুর্কানে খাতার সাথে মিলে উত্তর আফগানিস্তানের শহর "আন্দখুই"-এর কাছে ঘুরীদের পথ রোধ করেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর শাহাবুদ্দিন ঘুরী পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং নিজের সময়ের এই মহান বিজেতা মাত্র একশ সৈন্য নিয়ে "আন্দখুই দুর্গে" অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর উসমান খানের মধ্যস্থতায় সন্ধির আলোচনা হয় এবং শাহাবুদ্দিন দুর্গটি উসমান খানের হাতে তুলে দিয়ে গজনীর পথ ধরেন। [২]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৩০৬; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ৪১

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৩০৬, ৩০৭; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২১১

খোখরদের সাথে যুদ্ধ: ৬০১ হিজরি (১২০৫ খ্রিস্টাব্দ)

এই পরাজয়ের ফলে শাহাবুদ্দিন ঘোরীর সম্মানে চরম আঘাত লাগে এবং জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাঁর এক অফিসার আইবেক বেগ, যিনি 'আন্দখুই'-এর যুদ্ধে তাঁর সাথে পালিয়ে গিয়েছিলেন, মুলতান পৌঁছে সুলতানের শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে দেন এবং সেখানকার সুবাদার আমির দাদ হাসানকে হত্যা করেন। এরপর শাহাবুদ্দিন ঘোরীর নামে একটি মিথ্যা সরকার গঠন করে লোকদের নিজের অনুসারী বানান এবং সেখানে নিজের শাসন কায়েম করেন। এই পরিস্থিতিতে খোখররা 'আটক' থেকে শুরু করে 'কোহ-এ-শিওয়ালিক' পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা বিদ্রোহ করে এবং লাহোরের আশেপাশে এমন হাঙ্গামা সৃষ্টি করে যে লাহোর ও গজনীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শাহাবুদ্দিন ঘোরী এই বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করে পুনরায় হিন্দুস্তানের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হন এবং নিজের সাহায্যের জন্য কুতুবুদ্দিন আইবেককেও দিল্লি থেকে তলব করেন। উভয়ে মিলে খোখরদের সাথে এক কঠিন যুদ্ধের পর তাদের পরাজিত করেন। [১]

শেষ হিন্দুস্তান সফর—শাহাবুদ্দিন ঘোরীর তাবলিগি তৎপরতা:

যুদ্ধক্ষেত্রে খোখরদের তো কাবু করা হয়েছিল কিন্তু তাদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ বাকি ছিল। শাহাবুদ্দিন ঘোরী এবার এই লোকদের মাঝে ইসলাম প্রচারে অসাধারণ আগ্রহ দেখান। সেই দিনগুলোতে খোখরদের এক সর্দার একজন মুসলিম বন্দীর কাছ থেকে ইসলামের গুণাবলী শুনে বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুলতান শাহাবুদ্দিন যখন ওই খোখর সর্দারের এই আগ্রহের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাকে অনেক উৎসাহিত করলেন, তাকে একটি সম্মানসূচক পোশাক (খিলআত) প্রদান করলেন এবং পুনরায় তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করে তাকে কালিমা তাইয়্যেবা পড়ালেন। সেই সাথে কোহিস্তান-এ-নামক-এর শাসনভার তার হাতে অর্পণ করলেন। খোখর সর্দারের তাবলিগের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই খোখরদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান হয়ে যায়।

খোখরদের মধ্যে যারা তখনও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল, তারা সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। কিন্তু সুলতান তাদেরও পরাজিত করেন। এছাড়া এই অভিযানে 'তরাহিয়া' [২] নামক পাহাড়ি এলাকাও জয় করেন।

এখন হিন্দুস্তান বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। সুলতান লাহোরে অবস্থান করছিলেন। লাহোর ও পাঞ্জাবের মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। ঐতিহাসিক ফেরেশতার বর্ণনা অনুযায়ী, সুলতানের এই সফরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল তিন থেকে চার লক্ষ পর্যন্ত। হিন্দুস্তানের পর সুলতান শাহাবুদ্দিন তুর্কিস্তানের অমুসলিম এলাকাগুলোতে জিহাদ ও তাবলিগের সংকল্প করেন এবং লাহোর থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় বামিয়ানের সুবাদারকে এই মর্মে পয়গাম পাঠান যে, তিনি যেন সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমু নদীর তীরে পৌঁছে যান এবং সেখানে একটি সেতু নির্মাণ শুরু করেন যাতে তুর্কিস্তানে সৈন্য চলাচলে কোনো অসুবিধা না হয়। [৩]

---

[১] তারিখ-এ-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২১১, ২১২।

[২] "তরাহিয়া"-এর কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি, মনে হচ্ছে এটি নকলকারীদের কোনো লিখনজনিত ভুল। ধারণা করা হয় যে এটি কোহিস্তান-এ-নামক (লবণ পর্বতমালা) অঞ্চল হতে পারে অর্থাৎ চাকওয়াল, কালার কাহার, পিন্ড দাদন খান এবং খেওড়া ইত্যাদি এলাকা। খোখর ও ঘাক্কার গোত্রগুলো এখানেই আশেপাশে প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করত।

[৩] তারিখ-এ-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২১২, ২১৩।

শাহাবুদ্দিন ঘুরীর শাহাদাত: ৬০২ হিজরি (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ)

ঝিলাম থেকে ফেরার পথে 'ধামিয়াক' [১] নামক গ্রামের কাছে ইসলামী বাহিনী একটি স্থানে তাবু ফেলল। এটি ছিল ৩ শাবান ৬০২ হিজরি (১৪ মার্চ ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) রাত, যখন কিছু সশস্ত্র ব্যক্তি হঠাৎ রাজকীয় তাবুতে ঢুকে পড়ল। সুলতান তখন নামাজের সিজদারত অবস্থায় ছিলেন, এই সুযোগে তারা তলোয়ার ও খঞ্জর দিয়ে একের পর এক আঘাত করল। সুলতান ২২টি ক্ষত সহ্য করে নিজের প্রাণ আল্লাহর কাছে সঁপে দিলেন। আক্রমণকারীরা ছিল অমুসলিম খোখর অথবা হাসান বিন সাবাহর খঞ্জরধারী (ফেদায়ী)। ২২ শাবান মৃতদেহ গজনিতে পৌঁছায় যেখানে তাকে দাফন করা হয়। [২]

আমার ধূলিকণা ও রক্ত থেকে তুমি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছ
শহীদের প্রতিদান কী? চিরন্তন দীপ্তি ও তেজ।
(আল্লামা ইকবাল)

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর সীরাত

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীকে একজন সচ্চরিত্র, যোগ্য, আত্মমর্যাদাশীল ও সাহসী শাসক এবং সেই যুগের একজন মহান বিজেতা হিসেবে স্মরণ করা হয়। ইসলামের প্রচার এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসারে সুলতানের ব্যাপক আগ্রহ ছিল। আলেম ও তালিবে ইলমদের প্রতি এবং দ্বীনি বুজুর্গদের প্রতি তার গভীর ভক্তি ছিল। বিজয় অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সপ্তাহে চার দিন সাধারণ মানুষের সমস্যা শোনার জন্য দরবার বসানো তার নিয়ম ছিল। [৩]

শাহাবুদ্দিন ঘুরীর চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অপরিসীম রাজনৈতিক দূরদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। তার সামরিক অভিযানের শুরুতে, মধ্যভাগে এবং শেষ পর্যায়ে সুলতান তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিলেন: প্রাথমিক যুগে ভীমদেব থেকে, মধ্যযুগে পৃথ্বীরাজ থেকে এবং শেষ যুগে খোয়ারিজমি বাহিনী ও তুর্কিদের থেকে। এগুলোর মধ্যে প্রতিটি পরাজয়ই ছিল অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, কিন্তু সুলতান শাহাবুদ্দিনের ঈমান ও বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিল যে তিনি প্রতিটি পরাজয়কে একটি নতুন বিজয়ের আশা মনে করতেন এবং প্রতিটি পিছুটান থেকে নতুন পথ চলার শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

সুলতান গুজরাটে পরাজয়ের পর হিন্দুস্তান বিজয়ের জন্য যে নতুন নকশা তৈরি করেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের ওপর ভিত্তি করে, যা শতভাগ সফল হয়েছিল। সুলতান বিজিতদের ওপর জুলুম ও অত্যাচারের পরিবর্তে ন্যায়বিচার ও ইহসানের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং মানুষের মন জয় করেছিলেন। এই কারণেই তার বিজয়ের ধারায় অসংখ্য স্থানীয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

---

[১] ধামিয়াক নামক গ্রামটি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ঝিলাম জেলার সোহাওয়া তহসিলে অবস্থিত। এটি জিটি রোডে ইসলামাবাদ থেকে সোহাওয়া যাওয়ার পথে কয়েক কিলোমিটার আগে রাস্তার ডান পাশে অবস্থিত, যেখানে মহসিন-এ-পাকিস্তান ডক্টর আব্দুল কাদির খান একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। এটি সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর শাহাদাতস্থল, তার মাজার নয়।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৩, ২১৪; তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৪১, দার আল-ফিকর; তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৩, ৪০৫।

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৭৭, দার আল-ফিকর।

শাহাবুদ্দিন ঘুরীর অবদান - ইসলামী হিন্দের মহান দুর্গ:

সুলতান মাহমুদ গজনভীর পর হিন্দুস্তানে বিশাল ইসলামী সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করা শাহাবুদ্দিন ঘুরীর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। যদিও সুলতান ঘুরী পূর্ণ স্বাধীন সুলতান হিসেবে মাত্র তিন বছর সময় পেয়েছিলেন, কিন্তু এই মুজাহিদ হিন্দুস্তানে যে ইসলামী শাসন কায়েম করেছিলেন, তা পরবর্তী ছয় শতাব্দী পর্যন্ত খতম করা যায়নি। সুলতান তার ভাই সুলতান গিয়াসুদ্দিন ঘুরীর যুগেও সালতানাতের নায়েব হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সুলতানের অধিকাংশ জীবন জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে যার ফলশ্রুতি উপমহাদেশের সীমাবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত ইসলামী রাষ্ট্রকে বিস্তৃত ও ঐক্যবদ্ধ করে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর রূপে প্রকাশ পেয়েছিল।

সুলতানের অন্তরে কখনো এই খেয়ালও আসেনি যে তার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার মাত্র চৌদ্দ বছর পর:

- মঙ্গোলদের তুফান আলম-এ-ইসলামের এক বিশাল অংশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।
- তার পৈতৃক এলাকা ঘূর এবং তার রাজধানী গজনী কবরস্থানের রূপ ধারণ করবে।
- তার মহান সালতানাতে বসবাসকারী অধিকাংশ লোক নিহত অথবা মুহাজির হয়ে যাবে।
- মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণ আফগানিস্তান পর্যন্ত তার সমস্ত স্বদেশী ও প্রতিবেশী নাম-নিশানহীন হয়ে যাবে।
- ইরাক, খোরাসান এবং ইরানের ছয়শ বছরের ইসলামী সভ্যতা ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হবে।
- আর এই কিয়ামতে সোগরার পর হিন্দুস্তানে কায়েম করা ঘূরীদের মহান দুর্গই হবে মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

কিন্তু এমনই হয়েছিল। ৬১৬ হিজরিতে চেঙ্গিস খানের মধ্য এশিয়া ও খোরাসানের ওপর প্রলয়ঙ্করী আক্রমণ এই অঞ্চলের মানচিত্রই বদলে দিয়েছিল এবং জাতিতে জাতিতে ও গোত্রে গোত্রে মানুষ নাম-নিশানহীন হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে ঘূরী বিজয়ীর কায়েম করা হিন্দি ইসলামী কেল্লাই মুসলমানদের সেই একমাত্র শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, যেখানে ঘুরীর উত্তরসূরিরা মঙ্গোলদের চ্যালেঞ্জ করত, পরাজিত করত এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানাত।

সুতরাং শুধু উপমহাদেশ নয় বরং সারা দুনিয়ার মুসলমান কখনো এই রজলে রশীদের অবদান থেকে ঋণমুক্ত হতে পারবে না।

কেউ কি আন্দাজ করতে পারে তার বাহুবলের!
মুমিন ব্যক্তির দৃষ্টিতে বদলে যায় তকদির
বিলায়ত, বাদশাহি, ইলমে আশিয়ার বিশ্বজয়
এসব কী, কেবল ঈমানের একটি নুকতার তাফসির
(আল্লামা ইকবাল)

ভারতে ঘুরি বিজেতাদের সাফল্যের কারণসমূহ

তুর্কি ভাষাভাষী ঘুরি বিজেতারা ভারতের মতো এক বিশাল দেশ, যেখানে অনেক শক্তিশালী ও সুসংহত প্রাচীন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেভাবে দুই দশকের মধ্যে জয় করেছিলেন, তার পেছনে শক্তিশালী কারণ ছিল। নিচে আমরা সেই কারণগুলো পর্যালোচনা করছি:

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত:

বর্ণপ্রথা ভারতীয় শাসকদের সামরিক শক্তির জন্য অনেক সমস্যা তৈরি করেছিল। যুদ্ধ কেবল "ক্ষত্রিয়দের" দায়িত্ব বা পেশায় পরিণত হয়েছিল। ফলে রাজপুতদের মতো নির্দিষ্ট গোত্র এবং বিশেষ বর্ণের লোকদেরই সামরিক সেবার জন্য নিয়োগ করা হতো। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত ছিল।

২. শ্রম বিভাজনের সমস্যা:

অস্পৃশ্যতার নীতির কারণে সৈন্যদের মধ্যে শ্রম বিভাজনে সমস্যা দেখা দিত। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চবর্ণের কেউ নিম্নবর্ণের কারো হাত থেকে পানি পান করতে পারত না, ফলে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিটি রাজার দেহরক্ষীও হতো আবার তাকেই পানি আনা ও পান করানোর কাজও করতে হতো।

৩. সামাজিক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা:

ভারতে বর্ণপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার ধারণা সমাজে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তৈরি করে রেখেছিল, সমাজ অনেকগুলো দ্বীপে বিভক্ত ছিল, শ্রেণির এই বিভাজন দেশের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। এই অন্যায্য ব্যবস্থা, বর্ণপ্রথার যুক্তিহীন বিধিনিষেধ এবং বৈষম্যমূলক আচরণ সমাজে রাজনৈতিক ও মানসিক ঐক্যকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছিল।

৪. মুসলমানদের প্রতি জনসমর্থন:

মুসলমানদের আক্রমণ এই জরাজীর্ণ ব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা সেই অবদমিত মানুষের সমর্থন লাভ করেছিল যারা শতাব্দী ধরে এই অন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে কষ্ট সহ্য করে আসছিল। ফলে যখন মুসলিম তুর্কিরা জিহাদের পতাকা উত্তোলন করে এই ব্যবস্থা ভাঙতে শুরু করল, তখন ভারতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে তারা জনপ্রিয়তা লাভ করল। যদি এমনটি না হতো, তবে প্রশ্নই আসত না যে ভারতে তুর্কি মুসলিম সালতানাত এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাব এত বড় পরিসরে ছড়িয়ে দিতে পারত এবং এত দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারত।

৫ হিন্দুস্তানিদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব:

উপমহাদেশে হিন্দু ধর্ম ছিল কেবল একটি বিশেষ গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। সাধারণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ উচ্চবর্ণের (ব্রাহ্মণদের) আকাশচুম্বী মন্দিরের অভ্যন্তরীণ অংশের এক ঝলক দেখারও সুযোগ পেত না। সুতরাং হিন্দুদের সামনে এমন কোনো স্পষ্ট বিষয় ছিল না যা মুসলিম আক্রমণের সময় তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করত।

ফলে এসব যুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কেবল বিরক্তি ও উদাসীনতার সাথে হিন্দু শাসকদের পরাজয় প্রত্যক্ষ করত এবং প্রায়ই শহরবাসীরা মুসলমানদের হাতে হাত মিলিয়ে চলত।

নিঃসন্দেহে কিছু ক্ষেত্রে যখন মুসলমানরা কোনো দুর্গবেষ্টিত শহর বা দুর্গের আশপাশের উন্মুক্ত এলাকা দখল করে নিত, তখন সেই দুর্গের রাজার কোনো উপায় থাকত না এবং বাইরে থেকে কোনো কঠোর প্রতিরোধ বা সাহায্য পাওয়া যেত না। কারণ শাসকদের জন্য দেশের প্রতিরক্ষায় সাধারণ মানুষের কোনো সমর্থনই ছিল না।

৬ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভাব:

দেশপ্রেমের অভাবের কারণে হিন্দুদের সামনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও চতুর রাজনীতিকরা মুসলমানদের ওপর জুলুম ও রক্তপাতের কাহিনী শুনিয়ে, ধরিত্রী মাতার কসম দিয়ে এবং দেবী-দেবতাদের সম্মান ও মর্যাদার দোহাই দিয়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করত। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি সাধারণ সৈন্যদেরও একটি বড় অংশ জানত যে, এটি কেবল তাদের ওপর জুলুমের শাসন টিকিয়ে রাখার একটি প্রতারণা মাত্র। এ কারণে এই প্রচেষ্টাগুলো সাধারণত সফল হতো না। অন্যদিকে মুসলমানদের সামনে ইসলামের প্রচার ও জিহাদের দায়িত্ব পালনের মতো উচ্চতর লক্ষ্য ছিল, তাই তারা পুরোপুরি উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আবেগে ভরপুর ছিল।

৭ হিন্দুদের সেকেলে সামরিক ব্যবস্থা:

হিন্দুস্তানি সেনাবাহিনী যুদ্ধের সেই আধুনিক উন্নতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল যা মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে তুর্কিদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে নিচের দিকগুলো লক্ষ্য করার মতো:

- দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দুস্তানি সেনাবাহিনী ছিল সামন্ততান্ত্রিক সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত, যা ছিল অত্যন্ত ভারী ও মন্থর গতির। অন্যদিকে মুসলিম তুর্কি বাহিনীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের গতিশীলতা (Mobility) বা দ্রুতগতি। অশ্বারোহণে তারা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ ছিল এবং একটি অতিরিক্ত গুণ ছিল এই যে, তারা দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়েও তীরের সঠিক নিশানা লাগাতে পারদর্শী ছিল।

- মুসলিম বাহিনীতে রসদপত্রের প্রয়োজন হতো প্রয়োজন অনুযায়ী এবং তা দ্রুতগামী উটের ওপর বহন করা হতো, যাদের জন্য পশুখাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না বরং তারা পথে পাওয়া গাছের পাতা ও ঝোপঝাড় খেয়েই জীবন ধারণ করত। অন্যদিকে রাজপুত শাসকদের সাজসরঞ্জাম ছিল অনেক বেশি এবং তা ছিল গরুর গাড়ির ওপর যা তাদের চলাচলকে অত্যন্ত মন্থর করে দিত।

রাজপুতরা সেনাবাহিনীর দ্রুত গতির পরিবর্তে বিপুল জনবল, হাতির অন্তর্ভুক্তি এবং বাহ্যিক শান-শওকতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে আতঙ্কিত ও পদদলিত করার প্রবক্তা ছিল। তাদের সারিগুলো ছিল অনেক বড়, অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ এবং প্রদর্শনীতে ভরপুর। যুদ্ধের সময় দ্রুতগামী মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী এমনভাবে ঘুরে ফিরে আক্রমণ করত যে বারবার তাদের বিন্যাস ও শৃঙ্খলা তছনছ করে দিত।

ভারতে প্রাথমিক ইসলামী বিজয়ের প্রভাব

ভারতে প্রথমে গজনভী এবং পরে ঘুরি শাসকদের মাধ্যমে ইসলাম যে প্রাথমিক বিজয়গুলো লাভ করেছিল, তার ফলে এ দেশের গতিপথ বদলে যায়। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় বিপ্লব আসে। সেই পরিবর্তনগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

একীভূত রাষ্ট্র:

শতাব্দীকাল ধরে ভারতের রাজা-মহারাজারা গ্রীষ্মকালে বিশ্রাম নিতেন এবং শীত শুরু হতেই কোনো না কোনো অজুহাতে একে অপরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হতেন এবং নিজেদের যুদ্ধকৌশল বা বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। প্রথম হিজরি (সপ্তম শতাব্দী ঈসায়ী)-তে 'রাজা হর্ষ'-এর পর ছয় শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোনো শাসক ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি, কিন্তু মুসলমানরা বাইরে থেকে এসে মাত্র কয়েক বছরেই তা করে দেখান।

মুসলমানদের আগমনে সেই বহু-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যার অধীনে পুরো দেশ অসংখ্য রাজধানীতে বিভক্ত ছিল, দেশের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, মধ্য ও পূর্ব অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বাকি অঞ্চলগুলো থেকেও এর অবসানের পথ সুগম হয়।

জরাজীর্ণ সামন্ততন্ত্রের অবসান:

ঘুরিরা এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করার সাথে সাথেই অধিকৃত অঞ্চলগুলো থেকে প্রাচীন পদ্ধতির জরাজীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক (জাগিরদারি) ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দেয় এবং দূরবর্তী অঞ্চলগুলোকে একটি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করার জন্য 'ইকতা' ব্যবস্থা কায়েম করে। [১]

উন্নত প্রশাসনিক কাঠামো:

মুসলমানরা দিল্লিকে কেন্দ্র বানিয়ে পুরো দেশকে এর সাথে সংযুক্ত করে এবং দেশের জন্য একটি উন্নত প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করে। ঘুরিরা এই কাজের যোগ্য ছিল কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা গজনভী সালতানাতের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ঘুরিরা নিজে ভারত বিজয়ের আগেই একটি বিশাল সালতানাত কায়েম করতে সফল হয়েছিলেন।

---

[১] প্রাচীন ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামন্তকে (জাগিরদারকে) জমির মালিক বানিয়ে দেওয়া হতো এবং তাকে জমিতে বংশানুক্রমিক অধিকার দেওয়া হতো। সামন্তের আনুগত্য কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে রাজা বা রাজবংশের প্রতি হতো। মুসলমানরা যে "ইকতা" ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যদিও আজ তাকেও সামন্ততন্ত্র (জাগিরদারি) বলা হয়, কিন্তু তা প্রাচীন সামন্ততন্ত্র থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। এতে জমি সরকার বা সুলতানের মালিকানাধীন থাকত। সামন্তকে কেবল প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার অধিকার দেওয়া হতো। সুলতান তাকে যেকোনো সময় অপসারিত করতে পারতেন। এই ব্যবস্থায় কর্মকর্তাদের আনুগত্য কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি হতো।

সুবিধা এই ছিল যে, তারা বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন।

এই রাজকীয় ব্যবস্থায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা একটি সুসংগঠিত পদ্ধতির অধীনে কাজ করতেন। প্রতিটি জিনিসের হিসাব-নিকাশ এবং অডিট করা হতো। কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদাবনতি, বদলি, বরখাস্ত—সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার অধীনে সম্পন্ন হতো।

সুলতানদের শিক্ষিত হওয়া:

অধিকাংশ সুলতান উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তারা শৈশবেই দ্বীনি, সাহিত্যিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাদের মধ্যে অনেক দক্ষতার সমাবেশ ঘটেছিল। এর পাশাপাশি তারা সকল পদক্ষেপের জন্য বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করতেন। তারা ইসলামের মহান শিক্ষার ওপর বিশ্বাস রাখতেন এবং মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভেদ করতেন না। রাজপুত শাসক যেমন পৃথ্বীরাজ এবং ভীমদেব প্রমুখের জন্য তাদের বিশেষ আকিদা এবং সীমাবদ্ধ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কারণে এমন সুসংগঠিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।

বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ:

হিন্দুস্তানে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য এখানকার রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে, যা একটি প্রাচীরের মধ্যে বন্দি ছিল, বৈশ্বিক পর্যায়ে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। হিন্দুস্তান যা এর আগে বাকি বিশ্ব থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি কানাগলিতে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন তা চৌরাস্তায় চলে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং চীন পর্যন্ত বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হলো। নতুন রাস্তাঘাট নির্মিত হলো এবং সেগুলোর নিরাপত্তার চমৎকার ব্যবস্থা করা হলো, যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক হয়ে উঠল। বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রশস্ততা তৈরি হলো এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাগুলো মিটে যেতে লাগল। বিদেশ থেকে নিত্যনতুন দক্ষ ও কারিগরি পারদর্শী সম্পন্ন মানুষ হিন্দুস্তানে এসে বসবাস শুরু করল।

শহুরে জনসংখ্যা সবার জন্য:

রাজপুত যুগে শহর এবং কেল্লাবেষ্টিত জনপদগুলোতে কেবল উচ্চবর্ণের মানুষ বসবাস করতে পারত। নিম্নবর্ণের লোকেরা গ্রাম ও শহরতলিতে জীবন অতিবাহিত করত, যার অনিবার্য ফলাফল ছিল এই যে, তারা কৃষি, পশুপালন এবং অন্যান্য সাধারণ পেশার ওপর নির্ভর করে চলত এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকত। কিন্তু মুসলিম সরকার বর্ণপ্রথাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করল এবং এই সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হলো। এখন হিন্দু বা মুসলিমের ভেদাভেদ ছাড়াই, একইভাবে উচ্চ বা নিম্নবর্ণের পার্থক্য ছাড়াই সব ধরনের মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, কারিগর, রাখাল—সবাই শহরে আসা-যাওয়া শুরু করল। তাই শ্রমজীবী শ্রেণি এবং নিম্নবর্ণের লোকেরা সরকারের সাথে সানন্দে সহযোগিতা করল। এর ফলে শহরগুলোতে সব ধরনের শিল্প-কারখানা, বাণিজ্য এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র স্থাপিত হতে লাগল। মানুষও সচ্ছল হলো এবং সরকারি কোষাগারও সমৃদ্ধ হলো।

বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনী তৈরি:

হিন্দুস্তানের পেশাদার সামরিক দক্ষতা এখন শিখরে পৌঁছে গেল। সামরিক সেবা কোনো একটি নির্দিষ্ট বর্ণ বা শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত ছিল না।

https://t.me/BoierSomahar

বরং যারা যুদ্ধের কষ্ট সহ্য করতে পারত, তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে সৈনিক হতে পারত। জায়গিরদারি ব্যবস্থার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে সৈন্য নিয়োগ শুরু হয় এবং হিন্দুস্তানের ইতিহাসে প্রথম নিয়মিত বেতনভুক্ত স্থায়ী সেনাবাহিনী তৈরি হয়, যা শক্তি ও দক্ষতায় বিশ্বের বাকিদের সমকক্ষ বরং কিছু ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। পরবর্তী দশকগুলোতে মিশরের মামলুকদের পর এই সুসংগঠিত বাহিনীই প্রমাণ করেছিল যে তারা ধ্বংসাত্মক মঙ্গোলদের একের পর এক আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম।

সারা দেশে সরকারি ভাষার ঐক্য:

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দুস্তানে প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভাষাগুলো দেশের বিভিন্ন অংশে আলাদা আলাদা ছিল। উত্তর ভারতে রাজপুত রাজ্যগুলো ছিল যেখানে সংস্কৃতের প্রচলন ছিল। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষাগুলো (তামিল, তেলুগু, মালয়ালম) ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। গুজরাটে গুজরি, অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হতো।

মুসলিম শাসন আমলে সমস্ত প্রদেশ একটি এমন প্রশাসনিক ভাষা পেয়েছিল যা অনেক প্রতিবেশী দেশে প্রচলিত ছিল অর্থাৎ ফারসি। এটি লক্ষ্যণীয় যে দিল্লির অধিকাংশ সুলতান তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন কিন্তু তারা নিজেদের মাতৃভাষাকে সরকারি ভাষা করার পরিবর্তে সেই ভাষাকে প্রচলিত করেছিলেন যা শেখা সহজ ও অধিক লাভজনক ছিল এবং যা স্বদেশবাসীকে বহির্বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করতে অধিক সহায়ক ছিল। ফলে ফারসির প্রচলন প্রথমে দপ্তর এবং জ্ঞান ও সাহিত্যের আসরগুলোতে শুরু হয় এবং এটি জ্ঞান ও সাহিত্যের ভাষা হয়ে ধীরে ধীরে আরও জনপ্রিয় হতে থাকে। যেহেতু এই ভাষা খোরাসান থেকে মধ্য এশিয়া এবং এশিয়া মাইনর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাই উপমহাদেশের মানুষ খুব দ্রুত বিশ্বের মানুষের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে সহজে উপকৃত হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে।

কয়েক দশক পর ফারসি, আরবি এবং শাসকদের মাতৃভাষা তুর্কির সাথে দোয়াবে প্রচলিত ‘খড়ি বোলি’-র শব্দগুলো মিশ্রিত হয়ে যায় এবং এভাবেই উর্দু ভাষা গঠনের পথ সুগম হয় যা ভবিষ্যতে উপমহাদেশের জনপ্রিয়তম ভাষা হয়ে ওঠে।

স্থাপত্যের উন্নতি:

দিল্লির সুলতানদের শাসনামলে বিশিষ্ট স্থাপত্য বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হিন্দুস্তানে তুর্কি, আরবি, হিন্দি এবং ইরানি স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ উপস্থাপন করে এমন সব চমৎকার ইমারত ও শহর নির্মাণ করেছিলেন যা আজও তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই সমতল সড়ক, এই পরিচ্ছন্ন পথ..... দুই পাশে সমান বৃক্ষের ছায়া
স্থানে স্থানে মাইল ও ফারসাখের চিহ্ন স্থাপিত..... পথের ধারে কুয়া ও সরাইখানা বিদ্যমান
এগুলো থেকেই সবাই এই নকশা গ্রহণ করেছে
এই কাফেলারই চিহ্ন হলো এই সব
(খাজা আলতাফ হোসেন হালি)

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ষষ্ঠ খণ্ড

ঘুরি শাসকদের তালিকা

শাসক সময়কাল বিশেষ তথ্য

১. ইজ্জুদ্দীন হাসান ৪৯৩ হিজরি থেকে ৫৪০ হিজরি (১১০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) আদি পুরুষ

২. সাইফুদ্দীন সুরি ৫৪০ হিজরি থেকে ৫৪৪ হিজরি (১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) শুধুমাত্র ঘুরের ওপর শাসন

৩. বাহাউদ্দীন সাম প্রথম ৫৪৪ হিজরি (১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) শুধুমাত্র ঘুরের ওপর শাসন

৪. আলাউদ্দীন হুসাইন জাহান-সুজ ৫৪৪ হিজরি থেকে ৫৫৬ হিজরি (১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ) গজনি ধ্বংস করে গজনভি শাসককে বিতাড়িত করেন।

৫. সাইফুদ্দীন মুহাম্মদ ৫৫৬ হিজরি থেকে ৫৫৮ হিজরি (১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)

৬. গিয়াসুদ্দীন ঘুরি বিন সাম ৫৫৮ হিজরি থেকে ৫৯৯ হিজরি (১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ) সচ্চরিত্রবান ও ন্যায়পরায়ণ। পাঞ্জাব থেকেও গজনভি শাসনের অবসান ঘটান।

৭. শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরি বিন সাম ৫৯৯ হিজরি থেকে ৬০২ হিজরি (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৬৯ হিজরি (১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত নায়েবে সুলতান। প্রখ্যাত মুসলিম বিজয়ী।

৮. গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ ৬০২ হিজরি থেকে ৬০৯ হিজরি (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১২ খ্রিষ্টাব্দ) শুধুমাত্র আফগানিস্তানের ওপর শাসন

৯. বাহাউদ্দীন সাম দ্বিতীয় ৬০৯ হিজরি থেকে ৬১০ হিজরি (১২১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

১০. আলাউদ্দীন আতসিজ ৬১০ হিজরি থেকে ৬১১ হিজরি (১২১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

১১. জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ ৬১১ হিজরি থেকে ৬১২ হিজরি (১২১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দ) আফগানিস্তানের শেষ ঘুরি শাসক

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজনভী ও ঘুরি সুলতানদের সমসাময়িক

উপমহাদেশের প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ

https://t.me/BoierSomahar

আবু রায়হান আল-বিরুনী

৩৬২ হিজরি থেকে ৪৪০ হিজরি

(৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)

আবু রায়হান মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-বিরুনী ছিলেন একজন মহান মুসলিম পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ। তাঁর জন্ম ৩৬২ হিজরিতে (৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত শহর 'খিওয়া'-তে হয়েছিল যা খোয়ারিজম প্রদেশে অবস্থিত ছিল, তাই প্রথমে তিনি আল-খোয়ারিজমি নামে পরিচিত ছিলেন। আল-বিরুনী একই সাথে আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিব্রু, গ্রিক এবং সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, খনিজ বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে আল-বিরুনী এমন অবদান রেখেছিলেন যে চারদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

শুরুতে তিনি বেশ কয়েক বছর জুরজান ও তাবারস্তানের শাসক শামসুল মা'আলির দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে ৩৯১ হিজরিতে (১০০১ খ্রিষ্টাব্দ) যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর, তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আসারুল বাকিয়া আনিল কুরুনিল খালিয়া' সম্পন্ন করেন। এতে অতীতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত পঞ্জিকা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার পঞ্জিকাগুলোর মধ্যে বছরের পার্থক্যও স্পষ্ট করা হয়েছে।

জুরজানের পর আল-বিরুনী খোয়ারিজমের দরবারের সাথে যুক্ত হন। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক বু আলী সিনার সমসাময়িক এবং স্বদেশী ছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্ক চলত। যখন তাঁরা আলাদা হয়ে যান, তখনও তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান অব্যাহত ছিল।

সুলতান মাহমুদ গজনভি যখন খোয়ারিজম দখল করেন, তখন অন্যান্য দরবারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আল-বিরুনীও ৪০৭ হিজরিতে (১০১৭ খ্রিষ্টাব্দ) গজনীতে চলে আসেন। এরপর তিনি উপমহাদেশ সফর করেন এবং দীর্ঘ সময় সিন্ধুর একটি গ্রাম 'বিরুন'-এ অবস্থান করেন এবং 'আল-বিরুনী' উপাধিতে বিখ্যাত হন।

মাহমুদ গজনভির মৃত্যুর পর আল-বিরুনী সুলতান মাসউদ গজনভির সান্নিধ্যে থাকেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় পাক-ভারত উপমহাদেশে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর ১১৪টি বই লিখেছেন। 'আল-কানুনুল মাসউদী' যা তিনি সুলতান মাসউদ গজনভির নামে উৎসর্গ করেছেন, তা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর অত্যন্ত উচ্চমানের একটি রচনা।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

এটি একটি উচ্চমানের রচনা। প্রতিটি যুগে গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা হলো "তাহকীক মা লিল-হিন্দ", যাকে সাধারণত "কিতাবুল হিন্দ" বলা হয়। এতে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভূগোল এবং ইতিহাস ছাড়াও হিন্দুদের বিশ্বাস, রীতিনীতি ও অভ্যাসগুলো অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-বিরুনী ৭৮ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং ২রা রজব ৪৪০ হিজরি (১১ই সেপ্টেম্বর ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। বায়হাকীর বর্ণনা অনুযায়ী, আল-বিরুনী চল্লিশ বছর জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করেছেন এবং একটি উটের বোঝার সমপরিমাণ রচনা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন। আল-বিরুনীর গবেষণার পদ্ধতিতে পক্ষপাতের কোনো লেশমাত্র দেখা যায় না। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান যে জাতিরই হোক না কেন, তা শেখা, বোঝা এবং সহজীকরণ ও গবেষণার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার প্রবক্তা হিসেবে প্রতীয়মান হন। সত্যের অনুসন্ধান, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততা আল-বিরুনীর কাজে প্রতিটি পদক্ষেপে পরিলক্ষিত হয়। আল-বিরুনীর পাণ্ডিত্যের কারণে উপমহাদেশের স্থানীয় হিন্দু পণ্ডিতরা তাঁকে "বিদ্যাসাগর" (জ্ঞানের সমুদ্র) বলে স্মরণ করতেন। [১]

প্রতিটি পানশালা থেকে পাত্র পূর্ণ করে... প্রতিটি ঘাট থেকে তৃপ্ত হয়ে ফিরেছে
পতঙ্গের মতো প্রতিটি আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে... নবীর নির্দেশকে হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছে
যে, প্রজ্ঞাকে একটি হারানো সম্পদ মনে করো
যেখানেই পাও, তাকে নিজের সম্পদ মনে করো
(খাজা আলতাফ হোসেন হালি)

---

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: পৃষ্ঠা ২৯, খণ্ড ৩১, তদমুরী; নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭০, ৭১; আব-ই-কাওসার, শেখ মুহাম্মদ ইকরাম: পৃষ্ঠা ৬৫ থেকে ৭১।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অংশ: ষষ্ঠ

সালার মাসউদ গাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি

৪০৫ হিজরি থেকে ৪২৪ হিজরি

(১০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৩২ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান মাহমুদ গজনভীর যুগে সালার মাসউদ গাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি নামক এক তরুণ দরবেশ অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। [১]

তাঁর পিতার নাম ছিল সালার সাহু, যিনি কুতুব শাহী আওয়ান গোত্রের সরদার ছিলেন এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বংশধর ছিলেন। তাঁরা ইসলাম প্রচার ও জিহাদের নিয়তে নিজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সুলতান মাহমুদ গজনভীর অভিযানে শরিক হন। সুলতানের দরবারে সালার সাহুর মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি সুলতান তাঁর এক বোন 'সিতার-ই মুয়াল্লা'-কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এই মহীয়সী নারীই সালার মাসউদ গাজীর মাতা হন।

সুলতান মাহমুদ গজনভী ৩৯৯ হিজরি থেকে মধ্য ভারতে অভিযান শুরু করেন এবং এই সময়ে রাজপুতানা ও এর আশপাশের কয়েক ডজন শহর ও শত শত জনপদে প্রবেশ করেন এবং সেখানে মুসলমানদের বসতিও শুরু হয়। সালার সাহু ধার ও ঠাট্টায় গজনভী সালতানাতের জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব পালন শেষে ৪০৪ হিজরিতে আজমিরে এসে অবস্থান করেন। এখানেই ৪০৫ হিজরিতে সালার মাসউদ গাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্ম হয়। তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অসাধারণ। সাড়ে চার বছর বয়সে তিনি শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে বহু জ্ঞান ও শিল্পকলা আয়ত্ত করেন। এর পাশাপাশি তিনি যুদ্ধবিদ্যাও শিখতে থাকেন যাতে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারেন।

৪১৫ হিজরিতে সালার সাহু সুলতানের নির্দেশে সাত্রিখ (বারাবাঁকি)-এ স্থানান্তরিত হন এবং পরিবার-পরিজনকেও সেখানে ডেকে নেন। পরের বছর ৪১৬ হিজরিতে গজনভী বাহিনী ভারতের সোমনাথ বিজয়ের জন্য আসলে সালার সাহু তাঁর এই তরুণ পুত্রকে নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় সালার মাসউদ গাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বয়স ছিল এগারো বছর। সোমনাথ বিজয়ের পর সালার মাসউদ...

---

[১] সালার মাসউদ গাজীর বংশপরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে সৈয়দ বা আলভী বলেন। কেউ কেউ তাঁকে সুলতান মাহমুদের বংশের অর্থাৎ তুর্কি বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন, তবে এটি সঠিক নয়। অগ্রগণ্য মত হলো তিনি মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার বংশধর ছিলেন। তাঁর সময়কাল নিয়েও মতভেদ রয়েছে। এক মত অনুযায়ী তিনি সুলতান মাহমুদ গজনভীর সমসাময়িক ছিলেন, আবার দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তাঁর সময়কাল বাগদাদের পতন (৬৫৬ হিজরি)-এর পরের। অগ্রগণ্য মত হলো তিনি সুলতান মাহমুদ গজনভীর যুগে ছিলেন এবং তাঁর পরে শাহাদাত বরণ করেন।

গাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মামা সুলতান মাহমুদ গজনভীর সাথে রাজধানী গজনীতে চলে যান। সম্ভবত সুলতান মাহমুদের নির্দেশেই এমনটি হয়েছিল, অর্থাৎ সুলতান তাঁর ভাগ্নেকে সামরিক ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নিজের কাছে রাখা সমীচীন মনে করেছিলেন।

যা-ই হোক, এই সময়ে সালার সাহু হিন্দুস্তানে আরও বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অভিযানের ফলে বেনারস থেকে জৌনপুর পর্যন্ত বিশাল এলাকা সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, যেখানে তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

সালার মাসউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মামা সুলতান মাহমুদ গজনভীর তত্ত্বাবধানে প্রায় পাঁচ বছর কাটান। তাঁর দ্বিতীয় ভাই কুতুবুদ্দিন হায়দার সেই সময়ে বলখের গভর্নর ছিলেন। তাঁর চাচা সালার সাইফুদ্দিনও সুলতান মাহমুদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

সতেরো বছর বয়সে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এই যুবকের বুদ্ধি ও যোগ্যতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, যিনি যত দ্রুত সম্ভব জিহাদের ময়দানে নেমে হিন্দুস্তানকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। ফলে সুলতান মাহমুদ গজনভীর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সালার মাসউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুমতি নিয়ে তাঁর চাচা সালার সাইফুদ্দিনের সাথে মুজাহিদদের একটি ছোট দল নিয়ে হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রথমে তিনি তাঁর পিতা সালার সাহুর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দোয়া নিয়ে একটি দীর্ঘ অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, যার লক্ষ্য ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

এই সফরে তিনি মুলতান, উচ, অজোধন, দিল্লি, মিরাট, সম্ভল, বদায়ুন, কনৌজ, বিলগ্রাম এবং মানিকপুরসহ অসংখ্য এলাকা অতিক্রম করেন। তিনি ডজনখানেক যুদ্ধে লড়েন এবং অনেক রাজাকে পরাজিত করেন। যেসব জনপদে মুসলমানদের কিছু বসতি গড়ে উঠেছিল, সেখানে আরও মুসলমানদের পুনর্বাসিত করে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করেন। মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে গজনীতে সুলতান মাহমুদ গজনভী ইন্তেকাল করেন।

এদিকে সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে: শাহজাদা মুহাম্মদ এবং শাহজাদা মাসউদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পুনরায় আহমদ বিন হাসান মায়মান্দির হাতে চলে আসে। তিনি আওয়ানদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন, তাই তিনি সুলতান মাসউদকে প্ররোচিত করেন যেন তিনি কুতুবুদ্দিন হায়দারকে (সালার মাসউদের বড় ভাই) বলখের শাসনভার থেকে অপসারিত করেন। সুলতান মাসউদ তা-ই করলেন এবং কুতুবুদ্দিনকে তলব করলেন, কিন্তু কুতুবুদ্দিন বলখ ছেড়ে হিন্দুস্তানের পথ ধরলেন।

এই সময়ে তাঁর পিতা সালার সাহু, যিনি তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র বারাবাঁকি (সাতরাখ)-এ অবস্থান করছিলেন এবং এলাকাটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছিলেন, ইন্তেকাল করেন। এই খবরে শত্রুদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের প্ররোচনায় বাহরাইচের রাজা সোহেল দেব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। [১]

সালার মাসউদ গাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই সময়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে অযোধ্যা যাচ্ছিলেন, কিন্তু এই খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মুজাহিদদের নিয়ে বাহরাইচের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অন্যদিকে বিভিন্ন হিন্দু রাজা এই শাহীন-সদৃশ যুবকের মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের মধ্যে জোটবদ্ধ হন এবং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

---

[১] এই যুদ্ধের কারণেই এই স্থানের নাম বাহরাইচ অর্থাৎ “লড়াই-ঝগড়ার জায়গা” হয়ে যায়।

সালার মাসউদ তাঁর সংক্ষিপ্ত বাহিনী নিয়ে এই পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বিরতি দিয়ে তিনটি অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে ইসলামের মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করেন। সেই সময় যদি তাঁরা লাহোর থেকে সাহায্য পেতেন, তবে চূড়ান্ত যুদ্ধটি তাঁদের পক্ষেই যেত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সেই দিনগুলোতে সুলতান মাহমুদ গজনভীর উত্তরসূরিরা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, অন্যদিকে অন্যান্য আমীরগণও দুই দলে বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত ছিলেন। তাই সম্ভবত রণাঙ্গনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় কারো ছিল না। এর ফলে ৪২৪ হিজরির ১৪ই রজব চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়, যা পরবর্তী দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। এতে শত্রু পক্ষ বিজয়ী হয় এবং বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ শহীদ হন। সালার মাসউদ গাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাতের সুধা পান করেন। এই ঘটনাটি ৪২৪ হিজরির ১৪ই রজবের।

আমীর সৈয়দ ইব্রাহিম মাশহাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি শিবিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেখানে পৌঁছান এবং শহীদদের মরদেহ দাফন করেন। এই দুর্ঘটনার পর এই অঞ্চলগুলো গজনভী সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং শিহাবুদ্দিন ঘুরীর সময় পর্যন্ত এখানে হিন্দু রাজাদের শাসন বজায় থাকে।

সালার মাসউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর, কিন্তু তিনি যে ভালোবাসা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তার কারণে স্থানীয় মুসলমানরা প্রচুর সংখ্যায় তাঁর কবরে আসতেন। তিন শতাব্দী পর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কবরের ওপর মাজার নির্মাণ করে দেন। [১]

অপূর্ব তাঁদের ধরন, সারা দুনিয়া থেকে আলাদা
হে রব! এই প্রেমিকরা কোন জনপদের বাসিন্দা?
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তথ্যসূত্র: নুযহাতুল খাওয়াতির: পৃষ্ঠা ৮০, ৮১; বাহরাইচ, এক তারিখ শহর, জুনায়েদ আহমদ আনোয়ার কর্তৃক, মুদ্রিত জাবিয়া প্রিন্ট নয়া দিল্লি: পৃষ্ঠা ৩১ থেকে ৪৩; আব-ই-কাউসার: টীকা দেখুন: পৃষ্ঠা ৭৪, ৭৫, ৭৬।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

হযরত সৈয়দ আলী হুজুইরী রহমতুল্লাহি আলাইহি

৪০০ হিজরি থেকে ৪৬৩ হিজরি

(১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৭২ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত সৈয়দ আলী হুজুইরী রহমতুল্লাহি আলাইহি হিন্দুস্তানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সুফি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম আলী বিন উসমান। তিনি ৪০০ হিজরিতে (১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে) গজনীর হুজুইর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা উসমান জুল্লাবী রহমতুল্লাহি আলাইহিও একজন মহান সুফি বুজুর্গ ছিলেন, যাঁর বংশধারা হযরত জায়েদ বিন আলী রহমতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে হযরত হুসাইন বিন আলী আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছেছে।

তাঁর পরিবার জ্ঞান ও ফযিলতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি চার বছর বয়সে জ্ঞান অর্জন শুরু করেন এবং মধ্য এশিয়া থেকে আরব বিশ্বের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেন। খোরাসানে তিনি তিনশ আলেম ও মাশায়েখের কাছ থেকে ফয়েজ হাসিল করেন, যাদের মধ্যে হযরত শেখ আবুল আব্বাস আশকাতি, শেখ আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আল-মিসবাহ আস-সায়দলানী, শেখ আবুল কাসিম আব্দুল করিম বিন হাওয়াজিন আল-কুশায়রী, শেখ আবুল কাসিম বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ গুরগানী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী আল-মারুফ দাস্তানী বাস্তামী, আবু সাঈদ ফজলুল্লাহ বিন মুহাম্মদ মায়হানী এবং আবু আহমদ মুজাফফর বিন আহমদ বিন হামদান রহমতুল্লাহি আলাইহিম-এর নাম উল্লেখযোগ্য। সবশেষে তিনি সিরিয়ায় যান এবং দামেস্কের প্রখ্যাত মহান বুজুর্গ শেখ আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন হাসান খুত্তলী রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে বায়াত হন, যিনি জুনাইদিয়া সিলসিলার সুফি হওয়ার পাশাপাশি তাফসীর ও হাদিসেরও আলেম ছিলেন।

সৈয়দ আলী হুজুইরী রহমতুল্লাহি আলাইহি পঞ্চম হিজরি শতকের তৃতীয় দশকে তাঁর পীরের নির্দেশে দক্ষিণ এশিয়ায় সফর করেন এবং লাহোরে আগমন করেন। মুসলিম সুলতানদের এই প্রাথমিক যুগে এই শহরটি দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও তাহজীব-তামাদ্দুনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। তাঁর আগমন সুলতান মাসউদ গজনভীর শাসনকালে হয়েছিল। তিনি লাহোরে একটি মসজিদকে দরস ও তাদরীস, তাবলীগে ইসলাম এবং আত্মশুদ্ধির কেন্দ্রে পরিণত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অসংখ্য মূর্তিপূজারী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি অগণিত মুসলমানের আমল ও আখলাক সংশোধন করেন। সুলতান মাসউদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত লাহোরের শাসক ‘রায় রাজু’-ও তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি বেশ কিছু কিতাব লিখেছেন, যার মধ্যে ‘কাশফুল মাহজুব’ এবং ‘কাশফুল আসরার’ প্রসিদ্ধ।

কাশফুল মাহজুব বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে। এই কিতাবটি প্রতিটি যুগে অন্তরের সংশোধনের জন্য সর্বোত্তম বলে গণ্য হয়। এতে তাসাউফের পথের হাকিকত, আহলে তাসাউফের মাকামাত, সুফিয়াদের স্তর এবং আল্লাহর ওলিদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

বলা হয়েছে। জাহিলিয়াত সংশোধন, অন্তরকে অহংকার ও লোভ থেকে রক্ষা করা এবং মুর্শিদের অনুসরণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এতে মূর্খ সূফীদের দাবির মতো কাল্পনিক ও ভ্রান্ত কথাবার্তা নেই। শরীয়ত পালনের ওপর অনেক জোর দেওয়া হয়েছে এবং শরীয়ত বিরোধী সূফীদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

সৈয়দ আলী হুজবেরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর স্ত্রী বিয়ের এক বছর পর দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁদের কোনো সন্তানও হয়নি। এরপর তিনি সারা জীবনে আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি।

তিনি ৬৩ বছর বয়সে ৪৬৩ হিজরিতে (১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর গুণাবলি ও ফয়েজের কারণে 'গঞ্জ বখশ' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন, কারণ তাঁর মজলিসে বসলে হিদায়াতের ভাণ্ডার নসিব হতো।

লাহোর শহরের ভাটি দরজার কাছে তাঁর মাজার সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের মিলনস্থল। তাঁর সম্পর্কের কারণে লাহোরকে 'দাতার নগরী'ও বলা হয়। খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো দ্বীনের বুজুর্গগণ ফয়েজ হাসিলের জন্য তাঁর মাজারে চিল্লা পালন করেছেন। খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি চিল্লা শেষ করে বিদায় নেওয়ার সময় এই কবিতাটি বলেছিলেন:

গঞ্জ বখশ বিশ্বের জন্য অনুগ্রহ, আল্লাহর নূরের প্রকাশস্থল;
অপূর্ণদের জন্য পূর্ণ পীর এবং পূর্ণদের জন্য পথপ্রদর্শক।

তাঁর মাজার সর্বপ্রথম সুলতান মাসউদ গজনভির পুত্র জহিরুদ্দৌলা নির্মাণ করান। পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট আকবর নতুন করে কিছু নির্মাণ কাজ করান। দেশভাগের পরও এই ধারা অব্যাহত থাকে। জিয়ারতকারীদের আধিক্যের কারণে সম্প্রতি মাজার ও খানকাহকে আধুনিক পদ্ধতিতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। [১]

ইকবাল তাঁর শানে কতই না চমৎকার মানকাবাত বলেছেন:

সৈয়দ হুজবেরি উম্মতের মখদুম, তাঁর মাজার পীরে সাঞ্জারের জন্য হারাম।
তিনি পাহাড়ের বন্ধনসমূহ সহজেই ছিন্ন করেছেন এবং হিন্দুস্তানের জমিনে সিজদার বীজ বপন করেছেন।
তাঁর সৌন্দর্যে ফারুকী যুগ সতেজ হয়েছে এবং তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে।
তিনি উম্মুল কিতাবের সম্মানের পাহারাদার, তাঁর দৃষ্টিতে বাতিলের কলম ধ্বংস হয়ে যায়।
তাঁর ফয়েজে পাঞ্জাবের মাটি জিন্দা হয়েছে এবং তাঁর সূর্য দ্বারা আমাদের সকাল আলোকিত হয়েছে।

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০; তাযকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ ও পাকিস্তান, মুফতি ওয়ালি হাসান টোঙ্কি: পৃষ্ঠা ৩১ থেকে ৩৯; আবে কাওসার: পৃষ্ঠা ১৭৬ থেকে ১৮১।

সুলতান সখী সরওয়ার রহমাতুল্লাহি আলাইহি

৫২২ হিজরি - ৫৭৭ হিজরি

(১১৩০ খ্রিস্টাব্দ - ১১৮১ খ্রিস্টাব্দ)

ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে যখন উপমহাদেশে ঘুরি বংশের আক্রমণ চলছিল, তখন এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন সুলতান সখী সরওয়ার, যাঁর আসল নাম ছিল সৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

তাঁর পিতা শেখ জয়নুল আবেদিন রহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্পর্ক ছিল হিজাজের সাথে। তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় রওজা-এ-আতহারের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। একদিন স্বপ্নে হুজুর খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করেন। আকা-এ-নামদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উপমহাদেশে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে শেখ জয়নুল আবেদিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি সপরিবারে রওনা হয়ে ৫২০ হিজরিতে পাঞ্জাবের ঝাং জেলার শাহকোট নামক জনপদে এসে অবস্থান করেন এবং জীবিকার জন্য চাষাবাদ ও পশুপালনের পেশা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি সর্বদা জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। দুই বছর পর তাঁর স্ত্রী বিবি আমিনা ইন্তেকাল করেন, যাঁর গর্ভে দুই পুত্র ছিল। এমতাবস্থায় শাহকোটের চৌধুরী, যিনি খোখর বংশের ছিলেন, তিনি তাঁর কন্যা আয়েশাকে আপনার সাথে বিবাহ দেন।

৫২২ হিজরি (১১৩০ খ্রিস্টাব্দ) সালে এই মহীয়সী নারীর গর্ভে সৈয়দ আহমদ সুলতান রহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম হয়। আপনি প্রাথমিক শিক্ষা আপনার পিতার নিকট থেকে অর্জন করেন। এরপর উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষার জন্য আপনি লাহোর সফর করেন, যা সেই যুগে উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। সেখানে আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন এবং একজন বিজ্ঞ আলেম হন। ফিরে এসে আপনি পিতার সাথে পৈতৃক পেশায় সাহায্য করতে শুরু করেন। মুলতানের শাসক ঘেনু খান আপনার চারিত্রিক মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হন, ফলে নিজের কন্যার বিবাহ আপনার সাথে সম্পন্ন করেন।

পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে আপনার পিতা, মাতা এবং ভাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এদিকে আপনার মন দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যায়, ফলে কোনো শায়খের সন্ধানে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অবশেষে বাগদাদে পৌঁছান এবং শেখ আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৫৯১ হিজরি)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর খলিফা হন। একইভাবে বাগদাদে শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকেও খিলাফতের খিরকা লাভ করেন। এ ছাড়া চিশতিয়া সিলসিলায় খাজা মওদুদ চিশতি রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকেও ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে খেলাফত লাভ করেন।

তারিখ-এ-উম্মতে মুসলিমা

পরিশেষে, নিজ সময়ের প্রখ্যাত ওলিদের কাছ থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করে আপনি পাঞ্জাবে ফিরে আসেন। কিছুকাল লাহোরে অতিবাহিত করেন। এরপর সোহদরা (ওয়াজিরাবাদের নিকটবর্তী) চেনাব নদীর তীরে জিকির, ইবাদত ও সাধনায় জীবন অতিবাহিত করতে শুরু করেন। খুব শীঘ্রই আপনার (রহ.) বেলায়েতের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুকাল পর আপনি (রহ.) ডেরা গাজি খান চলে যান এবং জীবনের বাকি সময় সেখানেই ইসলামের প্রচার ও মুরিদদের প্রশিক্ষণে অতিবাহিত করেন।

আপনি (রহ.) অত্যন্ত দানশীল ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। আপনার কাছে যা আসত, তা তৎক্ষণাৎ অভাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। কোনো অভাবী আপনার দুয়ার থেকে খালি হাতে ফিরে যেত না। ফলে মানুষ আপনাকে ‘সুলতান সখি সরওয়ার’ এবং ‘লাখ দাতা’ উপাধিতে স্মরণ করতে শুরু করে। আপনার (রহ.) মুরিদদের ‘সুলতানি’ বলা হয়।

জীবনের ৫৩টি বসন্ত দেখার পর ৭৭৫ হিজরি (১০৮১ খ্রিস্টাব্দ) সালে আপনার (রহ.) ইন্তেকাল হয়। ডেরা গাজি খানের যে জনপদে আপনার মাজার অবস্থিত, সেটি আপনার নামানুসারে ‘সখি সরওয়ার’ নামে পরিচিত। এই জনপদটি মুলতান থেকে ১১০ কিলোমিটার এবং ডেরা গাজি খান শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে কোহ-এ-সুলাইমানের পাদদেশে অবস্থিত। [১]

হে সৌন্দর্যের সূর্য, এ তোমার অণু-পরিমাণ অনুগ্রহ... রাজাদের মাথা তুমি ভিক্ষুকদের সামনে নত করে দিয়েছ
হে লাঞ্ছিত প্রেম, এ তোমার অপমান-প্রিয়তা... সিংহাসনে আসীনদেরও তুমি ধুলোয় বসিয়ে দিয়েছ

---

[১] আব-এ-কাউসার: পৃষ্ঠা ৮৪ থেকে ৮৫; হযরত সখি সরওয়ার, লেখক: প্রফেসর হামিদ খান হামিদ, প্রকাশক: উলামা একাডেমি, ওয়াকফ বিভাগ পাঞ্জাব; সিরাত-এ-সখি সরওয়ার, লেখক: হাসিব আল-কাদরি, প্রকাশক: আকবর বুক সেলার্স লাহোর; তারিখ-এ-সোহরাওয়ার্দিয়া, লেখক: প্রফেসর মুহাম্মদ সাঈদ: পৃষ্ঠা ৪৫৭ থেকে ৪৬০, ১৩৫৭।

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

দিল্লির রাজন্যবর্গ

দাস বংশ, খিলজি, তুঘলক, সায়্যিদ এবং লোদি

৬০২ হিজরি থেকে ৯৩২ হিজরি (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ)

মোট সময়কাল: চান্দ্র বর্ষ অনুযায়ী: ৩৩০ বছর। সৌর বর্ষ অনুযায়ী: ৩২০ বছর।

https://t.me/BoierSomahar

শাহানে দিল্লির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শাহাবুদ্দিন ঘোরীর শাহাদাতের পর, ভারতের বিজিত অঞ্চলগুলোতে তাঁর মামলুকগণ, যারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, যা নিম্নরূপ:

(১) কুতুবুদ্দিন আইবেক মধ্য ভারত ও দিল্লির অঞ্চলে সরকার গঠন করেন।

(২) নাসিরুদ্দিন কাবাচা পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সরকার গঠন করেন।

(৩) তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ পশতুন অঞ্চলে নিজের সরকার গঠন করেন।

এভাবে ভারতে প্রথমবারের মতো স্বাধীন মুসলিম সালতানাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়, যা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। মুঘলদের আগে এখানে পাঁচটি বড় রাজবংশ অতিবাহিত হয়েছে, যাদের রাজধানী অধিকাংশ সময় দিল্লি ছিল। এই কারণে তাদের 'শাহানে দিল্লি' বলা হয়। শাহানে দিল্লির মধ্যে পাঁচটি রাজবংশ অন্তর্ভুক্ত:

(১) দাস বংশ (খানদানে গোলামা)

(২) খিলজি

(৩) তুঘলক

(৪) সাদাত

(৫) লোদি

ষষ্ঠ খণ্ড

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দাস বংশ

ক্ষমতার মেয়াদ..... হিজরি বছর: ৮৭ - সৌর বছর: ৮৪

৬০২ হিজরি থেকে ৬৮৯ হিজরি

(১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তোমার গোলামরাই বাদশাহি করেছে

পুত্রসন্তানহীন সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরি তুর্কি গোলামদের নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করেছিলেন। এই গোলামরা সালতানাতের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতানের শাহাদাতের পর ঘুরি সালতানাত এই উচ্চপদস্থ গোলামদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এজন্য এই যুগকে "খানদানে গোলামা" (দাস বংশ) বলা হয়।

ভাগ্যের এক অদ্ভুত কারিশমা এই যে, দাস বংশের উত্থানের মাত্র চার দশক পর মিসর ও সিরিয়াতেও তুর্কি মামলুকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব সাধারণভাবে তুর্কি গোলামরাই দিচ্ছিলেন।

এই সময়টি ছিল অত্যন্ত সংকটময়, কারণ একদিকে ক্রুসেডার এবং অন্যদিকে মঙ্গোল বিজেতারা মুসলিম বিশ্বকে তছনছ করে দিচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে প্রাচ্যে দিল্লির দাস বংশ এবং পাশ্চাত্যে কায়রোর মামলুকরা একাকী মুসলিম বিশ্বকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করে এই সত্যটি উন্মোচিত করে দেন যে, যদি উচ্চবংশীয় সুলতান ও শাহজাদারা ভোগ-বিলাস, মদ-নারী ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে অথবা ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে নিজেদের জাতীয় দায়িত্ব ভুলে যান, তবে আল্লাহর ইচ্ছা তাদের ভোঁতা তলোয়ারের মুখাপেক্ষী নয়। তিনি উম্মতে মুসলিমার হেফাজতের কাজ সমাজের সর্বনিম্ন স্তর থেকেও করিয়ে নিতে পারেন এবং ইসলামী সীমান্ত রক্ষার সৌভাগ্য তাদের তকদিরে লিখে দিতে পারেন।

হিন্দুস্তানের দাস বংশ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বাদশাহদের নিজের কোলে স্থান দিয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রথম বাদশাহ ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক। এরপর শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ, নাসিরুদ্দিন মাহমুদ এবং গিয়াসুদ্দিন বলবনের মতো শানদার বাদশাহরা একে একে আসেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এই মহান বংশের শাসকদের ইতিহাস অধ্যয়ন করব।

https://t.me/BoierSomahar

গজনীতে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর শাহাদাতের পর হিন্দুস্তানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিই আমাদের এই আলোচনার মূল বিষয়। তবে যেহেতু সেই সময় হিন্দুস্তানের রাজনীতি গজনীর রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তাই এটি জরুরি যে প্রথমে আমরা জেনে নিই এই তিন-চার বছরে গজনীতে কী কী ঘটেছিল।

মাহমুদ বিন গিয়াসুদ্দিন ঘুরী, উত্তরাধিকারের পদপ্রার্থী:

সুলতান শাহাবুদ্দিনের ভাতিজা মাহমুদ (গিয়াসুদ্দিন ঘুরীর পুত্র) একজন দানশীল, ভদ্র স্বভাবের কিন্তু আরামপ্রিয় যুবক ছিলেন। নিজের পিতার মৃত্যুর পর থেকেই তিনি ফিরোজ কোহ-এর সিংহাসনে আরোহণের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কিন্তু শাহাবুদ্দিন শাসনভার গ্রহণ করে তার পরিবর্তে মরহুম সুলতানের জামাতাকে ফিরোজ কোহ-এর সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছিলেন। মাহমুদকে তিনি বুস্ত ও ফারাহ অঞ্চল প্রদান করেছিলেন।

তখন থেকেই মাহমুদ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, ফলে যখন তিনি তার চাচার শাহাদাতের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি অবিলম্বে ফিরোজ কোহ আক্রমণ করে তা দখল করে নেন এবং নিজের পিতার উপাধি গ্রহণ করে সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ নামে পরিচিত হতে থাকেন। শীঘ্রই তিনি ঘূর, তালকান এবং গরম সিরও দখল করে নেন, কিন্তু গজনীর রাজকীয় অভিজাতরা তাকে সুলতান হিসেবে গ্রহণ করেনি। [১]

সুলতানের শাহাদাতের পর তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ-এর রাজনৈতিক ভূমিকা:

তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর মামলুকদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সুলতান ঘুরীর আদেশে তিনি তার এক কন্যার বিবাহ নাসিরুদ্দিন কাবাচা এবং অন্য কন্যার বিবাহ কুতুবুদ্দিন আইবেকের সাথে দিয়েছিলেন। [২] সম্ভবত সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল যে, তার এই তিনজন অত্যন্ত সম্মানিত আমির যেন পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঐক্য ও সংহতির সাথে থাকেন। সুলতান তাজউদ্দিন ইয়ালদুজকে “কুররাম” [৩] এবং “সানকুরান” [৪] অঞ্চল প্রদান করেছিলেন।

---

[১] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৩০৪, ৩৭৪

[২] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪১১

[৩] তাবাকাত-ই নাসিরি-তে “কুররাম”-কে কিরমান লেখা হয়েছে, তবে এটি ইরানের কিরমান নয় বরং বর্তমান “কুররাম”, যা পাক-আফগান সীমান্তের কাছে পাকিস্তানি সীমানার মধ্যে অবস্থিত।

[৪] “সানকুরান”-এর কোনো সঠিক পরিচয় গবেষকরা নির্ধারণ করতে পারেননি। যাই হোক, তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তা বিবেচনা করলে এটি কল্পনাতীত যে তাকে কেবল “কুররাম”-এর পাহাড়ি গিরিপথ দেওয়া হয়েছিল। লেখকের মতে, “কুররাম” থেকে “ঝিলাম” পর্যন্ত এলাকা তারই নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই দাবির সপক্ষে প্রমাণ হলো, শাহাবুদ্দিন ঘুরীর শাহাদাতের সময় (যা ঝিলামের কাছে হয়েছিল) মামলুক কর্মকর্তাদের যে কাফেলা সাথে ছিল, তারা সবাই ইয়ালদুজের লোক ছিল। এই কারণেই তারা সুলতানের মরদেহ এবং ধনভাণ্ডার এমনভাবে রক্ষা করেছিল যে কাফেলার রাজকীয় অভিজাতদেরও হস্তক্ষেপ করতে দেয়নি।

সুলতান ঘুরিকে গজনী থেকে হিন্দুস্তান যাওয়ার জন্য "কুররাম" হয়ে যেতে হতো। ফলে সুলতানের এই সফরগুলোতে ইয়ালদোজের ওখানে অবস্থান করা আবশ্যক ছিল, যে যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং মেহমানদারির ক্ষেত্রে সেবার হক খুব ভালোভাবে আদায় করত। যখন ঝিলামের কাছে সুলতানের শাহাদাত হলো, তখন মামলুকরা (ইয়ালদোজের অফিসারগণ) লাশ এবং রাজকীয় কোষাগার নিজেদের হেফাজতে নিয়ে রওয়ানা হলো। তারা এই দায়িত্ব পালনে কাফেলার রাজকীয় কর্মকর্তাদেরও হস্তক্ষেপ করতে দেয়নি।

যখন লাশ "কুররাম" পৌঁছাল, তখন ইয়ালদোজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুলতানের লাশ এবং রাজকীয় কোষাগার তার এক বিশ্বস্ত আব্দুল্লাহ সাঞ্জারি-র তত্ত্বাবধানে গজনী পাঠিয়ে দিল এবং তাকে নির্দেশ দিল যেন সেখানকার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের খবর পাঠাতে থাকে। ফলে সাঞ্জারি-র নেতৃত্বে মামলুকরা লাশ নিয়ে গজনী পৌঁছাল। দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হলো এবং দুটি দল তৈরি হলো। রাজকীয় কর্মকর্তারা বামিয়ান শাসনকারী দুই ঘুরি শাহজাদা: আলাউদ্দিন এবং জালালউদ্দিন (যারা সুলতান বাহাউদ্দিন সাম ঘুরির সন্তান ছিলেন)-এর মধ্যে যেকোনো একজনকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন। অন্যদিকে ইয়ালদোজের প্রতিনিধিদের জেদ ছিল যে, সুলতান শিহাবউদ্দিন ঘুরির ভাতিজা মাহমুদ বিন সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঘুরি যেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১]

আলাউদ্দিন গজনীর সিংহাসনে:

সাময়িকভাবে ঘুরি রাজকীয় অমাত্যদের পাল্লা ভারী থাকল এবং তারা আলাউদ্দিন মুহাম্মদ ও জালালউদ্দিনকে বামিয়ান থেকে আনিয়ে নিলেন। জালালউদ্দিন বড় ভাইয়ের পক্ষে দাবি ত্যাগ করে বামিয়ানের শাসনভার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন। ফলে আলাউদ্দিনকে গজনীর সিংহাসনে বসানো হলো। শিহাবউদ্দিন ঘুরির কোষাগার পাঁচশ উটের বোঝার সমান ছিল, যাতে সোনা, হীরাখচিত অলঙ্কার এবং সোনা-রূপার পাত্র ছিল। দুই শাহজাদার মধ্যে এই কোষাগার সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হলো এবং জালালউদ্দিন নিজের অংশ নিয়ে বামিয়ান চলে গেলেন। [২]

গজনীতে ওলটপালট:

ইয়ালদোজের মামলুকরা সে সময় আলাউদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেও মনেপ্রাণে তারা রাজি ছিল না। তারা তাজউদ্দিন ইয়ালদোজকে সবকিছু লিখে পাঠাল। তার হস্তক্ষেপের কারণে কিছুদিনের মধ্যেই রাজসিংহাসন বারবার ওলটপালট হতে লাগল, ফলে:

- প্রথমে ঘুরি মামলুকরা বিদ্রোহ করল এবং আলাউদ্দিনকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে বামিয়ান পাঠিয়ে দিল।
- এরপর আলাউদ্দিনের ভাই জালালউদ্দিন বামিয়ান থেকে এসে গজনী আক্রমণ করলেন এবং ইয়ালদোজের মামলুকদের তাড়িয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় আলাউদ্দিনকে সিংহাসনে বসালেন।
- এবার তাজউদ্দিন ইয়ালদোজ "কুররাম" থেকে গজনী আক্রমণ করলেন এবং চার মাস অবরোধ করার পর দুই ভাই: জালাল ও আলাউদ্দিনকে গ্রেফতার করে নিলেন।

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪০৮

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪০৮, ৪০৯

- একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো যার মাধ্যমে উভয় ভাই গজনীর সিংহাসন ত্যাগ করে বামিয়ানে চলে গেলেন।

- শীঘ্রই আলাউদ্দিনের মৃত্যু হলো, অথচ এর আগেই তার ভাই জালালুদ্দিন বামিয়ান ছেড়ে খোয়ারিজমে চলে গিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সংক্ষেপে, এভাবে এই দুই রাজপুত্র, যাদেরকে ঘুরী আমীরগণ সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন, তারা পথ থেকে সরে গেলেন।

এভাবে ঘুরী রাজ্যসমূহ বিশেষ করে তাজউদ্দীন ইয়ালদোজের সমর্থিত শাহজাদা মাহমুদ বিন গিয়াসউদ্দীন ঘুরী, ঘোর ও গজনীর সুলতান হলেন। এই সুযোগে তাজউদ্দীন ইয়ালদোজ গিয়াসউদ্দীন মাহমুদকে এই বিষয়ে সম্মত করালেন যে, তিনি বাদশাহ হয়ে তার পৈতৃক রাজধানী ফিরোজ কোহ-তে অবস্থান করবেন, আর রাজনৈতিক কেন্দ্র গজনীতে ইয়ালদোজ সালতানাতের প্রতিনিধি হিসেবে সিংহাসনে আসীন থাকবেন। [১]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরী: পৃষ্ঠা ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

(অষ্টম খণ্ড)

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক

৬০২ হিজরি থেকে ৬০৬ হিজরি

(১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১০ খ্রিষ্টাব্দ)

কুতুবুদ্দিন আইবেক শিহাবুদ্দিন ঘোরীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত আমিরদের একজন ছিলেন। যখন তিনি শিশু ছিলেন, তখন নিশাপুরের বিখ্যাত ফকিহ আল্লামা ফখরুদ্দিন আব্দুল আজিজ—যিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বংশধর ছিলেন এবং নিজের ফিকহী দক্ষতার কারণে "আবু হানিফা সানি" (দ্বিতীয় আবু হানিফা) নামে পরিচিত ছিলেন—তাকে ক্রীতদাস বাজার থেকে ক্রয় করেছিলেন। এই ইলমি পরিবারে আল্লামার সন্তানদের সাথেই আইবেক লালিত-পালিত হন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর তিলাওয়াতের সাথে কুরআন মাজিদ পাঠ করা শিখেছিলেন, যার ফলে তাকে "ক্বারী" বলা হতে থাকে। এখানেই তিনি তলোয়ার চালনা, তীরন্দাজি এবং ঘোড়সওয়ারিতে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি দেখতে সাধারণ গড়নের ছিলেন এবং তার এক হাতের কনিষ্ঠ আঙুল ভাঙা ছিল, এই কারণে তাকে "আইবেক শাল" বলা হতো [১]।

যৌবনকালে যখন তিনি পদার্পণ করেন, তখন কাজী সাহেব বা তার সন্তানরা তাকে বিক্রি করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি গজনীর বাজারে পৌঁছান যেখানে তাকে শিহাবুদ্দিন ঘোরীর খেদমতের জন্য ক্রয় করা হয়। নিজের যোগ্যতার কারণে তিনি খুব দ্রুতই প্রভুর নজরে চলে আসেন [২]।

দাসত্বে বদান্যতার চরম সীমা:

সুলতান শিহাবুদ্দিন কখনো কখনো খুশির মুহূর্তে তাকে অনেক বড় বড় পুরস্কার দিতেন। একবার একইভাবে তাকে...

---

[১] ফায়দা: আইবেক একটি প্রাচীন তুর্কি নাম এবং এর অর্থ হলো "চাঁদের মতো"। অন্য একটি মত অনুযায়ী, এই শব্দে "আই"-এর অর্থ হলো "চাঁদ" এবং "বেক" (বেগ)-এর অর্থ হলো সরদার বা নেতা। সুতরাং আইবেকের অর্থ হলো "চাঁদ সদৃশ নেতা"। "শাল" ফারসি শব্দ যার অর্থ হলো পঙ্গু বা অক্ষম। শৈশবে একটি কনিষ্ঠ আঙুল ভাঙা থাকার কারণে এবং চমৎকার গুণাবলির কারণে তাকে "আইবেক শাল" বলা হতো। পরবর্তীতে যখন মর্যাদা বৃদ্ধি পেল, তখন "শাল" শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু "আইবেক" বলা হতে থাকে। মনে রাখা দরকার যে, ঘোরী সালতানাতে এমন ছয় বা সাতজন আমির ছিলেন যাদের উপাধি ছিল "আইবেক"। মলহুজাহ (দ্রষ্টব্য): কিছু লেখক লিখেছেন যে তার নাম "আইবেক" এ কারণে রাখা হয়েছিল যে তার কনিষ্ঠ আঙুল (হাতের ছোট আঙুল, খিনসার) ভাঙা ছিল এবং তুর্কি ভাষায় আইবেক মানে হলো ভাঙা আঙুলওয়ালা। এই কথাটি সঠিক নয় কারণ তুর্কি ভাষায় আইবেকের অর্থ "ভাঙা আঙুলওয়ালা" নয়।

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪১৬; তারিখ-ই-ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: পৃষ্ঠা ২১, ২২, লন্ডন থেকে প্রকাশিত; লুবাবুল আলবাব আউফি: পৃষ্ঠা ৪২৮; জামিউত তাওয়ারিখ হিন্দ: পৃষ্ঠা ২৯২।

পুরস্কার ও সম্মান হিসেবে একটি বড় অংকের অর্থ প্রদান করলেন যা তিনি তখনই চাকর, গোলাম, কুলি এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। সুলতান শাহাবুদ্দিন আইবেকের এই বদান্যতার খবর পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং তাঁর প্রতি আরও সদয় হলেন। তিনি আইবেকের আনুগত্য বহুবার পরীক্ষা করেছেন এবং প্রতিবারই তাকে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি উৎসর্গকারী হিসেবে পেয়েছেন। [১]

যুদ্ধে বন্দিত্ব এবং প্রভুর অনুগ্রহ:

আইবেক শুরুতে তাঁর প্রভুর কাছে আমীর-ই-আখুর (রাজকীয় আস্তাবলের কর্মকর্তা) ছিলেন, যা সেই যুগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। যখন ঘুরিদের খাওয়ারিজমি শাহজাদা সুলতান শাহ (মার্ভের শাসক)-এর মোকাবিলায় বের হতে হলো, তখন এই যুদ্ধের সময়ও ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা এবং তাদের ঘাস-দানাপানি সরবরাহের দায়িত্ব কুতুবুদ্দিন আইবেকের ওপরই ছিল। এর পাশাপাশি যুদ্ধ চলাকালীনও তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিতে থাকেন।

একদিন তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর সাথে উপযুক্ত চারণভূমির সন্ধানে ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অনেক খাওয়ারিজমি অশ্বারোহী আক্রমণ করে বসে। আইবেক অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দি হন। ছয় মাস পর ঘুরি ও খাওয়ারিজমিদের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় যাতে সুলতান শাহ পিছু হটতে বাধ্য হন। এরপর যখন বন্দি বিনিময় হলো, তখন আইবেককে গলায় বেড়ি ও শিকল পরিয়ে একটি উটের ওপর সওয়ার করে তাঁর প্রভুর কাছে পাঠানো হলো। নিজের অনুগত গোলামকে এই অবস্থায় দেখে দয়ালু প্রভুর হৃদয়ে তাঁর প্রতি সম্মান আরও বেড়ে গেল এবং তিনি তাঁকে আরও সম্মানে ভূষিত করলেন। [২]

শাহাবুদ্দিন ঘুরির আইবেকের ওপর আস্থা:

সুলতান আইবেকের ওপর এতটাই আস্থা রাখতেন যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কথা শোনাও পছন্দ করতেন না। একবার কিছু আমীর শাহাবুদ্দিন ঘুরির কাছে অভিযোগ করলেন যে, আইবেক হিন্দুস্তানে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে। ঘুরি তাঁকে তলব করলেন। তিনি রাতদিন সফর করে তাঁর প্রভুর কাছে উপস্থিত হলেন যাতে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ থাকলে তিনি নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু সুলতান শাহাবুদ্দিন তাঁর ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি পরের দিন দরবার ডাকার আগে কুতুবুদ্দিনকে রাজসিংহাসনের নিচে লুকিয়ে রাখলেন। যখন দরবারীরা উপস্থিত হলেন, তখন সুলতান শাহাবুদ্দিন কুতুবুদ্দিন সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। হিংসুকরা তাঁকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করল। এটি শুনে শাহাবুদ্দিন রাজকীয় রীতি অনুযায়ী তালি বাজালেন এবং ডাক দিলেন: “আইবেক”।

এটি শোনামাত্রই কুতুবুদ্দিন “লাব্বাইক” বলতে বলতে রাজসিংহাসনের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন।

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৬; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৩। তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ: খণ্ড ১, পৃ. ৩৬।

[২] (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩০২, ৩০৩, ৩৫৯, ৩৬৭, ৪১৭) মিনহাজ-উস-সিরাজ (পৃ. ৩৯৮)-এ একে ৫৮৭ হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন, এবং একই ঘটনা যখন পৃ. ৩৫৯-এ বর্ণনা করেছেন তখন সেখানে একে ৫৮৮ হিজরির ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই উভয় কথা সঠিক হতে পারে না কারণ ৫৮৭ হিজরিতে ঘুরি শাসক তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন এবং পরাজয়ের পর পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং ৫৮৮ হিজরিতে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে গৌরবময় বিজয়ের পর আইবেককে বিজিত অঞ্চলসমূহের নায়েব বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এই ঘটনাটি আইবেককে হিন্দুস্তান অভিযানে পাঠানোর কয়েক বছর আগের, যখন তিনি আমীর-ই-আখুর ছিলেন।

ঈর্ষান্বিত আমীরগণ হতবাক হয়ে গেলেন। সুলতান শাহাবুদ্দিন তাদের বললেন: “আমি তোমাদের ক্ষমা করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আইবেক সম্পর্কে কোনো মন্দ কথা বলবে না।” [১]

হিন্দুস্তানে আইবেকের নায়েবগিরি ও বিজয়সমূহ

৫৮৮ হিজরি (১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে শাহাবুদ্দিন ঘুরি আজমিরের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং তার ডজন খানেক মিত্র শাসকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। এই বিজয়ে কুতুবুদ্দিন আইবেকের অনেক বড় ভূমিকা ছিল। এই কারণে সুলতান শাহাবুদ্দিন ফিরে যাওয়ার সময় আইবেককে ‘কোহরাম’-এর জায়গির প্রদান করেন এবং উত্তর হিন্দুস্তানে লাহোর থেকে দোয়াব পর্যন্ত নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন। দিল্লিকে রাজধানী করার আগে আইবেকের সামরিক কেন্দ্র এই ‘কোহরাম’-ই ছিল। [২]

কুতুবুদ্দিন আইবেক এরপর হিন্দুস্তানে বিজয়ের এক ধারা শুরু করেন এবং তার প্রচেষ্টার ফলে দিন দিন বিশাল এলাকা ঘুরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। কুতুবুদ্দিন আইবেক ৫৮৮ হিজরি (১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ৬০২ হিজরি (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ বছর শাহাবুদ্দিন ঘুরির নায়েব হিসেবে উত্তর হিন্দুস্তানের অসংখ্য শহর জয় করেন এবং অনেক বিদ্রোহ দমন করেন। এই অভিযানগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

হাসিতে জাটওয়ান রাজপুতের সাথে যুদ্ধ:

শাহাবুদ্দিন ঘুরি তরাইনের যুদ্ধের পর ‘সারসা’ এবং ‘হাসি’ জয় করে হাসিতে নুসরাতুদ্দিনকে কেল্লাদার নিযুক্ত করেছিলেন। যখন ঘুরি বাহিনী ফিরে গেল, তখন ‘জাটওয়ান’ নামক এক স্থানীয় জমিদার রমজান ৫৮৮ হিজরি (সেপ্টেম্বর ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে আক্রমণ করে তা অবরোধ করে। এই খবর শোনামাত্রই কুতুবুদ্দিন আইবেক সেদিকে অভিযান চালান। জাটওয়ান মোকাবিলা থেকে পিছু হটে যায়। কিন্তু আইবেক রাজস্থান পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেন। এখানে একটি যুদ্ধ হয় যাতে জাটওয়ান নিহত হয় এবং এই ফিতনা শেষ হয়ে যায়। [৩]

---

[১] সফরনামা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩০। এই ঘটনাটি আইবেকের দিল্লি জয়ের পর ঘটেছিল। সামনে আইবেকের অভিযানসমূহের অধীনে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আসছে।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৭; তাজুল মাআসির, হাসান নিজামী: পৃষ্ঠা ৯০, ৯১।

স্থানের ব্যাখ্যা: ‘কোহরাম’ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পাতিয়ালা জেলায় কাইথাল জেলার সীমান্তের কাছে অবস্থিত। দিল্লি থেকে এটি উত্তরে ২২০ কিলোমিটার দূরে। বর্তমানে একে ‘ঘোরাম’ বা ‘রামগড়’ বলা হয়। দিল্লির কাছে হওয়ার কারণে এটি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কোহরামের উল্লেখ বিশেষ করে সুলতান মাহমুদ গজনভি থেকে দাস বংশ পর্যন্ত ইতিহাসে বারবার আসে।

দ্রষ্টব্য: এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দুস্তানে আইবেকের অবস্থান সুলতানের একমাত্র নায়েব হিসেবে ছিল না, বরং আরও কিছু মামলুক আমীরও তার সমপদমর্যাদার ছিলেন যাদের পরবর্তীতে আরও কিছু এলাকা অর্পণ করা হয়েছিল। যেমন বাহাউদ্দিন তুঘরিল গোয়ালিয়রে, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বিহারে, তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ বর্তমান খাইবার পাখতুনখোয়ায় তার সমপর্যায়ের আমীর ছিলেন।

[৩] তাজুল মাআসির, হাসান নিজামী: পৃষ্ঠা ১০০ থেকে ১১৩।

স্থানের ব্যাখ্যা: হাসি ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পশ্চিম অংশে হিসার জেলার একটি ঐতিহাসিক শহর, যা তার প্রাচীন ইতিহাস এবং গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের জন্য পরিচিত। এর উল্লেখ প্রাচীন হিন্দু স্তম্ভেও পাওয়া যায়। দিল্লি থেকে এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দূরে।

মিরাট বিজয়: (৫৮৮ হিজরি মোতাবেক ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ)

চৌহান রাজপুতদের শক্তি পুরোপুরি চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা বড় কোনো যুদ্ধের যোগ্য ছিল না। তবে এখন দক্ষিণ দোয়াবে গাহড়বাল সালতানাতের রাজা জয়চন্দ্র অদূর ভবিষ্যতে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণিত হতে পারতেন। আইবেক এই বিষয়টি মাথায় রেখে রণকৌশল হিসেবে প্রথমে সেই বড় শহরগুলোকে পদানত করার সিদ্ধান্ত নেন, যা দখল করার পর গাহড়বাল সালতানাতের মোকাবিলা করা সহজ হতো। چنانچہ ৫৮৮ হিজরির (১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) শেষ দিকে অবরোধ ও যুদ্ধের পর মিরাট জয় করা হয়, যা উত্তর দোয়াবের একটি অত্যন্ত মজবুত দুর্গ ছিল। [১]

এরপর মিরাট থেকে ৬৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'বরণ' (বুলন্দশহর)-ও দখল করে নেওয়া হয়। [২]

দিল্লি বিজয়: (৫৮৮ হিজরি মোতাবেক ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ)

এরপর আইবেক দিল্লির দিকে মনোযোগ দেন, যা পৃথ্বীরাজ চৌহানের আমলে উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজপুত কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। একে লালকোটও বলা হতো। অনেকে একে পৃথ্বীরাজের নির্মিত বিশাল দুর্গের নামানুসারে 'কিলা রাই পিথোরা' বলতেন। এটি একটি সীমিত এলাকার ওপর বিস্তৃত একটি মজবুত প্রাচীরবেষ্টিত শহর ছিল, যেখানে রাজপুত স্থাপত্যশৈলীর ভবন, মন্দির এবং আবাসিক এলাকা ছিল। [৩]

সংক্ষেপে, কুতুবুদ্দিন আইবেক এই শহর আক্রমণ করে তা অবরোধ করেন। যদিও শহরের অধিবাসীরা কয়েকদিন ধরে পরিখা থেকে তীব্র লড়াই করেছিল, কিন্তু বড় কোনো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, কারণ তরাইনের যুদ্ধে রাজপুতদের সম্মিলিত শক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কুতুবুদ্দিন আইবেক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লি জয় করেন। [৪]

শুরুতে আইবেক দিল্লির শাসনভার রাজপুতদের 'তোমার' বংশের হাতে ন্যস্ত করেন, কিন্তু পরের বছর (৫৮৯ হিজরি - ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) যখন তিনি জানতে পারেন যে এই লোকেরা কিছু বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে, তখন আইবেক তাদের অপসারিত করে দিল্লির শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন এবং 'ইন্দ্রপ্রস্থ' (ইন্দরপত)-কে নিজের কেন্দ্রে পরিণত করেন। [৫]

---

[১] তাজুল মাআসির, হাসান নিজামী, পৃ. ১১৪-১১৬; তবাকাত-ই-নাসিরি, খণ্ড ১, পৃ. ৪১৭।

[২] জামে তারিখ-ই-হিন্দ, পৃ. ৪৩৬। তবে এর কোনো প্রাচীন তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। অবশ্য তবাকাত-ই-নাসিরি (পৃ. ৪৪৩)-তে আছে যে, আইবেক গোয়ালিয়র বিজয়ের পর 'বরণ' ইলতুতমিশকে প্রদান করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে 'বরণ' তার আগেই জয় করা হয়েছিল।

[৩] ঐতিহাসিক ফেরেশতার মতে, দিল্লি শহরের ভিত্তি তোমার বংশীয়রা ৩৭০ হিজরিতে (৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) স্থাপন করেছিল। শহরটির নামকরণের কারণ সম্পর্কে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান একে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এর প্রতিষ্ঠাতা রাজা 'ঢালু'-র নামানুসারে একে প্রথমে 'ঢালু' এবং পরে 'দিল্লি' বলা হতে থাকে। (আসার-উস-সানাদিদ, পৃ. ৮)। শহরের প্রতিষ্ঠাতার পর এখানে 'রাজা ভোজ' থেকে 'রাজা সালবাহন' পর্যন্ত আটজন শাসক অতিবাহিত হন। এরপর এখানে চৌহান রাজপুতদের শাসন আসে, যাদের মধ্যে চাহড় রাজ, বিসল দেব, দিউ রাজ, রাওয়াল দেব, চাহড় দেব, সোমেশ্বর দেব এবং পৃথ্বীরাজ অতিবাহিত হন। (পৃ. ১৩)। পৃথ্বীরাজ নিজে আজমিরে থাকতেন, আর তার প্রতিনিধি গোবিন্দ রায় দিল্লির শাসক ছিলেন।

[৪] তবাকাত-ই-নাসিরি, খণ্ড ১, পৃ. ৪১৭; তাজুল মাআসির, হাসান নিজামী, পৃ. ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১১৬, ১১৮।

[৫] (জামে তারিখ-ই-হিন্দ, পৃ. ৪৩৬) টীকা: তোমার রাজপুতরা ছিলেন সেই রাজা যারা দিল্লির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং এখানে অনেক প্রজন্ম ধরে শাসন করেছিলেন। পরবর্তীতে চৌহান রাজপুতরা তাদের কাছ থেকে দিল্লি ছিনিয়ে নেয়। কুতুবুদ্দিন আইবেক এক রাজপুত বংশের কাছ থেকে শাসনভার নিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুতদের হাতে তুলে দিয়ে এক চমৎকার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। যদি ওই লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা না করত, তবে সম্ভবত তাদের শাসনের ধারা আরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলত।

এই বছর দোয়াবে ‘কোল’ (বর্তমান আলীগড়) জয় করা হয়, যার ফলে উত্তর দোয়াব প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয়। দিল্লি এখন উত্তর ভারতের মুসলিম ক্ষমতার রাজধানী ছিল। এর ভৌগোলিক অবস্থান, উত্তর ভারতের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়া এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার কারণে এটি রাজনৈতিক কেন্দ্রের জন্য সর্বোত্তম পছন্দ ছিল। এর পরবর্তী মুসলিম সালতানাতগুলোও দিল্লিকেই তাদের রাজধানী হিসেবে বহাল রাখে, যার ফলে এর কেন্দ্রীয় মর্যাদা স্থায়ী হয়ে যায়। এভাবে আইবেকের বিজয় দিল্লির গুরুত্বকে একটি নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যুগে স্থানান্তরিত করে।

যদিও দিল্লি এর আগেও ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে চলে আসছিল, কিন্তু ইসলামি যুগে এর গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং এটি শতাব্দীকাল ধরে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ছিল।

চান্দাওয়ারের যুদ্ধ: ৫৯০ হিজরি (১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

উত্তর দোয়াব মুসলিম সালতানাতের অংশ হওয়ার পর এখন দক্ষিণ দোয়াবের রাজা এবং গহড়বাল সালতানাতের শাসক জয়চন্দ্রও যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এসেছিল, তাই শাহাবুদ্দিন ঘুরি নিজেই সৈন্য পরিচালনা করেন এবং কুতুবুদ্দিন আইবেক তাকে সহায়তা করেন। এই অভিযানে ‘কোল’ (আলীগড়)-কে (যা সম্ভবত কোনো বিদ্রোহের কারণে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল) পুনরায় জয় করা হয়।

এরপর ‘চান্দাওয়ার’ ময়দানে যমুনা নদীর তীরে রাজা জয়চন্দ্রের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিমরা বিজয় লাভ করে যাতে কুতুবুদ্দিন আইবেকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। (এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।) [২]

এই বিজয়ের ফলে ইসলামি সালতানাত বেনারস এবং আরও অনেক এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দোয়াব প্রায় সম্পূর্ণ পদানত হয়। জয়চন্দ্রের পরাজয়ের পরও গহড়বাল বংশের কিছু ছোট সর্দার প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে, কিন্তু তাদের কেন্দ্রীয় শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সফেদ হাতি (সাদা হাতি):

জয়চন্দ্র এই যুদ্ধে তিন হাজার হাতি নিয়ে এসেছিলেন যা মুসলিমদের হস্তগত হয়। শাহাবুদ্দিন ঘুরি বিজয়ের পর বেনারসে এই হাতিগুলো পরিদর্শন করছিলেন এবং হাতিগুলো সারি বেঁধে সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রতিটি হাতি যাওয়ার সময় মাহুতের ইশারায় শুঁড় তুলে সুলতানকে সালাম দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে একটি বিরল সাদা হাতিও ছিল। সেটি যাওয়ার সময় সালাম দেয়নি। মাহুত অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু হাতিটি তার জেদ ধরে অটল ছিল।

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪০১

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১১; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৭১; তাজুল মাআসির (হাসান নিজামী): পৃষ্ঠা ১৫৪ থেকে ১৬৭; ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ৯২ থেকে ৯৬

দ্রষ্টব্য: আইবেকের বিজয়াভিযানের সময়কাল নিয়ে মিনহাজুস সিরাজ এবং সিরহিন্দির বর্ণনায় মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিরহিন্দির বর্ণনা অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

দ্রষ্টব্য: চান্দাওয়ার, চান্দাউর, চান্দওয়াড়া ইত্যাদি একই স্থানের বিভিন্ন উচ্চারণ। বর্তমানে একে চান্দপুরও বলা হয়। এটি উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় ফিরোজাবাদ শহরের কাছে অবস্থিত। দিল্লি থেকে এটি দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় দুইশ কিলোমিটার দূরে।

সুলতান শাহাবুদ্দিন সেই হাতিটি নিজের জন্য রেখে দিলেন এবং বাকি সব হাতি কুতুবুদ্দিন আইবেককে দান করলেন। যখন সুলতান ঘুরি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন কিছু চিন্তা করে সেই সাদা হাতিটিও আইবেককে দিয়ে দিলেন এবং তাকে নিজের "সন্তান" বলে ঘোষণা করলেন।

এই হাতিটি কুতুবুদ্দিনের অনুগত হয়ে গেল এবং সবসময় তার সাথেই থাকত। কুতুবুদ্দিন আইবেকের ইন্তেকালের তিন দিন পর এই হাতিটিও প্রাণত্যাগ করল [১]।

বদায়ুন ও কালপুর অভিযান:

আইবেক গাহরওয়াল, চৌহান এবং অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখেন এবং উত্তর ভারতে ঘুরি শক্তিকে আরও সুসংহত করেন। ফলে তিনি শীঘ্রই থাথাঙ্কার, কালপুর এবং বদায়ুনও জয় করে নেন [২]।

হরি রায়ের বিদ্রোহ:

৫৮৮ হিজরি (১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয় ও মৃত্যুর পর শাহাবুদ্দিন ঘুরি আজমির দখল করেন। সুলতান আজমিরে পৃথ্বীরাজের পুত্র গোবিন্দরাজকে করদ রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজের ভাই হরি রায় (হরাজ রায়) তা মেনে নেননি এবং নিজের স্বাধীনতার দাবিতে তার ভাতিজা গোবিন্দরাজকে আজমির থেকে বিতাড়িত করে শহরটি দখল করে নেন। এরপর হরি রায় রণথম্বোরও নিজের দখলে নিয়ে নেন, যেখানে ঘুরিদের পক্ষ থেকে কওয়াম-উল-মুলক শাসন করছিলেন [৩]।

---

[১] (তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৯) ঐতিহাসিক ফিরিশতা এই ঘটনাটি এভাবে লিখেছেন যে, "সাদা হাতির সম্মান কেবল কুতুবুদ্দিন আইবেকই পেয়েছিলেন। অন্যথায় প্রাচীন সুলতানদের থেকে শুরু করে আমাদের সময় পর্যন্ত হিন্দুস্তানের কোনো শাসকের কাছে এমন হাতি ছিল না। তবে পেগু দ্বীপের শাসকদের কাছে সবসময় সাদা হাতি থাকে।" লেখকের মতে এখানে "পেগু" বলতে মিয়ানমার (বার্মা)-এর "কাশির পেগু" বোঝানো হয়েছে, যেখানে প্রাচীন শাসকদের সাদা হাতি রাখার প্রথা ছিল।

[২] (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১১) তওযীহুল আমাকিন: "কালপুর" বলতে সম্ভবত "কালপি" বোঝানো হয়েছে যা বদায়ুন থেকে ২২০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

দ্রষ্টব্য: থাথাঙ্কার জয়ের পর কুতুবুদ্দিন ঘুরি কালপি জয় করেছিলেন। সম্ভবত এখানে পরে বিদ্রোহ হয়েছিল যা দমন করা হয়েছিল।

[৩] তাজুল মাআসির হাসান নিজামী: পৃষ্ঠা ১৮৩-১৯১; জামিউত তাওয়ারিখ হিন্দ: পৃষ্ঠা ২৩০, ২৩৯।

তওযীহুল আমাকিন: রণথম্বোর ছিল একটি শক্তিশালী দুর্গ যা চৌহান এবং ঘুরি উভয়ের জন্যই সমান প্রতিরক্ষা গুরুত্বের অধিকারী ছিল। এটি আজমির থেকে প্রায় ১৫০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। একে রণথম্বোর বা রণথম্ভোর বলা হয়। এই নামটি তিনটি সংস্কৃত শব্দের সমষ্টি: "রণ", "থম্ভ", "পুর"। "রণ" মানে জঙ্গল, উপত্যকা বা মরুভূমি। এই এলাকাটি ঘন জঙ্গল ও উপত্যকা নিয়ে গঠিত। "থম্ভ" মানে স্তম্ভ বা মিনার। এই দুর্গটি একটি উঁচু স্তম্ভের মতো পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। "পুর" আসলে "পুরা" শব্দের পরিবর্তিত রূপ, যার অর্থ শহর বা স্থান। সংস্কৃত ও হিন্দিতে প্রায়ই স্থানের নামের শেষে "পুর" ব্যবহৃত হয়, যেমন জয়পুর, উদয়পুর ইত্যাদি। এই তিনটি অংশ মিলিয়ে হয় "রণ-থম্ভ-পুর"। অর্থ: জঙ্গলের উপত্যকায় স্তম্ভের মতো পাহাড়ের ওপর অবস্থিত দুর্গ। এই নামটি এর ভৌগোলিক অবস্থান ও কাঠামোর প্রতিফলন ঘটায়, কারণ এই দুর্গটি ঘন জঙ্গল এলাকায় একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এটি রাজধানী দিল্লি থেকে ৩১৬ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি ভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী দুর্গ, যা রাজস্থান রাজ্যের সওয়াই মাধোপুর জেলায় আরাবল্লী ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটি এখন রণথম্বোর ন্যাশনাল পার্কের অংশ।

ফায়দা: উপমহাদেশে যেসব শহরের নামের শেষে "পুর" আছে, সেগুলো বেশিরভাগই হিন্দুদের তৈরি করা, যেমন যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর, নাগপুর ইত্যাদি। যেসব শহরের নামের শেষে "আবাদ" আছে, সেগুলো প্রায় সবই মুসলিম আমলের, যেমন: হায়দ্রাবাদ, আওরঙ্গবাদ, ফয়জাবাদ, সিকান্দারাবাদ, ফরিদাবাদ, মুরাদাবাদ, আহমেদাবাদ, এলাহাবাদ। দ্রষ্টব্য: "পুর" যুক্ত কিছু শহর মুসলিম আমলেও তৈরি হয়েছে, যেমন: ফিরোজপুর (প্রতিষ্ঠাতা ফিরোজ শাহ তুঘলক), ফতেহপুর সিক্রি (প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দিন Akbar), গাজিপুর (প্রতিষ্ঠাতা গাজি মালিক অর্থাৎ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক), হাদিপর (প্রতিষ্ঠাতা নবাব হাদি খান, আলমগীরের সুবাদার)।

রণথম্ভোর অবরোধ, আজমিরের যুদ্ধ, আইবেকের গজনি সফর:

হরাজ রায়ের বিদ্রোহের খবর শুনে আইবেক রণথম্ভোরের দিকে রওনা হলেন। হরি রায় এটি দেখে পিছু হটে আজমিরে অবস্থান নিলেন। আইবেক শীঘ্রই সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং হরি রায়কে সেখান থেকেও পিছু হটতে হলো। আইবেক পৃথ্বীরাজের ছেলেকে পুনরায় আজমিরের শাসক নিযুক্ত করলেন। তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি কারণ হরি রায়ের শক্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল। এরই মধ্যে ৫৮৯ হিজরি (১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালে হঠাৎ সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরি আইবেককে গজনিতে ডেকে পাঠালেন।

আইবেককে তলব করার কারণ ছিল এই যে, কিছু ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি শাহাবুদ্দিন ঘুরির কাছে অভিযোগ করেছিল যে আইবেক স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শাহাবুদ্দিন ঘুরি সন্দেহে পড়ে যান এবং পরীক্ষা করার জন্য আইবেককে অবিলম্বে গজনিতে তলব করেন। আইবেক এক মুহূর্ত দেরি না করে তার বিশ্বস্ত গোলাম ইলতুতমিশের হাতে দেশের শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে দ্রুত প্রভুর দরবারে হাজির হলেন। এটি দেখে প্রভুর সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাকে নায়েব পদে বহাল রেখে ফেরত পাঠানো হলো। [১]

হরি রায়ের পরিণতি, আজমিরে মুসলিম শাসক নিয়োগ:

আইবেকের অনুপস্থিতিতে হরি রায় আবার শক্তি সঞ্চয় করলেন। তিনি আজমির থেকে পৃথ্বীরাজের ছেলেকে পুনরায় বিতাড়িত করলেন। ঝট রায় নামক এক হিন্দু সর্দার তাকে প্ররোচিত করলেন যেন তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে দিল্লি ছিনিয়ে নেন। ফলে হরি রায় সৈন্য প্রস্তুত করতে শুরু করলেন এবং ঝট রায়কে সেই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো।

এরই মধ্যে কুতুবুদ্দিন আইবেক গজনি থেকে দিল্লিতে ফিরে এলেন। তিনি বিদ্রোহ দমনের জন্য কোমর বেঁধে নামলেন এবং প্রতিপক্ষের প্রত্যাশার আগেই অভিযান শুরু করলেন। ঝট রায় এবং হরি রায় এই খবর পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন এবং আজমিরে অবস্থান নিলেন, যার দুর্গ ছিল অত্যন্ত উঁচু এবং আপাতদৃষ্টিতে অপরাজেয়। তবে আইবেক কঠোর অবরোধ করে একের পর এক আক্রমণ চালালেন। অবশেষে যখন হরি রায় তার পরাজয় নিশ্চিত দেখলেন, তখন তিনি পরাজয় ও বন্দিত্ব থেকে বাঁচতে "জহর" প্রথা পালন করলেন অর্থাৎ বন্দি হওয়ার অপমান থেকে বাঁচতে নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। এই ঘটনা ৫৯০ হিজরি (১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল।

এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে পৃথ্বীরাজের ছেলে আজমিরের শাসন পরিচালনা করতে পারছেন না, তাই কুতুবুদ্দিন আইবেক এখানকার শাসনভার একজন মুসলিম আমিরের হাতে তুলে দিলেন এবং পৃথ্বীরাজের ছেলেকে রণথম্ভোরের দুর্গাধিপতি নিযুক্ত করলেন। [২]

আজমিরে মেহর রাজপুতদের ব্যর্থ আক্রমণ:

কয়েক মাস পর আজমিরের পরিস্থিতি আবারও উদ্বেগজনক হয়ে উঠল। আজমিরের কাছে বসবাসকারী "মেহর রাজপুতরা" বিদ্রোহ করে শহর অবরোধ করে এবং সাহায্যের জন্য গুজরাটের "চালুক্য" শাসকদের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করে।

---

[১] (ফুতুহুস সালাতিন: ৮৬-৯১) এই সফরে আইবেক যখন গজনি পৌঁছালেন, তখন তার প্রভু তাকে সিংহাসনের নিচে লুকিয়ে রেখে ঈর্ষান্বিত আমিরদের ডাকলেন এবং আইবেকের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগগুলো শোনালেন। এরপর আইবেককে তাদের সামনে হাজির করলেন, যাতে তারা অত্যন্ত লজ্জিত হলো। (ঐ) এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আগে বর্ণিত হয়েছে।

[২] তাজুল মাআসির, হাসান নিজামী: পৃষ্ঠা ১৮৩ থেকে ১৮৮; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ২৩৯

আইবেক আজমির পৌঁছে কোনোমতে পরিস্থিতি সামাল দেন। তবে প্রতিপক্ষের চাপ দিন দিন বাড়তে থাকে এবং পরিস্থিতি প্রায় হাতের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, এমন সময় গজনি থেকে সাহায্যকারী বাহিনী পৌঁছে যায়, যার ফলে রাজপুতরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। [১]

গুজরাট আক্রমণ: ৫৯৩ হিজরি। গজনির দ্বিতীয় সফর: ৫৯৪ হিজরি

আজমির অভিযানের পর আইবেক গুজরাটের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। গুজরাটের রাজধানী "আনহিলওয়ারা" (পত্তন) এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় "৪০০ কিলোমিটার" দূরে ছিল, যেখানে চালুক্য (সোলাঙ্কি) বংশের শাসন ছিল এবং এই বংশেরই রাজা ভীমদেব কয়েক বছর আগে শিহাবউদ্দিন ঘুরিকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের মতে, এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। ফলে তিনি সফর ৫৯৩ হিজরি (জানুয়ারি ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দ)-তে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে (২৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে) "আবু পাহাড়" পর্যন্ত পৌঁছে যান (যা পত্তন থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে)। এখানে পাহাড়ি অঞ্চলের শাসক "ধরবর্ষ" [২] তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। সেই সাথে "নাডোল"-এর শাসক "কালহানা"-ও তার সাহায্যের জন্য চলে এসেছিলেন।

তবে আইবেক প্রতিটি বাধা চূর্ণ করে অবশেষে ১৩ রবিউল আউয়াল ৫৯৩ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দ)-তে গুজরাটের কেন্দ্র "আনহিলওয়ারা" পর্যন্ত পৌঁছে যান। রাজা দ্বিতীয় ভীমদেবের প্রতিনিধি রায় চৌহান সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি মোকাবিলার সাহস না করে সেনাবাহিনীসহ পালিয়ে যান। আইবেক তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন। তখন তিনি যুদ্ধে বাধ্য হন এবং লড়াই করতে করতে নিহত হন। রাজা দ্বিতীয় ভীমদেব এই সংবাদ পেয়ে তার রাজধানীর শেষ প্রান্তের দিকে পালিয়ে যান।

মোদ্দাকথা, মুসলমানরা "আনহিলওয়ারা" দখল করে নেয়। শহর থেকে প্রচুর মালে গনিমত অর্জিত হয়। গুজরাটে একটি করদ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদারকির জন্য একজন মুসলিম কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

আইবেক তার কর্মকাণ্ড এবং সালতানাতের পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতান ঘুরিকে সর্বদা অবহিত রাখতেন। এবার যখন তিনি গুজরাট বিজয়ের সুসংবাদ গজনীতে পাঠালেন, তখন সুলতান তাকে গজনীতে তলব করেন। আইবেক বিজিত সমস্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে সুলতানের দরবারে হাজির হন। সুলতান তাকে যথাযথ সম্মান ও সমাদর করেন। গজনীতে অবস্থানের দিনগুলোতে আইবেক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যান, কিন্তু পরে আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা দান করেন এবং সফরের উপযোগী হতেই তিনি ফিরে আসেন।

সুলতান ঘুরির ইচ্ছা ছিল যে তার রাজ্যগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পাক, তাই সুলতানের আদেশে এই সফরেই তার বিবাহ "কিরমান"-এর শাসক তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ-এর কন্যার সাথে সম্পন্ন হয়।

আইবেক দিল্লি বিজয়ের পর এখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছিলেন। গজনির এই সফর থেকে আইবেকের ফেরার...

---

[১] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ২৩০; তাজুল মাআসির, হাসান নিজামী: পৃষ্ঠা ১৮৯ থেকে ১৯১।

[২] ধরবর্ষ সম্ভবত পরমার বংশের শাসক ছিলেন যার রাজধানী আবু পাহাড় থেকে কিছুটা দূরে "চন্দ্রাবতী" নামক দুর্গ ছিল। এই বংশ ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে শাসন করেছিল। এই লোকেরা মুসলিম বিজয়ীদের বিরুদ্ধে গুজরাটের চালুক্য (সোলাঙ্কি) শাসকদের সাহায্য করত। "নাডোল" রাজস্থানের পালি জেলার একটি ঐতিহাসিক শহর যেখানে সেই সময়ে চৌহান রাজপুতদের শাসন ছিল এবং এই লোকেরা রাজস্থান ও গুজরাটের সীমান্তে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি রাখত।

কিছু দিন পর এই মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলো। একে মসজিদ কুওয়াতুল ইসলাম নাম দেওয়া হলো।

ঘুরিরা গুজরাটের ওপর পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী দখল বজায় রাখতে পারছিলেন না, কারণ রাজস্থানের শাসকরা তখনো মুসলমানদের নাগালের বাইরে ছিলেন এবং তারা গুজরাটকে একটি প্রতিরক্ষা বেষ্টনী প্রদান করতেন। তাই আইবাক গুজরাটকে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করার বোঝা বহন করা সমীচীন মনে করেননি। সেখানে স্থানীয় রাজাদের করদ রাজ্য হিসেবে শাসন বজায় ছিল, যা কিছুকাল পর পুনরায় স্বাধীন হয়ে যায়। [১]

বদায়ুন ও কনৌজ: ৫৯৩ হিজরি, ৫৯৫ হিজরি (১১৯৮ খ্রি., ১১৯৯ খ্রি.)

৫৯৪ হিজরিতে আইবাক বদায়ুন ও কনৌজের ওপর পুনরায় আক্রমণ করেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো পুরোপুরি জয় করে সেখানে নিজের দখল মজবুত করেন। এই সময়ে বেনারসের ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ফলে সেখানেও পুনরায় দখল সুসংহত করা হয়। এই অভিযান ৫৯৫ হিজরিতে সম্পন্ন হয়। এভাবে ৫৮৮ হিজরি থেকে ৫৯৫ হিজরি পর্যন্ত সাত বছরের মধ্যে বর্তমান উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ জেলা ঘুরি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। [২]

কালিঞ্জর ও পার্শ্ববর্তী দুর্গসমূহ: ৫৯৯ হিজরি (১২০৩ খ্রি.)

৫৯৯ হিজরিতে (১২০৩ খ্রি.) আইবাক মধ্য ভারতের “বিন্ধ্যা পর্বতমালা”র দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে “চান্দেলা রাজপুতদের” শক্তিশালী দুর্গগুলোর ওপর আক্রমণ করেন। এই ধারাবাহিকতায় রাজা “পরমর্দি দেব”-এর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করা হয়, যিনি “কালিঞ্জর” ও “মহোবা”-র অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। “খাজুরাহো”-ও তার অধীনে ছিল। [৩]

কালিঞ্জরের অবরোধ কিছুকাল অব্যাহত থাকে। রাজা নিকটবর্তী পাহাড়ে অবস্থিত একটি পানির ঝরনা থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাই তিনি প্রতিরোধে অটল ছিলেন। মুসলমানরা এর খবর পেয়ে যায় এবং তারা ঝরনার প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে দেয়। অবশেষে রাজা সন্ধিতে রাজি হন। তাকে সকল লোকসহ নিরাপদ পথ দেওয়া হয় এবং তিনি “অজয়গড়” দুর্গে চলে যান। [৪]

মোদ্দাকথা কালিঞ্জর, মহোবা ও “খাজুরাহো” বিজিত হলো। এই অভিযান ৬০০ হিজরিতে (১২০৩ খ্রি.) সম্পন্ন হয়। আইবাক হাসান আরনাব নামক একজন কর্মকর্তাকে এখানকার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই বিজয়গুলো বুন্দেলখন্ড অঞ্চলে ঘুরিদের শক্তিশালী দখলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [৫]

গজনির তৃতীয় সফর: খোয়ারিজম যুদ্ধ ও আন্দখুদ যুদ্ধ: ৬০১ হিজরি (১২০৫ খ্রি.)

শাহাবুদ্দিন ঘুরি ৬০১ হিজরিতে খোয়ারিজম আক্রমণ করলে এই অভিযানের জন্য আইবাককেও ভারত থেকে গজনিতে তলব করা হয়।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১১; তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৭১; তারিখ-ই-ফিরিশতা: পৃষ্ঠা ২১০, ২২০, ২২১; তাজুল মাআসির: পৃষ্ঠা ২০৬ থেকে ২২০; জামিউত তাওয়ারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ২৩২।

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১১, ১২; তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৭১; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২১০; জামিউত তাওয়ারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ২৩৩।

[৩] কালিঞ্জর উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায় দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় সাড়ে চারশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মহোবা দিল্লি থেকে প্রায় সাড়ে চারশ কিলোমিটার এবং কালিঞ্জরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে। খাজুরাহো একটি বিখ্যাত পর্যটন ও ঐতিহাসিক স্থান যা ভারতীয় রাজ্য মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলায় অবস্থিত এবং দিল্লির দক্ষিণে প্রায় সাড়ে চারশ কিলোমিটার দূরে। তিনটি স্থানই প্রাচীন নামেই এখনো বিদ্যমান।

[৪] অজয়গড় কালিঞ্জরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে “বিন্ধ্যা পর্বতমালা”র ওপর অবস্থিত। একে কালিঞ্জরের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা যমজ দুর্গ বলা হয়।

[৫] তাজুল মাআসির (হাসান নিজামী): পৃষ্ঠা ২২১ থেকে ২৭৩; জামিউত তাওয়ারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ২৩৪, ২৩৫।

গেল। এই যুদ্ধে ঘুরিরা প্রথমে খাওয়ারিজমি রাজধানী অবরোধের সময় পরাজিত হয় এবং তারপর পিছু হটার সময় আন্দখুই (উত্তর আফগানিস্তান)-এ তুর্কমেন খাতার হাতে পুনরায় চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়। [১]

আইবাক এই অভিযানে চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং গুরুতর আহতও হন। এই অবস্থায় সুলতানের অনুমতি নিয়ে পুনরায় দিল্লিতে ফিরে এসে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [২]

মালিক বাহাউদ্দিন তুঘরিলের কীর্তিসমূহ

শিহাবুদ্দিন ঘুরির ক্রীতদাস কর্মকর্তাদের মধ্যে আইবাকের পর মালিক বাহাউদ্দিন তুঘরিল সবচেয়ে বিশিষ্ট ও যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন, যাঁর লালন-পালন ঘুরি বিজেতা নিজেই করেছিলেন। নিজের যোগ্যতার কারণে তিনি প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি ভারতের অভিযানগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, ফলে যখন ৫৯২ হিজরি (১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)-তে ঘুরি বিজেতা বায়ানা ও গোয়ালিয়র বিজয়ের জন্য আক্রমণ করেন, তখন ওই অঞ্চলে অবস্থিত 'থানকার' দুর্গ জয় করে বাহাউদ্দিন তুঘরিলের হাতে ন্যস্ত করেন।

বাহাউদ্দিন তুঘরিল ছিলেন একজন পরিকল্পনাকারী ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এখানে উন্নয়নমূলক কাজ করান এবং জনকল্যাণের জন্য অনেক স্থাপনা নির্মাণ করেন। সেই সাথে এই অঞ্চলে মুসলিম জনবসতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি ও জমিসহ সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে থাকেন এবং এসব জিনিস তাঁদের মালিকানায় দিয়ে দিতেন। তাঁর বদান্যতার খ্যাতি শুনে খোরাসান ও ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষ করে বণিকরা তাঁর কাছে চলে আসেন। ধীরে ধীরে তাঁর প্রাসাদের আশেপাশে একটি মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে। কিছুকাল পর তিনি দেখলেন যে, 'থানকার'-এ সেই ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয় যা হিজরতকারী সম্পদশালী মুসলমানদের প্রয়োজন। ফলে তিনি কিছু দূরে 'সুলতান কোট' নামে একটি নতুন শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং একেই নিজের কেন্দ্র বানিয়ে নেন।

শিহাবুদ্দিন ঘুরির আক্রমণের সময় 'গোয়ালিয়র'-এর 'পরিহার' শাসকরা দিল্লির সিংহাসনের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সন্দেহ ও সংশয়ের পরিবেশ বজায় ছিল। অবশেষে 'গোয়ালিয়র'-কে পূর্ণরূপে পদানত করার দায়িত্বও বাহাউদ্দিন তুঘরিলকে অর্পণ করা হয়। এই কঠিন অভিযানও তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি সুলতান কোট থেকে গোয়ালিয়রের দিকে আক্রমণকারী বাহিনী পাঠাতে থাকেন। কিছুকাল পর এই অপরাজেয় দুর্গ থেকে ছয় মাইল দূরে তিনি একটি আলাদা দুর্গ নির্মাণ করেন যেখানে তাঁর সেনাবাহিনী শত্রুর আক্রমণের সময় নিরাপদ থাকত। এভাবে গোয়ালিয়রের ওপর ক্রমাগত কঠোর আক্রমণ শুরু হয়। এভাবে এক বছর কেটে গেল।

অবশেষে গোয়ালিয়রের রাজা ক্লান্ত হয়ে কুতুবুদ্দিন আইবাকের কাছে বার্তা পাঠান যে, তিনি দুর্গটি তাঁর হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। কুতুবুদ্দিন আইবাক নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দুর্গের দখল নিয়ে নেন। এই পদক্ষেপে বাহাউদ্দিন তুঘরিল অসন্তুষ্ট হন কারণ বিজয়...

---

[১] এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরির অভিযানসমূহের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

[২] তারিখ-ই-ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: পৃষ্ঠা ২৫

কাশগর অন্য কেউ গ্রহণ করে নিয়েছিল। এই কারণে আইবেক এবং তুঘরিলের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। [১]

সম্ভব ছিল যে, এই পরিস্থিতি কোনো বিদ্রোহের জন্ম দিত, কিন্তু হঠাৎ বাহাউদ্দিন তুঘরিলের মৃত্যু হয়ে যায়। [২]

বরফের মতো আয়ু কমে যাচ্ছে
চুপিসারে ধীরে ধীরে প্রতি নিঃশ্বাসে
নিঃশ্বাস হলো পরকালের পথের এক পথিক
হঠাৎ একদিন এটি থেমে যাবে
একদিন মরতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে
যা করার করে নাও, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে!
(খাজা মজজুব)

---

[১] প্রবল ধারণা অনুযায়ী এই ঘটনা সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর শাহাদাতের পরের। কারণ তাঁর জীবদ্দশায় আইবেক এবং তুঘরিল উভয়ই হিন্দুস্তানে তাঁর অধীনস্থ আমীর হিসেবে কাজ করছিলেন এবং সুলতান ঘুরীর তাঁর আমীরদের ওপর এবং বিশেষ করে রাজ্যগুলোর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। সুতরাং এটা সম্ভব ছিল না যে, তারা নিজেদের প্রভুকে উপেক্ষা করে একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২১, ৪২২।

মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির কাহিনী

হিন্দুস্তানের উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলোর ওপর ঘুরিদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পূর্বদিকের অঞ্চলগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি তখনও নিবদ্ধ হতে পারেনি। এই সৌভাগ্য ঘুরি সালতানাতের একজন সাধারণ অফিসার মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির ভাগ্যে জুটেছিল এবং তার বীরত্বগাথা কিংবদন্তি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। তাকে "খলজি দরাজদস্ত" (লম্বা হাতওয়ালা খলজি) ও বলা হতো।

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার "খলজি গোত্রের" একজন উচ্চবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন। খলজিদের ইতিহাসে সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছিলেন। তার পূর্বপুরুষরা গোরের নিকটবর্তী গরমসির নামক এলাকায় বসবাস করতেন। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার দেখতে কিছুটা অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন, অর্থাৎ তার হাতগুলো এত লম্বা ছিল যে তিনি যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তখন তার হাত হাঁটুর নিচে পৌঁছে যেত। সেই সময় ঘুরি সুলতানদের সৌভাগ্যের সূর্য মধ্যগগনে ছিল। খলজি তার গোত্রের কিছু যোদ্ধার সাথে রাজধানী গজনীতে চলে আসেন এবং সৈন্যদের নিয়োগ দপ্তরে (দিওয়ান-ই-আরজ) নিজেকে পেশ করেন, কিন্তু তার অদ্ভুত শারীরিক গঠনের কারণে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

তিনি এটি দেখে ভাগ্য অন্বেষণে দিল্লিতে চলে আসেন। এখানেও সামরিক বিভাগে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এখন তিনি দিল্লি থেকে বদায়ূঁতে চলে যান। এখানকার জায়গিরদার হিজবর উদ্দিন হাসান আরনব তাকে সামান্য বেতনে চাকরিতে নিয়োগ দেন। কিন্তু এই ব্যক্তি সামান্য কাজের জন্য সৃষ্টি হননি, তাই তিনি শীঘ্রই বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং দুঃসাহসিক অভিযানের নেশায় অযোধ্যায় চলে যান। এখানকার জায়গিরদার মালিক হুসাম উদ্দিন উগলবাক তাকে নিজের কাছে রেখে দেন। কয়েকটি যুদ্ধে তার বীরত্ব পর্যবেক্ষণ করে এবং তার যোগ্যতা পরিমাপ করে তাকে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নেন এবং তাকে "সহলত" এবং "সহোলী" এর অফিসার নিযুক্ত করেন। [১]

বিহারের ওপর অতর্কিত হামলা:

এখান থেকে খলজি বিহারের ওপর অতর্কিত হামলা শুরু করেন এবং বিশেষ করে "মুনাইর" ও এর আশপাশের এলাকাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানান। এটি স্পষ্ট যে তিনি একজন মাঝারি স্তরের অফিসার ছিলেন এবং তার কাছে কোনো বড় সেনাবাহিনী বা দুর্গ দখলের জন্য অবরোধের সরঞ্জাম ছিল না। তাই এই সময়ে তার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল অন্তত ঝুঁকি নিয়ে এবং অহেতুক রক্তপাত ছাড়াই বেশি থেকে বেশি...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২২। খালিক আহমদ নিজামী ব্রিটিশ অফিসার ও ঐতিহাসিক মেজর র‍্যাভার্টির বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, এই দুটি স্থান ইউপির পূর্ব জেলা "মির্জাপুর" এ "ভগবত" এবং "ভিয়োলি" নামে রয়েছে। ভিয়োলি এই জেলার তহশিল "চুনার" এর উত্তর-পূর্ব পরগনা, যেখানে ভগবত পশ্চিম দিকে এর সাথে সংযুক্ত। (জামে তারিখ-ই-হিন্দ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৩, টীকা)। এই জায়গাটি বিহারের সীমান্তের কাছাকাছি।

যাতে বেশি করে গনীমতের মাল হাসিল করা যায়। এই কারণেই সে কেবল সেই সমতল এলাকাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল যেখানে রাষ্ট্রের সুসংগঠিত সেনাবাহিনী নিরাপত্তার জন্য উপস্থিত ছিল না। এভাবে সে ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র এবং যোদ্ধা সংগ্রহ করে এতই খ্যাতি অর্জন করল যে, চারপাশ থেকে খলজি গোত্রের লোকেরা এদিকে আসতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তার কথা কুতুবুদ্দিন আইবেক পর্যন্ত পৌঁছাল এবং তাকে রাজকীয় পোশাক (খিলআত) দিয়ে সম্মানিত করা হলো। খলজি এই উৎসাহে আনন্দিত ও আরও তৎপর হয়ে উঠল এবং পরবর্তী এক-দেড় বছর পর্যন্ত সে এভাবেই বিহারে অতর্কিত হামলা চালিয়ে গনীমত হাসিল করতে থাকল। [১]

বিহার বিজয়:

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার এখন বিহার বিজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানগুলো থেকে সে ভালোভাবে জেনে গিয়েছিল যে, বিহারের মানুষ অত্যন্ত শান্তিকামী এবং তাদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। ফলে একদিন খলজি দুইশ অশ্বারোহী নিয়ে 'কেল্লা বিহার'-এর দিকে রওনা হলো। এই কেল্লাটি মূলত বৌদ্ধধর্মের একটি বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং পূর্ব ও উত্তর এশিয়া থেকে বৌদ্ধরা এখানে এসে তাদের ধর্মের পাশাপাশি ললিতকলার শিক্ষাও গ্রহণ করত। খলজি সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অবগত ছিল না, তাই সে তাদের সবাইকে ব্রাহ্মণ এবং মূর্তিপূজারী মনে করে বসল। [২]

সে তার যোদ্ধাদের নিয়ে কেল্লার পেছনের দরজা দখল করে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং তা জয় করে নিল। এখানে বৌদ্ধধর্মের অনেক 'ভিক্ষু' ছিল যারা তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মাথা মুণ্ডন করে রেখেছিল। তাদের ব্রাহ্মণ মনে করে হত্যা করা হলো। [৩]

বিজয়ের পর এখান থেকে বৌদ্ধধর্মের অনেক বই পাওয়া গেল। মুসলমানরা স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করল যে এগুলোতে কী লেখা আছে। তারা বলল: এগুলো পড়ার মতো সব লোকই মারা গেছে। তখন জানা গেল যে, এই জায়গাটি আসলে একটি 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (দরসগাহ) ছিল। [৪]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২৩

[২] খোদ এই ঘটনাবলী লিপিবদ্ধকারী কাজী মিনহাজুস সিরাজও ভুলবশত তাদের ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল বৌদ্ধ।

[৩] এই বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের হত্যা করা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী ছিল, কারণ ইসলামে জিহাদের সময়ও কেবল সেই লোকদের হত্যা করার অনুমতি আছে যারা মুকাতিলীন অর্থাৎ সশস্ত্র যোদ্ধা। নিরস্ত্র মানুষ, বিশেষ করে ধর্মীয় নেতা এবং শিক্ষক ও জ্ঞানীদের ওপর হাত তুলতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সেনাবাহিনী পাঠাতেন, তখন তাদের তাকিদ দিতেন: লা তাগদিরু ওয়া লা তাগল্লু ওয়া লা তামসিলু ওয়া লা তাকতুলুল উলদানা ওয়া লা আসহাবাস সাওয়ামি। (বিশ্বাসঘাতকতা করো না, গনীমতের মালে চুরি করো না, লাশের অবমাননা করো না, শিশুদের হত্যা করো না এবং উপাসনালয়ে অবস্থানরত সন্ন্যাসীদের হত্যা করো না)। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৭২৮) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, হাসান পর্যায়ের সনদসহ।

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২৪, ৪২৩

স্থানের ব্যাখ্যা: খলজি যে এলাকায় আক্রমণ করেছিল তা "মগধ" নামে পরিচিত ছিল। এতে "বিহার" বলতে একটি নয় বরং দুটি শহরকে বোঝানো হয়েছে যা কাছাকাছি ছিল এবং উভয়ই ছিল বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা কেন্দ্র। একটি "নালন্দা", অন্যটি "ওদন্তপুরী"। প্রথম শহরটি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর দ্বিতীয়টি সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের শাসক প্রথম গোপাল নির্মাণ করেছিলেন। উভয় স্থানে বৌদ্ধ দর্শনের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হতো। তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত খ্যাতির কারণে এই এলাকাকে "বিহার" (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) বলা হতে থাকে এবং এই শব্দটিই উচ্চারণের পরিবর্তনের মাধ্যমে "বিহার" হয়ে যায়। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, এই আক্রমণে "নালন্দা" এবং "ওদন্তপুরী" মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এই অভিযোগের সত্যতা এই পর্যন্তই পাওয়া যায় যে, এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্রাহ্মণ বা মূর্তিপূজারী হিন্দু মনে করে হত্যা করা হয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে, যখন বই পড়ানোর মতো লোক থাকল না, তখন ধর্মীয় ছাত্রদের আসাও বন্ধ হয়ে গেল এবং এই কেল্লা সদৃশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনশূন্য হয়ে পড়ল। এই কারণেই এরপর এই শহরগুলো তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

হাতির সাথে মোকাবিলা:

এই বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার প্রচুর গনিমতের মাল নিয়ে নায়েবে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের দরবারে উপস্থিত হন, যেখানে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। দিল্লির আমিরদের মধ্যে কিছু লোক তার এই সম্মান বৃদ্ধিতে দুঃখ ও হিংসায় লিপ্ত হয়। একদিন দিল্লির নতুন প্রাসাদ "কসরে সফিদ"-এ আয়োজিত এক মাহফিলে এই আমিররা খলজিকে কটাক্ষ করেন এবং উপহাস করেন। কথা এতদূর গড়ায় যে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারকে একটি বিপজ্জনক হাতির সাথে মোকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যখন হাতি সামনে এল, তখন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার তার শুঁড়ে নিজের গদা এমন শক্তিতে আঘাত করলেন যে হাতি মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে গেল এবং তিনি তার পেছনে দৌড়াতে লাগলেন। এটি দেখে উপস্থিতরা ধন্য ধন্য করে উঠলেন এবং কুতুবুদ্দিন আইবেক কেবল নিজে তাকে অনেক পুরস্কৃতই করলেন না, বরং দরবারের আমিরদেরও নির্দেশ দিলেন তাকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য। ফলে খলজি এত বেশি পুরস্কার পেলেন যার কোনো সীমা নেই। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দাও এমন উদার হৃদয়ের ছিলেন যে যা কিছু পেলেন, সেই মজলিসেই আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

যা-ই হোক, নায়েবে সুলতানের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদায় ধন্য হয়ে খলজি পুনরায় বিহারের রণাঙ্গনে চলে গেলেন। এখন লখনৌতি এবং বাংলার দূরদূরান্তের এলাকা পর্যন্ত তার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। [১]

বাংলা বিজয়:

সেই সময় পশ্চিম বাংলার রাজধানী ছিল "নদিয়া", যেখানে রায় লক্ষ্মণ সেন শাসন করছিলেন। তার বয়স ৮০ বছর হয়ে গিয়েছিল। দানশীলতা ও উদারতায় তার অনেক খ্যাতি ছিল। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের বিজয়ের খবর সেখানে পৌঁছালে কিছু জ্যোতিষী তাকে বললেন: "আমাদের প্রাচীন কিতাবসমূহে লেখা আছে যে শেষ পর্যন্ত এই দেশ তুর্কিদের দখলে চলে আসবে। সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিচক্ষণতার দাবি হলো সমস্ত মানুষ দেশ খালি করে দিক যাতে তুর্কিদের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।"

রাজা জিজ্ঞেস করলেন: "যে ব্যক্তি আমাদের দেশের ওপর বিজয়ী হবে, তার কি কোনো নিদর্শনের কথা উল্লেখ আছে?"

তারা বললেন: "জি হ্যাঁ, তার নিদর্শন এই লেখা আছে যে যখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবেন, তখন তার দুই হাত হাঁটু থেকেও নিচে পৌঁছাবে।"

রাজা এটি শুনে কিছু লোক তদন্তের জন্য পাঠালেন। তারা গিয়ে দেখলেন এবং ফিরে এসে নিশ্চিত করলেন যে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের শারীরিক গঠন এমনই। এই নিশ্চিত হওয়ার পর অনেক ভিক্ষু, পণ্ডিত এবং ধর্মীয় লোক এই দেশ ছেড়ে পূর্ব বাংলা এবং কামরূপের (আসাম) দিকে চলে গেলেন যা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল। তবে রাজা ভয়ে রাজধানী খালি করা সমীচীন মনে করেননি।

এর পরের বছর মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার একটি দ্রুতগামী সংক্ষিপ্ত বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং শত্রুর কাছ থেকে নিজেকে গোপন রেখে বাংলার রাজধানী "নদিয়া"র দিকে রওনা হলেন। সামনে গিয়ে তিনি এমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলেন যে বাকি বাহিনী পেছনে পড়ে রইল এবং তিনি মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে "নদিয়া"র দরজায় পৌঁছে গেলেন। এখানে তিনি গতি ধীর করে দিলেন এবং এমন প্রশান্তি ও...

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪২৪

অত্যন্ত শান্তভাবে শহরে প্রবেশ করলেন যে স্থানীয় লোকেরা মনে করল তারা ঘোড়া বিক্রি করতে আসা ব্যবসায়ী। লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের সামনে পৌঁছে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন এবং আক্রমণ শুরু করলেন। এটি ছিল দিনের বেলা এবং রাজা দস্তরখানে বসেছিলেন, খাবার ভর্তি সোনার ও রূপার পাত্রগুলো সামনে রাখা ছিল। হঠাৎ প্রাসাদের ভেতরে এবং শহরের মধ্যে চিৎকার ও হাহাকার শুরু হয়ে গেল। রাজা যখন আসল ঘটনা বুঝতে পারলেন, ততক্ষণে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার প্রাসাদের ভেতরে তাঁর হারেম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ রাজা খালি পায়ে প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁর ধনভাণ্ডার, হারেম, চাকর-বাকর, দরবারী এবং মহিলারা সব মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের দখলে চলে এল। ওদিকে বাকি সেনাবাহিনীও এসে পৌঁছাল এবং তারা শহর দখল করে নিল। গনিমতের মালে হাতির সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। মুসলমানদের হাতে এত বেশি সম্পদ এল যে তা গুছিয়ে নেওয়া কঠিন ছিল।

লক্ষ্মণ সেন পূর্ব বাংলায় চলে গেলেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করলেন। তাঁর সালতানাতের পূর্ব অংশ তাঁর কাছেই থেকে গেল। কিছুকাল পর তাঁর মৃত্যু হলো এবং তাঁর সন্তানরা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলো।

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পশ্চিম বাংলার সমস্ত এলাকায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেন। তবে তিনি 'নদিয়া'র ওপর স্থায়ী দখল বজায় রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ 'বিহার' ও 'অযোধ্যা' ইত্যাদি থেকে বেশ দূরে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই শহরের ওপর দখল বজায় রাখা কঠিন কাজ ছিল। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের সীমিত সামরিক সম্পদের ওপর এটি একটি ভারী বোঝা হতে পারত। তবে এই আশঙ্কাও ছিল যে প্রাক্তন শাসক পরিবারের লোকেরা 'নদিয়া'কে পুনরায় সামরিক কেন্দ্রে পরিণত করতে পারে। তাই শহরের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হলো [১]।

খলজিদের কেন্দ্র, লখনৌতি - দেওকোট:

খলজি বিজেতা নতুন সামরিক কেন্দ্র হিসেবে 'লখনৌতি' (গৌড়)-কে পছন্দ করলেন, যা বিহারে তাঁর সদর দপ্তরের কাছাকাছি ছিল এবং রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে তাঁর জন্য বেশি উপযোগী ছিল। লখনৌতি গঙ্গা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ছিল। পশ্চিম তীরে অবস্থিত অংশটি 'রাঢ়' নামে পরিচিত ছিল এবং সেই দিকেই কিছু দূরে আরেকটি শহর ছিল যাকে 'লখনৌর' বলা হতো। পূর্ব তীরে অবস্থিত অংশটিকে 'বরিন্দ' বলা হতো এবং সেই দিকেই কিছু দূরে একটি দুর্গবেষ্টিত শহর ছিল যাকে 'দেওকোট' বলা হতো। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার নিজের বসবাসের জন্য সেই 'দেওকোট'-কে নির্বাচন করলেন।

তিনি অধিকৃত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের সামরিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুসংহত করলেন। এখানে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং শাহাবুদ্দিন ঘৌরির নামে খুতবা পাঠ শুরু করলেন [২]।

---

[১] তবকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৩২ থেকে ৪৩৭।

মিনহাজ উস সিরাজ উক্ত বিজয়ের বর্ণনার পর লিখেছেন যে, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার নদিয়াকে বিরান (শহর ধ্বংস ও বরবাদ করা) করে দিয়েছিলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে, এর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা যেমন দুর্গের বুরুজ ও প্রাচীর ইত্যাদি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল যাতে এই দুর্গ তাঁর জন্য বিপদের কারণ না হতে পারে। যেখানে শহরের জনবসতি ও দালানকোঠার সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলোর কোনো ক্ষতি করা হয়নি। এই কারণেই 'নদিয়া' এর পরেও আবাদ ছিল এবং সেখানে হিন্দুদের আধিপত্যও বজায় ছিল।

[২] তবকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৩৭, ৪৩৬, ৪৩৭।

তিব্বত বিজয়ের পরিকল্পনা:

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি সম্ভবত জন্মগতভাবেই একজন বিজেতার মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছিলেন, তাই সুযোগ পেলেই তার মন লখনৌতি থেকে শত শত মাইল দূরে হিমালয়ের ওপারে 'তিব্বত'-এর দিকে নিবিষ্ট হতো এবং তিনি সেখানকার অবস্থা অনুসন্ধানে লিপ্ত হতেন। কে জানে এই বিজেতা কেন নিকটবর্তী পূর্ববঙ্গে অবস্থিত এলাকাগুলোকে উপেক্ষা করেছিলেন যার বিজয় সেই সময় অত্যন্ত সহজ ছিল। সম্ভবত তিনি তুর্কিস্তানের এমন কোনো পথ খুঁজছিলেন যা সংক্ষিপ্ত হোক—তুর্কিস্তানি অঞ্চলগুলোর সাথে এমনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা যাতে সালতানাতের সম্প্রসারণ এবং বাংলায় আরও অভিযানের জন্য প্রচুর লোকবল এখান থেকে আনা যায়। এটাও অসম্ভব নয় যে, এই উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি এভাবে অসাধারণ শক্তি অর্জন করে একটি স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিলেন।

কাজী মিনহাজ-উস-সিরাজের বর্ণনা অনুযায়ী, সেই সময় তিব্বত এবং লখনৌতির মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে তিন বংশের লোক বাস করত: (১) কোচ (২) মেচ (৩) থারু।

তাদের চেহারা ও আকৃতি তুর্কিদের মতো ছিল, তবে তাদের ভাষা ছিল হিন্দি ও তুর্কি ভাষার সংমিশ্রণ। এই লোকেরা লখনৌতি পর্যন্ত আসা-যাওয়া করত। তাদের মধ্য থেকে একজন সর্দার মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাকে "আলী মেচ" বলা হতো। তিনি খলজি বিজেতাকে সেই অঞ্চলগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন এবং এই পাহাড়গুলোতে তার পথপ্রদর্শক হতে রাজি হন। [১]

বর্ধনকোট এবং ব্রহ্মপুত্র নদ:

সংক্ষেপে, এভাবে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ অভিযানের সূচনা হলো। পথপ্রদর্শকের নেতৃত্বে তার বাহিনী চলতে চলতে একটি কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছে গেল যাকে "বর্ধনকোট" [২] বলা হতো। বলা হয় যে, এটি পারস্যের প্রাচীন বাদশাহ গুশতাস্প তখন নির্মাণ করেছিলেন যখন তিনি চীনের অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন। শহরের সামনে "বংমতি" [৩] নামক একটি বিশাল নদী প্রবাহিত হচ্ছিল যা গঙ্গার চেয়ে তিন গুণ বড় ছিল।

পাথরের বিশাল খিলানযুক্ত সেতু:

এই নদীর তীরে উচ্চতার দিকে দশ দিন সফরের পর বাহিনী এমন এক স্থানে পৌঁছাল যেখানে নদীর ওপর পাথরের... [৪]

---

[১] তবকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২৭।

[২] তবকাতে নাসিরিতে শহরের নাম "মৈম" থেকে মর্দনকোট লেখা হয়েছে। গোলাম রসুল মেহরের মতে এর সংস্কৃত নাম "বর্ধনকোট" ছিল এবং এটি (বর্তমান বাংলাদেশের এলাকা) দিনাজপুর থেকে রংপুরের দক্ষিণ দিকে ৩৫ মাইল দূরে। (টীকা: অনুবাদ তবকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৬৭)। মনে রাখা দরকার যে দিনাজপুর বাংলাদেশের ভারতের সাথে লাগোয়া সীমান্তে অবস্থিত।

[৩] আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী এটি ব্রহ্মপুত্র নদ ছিল। তবকাতে নাসিরিতে নদীর নাম "বংমতি" লেখা হয়েছে। জামে তারিখ হিন্দে উর্দু উচ্চারণ "বেগ মতি" করা হয়েছে। তবকাতে নাসিরির উর্দু অনুবাদক এবং প্রখ্যাত গবেষক মাওলানা গোলাম রসুল মেহর একে "বংমতি" লিখেছেন। ("মতি" হিন্দিতে "দরিয়া" বা "নদী" কে বলা হয়)। কাজী মিনহাজের মতে এটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতায় গঙ্গা নদী থেকে তিন গুণ বড় ছিল। (তবকাত: পৃষ্ঠা ৪২৮)। মাওলানা মেহর এর টীকায় লিখেছেন: "রাভার্টির মতে এই সফর তিব্বতের দিকে হয়নি বরং দার্জিলিং এবং সিকিমের দিকে করা হয়েছিল যার কারণে তার এই বর্ণনা যে এটি নদী 'তিস্তা' হতে পারে। কিন্তু এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা গঙ্গার সাথে তুলনীয় হতে পারে না।" (টীকা: অনুবাদ তবকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৬৭)।

[৪] তবকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২৭, ৪২৮।

হয়ে পাথরের একটি বিশাল সেতু ছিল যাতে বিশটিরও বেশি খিলান ছিল। মুসলমানদের মিত্র উপজাতি কোচ (কুচ) এবং মেচ (মেক)-এর এলাকা এখানে শেষ হতো, তাই খিলজি বিজেতা নদী পার হয়ে সেখানে সেনাবাহিনীর একটি দল নিযুক্ত করলেন যাতে তারা সেনাবাহিনীর ফিরে আসা পর্যন্ত সেতুর সুরক্ষা করে। [১]

কামরূপের রাজা:

সেতুর ওপারে 'কামরূপ' (পশ্চিম আসাম) নামক একটি রাজ্য ছিল যা ভারত ও তিব্বতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ছিল। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি সেখানকার রাজার কাছে এই অভিযানের রসদ ইত্যাদির ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন। [২]

মুসলমানদের এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে রাজা ভীত হয়ে পড়েছিলেন, তিনি কৌশলের আশ্রয় নিলেন এবং বার্তা পাঠালেন যে এই অভিযানের জন্য এই সময়টি উপযুক্ত নয়। আগামী বছর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন এবং সেই সময় আমি পূর্ণ সাহায্য প্রদান করব। [৩]

বাঁশের সেনাবাহিনীর সাথে মোকাবেলা:

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার তার পরামর্শ গ্রহণ করেননি এবং তিব্বতের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। কামরূপ থেকে তিব্বত পর্যন্ত পুরো এলাকাটি হিমালয়ের দুর্গম এলাকা ছিল যা মিনহাজুস সিরাজের মতে ৩৫টি গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতে হতো।

পনেরো দিন পর্যন্ত এই সেনাবাহিনী হিমালয়ের দুর্গম উপত্যকা এবং গিরিপথ দিয়ে চলতে থাকে। মিনহাজের বর্ণনা অনুযায়ী ষোড়শ দিনে সেনাবাহিনী তিব্বতের সমতল এলাকায় প্রবেশ করে। এই এলাকাটি বেশ আবাদি এবং চাষযোগ্য ছিল। অবশেষে সেনাবাহিনী একটি মজবুত দুর্গের কাছে পৌঁছাল এবং তার ওপর আক্রমণ করল। দুর্গের অধিবাসী এবং আশেপাশের লোকেরা মোকাবিলার জন্য একত্রিত হলো। তাদের প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র অর্থাৎ বর্ম, ঢাল এবং শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি রেশমি কাপড়ের টুকরো বাঁশের কঞ্চির ওপর সেলাই করে তৈরি করা হয়েছিল। এই সব লোক তীরন্দাজ ছিল এবং তাদের ধনুকগুলো বেশ লম্বা ছিল। ফজরের নামাজ থেকে আসর পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। ইসলামী সেনাবাহিনীতে অনেক...

---

[১] তবকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২৮।

যদি আমরা ভ্রমণের গতি প্রতিদিন পঁচিশ কিলোমিটার ধরি তবে উত্তর-পশ্চিম বাংলা থেকে চলা সেনাবাহিনী আসামের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং দশ দিনে আড়াইশ কিলোমিটার অতিক্রম করে তারা 'কামরূপ'-এর কেন্দ্র গুয়াহাটির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। গুয়াহাটির পুরনো নাম 'প্রাগজ্যোতিষপুর'। গুয়াহাটির সামনে একটি সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে ১২০৬ সালের মার্চ মাসে একটি তুর্কি সেনাবাহিনীর ধ্বংসের উল্লেখ রয়েছে। এভাবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে খিলজি সেনাবাহিনী এই পথেই তিব্বতের দিকে গিয়েছিল। (জামে তারিখ হিন্দ: পৃষ্ঠা ২৫৪)

[২] কামরূপ (কামরুদ) আসামের পশ্চিমাংশের একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক এলাকা। প্রাচীনকালে কামরূপ একটি শক্তিশালী রাজত্ব ছিল যার মধ্যে বর্তমান আসামের পশ্চিমাংশ, উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশ এবং কখনো কখনো ভুটান ও বাংলাদেশের কিছু এলাকাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই এলাকাটি তার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য পরিচিত ছিল। এর রাজধানী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ছিল যার মধ্যে বর্তমান গুয়াহাটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিব্বতের দিকে যাওয়া পথগুলোর মধ্যে কামরূপ এলাকাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল, বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে যাওয়া পথগুলো। এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান এমন ছিল যে এখানকার শাসকরা তিব্বত ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও ভ্রমণের পথগুলোকে প্রভাবিত করতে পারত। যখন বখতিয়ার খিলজি তিব্বত অভিযানের সূচনা করলেন, তখন তাকে কামরূপের রাজার কাছ থেকে পথ এবং রসদের ক্ষেত্রে সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। কামরূপের রাজা আপাতদৃষ্টিতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

[৩] তবকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২৮।

লোক শহীদ ও আহত হলেন। শত্রুপক্ষের অনেক লোককে বন্দী করা হলো। [১]

একটি বিশাল শহরের সংবাদ:

এই বন্দীদের কাছ থেকে জানা গেল যে, এখান থেকে পাঁচ ফরসাখ দূরত্বে 'করম পত্তন' (কার বাটান) নামক একটি বিশাল শহর রয়েছে, যেখানে ৫৩ হাজার সাহসী তুর্কি অশ্বারোহী ও ধনুর্বিদ বিদ্যমান। শহরের প্রাচীরগুলো খোদাই করা পাথরের। এর অধিবাসীরা মূর্তিপূজক (বৌদ্ধ)। এই বাজারে প্রতিদিন গড়ে পনেরোশ বেঁটে ঘোড়া (টাট্টু) বিক্রি হতো। লখনৌতিতে নিয়ে আসা সমস্ত ঘোড়া অশ্ব ব্যবসায়ীরা এখান থেকেই কিনে নিয়ে যেতেন। [২]

এই শহরের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির কথা শুনে এবং নিজের বাহিনীকে অত্যন্ত ক্লান্ত অনুভব করে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার লশকর প্রধানদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং অভিযানটি আগামী বছর পর্যন্ত স্থগিত করে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। [৩]

ফিরতি সফর ও খাদ্য সংকট:

কিন্তু হলো এই যে, এই বাহিনীর ফিরতি সফর অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ছিল। স্থানীয় লোকেরা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সমস্ত ঘাস ও গাছপালা পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং নিজেরা বাহিনীর পথ থেকে সরে গিয়ে গিরিপথ ও উপত্যকাগুলোতে চলে গিয়েছিল। যখন বাহিনী ফিরে আসছিল, তখন পুরো পথে কোথাও ঘাস দেখা যায়নি এবং জ্বালানোর জন্য কাঠের কোনো টুকরোও নজরে পড়েনি। এই পনেরো দিনে ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুর জন্য দানা বা ঘাস একেবারেই পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে সৈন্যরা নিজেদের ঘোড়া জবাই করে করে খেতে থাকল। [৪]

বিশাল খিলানযুক্ত সেতু ধ্বংস:

পনেরো দিন পর যখন তারা সেই বিশাল খিলানযুক্ত সেতুর কাছে পৌঁছাল, তখন এর দুটি খিলান ভাঙা অবস্থায় পেল। কারণ ছিল এই যে, যে দুজন আমিরকে সেতুটি রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হয়ে সেতুর পাহারা ও রাস্তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছিল। ফলে কামরূপের রাজা সৈন্য পাঠিয়ে সেতুটি ভেঙে দিয়েছিলেন। সেই সময় নদী পার হওয়ার জন্য নৌকাও সহজলভ্য ছিল না। বাধ্য হয়ে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারকে নৌকা তৈরির জন্য থামতে হলো। নদীর কাছে একটি আকাশচুম্বী দুর্গ সদৃশ মন্দির ছিল। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার সেখানেই ছাউনি ফেললেন এবং নৌকা তৈরির জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে লাগলেন। [৫]

---

[১] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪২৯

[২] ফায়দা: তাবাকাত-ই নাসিরি-তে 'টাট্টু'-র জন্য 'আস্প তাঙ্গানা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ একই অর্থাৎ বেঁটে ঘোড়া। দ্রষ্টব্য: এটি নিশ্চিত যে, এই বাহিনী বর্তমান তিব্বত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, কারণ আসাম থেকে তিব্বত পর্যন্ত সফর সেই যুগের যাতায়াত ব্যবস্থার নিরিখে এত অল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। তাই সম্ভবত বাহিনী এই সময়ের মধ্যে বর্তমান ভুটানের কোনো সীমান্ত সমতল এলাকা অথবা তিব্বতের দক্ষিণ সীমান্তের নিকটবর্তী কোনো এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে। এই এলাকার একমাত্র নিদর্শন আমাদের কাছে 'করম পত্তন' বা 'কার বাটান' শহরের নাম, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই শহরটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

[৩] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪২৯, ৪৩০

[৪] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৩০

[৫] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৩০

মুসলমানদের ঘেরাও করার চেষ্টা ব্যর্থ

এই সময়ে কামরূপের রাজা ইসলামি বাহিনীকে মারাত্মকভাবে ফেঁসে যেতে দেখে সাহসী হয়ে উঠেছিল। তার আদেশে অসংখ্য হিন্দু মুসলমানদের শিবিরের কাছে একত্রিত হলো এবং বাঁশের একটি দেয়াল তৈরি করে তাদের চারপাশ ঘেরাও করে ফেলল। মুসলমানরা বুঝতে পারল যে, এই ঘেরাওয়ের ফলাফল তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে তারা সাহসের সাথে কাজ করে একযোগে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর ঘেরাও ভেঙে দিল এবং নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেল। [১]

ইসলামি বাহিনীর ধ্বংস

খিলজি বিজয়ী নদীর তীরে অবস্থান করলেন যাতে নদী পার হওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু ইতিমধ্যে হিন্দুদের তাড়া করে আসতে দেখে কিছু মুসলমান তাদের ঘোড়াগুলো নদীতে নামিয়ে দিল। প্রায় দুইশ গজ পর্যন্ত নদীর পানি অগভীর ছিল, তাই তারা চিৎকার করে বলল: “নদী গভীর নয়।” এটি শুনে বাকি সৈন্যরাও তাদের পেছনে নদীতে নেমে পড়ল। পশ্চাদ্ধাবনকারী হিন্দুরা ময়দান খালি দেখে নদীর তীর দখল করে নিল। ফলে মুসলমানদের জন্য এখন ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। বিপদ এই হলো যে, সামনের দিকে নদীর পানি অত্যন্ত গভীর প্রমাণিত হলো। সেই সাথে এর স্রোতও এত তীব্র ছিল যে সাঁতার কাটাও কঠিন হয়ে পড়ল। যার ফলে অধিকাংশ সৈন্য ডুবে গেল। কেবল মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার প্রায় একশ সৈন্যের সাথে জীবিত অবস্থায় অন্য তীরে পৌঁছাতে সক্ষম হলেন। [২]

সম্ভবত সুলতান গাজীর ওপর বিপদ এসেছে!

এখানে বসবাসকারী মুসলমানদের মিত্র উপজাতি কোচ (কঞ্জ) এবং মেজ (মেক) যখন মুসলিম বাহিনীর এই ধ্বংসের কথা জানতে পারল, তখন তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। বিশেষ করে আলী মেজের গোত্র ফেরার পথে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারকে অনেক সহযোগিতা করল। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার বারবার বলতেন: “সম্ভবত সুলতান গাজী (শাহাবুদ্দিন)-এর ওপর কোনো বিপদ এসেছে যার কারণে ভাগ্য আমাদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে।” বিষয়টি ঠিক এমনই ছিল। প্রায় সেই দিনগুলোতেই সুলতান শাহাবুদ্দিনকে ঝিলামের কাছে শহীদ করা হয়েছিল। [৩]

তিরস্কার ও বদদোয়া

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার নিজের রাজধানী “দেবকোট”-এ ফিরে গেলেন কিন্তু এই দুর্ঘটনা তার সুনামকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। যখনই তিনি ঘোড়ায় চড়ে বের হতেন, শহীদ হওয়া সৈন্যদের আত্মীয়-স্বজনরা তাকে তিরস্কার করত, মহিলারা এবং শিশুরা বাড়ির ছাদ থেকে তাকে গালিগালাজ করত এবং বদদোয়া দিত। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার এতটাই দুঃখিত ও হতাশ হলেন যে তিনি ঘোড়ায় চড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। তার সাহস হারিয়ে গেল এবং তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। [৪]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৩০।

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৩০, ৪৩১।

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৩১, ৪৩২।

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৩১, ৪৩২।

খলজি জেনারেলের করুণ পরিণতি:

কিছু সেনা কর্মকর্তাও মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর থেকে মুক্তি চাচ্ছিলেন। তাঁদেরই মধ্যে আলী মর্দান নামক এক আমির তাঁর অসুস্থতা দেখার অজুহাতে "দেবকোট"-এ আসেন। বখতিয়ার বিছানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তিন দিন ধরে তিনি কারও সাথে দেখা করেননি। আলী মর্দান তাঁর মুখ থেকে চাদর সরিয়ে তাঁর বুকে খঞ্জর মেরে তাঁকে হত্যা করেন। [১]

তারা শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে
যাদের অস্থির আকাঙ্ক্ষা সর্বদা ব্যাকুল করে রাখত
দুনিয়াতে ফাগফুরি প্রতাপ হোক বা কায়সারি শান-শওকত
শত্রু মৃত্যুর আক্রমণ কখনো এড়ানো যায় না
(আল্লামা ইকবাল)

আলী মর্দান এরপর "দেবকোট"-এর শাসনভার গ্রহণ করেন এবং পুরো লখনৌতি (পশ্চিমবঙ্গ)-এর ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে তুলে নেন। কুতুবুদ্দিন আইবেকও তাঁকে নায়েব হিসেবে স্বীকৃতি দেন। [২]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি, মিনহাজুস সিরাজ থেকে: পৃষ্ঠা ৪৩২

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৩৪, ৪৩৫

https://t.me/BoierSomahar

ভারতে আইবেকের স্বায়ত্তশাসন এবং সমস্যা ও অভিযানসমূহ

যে বছর মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি তিব্বত অভিযানে রওনা হয়েছিলেন, প্রায় সেই সময়েই শাহাবুদ্দিন ঘুরি এবং কুতুবুদ্দিন আইবেক যৌথভাবে পাঞ্জাবে বিদ্রোহকারী খোখর উপজাতিদের পরাজিত করেন। এটি ছিল শাহাবুদ্দিন ঘুরির শেষ অভিযান, যার পর এই মুজাহিদ গজনী ফিরে যাওয়ার পথে শাবান ৬০২ হিজরি (মার্চ ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) তে শহীদ হন। [১]

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরির উত্তরাধিকার সমস্যা:

শাহাবুদ্দিন ঘুরির হত্যাকাণ্ড ছিল এমন একটি ঘটনা যা ঘুরি সালতানাতের বিশাল কাঠামোকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সুলতানের এক কন্যা ছাড়া কোনো সন্তান ছিল না। আবার তাঁর মৃত্যু হয়েছিল আকস্মিকভাবে, তাই কোনো উত্তরসূরি বা উত্তরাধিকারী নিয়োগের সুযোগই আসেনি। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সুলতান এ কারণেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে, তিনি নিজের পরিবার বা ঘুরি গোত্রের কাউকে খুব বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। [২]

সুলতানের নিজের গোত্রের চেয়ে তাঁর গোলামদের ওপর বেশি আস্থা ছিল। এই কারণেই একবার যখন কোনো এক সহচর সুলতানের পুত্রসন্তান না থাকায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন, তখন সুলতান স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলেন: “অন্যান্য বাদশাহদের একজন বা দুইজন পুত্র থাকে। আমার এক হাজার গোলাম আমার পুত্র, যারা আমার পর আমার রাজত্ব সামলাবে।” [৩]

কুতুবুদ্দিন আইবেকের পরীক্ষা:

শাহাবুদ্দিন ঘুরির পর কুতুবুদ্দিন আইবেকের জন্য দিল্লির সিংহাসন সামলানো এবং একে একটি স্বাধীন সালতানাতের রূপ দেওয়া কোনো সহজ কাজ ছিল না। হিন্দুস্তানের সমস্ত বিজিত এলাকা যেগুলোর শাসনভার আইবেকের হাতে ছিল, সেগুলো শূন্যতার শিকার হয়ে পড়ে এবং খোদ কুতুবুদ্দিন আইবেকের সাংবিধানিক অবস্থানও সংকটে পড়ে যায়। এই কারণে তাঁকে কেবল ঘুরি সালতানাতের অন্যান্য শক্তিশালী আমিরদের সাথে সংঘর্ষের মোকাবিলাই করতে হয়নি, বরং অভ্যন্তরীণভাবেও নিজের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করতে হয়েছিল। আইবেকের এই অভিযানসমূহ এবং প্রতিকূলতার বিবরণ বছরওয়ারি নিচে পেশ করা হচ্ছে:

---

[১] (তারিখে মুবারক শাহী: পৃ. ১২; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২১৪) এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[২] এই কারণেই তিনি ফিরোজ কোহ (ঘুরিদের পৈতৃক কেন্দ্র) গিয়াসউদ্দিন ঘুরি মরহুমের পুত্র মাহমুদের পরিবর্তে তাঁর জামাতা আলাউদ্দিন মুহাম্মদকে সঁপে দিয়েছিলেন।

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪০

নিজের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা: ৬০২ হিজরি (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ):

শিহাব উদ্দিন ঘুরির শাহাদাতের কয়েক মাস আগে কুতুব উদ্দিন আইবেক লাহোর থেকে দিল্লি পৌঁছেছিলেন। যখন তিনি তাঁর প্রভুর শাহাদাতের খবর পেলেন, তখন তিনি নিজেকে এতিম এবং হিন্দুস্তান সালতানাতকে বিশৃঙ্খলার খাদের কিনারে অনুভব করলেন। বিপদ আঁচ করতে পেরে তিনি দিল্লি থেকে লাহোরের দিকে রওনা হলেন। যদিও এটি জুনের প্রচণ্ড গরমের দিন ছিল, তবুও আইবেক এবং তাঁর সঙ্গীরা এই কষ্টকর সফর করে লাহোরে পৌঁছে গেলেন। লাহোরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যারা আইবেকের শাসনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর আগমনে আনন্দিত হলেন এবং নিজেদের নিরাপদ মনে করে তাঁর সমর্থক হয়ে গেলেন। এক সপ্তাহ অবস্থান ও পরামর্শের পর ১৭ জিলকদ ৬০২ হিজরি (২৫ জুন ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তখন সুলতান ঘুরির শাহাদাতের আড়াই মাস অতিবাহিত হয়েছিল। [১]

শহীদ সুলতানের উত্তরসূরির নিকট থেকে শাসনের সনদ: ৬০৫ হিজরি (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ):

আইবেকের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণার জন্য তখনও গজনির নতুন সুলতানের নিকট থেকে শাসনের সনদ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, গজনীতে প্রায় আড়াই বছর পর্যন্ত শহীদ সুলতানের উত্তরসূরির বিষয়টি পুরোপুরি মীমাংসা হয়নি, বরং সেখানে সিংহাসন নিয়ে টানাহেঁচড়া চলছিল। অবশেষে রাজত্বের অন্যান্য দাবিদাররা দৃশ্যপট থেকে সরে যান এবং ৬০৫ হিজরিতে গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হিন্দুস্তানের ঘুরি সাম্রাজ্যে তখন এই তিনজন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন:

- (১) কুতুব উদ্দিন আইবেক, লাহোর ও দিল্লির শাসক
- (২) নাসির উদ্দিন কুবাচা, মুলতান ও সিন্ধুর শাসক
- (৩) তাজ উদ্দিন ইয়ালদুজ, গাজম ও পেশোয়ারের শাসক।

তিনজনই প্রতিনিধি হিসেবে বিশাল এলাকা পরিচালনা করছিলেন এবং তাঁদের কেউ অন্য কারো অধীনস্থ ছিলেন না, বরং সুলতান ঘুরির জীবদ্দশায় তিনজনই সরাসরি সুলতানের অনুগত ছিলেন।

এই তিনজন নিজ নিজ পক্ষ থেকে নতুন ঘুরি সুলতানের কাছে আবেদন পাঠান যেন তাঁদের দাসত্ব থেকে মুক্তির পরোয়ানা এবং নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলের শাসনের সনদ প্রদান করা হয়। যেহেতু নতুন সুলতান তাঁর সিংহাসন আরোহণের জন্য ঘুরি সাম্রাজ্যের দেশগুলোর কাছে ঋণী ছিলেন, তাই তিনি ইতিবাচক সাড়া দেন এবং মুক্তির পরোয়ানা ও শাসনের সনদ প্রদানে কোনো কার্পণ্য করেননি। এভাবে আইবেক, ইয়ালদুজ এবং কুবাচা তিনজনই নিজ নিজ অঞ্চলের স্বাধীন শাসক হয়ে গেলেন। [২]

তাজ উদ্দিন ইয়ালদুজের সাথে সংঘর্ষ: ৬০৫ হিজরি (১২০৮ খ্রিষ্টাব্দ):

কুতুব উদ্দিন আইবেক তখন পাঞ্জাব, দোয়াব এবং মধ্য ভারতের শাসক ছিলেন। লাহোর, দিল্লি, শিয়ালকোট, ভাতিন্ডা, আজমির, কনৌজ, বেনারস, মিরাট, বদায়ুন এবং গোয়ালিয়রের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো তাঁর শাসনাধীন ছিল। এভাবে সবচেয়ে বড় রাজ্যটি তাঁরই ছিল। তাজ উদ্দিন ইয়ালদুজ ছিলেন তাঁর শ্বশুর এবং সেই হিসেবে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। তবে এই আনন্দদায়ক পরিবেশ সেই সময়...

---

[১] তারিখ ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ: পৃষ্ঠা ৩১; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৭

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৭৩

হঠাৎ করেই (পূর্বের পরিস্থিতি) শেষ হয়ে গেল যখন তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ নতুন সুলতানের কাছ থেকে গজনির প্রতিনিধিত্বও (নিয়াবত) লাভ করলেন। ফলে তিনি নিজেকে পুরো সালতানাতের নায়েব মনে করতে শুরু করেন। তাই তিনি সৈন্য নিয়ে লাহোর দখলের জন্য বেরিয়ে পড়েন, যা ছিল আইবাকের সালতানাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তার সাময়িক রাজধানী। ইয়ালদুজের উদ্দেশ্য ছিল আইবাককে নিজের অনুগত বানানো এবং হিন্দুস্তানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

পাঞ্জাবের ময়দানে আইবাক ইয়ালদুজের আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দেন এবং তাকে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে গজনি পর্যন্ত চলে যান এবং সেটিও জয় করে নেন। এটি আইবাকের জন্য একটি বড় সাফল্য ছিল, যা তাকে সাময়িকভাবে ঘুরি সালতানাতের প্রাণকেন্দ্রের ওপর কর্তৃত্ব এনে দেয়। ফলে এই বিজয়ের খুশিতে তিনি সেখানে উৎসব পালন করতে শুরু করেন। গজনির সাধারণ মানুষ একজন অভিজ্ঞ শাসক হিসেবে তাজউদ্দীন ইয়ালদুজকেই বেশি পছন্দ করত, তাই আইবাক যখন বিজয়ের উৎসবে মত্ত ছিলেন, তখন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইয়ালদুজকে গজনি দখলের জন্য ডেকে পাঠান। আইবাক গজনিতে মাত্র চল্লিশ দিন কাটাতে পেরেছিলেন। হঠাৎ তিনি জানতে পারলেন যে ইয়ালদুজ তার বাহিনীকে পুনর্গঠিত করে গজনির কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, তখন তিনি বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ “সাং-ই-সুরাখ” [১] এর পথ ধরে হিন্দুস্তানের দিকে রওনা হন।

এরপর থেকে তিনি ইয়ালদুজের সামরিক শক্তি ও দক্ষতা নিয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকতেন এবং এই কারণেই তিনি দিল্লির চেয়ে লাহোরে অবস্থান করা এবং একে সামরিক কেন্দ্রে পরিণত করা জরুরি মনে করতেন। এই পরাজয় আইবাককে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তার আসল মনোযোগ হিন্দুস্তানের দিকেই থাকা উচিত [২]।

স্থানীয় উমারাদের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা: ৬০৬ হিজরি (১২০৯ খ্রিস্টাব্দ)

ইয়ালদুজের সাথে দ্বন্দ্বের পর, আইবাক নাসিরুদ্দিন কাবাচার সাথে তার সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেন। তিনি তার এক মেয়েকে কাবাচার সাথে বিয়ে দেন যাতে তাকে নিজের মিত্র বানাতে পারেন অথবা অন্তত সাময়িকভাবে নিরপেক্ষ রাখতে পারেন। আইবাকের এই মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি তার দ্বিতীয় মেয়েকেও কাবাচার সাথে বিয়ে দেন। এটি ছিল একটি বিজ্ঞোচিত রাজনীতি যার উদ্দেশ্য ছিল একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে মিত্রে পরিণত করা [৩]।

কুতুবুদ্দিন আইবাকের মৃত্যু:

আইবাক তার শাসনের অবশিষ্ট সময়ে দিল্লি সালতানাতের প্রশাসনিক ও সামরিক ভিত্তি মজবুত করেন। তাকে এখনো অনেক কিছু করতে হতো। দেশের এই বিশৃঙ্খলা দূর করে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, কিন্তু ভাগ্য তাকে আর সময় দেয়নি। সে দিনগুলোতে তিনি লাহোরের পরিচ্ছন্নতা ও উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলেন। একদিন তিনি চৌগান (পোলো) খেলার সময় শহরের জনাকীর্ণ...

---

[১] সাং-ই-সুরাখ সম্পর্কে কোনো সঠিক গবেষণা নেই যে এটি কোন স্থান। নাম থেকে বোঝা যায় যে এটি কোনো অত্যন্ত সংকীর্ণ গিরিপথ ছিল। যাই হোক, আইবাক একটি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলেন কারণ লাহোর থেকে গজনির সবচেয়ে পরিচিত পথ ছিল “কুররাম” পথ, যা ইয়ালদুজের দখলে ছিল। দ্বিতীয় পথটি ছিল কান্দাহার থেকে কোয়েটা এবং তারপর কোহ-ই-সুলাইমান হয়ে লাহোর পর্যন্ত। প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে আইবাক এই পথেই এসেছিলেন। কয়েক বছর পর যখন ইয়ালদুজও খ্বারিজমীয়দের কাছে পরাজিত হন, তখন তিনিও এই পথেই লাহোরে এসেছিলেন।

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১২।

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৮।

জনবসতি থেকে দূরে তাদের জন্য আলাদা এলাকা নির্দিষ্ট করার নির্দেশ জারি করলেন। এরপর তিনি চৌগান (পোলো) খেলতে চলে গেলেন। সেখানে হঠাৎ তিনি নিজের ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। একটি পা রেকাবে আটকে রইল এবং তিনি পিঠের ওপর ভর দিয়ে ঘোড়ার সাথে সাথে হেঁচড়াতে লাগলেন। এমন সময় জিনটিও পিছলে তার ওপর এসে পড়ল এবং এর সূচালো কোণা তার পাঁজরে ঢুকে গেল। এই আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে সুলতান তা সহ্য করতে পারলেন না এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। [১]

আইবেকের সমাধি আনারকলি (লাহোর)-এ অবস্থিত। শিখ বিজেতা রণজিৎ সিং তার শাসনামলে এই সমাধিটি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে এই মাজারটি একটি চবুতরা বা বেদীর আকারে ছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার এখানে একটি সুন্দর সমাধি নির্মাণ করে দেয়।

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের রাজনৈতিক ভূমিকার ওপর এক নজর

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের রাজনৈতিক জীবন তিনটি অংশে বিভক্ত দেখা যায়:

(ক) ৫৮৭ হিজরি (১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৬০২ হিজরি (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ):

এই সময়কাল পনেরো বছর ব্যাপী ছিল। এই সময়ে তিনি উত্তর ভারতের অধিকাংশ এলাকায় ঘুরিদের প্রতিনিধি (নায়েব) ছিলেন। এই সময়কালটি নিরবচ্ছিন্ন সামরিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। আইবেকের প্রায় সমস্ত বিজয় এই সময়কালের সাথে সম্পর্কিত।

কুতুবুদ্দিন আইবেক প্রতিনিধি হিসেবে পূর্ণ মনোযোগের সাথে উত্তর ও মধ্য ভারতে ইসলামী সালতানাতের সীমানা বিস্তৃত করেন। দিল্লিকে নিজের কেন্দ্র বানিয়ে নিজের সামরিক যোগ্যতার বলে অনেক রাজপুত রাজ্যকে পরাজিত করেন এবং ইসলামী সালতানাতের স্থিতিশীলতায় মূল ভূমিকা পালন করেন। এই বিজয়গুলো পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যদিও ভারত বিজয়ের নকশা প্রণয়ন সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরি বিজেতার কৃতিত্ব ছিল, কিন্তু মাঝেমধ্যে সুলতানকে বারবার মধ্য এশিয়ার অভিযানে লিপ্ত হতে হতো। এমন পরিস্থিতিতে আইবেকই ছিলেন যিনি ভারতে বিজয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। পাশাপাশি তিনি শাসন ব্যবস্থাকেও পুরোপুরি বজায় রেখেছিলেন এবং সমস্ত কাজ পূর্ণ দায়িত্বের সাথে এমনভাবে সম্পন্ন করতেন যেন সুলতান নিজেই এখানে উপস্থিত আছেন।

(খ) ৬০২ হিজরি (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৬০৫ হিজরি (১২০৮ খ্রিস্টাব্দ):

এটি ছিল তিন বছরের সময়কাল যাতে তিনি লাহোর থেকে দিল্লি এবং দোয়াব পর্যন্ত স্বাধীন শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসক যিনি দিল্লিকে রাজধানী বানিয়েছিলেন এবং এভাবেই উপমহাদেশে নিয়মিত স্বাধীন ইসলামী সালতানাতের সূচনা হয়।

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৮, ৪৯১; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃষ্ঠা ১০৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২২৫; সফরনামা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩০।
আইবেকের মৃত্যুর তারিখ ও মাস কেউ উল্লেখ করেনি। মিনহাজ-উস-সিরাজও কেবল ৬০৭ হিজরি সালের কথা উল্লেখ করেছেন। ইসামিও নীরব। হাসান নিজামি ‘তাজুল মাআসির’-এ সুলতানের মৃত্যুতে চার পৃষ্ঠাব্যাপী শোক ও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন কিন্তু মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে একটি শব্দও লেখেননি। মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাশমি ‘তাকভিম-ই-তারিখি’-তে “জমাদিউল আউয়াল ৬০৭ হিজরি মোতাবেক অক্টোবর ১২১০ খ্রিস্টাব্দ” তারিখ লিখেছেন। কিন্তু এর কোনো প্রাচীন সূত্র আমাদের সামনে নেই।

তবে তার শাসনের প্রথম তিন বছর সুলতানের শাহাদাতের পর সালতানাতে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া অরাজকতায় কলুষিত ছিল। এই বিশৃঙ্খলার ঢেউকে নিজের এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে না দেওয়া ছিল একটি বড় কৃতিত্ব। এর জন্য তাকে রাজনৈতিক কৌশল এবং তার বিরোধী ঘুরি রাজ্যগুলোর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়েছিল, যার মধ্যে ইয়ালদোজের মতো বড় বড় আমিরদের সাথে যুদ্ধও হয়েছিল। এই সময়কালটি এই দিক থেকে অত্যন্ত কঠিন ছিল যে, আগে সুলতান ঘুরির ছায়াতলে আইবেক প্রয়োজনে গজনী বা অন্যান্য আমিরদের ইকতা থেকে সাহায্য পেতেন, কিন্তু সুলতানের পর তাকে কেবল নিজের বাহুবলের ওপরই ভরসা করতে হয়েছিল।

এই যুগে তাকে একজন যোদ্ধা সৈনিকের চেয়ে একজন দক্ষ রাজনীতিবিদের মতো বেশি মনে হতো। তিনি নতুন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদকে আস্থায় রেখেছিলেন। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়ালদোজকেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেননি। নাসিরুদ্দিন কুবাচার সাথেও সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন এবং বাংলায় আলী মাদানকে সাময়িকভাবে সরকারি অনুমতিপত্র দিয়ে সেখানেও পরিস্থিতির খুব একটা অবনতি হতে দেননি।

(গ) ৬০৫ হিজরি (১২০৯ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ৬০৭ হিজরি (১২১০ খ্রিষ্টাব্দ)

এই সময়ের আগে তিনি গজনীর সুলতানের কাছ থেকে শাসনের সনদের অপেক্ষায় ছিলেন। ৬০৫ হিজরিতে এই সনদ পাওয়ার পর তিনি তার অধিকৃত অঞ্চলের সাংবিধানিক স্বাধীন সুলতান হয়ে যান। যদিও এই সময়কালটি ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রায় দুই বছর ব্যাপী। তবুও এই সময়ে তিনি সালতানাতকে সুসংহত করেন এবং দিল্লি সালতানাতের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করতে থাকেন। সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এই সময়কালটি এই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এই সময়েই ভারতের সেই স্বাধীন ইসলামি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা বিভিন্ন রূপে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের গুণাবলি

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন দূরদর্শী এবং পরিকল্পনাকারী শাসক। তিনি তুর্কি আমির এবং যোদ্ধা সরদারদের সর্বোত্তম পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদ দিয়ে নিজের অনুগত করে নিয়েছিলেন। তিনি প্রভাবশালী আমিরদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের শাসক নাসিরুদ্দিন কুবাচাকে তিনি নিজের জামাতা বানিয়েছিলেন। তিনি বিজিত এলাকাগুলোর শাসনব্যবস্থা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং ন্যায়বিচারের মানদণ্ডকে কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। তিনি শরিয়ত বিরোধী কর বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং জনগণকে সম্ভাব্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। হিন্দু এবং সকল ধর্মের মানুষের সাথে বৈষম্যহীন দয়া ও করুণার আচরণ করতেন। তার অঢেল দানশীলতার কারণে তাকে “লাখ বখশ” [১] বলে স্মরণ করা হতো।

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক যোগ্যতা, দক্ষতা এবং গুণাবলিতে ছিলেন অসাধারণ। তার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক হলো:

- তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ সামরিক কমান্ডার। উত্তর ভারত বিজয়ে তার অবদান সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরির চেয়ে কম ছিল না। সুলতান ঘুরি ভারত সংক্রান্ত যে আদেশ জারি করতেন, আইবেকের মাধ্যমেই তা কার্যকর হতো।
- তিনি অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত এড়িয়ে চলতেন। তাকে কখনো একজন অত্যাচারী, দুর্নীতিবাজ বা স্বার্থান্বেষী শাসক হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

[১] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮, ৪

মুসলমান এবং হিন্দুরাও তাকে পছন্দ করত। ভারতের ইতিহাসে তিনি যে ছাপ রেখে গেছেন, তা ধ্বংসাত্মক ছিল না বরং অত্যন্ত গঠনমূলক ছিল।

তিনি হিন্দু শাসকদের মনস্তত্ত্ব বুঝতেন। তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কখনো প্ররোচনা, কখনো উপদেশ এবং কোথাও কোথাও শক্তির ব্যবহারও করতেন। তবে তিনি তলোয়ারের চেয়ে কূটনীতি ও রাজনীতির ওপর বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতারণা ও জালিয়াতিকে তিনি সর্বাবস্থায় মন্দ মনে করতেন এবং চুক্তিসমূহ পুরোপুরি মেনে চলতেন। জুলুম-অত্যাচার ও সংকীর্ণমনা স্বভাবের পরিবর্তে তিনি ন্যায়বিচার, সম্মান ও উদারতার প্রচলন করেন।

তাঁর সেনাবাহিনী তুর্কি, ঘুরি, খোরাসানি, খিলজি এবং ভারতীয়দের মতো বিভিন্ন বংশ ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত হলেও তা ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও নিয়মনিষ্ঠ। কারো ওপর সামান্যতম জুলুম করার অনুমতি তাদের ছিল না। তাঁর পুরো শাসনামলে সৈন্যরা কখনো কারো জমি থেকে ঘাস উপড়ে ফেলার, কারো খোঁয়াড় থেকে একটি ছাগল ছিনিয়ে নেওয়ার, কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক খাবার দাবি করার অথবা কোনো গ্রামবাসীকে বাধ্য করে তার বাড়িতে অবস্থান করার সাহস করেনি। [১]

তিনি খাজনা ও কর ব্যবস্থা সহজ করে দিয়েছিলেন। সেগুলোর বোঝা কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত গাইর-শরয়ি (শরীয়ত পরিপন্থী) কর বাতিল করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর আমলে জনগণ সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল এবং তারা তাদের শাসকের জন্য দোয়া করত। [২]

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের স্থাপত্যসমূহ

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের আমলের দিল্লি ‘কিলা রাই পিথোরা’র অভ্যন্তরে এবং এর বাইরে সংলগ্ন কিছু জনবসতি নিয়ে গঠিত ছিল, যাকে ‘লাল কোট, প্রাচীন দিল্লি বা কিলা রাই পিথোরা’ বলা হতো। এটি যমুনা নদী থেকে কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। [৩] এখানেই আইবেক মুসলিম স্থাপত্যরীতির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং বেশ কিছু জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ করান, কারণ স্থাপত্যশিল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর নির্মিত স্থাপত্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

কসরে সপেদ (সাদা প্রাসাদ):

এটি ছিল দিল্লিতে কোনো মুসলিম শাসকের প্রথম প্রাসাদ, এর নাম ছিল ‘কসরে সপেদ’। সম্ভবত এটি সাদা পাথর বা চুনাপাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এতে মার্বেল পাথরের কাজও প্রচুর পরিমাণে ছিল, যার কারণে একে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। [৪] এই প্রাসাদটি বেশ প্রশস্ত ছিল কারণ এতে একটি বড় আখড়া (স্টেডিয়াম) ছিল যেখানে হাতিদের লড়াই করানো হতো। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: পৃষ্ঠা ৩৩

[২] তারিখ-ই-ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: পৃষ্ঠা ৩৩, ৩৪

[৩] এই এলাকাটি বর্তমান মেহরাউলির কাছে এবং আজকের দক্ষিণ দিল্লির জোনে পড়ে। বর্তমান নতুন দিল্লি, মধ্য দিল্লি এবং উত্তর দিল্লির মতো এলাকাগুলো পরবর্তী সময়ে আবাদ হওয়ার পর সেগুলোর বিস্তার ঘটে। এটি যমুনা নদী থেকে কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে ছিল। পরবর্তী সময়ে দিল্লির বিভিন্ন শহর যেমন সিরি, তুঘলকাবাদ, ফিরোজাবাদ এবং শাহজাহানাবাদ যমুনার কাছে গড়ে ওঠে, কিন্তু আইবেকের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক কেন্দ্রটি নদী থেকে দূরে ছিল।

[৪] (আসারুস সানাদিদ: স্যার সৈয়দ আহমদ খান: পৃষ্ঠা ১২, ১৩) স্যার সৈয়দ বলেন যে, এখন এই প্রাসাদের কোনো নাম-নিশানাও পাওয়া যায় না।

[৫] যে কসরে সপেদে হাতির লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৩৪)

কুতুব মিনার:

আইবেকের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং চিরস্মরণীয় স্থাপত্য কীর্তি হলো 'কুতুব মিনার' নির্মাণ। এর নির্মাণ কাজ তিনিই শুরু করেছিলেন, তবে এর সমাপ্তি ঘটান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ। লাল পাথর দিয়ে নির্মিত এই বিস্ময়কর মিনারের উচ্চতা ২৪২ ফুট। এতে ৩৭৯টি সিঁড়ি রয়েছে। জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন এই মিনারে চড়ে আজান দিতেন। ইবনে বতুতার মতে, এই মিনারের ভেতরে নির্মিত সিঁড়ি এতটাই প্রশস্ত যে এতে হাতিও চড়তে পারে। [১]

আজও কুতুব মিনার একইভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বলা হয় যে, গত শতাব্দী পর্যন্ত এটি উপমহাদেশের সর্বোচ্চ ভবন এবং বিশ্বের একমাত্র স্বাধীন (কোনো বাহ্যিক অবলম্বন ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকা) মিনার হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল।

মসজিদ কুওয়াতুল ইসলাম:

মসজিদ কুওয়াতুল ইসলাম ছিল দিল্লির প্রথম জামে মসজিদ। আগে এখানে পৃথ্বীরাজের মন্দির ছিল। কুতুবুদ্দিন আইবেক এই স্থানেই একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। এর দৈর্ঘ্য ১৪২ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে ইলতুতমিশ এটিকে আরও প্রশস্ত করেন এবং নির্মাণে আরও সংযোজন করেন। প্রায় এক শতাব্দী পর ইবনে বতুতা এটি পর্যবেক্ষণ করে লিখেছেন যে, এর ছাদ এবং দেয়াল সবই খোদাই করা সাদা পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা সিসা দিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে। এতে কাঠের কোনো নামগন্ধ নেই। এতে তেরোটি গম্বুজ রয়েছে যা সবই পাথর দিয়ে তৈরি।

এই মসজিদের আঙিনায় অদ্ভুত ও বিচিত্র ধাতু দিয়ে তৈরি ত্রিশ হাত (৪৫ ফুট) উঁচু একটি স্তম্ভ ছিল যা পর্যটকদের জন্য বিস্ময়ের কারণ হতো। এটি এতটাই শক্ত এবং মসৃণ ছিল যে এতে লোহার আঘাতও কোনো প্রভাব ফেলত না। ইবনে বতুতা এটি দেখেছিলেন এবং মেপেছিলেন। তিনি মানুষের কাছে শুনেছিলেন যে, সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়ে এটি ঢালাই করা হয়েছিল।

তুঘলক সুলতানদের আমল পর্যন্ত দিল্লির জামে মসজিদের মর্যাদা এটিই লাভ করেছিল। [২]

মসজিদ কুওয়াতুল ইসলামের ওপর আল্লামা ইকবালের কবিতা:

মসজিদ কুওয়াতুল ইসলাম দীর্ঘকাল আগে ধ্বংস হয়ে গেছে, দুই-তিনটি খিলানযুক্ত দরজা এবং কয়েকটি দেয়াল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে এর ধ্বংসাবশেষ আজও এর অতীত গৌরবের একটি অস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরে যা জ্ঞানবান ও দূরদর্শী ব্যক্তিরা তাদের কল্পনায় দেখতে পান। মরহুম আল্লামা ইকবাল এর জরাজীর্ণ অবস্থার ওপর তার অনুভূতি এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন:

আমার এই জ্যোতিহীন হৃদয়ে এখন আর কী অবশিষ্ট আছে

লা ইলাহা মৃত, বিষণ্ণ এবং প্রকাশের স্বাদহীন

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৩২৭; ইসলামি ফন-এ তামির হিন্দুস্তান মে, জেমস ফার্গুসন, উর্দু অনুবাদ: সৈয়দ হাশমি ফরিদাবাদী: পৃষ্ঠা ১৮, ১৯।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৩২৬, ৩২৭; ইসলামি ফন-এ তামির হিন্দুস্তান মে, জেমস ফার্গুসন, উর্দু অনুবাদ: সৈয়দ হাশমি ফরিদাবাদী: পৃষ্ঠা ১৮, ১৯।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

কেন মুসলমান তোমার কঠোরতায় লজ্জিত হবে না
যেহেতু দাসত্বের কারণে তার অস্তিত্ব কাঁচের মতো হয়ে গেছে
তোমার শানের যোগ্য সেই মুমিনেরই সালাত
যার তাকবীরে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের লড়াই বিদ্যমান।

কুতুবুদ্দিন আইবেককে হাফিজ জলন্ধরীর শ্রদ্ধাঞ্জলি:
ইসলামের কবি মরহুম আবুল আসার হাফিজ জলন্ধরী "শাহনামা-এ-ইসলাম"-এ কুতুবুদ্দিন আইবেককে চমৎকার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেছেন:

সেই কুতুবুদ্দিন, সেই মুজাহিদ পুরুষ যার ভয়ে... এই পৃথিবী গাফলতের ঘুম থেকে নতুন করে জেগে উঠেছিল।
যার ভয়ংকর তলোয়ারকে নিষ্ঠুররা ভয় পেত... যার বাহুর প্রতাপে আকাশমন্ডলী ভীত থাকত।
এখানে লাহোরে এক নামহীন গলিতে তিনি ঘুমান,
ইসলামের ঐশ্বর্যের এক স্মৃতিচিহ্ন পড়ে আছে এই গলিতে।
এই সমাধি সেই হিজাজি অশ্বারোহীদের জন্য শোকাতুর... মুসলমানরা যাদের মাজারের মাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে।
এখানে কেউ ফাতিহা পড়ে না, কেউ কাঁদে না... কে জানে এই ছাদের নিচে কে ঘুমান।
আমার কাছে এই সমাধি থেকে এখনও শান প্রকাশ পায়,
গাজী পুরুষের মাজার থেকে এক অদ্ভুত ঈমান জাগ্রত হয়।
আমি প্রায়ই শহরের কোলাহলপূর্ণ হাঙ্গামা থেকে বিরক্ত হয়ে... প্রশান্তির খোঁজে এখানে এসে বসে থাকি।
কল্পনা আমাকে নিয়ে যায় এক ভয়াবহ ময়দানে... যেখানে মানুষের ভিড়ে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়।
নজরে আসে ইসলামের উড়ন্ত পতাকা,
চারিদিকে নূর ছড়িয়ে দিচ্ছে ইসলামের পতাকা।
বিপক্ষে আমি বাতিল বাহিনীর মেঘ দেখতে পাই... নজরে আসে ফেরাউনি খোদায়ি এবং বাতিলের আস্ফালন।
যুদ্ধের হুঙ্কারের শব্দ কানে আসে... উচ্চস্বরের তাকবীরগুলো কানে প্রবেশ করে।
আমার নজরে আসে শহীদদের সেই উজ্জ্বল মুখ,
সেই প্রশান্তি, সেই হাসিমাখা আশার চেহারা। [১]

---

[১] সূত্র: শাহনামা-এ-ইসলাম, হাফিজ জলন্ধরী।

আরাম শাহ বিন কুতুব উদ্দিন আইবেক

৬০৭ হিজরি (১২১০ খ্রি. থেকে ১২১১ খ্রি.)

কুতুব উদ্দিন আইবেকের মৃত্যুও হঠাৎ হয়েছিল, তাই তিনি সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর মতো নিজের উত্তরসূরি সম্পর্কে কোনো অসিয়ত করতে পারেননি। লাহোরে উপস্থিত আমিরদেরকে তড়িঘড়ি করে মরহুম সুলতানের উত্তরসূরি নির্বাচনের জন্য একত্রিত হতে হয়েছিল। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক এবং উত্তরসূরি নির্বাচনের সিদ্ধান্তের কোনো ভুল পুরো দেশকে গৃহযুদ্ধের আগুনে ঠেলে দিতে পারত। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত সালতানাতের আমিরগণ "আরাম শাহ বিন কুতুব উদ্দিন আইবেক"-কে বাদশাহ নির্বাচিত করেন।

কিন্তু তিনি শাসন করার যোগ্য ছিলেন না, কুতুব উদ্দিন আইবেকের পুত্র হওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল না যার কারণে সালতানাতের কোনো আমির তাঁর শাসন মেনে নিতেন, বরং তাঁরা স্বাধীনতার জন্য ডানা ঝাপটাতে শুরু করেন। এরই মধ্যে আরাম শাহ মৃত্যুবরণ করেন। দিল্লিতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিতই হতে পারেনি। তিনি লাহোরে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কয়েক সপ্তাহ পর সেখানেই ইন্তেকাল করেন। এক হিসাব অনুযায়ী তাঁর শাসনের মেয়াদ কয়েক সপ্তাহের বেশি ছিল না। [১]

---

[১] (তবকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ৫৪; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২২৯, ২৩০)

দ্রষ্টব্য: ইসামি স্পষ্ট করেছেন যে, আরাম শাহ লাহোরে অল্প কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। (ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১০৬) যদিও বদায়ুনির মতে তিনি কমবেশি এক বছর শাসন করেছিলেন। (মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ৫৪) এই ক্ষেত্রে তাঁর শাসনের সমাপ্তি এবং ইলতুতমিশের সিংহাসনে আরোহণের বছর ৬০৮ হিজরি (১২১১ খ্রি.) হয়, কিন্তু ইসামির বক্তব্য মিনহাজ এবং হাসান নিজামির সমর্থন লাভ করেছে যারা ইলতুতমিশের সিংহাসনে আরোহণ ৬০৭ হিজরিতে উল্লেখ করেছেন। (তবকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩২; তাজুল মাআসির: পৃষ্ঠা ২৬৯) এভাবে আরাম শাহের শাসনের মেয়াদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়। মিনহাজ এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, আইবেকের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই দিল্লির আমিরগণ ইলতুতমিশকে ডেকে তাঁর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, যেমনটি সামনে বিস্তারিত আসছে।

দ্রষ্টব্য: আরাম শাহ অল্পবয়সী ছিলেন, তাই ঐতিহাসিক নথিপত্রে প্রথমবারের মতো তাঁর উল্লেখ কুতুব উদ্দিন আইবেকের উত্তরসূরি হিসেবেই আসে, একে ভিত্তি করেই 'জামে তারিখ-ই-হিন্দ'-এর লেখকগণ তাঁকে আইবেকের পুত্র হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধা করেছেন। যদিও তবকাতে নাসিরিতে "আরাম শাহ বিন কুতুব উদ্দিন"-ই লেখা আছে। (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮) কিন্তু 'জামে'-এর লেখকগণ "ইবনে কুতুব উদ্দিন"-কে লিপিকারের ভুল বা সংযোজন বলে আলোচনার বাইরে রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা এটি বলতে পারেননি যে, তবে আরাম শাহকে উত্তরসূরি বানানোর কারণ কী ছিল? মিনহাজুস সিরাজ লিখেছেন যে, আমিরগণ আরাম শাহকে এই জন্যই নির্বাচিত করেছিলেন যাতে ফিতনা দমে থাকে এবং লশকরদের মন শান্ত থাকে। "ফিতনা প্রশমন, প্রজাদের শান্তি এবং লশকরদের হৃদয়ের আশ্বাসের জন্য" একজন অপরিচিত ব্যক্তি যিনি উচ্চ বংশীয়ও নন, তাঁকে সিংহাসনে বসানোর কোনো কারণ থাকে না। এমনটি করা তো গৃহযুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানানোরই নামান্তর ছিল। মোদ্দাকথা বিষয়টি স্পষ্ট। ঐতিহাসিক ফেরেশতা এবং মোল্লা বদায়ুনি প্রমুখও তাঁকে মরহুম সুলতানের পুত্র হিসেবেই গণ্য করেছেন। (তারিখ-ই-ফেরেশতা: পৃষ্ঠা ১৬৫; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ৫৪) ইসামি তো নিশ্চিতভাবেই তাঁকে বাদশাহর পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। (ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১০৬)

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মাতে মুসলিমা

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ

৬০৭ হিজরি থেকে ৬৩৩ হিজরি

(১২১০ খ্রি. থেকে ১২৩৬ খ্রি.)

শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ছিলেন কারাকিতাই তুর্কিদের 'আলবারী' গোত্রের একজন প্রধান ইল খানের পুত্র, যার অধীনে বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় যুবক ছিল এবং অসংখ্য ঘোড়া তার চারণভূমিতে চরত। তার পুত্রদের মধ্যে ইলতুতমিশ চেহারা ও চরিত্রে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই ইল খান তাকে সব ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। ইলতুতমিশের অন্য ভাইয়েরা এই কারণে তাকে হিংসা করত। ফলে তারা ইলতুতমিশের সাথে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের মতো আচরণ করল। তারা তাকে ঘোড়ার পাল দেখানোর বাহানায় দূরে কোথাও নিয়ে গেল এবং তারপর তাকে দাস হিসেবে জাহির করে একজন বণিকের কাছে বিক্রি করে দিল, যে তাকে বুখারায় নিয়ে গেল। এখানকার প্রখ্যাত আলেম আল্লামা সদর জাহানের পরিবারের একজন দয়ালু ব্যক্তি তাকে কিনে নিলেন এবং নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন ও শিক্ষা দান করলেন। [১]

একজন আল্লাহর ওলির উপদেশ:

একবার তার মনিব তাকে একটি মুদ্রা দিয়ে আঙুর নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। ইলতুতমিশ সেই মুদ্রাটি হারিয়ে ফেললেন। একজন আল্লাহর ওলি যখন শিশুটির পেরেশানি জানতে পারলেন, তখন তিনি নিজেই আঙুর কিনে দিলেন এবং সাথে এই উপদেশ দিলেন যে, যদি কখনো আল্লাহ তোমাকে বাদশাহ বানান, তবে গরিব ও অভাবীদের খেয়াল রেখো। [২]

আউলিয়াদের মজলিস এবং তুর্কি বালক:

ইলতুতমিশের দাসত্বের অধিকাংশ সময় বুখারায় অতিবাহিত হয়, যেখানে তিনি আউলিয়া ও দরবেশদের সান্নিধ্য লাভ করতে থাকেন। এরপর...

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৪১; তারিখে ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩০, ২৩১

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৪২, ৪৪৩; তারিখে ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩৮

https://t.me/BoierSomahar

তাকে বিক্রি করা হয়েছিল এবং অবশেষে বাগদাদের এক সুফি তাকে কিনে নিয়েছিলেন।

এক রাতে তিনি চল্লিশজন সুফি, দরবেশ এবং সমমনা আলেমদের তার খানকাহে আমন্ত্রণ জানান। সারা রাত জিকির ও ফিকির এবং সামার মাহফিল চলতে থাকে। ইলতুতমিশ সারা রাত কোমর বেঁধে এই মহান ব্যক্তিদের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। কখনো মোমবাতি জ্বালাতেন, কখনো তার মুনিবের ডাকে ছুটে আসতেন এবং আদেশ পালন করতেন। এই তুর্কি বালকের নিষ্পাপ সৌন্দর্য, মার্জিত আচরণ এবং একনিষ্ঠ খেদমত সমস্ত সুফিদের মুগ্ধ করেছিল। যখন ভোরের সময় মাহফিল শেষ হলো, তখন সবাই তার উন্নতি ও সফলতার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহর ওলিদের এই দোয়া এমনভাবে কবুল হয়েছিল যে, এই বালক একদিন রাজসিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। [১]

গজনির বাজারে গোলাম বালক:

ঘটনাটি এমন ছিল যে, কিছুকাল পরে বোখারার এক বণিক, যাকে হাজি বোখারি বলা হতো, তাকে কিনে নেন। কিছুকাল পর তিনি এই বালককে "হাজি জামাল চুস্ত ক্বাবা" নামক এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেন, যিনি তাকে গজনিতে নিয়ে যান। সেখানে তার শিক্ষা-দীক্ষা, রূপ-লাবণ্য, চরিত্র এবং যোগ্যতার কথা ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরি যখন এই সুখ্যাতি শুনলেন, তখন তিনি তাকে কিনতে চাইলেন এবং এক হাজার দিনার মূল্য নির্ধারণ করলেন, কিন্তু হাজি জামাল রাজি হলেন না। সুলতান রাগান্বিত হয়ে আদেশ দিলেন যে, কেউ যেন এই গোলামকে না কেনে।

এই ঘোষণার পর কারো সাহস হলো না যে হাজি জামালের সাথে সওদা করবে। হাজি জামাল এক বছর গজনিতে রইলেন কিন্তু কোনো লাভ হলো না। অবশেষে তিনি বোখারায় ফিরে গেলেন।

কিছুকাল পর হাজি জামাল ইলতুতমিশকে নিয়ে পুনরায় গজনিতে আসেন। এই গোলামের ভাগ্যের নক্ষত্র এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কারণ সেই দিনগুলোতে শাহাবুদ্দিন ঘুরির সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক সুলতানের তলবে গজনিতে এসেছিলেন। তিনি যখন ইলতুতমিশের গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন সুলতান শাহাবুদ্দিনের কাছে তাকে কেনার অনুমতি চাইলেন। সুলতান বললেন:

"আমি একবার মানুষকে এই গোলাম কেনা থেকে নিষেধ করেছি, তাই গজনির বাজার থেকে তাকে কেনা সমীচীন নয়। হ্যাঁ, তাকে দিল্লির বাজারে নিয়ে যান এবং সেখানে যদি সে বিক্রি হয় তবে কোনো বাধা নেই।"

ফলে কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লি রওনা হওয়ার আগে তার উজির নিজামুদ্দিনকে আদেশ দিলেন যেন তিনি কয়েক দিন পর হাজি জামালকে নিয়ে দিল্লিতে চলে আসেন। এভাবে ইলতুতমিশ হাজির সাথে দিল্লিতে পৌঁছান যেখানে কুতুবুদ্দিন আইবেক তাকে এবং হাজির অন্য এক গোলামকে এক লক্ষ তনকায় কিনে নেন। কুতুবুদ্দিন এই ভাগ্যবান গোলামের নাম দিলেন ইলতুতমিশ। [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৩৮, ২৩৯; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ১১৭ থেকে ১১৯।

[২] (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৪২, ৪৪৩; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৪১) ফায়দা: তুর্কি ভাষায় এমন শিশুকে যার জন্ম চন্দ্রগ্রহণের সময় হয়েছে, ইলতুতমিশ বলা হয়। শামসুদ্দিনের জন্মও চন্দ্রগ্রহণের সময় হয়েছিল। (এই বিষয়টি কুতুবুদ্দিন আইবেক গোলামের পরিচয় অনুসন্ধানের সময় জানতে পেরেছিলেন)। সুতরাং এই ভিত্তিতে তার নাম ইলতুতমিশ রাখা হয়েছিল। তাকে আলতামাশও বলা হয়। সঠিক শব্দ হলো ইলতুতমিশ কিন্তু আলতামাশ শব্দটি প্রচলিত হয়ে গেছে। কখনো উর্দুতে শব্দটি বিকৃত হয়ে আতামাশ হয়ে গেছে। ইলতুতমিশের সাথে বিক্রি হওয়া অন্য গোলামের নাম ছিল আইবেক অর্থাৎ তিনি সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের নামধারী ছিলেন। সুলতান আইবেক তাকে তামগাজ উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি প্রশিক্ষণ ও খেদমতের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ভাতিন্ডার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং অবশেষে কিছুকাল পর তার মুনিবের পতাকাতলে তাজউদ্দিন ইয়ালদোজের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। (মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃ. ৫৫)।

ইলতুতমিশ আইবেকের পৃষ্ঠপোষকতায়:

কুতুবুদ্দিন আইবেক ইলতুতমিশকে নিজের সন্তানদের মতো রাখতেন এবং শুরুতে তাকে আমীর-ই-শিকার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তাকে যুদ্ধাভিযানগুলোতে পাঠানো হতে থাকে। ইলতুতমিশই ৫৯৭ হিজরিতে আইবেকের জন্য গোয়ালিয়রের সুদৃঢ় দুর্গ জয় করেন এবং এর দুর্গাধিপতি নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে আইবেক তাকে বরন (বুলন্দ শহর) এবং এর আশপাশের জায়গিরদারি দান করেন। এরপর আরও পদোন্নতি দিয়ে বদায়ূনের শাসনভার অর্পণ করেন। [১]

আত্মোৎসর্গমূলক কৃতিত্ব এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি:

যখন শাহাবুদ্দিন খোখরদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য হিন্দুস্তানে আসলেন, তখন কুতুবুদ্দিন আইবেকও রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিলেন। ওদিকে বদায়ূন থেকে ইলতুতমিশ একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে কুতুবুদ্দিন আইবেকের দরবারে এসে পৌঁছালেন এবং উভয়েই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরীর কাছে উপস্থিত হলেন। পাঞ্জাবের এই যুদ্ধগুলোতে ইলতুতমিশ সাহস, আত্মত্যাগ এবং যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতার ছাপ রেখেছিলেন। চূড়ান্ত যুদ্ধে খোখররা ঝিলাম নদীর ওপারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যাতে ইসলামী বাহিনী নদী পার হতে না পারে। ইলতুতমিশ ঘোড়াকে তাড়া দিলেন এবং কিছু আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধার সাথে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্য তীরের কাছে এমন এক জায়গায় পৌঁছে যেখানে পানিতে পা রাখা সম্ভব ছিল, সেখানে ব্যূহ রচনা করলেন এবং প্রতিপক্ষের ওপর এমন তীব্র তীরবর্ষণ করলেন যে তাদের পা টলে গেল এবং ইসলামী বাহিনীর নদী পার হওয়ার সুযোগ তৈরি হলো। ইলতুতমিশের জানবাজ যোদ্ধারা শত্রুদের হটিয়ে দিলেন। তাদের বারো হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলো এবং বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

ইলতুতমিশের এই বীরত্বপূর্ণ পারফরম্যান্স দেখে সুলতান শাহাবুদ্দিন কুতুবুদ্দিন আইবেককে বললেন: “এই গোলামকে মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং এর একটি লিখিত দলিলও তৈরি করা হোক।” ফলে আদেশ অনুযায়ী আইবেক সেই দিনই ইলতুতমিশকে মুক্ত করে তার সনদও লিখে দিলেন। এটি ছিল একটি অসাধারণ সম্মান, কারণ সুলতান ঘোরী তার জীবদ্দশায় তার সবচেয়ে প্রধান মামলুক অর্থাৎ কুতুবুদ্দিন আইবেক, تاج الدين يلدوز (তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ) এবং ناصر الدين قباچه (নাসিরুদ্দিন কুবাচা)-কেও দাসত্ব থেকে মুক্তি দেননি, কিন্তু তার গোলামের (আইবেক) এই গোলামের ওপর এমন অনুগ্রহ করলেন যে লিখিত মুক্তির সনদ পাইয়ে দিলেন। নিশ্চিতভাবেই ঐশী ইচ্ছায় এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল যাতে কয়েক বছর পর হিন্দুস্তানকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করার মতো একজন মহান সম্রাটের আবির্ভাব হতে পারে।

আইবেক তার সুলতানকে ইলতুতমিশের প্রতি এত সদয় দেখে তাকে আরও সম্মান দিলেন এবং নিজের জামাতা বানিয়ে নিলেন। আইবেকের মৃত্যু পর্যন্ত ইলতুতমিশ বদায়ূনের সুবাদারি ছাড়াও আমীরুল উমারা-র সম্মানও লাভ করেছিলেন। তিনি নিজের যোগ্যতা ও বীরত্বের যে নিদর্শন দেখিয়েছিলেন তাতে প্রমাণিত হয়েছিল যে সেনাবাহিনীতে তার মতো দক্ষ, বিশ্বস্ত এবং আত্মোৎসর্গকারী দ্বিতীয় কেউ নেই। [২]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরী: পৃ. ৩৩৩, ৩৩৪।

[২] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃ. ৫৪, ৫৫; তাবাকাত-ই-নাসিরী: পৃ. ৩৩৩, ৩৩৪।

ইলতুৎমিশের দিল্লিতে সিংহাসন আরোহণ:

আইবেকের পর তার পুত্র আরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনি শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না। ফলে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল:

- নাসিরুদ্দিন কুবাচা, যিনি উচ ও মুলতানের শাসক ছিলেন, ভাক্কারসহ সমগ্র সিন্ধুর ওপর স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- বিহার ও বাংলায় খিলজি আমিরদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ঝিলাম থেকে লাহোর পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন ছিল যে, কখনো তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ গজনি থেকে আক্রমণ করে এখানে দখলদারিত্ব কায়েম করতেন, আবার কখনো কুবাচা সুযোগ বুঝে তা নিজের দখলে নিতেন। [১]

তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ এবং নাসিরুদ্দিন কুবাচাসহ অনেক আমির স্বাধীন হয়ে যান। দিল্লির আমিরদের ভয় ছিল যে, এর ফলে দোয়াব ও মধ্য ভারতে আরও বেশি অরাজকতা ছড়িয়ে না পড়ে। ফলে কুতুবুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর দিল্লিতে সিংহাসন আরোহণ নিয়ে পরামর্শ শুরু হয় এবং অবশেষে বিচারমন্ত্রী আমির আলী ইসমাইল আরও কয়েকজন বড় আমিরের ঐকমত্যে বদায়ূনের গভর্নর ইলতুৎমিশকে আমন্ত্রণ জানান যেন তিনি দ্রুত দিল্লিতে এসে শাসনভার গ্রহণ করেন। ইলতুৎমিশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণগুলো ছিল এই যে, তিনি অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী, সুলতান আইবেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তার জামাতাও ছিলেন, তাছাড়া মরহুম সুলতান তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করতেন।

ইলতুৎমিশ এই আমিরদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দিল্লিতে আসেন এবং "শামসুদ্দিন" উপাধি গ্রহণ করে শাসনভার গ্রহণ করেন। [২]

বায়াতের শরয়ী মর্যাদা ও স্বাধীনতার সনদ:

দিল্লির উলামায়ে কেরাম জানতেন যে, কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লির শাসক হওয়ার সময় গোলাম ছিলেন এবং তিনি স্বাধীনতার সনদ পরে পেয়েছিলেন। তাই ইলতুৎমিশের বায়াতের সময় তাদের মনে এই ধারণাই ছিল যে, তিনি একজন গোলাম যার বায়াত করা যায় না। ইলতুৎমিশ তাদের অবস্থা বুঝতে পারেন এবং সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের জারি করা স্বাধীনতার সনদ বের করে পেশ করেন। তা দেখে সবাই সন্তুষ্ট হন এবং বায়াত গ্রহণ করেন। [৩]

ইলতুৎমিশের শাসনকালকে আমরা তিনটি যুগে ভাগ করে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি:

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৮

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা: খণ্ড ১, পৃ. ২৩২; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃ. ৫৪, ৫৫; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৮, ৪৪৪; তাজ-উল-মাআসির (হাসান নিজামী): পৃ... মিনহাজের মতে, কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দিল্লির আমিররা বদায়ূন থেকে ইলতুৎমিশকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। "যখন সুলতান কুতুবুদ্দিন লাহোরে আল্লাহ তায়ালার রহমতে মিলিত হলেন, তখন আমির আলী ইসমাইল, যিনি দিল্লির আমির-ই-দাদ ছিলেন, অন্যান্য আমির ও কর্মকর্তাদের সাথে বদায়ূনের দিকে সুলতান শামসুদ্দিনের খেদমতে পত্র লেখেন এবং তাকে আসার অনুরোধ জানান।" (তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ৪৪৪) অর্থাৎ দিল্লিতে আরাম শাহের শাসন প্রতিষ্ঠিতই হতে পারেনি এবং কুতুবুদ্দিনের পর পরবর্তী সিংহাসন আরোহণ ইলতুৎমিশেরই হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: ইলতুৎমিশ কোন মাসে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তা কোথাও স্পষ্ট নয়। তবে ৬০৭ হিজরি সাল পাওয়া যায়। (তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ৪৪৪; তাজ-উল-মাআসির পৃ. ২৬৯) ধারণা করা হয় যে, এটি হিজরি বছরের শেষ মাসগুলোর ঘটনা হবে।

[৩] সফরনামা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃ. ২৩১

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

- বিরোধীদের দমনের কাল: ৬০৭ হিজরি থেকে ৬১৫ হিজরি (১২১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
- মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষামূলক পদক্ষেপের কাল: ৬১৬ হিজরি থেকে ৬২১ হিজরি (১২১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
- সম্প্রসারণ ও বিজয়ের কাল: ৬২২ হিজরি থেকে ৬৩৩ হিজরি (১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রথম যুগ: বিদ্রোহী ও বিরোধীদের দমন

শুরুতে ইলতুৎমিশকে অগণিত সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। বাংলায় খিলজি আমিরগণও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। শিহাবুদ্দিন ঘোরীর গোলাম তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ, যিনি গজনীর শাসক ছিলেন, অগ্রসর হয়ে লাহোর দখল করে নেন। হিন্দু সর্দারগণ, বিশেষ করে রাজপুতরা অবাধ্যতা শুরু করে। মুলতানের শাসক নাসিরুদ্দিন কাবাচাও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এই পরিস্থিতিতে শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ অসাধারণ সাহস, কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করেন।

আমিরদের বিদ্রোহ ও পরাজয়:

ইলতুৎমিশের সিংহাসন আরোহণে কিছু আমির একমত ছিলেন না। তারা তাদের সমর্থকদের নিয়ে দিল্লি থেকে বেরিয়ে যান, সৈন্য সমাবেশ করেন এবং ইলতুৎমিশের সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন। দিল্লির কাছে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাদের প্রধান দুই নেতা আক সুনকুর এবং ফররুখ শাহ নিহত হন। এভাবে বিদ্রোহীদের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীটি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়। [১]

লাহোরে ইয়ালদুজের শাসন:

আইবকের মৃত্যু এবং তার পরপরই তার উত্তরসূরি আরাম শাহের ইন্তেকালের ফলে লাহোরের শাসন ক্ষমতা শূন্য হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মরহুম সুলতানের একজন জ্যেষ্ঠ মামলুক তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ, যিনি গজনীর সিংহাসন দখল করেছিলেন, লাহোরের দিকে অগ্রসর হন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তা দখল করে নেন। একই সাথে তিনি ইলতুৎমিশকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে তাকে রাজকীয় ছত্র (চত্র-ই-শাহী) পাঠান এবং সাথে এই বার্তা দেন:
“তুমি হিন্দুস্তানে শাসন করতে থাকো। তোমার বাহিনীকে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত নিয়ে যাও এবং হিন্দুদের ওপর রাজত্ব করো। তবে লাহোর পর্যন্ত এলাকা আমার।”
ইলতুৎমিশ এটি গ্রহণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তার হাত ইয়ালদুজের সীমানা পদদলিত করে কলঙ্কিত হবে না। [২]

---

[১] (তবকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৪; তারিখে ফেরেশতা: ১, পৃষ্ঠা ২৩৩) বদায়ুনী এই যুদ্ধের বিবরণ এভাবে লিখেছেন যে, আরাম শাহের সমর্থক আমিরগণ তাকে লাহোর থেকে দিল্লিতে নিয়ে এসেছিলেন এবং এখানে ইলতুৎমিশের সাথে যুদ্ধটি তার নেতৃত্বেই লড়া হয়েছিল। (মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: ১, পৃষ্ঠা ৫৪) তবে প্রাচীন উৎসগুলো থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় না।

[২] ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১০৬, ১০৭

তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ গজনী থেকে বহিষ্কৃত:

কিন্তু ৬১২ হিজরিতে ইয়ালদুজ এক মহাবিপদে ফেঁসে যান। খাওয়ারিজমি শাসক আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ গজনীসহ ঘুরিদের কাছ থেকে সমস্ত শহর ছিনিয়ে নেন এবং ইয়ালদুজকে তার সৈন্যবাহিনীসহ গজনী থেকে পালিয়ে যেতে হয়। এভাবে গজনী চিরতরে ঘুরি সাম্রাজ্যের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। [১]

নাসিরুদ্দীন কাবাচার লাহোর দখল:

ইয়ালদুজের এই পরিস্থিতির সুযোগ নেন সুলতান ঘুরির প্রাচীন ও বিশিষ্ট মামলুক আমির নাসিরুদ্দীন কাবাচা (যিনি ৬০১ হিজরি থেকে মুলতান ও উচ-এর ওয়ালি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন)। [২]

তিনি আইবেকের মৃত্যুর পর ময়দান খালি দেখে উচ্চ সিন্ধুর কেন্দ্র "সিওয়ান" থেকে শুরু করে নিম্ন সিন্ধুর "দাবল" পর্যন্ত সমস্ত এলাকা পদানত করে এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এখন তিনি পাঞ্জাবে শাসন প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে বের হন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে লাহোর, ভাতিন্ডা, কুহরাম ও সরস্বতী (সারসা) দখল করে নেন এবং বড় বাদশাহদের মতো রাজকীয় ছত্র (দু-চতর) ধারণ করেন। [৩]

ইয়ালদুজের লাহোর দখল, ইলতুতমিশের সাথে যুদ্ধ ও পরিণতি:

ইয়ালদুজ গজনীতে পরাজিত হওয়ার পর "সাং-ই-সুরাখ" পথ দিয়ে ফিরে আসেন এবং ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন এবং লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখানে কাবাচার বাহিনীকে পরাজিত করে তিনি লাহোর দখল করেন। [৪]

এই সাফল্যের পর প্রায় পুরো পাঞ্জাব তার অধীনে চলে আসে এবং তিনি দিল্লি পর্যন্ত এলাকাগুলো জয় করে হিন্দুস্তানের শাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ফলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পথের দুর্গপতিদের নিজের সাথে যুক্ত করে তিনি দিল্লির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এভাবে ইয়ালদুজ ইলতুতমিশের সাথে করা সেই চুক্তি থেকে বিচ্যুত হন যাতে তিনি নিজেই লাহোরকে নিজের সীমান্ত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। ফলে এখন ইলতুতমিশও যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। উভয় বাহিনী অগ্রসর হতে হতে "তরাইন"-এ মুখোমুখি হয়। এটি ৬১৩ হিজরির ঘটনা। [৫]

যুদ্ধের আগে ইয়ালদুজ ইলতুতমিশকে বার্তা পাঠান: "তুমি মনে করো যে হিন্দুস্তানের বাদশাহি তোমার হাতে আছে, তবে তুমিই এর যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এই বাদশাহির অধিক যোগ্য আমি, কারণ আমি বাদশাহ (শাহাবুদ্দীন ঘুরি)-এর সন্তানের..."

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন, পৃ. ১০৭; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি, খণ্ড ৭, পৃ. ৭৫৭

[২] তিনি কুতুবউদ্দীন আইবেকের জামাতাও ছিলেন, কারণ তার দুই কন্যা একের পর এক তার বিবাহবন্ধনে এসেছিলেন। (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪১৯)

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪১৯

[৪] ফুতুহুস সালাতিন, পৃ. ১০৭; তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪১৯

[৫] তরাইন (তরাউড়ি) দিল্লি থেকে "১৫২" কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানার একটি ঐতিহাসিক শহর যেখানে পৃথ্বীরাজ ও শাহাবুদ্দীন ঘুরির মধ্যে দুটি যুদ্ধ হয়েছিল।

জায়গায় আছি। তুমি তো সেই বাদশাহর গোলামদের গোলাম। জানা আছে তো যে, কুতুবুদ্দিন আইবেক বিদ্রোহ করেছিল এবং অসতর্ক অবস্থায় আমার কাছ থেকে গজনী ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ই পরাজিত হয়েছিল এবং সময়ের আবর্তনে তার যে পরিণতি হয়েছিল, তা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক, তাই আমার সাথে যুদ্ধ করা তোমার শোভা পায় না।“

ইলতুতমিশ তাকে জবাব দিলেন: “হে নামী বাদশাহ! আজ বাদশাহি তারই, যার শক্তি বেশি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাদশাহির যুগ শেষ হয়ে গেছে। যদি গজনী ও ঘোরে শক্তির মুদ্রা চলে এবং সেখান থেকে তোমার শাসন চলে গিয়ে থাকে, তবে এখানেও তলোয়ারই ফয়সালা করবে। দাবি এবং আস্ফালনে কিছুই হবে না। আমি তোমার সাথে যুদ্ধ শুরু করিনি বরং আক্রমণ তুমিই করেছ এবং নিজের সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ যার ভিত্তিতে তুমি আমাকে রাজকীয় ছত্র (চতর-ই শাহী) দিয়েছিলে। এখন যদি তুমি خوارزمিদের কাছে পরাজিত হয়ে থাকো, তবে সেই কারণে আমার ওপর চড়াও হয়েছ। যদি শান্তি ও নিরাপত্তা উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি সন্ধির জন্য প্রস্তুত। তুমি লাহোরে ফিরে যাও আর আমি দিল্লিতে চলে যাই।”

ইয়ালদুজ এই জবাব শুনে রাগান্বিত হলেন এবং আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। মোদ্দাকথা, এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো যাতে শেষ পর্যন্ত ইলতুতমিশের জানবাজদের পাল্লা ভারী রইল এবং তাদের একের পর এক আক্রমণে ইয়ালদুজের সৈন্যদের পা উপড়ে গেল এবং পুরো বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ইয়ালদুজ পালিয়ে হানসি পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যে দিল্লির অশ্বারোহীরা তাড়া করে মাথার ওপর পৌঁছে গেল। ইয়ালদুজ নামাজের নিয়ত বাঁধলেন যে এখন শেষ সময়। সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার করল এবং ইলতুতমিশের কাছে নিয়ে গেল। [১]

তাকে বদায়ুন পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং সেখানেই হত্যা করে দাফন করা হলো। তার মাজারও সেখানেই। [২]

মোদ্দাকথা, তরাইনের যুদ্ধ থেকে ইলতুতমিশ দ্বিগুণ সুবিধা লাভ করলেন। তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী চিরতরে রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং এখন দিল্লি সালতানাতের জন্য পাঞ্জাব বিজয়ের পথ সুগম হলো।

নাসিরুদ্দিন কুবাচার লাহোর দখল - ইলতুতমিশের সাথে যুদ্ধসমূহ:

ওদিকে নাসিরুদ্দিন কুবাচা ইয়ালদুজের এই পরিণতির পর সুযোগ পেয়ে গেলেন, ফলে তিনি সহজেই লাহোর দখল করে নিলেন। এরপর ইলতুতমিশ ও কুবাচার মধ্যে সীমান্ত বিরোধ, বিশেষ করে লাহোরের ওপর দাবির কারণে উত্তেজনা ও টানাপোড়েন চলতে থাকে। এতে ইলতুতমিশের পাল্লা ভারী ছিল এবং খুব শীঘ্রই তিনি কুবাচার কাছ থেকে কুহরাম ও ভাতিন্ডা ছিনিয়ে নেন। [৩]

কিছুদিনের জন্য শান্তি বজায় ছিল কারণ ইলতুতমিশ লাহোর দখলের জন্য তাড়াহুড়ো করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করল এবং ৬১৩ হিজরিতে উভয়ের মধ্যে চেনাব নদীর তীরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হলো যাতে কুবাচা দিল্লির বাহিনীর মোকাবিলায় চরম পরাজয় বরণ করেন। [৪]

তবে কুবাচার দাপট তখনও শেষ হয়নি। এই দিনগুলোতে তিনি সেই খলজি আমিরদের শক্তিকে চূর্ণ করে দিয়েছিলেন যারা সিন্ধুর বিভিন্ন এলাকা দখলের চেষ্টা করছিল। এই লোকেরা পরাজিত হয়ে ইলতুতমিশের কাছে চলে আসে এবং সাহায্যের আবেদন করে। ফলে

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ১০৮ থেকে ১১২

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৩

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ৩৩৪, ৩৪৫

[৪] তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৩২, ২৩৩

ইলতুৎমিশ ৬১৫ হিজরিতে কুবাচাকে আরও একবার পাঞ্জাবে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। [১]

এইবার সুলতান কুবাচার কাছ থেকে লাহোর ছিনিয়ে নেন এবং এর শাসনভার নিজের পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে অর্পণ করে ফিরে আসেন। [২]

এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে ইলতুৎমিশ অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে দিল্লির শাসনকে সুসংহত করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়: মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ

হতে পারত যে সুলতান ইলতুৎমিশ কুবাচার কাছ থেকে মুলতান ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করতেন, কিন্তু ৬১৮ হিজরিতে মধ্য এশিয়া ও খোরাসানে চেঙ্গিস খানের আক্রমণ, তারপর খোয়ারিজম শাহ সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদের ক্রমাগত পরাজয় এবং তার পরে গজনী ও কাবুল পর্যন্ত মঙ্গোলদের আক্রমণের ফলে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক দৃশ্যপট এবং সেই সাথে হিন্দুস্তানের শাহী অগ্রাধিকারগুলো বদলে যায়।

৬১৮ হিজরি (১২২১ খ্রিষ্টাব্দ) সালে হিন্দুস্তানের ভূখণ্ডের জন্য পরীক্ষার মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয় যখন মঙ্গোল বিজেতা চেঙ্গিস খানের বাহিনী সুলতান জালালুদ্দিন খোয়ারিজম শাহকে তাড়া করতে করতে সিন্ধু নদ পার হয়ে আসে [৩] এবং ইলতুৎমিশের পূর্ণ মনোযোগ এই বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ হয় যে কীভাবে হিন্দুস্তানকে এই আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়।

সুলতান ইলতুৎমিশের প্রতি সুলতান জালালুদ্দিনের বার্তা:

সুলতান জালালুদ্দিন দিল্লির কাছাকাছি পৌঁছে নিজের দূতদের মাধ্যমে সুলতান ইলতুৎমিশের কাছে তাতারদের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান। সুলতান ইলতুৎমিশ অত্যন্ত সতর্ক কৌশল ও গভীর দূরদর্শিতার সাথে এই সমস্যার সমাধান করেন। কারণ খোয়ারিজমীয়দের সরাসরি সাহায্য করা মানে ছিল চেঙ্গিস খানকে শক্তি পরীক্ষার আমন্ত্রণ জানানো এবং দিল্লির ইসলামী সালতানাত এর ভার সহ্য করার মতো অবস্থায় ছিল না। তাই ইলতুৎমিশ সুলতান জালালুদ্দিন খোয়ারিজম শাহের দূতদের মাধ্যমে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এই বার্তা পাঠান:

“উত্তম হবে যে আপনি অন্য কোনো অঞ্চলকে আপনার কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বানান, কিন্তু আপনি যদি এখানেই থাকতে পছন্দ করেন তবে এই দেশের অ-বিজিত অঞ্চলগুলোর মধ্য থেকে যে এলাকাগুলো আপনি নিজের শক্তিতে বিদ্রোহী ও ফিতনাবাজদের হাত থেকে মুক্ত করবেন, আমরা সেগুলোতে আপনার শাসন মেনে নেব।”

এভাবে ইলতুৎমিশ নিজেকে নিরপেক্ষ রেখে খোয়ারিজমী সুলতানকে সুযোগ করে দেন যাতে তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে তাতারদের গতিরোধ করেন। এভাবে দিল্লির শাসন চেঙ্গিস খানের সাথে শত্রুতা থেকে বেঁচে যায়। তাতার বাহিনী সরগোদা ও মুলতান পর্যন্ত লুটতরাজ করে ফিরে যায় এবং দিল্লি তাদের ভয়াবহ আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৩।

[২] বিস্তারিত জানার জন্য ‘তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা’র চতুর্থ খণ্ড দেখুন।

[৩] তাজুল মাসির, হাসান নিজামী, পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৬।

[৪] সীরাত-ই-জালালুদ্দিন মানকবর্নি, পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৭৫।

সুলতান ইলতুতমিশের কৌশলের তিনটি দিক:

সুলতান ইলতুতমিশ সুলতান জালালুদ্দিনকে প্রত্যক্ষ সাহায্য করা থেকে বিরত থেকে এবং পরোক্ষ সহযোগিতা করে একজন সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিবিদের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই নীতির তিনটি দিক ছিল:

- (১) ইলতুতমিশ তাঁর সূক্ষ্ম রাজনীতির মাধ্যমে একদিকে মঙ্গোলদের ভারতে এবং বিশেষ করে নিজের এলাকায় প্রবেশের কোনো অজুহাত দেননি। এর ফলে চেঙ্গিস খানের আক্রমণের সরাসরি লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল সেই এলাকাগুলো যা নাসিরুদ্দিন কাবাচার শাসনাধীন ছিল।

- (২) এভাবে ইলতুতমিশ মঙ্গোলদের তাঁর এক প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, যে তাদের যথেষ্ট ক্লান্ত করে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। কাবাচা নিজেও একজন বড় মাপের জেনারেল ছিলেন, তাই তিনি আক্রমণ প্রতিহত ও মোকাবিলা করতে থাকেন। ফলে যখন ৬২২ হিজরিতে চেঙ্গিস খানের পুত্র চাগাতাই খান মুলতান অবরোধ করেন, তখন কাবাচা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিরক্ষা করেন। অবশেষে চল্লিশ দিন পর মঙ্গোলদের অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যেতে হয় [১]।

- (৩) এই নীতির মাধ্যমে ইলতুতমিশ জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহকে পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সরকার গঠনের অনুমতি দিয়ে নাসিরুদ্দিন কাবাচাকে দুর্বল করার পথ সুগম করেন।

জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ ও কাবাচার দ্বন্দ্ব:

সুলতান জালালুদ্দিন খুব দ্রুত সিন্ধু উপকূল থেকে কোহিস্তান-ই-নামাক পর্যন্ত নিজের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এরপর নাসিরুদ্দিন কাবাচার এলাকার দিকে অগ্রসর হন। মঙ্গোল আক্রমণের সময় কাবাচা পুনরায় লাহোরকে নিজের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেখানে তাঁর পুত্রকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। সুলতান জালালুদ্দিন লাহোর আক্রমণ করে কাবাচার পুত্রকে বশীভূত করেন। এছাড়া উচ-এর ময়দানে কাবাচার বাহিনীকে পরাজিত করেন, যার ফলে কাবাচাকে পিছু হটে মুলতানে যেতে হয়। খাওয়ারিজমি সুলতান এরপর সেহওয়ান ও দেবল পর্যন্ত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর বাহিনী গুজরাটের রাজধানী 'আনহিলওয়ারা' পর্যন্ত আক্রমণ করতে শুরু করে [২]।

সুলতান ইলতুতমিশ ও সুলতান জালালুদ্দিনের মধ্যে উত্তেজনা ও সন্ধি:

মঙ্গোলদের তাৎক্ষণিক বিপদ এখন কেটে গিয়েছিল এবং নাসিরুদ্দিন কাবাচার শাসনও মুলতান, ভাক্কার এবং সিন্ধুর কিছু উপকূলীয় দুর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে সুলতান ইলতুতমিশ এটাই সমীচীন মনে করলেন যে, খাওয়ারিজমি সুলতানকে আর শক্তিশালী হতে দেওয়া যাবে না, বরং তাঁকে তাঁর পৈতৃক এলাকায় ফিরে যেতে বাধ্য করতে হবে। ফলে সুলতান ইলতুতমিশ এক লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং তিনশ হাতি নিয়ে খাওয়ারিজমি সুলতানের পিছু পিছু সিন্ধুতে পৌঁছে যান।

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৯, ৪২০।

[২] জাহান কুশা জুওয়াইনি: পৃষ্ঠা ১৩৬, ১৩৭; রওজাতুস সাফা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮২৮; তারিখ ইবনে খালদুন: পৃষ্ঠা ১৬২, ১৪, ১৩।

https://t.me/BoierSomahar

এবং ‘খাসার’-এ উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো। [১]

উভয় বাহিনীর মধ্যে একটি সংঘর্ষ হলো, তবে সাধারণ যুদ্ধের উপক্রম হওয়ার আগেই সুলতান ইলতুতমিশ পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সুলতান জালালুদ্দিনকে সমঝোতার প্রস্তাব দেন এবং এই বার্তা পাঠান:

“আপনার কাছে এটি গোপন নয় যে, দ্বীনের শত্রু আমাদের মাথার ওপর এসে পৌঁছেছে। আপনি সুলতানুল মুসলিমীন এবং সুলতানের পুত্র। আমার জন্য এটি বৈধ নয় যে আমি আপনার বিরুদ্ধে কারো সহায়ক হই, আর আমার মতো কোনো ব্যক্তির জন্য এটি শোভনীয় নয় যে আপনার মতো কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করি, যদি না আত্মরক্ষার বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সন্ধি করে নেওয়া উচিত। আপনি যদি পছন্দ করেন তবে আমি আমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব আপনার কাছে পেশ করছি যাতে উত্তেজনা দূর হয় এবং আমার ও আপনার মধ্যে আস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়।”

সুলতান জালালুদ্দিন এটি গ্রহণ করে নিলেন এবং এভাবে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। [২]

এই ঘটনা থেকে ইলতুতমিশের দূরদর্শিতা, ইসলামী চেতনা, রাজনৈতিক দক্ষতা এবং উদারতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিছু দিন পর খওয়ারিজমি সুলতান অধিকৃত পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে ৬২১ হিজরিতে ফিরে যান। কয়েক বছর পর যখন খওয়ারিজমি সুলতানের সালতানাত ধ্বংস হয়ে গেল, তখন ইলতুতমিশের আদেশে তাঁর আমিরগণ পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে জালালুদ্দিন খওয়ারিজম শাহের প্রতিনিধিদের বহিষ্কার করেন এবং এই এলাকাগুলো পুনরায় দিল্লি সালতানাতের অধীনে চলে আসে। [৩]

তৃতীয় যুগ: সম্প্রসারণ ও বিজয়

তাতারিদের প্রত্যাবর্তনের পর সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের শাসনের তৃতীয় যুগ শুরু হয়, যাতে পূর্ব ও মধ্য ভারতে সম্প্রসারণের জন্য অভিযান শুরু করা হয়েছিল এবং বিজয় সর্বত্র সৌভাগ্যবান সুলতানের পদচুম্বন করতে থাকে।

বাংলা ও বিহারের পরিস্থিতি:

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরির পর পূর্বদিকের প্রদেশগুলো অর্থাৎ বাংলা ও বিহারের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছিল। সেখানকার বিজেতা ও শাসক মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজিকে ৬০২ হিজরিতে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যাকারী সরদার আলী মর্দান তাঁর সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন এবং কুতুবুদ্দিন আইবেকও সাময়িক কৌশলের খাতিরে তাঁকে শাসনের সনদ দিয়েছিলেন। [৪]

আলী মর্দান কুতুবুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর ৬০৭ হিজরিতে বাদশাহি ঘোষণা করেন এবং নিজের উপাধি ‘সুলতান’...

---

[১] খাসারকে বর্তমানে খিনসর বলা হয়, এটি থরপারকার জেলায় উমরকোটের পূর্বে অবস্থিত।

[২] সিরাতে জালালুদ্দিন পৃ. ১৬৮; নিহায়াতুল আরাব খণ্ড ২৭ পৃ. ৩৬৭; ইবনে খালদুন, খণ্ড ৫ পৃ. ১১৯।

[৩] সিরাতে জালালুদ্দিন লিল মানসাবি পৃ. ১৭, ৩৪৬।

[৪] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৩৩৫, ৩৩৬।

‘আলাউদ্দিন’ নাম ধারণ করল। সে খলজি আমিরদের থেকে বিপদের আশঙ্কা করত, তাই তাদের অনেক আমিরকে হত্যা করাল এবং জুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করল। তার জুলুম ও অত্যাচারে মানুষ শীঘ্রই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। অবশেষে দুই বছর পর ৬০৯ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের এক বিশ্বস্ত সঙ্গী হুসামুদ্দিন ইওয়াজ খলজি বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করেন এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন খলজি নামে নিজে সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করতে থাকেন। তার কেন্দ্র ছিল ‘লখনৌতি’। [১]

কাজী মিনহাজের মতে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, দানশীল এবং প্রজাবৎসল শাসক। তিনি এখানে প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। লখনৌতি, লখনৌর এবং দেবকোটের মাঝে নদী ও জলপথের কারণে যাতায়াত কঠিন ছিল, বিশেষ করে বর্ষাকালে মানুষ কেবল নৌকায় যাতায়াত করতে পারত। এই নেককার শাসক স্থানে স্থানে সেতু নির্মাণ করে যাতায়াত অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। এই অঞ্চলে তার প্রতাপ ও মহিমা এতটাই ছিল যে, তিনি জাজনগর (উড়িষ্যা) এবং কামরূপ (আসাম)-এর রাজাদের থেকেও কর আদায় করতেন। [২]

সুলতান ইলতুতমিশের লখনৌতি (পশ্চিমবঙ্গ) দখল:

সুলতান ইলতুতমিশ গিয়াসউদ্দিন খলজিকে শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু তিনি পুরো উপমহাদেশকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাই ৬২২ হিজরিতে (১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি বাংলার উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রথমে তিনি বিহারকে নিজের অধীনে আনেন এবং তারপর লখনৌতির দিকে অগ্রসর হন। গিয়াসউদ্দিন খলজি সেই সময় পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং ৩৮টি হাতি ও সাত লক্ষ মুদ্রা নজরানা হিসেবে পেশ করেন।

সুলতান ইলতুতমিশও অকারণে রক্তপাত চাইতেন না। তিনি এই নেককার শাসককে পছন্দ করতেন, বিশেষ করে যখন তিনি লখনৌতিতে তার নির্মাণ কাজ, সেতু ইত্যাদি দেখলেন, তখন বলে উঠলেন:
“এমন জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনকারীর জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন উপাধি ধারণ করে রাখা শানদার ও মানানসই।”

যা-ই হোক, সুলতান তার বড় ছেলেকে সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ উপাধি দিয়ে বাংলার আনুষ্ঠানিক শাসক এবং গিয়াসউদ্দিন খলজিকে নায়েবে মামলুকাত নিযুক্ত করেন। ফেরার পথে বিহারে পৌঁছে মালিক আলাউদ্দিন জানিকে সেখানকার শাসনভার অর্পণ করেন এবং দিল্লিতে ফিরে আসেন।

গিয়াসউদ্দিন খলজি নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য ও ভদ্র শাসক ছিলেন কিন্তু সম্ভবত তার মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল। তিনি এই সুযোগে একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সুলতান ইলতুতমিশের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কিছুকাল পর বিদ্রোহ করলেন এবং বিহারও দখল করে নিলেন।

সুলতান ইলতুতমিশ প্রতিক্রিয়ায় কোনো তাড়াহুড়ো করেননি এবং (সম্ভবত তারই নির্দেশে) তার পুত্র শাহজাদা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ, যিনি অযোধ্যার জায়গিরদার ছিলেন, ধৈর্য ধারণ করেন। সম্ভবত গিয়াসউদ্দিন খলজি তাদের এই বিলম্বকে দুর্বলতা মনে করেছিলেন এবং ৬২৪ হিজরিতে তিনি সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে কামরূপ (আসাম) জয় করতে চলে যান।

মালিক আলাউদ্দিন জানি, যিনি বিহার থেকে পিছু হটেছিলেন, এই পরিস্থিতির খবর শাহজাদা নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে দেন এবং...

---

[১] লখনৌতি বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তে একটি স্থান যাকে এখন “গৌড়” বলা হয়। দিল্লি থেকে এর দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার।

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৬।

অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করলেন। ফলে শাহজাদা ৬২৪ হিজরিতে গিয়াসউদ্দিন খলজির সাথে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। সেই সময় লখনৌতি সৈন্যশূন্য ছিল, তাই শাহজাদা সহজেই সেখানে দখল করে নিলেন।

এদিকে গিয়াসউদ্দিন খলজি এই আক্রমণের খবর শুনে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ফিরে আসলেন এবং শাহজাদার মুখোমুখি হলেন। তবে তার সময় শেষ হয়ে এসেছিল, ফলে তিনি পরাজিত হয়ে নিজের অনেক আমিরসহ গ্রেফতার হলেন এবং বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হলো।

শাহজাদা নাসিরউদ্দিন এই বিজয়ে অর্জিত সম্পদের একটি বড় অংশ দিল্লিতে পাঠালেন যা দিল্লির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হলো। সংক্ষেপে, বিহার প্রদেশটি পুরোপুরিভাবে দিল্লি সালতানাতের অনুগত হয়ে গেল। [১]

রণথম্বোর বিজয়:

৬২৩ হিজরিতে (১২২৬ খ্রি.) সুলতান "রণথম্বোর" আক্রমণ করেন। এই দুর্গটি অপরাজেয় বলে গণ্য হতো। বলা হতো যে, এর আগে সত্তরজন রাজা এটি অবরোধ করেছিলেন কিন্তু কেউ এটি জয় করতে পারেননি। ইলতুতমিশ কয়েক মাসের মধ্যে এই অপরাজেয় দুর্গটি পদানত করেন। [২]

কোহে শিবালিক অভিযান:

৬২৪ হিজরিতে (১২২৭ খ্রি.) সুলতান কোহে শিবালিকের জেলাগুলোর দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠান যারা সেখানে "মান্দোর" দুর্গসহ একটি বিশাল এলাকা জয় করে নেয়। [৩]

নাসিরউদ্দিন কাবাচার সাথে চূড়ান্ত লড়াই। পাঞ্জাব বিজয়:

সেই সময়ে কাবাচার প্রতাপ ও মহিমা তুঙ্গে ছিল। গজনী ও ঘোরের ওপর মঙ্গোলদের আক্রমণের কারণে হিন্দুস্তানে আসা অনেক আমির কাবাচার কাছে চলে এসেছিলেন। কাবাচা সহযোগিতা, আতিথেয়তা এবং সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যমে তাদেরকে নিজের অনুগত করে নিয়েছিলেন। ৬২১ হিজরিতে মুলতানের ওপর মঙ্গোলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে তিনি আরও খ্যাতি অর্জন করেন এবং পরবর্তী দেড় বছরের মধ্যে আরও অনেক ঘুরি তার দরবারের সাথে যুক্ত হন।

৬২৪ হিজরিতে কাবাচা নতুন বিজয় অর্জন করেন। তিনি খাওয়ারিজমের খলজিদের সেই বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেন যারা হঠাৎ সিউস্তান (সিহওয়ান) এবং মানসুরা দখল করে নিয়েছিল। কাবাচা তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং তাদের সরদার মালিক খান খলজি নিহত হন। [৪]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৫, ৪৪৬; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪ থেকে ৪৭; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩৫, ২৩৬।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৫, ৪৩৬; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩৫; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭; তারিখে হিন্দুস্তান: পৃষ্ঠা ৩৬৮, ৩৬৯।

[৩] তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩৫; তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৬।

মান্দোর রাজস্থানের যোধপুর শহরের উত্তরে ৯ কিলোমিটার দূরে একটি শহরতলী এলাকা যা তার ঐতিহাসিক বাগান এবং স্মৃতিস্তম্ভের জন্য বিখ্যাত। যদিও এটি সরাসরি কোহে শিবালিকে অবস্থিত নয়, তবে উত্তর রাজস্থানের কিছু অংশ শিবালিকের পাদদেশ এবং এর সাথে যুক্ত ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। এটি রাজপুত শাসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এর এই নামটি এখনও বজায় আছে।

[৪] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪১৯, ৪২০।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

কুবাজার শক্তির কারণে পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর বিশাল এলাকা দিল্লি সালতানাতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। ইলতুতমিশ দীর্ঘকাল ধরে এটি জয় করতে চাচ্ছিলেন। এখন সেই সময় এসে গিয়েছিল, তাই সুলতান ইলতুতমিশ কুবাজার সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে বের হলেন এবং ভাতিন্ডা হয়ে কুবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর "উচ"-এর দিকে অগ্রসর হলেন। একই সাথে তিনি লাহোরের শাসক নাসিরুদ্দিন আইতমারকে মুলতান দখলের নির্দেশ দিলেন। ওদিকে কুবাজা "মরোত" [১] নামক স্থানে নদীর তীরে তাবু গেড়েছিলেন।

তাঁর নৌযুদ্ধের বিশাল অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাঁর কাছে নৌকার একটি শক্তিশালী বহর ছিল। এরই মধ্যে তিনি খবর পেলেন যে ইলতুতমিশের দ্বিতীয় বাহিনী লাহোরের ওয়ালি নাসিরুদ্দিন আইতমারের নেতৃত্বে মুলতান দখলের জন্য পৌঁছে গেছে। কুবাজা এই দ্বিমুখী আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারলেন না এবং পিছু হটে নৌকার মাধ্যমে "ভাক্কার" [২]-এর দুর্গে আশ্রয় নিতে চলে গেলেন, যা সিন্ধু নদের একটি দ্বীপের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত নিরাপদ ছিল। যাওয়ার সময় কুবাজা তাঁর উজির আইনুল মুলককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন উচ-এর দুর্গে সংরক্ষিত তাঁর ধনভাণ্ডার নিয়ে ভাক্কারে চলে আসেন। তবে আইনুল মুলক এই নির্দেশ পালন করতে পারেননি কারণ এর আগেই ১লা রবিউল আউয়াল ৬২৫ হিজরিতে সুলতান ইলতুতমিশ উচ অবরোধ করেছিলেন। একই সাথে তিনি তাঁর উজির নিজামুল মুলক জুনাইদির নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি অংশকে কুবাজার পিছু পিছু "ভাক্কার"-এ পাঠিয়ে দেন।

সুলতান দুই মাস অবরোধের পর জমাদিউল আউয়াল ৬২৫ হিজরিতে উচ একটি চুক্তির মাধ্যমে জয় করেন এবং কুবাজার সমস্ত ধনভাণ্ডার তাঁর দখলে চলে আসে। কুবাজা ভাক্কারে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় অবরুদ্ধ ছিলেন এবং উজির নিজামুল মুলক জুনাইদি তাঁকে কঠোরভাবে ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি তাঁর ছেলে আলাউদ্দিন বাহরামকে সুলতানের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন যাতে সন্ধির আলোচনা করা যায়। কিন্তু বাহরাম ইলতুতমিশের কাছে পৌঁছানোর আগেই ওদিকে উজির "ভাক্কার" দুর্গ জয় করে নেন। কুবাজার দিন ফুরিয়ে এসেছিল। তাই তিনি নৌকায় চড়ে পালানোর চেষ্টা করেন এবং সিন্ধু নদে ডুবে মারা যান। [৩]

সিন্ধুর অন্তর্ভুক্তি:

সংক্ষেপে লাহোর ও মুলতানসহ পাঞ্জাবের সমস্ত এলাকা বিজিত হলো। ওদিকে সিন্ধুতে কুবাজার নায়েব মালিক সিনান উদ্দিন চানিসার, যিনি সেওয়ান থেকে দেবল পর্যন্ত এলাকার ওয়ালি ছিলেন, নিজে উপস্থিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এভাবে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সমস্ত এলাকা ইলতুতমিশের অধীনে চলে আসে। এই সময়েই মিনহাজ আল-সিরাজ গজনী থেকে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হন।

---

[১] মরোত বাহাওয়ালপুর রাজ্যের একটি শহর।

[২] এখানে ভাক্কার বলতে সেই প্রাচীন শহরকে বোঝানো হয়েছে যা সুক্কুরের কাছে সিন্ধু নদের দুটি শাখার মাঝখানে অবস্থিত।

[৩] (তবকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪২১, ৪২৭, ৪৩২, ৪৪৩; ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১১৩; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩৫) আসমির বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ছিল। ফেরেশতার বর্ণনা (নদীতে ডুবে যাওয়া বা ডুবে মরা) থেকেও এই অর্থই প্রকাশ পায়। তবে মিনহাজ আল-সিরাজ স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে কুবাজা নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করেছিলেন (নিজেকে সিন্ধু নদে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন)। (পৃষ্ঠা ৪২১) মালিক নাসিরুদ্দিন কুবাজা ভাক্কার দুর্গ থেকে নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করে ডুবে মরেন। (পৃষ্ঠা ৪২৭) মিনহাজের বক্তব্য অনুযায়ী কুবাজা মুলতান ও উচ-এ ২২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। (পৃষ্ঠা ৪২১) তাঁর মধ্যে অনেক ভালো গুণ ছিল যা মিনহাজ উল্লেখ করেছেন। যদি এই ঘটনা সত্য হয়, তবে একজন নামকরা শাসকের এভাবে আত্মহত্যা করা মুসলিম ইতিহাসের বিরল ও বেদনাদায়ক ঘটনাগুলোর মধ্যে গণ্য হবে। চরম হতাশা ও তীব্র মানসিক চাপ ছাড়া এমনটা করা সম্ভব নয়।

উপস্থিত হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। [১]

কনৌজ বিজয়:

কনৌজ যা গাহড়বাল রাজপুতদের কেন্দ্র ছিল এবং যা ঘুরিরা জয় করে দেখিয়েছিল, তা আবারও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ইলতুতমিশ তা পুনরায় জয় করেন। একইভাবে মান্ডু অঞ্চলটিও সুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে উপমহাদেশে ইসলামি সালতানাত আরও বিস্তৃত হয়। [২]

খিলাফতের দরবারে স্বীকৃতি:

ইলতুতমিশকে তাঁর যুগে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম বাদশাহ মনে করা হতো। ৬২৬ হিজরিতে আব্বাসীয় খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহ, যিনি তাতারীদের আক্রমণের আশঙ্কায় বাগদাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করছিলেন, ইলতুতমিশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং একটি প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে তাঁর কাছে একটি খিলাত প্রেরণ করেন, যার মধ্যে খিলাফতের আমামাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিল্লির সিংহাসনের জন্য এটি ছিল এক বড় সম্মানের বিষয়। ২২ রবিউল আউয়াল ৬২৬ হিজরিতে এই দূতগণ দিল্লিতে পৌঁছান। এই খুশির উপলক্ষে পুরো দিল্লিতে উৎসব পালন করা হয়। সুলতান ইলতুতমিশ খলিফার খিলাত পরিধান করেন এবং আব্বাসীয় খিলাফতের সেবা ও আনুগত্য করার অঙ্গীকার করেন। [৩]

উত্তরাধিকারীর মৃত্যু এবং বিহার অভিযান:

আগেই বলা হয়েছে যে, ইলতুতমিশের বড় ছেলে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ লখনৌতি (বাংলা ও বিহারের কেন্দ্র) এর সুবাদার ছিলেন। ইলতুতমিশ তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফতের দূতদের আগমনে উদযাপিত উৎসবের আনন্দ তখনও সতেজ ছিল, এমন সময় জমাদিউল আউয়াল ৬২৬ হিজরিতে (১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ) উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হয়, যা সুলতানকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। তিনি প্রয়াত পুত্রের স্মরণে একটি মাকবারা নির্মাণ করেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর বিহারে বিশৃঙ্খলাকারীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেখানে খিলজি সরদার ইখতিয়ার উদ্দিন বলকা বিদ্রোহ করেন। ফলে সুলতান ৬২৭ হিজরিতে (১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) নিজেই লখনৌতি (বাংলা ও বিহারের কেন্দ্র) অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন এবং বিজয় লাভ করেন। এখানে ইজ্জুল মুলক আলাউদ্দিন খানিকে শাসনভার অর্পণ করে সুলতান দিল্লির দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। [৪]

প্রাণঘাতী হামলা:

সুলতান ইলতুতমিশ জুমার সালাতের জন্য যাওয়ার সময় পাহারার প্রথা বন্ধ করে দেন এবং সাধারণ মুসলমানদের সাথে মিশে সালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলে সবার মন জয় করে নেন। সেই সময়ে হাসান বিন সাবাহর অনুসারীরা অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিল। একদিন জুমার সালাতের সময় তারা সুলতান ইলতুতমিশের ওপর আক্রমণ করে বসে। সৌভাগ্যবশত এই হামলা ব্যর্থ হয়। অনেক লোক [৫]

---

[১] ফুতুহ আল-সালাতিন: পৃ. ১১২; তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৪১, ৪৪৭।

[২] মিনহাজ আল-সিরাজ পৃ. ৪২০, ৪৪১-এ এই অভিযানকে ৬৩২ হিজরিতে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে পৃ. ৪৪৬-এ একে ৬২৫ হিজরির ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। দৃশ্যত এই দ্বিতীয় মতটিই সঠিক।

[৩] মুনতাখাব আল-তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃ. ৪৪ থেকে ৪৭; তারিখ-ই হিন্দুস্তান: পৃ. ৩৬৮, ৩৬৯।

[৪] তারিখ-ই ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৩৬; তাবাকাত-ই নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ৫২১ থেকে ৫২৫। মুনতাখাব আল-তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃ. ৪৪ থেকে ৪৭।

[৫] মুনতাখাব আল-তাওয়ারিখ: পৃ. ৫৭; তারিখ-ই ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৩৬।

...আহত ও শহীদ হলেন কিন্তু সুলতানের কোনো ক্ষতি হয়নি। লোকেরা ঘরের ছাদ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে এবং তীর ছুড়ে সেই দুর্ভাগাদের অনেককে মেরে ফেলল। বাকি আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করা হলো এবং পরে শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হলো। [১]

গোয়ালিয়র অভিযান:

৬২৯ হিজরি (১২৩২ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান গোয়ালিয়র জয় করার প্রস্তুতি শুরু করেন, যা কিছুকাল আগে মুসলমানদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই দুর্গের প্রাচীরের উচ্চতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে এটি নিশ্চিত ছিল যে সুলতানের রাজধানী থেকে অনুপস্থিতি দীর্ঘ হবে, তাই সুলতান দিল্লিতে তাঁর কন্যা শাহজাদী রাজিয়াকে ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করলেন। [২]

এখানে বিখ্যাত হিন্দু রাজা বেল দেবের পুত্র রাজা মলগ দেব (মঙ্গল দেব) শাসক ছিলেন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত নামী-দামী বীর। তিনি এগারো মাস পর্যন্ত দুর্গে অবস্থান করে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। সুলতানও সাহস হারাননি এবং আবহাওয়ার কঠোরতার পরোয়া না করে অবরোধের তীব্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করেন। অবশেষে এক রাতে রাজা পালিয়ে যান এবং মুসলমানরা চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে ২৬ সফর ৬৩০ হিজরিতে এই অত্যন্ত সুদৃঢ় দুর্গটিও জয় করে নেয়। সুলতান এখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং ২ রবিউল আউয়াল এই ক্লান্তিকর অভিযান থেকে ফিরে আসেন। রশিদ উদ্দিনকে এখানকার কোতোয়াল এবং জিয়া উদ্দিন জুনায়েদীকে আমির-ই-দাদ (বিচার মন্ত্রী) নিযুক্ত করা হয়েছিল। [৩]

শাহজাদী রাজিয়ার উত্তরাধিকার ঘোষণা:

সুলতানের অনুপস্থিতিতে এগারো মাস পর্যন্ত শাহজাদী রাজিয়া এমন প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন যে আপন-পর সকলেই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত দোয়া বের হতে থাকে। সুলতান ফিরে এসে সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিবরণ শুনলেন এবং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করলেন যে তাঁর উত্তরাধিকারের যোগ্য এই মেয়েটিই।

যখন সুলতান দরবারে এই ঘোষণা দিলেন, তখন সালতানাতের আমিরগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। কিছু দরবারী সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনার পুত্ররা সালতানাত পরিচালনার যোগ্য এবং বয়সে এই শাহজাদীর চেয়ে বড়। তাদের উপস্থিতিতে শাহজাদীকে উত্তরাধিকারী বানানোর পেছনে কী রহস্য রয়েছে?”

সুলতান উত্তর দিলেন: “আমার পুত্ররা যৌবনের নেশায় মত্ত এবং ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন। তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে গুরুত্বের সাথে রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পাদন করে। তাদের কেউ এত বড় সালতানাতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবে না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা বুঝতে পারবে যে শাহজাদাদের মধ্যে কেউই উত্তরাধিকারের যোগ্য নয়।”

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ১২৪; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৩৯

[২] (তারিখ-ই-মিল্লাত: ৩, পৃ. ৪৬৬) এই ঘটনার মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

[৩] (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৩৮, ৪৩৯) তাবাকাত-ই-নাসিরির লেখক কাজী মিনহাজুস সিরাজ নিজে এই অবরোধে উপস্থিত ছিলেন এবং বিজয়ের পর গোয়ালিয়রের কাজী ও খতিব নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুলতান কেবল রাজকুমারীর উত্তরাধিকারের মৌখিক ঘোষণাই করেননি, বরং নিজের মীর মুন্সী তাজুল মুলক মাহমুদকে নির্দেশ দিয়ে উত্তরাধিকারের একটি বিধিবদ্ধ ঘোষণাপত্র তৈরি করিয়েছিলেন যাতে পরবর্তীতে কেউ এর বিরোধিতা করার সাহস না করে। [১]

মালওয়া বিজয় এবং মূর্তিমন্দির ধ্বংস:

৬৩১ হিজরিতে (১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান সেনাবাহিনী নিয়ে মালওয়া [২] প্রদেশের দিকে অগ্রসর হন এবং এখানকার গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ 'ভীলসান' [৩]-কে জয় করেন। এখানে তিন হাজার বছরের পুরনো একটি মন্দির ছিল যার ইমারতে প্রতিটি যুগে রাজ-মহারাজারা ক্রমাগত সংযোজন করে আসছিলেন। এর উচ্চতা ছিল ১৭৫ ফুট। [৪]

সুলতান এই মন্দিরটি ভেঙে ফেলেন। এরপর উজ্জয়িনীর [৫] ওপর আক্রমণ চালিয়ে সেটিও জয় করেন। উজ্জয়িনীতে 'মহাকাল দেব' নামে একটি চারশ বছরের পুরনো মন্দির ছিল। সুলতান এর ইট থেকে ইট আলাদা করে দেন এবং এর ভিত্তি পর্যন্ত উপড়ে ফেলেন। [৬] এখানে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের একটি মূর্তি ছিল যা ভেঙে ফেলা হয়। এখান থেকে সুলতান পিতলের কিছু মূর্তি এবং মহাকাল...

---

[১] (তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃষ্ঠা ২৫৮; তারিখ-ই ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩২) তাবাকাত-ই নাসিরির লেখক কাজী মিনহাজুস সিরাজ স্বয়ং ইলতুতমিশের দরবারের লোক এবং বিশ্বস্ত ছিলেন, তাই এই বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য ও বর্ণনাকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও কোনো সন্দেহ ছাড়াই এটি নকল করেছেন। ফিরিশতার বর্ণনা অনুযায়ী সুলতান এও বলেছিলেন যে, আমার ছেলেরা মদ্যপানে অভ্যস্ত: "পসরানে খুদ রা ব-শরব খোর ও ফিসক ও ফুজুর ও তামাশা মবনা ও হওয়াপরস্তি মুবতালা বিনম।"

[২] মালওয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। আজও এই অঞ্চলটি সাধারণভাবে মালওয়া নামেই পরিচিত, যদিও এটি এখন কোনো একটি রাজ্যের নাম নয় বরং একটি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে বোঝায় যা উত্তর ভারতের মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত এবং অত্যন্ত সবুজ ও উর্বর এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার এলাকা। এটি ভারতীয় রাজ্য মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম অংশ এবং রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ নিয়ে গঠিত। এর প্রধান কেন্দ্র ইন্দোর। এছাড়াও ভোপাল এবং উজ্জয়িনী এর বিখ্যাত শহর। এটি দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং দিল্লি থেকে এর কেন্দ্রীয় শহর যেমন ইন্দোর বা ভোপালের দূরত্ব প্রায় ৬০০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার। মালওয়া তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য পরিচিত, যেখানে অনেক শক্তিশালী সালতানাত শাসন করেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে মালওয়া আলাদা অঞ্চল এবং 'মারওয়াড়' আলাদা। কিছু মানুষ এই দুইটিকে এক মনে করে। 'মারওয়াড়' এর শাব্দিক অর্থ মরুভূমি এলাকা। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের রাজস্থান রাজ্যের একটি অঞ্চল, যার কিছু অংশ থর মরুভূমিতেও পড়ে। যোধপুর এর বিখ্যাত শহর। বাড়মের, জালোর, নাগৌর এবং পালি জেলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

[৩] ভীলসানের বর্তমান নাম "বিদিশা"। এটি ভারতীয় রাজ্য মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং বিদিশা জেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর। এটি প্রাচীন শহর বিদিশার কাছে অবস্থিত। দিল্লির দক্ষিণে এর দূরত্ব প্রায় ৬৮০ কিলোমিটার।

[৪] তাবাকাত-ই নাসিরিতে এর উচ্চতা "এক সদ ও পাঞ্জ গজ" (একশ পাঁচ গজ) উল্লেখ আছে। এক প্রাচীন গজ দেড় ফুটের হতো, সেই হিসেবে এই উচ্চতা ১৫৭ ফুট ৫ ইঞ্চি হয়।

[৫] উজ্জয়িনী প্রাচীনকালে অবন্তী বা উজ্জয়িনী নামেও পরিচিত ছিল। এটি মধ্য ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত এবং মালওয়া অঞ্চলে শিপ্রা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। দিল্লির দক্ষিণে এর দূরত্ব প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার।

[৬] এই মন্দিরটি ভাঙার কারণ ছিল এই যে, এই স্থানটি ব্যভিচারের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল এবং পূজারিরা সেখানে আসা কুমারী মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠনে অভ্যস্ত ছিল। খোদ হিন্দু রাজারা সুলতানের কাছে আবেদন করেছিলেন যেন এটি পুরোপুরি নির্মূল করে দেওয়া হয়। (তারিখ-ই মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৯৪-৭৯৫) সম্ভবত ভীলসানের মন্দির ভাঙার কারণও এটাই ছিল।

ফায়দা: মন্দির ভাঙার শরয়ি বিধান হলো এই যে, যদি কোনো এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয় তবে সেখানে কুফরি নিদর্শন এবং বাতিল আকিদার কেন্দ্রগুলো নির্মূল করে দেওয়া হবে যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর করেছিলেন। কিন্তু যদি কোনো এলাকা সন্ধির মাধ্যমে জয় করা হয় তবে সেখানে শর্ত অনুযায়ী...

...পাথরের টুকরোগুলো সাথে নিয়ে গেল যেগুলোকে জামে মসজিদের দরজার সামনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যাতে নামাজিরা আসা-যাওয়ার সময় সেগুলোকে পদদলিত করে। [১]

গোয়ালিয়র দখল এবং হাকেম নুসরাত উদ্দীন তাইসির কালিঞ্জর আক্রমণ:

কিছুকাল পর সুলতান উমারায়ে চেহেলগানের একজন যোগ্য অফিসার নুসরাত উদ্দীন তাইসিকে এখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। বায়ানাহ এবং সুলতান কোট, এছাড়া কনৌজ, মেহর এবং মাহাওন (মহাবন) ও তার অধীনে দিয়ে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তিনি যেন মধ্য ভারতের বিখ্যাত দুর্গ কালিঞ্জর এবং চান্দেরি জয় করেন। ফলে নুসরাত উদ্দীন তাইসি ৬৩১ হিজরিতে কালিঞ্জরের ওপর সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সেখানকার রাজার সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধের পর রাজা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান।

তাইসি তাকে ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিজন পথে পথপ্রদর্শনের জন্য একজন হিন্দু গাইডকে সাথে নেন। ছত্রিশ ঘণ্টা ধাওয়া করার পরও কিছু পাওয়া গেল না এবং অবশেষে মাঝরাতে গাইড স্বীকার করল যে সে পথ ভুলে গেছে। তাইসি তাকে হত্যা করে নিজেই পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব নিলেন। কিছুক্ষণ এগিয়ে যাওয়ার পর তিনি একটি টিলায় পৌঁছালেন যেখানে হাত-মুখ ধোয়ার জন্য কাদাটে পানি এবং পশুর প্রস্রাব ছড়িয়ে ছিল, যার অর্থ ছিল কোনো সৈন্যদল কিছুক্ষণ আগেই এখান দিয়ে অতিক্রম করেছে। সঙ্গীরা বলল: “আমরা শত্রুর কাছাকাছি, কোথাও বিপদে না পড়ে যাই।”

কিন্তু তাইসি আশ্বস্ত করে বললেন: “এগুলো সৈন্যদলের পেছনের অংশের চিহ্ন। যদি এগুলো অগ্রবর্তী বাহিনী বা মূল বাহিনীর চিহ্ন হতো তবে তাদের ওপর দিয়ে পেছনের অংশের অতিক্রম করার চিহ্ন অবশ্যই থাকত।”

মোটকথা তাইসি সঠিক অনুমান করেছিলেন যে তিনি সৈন্যদলের পেছনের অংশের কাছাকাছি আছেন যা রসদ সামগ্রীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে সৈন্যদল এগিয়ে গেল এবং সকালের সময় তারা গোয়ালিয়রের সৈন্যদলের পেছনের অংশে আক্রমণ করে তাদের তছনছ করে দিল এবং রাজার রাজকীয় ছত্রও লুটে নিল। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত ওই এলাকায় লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর এই সৈন্যদল প্রচুর ধন-সম্পদ ও হাজার হাজার গবাদি পশু নিয়ে ফিরে চলল। এমন সময় ‘আজাজ’ এর রাজা ‘জাহার’ এই গিরিপথটি অবরোধ করল যেখান দিয়ে এই সৈন্যদলের ফেরার কথা ছিল। ডানে-বামে অন্যান্য সম্ভাব্য পথগুলোও সে বন্ধ করে দিল।

হয়েছে, তাদের খেয়াল রাখা ওয়াজিব। যদি এলাকার মানুষ সন্ধির শর্তে এই নিশ্চয়তা নেয় যে তাদের উপাসনালয় এবং ধর্মীয় নিদর্শনগুলোর কোনো ক্ষতি করা হবে না, তবে তা রক্ষা করা আবশ্যক। যেমন সিরিয়া ও অন্যান্য বিজিত অঞ্চলে যে সন্ধি হয়েছিল সেখানে সাহাবায়ে কেরাম নাসারাদের গির্জাগুলো অক্ষত রেখেছিলেন।

আজকাল যেহেতু অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শক্তির সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে, এছাড়া তাদের সংবিধান ও দস্তাবেজ তৈরির সময় প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় নিদর্শন ও উপাসনালয়গুলোর সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তাই সেগুলো মেনে চলা আবশ্যক। এই আমল ইসলামের পরিপন্থী নয়। ভবিষ্যতে যদি কোনো দেশ বা শহর যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয় এবং স্থানীয় লোকদের সাথে কোনো চুক্তি ছাড়াই সেখানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে ফাতহ-ই-মক্কা বা মক্কা বিজয়ের মতো হুকুম হবে অর্থাৎ সেখানে মুসলিম শাসকের অনুমতি থাকবে যে তিনি যদি জনস্বার্থে মনে করেন তবে সেই শহর থেকে শিরক ও কুফরের নিদর্শনগুলো পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেন।

[১] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৯, ৩৩৮; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩৬, ২৩৭; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ৫৮।

সেই সময় তাইসির শরীর অসুস্থ ছিল। তাছাড়া ধন-সম্পদ ও গবাদি পশুতে বোঝাই সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলাও কোনো সহজ কাজ ছিল না। এমন অবস্থায় তিনি প্রতিপক্ষের বাহিনীকে পথ দখল করে থাকতে দেখলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সৈন্যবাহিনীর তিনটি অংশকে দূরে দূরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। গবাদি পশুর অংশ আলাদা, ধন-সম্পদ ও তাঁবুর কাফেলা আলাদা এবং যুদ্ধরত সৈনিকদের আলাদা করলেন। যাতে রাজা যদি গবাদি পশু লুট করে, তবে যুদ্ধরত সৈনিকরা ধন-সম্পদ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। যদি সে ধন-সম্পদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে তারা গবাদি পশু রক্ষা করে নিয়ে যেতে পারে এবং যদি সে সশস্ত্র সৈনিকদের সাথে লড়াই করে, তবে তলোয়ারের জবাব তলোয়ার দিয়ে দেওয়া হবে।

রাজা এই চালে পরাস্ত হলেন। যাই হোক, তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিলেন, যাতে তাইসি তাকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিলেন এবং সমস্ত গনিমতের মালসহ নিরাপদে গোয়ালিয়রে পৌঁছে গেলেন। [১]

সুলতান ইলতুতমিশের শেষ সফর ও ইন্তেকাল:

৬৩৩ হিজরিতে সুলতান মুলতান ও সিউস্তান (সিন্ধু)-এর দিকে এক দীর্ঘ অভিযানের জন্য কোমর বাঁধলেন। ক্রমাগত সফর সুলতানকে ক্লান্ত করে দিয়েছিল, ফলে সফর চলাকালীন তিনি এক রোগে আক্রান্ত হন যার কারণে সুলতানকে অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে দিল্লি ফিরে আসতে হয়। এখানে সব ধরনের চিকিৎসা ও বিশ্রাম সত্ত্বেও সুলতানের রোগ বাড়তে থাকে, এমনকি ২০ শাবান ৬৩৩ হিজরি (১২৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে এই মহান বাদশাহ ইন্তেকাল করেন। সুলতানের শাসনকাল ২৬ বছর দীর্ঘ ছিল। [২]

কবরের অন্ধকারে রয়েছে সেই সূর্যদের চমক
যাদের দরজায় আকাশ সিজদাবনত থাকত
এটাই কি সেই শাহেনশাহদের মহত্ত্বের পরিণতি
যাদের বিশ্ব শাসনের কৌশলে পতনও ভয় পেত
(ইকবাল)

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ১৭০ থেকে ১৭২

[২] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৯; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩৭; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ৫৮

দ্রষ্টব্য: একটি বর্ণনা অনুযায়ী সুলতানের ইন্তেকালের দেড় মাস আগে ৬ রজব ৬৩৩ হিজরিতে আজমিরে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেছিলেন। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী যা অধিক গ্রহণযোগ্য, হযরত খাজা সাহেবের ইন্তেকাল ৬২৭ হিজরিতে হয়েছিল।

দ্রষ্টব্য: এই যুগের অন্যান্য অধিকাংশ আজমি সুলতানদের মতো ইলতুতমিশের জন্মসালও কোথাও লিখিত পাওয়া যায়নি, তবে ধারণা করা হয় যে তিনি ৫৭০ হিজরি থেকে ৫৮০ হিজরির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর, এভাবে তার ইন্তেকাল প্রায় ৫৫-৫৬ বছর বয়সে হওয়া যুক্তিযুক্ত।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সুলতান ইলতুতমিশের শাসনকাল ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের সীরাত অনেক গুণাবলীতে সুশোভিত ছিল এবং তাঁর চরিত্র ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল ও ঈর্ষণীয়। নিচে সুলতানের শাসনকাল এবং সীরাত ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক পাঠকদের জন্য পেশ করা হলো:

নির্মাণ কাজ:

ইলতুতমিশের উন্নয়নমূলক কাজে অনেক আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর মনিব কুতুবুদ্দিন আইবেকের নির্মিত মসজিদ কুওয়াতুল ইসলামকে দক্ষিণ ও উত্তর দিকে আরও প্রশস্ত করেন এবং উভয় পাশে তিনটি করে নতুন দরজা স্থাপন করান।

আইবেকের কুতুব মিনারও তখন নির্মাণাধীন ছিল, এর সমাপ্তি ইলতুতমিশই করিয়েছিলেন। [১]

দিল্লির নাগরিকদের পানি সরবরাহের জন্য "হাওজে শামসী" নির্মাণ এই বাদশাহরই কীর্তি, যা পরবর্তীতে আলাউদ্দিন খিলজি এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক আরও উন্নত করেছিলেন। দুই মাইল দীর্ঘ এবং এক মাইল প্রশস্ত এই পুকুরটি লাল পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল যেখানে বৃষ্টির পানি জমা হতো। দিল্লির নাগরিকরা এখান থেকে পানি সংগ্রহ করত। হাওজের পশ্চিমে শহরের ঈদগাহ ছিল। এই স্থানটি একটি ভ্রমণস্থল এবং মিলনস্থলও ছিল। সৌন্দর্যের জন্য পাড়ে অনেকগুলো গম্বুজ তৈরি করা হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় মানুষের বসার জন্য পাকা চাতাল ছিল। পানির স্তর পর্যন্ত নামার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা ছিল। হাওজের মাঝখানেও একটি চাতাল তৈরি করা হয়েছিল যার ওপর খোদাই করা পাথরের গম্বুজ ছিল। মানুষ নৌকায় চড়ে সেই গম্বুজ পর্যন্ত যেত এবং আনন্দ উপভোগ করত। [২]

কালো ও লাল পতাকা:

ইলতুতমিশের আমলে দিল্লির বাহিনীর জন্য কালো ও লাল পতাকার প্রচলন শুরু হয়। লশকর বা বাহিনীর ডান দিকের অংশের জন্য কালো এবং বাম দিকের অংশের জন্য লাল পতাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তী কয়েকজন বাদশাহ পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। [৩]

রাজনীতি ও ন্যায়বিচারের ধরণ:

ইলতুতমিশের রাজনীতির ধরণ ছিল শুরা বা পরামর্শ ভিত্তিক। দরবারে একটি বিশাল মজলিসে শুরা ছিল যাতে চল্লিশজন উমারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

---

[১] আসারুস সানাদিদ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, পৃ. ৯১ থেকে ৯৩; তারিখে মিল্লাত: ৩, পৃ. ৪৬০ থেকে ৪৬৪।

[২] তারিখে ফেরেশতা: ১, পৃ. ২৩২; আসারুস সানাদিদ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, পৃ. ৯৯; রেহলা ইবনে বতুতা: ২, পৃ. ৩২৮; তারিখে মিল্লাত: ৩, পৃ. ৪৬৫। দিল্লির জন্য পানি সরবরাহের জন্য আজও এই পরিকল্পনাটি কার্যকর। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এটি মেরামত করে দিল্লিতে প্রচুর পানি সরবরাহ করা সম্ভব।

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: ১, পৃ. ৪৫০।

একে ‘উমরায়ে চেহেলগানা’ (চল্লিশ আমীর) বলা হতো।

ইলতুৎমিশের দরবারে নির্দেশ ছিল যে, সাধারণ মানুষ সাদা পোশাক পরিধান করবে এবং যার ওপর কোনো জুলুম হবে সে রঙিন পোশাক পরে আসবে যাতে বাদশাহ তাকে দেখামাত্রই ফরিয়াদ শুনতে পারেন। প্রাসাদের বাইরে একটি শিকল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা কেউ নাড়া দিলে ইলতুৎমিশের বিশ্রামাগারে রাখা ঘণ্টা বেজে উঠত। বাদশাহর পক্ষ থেকে সেই মুহূর্তেই ফরিয়াদ শোনা হতো, চাই তা রাতের শেষ প্রহরই হোক না কেন। হিন্দুস্তানের এই মহান বাদশাহর রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদত এবং প্রজাদের অবস্থা পরিদর্শনে অতিবাহিত হতো। তিনি খুব কম ঘুমাতেন এবং দ্রুত জাগ্রত হয়ে অজু করে জায়নামাজে বসে যেতেন। রাতে তিনি কম্বল পরিধান করে শহর টহল দিতেন। হাতে আশরাফীর (স্বর্ণমুদ্রা) একটি থলি থাকত। তিনি মসজিদ, খানকাহ এবং বাজারগুলোতে চক্কর দিতেন। মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের অবস্থা জেনে তাদের সাহায্য করতেন। সেই সাথে এই তাকিদও থাকত যে, এই সহযোগিতার কথা যেন কারো কাছে উল্লেখ না করা হয়। দিনের বেলা যখন তাঁর দরবারে অভাবী মানুষ আসত, তিনি তাদের সবাইকে কিছু না কিছু অবশ্যই দিতেন। তিনি সাধারণ মানুষকে কসম দিয়ে বলতেন যে, যখনই তারা অভাব বা কোনো জুলুমের সম্মুখীন হবে, তারা যেন তৎক্ষণাৎ এসে আদলের শিকল টানে যাতে তিনি ইনসাফ করতে পারেন। [১]

ওয়াজ ও নসিহতের মজলিস:

সুলতান ইলতুৎমিশের প্রাসাদে উলামা, সুফিয়া এবং ওয়ায়েজীনদের অনেক কদর ছিল। সুলতানের চেষ্টা ছিল যেন দরবারীদের মধ্যে দ্বীনি ফিকির, মারেফাতে ইলাহি, আখেরাতের ফিকির এবং আত্মশুদ্ধির গুণাবলি সৃষ্টি হয়। এজন্য প্রতি বছর নির্ধারিত দিনগুলোতে ওয়াজ ও নসিহতের মজলিস অনুষ্ঠিত হতো যাতে প্রখ্যাত উলামা, খতিব এবং আউলিয়াগণ ওয়াজ ও নসিহত করতেন। এর বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:

- রমজানে প্রতিদিন (২৯ বা ৩০টি মজলিস)
- জিলহজের প্রথম দশকে প্রতিদিন (১০টি মজলিস)
- মহররমের প্রথম দশকে প্রতিদিন (১০টি মজলিস)
- বছরের বাকি মাসগুলোতে প্রতি মাসে তিনবার (৭২টি মজলিস) [২]

কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী এবং সামা-এর মাসআলা:

ইলতুৎমিশের যুগে প্রখ্যাত আলেম ও সুফি বুজুর্গ কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী দিল্লি ও দিল্লিতে আগমন করেন। [৩] এবং ওয়াজ ও নসিহতের...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩১; নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৪৮

[৩] কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী ৫৩৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলেম, ফকিহ এবং সুফি ছিলেন। তাঁর পিতা আতাউল্লাহ মাহমুদ বুখারার শাহী খানদানের লোক ছিলেন। কাজী হামিদুদ্দিন বাগদাদে গিয়ে হযরত শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর হাতে বায়াত হন এবং খিলাফতের খিরকা লাভ করেন। এরপর হজে যান এবং তিন বছর হিজাজে অবস্থান করেন। এরপর হিন্দুস্তানে আসেন এবং নাগোর-এ কাজী নিযুক্ত হন। ৬৪৩ হিজরিতে দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন। (বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে আসবে)।

দ্রষ্টব্য: প্রসিদ্ধ আছে যে কাজী হামিদুদ্দিনের পিতা সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরীর যুগে দিল্লিতে আসেন এবং নাগোরের কাজী ছিলেন (কতদিন পর্যন্ত? তা কোথাও উল্লেখ নেই) এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। এরপর কাজী হামিদুদ্দিন এই পদে তিন বছর ছিলেন। (নুযহাতুল খাওয়াতির: পৃষ্ঠা ১২২)

সিলসিলা শুরু করলেন। কাজী সাহেব সুফিয়াদের সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের কাছে সামা পছন্দনীয় ছিল, তাই কাজী সাহেবের মজলিসে প্রতিদিন সামার মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। দিল্লির দুই প্রখ্যাত আলেম: মাওলানা ইমাদউদ্দীন এবং মাওলানা জালালউদ্দীন শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সামার মাহফিলের ওপর আপত্তি শুরু করলেন এবং সুলতান ইলতুতমিশকে চাপ দিলেন যেন তিনি সামার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সুলতান উভয় পক্ষকে বিতর্কের জন্য নিজের কাছে তলব করলেন। বিতর্ক শুরু হলে উভয় আলেম কাজী সাহেবকে প্রশ্ন করলেন: "সামা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম নাকি হালাল?"

কাজী সাহেব উত্তর দিলেন: "এটি আহলে হাল-এর জন্য হালাল এবং আহলে কাল-এর জন্য হারাম।"

একথা বলে কাজী সাহেব সুলতানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন:

"হুজুরের নিজের শৈশবের সেই ঘটনার কথা তো মনে থাকবে যখন আপনি গোলাম ছিলেন এবং আপনার মালিকের ঘরে সামার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মাহফিলে আপনি সারারাত হাতে মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই দরবেশদের কাছে আপনার এই খিদমত অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিল এবং সেই ফকিরদের এত দোয়া আপনি পেয়েছিলেন যে তাদের উসিলায় আল্লাহ আপনাকে বাদশাহীর মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন।"

এই ঘটনা শুনে সুলতানের কল্পনায় শৈশবের সেই রাত এবং তার সমস্ত স্মৃতি ভেসে উঠল, মন ভরে এল এবং চোখ ভিজে গেল। তিনি কাজী সাহেবের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা করলেন এবং কেবল সামার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আদেশই বাতিল করলেন না, বরং নিজেও এই ধরনের মাহফিলে অংশগ্রহণ শুরু করলেন। [১]

চিন্তা করলে দেখা যায় যে এটি কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না কারণ যে সময় কাজী হামিদউদ্দীন বাগদাদ গিয়েছিলেন, সেই সময় শামসউদ্দীন ইলতুতমিশ সেখানেই ছিলেন এবং এটি ছিল তাঁর শৈশব ও গোলামির সময়। (ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ১১৭, ১১৮)। শাহাবউদ্দীন ঘুরি ৫৯৯ হিজরিতে এবং ইলতুতমিশ ৬০৭ হিজরিতে বাদশাহী লাভ করেন। যদি শাহাবউদ্দীন ঘুরির সিংহাসন আরোহণের পর কাজী হামিদউদ্দীন বাগদাদ গিয়ে থাকেন, তবে সেই সময় ইলতুতমিশের সেখানে উপস্থিত থাকার প্রশ্নই ওঠে না কারণ তিনি তখন কুতুবউদ্দীন আইবেকের নায়েব এবং বারবকের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। এটিও মনে রাখা উচিত যে কাজী হামিদউদ্দীন ইলতুতমিশের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন কারণ তিনি খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর ওস্তাদ ছিলেন যিনি ইলতুতমিশের পীর ও মুরশিদ ছিলেন। সুতরাং কাজী হামিদউদ্দীনের বাগদাদ যাওয়া শাহাবউদ্দীন ঘুরির সিংহাসন আরোহণের অনেক আগের ঘটনা। সম্ভবত সেই সময় কাজী সাহেবের বয়স ছিল প্রায় তেইশ বছর এবং ইলতুতমিশের বয়স তেরো-চৌদ্দ বছর। এভাবে এটি ৫৯৩ হিজরির ঘটনা হওয়া উচিত। আল্লাহই ভালো জানেন।

[১] (তারিখ-এ-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৩৮, ২৩৯)

মলহুজাহ: হামদ, নাত এবং আউলিয়াদের শানে মানাকিব ভিত্তিক প্রেম ও ভালোবাসায় ভরপুর কবিতা শোনার মজলিসকে 'মেহফিল-এ-সামা' বা 'কাওয়ালি' বলা হতো যা অনেক সুফিয়া-এ-কেরামের কাছে প্রচলিত ছিল। সেই যুগে এর দুটি প্রকার ছিল: এক হলো যাতে কেবল সুর ও তালের সাথে কবিতা শোনানো হতো। এই ধরনের মজলিসের বৈধতার ব্যাপারে কোনো মতভেদ ছিল না। দ্বিতীয় প্রকারের সামার মাহফিল ছিল যাতে সুর ও তালের সাথে দফও ব্যবহার করা হতো। এই ধরনের মজলিস সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ আউলি এবং গায়র-আউলি-এর গণ্ডিতে ছিল। অর্থাৎ কিছু আলেম দফ ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন এবং কিছু শরয়ী অবকাশের ওপর আমল করে এর অনুমতি দিতেন। আর সেই সব সামার মাহফিল যাতে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও সংগীতের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় এবং কবিতার বিষয়বস্তুও শরয়ী সীমা লঙ্ঘন করে, সেগুলোর না-জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। শরীয়ত অনুসারী সুফিয়া এবং উলামা-এ-কেরাম এ বিষয়ে সর্বদা একমত যে সামার মাহফিলের কিছু শর্ত রয়েছে যা ছাড়া এই ধরনের মাহফিলে যাওয়া বা তাতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। সেই শর্তগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্ধলভি-র কিতাব 'তারিখ-এ-মাশায়েখ-এ-চিস্ত' (পৃ. ১৯৩ থেকে ২০৩) এ দেখে নিন। যেহেতু এখন সেই শর্তগুলো মোটেও পালন করা হয় না, তাই উলামা ও ফুকাহাগণ সামা বা কাওয়ালি থেকে বিরত থাকতে বলেন।

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার রহ.-এর জানাজার নামাজ এবং ইলতুতমিশের তাকওয়া:

৬৩৩ হিজরী সুলতান ইলতুতমিশের জীবনের শেষ বছর ছিল। এই দরবেশ স্বভাবের শাসক চিশতিয়া সিলসিলার শিরোমণি খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহ.-এর প্রতি বিশেষ ভক্তি রাখতেন এবং চিশতিয়া খানকাহে যাতায়াত তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাসের অংশ ছিল। ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরীতে খাজা কুতুবুদ্দিন উশি রহ. ইন্তেকাল করেন এবং শোক ও দুঃখের কারণে পুরো দিল্লিতে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। সুলতান নিজেও অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। এদিকে খাজা সাহেব ইন্তেকালের পূর্বে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমার জানাজার নামাজ সেই ব্যক্তি পড়াবে যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে:

- সারা জীবনে কখনো তাহাজ্জুদের নামাজ কাজা হয়নি।
- সারা জীবনে কখনো আসরের সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাও কাজা হয়নি।
- সারা জীবনে কখনো কোনো গায়রে মাহরামের সাথে সম্পর্ক রাখেনি।

যখন মানুষ জানাজার জন্য সমবেত হলো, তখন মরহুম খাজা সাহেবের ওসিয়তনামা পড়ে শোনানো হলো এবং উল্লিখিত গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তির খোঁজ শুরু হলো। কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হলো কিন্তু এমন কোনো ব্যক্তি সামনে আসছিল না যার মধ্যে এই তিনটি গুণই বিদ্যমান। অবশেষে ইলতুতমিশ চিৎকার করে বললেন: “আমি আমার রহস্য গোপন রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু খাজা চেয়েছিলেন যে এটি প্রকাশ হয়ে যাক। তাঁর হুকুম পালন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।” এই বলে তিনি জানাজার নামাজ পড়ালেন কারণ সুলতানের মধ্যে এই তিনটি গুণই বিদ্যমান ছিল। সেদিন মানুষ সুলতান ইলতুতমিশের ইবাদত, রিয়াজত এবং পরহেজগারির সঠিক ধারণা পেল। [১]

সন্তানাদি এবং উত্তরাধিকারী:

ইলতুতমিশের বড় ছেলের নাম ছিল নাসিরুদ্দিন মাহমুদ, যে তাঁর রাজত্বকালেই ৬২৬ হিজরী (১২২৯ খ্রি.) ইন্তেকাল করেছিল। দ্বিতীয় বড় ছেলে ছিল রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহ। তার মা ছিল অত্যন্ত চতুর তুর্কি দাসী “তুরকান খাতুন”। হারাম সারার সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে ছিল। যদিও একদিকে তিনি দানশীলতা ও মেহেরবানি প্রদর্শন করতেন এবং আলেম, তলোয়ারধারী ও অভাবীদের প্রচুর সাহায্য করতেন, কিন্তু অন্যদিকে তিনি সুলতানের অন্যান্য স্ত্রী এবং হারাম সারার অন্যান্য নারীদের কষ্ট দেওয়ার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। তুরকান খাতুনের অতিরিক্ত আদরের কারণে তাঁর ছেলে রুকনুদ্দিন খুব বিগড়ে গিয়েছিল, তবুও তুরকান খাতুন তাকেই সুলতানের উত্তরাধিকারী বানাতে চেয়েছিলেন।

সুলতান রুকনুদ্দিনকে পরীক্ষা করার জন্য ৬২৫ হিজরীতে বদায়ূনের ওয়ালী নিযুক্ত করেন এবং সবুজ ছাতা প্রদান করেন যা উচ্চ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। ৬৩০ হিজরীতে গোয়ালিয়র বিজয়ের পর সুলতান তাকে পদোন্নতি দিয়ে লাহোরের সুবাদার নিযুক্ত করেন, যার ভিত্তিতে কিছু লোক ধারণা করতে শুরু করে যে তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। [২] কিন্তু যেহেতু তিনি নেক চরিত্র, বীরত্ব এবং সাহসিকতার মতো গুণাবলী থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাই সুলতান তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা থেকে বিরত থাকেন।

---

[১] খাজিনাতুল আসফিয়া: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৫; সিয়ারুল আউলিয়া: পৃষ্ঠা ৫৪

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৫৫; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯, ৬০, ৭০

তৃতীয় ছেলেটি ছিল কুতুবউদ্দিন, যে ছিল শাহজাদী রাজিয়ার আপন ভাই। চতুর্থ ছেলে ছিল গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ, যে ছিল আউধের শাসক। [১]

পঞ্চম ছেলে মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহ নাবালক ছিল। [২]

এই ছেলেদের মধ্যে কেবল একজনই যোগ্য ছিল, যে ইন্তেকাল করেছিল। তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক শাহজাদার মধ্যে কুতুবউদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিনের শাসন পরিচালনার সামান্য যোগ্যতা ছিল, যেখানে রুকনউদ্দিন ছিল অযোগ্য এবং মুইজউদ্দিন ছিল নাবালক। এই কারণেই সুলতান বাধ্য হয়ে নিজের মেয়ে শাহজাদী রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

ছেলে নাকি নাতি:

এই ছেলেদের বাইরে সুলতানের আরও একজন ছেলে বিখ্যাত, যার নাম ছিল নাসিরউদ্দিন। তার জন্ম হয়েছিল ৬২৬ হিজরিতে এবং সুলতান তার মরহুম সন্তানের নামানুসারে তার নাম নাসিরউদ্দিন মাহমুদ রেখেছিলেন। [৩] সাধারণত ঐতিহাসিকগণ তাকে ছেলেই গণ্য করেছেন, কিন্তু ইসামী লিখেছেন যে, সে ছিল সুলতানের মরহুম সন্তান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের ছেলে, যে তার পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছিল। ইলতুতমিশ তার নাম তার মরহুম উত্তরাধিকারীর নামানুসারে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ রেখেছিলেন। [৪] সম্ভবত সুলতান এই ভেবে যে, এই নাতি তার মরহুম ছেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভবিষ্যতে এই দেশের অধিপতি হবে, তাকে ছেলেই বলতেন। এভাবেই সে তার ছেলে হিসেবেই পরিচিত হতে থাকে। তার সাথে তার এক ভাই জালালউদ্দিনও ছিল, যে সম্ভবত সৎ ভাই ছিল অর্থাৎ মরহুম নাসিরউদ্দিনের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত ছিল। [৫]

---

[১] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ৭৫, ৫৯, ৬০

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ২০২, ৪৭৪

[৩] পরবর্তীতে সে ভারতের বাদশাহ হয়েছিল। মিনহাজুস সিরাজের কিতাব তাবাকাত-ই-নাসিরি এই নাসিরউদ্দিন মাহমুদের নামেই নামকরণ করা হয়েছে।

[৪] ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৩৫

[৫] “জামে’ তারিখ-ই-হিন্দ”-এ এ বিষয়ে ভালো আলোচনা করা হয়েছে এবং যে সকল দলিল ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, তা থেকে আপাতদৃষ্টিতে এটাই সঠিক মনে হয় যে, নাসিরউদ্দিন মাহমুদ—যিনি পরবর্তীতে ভারতের বাদশাহ হয়েছিলেন—তিনি সুলতান ইলতুতমিশের নাতি ছিলেন। (দ্রষ্টব্য: জামে’ তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৩৬৪)

উমরায়ে চহেলগান

ইলতুৎমিশের অধিকাংশ আমিরই তুর্কি গোলাম ছিলেন যাদের তিনি মুক্ত করে সামরিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে চল্লিশ জন মুক্ত গোলাম উচ্চ রাজকীয় পদে আসীন হন এবং "উমরায়ে চহেলগান" নামে পরিচিত হন। ইলতুৎমিশের পর প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই আমিররাই হিন্দুস্তান ভূখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমিরদের পরিচয় নিচে দেওয়া হলো:

•

১. মালিক তাজউদ্দীন সঞ্জর কুজলুক খান: (মৃত্যু ৬২৯ হিজরি)

এই তুর্কি গোলাম সুলতানের বড় ছেলে নাসিরুদ্দীন মাহমুদের সাথে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত পদগুলো লাভ করেন: চাশনিগির, দারোগায়ে আস্তাবল। ৬২৫ হিজরিতে উচ-এর শাসক। ৬২৮ হিজরিতে মুলতানের ওয়ালি। এছাড়াও: কুহরামের ওয়ালি [১]। ওয়ালি-এ-ভাতিন্ডাও ছিলেন। ইলতুৎমিশের জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। [২]

•

২. কবীর খান আয়াজ: (মৃত্যু ৬৩৯ হিজরি)

রুমি বংশোদ্ভূত গোলাম ছিলেন। নিম্নোক্ত পদগুলো লাভ করেন: ৬২৫ হিজরিতে মুলতানের ওয়ালি। রাজিয়া সুলতানের আমলে লাহোরের ওয়ালি। পুনরায় মুলতানের ওয়ালি। রাজিয়া সুলতানের পর মুলতান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত স্বাধীন সরকার গঠন করেন যা কয়েক বছর স্থায়ী ছিল। [৩]

•

৩. মালিক নুসরাতউদ্দীন তাইসি: (মৃত্যু ৬৪২ হিজরি)

অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। ইলতুৎমিশ তাকে গোয়ালিয়রের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। ৬৩১ হিজরিতে তিনি কালঞ্জরের রাজাদের পরাজিত করে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা গনিমতের মাল হিসেবে সুলতানের দরবারে পাঠান। রাজিয়া সুলতানের আমলে অযোধ্যার সুবাদারি পান। রাজিয়া সুলতানকে সমর্থন করার কারণে বিরোধীদের হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। [৪]

---

[১] প্রাচীন ফারসি ইতিহাসে যে কুহরাম নামক এলাকার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা আজ গুগল ম্যাপে "ঘুরাম" নামে দেখা যায়। এটি সেই ঐতিহাসিক কুহরামেরই একটি পরিবর্তিত নাম। এটি বর্তমান ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পাতিয়ালা ও কাইথাল জেলার সীমানার কাছে অবস্থিত। দিল্লি থেকে এটি উত্তর দিকে ২২০ কিলোমিটার দূরে। এই এলাকাটি ঐতিহাসিকভাবে দিল্লি ও লাহোরের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বাণিজ্যিক পথে অবস্থিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি সেই কুহরাম যেখানে সুলতান মাহমুদ গজনভি এবং পরবর্তীতে শিহাবুদ্দীন ঘুরির বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল এবং যেখান থেকে তারা ভারতে তাদের অভিযান পরিচালনা করেছিল।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৩

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪ থেকে ৫৬

[৪] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০ থেকে ১৩

ইজ্জুদ্দিন তুগান খান তুগরিল: (মৃত্যু ৬৪৪ হিজরি)

তিনি কারাকিতাই তুর্কি ছিলেন। ইলতুৎমিশ তাকে নিজের চাশনিগির (রান্নাঘরের তত্ত্বাবধায়ক) এবং পরে আস্তাবলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। ৬৩০ হিজরিতে তাকে বদায়ূনের ওয়ালি (গভর্নর) বানানো হয়। এরপর ৬৩১ হিজরিতে সাইফুদ্দীন আইবেক "ইয়াগান তত"-এর মৃত্যুর পর তিনি বিহারের শাসক হন। তিনি অনেক বিরোধীদের দমন করতে সক্ষম হন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের সিংহাসন আরোহণের পর অযোধ্যাকেও তার শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু শীঘ্রই তার মৃত্যু হয়। [১]

মালিক কারাকুশ আইতিগিন, ইখতিয়ারুদ্দিন: (মৃত্যু ৬৪৪ হিজরি)

তার আসল নাম ছিল আইতিগিন। তিনি কারাকিতাই তুর্কি বংশের একজন ক্রীতদাস ছিলেন যাকে সুলতান ইলতুৎমিশ ক্রয় করেছিলেন, তারপর প্রশিক্ষণ দিয়ে অফিসার বানিয়েছিলেন এবং পদোন্নতি দিতে দিতে মুলতানের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন এবং "কারাকুশ" উপাধি দিয়েছিলেন। পরে তিনি ইখতিয়ারুদ্দিন খেতাবও লাভ করেন। রাজিয়া সুলতানের আমলে তিনি লাহোরের শাসক হন। ৬৩৯ হিজরিতে লাহোরে মঙ্গোল আক্রমণের সময় তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। আলাউদ্দিন মাসউদের আমলে তিনি আমির-ই-হাজিব পদ লাভ করেন। [২]

আমির-ই-হাজিব আইতিগিন, ইখতিয়ারুদ্দিন: (মৃত্যু ৬৩৮ হিজরি)

মালিক ইখতিয়ারুদ্দিন আইতিগিন ওরফে আমির-ই-হাজিব ছিলেন একজন তুর্কি ক্রীতদাস যাকে সুলতান ইলতুৎমিশ দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি ভারতের সীমান্ত রক্ষক হন। রাজিয়া সুলতান তাকে আরও পদোন্নতি দিয়ে বদায়ূনের সুবাদারি প্রদান করেন। পরে তাকে দিল্লিতে ডেকে আনা হয় এবং আমির-ই-হাজিব পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। সুলতান بہرام شاہ (বাহরাম শাহ)-এর আমলে তিনি কুচক্রী হত্যার শিকার হন। [৩]

মালিক আলতুনিয়া ইখতিয়ারুদ্দিন: (মৃত্যু ৬৩৮ হিজরি)

মালিক আলতুনিয়া মূলত একজন তুর্কি ক্রীতদাস ছিলেন যাকে সুলতান ইলতুৎমিশ ক্রয় করে তাকে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং শুরুতে অফিসার-ই-আবদারি এবং পরে অফিসার-ই-চত্রদারি নিযুক্ত করেছিলেন। (অফিসার-ই-আবদারি সুলতানের জন্য পানির ব্যবস্থা করেন। অফিসার-ই-চত্রদারি সুলতানের জন্য ছাতা ও ছায়ার ব্যবস্থা করেন।) তিনি অত্যন্ত সাহসী ও যোদ্ধা সৈনিক ছিলেন। নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে সুলতানের পক্ষ থেকে ইখতিয়ারুদ্দিন খেতাব লাভ করেন। তার যোগ্যতা দেখে রাজিয়া সুলতান তাকে আরও পদোন্নতি দেন এবং প্রথমে "বরন"-এর কেল্লাদার এবং পরে "ভাতিন্ডা"-র সুবাদার বানিয়ে দেন। বাকি ঘটনাবলী রাজিয়া সুলতানের বর্ণনায় আসবে। [৪]

বলবন-ই-কবীর, মালিক ইজ্জুদ্দিন কিশলু খান:

তিনি কিপচাক তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, উচ্চাভিলাষী এবং দানশীল ছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের থেকে আলাদা পরিচয় করার জন্য...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ১৬৪ থেকে ১৭১

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৪

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৪, ২৩

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২১, ২০

এর জন্য তাকে “বলবন কবীর” বা “বলবন বুজুর্গ” বা “বলবন জাল” অর্থাৎ সাদা চুলের বলবন বলা হতো। সুলতান ইলতুতমিশ তাকে ক্রয় করে প্রথমে সাকি বানিয়েছিলেন। এরপর আফসারে আবদার (পানীয় তদারককারী) নিযুক্ত করেন। এরপর সে উন্নতি লাভ করে “বরন”-এর জায়গিরদার হয়ে যায়। দরবার থেকে তাকে “ইজ্জুদ্দিন” খেতাবও দেওয়া হয়েছিল।

ইলতুতমিশের পর শাহজাদা রুকনুদ্দিনকে সিংহাসনে বসাতে অংশ নিয়েছিলেন। এরপর রাজিয়া সুলতানা এবং মুইজুদ্দিন বাহরাম শাহের আমলে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। ৬৪০ হিজরিতে মুইজুদ্দিন বাহরাম শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অংশ নেন এবং প্রথমে নিজের বাদশাহীর ঘোষণাও দিয়ে দেন, কিন্তু পরে তা থেকে বিরত হয়ে শাহজাদা আলাউদ্দিন মাসউদের বাদশাহী কবুল করে নেন এবং বিনিময়ে নাগোরের জায়গিরদার হন।

মঙ্গোলদের আক্রমণ হলে আলাউদ্দিন মাসউদের সাথে এর প্রতিরক্ষা করতে উচ-এর রণাঙ্গনে যান এবং এই কারণে উচ ও মুলতানের জায়গিরদারি লাভ করেন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের আমলে তাকে “নাগোর”-এর জায়গির এবং “কাশলু খান” উপাধি দেওয়া হয়। কিছুকাল পর তিনি বিদ্রোহ করেন এবং ৬৫৫ হিজরিতে দিল্লি আক্রমণের জন্য আসেন কিন্তু ব্যর্থ হন এবং পুনরায় আনুগত্য স্বীকার করেন। ৬৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [১]

৯. বলবন সগির, বাহাউদ্দিন, উলুগ খান (সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন):
তিনি মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী ইলবারি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মঙ্গোলদের আক্রমণের ফলে গোলাম হিসেবে বিক্রি হন। বাগদাদের বাজারে বিক্রি হন। অবশেষে ভাগ্য তাকে দিল্লিতে নিয়ে এসে সুলতান ইলতুতমিশের অনুগত দাসে পরিণত করে। মালিক বলবন কবীর (ইজ্জুদ্দিন কাশলু খান) থেকে পার্থক্য করার জন্য তাকে “বলবন খুরদ” বা “বলবন সগির” বলা হতো।

তার গুণাবলী দেখে তাকে “খাসাদারি” (রাজকীয় অস্ত্রের তদারকি) পদ দেওয়া হয়। সুলতান রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কিছুদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। রাজিয়া সুলতানার আমলে “আমিরে শিকার” নিযুক্ত হন। মুইজুদ্দিন বাহরাম শাহের আমলে “রেওয়ারি”-র জায়গিরদার বানানো হয়। ৬৪২ হিজরিতে আলাউদ্দিন মাসউদের আমলে “আমিরে হাজিব” পদ লাভ করেন।

৬৪৩ হিজরিতে যখন মঙ্গোলরা উচ অবরোধ করে, তখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করেন, যার ফলে তিনি শীর্ষস্থানীয় আমিরদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন। আলাউদ্দিন মাসউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং তার স্থলে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে উলুগ খান (খানে আজম) উপাধি এবং নায়েবে সালতানাত পদ লাভ করেন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের ইন্তেকালের পর গিয়াসুদ্দিন উপাধি নিয়ে হিন্দুস্তানের সুলতান হন। [২]

১০. মালিক নুসরাতুদ্দিন শের খান:
তিনি বলবন সগির (সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। মঙ্গোলদের আক্রমণে ইলবারি বংশের অন্যান্য ছেলেদের মতো তিনিও গোলাম হয়ে দিল্লিতে পৌঁছান এবং ইলতুতমিশের খিদমতে আসেন। তার যোগ্যতার পরীক্ষার পর সুলতান তাকে ভাতিন্ডা ও লাহোরের শাসনভার দান করেন।

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৬ থেকে ৪০

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৭ থেকে ৪৯

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে তাকে মুলতান ও উচের ওয়ালি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন এই অঞ্চলগুলো বলবন কবীর (ইজ্জুদ্দিন কিশলু খান)-এর অধীনে আসে, তখন তার ও শের খানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়। বলবন কবীর এই অঞ্চলগুলো রক্ষা করতে পারেননি এবং শের খান নিজের শক্তি ও কৌশলে সেগুলো পুনরায় দখল করে নেন। এরপর শের খান দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিমুখ হয়ে যান এবং ভাতিন্ডা থেকে দক্ষিণ পাঞ্জাব পর্যন্ত অঞ্চলগুলো দখল করে নেন। দীর্ঘ সময় পর তিনি আনুগত্য স্বীকার করেন। দিল্লির দরবারের ফরমান অনুযায়ী তাকে উল্লিখিত অঞ্চলগুলো থেকে অব্যাহতি দিয়ে গোয়ালিয়র ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর ওয়ালি নিযুক্ত করা হয়।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের শাসনামলে পারস্পরিক কলহের কারণে সুলতানের নির্দেশে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। [১]

কিশলু খান আমির হাজিব, সাইফুদ্দিন আইবাক:

তিনি বলবন সগির (সুলতান বলবন)-এর আপন ও ছোট ভাই ছিলেন। মধ্য এশিয়ায় মঙ্গোলদের আক্রমণের সময় দুই ভাই বন্দি হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং দাসে পরিণত হন। এরপর বিক্রি হতে হতে তারা দিল্লিতে একত্রিত হন যেখানে সুলতান ইলতুতমিশ তাদের কিনে নেন।

কিশলু খান প্রশিক্ষণ পেয়ে ইলতুতমিশের খাস খাদেম হয়ে যান। রাজিয়া সুলতানার আমলে তিনি দেহরক্ষী বাহিনীর নায়েব সালার নিযুক্ত হন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের আমলে যখন তার বড় ভাই (বলবন সগির) নায়েবে সালতানাত পদ লাভ করেন, তখন তিনিও পদোন্নতি পেয়ে 'আমির হাজিব' হন এবং 'হোগিয়া' ও 'নাগোর'-এর ওয়ালি নিযুক্ত হন। শীঘ্রই 'কোহ বন্দ ইয়ারান' এবং 'রুরকি'ও তার জায়গির হিসেবে প্রদান করা হয়, যেখানে তিনি অত্যন্ত ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করতে থাকেন। অন্ত্রের প্রদাহে এক বছর ভুগে ৬৭৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। [২]

সাইফুদ্দিন আইবাক, উচের ওয়ালি: (মৃত্যু ৬৩৩ হিজরি)

সুলতান তাকে দেহরক্ষী বাহিনীর অফিসার নিযুক্ত করেন এবং সেই সাথে অনুমতি দেন যে, তিনি (সেইসব) সৈন্যদের থেকে (যারা নির্ধারিত সময় বা উপস্থিতির নিয়ম মেনে চলে না) বার্ষিক তিন লক্ষ মুদ্রা জরিমানা হিসেবে আদায় করতে পারবেন। সাইফুদ্দিন এই অর্থ কখনো আদায় করেননি এবং সুলতানকে স্পষ্টভাবে বলে দেন: "হুজুর আমার প্রথম নিয়োগই কি জরিমানা আদায়ের কাজে করলেন? আমার পক্ষে জালিম হওয়া এবং মুসলমানদের থেকে জরিমানা আদায় করা সম্ভব নয়। আমাকে অন্য কোনো দায়িত্ব দিন।"

ইলতুতমিশ তার খোদাভীতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একের পর এক বিভিন্ন স্থানের ওয়ালি নিযুক্ত করেন। ফলে তিনি পর্যায়ক্রমে: নারনোল [৩],

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩ থেকে ৪৫।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫ থেকে ৪৭।

[৩] ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে 'নারনোল' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং আজও এটি এই নামেই পরিচিত। এটি ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের মহেন্দ্রগড় জেলায় অবস্থিত একটি শহর, যা দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে অনেক ঐতিহাসিক ভবন, দুর্গ এবং মাকবারা (সমাধি) রয়েছে। মহাভারতেও নারনোলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে একে 'নকুলগড়' বলা হয়েছে। মধ্যযুগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক চৌকি, বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। মুসলিম দিল্লি সালতানাতের অধীনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিক কেন্দ্র ছিল যেখানে টাকশালও ছিল যেখানে মুদ্রা তৈরি করা হতো। শের শাহ সুরি এই অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তার দাদা হাসান খান এখানকার জায়গিরদার ছিলেন। শের শাহ সুরি এখানে তার প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত করেন। মুঘল আমলেও নারনোলের গুরুত্ব বজায় ছিল। এটি রাজা টোডরমলের জন্মভূমি, যিনি মুঘল সম্রাট আকবরের নবরত্নদের একজন ছিলেন।

বরন [১], সুনাম [২] এবং সবশেষে উচ-এর সুবেদার ছিলেন। সুলতান ইলতুতমিশের মৃত্যুর পর তিনি উচ-এর ওপর এক শক্তিশালী প্রধান সাইফ উদ্দিন কুরলুগের বিপজ্জনক আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিয়ে বড় খ্যাতি অর্জন করেন। এর কিছুদিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. ইغان তত, সাইফ উদ্দিন আইবক (মৃত্যু ৬৩১ হিজরি)

তিনি তুর্কান-ই-খাতা বংশের ছিলেন। প্রথমে সিরস্তি এবং পরে বিহারের ওয়ালি (গভর্নর) হন। লখনৌতিতে শাসন করতে থাকেন। [৩]

৪. বাত খান, সাইফ উদ্দিন আইবক খিতাই: (মৃত্যু ৬৪৪ হিজরি)

তিনিও তুর্কান-ই-খাতা গোত্রের ছিলেন। ইলতুতমিশ এবং আলাউদ্দিন মাসউদের আমলে দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান (সালাহদার) ছিলেন। এই সময়ে তিনি পর্যায়ক্রমে কুহরাম, সামানা [৫] এবং বরনের জায়গির লাভ করেন। পরিশেষে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের 'ওয়াকিল-ই-দার' [৬] ছিলেন। [৪]

৫. আরসালান খান খাওয়ারিজমি, তাজ উদ্দিন সাঞ্জর:

তিনি বংশগতভাবে খাওয়ারিজমি ছিলেন এবং সুলতান ইলতুতমিশের প্রশিক্ষিত গোলামদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইলতুতমিশের আমলে 'খাসাদার' [৭] এবং রাজিয়া সুলতানের আমলে 'চাশনিগির' ছিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের আমলে 'বায়ানা' [৮]-এর জায়গিরদারি লাভ করেন। যখন শের খান ভাতিন্ডা থেকে দক্ষিণ পাঞ্জাব পর্যন্ত এলাকায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তখন আরসালান...

---

[১] বরন: এর দ্বিতীয় নাম 'বুলন্দশহর'। ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত এবং দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন গঙ্গা ও যমুনার দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত। বরন এর প্রাচীন নাম ছিল। মাহমুদ গজনভির আক্রমণের সময়ও এই শহরের উল্লেখ বরন নামেই পাওয়া যায়। পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাত ও মুঘল আমলে এটি বুলন্দশহর নামে পরিচিতি পায়। সম্ভবত শহরের উঁচু স্থানে অবস্থিত হওয়ার কারণে বা এর গুরুত্বের কারণে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই শহরটি কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করে আম এবং সেই সাথে মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

[২] সুনাম: ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের সাংরুর জেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর। এটি সাংরুর শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দিল্লি থেকে এর দূরত্ব আড়াইশ কিলোমিটারের বেশি। দিল্লি সালতানাতের আমলে পাঞ্জাব থেকে দিল্লির দিকে যাওয়ার পথে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও সামরিক চৌকি ছিল। এই জনপদটি আজও সুনাম নামেই পরিচিত।

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি, পৃ: ৯০৮।

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি, পৃ: ৯০৯।

[৫] সামানা (সামানাহ): ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের পাতিয়ালা জেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর যা পাতিয়ালা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। লাহোর ও দিল্লির মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটি একটি বড় সামরিক ছাউনি ছিল। এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

[৬] প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে, বিশেষ করে দিল্লি সালতানাতের আমলে 'ওয়াকিল-ই-দার' (ওয়াকিল দার)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অর্থ ছিল রাজদরবারের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রাসাদের প্রধান ব্যবস্থাপক। তার দায়িত্ব ছিল মূলত রাজকীয় পরিবার এবং প্রাসাদের বিষয়াবলি দেখাশোনা করা। তিনি পুরো রাজকীয় প্রাসাদ, এর কর্মচারী, বাবুর্চিখানা, আস্তাবল এবং অন্যান্য সমস্ত রাজকীয় বিভাগের ইনচার্জ ছিলেন। তিনি সরাসরি বাদশাহর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও আরাম-আয়েশের খেয়াল রাখতেন, যার মধ্যে রাজকীয় সফর, ভোজসভা এবং অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। দরবারে আদব-কায়দা ও রীতিনীতি মেনে চলা নিশ্চিত করাও তার দায়িত্ব ছিল। তিনি শাহী দরবারে আগত প্রতিনিধি ও লোকজনের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতেন। কখনো কখনো বাদশাহ ও আমিরদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন এবং আমিরদের আবেদন বাদশাহর কাছে পৌঁছাতেন। এই পদটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের দেওয়া হতো, কারণ তারা বাদশাহর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মুঘল আমলে একে ওয়াকিল-ই-মুতলাক বলা হতো।

[৭] 'খাসাদার' সুলতানের ব্যক্তিগত ও বিশেষ সেবার অফিসার ছিলেন। তার প্রধান কাজ ছিল পানীয় তদারকি করা এবং বিষক্রিয়া থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

[৮] 'বায়ানা' ভারতের রাজস্থান রাজ্যের ভরতপুর জেলায় অবস্থিত। এটি দিল্লি ও গোয়ালিয়রের প্রাচীন পথে একটি সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থান ছিল। এটি তার প্রাচীন কেল্লা 'বিজয়গড়' নামেও পরিচিত যা যদুবংশীয়রা নির্মাণ করেছিলেন। এটি দক্ষিণ ও পশ্চিম এলাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক চৌকি ছিল।

...খান এই ফিতনা দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ফলস্বরূপ তাকে ভাতিন্ডার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। যখন বলবন সাগিরকে নায়েবে সালতানাত পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল, তখন তাকে সমর্থন করে পুনর্বহাল করার ক্ষেত্রে আরসালান খান অগ্রণী ছিলেন। এর বিনিময়ে তিনি আওধের শাসনভার লাভ করেন। কিছুকাল পর ৬৫৭ হিজরিতে তিনি সুলতানের অনুমতি ছাড়াই বাংলা ও বিহারের কেন্দ্র লখনৌতি দখলের চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন এবং নিহত হন অথবা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার পুত্র তাতার খান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনামলে খ্যাতি অর্জন করেন। [১]

৬. মালিক ইজ্জুদ্দিন তুগান খান তুঘরিল:

তিনি ছিলেন কারাকিতাই তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন গোলাম। সুলতান ইলতুতমিশ তাকে পর্যায়ক্রমে সাকি-ই-খাস, চাশনিগির এবং তারপর দারোগা-ই-আস্তাবল নিযুক্ত করেন। ৬৩০ হিজরিতে তিনি বদায়ূনের শাসক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পর তাকে লখনৌতির সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। রাজিয়া সুলতানা এবং মুইজুদ্দিন বাহরাম শাহের শাসনামলেও তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। আলাউদ্দিন মাসুদ শাহের শাসনামলে আওধের শাসক তমর খান তার কাছ থেকে লখনৌতির শাসনভার ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন, অন্যদিকে তাকে আওধের সুবাদারি দেওয়া হয়। ৬৪৪ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [২]

৭. তমর খান কিরান:

তিনি কিপচাক তুর্কিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুলতান ইলতুতমিশের শাসনামলে তিনি দারোগা-ই-আস্তাবল ছিলেন। রাজিয়া সুলতানার শাসনামলে তাকে কনৌজ, মালব এবং গোয়ালিয়রের শাসক বানানো হয়েছিল। মালিক নুসরাতুদ্দিন তাইসির মৃত্যুতে আওধের সিংহাসন শূন্য হলে তাকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করা হয়। ৬৪২ হিজরিতে তিনি তুগান খানের জন্য সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে লখনৌতি যান এবং তারপর তার সাথে বিবাদ করে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। তার এবং তুগান খানের মৃত্যু ৬৪৪ হিজরির জিলকদ মাসের একই রাতে (জুমার রাত) হয়েছিল। [৩]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৩৩ থেকে ৩৬

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৫১৩ থেকে ১৭

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ১৭৭, ১৮০

দ্রষ্টব্য: এই সকল আমীরদের বৃত্তান্ত তাবাকাত-ই-নাসিরি দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ৫ থেকে পৃষ্ঠা ৫৫ থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে একত্রে দেখা যেতে পারে।

https://t.me/BoierSomahar

রুকনউদ্দিন ফিরোজ শাহ বিন ইলতুতমিশ

৬৩৩ হিজরি থেকে ৬৩৪ হিজরি

(১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ)

ইলতুতমিশের মৃত্যুর পর রাজকুমারী রাজিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তাঁর ওসিয়তকে উপেক্ষা করা হয় এবং রাজকুমারীর সৎ ভাই রুকনউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনে বসানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় রুকনউদ্দিনের মা তুরকান খাতুন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, যিনি তুর্কি আমিরদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতেন। ফলে তিনি বলবন কবির (ইজ্জুদ্দিন) এবং বলবন সগির (বাহাউদ্দিন)-এর মতো শীর্ষস্থানীয় তুর্কি আমিরদের নিজের সাথে যুক্ত করতে সফল হন। [১]

এই আমিরদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২১ শাবান ৬৩৩ হিজরিতে রাজধানী দিল্লিতে রুকনউদ্দিনের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই নতুন বাদশাহ রাজকোষের মুখ খুলে দেন যাতে মানুষ তাঁর বাদশাহীর ওপর কোনো আপত্তি না তোলে। তিনি অপব্যয় ও অপচয়ের চরম সীমায় পৌঁছে যান এবং ধন-সম্পদ দুহাতে বিলিয়ে দিতে শুরু করেন। [২]

নতুন বাদশাহর বিলাসিতা:

নতুন বাদশাহর রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি অধিকাংশ সময় নাচ-গান এবং ভোগ-বিলাসের আসর সাজিয়ে কাটাতেন। ভাঁড়, বিদূষক, গায়ক, বাদক, মিরাসি এবং নর্তকীদের নিজের চারপাশে জড়ো করে রাখতেন। মদ্যপানের নেশা দিনরাত চলত। [৩]

---

[১] (ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ১২৯) ইসামি এখানে বড় বলবন এবং ছোট বলবনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা এই দুই আমিরকেই বোঝানো হয়েছে। বলবন কবিরের উপাধি ছিল ইজ্জুদ্দিন এবং তাঁকে আমির হাজিবও বলা হতো। পরবর্তীতে তিনি "কাশলু খান" উপাধিও লাভ করেন। কিশলু খান আলাদা এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের ভাই কাশলু খান (সাইফুদ্দিন আইবাক) আলাদা। বলবন সগিরের উপাধি ছিল বাহাউদ্দিন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে তিনি "উলুগ খান" উপাধি পান। পরিশেষে গিয়াসউদ্দিন উপাধি ধারণ করে হিন্দুস্তানের শাহ হন। কিছু লোক বলবন সগির এবং বলবন কবিরকে ভাই মনে করেন, যদিও তাঁদের গোত্রও আলাদা ছিল।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৫৫; ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ১২৯।

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৫৭; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ৬০; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৩০।

https://t.me/BoierSomahar

তাকে হাতিতে চড়ার খুব শখ ছিল। মাহুতদের তিনি খুব পুরস্কৃত করতেন। প্রায়ই নিজের হাতিতে সওয়ার হয়ে দিল্লির অলিগলিতে বেরিয়ে পড়তেন। রাজকীয় সওয়ারি দেখার জন্য মানুষ ভিড় জমাত। কয়েকজন খাদেম সাথে থাকত যারা তার ইশারায় মুঠো ভরে আশরাফি দর্শকদের ওপর ছিটিয়ে দিত। মানুষ হাসাহাসি করত এবং সেগুলো কুড়ানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত আর রুকন উদ্দিন এই তামাশা দেখে খুব আনন্দিত হতেন। [১]

তুর্কান খাতুনের জুলুম-অত্যাচার:

কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে শাসন পরিচালনা করা রুকন উদ্দিনের সাধ্যের বাইরে। ফলে সালতানাতের প্রশাসনিক দায়িত্ব তার মা তুর্কান খাতুন নিজের হাতে তুলে নিলেন। এর আগে থেকেই তুর্কান খাতুনের সাথে সুলতান ইলতুতমিশের অন্যান্য স্ত্রী ও শাহজাদাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না এবং পারস্পরিক রেষারেষি চলত। এখন যখন সালতানাতের ক্ষমতা তার হাতে এল, তখন তিনি হেরেমের বাসিন্দাদের কষ্ট দিতে কোনো ত্রুটি করলেন না। তিনি ইলতুতমিশের কিছু স্ত্রীর ওপর এত জুলুম করলেন যে তারা প্রাণ হারালেন। মরহুম সুলতানের কিছু বেগম এবং হেরেমের অনেক সম্মানিত নারীকে কপর্দকহীন ও নিঃস্ব অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য করা হলো। এভাবে প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ল। [২]

রুকন উদ্দিনের জুলুম - শাহজাদা কুতুব উদ্দিনের মৃত্যুদণ্ড:

সেই সময় শাহজাদী রাজিয়ার আপন ভাই কুতুব উদ্দিন রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, বুদ্ধিমান এবং চতুর বালক। সালতানাতের আমিরদের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ ছিল যে তাকে শাসনভার অর্পণ করা হলে ভালো হতো। রুকন উদ্দিন এবং তার মা তার পক্ষ থেকে বিপদ অনুভব করতে লাগলেন। ফলে তাকে বন্দি করা হলো এবং তার চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো যাতে দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণে তিনি আর কখনো শাসনের যোগ্য না হতে পারেন। কিন্তু এরপরও মা ও ছেলের মনের খটকা দূর হলো না। অবশেষে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে এই নিরপরাধ বালককে হত্যা করা হলো। [৩]

সালতানাতের আমিরদের বিদ্রোহ:

আওধে সুলতান ইলতুতমিশের ছেলে গিয়াস উদ্দিন মুহাম্মদ সুবাদার ছিলেন, যিনি রুকন উদ্দিনের চেয়ে ছোট ছিলেন। যখন তিনি কুতুব উদ্দিনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর পেলেন, তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে রুকন উদ্দিনের পরবর্তী লক্ষ্য তিনিই হবেন। ফলে তিনি রুকন উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং লখনৌতি (বাংলা ও বিহারের কেন্দ্র) থেকে দিল্লিগামী রাজস্ব আটকে দিলেন।

এটি দেখে বাদাউনের সিপাহসালার মালিক ইজ্জুদ্দিন মুহাম্মদ সালার, লাহোরের ওয়ালি মালিক আলাউদ্দিন জানি, মুলতানের আমির মালিক ইজ্জুদ্দিন কবির খাঁ এবং হাসির শাসক মালিক সাইফ উদ্দিন কুচিও নতুন বাদশাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। যেহেতু রুকন উদ্দিন...

---

[১] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৫৭

[২] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৫৫; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ৬০; তারিখ-ই ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৩০, ২৩১

[৩] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৫৫

...এর অত্যাচারের কারণে কেবল দিল্লির সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেনি, বরং অন্যান্য প্রদেশেও উদ্বেগের তীব্র ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে বিদ্রোহ সর্বত্র সফল হয় এবং পুরো দেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এই পরিস্থিতি দেখে রুকন উদ্দিন ফিরোজ শাহকে লস্কর নিয়ে দিল্লি থেকে বের হতে হয় যাতে বিরোধী আমিরদের দমন করা যায়। এই সময়ে সালতানাতের উজির নিজামুল মুলক জুনাইদি দেয়ালের লিখন পড়ে ফেলেছিলেন, তাই যখন এই লস্কর দিল্লির বাইরে 'কিলুখেরি' [১] পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন উজির লস্করের সঙ্গ ছেড়ে বদায়ূঁতে চলে যান এবং মালিক ইজউদ্দীন সালারের সাথে মিলিত হন। [২]

যুদ্ধের মেঘ - রাজ্যের অভিজাতদের হত্যা করা হলো:

এই সময়ে হাসি থেকে মালিক কুচি এবং লাহোর থেকে মালিক জানির বাহিনীও অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। শীঘ্রই এই সমস্ত বাহিনী একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে গেল। ওদিকে রুকন উদ্দিন তার লস্কর নিয়ে সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্র 'কাহরাম'-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথে তিনি তরাইন [৩] হয়ে মনসুরপুরে [৪] অবস্থান করেন।

এই সময়ে রুকন উদ্দিনের অনেক আমির বিভিন্ন ধরণের সন্দেহে নিমজ্জিত ছিলেন। বিশেষ করে সালতানাতের উজিরের পলায়নের পর অনেক তাজিক ও তুর্কি আমিরের ধারণা ছিল যে, লস্করের ভেতরের অনেক প্রধান ব্যক্তি বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই ধরণের সন্দেহভাজন প্রধানদের হঠাৎ হত্যা করা হবে। সে অনুযায়ী তারা সালতানাতের উজির নিজামুল মুলক জুনাইদির পুত্র জিয়াউল মুলক, মীর মুন্সি তাজুল মুলক মাহমুদ (চিফ সেক্রেটারি), বাহাউল মুলক হুসাইন আশআরি, করিম উদ্দিন জাহিদ, নিজাম উদ্দিন শারকানি এবং খাজা রশিদ উদ্দিন মালগানির মতো অভিজাতদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে হত্যা করেন। [৫]

তুর্কান খাতুন ও শাহজাদী রাজিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব:

এই আমির ও প্রধানদের হত্যাকাণ্ড রুকন উদ্দিনের অধিকাংশ কর্মকর্তাদের এতটাই নিরুৎসাহিত করে দেয় যে, লস্করের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং রুকন উদ্দিনের পক্ষে বিরোধী আমিরদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করা আর সম্ভব ছিল না। ওদিকে শাহজাদী রাজিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রুকন উদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে মরহুম পিতার অসিয়ত অনুযায়ী ক্ষমতার লাগাম নিজের হাতে নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময় এবং এছাড়া পরিস্থিতির ওপর...

---

[১] কিলুখেরি (কিলুগড়ি): এটি প্রাচীন দিল্লির (কিলা রায় পিথোরা) কাছে যমুনার তীরে দিল্লির একটি শহরতলি ছিল। একে কুলুখারি, কিলুখেরি বা কিলুগড়ি বলা হতো। গিয়াসউদ্দিন বলবনের উত্তরসূরি মুইজউদ্দিন কায়কোবাদ এখানে তার রাজপ্রাসাদ এবং একটি ছোট শহর গড়ে তোলেন যাকে "গিয়াসপুর" বলা হতে থাকে। পরবর্তীতে জালাল উদ্দিন খিলজি এবং আলাউদ্দিন খিলজিও পর্যায়ক্রমে এখানে একটি দুর্গ সদৃশ জনপদ গড়ে তোলেন। হুমায়ুনের সমাধি এখানেই অবস্থিত। বর্তমানে এটি দিল্লি শহরের পূর্ব জোনের অন্তর্ভুক্ত।

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৫৬

[৩] তরাইন (তরাউড়ি) দিল্লি থেকে ১৫২ কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যের একটি ঐতিহাসিক শহর।

[৪] মনসুরপুর (মনসুরপুর): দিল্লি থেকে ২০৫ কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানার একটি শহর যা আম্বালা (আম্বালা) থেকে ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

[৫] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৫৬

এই ঘটনাটি ইয়াহইয়া সিরহিন্দি 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে এবং মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা তার ইতিহাসে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে, নিজামুল মুলকের পুত্র জিয়াউল মুলক এবং বাকি প্রধানরা রুকন উদ্দিনের লস্কর থেকে বেরিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিলেন যাতে সেখানে রাজিয়া সুলতানকে সিংহাসনে বসাতে পারেন। (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ২২, ২৩; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩৩১) কিন্তু মিনহাজ-উস-সিরাজ এর মতে, এই লোকেরা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারেননি বরং সেখানেই লস্কর ছাউনিতে তাদের হত্যা করা হয়েছিল।

কাবু করার কোনো উপায় ছিল না। তাই তিনি নিজের পক্ষ থেকে এর জন্য চেষ্টা ও সংবাদ আদান-প্রদান শুরু করলেন।

এদিকে তুর্কান খাতুন তার ছেলের সামরিক অভিযানের ব্যর্থতার খবর পেয়েছিলেন এবং সেই সাথে শাহজাদী রাজিয়ার উদ্দেশ্যও তার কাছে গোপন ছিল না। তিনি রুকন উদ্দিনের কাছে বার্তা পাঠালেন যেন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই তিনি দিল্লি ফিরে আসেন। একই সাথে তিনি শাহজাদী রাজিয়াকে হেফাজতে নেওয়া এবং হত্যার পরিকল্পনা শুরু করেন, কিন্তু এই খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। রুকন উদ্দিন যখন ফেরার পথে 'কিলুখারি' পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, তখনই দিল্লিতে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তেজিত জনতা প্রাসাদে ঢুকে তুর্কান খাতুনকে বন্দি করে ফেলে। রুকন উদ্দিন যখন দিল্লির কাছাকাছি পৌঁছালেন, তখন অধিকাংশ তুর্কি আমির তার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং শহরে প্রবেশ করে শাহজাদী রাজিয়াকে সিংহাসনে বসানোর জন্য পারস্পরিক পরামর্শ শুরু করেন। [১]

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভায় শাহজাদী রাজিয়ার ভাষণ:

একদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শাহজাদী রাজিয়া রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং শহরের অভিজাতদের সম্বোধন করে বলেন: "তোমাদের বাদশাহ আমাকে তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন। রাজকীয় আংটি আমার কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। তোমরা বাদশাহর আদেশ অমান্য করেছ এবং রাজমুকুট অন্যের মাথায় পরিয়ে দিয়েছ। এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমরা নিজেরাই অবাক ও পেরেশান এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। যে কেউ তার হিতৈষী ও অভিভাবকের আদেশ অমান্য করে, সে দুনিয়াতে এভাবেই অনুশোচনার শিকার হয়। আজ সময় এসেছে যে, আপনারা তর্ক-বিতর্কে সময় নষ্ট না করে পরীক্ষার খাতিরে হলেও রাজমুকুট আমার মাথায় রাখুন। যদি আমি পুরুষদের চেয়ে ভালো শাসন করে দেখাতে পারি, তবে আমার শাসন বজায় রাখবেন। অন্যথায় আমাকে শুধু পদচ্যুতই করবেন না, বরং আমার শিরশ্ছেদ করবেন।"

রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই ভাষণে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আগে থেকেই শাহজাদীকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন। যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন, তারাও এখন আশ্বস্ত হলেন এবং বলতে লাগলেন: "বাস্তবিকই! অযোগ্য ছেলের চেয়ে সচ্চরিত্রা মেয়ে উত্তম।" [২]

রুকন উদ্দিনের গ্রেপ্তার:

রুকন উদ্দিন তখন তার অনুচর ও সামান্য সৈন্য নিয়ে শহরের বাইরে অবস্থান করছিলেন। শাহজাদীর নির্দেশে সালতানাতের আমিরগণ সৈন্য নিয়ে বাইরে বের হলেন এবং সামান্য সংঘর্ষের পর রুকন উদ্দিনকে কাবু করে শহরে নিয়ে এলেন। এটি ১৮ রবিউল আউয়াল ৬৩৪ হিজরির ঘটনা। রুকন উদ্দিন ফিরোজ শাহর শাসনকাল ছিল মাত্র ছয় মাস ২৮ দিন। [৩]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৫৬; তারিখে মুবারক শাহী: পৃ. ২২, ২৩; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৩১, ২৩২

[২] ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ১৩২

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৫৬

রাজিয়া সুলতান বিনতে ইলতুতমিশ

৬৩৪ হিজরি হতে ৬৩৭ হিজরি

(১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ)

রাজিয়া সুলতান ছিলেন ইলতুতমিশের কন্যা। তাঁর মাতা ছিলেন সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের কলিজার টুকরো। এভাবে রাজিয়া ছিলেন অত্যন্ত উচ্চবংশীয় এক মেয়ে। তাঁর লালন-পালন জ্ঞান ও তাসাউফের পরিবেশে হয়েছিল। তিনি জিকির-আজকার ও ওজিফার ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠোর অনুসারী ছিলেন। হানাফি ফিকহের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং তিনি তা মেনে চলতেন। [১]

সুলতান ইলতুতমিশ একবার রাজিয়াকে সাথে নিয়ে খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হন। তিনি স্নেহের সাথে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বরকতের দোয়া করলেন এবং বললেন: “এই শিশুটি পুরুষদের ওপর ভারী হবে।” তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। রাজকুমারী পরবর্তীতেও হযরত খাজা সাহেবের খেদমতে সালাম পেশ করতে এবং দোয়া নিতে উপস্থিত হতেন। একইভাবে তিনি সর্বদা আল্লাহর ওলি এবং সুফিদের সেবা করতেন। [২]

দিল্লির প্রখ্যাত আলেম কাজী শামসুদ্দিন ইসলামি জ্ঞানসমূহে তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। নিজের অসাধারণ মেধার কারণে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তেরো বছর বয়সেই তিনি ঘোড়সওয়ারি, তলোয়ার চালনা, নেজাবাজি, তিরন্দাজি এবং যুদ্ধের অন্যান্য বিদ্যায় এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, তাঁকে অভিজ্ঞ সৈনিকদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করা হতো।

সুলতানের কাছে তাঁর সন্তানদের মধ্যে রাজিয়া সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন, কারণ তিনি বিদুষী এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত সেবাপরায়ণ এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় ভূষিত ছিলেন। তাঁর ভাইদের তুলনায় তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে বেশি আগ্রহ দেখাতেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। এই কারণেই সুলতান ইলতুতমিশ মাঝেমধ্যে যুদ্ধাভিযানেও তাঁকে সাথে নিয়ে যেতেন। কখনো তাঁর সাহসিকতার পরিচয় দেখে খুশি হতেন, আবার কখনো কঠিন বিষয়ে তাঁর সঠিক সিদ্ধান্তের কারণে।

---

[১] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৪

[২] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৬

মতামতের প্রশংসা করতেন। অভিযানের সময় রাজিয়া তার পিতার সাথে তাঁবুতে ঘুমাতেন। শেষ রাতে পিতার সাথে জেগে উঠতেন এবং তাকে অজু করাতেন। তারপর পিতা ও কন্যা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। [১]

সুলতান ইলতুতমিশ ৬২৯ হিজরিতে যখন গোয়ালিয়র অভিযানে গিয়েছিলেন, তখনও তিনি রাজিয়াকে স্থলাভিষিক্ত শাসক বানিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। ফলে তিনি শাসনের অসিয়ত তার অনুকূলে করে দেন। [২] কিন্তু এই অসিয়তকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের আমিরগণ রুকনউদ্দিনের মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। [৩]

রাজিয়ার সিংহাসন আরোহণ:

যা-ই হোক, রুকনউদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর রবিউল আউয়াল ৬৩৪ হিজরিতে (নভেম্বর ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) রাষ্ট্রের আমিরগণ রাজকুমারী রাজিয়াকে সিংহাসনে বসান। তিনি 'রাজিয়াতুদ্দিন' উপাধি গ্রহণ করেন। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। [৪] রাজিয়া সুলতানের সিংহাসন আরোহণ ছিল একটি অসাধারণ ঘটনা। এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সত্যগুলো প্রমাণিত হয়:

- যদিও দিল্লির শাসকরা ধর্মীয় ও দ্বীনদার ছিলেন, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়গুলোতে উলামা ও ফুকাহাদের থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়ার বাধ্যবাধকতা সবসময় পালন করা হতো না। এই কারণেই এখানে উলামা ও ফুকাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়নি যে, নারীর শাসন শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ কি না?
- দিল্লির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো সরকারি আদেশের পরিবর্তে জনসমর্থনের কারণে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল।
- রাজিয়া রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের এই কথা বলে যে, যদি তিনি অযোগ্য প্রমাণিত হন তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে, নিজের সিংহাসন আরোহণকে একটি নিয়মিত সামাজিক চুক্তির মর্যাদা দিয়েছিলেন।
- এর মাধ্যমে এটিও জানা যায় যে, সুলতান ইলতুতমিশ তার পুত্রদের অযোগ্যতা এবং এই কন্যার যোগ্যতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন।
- তুর্কি আমিরগণ এই সুযোগে একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন বা জরুরি সময়ে এই ধরনের সিদ্ধান্তকে সময়ের প্রয়োজন এবং কল্যাণকর মনে করছিলেন।

রুকনউদ্দিনের পরিণতি:

দিল্লিতে রুকনউদ্দিন তাজ ও সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রের কিছু আমিরের সমর্থন তার প্রতি ছিল, তাই তার ওপর তৎক্ষণাৎ হাত দেওয়া হয়নি এবং ইনসাফের দাবিকে কৌশলগত কারণে বিলম্বিত করা হয়েছিল। তবে রুকনউদ্দিন শান্ত হয়ে বসে থাকার লোক ছিলেন না। ফলে তিনি রাজিয়াকে হত্যার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। যদিও এই কাজটি সহজ ছিল না কারণ সালতানাতের অধিকাংশ আমির এখন রাজকুমারী রাজিয়ার অনুগত ছিলেন। তাদের মাধ্যমে রাজিয়া রুকনউদ্দিনের অপবিত্র সংকল্পের খবর পেয়ে যান। রুকনউদ্দিন জুমার সালাত

---

[১] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৬৬

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩২; তারিখ-ই-মিল্লাত: পৃষ্ঠা ৪৬৬

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩৫, ৫৩৬

[৪] ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৩৩

এর জন্য জামে মসজিদে গেলেন যা শাহী মহলের সামনে ছিল। যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন রাজিয়া ফরিয়াদীদের মতো পোশাক পরে শাহী মহলের ছাদে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি জুমার নামাজের জন্য আগত লোকদের উচ্চস্বরে ডাকলেন এবং তাদের মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। তিনি বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি জনগণের সামনে রুকন উদ্দিনের জুলুমের ফরিয়াদ করলেন এবং লোকদেরকে তাদের মরহুম পিতার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন: "রুকন উদ্দিন আমার ভাইকে হত্যা করেছে। এখন সে আমাকেও হত্যা করতে চায়।"

লোকেরা তার বক্তৃতায় এতটাই অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে তারা রুকন উদ্দিনকে মসজিদ থেকে টেনে রাজিয়ার সামনে নিয়ে এল। রুকন উদ্দিনের প্রতি মানুষের ঘৃণা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তার পর্দা ও মর্যাদার কোনো বাধা অবশিষ্ট ছিল না, তাই তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করা হলো। যেহেতু এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে তিনি রাজিয়ার ভাই কুতুব উদ্দিনের হত্যাকারী ছিলেন, তাই রাজিয়া বললেন: "শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়।" ফলে তাকে হত্যা করা হলো।

রাজিয়ার কর্মকাণ্ড:

রাজিয়া শাসক হয়ে সরকারি শাসনব্যবস্থায় বিদ্যমান সেই সমস্ত ত্রুটি দূর করলেন যা তার ভাই রুকন উদ্দিন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ পুনর্বহাল করলেন। জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নতুন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার পদক্ষেপ নিলেন। এভাবেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজের যোগ্যতার ছাপ রাখলেন।

তিনি প্রতি সপ্তাহে দুবার খোলা দরবার আয়োজন করতেন যেখানে সাধারণ মানুষ কোনো বাধা ছাড়াই উপস্থিত হয়ে সরাসরি সুলতানার কাছে তাদের ফরিয়াদ শোনাতে পারত। মাসে একবার তিনি হাতিতে চড়ে নিজে টহল দিতেন যাতে সেইসব মজলুম যারা দরবারে উপস্থিত হতে পারে না তারা তার কাছে পৌঁছাতে পারে।

---

[১] সফরনামা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩১

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৫৬, ৪৫৭

[৩] সফরনামা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩১

স্মর্তব্য যে, ইবনে বতুতা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। ইবনে বতুতার মতে, রাজিয়া শাহজাদী মহলের ছাদ থেকে লোকদের সম্বোধন করে রুকন উদ্দিনের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছিলেন, লোকেরা উত্তেজিত হয়ে রুকন উদ্দিনকে মসজিদ থেকে ধরে এনে হত্যা করে। এরপর রাজিয়া সিংহাসনে বসেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো, দিল্লিতে রাজিয়ার বায়াত সম্পন্ন হয়েছিল, যার পর রুকন উদ্দিনের বিরুদ্ধে দিল্লির বাইরে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল এবং যুদ্ধ করে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

লেখকের মতে, এই দুটি পরস্পরবিরোধী বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে যে, দিল্লিতে রাজিয়ার বায়াতের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল এবং তার সাথে সাথেই রুকন উদ্দিনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল (যেমনটি ঐতিহাসিকদের বর্ণনা)। কিন্তু কৌশলগত কারণে তাকে তাৎক্ষণিক কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি (কারণ তার একটি শক্তিশালী সমর্থক গোষ্ঠী ছিল)। এরই মধ্যে জুমার নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া যেতে পারে (যেমনটি ইবনে বতুতার বর্ণনা)। এই সময়ে শাহজাদীর সিংহাসন আরোহণ সম্পন্ন হয়েছিল (যেমনটি ঐতিহাসিকরা বলেন), তবে রুকন উদ্দিন তবুও বিরত হননি এবং শাহজাদীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে শাহজাদী জনগণের সমর্থন নিয়ে এই বিষয়টির নিষ্পত্তি করা সমীচীন মনে করেন এবং জুমার নামাজের সুযোগে জনগণকে সম্বোধন করেন এবং তাদের মাধ্যমে রুকন উদ্দিনকে ধরিয়ে দেন (যেমনটি ইবনে বতুতা বলেন)। তবে রুকন উদ্দিনকে তার হাতে হত্যা করা হয়নি (যদিও ইবনে বতুতার শব্দ থেকে এটি সন্দেহ হতে পারে, তবে ইবনে বতুতার শব্দের মধ্যে এই বিষয়ে স্পষ্টতা নেই। "ফাকাতালুহু কিসাসান"-এর মধ্যে 'ফা' অনুগামী হতে পারে এবং "কাতালু" এর কর্তা জরুরি নয় যে সাধারণ জনগণই হবে। সম্ভব যে এর দ্বারা সরকারি কর্মকর্তারা উদ্দেশ্য যারা অপরাধের প্রমাণ দেখার পর সাজা কার্যকর করেছিলেন)। এভাবে ইবনে বতুতার বক্তব্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনার পরিপন্থী থাকে না।

হতে পারে, পথে তারা তার সাথে দেখা করে নিজেদের অভিযোগ বর্ণনা করতে পারে। [১]

কারামতিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা:

রাজিয়া ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র কয়েক মাস হয়েছিল যখন কারামতিয়াদের ফিতনা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। এটি ছিল ইসমাইলি শিয়াদের একটি দল যাদের আকিদা ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। তাদের একজন দাঈ যার নাম ছিল "নূর তুর্ক", গুজরাট ও সিন্ধুতে ফিতনা ছড়ানোর পর দিল্লিতে আসে। তার সাথে মুরিদদের একটি বিশাল সংখ্যা ছিল। সে জায়গায় জায়গায় মানুষকে একত্রিত করে বক্তব্য দিত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাবকে বাতিল ঘোষণা করত, আইম্মায়ে আরবা (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)-এর বিরুদ্ধে ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করত এবং মানুষকে উত্তেজিত করত।

এরপর সে তার কারামতি মুরিদদের সাথে মিলে মুসল্লিদের ওপর হামলার পরিকল্পনা করে যার জন্য তার দুই হাজার সশস্ত্র মুরিদ প্রস্তুত হয়। ৬ রজব ৬৩৪ হিজরিতে জুমার নামাজের সময় তাদের মধ্য থেকে এক হাজার মুরিদ জামে মসজিদের উত্তর দিকে নতুন কেল্লার কাছে একত্রিত হয় এবং বাকি এক হাজার "বাজার-এ-বাজাজান"-এ মাদ্রাসা-এ-মুইজ্জিয়ার কাছে সমবেত হয়। তাদের কাছে তলোয়ার, ঢাল, নেজা এবং তীর-ধনুকসহ সব ধরনের অস্ত্র ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে যখন মানুষ জুমার নামাজ আদায় করছিল, এই উভয় দল দুই দিক থেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে শত শত মুসল্লি শহীদ হয়ে যান। কিছু মানুষ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভিড়ের পায়ের নিচে পিষ্ট হন।

রাজিয়া সুলতান এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই দুই কর্মকর্তা: নাসিরুদ্দিন বিলগেরামি এবং আমির নাসিরিকে নির্দেশ দেন যেন ফিতনাকারীদের একজনও বেঁচে ফিরতে না পারে। ফলে তাদের নেতৃত্বে বর্মধারী বাহিনী যারা ঢাল ও নেজা নিয়ে সশস্ত্র ছিল, জামে মসজিদের মিনারের দিক থেকে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালায়। এদিকে অনেক মুসল্লি মসজিদের ছাদে উঠে যান এবং সেখান থেকে কারামতিয়াদের ওপর পাথর ও ইটের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকেন। পরিশেষে কারামতিয়াদের ঘিরে ফেলে নির্মূল করা হয়। তাদের একজনকে ও জীবিত ছাড়া হয়নি। [২]

কারামতিয়াদের সম্পর্কে ফতোয়া তলব:

এই ঘটনার পর রাজিয়া কারামতিয়াদের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযান শুরু করার কথা ভাবতে থাকেন। এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য তিনি আল্লামা নূরুদ্দিন মুহাম্মদ আউফিকে তলব করেন যিনি দিল্লির একজন বড় বুজুর্গ আলেম ছিলেন। দূত উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ নিয়ে মসজিদে পৌঁছায় যেখানে আল্লামা হাদিস বা তাফসিরের দরস দিচ্ছিলেন। তিনি জবাবে বললেন: "সুলতানাকে বলো, আমি আল্লাহর ঘরে ছাত্রদের দ্বীনি ইলমের দরস দিচ্ছি। এই মজলিস আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এটা ছেড়ে সুলতানার দরবারে হাজিরা দেওয়া কি বেশি জরুরি?"

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৩৩

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৬১

দূত এসে রাজিয়া সুলতানকে আল্লামার উত্তর শোনালেন। রাজিয়া তা নীরবে শুনলেন এবং দূতকে বললেন: “হযরত যখন দরস থেকে অবসর হবেন, তখন আবার ডেকে নিও।”

দুই ঘণ্টা পর যখন আল্লামা দরস থেকে অবসর হলেন, তখন দূত তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে এল। সুলতানা দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং বিনম্রভাবে বললেন: “আমার একটি শরয়ী বিধান জানার ছিল। সেজন্য আপনাকে কষ্ট দিলাম।”

এরপর মূল বিষয়টি বর্ণনা করে বললেন: “কারামতিরা বড় ধরনের বিদ্রোহ করছে। তাদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান কী?”

আল্লামা বললেন: “সুলতানা! এই লোকেরা মুরতাদ এবং ওয়াজিবুল কতল।”

রাজিয়া মাসআলাটি যাচাই করার পর আল্লামাকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিদায় দিলেন এবং বেশ দূর পর্যন্ত নিজে এগিয়ে দিতে গেলেন।

এই ঘটনা থেকে রাজিয়ার দ্বীনদারী এবং উলামাদের প্রতি তাঁর আদব ও সম্মানের বিষয়টি অনুমান করা যায়।

কারামতিরা যেহেতু মুরতাদ এবং চরম ফিতনাবাজ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ছিল, তাই তাদের ব্যাপারে রাজিয়ার কঠোর নীতি অবশ্যই সঠিক ছিল। তবে এ ছাড়া রাজিয়া ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুস্তানের সকল নাগরিকের সাথে সহনশীলতা প্রদর্শনের সেই নীতিতেই অটল ছিলেন, যা তাঁর পূর্বসূরি সুলতানগণ অনুসরণ করে আসছিলেন। [১]

ধর্মীয় সহনশীলতা:

একবার এমন হলো যে, রাজিয়ার মনে হিন্দুদের কিছু উপাসনালয় ভেঙে ফেলার চিন্তা এল। এর একটি বিশেষ কারণ ছিল, তা হলো যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হিন্দুদের মন্দিরগুলোতে উৎসবের সময় প্রচুর ভিড় হতো। সেই সময় ঘণ্টা ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো, যার ফলে আশেপাশের জনবসতি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। অবশেষে নাগরিকদের একটি প্রতিনিধি দল এসে রাজিয়া সুলতানের কাছে আবেদন করল যেন এই মন্দিরগুলো ভেঙে ফেলা হয়। তারা বলল:

“আপনার পিতাও মহাকাল মন্দির ভেঙেছিলেন। আপনি যমুনার শিবালয়গুলো ভেঙে সওয়াব অর্জন করুন।”

রাজিয়া তাদের অভিযোগকে সঠিক মনে করে যমুনার মন্দিরগুলো ভেঙে ফেলার সংকল্প করলেন। কিন্তু নতুন আদেশ জারি করার আগে তিনি অভ্যাস অনুযায়ী উলামাদের সাথে পরামর্শ করা জরুরি মনে করলেন। তিনি কাজী সাদউদ্দিন গার্দির সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন: “আগে এটি জানা দরকার যে, এই মন্দিরগুলো কবে থেকে প্রতিষ্ঠিত।”

রাজিয়া তদন্ত করালেন এবং জানতে পারলেন যে, এই মন্দিরগুলো প্রাচীনকাল থেকেই এভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এর ওপর কাজী সাদউদ্দিন গার্দি নিম্নোক্ত কথাগুলো বললেন:

“প্রাচীনকাল থেকে এই জাতিগুলোর মধ্যে যে রীতিনীতি চলে আসছে, সেগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অধিকার কারো নেই। সুলতান ইলতুতমিশ মহাকাল মন্দির এই কারণে ভেঙেছিলেন যে, সেই জায়গাটি দেহব্যবসার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। পূজারিরা সেখানে পূজা করতে আসা কুমারী মেয়েদের শ্লীলতাহানি করত। স্বয়ং সেখানকার ব্রাহ্মণরাই সুলতানকে বলে...”

---

[১] তারিখ-ই-মিল্লাত: পৃষ্ঠা ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬ -

মন্দির ধ্বংস করিয়েছিলেন।

সুলতানা! সাহাবায়ে কেরাম যখন ইরান জয় করেছিলেন, তখন সেখানে জরথুষ্টি ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং জায়গায় জায়গায় অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত ছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও অগ্নিকুণ্ডগুলো ধ্বংস করেননি, আর না তারা মজুসিদের সেই অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করেছিলেন যা তারা পূর্ববর্তী শাসনামলে ভোগ করত। তাদের বলা হয়েছিল যে তারা আহলে কিতাবদের সমতুল্য। একই আচরণ মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু ও মুলতান জয় করে সেখানকার অধিবাসীদের সাথে করেছিলেন, যারা সবাই হিন্দু ছিল। তাদের মন্দিরগুলো বহাল রাখা হয়েছিল এবং তাদের রীতিনীতি ও প্রথা চালু ছিল। সুলতানা! আপনি কি তাদের চেয়েও বড় হয়ে গেছেন যে একটি নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

রাজিয়া কাজি সাহেবের কথা শুনে নিজের ইচ্ছা পরিবর্তন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে হিন্দুদের পূজায় যেন কোনো বাধা সৃষ্টি না করা হয়। [১]

বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়

রাজিয়া শাসনভার গ্রহণ করার পর খুব অল্প সময় অতিবাহিত হয়েছিল যে তাকে বিরোধীদের এক ঝড়ের এবং বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হলো। বিভিন্ন প্রদেশের আমিররা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। বাস্তবতা হলো, রাজিয়া দিল্লির তুর্কি আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মতিতে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এতে অন্যান্য প্রদেশের তুর্কি শাসকরা, যারা সালতানাতে দিল্লির একটি শক্তিশালী অংশ ছিল, অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। ফলে ক্ষমতার হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের কোনো ভূমিকা না দেখে তারা ক্ষুব্ধ ও বিচলিত ছিল। এছাড়া এটাও সম্ভব যে তারা কোনো নারীর সিংহাসনে আরোহণ নিয়ে শরয়ি বা প্রথাগত আপত্তির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। [২]

যাই হোক, এই বিরূপ পরিস্থিতির ফলাফল এই দাঁড়ালো যে সালতানাতের উজির নিজামুল মুলক জুনাইদি প্রশাসনিক বিষয়ে সুলতানার সাথে সহযোগিতা ছেড়ে দিলেন। অন্যদিকে তুর্কি প্রদেশগুলোতে মালিক জানি, মালিক কুচি, মালিক কবির খান এবং মালিক ইজ্জুদ্দিন মুহাম্মদ সালার প্রধান ছিলেন; তারা দিল্লিতে এসে পৌঁছালেন। তারা সৈন্যদের শহরের বাইরে অবস্থান করালেন এবং ভেতরে এসে বিপ্লব ঘটানোর প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

---

[১] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৮, ৪৭৯।

[২] যেহেতু ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে বিদ্রোহকারীদের মধ্যে কেউ একে শরয়ি সমস্যা হিসেবে বিদ্রোহের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তাই লেখক একে সম্ভাবনার স্তরে রেখেছেন। কিছু লোক বলেন যে আমির জামালুদ্দিন ইয়াকুত হাবশির প্রতি সুলতানার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। কিছু বর্ণনায় এটাও এসেছে যে ইয়াকুত হাবশি সুলতানাকে ঘোড়া বা হাতিতে চড়ার সময় সাহায্য করতেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে সুলতানার সাথে এই হাবশির কোনো সম্পর্ক রয়েছে। (ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৩২) অথচ এই কথাটি সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর এবং ভিত্তিহীন। এখানে উল্লেখ্য যে রাজিয়া সুলতানার পক্ষ থেকে মালিক ইয়াকুত হাবশিকে পদোন্নতি এই বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরেই দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং ইয়াকুত হাবশির প্রতি রাজিয়ার অনুগ্রহ দেখে অন্যান্য আমিররা বিদ্রোহে প্ররোচিত হয়েছে বলাটা সম্পূর্ণ ভুল। বিদ্রোহের আসল কারণ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই বিদ্রোহের সময় ইয়াকুত হাবশির আনুগত্য ও কর্মতৎপরতা সুলতানার মনে তার প্রতি কদর সৃষ্টি করেছিল।

রাজিয়া বুঝতে পারলেন যে শীঘ্রই বিদ্রোহী আমীররা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তিনি অবিলম্বে সাহায্যের জন্য অযোধ্যার শাসক মালিক নুসরাতউদ্দীন তাইসিকে তলব করলেন। ফলে তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেনাবাহিনী নিয়ে গঙ্গা নদী পার হয়ে এসে পৌঁছালেন। বিরোধী আমীররা এটি দেখে একটি চাল চালল। তারা মালিক নুসরাতউদ্দীনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে শহরের বাইরে বেরিয়ে এল। এই খাতির-যত্ন দেখে মালিক নুসরাতউদ্দীন নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। যখন তিনি দিল্লিতে প্রবেশ করলেন, তখন ষড়যন্ত্রকারী আমীররা তাকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করে নিল। মালিক নুসরাত আগেই অসুস্থ ছিলেন। এই শোকের সাথেও যখন পাল্লা দিতে হলো, তখন কয়েকদিন পর বন্দি অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করলেন।

রাজিয়া এই উদ্বেগজনক খবর শুনেও সাহস হারালেন না। তিনি বিরোধী আমীরদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন এবং রাজনৈতিক চাল চাললেন। কিন্তু আলোচনার প্রতিটি পর্যায়ই নিষ্ফল রইল এবং সময় অতিবাহিত হতে থাকল।

অবশেষে বিরোধী আমীররা প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হলো। যদিও নিজামুল মুলক জুনাইদি রাজনৈতিকভাবে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য আমীররা তার একটি কথাও শুনল না এবং দিল্লি থেকে কয়েক মাইল দূরে তাদের কাতারবন্দি করতে শুরু করল। রাজিয়াও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং নিজের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লির বাইরে চলে এলেন এবং যমুনা নদীর তীরে ছাউনি ফেললেন।

এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু সংঘর্ষ হলো কিন্তু নিয়মিত যুদ্ধের উপক্রম হলো না। এই সময়ে দিল্লির উলামা ও মাশায়েখগণ যুদ্ধবিরতির জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তারা উভয় পক্ষের নেতৃত্বের সাথে দেখা করে বিবাদ মিমাংসা করতে লাগলেন।

অন্যদিকে রাজিয়া গোয়েন্দাদের মাধ্যমে গোপনে কিছু বিরোধী আমীরকে স্নেহপূর্ণ বার্তা পাঠিয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে মালিক ইজ্জউদ্দীন সালার এবং মালিক কবীর খান আয়াজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। রাজিয়া তাদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা বিদ্রোহী আমীরদের তাবুগুলো ঘেরাও করে তাদের গ্রেপ্তার করে। রাজিয়ার সমর্থক আমীররা এই অভিযানের পরিকল্পনা ঠিক করার জন্য একটি তাবুতে সমবেত হলে ওদিকে মালিক কোচি, মালিক জানি এবং নিজামুল মুলক জুনাইদি প্রমুখ এর খবর পেয়ে গেলেন। তাদের সাহস দমে গেল এবং তারা দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল এবং সেই সাথে তাদের সৈন্যরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

রাজিয়া একেই যথেষ্ট মনে করলেন না বরং ফিতনার মূল পুরোপুরি উপড়ে ফেলার জন্য নিজের বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা বিদ্রোহী আমীরদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এই অভিযানের ফলে মালিক কোচি এবং তার ভাই ফখরুদ্দীন গ্রেপ্তার হলেন। পরে তাদের হত্যা করা হয়। মালিক জানি লুধিয়ানার দিকে পালানোর সময় “পায়েল” নামক একটি দুর্গের কাছে নিহত হন এবং তার মাথা সুলতানার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিজামুল মুলক সিরহিন্দের একটি পাহাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করলেন। এভাবে রাজিয়া সুলতানার বাহিনী বিজয়ী বেশে দিল্লিতে ফিরে এল। [১]

সুলতানার সামরিক পোশাক:

যুদ্ধের এই দিনগুলোতে রাজিয়া সুলতানা বেশিরভাগ সময় পুরুষালি সামরিক পোশাকে সজ্জিত থাকতেন। বিজয়ের পর তিনি স্থায়ীভাবে পুরুষালি পোশাক গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্ভবত তিনি এটি প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন যাতে আমীররা তাকে একজন সুকোমল রাজকুমারী মনে না করে এবং তাদের ওপর রাজকীয় মুকুটের প্রভাব বজায় থাকে, তাই তিনি পর্দা ত্যাগ করলেন, নিজের পিতার মতো রাজকীয় টুপি এবং পুরুষালি...

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ২৭; তাবাকাত-ই-নাসিরি: ৪৫৮, ৪৫৯।

রাজকীয় পোশাক পরিধান করতে শুরু করলেন এবং পর্দা ছাড়াই দরবারে বসতে লাগলেন। [১] তিনি সামরিক পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রকে নিজের অলঙ্কার বানিয়ে নিয়েছিলেন, ফলে প্রায়ই তলোয়ার ঝোলানো থাকত এবং ঢাল, তীর-ধনুক ও তূণ দ্বারা সজ্জিত থাকতেন। [২] তিনি মুখ খোলা রেখে হাতির পিঠে সওয়ার হতেন এবং দিল্লিতে টহল দিতেন ও জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। [৩]

সালতানাত সুসংহতকরণের যুগ

বিদ্রোহের তুফান দমন করার পর রাজিয়া পূর্ণ একাগ্রতার সাথে সালতানাত সুসংহত করার দিকে মনোযোগ দেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিশাল দেশটিকে তাঁর পিতার আমলের মতো নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে তোলেন এবং চারদিকে শান্তি ও স্বস্তি বিরাজ করতে থাকে।

নতুন বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা:
রাজিয়া সুলতান এই উদ্দেশ্যে সরকারকে নতুন করে সংগঠিত করেন। বিদ্রোহের এই কঠিন সময়ে যে সকল কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সুলতানাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন, তাঁদের সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পদোন্নতি দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। নতুন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:

- সালতানাতের উজিরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব খাজা মুহাজ্জাব উদ্দিনকে অর্পণ করেন এবং তাঁকে “নিজামুল মুলক” উপাধি দেন।
- মালিক কবির খান আইয়াজকে লাহোরের শাসনভার অর্পণ করেন।
- মালিক সাইফ উদ্দিন আইবেক বেহতুকে “কুতলুগ খান” উপাধি দিয়ে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পর বেহতুর মৃত্যু হলে কুতুব উদ্দিন হাসান ঘুরিকে প্রধান সেনাপতি করা হয়। [৪]
- মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন আইতেগিনকে আমির-ই-হাজিব নিযুক্ত করেন। [৫]
- বলবন সগির (বাহাউদ্দিন)-কে আমির-ই-শিকার নিযুক্ত করা হয়। [৬]
- মালিক জামাল উদ্দিন ইয়াকুত নামক একজন হাবশি কর্মকর্তাকে “আমির-ই-আখুর” নিযুক্ত করেন। [৭]
- কিছুকাল পর জামাল উদ্দিন ইয়াকুতকে “আমিরুল উমারা” বানিয়ে দেওয়া হয়। [৮]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৬০; তারিখ-ই-মুবারক শাহি: পৃ. ২৭

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৬০; তারিখ-ই-মুবারক শাহি: পৃ. ২৭

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৫৯, ৪৬০

[৫] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৫১

[৬] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৫৯, ৪৬০

[২] সফরনামা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৩২

[৭] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৩৪

দ্রষ্টব্য: আমির-ই-আখুর বলতে রাজকীয় আস্তাবলের তত্ত্বাবধায়ককে বোঝায়। বাদশাহর ব্যক্তিগত আস্তাবল এবং রাজকীয় ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা, উন্নত জাতের ঘোড়া ক্রয় ও বংশবৃদ্ধি, ঘোড়ার খাদ্য, প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা এবং বাদশাহর সওয়ারির জন্য সেরা ঘোড়া নির্বাচন করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। আমির-ই-আখুরের সরাসরি যোগাযোগ বাদশাহর সাথে থাকত, তাই এই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি প্রায়শই অনেক বেশি রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী হতেন।

রনথম্ভোর রণাঙ্গন:

রনথম্ভোর দুর্গ সুলতান ইলতুতমিশ কঠোর সংগ্রামের পর জয় করেছিলেন এবং সেখানে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী নিযুক্ত করেছিলেন। যখন সুলতানের ওফাত হলো, তখন কিছুকাল পর আশেপাশের হিন্দু রাজারা বিদ্রোহ করে দিল। সেই দিনগুলোতে তারা আক্রমণ চালিয়ে রনথম্ভোর দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং দুর্গটি ঘেরাও করে ফেলেছিল। যদিও দুর্গটি তার দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের কারণে নতি স্বীকার করেনি, তবে সেখানে অবস্থানরত মুসলমানরা চরম কষ্টের মধ্যে ছিল। রাজিয়া সুলতান বিদ্রোহীদের থেকে অবসর হওয়া মাত্রই কুতুবুদ্দিন হাসানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী এই রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিলেন। এই বাহিনী হিন্দু রাজাদের ঘেরাও ভেঙে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করল। ফিরে আসার আগে কুতুবুদ্দিন হাসান রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী রনথম্ভোর দুর্গের প্রাচীর ভেঙে তা জনশূন্য করে দিলেন যাতে হিন্দুরা পরবর্তীতে এটিকে নিজেদের কেন্দ্র বানাতে না পারে। [১]

গোয়ালিয়র বিজয়:

গোয়ালিয়রের শাসক জিয়াউদ্দিন জুনাইদি এখন পর্যন্ত রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেননি। রাজিয়া চেয়েছিলেন যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হোক। ফলে একটি বাহিনী গোয়ালিয়রে পাঠানো হলো এবং সেই সাথে এর কমান্ডারের মাধ্যমে গোয়ালিয়রের শাসকের জন্য মূল্যবান উপহার ও পুরস্কারও পাঠানো হলো। এই নীতি সফল হলো এবং ১লা শাবান ৬৩৫ হিজরিতে গোয়ালিয়রের শাসক আনুগত্য স্বীকার করে দুর্গের দরজা রাজকীয় বাহিনীর জন্য খুলে দিলেন। রাজিয়া সুলতান গোয়ালিয়রে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা জামিয়া নাসিরিয়ার ব্যবস্থাপনা কাজী মিনহাজুস সিরাজের ওপর অর্পণ করলেন। [২]

জনকল্যাণ এবং ন্যায়বিচার:

রাজিয়া সরকারের ভিত্তি মজবুত করার পর জনগণকে সচ্ছল ও সন্তুষ্ট রাখার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করেন। মানুষ তার ন্যায়বিচারের কারণে তাকে পছন্দ করতে শুরু করল। তিনি আলাপ-আলোচনার কৌশল অবলম্বন করে অনেক বিরোধীকে অনুসারী বানিয়ে নিলেন। রাজিয়া সুলতানের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নিরপেক্ষ জবাবদিহিতা। এতে ছোট-বড় কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তিনি মজলুম ও অসহায়দের ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তার দরবারে এমন নিঃস্বদের জন্য একটি স্থায়ী বিভাগ ছিল যেখানে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিকার করা হতো। [৩]

নারীদের অধিকার:

রাজিয়া নারীদের সংশোধন এবং তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি নারীদের পারিবারিক ও গোত্রীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে এবং ঐক্য ও সংহতির উপদেশ দিতেন। দিল্লিতে তাতারী, মুঘল, হিন্দু এবং...

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৬০

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৬০

[৩] তারিখে মিল্লাত: পৃ. ৪৭৩, ৪৭৪

বিভিন্ন জাতি সেখানে বসবাস করত। রাজিয়া তাদের নারীদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিতেন এবং তাদের সাথে এত সদয় ও মেহেরবানি আচরণ করতেন যে তারা তার ভক্ত হয়ে যেত এবং অনেক অমুসলিম নারী ইসলাম গ্রহণ করত। মজলুম নারীদের ইনসাফ পাইয়ে দেওয়ার জন্য একটি আলাদা বিভাগ ছিল যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজিয়ার বিশেষ সহচরী, কারাহ খানম। তিনি অসহায় নারীদের অবস্থা জানতেন। তাদের থেকে মৌখিক উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে সেগুলোকে লিখিত আবেদনে রূপান্তর করাতেন। তারপর সেই আবেদন অনুযায়ী ওই নারীদের ইনসাফ পাইয়ে দেওয়া হতো। এজন্য সেই যুগের ঐতিহাসিকরা বলতেন যে রাজিয়া আদল ও ইনসাফে তার পিতার থেকেও এগিয়ে গিয়েছিলেন। [১]

ওলামা ও মাশায়েখদের প্রতি ভক্তি, ইলমি আলোচনা এবং দ্বীনি আত্মমর্যাদা:

সুলতানা আমোদ-প্রমোদের মজলিসের পরিবর্তে ইলমি মজলিস ও আলোচনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা থেকে যেটুকু সময় বাঁচত, তাতে তিনি এমন মজলিস আয়োজন করতেন যেখানে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত হতেন। অন্যান্য ধর্ম ও ফেরকার লোকদেরও সুযোগ দেওয়া হতো যাতে তারা মার্জিতভাবে তাদের ধর্মের পরিচয় তুলে ধরতে পারে। কিন্তু এর পাশাপাশি সুলতানার মধ্যে দ্বীনি আত্মমর্যাদাও অনেক ছিল, এজন্য কাউকে ইসলাম বা আসলাফ (পূর্বসূরিদের) প্রতি কটাক্ষ করার অনুমতি দেওয়া হতো না। একবার মুলতানের কারামতিয়াদের মধ্য থেকে একজন দাঈ এই মজলিসে আসে এবং কুফরি ও নাস্তিকতার দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি ওলামায়ে আহনাফকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। সুলতানা রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। ফলে তাকে হত্যা করা হয়। [২]

ধর্মীয় খিদমত:

রাজিয়া সুলতান ফিকহে হানাফীর অনুসারী ছিলেন এবং দ্বীনি আকিদা ও মতাদর্শে অটল ছিলেন। তার দরবারে ওলামায়ে কেরামের আধিক্য ছিল। অধিকাংশ ওলামা ও ফুকাহা আহনাফদের মধ্য থেকে ছিলেন। তিনি প্রায়ই ওলামাদের মজলিসে বসতেন, তাদের কাছে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতেন এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়েও পরামর্শ নিতেন। তিনি ওলামা ও ফুকাহাদের একটি কমিটি গঠন করেছিলেন যাদের পরামর্শে বিধানসমূহ নির্ধারিত হতো এবং সেগুলো প্রচার করা হতো। এই ফুকাহাদের মধ্যে সুলতান ইলতুতমিশের আমলের চারজন ফকীহ বিশিষ্ট ছিলেন: কাজী সাঈদ উদ্দিন, কাজী নাসির উদ্দিন, কাজী জালাল উদ্দিন এবং কাজী কবীর উদ্দিন। এই ব্যক্তিরা রাজিয়ার লশকর বা বাহিনীর কাজীও ছিলেন। [৩]

প্রতি জুমাবারে ওলামাদের একটি বিশেষ মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। মজলিসের সভাপতিকে “মীর-এ-মাহফিল” বলা হতো। এই সম্মান পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সদস্যদের দেওয়া হতো। রাজিয়া এক কোণে অত্যন্ত আদবের সাথে বসে ওলামাদের আলোচনা শুনতেন। পরিশেষে শরবত, ফলমূল এবং অন্যান্য উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে মজলিস সমাপ্ত হতো। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৮

[২] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৪

[৩] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৬, ৪৭৭

[৪] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৭

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মজলিস-ই-তহকীক ও তসনীফ:

সুলতানা গবেষণামূলক ও রচনামূলক কাজের জন্য একটি ইলমী মজলিসও গঠন করেছিলেন, যার সদস্যদের মধ্যে কাজী শামসুদ্দিন, কাজী জালালুদ্দিন কাশানি, শেখ মুহাম্মদ সাউজি এবং আল্লামা নূরুদ্দিন মুহাম্মদ আউফি উল্লেখযোগ্য। আল্লামা আউফির 'জামেউল হিকায়াত ওয়া লাওয়ামিউর রিওয়ায়াত' একটি দরকারী এবং শিক্ষামূলক ইতিহাসের মর্যাদা রাখে। [১]

খানকাহসমূহের সাথে সহযোগিতা:

রাজিয়া খানকাহসমূহের সাথেও সহযোগিতা করতেন। এটি ছিল দিল্লিতে খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর চিশতিয়া খানকাহর উন্নতির সময়। খাজা সাহেব ইন্তেকাল করেছিলেন কিন্তু তাঁর খলিফাদের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণের পরপরই খানকাহগুলোর জন্য মূল্যবান বৃত্তি চালু করেন এবং চিশতিয়া খলিফাগণ বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন খানকাহ খুলে ইসলামের প্রচার এবং উম্মতের প্রশিক্ষণের কাজ পূর্ণ একাগ্রতার সাথে শুরু করেন। এই খানকাহগুলোতে সকাল-সন্ধ্যা লঙ্গরও চালু ছিল, যেখানে ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম সবাই এক জায়গায় বসে খাবার খেতেন। এতে সাম্যের একটি চমৎকার রূপ ফুটে উঠত এবং অনেক মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতেন। রাজিয়ার পক্ষ থেকে গোপনে এই খানকাহগুলোতে আর্থিক সহায়তা অব্যাহত ছিল। [২]

মাদরাসা নির্মাণ ও উন্নতি:

রাজিয়া তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনামলে স্থানে স্থানে মাদরাসা স্থাপন করেন। তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া নাসিরিয়াকে উন্নত করে একটি বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। [৩]

দ্বীনি পরিবেশ:

এই যুগে মসজিদগুলো আবাদ ছিল এবং মুসল্লিতে ভরপুর থাকত। নামাজের পাবন্দি বা নিয়মিতকরণের তদারকি করা হতো। প্রকাশ্যে নামাজ ত্যাগকারীদের বেত্রাঘাত করা হতো। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জাকাতের অর্থ এবং জমিদারদের কাছ থেকে উশর আদায়ের ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছিল। জাকাত ও উশরের অর্থ হকদারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আরও স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করা হয়েছিল। এই যুগের ঐতিহাসিকদের মতে, রাজিয়ার প্রচেষ্টায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। [৪]

বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়:

রাজিয়া সুলতানের শাসন কার্যক্রমের দিক থেকে খুব ভালো চলছিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে লাভা ফুটছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, রাজিয়া সুলতান যোগ্যতা ও আত্মত্যাগের প্রমাণ দানকারীদের পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদানের কারণে একজন হাবশি অফিসার জামালুদ্দিন ইয়াকুতকে আমিরুল উমারা পদে ভূষিত করা হয়েছিল। যেহেতু সালতানাতের অধিকাংশ... [৫]

---

[১] তারিখ-ই-মিল্লাত: ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৭

[২] তারিখ-ই-মিল্লাত: ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৭

[৩] তারিখ-ই-মিল্লাত: ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৭

[৪] তারিখ-ই-মিল্লাত: ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৭

[৫] তারিখ-ই-মিল্লাত: ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৭

তুর্কি অফিসাররা ছিলেন, তাই একজন হাবশির এই উন্নতি তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল এবং এই কারণেই তারা সুলতানার ওপরও অসন্তুষ্ট হলেন। এ ছাড়া সুলতানার কিছু নতুন নিয়োগও কিছু আমিরের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। [১]

ফলে এর পর ৬৩৭ হিজরিতে সুলতানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক নতুন ধারা শুরু হয়।

লাহোরে বিদ্রোহ:

সর্বপ্রথম রাজিয়ার অত্যন্ত বিশ্বস্ত আমির মালিক ইজ্জুদ্দিন কবির খান বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন, যিনি লাহোরের ওয়ালি ছিলেন। সুলতানা রাজিয়া এই অভিযানকে অস্বাভাবিক মনে করে কোনো আমিরকে পাঠানোর পরিবর্তে নিজেই সেনাবাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন এবং লাহোরের দিকে যাত্রা করেন। যখন সেনাবাহিনী লাহোরের উপকণ্ঠে পৌঁছাল, তখন কবির খান তার বাহিনী নিয়ে পিছু হটেন এবং রাভি নদী পার হয়ে সোহদরার দিকে চলে যান। সুলতানা তার বাহিনী নিয়ে তাকে তাড়া করতে থাকেন, তবে তিনি চেয়েছিলেন যতটা সম্ভব আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করতে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো এবং মালিক কবির খানের সাথে আলোচনা সফল হলো। তিনি পুনরায় আনুগত্যের বলয়ে ফিরে এলেন। সুলতানা তার কাছ থেকে লাহোরের শাসনভার নিয়ে তার বদলে মুলতানের শাসনভার প্রদান করেন, যা আগে মালিক কারাকুশ-এর কাছে ছিল, আর কারাকুশকে বায়ানার জায়গির দেওয়া হলো।

১৯ শাবান ৬৩৭ হিজরিতে সুলতানা রাজিয়া এই অভিযানে সফল ও বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন। [২]

ভাতিন্ডার যুদ্ধ - রাজিয়ার গ্রেফতারি:

সুলতানা ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই তাকে এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে হলো। দিল্লির অনেক তুর্কি আমির, যারা ইয়াকুত হাবশির উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন, তারা এক নতুন বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করছিলেন। এই আমিরদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আমির হাজিব আইতগিন।

যখন জামালুদ্দিন ইয়াকুতকে পদোন্নতি দেওয়া হলো এবং সুলতানা তার ওপর বেশি আস্থা রাখতে শুরু করলেন, তখন আমির হাজিব আইতগিন ঈর্ষান্বিত হলেন। একইভাবে আরও অনেক তুর্কি, ঘুরি এবং তাজিক আমির তার সাথে একমত হলেন এবং সুলতানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করলেন।

যেহেতু দিল্লির জনগণ সুলতানাকে সম্মান করত, তাই এই হিংসুকদের সুলতানার বিরুদ্ধে সরাসরি রুখে দাঁড়ানোর সাহস ছিল না। ফলে তারা ভাবলেন অন্য কোনো স্থানে এমন বিদ্রোহ সৃষ্টি করা হোক যাতে সুলতানা সেখানে যেতে বাধ্য হন...

---

[১] লেখকের মতে ফিতনার আসল কারণ ছিল বর্ণ ও বংশগত বিদ্বেষ। তুর্কি আমিররা প্রায়ই একে অপরের আত্মীয় ছিলেন এবং সালতানাতকে নিজেদের উত্তরাধিকার মনে করতেন। একজন হাবশির এই মর্যাদা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। রাজনৈতিক শত্রুতা অন্ধ হয় এবং অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সীমানা মানে না। তাই এখানেও ইয়াকুত ও সুলতানার মধ্যে প্রেমের কাহিনী রটিয়ে সুলতানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিবেশ তৈরি করার এবং ইয়াকুতকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

[২] (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৩৬০; পৃষ্ঠা ৪৬) এখানে তাবাকাত-ই-নাসিরিতে রাজিয়ার ফিরে আসার তারিখ ১৯ রমজান লেখা হয়েছে এবং এরপর তার ভাতিন্ডা অভিযানে রওনা হওয়ার তারিখ ৯ রমজান লেখা হয়েছে। স্পষ্টতই এটি সঠিক হতে পারে না। তারিখ-ই-মুবারক শাহিতে লাহোর থেকে ফেরার তারিখ ১৯ শাবান এবং ভাতিন্ডা রওনা হওয়ার তারিখ ৯ রমজান উল্লেখ আছে (পৃষ্ঠা ২৭)। সুতরাং এটাই সঠিক।

...যাওয়া হোক এবং পেছন থেকে দিল্লির সিংহাসনে অন্য কাউকে বসিয়ে দেওয়া হোক।

এখানে এ কথাটি উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লির জনগণের পূর্ণ সমর্থনের কারণেই রাজিয়া সুলতান রাজমুকুট ও সিংহাসন লাভ করেছিলেন এবং দিল্লির জনগণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ও সমর্থন শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। এ কারণেই যতক্ষণ তিনি দিল্লিতে ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদের ভেতরে বা বাইরে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হতে পারেনি। এই কারণেই ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে দিল্লির বাইরে পাঠানো জরুরি মনে করেছিল।

সেই সময় ভাতিন্ডার শাসক মালিক আলতুনিয়া অত্যন্ত প্রভাবশালী আমির ছিলেন এবং নিজের বীরত্ব ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে সবদিকে পরিচিত ছিলেন। দিল্লির বিশ্বাসঘাতক আমিরদের পক্ষ থেকে তাঁকে বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়া হয় এবং গোপনে পারস্পরিক আঁতাত করে নেওয়া হয়।

এই সুযোগে মুলতানের প্রাক্তন শাসক মালিক কারাকুশ-এর রূপে মালিক আলতুনিয়া একজন শক্তিশালী সাহায্যকারী পেয়ে যান। সুলতানা সম্প্রতি লাহোরের বিদ্রোহ দমন করে মালিক কারাকুশ-এর কাছ থেকে মুলতানের শাসনভার নিয়ে কবির খানকে দিয়েছিলেন। এতে মালিক কারাকুশ-এর মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

আবার মালিক কারাকুশ-এর সাথে মালিক আলতুনিয়ার পুরনো ও অত্যন্ত গভীর বন্ধুত্ব ছিল। মালিক ইয়াকুত হাবশীর উন্নতিতে ঈর্ষার ক্ষেত্রেও এই দুজনেই একমত ছিলেন। এখন যখন দিল্লির ষড়যন্ত্রকারী আমিরদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আমন্ত্রণ জানানো হলো, তখন এই দুজনেই তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

মালিক আলতুনিয়ার বিদ্রোহের খবর শুনে রাজিয়া চমকে উঠলেন। নির্ভরযোগ্য আমিরদের অভাবের কারণে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁকে নিজেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ফলে ৯ রমজান ৬৩৭ হিজরি (১১ মার্চ ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ) তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে ভাতিন্ডার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আমির ইয়াকুত সেনাপতি হিসেবে সাথে ছিলেন। তবে এই সেনাবাহিনীতে অনেক আমির আগে থেকেই মালিক আলতুনিয়ার সাথে আঁতাত করে রেখেছিলেন।

যখন সেনাবাহিনী ভাতিন্ডার প্রাচীরের সামনে পৌঁছাল এবং উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো, তখন যুদ্ধের আগেই রাজিয়ার সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতক আমিররা আমির ইয়াকুত হাবশীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন। ইয়াকুত হাবশী নিহত হওয়ার পর সেনাবাহিনীতে এমন কোনো বড় অফিসার ছিল না যে সুলতানার নিরাপত্তার জন্য অটল হয়ে যুদ্ধ করত। বিশ্বাসঘাতক আমিররা রাজিয়া সুলতানকে গ্রেপ্তার করে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মালিক আলতুনিয়ার হাতে তুলে দিল, যিনি তাঁকে ভাতিন্ডার দুর্গে বন্দি করে রাখলেন।

এই আমিররা লক্ষ্য অর্জনের পরপরই দিল্লিতে বার্তা পাঠিয়ে নিজেদের সাফল্যের খবর জানান এবং সেই সাথে তাগিদ দেন যে অবিলম্বে মরহুম সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহকে সিংহাসনে বসানো হোক। ফলে ২৮ রমজান (৩০ মার্চ ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ) এই নির্দেশনা কার্যকর করা হয়। এভাবেই রাজিয়ার শাসনকাল শেষ হলো যা তিন বছর, পাঁচ মাস একুশ দিন স্থায়ী ছিল। [১]

বিদ্রোহের বড় ঘুঁটি আইতিগিনের আধিপত্য ও উত্থান:

১৫ শাওয়াল ৬৩৭ হিজরি বিশ্বাসঘাতকতা করা আমিররা দিল্লিতে ফিরে এলেন। [২] এখন মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহের বায়াত গ্রহণের পর্যায়...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৬১, ৩৬২; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ২৭, ২৮

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৩৬২, ৩৬৩

এল। এই অল্পবয়স্ক বালকের শাসনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। [১] রাজিয়ার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা প্রধান আমির আইতিগিন হাজিব চেয়েছিলেন যে একজন আনাড়ি বালকের আড়ালে তিনি নিজেই শাসন করবেন, তাই তিনি আনুগত্যের শপথের (বাইয়াত) সময় এই শর্ত আরোপ করেন যে যেহেতু বাদশাহ অল্পবয়স্ক, তাই অন্তত এক বছরের জন্য "নায়েবে সালতানাত" (সুলতানের প্রতিনিধি) নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করে তাকে দেওয়া হোক। ফলে তাই হলো। এরপর সালতানাতের কাজকর্ম আইতিগিনের হাতে চলে এল। তিনি মালিক মুহাজ্জিবুদ্দিন ওরফে নিজামুল মুলককে উজির হিসেবে নিযুক্ত করলেন। কিছুদিন পর তিনি বাহরাম শাহের এক বোনকে (যিনি কিছুকাল আগে খুলার মাধ্যমে স্বামীর থেকে আলাদা হয়েছিলেন) বিয়ে করে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করে নিলেন। [২]

আইতিগিনের শিক্ষণীয় পরিণতি - বাহরাম শাহের প্রকৃত ক্ষমতার সূচনা:

ইখতিয়ার উদ্দিন আইতিগিন তার পছন্দের লোকদের বড় বড় পদ, জায়গির এবং পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করেন, কিন্তু তিনি মালিক আলতুনিয়া এবং মালিক কারাকুশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন, অথচ রাজিয়া সুলতানের সিংহাসনচ্যুত করার ক্ষেত্রে তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং তারা এর বিনিময়ে মূল্যবান পুরস্কারের প্রত্যাশা করেছিলেন। বিশেষ করে যখন মালিক আলতুনিয়া কিছুই পেলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং ভাবতে বাধ্য হলেন যে তাকে একটি দাবার ঘুঁটি হিসেবে একটি ফিতনায় টেনে আনা হয়েছিল যাতে কেবল তার হাতই কালো হয়েছে।

ওদিকে রাজধানী দিল্লিতে পুতুল বাদশাহ বাহরাম শাহ নায়েবে সালতানাত আইতিগিন এবং উজির মুহাজ্জিবুদ্দিনকে সমস্ত বিষয়ে কর্তৃত্ব করতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন এবং একটি ঘুঁটি হয়ে সিংহাসনে বসে থাকা তার কাছে লজ্জাজনক মনে হচ্ছিল। অবশেষে তিনি একটি বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিলেন। তার আদেশে সিপাহসালার আহমদ সাদ দুজন তুর্কি গোলামকে প্রাণঘাতী হামলার জন্য প্রস্তুত করলেন।

আইতিগিন এবং উজির মুহাজ্জিবুদ্দিন রাজপ্রাসাদ "কাসরে সফিদ"-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় প্রাসাদের ওপরের তলা থেকে এই দুই গোলাম পাগলের মতো অভিনয় করতে করতে নিচে নেমে এল এবং দরবারে ঢুকে পড়ল। তাদের উন্মাদসুলভ আচরণ দেখে আইতিগিন তাদের জোরে ধমক দিলেন, যার সুযোগ নিয়ে তাদের একজন আইতিগিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং খঞ্জর দিয়ে এমন মারাত্মক আঘাত করল যে তিনি প্রাণ হারালেন। দ্বিতীয় গোলাম উজিরের ওপর হামলা করল। উজিরের বাহুতে দুটি ক্ষত হলো এবং তিনি পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। ওদিকে দরবারী ও আমিররা দুই গোলামকে কাবু করে ফেললেন। এটি ৮ মহরম ৬৩৮ হিজরির ঘটনা। তাদের পাগল মনে করে জেলে নিক্ষেপ করা হলো এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা চালানো সম্ভব হয়নি। পরে যখন বিষয়টি পুরনো হয়ে গেল, তখন বাহরাম শাহ তাদের মুক্তি দিলেন।

বাহরাম শাহ আইতিগিনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কাউকে নায়েবে সালতানাত বানাননি। তবে বদরুদ্দিন সানকার রুমিকে আমির হাজিব নিযুক্ত করে বেশিরভাগ প্রশাসনিক দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেন। [৩]

মালিক আলতুনিয়ার অনুশোচনা - রাজিয়া সুলতানের সাথে বিবাহ:

দিল্লিতে নায়েবে সালতানাতের হত্যার খবর থেকে স্পষ্ট ছিল যে সেখানে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র তুঙ্গে রয়েছে। এই পরিস্থিতি...

---

[১] যেহেতু বাদশাহ অল্পবয়স্ক ছিলেন (তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৩)

[২] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৩; তারিখ-ই মুবারক শাহী: পৃ. ২৮

[৩] তাবাকাত-ই নাসিরি: পৃ. ৪৩, ৪৪

আলতুনিয়াকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করেছিল। তিনি রাজিয়াকে বন্দী করে রেখেছিলেন কিন্তু তাঁর সাহসিকতা, আত্মমর্যাদা এবং সুন্দর রূপ ও চরিত্রের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাই তিনি ভাবতে লাগলেন যে পূর্বের ভুলের প্রতিকার এভাবেই করা যেতে পারে যে রাজিয়াকে বিবাহ করে তাঁকে তাঁর রানী হিসেবে পুনরায় সিংহাসনে বসানো হোক। রাজিয়াও দিল্লি জয়ের পরিকল্পনা করছিলেন। এভাবে মালিক আলতুনিয়া রাজিয়াকে রাজি করাতে সফল হন এবং ৬৩৮ হিজরির সফর মাসে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। [১]

রাজিয়ার দিল্লি অভিযান এবং করুণ পরিণতি:

শীঘ্রই তাঁরা দুজনে মিলে একটি যৌথ সরকার গঠনের সংকল্প নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন শুরু করেন। মালিক আলতুনিয়ার বন্ধু মালিক কারাকাশ এবং মালিক ইজ্জুদ্দিন মুহাম্মদ সালারও তাঁদের মিত্র হয়ে যান। [২] খোখর, জাট এবং অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বিপুল সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেনাবাহিনী ভাতিন্ডা থেকে দিল্লির দিকে যাত্রা করে। [৩]

এই সংবাদ পেয়ে বাহরাম শাহও তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বের হন যার সেনাপতি ছিলেন বলবন কবির (ইজ্জুদ্দিন)। ২৪ রবিউল আউয়াল ৬৩৮ হিজরিতে দিল্লির উপকণ্ঠে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় যাতে দিল্লির সেনাবাহিনী বিজয়ী হয় এবং মালিক আলতুনিয়া ও রাজিয়া সুলতান পরাজিত হন। [৪]

উভয়েই পিছু হটে ভাতিন্ডার দিকে রওনা হন কিন্তু যখন দিল্লি থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে কাইথাল (হরিয়ানা) পৌঁছান, তখন তাঁদের অবশিষ্ট সৈন্যরাও তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে। এমন সময় স্থানীয় হিন্দুরা তাঁদের ঘিরে ফেলে বন্দী করে এবং পুরস্কার ও সম্মানের লোভে তাঁদের দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে উভয়কে হত্যা করে। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ২৯।

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ২৯।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা কাসেমি: খণ্ড ১, পৃ. ২২৫।

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ৪৬২, ৪৬৩; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ২৯; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ২২৫। সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে এটি একটিই যুদ্ধ ছিল কিন্তু ফেরেশতার বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম যুদ্ধের পর রাজিয়া ও মালিক আলতুনিয়া পরাজিত হয়ে ভাতিন্ডা পৌঁছান এবং দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে সফল হন। এর কিছুদিন পর তাঁরা নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হন যাতে পরাজিত হওয়ার পর তাঁরা নিহত হন।

[৫] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ. ৪৬২, ৪৬৩; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ২৯; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ২৩৬। তাবাকাত-ই-নাসিরি অনুযায়ী হিন্দুরা তাঁদের উভয়কে বন্দী করে সেখানেই শহীদ করে দেয়। “সুলতান রাজিয়া ও আলতুনিয়া হিন্দুস্তানিদের হাতে বন্দী হয়ে শহীদ হন।” (পৃ. ৪৬২) এবং “রাজিয়া সুলতান ও আলতুনিয়া হিন্দুদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।” (পৃ. ৪৬৪)। ইয়াহিয়া সিরহিন্দি বলেন: “তাঁদেরকে বন্দী করে ২৫ রবিউল আউয়াল তারিখে দরবারে (দিল্লিতে) পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং পথিমধ্যে উভয়কে শহীদ করা হয়।” অর্থাৎ হিন্দুরা তাঁদের বেঁধে দিল্লির দরবারে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। ২৫ রবিউল আউয়াল তারিখে উভয়কে শহীদ করা হয়। (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ২৯)। লেখক এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন কারণ রাজিয়া সুলতানের কবর দিল্লির উপকণ্ঠে পাওয়া যায়। অন্যথায় কাইথাল বা তার আশেপাশে হওয়া উচিত ছিল। ইবনে বতুতার বর্ণনা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি লেখেন: রাজিয়া একা পালিয়ে যান, ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে তাঁর অবস্থা শোচনীয় ছিল। একজন কৃষককে চাষ করতে দেখে তিনি তাঁর কাছে কিছু খাবার চাইলেন। সে তাঁকে এক টুকরো রুটি দিল। তিনি তা খেলেন। তারপর তাঁর তন্দ্রা এসে গেল। তিনি পুরুষালি পোশাকে ছিলেন। যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, কৃষক তাঁর পোশাকের নিচে রত্নখচিত কোমরবন্ধ দেখে বুঝতে পারল যে তিনি একজন নারী। অতঃপর সে তাঁকে হত্যা করে তাঁর পোশাক ও ঘোড়া নিয়ে নিজের জমিতে পুঁতে ফেলল। তারপর তাঁর কিছু কাপড় বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে গেল। সেখানে এক ব্যবসায়ী তাঁর কাছে এমন পোশাক দেখে অবাক হয়ে কোতোয়ালকে খবর দিল। যখন কোতোয়াল তাকে মারধর করল তখন সে রাজিয়াকে হত্যার কথা স্বীকার করল এবং তাঁর দাফনের স্থানটিও দেখিয়ে দিল। অতঃপর লোকেরা রাজিয়ার লাশ বের করে গোসল ও কাফন দিয়ে সেখানেই (দিল্লির কাছে) দাফন করল এবং তাঁর কবরের ওপর একটি গম্বুজ তৈরি করে দিল যেখানে মানুষ জিয়ারত করতে আসে। এই কবরটি দিল্লি থেকে তিন মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। (সফরনামা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৩২)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

রাজিয়ার কবর:

রাজিয়া সুলতানের কবর নয়াদিল্লির "বুলবুলি খানা" মহল্লায় জনবসতি দ্বারা বেষ্টিত, যাকে মানুষ "রজি বজি কি দরগাহ" বলে থাকে। এগুলো দুটি কবর। "রজি" বলতে রাজিয়ার কবর এবং "বজি" বলতে "বজিলা বেগম" নামক এক মহিলার কবরকে বোঝানো হয়েছে। [১]

মাজার-ই-ইলতুতমিশ:

রাজিয়া সুলতান খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার প্রাঙ্গণে সমাহিত তাঁর পিতার কবরের ওপর একটি সুন্দর মাকবারা নির্মাণ করেছিলেন, যাতে গ্রানাইট, লাল পাথর এবং মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল এবং দেয়ালগুলোতে কুরআনের আয়াতের নকশা ও কারুকাজ করা হয়েছিল। মাকবারার ওপর স্তম্ভযুক্ত গম্বুজ ছিল যা পরবর্তীতে কালের বিবর্তনে ভেঙে পড়ে। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁর শাসনামলে এটি মেরামত করান। [২]

রাজিয়ার চরিত্রের ওপর একটি মন্তব্য:

রাজিয়া ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ইনসাফ, দানশীলতা এবং সাহসিকতা ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর শাসনকাল সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি পুরুষ শাসকদের জন্য উত্তম চরিত্র, জনসেবা এবং উদারতার এক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। [৩]
কাজী মিনহাজুস সিরাজ, যিনি ওই যুগের বিশিষ্ট আলেম, বুজুর্গ এবং ঐতিহাসিক ছিলেন, রাজিয়া সম্পর্কে লিখেছেন:
"রাজিয়া সুলতান, আল্লাহ তাঁর কবরকে শীতল করুন, মহান, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু ছিলেন। তিনি আলেমদের সম্মানকারী, জনগণের যত্নশীল এবং যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর মধ্যে বাদশাহদের যোগ্য সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।" [৪]
এই গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তাঁর নারীত্বের কারণে অধিকাংশ আমির তাঁর শাসনকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। মালিক ইয়াকুতকে পদোন্নতি দেওয়া তাদের হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা তিলকে তাল বানিয়ে বিভিন্ন ধরণের অপবাদ রটায়।

রাজিয়ার ওপর মিথ্যা অপবাদ এবং এর বাস্তবতা:

এই অপবাদগুলোর মধ্যে একটি হলো রাজিয়া ইয়াকুত হাবশীর প্রেমে পড়েছিলেন, তাদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং ইয়াকুত রাজিয়ার বগলে হাত দিয়ে তাঁকে ঘোড়ায় বসাতেন, অথবা রাজিয়া সুলতান হাতি বা ঘোড়ায় চড়ার সময় ইয়াকুত হাবশীর সাহায্য নিতেন। এই কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ রাজিয়া সুলতান ঘোড়সওয়ারিতে পুরুষদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁর প্রয়োজনই ছিল না যে কেউ তাঁকে সাহায্য করে সওয়ারিতে ওঠাবে।
এটি নিছক একটি কাহিনী যার মর্যাদা সেলিম ও আনারকলির মতো গল্পের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এই যুগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ তাবাকাত...

---

[১] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৭

[২] তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮০

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩৫ থেকে ৫৪০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৪ থেকে ২৩৬

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩৫

নাসিরী এবং তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে এসব কথার কোনো উল্লেখ নেই। ইবনে বতুতাও একে একটি অপবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রথম ইসামী দীর্ঘকাল পর এই অপবাদকে কাব্যিক ঢঙে উপস্থাপন করেন এবং নিজের ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে রাজিয়া ও ইয়াকুতের 'দাস্তানে ইশক' বর্ণনা করেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ, যেমন মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা, যাচাই-বাছাই ছাড়াই তা নকল করে গেছেন। যদি এসব কথার মধ্যে কোনো সত্যতা থাকত, তবে এই বিষয়টি তখনই প্রসিদ্ধ হতো যখন রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই কথাগুলো তখন বেশি প্রসিদ্ধ হয় যখন ৬৩৭ হিজরিতে তিনি বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করছিলেন। স্পষ্টতই বাহরাম শাহকে সিংহাসনে বসানোর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য এসব কথা রটানো হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজিয়ার পবিত্র চরিত্রের বিরুদ্ধে এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সময় অধিকাংশ ব্যক্তিত্বই অপবাদের শিকার হন, ফলে এই মিথ্যা গুজবগুলো রাজিয়ার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চিন্তা ও গবেষণার বিষয়:

এখানে আমাদের আবারও এই দিকটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত যে, মুসলমানদের মধ্যে যখনই সালতানাতের ব্যবস্থা যোগ্যতা ও সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে শুরাইয়াত (পরামর্শমূলক ব্যবস্থা)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন সর্বোত্তম নেতৃত্ব নসীব হয়েছে। এর বিপরীতে যখনই শাসন ব্যবস্থায় 'বংশানুক্রমিক নীতি'কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তখন যোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বের সম্ভাবনা কমে গেছে।

ইলতুতমিশ পর্যন্ত দাস বংশে যোগ্যতার নীতি কার্যকর ছিল, তাই একে একে ইলতুতমিশের মতো দুই জন অত্যন্ত যোগ্য মানুষ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ইলতুতমিশ তার উত্তরসূরি নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। যদি ছেলেরা অযোগ্য ছিল, তবে সালতানাতের আমিরদের মধ্য থেকে কোনো যোগ্যতম ব্যক্তিকে উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচন করা উচিত ছিল। বলবন সগীর (বাহাউদ্দিন) বা বলবন কবীর (ইজ্জুদ্দিন)-এর মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা থাকা সত্ত্বেও সালতানাত তার নিজ বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। এর ফলাফল দাঁড়ালো বোন ও ভাইদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, যা দেশের জন্য কোনোভাবেই শুভ লক্ষণ ছিল না। [১]

---

[১] নারীর শাসন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামে নেতৃত্ব (সরকার, বিচার বিভাগ এবং ইমামতে কুবরা)-এর মতো পদগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল। এসব পদের জন্য শরীয়ত বিশেষ শর্তাবলি নির্ধারণ করেছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "সেই জাতি কখনোই সফল হবে না যারা তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব কোনো নারীর হাতে সঁপে দেয়।" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৪৪২৫, বাব কিতাবুন নবী (সা.) ইলা কায়সার)।

এর কারণ হলো, নারীরা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন, যার ফলে সাধারণত নারীরা সৃষ্টিগতভাবে নাজুক ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে বেশি পারদর্শী হয়; যেমন গৃহস্থালি কাজ, সন্তান লালন-পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সৃজনশীল শিল্পকলা।

তাই ইসলামী ফকীহগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হলো, নারীর নেতৃত্ব (অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া) এই পদের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এই পদে এমন সব দায়িত্ব, যুদ্ধের সিদ্ধান্ত, বাস্তব রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যা সৃষ্টিগতভাবে নারীর দায়িত্ব ও কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, নারী কোনো ক্ষেত্রেই সেবা প্রদান করতে পারবে না। কুরআন ও সুন্নাহতে আমরা হযরত মারইয়াম, রাণী সাবা, হযরত খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং অন্যান্য নারীদের ইতিবাচক ভূমিকার কথা পাই, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের মতো শাসনভার একটি ব্যতিক্রম বিষয়, মূল নীতি নয়।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

মুইজুদ্দিন বাহরাম শাহ বিন ইলতুতমিশ

৬৩৭ হিজরি থেকে ৬৩৯ হিজরি

(১২৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৪২ খ্রিস্টাব্দ)

বলা হয়েছে যে, যখন রাজিয়া সুলতানকে ভাতিন্ডা দুর্গে বন্দী করা হয়েছিল, তখন বিরোধী আমীরগণ ১৫ শাওয়াল ৬৩৭ হিজরিতে দিল্লিতে পৌঁছে শাহজাদা মুইজুদ্দিন বাহরাম শাহের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তখন থেকেই তিনি দিল্লির বাদশাহ ছিলেন। তাঁর শাসনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তিনি দেশ পরিচালনা করতে পারছিলেন না। রাজধানী দিল্লিতে সালতানাতের আমীরদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। প্রাসাদে সবদিকেই ষড়যন্ত্র চলছিল। সালতানাতের উজির মুহাজ্জিবুদ্দিন নিজামুল মুলকের ওপর বাদশাহর ষড়যন্ত্রে একটি প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল এবং উজির নিশ্চিতভাবেই তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বাদশাহর সাথে তাঁর বনিবনা ছিল না, যদিও বাহ্যিকভাবে তিনি সালতানাতের অনুগত ছিলেন।

একজন মজজুব, বাদশাহর বুদ্ধির ওপর সওয়ার:

সেই দিনগুলোতে আইয়ুব নামে এক তুর্কি মজজুবের খুব চর্চা হচ্ছিল। আগে সে মেহেরপুরা জনপদে বাস করত। সেখানকার কাজী শামসুদ্দিন মেহের, যিনি ইলম ও ফজিলতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন, তার কোনো এক আচরণের কারণে তাকে মারধর করে জনপদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এখন সে দিল্লিতে এসে হাউজে সুলতানিতে চিল্লা শুরু করে দিল। এভাবে তার ইবাদত ও রিয়াযতের শোরগোল পড়ে গেল এবং বাদশাহও তার ভক্ত হয়ে গেলেন। যখন সে দেখল যে বাদশাহ তার প্রতিটি কথা মেনে নিচ্ছেন, তখন সে কাজী শামসুদ্দিন মেহেরের ওপর এমন সব অভিযোগ আরোপ করল যে বাদশাহ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং তিনি কাজী শামসুদ্দিনকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে মেরে ফেললেন। এই ঘটনায় দিল্লিতে ভয়ের একটি ঢেউ খেলে গেল এবং প্রত্যেকেই এই অল্পবুদ্ধি বাদশাহকে ভয় পেতে শুরু করল। [১]

লাহোরে মঙ্গোলদের আক্রমণ। দ্বীনদার মুহাম্মদ এবং মালিক কারাকুশের বীরত্ব:

দিল্লি সালতানাত যখন এই রাজনৈতিক দুর্বলতা ও সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই মঙ্গোলরা আবারও উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। তাদের কমান্ড তায়ির বাহাদুর নামক এক বিখ্যাত মঙ্গোল কমান্ডারের হাতে ন্যস্ত ছিল, যে হেরাত ও বাদগিসের শাসক ছিল।

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৬৬

সেই সময়ে কবীর খান আয়াজ মুলতানের এবং ইখতিয়ার উদ্দিন কারাকুশ লাহোরের ওয়ালী ছিলেন। যখন মঙ্গোলরা সিন্ধু নদ পার হয়ে এল, তখন মালিক কবীর উদ্দিন আয়াজ শহর রক্ষার ব্যবস্থা করে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। মঙ্গোলরা যখন জানতে পারল, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে মুলতানের পরিবর্তে লাহোরে আক্রমণ করা উচিত। ফলে তারা জমাদিউল আখিরা ৬৩৯ হিজরী (১২৪১ খ্রিষ্টাব্দ) সালে লাহোরে পৌঁছে গেল এবং শহরটি অবরোধ করল।

লাহোর কোনো বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কেল্লায় খাদ্য বা যুদ্ধ সরঞ্জামের কোনো বড় মজুদ ছিল না। লাহোরের নাগরিকরাও ছিল উদাসীন। এর কারণ ছিল এই যে, সেখানকার অধিকাংশ মানুষ ছিল ব্যবসায়ী। তারা মঙ্গোলদের শাসনাধীন খোরাসান ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত যাতায়াত করত। এই ব্যবসায়ীরা নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তার খাতিরে মঙ্গোল কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ভ্রমণ অনুমতিপত্র ও আমান-নামা (নিরাপত্তাপত্র) সংগ্রহ করে রেখেছিল, তাই তারা আশা করেছিল যে যুদ্ধে তারা নিরাপদ থাকবে। ফলে তারা শহরের প্রাচীর ও কেল্লা রক্ষায় মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন কারাকুশকে কোনো প্রকার উৎসাহ-উদ্দীপনা বা সহযোগিতা প্রদর্শন করেনি।

বিপদ আরও বাড়ল এই কারণে যে, দিল্লি থেকেও কোনো সাহায্য আসছিল না। কারণ দিল্লির ঘুরি ও তুর্কি সরদাররা সুলতান মুইজ উদ্দিন বাহরাম শাহকে ভয় পেত এবং তার প্রতি আস্থাহীন ছিল। পারস্পরিক মতভেদ এবং সীমান্ত বিপদের কারণে সেখানে কোনো সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি।

মালিক কারাকুশ অত্যন্ত সাহসী ও হিম্মতওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে পরিখা থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যান। মঙ্গোলরা বারবার শহরের ওপর প্রবল আক্রমণ চালাত এবং কারাকুশ তার অল্প কিছু জানবাজ সঙ্গীদের নিয়ে তাদের পিছু হটিয়ে দিতেন। তবে মঙ্গোলরা মানজানিকের (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) সাহায্যে শহরের প্রাচীরে অনবরত পাথর বর্ষণ করতে থাকে, যার ফলে প্রাচীর অনেক জায়গায় দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ে।

কারাকুশ নিশ্চিত হলেন যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রাচীর ধসে পড়বে এবং মঙ্গোলরা শহরে ঢুকে পড়বে। এটি দেখে তিনি আরও বেশি ব্যথিত হলেন যে, শহরের মানুষ প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধে কোনো বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে না। যতক্ষণ কারাকুশের পক্ষে সম্ভব ছিল, তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান, কিন্তু পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে দেখে তিনি শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর আগে তিনি গোপনে শহরের কোষাগার রাভী নদীর তীরে পানির নিচে পুঁতে রাখেন এবং সেখানে একটি বিশেষ চিহ্ন দিয়ে দেন।

এরপর তিনি তার সৈন্যবাহিনী, ভৃত্য ও পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে এক রাতে শহর থেকে বের হয়ে মঙ্গোলদের ওপর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন যে তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল এবং এভাবে তিনি অবরোধ ভেঙে দিল্লির দিকে রওনা হলেন। এই ঝোড়ো আক্রমণ ও বিদ্যুৎগতির পলায়নে তার শত শত সঙ্গী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হন এবং কেউ কেউ কবরস্থান বা জনমানবহীন প্রান্তরে আত্মগোপন করেন। পরিবারের বেশ কিছু নারীও পেছনে রয়ে যান, যারা যে যেখানে পেরেছেন আত্মগোপন করে থাকেন।

লাহোরের মানুষ এ পর্যন্ত তাদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তামাশা দেখছিল এবং তারা মনে করেছিল যে মঙ্গোলরা তাদের আমান-নামার মর্যাদা রক্ষা করবে। কিন্তু যখন তারা দেখল কারাকুশ শহর ছেড়ে চলে গেছেন এবং সৈন্যবাহিনী নেই, তখন তারা বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে মঙ্গোলরা প্রাচীর ভেঙে শহরে প্রবেশ করল এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ শুরু করল। চারদিকে লাশের...

স্তূপ দেখে লাহোরের নাগরিকদের চোখ খুলে গেল। তারা ঐতিহাসিক সাহস ও সংকল্প প্রদর্শন করে নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং হাতে তলোয়ার নিয়ে অলিগলি ও রাজপথে নেমে এল। লাহোরের কোতোয়াল আক সানকার এবং শহরের আস্তাবল কর্মকর্তা আমির দ্বীনদার মুহাম্মদ তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তারা নিজেদের জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাতারীদের জাহান্নামে পাঠাতে শুরু করলেন। লাহোরের নাগরিকরাও তাদের মতো জীবনের বাজি ধরতে লাগল। তারা প্রতিটি অলিগলি ও প্রতিটি মহল্লায় আত্মোৎসর্গকারী লড়াই লড়ল। হাজার হাজার মানুষ ছাদ থেকে পাথর ও তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকল। লাহোরবাসীরা একটি বিশেষ লক্ষ্য স্থির করেছিল যে, তারা মঙ্গোলদের ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে আঘাত করতে থাকল যাতে তারা আর সামনে অগ্রসর হতে না পারে।

আমির দ্বীনদার মুহাম্মদ তার পুত্র ও ভৃত্যদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ তার শেষ নিঃশ্বাস অবশিষ্ট ছিল। এক অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মঙ্গোল সেনাপতি "তায়ের বাহাদুর" এবং আমির আক সানকার মুখোমুখি হলেন। উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হলো। উভয়ের নেজা একই সাথে একে অপরের দেহ ভেদ করে চলে গেল। মঙ্গোল সেনাপতিও সেখানেই লুটিয়ে পড়ল এবং আমির আক সানকারও তার প্রাণ স্রষ্টার নিকট সঁপে দিলেন।

যদিও মঙ্গোলরা শহর দখল করে নিয়েছিল, কিন্তু তাদের নিজেদের এত বেশি সৈন্য মারা গিয়েছিল যে তাদের গণনা করা কঠিন ছিল। প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ হাজারের বেশি মঙ্গোল এবং ৮০ হাজারের বেশি তাদের ঘোড়া মারা গিয়েছিল। আহতদের কোনো হিসাবই ছিল না। মঙ্গোলদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যার শরীরে নেজা, তলোয়ার বা তীরের আঘাত লাগেনি। মঙ্গোলদের অধিকাংশ "নয়ান" (উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) এবং "বাহাদুর" (মধ্যম সারির কর্মকর্তা) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।

মঙ্গোলরা এই পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির পর আর অন্য কোনো শহরের দিকে আক্রমণের যোগ্য ছিল না। তারা শহরটিকে যতটুকু সম্ভব লুট করল, ভবনগুলো ধ্বংস করল, কিন্তু শহরের যে ধনভাণ্ডার কারাকুশ পানির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা তাদের হস্তগত হলো না। সেই দিনগুলোতে তাদের খানে আজম ওকতাই (ওগদাই) খান মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং মঙ্গোলদের রীতি অনুযায়ী সামরিক অভিযানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সকল সরদারের জন্য কুরুলতাই (বড় সভা)-এ অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে মঙ্গোলরা লাহোর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথ বেছে নিল। তাদের চলে যাওয়ার সাথে সাথেই হিন্দু ও খোখাররা সুযোগ বুঝে নিল এবং তাদের অসংখ্য দল শহরে আসতে শুরু করল। যেখানেই তাদের সুযোগ মিলত, তারা মানুষের মালামাল লুট করে পালিয়ে যেত। এই সিলসিলা চলাকালীনই মালিক কারাকুশ, যিনি বিয়াস নদী পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, ফিরে এলেন। এসেই তিনি এই লুটেরাদের ধাওয়া করলেন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিলেন।

এরপর তিনি রাভি নদীতে লুকানো রাজকীয় ধনভাণ্ডার উদ্ধার করলেন এবং তা দিল্লিতে পৌঁছে দিলেন। [১]

বাহরাম শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ:

বাহরাম শাহ লাহোরের দুর্ঘটনার বিস্তারিত জানার পর সালতানাতের আমিরদের একত্রিত করে নতুন করে নিজের প্রতি আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এরপর উজির মুহাজ্জাব উদ্দিন নিজাম এবং সালার কুতুব উদ্দিন হাসান ঘুরিকে একটি বাহিনী দিয়ে লাহোরে পাঠালেন যাতে

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ১৬২, ১৬৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৩৮

মঙ্গোলদের প্রতিরোধ করা হোক। উজির মুহাজ্জিবুদ্দিনের ওপর যখন থেকে প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল, তখন থেকে তিনি বাহরাম শাহের ব্যাপারে ক্রমাগত ভীত ছিলেন। যদিও বাহ্যিকভাবে তিনি বাদশাহর অনুগত ও উৎসর্গিত প্রাণ সেজে ছিলেন, কিন্তু মনে মনে চাইতেন যে কোনোভাবে যেন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। অবশেষে তিনি ভাবলেন যে কোনোভাবে যদি সালতানাতের আমিরদের বাদশাহর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দেওয়া যায়, তবে ক্ষমতাচ্যুতির পথ সুগম হবে। ফলে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন এবং যখন সেনাবাহিনী বিয়াস নদীর তীরে সুলতানপুরে পৌঁছাল, তখন তিনি বাদশাহর নামে নিম্নোক্ত পত্র পাঠালেন:

“আপনি যেসব তুর্কি আমিরকে আমার সাথে পাঠিয়েছেন, তারা আদেশ পালন করছে না। উচিত হলো হুজুরের পক্ষ থেকে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার অনুমতি আমাদের প্রদান করা হোক, যাতে আমি কুতুবুদ্দিন হাসানের সাথে মিলে এই আমিরদের কাজ শেষ করে দিতে পারি।”

অল্পবয়সী বাহরাম শাহ চালাক সাজার চেষ্টা করলেও তিনি মোটেও দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন না। তিনি উজিরের চাল বুঝতে পারলেন না এবং জবাবে পাঠালেন:

“নিঃসন্দেহে তোমার এমন সঙ্গীরা মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য, কিন্তু এখন তাদের ঘাঁটানো ঠিক হবে না। এখন তাদের খাতির-যত্ন করে এই অভিযান শেষ করো। এরপর এই মুনাফিকদের তাদের অপকর্ম অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।”

উজির বাদশাহর এই পত্র আমিরদের সভায় পড়ে শোনালেন এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলেন যে তিনি তাদের কত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী যে এমন একটি সরকারি গোপন তথ্য তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। আমিরদের শরীরে আগুন জ্বলে উঠল এবং তারা উজিরের সাথেই পরামর্শ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং মঙ্গোলদের চিন্তা ছেড়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

১৯ শাবান ৬৩৯ হিজরিতে এই লোকেরা দিল্লি পৌঁছে গেল এবং এক হাঙ্গামা সৃষ্টি করল। শহরের অনেক মানুষও তাদের সাথে যোগ দিল। তিন মাস পর্যন্ত শহরে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করল। উলামা ও মাশায়েখদের পক্ষ থেকে বাদশাহ ও আমিরদের মধ্যে মীমাংসার অনেক চেষ্টা করা হলো, কিন্তু সব নিষ্ফল হলো। অবশেষে ৮ জিলকদ ৬৩৯ হিজরিতে বিদ্রোহীরা শহর ও কেল্লার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। বাহরাম শাহকে হেফাজতে নিয়ে ১৩ জিলকদ রাতে হত্যা করা হলো। তার শাসনকাল ছিল দুই বছর দেড় মাস। [১]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ৪৬৭, ৪৬৮; তারিখে মুবারক শাহী: পৃ. ৩১, ৩২

ইতিহাসে উম্মতে মুসলিমা

সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ বিন রুকন উদ্দীন

৬৩৯ হিজরি থেকে ৬৪৪ হিজরি

(১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)

বাহরাম শাহ নিহত হলে উমারাগণ 'দৌলত খানা' অর্থাৎ ইলতুতমিশের রাজকীয় কেল্লা দখল করে নেন, যা দুটি প্রাসাদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল যেগুলোকে কসর-ই-সফিদ এবং কসর-ই-ফিরোজী বলা হতো। [১]

এমন পরিস্থিতিতে তুর্কি উমারাদের সর্দার বলবন কবীর (ইজ্জউদ্দীন) রাজসিংহাসনে আসীন হন এবং নিজের বাদশাহীর ঘোষণাও করিয়ে দেন, কিন্তু দিল্লির উমারা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এতে একমত হননি। ফলে বলবন কবীরও কোনো ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেন।

বাহরাম শাহ তার শাসনামলে বেশ কয়েকজন শাহজাদাকে নজরবন্দি করে রেখেছিলেন। পারস্পরিক পরামর্শের পর নজরবন্দি শাহজাদাদের মধ্য থেকে আলাউদ্দীনকে নির্বাচিত করা হয়, যিনি ছিলেন ইলতুতমিশের নাতি এবং রুকন উদ্দীনের ছেলে। উমারাগণ তাকে কসর-ই-সফিদ এর বন্দিদশা থেকে বের করে কসর-ই-ফিরোজীতে নিয়ে আসেন এবং তাকে সিংহাসনে বসানো হয়।

সালতানাতের পদসমূহের নতুন করে বণ্টন ছিল নিম্নরূপ:

- নায়েবে সালতানাত: মালিক কুতুব উদ্দীন হাসান ঘুরী
- উজির-এ-সালতানাত: মুহাজ্জাব উদ্দীন নিজাম
- আমীর-ই-হাজিব: মালিক কারাকাশ
- সুবেদার রাজপুতানা: বলবন কবীর (ইজ্জউদ্দীন)

যেহেতু উজির মুহাজ্জাব উদ্দীন প্রাক্তন বাদশাহ বাহরাম শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল হোতা ছিলেন, তাই বাদশাহ নির্মাতা হিসেবে কার্যত তিনিই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাজিক বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি তুর্কি উমারাদের প্ররোচিত করে বিদ্রোহ করিয়েছিলেন

---

[১] কসর-ই-সফিদ ছিল প্রাচীন প্রাসাদ যেখানে কুতুব উদ্দীন আইবেকের দরবার বসত। কসর-ই-ফিরোজী পরবর্তীতে ইলতুতমিশের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। সম্ভবত এই প্রাসাদগুলোর রঙের কারণে এই নামগুলো দেওয়া হয়েছিল।

ছিল কিন্তু সফলতার পর তাদের তেমন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি যেমনটি তারা আশা করেছিল। এটি দেখে তুর্কি আমিররা তার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ল। এখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। অবশেষে ৩ জমাদিউল আউয়াল ৬৪০ হিজরিতে দিল্লি শহরের বাইরে লশকরগাহে তুর্কিরা উজিরের ওপর হাত তোলার সুযোগ পেয়ে গেল। ফলে সেখানেই তার কাজ শেষ করে দেওয়া হলো। [১]

পদমর্যাদা বণ্টন:

এর পর নতুন পদমর্যাদা বণ্টন এভাবে হলো:

- আবু বকর নজম উদ্দিন: সদরুল মুলক উপাধিসহ উজিরের পদ
- বলবন সগির (বাহাউদ্দিন): আমির-ই-হাজিব
- বলবন কবির (ইজ্জুদ্দিন): নাগোর, আজমির এবং সিন্ধুর সুবাদার
- মালিক তাজ উদ্দিন: বদায়ূনের সুবাদারি [২]

শাহজাদাদের মুক্তি:

আলাউদ্দিন মাসুদ যুবক, সাহসী এবং উদারমনা ছিল। ৬৪১ হিজরিতে ঈদুল আযহার দিন সে শাহজাদা জালাল উদ্দিন এবং শাহজাদা নাসির উদ্দিন মাহমুদকে, যারা নজরবন্দি ছিল, মুক্ত করে দিল। শুধু তাই নয়, বরং নাসির উদ্দিন মাহমুদকে বাহরাইচ এবং জালাল উদ্দিনকে কনৌজের শাসক নিযুক্ত করল। এই দুই শাহজাদা নিজ নিজ শাসনামলে ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করে জনগণের মন জয় করে নিল। এভাবে আলাউদ্দিন মাসুদের মর্যাদা ও সুনামও বৃদ্ধি পেল। [৩]

হিন্দুদের আক্রমণ:

সেই সময়ে লখনৌতি (বিহার ও বাংলার কেন্দ্র) এর শাসক ছিল তুগান খান। ৬৪১ হিজরিতে (১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) 'জাজনগর' (উড়িষ্যা) এর হিন্দু রাজা 'রায় নরসিংহ' তাকে উত্যক্ত করতে শুরু করল। অবশেষে শাওয়াল ৬৪১ হিজরিতে তুগান খান তার এলাকায় সৈন্য পরিচালনা করল। লশকর জাজনগরের সীমান্ত 'কাতাসিন' পৌঁছাল যেখানে ৬ জিলকদ এর চূড়ান্ত যুদ্ধে শুরুতে তুগান খান শত্রুকে পিছু হটতে বাধ্য করল কিন্তু এরপর যখন তার সৈন্যরা দুপুরের খাবার খাচ্ছিল, হিন্দুরা হঠাৎ অন্য দিক থেকে আক্রমণ করে বসল। মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শহীদ ও আহত হলো যার ফলে লশকরকে ফিরে আসতে হলো।

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৭০, ৪৭১

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৫০

সেই সময় মুলতানের সুবাদার মালিক কবির খান আয়াজ স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু লাহোর ধ্বংসের কিছু দিন পর সম্ভবত ৬৩৯ হিজরিতেই তার মৃত্যু হয়। এরপর তার ছেলে তাজ উদ্দিন আবু বকর আয়াজ, যে তার পিতার মতো একজন বড় নামকরা যোদ্ধা ছিল, মুলতানের শাসনকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত করে নিল কিন্তু সে যৌবনেই মৃত্যুবরণ করল এবং এভাবে আয়াজি বংশের শাসন সিন্ধুতে কয়েক বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকল। (জামে তারিখ-ই-হিন্দ, খালিক আহমদ নিজামি: পৃ. ৩৫৪)

[৩] (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৫০, ২৫১) ইলতুতমিশের অবস্থার বর্ণনার শেষে জানানো হয়েছে যে, এই দুই শাহজাদা এক বর্ণনা অনুযায়ী ইলতুতমিশের ছেলে এবং অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তার নাতি (নাসির উদ্দিন বিন ইলতুতমিশের ছেলে) ছিলেন।

এখন তিনি দিল্লি থেকে সাহায্য চাইলেন। ফলে সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ অযোধ্যার শাসনকর্তা তমর খান কিরানকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে লখনৌতি পৌঁছে যান। এর মধ্যে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। এদিকে উড়িষ্যার রাজা শাওয়াল ৬৪২ হিজরিতে পুনরায় লখনৌতির দিকে অগ্রসর হলেন এবং ১৩ই শাওয়াল সীমান্ত অতিক্রম করে 'লখনৌর' আক্রমণ করলেন। এখানকার জায়গিরদার করিমুদ্দিন লাগরি অনেক মুসলমানসহ আক্রমণকারীদের হাতে শহীদ হলেন। জিলকদ ৬৪২ হিজরিতে হিন্দু বাহিনী লখনৌতি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু এরই মধ্যে খবর এল যে, তমর খান কিরান এক বিশাল সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে রণক্ষেত্রে পৌঁছাতে চলেছেন। এই খবর শুনে জাজ নগরের হিন্দু আক্রমণকারীরা পিছু হটল। এটি জিলকদ ৬৪২ হিজরির ঘটনা। [১]

হিন্দু বাহিনী ফিরে যাওয়ার পর তুগান খান ও তমর খানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। তমর খান চেয়েছিলেন লখনৌতির শাসনভার তার হাতে অর্পণ করা হোক, কিন্তু তুগান খান এতে রাজি ছিলেন না। উত্তেজনা এতটাই বৃদ্ধি পেল যে, উভয়ের বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হয়ে গেল এবং একদিন সকাল থেকে চাশত পর্যন্ত পারস্পরিক সংঘর্ষও হলো। অবশেষে কাজী মিনহাজুস সিরাজ এবং অন্যান্য উলামা ও মাশায়েখ মধ্যস্থতা করে মিমাংসা করে দিলেন, যার ফলে লখনৌতিতে তমর খান কিরানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তুগান খান দিল্লি চলে গেলেন ও তাকে অযোধ্যার শাসনভার দেওয়া হলো। [২]

মঙ্গোলদের আক্রমণ এবং বলবন সগীরের কীর্তিসমূহ:

৬৪৩ হিজরিতে মঙ্গোল সর্দার মঙ্গুতমরের নেতৃত্বে তাতারী আক্রমণকারীরা কান্দাহার ও বেলুচিস্তান হয়ে সিন্ধু নদ পার হয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে 'উচ' ঘেরাও করে ফেলে। দিল্লিতে এই খবর পৌঁছালে সেখানে সাহায্য পাঠানোর ব্যাপারে পরামর্শ হলো। অধিকাংশ আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন, কিন্তু দরবারের আমির হাজিব 'বলবন সগীর' দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করে সবার সাহস জোগালেন এবং সৈন্য অভিযানের ওপর জোর দিলেন। ফলে আলাউদ্দিন মাসুদ নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এত বিশাল বাহিনী প্রস্তুত হলো যা এর আগে দিল্লির কোনো বাদশাহর সাথে দেখা যায়নি। যাত্রাপথে 'বলবন সগীরের' বীরত্ব ও তৎপরতা ছিল বিস্ময়কর। তিনি অফিসার ও সৈন্যদের ক্রমাগত সাহস জোগাতে থাকলেন। প্রায়ই তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করতেন যে পরবর্তী গন্তব্য ২৪ মাইল দূরে, কিন্তু তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। এভাবে বাহিনী খুব অল্প সময়ে বিয়াস নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

বিয়াস নদীকে বাহিনী বরস্তি ও আম্রোট নামক স্থানে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে অতিক্রম করল এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাভি নদীর তীরে 'লাহোর' পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এখান থেকে অগ্রবর্তী দলগুলোকে দ্রুত উচের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং তাদের আগে সুলতানের গোয়েন্দারা সংবাদ নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে 'উচ'-এর আশেপাশে পৌঁছে গেল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে অবরোধ...

---

[১] (তবকাতে নাসিরি: পৃ. ২৪-২৫০) ফেরেশতা একে মঙ্গোলদের আক্রমণ বলে অভিহিত করেছেন এবং এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, এই লোকেরা বখতিয়ার খলজির অবলম্বন করা পথে (যা হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে তিব্বত পর্যন্ত যায়) আক্রমণ চালিয়ে ভারত পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে। (তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৫১) কিন্তু ফেরেশতার এটি একটি ভুল ধারণা। কারণ তবকাতে নাসিরিতে কাজী মিনহাজুস সিরাজ (যিনি এই যুদ্ধের সময় লখনৌতিতে উপস্থিত ছিলেন) স্পষ্ট করেছেন যে, এটি জাজ নগরের রাজার আক্রমণ ছিল।

[২] তবকাতে নাসিরি: পৃ. ২৫-২৬

আক্রমণকারী মঙ্গোলরা তাদের ধরে ফেলেছিল, কিন্তু বাকিরা নিরাপদে গোপন পথে শহরে প্রবেশ করে এবং সরকারি বার্তাগুলো পৌঁছে দেয় যাতে লেখা ছিল যে, "রাজকীয় বাহিনী বড় বড় নামী কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কাছে পৌঁছে গেছে। মনোবল অটুট রেখে শহরের প্রতিরক্ষা করতে থাকো।" এই সুসংবাদপূর্ণ বার্তাগুলো মানুষের মৃতদেহে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার করল এবং তারা আগের চেয়েও বেশি সাহসী হয়ে নিজ নিজ অবস্থানে অটল রইল।

শীঘ্রই মঙ্গুতমর খবর পেলেন যে রাজকীয় বাহিনীর অগ্রবর্তী দল রণক্ষেত্রের খুব কাছে চলে এসেছে। তিনি তার গোয়েন্দাদের জিজ্ঞেস করলেন: "রাজকীয় বাহিনী সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করে বরস্তি বা আমরুট থেকে বিয়াস নদী পার হলো না কেন? আর পাহাড়ের পাদদেশ থেকে নদী পার হওয়া কেন পছন্দ করল?"

উপদেষ্টারা বললেন: "নিকটবর্তী পথে নদীর তীর এমন যে সেখান দিয়ে বিশাল বাহিনী নদী পার হতে পারে না। তাই বাহিনী দীর্ঘ পথ অবলম্বন করে নদী পার হয়ে এসেছে।"

মঙ্গুতমর এটি শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন: "এর মানে হলো এই বাহিনী অনেক বড়।"

ফলে তিনি উচ-এর অবরোধ তুলে নিয়ে পিছু হটলেন। যাওয়ার সময় দ্রুত গতির জন্য তিনি বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে আলাদা আলাদা পথে রওনা করালেন যাতে কোনো এক দিক থেকে মুসলিম বাহিনী বাধা দিলে বাকি বাহিনী রক্ষা পায়। মঙ্গোলদের এই আকস্মিক পশ্চাদপসরণের ফলে অনেক মুসলিম ও হিন্দু নাগরিক যারা তাদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তারা মুক্ত হয়ে গেল।

গোয়েন্দারা ২৫ শাবান ৬৪৩ হিজরিতে সুলতানি বাহিনীতে উপস্থিত হয়ে এই সুসংবাদ শোনালেন। বলবন সগীরের পরামর্শে শত্রুদের আরও আতঙ্কিত করার জন্য ইসলামের বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করে সোহদরা পর্যন্ত চেনাব নদী পর্যন্ত গেল এবং পূর্ণ সন্তুষ্টির পর ২৭ শাওয়াল ফেরার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল এবং ১২ জিলহজ দিল্লি পৌঁছাল। [১]

আলাউদ্দিন মাসউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ:

এই বিজয়ের পর দিল্লি ফিরে এসে আলাউদ্দিন মাসউদ ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়লেন এবং সালতানাতের বিষয়াবলি পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন। সেই সাথে তিনি আমিরদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়ার একটি ধারা শুরু করলেন।

এই পরিস্থিতিতে দিল্লির আমিররা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং ২৩ মহরম ৬৪৪ হিজরিতে তাকে হেফাজতে নিলেন। তার শাসনের মেয়াদ ছিল চার বছর এক মাস। তিনি কিছুকাল বন্দী অবস্থায় ছিলেন এবং এরপর সেই অবস্থাতেই প্রকৃত স্রষ্টার সাথে মিলিত হলেন। [২]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫, ৫৬

[২] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ৬৬; তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৭১; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৫১, ২৫২

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ

৬৪৪ হিজরি থেকে ৬৬৪ হিজরি

(১২৪৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দ)

আলাউদ্দিন মাসউদের সিংহাসন উল্টে দেওয়ার আগেই সালতানাতের আমিরগণ, যাদের মধ্যে বলবন সগির অগ্রগণ্য ছিলেন, সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের পৌত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে সিংহাসনে বসানোর ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। এই ছেলেটি অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল ছিল। ইলতুতমিশ তার শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং এই ধারা রাজিয়া সুলতানের শাসনামলেও অব্যাহত ছিল। সে সময় সে নাবালক ছিল।

পরবর্তী যুগে অন্যান্য অনেক ইলতুতমিশি শাহজাদার মতো তাকেও বন্দি করা হয়েছিল। আলাউদ্দিন মাসউদের শাসনকালে সে মুক্ত হয়ে বাহরাইচের শাসক নিযুক্ত হয়। তার ন্যায়বিচার সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দিত করেছিল। যখন আলাউদ্দিন মাসউদের সিংহাসন উল্টে দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল, তখন তার আগেই সালতানাতের আমিরগণ নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে পত্র লিখে এই মর্মে জোর দেন যে, সে যেন গোপনে বাহরাইচ থেকে দিল্লিতে চলে আসে। নাসিরউদ্দিন মাহমুদের বয়স তখন ছিল কমবেশি ষোলো-সতেরো বছর। তাকে গোপনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তার মা 'মালিকা-ই-জাহান' করেছিলেন এবং বাহরাইচের আমিরদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, নাসির অসুস্থ এবং আমরা তাকে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছি। সফর চলাকালীন মা দিনের বেলা নাসিরকে নিজের পালকিতে লুকিয়ে রাখতেন। রাতের বেলা শাহজাদা মুখে নেকাব দিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হতেন। এভাবে কয়েকজন অশ্বারোহী ও খাদেমের সাথে তারা গোপনে দিল্লিতে পৌঁছান। যেদিন আলাউদ্দিন মাসউদকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়, সেদিনই (২৩ মহরম ৬৪৪ হিজরি) শাহজাদা নাসিরউদ্দিনের বায়আত গ্রহণ করা হয়। [১]

নাসিরউদ্দিন মাহমুদের রাজনৈতিক ধারা:

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ খ্যাতি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে দূরে একজন আবিদ ও জাহিদ মানুষ ছিলেন এবং নম্রতার সাথে কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বাধ্য হয়েই শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি এটাও জানতেন যে, এই সরকারে তার অবস্থান সীমিত এবং ক্ষমতা সেই আমিরদের হাতেই থাকবে যারা 'বাদশাহ নির্মাতা'। তিনি এটাও জানতেন যে, গত দশ বছর ধরে...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৮২

https://t.me/BoierSomahar

রাজধানী দিল্লি রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন এবং রাজপ্রাসাদ অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই কারণেই দশ বছরে চারজন বাদশাহকে বিদ্রোহের মাধ্যমে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ দূরদর্শিতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে এটি স্থির করলেন যে, তিনি শাসনকার্যে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ করবেন এবং সমঝোতার পরিচয় দিয়ে চেষ্টা করবেন যেন বর্তমান সামরিক নেতৃত্ব একাগ্রতার সাথে দেশটিকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করতে থাকে। এই সামরিক নেতৃত্বের প্রধান ছিলেন তৎকালীন দিল্লি দরবারের "আমীর-ই-হাজিব" বলবন সগির (বাহাউদ্দিন)।

বিদ্রোহীদের দমনের অভিযানসমূহ:

বলবন সগিরের কৌশল ছিল এই যে, বাহিনীকে ব্যস্ত রাখা হবে এবং বাদশাহ নিজেও বছরে অন্তত একবার কোনো না কোনো সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন, যাতে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহী ও ফিতনাবাজ লোকেরা রাজকীয় প্রতাপ ও দাপট দেখে ভীত থাকে। তাই বলবনের পরামর্শে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তাঁর সিংহাসন আরোহণের প্রথম বছরই রজব ৬৪৪ হিজরি (১২৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে সেনাবাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে যাত্রা করেন। সেই সময় সামনে কোনো বড় শত্রু ছিল না, তাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শক্তি প্রদর্শন। জিলকদ মাসে রাজকীয় বাহিনী রাভি নদী পার হয়ে লাহোরের কাছে তাবু স্থাপন করে, অন্যদিকে বাহাউদ্দিন বলবন কোহিস্তানে লবণ ও নন্দনাহ (ঝিলাম)-এর আশপাশে খোখর ও অন্যান্য বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে দমন করেন।

সেই সময়ে মঙ্গোলরা তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তাই বলবন সগির দেশের অভ্যন্তরে আরও অভিযানের প্রস্তুতি নেন এবং সুলতানকে সাথে নিয়ে দোয়াব (গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা) অঞ্চলে অভিযান চালান। এখানে কনৌজের আশেপাশে হিন্দুরা একটি অত্যন্ত সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দিয়েছিল "তাল সিন্দাহ"। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ২৪ শাওয়াল ৬৪৫ হিজরি (১২৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে এই দুর্গটি জয় করা হয়। অন্য এক হিন্দু রাজা যমুনা নদীর তীর থেকে কালিঞ্জর পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিল। বলবন সগির বাহিনী নিয়ে তার ওপর আক্রমণ করেন। রাজা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এই বিজয়ে এত বিপুল পরিমাণ গনিমত অর্জিত হয় যে তা গণনা করা কঠিন ছিল। পরের বছর ৬৪৬ হিজরি (১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান বাহাউদ্দিন বলবনকে "রণথম্ভোর" এবং মেওয়াতের বিদ্রোহী হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাঠান। যদিও এই অভিযানে বিশেষ কোনো ফলাফল অর্জিত হয়নি। [১]

শাহজাদা জালালুদ্দিনের অসন্তুষ্টি:

এই অভিযানগুলো থেকে ফেরার সময় সুলতানের ভাই শাহজাদা জালালুদ্দিনও সুলতানের সঙ্গী হন, যিনি কনৌজের সুবাদার ছিলেন। দিল্লিতে তিনি কিছুদিন সুলতানের মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। যেহেতু তিনি কনৌজের আশেপাশে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা হিন্দু রাজাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, তাই সুলতান তাকে বদলি করে সম্ভল ও বদায়ূনের জায়গির প্রদান করেন, যা ছিল তুলনামূলক নিরাপদ এলাকা। কিন্তু শাহজাদা জালালুদ্দিনের কাছে এই বদলি পছন্দ হয়নি, তাই সম্ভলে গিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে তিনি "সিরমুর"-এর পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে পালিয়ে যান। [২]

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৮২

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৮২

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের বলবনের কন্যার সাথে বিবাহ:

বেশ কিছুকাল ধরে রাজপরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই চিন্তায় ছিলেন যে, তরুণ সুলতান (যার বয়স ২১ বছর হয়েছিল) যেন বিবাহ করেন। ফলে এই বিষয়টি সামনে এগিয়ে যায় এবং ২০ রবিউল আখের ৬৪৭ হিজরিতে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের সাথে বলবনের (বলবন-ই-সগির) কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এভাবে সুলতানের শ্বশুর হওয়ার কারণে তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। [১]

যখন বলবন সগির "উলুগ খান" হলেন:

৩ রজব ৬৪৭ হিজরিতে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তার শ্বশুরকে সালতানাতের নায়েব (উপ-সুলতান) নিযুক্ত করেন এবং সেই সাথে তাকে "উলুগ খান" (মহান খান) উপাধিতে ভূষিত করেন। এভাবে তিনি ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করেন। [২]

এই উপলক্ষে সুলতান নাসিরুদ্দিন উলুগ খানকে বলেছিলেন: "আমি আপনাকে আমার নায়েব এবং আল্লাহর সৃষ্টির শাসক নিযুক্ত করেছি। কখনো এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে আমাকে আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হয়।" উলুগ খান এই উপদেশটি হৃদয়ে গেঁথে নেন এবং অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেন। তিনি কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহী আমিরদের বরখাস্ত করে সরকারকে শক্তিশালী করেন। তিনি হিন্দু, রাজপুত, খোখর এবং মেওয়াতিদের বিদ্রোহের শক্তিও চূর্ণ করে দেন। [৩]

যেহেতু উলুগ খান (বলবন সগির) আমির-ই-হাজিব পদটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই তার ছোট ভাই সাইফুদ্দিন আইবক, যিনি "আমির-ই-আখুর" ছিলেন, তাকে এই পদটি দেওয়া হয় এবং সেই সাথে তাকে "কিশলু খান" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। [৪]

উলুগ খানের (বলবন সগির) চাচাতো ভাই শের খানকে "খান-ই-আজম" উপাধি দেওয়া হয় এবং তার বীরত্ব ও প্রশাসনিক যোগ্যতার ভিত্তিতে তাকে মুলতান ও পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়, যাতে তিনি সেই মঙ্গোলদের প্রতিরোধ করতে পারেন যারা মধ্য এশিয়া ও খোরাসান দখলের পর বারবার ভারতে আক্রমণ করছিল। [৫]

ইজ্জুদ্দিন বলবনের ব্যর্থতা:

বলবন-ই-কবীর (ইজ্জুদ্দিন), যিনি "নাগৌর" এবং "শিওয়ালিক"-এর শাসক ছিলেন, বলবন সগিরের "উলুগ খান" হওয়াতে খুশি ছিলেন না এবং নিজের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছিলেন। তার দাবি ছিল তাকে মুলতান ও উচ-এর শাসক নিযুক্ত করা হোক।

সুলতান এই আবেদন গ্রহণ করে তার বদলির আদেশ দেন এবং শর্ত দেন যে তাকে নাগৌর ও শিওয়ালিকের শাসনভার ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু বলবন-ই-কবীর উচ ও মুলতানের শাসনের ফরমান হাতে পেয়েও নাগৌর ও শিওয়ালিক ছাড়তে অস্বীকার করেন। বাধ্য হয়ে ৬৪৮ হিজরিতে...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৮৩

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৬০

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৫৩; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৮৯

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৬

[৫] (তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৫৩) ফিরিশতার মতে শের খানের প্রদেশের মধ্যে ভাটনের (হনুমানগড়, রাজস্থান) এবং ভাতিন্ডাও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ভাতিন্ডা তিনি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।

(১২৫০ খ্রি.)-এ সুলতান বলবন সগিরের সাথে তাকে দমনের জন্য নাগোরের দিকে রওনা হতে হলো। বলবন কিশলু খাঁ ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করে উচ ও মুলতান অর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তিনি উচ ও মুলতানের ব্যবস্থাপনা বুঝে নিতে সেখানে পৌঁছালেন এবং মুলতানের শাসক শের খাঁ, যিনি দক্ষিণ পাঞ্জাবকে ভালোভাবে রক্ষা করছিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। তবে বলবন কিশলু খাঁ তাকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন না। এই অঞ্চলগুলোতে যাওয়ার আগে পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মালিক হাসান কারলুগ [১] নামক এক অভিজ্ঞ তুর্কি জেনারেল গত ত্রিশ বছর ধরে দক্ষিণ পাঞ্জাবে দিল্লি সালতানাতের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি যখন দিল্লি সালতানাতের আমিরদের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য বাড়তে দেখলেন, তখন সুযোগ বুঝে মুলতানের ওপর আক্রমণ করলেন। বলবন কিশলু খাঁ, যিনি সেই সময় উচে ছিলেন, এই খবর শুনে মুলতান রক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধে হাসান কারলুগ নিহত হন, কিন্তু তার সঙ্গীরা এই খবর গোপন রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং মুলতান অবরোধ করেন। বলবন কিশলু খাঁ সাহস হারিয়ে খুব দ্রুত মুলতান আক্রমণকারীদের হাতে তুলে দেন। পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে তার প্রতিপক্ষ হাসান কারলুগ নিহত হয়েছেন, তখন তিনি তার দ্রুত আত্মসমর্পণের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন।

মুলতান যথারীতি কারলুগদের সঙ্গীদের কাছেই ছিল। এমন সময় সাবেক শাসক মালিক শের খাঁ (বলবন সগিরের চাচাতো ভাই) পুনরায় ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে কারলুগদের কাছ থেকে মুলতান ছিনিয়ে নিলেন। এই কৃতিত্বের কারণে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর শাসনের জন্য তিনি পুনরায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন, তাই তিনি উচ দখলের জন্য অগ্রসর হলেন।

বলবন কিশলু খাঁ যে ভুলগুলো করছিলেন, তার ওপর আরও বোকামি করলেন এই যে, সমস্ত সতর্কতা উপেক্ষা করে শের খাঁর সাথে আলোচনার জন্য তার শিবিরে চলে গেলেন। সেখানে শের খাঁ কোনো খাতির না করেই তাকে গ্রেপ্তার করলেন এবং তখনই তাকে মুক্তি দিলেন যখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে উচের শাসনভার শের খাঁকে হস্তান্তর করলেন।

এইসব ব্যর্থতার পর বলবন কিশলু খাঁ ৬৪৯ হিজরি (১২৫১ খ্রি.)-তে দিল্লি চলে যান, যেখানে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তার মন রক্ষার জন্য তাকে বদায়ূনের জায়গির প্রদান করেন এবং আরও সান্ত্বনার জন্য তাকে “কাশলু খাঁ” [২] উপাধিও দেন।

গোয়ালিয়র ও মালব অভিযান:

৬৪৯ হিজরি (১২৫১ খ্রি.)-তে সুলতান উলুগ খাঁ (বলবন সগির)-এর সাথে গোয়ালিয়র, চান্দেরি ও মালব পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। এখানকার সবচেয়ে বড় রাজা “চাহার দেব” দুই লক্ষ পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে মোকাবিলা করতে এলেন, কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর সামনে তিনি...

---

[১] এই ব্যক্তি ৬১৮ হিজরিতে সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহকে সিন্ধু নদ পার হতে সাহায্য করার পর অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছিলেন এবং এর বিনিময়ে খাওয়ারিজম শাহ পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয় করে তাকে নিজের নায়েব বানিয়েছিলেন। সুলতান জালালুদ্দিনের প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লির বাহিনী তার কাছ থেকে শহরাঞ্চলগুলো ছিনিয়ে নিলেও গ্রাম, কসবা ও জঙ্গলগুলোতে এই ব্যক্তির শক্তি অবশিষ্ট ছিল।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃষ্ঠা ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০।

...চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিলেন।

উলুগ খান (বলবন সগির)-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জোট এবং এর পতন:

সেই সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারে উলুগ খান নায়েবে সুলতানাত হিসেবে সবকিছুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তারপর তাঁর ভাই সাইফউদ্দিন আইবক (কিশলু খান) আমিরে হাজিব হিসেবে দিল্লির সবচেয়ে বড় আমির ছিলেন। তারপর তাঁদেরই চাচাতো ভাই শের খান পাঞ্জাব ও সিন্ধুর শাসক ছিলেন। এভাবে শাসনব্যবস্থা কার্যত 'ইলবারি' বংশের এই তিন তুর্কির হাতে দেখা যেত। অনেক তুর্কি আমির এই পরিস্থিতিতে খুশি ছিলেন না, ফলে পরবর্তী দিনগুলোতে তাঁরা প্রতিবাদী রাজনীতি বা বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অসন্তুষ্ট আমিরদের মধ্যে যারা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁরা হলেন:

- হুসামউদ্দিন কুতলুগ খান: ইনি ইলতুৎমিশের সবচেয়ে পুরনো তুর্কি অফিসার আলাউদ্দিন জানি (বিহারের শাসনকর্তা)-র ছেলে ছিলেন। সেই সময় তিনি বায়ানা-র শাসনকর্তা ছিলেন এবং উলুগ খান (বলবন সগির)-এর ক্ষমতায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবং কিছু সমস্যার কারণে সুলতানের ওপরও কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিলেন।

- বলবন কবির (ইজ্জুদ্দিন কিশলু খান): ইনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁকে মুলতান ও উচ থেকে সরিয়ে বদায়ূঁ-র শাসনকর্তা করা হয়েছিল। ইনি হুসামউদ্দিন কুতলুগ খানের জামাতাও ছিলেন, তাই বলবন সগিরের বিরুদ্ধে নিজের শ্বশুরের সমর্থক ছিলেন।

- কাজী ইমাদউদ্দিন রায়হান: এই ভারতীয় কাজী সুলতান নাসিরউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং কর্মকর্তাদের ও কাজীদের নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষেত্রে সুলতান তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনিও উলুগ খান (বলবন সগির)-এর ক্ষমতায় অসন্তুষ্ট ছিলেন।

৬৫০ হিজরির শাওয়াল মাসে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ আবারও উলুগ খান (বলবন সগির)-এর সাথে সফরে বের হন যার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিষয়াবলি উন্নত করা। সেনাবাহিনী লাহোর হয়ে 'উচ' ও 'মুলতান' পর্যন্ত যায় এবং তারপর কাইথাল (হরিয়ানা) হয়ে ফিরে আসে। এই সময় কাজী ইমাদউদ্দিন রায়হান সুলতানের মেজাজের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং সুলতানকে বিশ্বাস করাচ্ছিলেন যে, উলুগ খান (বলবন সগির) এত অনুগ্রহের যোগ্য নন এবং সাম্রাজ্যের ওপর তাঁর আধিপত্যের কারণে অনুগত আমিররা আশঙ্কা বোধ করছেন। এই সফরের সময় উলুগ খান (বলবন সগির)-এর ক্ষমতায় অসন্তুষ্ট আমিরগণ অর্থাৎ বলবন কবির ও কুতলুগ খানও তাঁদের সেনাবাহিনীসহ সাথে ছিলেন। তাঁরাও সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। সুলতান সমস্যার সমাধান জানতে চাইলে এই আমিররা বলেন: "উলুগ খানকে রাজধানী থেকে বের করে কোথাও দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।"

ফলে এই সফর থেকে ফিরে আসার পরপরই ১লা মহররম ৬৫১ হিজরিতে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ উলুগ খান (বলবন সগির)-কে কেন্দ্রের বিষয়াবলি থেকে অব্যাহতি দেন এবং শুধুমাত্র একজন জায়গিরদার হিসেবে 'হাসি' ও 'শিওয়ালিক' জেলাগুলোতে যাওয়ার নির্দেশ দেন যা কিছুকাল ধরে জায়গির হিসেবে তাঁর নামে ছিল। শীঘ্রই সুলতান ইমাদউদ্দিন রায়হানের কথায় 'হাসি' ও 'শিওয়ালিক'-এর জায়গির থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করেন এবং নতুন নির্দেশ দেন যে তিনি যেন 'নাগোর' চলে যান।

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৮৫

উলুগ খান সুলতানি নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নিজেকে সালতানাতের কার্যাবলি থেকে পৃথক করে নিলেন। এটি ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং সালতানাতের প্রতি তাঁর আনুগত্যের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ।

উলুগ খান (বলবন সগির) দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর রাজধানী (দারুস সালতানাত)-এ নতুন কিছু নিয়োগ দেওয়া হয়, যার বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:

- মুহাম্মদ নিজামুল মুলক জুনাইদিকে উজির নিযুক্ত করা হয়।
- উলুগ খানের ভাই সাইফুদ্দিন কিশলু খানকে আমীর-ই-হাজিব পদ থেকে সরিয়ে 'দামন-ই-কোহ' পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
- ইমাদুদ্দিন রায়হান 'ওয়াকিল-ই-দার' (রাজকীয় সচিব) নিযুক্ত হন।
- শামসুদ্দিন বাহরাইচিকে কাজী মিনহাজুস সিরাজের স্থলে কাজীউল কুজাত নিযুক্ত করা হয়।
- মালিক ইজ্জুদ্দিন কিশলু খান (বলবন কবির)-কে নায়েব আমীর-ই-হাজিব পদ প্রদান করা হয়। [১]

একটি বিদ্রোহ:

সালতানাতে এমন কিছু আমীরও কম ছিল না যারা উলুগ খান (বলবন সগির)-এর অনুগ্রহের ঋণী ছিল; তাই তারা তাঁর কোণঠাসা হওয়াকে রাজ্যের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চলে যেতে লাগল। সবার আগে উলুগ খানের চাচাতো ভাই শের খান বিদ্রোহ করেন, যাকে এর আগেই বলবন কবির শক্তি প্রয়োগ করে উচ ও মুলতান থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তিনি কেন্দ্রের দিক থেকে আশাহত হয়ে নিজের শাসন এলাকাকে বিস্তৃত করতে থাকেন, এমনকি ভাতিন্ডা (পূর্ব পাঞ্জাব) থেকে সিন্ধু পর্যন্ত তাঁর দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু এই এলাকাগুলোতে মঙ্গোলদের আক্রমণ চলতেই থাকত, তাই তিনি এই আক্রমণ এবং দিল্লির দাসত্ব থেকে মুক্তির সমাধান এটাই বের করলেন যে, মঙ্গোলদের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়া হোক। چنانچہ তিনি নিজের এলাকা নায়েবদের হাতে সোপর্দ করে নিজে তুর্কিস্তানে চলে যান যাতে খাকান মেঙ্গু খানের আনুগত্য স্বীকার করে নিজের দখলকৃত এলাকাগুলোর সনদ লাভ করতে পারেন। [২]

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ পাঞ্জাবে:

এই খবর যখন দিল্লিতে পৌঁছাল, তখন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ৬৫১ হিজরির শাওয়াল মাসে পাঞ্জাব পুনরুদ্ধারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। লস্কর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ভাতিন্ডা, উচ এবং মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং সব এলাকা থেকে শের খানের নায়েবদের হটিয়ে দিল। এই অভিযানে 'বায়ানা'-র জায়গিরদার আরসালান খান সানজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দেন এবং বিশেষ করে ভাতিন্ডা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর এই অভিযানের পর ভাতিন্ডা তাঁর হাতে সোপর্দ করা হয়, আর উচ ও মুলতান পুনরায় বলবন কবিরের দায়িত্বে দেওয়া হয়। [৩]

---

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ ২০৪, ২০৮, খণ্ড ২, পৃ ৬৪

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ২, পৃ ৪৪

[৩] তবাকাত-ই-নাসিরি: খণ্ড ১, পৃ ২০৮, খণ্ড ২, পৃ ৪৪

আরসালান খান সানজার ওরফে মালিক তাজউদ্দিন সুলতান ইলতুতমিশের পুরনো গোলাম এবং তুর্কি বীরদের একজন ছিলেন। সুলতান তাঁর বিয়ে বায়ানা-র জায়গিরদার মালিক বাহাউদ্দিন তুঘরিলের মেয়ের সাথে করিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে মুসলমানদের আবাদ করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন, তাই সুলতান নাসিরুদ্দিনের যুগে তাঁকে বায়ানা-র জায়গিরদার বানানো হয়েছিল। (তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ ৩৫)

ইমাদউদ্দিন রায়হানের বরখাস্ত - বলবন সগির পুনরায় নায়েবে সুলতান:

এদিকে দিল্লিতে অবস্থা এমন ছিল যে, ইমাদউদ্দিন রায়হান সুলতানের মেজাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে দিন দিন পুরনো অনুগত তুর্কি ও তাজিক কর্মকর্তাদের কেবল বরখাস্তই করছিল না, বরং তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছিল। এমন পরিস্থিতিতে অযোধ্যা, বদায়ুন, মানকপুর, ভাতিন্ডা এবং শিবালিকের আমিরগণ উলুগ খানের কাছে বার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ করেন যেন তিনি দিল্লিতে এসে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি পরিচালনা করেন।

উলুগ খান (বলবন সগির) নাগোর থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলেন এবং ভাতিন্ডার কাছে আরসালান খান তার সেনাবাহিনীসহ তার সাথে যোগ দিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের ভাই শাহজাদা জালালুদ্দিন মাসুদ শাহ বর্তমান রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে বাইরে থাকার কারণে হতাশ ছিলেন। তিনিও লাহোর থেকে তার অনুগতদের নিয়ে এই জোটে যোগ দিলেন।

এই খবর দিল্লিতে পৌঁছালে ইমাদউদ্দিন রায়হানের প্ররোচনায় সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদও সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলেন। ২৭ রমজান ৬৫২ হিজরিতে উভয় পক্ষ কাইথালের কাছে মুখোমুখি হলো। এই সময়ে বেশ কয়েকজন আমির মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসেন এবং রক্তপাত বন্ধ করতে সালিশের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। মিত্রপক্ষ স্পষ্ট করে দেয় যে, তারা সুলতানের আনুগত্যের জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত, কিন্তু তারা ইমাদউদ্দিন রায়হানের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে রাজি নয়।

অবশেষে ২ জিলকদ ৬৫২ হিজরিতে একটি শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হলো। বিদ্রোহী আমিরগণ ক্ষমা চাইলেন এবং শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন করে আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন। ইমাদউদ্দিন রায়হানকে রাজধানী পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বদায়ুনের জায়গিরদারি দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। রজব ৬৫৩ হিজরিতে ইমাদউদ্দিন রায়হান ইন্তেকাল করেন। [১] এদিকে রাজধানী দিল্লিতে উলুগ খানকে পুনরায় নায়েবে সুলতান এবং তার ভাই সাইফউদ্দিন আইবেককে (কিশলু খান) মীর হাজিব নিযুক্ত করা হলো। [২]

সুলতানের মাতার সাথে কতলুগ খানের বিবাহ এবং নতুন সমস্যা:

৬৫৩ হিজরির শুরুতে সুলতানের মাতা “মালিকা-ই-জাহান” সালতানাতের পুরনো আমির হুসামুদ্দিন কতলুগ খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যিনি “বায়ানা”-র ওয়ালি ছিলেন। এরপর সুলতান ও তার মাতার মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হয়। সুলতানের বাহ্যিকভাবে তার মাতার দ্বিতীয় বিবাহে কোনো আপত্তি ছিল না, তবে এর ফলে যে রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারত, তিনি তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। [৩] এটা স্পষ্ট যে, এখন তার মাতা রাজপ্রাসাদের হারেমে কর্তৃত্ব করতে পারতেন না, কারণ তিনি এখন একজন কর্মকর্তার স্ত্রী ছিলেন।

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৬৭ থেকে ২৭০

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ২৭৪

[৩] হুসামুদ্দিন কতলুগ খান সুলতান ইলতুতমিশের প্রাচীনতম তুর্কি কর্মকর্তা আলাউদ্দিন জানির (বিহারের ওয়ালি) পুত্র ছিলেন। লেখকের অনুমান অনুযায়ী ৬৫৩ হিজরিতে কতলুগ খানের বয়স প্রায় পঞ্চাশ এবং মালিকা-ই-জাহানের বয়স প্রায় চল্লিশ বছর হবে। এই বিবাহের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিশ্চিত হয় যে, নাসিরুদ্দিন মাহমুদ সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র ছিলেন না, বরং পৌত্র ছিলেন। কারণ রাজার বিধবা স্ত্রীর কোনো কর্মকর্তার সাথে বিবাহ হওয়া অত্যন্ত অশোভন ছিল, বিশেষ করে রাজপরিবারের বাইরে তার বিবাহের কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। সুতরাং প্রবল ধারণা এটাই যে, মালিকা-ই-জাহান সুলতানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নাসিরের (মৃত্যু ৬২৬ হি.) স্ত্রী ছিলেন এবং এ কারণেই স্বামীর মৃত্যুর পর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে তার বিবাহ করা অনুপযুক্ত ছিল না।

আশঙ্কা এও ছিল যে, এই অফিসাররা নিজেদেরকে বাদশাহর সৎ বাবা মনে করে স্বেচ্ছাচারিতা শুরু না করে দেয়। যাই হোক, সুলতান কুতলুগ খানের ওপর ইনাম ও ইকরাম বর্ষণ করে তাকে অযোধ্যার জায়গির প্রদান করেন এবং নির্দেশ দেন যে তিনি এবং মালিকা-ই-জাহান এখন থেকে সেখানেই গিয়ে বসবাস করবেন। [১]

অযোধ্যায় কুতলুগ খানের বিদ্রোহ:

কুতলুগ খান অযোধ্যায় গিয়ে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং আশেপাশের সরকারি জেলাগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে নিজের শাসন এলাকা বিস্তৃত করতে শুরু করেন। এরপর তিনি বাহরাইচও দখল করে নেন। এদিকে তার জামাতা মালিক ইজ্জুদ্দিন বলবন, যাকে কিছুকাল আগে মুলতান ও উচ-এর সুবাদারি দেওয়া হয়েছিল, তার সাথে যোগ দিয়ে কেন্দ্র থেকে স্বাধীন হয়ে যান।

এই সংবাদ শুনে সুলতান এবং উলুগ খান (বলবন সগির) এক বিশাল বাহিনী নিয়ে কুতলুগ খানকে দমনের উদ্দেশ্যে বের হন এবং মহররম ৬৫৪ হিজরিতে অযোধ্যায় পৌঁছে ব্যূহ রচনা করেন। কুতলুগ খান রাজকীয় বাহিনীর বিশালতা দেখে ভীত হয়ে পড়েন। তার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তিনি পিছু হটেন, তবে সুলতানি বাহিনী অনেক দূর পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করে। অবশেষে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে "সিরমুর"-এর পাহাড়ি এলাকায় চলে যান যেখানে হিন্দু রাজারা তাকে আশ্রয় দেন। সুলতানি বাহিনী এখানে হিন্দুদের অনেক পাহাড়ি জনপদ ও দুর্গ দখল করে ফিরে আসে এবং ২৫ রবিউস সানি ৬৫৫ হিজরিতে দিল্লিতে পৌঁছায়। [২]

কুতলুগ খান এবং বলবন কবিরের ব্যর্থ জোট:

সুলতান এবং উলুগ খান (বলবন সগির)-এর প্রত্যাবর্তনের পর কুতলুগ খান তার ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে পুনরায় একত্রিত করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পান যে তার মিত্র ও জামাতা বলবন কবির তার সাহায্যের জন্য আসছেন এবং বিয়াস নদী পার হয়ে গেছেন। ফলে তিনি সেখানে পৌঁছে যান এবং উভয়ে মিলে যৌথ আক্রমণ চালিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব ও হরিয়ানার উল্লেখযোগ্য এলাকা দখল করে নেন এবং কাইথালে পৌঁছে যান। এই সংবাদ পেয়ে উলুগ খান (বলবন সগির) ১৫ জমাদিউল আউয়াল ৬৫৫ হিজরিতে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হন, যার এক অংশের কমান্ড ছিল তার আপন ভাই সাইফুদ্দিন (কাশলু খান)-এর হাতে এবং অন্য অংশের নেতৃত্ব ছিল তার চাচাতো ভাই শের খানের হাতে। [৩]

উভয় পক্ষ মুখোমুখি শিবির স্থাপন করেছিল এবং সবার বিশ্বাস ছিল যে এখন যুদ্ধ অবশ্যই হবে। এই সময়ে শাইখুল ইসলাম সৈয়দ কুতুবুদ্দিন এবং কাজী শামসুদ্দিন বাহরাইচি দিল্লি থেকে কুতলুগ খানের কাছে চিঠি পাঠান যে, বর্তমানে শহরটি সেনাবাহিনী শূন্য। আপনি অবিলম্বে দিল্লিতে পৌঁছালে সমস্ত দাবি কোনো যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হবে। যদি আপনি এখানে রাজদরবারে চলে আসেন তবে উলুগ খান এবং...

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৮৯

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩

[৩] শের খান বলবন সগিরের চাচাতো ভাই এবং পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন। কিছুকাল আগে তিনি দিল্লি কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন এবং তুর্কিস্তানে গিয়ে মঙ্গোল খাকানের প্রতিনিধিত্বের সনদ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে পাঞ্জাব দিল্লি বাহিনীর দখলে চলে গিয়েছিল। তিনি ভাতিন্ডা দখলের জন্য আক্রমণ করেন কিন্তু সেখানকার ওয়ালি আরসালান খান তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। অবশেষে শের খান অনুতপ্ত হয়ে আনুগত্য প্রকাশে সম্মত হন এবং দিল্লি দরবারে এসে পুনরায় বিশ্বস্ততার শপথ নেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তাকে ভাতিন্ডার প্রদেশ দান করেন এবং আরসালান খানকে অযোধ্যা দিয়ে দেন। ফলে এখন শের খান পুনরায় দিল্লি কেন্দ্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। (তাবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৪৭৪)

তার লশকর বাইরেই থেকে যাবে এবং বিষয়াবলির নিষ্পত্তি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী হবে।

কিন্তু এই সময়ে দিল্লিতে উলুগ খানের অনুগতরা সতর্ক ছিলেন। তারা এই ষড়যন্ত্রের খবর তাকে পাঠিয়ে দেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে অনুরোধ করেন যে, এই লোকদের অবিলম্বে শহর থেকে বহিষ্কার করুন। ফলে উলুগ খান দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, যার অনুযায়ী সেই ষড়যন্ত্রকারীদের শহর থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং শহরের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ওদিকে কুতলুগ খান এবং বলবন কবির ষড়যন্ত্রকারীদের আমন্ত্রণে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আক্রমণ চালিয়ে "১৮০" মাইল দূরত্ব দুই দিনে অতিক্রম করে দিল্লির বাইরে পৌঁছে যান। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারেন যে শহরের দরজাগুলো বন্ধ, কেউ অভ্যর্থনা জানানোর নেই বরং তাদের সমর্থক গোষ্ঠীকে দুই দিন আগেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি দেখে বলবন কবির এবং কুতলুগ অবাক ও বিচলিত হয়ে পড়েন।

অবশেষে কুতলুগ তার স্ত্রীর সাথে অযোধ্যায় ফিরে যান। বলবন কবির দুই-তিনশ অশ্বারোহীর সাথে উচ-এ ফিরে যান, যখন তার অবশিষ্ট সেনাবাহিনী তার সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সুলতানি লশকরে যোগ দেয়। ১১ই জমাদিউল আখিরা ৬৫৫ হিজরিতে উলুগ খান সুলতানি লশকর নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছালে সমস্ত বিদ্রোহী পালিয়ে গিয়েছিল এবং ফিতনা নিজেই নিজের মৃত্যুতে শেষ হয়ে গিয়েছিল। [১]

মঙ্গোলদের আক্রমণ:

জিলহজ ৬৫৫ হিজরিতে মঙ্গোলরা আবারও উচ এবং মুলতানের কাছে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। বলবন কবির, যিনি সেখানে অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে ছিলেন, মঙ্গোলদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন এবং তাদের সাথে যোগ দেন। শীঘ্রই তারা মুলতান দুর্গ অবরোধ করে। এই খবর দিল্লিতে পৌঁছালে উলুগ খান সুলতানকে জোর দিয়ে বলেন যে, তাকে নিজেই লশকর নিয়ে বের হওয়া উচিত। সংক্ষেপে, মহররম ৬৫৬ হিজরিতে দিল্লির বাইরে একটি বিশাল লশকর জমা হতে শুরু করে। এই প্রস্তুতির খবর মঙ্গোলদের কাছে পৌঁছালে তারা ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটে যায়। [২]

বাগদাদের পতন—দিল্লি দরবারে মঙ্গোল দূত অভিভূত:

সফর ৬৫৬ হিজরিতে হালাকু খান বাগদাদে কিয়ামতে সুগরা (ছোট কিয়ামত) কায়েম করে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটান। এরপর তিনি অন্যান্য দেশকেও হুমকি দিতে এবং দমন করতে শুরু করেন। ৬৫৭ হিজরির শেষের দিকে তিনি তার দূতকে দিল্লিতে পাঠান যাতে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে ভীত ও পরাভূত করা যায়। দূত রবিউল আউয়াল ৬৫৮ হিজরিতে দিল্লিতে পৌঁছান।

উলুগ খান বলবন পাল্টা কৌশল হিসেবে পঞ্চাশ হাজার আরব, ফারসি, তুর্কি, খিলজি এবং আফগান অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত দুই হাজার হাতি এবং আতশবাজির তিন হাজার গাড়ির সাথে শহরের বাইরে দূতের এমনভাবে অভ্যর্থনা জানান যে, সে হাতির গর্জন, ঘোড়ার হ্রেষা এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে শুনতে রাজপ্রাসাদে পৌঁছায়। এই পরিবেশ তাতারীদের (মঙ্গোলদের) সত্যিই অভিভূত করে দেয় এবং সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের জীবদ্দশায় তারা আর কখনও উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর হয়নি। [৩]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ২৭২, ২৭৩; পৃ. ৪৯৪, ৪৯৫

[২] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ২৭৫, ২৭৬..... এই ঘটনার কিছুকাল পর রজব ৬৫৮ হিজরি (১২৬০ খ্রি.)-তে বলবন কবির (ইজ্জুদ্দিন)-এর ইন্তেকাল হয়।

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: পৃ. ২৯৬, ২৯৭; পৃ. ৮৬২, ৮৬৩;; তাবাকাতে আকবরি: খণ্ড ১ পৃ. ৭৭; তারিখে ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৬১, ২৬২

মেওয়াত অভিযান:

রজব ৬৫৮ হিজরি (১২৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের অনুমতিতে উলুগ খান মেওয়াত অঞ্চলে আক্রমণ করেন এবং সমস্ত বিদ্রোহীদের দমন করে ফিরে আসেন। এই অভিযানে শত্রুপক্ষের প্রায় বারো হাজার লোক নিহত হয়। [১]

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু - তাঁর সীরাত ও চরিত্রের ওপর এক নজর:

কিছুকাল পর সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অবশিষ্ট দিনগুলো প্রাসাদেই অতিবাহিত হয়। অবশেষে ১১ই জমাদিউল আউয়াল ৬৬৪ হিজরি (১৮ই ফেব্রুয়ারি ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিশ বছর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর অন্যান্য ভাইদের বিপরীতে তিনি তাঁর পিতার মতো অত্যন্ত মুত্তাকি মানুষ ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সময় একটি হুজরায় জিকির, ইবাদত এবং তিলাওয়াত করে অতিবাহিত হতো। তিনি রাজকীয় পোশাক কেবল দরবারের সময় পরিধান করতেন, অন্যথায় সাধারণ সাদাসিধে পোশাকে থাকতেন। হুজরায় বসে প্রতি বছর নিজ হাতে কুরআন মাজীদের দুটি পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করতেন এবং সেগুলোর হাদিয়া (বিক্রয়লব্ধ অর্থ) দিয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি এ বিষয়েও খেয়াল রাখতেন যেন তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো সাধারণ দামেই বিক্রি হয় এবং কেউ জানতে না পারে যে এটি বাদশাহর হাতের লেখা। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, তাঁর সরলতা এবং যুহদ ও রিয়াযতের (তপস্যা) কাহিনীগুলো খুলাফায়ে রাশেদীনের অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘরে কোনো দাসী বা পরিচারিকা পর্যন্ত ছিল না। তাঁর স্ত্রী, নায়েবে সালতানাত বলবনের কন্যা ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ হাতে রান্না করতেন এবং ঘরের বাকি কাজ সম্পন্ন করতেন। একবার কাজ করতে করতে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। তিনি সুলতানকে বললেন: "ঘরের কাজের জন্য কোনো দাসী বা পরিচারিকা রাখা হলে ক্ষতি কী?" সুলতান বললেন: "সরকারি কোষাগারের ওপর কেবল প্রজাদের অধিকার রয়েছে। আমার এই অধিকার নেই যে, নিজের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের জন্য সেখান থেকে অর্থ নিয়ে দাসী ক্রয় করি। তোমার দুনিয়ার কষ্টের ওপর সবর করা উচিত। আল্লাহ আখিরাতে এর প্রতিদান দেবেন।"

নাসিরুদ্দিন মাহমুদের হুজুর খাতামুল মুরসালীন ﷺ-এর প্রতি এমন ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল যে, অজু ছাড়া তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনার সাহস কখনো করতেন না। একজন দরবারির নাম ছিল মুহাম্মদ। একদিন সুলতান অভ্যাসের বিপরীতে তাঁকে তাঁর উপাধি "তাজউদ্দীন" বলে ডাকলেন। দরবারি ভাবলেন সুলতান হয়তো আমার ওপর কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই ভয়ে পরের দিন দরবারে উপস্থিত হলেন না। সুলতান তাঁকে ডেকে বিষয়টি জানতে চাইলেন এবং বললেন: "তোমার ওপর আমার কোনো অসন্তুষ্টি নেই। যখন আমি তোমাকে ডাকতে চেয়েছিলাম তখন আমি অজু অবস্থায় ছিলাম না, অপবিত্র অবস্থায় পবিত্র নাম নিতে লজ্জা বোধ হচ্ছিল। তাই তাজউদ্দীন বলে সম্বোধন করেছি।" [২]

নাসিরুদ্দিন মাহমুদের উলামা ও মাশায়েখদের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে কাজী মিনহাজুস সিরাজ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

---

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: পৃ. ৮৮, ৮৯... স্থানের ব্যাখ্যা: মেওয়াত অঞ্চলটি দিল্লির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। এটি রাজস্থান, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে রাখবেন যে মেওয়াত, মেওয়ার এবং মারওয়ার আলাদা আলাদা অঞ্চল। এগুলোর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য রাখুন।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৬৩, ২৬৪

সাহেব ৬৫৮ হিজরিতে যখন তাঁর বয়স সত্তর (৭০) বছর হয়েছিল, তখন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'তাবাকাত-ই-নাসিরী' সম্পন্ন করেন এবং সুলতান নাসিরুদ্দিনের নামে নামকরণ করে দরবারে পেশ করেন। [১]

কাজী মিনহাজুস সিরাজ এবং তাবাকাত-ই-নাসিরী:

এই পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এখন পর্যন্ত স্থানে স্থানে কাজী মিনহাজুস সিরাজ এবং তাঁর বই তাবাকাত-ই-নাসিরীর উদ্ধৃতি দিয়ে আসছি, তাই পাঠকদের এই মহান ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে।

মিনহাজুস সিরাজের জন্ম ৫৮৯ হিজরিতে হয়েছিল। তাঁর পিতা মাওলানা সিরাজুদ্দিন লাহোরের একজন বড় আলেম ছিলেন। পিতাকে ৬০৭ হিজরিতে বামিয়ান (বর্তমান মধ্য আফগানিস্তান)-এর কাজী নিযুক্ত করা হয়েছিল, ফলে এই পরিবার সেখানে স্থানান্তরিত হয়। কাজী মিনহাজ তাঁর পিতার কাছ থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন কিন্তু পিতা দ্রুত ইন্তেকাল করেন। তরুণ মিনহাজ তাঁর শিক্ষা চালিয়ে যান এবং অবশেষে একজন দক্ষ আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এরই মধ্যে মধ্য এশিয়া ও খোরাসানে মঙ্গোলদের আক্রমণ শুরু হয়।

কাজী মিনহাজুস সিরাজ ৬২৪ হিজরিতে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের আমলে হিন্দুস্তানে চলে আসেন। তাঁকে গোয়ালিয়রের কাজী নিযুক্ত করা হয়। রাজিয়া সুলতান তাঁর আমলে তাঁকে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-ই-নাসিরিয়ার মুহতামিম বানিয়ে দেন। রাজিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং এরপর শাহজাদাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে কাজী সাহেব ৬৪০ হিজরিতে লখনৌতি (পশ্চিমবঙ্গ)-তে চলে যান। দুই বছর পর যখন গৃহযুদ্ধ থামল এবং সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনকাল শুরু হলো, তখন তিনি ফিরে আসেন। আবারও তাঁকে গোয়ালিয়রের কাজী এবং মাদ্রাসা-ই-নাসিরিয়ার মুহতামিম নিযুক্ত করা হয়। ৬৪৯ হিজরিতে তাঁকে কাজীউল কুজাত নিযুক্ত করা হয়। এরপরও তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৬৬০ হিজরিতে (১২৬১ খ্রিস্টাব্দ) এই মহান আলেম ও ঐতিহাসিকের মৃত্যু হয়।

কাজী মিনহাজুস সিরাজের ফিকহ, উসুলে ফিকহ, ইতিহাস, সীরাত, সাহিত্য, রচনাশৈলী এবং কবিতায় ব্যাপক দক্ষতা ছিল। তাঁর অমর কীর্তি হলো 'তাবাকাত-ই-নাসিরী', যাতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের সময় পর্যন্ত ইতিহাস অত্যন্ত চমৎকার বিন্যাসে সংকলিত হয়েছে। আলেমগণ প্রতিটি যুগে এটি থেকে উপকৃত হয়ে আসছেন। বিশেষ করে গজনভি, ঘুরি, খাওয়ারিজম শাহী এবং হিন্দুস্তানের সুলতানদের অবস্থার বর্ণনায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বইটি ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছে। ভাষা সহজ, সাবলীল, অনাড়ম্বর এবং প্রভাবশালী। [২]

সেই সব নক্ষত্র যারা পূর্বে ছিল ক্ষণপ্রভা... তাদের কিরণে পশ্চিম পর্যন্ত ছিল আলোকিত
যাদের পাণ্ডুলিপিতে আজও সুশোভিত... প্যারিস, রোম ও লন্ডনের পাঠাগার
(খাজা আলতাফ হোসেন হালি)

---

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরী: ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন

৬৬৪ হিজরি থেকে ৬৮৬ হিজরি

(১২৬৬ খ্রি. থেকে ১২৮৭ খ্রি.)

আইবেক এবং ইলতুতমিশের পর গিয়াসউদ্দিন বলবন দাস বংশের তৃতীয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর আসল নাম ছিল 'বাহাউদ্দিন'। তিনি ইলবারি বংশের একজন তুর্কি আমীরজাদা ছিলেন, যিনি শৈশবে তাতারীদের আক্রমণের সময় বন্দী হন এবং দাস হিসেবে বাগদাদে বিক্রি হন। জামাল উদ্দিন বসরী নামক এক বুজুর্গ তাঁকে ক্রয় করেন এবং সর্বোত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দেন। অতঃপর সময়ের আবর্তনে তিনি দিল্লিতে পৌঁছান। ইলতুতমিশ তাঁকে ক্রয় করে নিজের বিশ্বস্ত করে তোলেন এবং 'উমরায়ে চেহেলগানা'-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। [১]

ইলতুতমিশের মৃত্যুর পর বলবন সালতানাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ছিলেন। নিজের মেয়েকে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের সাথে বিবাহ দিয়ে তিনি ভারতের অধিপতির শ্বশুরও হন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে তিনি 'উলুগ খান' উপাধি লাভ করেন এবং সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়। ফলে নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর শাসনক্ষমতা অত্যন্ত সহজেই বলবনের হাতে চলে আসে। তিনি একজন যোগ্য ও দায়িত্বশীল শাসক হওয়ার প্রমাণ দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী। প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে তিনি শাসনব্যবস্থাকে অত্যন্ত সুসংহত করেন। তাঁর প্রতিটি নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তের পেছনে গভীর চিন্তা নিহিত ছিল। [২]

নতুন ব্যবস্থা এবং রাজনীতির নতুন ধারা:

সিংহাসনে আরোহণের পর বলবন এটি জরুরি মনে করতেন যে, সালতানাতের আমীরদের সাথে সম্পর্কের নীতিমালা নতুন করে নির্ধারণ করা হোক এবং দিল্লি সালতানাতের শক্তি ও শান-শওকত নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করা হোক, যাতে ভারতের জন্য রাজতন্ত্রের একটি নতুন মূলনীতি চালু হয়। প্রকৃতপক্ষে বলবনের আমলে তাতারীরা বাগদাদ বিজয়ের পর অহংকারী হয়ে উপমহাদেশ পদদলিত করার স্বপ্ন দেখছিল। এর পাশাপাশি ভারতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ধারা দীর্ঘকাল ধরে কোনো বড় বিরতি ছাড়াই চলছিল। এটি...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৬৫

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৬৫, ২৬৬

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদসমূহ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে পারত। তাই বলবনের মতে, অনিবার্য পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে শক্তিশালী হাতে কেন্দ্রীভূত করা সময়ের দাবি ছিল। ফলে 'উমরায়ে চাহালগান'-এর শক্তি চূর্ণ করা জরুরি ছিল। [১]

বলবনের সামনে দ্বিতীয় বড় সমস্যা ছিল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার করা। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা পুরোপুরি সফল হয়নি এবং এখনও পাঁচটি স্থান সরকারি বাহিনীর জন্য বড় সমস্যার কারণ ছিল:

- মেওয়াত
- দোয়াব
- দিল্লি থেকে আওধ যাওয়ার রাস্তা
- কাটিহার (রোহিলখণ্ড)
- কোহিস্তানে নমক

মেওয়াত:

ইলতুতমিশের পর শুরু হওয়া আমীরদের অনৈক্য, বিদ্রোহ এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের দীর্ঘ সময়ে দিল্লির আশেপাশের এলাকায় মেওয়াতিরা অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠেছিল। তাদের পেশা ছিল চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি। তারা এমন ঘন জঙ্গলে বসবাস করত যেখানে কোনো বাহিনীর প্রবেশ করা কঠিন ছিল। তারা রাতে শহরে ঢুকে পড়ত এবং মানুষকে নানাভাবে উত্যক্ত করত। এমনকি কখনও কখনও তারা দেয়ালে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে পড়ত এবং মানুষকে লুট করত। দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকার সরাইখানাগুলোতে তারা লুটতরাজ চালাত। দাস ও দাসীরা যখন শহরের প্রাচীরের বাইরে হাউজে শামসি বা অন্য কোনো পুকুর থেকে পানি আনতে যেত, তখন তারা প্রায়ই তাদের লক্ষ্যবস্তু হতো। সাধারণত তারা দাসীদের কাপড় পর্যন্ত খুলে নিত এবং তাদের উলঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দিত। দিল্লির দিকে আসা অনেক মহাসড়ক তাদের কারণে অনিরাপদ ছিল। কাফেলা ও বণিকদের যাতায়াত অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের ভয়ে আসরের নামাজের পর শহরের পশ্চিম দরজা বন্ধ করে দেওয়া হতো এবং সন্ধ্যায় মাশায়েখদের মাজার জিয়ারত বা হাউজে শামসির তীরে ভ্রমণের জন্য বাইরে বের হওয়ার সাহস কারো হতো না।

এই কারণে সুলতান বলবন শাসনের প্রথম বছর দিল্লির চারপাশের জঙ্গল কাটতে এবং মেওয়াতের বিদ্রোহীদের দমন করতে ব্যয় করেন। তিনি মেওয়াত বিজয়কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অভিযান হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে তিনি শহর থেকে বের হয়ে নিজের সামরিক তাবু স্থাপন করে একটি ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানে হাজার হাজার বিদ্রোহী মেওয়াতি নিহত হয়।

এরপর তিনি মেওয়াতের সীমান্তে 'গোপাল গির'-এ একটি দুর্গ নির্মাণ করান এবং একজন কেল্লাদারের অধীনে অনেক থানা ও চৌকি স্থাপন করে সেখানে সাহসী আফগানদের মোতায়েন করেন। এছাড়া অনেক ভূমি, যা করমুক্ত ছিল, এই থানাগুলোর ব্যয়ের জন্য ওয়াকফ করে দেন যাতে এই ধারা অব্যাহত থাকে। এভাবে সুলতান মেওয়াতিদের লুটতরাজ থেকে জনগণকে রক্ষা করেন। [২]

---

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৬।

[২] (তারিখ ফিরোজশাহী বারানি: পৃষ্ঠা ৫৬; তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৪, ২৭৫) ফিরিশতার মতে, বলবন এই অভিযানে কমবেশি এক লক্ষ বিদ্রোহীকে হত্যা করেছিলেন। "এক লাখ আদমি রা আলফে তেগ সাখতা।"

দোয়াবা:

গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী সবুজ ও সজীব ভূখণ্ড দোয়াবা নামে পরিচিত। সে সময় এখানে বিশাল বিশাল জঙ্গল ছিল যেখানে বিদ্রোহী গোষ্ঠী, ডাকাত ও দস্যুদের ডজন ডজন দল লালিত-পালিত হচ্ছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য আযাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে মেওয়াতিদের দমন করার পর সুলতান দোয়াবার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং নির্দেশ দেন:

- বিদ্রোহীদের আস্তানাগুলো পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হোক।
- পুরুষদের হত্যা করা হোক।
- নারী ও শিশুদের দাসী ও দাস বানানো হোক।
- তাদের সম্পদকে গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য করা হোক।
- জঙ্গলগুলো সম্পূর্ণভাবে কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হোক।

তিনি দোয়াবার শহর, জনপদ ও জঙ্গলগুলোর দায়িত্ব এমন সব জায়গিরদারদের হাতে অর্পণ করেন যারা ছিল দুঃসাহসী, তৎপর ও কঠোর প্রকৃতির। ফলে এই আমীরগণ পূর্ণ একাগ্রতার সাথে এই অভিযানে লিপ্ত হন। এভাবে বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। জঙ্গলগুলো কেটে পরিষ্কার করা হয় এবং দোয়াবার অবশিষ্ট প্রজারা অনুগত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে যায়। [১]

অযোধ্যার মহাসড়ক:

দোয়াবার অভিযান সম্পন্ন করার পর বলবন দিল্লি থেকে অযোধ্যা যাওয়ার মহাসড়কটি উন্মুক্ত করার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি কাম্পিল ও পাতিয়ালিতে অবস্থান করেন এবং এই মহাসড়কের চারপাশের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ডাকাত ও বিদ্রোহীদের নির্মূল করেন। কাম্পিল, পাতিয়ালি ও ভোজপুরের বাণিজ্যিক মহাসড়কগুলোতে লুটেরাদের বড় বড় আস্তানা ছিল, যা ধ্বংস করে তিনটি মজবুত দুর্গ এবং বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ডাকাতদের ওত পাতার জায়গাগুলো সামরিক চৌকিতে পরিণত করা হয়। সুলতান এই তিনটি দুর্গ আফগান আমীরদের হাতে ন্যস্ত করেন এবং দুর্গের সংলগ্ন আবাদযোগ্য জমিগুলোকে করমুক্ত করে দেন। এই অভিযানে পাঁচ-ছয় মাস সময় ব্যয় হয়, তবে দিল্লি থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত পুরো এলাকা নিরাপদ হয়ে যায়। এখানে বসতি স্থাপনকারী আফগান আমীর এবং তাদের স্বগোত্রীয় মুসলমানদের কারণে এখানে ইসলামী শাসন অত্যন্ত সুসংহত হয় এবং মহাসড়কগুলোতে ডাকাতি ও লুটতরাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। [২]

কাটিহার (রোহিলখন্ড):

সুলতান যখন এই অভিযানগুলোতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাকে অনবরত এই সংবাদ দেওয়া হচ্ছিল যে, হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তৃত বিশাল সবুজ পাহাড়ি এলাকা কাটিহারের বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা গ্রামগুলোতে লুটতরাজ চালিয়ে সেগুলো উজাড় করে দিচ্ছে। বদায়ুন ও আমরোহা-র আমীরগণও তাদের দমনে অক্ষম ছিলেন। বলবন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কাটিহারের বিদ্রোহীদের শাস্তি কেবল রাজকীয় বাহিনীই দিতে পারে।

উল্লিখিত অভিযানগুলো থেকে অবসর হওয়ার সাথে সাথেই তিনি দিল্লি ফিরে এসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দলগুলোকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং প্রকাশ্য...

---

[১] তারিখে ফিরোজ শাহী, জিয়াউদ্দীন বারানী: পৃষ্ঠা ৫৭

[২] (তারিখে ফিরোজ শাহী, জিয়াউদ্দীন বারানী: পৃষ্ঠা ৫৭, ৫৮) স্থানের ব্যাখ্যা: পাতিয়ালি বলতে পাঞ্জাবের পাতিয়ালা নয়, বরং এই পাতিয়ালি দিল্লির পূর্বে প্রায় দুইশ কিলোমিটার দূরে উত্তর প্রদেশের কাসগঞ্জ জেলার একটি শহর, যা আমির খসরুর জন্মস্থান হিসেবেও বিখ্যাত।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি পাহাড়ি এলাকায় শিকার করতে যাবেন, কিন্তু সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার সাথে সাথেই তিনি হঠাৎ কাটিহারের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তিন দিন ও দুই রাতে বিদ্রোহীদের মাথার ওপর পৌঁছে গেলেন। তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এমনভাবে তলোয়ারের নিচে আনা হলো যে সবদিকে লাশের স্তূপ জমে গেল। এরপর পরবর্তী অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত এই এলাকাগুলোতে কোনো বিদ্রোহী মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। [১]

কোহিস্তান-ই-নামাক:

শীঘ্রই বলবন পাঞ্জাবের কোহিস্তান-ই-নামাকের ফিতনাবাজ ও বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আক্রমণ করেন এবং তাদের □□□□ভাবে দমন করেন। এই সামরিক অভিযানের ফলে নিহত, পরাজিত এবং পলায়নকারী শত্রুদের হাজার হাজার ঘোড়া তাঁর সেনাবাহিনীর হস্তগত হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ায় যখন সেগুলো বাজারে বিক্রি করা হলো, তখন ঘোড়ার আধিক্যের কারণে সেগুলোর দাম কমে গেল এবং মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ টাকায় একটি ঘোড়া পাওয়া যেতে লাগল। সংক্ষেপে, কয়েক বছরের মধ্যে সুলতান সমস্ত অবাধ্য শক্তিকে অনুগত করে বিদ্রোহ কবলিত এলাকাগুলোতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে দেখালেন। [২]

লাহোর সফর:

এই অভিযানগুলোর পর বলবন তাঁর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা উন্নত করার দিকে মনোযোগ দেন এবং ৬৬৮ হিজরি (১২৭০ খ্রিস্টাব্দ) সালে লাহোর সফর করেন। এই সুন্দর ঐতিহাসিক শহরটিকে মঙ্গোলরা ৬৩৯ হিজরি (১২৪১ খ্রিস্টাব্দ) সালের আক্রমণে এমনভাবে ধ্বংস করেছিল যে শহরের অবস্থা চেনা যাচ্ছিল না। আশেপাশের অধিকাংশ শহর ও গ্রামও জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং ভবনগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বলবন এখানে অবস্থান করে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লাহোর শহরের অবস্থা সংশোধন করেন। কেল্লা ও প্রাচীর নতুন করে নির্মাণ করান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন ও রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ শুরু করান। শহর ও গ্রামগুলোতে কর্মকর্তা ও স্থপতি নিয়োগ করেন যাতে সেগুলো পুনরায় আবাদ করা যায়। এভাবে বলবনের প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের জৌলুস ফিরে আসে। [৩]

এরপর লাহোর সর্বদা দিল্লি থেকে নিযুক্ত সুবাদারদের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। সীমান্তের সীমানা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং পাঞ্জাব প্রদেশের প্রশাসনিক আয়তনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, কিন্তু লাহোর, দিপালপুর, সুনান, সামানা, উচ এবং মুলতান দিল্লির কর্মকর্তাদের হাতেই থেকে যায়।

শাহজাদা মাহমুদ বুগরা খান, শাহজাদা মুহাম্মদ খান এবং মঙ্গোলদের প্রতিরোধ:

বলবনের মাত্র দুই ছেলে ছিল: বুগরা খান এবং মুহাম্মদ খান। বুগরা খানের প্রতি তাঁর খুব বেশি আশা ছিল না, বরং তাঁর আবেগপ্রবণ মেজাজের কারণে বলবনের আশঙ্কা থাকত যে তিনি হয়তো বিদ্রোহ করে বসবেন। তবুও লখনৌতিতে তুঘরিল খানের বিদ্রোহ দমনের পর তিনি লখনৌতির সুবাদারি বুগরা খানকে অর্পণ করেছিলেন এবং সেই সাথে তাঁকে তাকিদ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন দিল্লির সিংহাসনের...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, জিয়াউদ্দিন বারানি: পৃষ্ঠা ৫৮, ৫৯

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, জিয়াউদ্দিন বারানি: পৃষ্ঠা ৫৯, ৬০

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, জিয়াউদ্দিন বারানি: পৃষ্ঠা ৬০, ৬১

কখনো যেন বিরুদ্ধে না যায়। সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল যে, বুঘরা খান এত বড় দায়িত্ব নিয়ে অন্তত দিল্লির অনুগত তো থাকবে।

বলবন শুরুতে 'সুনাম' ও 'সামানা'র জেলাগুলো 'আমীর-ই-চাহেলগান'-এর বিশিষ্ট সদস্য 'তমর খান'-এর হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি এর আগে বলবন কবীর (ইজ্জুদ্দিন কিশলু খান) এবং তাঁর চাচা শের খানকে বারবার আনুগত্য পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন, তাই কিছুকাল পর তিনি তমর খানের পরিবর্তে 'সুনাম' ও 'সামানা'র প্রাদেশিক শাসনভার তাঁর ছোট ছেলে মাহমুদ বুঘরা খানের হাতে তুলে দেন। তবে তিনি বুঘরা খানকে কম বুদ্ধিমান মনে করতেন, তাই তাঁর অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা অবগত থাকার জন্য বেশ কয়েকজন গুপ্তচর নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন।

যা-ই হোক, বলবনের সমস্ত নেক আশা তাঁর বড় ছেলে মুহাম্মদ খানের সাথে যুক্ত ছিল, যিনি পরবর্তীতে 'খান-ই-শহীদ' উপাধিতে বিখ্যাত হন। সুলতান তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন এবং যেহেতু এই যুগে ভারতে মঙ্গোল আক্রমণের আশঙ্কা সর্বদা বিরাজমান ছিল, তাই বলবন তাঁকে পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্বও অর্পণ করেছিলেন।

শাহজাদা মুহাম্মদ খান অনেক দিক থেকেই তাঁর পিতার চেয়ে ভিন্ন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের, বিনয়ী এবং মার্জিত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। বলবন শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষিত ছিলেন। তিনি যখন পাঞ্জাবের শাসক হিসেবে মুলতানে অবস্থান করতে শুরু করেন, তখন তা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সেই সময়ে মঙ্গোল সৈন্যরা প্রায় প্রতি বছর বা দুই বছর অন্তর সিন্ধু নদ ও বিয়াস নদী পার হয়ে পাঞ্জাবে লুটতরাজ করার চেষ্টা করত। সুলতান বলবন তাদের প্রতিরোধের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রতি বছর উভয় শাহজাদা একই সময়ে অগ্রসর হয়ে ভারতের সেই সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন যা মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সাথে মিশেছে। সে অনুযায়ী মাহমুদ বুঘরা খান 'সামানা' থেকে সৈন্য নিয়ে বের হতেন, আর শাহজাদা মুহাম্মদ খান মুলতানের বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যেতেন। অন্যদিকে সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী আমীর বারবক তাঁদের সাহায্যের জন্য দিল্লি থেকে সৈন্য পরিচালনা করতেন। তাঁদের প্রত্যেকের বাহিনী আঠারো হাজার অশ্বারোহীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সফল ছিল। প্রায়ই এমন হতো যে, মঙ্গোলরা তাঁদের আগমনের খবর পেয়ে লুটতরাজ করে ফিরে যেত এবং তাদের সিন্ধু নদ পার হওয়ার সাহস হতো না। [১]

আমীর-ই-চাহেলগানের অবসান:

সুলতান ইলতুতমিশ কর্তৃক প্রশিক্ষিত চল্লিশজন তুর্কি ক্রীতদাস দিল্লি সালতানাতের স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হতেন, যাঁদের 'আমীর-ই-চাহেলগান' বলা হতো। ইলতুতমিশের মৃত্যুর পর তাঁদের 'তুর্কান-ই-খাজা তাশ' বলা হতে থাকে। তাঁরা সবাই সালতানাতের শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুই-তিনটি দল ছিল যাদের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং অন্য দলগুলোর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এই দলগুলো একের পর এক বিভিন্ন সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আসছিল।

সুলতান বলবনও তাঁদেরই একজন ছিলেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় পর্যন্ত এই চল্লিশজনের মধ্যে অধিকাংশ মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং যারা অবশিষ্ট ছিলেন...

---

[১] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩।

তারা যাই হোক সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল, তবে বলবন তাদের সালতানাতের ঐক্যের জন্য হুমকি মনে করতেন কারণ এই লোকেরা নিজেদের রাজকীয় আনুগত্য থেকে মুক্ত মনে করত। বলবন অবাধ্যদের সহ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর তার "খাজা তাশ" ভাইদের ওপর কড়া নজর রাখলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও কৌশলের সাথে ধীরে ধীরে এই উমারা বা খাজা তাশদের প্রভাব খতম করে দিলেন। যে আমিরের নিয়তে ফিতনা বা কাজে অবাধ্যতার লক্ষণ অনুভব করতেন, তাকেই শেষ করে দিতেন। এমনকি তার চাচাতো ভাই শের খানও তার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেনি এবং সুলতান তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করিয়েছিলেন। [১] এভাবে তিনি প্রাচীন উমারাদের আধিপত্য খতম করে শক্তি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করলেন।

জাগিরদারদের জবাবদিহিতা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বলবন জাগিরদারদের জবাবদিহিতা শুরু করেন এবং বিশেষ করে সেই জাগিরগুলোর তদন্ত করান যা ইলতুতমিশের সময় থেকে তুর্কি উমারা ও অফিসারদের তাদের সেবার বিনিময়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে দুই হাজার তুর্কির ছোট ছোট জাগির দোয়াবে ছিল। এই জাগিরদারদের ওপর না কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল আর না সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদানের কোনো দায়বদ্ধতা ছিল। জাগিরদারদের সাথে চুক্তি ছিল এই যে, তারা সামরিক সেবা প্রদান করবে এবং বিনিময়ে এই জাগিরের খাজনা নিজেরা আদায় করে নেবে। ইলতুতমিশের কঠোরতা ও সম্মানের কারণে এই ব্যবস্থা সেই যুগে কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু তার মৃত্যুর পর অরাজকতার ফলে জাগিরদারির এই পুরো ব্যবস্থা কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল।

এই ভিত্তিতে বলবন সেই দুই হাজার জাগিরদারের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলীর তদন্ত করলে জানা গেল যে, অধিকাংশ জাগিরদার মারা গেছে এবং যারা জীবিত আছে তারা বার্ধক্যের কারণে কোনো ধরনের সামরিক সেবা দিতে সক্ষম নয়। তবুও ভূমি অফিসের যোগসাজশ বা অবহেলার কারণে তারা এখনও জাগির থেকে সুবিধা ভোগ করছিল এবং এখন বংশানুক্রমিক জাগিরদার হওয়ার দাবিদার হয়ে বসেছিল। বলবন তদন্তের পর তাদের দাবি বাতিল ঘোষণা করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, এই জাগিরগুলো সামরিক সেবার বিনিময় ছিল এবং যখন জাগিরদাররা সেবা থেকে অবসরপ্রাপ্ত বা অক্ষম হয়ে গেছে, তখন এই চুক্তিও শেষ হয়ে গেছে। ফলে বলবন এই জাগিরগুলো ফিরিয়ে নিয়ে সরকারি মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এই সিলসিলায় কিছু জাগিরদারকে নগদ ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হলো। বাকিদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ছিল, তাদের জন্য পেনশন নির্ধারণ করে দেওয়া হলো, আর যারা সামরিক সেবার যোগ্য ছিল, তাদের বিধিবদ্ধভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে তাদের বেতন নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। [২]

সম্প্রসারণের পরিবর্তে স্থিতিশীলতা

দেশ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার পর বলবন সালতানাত সম্প্রসারণের চেষ্টা করেননি বরং তার সমস্ত মনোযোগ...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৬৬

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ৬১, ৬২

স্থিতিশীলতার ওপর ছিল, কারণ সালতানাতের বিভিন্ন স্থানে করদ হিন্দু রাজারা সুযোগের সন্ধানে থাকত যে কখন সুলতান দীর্ঘ ও দূরবর্তী অভিযানে ব্যস্ত হবেন এবং তারা পেছন থেকে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। আবার সিন্ধু নদের ওপারে মঙ্গোলদের উপস্থিতি ছিল এক গুরুতর পরিস্থিতি, যারা নদী পার হয়ে পাঞ্জাবের শহরগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর অপেক্ষায় ছিল।

এই কারণেই একদিন যখন তাঁর সেনাপতিরা: আদিল খান এবং তমর খান তাঁকে গুজরাট ও অন্যান্য কিছু রাজ্য জয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন, তখন বলবন বললেন:

“বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকা অবস্থায় দিল্লি ছেড়ে দূরবর্তী অভিযানে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ওদিকে মঙ্গোলরা ইসলামি দেশগুলো দখল করে নিয়েছে, লাহোরে তারা আক্রমণ করেছে এবং তারা প্রতি বছর একবার আমাদের দেশে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। আমি যদি দিল্লি থেকে দূরে যাই, তবে মঙ্গোলরা অবশ্যই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে, এমনকি তারা দিল্লি ও দোয়াব অঞ্চলকেও পদদলিত করবে। সুতরাং এখন যেহেতু আমাদের রাজ্য অনিরাপদ, আমার কাছে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং একে স্থিতিশীল করা অন্য রাজ্যগুলোতে আক্রমণ করার চেয়ে উত্তম।”

এটাও মনে রেখো যে, নতুন বিজিত অঞ্চলগুলোর জন্য যোগ্য কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হবে, যা এখন সরবরাহ করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যদি পরে সুযোগ পাই তবে অবশিষ্ট হিন্দুস্তানকেও পদানত করব এবং আমার সালতানাতের সীমানা বৃদ্ধি করব, কিন্তু বর্তমানে আমি মঙ্গোলদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করব।”

মোদ্দাকথা, বলবন তাঁর সমস্ত মনোযোগ অধিকৃত অঞ্চলগুলোর স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার ওপর ব্যয় করেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে নিজের ওপর সওয়ার হতে দেননি, যা সেই পরিস্থিতিতে উপকারী নয় বরং ক্ষতিকর ছিল। [১]

তাতারীদের সাথে যুদ্ধ:

বলবনকে তাতারীদের নিয়মিত সামরিক অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ৬৬৭ হিজরি (১২৬৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে তাদের ক্রমাগত আক্রমণ শুরু হয়। বলবন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের মোকাবিলা করেন এবং তাদের একের পর এক পরাজয় বরণ করান। সুলতানের পুত্ররা এই যুদ্ধগুলোর নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর দুই শাহজাদা: মুহাম্মদ খান এবং বুগরা খান দিপালপুরের কাছে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাতারীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

বলবন তাতারী প্লাবন রোধ করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার ফলে হিন্দুস্তান এই অসভ্য জাতির লুণ্ঠন থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। বলবনের প্রতিরক্ষা নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- তিনি অন্য রাজ্যগুলোতে সামরিক অভিযান ত্যাগ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, অন্য দেশ আক্রমণ করার চেয়ে বাদশাহর জন্য নিজের দেশের শাসনব্যবস্থা ঠিক রাখা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা উত্তম।

- তিনি বেশিরভাগ সময় দিল্লিতে অবস্থান করতেন, যাতে তাতারীদের অগ্রযাত্রার সংবাদ পাওয়া মাত্রই প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৫০, ৫১; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৭৩।

- তিনি দূরবর্তী অভিযানগুলোতে সৈন্য পাঠানো বন্ধ করে দেন যাতে প্রয়োজনে বাহিনী দ্রুত একত্রিত হতে পারে।
- তিনি সীমান্ত অঞ্চলের খোখর উপজাতিদের নিজের অনুগত করে নেন যাতে তাতাররা উপমহাদেশে নীরবে প্রবেশ করার এবং এখানে নিজেদের সমর্থক পাওয়ার সুযোগ না পায়।
- তিনি সেনাবাহিনীকে নতুন করে সংগঠিত করেন এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করেন।
- তিনি লাহোরে গিয়ে সেখানকার প্রাচীর নতুন করে নির্মাণ করান যা অতীতে তাতারদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।
- তিনি সীমান্তে কয়েক ডজন দুর্গ নির্মাণ করান এবং সেগুলোতে সৈন্য মোতায়েন করেন যাতে তাতারদের প্রতিটি পদক্ষেপে বাধার সম্মুখীন হতে হয়।
- তিনি সীমান্ত রক্ষার জন্য নিজের শাহজাদা এবং অত্যন্ত যোগ্য সরদারদের নিযুক্ত করেন। [১]

মহাজরিনদের পুনর্বাসন:

বলবনের পদক্ষেপের কারণে উপমহাদেশ বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিরাপদ থাকে এবং অভ্যন্তরীণভাবেও এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা আদর্শ পর্যায়ে ছিল। এই অঞ্চল তাতারদের গণহত্যা থেকে বেঁচে আসা লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মুসলমানের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। তাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দরবারে স্থান দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে বনু আব্বাসের দুইজন এবং অন্যান্য রাজপরিবারের তেরোজন শাহজাদাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

দিল্লিতে মহাজরিনদের পুনর্বাসনের পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি পরিবার ও সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা মহল্লা তৈরি করা হয়। দিল্লিতে এমন পনেরোটি মহল্লা গড়ে ওঠে যার মধ্যে আব্বাসি মহল্লা, খাওয়ারিজম শাহী মহল্লা, আতাবকি মহল্লা, ঘুরি মহল্লা, রুমি মহল্লা, কাশঘরি মহল্লা, ইয়ামানি মহল্লা, সাঞ্জারি মহল্লা, আলভি মহল্লা এবং খিতাই মহল্লা উল্লেখযোগ্য।

বলবনের বীরত্ব ও সুশাসনের দ্বারা অনেক তাতার সরদারও প্রভাবিত হন এবং তারা বলবনের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই নওমুসলিমদের জন্য আলাদাভাবে “চেঙ্গীজি মহল্লা” নির্মাণ করা হয়। [২]

লখনৌতিতে তুঘরিলের বিদ্রোহ এবং সুলতান বলবনের দীর্ঘতম অভিযান:

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শেষ দিনগুলোতে ‘উমরায়ে চেহেলগানা’র সদস্য রুকনুদ্দিন আরসালান খান খাওয়ারিজমি, যিনি লখনৌতির (বিহার ও বাংলার কেন্দ্র) সুবাদার ছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র তাতার খান, যিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তিনি সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু সুলতান বলবনের সিংহাসন আরোহণের পর তিনি কেবল আনুগত্যই প্রকাশ করেননি বরং সুলতানকে নজরানা হিসেবে ৬৩টি হাতিও পাঠিয়েছিলেন। তাই বলবনের লখনৌতি নিয়ে কোনো শঙ্কা ছিল না।

তবে কিছুকাল পর তাতার খান লখনৌতিতে নিজের স্থলে “তুঘরিল খান” নামক এক কর্মকর্তাকে নায়েব নিযুক্ত করেন, যিনি সুলতান বলবনের একজন বিশ্বস্ত গোলাম ছিলেন। ৬৭৭-৮ হিজরি (১২৮০ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি তার প্রতিবেশী রাজ্য “জাজনগর” (উড়িষ্যা)-এর রাজার...

---

[১] তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮৭-৩৯০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৬৮, ২৬৯, ২৬৭।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৬৮, ২৬৭।

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং এক গৌরবময় বিজয় অর্জন করেন। ফেরার পথে তিনি বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ এবং অনেক হাতি গনিমত হিসেবে নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি গনিমতের মালের সরকারি অংশ এই ভেবে দিল্লিতে পাঠাননি যে, সুলতান এখন বার্ধক্য এবং অন্যান্য অভিযানের কারণে এর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে অক্ষম।

সে সময় সুলতান বলবন অসুস্থতার কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এই কারণে তিনি এক মাস পর্যন্ত দরবারেও আসতে পারেননি। এই গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাদশাহ ইন্তেকাল করেছেন। যখন তুঘরিল খানের কাছে এই খবর পৌঁছাল, তখন তিনি খবরের সত্যতা যাচাই না করেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজের উপাধি "সুলতান মুগিসুদ্দিন" রাখেন। তিনি স্বাধীনতার সমস্ত প্রতীক গ্রহণ করেন, যেমন: রাজকীয় ছত্র (চত্র-ই-শাহী), খুতবা এবং মুদ্রা প্রচলন। যেহেতু তিনি দানশীল ও প্রজাবৎসল ছিলেন, তাই জনগণ তাঁর বাদশাহিতে খুশি হয়েছিল।

তুঘরিল খানের বিদ্রোহের সংবাদে সুলতান বলবন এতটাই মর্মাহত হন যে, তিনি সেই রাতে না কিছু খেতে পেরেছিলেন, না ঘুমাতে পেরেছিলেন। তিনি অবিলম্বে অযোধ্যার সুবাদার আমিন খান (মালিক আইতিগিন মুয়ে-দরাজ)-কে এক বিশাল বাহিনীসহ লখনৌতির দিকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আমিন খান সরাউ (ঘাঘরা) নদী পার হওয়া মাত্রই তুঘরিল খান সামনে চলে আসেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাঁর মোকাবিলা করে তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সেই সাথে তিনি মূল্যবান উপঢৌকন ও উপহার দিয়ে সরকারি বাহিনীর অনেক কর্মকর্তা ও সৈন্যকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। যে সকল সরকারি সৈন্য বলবনের অনুগত ছিল, তারা পথের হিন্দু উপজাতিদের আক্রমণের মোকাবিলা করে কোনোমতে দিল্লিতে ফিরে আসে।

নিজের প্রাক্তন দাসের হাতে শোচনীয় পরাজয়ে বলবন এতটাই রাগান্বিত হন যে, তিনি পরাজিত সেনাপতি আমিন খানকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তাঁর লাশ অযোধ্যার ফটকে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি আরও বেশি প্রস্তুতি নিয়ে মালিক তারগির নেতৃত্বে একটি বাহিনী তুঘরিল খানকে দমনের জন্য পাঠান। কিন্তু লখনৌতির বাইরে তুঘরিল খান তাকেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

এটি দেখে সুলতান বলবন নিজেই তুঘরিল খানের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তিনি জানতেন যে, এমন শক্তিশালী শত্রুকে গভীর পরিকল্পনার মাধ্যমেই কাবু করা সম্ভব এবং লখনৌতির এই অভিযান দীর্ঘ হতে পারে। তাই তিনি যাওয়ার আগে পুরো দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নতুন করে সাজান। তিনি নিজে দিল্লি থেকে বের হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে যান এবং সেগুলো অত্যন্ত বিশ্বস্ত আমিরদের হাতে ন্যস্ত করেন। কিছু প্রদেশকে ছোট ছোট জেলায় বিভক্ত করে সেখানে অনেক যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। নিজের উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ খানকে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করেন এবং তাকে মঙ্গোলদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। দিল্লিতে মালিকুল উমারা ফখরুদ্দিন কোতোয়ালকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নির্দেশ দেন যে, প্রতিটি বিষয়ের খবর আমাদের কাছে পাঠাতে থাকবে। তবে জরুরি অবস্থায় রাজকীয় ফরমানের অপেক্ষা না করে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী যা ইচ্ছা করতে পারো, কারণ তুঘরিলকে শেষ না করে আমাদের ফেরা হবে না।

এখন সুলতান বলবন বাহিনী নিয়ে পূর্ব দিকে রওনা হলেন। যদিও বর্ষাকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সফর ছিল কঠিন, কিন্তু তিনি কোনো অসুবিধার পরোয়া না করে কুচ করে সরাসরি অযোধ্যায় পৌঁছে গেলেন। এখান থেকে আরও দুই লক্ষ লোকের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলেন।

গেল। সেই সাথে গঙ্গা নদীর পথ দিয়ে অসংখ্য নৌকাও ভারী যুদ্ধাস্ত্র এবং সৈন্যদের নিয়ে রওনা হয়ে গেল। সুলতান বলবন নিজে স্থলপথে অগ্রসর হয়ে "সামানা" পৌঁছালেন এবং নিজের ছোট ছেলে শাহজাদা বুগরা খান ও তার বাহিনীকে সাথে নিয়ে অভিযান অব্যাহত রাখলেন, এমনকি তিনি লখনৌতির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।

এত বড় বাহিনীর অগ্রসরের খবর শুনে তুঘরিল খান উড়িষ্যার কেন্দ্র "জাজ নগর"-এর মজবুত কেল্লায় আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তবে সেই সাথে ঘোষণা করে দিলেন যে, রাজকীয় বাহিনী ফিরে যাওয়ার পর তিনি পুনরায় এসে লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করবেন। যখন সুলতান বলবন লখনৌতি পৌঁছালেন, তখন ময়দান খালি ছিল। তিনি সেখানে কয়েক দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর পুনরায় তুঘরিল খানের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করলেন এবং শীঘ্রই সোনারগাঁ পৌঁছে গেলেন। এখানে সোনারগাঁয়ের চৌধুরী ধনুজ রায়ের কাছ থেকে জানা গেল যে, তুঘরিল খান উড়িষ্যার দিকে চলে গেছেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে জাজ নগরের কেল্লায় পৌঁছে যাবেন। সুলতান তাকেও তাকিদ দিলেন যেন তুঘরিলকে জল ও স্থল সকল পথে তালাশ করা হয়।

এরপর সুলতান বলবন দ্রুতগতিতে জাজ নগরের দিকে অভিযান শুরু করলেন। জাজ নগর থেকে একশ বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে তিনি মালিক বারবাককে অগ্রগামী ক্ষিপ্রগতির বাহিনীর সাথে সামনে পাঠিয়ে দিলেন। মালিক বারবাক সামনে গিয়ে তুঘরিলের কোনো হদিস না পেয়ে ডানে-বামে কয়েকটি দল পাঠালেন। তাদের মধ্যে মালিক শের আন্দাজের দল কিছু শস্য ব্যবসায়ীকে পেয়ে গেল। তিনি তাদের কাছে তুঘরিল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করল। মালিক শের আন্দাজ তাদের আতঙ্কিত করার জন্য তাদের মধ্য থেকে দুইজনের শিরশ্ছেদ করে দিলেন। ব্যবসায়ীরা থরথর করে কাঁপতে লাগল এবং বলল: "তুঘরিল খান মাত্র এক মাইল দূরে একটি পাথুরে জলাশয়ের পাড়ে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন এবং আগামীকাল তিনি জাজ নগর পৌঁছে যাবেন।"

মালিক শের আন্দাজ এ কথা শোনামাত্রই মালিক বারবাককে খবর দেওয়ার জন্য নিজের দূত পাঠালেন যে, তুঘরিল খানের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারপর তাদের মধ্য থেকে দুইজন ব্যবসায়ীকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সাথে নিলেন এবং তুঘরিলের ছাউনির দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন। ওদিকে তুঘরিল নিশ্চিন্ত ছিলেন যে রাজকীয় বাহিনী এখনও অনেক দূরে, তাই যখন রাজকীয় অশ্বারোহীদের এই দলটি সেখানে পৌঁছাল, তখন তুঘরিল খান তার বাহিনীসহ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং হাতি-ঘোড়াগুলো তৃণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছিল।

যেহেতু এই সম্ভাবনা ছিল যে তুঘরিল বিপদের আভাস পেয়ে যেতে পারেন এবং বাকি বাহিনী আসার আগেই তিনি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারেন, তাই তাদের মধ্য থেকে চল্লিশজন সৈন্য কোনো বিরতি ছাড়াই অতর্কিত হামলা চালিয়ে দিলেন এবং সেই সাথে তুঘরিলকে চিৎকার করে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিতে লাগলেন। তুঘরিল যদি এখানে সাহসের পরিচয় দিতেন তবে নিজের বাহিনী নিয়ে এই ছোট দলটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে দাঁড়াল এবং তিনি ভাবলেন যে সুলতান মাথার ওপর এসে পৌঁছেছেন, তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একটি ঘোড়ায় চড়ে একাকী জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে গেলেন যাতে নিকটস্থ নদীতে পৌঁছাতে পারেন। তাকে পালিয়ে যেতে দেখে দুইজন সৈন্য তার পিছু নিল। তুঘরিল নদীর তীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এমন সময় সুলতানি সৈন্যরা তাকে তীর মেরে ঘোড়া থেকে নিচে ফেলে দিল এবং তারপর তার শিরশ্ছেদ করে তাকে নদীর তীরের নরম মাটিতে লুকিয়ে রাখল। কিছুক্ষণ পর মালিক বারবাকও সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তার মস্তক গ্রহণ করে সুলতানের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন।

সুলতান চেয়েছিলেন তুঘরিলকে জীবিত গ্রেপ্তার করা হোক এবং তিনি তাকে নিজ হাতে হত্যা করবেন, তাই শুরুতে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলেন। তবে কিছুক্ষণ পর রাগ প্রশমিত হলে তিনি তুঘরিলকে হত্যাকারী সৈন্যদের বড় বড় পুরস্কার প্রদান করেন। এরপর তিনি লখনৌতি শহরের বাজারে দুই মাইল পর্যন্ত ফাঁসির মঞ্চ তৈরির নির্দেশ দেন এবং তুঘরিলের সমস্ত বন্ধু, বন্দী সৈন্য এবং আত্মীয়-স্বজনদের সেখানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া অনেক বন্দীকে সুলতান নিজের সাথে দিল্লিতে নিয়ে যান।

সুলতান বলবন তিন বছর পর অর্থাৎ ৬৮১ হিজরি (১২৮২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে এই অভিযান থেকে দিল্লিতে ফিরে আসেন। তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন এবং অনেক ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লিতে তার সাফল্যের উৎসব পালন করা হয়। সুলতান তৎকালীন শাসক মালিক ফখরুদ্দিন কোতোয়ালকে নিজের ভাই বলে সম্মান দেন এবং নিজের গায়ের চাদর খুলে তাকে পরিয়ে দেন। মানুষের মাঝে সদকা ও খয়রাত বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। দেওয়ানি মামলার সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। জনগণের ওপর ধার্যকৃত ট্যাক্স মওকুফ করা হয়।

এরপর সুলতান বলবন সেই সমস্ত লোকদের ফাঁসির নির্দেশ দেন যাদের তুঘরিলকে সমর্থনের অপরাধে লখনৌতি থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে দিল্লির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয় ছিলেন। এই নির্দেশের ফলে শহরে শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এমন সময় কাজী লস্কর শেখ ইমাদউদ্দিন বড় সাহস দেখালেন এবং সুলতানের কাছে তাদের প্রাণভিক্ষার সুপারিশ করলেন, যা সুলতান কবুল করে নেন এবং বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়।

এই অভিযানে সাফল্যের পর সুলতান তার ছেলে বুঘরা খানকে ‘সামানা’ ও ‘সুনাম’-এর জায়গিরদারি থেকে সরিয়ে লখনৌতির বিশাল ভূখণ্ডের সুবাদার বানিয়ে দেন। অন্যদিকে তিনি মঙ্গোলদের হাত থেকে পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব তার উত্তরাধিকারী শাহজাদা মুহাম্মদ খানের ওপর অর্পণ করেন [১]।

উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ খানের গুণাবলি:

সুলতান বলবন তার ছেলে শাহজাদা মুহাম্মদ খানকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন। শাহজাদার আসল নাম ছিল মুহাম্মদ সুলতান। তিনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দের পাত্র ছিলেন। তিনি জ্ঞান, মর্যাদা, বীরত্ব ও দানশীলতায় গুণান্বিত ছিলেন এবং অত্যন্ত সদাচারী ও মন জয় করার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মুখ থেকে কখনো কোনো কটু কথা শোনা যায়নি। ডজন ডজন আলেম ও গুণীজন তার সহচর ছিলেন। তার দরবারে ফেরদৌসীর শাহনামা, হাকিম সানায়ি ও খাকানির দিওয়ান এবং নিজামীর খামসা থেকে কবিতা পাঠ করা হতো এবং বিজ্ঞ চিন্তাবিদ ও মহান কবিদের কালামের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে শাহজাদা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও আলোচনা করতেন।

তার সাহিত্যিক অনুরাগের আন্দাজ এখান থেকে করা যায় যে, তিনি আলেম ও গুণীজনদের মজলিসে এক পাশে বসে রাত কাটিয়ে দিতেন। তিনি প্রাচীন কবিদের কালাম থেকে বিশ হাজার পঙক্তি নির্বাচন করেছিলেন। শাহজাদার গুণগ্রাহিতার কারণে আমির খসরু এবং আমির হাসান-এর মতো ‘আফতাব-এ-দরবার-এ-মুলতান’ শাহজাদার সহচর হিসেবে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী বারানি: পৃ. ৮০-৯০; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৮১-২৮৫।

এই গুণগ্রাহিতার কারণে শাহজাদা দুইবার শিরাজের বুলবুল হযরত শেখ সাদী (রহ.)-এর নিকট নিজের দূত পাঠান এবং তাঁকে মুলতানে আসার দাওয়াত দেন যাতে হিন্দুস্তানের মানুষ শেখের বরকত ও ইলম দ্বারা উপকৃত হতে পারে। শাহজাদা সমস্ত খরচ পাঠানোর এবং মুলতানে তাঁর জন্য একটি খানকাহ নির্মাণ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন যার ব্যয়ের জন্য বিশাল জমি ওয়াকফ করা হবে। এটি ভিন্ন কথা যে, শেখ সাদী (রহ.) নিজের বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজের হাতে একটি গজল লিখে শাহজাদার কাছে পাঠান এবং নিজের আসতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এই যুগেই হযরত উসমান মারভান্দি (লাল শাহবাজ কালান্দার রহ.) মুলতানে তশরিফ আনেন, তো শাহজাদা তাঁর অত্যন্ত সম্মান ও কদর করেন এবং এতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। তিনি চেষ্টা করেছিলেন যেন তাঁর জন্য মুলতানে একটি খানকাহ তৈরি করে দেওয়া হয় যাতে তিনি এখানেই অবস্থান করেন, কিন্তু হযরত তা গ্রহণ করেননি। শাহজাদা হযরত শেখ সদরুদ্দিন আরিফ (রহ.) (হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ.-এর সাহেবজাদা)-এর সাহচর্য থেকেও উপকৃত হতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। [১]

মঙ্গোল যুদ্ধের পূর্বে সুলতান বলবনের শাহজাদা মুহাম্মদ খানকে নসিহতসমূহ:

৬৮৩ হিজরি (১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ইরানের ইলখানি মঙ্গোল সালতানাতের তখতে হালাকু খানের পৌত্র আরগুন খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পুনরায় পাঞ্জাবের দিকে সৈন্য পরিচালনার পরিকল্পনা করেন। ফলে আবারও তাতারদের অগ্রসর হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে শাহজাদা মুহাম্মদ খানের অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি বছর একবার দিল্লি এসে পিতার খিদমতে হাজিরা দিতেন, নিজের কাজের বিবরণ দিতেন এবং পরামর্শ নিতেন। এবার বলবন শাহজাদা মুহাম্মদ খানকে বিদায় করার সময় তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেন যা নিম্নরূপ:

- “যখন আল্লাহ তোমাকে মাখলুকের সরদারি অর্থাৎ বাদশাহি দান করেন, তখন এই পদকে সহজ মনে করো না। একে খোদার নিয়াবত (প্রতিনিধিত্ব) মনে করো। এই পবিত্র ও মহান দায়িত্বকে অশোভন আচরণ ও অপছন্দনীয় অভ্যাস দ্বারা কলুষিত হতে দিও না।”
- “উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাদশাহি একে অপরের জন্য অপরিহার্য। বাদশাহর হিম্মত সমস্ত হিম্মতের বাদশাহ হওয়া উচিত, অন্যথায় সাধারণ মানুষ ও বাদশাহর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। লক্ষ্যহীনতা ও বাদশাহির কোনো জোড় নেই।”
- “লোভী ও নির্দয় লোকদের কাছ থেকে কখনো মঙ্গলের আশা রেখো না।”
- “যাকে তুমি একবার সম্মানিত করেছ, তাকে সামান্য ভুলের জন্য কখনো লাঞ্ছিত করো না। কোনো রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ছাড়া নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুদের কখনো দুঃখ দিও না।”

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৬৮, ২৭৭ থেকে ২৭৯।

“শরিফদের (অভিজাতদের) কষ্ট দিতে তাড়াহুড়ো করো না। এমন লোকদের অপমানের ক্ষত সহজে শুকায় না এবং এর ক্ষতিপূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।”

“যে কাজ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তাতে কখনো হাত দিও না; কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রাখা বাদশাহর জন্য বড় লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।”

“বাদশাহর জন্য জরুরি হলো প্রজাদের ভালো-মন্দ অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা।”

“বাদশাহর জন্য জরুরি হলো প্রতিটি বিষয়ে পরিমিতিবোধ বজায় রাখা, রাগের তীব্রতা না দেখানো, কারণ এতে মানুষ বাদশাহর প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করে।”

“অলসতা এবং অপ্রয়োজনীয় কোমলতাকে কাছে ঘেঁষতে দিও না, কারণ এতে বিদ্রোহীদের সাহস বেড়ে যায় এবং প্রজারা অশান্তির শিকার হয়।”

“নিজের সুরক্ষা সবসময় করা উচিত, কারণ বাদশাহর জীবন প্রজাদের জন্য ঢাল স্বরূপ।” [১]

শাহজাদা মুহাম্মদ খানের মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধসমূহ:

শাহজাদা মুহাম্মদ খান পাঞ্জাবে পৌঁছে মঙ্গোলদের মোকাবিলার প্রস্তুতি নিলেন, যারা সীমান্তে উস্কানি দিচ্ছিল। শাহজাদা বেশ কিছু সীমান্ত এলাকায় তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং তাদের অনেককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন।

এই মঙ্গোল সৈন্যরা আরগুনের অধীনে তৈমুর খানের পক্ষ থেকে পাঠানো হচ্ছিল, যে হেরাত, গজনী এবং কান্দাহারের শাসক ছিল। যখন সে খবর পেল যে শাহজাদা মুহাম্মদ খানের পাল্টা হামলায় তার অনেক আত্মীয়-স্বজনও নিহত হয়েছে, তখন সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঞ্জাবের দিকে পাঠিয়ে দেয়। এই বাহিনী লাহোর ও দিপালপুরের মধ্যবর্তী এলাকা লুণ্ঠন করতে করতে মুলতানের দিকে অগ্রসর হয়। [২]

শাহজাদা মুহাম্মদ খান তার বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের মঙ্গোলদের মোকাবিলার জন্য পাঠান। অবশেষে “ঢান্ডি কানডালি” নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে মঙ্গোল বাহিনী তাদের বিশাল সংখ্যার কারণে জয়ী হয় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে। এই পরাজয়ের খবর শুনে শাহজাদা মুহাম্মদ খান অত্যন্ত রাগান্বিত হন। যখন পরাজিত সরদাররা তার সামনে উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সংকল্প করেন, কিন্তু পরে কিছু বিজ্ঞ সহচরদের পরামর্শে তাদের ক্ষমা করে দেন এবং আরও উৎসাহিত করার জন্য তাদের খেলাত প্রদান করেন। [৩]

মঙ্গোলদের দ্বিতীয় আক্রমণ এবং শাহজাদা মুহাম্মদ খানের বীরত্ব:

লখনৌতি থেকে ফেরার পর সুলতান বলবন ক্রমাগত নিজের স্বাস্থ্যের অবনতি অনুভব করছিলেন, তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সালতানাত...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৮৭ থেকে ২৮৮

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৮৯, ২৯০

[৩] ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৭১, ১৭২, ১৭৩

শাহজাদা মুহাম্মদ খানকে সঁপে দিই। ফলে তিনি ফরমান পাঠিয়ে শাহজাদাকে অবিলম্বে দিল্লি তলব করলেন। সুলতানের দূত দশম দিনে মুলতান পৌঁছাল। সেই সময় শাহজাদা সুলতান মুহাম্মদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই উত্তর পাঠালেন যে খাদেম শীঘ্রই রওনা হচ্ছে। সুলতান বলবনের কাছে শাহজাদার উত্তর পছন্দ হলো না এবং তিনি তার ওপর কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি শাহজাদাকে একটি অত্যন্ত কঠোর ও অভিযোগমূলক পত্র লিখে পাঠালেন।

কিন্তু যখন এই পত্র মুলতানে পৌঁছাল, তখন শাহজাদার জন্য দিল্লি সফর অসম্ভব ছিল, কারণ সেই সময় মুলতানের দক্ষিণে সুমরা গোত্রগুলো বিদ্রোহ করেছিল এবং শাহজাদা সেই গোত্রগুলোকে দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হচ্ছিলেন। ফলে শাহজাদা সুমরা গোত্রগুলোর এলাকায় পৌঁছালেন এবং সেখানকার বিশৃঙ্খলাকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনলেন। তিনি তখনো সেই এলাকার 'জতরাল' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গোয়েন্দারা খবর দিল যে মঙ্গোল সর্দার তৈমুর খান ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শাহজাদা এই খবর তখন পেলেন যখন মঙ্গোল বাহিনী মাত্র পাঁচ ফরসাখ (পনের মাইল) দূরত্বে চলে এসেছে। অর্থাৎ মঙ্গোলরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও নিঃশব্দে অগ্রসর হয়েছিল এবং এখন যুদ্ধ সন্নিকটে ছিল।

শাহজাদা মুহাম্মদ খান অবিলম্বে মঙ্গোলদের মোকাবিলার জন্য বের হতে লাগলেন, কিন্তু অফিসাররা বললেন:

"আপনি এই যুদ্ধের জন্য আমাদের পাঠিয়ে দিন এবং নিজে মুলতানে ফিরে গিয়ে দুর্গ মজবুত করুন। আমাদের মতো হাজারো মানুষ যদি শহীদ হয়ে যায়, তবে বাদশাহ তাদের জায়গায় অন্য সৈন্য পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু আপনার যদি কিছু হয়ে যায় তবে আপনার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কেউ থাকবে না।"

শাহজাদা হাসিমুখে তাদের কথা শুনলেন এবং তারপর বললেন:

"আপনাদের মতো শুভাকাঙ্ক্ষীদের এটাই মানায় যে আমাদের মঙ্গলের কথা ভাববেন এবং আমাদের পরিবর্তে নিজেদের জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবেন, কিন্তু শাহজাদাদের এটা মানায় না যে তারা শত্রুদের দেখে ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে নেবে। মঙ্গোলরা যদি ত্রিশ হাজার নয়, এক লক্ষও হয় তবুও আমি পিছু হটার পাত্র নই। যদি ভাগ্য সহায় হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছা আমাদের পক্ষে থাকে, তবে আমরা শত্রুদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে আমাদের সালতানাতের নাম উজ্জ্বল করব। আর যদি তা না হয়, তবুও আমরা বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে করতে আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দেব।"

এভাবে সেনাকর্মকর্তা ও সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করে শাহজাদা যাত্রা শুরু করলেন। পরদিন সকালে মঙ্গোলদের অগ্রবর্তী দলগুলো সামনে দেখা যেতে লাগল, যারা দলে দলে রাভি নদী পার হচ্ছিল। মুসলমানরা তাদের ব্যূহ রচনা করার আগেই মঙ্গোলরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে সামনে চলে এসেছিল। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলমানরা তলোয়ার ও বর্শার নৈপুণ্য দেখিয়ে মঙ্গোলদের কোনো সুযোগই দিল না। মঙ্গোলরা বারবার প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল কিন্তু ইসলামের সৈন্যদের ব্যূহ পেছনে হটাতে পারল না। এভাবে দুপুর পর্যন্ত অত্যন্ত তীব্রতার সাথে যুদ্ধ চলতে থাকল। [১]

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৭৪ থেকে ১৭৮

শাহজাদা মুহাম্মদ খানের শাহাদাত:

ইসলামী বাহিনীতে 'তুর্কান-ই-গুজ' বংশীয় একজন অফিসার ছিলেন যার নাম ছিল 'দমনগলি'। তিনি দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন এবং মঙ্গোলরা এ কথা জানত। ফলে মঙ্গোল সরদার তার অবস্থান জেনে নিয়ে হঠাৎ তার বাহিনীর ওপর জোরালো আক্রমণ চালায়। দমনগলি পিছু হটে যান এবং তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী লশকর বা বাহিনীর অন্যান্য অংশও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। যেহেতু মঙ্গোল বাহিনীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, তাই মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ অংশ পিছু হটতে বাধ্য হয়।

তবে শাহজাদা মুহাম্মদ খান তার অনুগতদের নিয়ে দৃঢ়ভাবে লড়াই চালিয়ে যান। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে বাহিনীর অধিকাংশ পিছু হটে গেছে এবং তার চারপাশে মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু লোক অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি তার ঘোড়া রাভী নদীর দিকে ঘুরিয়ে দেন। কিন্তু মঙ্গোলরা তাকে ধাওয়া করে এবং তাকে শহীদ করে দেয়। একজন মঙ্গোল সরদার তার ঘোড়াটি দখল করে নেয়। মঙ্গোলরা জানতে পারেনি যে মুসলমানদের শাহজাদা নিহত হয়েছেন। কিন্তু শাহজাদার একজন দাসী, যাকে মঙ্গোলরা বন্দি করেছিল, সে মঙ্গোল সরদারকে শাহজাদার ঘোড়ায় সওয়ার দেখে বুঝতে পারে যে তার মনিব শহীদ হয়েছেন। ফলে তার চিৎকার ও আহাজারিতে মঙ্গোলরা সজাগ হয় এবং বিষয়টি জানতে পারে। যখন তারা জানতে পারল যে নিহতদের মধ্যে শাহজাদাও রয়েছেন, তখন তারা তার লাশ খুঁজে বের করে। তারা লাশটি একটি কফিনে ভরে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু শহীদ শাহজাদার শ্বশুরবাড়ি কালুন-এর পক্ষ থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং বিপুল অর্থের বিনিময়ে শাহজাদার লাশটি সংগ্রহ করা হয়। মঙ্গোলরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে যায়। আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, এই ঘটনাটি ৬৮৪ হিজরি (১২৮৫ খ্রিস্টাব্দ) সালের। [১]

এই যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক নামকরা আমির বন্দি হন, যাদের মধ্যে হযরত আমির খসরু (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-ও ছিলেন। পরবর্তীতে তারা মুক্তি পান এবং পুনরায় দিল্লির দরবারের সাথে যুক্ত হন। [২]

সুলতান বলবনের শেষ দিনগুলো:

শাহজাদা মুহাম্মদ খানের শাহাদাত সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের জন্য এক অসহনীয় শোক হিসেবে প্রমাণিত হয়। তার বয়স '৮০' বছরের বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে তা উত্তরাধিকারীর হাতে সোপর্দ করতে যাচ্ছিলেন। এই শাহজাদাই ছিল তার আশার শেষ আশ্রয়স্থল। কলিজার টুকরো সন্তানের মৃত্যু তাকে এতটাই ভেঙে দেয় যে তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তার হৃদয় এতটাই ভেঙে গিয়েছিল যে প্রতিটি নিঃশ্বাস তার কাছে কষ্টদায়ক মনে হতে লাগল। যদিও মুখে সবরের কথা থাকত, কিন্তু হৃদয়ের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ...

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৭৮ থেকে ১৮১; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ১০৯; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৫ থেকে ৩৯৭। দ্রষ্টব্য: যুদ্ধের এই বিবরণগুলো মূলত ইসামির ফুতুহুস সালাতিন থেকে নেওয়া হয়েছে। ফেরেশতার বর্ণনা ভিন্ন, তিনি বলেন যে তীব্র যুদ্ধের পর অনেক নামকরা তাতারী সরদার নিহত হয় এবং তাদের বাহিনী পিছু হটে যায়। শাহজাদা মুহাম্মদ খান শত্রুদের ধাওয়া করেন। জোহরের সময় শাহজাদা বাহিনীকে এক জায়গায় থামিয়ে নামাজ আদায় করতে শুরু করেন, এই অবসরে তাতারীরা ফিরে এসে হঠাৎ আক্রমণ করে। শাহজাদা পূর্ণ বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবিলা করেন কিন্তু এই সময়ে একটি তীর তার গায়ে লাগে এবং তিনি শহীদ হন। (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৯০-২৯১)।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৯১; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ১১০।

...নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং রাতে উঠে উঠে কাঁদত। [১]

মজলুমদের দীর্ঘশ্বাস:

বলা হয় যে, একবার সুলতানের সামনে কিছু লোককে পেশ করা হয়েছিল যাদের বিরুদ্ধে জাল মুদ্রা তৈরির অভিযোগ ছিল। তাদের মধ্যে একজন যুবক ছিল যে তার বৃদ্ধা বিধবা মায়ের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সে নির্দোষ ছিল কিন্তু ভুলবশত তাকে ধরা হয়েছিল। বৃদ্ধা সুলতানের কাছে দয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু সুলতানের নীতি ছিল যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করা হবে না। ফলে এই মামলায় ধৃত সকল ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

সেই দিনের পর থেকে সেই বৃদ্ধা মহিলা প্রতি রাতে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে অত্যন্ত হৃদয়বিদারকভাবে চিৎকার ও আর্তনাদ করত, তার ছেলের মৃত্যুর শোক পালন করত এবং সুলতানকে অভিশাপ দিত। তার চিৎকার ও চেঁচামেচিতে সুলতানের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটত। তাই সুলতানের কর্মকর্তারা তাকে চিৎকার করা থেকে বিরত রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাকে ভয়ভীতিও দেখানো হয়েছিল এবং সম্পদের লোভও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে বিরত হয়নি। যেদিন দিল্লিতে শাহজাদা খানের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ল, সেই দিনের পর থেকে সেই বৃদ্ধা মহিলা আর কখনো প্রাসাদের কাছে আসেনি। সম্ভবত তার বিশ্বাস জন্মেছিল যে বিচার পাওয়া গেছে। সুলতানের পক্ষ থেকে তাকে খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তার আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। [২]

বুগরা খান থেকে আশা ও নিরাশা:

বলবন যেভাবেই হোক তার পরিবার ও সালতানাতকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন যার এখন আর কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী অবশিষ্ট ছিল না। বলবনের মতে, তার ছেলে বুগরা খান, যিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন, তিনি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা বর্জিত ছিলেন। তার সমস্ত আশা মুহাম্মদ খানের সাথে জড়িত ছিল যিনি শহীদ হয়েছিলেন। তবুও শেষ পদক্ষেপ হিসেবে তিনি বুগরা খানকে লখনৌতি থেকে রাজধানীতে ডেকে পাঠান এবং তাকে তাকিদ দেন যে তিনি যেন এখন এখানেই থাকেন কারণ যেকোনো সময় তার প্রয়োজন হতে পারে। যদিও তার ভরসা ছিল না যে বুগরা খান সালতানাত সামলাতে পারবেন কি না। বলবনের দুই নাতি: “কায়খসরু” এবং কায়কোবাদ অল্পবয়সী ও অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই পদমর্যাদা তাদের যোগ্যতার তুলনায় অনেক বড় ছিল।

পিতার আহ্বানে বুগরা খান বাংলা থেকে দিল্লিতে তো এলেন কিন্তু তার পিতার কড়া মেজাজের সাথে তার বনিবনা ছিল না এবং তার বিধিনিষেধও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি তার পিতার কাছে দুই বা তিন মাস অবস্থান করেন। যখন তিনি দেখলেন যে সুলতানের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তখন তিনি সুলতানের অনুমতি না নিয়েই লখনৌতির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

এটি দেখে বৃদ্ধ সুলতানের মন একেবারে ভেঙে গেল। যদিও তিনি যথারীতি সারাদিন সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাতে যখন নিজের কামরায় আসতেন তখন চিৎকার করে কাঁদতেন এবং নিজের মাথায় ধুলো ছিটিয়ে দিতেন। তিনি তার উত্তরাধিকারীর মৃত্যুকে বেশি দিন...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ১১০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৯৭

[২] ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৩

সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী।

অবশেষে তিনি বুগরা খানের পরিবর্তে উত্তরাধিকারের জন্য তাঁর তরুণ পৌত্রদের দিকে তাকালেন। মুহাম্মদ খান শহীদের পুত্র 'খসরু' সব দিক থেকেই যোগ্য ছিলেন এবং বুগরা খানের ছেলে কায়কোবাদ ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা ও উদাসীন। তাই সুলতান উজির খাজা হাসান বসরী, ফখরুদ্দিন কোতোয়াল এবং অন্যান্য আমিরদের ডাকলেন এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ওসিয়ত করে বললেন:

"আমি আমার বড় ছেলে খান শহীদের পুত্র 'খসরু'কে আমার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছি। তাকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে দাও, সে একজন প্রতিশ্রুতিশীল যুবক কিন্তু বয়সে ও অভিজ্ঞতায় নবীন এবং বাদশাহীর দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, কিন্তু এ ছাড়া আমি আর কী-ই বা করতে পারি? বুগরা খান যাকে মানুষ সম্মান করে এবং যার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করা যেতে পারে, সে লখনৌতিতে চলে গেছে এবং এখন তাকে ফিরিয়ে আনার সময় নেই। সুতরাং 'খসরু'কে উত্তরাধিকারী করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।"

এরপর তিনি সমস্ত আমিরদের বিদায় দিলেন। [১]

বুগরা খানের যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল ধারণা:

এখানে উল্লেখ্য যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাঁর পুত্র বুগরা খানকে সর্বদা অযোগ্য ও নির্বোধ মনে করতেন, অথচ বিষয়টি মোটেও তেমন ছিল না। বলবনের মৃত্যুর পর বুগরা খান বাংলার মতো বিশাল এক দেশ যেভাবে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করেছেন, তা তাঁর যোগ্যতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। শুধু তাই নয়, বরং দিল্লির সিংহাসনে তাঁর অযোগ্য পুত্র মুইজউদ্দিনের শাসন মেনে নেওয়া এবং বিদ্রোহ না করাও তাঁর নৈতিক উচ্চতা প্রমাণ করে। এমনকি এক পর্যায়ে যখন মুইজউদ্দিন বাদশাহ হওয়ার অহংকার দেখিয়ে পিতাকে রাজকীয় আদব পালনে বাধ্য করেন, তখন বুগরা খান দেশের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য আবেগ পরিহার করে তাঁর অহংকারী পুত্রের সেই জেদও পূরণ করে দেন। এতে বুগরা খানের দূরদর্শিতা ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

পরবর্তীতে তিনি রাজসিংহাসনে আসীন পুত্রকে যে নসিহত করেছিলেন, সেগুলোও স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো এবং বুগরা খানের যোগ্যতার পরিচায়ক। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, বলবন এমন যোগ্য পুত্রের ব্যাপারে কেন এত হতাশ ছিলেন?

লেখক আরজ করছেন যে, মূলত পিতা ও পুত্রের মেজাজ ও স্বভাবের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। পিতা ছিলেন উগ্র মেজাজী, গতিশীল, কর্মতৎপর, প্রশাসনে কঠোর ও চটপটে এবং সম্ভবত বড় শাহজাদাও এই গুণাবলির অধিকারী হওয়ার কারণে সুলতানের প্রিয় ছিলেন, যেখানে বুগরা খানের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি ছিলেন ধীরস্থির, নম্র স্বভাবের, অল্পে তুষ্ট এবং একমুখী স্বভাবের। বলবন সম্ভবত এই স্বভাবকে অলসতা, চারিত্রিক দুর্বলতা, ভীরুতা ও অযোগ্যতা বলে মনে করতেন এবং এটা অসম্ভব নয় যে তিনি পুত্রকে বারবার এই ত্রুটিগুলোর জন্য তিরস্কারও করতেন। আর এই কারণেই পিতা ও পুত্রের মধ্যে এমন এক দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল যে পুত্র বাংলায় নিজের আলাদা জগত গড়ে তোলাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এই কারণেই বলবন বুগরা খানকে উত্তরাধিকারী করার ব্যাপারে দ্বিধা ও সংশয়ে ভুগছিলেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ১২০, ১২১; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৯৮, ২৯৯; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃষ্ঠা ১৮৩, ১৮৪।

বুগরা খানের একটি ভুল এটাও ছিল যে, তিনি যদি বলবনের শেষ দিনগুলোতে দিল্লিতে থাকতেন, তবে হয়তো সুলতানের অসিয়ত তাঁর পক্ষেই হতো। কিন্তু তাঁর কাছে দিল্লির সিংহাসন কণ্টকশয্যা মনে হতো, তাই তিনি এত বড় সালতানাত ত্যাগ করে বাংলায় সন্তুষ্টি ও শান্তিতে থাকাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

সুলতানের ইন্তেকাল:

বুগরা খানের পরিবর্তে তাঁর ছেলের জন্য রাজকীয় অসিয়ত করার মাত্র তিন দিন পর ১লা জমাদিউল আউয়াল ৬৮৬ হিজরি (জুন ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) উপমহাদেশীয় ইতিহাসের এই অনন্য শাসকের ইন্তেকাল হয়, যাঁর শান-শওকত ও মহত্ত্বের কাহিনী শতাব্দী ধরে আলোচিত হয়ে আসছে [১]।

সুলতানের জানাজা ও দাফনের প্রস্তুতি নেওয়া হলো। শেষ রাতে সুলতানের খাটিয়া রাজপ্রাসাদ থেকে বের করা হলো, যাকে 'কুশকে লাল' (লাল মহল) বলা হতো। জানাজার পর তাঁকে দাফনের জন্য কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। এই সময় শাহজাদা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা নগ্নপদ ও বিমর্ষ অবস্থায় ছিলেন। কেউ নিজের মাথায় ধুলো ছিটাচ্ছিলেন আবার কেউ নিজের কাপড় ছিঁড়ছিলেন। যখন সুলতানের মরদেহ কবরে রাখা হলো, তখন মালিক ফখরুদ্দিন কোতোয়াল তাঁর প্রিয় মনিবকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সুলতানের ইন্তেকাল ও বিচ্ছেদ এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে, শোকে মানুষ ছয় মাস পর্যন্ত মাটিতেই ঘুমাত। অনেক নামী-দামী আমীরও তাই করেছিলেন। দিল্লির অনেক মানুষ মরহুম সুলতানের রূহের মাগফিরাতের জন্য সদকা করতেন এবং গরিবদের খাবার খাওয়াতেন [২]।

আনন্দের আসরের শোরগোল কী, আর ঊদ বাদ্যের সুরই বা কী
দুনিয়ার ব্যথিতদের রাতের আর্তনাদই বা কী
রণক্ষেত্রে তলোয়ারের ঝনঝনানিই বা কী
রক্তকে উত্তপ্তকারী তাকবীরের ধ্বনিই বা কী
এখন কোনো আওয়াজই ঘুমন্তদের জাগাতে পারবে না
উজাড় বক্ষে চলে যাওয়া প্রাণ আর ফিরে আসতে পারবে না
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি): খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৯। সুলতানের ইন্তেকালের সঠিক তারিখ কোনো প্রাচীন উৎসে পাওয়া যায় না। ফিরিশতা '৬৮৫ হিজরির শেষ দিকে' বলেছেন, যাতে দিন ও মাস অস্পষ্ট। মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাশমীর ঐতিহাসিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটি ১লা জমাদিউল আউয়াল ৬৮৬ হিজরি মোতাবেক জুন ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। আল্লাহই ভালো জানেন। 'কিরানুস সা'দাইন' (আমীর খসরু রচিত)-এর উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় সৈয়দ হাসান বারনী কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে বলেছেন যে, এটি মুইজুদ্দিন কায়কোবাদের শাসনামলে ৬৮৬ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে হয়েছিল। হাশমী সাহেবের বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারনী: পৃষ্ঠা ১২১, ১২২।

সুলতান বলবনের শাসন পদ্ধতির ওপর এক নজর

এই যুগের বিশ্বের অধিকাংশ সরকারের মতো বলবনের সরকারও ছিল আধা-রাজনৈতিক, আধা-দেওয়ানি এবং আধা-সামরিক। এই যুগে উচ্চ পদে কেবল তারাই অধিষ্ঠিত হতে পারতেন যাদের মধ্যে একই সাথে চারটি গুণ বিদ্যমান ছিল:

- রাজনীতি জ্ঞান
- সাহসিকতা ও সামরিক অভিজ্ঞতা
- শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা
- জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ

এই চতুর্থ বিষয়টি অপরিহার্য না হলেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বলবনের মধ্যে এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই কম ছিল, তবে প্রথম তিনটি বিষয়ে তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের দক্ষ। তিনি তার লৌহ হস্ত দিয়ে সেই বিশৃঙ্খলা ও প্রবণতাগুলোকে দমন করেছিলেন যা সালতানাতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। অধিকাংশ সরকারি নিয়োগ তিনি নিজে করতেন অথবা তার অনুমতি নিয়ে করা হতো। পুরো সরকারি যন্ত্রের ওপর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো যেমন মুলতান এবং লখনৌতি সাধারণত বিদ্রোহের আখড়া ছিল, তাই বলবন এগুলোর দায়িত্ব নিজের ছেলেদের দিয়েছিলেন। তিনি কোনো নায়েবকে এই সুযোগ দিতেন না যে সে ওই এলাকায় স্বায়ত্তশাসন লাভের চেষ্টা করতে পারে। নিচে আমরা বলবনের সামরিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি:

ফৌজ পুনর্গঠন ও প্রশিক্ষণ

বলবন জানতেন যে ফৌজ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাই এর সুশৃঙ্খল গঠন ও উত্তম প্রশিক্ষণ ছিল অপরিহার্য। কুতুবুদ্দিনের সময় থেকেই সামরিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং বিভিন্ন বর্ণ ও বংশের লোক ফৌজে নিয়োগ পেত। তবে পদোন্নতির সুযোগ সাধারণত তুর্কি আমিরদেরই দেওয়া হতো এবং শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের কাজে তাদের ওপরই বেশি আস্থা রাখা হতো। বলবন ফৌজে জাতিগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য বজায় রেখেছিলেন, তবে অনেক পুরনো বিষয় পরিবর্তন করে নতুন নিয়ম ও কানুন নির্ধারণ করেছিলেন যা নিচে দেওয়া হলো:

সৈন্য সংখ্যা ও বেতনে বৃদ্ধি:

বলবন সৈন্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হাজার হাজার অভিজ্ঞ অফিসারকে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সৈন্য ও অফিসারদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কাউকে বেতনের পরিবর্তে জায়গির প্রদান করা হয়েছিল। সৈন্যদের বেতনে সময় সময় বৃদ্ধি করা এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখাকে তিনি তার রণকৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বানিয়েছিলেন।[১]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৪৯।

তিনি তাঁর পুত্র বুগরা খানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সেনাবাহিনীর পেছনে হওয়া ব্যয়কে কখনো বেশি মনে করো না। [১]

অধীনস্থদের সাথে যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা:

অধীনস্থ কর্মকর্তা ও সৈন্যদের কর্মতৎপরতা প্রতিদিন তদারকি করা এবং তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা তিনি বাধ্যতামূলক করেছিলেন এবং নিজের সন্তানদেরও এর অসিয়ত করেছিলেন। [২]

শিকারের বেশে সামরিক মহড়া:

সেনাবাহিনীকে চটপটে ও কর্মক্ষম রাখার জন্য তিনি সেনাবাহিনীর জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তিনি সৈন্যদের সাথে নিজেও শিকারে বের হতেন এবং তাদের প্রচুর পরিশ্রম করাতেন। এটি তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখার সর্বোত্তম মহড়া ছিল। [৩]

গোপনীয়তা:

গোপনীয়তা ছিল তাঁর সামরিক রণকৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। বলবন তাঁর সমস্ত অভিযান গোপন রাখতেন। একদম শেষ মুহূর্তের আগে কেউ তাঁর গতিবিধির প্রকৃত দিক এবং গন্তব্যস্থল সম্পর্কে জানতে পারত না। কেবল যাত্রার রাতে তিনি কর্মকর্তাদের গন্তব্যস্থল এবং সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করতেন। [৪]

সেনাবাহিনীর যাত্রা ও অবস্থানের সময় দুর্বলদের প্রতি খেয়াল রাখা:

সেনাবাহিনীর যাত্রা ও অবস্থানের সময় তিনি এই বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতেন যেন দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের কোনো কষ্ট না হয়। তিনি নদী, সেতু এবং জলাভূমি পার হওয়ার ক্ষেত্রে বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতেন। সৈন্যরা লাঠি হাতে সেতুর কিনারে দাঁড়িয়ে যেত যাতে ভিড় না জমে এবং এই ধরনের মানুষরা অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে। যদি কোথাও সেতু না থাকত, তবে তিনি কাফেলার দুর্বল লোকদের খেয়াল রাখতেন এবং হুড়োহুড়ির মধ্যে লোকদের নদী পার করানোর চেষ্টা করতেন না, বরং কখনো কখনো দশ থেকে বারো দিন পর্যন্ত নৌকার অপেক্ষা করতেন, এরপর সহজভাবে সবাইকে পার করে নিয়ে যেতেন।

যদি হাতির মাধ্যমে নদী পার হওয়া সম্ভব হতো, তবে রাজকীয় হাতিসহ সমস্ত পিলখানা এই কাজের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন এবং নারী, শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের আগে পার করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং নিজে সেনাবাহিনীর সাথে বসে অপেক্ষা করতেন।

মোদ্দাকথা, যেখানে তাঁর সেনাবাহিনী যুদ্ধে সফল হয়েছিল, সেখানে তিনি জনগণের সমর্থন ও দোয়াও লাভ করেছিলেন। [৫]

সৈন্যদের মূল্যায়ন:

তা সত্ত্বেও বলবন সাধারণ সৈন্যকে অনেক গুরুত্ব দিতেন এবং তাদের কদর ও মূল্য বুঝতেন। ঐতিহাসিকরা লেখেন যে, যখন বলবন সেনাপতি ছিলেন, তখনই তাঁর কাছে এক হাজার অভিজ্ঞ সৈন্যের একটি বিশেষ বাহিনী ছিল। বাদশাহ হওয়ার পরও তিনি একে সর্বদা

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি প্রণীত: পৃ. ১০১

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি প্রণীত: পৃ. ১০১

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৭৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি প্রণীত: পৃ. ৫৪, ৫৫

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি প্রণীত: পৃ. ৬০

[৫] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি প্রণীত: পৃ. ৪৫

...নিজের সাথে রাখতেন। যদি তিনি শিকারেও বের হতেন, তবুও এই সৈন্যরা তাঁর সাথে থাকত। বলবন এই বাহিনীর সকল সৈন্যকে চিনতেন। তারা সবাই সর্বদা সুলতানের দস্তরখানে খাবার খেত। [১]

রাজনৈতিক সংস্কার

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন হিন্দুস্তানকে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেন যা আগের তুলনায় অনেক ভিন্ন এবং উন্নত ছিল। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশকে ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত এবং জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও এই ব্যবস্থা কঠোরতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শান-শওকতের আবরণে ঢাকা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর পেছনে জনগণের কল্যাণই উদ্দেশ্য ছিল। বলবনের রাজনৈতিক সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ:

পদের জন্য শরীফ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্বাচন:
তিনি পদাধিকারীদের পারিবারিক আভিজাত্য এবং উচ্চ বংশীয় মর্যাদার প্রতিও খেয়াল রাখতেন। সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যোগ্য এবং সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সন্ধান করতেন এবং তাদের ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করতেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সর্বদা সম্মানিত ব্যক্তি এবং বুদ্ধিমান লোকদের হাতে অর্পণ করতেন এবং কখনও নিচ ও হীনমনা লোকদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। [২]

পদাধিকারীদের তদারকি:
কাউকে কোনো পদ বা দায়িত্ব অর্পণ করার পর তিনি তার ওপর কড়া নজর রাখতেন এবং যদি তার চরিত্র, গুণাবলী বা কর্মদক্ষতায় কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করতেন, তবে তাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করে দিতেন। [৩]

অমুসলিমদের উচ্চ পদে নিয়োগে সতর্কতা:
তিনি অমুসলিমদের উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, এর ফলে অমুসলিমরা মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং বিজয়ী হয়ে যাবে, যার ফলে মুসলিম প্রজাদের অধিকার বিপন্ন হতে পারে। [৪]

মন্দ চরিত্র এবং হীন মানসিকতার লোকদের থেকে পরিহার:
বলবনের কাছে সংকীর্ণমনা এবং হীন চিন্তার লোকদের কোনো স্থান ছিল না। তিনি তাঁর বাইশ বছরের শাসনামলে কখনও ভাঁড়, কৌতুক অভিনেতা এবং চাটুকার কবিদের প্রশ্রয় দেননি। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৫৫

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ২৯, ৩০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৬৭

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৬৭

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৬৭

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৬৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৩

ধর্মনিরপেক্ষ এবং উদারপন্থী ঐতিহাসিকরা একে সুলতান বলবনের অহংকার ও দম্ভ হিসেবে গণ্য করেছেন যে, তিনি নিম্নবর্ণের লোকদের সাথে সেই আচরণ করতেন যা ব্রাহ্মণরা করত। অথচ এখানে বর্ণপ্রথার পার্থক্য উদ্দেশ্য নয়, বরং এমন লোকদের থেকে সতর্কতা উদ্দেশ্য যারা হীন মেজাজ, অসভ্য, অমার্জিত বা অশালীন পেশার সাথে জড়িত। ফেরেশতা লিখেছেন: “তিনি তাঁর মজলিসে ভাঁড় ও ঠাট্টাকারীদের প্রবেশ করতে দিতেন না” (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৬৭) কারণ এমন লোকদের সঙ্গ গাম্ভীর্য ও সভ্যতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ফখর-ই-মাদী নামক এক আমীর, যিনি পূর্ববর্তী রাজাদেরও সেবা করেছিলেন, বহু বছর ধরে চেষ্টা করছিলেন যেন কোনোভাবে বলবনের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দরবারীদের বড় অংকের ঘুষও দিয়েছিলেন। বলবনের এই বিষয়টি পছন্দ ছিল না (যে এভাবে ঘুষ দিয়ে নিজের মর্যাদা বাড়িয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করা হোক)। ফলে যখন দরবারীরা তার সুপারিশ করল, তখন বলবন বললেন: "ফখর যদি সম্পদশালী এবং বাজারী লোক হয় তবে বাদশাহর সাথে এভাবে কথা বললে প্রজাদের মনে বাদশাহর প্রতি আর সম্মান অবশিষ্ট থাকবে না এবং সালতানাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।" [১]

বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্রতি কঠোরতা:

বলবন বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন। তিনি এ ব্যাপারে কোনো প্রকার নমনীয়তা দেখাতেন না এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। তিনি মনে করতেন যে, এ ধরনের বিশৃঙ্খলাকারীদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেই সালতানাতের কল্যাণ নিহিত। এ ব্যাপারে তিনি শরয়ী বিধানেরও তোয়াক্কা করতেন না বরং নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কঠোরতম শাস্তি প্রদান করতেন। এছাড়া তিনি নিজের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদেরও কোনো ছাড় দিতেন না, ফলে ইলতুতমিশের অনেক আমীর এবং তাদের সন্তানদের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে রাজনৈতিক স্বার্থে হত্যা করা হয়েছিল। কখনো কখনো তিনি একজন বিদ্রোহী ব্যক্তিকে দমনের জন্য পুরো সেনাবাহিনী পাঠাতেও দ্বিধা করতেন না। এভাবে তিনি সমস্ত বিশৃঙ্খলা নির্মূল করেন এবং ইলতুতমিশের পর সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটান। [২]

বলবনের রাজনীতির কিছু অনন্য দিক:

- বলবন এই খেয়াল রাখতেন যেন কোনো একজন অফিসারের কাছে খুব বেশি ক্ষমতা পুঞ্জীভূত না হয়। এর আগে উজির-এ-সালতানাতের কাছে সামরিক ও আর্থিক বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা থাকত এবং উজিররা কেবল ক্ষমতার হস্তান্তরের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত না বরং কখনো কখনো প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের কারণও হয়ে দাঁড়াত। বলবন উজিরের কাছ থেকে আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ে একটি আলাদা দপ্তরে ন্যস্ত করেন। একইভাবে সামরিক বিষয়েও তার অংশীদারিত্ব শেষ করে দেন। আর্থিক ও সামরিক ক্ষমতা আলাদা হয়ে যাওয়ায় উজির এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ষড়যন্ত্র করার সুযোগ কমে যায়।

- বলবন উদ্দেশ্যহীন অভিযানের বিরোধী ছিলেন। কোনো যুদ্ধ বা অভিযানের আগে তিনি সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করতেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে সমস্ত প্রস্তুতি সময়ের অনেক আগেই সম্পন্ন করে ফেলতেন। কোনো অভিযানে বের হওয়ার এক বছর আগেই তিনি সৈন্যদের প্রস্তুত থাকার এবং কারখানায় যুদ্ধাস্ত্র তৈরির নির্দেশ জারি করে দিতেন।

- বলবন সরকারকে আরও ভালোভাবে পরিচালনার জন্য গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তার সালতানাতের প্রতিটি অংশে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত থাকতেন। তার শাহজাদা, আত্মীয়-স্বজন, সুবাদার...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৭; তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, আজ বারনী: পৃষ্ঠা ৩৩, ৪৪

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭২

সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণের কর্মকাণ্ডও নথিবদ্ধ করা হতো এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হতো।

বলবন ডাক ব্যবস্থাকে উন্নত করেন; সংবাদাতা, গোয়েন্দা এবং ইতিহাস লেখকদের নিয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কোনো সংবাদদাতার নিয়োগ তার চরিত্র, সততা এবং বংশপরিচয় যাচাই করার পর করা হতো। সংবাদাতা ও গোয়েন্দাদের জন্য রাজপ্রাসাদের কাছে ঘেঁষা নিষিদ্ধ ছিল, যাতে শাসকের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা অন্যদের মধ্যে অবিশ্বাস ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি না করে। গোয়েন্দা বিভাগের কার্যক্রমে এই সতর্কতা অবলম্বন করা হতো যাতে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি না হয়।

বলবন তার পুত্রদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সংবাদাতা ও গোয়েন্দাদের যেন কখনোই দরবারের কাছে আসার অনুমতি না দেওয়া হয়, কারণ বাদশাহর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা অনুগত বন্ধুদের ভীত করে তোলে এবং তারা বাদশাহর প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে, অথচ সুশাসনের ভিত্তি হলো বাদশাহ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা।

বলবন যেখানে আমির ও কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন, সেখানে তিনি জনগণের প্রতি ছিলেন কোমল স্বভাবের, দয়ালু ও সতর্ক। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে দেশকে নিরাপদ করে জনগণকে সেই শান্তি ও ন্যায়বিচার দিয়েছিলেন যার জন্য মানুষ বছরের পর বছর ধরে আকাঙ্ক্ষা করে আসছিল। [১]

ইসলামী খিলাফতের প্রতি সম্মান:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ইসলামী খিলাফতের গুরুত্ব বুঝতেন এবং এর প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। যদিও তার সিংহাসন আরোহণের কয়েক বছর আগে ৬৫৬ হিজরিতে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত মঙ্গোলদের হাতে শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে মিশরে আব্বাসীয় খিলাফত পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এই কারণে বলবনের শাসনামলে প্রচলিত মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফার নাম খোদাই করা থাকতো। জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবায় সুলতানের সাথে খলিফার জন্যও দোয়া করা হতো। [২]

এভাবে সুলতান বলবন তার দেশকে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত রেখেছিলেন। এই সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক হলেও এর ইতিবাচক প্রভাব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এটি ছিল মঙ্গোলদের বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ যে, তোমরা যতই শক্তিশালী হও না কেন এবং তোমরা বাগদাদ খিলাফত ধ্বংস করলেও খিলাফত এখনো টিকে আছে এবং আমরা এর অনুসারী।

عدل ও انصاف (আদল ও ইনসাফ):

সুলতান বলবন ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আপসহীন ছিলেন। কোনো অপরাধীর প্রতি তিনি অনুকম্পা দেখাতেন না, সে যত বড় পদমর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন। বদায়ূনের সুবাদার মালিক আতিক এক খাদেমকে এত বেশি বেত্রাঘাত করেছিলেন যে সে মারা যায়। খাদেমের বিধবা স্ত্রী সুলতান বলবনের কাছে ফরিয়াদ করেন। বলবন সুবাদারকে গ্রেপ্তার করে তাকেও সমপরিমাণ বেত্রাঘাত করান যার ফলে তার মৃত্যু হয়। এরপর শিক্ষা হিসেবে লাশটি বদায়ূনের ফটকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। [৩]

---

[২] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৪০১

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৫৫ থেকে ৯৮

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা কাদরী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৯

সুলতান বলবনের একজন গোলাম হাইবাত খান অযোধ্যার শাসক ছিলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। তার বিধবা স্ত্রী বলবনের দরবারে বিচার চাইলেন। বলবন হাইবাত খানকে পাঁচশ দোররা মারার নির্দেশ দিলেন। তারপর তাকে ফরিয়াদি মহিলার হাতে সোপর্দ করে বললেন:

“এখন সে তোমার গোলাম। যা খুশি আচরণ করো। চাইলে হত্যা করো, চাইলে মাফ করে দাও।”

হাইবাত খান অনেক বড় বড় আমীরদের মধ্যস্থতায় প্রাণভিক্ষার সুপারিশ করালেন এবং শেষ পর্যন্ত বিশ হাজার তঙ্কা (আজকের দিনে কয়েক কোটি টাকা) দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। এই অপমানের পর তিনি আর ঘর থেকে বের হননি। [১]

ইনসাফের মূর্ত প্রতীক, কাজী ইমাদুল মুলক:

সুলতান বলবনের সেনাবাহিনীর বিচারক ছিলেন কাজী ইমাদুল মুলক, যিনি ছিলেন একজন বড় আলেম, ফাজিল এবং অত্যন্ত পরহেজগার বুজুর্গ। তিনি বিখ্যাত কবি আমির খসরুর নানা ছিলেন। সুলতান এবং সাধারণ মানুষ তাকে সমানভাবে সম্মান করতেন।

কাজী সাহেব সেনাবাহিনীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। সুলতান তার জন্য একটি বিশাল বেতন নির্ধারণ করেছিলেন, যার ফলে তিনি সচ্ছল ছিলেন। তিনি নিজের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করার জন্য নিজের পকেট থেকে পুরস্কার দিতেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে গভীর আগ্রহ দেখাতেন। তিনি তার দাপ্তরিক কর্মীদের সবসময় বোঝাতেন যেন তারা কখনো ঘুষ না নেয় এবং সৈন্যদের বেতনের কোনো অংশ আত্মসাৎ না করে। [২]

আদাবে শাহী এবং শান-শওকত

সুলতান বলবনের মতে, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বাহ্যিক বিপদ দূর করার জন্য প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র, অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখা জরুরি ছিল। তাই সুলতান বলবন তার দরবেশ-সুলভ মনিব আলতামাশ এবং তার পরহেজগার পূর্বসূরি নাসিরুদ্দিন মাহমুদের বিপরীতে দাপট ও শান-শওকতের মাধ্যমে অধীনস্থ ও জনগণকে অনুগত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি সাদাসিধে জীবন ত্যাগ করে অসাধারণ শান-শওকত গ্রহণ করেন এবং রাজকীয় আদব-কায়দা নির্ধারণ করে তা কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দেন। তার মতে, বাদশাহি হলো আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ও সংশোধনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম, তাই এর বাহ্যিক গাম্ভীর্য ও সম্মানও এমন হওয়া উচিত যাতে ছোট-বড় সবাই সরকারি নির্দেশের সামনে মাথা নত করে। তিনি বলতেন:

“বাদশাহর নির্দেশ কার্যকর হওয়া তার প্রভাব ও সম্মানের ওপর নির্ভরশীল। জনগণের চোখে নিজেকে হালকা করার পর বাদশাহি আর টিকে থাকতে পারে না। বাদশাহি হলো আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও খিলাফতের নাম। এটি লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে চালানো যায় না। অন্তরে সম্মান, প্রভাব ও মর্যাদা ছাড়া বাদশাহি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কেউ বংশগত রাজপরিবারের হয় এবং সেই পরিবারের প্রতি সম্মান মানুষের অন্তরে আগে থেকেই থাকে, তবে সেই ভিত্তিতে বাদশাহর সম্মান বজায় থাকে।”

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৯

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ১১৪, ১১৫

তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন বা না করুন, কিন্তু যে ব্যক্তি বংশগতভাবে বাদশাহ নন এবং যার মধ্যে নেতৃত্বসুলভ ও রাজকীয় গুণাবলি নেই, সাধারণ ও বিশিষ্টজন এবং কাছের ও দূরের মানুষের কাছে প্রকাশ্য ও গোপনে রাজকীয় শিষ্টাচার ও আদব রক্ষা না করলে তার সম্মান ও মর্যাদা কারো হৃদয়ে স্থান পায় না। [১]

যেহেতু সুলতান বলবন নিজে বংশগত বাদশাহ ছিলেন না, তাই তিনি এসব বিষয়ে অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন: "প্রজাদের হৃদয়ে বাদশাহর গাম্ভীর্য ও মর্যাদা যে পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কিছু তা করে না। বাদশাহর প্রভাব না থাকলে প্রজারা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। যে বাদশাহ নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও গরিমা রক্ষা করেন, তিনি দীর্ঘকাল শাসন করতে পারেন, অন্যথায় তার শাসন বিশৃঙ্খলার আখড়ায় পরিণত হয়।" [২]

এই কারণেই সুলতান বলবন সুলতান হিসেবে নিজের জন্য ব্যাপক শান-শওকত ও জাঁকজমক আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। একইভাবে দরবারীদের ওপরও রাজকীয় আদব-কায়দা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তিনি পূর্ণ সাজসজ্জা ছাড়া কখনো দৃষ্টিগোচর হতেন না। এমনকি তার ঘনিষ্ঠ খাদেমরাও তাকে কখনো রাজকীয় পোশাক, মোজা এবং রাজমুকুট ছাড়া খালি মাথায় বা খালি পায়ে দেখেনি। তিনি কখনো মজলিসে অট্টহাসি দিতেন না এবং অন্য কারো তার উপস্থিতিতে এমন করার সাহস ছিল না। [৩]

দরবারের দৃশ্য:

সুলতানের শাসনামলে তুর্কিস্তান, ইরান, ইরাক, খোরাসান, আজারবাইজান, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর থেকে অন্তত পনেরোজন শাহজাদা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি মঙ্গোলদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে দিল্লিতে এসেছিলেন। সুলতান বলবন তাদের সবাইকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন এবং নিজের দরবারে স্থান দেন। তাদের উপস্থিতিতে সুলতানের শান-শওকত বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বাদশাহও নিজের দরবারের সাথে তাদের সম্পৃক্ততায় গর্ববোধ করতেন। দরবারের সময় এই শাহজাদারা সুলতানের সামনে বুকে হাত রেখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তবে আব্বাসীয় বংশের দুইজন শাহজাদাকে সুলতানের সিংহাসনের ডানে ও বামে আসনে বসানো হতো। [৪]

শান ও শওকতের দৃশ্য:

ঐতিহাসিকদের মতে, যখন সুলতান বলবনের সওয়ারি বের হতো, তখন তার জাঁকজমক ও গাম্ভীর্যের দৃশ্য এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করত। সুলতানের সাথে সিস্তান, ঘোর, সমরকন্দ, কুর্দিস্তান এবং আরবের পাঁচশ সেরা তলোয়ারধারীর একটি দল থাকত। তাদের চকচকে তলোয়ার দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যেত এবং মিছিলের প্রভাবে মানুষের অন্তর কেঁপে উঠত। নিজের এই আচরণের যৌক্তিকতা হিসেবে বলবন বলতেন: "আমি আমার মনিব সুলতান ইলতুতমিশের কাছে শুনেছি যে, বাদশাহীর জন্য দরবারে সুশৃঙ্খল..."

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৩, ৩৫।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭২।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৩।

[৪] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৬, ২৭৮।

...সওয়ারি এবং ব্যবস্থাপনায় রাজকীয় আদব রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। যে তা করবে না, তার রাজত্ব খুব শীঘ্রই পতনের সম্মুখীন হবে। [১]

উৎসব ও মজলিসের দৃশ্য:

সুলতান বলবন উৎসবের দিনগুলোতে অত্যন্ত জাঁকজমক ও আয়োজন করতেন। একইভাবে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, নওরোজ এবং অন্যান্য উৎসবগুলো অনারব সুলতানদের মতো পালন করতেন এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের ক্ষেত্রে তাদেরই অনুকরণ করতেন। তাঁর দরবারে রঙিন ও কারুকার্যখচিত গালিচা বিছানো হতো। কিংখাবের পর্দা ঝোলানো হতো। দস্তরখানে সোনা ও রূপার পাত্র রাখা হতো। বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল, হরেক রকমের পানীয় ও খাবার দিয়ে উপস্থিতদের আপ্যায়ন করা হতো। পান তার আনুষঙ্গিক সরঞ্জামসহ পরিবেশন করা হতো।

প্রতিটি উৎসবের মজলিসে সুলতান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকতেন। এই সময়ে আমীর ও সর্দারগণ তাদের আবেদন পেশ করতেন, যার ওপর সুলতান কোমলতা ও দয়ার সাথে বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিতেন। উৎসবের দিনগুলোতে মাঝে মাঝে কবিদের কাব্য আসরও বসত। সুমধুর কণ্ঠ ও সুরের সাথে কবিতা শোনানো হতো এবং গান গাওয়া হতো। [২]

যখন বাদশাহ কোনো সফর বা অভিযান থেকে ফিরে আসতেন, তখন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ দুই-তিন মঞ্জিল এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাতেন। শহরকে কনের মতো সাজিয়ে উৎসব পালন করা হতো। বাদশাহর সহি-সালামতে ফিরে আসার খুশিতে এবং শুকরিয়া আদায়ের জন্য মাহফিল ও মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। বাদশাহর ওপর সোনা ও জহরত সদকা করে সেগুলো জমা করা হতো এবং পরে তা সারা দেশের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হতো। [৩]

শিকারের শখ:

এত ব্যস্ততা এবং গম্ভীর জীবন সত্ত্বেও বলবন শীতকালে শিকারের জন্য অবশ্যই সময় বের করতেন। দিল্লির আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল এলাকা পর্যন্ত শিকারের জন্য চলে যেতেন। তিনি রাতের শেষ প্রহরে নিজের প্রাসাদ “কুশকে লাল” থেকে বের হতেন। এক হাজার দেহরক্ষী সৈন্য, এক হাজার পদাতিক ধনুর্বিদ এবং বাবুর্চিসহ সেবক ও ভৃত্যরা সাথে থাকত। সারাদিন দৌড়ঝাঁপের মধ্যে কাটিয়ে মধ্যরাত বা শেষ প্রহরে ফিরে আসতেন। মোটকথা, শিকারের ব্যস্ততার মাধ্যমে তিনি নিজেকে চটপটে ও শক্তিশালী রাখতেন। [৪]

সেই সময়ের একজন মঙ্গোল বাদশাহ যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন: “বোঝা যাচ্ছে বলবন অত্যন্ত চতুর ও অভিজ্ঞ বাদশাহ। তিনি বাহ্যিকভাবে শিকারে যান, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হলো তাঁর সৈন্য ও ঘোড়াগুলো যেন ক্রমাগত চলাফেরার মধ্যে থেকে কঠোর পরিশ্রমের...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৬৮, ২৬৯

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারনি: পৃ. ৩২

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৭৫

[৪] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৭২, ২৭৩

...অভ্যস্ত হয় এবং হঠাৎ কোনো বড় যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলে অলস ও অকর্মণ্য প্রমাণিত না হয়।“ [১]

প্রাচীন পারস্য সম্রাটদের দ্বারা প্রভাবিত:

সুলতান বলবন প্রাচীন পারস্য সম্রাটদের ইতিহাসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত বলে মনে হয়। অনেক রীতিনীতি ও অভ্যাস, বিশেষ করে রাজকীয় আদব-কায়দায় তিনি প্রাচীন ইরানি বাদশাহদের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বলবনের মধ্যে এই পরিবর্তন সিংহাসনে আরোহণের পরেই প্রকাশ পেয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল যাদের নাম তিনি মুহাম্মদ খান এবং মাহমুদ (বুগরা খান) রেখেছিলেন।

কিন্তু বাদশাহ হওয়ার পর যখন তাঁর নাতিদের জন্মের সিলসিলা শুরু হলো, তখন তিনি তাদের নাম প্রাচীন সাসানি সম্রাটদের নামে রাখা শুরু করলেন। چنانچہ এক নাতির নাম ‘কায়কোবাদ’, দ্বিতীয়জনের ‘খসরু’, তৃতীয়জনের ‘কায়কাউস’ এবং চতুর্থজনের ‘কায়ুমার্স’ রাখলেন। সম্ভবত বলবন এই আশা করতেন যে তাঁর বংশধরদের মধ্যেও এমন শান-শওকত সম্পন্ন বাদশাহ আসবে। যদিও বলবনের এই ইচ্ছা পূরণ হয়নি বরং এর বিপরীত হয়েছে। [২]

আত্মপ্রদর্শন ও শান-শওকতের কাফফারা:

বলবনের এই উপলব্ধি ছিল যে মহিমা ও আত্মপ্রদর্শনের এই দৃশ্যগুলো আল্লাহর অনেক বিধান এবং সুন্নতে নববীর পরিপন্থী। কিন্তু এই উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি এই দৃশ্যগুলোকে বজায় রেখেছিলেন কারণ তিনি কোনো রাজকীয় বংশের ছিলেন না এবং সেই সাথে হিন্দুস্তানের বিশেষ পরিবেশের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে করতেন যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এই প্রভাব ও দাপট বজায় রাখার মধ্যেই নিহিত। যাই হোক, সেই জাঁকজমক, আত্মপূজা এবং শান-শওকত ও প্রতাপ প্রদর্শন ছিল স্বৈরাচারী শাসকদের রীতিনীতি, যা তিনি শিরকের নিকটবর্তী, সুন্নাহ বিরোধী এবং আযাবের কারণ হিসেবেও গণ্য করতেন। কিন্তু তাঁর মতে যারা রাজনৈতিক কৌশলের অধীনে এই বিষয়গুলোতে লিপ্ত ছিল, তাদের জন্য নাজাতের পথ ছিল এই যে, সে যেন সেই প্রভাব ও ক্ষমতা সৃষ্টির সেবায় ব্যবহার করে এবং ফিতনা-ফাসাদ ও জুলুম-অত্যাচার নির্মূল করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। পদ ও দায়িত্বগুলো যেন সৎ লোকদের হাতে অর্পণ করে এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম রাখে। তিনি তাঁর পুত্র ও আমিরদের শেখ মুবারক গজনভীর এই উক্তি শোনাতেন:

“বাদশাহদের কার্যাবলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরকের সীমানা স্পর্শ করে। এমন অনেক কাজ তারা করে যা আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর পরিপন্থী। এরপর তারা তখন আরও বেশি গুনাহগার হয়ে যায় যখন তারা এই চারটি বিষয়ের ওপর আমল করে না:

১. বাদশাহর জন্য জরুরি হলো সে যেন তার শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যথাযথ পদ্ধতিতে ব্যবহার করে। খোদাভীতি এবং সৃষ্টির কল্যাণ যেন সর্বদা তার সামনে থাকে।

২. বাদশাহর উচিত তার দেশ থেকে পাপাচার নির্মূল করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। ফাসেক ও নির্লজ্জ লোকদের সর্বদা...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৫৪, ৫৫... দ্রষ্টব্য: বর্ণনাকারীরা এই মঙ্গোল বাদশাহর নাম হালাকু খান বলেছেন, কিন্তু হালাকু খান সুলতান বলবনের সিংহাসনে আরোহণের এক বছর পূর্বে ৬৬৩ হিজরি (১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাই নিশ্চিতভাবেই তিনি অন্য কোনো মঙ্গোল বাদশাহ ছিলেন।

[২] জামেউত তাওয়ারিখ হিন্দ: পৃষ্ঠা ৪০১, ৪০২।

...অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা উচিত।

৩. বাদশাহর উচিত সালতানাতের বিষয়াবলি সর্বদা বুদ্ধিমান ও মার্জিত ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত করা। প্রজাদের ওপর এমন লোকদের শাসক নিযুক্ত করা উচিত যারা আমানতদার এবং আল্লাহকে ভয় করে। (এজন্যই) ভ্রান্ত আকিদার লোকদের (পদমর্যাদা দিয়ে) দেশে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তারা প্রজাদের ভুল পথে পরিচালিত করে।

৪. বাদশাহর উচিত পূর্ণ ইনসাফের সাথে কাজ করা, অধস্তনদের কর্মকাণ্ডের তদারকি করা যাতে দেশ থেকে জুলুম ও অত্যাচারের নাম-নিশান পর্যন্ত মুছে যায়। [১]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বলবন কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বড় পরিসরে নিজের মধ্যে এই গুণাবলি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। সেই যুগে এবং সেই পরিস্থিতিতে এটি কোনো ছোট বিষয় ছিল না। এই কারণেই কেবল সেই সময়ের ঐতিহাসিকগণই নন, বরং দ্বীনের বুজুর্গগণও সুলতান বলবনের নাম অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের সাথে নিতেন। সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নাম নেওয়ার সময় 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলতেন এবং তাঁর সুদৃঢ় আকিদা বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতেন। [২]

রাজনীতির শিক্ষা

দিল্লির সুলতানদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন বলবনের এই অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তিনি বাদশাহীর মূলনীতি এবং নিয়ম-কানুন সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর সন্তান ও সঙ্গীদের রাজনীতির মূলনীতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন। অন্য কোনো শাসকের কাছ থেকে রাজনীতির বিষয়ে এত বেশি উক্তি বর্ণিত হয়নি যতটা বলবনের কাছ থেকে হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও কিছু নমুনা লক্ষ্য করুন:

শাহজাদা বুঘরা খানকে নসিহতসমূহ:

বাংলা অভিযান থেকে ফেরার পথে তিনি তাঁর পুত্র বুঘরা খানকে সেখানকার নায়েব নিযুক্ত করে নিম্নোক্ত নসিহতগুলো করেছিলেন:

- 'প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। খাজনা যেন এত কম না হয় যে বিদ্রোহীরা সুযোগ পেয়ে যায়, আবার এত বেশিও না হয় যে প্রজারা ধ্বংস হয়ে যায়।'
- 'কর্মচারীদের বেতন এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যা সারা বছরের জন্য যথেষ্ট হয়, প্রয়োজনের চেয়ে কম বেতন দেওয়া উচিত নয় যাতে তারা...'

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৭০; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ৪৪ থেকে ৪৭। মজার ব্যাপার হলো, সুলতান বলবন এই মালফুজ পূর্ণ সনদসহ শোনাতেন যে, আমি এটি আমার মনিব শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ থেকে শুনেছি, তিনি সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর মজলিসে সৈয়দ নূরুদ্দিন মুবারক গজনভী থেকে এই কথা শুনেছেন। এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, বলবন যদিও আলেম-ফাযেল ছিলেন না, কিন্তু সেই যুগে হিন্দুস্তানের ইলমি ঐতিহ্য এতটাই মজবুত ছিল যে, কোনো বুজুর্গের বাণীও সনদসহ শোনানোর রেওয়াজ ছিল এবং তা ছাড়া এর মর্যাদা সুদৃঢ় হতো না।

[২] ফাওয়াইদুল ফুয়াদ ফারসি: পৃষ্ঠা ২৩১, ২৩২।

...অভাবগ্রস্ত না হয়।

- রাষ্ট্রীয় অভিযানসমূহ নিজের শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া সম্পন্ন করা উচিত নয়।
- নির্দেশ জারি করার সময় নিজের খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়।
- নিজের সেবকদের অবহেলার শিকার বানানো উচিত নয়। তাদের প্রয়োজনের পূর্ণ খেয়াল রাখা উচিত। যে এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয় তাকে শত্রু মনে করে তার কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়।
- যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর সত্তার ওপর ভরসা করেছে, তাকে সর্বদা সমর্থন করা উচিত। [১]

উপদেশের সারসংক্ষেপ:

নিজের পুত্রদের তিনি বিভিন্ন সময়ে যে উপদেশগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- সরকারের উচিত সুরক্ষামূলক আইন কার্যকর করা যাতে শক্তিমানদের জুলুম ও অত্যাচার থেকে দুর্বলদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়।
- মধ্যপন্থা অবলম্বন করা সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জনগণের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কঠোরতা বা শিথিলতা কোনোটিই কাম্য নয়। কর এত বেশি হওয়া উচিত নয় যা জনগণকে নিঃস্ব ও অসহায় করে দেয়। আবার এত কমও হওয়া উচিত নয় যে মানুষ উদাসীন ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
- জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেবে।
- সরকারের নির্দেশসমূহ কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বারবার পরিবর্তন করা যাবে না।
- আর্থিক ব্যবস্থার সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- বার্ষিক আয়ের অর্ধেক ব্যয় করতে হবে এবং বাকি অর্ধেক জরুরি অবস্থার জন্য জমা রাখতে হবে।
- বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে।
- সৈন্যদের বেতন নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। [২]

দীনদারি

সুলতান বলবন বাদশাহ হওয়ার আগে পরহেজগারি ও তাকওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না, বরং তিনি মদ্যপান থেকেও বিরত থাকতেন না এবং আমোদ-প্রমোদের মজলিস সাজাতেন। জুয়ার আসরও বসাতেন এবং জয়ের সমস্ত অর্থ উপস্থিতদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। মিষ্টভাষী সঙ্গী এবং সুকণ্ঠী গায়ক প্রায়ই তার সাথে থাকত। কিন্তু বাদশাহ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি এসব কিছু বর্জন করেন। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৬

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩০ থেকে ৮৭

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১

নামাজ ও নফলের গুরুত্ব:

সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি যেভাবে রাজনৈতিক জীবনকে অত্যন্ত নীতিবান ও গম্ভীর করে তুলেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনকেও তেমনি পবিত্র করে নিয়েছিলেন। ফলে বাদশাহ হওয়ার পর তিনি কখনো তাহাজ্জুদ, ইশরাক এবং চাশত কাজা করেননি। সর্বদা অজু অবস্থায় থাকতেন। [১]

উলামা ও মাশায়েখদের সাথে সম্পর্ক:

উলামা ও মাশায়েখদের সাথে না বসিয়ে তিনি খাবার খেতেন না এবং দস্তরখানে তাদের কাছে দ্বীনি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। জুমার নামাজের পর শেখ বুরহান বলখি, মাওলানা সিরাজউদ্দিন সাঞ্জারি এবং মাওলানা নাজমুদ্দিন দামেশকির মতো বুজুর্গদের জিয়ারতের জন্য তাদের বাসস্থানে উপস্থিত হতেন। [২]

মাজার জিয়ারত ও জানাজায় অংশগ্রহণ:

একইভাবে তিনি বুজুর্গদের মাজার জিয়ারতের জন্যও যেতেন। উলামা ও মাশায়েখদের মধ্যে কেউ ইন্তেকাল করলে জানাজায় অবশ্যই শরিক হতেন। মৃত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে সমবেদনা জানাতে যেতেন। মৃতের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের সান্ত্বনা দিতেন এবং এতিমদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিতেন। [৩]

ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ:

কখনো কখনো তিনি পূর্ণ শান-শওকতের সাথে নিজের মিছিলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথে জানতে পারতেন যে অমুক আলেম বা বুজুর্গের ওয়াজ মাহফিল চলছে, তখন তিনি সরাসরি সেখানে চলে যেতেন এবং আদবের সাথে বসে পড়তেন এবং নসিহতের কথা শুনে কখনো কখনো কাঁদতে শুরু করতেন। [৪]

ভুল সংশোধন:

সুলতান স্বভাবগতভাবে কঠোর ছিলেন, তাই কখনো কখনো অন্যায্য আদেশও জারি করে দিতেন, কিন্তু সতর্ক করার পর তিনি নিজেকে সামলে নিতেন এবং সংশোধনে দেরি করতেন না। একবার তিনি আদেশ দিলেন যে, সমস্ত বৃদ্ধ সৈন্যদের কিছু অর্থ দিয়ে বরখাস্ত করা হোক, কারণ তারা সরকারি কোষাগারের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই আদেশে সেনাবাহিনীতে হুলস্থুল পড়ে গেল। বৃদ্ধ সৈন্যরা বাদশাহর ঘনিষ্ঠ ফখরুদ্দিন কোতোয়ালকে সুপারিশকারী হিসেবে পাঠাল। তিনি দরবারে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। বলবন তাকে চিন্তিত দেখে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলতে লাগলেন:

“দরবারে বৃদ্ধদের ফরিয়াদের প্রতি কোনো মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমি ভাবছি, কিয়ামতের দিন আমরা বৃদ্ধরা যদি একইভাবে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হই, তবে কী হবে।”

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২

সুলতান এটি শুনে কাঁদতে লাগলেন এবং তখনই বরখাস্তকৃত বৃদ্ধ সৈন্যদের জন্য বেতনের সমান ভাতা চালু করে দিলেন। [১]

বলবনের ব্যাপারে আল্লামা বারনী রহমাতুল্লাহ-এর মতামত:

আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারনী রহমাতুল্লাহ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের ব্যাপারে লিখেন: "তিনি একজন শক্তিশালী বাদশাহ, ইবাদতগুজার, ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফকারী, দক্ষ রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসক ছিলেন। তাঁর কঠোরতা কেবল অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের জন্য ছিল। আইন অনুযায়ী চলা ব্যক্তিদের জন্য তিনি মা-বাবার চেয়েও বেশি দয়ালু ছিলেন। তবে তাঁর চেষ্টা ছিল যেন তাঁর নির্দেশের মর্যাদা এবং তাঁর তৈরি করা প্রভাব-প্রতিপত্তি মানুষের অন্তরে কমে না যায়। এর পাশাপাশি তিনি মানুষের সম্মান ও তাদের সম্পদের ওপর লোভাতুর দৃষ্টি দিতেন না এবং কখনও শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ জারি করতেন না। কাউকে চিরতরে কারাবন্দী বা নির্বাসিত করা তিনি জায়েজ মনে করতেন না। এর পাশাপাশি তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যে, সেই যুগের আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তিরাও তাঁর সমকক্ষ হতে পারত না।" [২]

মানবীয় সমতা এবং বংশমর্যাদার প্রভাব:

বর্তমান সময়ের কিছু ইতিহাসবিদ সুলতান বলবনের ওপর এই অপবাদ দেন যে, তিনি মানবীয় সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না এবং কিছু মানুষকে উচ্চ ও কিছু মানুষকে নিচু মনে করতেন। এই ব্যক্তিবর্গ এই চিন্তাধারাকে সংকীর্ণ মানসিকতার লক্ষণ এবং হাস্যকর বলে অভিহিত করেন, যদিও এখানে সমস্যার দুটি দিক রয়েছে: একটি হলো নিজেকে মহান এবং অন্য মানুষকে তুচ্ছ মনে করা, যাকে অহংকার বলা হয়। এটি যুক্তির বিচারেও নিন্দনীয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় দিকটি হলো কোনো কাজের জন্য মানুষের বংশগত যোগ্যতা যাচাই করা এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করা। এটি যুক্তির বিচারেও কাম্য এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও প্রশংসনীয়। যদি এমনটি না করা হয়, তবে দুনিয়ার সমস্ত কাজ এলোমেলো হয়ে যাবে।

মানুষের যোগ্যতার ক্ষেত্রে তাদের বংশমর্যাদার প্রভাব এতই স্পষ্ট বিষয় যে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটি অস্বীকার করতে পারে না। এটি এক অকাট্য বাস্তবতা যে, বিভিন্ন পরিবার ও জাতির নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। যদিও তাদের প্রতিটি সদস্য এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হয় না, তবে অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে সেই বিশেষ অভ্যাস ও যোগ্যতাগুলো পাওয়া যায়। যদি এই লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের বিশেষ যোগ্যতাগুলোকে শাণিত করা হয়, তবে তাদের দিয়ে অত্যন্ত উচ্চমানের কাজ করানো সম্ভব। "ডিএনএ" বিজ্ঞান এই বাস্তবতাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

নিশ্চিতভাবেই কুরআন মাজীদ মানবীয় সমতার ওপর জোর দেয়, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা, অর্থাৎ:

- আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে অন্য মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত এবং কেবল নিজের বান্দা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
- সমস্ত মানুষের আল্লাহর নৈকট্য লাভের অধিকার সমানভাবে রয়েছে।
- প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে যে সে পরকালের জীবনকে, যা আসল ও চিরস্থায়ী জীবন, তাকে চমৎকার থেকে চমৎকারতর করে গড়ে তুলবে।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৬, ২৭৭

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৩৮৫, ৩৮৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

- প্রত্যেক মানুষের মালিকানা লাভের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বিবাহের অধিকার এবং ন্যায়বিচারের মতো মৌলিক সামাজিক অধিকার সমানভাবে রয়েছে।
- প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে যে, অন্য কেউ তার পারিবারিক জীবন এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে।
- প্রত্যেক মানুষের ঈমান, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ও সতীত্ব এবং আমানত ও বিশ্বস্ততার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে যে, সে স্রষ্টার আনুগত্য থেকে বিরতকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক নীতিকে প্রত্যাখ্যান করবে।

এটিই হলো ইসলামি সাম্যের মর্মার্থ। যেখানে বিভিন্ন পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে যোগ্যতার পার্থক্যের বিষয় রয়েছে, এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয়। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন:

“النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا”

(মানুষ খনিসমূহের মতো, তাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতের যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম প্রমাণিত হয়, যদি তারা দ্বীনের সঠিক বুঝ লাভ করে।) [১]

সুলতান বলবনের সংস্কারের পরবর্তী যুগের ওপর প্রভাব:

সুলতান বলবনের সংস্কারের প্রভাব আমরা দিল্লির সুলতানদের বিভিন্ন যুগেও দেখতে পাই। তাঁর সবচেয়ে চমৎকার কাজ ছিল এই যে, তিনি বিহার ও বাংলা থেকে শুরু করে হরিয়ানা ও পাঞ্জাব পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে দুর্গ এবং সামরিক চৌকির সাহায্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করেছিলেন। তিনি সালতানাতের শহরগুলোতে এবং গ্রামাঞ্চলে সালতানাতের অনুগত বংশানুক্রমিক হিন্দু সর্দারদের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। সুলতান যদি এই মৌলিক কাজ না করতেন, তবে পরবর্তীকালে খিলজি ও তুঘলক বংশের সুলতানদের জন্য সেই সাফল্যগুলো অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হতো যার জন্য তাঁদের প্রশংসা করা হয়।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৩৮৩।

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ

৬৮৬ হিজরি থেকে ৬৮৯ হিজরি

(১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন দাস বংশের সর্বশেষ গৌরবময় বাদশাহ। তাঁর পর দাস সালতানাত বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। সুলতানের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর ওসিয়ত বিস্মৃত হয়ে যায়।

ফখরুদ্দিন কোতোয়ালের চক্রান্ত:

এর মূল দায়ী ছিলেন মালিক ফখরুদ্দিন কোতোয়াল, যাকে মালিকুল উমারা বলা হতো। কারণ সুলতান বলবন লখনৌতি যাওয়ার পর তিনি তিন বছর পর্যন্ত দিল্লিতে ভারপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন এবং বর্তমানে তাঁর বয়স ৯০ বছর হয়েছিল। কোনো কারণে শাহজাদা মুহাম্মদ খান শহীদের প্রতি তাঁর কিছু ক্ষোভ ছিল। তাই তিনি এটা সহ্য করতে পারছিলেন না যে, খান শহীদের ছেলে সিংহাসনে আরোহণ করুক। তিনি তাঁর পরিবর্তে সুলতানের দ্বিতীয় পৌত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসানোই শ্রেয় মনে করলেন। তিনি দিল্লির উমারাদের বুঝিয়ে বললেন:

“কায় খসরু জেদি এবং কঠোর মেজাজের। সে যদি শাসনভার গ্রহণ করে তবে তা ভালো হবে না। বরং এটাই সমীচীন হবে যে, আমরা কায়কোবাদকে বাদশাহ হিসেবে নির্বাচন করি, যে নেক স্বভাবের এবং সহজ-সরল, আর সে সুলতান বলবনের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছে।”

ফলে উমারাগণ এ বিষয়ে একমত হলেন। [১]

শাহজাদা “কায় খসরু”-র পলায়ন এবং শাহজাদা কায়কোবাদের সিংহাসন আরোহণ:

এখন মালিকুল উমারা (ফখরুদ্দিন কোতোয়াল) একটি দলিল তৈরি করলেন যাতে সমস্ত উমারাদের স্বাক্ষর ছিল যে, তারা কায়কোবাদকে বাদশাহ বানাতে একমত। মালিকুল উমারা এই দলিল “কায় খসরু”-কে দেখালেন এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে পরামর্শ দিলেন যে, এখনই মুলতানের দিকে চলে যান, অন্যথায় আপনার প্রাণ বাঁচানো কঠিন হবে। ফলে শাহজাদা “কায় খসরু” পালিয়ে মুলতানে চলে গেলেন। এদিকে উমারাগণ...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৯৯

আরামের সাথে তার পরিবর্তে বুগরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে "মুইজুদ্দিন" উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসানো হয়। এটি ৬৮৬ হিজরির (জুলাই ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) জুমাদিউল আউয়াল মাসের শেষের দিকের ঘটনা। এই ষড়যন্ত্রে কায়কোবাদের পিতা বুগরা খানের কোনো হাত ছিল না। সুলতান বলবনের মৃত্যুর সময় তিনি দিল্লি থেকে শত শত মাইল দূরে বাংলায় ছিলেন। [১]

পদের বণ্টন:

নতুন সরকারে পদের বণ্টন এভাবে হয়েছিল:

- খাজা খতিরুদ্দিন: উজির-এ-সুলতানাত
- মালিক নিজামুদ্দিন: ওয়াকিল-এ-দর (সুলতানের বিশেষ নায়েব)
- মালিক কাওয়ামুদ্দিন: নায়েব ওয়াকিল-এ-সুলতানাত (সুলতানাতের সাধারণ কার্যাবলীতে সুলতানের নায়েব)
- মালিক ইখতিয়ারুদ্দিন তুর্কি: হাজিব-এ-খাস (সুলতানের সাথে সাক্ষাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
- মালিক জাওয়ারজি: সার-এ-জানদার (শাহী দেহরক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক) [২]

মালিক নিজামুদ্দিনের উত্থান ও আধিপত্য:

বৃদ্ধ মালিক ফখরুদ্দিন কোতোয়ালকে সম্ভবত বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে কোনো পদ দেওয়া হয়নি, যদিও নতুন সুলতানকে আনার ক্ষেত্রে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এখন কার্যত তারই জামাতা ও ভাতিজা মালিক নিজামুদ্দিনের হাতে ছিল, যিনি ওয়াকিল-এ-দর হওয়ার কারণে সব সময় নতুন সুলতানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকতেন। তার স্ত্রী (যিনি ফখরুদ্দিন মালিকের কন্যা ছিলেন) নিজেকে নতুন সুলতানের পালক মা বানিয়ে নেন এবং "উম্মে সুলতান" নামে পরিচিত হতে থাকেন। রাজপ্রাসাদ এবং হারেমের সমস্ত বিষয়ের ওপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। [৩]

নায়েব-এ-সুলতানাত মালিক কাওয়ামুদ্দিন কেবল প্রশাসনিক বিষয়ে জড়িত ছিলেন। উজির-এ-সুলতানাত খাজা খতিরুদ্দিনের সম্পর্ক ছিল কেবল দাপ্তরিক কাজের সাথে এবং তিনি কার্যত রাজনৈতিক খেলা থেকে দূরে ছিলেন। [৪]

কায়কোবাদের বিলাসিতা ও মত্ততা:

নতুন সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ সতেরো-আঠারো বছর বয়সী সুদর্শন, কোমল স্বভাবের এবং দানশীল যুবক ছিলেন। তার দাদা (বলবন) নিজের কঠোর তত্ত্বাবধানে তাকে লালন-পালন করেছিলেন। তার গৃহশিক্ষক ও শিক্ষকগণ তাকে কখনো কোনো গায়রে মাহরাম মেয়ের দিকে তাকাতে বা মদের এক ফোঁটাও পান করার অনুমতি দেননি। তিনি যুদ্ধবিদ্যার সব ধরনের কৌশল যেমন তলোয়ার চালনা, তীরন্দাজি, নেজাবাজি এবং অশ্বারোহণে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি কাব্য-সাহিত্য এবং ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তবে রাজনীতির কোনো...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৩; তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৯

[২] তারিখ মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৫৩

[৩] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৪

[৪] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০১

তাঁর কোনো বোধ ছিল না। তিনি বাদশাহীকে সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি বরং শিশুসুলভ খেলা মনে করতেন, ফলে তাঁর জীবন বদলে গেল এবং তিনি বিলাসিতা, মদ্যপান ও শিকারে মগ্ন হয়ে পড়লেন। বলবনের সেই মহিমান্বিত দরবার যেখানে কারো হাসার সাহস ছিল না, তা ভাঁড়, নর্তকী ও ষড়যন্ত্রকারীদের আড্ডায় পরিণত হলো। সিংহাসনে আরোহণের ছয় মাস পর (জিলহজ ৬৮৬ হিজরি) তিনি শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে কিলুঘড়িতে (কিলুখড়ি) একটি জাদুকরী ও অত্যন্ত সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করান, যার চারপাশে ফুল ও সবুজে ঘেরা অত্যন্ত মনোরম বাগান ছিল। অল্পবয়সী বাদশাহ সেখানে ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে গেলেন। [১]

সেখানে অল্পবয়সী দাসীদের আনা হতো এবং তাদের তীরন্দাজি, তলোয়ার চালনা, ঘোড়সওয়ারি এবং পরবর্তীতে গীতবাদ্য ও নৃত্যের শিক্ষা দেওয়া হতো। এই ভোগবিলাসের শহরে গায়ক ও নৃত্যশিল্পীদের পোয়াবারো হলো। তারা দাসীদের ফারসি ও হিন্দি রাগ শেখাত। যখন কোনো দাসী নৃত্য বা সংগীতে পারদর্শী হয়ে নিজের নৈপুণ্য প্রদর্শন করত, তখন বাদশাহ খুশি হয়ে সেই দাসী ও তার ওস্তাদকে মালামাল করে দিতেন।

বাদশাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সমমনা কর্মচারী ও কর্মকর্তারাও কিলুঘড়িতে স্থানান্তরিত হলেন এবং প্রাসাদের অদূরে নিজেদের আবাসস্থল নির্মাণ করে নিলেন। এভাবে এই জনপদটি একটি সুন্দর শহরে পরিণত হলো। সালতানাতের আমীর ও সরকারি কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্ত মনে করে আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হওয়াতে কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না।

কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রভাব সাধারণ জনগণের ওপরও পড়তে শুরু করল এবং তাদের মধ্যেও মদ্যপান ও অন্যান্য বিলাসিতার প্রবণতা দিন দিন বাড়তে লাগল। মদের চাহিদা এত বেড়ে গেল যে এর দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। জায়গায় জায়গায় মদের দোকান খুলে গেল। মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সংখ্যা কমে গেল এবং খানকাহগুলোতে ভিড়ও হ্রাস পেল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, হিন্দুস্তানের যে শাসন ও শৃঙ্খলা ছিল তা হঠাৎ বিলাসিতা ও মত্ততায় পরিবর্তিত হতে লাগল। অন্যদিকে বাদশাহ অত্যধিক মদ্যপানের পাশাপাশি অত্যধিক কামলিপ্সাতেও অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। ফলে দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে লাগল। [২]

শাহজাদা “খসরু”-র কাহিনী

মালিক নিজামুদ্দিন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে লাগলেন, যেন তিনিই সালতানাতের নায়েব বা প্রতিনিধি। বাকি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো তিনি নিজের অনুগতদের দিয়ে দিলেন। তরুণ বাদশাহ বিলাসিতায় এতটাই মগ্ন ছিলেন যে, সালতানাতের ওপর মালিক নিজামুদ্দিনের নিয়ন্ত্রণ মজবুত হয়ে গেল। অবশেষে তিনি সিংহাসন দখলের পরিকল্পনা শুরু করলেন। কারণ তিনি দেখছিলেন যে কায়কোবাদ অযোগ্য এবং পুরোপুরি তাঁর হাতের মুঠোয়। আর সুলতান বলবনের ছেলে বুগরা খানের বার্ধক্য শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বাংলার সুখী ও আরামদায়ক শাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং কোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়ানো থেকে বিরত ছিলেন।

---

[১] কায়কোবাদের দিল্লি থেকে কিলুঘড়ি স্থানান্তরের তারিখ কোথাও বর্ণিত নেই, তবে যেহেতু তাঁর সিংহাসনে আরোহণ জমাদিউল আউয়াল মাসের শেষে বলে স্বীকৃত, তাই জিলহজ মাসে ছয় মাস পূর্ণ হয়।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী: পৃষ্ঠা ১২৭ থেকে ১৩০।

তাকে সবচেয়ে বেশি বিপদ মনে করা হতো শাহজাদা ‘কায়খসরু’কে, যাকে সুলতানের অসিয়ত পদদলিত করে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। [১]

সুলতান কায়কোবাদের সাথে ‘কায়খসরু’র পত্রালাপ:

শাহজাদা ‘কায়খসরু’ কিছুদিন মুলতানে অবস্থান করেন। এটা স্পষ্ট যে, তিনি শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলেন তার সাথে কত বড় প্রতারণা করা হয়েছে। কয়েক মাস পর্যন্ত তিনি নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করতে থাকেন। তিনি অনভিজ্ঞ ও একগুঁয়ে ছিলেন, তাই যখন বিলাপ করা বন্ধ করলেন তখন সংকল্প করলেন যে, যেকোনো বৈধ বা অবৈধ উপায়ে নিজের সিংহাসন ফিরে পাবেন।

একদিন তিনি শিকারের বাহানায় মুলতান থেকে বের হলেন এবং নিজের দেশ ছেড়ে গজনীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যেখানে মঙ্গোল শাহজাদা তৈমুর খানের শাসন ছিল। ‘কায়খসরু’ চেয়েছিলেন তাকে কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সাহায্য নিতে এবং নিজের চাচাতো ভাই কায়কোবাদের সিংহাসন উল্টে দিতে। কিন্তু সেই দিনগুলোতে মঙ্গোলরা নিজেদের গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে এতটাই মগ্ন ছিল যে তার দিকে মনোযোগই দেয়নি। এই দুর্ভাগা শাহজাদা নিজের ধন-সম্পদ এখানে-সেখানে বিলিয়ে দিলেন কিন্তু কিছুই অর্জন করতে পারলেন না। অবশেষে নিঃস্ব হয়ে হিন্দুস্তানে ফিরে এলেন। [২]

নিরুপায় হয়ে তিনি মুলতানে অবস্থান করে সুলতান মুইজউদ্দীন কায়কোবাদের দরবারে এই আবেদনপত্র পাঠালেন:

“আমার কর্তব্য হলো যেকোনো পরিস্থিতিতে আপনার আনুগত্য ও আজ্ঞাবহতা স্বীকার করা। আমার এ বিশ্বাসও আছে যে, আপনিও আমার প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আন্তরিকতা ও ভালোবাসা পোষণ করেন। কিন্তু আমি দেখছি যে, আপনার কিছু অদূরদর্শী দরবারী আমার ও আপনার মধ্যে বিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তবে আপনি যদি আমাকে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ও প্রকৃত দরদী মনে করে মুলতানের সুবাদারি আমার নামে করে দেন, তবে এই পদক্ষেপ ভ্রাতৃসুলভ স্নেহের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।”

মুইজউদ্দীন কায়কোবাদের স্বভাব ছিল অত্যন্ত নরম। তিনি এই চিঠি পড়ে বিগলিত হয়ে গেলেন এবং জবাবে লিখে পাঠালেন:

“দুনিয়াতে তোমার চেয়ে বেশি আমি কাউকে ভালোবাসি না। কোনো ভয় বা বিপদ ছাড়াই আমার কাছে চলে এসো, আমি তোমাকে মুলতানের সুবাদার বানিয়ে দেব। এভাবে কটুভাষীদের মুখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।”

এই জবাব পেয়ে শাহজাদা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। [৩]

মালিক নিজামউদ্দীন যেভাবে ‘কায়খসরু’কে হত্যা করালেন:

এদিকে মালিক নিজামউদ্দীন সবচেয়ে বেশি বিপদ এই শাহজাদার পক্ষ থেকেই মনে করতেন। যখন খবর পেলেন যে তিনি দিল্লি আসছেন, তখন তার হাত-পা ফুলে গেল (আতঙ্কিত হলেন)। তিনি তৎক্ষণাৎ সুলতান কায়কোবাদের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন:

“এই শাহজাদা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সালতানাতের অংশীদার। সুলতান বলবনের বড় ছেলের সন্তান হওয়ার কারণে তিনি সম্মানিত। আমি জানি যে, অনেক আমির তার সাথে গোপন পত্রালাপ করছেন যাতে দিল্লিতে আপনার সিংহাসন উল্টে দিয়ে তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া যায়।” [৪]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ১৩২, ১৩৩

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩০২

[৩] ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ১৯৬ থেকে ১৯৮

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ১৩২, ১৩৩

উজির কায়কোবাদকে এও জানালেন যে, তার চাচাতো ভাই সিংহাসনের লোভে মঙ্গোলদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। [১]

এই কথাগুলো তিনি ঠিক সেই সময়েই বলেছিলেন যখন সুলতান কায়কোবাদ নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুদণ্ডের ফরমান জারি করে দিলেন। শাহজাদা "খসরু" সেই সময় "রোহতক" নামক জনপদে অবস্থান করছিলেন। সরকারি কর্মকর্তারা সেখানেই অভিযান চালায় এবং তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করে। [২]

উজির খাজা খাতিরের লাঞ্ছনা - নওমুসলিম মোগল কর্মকর্তাদের ওপর নির্যাতন:

শাহজাদার হত্যার পর নিজামুদ্দিন একে একে প্রাচীন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আমিরদের সরিয়ে দিতে থাকেন। উজির খাজা খাতির উদ্দিন ওরফে খাজা জাহান পদের দিক থেকে নিজামুদ্দিনের চেয়ে উচ্চতর ছিলেন, তাই নিজামুদ্দিন তাকে পথ থেকে এভাবে সরিয়ে দিলেন যে, তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণ করালেন যার ফলে উজিরকে গাধার পিঠে বসিয়ে দিল্লির অলিগলিতে ঘোরানো হলো। উজিরকে বরখাস্ত করার পর নিজামুদ্দিন এখন নিজেই সালতানাতের উজির হয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, নিজামুদ্দিন সুলতানের কাছে যার বিরুদ্ধেই চাইতেন অভিযোগ করতেন এবং তিনি তা বিশ্বাস করে তার ওপর শাস্তি জারির অনুমতি দিয়ে দিতেন। যদি কেউ অন্য কোনো মাধ্যমে নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে অভিযোগ পৌঁছাত, তবে সুলতান সবার আগে নিজামুদ্দিনকেই তা জানাতেন। ফলে সেই শুভাকাঙ্ক্ষীর বিপদ ঘনিয়ে আসত এবং তার কাজ শেষ করে দেওয়া হতো।

এখন সমস্ত আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিজামুদ্দিনকে ভয় পেতে শুরু করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলা বা শোনা মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর সমতুল্য হয়ে দাঁড়াল। তার ষড়যন্ত্র দিল্লির নওমুসলিম মোগল কর্মকর্তাদের বেশি প্রভাবিত ও চিন্তিত করে তুলল যারা সালতানাতের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

এদিকে নিজামুদ্দিনও তাদের পক্ষ থেকে বিপদ অনুভব করলেন এবং সুলতান কায়কোবাদের কাছে আরজ করলেন:

"দিল্লির নওমুসলিম মোগল আমিররা একমত হয়েছে যে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং হঠাৎ প্রাসাদে ঢুকে আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে এবং বাদশাহীর ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করবে। এরা সবাই এক বংশের এবং এদের লোকবল ও সেবকও প্রচুর।"

কায়কোবাদ যখনই মদের নেশায় থাকতেন, নিজামুদ্দিন তাকে নওমুসলিম মোগলদের বিরুদ্ধে উসকাতে থাকতেন। অবশেষে একদিন কায়কোবাদ আদেশ জারি করলেন যে তাদের সবাইকে হত্যা করা হোক। ফলে নিজামুদ্দিন একদিনেই হঠাৎ অভিযান চালিয়ে সবাইকে হেফাজতে নিলেন এবং তারপর হত্যা করে তাদের লাশ যমুনা নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। দিল্লির যেসব শরীফ ও আমিরদের এই মোগল কর্মকর্তাদের সাথে আত্মীয়তা ছিল, তাদের দূর-দূরান্তের কেল্লাগুলোতে বন্দি করে রাখা হলো। [৩]

নিজামুদ্দিনের চাল এবং অন্যান্য আমিরদের ওপর জুলুম:

দিল্লিতে নিজের বিরোধীদের নির্মূল করার পর নিজামুদ্দিন অন্যান্য প্রদেশের দিকে নজর দিলেন। মুলতানের সুবাদার...

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ১৯৮

[২] (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ১২৪, ১৩৩)। রোহতক দিল্লি থেকে ৭৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের একটি জনপদ।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ১৩৩, ১৩৪

নিজাম বেগ এবং লাহোরের সুবাদার মালিক তুর্কি এবং একইভাবে আরও কিছু আমীর তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলেন। নিজামুদ্দীনের শয়তানি মস্তিষ্ক এই ধরণের সমস্ত আমীরদের থেকে একবারে মুক্তি পাওয়ার একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা তৈরি করল। [১]

একদিন কিলুঘড়িতে রাজকীয় দরবার বসেছিল যখন নিজামুদ্দীনের পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন বার্তাবাহক একটি জাল বার্তা নিয়ে এল। বার্তায় পড়া হলো যে মুলতানের সুবাদার মঙ্গোল বাহিনীর ওপর রাজকীয় বাহিনীর বিজয়ের সংবাদ দিচ্ছেন। (যদিও এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি)। কায়কোবাদ এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং উদযাপনের প্রস্তুতির অজুহাতে মুলতান, লাহোর এবং অন্যান্য শহরের আমীরদের ডেকে পাঠালেন। যখন এই লোকেরা রাজধানীতে পৌঁছালেন এবং রাজকীয় দুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন নিজামুদ্দীনের আদেশে সশস্ত্র সৈন্যরা তাঁদের গ্রেপ্তার করল। তাঁদের মধ্যে কাউকে হত্যা করা হলো এবং কাউকে নির্বাসিত করা হলো। এরপর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো নতুন করে বণ্টন করা হলো এবং সেইসব লোকদেরই ওই পদগুলোতে নিযুক্ত করা হলো যারা নিজামুদ্দীনের অনুগত বা তাঁর বিশ্বস্ত ছিল। [২]

ফখরউদ্দীন কোতোয়ালের নিজামুদ্দীনকে নসিহত:

নিজামুদ্দীনের শ্বশুর মালিক ফখরউদ্দীন কোতোয়াল বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজামুদ্দীনের এই ষড়যন্ত্রগুলো সালতানাতের পতনের পূর্বাভাস। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও অস্থির হয়ে নিজামুদ্দীনকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনি যেন বাদশাহ হওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তাঁর অর্পিত কাজ ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করেন। তিনি বললেন:

“নিজামুদ্দীন! আমি তোমাকে লালন-পালন করেছি এবং তোমাকে শিক্ষিত করেছি। তুমি আমার কাছে একজন সন্তানের মতো। আমার বাবা বাদশাহর ব্যক্তিগত খাদেম হিসেবে তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন এবং কোতোয়ালের পদে পৌঁছেছিলেন। আশি (৮০) বছর ধরে আমাদের পরিবার এই পদে অধিষ্ঠিত। আমাদের আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি এখানেই। আমাদের সাফল্যের রহস্য হলো আমরা কখনোই রাষ্ট্রের রাজনীতিতে অংশ নিইনি। তুমিও তাই করো।” [৩]

নিজামুদ্দীন উত্তর দিলেন: “আপনার কথা যথার্থ, আপনার উপদেশ প্রজ্ঞাপূর্ণ, কিন্তু আপনার উপদেশের বিরোধিতা করা মূর্খতা, তবে আমি এই বিষয়ে...”

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৩।

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী, পৃষ্ঠা ৫৬, ৫৭।

তারিখ-ই-মুবারক শাহীর লেখক ইয়াহিয়া সিরহিন্দি সেই দুর্ভাগা আমীরদের নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন:

- মালিক বেগ সারিক আমীর হাজিব
- মালিক গাজী ওয়াকিল-ই-দার
- মালিক করিমুদ্দীন নায়েব বারবাক
- মালিক বাহরাম আখুর বেগ
- মালিক জাওয়ারজি সর জানদার
- মালিক মুঘলতি মুসাল্লি। এদের মধ্যে শেষোক্ত দুজনকে নির্বাসিত করা হয়েছিল এবং বাকিদের হত্যা করা হয়েছিল।

নোট: “বারবাক” শব্দটি “হাজিব”-এর সমার্থক। দিল্লির সুলতানদের শাসনামলে বারবাক এবং নায়েব বারবাক রাজকীয় দরবারের বিষয়াবলী তদারকি করতেন। বারবাকের দায়িত্বের মধ্যে ছিল দরবারের আদব-কায়দা তদারকি করা এবং দরবারের ঐতিহ্য ও শান-শওকত বজায় রাখা, এবং দরবারে আমীর ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী বিন্যাস করা, সুলতানের সাথে সাক্ষাতের তদারকি করা এবং তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। নায়েব বারবাক, বারবাকের সহকারী হতেন এবং সরাসরি বারবাকের অধীনে কাজ করতেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে বা তাঁর সহায়তায় দায়িত্ব পালন করতেন।

[৩] ফখরুল মুলক কোতোয়ালের এই দাবি বাস্তবসম্মত ছিল কারণ তিনি শাহজাদা খসরুর পরিবর্তে কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

“অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। যা কিছু করেছি তার কারণে মানুষ আমার শত্রু হয়ে গিয়েছে এবং আমার বাস্তবতা জেনে ফেলেছে। এখন যদি নিজের কদম পিছিয়ে নেই তবে আমি নিহত হব।”

একথা শুনে ফখরুদ্দিন বললেন: “তবে আমাদের, আমাদের পরিবার এবং আমাদের সন্তানদের মৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে করো।”

যাই হোক, নিজামুদ্দিনের ওপর কোনো প্রভাব পড়ল না। সে ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিরোধীদের নির্মূল করতে থাকল। [১]

বুগরা খানের নিজ পুত্র সুলতান কায়কোবাদের সাথে সাক্ষাতের প্রচেষ্টা:

সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর তার ছোট ছেলে মাহমুদ বুগরা খান লখনৌতিতে (বাংলা ও বিহারের কেন্দ্র) সুলতান নাসিরুদ্দিন উপাধি নিয়ে নিজের বাদশাহীর ঘোষণা দিয়ে নিজের খুতবা ও মুদ্রা জারি করেছিলেন। তার জন্য খুশির বিষয় ছিল যে তার ছেলে দিল্লির সিংহাসনে আসীন এবং তিনি এই আশা করেছিলেন যে ছেলে তার বাবার স্বায়ত্তশাসনে বাধা হবে না, তবুও ছেলের অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি কিছু আশঙ্কায় ছিলেন। তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে ছেলের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। উভয় পক্ষ থেকে উপহার ও উপঢৌকন আদান-প্রদানও হতে লাগল।

কিন্তু কিছুকাল পর বুগরা খানকে দেশ ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী আমীররা সবকিছু লিখে জানিয়েছিলেন। তারা স্পষ্ট করেছিলেন যে তার ছেলে আমোদ-প্রমোদের জীবন অতিবাহিত করছে। সে এমনকি সালাত ও সওম পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল। কোনো কেনা গোলাম আলেম সওম ও সালাত ত্যাগের বৈধতার পথও বলে দিয়েছে। নিজামুদ্দিনের প্ররোচনায় পড়ে সে বড় বড় আমীর ও কর্মকর্তাদের হত্যা করছে। এভাবে সালতানাত দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বুগরা খান এটি জানতে পেরে খুব চিন্তিত হলেন। তিনি ছেলেকে চিঠি লিখে বোঝানোর সিলসিলা শুরু করলেন কিন্তু কায়কোবাদ বাবার লিখিত উপদেশের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এভাবে কয়েক মাস কেটে গেল এবং পরিস্থিতির অবনতি চরমে পৌঁছে গেল, তখন বুগরা খান ছেলের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাকে চিঠিতে লিখলেন:

“হে বৎস! তোমার বাদশাহী কায়েম থাকুক এবং সুখ ও সফলতা ও কামিয়াবি থেকে তুমি কখনো বঞ্চিত না হও। আমাকে তোমার দিদারের সুযোগ দাও কারণ তোমাকে না দেখে আমি শান্তি পাচ্ছি না এবং আর সবর করার শক্তি নেই।”

কায়কোবাদ যখন এই পত্র পড়লেন তখন বাবার ভালোবাসা হৃদয়ে জোশ মারল এবং চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এল। সে নিজের দূতকে বাবার কাছে পাঠাল এবং ঠিক হলো যে বাবা লখনৌতি থেকে এবং ছেলে দিল্লি থেকে রওনা হবেন এবং অযোধ্যার কাছে ঘাগরা নদীর তীরে সাক্ষাৎ হবে।

ফলে কায়কোবাদ কিছু অনুচর ও দেহরক্ষী বাহিনীর সাথে রওনা হওয়ার সংকল্প করলেন। উজির নিজামুদ্দিন জানতে পেরে সাথে সাথে মাঝখানে এসে পড়লেন, কারণ তিনি চাইতেন না যে বাবা ও ছেলের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা হোক। তিনি বাদশাহকে বললেন:

“রাজনীতি অন্ধ হয়, কোনো সম্পর্কের তোয়াক্কা করে না। ক্ষমতার জন্য বারবার বাবা ছেলের শিরশ্ছেদ করেছে এবং ছেলে বাবার।”

---

[১] তারিখ-ই ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ১৩৫, ১৩৬; (তারিখ-ই ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩০৪)

পিতা হত্যা করেছেন। আপনার পিতা নিজেই একটি দেশের বাদশাহ এবং এই সালতানাতের আসল উত্তরাধিকারীও তিনিই। এমতাবস্থায় যখন উভয় লশকর একসাথে জমা হবে, তখন কী ফলাফল বের হবে? সুতরাং আপনি যখন যাচ্ছেন, তখন (অল্প কিছু সৈন্যের পরিবর্তে) একটি বিশাল লশকর নিয়ে বের হোন যাতে সবার ওপর আপনার প্রভাব ও মহত্ত্বের ছাপ পড়ে। [১]

কায়কোবাদ এই কথা পছন্দ করলেন এবং তিনি একটি বিশাল লশকর প্রস্তুত করে রবিউল আউয়াল ৬৮৭ হিজরিতে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন এবং দুই মাসের সফর শেষে জমাদিউল আউয়াল মাসে অযোধ্যায় পৌঁছে গেলেন। [২]

এদিকে বুগরা খান যখন জানতে পারলেন যে ছেলে বিশাল লশকর নিয়ে আসছে, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে উজির নিজামুদ্দিন তাকে আমার ব্যাপারে ভীত করে রেখেছে। যা-ই হোক, তিনিও নিজের বাহিনী নিয়ে বের হলেন এবং ঘাগরা নদীর তীরে পৌঁছে গেলেন। [৩]

পিতা ও পুত্রের মধ্যে পত্রালাপ:

নদীর দুই পাড়ে উভয়ের তাবু খাটানো হলো। বুগরা খান তীরে এসে দাঁড়ালেন যাতে দীর্ঘকাল পর ছেলেকে এক নজর দেখতে পারেন। ছেলে অন্য তীরে রাজকীয় শান-শওকতের সাথে সামনে ছিল। বুগরা খান জানতেন যে ছেলের মনে আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে যে আমি তার দেশ ছিনিয়ে নিতে চাই। তিনি দূতের মাধ্যমে ছেলের কাছে বার্তা পাঠালেন:

“দিল্লির সালতানাত আমার, কিন্তু যদি এটি আমার ছেলের কাছে এসে থাকে, তবে তার নিজের পিতার সাথে লড়াই করা উচিত নয়। আমার জন্য লখনৌতির সালতানাত, যা আমার পিতার উত্তরাধিকার, সেটিই অধিক পছন্দনীয়।”

কায়কোবাদ এর কটু জবাব দিলেন যাতে বলা হয়েছিল:

“তখতের মঙ্গোলদের হাত থেকে আমি রক্ষা করেছি এবং একে নিরাপদ রেখেছি।”

পরের দিন বুগরা খান নিজের হাজিবকে ফিরতি বার্তা দিয়ে ছেলের কাছে পাঠালেন। নৌকাটি যখন মাঝনদীতে ছিল, তখন কায়কোবাদের সৈন্যরা নৌকার ওপর তীর নিক্ষেপ করে সেটি ডুবিয়ে দিল এবং হাজিব কোনোমতে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেন। [৪]

বুগরা খান এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। সারারাত দুঃখের কারণে ঘুম আসেনি। পরের দিন তিনি বার্তা পাঠালেন:

“হে আমার পুত্র! বিদ্রোহের ইচ্ছা নিজের অন্তর থেকে বের করে দাও। তখতের আসল উত্তরাধিকারী আমি। এই মর্যাদা আমি আমার পিতার বদৌলতে এবং তুমি আমার বদৌলতে লাভ করেছ। এখন তুমি আমার সাথে অভদ্রতা করছ। তুমি কি আমার লবণের হক ভুলে গেলে?”

কায়কোবাদ আরও কঠোর জবাব পাঠালেন যাতে বলা হয়েছিল:

“নিজের বংশমর্যাদা নিয়ে গর্ব করবেন না, কারণ কেউ কোনো সালতানাতের উত্তরাধিকারী ততক্ষণ হতে পারে না যতক্ষণ না সে তাকে”

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ১৩৯ থেকে ১৪১

[২] মসনবী কিরানুস সাদাইন, অনুবাদকের ভূমিকা: পৃষ্ঠা ৫৩

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ১৪১

[৪] (কিরানুস সাদাইন, আমির খসরু: পৃষ্ঠা ৪৪) নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার কারণ আমির খসরু উল্লেখ করেননি, তবে স্পষ্টতই এটি বাদশাহর ষড়যন্ত্রকারী উপদেষ্টাদের কাজ ছিল যারা চেয়েছিল যেন পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের সুযোগ না আসে।

...বজায় রাখার জন্য লড়াই করার শক্তি আমার নেই। আমি এখন আর সেই শিশু নই যাকে আপনি কয়েক বছর আগে দেখেছিলেন। আল্লাহ আমাকে মর্যাদা দান করেছেন।“

বুগরা খান তার ছেলের এই আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তবে তিনি বুঝতে পারলেন যে এর কারণ হলো নিজামুদ্দিনের ফিতনা-ফ্যাসাদ। এখন তিনি উপদেশ ও বুঝানোর পরিবর্তে ছেলের আবেগ স্পর্শ করে একটি অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি লিখলেন, যাতে তিনি জানালেন যে তিনি ছেলের সাথে দেখা করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী এবং এর জন্য তিনি এতটাই অস্থির যে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

এভাবে কায়কোবাদ কিছুটা নরম হলেন এবং সাক্ষাতের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করলেন। বুগরা খান তার কনিষ্ঠ পুত্র কায়কাউসকে কায়কোবাদের কাছে এবং কায়কোবাদ তার পুত্র কায়ুমারসকে পিতার কাছে পাঠালেন এবং উপহার বিনিময় হলো। [১]

পিতা ও পুত্র মুখোমুখি:

এই সময়ে ষড়যন্ত্রকারী দলটি ক্রমাগত চেষ্টা করছিল যাতে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ফলে তারা কায়কোবাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করল যেন সে তার পিতার ওপর সমস্ত দরবারি আদব-কায়দা পালন করা বাধ্যতামূলক করে দেয়। বুগরা খান অসাধারণ উদারতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দিলেন এবং সমস্ত দরবারি আদব-কায়দা মেনে নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিলেন।

বুগরা খান যখন দরবারে পৌঁছালেন, তখন কায়কোবাদ অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে সিংহাসনে বসে ছিলেন এবং উদাসীনভাবে পিতার দিকে তাকালেন, যিনি মাথা নত করে এবং ভূমি চুম্বন করতে করতে আসছিলেন। বুগরা খান সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে নিজেকে ছেলের পায়ে সঁপে দিলেন। এখন ছেলের মন ভরে এল এবং সে উঠে তার পিতার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তারপর অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে নিজের সাথে সিংহাসনে বসাল। এই অবস্থা দেখে আমির ও দরবারিদের চোখ থেকেও অশ্রু ঝরতে লাগল। উজির নিজামুদ্দিনের জাল ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হলো এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে উৎসব পালন করা হতে লাগল। [২]

বুগরা খানের পুত্রকে উপদেশ ও নসিহত:

এরপর বুগরা খান ছেলের সাথে কখনো নির্জনে আবার কখনো জনসমক্ষে দেখা করতে থাকলেন। একদিন তিনি ছেলেকে নির্জনে বসিয়ে বললেন: “আমি যে এত দূর থেকে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি, তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তোমাকে কিছু নসিহত করা।”

কায়কোবাদ বললেন: “আপনি যা ভালো মনে করেন, নিঃসঙ্কোচে তা বলুন।”

বুগরা খান বললেন: “উজির নিজামুদ্দিন এবং মালিক কাওয়ামুদ্দিনকেও ডেকে নাও যাতে তারা এই নসিহতগুলোর সাক্ষী থাকে।” যখন তারা দুজনেই আসলেন, তখন বুগরা খান বললেন:

“হে পুত্র! তোমার উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা যে, তিনি তোমাকে আমার পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং আমি এটাই মনে করি যে দিল্লির শাসনভার আমার কাছেই আছে। কিন্তু যখন আমি তোমার এই চরম গাফিলতির...”

---

[১] কিরানুস সা’দাইন, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ৩২২।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ১৪২, ১৪৩; আমির খসরু রচিত কিরানুস সা’দাইন: পৃষ্ঠা ২২ থেকে ৩৩; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩০৭।

খবর পৌঁছালে আমি অবাক হলাম যে এত বিলাসিতা সত্ত্বেও তুমি কীভাবে বেঁচে আছো? আমি তখন থেকেই নিজেকে এবং তোমাকে মৃত মনে করতে শুরু করেছিলাম এবং নিশ্চিত হয়েছিলাম যে দিল্লি ও লখনৌতি পতনের মুখে। বিশেষ করে যখন তুমি আমার বাবার অনুগত সালতানাতের আমিরদের রক্ত ঝরালে, তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে শাসনের অবসান নিকটবর্তী। এর ফলে একদিকে যেমন এই অতুলনীয় আমিররা প্রাণ হারালেন, অন্যদিকে অন্যান্য গণ্যমান্য ও অভিজাত ব্যক্তিরাও তোমার প্রতি ভীত হয়ে পড়লেন। এখন আমার এই সালতানাতের সমৃদ্ধি ও টিকে থাকার কোনো আশা নেই। একটু ভেবে দেখো! আমার ভাই (খান মুহাম্মদ শহীদ), যিনি বাবার সামনেই ইন্তেকাল করেছিলেন, তিনি মাত্র একটি পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। এই পুত্র কায়খসরু সব দিক থেকেই সালতানাতের যোগ্য ছিল, কিন্তু স্বার্থান্বেষী আমিরদের প্ররোচনায় সে তোমার জুলুমের শিকার হলো। এই ফিতনাকারীদের উদ্দেশ্য এটাই যে কায়খসরু-এর পর তোমাকেও মিটিয়ে দেবে এবং নিজেরা সালতানাত দখল করে নেবে। যদি নিজের যৌবনের প্রতি তোমার দয়া না হয়, তবে অন্তত নিজের সন্তান ও পরিজনদের প্রতি দয়া করো এবং গাফলতের ঘুম থেকে জেগে ওঠো।

এরপর বুগরা খান তার ছেলেকে নিম্নোক্ত নসিহতগুলো করলেন:

- নিজের স্বাস্থ্য ও যৌবনের খেয়াল রাখো। চিকিৎসা ও আরোগ্যের ব্যবস্থা করো। আয়নায় নিজের চেহারা দেখো। একসময় এই চেহারা গোলাপের মতো ছিল আর এখন যৌবনের ভুল আচরণের কারণে কাঠের মতো শুষ্ক হয়ে গেছে। বিলাসিতা তোমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই অভ্যাসগুলো ত্যাগ করো। যদি জীবনই নিরাপদ না থাকে, তবে বাকি দুনিয়ার স্বাদ কীভাবে উপভোগ করবে?

- বাদশাহী পাঁচটি জিনিসের ওপর চলে: প্রথম: আদল ও ইহসান দ্বারা। দ্বিতীয়: দৃঢ়তার সাথে জনগণের দেখাশোনা ও তাদের লালন-পালন করার মাধ্যমে। তৃতীয়: অর্থনৈতিক শক্তি মজবুত রাখার মাধ্যমে। চতুর্থ: সালতানাতের সাহায্যকারীদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে। পঞ্চম: রাজ্যের কাছের বা দূরের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকার মাধ্যমে।

- নিজের আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকো, অন্যথায় তারা কীভাবে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী থাকবে। উজির নিজামুদ্দিন এবং মালিক কাওয়ামুদ্দিনের সাথে আরও দুইজন আমিরকে তোমার বিশেষ সহকারী বানিয়ে নাও এবং এই চারজনকে সালতানাতের স্তম্ভ হিসেবে রাখো। প্রতিটি কাজে তাদের পরামর্শ নাও। তাদের মধ্যে কাউকে অন্য কারো ওপর এমন প্রাধান্য দিও না যাতে সে অবাধ্য হওয়ার সুযোগ পায়।

- নিজের গোপন কথা কেবল এই চারজনকে জানাবে। এমন করো না যে এই চারজনের মধ্যে কেবল একজনকে বললে। অন্যথায় বাকি তিনজন তোমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে।

- বৎস! আমি আমার মরহুম পিতাকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে আলেমদের দুটি শ্রেণি রয়েছে: এক. উলামায়ে আখেরাত। এরা তারা যাদের আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার লোভ ও মোহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। দ্বিতীয়. উলামায়ে দুনিয়া। এরা তারা যারা দুনিয়ার মোহ ও লালচে আমিরদের বাসভবনে যায়। তাদের কাজই হলো হিলা ও তাবিল করা। বুদ্ধিমান বাদশাহ সেই যে উলামায়ে দুনিয়ার কথায় আমল করে না। এমন আলেমদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করো না যাদের কাছে দুনিয়া প্রাণের চেয়েও প্রিয়। যদি দ্বীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ প্রয়োজন হয়, তবে আহকামে শরীয়তের জন্য সেই আলেমদের দিকে রুজু করা উচিত যারা দুনিয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছেন, যারা টাকা-পয়সাকে সাপ ও বিচ্ছু মনে করেন।

বৎস, নামাজ ও রোজার পূর্ণ পাবন্দি করবে। এমন যেন না হয় যে, এই ফরজগুলো ত্যাগ করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে বঞ্চিত হও। আমি জানতে পেরেছি যে তুমি নামাজ পড়ো না। রমজান মাসে রোজা রাখো না। এক ফন্দিবাজ আলেম টাকার লোভে তোমাকে রোজা ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে এবং তোমাকে বলেছে যে, একটি রোজার বদলে একজন গোলাম বা ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাইয়ে দিলে তুমি রোজার সওয়াব পেয়ে যাবে। তুমি এই কথা মেনে নিয়েছ কিন্তু তুমি ঈমানদারদের এই কথা শোনোনি যে, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখে না সে যৌবনেই মারা যায়।

আমার সন্তান! তোমার দাদা (সুলতান বলবন) প্রায়ই বলতেন যে, বাদশাহদের বরং সমস্ত মুসলমানদের আখেরাতমুখী আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিজেদের আকিদা ও আমল সংশোধন করা উচিত। দুনিয়ালোভী ফন্দিবাজ আলেমদের সামনে আসতেই দেওয়া উচিত নয়। তাদের ফন্দি-ফিকিরকে নিজেদের জন্য ঢাল বানানো উচিত নয়।

আমার বৎস! তুমি তোমার দাদা সুলতান বলবনের খিদমতে ছিলে। তুমি দেখেছ যে তিনি নামাজ, রোজা, ফরজ ও নফল ইবাদতে এতটাই মশগুল থাকতেন যে কোনো আলেম বা বুজুর্গের মধ্যেও এত নফল নামাজ ও রোজার শক্তি থাকত না। বৎস! যদি কখনো তোমার দাদা জানতে পারতেন যে আমাদের দুই ভাইয়ের (বুগরা খান ও মুহাম্মদ খান) মধ্যে কারো কোনো নামাজ কাজা হয়েছে, অথবা আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম এবং ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়িনি, তবে তিনি পুরো মাস আমাদের সাথে কথা বলতেন না। যদি আমরা তাঁর খিদমতে যেতাম তবে তিনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। বৎস, আমি অনেক বুজুর্গের কাছে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখে না সে যৌবনেই মারা যায়। আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

আমার সন্তান! মৃত্যুর সময়টি অত্যন্ত কঠিন হয়। বিশেষ করে সেই সব শাসক যারা সারা জীবন অঢেল নেয়ামত ভোগ করেছে, তাদের মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন হয়। আবার যুবক বাদশাহর মৃত্যু আরও বেশি বেদনাদায়ক হয় যে দুনিয়ার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সাথে নিয়ে চলে যায়।

বৎস! আমার শেষ নসিহত হলো রমজানে রোজা রাখবে। যেভাবে সম্ভব নামাজ পড়বে। আর হ্যাঁ! একজন আল্লাহওয়ালা আলেমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবে। কারণ তিনি তোমার দ্বীনের ফিকির করবেন যেখানে অন্য হাজার হাজার মানুষ দুনিয়ার চিন্তায় ধ্বংস হয়ে যায়। [১]

বুগরা খানের প্রত্যাবর্তন ও শেষ নসিহত:

যখন বুগরা খান লখনৌতি ফিরে যেতে লাগলেন তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদলেন এবং কানে কানে তাকে বললেন:
“নিজামুদ্দিনকে অবিলম্বে সরিয়ে দাও, অন্যথায় সে সুযোগ পেলেই তোমার তখত উল্টে দেবে।”
সেই দিন দুঃখের কারণে বুগরা খান খাবারও খেতে পারেননি এবং যাওয়ার সময় তিনি তাঁর খাস লোকদের বলছিলেন:
“আজ আমি আমার ছেলে এবং দিল্লির সালতানাতকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে দিলাম।” [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃ. ১৩৮ থেকে ১৫৫; (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩০৭ থেকে ৩১০)

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃ. ১৪৮ থেকে ১৫৬

বুগরা খান ছেলেকে কেবল উপদেশই দিতে পারতেন। শাসন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ছেলে তাঁর উপদেশে আমল করার প্রতিশ্রুতি দিল এবং বুগরা খান বাংলায় ফিরে গেলেন। যদিও তিনি মনে মনে ছেলের সালতানাতের ওপর ফাতেহা পড়ে নিয়েছিলেন, তবুও তিনি নিজের ওপর এটি আবশ্যক করে নিয়েছিলেন যে, তিনি সর্বদা দিল্লির সিংহাসনের অনুগত থাকবেন, বাদশাহ যেই হোক না কেন। ফলে খিলজি শাসকদের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি বাংলা ও বিহারের সুবাহদার হিসেবে বহাল রইলেন। [১]

কায়কোবাদ তওবা ভেঙে ফেললেন:

দিল্লি ফিরে গিয়ে কায়কোবাদ কিছুদিন সেই উপদেশগুলো মেনে চললেন এবং কিছুকাল নিজেকে পাপাচার থেকে বাঁচাতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একদিন এক নজরে এমন কিয়ামত নেমে এল যে, তাঁর এই পরহেজগারী ও তাকওয়া এক নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। তিনি ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক পারস্য বংশোদ্ভূত গায়িকা ও নর্তকী, যার রূপ ও সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়, তাঁর সামনে এসে পড়ল। প্রেমিক স্বভাবের বাদশাহ তার রূপ দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। ইতিমধ্যে সেই আপদ-ই-জান (প্রাণঘাতী সুন্দরী) অত্যন্ত সুমধুর সুরে কিছু প্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি করল। তরুণ বাদশাহ অস্থির হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। সেখানেই রাজকীয় তাবু খাটানো হলো এবং তিনি সেই সুন্দরীর নাচ দেখতে ও গান শুনতে মগ্ন হয়ে গেলেন। এরপর নেশা বাড়ানোর জন্য মদ্যপানের কথা মনে পড়ে গেল। ফলে মদ্যপানের সরঞ্জাম আনানো হলো এবং মেয়েটি পেয়ালা ভরে ভরে তাঁকে পান করাতে লাগল। ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের ধারা আবার শুরু হলো। আমীর ও ওমরাহগণও, যারা অনেক দিন ধরে সংযম পালন করে হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, এই দৃশ্য দেখে পথভ্রষ্ট হলেন। সবাই রাজকীয় তাবুর বাইরে নিজ নিজ আমোদ-প্রমোদের আসর সাজিয়ে নিলেন এবং রাতটি আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলো।

এরপর বাদশাহ পাপাচারের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গেলেন যে, তাঁর আর কোনো কিছুর হুঁশ রইল না। প্রতি মুহূর্তে তিনি নেশায় চুর হয়ে থাকতেন এবং মদ ও যৌবনের আসর দিন-রাত জমজমাট থাকত। যৌবনের শক্তি নতুন নতুন দাসীদের ওপর অকাতরে ব্যয় করার ফলে তিনি দিন দিন দুর্বল হতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। [২]

মন এই অলকগুচ্ছে আটকে গিয়ে কী করবে... এই কালো নাগ দংশন করলে কী করবে? মদ্যপানের শেষ পরিণতি হলো অবসাদ... ওহে লম্পট, এখন ধৈর্য ধরো, কী করবে? [৩]

নিজামুদ্দিনের সমাপ্তি:

বাদশাহ যখনই কিছুটা হুঁশ ফিরে পেতেন, তখনই বাবার সেই উপদেশ বারবার মনে পড়ত যে, উজির নিজামুদ্দিনের কাজ শেষ করে দিতে হবে। ফলে তিনি মনে মনে উজিরকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মনের অস্থিরতা এবং মস্তিষ্কের অবনতিশীল অবস্থা ও অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে কী কৌশল অবলম্বন করবেন। অবশেষে তিনি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উজিরকে নিজের কাছ থেকে দূরে পাঠানোই সমীচীন মনে করলেন এবং তাকে মুলতানে গিয়ে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করার নির্দেশ দিলেন। ধূর্ত উজির বুঝতে পারলেন যে, বাদশাহ এখন আর আগের মতো...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১০।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, জিয়াউদ্দীন বারানি: পৃষ্ঠা ১৫৯ থেকে ১৬৮; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১০ থেকে ৩১২।

[৩] নেফাস।

ভরসা করছে না এবং আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে, তাই আদেশের আনুগত্য থেকে ক্ষমা চেয়ে বিভিন্ন অজুহাত পেশ করতে লাগল কিন্তু কায়কোবাদ নাছোড়বান্দা রইলেন এবং অবশেষে উজিরকে মুলতান যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হলো।

এমন পরিস্থিতিতে কিছু আমির বুঝতে পারলেন যে উজির এখন আগের মতো বাদশাহর ওপর প্রভাবশালী নন এবং বাদশাহ তার আধিপত্য কমাতে চান। যেহেতু অধিকাংশ আমির তার ওপর বিরক্ত ছিলেন, তাই তারা নির্জনে বাদশাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিলেন যেন তারা উজিরকে সরিয়ে দেন। এরপর তারা মদ্যপানের আসর চলাকালীন উজিরের পেয়ালায় এক বিশেষ ধরনের বিষ মিশিয়ে দিলেন।

উজির পরের দিন পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদসহ অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে মুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হতেই তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল। তিনি বিষপ্রয়োগের বিষয়টি বুঝতে পারলেন কিন্তু সময় হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে এই চতুর কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও জালিম উজির নিজের পরিণতির দিকে এগিয়ে গেল। [১]

নতুন দায়িত্বসমূহ:

তার স্থলে সামানার সুবাদার মালিক ফিরোজ (জালালুদ্দিন) খিলজিকে দরবারে তলব করা হলো এবং শায়েস্তা খাঁ উপাধি দিয়ে আরজে মামালিক (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) বানিয়ে দেওয়া হলো এবং 'বরন'-এর জায়গির তার নামে করে দেওয়া হলো। [২] এছাড়া সুলতান বলবনের দুই গোলাম: 'মালিক কাঝান' এবং 'মালিক আইতামার সুরখা'কে নিজের ঘনিষ্ঠ করে রাজপ্রাসাদের বিষয়াদি তাদের ওপর ন্যস্ত করলেন। মালিক কাঝানকে 'বারবাক' [৩] এবং মালিক সুরখাকে 'ওয়াকিল-ই-দার' বানিয়ে দেওয়া হলো। [৪]

কায়কোবাদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত: তিন বছরের শিশু সিংহাসনে:

এদিকে কায়কোবাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার মুখমণ্ডল ও শরীরের এক পাশ অবশ (পক্ষাঘাত) হয়ে গেল। তিনি স্থবির হয়ে পড়লেন, শারীরিক ও মানসিকভাবে চিকিৎসার অতীত এবং সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। অন্যদিকে দেশের পুরো শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

যখন কায়কোবাদ অসহায় অবস্থায় কিলুঘড়ির প্রাসাদে পড়ে ছিলেন, তখন 'মালিক কাঝান' এবং 'মালিক আইতামার সুরখা' এই চিন্তায় ছিলেন যে বলবনের বংশের নাম এবং তুর্কি অভিজাতদের আধিপত্য যেন বজায় থাকে। দরবারের এই দুই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আরও কিছু তুর্কি আমিরকে সাথে নিয়ে কায়কোবাদের পুত্র কায়ুমারসকে, যার বয়স ছিল মাত্র তিন বছর, শামসুদ্দিন দ্বিতীয় উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন এবং চবুতরা-ই-নাসিরিতে তার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ১৬৯, ১৭০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩১২, ৩১৩।

[২] দ্রষ্টব্য: আরজে মামালিক 'দিওয়ান-ই-আরজ' নামক সামরিক বিভাগের প্রধান হতেন, অর্থাৎ এই পদটি ছিল সামরিক বিষয়ক মন্ত্রীর। তার মৌলিক দায়িত্বসমূহ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, যেমন—সেনাবাহিনীর জন্য সৈন্য নিয়োগ ও তাদের নিবন্ধন, তাদের বেতন প্রদান করা, প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা, সামরিক বিভাগের সামগ্রিক প্রশাসন ও শৃঙ্খলা তদারকি করা, সেনাবাহিনীর নিয়মিত পরিদর্শন করা, সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং যুদ্ধের রণকৌশল তৈরি করা। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আরজে মামালিক সেনাবাহিনীর মন্ত্রী ছিলেন, সেনাপতি ছিলেন না। তিনি প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

[৩] বারবাক বলতে হাজিব (দরবারের তত্ত্বাবধায়ক) বোঝায় এবং ওয়াকিল-ই-দার বলতে রাজপ্রাসাদ ও রাজপরিবারের তত্ত্বাবধায়ক বোঝায়।

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ১৬৯, ১৭০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩১৩।

[৫] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ১৭৪; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩১৩।

মালিক কাচ্ছানের ষড়যন্ত্র। খিলজি সর্দার মালিক ফিরোজের প্রতিরোধ:

এখন আমিরদের দুটি দল হয়ে গেল: একটি দল ছিল তুর্কি আমিরদের, যারা অল্পবয়স্ক বাদশাহর সমর্থক ছিল এবং তার আড়ালে নিজেরা শাসন করতে চেয়েছিল, যার অনিবার্য ফলাফল ছিল অরাজকতা। দ্বিতীয় দলটি ছিল খিলজি আমিরদের, যাদের নেতা ছিলেন শক্তিশালী ও বয়োবৃদ্ধ আমির মালিক ফিরোজ (শায়েস্তা খাঁ) খিলজি। আরজে মামালিক (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) হওয়ার সুবাদে হাজার হাজার সৈন্য তার অধীনে ছিল এবং তিনি তখন "ভোগল পাহাড়"-এ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিলেন।

ওদিকে তুর্কি আমিররা মালিক কাচ্ছানের নেতৃত্বে সেই সব অ-তুর্কি আমিরদের একটি তালিকা তৈরি করে ফেলেছিল যারা তাদের আধিপত্য বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করতে পারত, তাদের মধ্যে ফিরোজ খিলজির নাম ছিল তালিকার শীর্ষে। সিদ্ধান্ত হলো যে, এই সমস্ত সন্দেহভাজন আমিরদের হত্যা করা হবে। মালিক ফিরোজ (শায়েস্তা খাঁ) তার ভাগ্নে আহমদ হাবিবের মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে যান। [১]

ওদিকে গোপনে দিল্লির আরও অনেক অ-তুর্কি অফিসারও মালিক ফিরোজকে সমর্থনের আশ্বাস দেন। ফলে মালিক ফিরোজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানী "গিয়াসপুর" (কিলুখেরি)-এর কাছে এসে পৌঁছান যাতে নতুন শাসন ব্যবস্থায় নিজের ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে তিনি মালিক কাচ্ছান বা তার কোনো সমর্থকের কাছে প্রকাশ হতে দেননি যে, তিনি তার বিরুদ্ধে হওয়া কোনো ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত আছেন। [২]

মালিক কাচ্ছানের কাজ শেষ। শিশু বাদশাহ মালিক ফিরোজ খিলজির হাতে:

যা-ই হোক, মালিক কাচ্ছান তার ষড়যন্ত্র এগিয়ে নিয়ে মালিক ফিরোজ খিলজিকে একটি আদেশনামা পাঠান যাতে তিনি নতুন বাদশাহ শামসুদ্দিন কায়ুমারসের দরবারে হাজিরা দেন। মালিক ফিরোজ খিলজি আদেশের উদ্দেশ্য জানতেন, তাই তা পালনে বিলম্ব করতে থাকেন। মালিক কাচ্ছান ধৈর্য ধরতে পারলেন না এবং তিনি মালিক ফিরোজ খিলজিকে সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বেখবর মনে করে তার সাথে দেখা করতে চলে গেলেন এবং তার ওপর জোর দিতে লাগলেন যে, তার দরবারে দ্রুত পৌঁছানো খুবই উপকারী হবে। মালিক ফিরোজ আপাতদৃষ্টিতে খুব মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে থাকলেন এবং ওজর পেশ করতে থাকলেন যে, তিনি সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ঠিক করতে ব্যস্ত আছেন এবং অবসর হওয়া মাত্রই দরবারে হাজিরা দেবেন।

এরপর কাচ্ছান বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটি তাঁবুতে প্রবেশ করা মাত্রই খিলজির আদেশে কয়েকজন যুবক তাকে হত্যা করে এবং মাথা কেটে দেহ যমুনা নদীতে ফেলে দেয়। এখন উভয় বিরোধী দলের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। খিলজির সৈন্যরা বিরোধী দলকে সামলে ওঠার সুযোগ দেয়নি। তার পাঁচশ সৈন্য দ্রুত রাজপ্রাসাদে আক্রমণ করে এবং শিশু নামমাত্র বাদশাহ কায়ুমারসকে তুলে নিয়ে নিজেদের শিবিরে চলে আসে। এটি দেখে আইতামার সুরখা এবং কিছু তুর্কি অফিসার শিশু বাদশাহকে ফিরিয়ে নিতে দৌড়ে এলেন কিন্তু তাদের ধরে হত্যা করা হলো। [৩] বিপ্লবের এই ঘটনাটি ৬৮৮ হিজরির শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিল। [৪]

---

[১] আহমদ হাবিবকে কিছু প্রাচীন উৎস যেমন ফিরোজ শাহী ইত্যাদিতে 'আহমদ চাপ' লেখা হয়েছে।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ১৭২; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩১২, ৩১৩।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ১৭২, ১৭৩; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩১২, ৩১৩।

[৪] এই সময়কালটি উদ্ধৃত নয় বরং অনুমাননির্ভর। ১৯ মহররম ৬৮৯ হিজরির তারিখ উদ্ধৃত আছে যাতে মুইজুদ্দিন কায়কোবাদকে হত্যা করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা সেখানে উল্লেখ করেছেন যে, সেই সময় বিপ্লবের তিন মাস অতিবাহিত হয়েছিল।

শামস উদ্দিন কায়ুমারস

শাওয়াল ৬৮৮ হিজরি থেকে মহরম ৬৮৯ হিজরি

অক্টোবর ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ

মালিক ফিরোজ সেই সময় রাজকীয় ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় ছিলেন না। তাই হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে আনার পর তিনি মাসুম কায়ুমারসকে কিলুগড়ি প্রাসাদে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসানোর রীতি সম্পন্ন করেন এবং পাঞ্জাবের (গুরুত্বপূর্ণ জেলাসমূহ: মুলতান, ভাতিন্ডা এবং দিপালপুর) সুবাদারি নিজের জন্য পছন্দ করেন।

সেই সময় গিয়াসউদ্দিন বলবনের এক ভাতিজা মালিক ছাজ্জু নিজেই বাদশাহি দাবি করছিলেন। মালিক ফিরোজ খিলজি তাকে প্রস্তাব দেন যে তিনি যেন অল্পবয়স্ক বাদশাহর নায়েব হন, কিন্তু তিনি রাজি হননি এবং এর পরিবর্তে "কারা" ও "মানিকপুর"-এর সুবাদারি গ্রহণ করেন। মালিক ফিরোজ বাদশাহর নায়েব হওয়ার পদটি বয়োবৃদ্ধ ফখরুদ্দিন কোতোয়ালকে প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনিও অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে মালিক ফিরোজ নিজেই এই দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নেন। [১]

কায়কোবাদের হত্যা - দাস বংশের সমাপ্তি:

তিন মাসের কিছু বেশি সময় পর্যন্ত কায়ুমারস সিংহাসনে বহাল ছিলেন, কিন্তু এই কৃত্রিম ও দুর্বল ব্যবস্থা বেশিদিন চলতে পারত না। ফলে মালিক ফিরোজ খিলজি বলবন বংশের শাসনের অবসান ঘটানোর অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি এমন একজন অফিসারকে কায়কোবাদকে হত্যার জন্য নিযুক্ত করেন যার পিতাকে কায়কোবাদ হত্যা করিয়েছিলেন। দুর্ভাগা কায়কোবাদ কিলুগড়ি প্রাসাদে নিজের বিছানায় কেবল শ্বাস নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন। তাকে একটি চাদরে জড়িয়ে কয়েকটি আঘাত করা হলে তার আত্মা দেহত্যাগ করে। লাশ যমুনা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এটি ১৯ মহরম ৬৮৯ হিজরির ঘটনা। এভাবেই ক্ষমতার সেই একাধিপত্য যা বহু বছর ধরে তুর্কি দাস অফিসারদের হাতে ছিল, তা শেষ হয়ে যায়। সেই সাথে উপমহাদেশীয় ইতিহাসে অমলিন ছাপ রেখে যাওয়া দাস বংশের যুগের সমাপ্তি ঘটে। [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ১৭৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩১৪

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ১৭৩, ১৭৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩১৪; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৪০ থেকে ৪২

দাস বংশের পতনের কারণসমূহ

দাস বংশ, যাকে মামলুক বংশও বলা হয়, ছিল দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি স্থাপনকারী প্রথম রাজবংশ। এতে কুতুবুদ্দিন আইবেক, শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ, রাজিয়া সুলতানা এবং গিয়াসউদ্দিন বলবনের মতো শক্তিশালী ও যোগ্য শাসক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বংশ প্রায় ৮৪ চন্দ্র বছর (৮৪ সৌর বছর) ক্ষমতায় ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পতনের সম্মুখীন হয়। এর পতনের প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- ১. তুর্কি আমীরদের (চাহালগানি) ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি:

ইলতুতমিশ তাঁর অনুগত তুর্কি দাস সরদারদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন যাকে “তুর্কান-ই-চাহালগানি” বা “চল্লিশজন আমীর” বলা হতো। এই দলটি সালতানাতের স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা নিজেরাই ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ‘রাজা নির্মাতা’ (কিং মেকার) হিসেবে ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। ইলতুতমিশের পর তারা ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এবং দলাদলির মাধ্যমে সিংহাসনচ্যুত করা এবং নিজেদের পছন্দের রাজপুত্রদের সামনে আনার ধারা শুরু করে। রাজিয়া সুলতানার বিরুদ্ধেও তাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

- ২. অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র:

বলবন যদিও চাহালগানি আমীরদের শক্তি ভেঙে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরে এই দলের প্রভাব আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র সালতানাতকে ভেতর থেকে ফোকলা করে দেয়। প্রত্যেক আমীর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অন্য আমীরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত।

- ৩. সালতানাতের মৌলিক কাঠামোতে দুর্বলতা:

দাস বংশের সালতানাত তখনো শাসনব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের দিক থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং এর প্রশাসনিক কাঠামো পুরোপুরি শক্তিশালী ছিল না। এই অভাবও অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- ৪. কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অভাব:

যদিও বলবন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে এবং প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ে।

- ৫. দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারী:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর দাস বংশ সবচেয়ে বড় ধাক্কা খায় দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের...

দাস বংশের সমাপ্তির ঘটনা ফেরেশতা ৬৮৭ হিজরির শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে আল্লামা বারানি ৬৮৮ হিজরি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এর মুন্সি ৬৮৯ হিজরিকে সঠিক বলে গণ্য করেছেন। তাকভীম-ই-তারিখি (মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাশমী রচিত) অনুযায়ী এটি জমাদিউল আখিরা ৬৮৯ হিজরির ঘটনা। তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে এর সময়কাল ১৯ মহরম ৬৮৯ হিজরি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ এটিই অগ্রগণ্য।

অবস্থায় লিপ্ত হলো। তার মৃত্যুর পর তার নাতি কায়কোবাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন, যিনি ছিলেন বিলাসপ্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর প্রতি উদাসীন। তার বিলাসিতা এবং দুর্বলতা আমিরদের শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এরপর কায়ুমারসকে সিংহাসনে বসানো হয়, যিনি ছিলেন নিছক একজন অল্পবয়স্ক শিশু। এই দুর্বল শাসকদের কারণে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬. আর্থিক স্থিতিশীলতার অভাব:

সালতানাতের আয়ের সিংহভাগ নির্ভর করত গনিমতের মাল এবং খাজনার ওপর। একটি স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থার অভাব ছিল যা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা প্রদান করতে পারত।

৭. সামরিক ব্যবস্থায় দুর্বলতা এবং অভিজাত শ্রেণির ওপর নির্ভরতা:

যদিও দাস বংশের শাসকরা সামরিকভাবে শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু বলবনের মৃত্যুর পর উচ্চপর্যায়ের সামরিক নেতাদের অভাব দেখা দেয় এবং সামরিক ব্যবস্থাতেও দুর্বলতা চলে আসে। এছাড়া এই যুগে শাসনব্যবস্থা মূলত অভিজাত শ্রেণি এবং সামরিক প্রধানদের ওপর নির্ভরশীল ছিল, ফলে যখন কোনো বাদশাহর শাসন বিপদে পড়ত, তখন তার বিরোধীদের পথে সাধারণ জনগণ বিশেষ কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলত না। এই যুগের সরকারগুলোর পতনের এটিও একটি বড় কারণ ছিল।

৮. আমির ও সর্দারদের মধ্যে গোত্রীয় দলাদলি:

খিলজি বিপ্লবের পূর্বেই দিল্লি সালতানাতে বিভিন্ন জাতিগত ও গোত্রীয় গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত আমিররা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সালতানাতে তুর্কি বংশোদ্ভূত আমিরদের আধিপত্য ছিল, তবে অন্যান্য জাতিগত গোষ্ঠীর আমিররাও বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে জাতিগত ও গোত্রীয় গোঁড়ামির কারণে দ্বন্দ্ব চলত, যার ফলে সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রত্যেক আমির ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় লিপ্ত থাকত এবং কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রধানের অনুপস্থিতিতে এই দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করত।

এই সমস্ত কারণ সম্মিলিতভাবে দাস বংশের শক্তিশালী সালতানাতকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যেখান থেকে তা আর সামনে এগোতে পারেনি এবং পরিশেষে নতুন শাসকদের জন্য পথ সুগম হয় এবং খিলজিরা সিংহাসন দখল করে নেয়।

মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাস

খিলজি বংশ

৬৮৯ হিজরি থেকে ৭২০ হিজরি

(১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ)

ক্ষমতার মেয়াদ: চান্দ্র: ৩১ বছর - সৌর: ৩০ বছর

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-মিল্লাত-ই-ইসলামি

সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খলজি

৬৮৯ হিজরি থেকে ৬৯৫ হিজরি

(১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)

খলজিরা কারা ছিলেন?

খলজিদের বংশপরিচয় সম্পর্কে একটি মত হলো তারা বংশগতভাবে তুর্কি ছিলেন না, বরং তাদের রঙে রঞ্জিত হয়েছিলেন। এমনকি ফেরেশতাও বলেন যে খলজিরা মূলত তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন না। [১]

দ্বিতীয় মতটি হলো তারা তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন, খলজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মধ্য এশিয়া থেকে হিজরত করে বর্তমান আফগানিস্তানের গরম এলাকা বিশেষ করে গজনী ও বুস্তের মধ্যবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শত শত বছর ধরে এই অঞ্চলে বসবাসের কারণে তারা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে কিছু ঐতিহাসিক ভুলবশত তাদের আফগান মনে করেছিলেন, যদিও তারা জাতিগতভাবে তুর্কিই ছিলেন। তাদের আফগান হওয়া একটি ভুল ধারণা যা তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ছড়িয়ে পড়েছিল—অর্থাৎ তারা এমন একটি অঞ্চলে বসবাস করতেন যা পরবর্তীতে পশতুভাষীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেরা বংশগতভাবে তুর্কি ছিলেন। [২]

জালালুদ্দিন খলজি—একটি নতুন যুগের সূচনা

গিয়াসউদ্দিন বলবনের উত্তরসূরিদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হওয়ার পর খলজিদের শাসনের যুগ শুরু হয়। খলজি নেতা মালিক ফিরোজ (শায়েস্তা খান) জালালুদ্দিন উপাধি ধারণ করে ৬৮৯ হিজরির মহররম মাসে ৭০ বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসন আরোহণ করেন এবং সরকারের ওপর তুর্কি আমিরদের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটান।

সরকারের এই পরিবর্তন কেবল একটি রাজবংশের পরিবর্তন ছিল না, বরং এটি এমন একটি যুগের সমাপ্তি ছিল যেখানে তুর্কি দাসদের মধ্যে...

---

[১] সায়র-ই-উমারা-ই-খলজ ইত্যাদি মূলত তুর্কি বংশোদ্ভূত নয়। (তারিখ-ই-ফেরেশতা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬৩)

[২] আল-খলজিয়া ওয়া হুম সিনফ মিনাল আতরাক। (নুজহাতুল মুশতাক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭১৭)

https://t.me/BoierSomahar

হিন্দুস্তানের শাসনভার ছিল দাস বংশের হাতে। দাস বংশের অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও কুতুবুদ্দিন আইবেকের মুক্ত করা তুর্কি দাস এবং তাদের বংশধরদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। অন্য কোনো বংশের লোকদের পক্ষে সিংহাসনে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। বলবনের যুগে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোরতার চরম সীমায় পৌঁছেছিল, যার ফলে এক ধরণের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভেতরে ভেতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধছিল। এটি ভিন্ন কথা যে, বলবনের প্রভাব ও সম্মানের কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল।

কিন্তু বলবনের কয়েক বছর পর খিলজিরা যেভাবে সহজে নিজেদের সরকার কায়েম করল, তা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হিন্দুস্তানে একটি বংশের আধিপত্য চিরকাল থাকতে পারে না এবং অন্যান্য বংশের যোগ্য ব্যক্তিরা এখন শাসনের অধিকতর যোগ্য। সুলতান জালালুদ্দিন খিলজি তার পূর্বসূরি সুলতানদের বিপরীতে প্রতিরোধ ও সমঝোতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত গোত্রকে সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন উদারমনা, সচ্চরিত্র এবং কোমল হৃদয়ের শাসক। শক্তির পরিবর্তে দয়া ও উদারতার মাধ্যমে অধীনস্থদের অনুগত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

তিনি জানতেন যে, দিল্লির জনগণের তুর্কি রাজবংশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ভক্তি রয়েছে, কারণ তারা ৮০ বছর ধরে তাদের ছায়াতলে বসবাস করছে। এখন এই বংশের পরিবর্তে অন্য কোনো বংশের লোককে রাজসিংহাসনে দেখা এই লোকদের জন্য মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে। তাই তিনি সুলতান বলবন ও তার বংশধরদের রাজপ্রাসাদ “কুশক-এ-লাল”-এ প্রবেশ করার এবং সেখানে অবস্থান করার কষ্ট স্বীকার করেননি, বরং দিল্লিতে প্রবেশ স্থগিত রেখে কিলুঘারিতে কায়কোবাদের প্রাসাদে অবস্থান করেন, যার কিছু অংশ তখনও নির্মাণাধীন ছিল। তিনি এই প্রাসাদটি দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। তিনি সংলগ্ন জমিতে প্রাচীর নির্মাণ, জামে মসজিদ এবং বাজার তৈরির নির্দেশ দেন এবং এই নতুন মহল্লায় বসবাস শুরু করেন। উজির ও আমীরগণও সেখানে ভবন নির্মাণ করতে শুরু করেন। এভাবে দিল্লি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল: পুরনো দিল্লি এবং নতুন দিল্লি।

পদবন্টন:

নতুন সরকারে যখন পদবন্টন করা হলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী আমীরদের বড় বড় পদ দেওয়া হলো। সে অনুযায়ী তিনি তার ভাতিজা আহমদ হাবিবকে “নায়েব বারবাক” (হাজিব) নিযুক্ত করেন এবং তার ভাই ইয়াগরাশ খানকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ ছাড়া তিনি তার বড় ছেলেকে খান-ই-খানান, মেজ ছেলেকে আরকালি খান এবং ছোট ছেলেকে কদর খান উপাধিতে ভূষিত করেন। অন্যদিকে তার চাচা হোসেনকে তাজুল মুলক উপাধি দেওয়া হয়। মালিক নাসিরুদ্দিন বাক বাককে আমীর-ই-হাজিব পদ প্রদান করা হয়। নতুন সুলতান পুরনো তুর্কি আমীরদের ঢালাও বরখাস্ত করা থেকে বিরত থাকেন। সুলতান বলবনের পুরনো অনুগত ফখরুদ্দিনকে শহরের কোতোয়াল পদে বহাল রাখা হয়। পুরনো উজির খাজা খাতিরকে উজিরের পদে পুনর্বহাল করা হয়।

বলবনের ভাতিজা মালিক চাজ্জুকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী “কারা” এবং “মানিকপুর”-এর সুবাদারি দেওয়া হয়। [১] এবং বলবন...

---

[১] “কারা”-র বর্তমান নামও এটাই। তবে একে প্রায়ই “কারা-কোশাম্বী” বলা হয় কারণ এটি ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কোশাম্বী এলাকায় গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। এটি প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ) থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার পশ্চিমে। অন্যদিকে দিল্লি থেকে এর দূরত্ব ১৮৫ কিলোমিটার।

পরিবারের সদস্যদের অনুমতি দেওয়া হলো যে তারা চাইলে সেই জায়গিরেই গিয়ে থাকতে পারে। কয়েক মাসের মধ্যে দিল্লির মানুষেরা বুঝতে পারল যে এই সত্তর বছর বয়সী সুলতান পূর্ববর্তী শাসকদের তুলনায় অনেক বেশি দয়ালু, বিনয়ী এবং শান্তিকামী। [১]

সুলতানের দিল্লি আগমন এবং কুশকে লালে প্রবেশ:

কয়েক মাস পর যখন দিল্লির মানুষের আশঙ্কা দূর হলো, তখন সুলতান প্রথমবারের মতো দিল্লিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর জনহিতৈষী মনোভাব, সদাচার এবং নম্র স্বভাব মানুষকে যেমন অবাক করল, তেমনি আনন্দিতও করল। এই অবস্থাতেই তিনি প্রথমবারের মতো সুলতান বলবনের রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং প্রধান ফটকে দুই রাকাত শুকরানা নামাজ আদায় করলেন। এরপর তাঁর সঙ্গীদের বললেন: “আমি আল্লাহর শুকরিয়া কীভাবে আদায় করব যে, যে সিংহাসনের সামনে আমি মাথা নত করতাম, আজ তাতে নিজের পা রাখতে যাচ্ছি।”

সুলতান বলবনের বিশেষ বসার স্থান “কুশক মহল”-এ গিয়ে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। মালিক আহমদ হাবিব বললেন: “এর প্রয়োজন নেই।” কিন্তু জালালুদ্দিন খলজির উত্তর ছিল: “এটি আমার প্রভুর আবাসস্থল। আমার ওপর এর সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এই রাজকীয় জাঁকজমক আমার বংশগত স্বভাবের মধ্যে নেই, কারণ আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন না।”

রাজসিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে তিনি এর কাছে আমিরদের বসার স্থানগুলোর একটিতে বসে পড়লেন এবং রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। কিছুটা সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন:

“বাদশাহি পুরোপুরি লোকদেখানো ও প্রদর্শনী মাত্র। বাইরে থেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় কিন্তু ভেতর থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ভগ্ন। মালিক ছাজ্জু এবং মালিক সুরখা সালতানাতকে নষ্ট করে দিয়েছিল এবং আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল, আর আমি নিজের প্রাণের ভয়ে এই সবকিছু করতে বাধ্য হয়েছি। সারা জীবন সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছি, এমনকি বার্ধক্য চলে এসেছে। আফসোস! বাকি জীবনটাও যদি এভাবেই কেটে যেত। এখন চার দিনের জীবন আর এই সালতানাতের পরীক্ষা। জানি না এই বোঝার পরিণাম কী হবে যা আমি নিজের মাথায় তুলে নিয়েছি। সুলতান বলবনের মতো মহান বাদশাহ, যিনি বিশ বছর নায়েবে সালতানাত এবং বিশ বছর বাদশাহ হিসেবে চল্লিশ বছর শাসন করেছেন এবং যোগ্য সন্তানদের শ্রেষ্ঠ আমিরদের সাথে রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী পরিণাম এই হলো যে তিন বছরের মধ্যে সবাই ক্ষমতাচ্যুত হলো, তাঁর আমিররা সম্পদহীন হয়ে পড়ল। আমরা তো বলবনের চাকর-বাকর। সম্ভবত আমাদের সন্তানদের অবস্থা এর চেয়েও খারাপ হবে।”

জালালুদ্দিন খলজির এই কথাগুলো শুনে গম্ভীর ও বাস্তববাদী আমিররা অশ্রুসিক্ত ছিলেন, অন্যদিকে কিছু বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন আমির নিজেদের হাসি লুকিয়ে চুপিচুপি একে অপরকে বলছিলেন: “ইনি তো শুরুতেই কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে এই সালতানাত ছিনিয়ে নেওয়া হবে, কারণ সালতানাত শক্তি ও সামর্থ্যের মাধ্যমেই চলে আর শক্তি রক্তপাতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।”

দক্ষিণে অবস্থিত। এই প্রাচীন জনপদটি কয়েক শতাব্দী ধরে দিল্লি সালতানাত এবং জৌনপুর সালতানাতের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক কেন্দ্র ছিল। একে কখনো কখনো “কড়া মানিকপুর”-ও বলা হয়। মানিকপুর গঙ্গা নদীর অপর তীরের একটি জনপদ। “কড়া” এবং “মানিকপুর”-এর মধ্যে দূরত্ব প্রায় পনেরো কিলোমিটার।

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৭৬, ৭৭

প্রকৃতপক্ষে এই আমিরগণ দীর্ঘকাল ধরে একটি সামরিক প্রশাসনিক কাঠামোয় গড়ে ওঠা রাজকীয় মেজাজের সম্মুখীন হয়ে আসছিলেন। তাই তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, নম্রতা, মমতা ও ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই নতুন আচরণ সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার কারণ হবে।

এই সভার পর সুলতান সেই সন্ধ্যায়ই কিলুঘারি ফিরে যান এবং সেখানেই অবস্থান করেন। দিল্লির অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আমিরদের ওপর এই প্রথম সভার এমন প্রভাব পড়েছিল যে, তারা কায়মনোবাক্যে নতুন বাদশাহর অনুগত হয়ে যান। এভাবে সুলতান জালালুদ্দিন খলজি ক্ষমতা গ্রহণ করে যে নম্রতা, দয়া ও ক্ষমার পরিচয় দিয়েছিলেন তা প্রবাদে পরিণত হয়। [১]

মালিক ছাজ্জুর বিদ্রোহ - সুলতানের নম্রতা ও সদাচরণ:

তার শাসনের দ্বিতীয় বছরে (৬৯০ হিজরি - ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে) মানিকপুরের শাসক মালিক ছাজ্জু, যিনি সুলতান বলবনের ভাতিজা ছিলেন, বিদ্রোহ করেন। তিনি নিজের উপাধি 'সুলতান মুগিসুদ্দিন' রাখেন এবং রাজকীয় ছত্র (চতর-ই-শাহী) গ্রহণ করেন যা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। তার দাবি ছিল যে, সুলতান জালালুদ্দিন খলজির বাদশাহ হওয়ার কোনো অধিকার নেই কারণ তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন না। এই অধিকার কেবল সুলতান বলবনের পরিবারের, যাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সালতানাত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অযোধ্যার শাসক মালিক হাতেম খানও তার সাথে যোগ দেন। গঙ্গা নদীর ওপার থেকে হিন্দু রাজা ও রানারাও তার পাশে এসে দাঁড়ান। তারা মালিক ছাজ্জুর কাছ থেকে পানের খিলি গ্রহণ করেন যা বন্ধুত্বের প্রতীক ছিল। তারা আস্ফালন করে বলেন যে, আমরা জালালুদ্দিন খলজির রাজকীয় ছত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব। এভাবে মালিক ছাজ্জু এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে দিল্লির দিকে রওনা হন এবং গঙ্গা নদীর পূর্ব তীর ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আব-ই-রাহাপ [২] (রামগঙ্গা নদী) পর্যন্ত পৌঁছে যান।

এদিকে জালালুদ্দিন খলজিও শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই স্নেহশীল ও দয়ালু অবয়বের ভেতরে ছিল একটি শক্তিশালী হৃদয় ও তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক যা সামরিক পরিকল্পনা তৈরির জন্য পুরোপুরি সক্রিয় ছিল। নিজের বড় ছেলে খান-ই-خانানকে দিল্লিতে ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করে তিনি নিজে বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। তিনি তার মেজ ছেলে আরকালি খানকে অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি করে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি আমরোহা হয়ে বদায়ুন পৌঁছে যান। তার আক্রমণ শত্রুকে আতঙ্কিত করে তোলে।

এদিকে সুলতান জালালুদ্দিন খলজি 'কোল' (আলিগড়) হয়ে গঙ্গা নদী পার হন এবং যে সময় আরকালি খান প্রতিপক্ষকে বেশ ভালোই নাজেহাল করে ফেলেছিলেন, সুলতান তখন নিজের বাহিনী নিয়ে শত্রুর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করছিলেন। মালিক ছাজ্জু এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার জ্ঞান হারানোর দশা হয় এবং তিনি ঘেরাও হওয়া থেকে বাঁচতে পালিয়ে যান। বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে। আরকালি খান ধাওয়া অব্যাহত রাখেন যাতে শত্রুর কিছু কর্মকর্তা ও হিন্দু রাজা নিহত হন। অনেক...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ১৭৮ থেকে ১৮১; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ: খণ্ড ২, পৃ. ৪

[২] আব-ই-রাহাপ (রাহব) যাকে রামগঙ্গা নদী এবং কালী নদীও বলা হয়, এটি গঙ্গা নদীর একটি উপনদী যা ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটি হিমালয় থেকে শুরু হয়ে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা: মোরাদাবাদ, বেরেলি, শাহজাহানপুর এবং হারদোই হয়ে প্রবাহিত হয় এবং কনৌজের কাছে গঙ্গা নদীতে মিলিত হয়। এটি গঙ্গার বাম তীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপনদী এবং এর নিজস্ব একটি বিশাল সমভূমি রয়েছে।

গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। মালিক ছাজ্জু নিজে দূরে পালিয়ে গেলেন কিন্তু তার তালাশ অব্যাহত রইল।

আরকালি খান বন্দী কর্মকর্তাদের উটের পিঠে চড়িয়ে এবং গলায় ও হাতে শিকল পরিয়ে সুলতানের তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেন। সুলতানের কোমল হৃদয়ের অবস্থা এমন ছিল যে, বিদ্রোহী আমিরদের সাথে এই আচরণ তিনি সহ্য করতে পারলেন না; তাদের দেখামাত্রই তিনি রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললেন এবং চিৎকার করে বললেন: "এসব কী! এদের সবার শিকল খুলে দাও এবং হামামে নিয়ে যাও।"

এখন তাদের প্রস্তুত করে রাজকীয় পোশাকে সুলতানের কাছে পাঠানো হলো। সুলতান তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন এবং অত্যন্ত দয়ার্দ্র আচরণ করলেন। বিদ্রোহীদের মাথা নত হয়ে গেল। এটি দেখে সুলতান বললেন:

"আপনারা এত লজ্জিত হচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাদের বাদশাহ ছিলাম না যে আপনারা আমার সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তাকে আমি নিমকহারামি হিসেবে গণ্য করব। আপনারা যা করেছেন, তা আপনাদের অন্নদাতা প্রভুর পক্ষাবলম্বন করে করেছেন যাতে বাদশাহীর পদ আপনাদের প্রভু সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পরিবারের বাইরে না যায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটাই ছিল যে, শাসনভার আমি পাই এবং আপনাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোক। আপনারা সফল হননি এবং এই বৃদ্ধ বয়সে বাদশাহী আমার হাতে এল। আপনারা সেই সব লোক যারা সুলতান বলবনের যুগে কখনো আমার সাথে হেসে কথা বললে আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে যেতাম এবং আমার সাথীদের সামনে আপনাদের এই দয়ার কথা অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করতাম।"

কিছুদিন পর বিদ্রোহীদের সর্দার মালিক ছাজ্জুও গ্রেপ্তার হলেন। সুলতান তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মুলতানে পাঠিয়ে দিলেন এবং মুলতানের শাসককে তাকিদ দিলেন যেন সুলতান বলবনের সাথে মালিক ছাজ্জুর আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে তাকে পূর্ণ মর্যাদা, সম্মান এবং আরাম-আয়েশের সাথে রাখা হয়। একজন বিদ্রোহীর সাথে এই সদ্ব্যবহার দেখে সুলতানের অনেক উপদেষ্টা অসন্তুষ্ট হলেন। একদিন সুলতানের ভাগ্নে মালিক আহমদ হাবিব (নায়েবে আমির হাজিব) হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আরজ করলেন:

"শত্রুর সাথে এই আচরণ সমীচীন নয়। ভেবে দেখুন, আমরা যদি তাদের হাতে পড়তাম তবে তারা আমাদের সাথে কেমন আচরণ করত। আপনার এই কোমলতা দেখে অন্যান্য ফিতনাবাজরাও বিদ্রোহ করার সাহস পাবে। সুলতান বলবনের রাজনীতি তো আপনার মনেই আছে যে, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে কেমন কঠোর আচরণ করতেন।"

সুলতান তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন: "মুসলমানদের রক্ত ঝরানো আমার অভ্যাস নয়। এই বৃদ্ধ বয়সে বাদশাহীর স্থায়িত্বের জন্য কেন এমন করব? এমনটি করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে কী জবাব দেব? এই লোকেরা সুলতান বলবন এবং সুলতান মুইজউদ্দিনের যুগে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এবং তারা অনেকবার আমাকে ভোজসভায় শরিক করেছেন। আমরা এক দস্তরখানে পানাহার করতাম। আজ তাদের শিকলবন্দী করে আমার কাছে আনা হয়েছে, অথচ আল্লাহ আমাকে বিজয় ও মর্যাদা দান করেছেন, এমতাবস্থায় আমি পূর্বের সম্পর্ক কীভাবে ভুলে যাব? আমি জুলুম-অত্যাচার, নির্লজ্জতা এবং খোদাবিমুখতার পরিচয় দিতে পারি না। এই লোকেরাও মানুষ এবং মুসলমান। তারা আল্লাহ এবং সৃষ্টির কাছে অবশ্যই লজ্জিত হবে। আশা করি এই সদ্ব্যবহারের কারণে তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং পুনরায় বিদ্রোহ করবে না।"

এই অভিযান থেকে ফিরে সুলতান প্রশাসনিকভাবে কেবল এই পরিবর্তনটি করেন যে, মালিক ছাজ্জুর জায়গির (কারা ও মানিকপুর) তার ভাতিজা আলাউদ্দিন খলজির হাতে তুলে দেন এবং তার ভাই আলমাস বেগকে "আখুর বেগ" পদ প্রদান করেন।

যা-ই হোক, বিদ্রোহীদের ব্যাপারে সুলতানের এই আশা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। এই লোকেরা আর কখনও বিদ্রোহ করেনি এবং সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। [১]

ঠগ ও লুটেরাদের সাথে আচরণ:

সেই সময়ে সুলতানের কর্মকর্তারা বিভিন্ন স্থানে ঠগ ও লুটেরাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রায় এক হাজার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু যখন তারা সুলতানের সামনে অনুশোচনা প্রকাশ করল এবং তওবা করে ভালো থাকার প্রতিশ্রুতি দিল, তখন সুলতান এখানেও ক্ষমা ও উদারতার পরিচয় দিলেন এবং তাদের নৌকায় বসিয়ে গঙ্গা নদীর নিম্নাঞ্চলের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী লখনৌতির সীমান্তের কাছে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়।

সুলতানের এই মাত্রার নমনীয়তা বিচক্ষণতার পরিপন্থী ছিল, ফলে এরপর চোর ও লুটেরাদের সাহস অনেক বেড়ে যায় এবং তারা বিভিন্ন স্থানে নির্ভয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। [২]

সুলতানের বিরুদ্ধে আমিরদের জোট:

সুলতান জালালউদ্দিন খলজির এই নমনীয়তায় কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আমির অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তারা সুলতানকে কাপুরুষ হিসেবে প্রচার করতে শুরু করেন। একবার এমনই কিছু বিদ্রোহী আমির মদ্যপানের আসর বসান এবং সেখানে সুলতানের বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলতে শুরু করেন। একজন বলল: "আমি এই খঞ্জর দিয়ে সুলতানের ফয়সালা করে দেব।"

দ্বিতীয়জন বলল: "আমি তলোয়ার দিয়ে সুলতানকে দুই টুকরো করে দেব।"

সুলতানের কিছু অনুগত ব্যক্তি তাকে এই মজলিসের খবর পৌঁছে দেন। সুলতান সেই আমিরদের একত্রিত করেন, তাদের সামনে একটি তলোয়ার রাখেন এবং গর্জে উঠে বলেন: "যদি কেউ পুরুষ থাকে তবে এখনই আমার সাথে বীরত্বের সাথে লড়াই করে দেখাক। অন্যথায় আজেবাজে বকে কী লাভ?"

এ কথা শুনে সবাই মাথা নিচু করে ফেলল। তাদের মধ্যে একজন রসিক স্বভাবের আমির মালিক নুসরাত সাবাহ আরজ করলেন:

"হুজুর! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মানুষ মুখ দিয়ে এমন কথা বের করেই ফেলে। আমরা যদি আপনার মতো একজন মনিবকে কোনো ক্ষতি পৌঁছাই, যিনি আমাদের সন্তানের মতো লালন-পালন করছেন, তবে আপনার মতো পিতা আর কোথায় পাব? আর আপনি যদি আমাদের মতো নিমকখোর সন্তানদের আজেবাজে কথার জন্যও শাস্তি দিতে শুরু করেন, তবে আমাদের মতো নিমকখোর আবার কোথায় পাবেন?"

সুলতান এ কথা শুনে হেসে দিলেন। তার রাগ ঠান্ডা হয়ে গেল এবং তিনি আর কিছু না বলে সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ১৮১-১৮৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৬৩, ৬৫, ৭০; তারিখ-ই-ফেরেশতা (ফারসি): পৃ. ৩২১, ৩২২।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ১৮৯, ১৯০।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ১৮৭-১৮৯; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ: খণ্ড ২, পৃ. ৯-১১।

https://t.me/BoierSomahar

সিদি মওলার ঘটনা:

সেই দিনগুলোতে সিদি মওলা নামে একজন সুফি দিল্লিতে থাকতেন। তাঁর মূল সম্পর্ক ছিল জুরজান থেকে। সেখান থেকে পাকপত্তন এসে বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহ.-এর নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করেন এবং বাইয়াতের অনুমতি লাভ করেন। এরপর তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, দিল্লিতে গিয়ে তাজকিয়া ও সুলুকের ধারা জারি করবেন এবং দরবেশ ও অভাবীদের সাহায্য করবেন। বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহ. এর অনুমতি দেন, তবে সাথে সাথে এই তাকিদও করেন যে, সালতানাতের আমিরদের সাথে মেলামেশা না বাড়াতে, অন্যথায় ফিতনায় পড়ে যাবেন।

সিদি মওলা সুলতান মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদের যুগে দিল্লিতে আসেন এবং একটি বিশাল খানকাহ নির্মাণ করেন, যেখানে হাজার হাজার মুরিদ জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতে শুরু করেন। সিদি মওলা মসজিদে জামাতের সাথে নামাজে উপস্থিত হতেন না, বরং নামাজ নিজের ঘরেই আদায় করতেন। ইবাদত ও রিয়াজতে নিমগ্ন থাকতেন। বিয়ে করেননি। অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন এবং খাবারও খুব সামান্য গ্রহণ করতেন, কিন্তু অন্যদিকে গরিব, ফকির এবং মেহমানদের খুব আপ্যায়ন করতেন। মেহমানদের সব ধরনের সুস্বাদু খাবার ও পানীয় পরিবেশন করতেন। খিদমতের জন্য প্রচুর চাকর-বাকর তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর লঙ্গরখানায় সাধারণত প্রতিদিন এক হাজার মণ আটা, চল্লিশ মণ চিনি, পাঁচশ মণ গোশত এবং কয়েক মণ ঘি ব্যবহৃত হতো। শরীফ এবং সালতানাতের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তাঁর কাছে আসতেন। বিশেষ করে সুলতান বলবনের পুরনো আমিরগণ যাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল, তারা তাঁর মুরিদ ছিলেন। স্বয়ং সুলতান জালাল উদ্দিন খিলজির উত্তরাধিকারী শাহজাদা খান-ই-خانানও তাঁর ভক্ত ছিলেন।

সিদি মওলা সম্মানিত মেহমানদের কখনো কখনো উপহার হিসেবে তিন তিন হাজার আশরাফির থলি দিয়ে দিতেন। মানুষ অবাক হতো যে, তাঁর কাছে এত সম্পদ কোথা থেকে আসে। কিছু লোক বলত যে, তিনি 'কিমিয়া' (জড়িবুটি ও ধাতু মিশিয়ে সোনা তৈরি করা) জানেন।

এই সময়েই কাজী জালাল উদ্দিন কাশানি নামক এক ব্যক্তি সিদি মওলার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি খানকাহতে অনেক দিন অবস্থান করতেন। তাঁর ইলম ও ফজল এবং বাগ্মিতায় সিদি মওলা খুব প্রভাবিত ছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি হিন্দুস্তানে একটি ইসলামি বিপ্লবকে আবশ্যক ঘোষণা করে সিদি মওলাকে ক্ষমতা দখলের প্ররোচনা দিতে শুরু করেন। সিদি মওলা তাঁর যুক্তিতে আশ্বস্ত হন। বলবনের অনেক আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা সিদি মওলার মুরিদ ছিলেন, তাদেরও এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটিও ঠিক করা হয় যে, সুলতানকে হত্যার পর সিদির দশ হাজার মুরিদ তাদের পীরকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেবেন। শহরের দুই হিন্দু অফিসার: হাতিয়া পাইক এবং নিরঞ্জন সুলতানকে হত্যার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। যা-ই হোক, সুলতান গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে যান যে, সিদি মওলার নেতৃত্বে বিদ্রোহের পরিকল্পনা হচ্ছে এবং সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র প্রস্তুত।

সুলতান এটি শুনে রাগান্বিত হলেন। প্রথমবারের মতো তিনি কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিলেন। যে বলবনি শরীফদের নাম এই ষড়যন্ত্রে আসছিল, তাদের শহর থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। হামলার দায়িত্ব নেওয়া দুই হিন্দু অফিসারকে হত্যা করালেন এবং কাজী কাশানিকে বদায়ূনের কাজী বানিয়ে রাজধানী থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর সুলতান সিদি মওলাকে তলব করলেন এবং নিজের প্রাসাদের প্রাঙ্গণে...

রাজকীয় চত্বরের কাছে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করলেন কিন্তু সুলতান সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সেই সময় সেখানে অন্য একজন সুফি শেখ আবু বকর তুসি হায়দারিও উপস্থিত ছিলেন। সুলতান তাকে সম্বোধন করে বললেন: "দেখুন তো! এই দরবেশ সিদি মাওলা আমার সাথে কী আচরণ করেছে এবং আমার দেশে ফিতনা ছড়ানোর জন্য কীভাবে পরিকল্পনা করেছে! এখন আমি ইনসাফ আপনার হাতে দিচ্ছি। আমাকে ইনসাফ পাইয়ে দিন।"

এ কথা শুনেই আবু বকর হায়দারির এক মুরিদ উত্তেজিত হয়ে ছুরি দিয়ে সিদি মাওলার ওপর হামলা করল এবং একের পর এক আঘাত করল। কয়েকটি আঘাত পেয়ে সিদি মাওলা সুলতানকে সম্বোধন করে বললেন: "আমার নিজের মৃত্যুর জন্য কোনো দুঃখ নেই, তবে আমার রক্ত বৃথা যাবে না।"

সুলতান তখনও সিদিকে হত্যা করার আদেশ দেননি, তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং সম্ভবত তার মনে দয়া আসত, কিন্তু এরই মধ্যে সুলতানের ছেলে আরকালি খান হস্তক্ষেপ করলেন। আসলে তিনি তার বড় ভাই খান-ই-খানানের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং যেহেতু খান-ই-খানান সিদি মাওলার মুরিদ ছিলেন, তাই আরকালি খানের সিদি মাওলার প্রতিও ঘৃণা ছিল। ফলে তার ইশারায় মাহুত একটি মত্ত হাতিকে সিদি মাওলার ওপর ছেড়ে দিল। সেই বিশালদেহী প্রাণীটি মুহূর্তের মধ্যে সিদি মাওলাকে পিষে মেরে ফেলল।

সিদি মাওলার হত্যাকাণ্ডে সুলতানের সুনাম ও দয়ালু হিসেবে খ্যাতির ক্ষতি হলো। নিশ্চিতভাবেই সিদি মাওলা একটি বড় ভুল করেছিলেন এবং এই ভুলের কারণ ছিল যে, তিনি তার শেখ বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহ.-এর নসিহত উপেক্ষা করে সালতানাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও আমিরদের সাথে সম্পর্ক বাড়িয়েছিলেন এবং এই লোকেরাই তাকে ফিতনায় লিপ্ত করেছিল, কিন্তু কার্যত তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেননি বরং তার আগেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাই সুলতানের উচিত ছিল কেবল প্রয়োজনীয় শাসন ও তিরস্কারের (যেমন কারাদণ্ড) ওপর সীমাবদ্ধ থাকা অথবা তাদের বিষয়টি শরয়ি আদালত ও কাজিদের হাতে সোপর্দ করা।

এই বিষয়ে সুলতানের আবেগতাড়িত হওয়া এবং নিজের সামনে সিদি মাওলাকে নির্মমভাবে খুন হতে দেখেও তাতে কোনো বাধা না দেওয়া এমন একটি দৃশ্য যা যে কারো মনে আঘাত দেয়। সম্ভবত এখান থেকেই সুলতানের পতন শুরু হয়েছিল। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর লেখক আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানি রহ.-এর বর্ণনা হলো, যেদিন সিদি মাওলা নিহত হন, সেদিন আমি দিল্লিতে ছিলাম। সিদি মাওলার হত্যার পর সেদিনই দিল্লিতে একটি কালো ধূলিঝড় আসে এবং দিনের বেলাতেই রাতের অন্ধকার নেমে আসে। সেদিনই সুলতানের উত্তরাধিকারী শাহজাদা খান-ই-খানানের শরীর খারাপ হয়ে যায়। অসুস্থতা এতটাই বেড়ে যায় যে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই শাহজাদা ইন্তেকাল করেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ২০৮ থেকে ২১২; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩২৭ থেকে ৩৩২।

কিছু ইতিহাস অনুযায়ী শাহজাদা খান-ই-খানানের মৃত্যু সিদি মাওলার হত্যাকাণ্ডের আগেই হয়েছিল এবং কিছু ব্যক্তি একে এই কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, যদি শাহজাদা খান-ই-খানান জীবিত থাকতেন তবে তিনি অবশ্যই সিদি মাওলাকে বাঁচাতেন কারণ তিনি তার মুরিদ ছিলেন। কিন্তু আল্লামা বারানি এই ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাই তার বর্ণনাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শাহজাদা খান-ই-খানানের হস্তক্ষেপ না করার কারণ হতে পারে যে তিনি সময়মতো খবর পাননি। কারণ সিদি মাওলাকে তলব করে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পরই হত্যা করা হয়েছিল। হতে পারে সেই সময় উত্তরাধিকারী কোনো কাজের কারণে ঘটনাস্থল থেকে এত দূরে ছিলেন যে এত অল্প সময়ে তাকে জানানো এবং ডেকে আনা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং পরে যখন এই খবর পান, তখন সেই শোকেই তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

রাজপুতানা অভিযান

শাহজাদা খান খানার মৃত্যু সুলতানের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। এই শোকের রেশ কাটতে না কাটতেই তাকে রাজপুতানার হিন্দু রাজাদের সাধারণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। এরা ছিল মান্দোর, ঝাইন, মালব, রণথম্ভোর এবং উজ্জয়িনীর যোদ্ধা রাজপুত, যারা সুলতানের কোমলতার সুযোগ নিয়ে অবাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাদের বিদ্রোহের ঘোষণা শুনে জালালুদ্দিন খিলজি তার পুত্র আরকালি খানকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে তাকে দিল্লিতে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন এবং বিদ্রোহীদের দমনের জন্য নিজেই সসৈন্যে অভিযান পরিচালনা করেন।

সুলতানি বাহিনী প্রথমে 'ঝাইন' [১] পৌঁছায়, যা জয় করে প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করা হয়।

এরপর বাহিনী মালবে প্রবেশ করে যেখানে সুলতান বেশ কিছু মন্দির ধ্বংস করেন। এরপর সুলতান রণথম্ভোর দুর্গে পৌঁছান এবং তা অবরোধ করেন, কিন্তু শীঘ্রই সুলতান বুঝতে পারেন যে দুর্গটি অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় এবং এটি জয় করতে দীর্ঘ সময় এবং জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। ফলে সুলতান ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং বলেন:

"এটি জয়ের প্রচেষ্টায় কত শিশু এতিম হবে এবং কত নারী বিধবা হবে। এই দুর্গের খাতিরে কোনো মুসলমানের শরীরের একটি পশমও নষ্ট করা উচিত নয়।"

আমিরগণ সুলতানের এই ভাবনাকে আবেগপ্রসূত এবং রাজনীতি-বিরোধী মনে করেন এবং এর সাথে একমত হননি। আহমদ হাবিব বলেন:

"বিজয়ীরা তাদের অভিযানে এসব বিষয় বিবেচনায় আনেন না। আমরা যদি এভাবে ফিরে যাই তবে রাজকীয় প্রতাপ ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে। এভাবে ফিরে আসা বিশ্বজয়ের নীতির পরিপন্থী।"

সুলতান উত্তর দিলেন: "আমি পূর্ববর্তী বাদশাহদের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত এবং বিশ্বজয়ের আদব-কায়দা জানি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন তা এক জিনিস, আর জালেম ও স্বৈরাচারী বাদশাহ এবং ফেরাউনরা যা করেছে তা অন্য জিনিস। মুক্তি তো নবীদের পথেই রয়েছে। আমি যা করছি তা বাদশাহ হিসেবে নয়, বরং একজন মুসলমান হিসেবে করছি।"

আহমদ হাবিব বললেন: "আমাদের সুলতান মাহমুদ গজনভি এবং সুলতান সাঞ্জারের মতো বাদশাহদের অনুসরণ করা উচিত যারা দ্বীনে মুহাম্মাদীর খাদেম ছিলেন।" সুলতান বললেন: "সুলতান মাহমুদ এবং সুলতান সাঞ্জার নিঃসন্দেহে ইসলামপ্রিয় এবং দ্বীনদার ছিলেন, কিন্তু তাদের মতো সহযোগী এবং তাদের মতো শক্তি ও শৌর্যবীর্য আমি কোথায় পাব যে তাদের অনুকরণ করতে পারব।"

পরিশেষে রাজকীয় বাহিনী রণথম্ভোর অবরোধ ত্যাগ করে ফিরে আসে। এগুলো ৬৯০ হিজরি (১২৯১ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [২]

তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ

সুলতান এই অভিযানগুলো থেকে মাত্র অবসর নিয়েছেন এমন সময় তাতারীদের বিপদ ঘনিয়ে আসে, যারা হালাকু খানের নাতি 'আলগুন খান'

---

[১] ঝাইন বা ঝাইনের দুর্গ রণথম্ভোর দুর্গে পৌঁছানোর পথে একটি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে ছিল। বর্তমান যুগে এটি 'ছান' নামে পরিচিত, যা রাজস্থানের রণথম্ভোরের কাছে অবস্থিত।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ২১৩ থেকে ২১৮; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮ থেকে ২০।

https://t.me/BoierSomahar

...নেতৃত্বে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা এক থেকে দেড় লক্ষ পর্যন্ত বলা হচ্ছিল।

সুলতান জালালুদ্দিন খিলজি সম্প্রতি তার পুত্র আরকালি খানকে মুলতানের সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এই সংবাদ শুনে তিনি একটি শক্তিশালী লস্কর প্রস্তুত করেন এবং কমান্ড গ্রহণ করে নিজেই জিহাদের জন্য বের হন। তার জীবনের অধিকাংশ সময় পাঞ্জাবের সীমান্ত মঙ্গোলদের হাত থেকে নিরাপদ রাখতে অতিবাহিত হয়েছিল, সম্ভবত নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য তিনি নিজেই অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া উপযুক্ত মনে করেছিলেন।

উভয় লস্কর 'বাররাম' নামক স্থানে মুখোমুখি হয়। মাঝখানে একটি নদী ছিল। উভয় পক্ষ কয়েক দিন পর্যন্ত পরিখা খনন করে একে অপরের ওপর তীর নিক্ষেপ ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে। [১]

অবশেষে একদিন উভয় লস্কর খোলা ময়দানের দিকে বেরিয়ে আসে। দিল্লি লস্করের অগ্রবর্তী দল আক্রমণ চালিয়ে মঙ্গোল লস্করের অগ্রবর্তী দলের কাছে পৌঁছে যায় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সংঘর্ষ হয় যাতে খিলজি সৈন্যরা বিজয়ী হয় এবং অনেক তাতারীকে বন্দি করে নিয়ে আসে।

পরের দিন মঙ্গোলরা নদী পার হয়ে যায় এবং পুরো শক্তি ময়দানে ঢেলে দেয়। সুলতান জালালুদ্দিন খিলজি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবিলা করেন এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দুই হাজার তাতারী অফিসারকে জীবিত বন্দি করেন।

বিজয়ের পর তিনি বন্দিদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেন। এই সময়ে কিছু আমিরের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির আলোচনা শুরু হয়। জালালুদ্দিন খিলজি চেঙ্গিস খানের নাতিকে, যে পরাজিত হয়ে কিছু দূরে অবস্থান করছিল, পুত্র বলে সম্বোধন করেন এবং সে উত্তরে খিলজিকে পিতা বলে সম্বোধন করে। উভয় পক্ষের মধ্যে উপহার বিনিময় হয় যার পর তাতারী লস্কর ফিরে যায়। এটি ৬৯১ হিজরি (১২৯২ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা।

কিছুকাল পর আলঘু খান সুলতানের উত্তম ব্যবহার দেখে তার লস্করসহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সুলতান তাকে সম্মান দিয়ে নিজের জামাতা বানিয়ে নেন। তার নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ। আলঘু খান ও তার সঙ্গীদের দিল্লির উপকণ্ঠে পুনর্বাসিত করা হয় যাকে 'গিয়াসপুর' বলা হতো, পরবর্তীতে একে মুঘলপুরা বলা হতে থাকে। আলঘু খানের দাফনও এখানেই হয়েছিল। সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজারও এখানেই অবস্থিত এবং তার পবিত্র নামের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এখন এই এলাকা বস্তি নিজামুদ্দিন নামে পরিচিত। [২]

মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ

সুলতান অফিসার থাকাকালীন সময়েও মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ লড়েছিলেন। এখন তাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিজয়ের পর তার মনে ইচ্ছা জাগল যে তাকে 'মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ' উপাধি দেওয়া হোক। কিন্তু এই ইচ্ছার কথা তিনি নিজের মুখে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না, তাই নিজের স্ত্রী মালিকা-ই-জাহানকে বললেন যেন তিনি এই বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যান। ফলে রানীর উৎসাহ ও অনুরোধে উলামা ও কাজিগণ এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে সুলতানের খিদমতের কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবায় তার নাম...

---

[১] 'বাররাম' নামক স্থানটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত এই যুদ্ধ লাহোরের কাছে হয়েছিল এবং এই নদী বলতে রাভি নদী বোঝানো হতে পারে।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৪, ৩৩৫; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ২১৮, ২১৯; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৯।

এর সাথে এই নতুন উপাধি ‘মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ’ও যুক্ত করা হবে।

এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুমোদনের জন্য উলামা ও কাজীগণ একদিন সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন:

“আমাদের ইচ্ছা যে এখন থেকে খুতবাগুলোতে আপনাকে মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ বলা হোক।”

সুলতান এটি শুনে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: “মালিকার সামনে আমি নিজেই আমার এই ইচ্ছার কথা উল্লেখ করেছিলাম এবং সেই ভিত্তিতেই মালিকা আপনাদের রাজি করিয়েছেন। কিন্তু পরে চিন্তা করে আমি বুঝতে পারলাম যে আমি এই খেতাবের মোটেও যোগ্য নই। কোনো যুদ্ধে আমার নিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য খাঁটি ছিল না, বরং সর্বদা খ্যাতি এবং সুলতান বলবনের দৃষ্টিতে সম্মানই লক্ষ্য ছিল।”

উলামাগণ সুলতানের এই সন্দেহ দূর করার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সুলতান মানলেন না এবং এই খেতাবের অনুমতি দিলেন না। [১]

‘মান্দাওয়ার’ অভিযান:

‘মান্দাওয়ার’ রাজপুতানার উত্তর সীমান্তে চৌহান বংশের হিন্দু রাজাদের অত্যন্ত সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। ৬৯২ হিজরি (১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে এই রাজারা বিদ্রোহ করে। ফলে সুলতান বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করে ‘মান্দাওয়ার’ পৌঁছান এবং সেটি অবরোধ করেন।

অবরোধ চলাকালীন সুলতানের কিছু আমির তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে যার খবর সুলতান সাথে সাথেই পেয়ে যান। পরের দিন তাদের তলব করে বললেন: “এই সালতানাত আমাকে আল্লাহ দিয়েছেন, আমরা দেইনি। তাই তোমরা এটি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতেও পারবে না। আমি তোমাদের ওপর এমন কী জুলুম করেছি যে তোমরা এই ধরনের কথা চিন্তা করছ।”

এরপর ষড়যন্ত্রকারী আমিরদের বরখাস্ত করে তাদের স্থলে অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করে দিলেন।

‘মান্দাওয়ার’ কয়েক সপ্তাহের অবরোধের পর বিজয়ী হয়। এই অভিযান তখনও অসম্পূর্ণ ছিল কিন্তু সুলতানকে দিল্লি ফিরে যেতে হয়। [২]

দেওগিরি বিজয়:

সে দিনগুলোতে জালালুদ্দিন খলজির ভাতিজা আলী হঠাৎ করে সামনে উঠে আসে। তার পুরো নাম ছিল ‘আলী গুরশাস্প’। (পরবর্তীতে তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খলজি নামে পরিচিত হন।) তিনি সুলতানের বড় ভাই শিহাবুদ্দিন মাসউদের বড় ছেলে ছিলেন। সুলতান নিজের সন্তানদের মতো তার শিক্ষা ও লালন-পালনের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং যখন সে যুবক হলো তখন তাকে নিজের জামাতা বানিয়ে নিলেন। তিনি সামরিক অভিযানের অনুরাগী, চতুর এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সুলতান যখন মালিক ছাজ্জুকে বিদ্রোহের কারণে ‘কারা’-এর সুবাদারি থেকে বরখাস্ত করলেন, তখন নিজের এই ভাতিজাকে সেই এলাকার ওয়ালি বানিয়ে দিলেন। ‘কারা’-এর সুবাদারি তার খুব পছন্দ হয়েছিল কারণ তিনি তার শ্বশুর ও শাশুড়ি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন যাতে তার ওপর কারো চাপ না থাকে। কারা-তে তিনি মালিক ছাজ্জুর প্রাক্তন সঙ্গীদেরও দেখা পান যারা ছিল مفسد ও ফিতনাবাজ। ওদিকে সিদি মাওলার হত্যার পর ফখরুদ্দিন কোতয়ালের বেশ কিছু ষড়যন্ত্রকারী সহচরও ‘কারা’-তে আলীর চারপাশে সমবেত হয়েছিল। এই লোকেরা তাকে কেন্দ্রের ওপর আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে থাকত। [৩]

---

[১] তারিখ ফিরোজ শাহী: পৃ. ১৯৬, ১৯৭; তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩২৭

[২] তারিখ মুবারক শাহী: পৃ. ৬৫, ৬৬; তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩৩৫

[৩] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩১৯, ৩২৩, ৩২৪

তবে আলী অত্যন্ত চতুরতার সাথে নিজের সংকল্প গোপন রেখেছিলেন। 'মান্দাওয়ার' অভিযানের পর ৬৯৩ হিজরি (১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আলী 'ভিলসান' আক্রমণ করেন এবং কাউকে প্রতিরোধের সুযোগ না দিয়েই বেশ কিছু দুর্গ ও মন্দির দখল করেন। সেখান থেকে অসংখ্য ধাতব মূর্তি, সোনা-রূপার ভাণ্ডার এবং গবাদি পশু সংগ্রহ করে সুলতানের দরবারে পেশ করেন। তার এই সাফল্যে খুশি হয়ে সুলতান তার জায়গিরের সাথে অযোধ্যা যুক্ত করে দেন। [১]

আলী ভিলসান অভিযান থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পেশ করে সুলতানের সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তিনি সুলতানের কাছ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি গোপন রেখেছিলেন যা তিনি অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন; অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের জাদুকরী সম্পদ, সেখানকার দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং সেখানকার দুর্গগুলোতে পৌঁছানোর পরিচিত ও গোপন পথগুলোর বিবরণ।

এই বিবরণগুলো থেকেই আলী জানতে পেরেছিলেন যে, দেবগিরিতে [২] অপরিমিত সম্পদ রয়েছে যা বংশপরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু এই শহরের দুর্গ পর্যন্ত যাওয়ার পথ এতটাই দুর্গম ছিল যে, কয়েক শতাব্দী ধরে কোনো বিজয়ী সেখানে আক্রমণ করার সাহস করেনি। দিল্লির তুলনায় সমুদ্রপথের কাছাকাছি হওয়ার কারণে এখানকার শাসকদের জন্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বাণিজ্য বিস্তার করা সহজ ছিল। এভাবে তারা বিপুল পরিমাণ পুঁজি গড়ে তুলেছিলেন যা বড় বড় সাম্রাজ্যের কোষাগারের চেয়েও বেশি ছিল।

আলী ৬৯৪ হিজরি (১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) সালে দেবগিরি আক্রমণের পরিকল্পনা শুরু করেন। পরের বছর তিন-চার হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি 'কারা' থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটারের সফর শুরু করেন। তবে তিনি নিজের যাত্রাকে অত্যন্ত গোপন রাখেন, এমনকি তার প্রভু সুলতান জালালুদ্দিন খিলজিকেও অবহিত করেননি; বরং তার কাছে কেবল এটি প্রকাশ করেন যে, তিনি হিন্দুদের রাজ্য 'চান্দেরি'র [৩] ওপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু করছেন।

তিনি প্রধান রাজপথ ছেড়ে বন-জঙ্গল ও পাহাড়ের সংক্ষিপ্ত কিন্তু দুর্গম ও কঠিন পথ বেছে নেন। পথে তিনি বিভিন্ন স্থানে শিকার করতে করতে বিরতি নিতেন। ফলে মাঝখানের ছোট ছোট হিন্দু রাজ্যের রাজারা মনে করেছিলেন যে, এটি কোনো রাজপুত্র যে শিকারে বের হয়েছে। দেবগিরি থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ কিলোমিটার দূরে 'এলিচপুর' (অচলপুর)-এ অবস্থানকালে নিজের পরিচয় আরও গোপন রাখার জন্য তিনি এটিও প্রচার করে দেন যে, তিনি একজন মুসলিম রাজপুত্র যিনি দিল্লির...

---

[১] তারিখ ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৩৫; তারিখ ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃষ্ঠা ২১৮

[২] 'দেবগিরি'কে 'দেবগড়'ও বলা হয়। এই দুর্গ এবং এর সংলগ্ন শহরটি ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের আওরঙ্গবাদ শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এর উত্তরে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার দূরে দিল্লি, পশ্চিমে ৩২০ কিলোমিটার দূরে মুম্বাই এবং উত্তর-পশ্চিমে ৪৬০ কিলোমিটার দূরে সুরাট বন্দর অবস্থিত। দুর্গটি তার অনন্য সামরিক কৌশল, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং জটিল প্রবেশপথের জন্য বিখ্যাত। এটি যাদব বংশের রাজধানী ছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা ভিল্লাম পঞ্চম এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবগিরি শব্দের অর্থ হলো দেবতাদের পাহাড়। দিল্লির সুলতানরা এটি জয় করে এর নাম দৌলতাবাদ রেখেছিলেন। তবে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে মহারাষ্ট্র সরকার এর নাম পুনরায় 'দেবগিরি' রাখে। বর্তমানে এটি মহারাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র।

[৩] চান্দেরি ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অশোকনগর জেলায় অবস্থিত। এটি মালব ও বুন্দেলখণ্ডের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এটি দিল্লির দক্ষিণে প্রায় ৭০৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সুলতানের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এই দিকে আসছে এবং তেলেঙ্গানার রাজা রাজমন্দুরীর চাকরি করতে চায়। এই গুজবে বিশ্বাস করে কেউ এই বাহিনীকে বাধা দেয়নি।

এর পর আলী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে দেবগিরির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। এখানকার রাজা রামদেব যখন হঠাৎ এই বিপদের খবর পেলেন, তখন তিনি প্রতিরোধের জন্য তিন হাজার সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু এই হিন্দুরা মুসলমানদের যুদ্ধের পদ্ধতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল, তাই দেবগিরি থেকে ছয় মাইল দূরে হওয়া প্রথম সংঘর্ষেই মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই তাদের পা উপড়ে গেল এবং তারা পিছু হটল। আলী তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং দেবগিরি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। শহরটি কোনো বড় ধরনের সময় ব্যয় ছাড়াই দখল করে নেওয়া হলো। যখন রাজা রামদেব দেবগিরির মজবুত দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন, আলী শহরের ব্যবসায়ী ও মহাজনদের বন্দী করলেন এবং চল্লিশটি হাতি ও কয়েক হাজার ঘোড়া নিজের দখলে নিয়ে নিলেন এবং এই গুজব ছড়িয়ে দিলেন যে মুসলমানদের আরও একটি বড় বাহিনী এই দিকেই আসছে।

দুর্গে অবরুদ্ধ রাজা এই পরিস্থিতি দেখে আলীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন এবং সাথে সাথে তাকে সতর্ক করলেন যে অদূর ভবিষ্যতে মালবের রাজা চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এখানে চলে আসবেন এবং যদি তার সাথে খানদেশ ও অন্যান্য শহরের রাজারাও যোগ দেন, তবে তোমরা এই বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে না। তাই ভালো হয় যে তোমরা যেসব ব্যবসায়ীকে বন্দী করেছ, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও এবং ফিরে যাও। আলী এটাকে উপযুক্ত মনে করলেন এবং বন্দী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পঞ্চাশ মণ সোনা, কয়েক মণ মুক্তা এবং মূল্যবান কাপড় নিয়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

আলীর আক্রমণের আগে রাজা রামদেবের ছেলে রাজকুমার 'সিংঘানা' কোনো অভিযানে গিয়েছিলেন এবং এখন ফিরে আসছিলেন। যখন তিনি পরিস্থিতি জানতে পারলেন, তখন তিনি নিজের সৈন্য নিয়ে শহর থেকে নয় মাইল দূরে আলীর পথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ব্যুহ রচনা করতে লাগলেন। রামদেব তার ছেলের এই পদক্ষেপে উদ্বিগ্ন হলেন এবং তাকে বোঝানোর জন্য দূত পাঠালেন যে মুসলমানদের সাথে লড়াই করা তার জন্য ক্ষতিকর হবে। কিন্তু রাজকুমার জানতে পেরেছিলেন যে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা তার সৈন্য সংখ্যার অর্ধেক, তাই তিনি অহংকারে এসে বাবার পরামর্শ গ্রহণ করলেন না এবং আলীকে বার্তা পাঠালেন:

"যদি মঙ্গল চাও, তবে আমাদের প্রজাদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পদ ও মালামাল ছিনিয়ে নিয়েছ, তা ফেরত দিয়ে নিজের দেশে চলে যাও।"

এই বার্তা শুনে আলীর এত রাগ হলো যে তিনি রাজকুমারের দূতের মুখ কালো করে তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে পুরো শহরে ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মালিক নুসরাতকে এক হাজার সৈন্যের সাথে দুর্গের অবরোধে রেখে নিজে বাকি সৈন্য নিয়ে রাজকুমারের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়লেন। এখানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হলো যাতে হিন্দুরাও অত্যন্ত জোশ ও খরোশের সাথে লড়াই করল। প্রায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে তারা তাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে বিজয়ী হয়ে যেত, এমন সময় মালিক নুসরাত দুর্গের অবরোধ ছেড়ে এক হাজার সৈন্য নিয়ে আলীর সাহায্যে চলে এলেন। রাজকুমারের বাহিনী মনে করল যে এটি মুসলমানদের সেই বিশাল বাহিনী যার আগমনের গুজব আলী কিছুদিন আগেই ছড়িয়েছিলেন। ফলে হিন্দুদের পা উপড়ে গেল, অনেকে নিহত হলো এবং অনেকে বন্দী হলো। আলী বিজয়ী হয়ে দেবগিরি শহরে ফিরে এলেন এবং পুনরায় দুর্গের অবরোধ কঠোর করে দিলেন। অবশেষে দুর্গে খাদ্যের অভাব দেখা দিল এবং রামদেব...

নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো। সে আলোচনার জন্য দূত পাঠাল। পারস্পরিক আলোচনায় এই বিষয়গুলো স্থির হলো:

- রামদেব ছয়শ মণ সোনা, সাত মণ মুক্তা, দুই মণ লাল (চুনি), ইয়াকুত, আলমাস (হীরা) ও যমরুদ (পান্না), এক হাজার মণ রূপা এবং চার হাজার রেশমি থান প্রদান করবে।
- ইলিচপুর প্রদেশ আলীর হাতে তুলে দেওয়া হবে অথবা এর বার্ষিক রাজস্ব আলীর কাছে পাঠানো হবে।
- আলী সমস্ত হিন্দু বন্দীদের মুক্তি দেবে এবং যে সেনাবাহিনী দিল্লি থেকে এদিকে আসছে, তাদের পথ থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দেবে।
- আলী রামদেব ও দিল্লির সুলতানের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়ে দেবে যাতে ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের মধ্যে আর কখনো যুদ্ধ না হয়।

মোদ্দা কথা, আলী পঁচিশ দিনের অবরোধের পর বিজয়ী হয়ে যখন ফিরে চলল, তখন তার কাছে সম্পদের এত বিশাল স্তূপ ছিল যা দিল্লির সুলতানদের ভাগ্যেও জোটেনি। [১] এই অভিযান ৬৯৫ হিজরি (১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সম্পন্ন হয়।

আলী গুরশাস্পের ষড়যন্ত্র - সুলতানের হত্যাকাণ্ড:

আলী গুরশাস্পের গোপনীয়তা সত্ত্বেও সুলতান জালালুদ্দিন খিলজি দিল্লিতে একেবারেই বেখবর ছিলেন না। আলীর এই বীরত্বগাথার খবর তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। নিজের সাহসী ভাতিজার এই গোপনীয়তায় তিনি কিছুটা দুঃখিত হলেও পরে এই আনন্দে সেই দুঃখ দূর হয়ে গেল যে, এত বড় ধনভাণ্ডার শীঘ্রই দিল্লিতে আসতে চলেছে। তার বিশ্বাস ছিল যে, বিজয়ী ভাতিজা কেবল সামরিক প্রয়োজনেই এই গোপনীয়তা অবলম্বন করেছে এবং এখন যেহেতু বিজয় অর্জিত হয়েছে, এই অনুগত ভাতিজা তার জায়গির ‘কড়া’-তে যাওয়ার আগে অবশ্যই দিল্লিতে আসতে চাইবে। এই সুধারণার বশবর্তী হয়ে ৬৯৬ হিজরির শুরুতে জালালুদ্দিন খিলজি শিকারের অজুহাতে দিল্লি থেকে বের হয়ে গোয়ালিয়র পর্যন্ত চলে আসেন, কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ভাতিজার সাথে দেখা করে এই বিজয়ের জন্য তাকে অভিনন্দন জানানো।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গোয়েন্দারা বাদশাহকে জানাল যে, আলী দেবগিরির ধনসম্পদ গুটিয়ে সরাসরি ‘কড়া’-র দিকে যাচ্ছে।

এবার সুলতান সন্দিহান হলেন এবং তিনি উপদেষ্টাদের তলব করে জিজ্ঞেস করলেন যে, এখন কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

আহমদ হাবিব অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং আলীর স্বভাব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, তাই তিনি আরজ করলেন:

“ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সর্বদা অবাধ্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আলীর চারপাশে সেই সব লোকই সমবেত হয়েছে যারা মালিক ছজ্জুকে প্ররোচিত করে বিদ্রোহে লিপ্ত করেছিল। তাদের পরামর্শেই আলী বাদশাহর অনুমতি ও সংবাদ দেওয়া ছাড়াই এই অভিযান সম্পন্ন করেছে। যদি সে এই অমূল্য ধনভাণ্ডার নিয়ে কড়া পৌঁছে যায়, তবে ফলাফল ভালো হবে না। অতএব আপনার উচিত হবে অগ্রসর হয়ে চান্দেরি পর্যন্ত যাওয়া, যা আলীর কাফেলার পথে অবস্থিত। তার সেনাবাহিনী দীর্ঘ অভিযানের কারণে ক্লান্ত এবং ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রে ভারাক্রান্ত। নিশ্চিতভাবেই সে আপনার মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারবে না এবং সমস্ত ধন-সম্পদ তাকে আপনার নজরানা হিসেবে পেশ করতে হবে। এরপর আপনি চাইলে তার জায়গির বৃদ্ধি করে দিতে পারেন অথবা চাইলে তাকে দিল্লিতে আপনার কাছে রেখে দিতে পারেন।”

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা (ফারসি): পৃ. ৩৩৬ থেকে ৩৪০; তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (বারানি): পৃ. ২২১ থেকে ২২৩।

বাদশাহর এই স্পষ্টবাদিতা পছন্দ হলো না, তাই অন্য এক অফিসার ফখরুদ্দিন কুচি এই মত প্রত্যাখ্যান করে বললেন:

“পানিতে পৌঁছানোর আগে জুতো খোলা উচিত নয়। এই বর্ষার মৌসুমে আলীর পিছু নেওয়া সমীচীন নয়। যদি সে কড়া-তে পৌঁছে যায় এবং তার কুমতলব প্রকাশ পায়, তবে আমরা এক আক্রমণেই তার কাজ শেষ করে দেব।”

মোদ্দাকথা, সুলতানের তার ভাতিজার ওপর আস্থা টলানো গেল না। তিনি এমনকি এও বললেন:

“এটা হতে পারে যে আমার ছেলেরা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে, কিন্তু আলী আমার বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ করতে পারে না।”

এভাবে সুলতান গোয়ালিয়র থেকে দিল্লি ফিরে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন যে আলী গনিমতের মাল নিয়ে শীঘ্রই দিল্লি ফিরে আসবে এবং তার কাছে ক্ষমা চাইবে আর তিনি তার ওজর কবুল করে নেবেন। কিন্তু আলী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তার প্রদেশ ‘কড়া’-তে পৌঁছে গেল। তার পরিকল্পনা অনেক সুদূরপ্রসারী ছিল। পূর্বদিকের প্রদেশ লখনৌতি সম্প্রতি দিল্লি সালতানাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যেখানে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের নাতি সুলতান রুকনুদ্দিন কায়কাউস নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। আলীর ইচ্ছা ছিল যে এখন সে ঘাগরা নদী পার হয়ে লখনৌতি আক্রমণ করবে এবং ওটাকেও নিজের জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। এই উদ্দেশ্যে সে সৈন্য প্রস্তুত করছিল এবং ঘাগরা নদীর তীরে একটি নতুন নৌকা তৈরি করছিল।

কিন্তু যেহেতু তার ভয় ছিল যে এই খবর শোনামাত্রই বাদশাহ তার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করবেন, তাই সময় কাটানোর জন্য সুলতানকে একটি বিস্তারিত পত্র লিখে নিজের অপরাধ স্বীকার করল এবং তার পরে বলল:

“আমি এই বিজয়ের সমস্ত ধন-সম্পদ সুলতানের খেদমতে পেশ করতে চাই, কিন্তু যেহেতু আমি দীর্ঘ সময় ধরে সুলতানের দরবার থেকে দূরে আছি এবং মহাসড়কগুলো বন্ধ থাকার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে, তাই আমি এবং আমার সঙ্গীরা আপনার অসন্তুষ্টি ও তিরস্কারের ভয়ে ভীত। অতএব, আপনি যদি নিজের বিশেষ কলমে একটি ক্ষমা-পত্র আমার ও আমার সঙ্গীদের জন্য লিখে পাঠান, তবে বড়ই মেহেরবানি হবে এবং এরপর আমি কোষাগার নিয়ে হাজির হয়ে খেদমত করব।”

সুলতান তো আগে থেকেই ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এই চিঠি পড়ে নিজের বিশেষ কলমে ক্ষমা-পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন। যখন সুলতানের ‘দূত’ ‘কড়া’-তে পৌঁছালেন এবং সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করলেন, তখন আলীর সামরিক শক্তি এবং তার পরিকল্পনা তাদের কাছে গোপন থাকল না। কিন্তু তারা এমন এক বিস্ময়কর অবস্থায় ছিলেন যে আলী তাদের নজরবন্দি করে ফেলল যাতে দিল্লির কাছে কোনো খবর না পৌঁছায়। বাদশাহকে আরও গাফিলতির মধ্যে রাখার জন্য সে তার ছোট ভাই আলমাস বেগকে ব্যবহার করল, যে দরবারে দিল্লির এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং সুলতানের প্রিয়পাত্র ছিল। তার বিয়ে সুলতানের দ্বিতীয় মেয়ের সাথে হয়েছিল। আলীকে গোপনে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে বৃদ্ধ বাদশাহকে যেন ভুল ধারণার মধ্যে রেখে ধোঁকা দেওয়া অব্যাহত রাখা হয়। چنانچہ সে তাই করল।

আলমাস বেগ নেক-স্বভাবের সুলতানকে বিশ্বাস করালেন যে তার ভাই অপরাধবোধের কারণে তীব্র দুঃখ, অনুশোচনা এবং মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সুলতান নিজে গিয়ে তাকে দেখা না দেবেন এবং তাকে ক্ষমা না করবেন এবং নিজের স্নেহের হাত তার মাথায় না রাখবেন, ততক্ষণ সে শান্তি পাবে না বরং ভয় পাচ্ছে যে সে আত্মহত্যা করে ফেলবে।

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান এ কথা শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এবং তাঁর ভাতিজার প্রতি তাঁর মন আরও নরম হয়ে গেল।

ওদিকে আলী নাটকীয় ভঙ্গিতে আলমাস বেগের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন যাতে লেখা ছিল: "বাদশাহর অসন্তুষ্টি আমার জন্য আযাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি শুধু আমার চাচাই নন, আমার পিতাও এবং আমার জীবনের মালিক। যদি তোমরা বুঝতে পারো যে তিনি সত্যিই আমার ওপর রাগান্বিত এবং আমাকে হত্যা করতে চান, তবে আমাকে জানিয়ে দিও। আমি সবসময় নিজের সাথে বিষ রাখি, তা খেয়ে আমি আত্মহত্যা করব।"

আলমাস বেগ পরিকল্পনা অনুযায়ী এই চিঠিটিও বাদশাহকে দেখালেন, তখন তিনি ব্যথিত হয়ে উঠলেন এবং অবিলম্বে ভাতিজার সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ আলমাস বেগকে এই আশ্বাস দিয়ে পাঠালেন যে, বাদশাহ শীঘ্রই আসছেন, তাই যেন তার ভাই আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকে।

এরপর সুলতান কারো পরামর্শের তোয়াক্কা না করে 'কারা'র অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি আহমদ হাবিবকে সসৈন্যে স্থলপথে কারা যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে ৬৯৬ হিজরির (জুলাই ১২৯৬ খ্রি.) রমজানের শুরুতে গঙ্গা নদী দিয়ে কারা অভিমুখে রওনা হলেন। সে দিনগুলোতে প্রবল বৃষ্টির কারণে নদীতে প্রবল স্রোত ছিল, কিন্তু বাদশাহ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ১৭ই রমজান (২০শে জুলাই) রাজকীয় নৌকা কারা-র কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

ওদিক থেকে আলী আলমাস বেগকে বললেন: "সুলতানকে এই বিষয়ে রাজি করাও যেন তিনি দেহরক্ষী সৈন্য বোঝাই নৌকাগুলো অন্য তীরে রেখে আসেন, অন্যথায় তাঁর ভাই এতটাই ভীত যে সে আত্মহত্যা করতে পারে।"

আলমাস বেগ সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন: "আমি যদি একদিনও দেরি করে এখানে পৌঁছাতাম, তবে আমার ভাই আত্মহত্যা করে ফেলত। আমি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু তার ভয় এখনো কাটেনি। হতে পারে আপনার সাথে এই সৈন্যবাহিনী দেখে সে এখান থেকে পালিয়ে অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নিতে পারে।"

সুলতান এ কথাটিও মেনে নিলেন এবং দেহরক্ষী সৈন্যদের পেছনে রেখে শুধুমাত্র নিজের নৌকায় সালতানাতের কয়েকজন আমিরের সাথে সামনে অগ্রসর হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আলমাস বেগ বললেন: "আমার ভাই এখন খুব কাছে চলে এসেছে। ভালো হয় যদি আপনি আপনার এই কয়েকজন সশস্ত্র সঙ্গীকেও আলাদা করে দেন যাতে ভাই কোনো বিপদের আশঙ্কা করে আপনার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হয়ে পড়ে।"

এ কথা শুনে সুলতান সেই সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ পর নৌকা যখন তীরের কাছাকাছি পৌঁছাল, তখন সেখানে আলীর শত শত সৈন্য পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। সুলতানের সঙ্গীরা আসন্ন বিপদ আঁচ করতে পারলেন। জনৈক আমির খুররম রকীক বললেন: "আমরা তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে এখানে চলে এসেছি, কিন্তু তোমরা পুরোপুরি সশস্ত্র এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।"

আলমাস বেগ বললেন: "আমার ভাইয়ের ইচ্ছা হলো তিনি তাঁর বাহিনীকে সুসজ্জিত ও সশস্ত্র করে সুলতানের পরিদর্শনের জন্য পেশ করবেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন।"

সুলতান তখন শুধু এতটুকু বললেন: "আমি এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে রোজা রাখা অবস্থায় আলীর সাথে দেখা করতে এসেছি, কিন্তু সে এতটুকুও পারল না যে নৌকায় করে কিছুটা পথ এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাত।"

আলমাস ধূর্ততার সাথে উত্তর দিয়ে বলল: “ভাই পছন্দ করেন না যে তিনি খালি হাতে আপনার খেদমতে আসবেন। তিনি ধন-সম্পদ, হীরা-জহরত এবং হাতি-ঘোড়া নিয়ে আপনার কদমবুসি করবেন। আপনার জন্য ইফতারের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন এবং তার ইচ্ছা হলো আপনি যেন তার ঘরে ইফতার করেন যাতে তিনি গর্বে মাথা উঁচু করতে পারেন।”

বাদশাহ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তবে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে সময় হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। তিনি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে থাকলেন, অন্যদিকে তার সাথে থাকা আমিরদের বুক কাঁপছিল। এদিকে সূর্যও ডুবুডুবু ছিল যখন নৌকা তীরে পৌঁছাল।

বাদশাহ নৌকা থেকে নামলে আলী তার লোকলস্কর নিয়ে সামনে এল এবং তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সুলতান জালালুদ্দিন খলজির সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল, ভালোবাসার একটি ঢেউ শরীরে খেলে গেল, তিনি ব্যাকুল হয়ে তাকে টেনে তুললেন এবং তার গালে চুমু খেলেন। সেই সাথে গালে হালকা চড় মেরে বললেন: “আমি তোকে ছোটবেলা থেকে লালন-পালন করে বড় করেছি। নিজের আপন ছেলেদের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছি। তোর মনে এই ধারণা কীভাবে এল যে আমি তোর বিরুদ্ধে?”

এ কথা বলে সুলতান অত্যন্ত স্নেহের সাথে তার হাত ধরে তাকে নিজের নৌকার দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। এমন সময় বিশ্বাসঘাতক ভাতিজা ইশারা করল এবং সামানার এক অফিসার মাহমুদ বিন সালিম সালাহদার ঝাঁপিয়ে পড়ে সুলতানকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। সুলতান হঠাৎ আঘাত পেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল: “আলা বদবখত! এ তুই কী করলি?”

তিনি নৌকার দিকে দৌড়ানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু অন্য এক অকৃতজ্ঞ অফিসার ইখতিয়ার উদ্দিন পেছন থেকে ধাওয়া করল এবং মোক্ষম আঘাত করে সুলতানকে ফেলে দিল। এদিকে সুলতান কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন আর ওদিকে ইখতিয়ার উদ্দিনের তলোয়ার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। কয়েক মুহূর্ত পর সুলতানের মাথা একটি বর্শার মাথায় উঁচিয়ে ধরা হলো এবং বিশ্বাসঘাতক ভাতিজা নিজের মাথায় রাজকীয় ছত্র ধারণ করে নিজের বাদশাহির ঘোষণা দিচ্ছিল।

তীর খেয়ে যখন ওত পাতার জায়গার দিকে তাকালাম
নিজের বন্ধুদের সাথেই দেখা হয়ে গেল
নিঃস্ব বন্ধুরা যারা জীবনের প্রতিটি খেলায়
না খেলেই হেরে গেল, পরাজয় হয়ে গেল [১]

বাদশাহর সাথে আসা প্রায় সমস্ত আমির এবং সৈনিক যারা নৌকায় সওয়ার ছিল, তাদের ঘিরে ফেলে হত্যা করা হলো। তবে যে বাহিনী আহমদ হাবিবের নেতৃত্বে স্থলপথে আসছিল, তারা এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্টের সাথে দিল্লিতে ফিরে গেল। [২]

---

[১] হাফিজ জলন্ধরী

[২] ফিরিশতা: খণ্ড ১, পৃ. ৩৪০ থেকে ৩৪৬; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ২৩০ থেকে ২৩৬; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৬৯; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ২৪৩ থেকে ২৪৫। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খলজির হত্যাকাণ্ড এবং সুলতান আলাউদ্দিনের সিংহাসন আরোহণের ঘটনাগুলোকে আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানি ৬৯৫ হিজরির ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবে আমির খসরুর মতে এগুলো ৬৯৬ হিজরির ঘটনা। দৃশ্যত আমির খসরুর তারিখই সঠিক মনে হয়। অর্থাৎ জালালুদ্দিন খলজির শাসনকাল মহররম ৬৮৯ হিজরি থেকে শুরু হয়ে রমজান ৬৯৬ হিজরিতে শেষ হয়। এভাবে নিহত সুলতানের শাসনকাল সাত বছর নয় মাস হয়।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

সুলতান জালাল উদ্দিন খিলজির চরিত্রের ওপর এক নজর

সুলতান জালাল উদ্দিন খিলজি ইসলামী হিন্দুস্তানের দিগন্তে এক নতুন আশা এবং নতুন রাজনৈতিক ধারার সাথে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি রাজকীয় রাজনীতির মূলনীতির চেয়ে ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করার বেশি চেষ্টা করতেন। তাঁর ঝোঁক হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর মতো শাসকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখা যায়। তাঁর শাসনের সময়কাল ছিল সাত বছর নয় মাস। তাঁর বিশেষ গুণাবলির কারণে তাঁকে উপমহাদেশের নেককার, ন্যায়পরায়ণ এবং মর্যাদাবান সুলতানদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

ক্ষমা ও উদারতা:

যে সময়ে জালাল উদ্দিন খিলজি কাইথালের গভর্নর ছিলেন, সেখানে সিরাজ উদ্দিন নামক এক সাহিত্যিক ও কবি তাঁর প্রশংসায় একটি কাসিদা লিখেছিলেন যাতে তিনি পুরস্কার ও সম্মান লাভ করতে পারেন। খিলজি নিজের ব্যস্ততার কারণে সেই কাসিদার প্রতি মনোযোগ দিতে পারেননি। এতে কবি সাহেব রাগান্বিত হলেন। এই অসন্তুষ্টির আরও একটি কারণ বর্ণনা করা হয় যে, পূর্ববর্তী সুলতানদের পক্ষ থেকে কবি সাহেবকে জায়গির হিসেবে দেওয়া একটি গ্রাম খিলজি আইন অনুযায়ী কবি সাহেবের কাছ থেকে ফেরত নিয়েছিলেন। কবি সাহেব এতে এতই রাগান্বিত হলেন যে তিনি খিলজির কুৎসা রটনা করে একটি কবিতা লিখলেন যার নাম দিলেন “খিলজি নামাহ”।

যখন জালাল উদ্দিন খিলজি বাদশাহ হলেন, তখন কবি সাহেব ঘাবড়ে গেলেন। প্রথমে তিনি নিজের এলাকা ছেড়ে আত্মগোপন করলেন। তারপর নিজে দিল্লি পৌঁছালেন এবং নিজের গলায় দড়ি দিয়ে গোলামদের মতো দরবারে হাজির হলেন। সুলতান খিলজি যখন তাঁর অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন কিছু না বলেই কেবল ক্ষমা করে দিলেন না বরং খিলাত দিয়েও সম্মানিত করলেন এবং আরও একটি গ্রাম তাঁর নামে জায়গির করে দিলেন।

গভর্নর থাকাকালীন সময়েই জালাল উদ্দিন খিলজি একটি গোত্রের ওপর আক্রমণ করেছিলেন যাদের লোকজনকে “মুন্দাহির” বলা হতো। মোকাবিলার সময় একজন মুন্দাহির তাঁর মুখোমুখি হয় এবং তলোয়ারের এমন এক আঘাত করে যার ফলে তাঁর চেহারায় একটি ক্ষত তৈরি হয় যার চিহ্ন কখনো মুছে যায়নি।

সুলতানের বাদশাহ হওয়ার খবর যখন সেই মুন্দাহিরের কাছে পৌঁছাল, সেও গলায় দড়ি দিয়ে দরবারে পৌঁছাল। সুলতান যখন তাকে দেখলেন, তখন শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তার প্রশংসা করলেন এবং বললেন: “আমি আমার জীবনে তার মতো সাহসী মানুষ দেখিনি।” তারপর তাকে খিলাত দিলেন এবং একটি বড় অংকের ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী বারানি কৃত: পৃষ্ঠা ১৯৩ থেকে ১৯৫; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৩৬; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান মৌলভী জাকাউল্লাহ কৃত: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২, ১৩।

নির্মাণশৈলীর প্রতি আগ্রহ:

জালালুদ্দীন খিলজী নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের শৌখিন ছিলেন। তিনি সর্বদা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও আমীরদের উন্নয়নমূলক কাজ করতে এবং উপকারী ও আকর্ষণীয় ইমারত নির্মাণ করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি কিলুঘড়িতে অবস্থানের সময় সেখানে অনেক মসজিদ নির্মাণ করান, বেশ কিছু বাজার তৈরি করান এবং এই অংশের নাম দেন "শহর-ই-নও"। পরবর্তীতে সুলতান বলবনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে একে "গিয়াসপুর" বলা হতে থাকে। জালালুদ্দীন খিলজী যমুনা নদীর তীরে একটি অত্যন্ত সুন্দর বাগান তৈরি করান যার চারপাশে পাথরের প্রাচীর নির্মাণ করান। [১]

জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ:

তাঁর দরবার জ্ঞান ও গুণীজনে পরিপূর্ণ ছিল যাদের মধ্যে আমীর খসরু, মুয়াইয়িদ জরজানী, মালিক সাদ মানতিকী এবং তাজউদ্দীন ইরাকীর মতো ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমীর খসরু বাদশাহর বিশেষ সহচর ছিলেন। জালালুদ্দীন খিলজী তাঁর প্রতি এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে তাঁকে একটি বিশেষ রাজকীয় পোশাক দান করেছিলেন। সুলতানের মজলিসে আমীর খসরু প্রতিদিন নতুন কোনো না কোনো গজল পাঠ করতেন যার বিনিময়ে রাজকীয় পুরস্কারের বৃষ্টি হতো। [২]

জালালুদ্দীন খিলজী নিজেও একজন ভালো কবি ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ বছর যখন তিনি গোয়ালিয়র যান তখন সেখানে একটি চত্বর ও গম্বুজ নির্মাণ করান। তারপর ফারসিতে একটি রুবাই বলেন যা ওই ইমারতে খোদাই করা হয়েছিল।

মারা কে কদম বর সর-এ-গরদুন সায়িদ..... আজ তূদা-এ-সং-ও-গিল চে কদর আফজায়েদ

(আমাদের কদম আসমানের ঘাড়ের ওপর হওয়া উচিত, পাথর ও মাটির স্তূপ থেকে তাদের আর কী মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।)

আঁ সং শিকিস্তা-ও-আব নেহাদিম দুরুস্ত..... বাশাদ কে দিল-এ-শিকিস্তা আসায়িদ

(আমরা পানি দিয়ে ভাঙা পাথরকে ঠিক করে দিয়েছি..... হয়তো ভাঙা মনও প্রশান্তি পাবে।) [৩]

জুলুমের পরিণাম:

সুলতান জালালুদ্দীন খিলজী একজন মহৎ ও কোমল স্বভাবের শাসক ছিলেন। তাঁর পুরো শাসনকালে সিদী মওলার হত্যাকাণ্ড ছাড়া এমন কোনো ঘটনা নেই যা তাঁর চরিত্রের ওপর কলঙ্ক। তিনি সরলতা, সহানুভূতি, দয়া এবং উদারতার এক নমুনা ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর সাথে যে ছিল, তার ধূর্ততা, প্রতারণা এবং জুলুম-অত্যাচারের এক হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত। তবে জালেমদের কর্মফল প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে শীঘ্রই তাদের পাকড়াও করল। ঘাতক আক্রমণকারী মাহমুদ বিন সালিম এক বছর পর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে পচে খসে পড়তে থাকে যতক্ষণ না সে মারা যায়।

---

(১) তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৭। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মসজিদ ও খানকাহও গিয়াসপুরে ছিল।

(২) তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২০।

(৩) তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৬৭।

শিরশ্ছেদকারী ইখতিয়ার উদ্দিন কিছুদিন পর পাগল হয়ে গেল। উন্মাদ অবস্থায় সে চিৎকার করে বলত যে, সুলতান জালালুদ্দিন খিলজি হাতে তলোয়ার নিয়ে আমার মাথা কাটছেন। আলমাস বেগ এবং অন্যান্য অপরাধীরা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে কুদরতে ইলাহির প্রতিশোধের শিকার হয়ে নাম-নিশানহীন হয়ে গেল। আলী গুরশাস্প (আলাউদ্দিন খিলজি) যদিও বাদশাহ হয়ে দীর্ঘ সময় শান-শওকতের সাথে শাসন করেছিলেন, কিন্তু তার পরিণতিও ছিল শিক্ষণীয়। তার পরিবার কিছুটা তার নিজের হাতে এবং কিছুটা তার বিশ্বস্ত আমিরদের হাতে শিক্ষার নিদর্শন হয়ে রইল। [১]

যে অন্যদের পার করে দেয়, তাকেও পার হতে হয়
যে ডুবিয়ে দেয়, তাকেও হাবুডুবু খেতে হয়
তলোয়ার, কুঠার, বন্দুক, বর্শা এবং নশতর, তীর, নখ কাটার যন্ত্র
এখানে যেমন কর্ম, তেমন ফল ভোগ করতে হয়
কোনো দেরি নেই, কোনো অন্ধকার নেই, এখানে কেবল ইনসাফ ও ন্যায়বিচার
এই হাতে করো, ওই হাতে পাও; এখানে লেনদেন হাতে হাতে [২]

---

[১] তারীখে ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৫১

[২] নজির আকবরাবাদী

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (ষষ্ঠ খণ্ড)

রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম (কদর খান)

৬৯৬ হিজরি

(১২৯৭ খ্রিস্টাব্দ)

আলী গুরশাসপের ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তিনি দিল্লি সালতানাতের সমান্তরালে একটি পৃথক রাজত্ব কায়েম করবেন যা লখনৌতি থেকে দেবগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। দিল্লির ওপর দখলদারিত্বের লক্ষ্য সম্ভবত তাঁর প্রত্যাশার বাইরে ছিল, কিন্তু হঠাৎ নিহত সুলতানের স্ত্রী মালিকা-ই-জাহানের একটি অযৌক্তিক পদক্ষেপ বিদ্রোহীদের জন্য দিল্লির ওপর দখলদারিত্ব একেবারেই সহজ করে দিল।

মালিকার ভুল সিদ্ধান্ত—রুকনুদ্দিন ইব্রাহিমের সিংহাসন আরোহণ:

ঘটনা এই যে, সুলতানের হত্যার খবর শোনামাত্রই মালিকা-ই-জাহান কারো সাথে পরামর্শ না করেই তাঁর ছোট ছেলে কদর খানকে বাদশাহ বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। যদিও সেই সময় নিহত সুলতানের সাহসী ও অভিজ্ঞ পুত্র আরকালি খান মুলতানে অবস্থান করছিলেন। যদি তাঁকে সুলতান বানানো হতো, তবে তিনি তাঁর পিতার হত্যাকারীদের পরাস্ত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু মালিকা-ই-জাহান তাড়াহুড়ো করে কিলুঘড়ি থেকে দিল্লিতে আসলেন, “কাসরে সাবজ”-এ নিজের ছেলেকে “রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম” উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসালেন এবং উমারাদের ধন-সম্পদ ও জায়গির প্রদান করে মনে করলেন যে, এখন তারা এই অল্পবয়স্ক বাদশাহর অনুগত থাকবে।

কিন্তু তেমনটি হলো না। সর্বপ্রথম শাহজাদা আরকালি খান এই সিংহাসন আরোহণের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি দিল্লির সাহায্যকারী হওয়ার পরিবর্তে ভবিষ্যতে চুপচাপ মুলতানে অবস্থান করাকে প্রাধান্য দিলেন, যদিও এই নাজুক মুহূর্তে তিনিই দিল্লিকে সামলাতে পারতেন। অন্যদিকে দিল্লির উমারাগণও এমন নাজুক পরিস্থিতিতে একজন অল্পবয়স্ক বালকের অধীনে থাকতে খুশি ছিলেন না। [১]

আলী গুরশাসপের আক্রমণ ও রাজনৈতিক অনুগ্রহ:

আলী গুরশাসপ যখন এই খবরগুলো পেলেন, তখন তিনি সাহসী হয়ে উঠলেন এবং তিনি লখনৌতির অভিযান স্থগিত করে অবিলম্বে দিল্লির ওপর দখলদারিত্বের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩৫১, ৩৫২; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ২৩৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৬৯; ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ২৪৬

করে নিল। বর্ষাকাল তখনও শেষ হয়নি, সে আগ্রা থেকে দিল্লির দিকে অভিযান শুরু করল। দেবগিরির ধনভাণ্ডার তার সাথে ছিল। পথে সে আমির ও কর্মকর্তাদের ওপর পুরস্কার ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকল। এভাবে প্রতিটি স্থানে নতুন নতুন সর্দার ও অভিজাতরা তার অনুগত হতে লাগল। [১]

সময় হাত থেকে বেরিয়ে গেছে:

যখন এই বাহিনী বদায়ূনের কাছে পৌঁছাল, তখন রুকন ইব্রাহিম প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু নিজে বের হওয়ার সাহস করলেন না এবং কিছু আমিরকে সৈন্য দিয়ে প্রতিরোধের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বদায়ূনের কাছে যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো, তখন আলী গরশাস্প একজন চতুর রাজনীতিবিদের মতো দিল্লির বাহিনীর আমিরদের সাথে আলোচনা করলেন এবং আর্থিক অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদের নিজের পক্ষে নিয়ে নিলেন। এভাবে দিল্লির ষাট হাজার সৈন্য তার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

মালিকা-ই-জাহান যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি মুলতানে দূত পাঠিয়ে আরকালি খানকে তলব করলেন যাতে সে এসে দিল্লিকে রক্ষা করে, কিন্তু সে উত্তর দিল: ‘এখন সময় হাত থেকে বেরিয়ে গেছে এবং আমাদের বাহিনী বিদ্রোহীদের সাথে মিশে গেছে। আমার আসা নিরর্থক হবে।’ [২]

রুকন উদ্দিন ইব্রাহিমের পলায়ন:

এই খবর পাওয়া মাত্রই আলী গরশাস্প পূর্ণ গতিতে দিল্লির দিকে অভিযান শুরু করলেন। তিনি একটি বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছিলেন। ফলে যিলকদ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যমুনা নদীর তীরে পৌঁছে মানজানিক, দাব্বাবা এবং অন্যান্য অবরোধের সরঞ্জাম নদী পার করতে শুরু করলেন। তার বদান্যতার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই দিল্লি থেকে প্রতিদিন দুই-তিনজন আমির এসে তার আনুগত্য স্বীকার করতে লাগলেন।

ওদিকে রুকন ইব্রাহিম বেশ সময় নষ্ট করার পর বাহিনী নিয়ে মোকাবিলার জন্য বের হলেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে যুদ্ধের পরিণাম শোচনীয় পরাজয়। তাই তিনি দিল্লির দিকে ফিরে এলেন, যতটুকু সম্ভব কোষাগার থেকে ধন-সম্পদ সাথে নিলেন এবং নিজের পরিবারসহ দ্রুত মুলতানের দিকে চলে গেলেন। এটি যিলহজ ৬৯৬ হিজরির ঘটনা। মালিক আহমদ হাবিব এবং কয়েকজন অনুগত আমির তার সাথে চলে গিয়েছিলেন। দিল্লির বাকি আমিররা বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩৫৩; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ২৩৮, ২৩৯; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৬৯; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ২৪৬

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩৫২, ৩৫৩; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ২৩৯, ২৪০; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৭০; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ২৪৪

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩৫৪, ৩৫৫; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ২৪২; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৭০; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ২৪৭

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (ষষ্ঠ অংশ)

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি

৬৯৬ হিজরি থেকে ৭১৫ হিজরি

(১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ)

রুকন ইব্রাহিমের পলায়নের পর আলী গুরশাস্পের জন্য আর কোনো বাধা অবশিষ্ট ছিল না। ফলে তিনি বিজয়ী বেশে দিল্লিতে প্রবেশ করেন, যেখানে ২২ জিলহজ ৬৯৬ হিজরিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় এবং তিনি "আলাউদ্দিন খিলজি" উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১] নতুন বাদশাহ শহরে ধুমধাম, খেলাধুলা এবং আমোদ-প্রমোদে ভরপুর উৎসবের আয়োজন করেন যাতে মানুষ পূর্ববর্তী সুলতানের হত্যাকাণ্ড ভুলে যায় এবং হাসি-খুশিতে এক নতুন যুগের আশায় তাঁর সমর্থক হয়ে ওঠে। [২] সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। তিনি বিশ বছর শাসন করেন এবং পঞ্চাশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। [৩]

আলাউদ্দিনের ব্যক্তিত্ব:

আলাউদ্দিন খিলজি নিশ্চিতভাবেই জুলুম এবং মকর ও প্রতারণার মাধ্যমে বাদশাহ হয়েছিলেন, কিন্তু দেখা যায় যে রাজকীয় রাজনীতির মেজাজ এমনই এবং এই বিষয়গুলো এর ঐতিহ্যের অংশ। এটাও জরুরি নয় যে, এ ধরনের অপরাধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তি অবশ্যই কুপ্রকৃতির এবং দুর্নীতিবাজ হবেন, বরং আমরা যত্রতত্র এমন উদাহরণ পাই যখন উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভকারী এমনকি ছিনিয়ে নেওয়া ব্যক্তি একজন শ্রেষ্ঠ প্রশাসক, দেশপ্রেমিক এবং সালতানাতের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। মিশরের মামলুকদের ইতিহাসে রুকন উদ্দিন বিবারসের মতো জাঁকজমকপূর্ণ শাসক সাইফ উদ্দিন কুতুজের মতো শরীফ এবং মুজাহিদ শাসককে ধোঁকা ও নির্মমতার সাথে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, কিন্তু এরপর তিনি একদিকে ক্রুসেডারদের এবং অন্যদিকে মঙ্গোলদের একের পর এক পরাজয় বরণ করিয়ে এবং সিরিয়া, মিশর ও হারামাঈন শরীফাইনে অতুলনীয় নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পন্ন করে সমগ্র ইসলামি বিশ্ব থেকে শ্রদ্ধা...

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৭০

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৫৫

[৩] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৪৬৫, বরাতে খায়রুল মাজালিস আজ হাজী দাবীর

প্রশংসা লাভ করলেন। আলাউদ্দিন খিলজির অবস্থাও অনেকটা এমনই ছিল। তবে তার মধ্যে কঠোরতা ছিল মাত্রাতিরিক্ত।

তিনি শিক্ষিত ছিলেন না। তার জ্ঞান পুঁথিগত ছিল না বরং তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সবকিছু শিখেছিলেন। তিনি ছিলেন সতর্ক, চতুর, সাহসী, কঠোর এবং শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী; এই ভিত্তিতেই তিনি শাসনকার্য ও সেনাপতিত্বে বিশেষ পারদর্শিতা রাখতেন। তিনি দেবগিরি জয় করে দিল্লি সালতানাতের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই অঞ্চলগুলো জয় করা তার একটি বড় কৃতিত্ব ছিল যা তাকে সালতানাতে অসাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দান করেছিল। তিনি একজন সাধারণ মুসলমানের মতো আল্লাহর ওপর ঈমান এবং ইসলামের ওপর ভাসা ভাসা বিশ্বাস রাখতেন, কিন্তু শরয়ি বিধান জানা, সেগুলো পালন করা বা সেগুলো কার্যকর করার ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি নামাজ-রোজারও কোনো পাবন্দি করতেন না। অবশ্য তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের মতো শরয়ি বিভাগসমূহ যেমন: কাজা, আওকাফ ইত্যাদিকে বহাল রেখেছিলেন এবং এই সমস্ত বিষয়ের তদারকি আলেম "সদরুস সুদুর"-এর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। [১]

নতুন পদমর্যাদাসমূহ:

আলাউদ্দিন খিলজি পূর্ববর্তী সরকারের আমির, কর্মকর্তা এবং বরখাস্তকৃত সৈনিক ও কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য প্রথমে কোনো মানদণ্ড বিচার না করেই সবাইকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দিলেন এবং তাদের ওপর প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করলেন যাতে পূর্ববর্তী সরকারের অবশিষ্টাংশ নির্মূল হয়ে যায়। প্রথম বছর তিনি তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে সরকার গঠন করেন:

(১) গোলাম বংশের (ইলতুতমিশ ও বলবন) প্রাচীন আমিরগণ যাদের মধ্যে কেউ কেউ তখনও সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত নিয়োগগুলো সম্পন্ন হয়:

- খাজা খাতির: উজারাত-ই-সালতানাত
- শেখ সদরুদ্দিন আরিফ: সদরুস সুদুর (কাজি-উল-কুজাত)
- উমদাতুল মুলক আলা দাবির: দিওয়ান-ই-ইনশা (কেন্দ্রীয় সচিবালয়)

(২) আলাউদ্দিন খিলজির নিজস্ব অনুগত আমিরগণ: তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত পদগুলো বণ্টন করা হয়:

- জাফর খান: আরিজ-ই-মামালিক (প্রতিরক্ষামন্ত্রী)
- আলমাস বেগ (আলাউদ্দিনের ভাই): উলুগ খান খেতাব দিয়ে তাকে আমির-ই-হাজিব বানানো হয়।
- নুসরাত খান: দিল্লির কোতোয়াল
- আরসালান খান: সামানার শাসক নিযুক্ত করা হয়।
- মালিক জুনা (প্রাচীন): নায়েব-ই-ওয়াকিল-ই-দার নিযুক্ত করা হয়। [২]

---

[১] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৪৬৪, ৪৬৫।

[২] মালিক জুনা (প্রাচীন) ছিলেন ভিন্ন একজন কর্মকর্তা, পক্ষান্তরে "মালিক ফখরুদ্দিন জুনা" ছিলেন অন্য একজন কর্মকর্তা যিনি আলাউদ্দিনের পুত্রদের যুগে আবির্ভূত হন এবং পরবর্তীতে পরবর্তী যুগে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক নামে পরিচিত হন।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

(৩) খিলজি বংশের সেই সব অফিসার যারা জালালুদ্দিন খিলজির সঙ্গ ছেড়ে চলে এসেছিলেন।

তাদের মধ্যে মালিক ফখরউদ্দিন কুচি [১] কে দিল্লির 'দাদ বেগ' (রাজধানীর সামরিক ব্যয়ের নিয়ন্ত্রক) নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এ ছাড়া অনেক অনুগত ব্যক্তিকে "আমির" পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের খেতাব প্রদান করা হয়েছিল। যারা আগে থেকেই আমির পদমর্যাদায় ছিলেন, তাদের "মালিক" পদমর্যাদা দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়েছিল। [২]

আলাউদ্দিন খিলজির সামনে উপস্থিত অভিযানসমূহ

আলাউদ্দিন খিলজি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন উত্তর ভারতে তুর্কিদের আধিপত্যের নয়টি দশক অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ইলতুৎমিশের আমলে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা এখন আর কার্যকর ছিল না, বরং সেগুলোর আমূল সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। রাজকীয় ক্ষমতার জন্য বারবার উদ্ভূত বিপদগুলো আগের মতোই বিদ্যমান ছিল। স্থানে স্থানে বিদ্রোহী উপাদানগুলো বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছিল। পশ্চিমে লাহোরের ওপারে পাঞ্জাব অঞ্চল খোখরদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকত, অন্যদিকে মঙ্গোলদের বিপদও এই অঞ্চলে ছায়া ফেলেছিল। যেহেতু অধীনস্থ রাজ্যগুলো কেন্দ্রে কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, তাই মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

খোদ দিল্লির চারপাশের এলাকাগুলোতে অনেক বিরোধী শক্তি ছিল যারা সালতানাতের জন্য স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলবন তাদের দমনের জন্য কয়েকবার সসৈন্যে অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজস্থানের রাজপুত রাজ্যগুলো তখনও তাদের স্বাধীনতার জন্য অস্থির ছিল। রণথম্ভোর ও চিতোর ছিল রাজপুত শক্তির প্রধান কেন্দ্র এবং মাত্র পাঁচ বছর আগে দিল্লির সেনাবাহিনী রণথম্ভোর জয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। দক্ষিণ গুজরাটে ভীল শাসকদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মধ্য ভারতে ধার, উজ্জয়িনী এবং চান্দেরি দিল্লির সেনাবাহিনীর সামনে কেবল সাময়িকভাবে নতি স্বীকার করত এবং শীঘ্রই বিদ্রোহ করে বসত। একটু দূরে পূর্বে বিহার ও বাংলা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণাঞ্চল আগের মতোই রাজনৈতিক অস্থিরতায় নিমজ্জিত ছিল। দেবগিরির যাদব শাসকরা তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পুনর্প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। আলাউদ্দিন খিলজি একজন চতুর শাসকের মতো এই সমস্যাগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে এই সবগুলোর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তার অভিযানগুলো দেখলে স্পষ্ট হয় যে, তার কাছে পাঁচটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

(১) নিজের চাচার পরিবার ও অনুগতদের নির্মূল করা।

---

[১] মালিক ফখরউদ্দিন কুচি সেই সব আমিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির সাথে "কারা" গিয়েছিলেন এবং সুলতানের হত্যার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছিল বা হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু ফখরউদ্দিন কুচিকে আশ্চর্যজনকভাবে পদে ভূষিত করা হয়েছিল। এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, ফখরউদ্দিন কুচি সুলতান জালালুদ্দিন খিলজিকে ভুল পরামর্শ দিতেন, ফলে যখন মালিক আহমদ হাবিব সুলতানকে বুঝিয়েছিলেন যে আলাউদ্দিন খিলজিকে কারার পথে বাধা দেওয়া হোক, তখন ফখরউদ্দিন কুচি উল্টো বুঝিয়েছিলেন এবং এভাবে আলাউদ্দিন কারা পৌঁছে নিরাপদ হয়ে যান। এটাও অসম্ভব নয় যে, আলমাস বেগের মতো কুচিও আলাউদ্দিনেরই এজেন্ট ছিলেন।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা, ফারসি: ১/৩৫৫, ৩৫৬; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ২৩০ থেকে ২৩২; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ২৪০, ২৫০।

(২) খালি হতে থাকা সরকারি কোষাগারকে শক্তিশালী করা।

(৩) সালতানাতকে সম্প্রসারিত করা।

(৪) দেশকে বহিঃশত্রুর বিপদ থেকে রক্ষা করা।

(৫) দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি নতুন ব্যবস্থা প্রদান করা।

পরিশেষে, আলাউদ্দিন খিলজি অত্যন্ত মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

জালালুদ্দিন খিলজির পরিবারের ওপর নিয়ন্ত্রণ:

আলাউদ্দিন খিলজি শাসনভার গ্রহণ করে সর্বপ্রথম তার প্রভুর পরিবারের সদস্যদের দমনের দিকে মনোযোগ দেন। এই লোকেরা মুলতানে শাহজাদা আরকালি খানের কাছে নিজেদের নিরাপদ মনে করছিল, কিন্তু আলাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণের কয়েকদিন পর (জিলহজ ৬৯৬ হিজরিতে) আলমাস বেগ এবং জাফর খানকে চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে মুলতানে পাঠিয়ে দেন যাতে তারা জালালুদ্দিন খিলজির পরিবারকে পথ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে দিতে পারে। এই বাহিনী মুলতানে পৌঁছে শহরটি অবরোধ করে। আরকালি খান এবং কদর খান ছাড়াও সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির তৃতীয় জামাতা আলগু খান আবদুল্লাহ (চেঙ্গিস খানের নাতি) সেখানে ছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে এত সৈন্য ছিল না যে তারা খোলা ময়দানে এসে যুদ্ধ করতে পারে, তবুও তারা দুই মাস অবরুদ্ধ থেকে লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে প্রতিরোধের শক্তি শেষ হয়ে যায়। এই লোকেরা নতুন সুলতানের বাহিনীর কাছ থেকে কোনো দয়ার আশা করতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে তারা তৎকালীন প্রখ্যাত ওলি শাহ রুকন আলম রহ. কে সুপারিশকারী বানিয়ে প্রাণভিক্ষার নিশ্চয়তা গ্রহণ করেন। আলমাস বেগ ইতিবাচক উত্তর দেন, যার পর মরহুম সুলতানের এই দুই ছেলে আলমাস বেগের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সে বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আচরণ করে এবং সব ধরনের আশ্বস্ত করে। এভাবে মরহুম সুলতানের পরিবার তার সাথে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

দিল্লিতে এই বিজয়ের খবর পৌঁছামাত্রই উৎসব পালন করা হয় এবং এর পরপরই আলাউদ্দিন তার কোতোয়াল নুসরাত খানকে তার অন্নদাতা প্রভুর পরিবারের ধ্বংসের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। আলমাস বেগ এই পরিবারকে নিয়ে আসছিলেন, পথিমধ্যে নুসরাত খান তার সাথে মিলিত হন এবং নতুন নির্দেশ প্রদান করেন যার মাধ্যমে এখন বন্দিদের বিষয়টি তার ওপর ন্যস্ত করা হয়। সে কদর খান, আরকালি খান এবং আলগু খান আবদুল্লাহর চোখে গরম শলাকা দিয়ে তাদের অন্ধ করে দেয় এবং তাদের হাসি দুর্গের কারাগারে নিক্ষেপ করে। আরকালি খানের দুই ছেলে ছিল যাদের হত্যা করা হয়। নিহত সুলতানের বেগম এবং পুত্রবধূদের দিল্লিতে এনে একটি হাভেলিতে বন্দি করা হয়। তাদের মধ্যে নতুন সুলতানের নিজের শাশুড়ি মালিকা-ই-জাহানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মালিক আহমদ হাবিব এবং আরও অনেক অনুগতদের ভাগ্যও দিল্লির কারাগার নির্ধারিত হয়। [১]

কোষাগারকে শক্তিশালী করা:

এরপর আলাউদ্দিন দিল্লির খালি হতে থাকা কোষাগার পূর্ণ করার কাজ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শুরু করেন। এর জন্য...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩৫৬, ৩৫৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ২৫০, ৩৩৯; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ২৫০, ২৫১।

সাবেক সরকারের অনুগতদের বলির পাঁঠা বানানো হলো। এরা সেই সব আমীর ও কর্মকর্তা ছিলেন যাদের আলাউদ্দিন খিলজি কয়েক মাস আগে নিজের সরকারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অঢেল ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। এখন তাদের ওপর চড়াও হওয়া হলো এবং কেবল সেই ধন-সম্পদই তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো না যা আলাউদ্দিন তাদের দিয়েছিলেন, বরং তাদের প্রাচীন ভূ-সম্পত্তি ও আসবাবপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হলো। শুধু তাই নয়, বরং তাদের মধ্যে কাউকে হত্যা করা হলো, কারও চোখে তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করে অন্ধ করে দেওয়া হলো, কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো।

এই কর্মকর্তা ও আমীরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও বিক্রির দায়িত্ব মালিক নুসরাত খানকে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম বছরেই তিনি এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত এক কোটি মুদ্রা সরকারি কোষাগারে জমা করেন। এভাবে সরকারি কোষাগার পূর্ণ হতে লাগল, অন্যদিকে জালালুদ্দিন খিলজির আমীর ও কর্মকর্তাদের মধ্যে দুই-তিনজন ছাড়া বাকি সবাই কয়েক মাসের মধ্যেই বিস্মৃত কাহিনীতে পরিণত হলেন। [১]

কোনো কিছুই এক অবস্থায় স্থির থাকে না
নতুনত্বের স্বাদ থেকেই জগতের মেজাজ গঠিত
জগতের প্রশান্তির সৌন্দর্য সর্বদা নতুন নামে
ধরিত্রী মাতা সর্বদা নতুন জাতিসমূহের গর্ভধারিণী
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৫৭, ৩৫৮; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি রচিত): পৃষ্ঠা ২৫০, ২৫১

রাজ্য বিস্তার

রাজ্য বিস্তার ছিল আলাউদ্দিন খিলজির প্রধান লক্ষ্য। তিনি সিংহাসনে আরোহণের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ৬৯৭ হিজরিতে এই কাজ শুরু করেন এবং বিভিন্ন আমিরকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠিয়ে বিশাল এলাকা দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

গুজরাট বিজয়:

আলাউদ্দিনের শাসনামলে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য বিজয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ৬৯৯ হিজরিতে তিনি তাঁর ভাই আলমাস বেগ (উলুগ খান) এবং নুসরাত খানের নেতৃত্বে গুজরাট দখলের জন্য সেনাবাহিনী পাঠান। রাজা রায় করণ বাঘেলা ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, আশি হাজার পদাতিক এবং ত্রিশটি যুদ্ধহস্তী নিয়ে ময়দানে আসেন, কিন্তু আলমাস বেগের বাহিনী যখন কাছে পৌঁছাল, তখন রাজার সাহস হারিয়ে গেল এবং তিনি পালিয়ে গেলেন। অন্যদিকে তাঁর ধনভাণ্ডার, হাতি এবং তাঁর রানিরা দিল্লি বাহিনীর কবজায় চলে আসে। রানিদের মধ্যে ‘কমলা দেবী’ ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী, যাঁকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে আলাউদ্দিন খিলজি তাঁকে নিজের হারামে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

দিল্লি বাহিনী রাজধানী ‘আনহিলওয়ারা’ দখল করার পর অন্যান্য সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ শহর যেমন খাম্বাত ইত্যাদিও জয় করে এবং সেখান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করে। হিন্দুরা সোমনাথ মন্দির পুনরায় নির্মাণ করেছিল এবং সেখানে সোমনাথ মূর্তির পূজাও পুনরায় শুরু হয়েছিল। ফলে দিল্লির বাহিনী সেই মন্দিরটি পুনরায় ধ্বংস করে দেয় এবং বড় মূর্তিটিকে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেয়, যেখানে সেটিকে রাজপথে ফেলে রাখা হয় যাতে তা মানুষের পায়ের নিচে পদদলিত হতে থাকে। [১]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৭৬; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৮; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ২৫১; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ২৫২, ২৫৩। সতর্কবার্তা: ফিরিশতা একে ৬৯৭ হিজরির শুরু, মুবারক শাহ একে ৬৯৮ হিজরি এবং আল্লামা বারানি একে আলাউদ্দিনের সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয় বছরের শুরুর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। (ফিরোজ শাহী: পৃ. ২৫১) ফিরিশতার বর্ণনা নিশ্চিতভাবেই ভুল। বারানির বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে সঠিক এবং সিংহাসনে আরোহণকে জিলহজ ৬৯৬ হিজরি হিসেবে গণ্য করলে এই অভিযানকে ৬৯৯ হিজরির শুরুতে ধরা উচিত।

দ্রষ্টব্য: মাহমুদ গজনভির উত্তরসূরিদের আমলে গুজরাট মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কয়েক দশক পর কুমার পাল নামক রাজা (১১৩৩ খ্রি.) সোমনাথ মন্দিরকে পুনরায় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে নির্মাণ করেছিলেন। (জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৪৭৫) আলমাস বেগের এই আক্রমণের প্রসঙ্গে ফিরিশতা উল্লেখ করেছেন যে, সেখানে একটি বিখ্যাত মূর্তি ছিল যা ‘সোমনাথ’-এর সমনাম ও সমমর্যাদার ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই নতুন সোমনাথ মন্দির ও তার মূর্তির কথাই উল্লেখ করছেন, যেমনটি তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নওমুসলিম মোগলদের বিদ্রোহ এবং নুসরাত খানের জুলুম:

গুজরাট থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল অনেক বেশি ছিল কিন্তু তখনও তা বণ্টন করা হয়নি। যখন ফেরার পথে সেনাবাহিনী জালোর (যোধপুর রাজ্য) দুর্গের কাছে পৌঁছাল, তখন নুসরাত খান এবং আলমাস বেগ (উলুগ খান) সেনাবাহিনীর অফিসারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন যেন তারা গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়। কিন্তু মোগল নওমুসলিম অফিসাররা, যাদের মধ্যে চারজন প্রধান আমীর ছিলেন, মাল জমা দিতে অস্বীকার করলেন। কারণ তারা বিজয়ের পর প্রচুর গনিমতের মাল সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলোকে নিজেদের মালিকানা মনে করতেন। নুসরাত খান এবং আলমাস বেগ এর জবাবে কঠোরতা ও নির্যাতনের পথ বেছে নিলেন এবং তাদের লাঠি দিয়ে পেটানো হলো। এটি দেখে অনেক সৈন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রায় দুই-তিন হাজার বিদ্রোহী সৈন্য একত্রিত হয়ে মালিক নুসরাত এবং আলমাস বেগের তাঁবুতে আক্রমণ করে। এতে নুসরাত খানের ভাই ইজ্জুদ্দিন নিহত হন। এছাড়া আলমাস বেগের তাঁবুতে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির এক ভাগ্নেও অবস্থান করছিলেন—বিদ্রোহীরা তাকেও আলমাস বেগ মনে করে হত্যা করে।

অল্প সময়ের মধ্যেই আলমাস বেগ এবং নুসরাত তাদের অনুগতদের সংগঠিত করে বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ করেন, যার ফলে তারা টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী নওমুসলিম মোগল আমীররা ধরা না দিয়ে বরং হিন্দু রাজাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে সক্ষম হন।

যখন নুসরাত এবং আলমাস বেগ দিল্লি ফিরে এলেন এবং আলাউদ্দিন খলজিকে পুরো ঘটনা শোনালেন, তখন বিজয়ের আনন্দের চেয়ে তার রাগ ও প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা বেশি প্রবল হলো। তিনি বিদ্রোহী নওমুসলিম আমীরদের স্ত্রী ও সন্তানদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আরও বেশি জুলুমের জন্য নুসরাত খান এগিয়ে এলেন। তিনি বিদ্রোহীদের নারী ও শিশুদের আলাদা করে ফেললেন। শিশুদের মেথরদের (ভাঙ্গি) হাতে তুলে দিয়ে নির্দেশ দিলেন যেন তাদের মায়েদের সামনেই শিশুদের মাথা পাথরে আছড়ে পিষে ফেলা হয় যতক্ষণ না তারা মারা যায়। এভাবে জুলুমের এক নগ্ন নৃত্য শুরু হলো। নিষ্পাপ শিশুরা (যাদের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য শিশুও ছিল) ধুনিত তুলার মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এরপর নারীদের মেথরদের হাতে তুলে দেওয়া হলো যেন তারা তাদের নিজেদের ঘরে নিয়ে যায় এবং তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। এই নিরপরাধ মা ও নিষ্পাপ শিশুরা এমন জুলুমের শিকার হলো যা বর্ণনা করলে কলিজা ফেটে যায়।

আল্লামা বারানি লিখেছেন যে, এর আগে কেউ কল্পনাও করেনি যে একজনের অপরাধের শাস্তি তার স্ত্রী-সন্তানদেরও দেওয়া যেতে পারে। দিল্লিতে এটিই ছিল জুলুমের প্রথম এমন ভয়াবহ দৃষ্টান্ত যা দেখে মানুষ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। [১]

---

[১] (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী: পৃ. ২৫৩) লেখক এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত মনে করেন, কিন্তু সেই যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিক বারানি (যার বাবা ও চাচা এই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) এই সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন। আফসোস, ইসলামের মতো সুন্দর দ্বীনের অনুসারী দাবিদাররা এমন পাশবিকতা প্রদর্শন করে ইসলামকে কলঙ্কিত করেছে এবং ইতিহাসে জুলুমের এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছে যা দেখে মানবতা লজ্জায় মাথা নত করে।

নিজের চরিত্র থেকে বিচ্যুত হওয়া মানুষ দেখেছি
আমি মানুষের রূপে হিংস্র পশু দেখেছি
আগে কেবল অপরাধীই তার পাপের শাস্তি পেত
এখন তো নিরপরাধীদের ঘাড়েও ফাঁসির দড়ি দেখেছি

রণথম্ভোর অভিযান - সুলতানের ওপর প্রাণঘাতী হামলা:

গুজরাট বিজয়ের পর ফিরে আসার সময় নওমুসলিম মঙ্গোলরা বিদ্রোহ করেছিল, তারা পিছু হটে রণথম্ভোরের রাজার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। আলাউদ্দিনের জন্য রাজার এই ধৃষ্টতা ছিল অসহ্য যে তিনি তার শত্রুদের আশ্রয় দেবেন। প্রথমে তিনি রাজাকে হুমকি দিলেন যা কোনো কাজে আসেনি, তখন তিনি আলমাস বেগ (উলুগ খান)-কে সৈন্য দিয়ে পাঠিয়ে 'ঝাইন' জয় করে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে বললেন। অন্যদিকে নুসরাত খান, যাকে অযোধ্যার সুবাদার করা হয়েছিল, তাকেও নির্দেশ দেওয়া হলো যেন তিনি নিজের প্রদেশের সৈন্য নিয়ে এই রণাঙ্গনে পৌঁছান। এত বিশাল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও রণথম্ভোর অবরোধ অত্যন্ত দীর্ঘ ও কঠিন প্রমাণিত হলো। একদিন দুর্গ থেকে নিক্ষেপ করা একটি পাথরের আঘাতে নুসরাত খান আহত হলেন এবং কয়েকদিন পর মৃত্যুবরণ করলেন। ওদিকে অবরুদ্ধরা সাহসী হয়ে উঠল এবং তাদের বারো হাজার অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য দুর্গ থেকে অতর্কিতে বের হয়ে এমনভাবে আক্রমণ করল যে আলমাস বেগকে পালিয়ে 'ঝাইন'-এ আশ্রয় নিতে হলো। এই পরিস্থিতিতে আলাউদ্দিন খিলজি নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লি থেকে এখানে চলে এলেন। এর ফলেও দুর্গের পতন হলো না।

এই সময়ে সুলতানের ভাতিজা সুলাইমান শাহ ওরফে আকত খান, যিনি উকিল-ই-দার এর উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুলতানের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন। একদিন সুলতান সিংহ শিকারে বের হলেন। তিনি একটি মোড়হে (বেতের আসন) বসে সিংহের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং বাকি সৈন্যরা সিংহকে তাড়িয়ে তার দিকে নিয়ে আসছিল। এমন সময় আকত খান তার একদল নওমুসলিম ভৃত্যকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তার নির্দেশে বিদ্রোহী সৈন্যরা সুলতানের ওপর তীর চালাতে শুরু করল। সুলতান দ্রুত মোড়হের আড়াল নিলেন। একজন গোলাম সামনে এসে সুলতানকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনটি বা চারটি তীরের আঘাত খেলেন। ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ঢাল নিয়ে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। যাই হোক, দুটি তীর সুলতানের বাহুতে বিঁধল এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। যখন আক্রমণকারীরা ঘোড়া থেকে নেমে কাছে এল যাতে সুলতানের শিরশ্ছেদ করতে পারে, তখন রাজকীয় দেহরক্ষীরা তলোয়ার বের করে বাধা দিল এবং তাদের বলল: "বাদশাহ মারা গেছেন, এখন মাথা কেটে কী লাভ।"

আকত খান অচেতন সুলতানকে মৃত মনে করলেন এবং রাজকীয় তাঁবুতে গিয়ে নিজের বাদশাহ হওয়ার ঘোষণা দিলেন। ওদিকে রাতের বেলা সুলতানের জ্ঞান ফিরলে তিনি ভাবলেন ঝাইন দুর্গে গিয়ে আলমাস বেগের সাহায্য নেবেন। কিন্তু একজন ঘনিষ্ঠ মালিক হামিদউদ্দিন তাকে বোঝালেন যে অবিলম্বে রাজকীয় তাঁবুর দিকে যাত্রা করুন, আপনাকে দেখে সেনাবাহিনী কদমবুসি করার জন্য দৌড়ে আসবে।

https://t.me/BoierSomahar

আলাউদ্দিনও তাই করলেন। জঙ্গলে ঘেরাও হয়ে রাজকীয় ছাতা উঁচু করলেন এবং তার ছায়ায় চলতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় যখন আকত খাঁ নিজের বাদশাহ হওয়ার মোবারকবাদ গ্রহণ করছিলেন, বাদশাহ তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং তাকে দেখামাত্রই তার সৈন্যরা তার চারপাশে জড়ো হয়ে গেল। আকত খাঁ পালিয়ে গেল কিন্তু রাজকীয় সৈন্যরা তাকে ধাওয়া করে আফগানপুর থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। তার শিরশ্ছেদ করে দিল্লিতে ঘোরানো হলো এবং তার সাথে তার ভাই 'কুতলুগ খাঁ'কেও হত্যা করা হলো।

রণথম্বোর অবরোধ যথারীতি চলতে থাকল। যখন কোনো উপায় কার্যকর হচ্ছিল না, তখন সুলতানের নির্দেশে হাজার হাজার সৈন্য মাটি এনে কেল্লার সামনে ফেলতে শুরু করল, এমনকি কেল্লার সমান একটি কৃত্রিম টিলা তৈরি হয়ে গেল। এর ঢাল বেয়ে সৈন্যরা কেল্লার প্রাচীরে উঠে দখল করতে সক্ষম হলো। অবশেষে কেল্লাটি জয় হলো। এই অবরোধ বসন্তের শুরুতে শুরু হয়ে বর্ষার পরে শেষ হয়েছিল। কেল্লা থেকে প্রচুর গনীমতের মাল হিসেবে অগণিত সোনা-রূপা ও ধন-রত্ন হস্তগত হলো, যা নিয়ে আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লিতে ফিরে এলেন। এটি ৭০০ হিজরি (১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। যাওয়ার সময় তিনি তার ভাই আলমাস বেগ (উলুগ খাঁ)-কে এই অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করে যান। [১]

আলমাস বেগের মৃত্যু:

যখন আকত খাঁ সুলতান আলাউদ্দিনের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল এবং সুলতানকে মৃত মনে করা হয়েছিল, তখন সেই রাতে এই গুজব "ঝাইন কেল্লায়" সুলতানের ভাই আলমাস বেগ (উলুগ খাঁ) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি তা বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি তার অনুগতদের গোপনে একত্রিত করে পরামর্শ চাইলেন এবং বললেন: "যদি বাদশাহ ইন্তেকাল করে থাকেন, তবে সালতানাত চালানোর জন্য আমি উপস্থিত আছি। বাদশাহর গুলস্তানের বাগান আমিই এবং আমার ছাড়া অন্য কারো বাদশাহ হওয়া শোভা পায় না।"

পরে যখন সুলতানের হত্যার খবর মিথ্যা প্রমাণিত হলো, তখন সেই মজলিসে উপস্থিত কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি সুলতানকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। আলাউদ্দিন আগে থেকেই তার ভাইয়ের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রভাব নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। এই খবর জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করল এবং তিনি তার গুপ্তচরদের নির্দেশ দিলেন যেন আলমাস বেগকে শেষ করে দেওয়া হয়। ফলে এই নির্দেশ কার্যকর করা হলো। আলমাস বেগকে শরবতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হলো, যার ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন কিন্তু পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হলো। যেমনটি তিনি জালালুদ্দিন খিলজির সাথে করেছিলেন, তার সাথেও তেমনটিই ঘটল। [২]

হাজি মওলার বিদ্রোহ:

যখন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি রণথম্বোর অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন পেছনে দিল্লিতে একটি ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীদের...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী: পৃ. ২৭২ থেকে ২৭৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১/৩৬ থেকে ৩৭; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ২৭১ থেকে ২৭৭; খাজাইন-উল-ফুতুহ আজ আমির খসরু: পৃ. ৫০, ৫১, প্রকাশনা ন্যাশনাল বুক একাডেমি পাকিস্তান, ১৯৭৯ খ্রি.।

[২] (ফুতুহ-উস-সালাতিন আজ ইসামি: পৃ. ২৪২) আলমাস বেগকে বিষ দেওয়ার ঘটনাটি কেবল ইসামি বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে অন্যান্য ঐতিহাসিকরা সংক্ষেপে লিখেছেন যে তিনি অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী: পৃ. ২৭৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা: ১/৩৭) যদি কর্মফলের আইন দেখা যায়, তবে ইসামির বর্ণনাটিই সঠিক মনে হয়।

এর মূল হোতার নাম ছিল হাজি মওলা, যে দিল্লির প্রাক্তন কোতোয়াল ও আমীরুল উমারা মালিক ফখরউদ্দীনের গোলাম ছিল। জালালুদ্দীন খিলজির শাসনামলে সে দিল্লির কারাগারের দারোগা হয়েছিল এবং বর্তমানেও একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হতো।

সে দিল্লি থেকে সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগ নিল। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল সুলতান ইলতুতমিশের এক মেয়ের বংশধর জনৈক আলভী ব্যক্তি 'শাহ নিমা'কে পুতুল শাসক বানানো এবং তার আড়ালে নিজে শাসন করা।

সে দিনগুলোতে দিল্লির কোতোয়াল মালিক তিরমিজি জনগণের ওপর কঠোরতা করছিল এবং মানুষ তার ওপর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হাজি মওলার বিশ্বাস ছিল যে, সে যদি এই কোতোয়ালকে হত্যা করে তবে দিল্লির জনগণ খুশি হয়ে তাকে সমর্থন দেবে। সে সুলতানের নামে একটি জাল ফরমান তৈরি করল এবং তা নিয়ে দুপুরের সময় মালিক তিরমিজির প্রাসাদে পৌঁছাল এবং বলল যে সুলতানের একটি বার্তা এসেছে। যখন তিরমিজি বাইরে এল, তখন হাজি মওলার ইশারায় তার সঙ্গীরা তাকে হত্যা করল। প্রত্যক্ষদর্শীরাও মনে করল যে তাকে সুলতানের নির্দেশেই হত্যা করা হয়েছে। এরপর সে সুলতানের প্রাসাদ 'কুশকে লাল'-এ ঢুকে পড়ল এবং সেখান থেকে বন্দিদের মুক্ত করে দিল এবং যে ধন-সম্পদ, অস্ত্র ও ঘোড়া হস্তগত হলো তা নিজের সমর্থকদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। এরপর সে শাহ নিমাকে সিংহাসনে বসাল এবং সালতানাতের কর্মকর্তাদের তার আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) নিতে বাধ্য করল।

আলাউদ্দীন খিলজি রণথম্ভোর (থানপুর) রণাঙ্গনে বিদ্রোহের খবর পেলেন, তখন তিনি এই খবরটি চেপে গেলেন এবং রণথম্ভোর অবরোধ অব্যাহত রাখলেন। এদিকে দিল্লিতে আলাউদ্দীন খিলজির একজন অনুগত কর্মকর্তা মালিক হামিদউদ্দীন অনুগত সৈন্যদের একত্রিত করে এই বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব নিলেন। তিনি গোপনে দিল্লি থেকে বের হলেন। লোকজনের সাথে দেখা করে তাদের নিজের সমর্থক বানালেন এবং তারপর হঠাৎ দিল্লিতে ঢুকে পড়লেন। শহরে হাজি মওলা ও তার সঙ্গীদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হলো। মালিক হামিদউদ্দীন নিজে পায়ে হেঁটে হাজি মওলার ওপর আক্রমণ করলেন এবং তাকে ঘোড়া থেকে নিচে ফেলে দিয়ে তার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করলেন। যদিও হাজি মওলার সমর্থকরা মালিক হামিদউদ্দীনকে অনেক আঘাত করল এবং তিনি আহতও হলেন, কিন্তু তিনি হাজি মওলার মাথা কেটেই ক্ষান্ত হলেন। এরপর বিদ্রোহীদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আর হামিদউদ্দীন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে পুতুল আলভী শাসক শাহ নিমার মাথাও কেটে ফেললেন এবং বর্শার মাথায় তা প্রদর্শন করলেন। এভাবে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা হলো।

আলাউদ্দীন খিলজিকে এই সাফল্যের সংবাদ জানানো হলো। শীঘ্রই তার পক্ষ থেকে একজন কর্মকর্তা একটি সেনাদল নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন। তিনি বিদ্রোহীদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরও শূলে চড়ালেন। এমনকি মালিক ফখরউদ্দীন কোতোয়ালের ছেলেদের কেবল এই কারণে হত্যা করা হলো যে হাজি মওলা তাদের পরিবারের পালিত ছিল, অথচ বিদ্রোহে তাদের কোনো হাত ছিল না। [১]

চিতোর বিজয়:

জমাদিউল আখিরা ৭০২ হিজরি (জানুয়ারি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ)-এ সুলতান 'চিতোর' [২] বিজয়ের সংকল্প করে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হলেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ১০৩, ৩৭১

[২] চিতোর, যাকে এখন 'চিতোরগড়' বলা হয়, ভারতের রাজস্থান রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চল 'মেওয়ার'-এ অবস্থিত। দিল্লি থেকে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম =

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

এই কেল্লাটি একটি পৃথক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল যার দৈর্ঘ্য ছিল তিন মাইল এবং প্রস্থ এক মাইলেরও বেশি। পাহাড়ের উচ্চতা ছিল প্রায় পাঁচশ ফুট। এর খাড়া চড়াইয়ের শেষ প্রান্তে চিতোর কেল্লা ছিল যার প্রাচীর ছিল চল্লিশ ফুট উঁচু। এখানে পানির পর্যাপ্ত ভাণ্ডার ছিল। পাহাড়ের পূর্বে দুটি নদী ছিল: 'গম্ভীড়ি' এবং 'বেড়াচ', যা একে অপরের সাথে মিলিত হতো। কেল্লায় অনেক প্রাকৃতিক ঝরনা ছিল। জায়গায় জায়গায় বাগান ছিল যার মাঝে ছোট-বড় '৮৪'টি পুকুর ছিল। কেল্লার উত্তরে 'চিতোরি' নামক একটি পাহাড় ছিল। আলাউদ্দিন খিলজি এই পাহাড়েই তাবু গেড়ে চিতোর কেল্লায় আক্রমণ শুরু করেন।

অবশেষে ছয় মাসের দীর্ঘ ও কঠোর অবরোধের পর মহররম ৭০৩ হিজরিতে এই কেল্লা বিজিত হয়। আলাউদ্দিন এর শাসনভার তার পুত্র খিজির খানের নামে করে দেন এবং এই কেল্লার নাম 'খিজিরবাদ' রাখেন। [১]

রানি পদ্মাবতীর সাহসিকতা:

চিতোর বিজয়ের পর আলাউদ্দিন সেখানে তার পুত্র খিজির খানকে নামমাত্র শাসক নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা পূর্বের ন্যায় স্থানীয় সরদারদের হাতেই ছিল। আলাউদ্দিন রাজা রতন সেনকে গ্রেপ্তার করে তার রাজপ্রাসাদের একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর আলাউদ্দিন খিলজি জানতে পারেন যে, রাজার মেয়ে পদ্মাবতী [২] দীর্ঘদেহী, কালো চোখ এবং অন্যান্য গুণাবলীতে রূপ ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। আলাউদ্দিনের মনে কৌতূহল জাগল যে, অন্তত একবার এই রূপসীকে দেখে নেবেন।

তিনি বন্দি রাজাকে বললেন যে, যদি তিনি মুক্তি চান তবে মেয়েটিকে ডেকে এনে তাকে দেখান। রাজা এই বার্তা চিতোরে তার সরদারদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারা এটি শুনে ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু পদ্মাবতী তাদের একটি পরিকল্পনা বোঝালেন। তা হলো চিতোরের অনেক সৈন্যকে নারীর বেশে পালকিতে করে দিল্লির রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে এবং প্রকাশ করা হবে যে পদ্মাবতী আসছেন। সেখানে পৌঁছে তারা রাত কাটানোর অজুহাতে বাহানা করবে যে রাজার ঘরের মহিলারা রাজপ্রাসাদ ভ্রমণ করতে চায়। এভাবে রাজপ্রাসাদে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তারা বন্দিশালার কাছে পৌঁছে যাবে এবং আক্রমণ করে রাজাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে।

ফলশ্রুতিতে এই পরিকল্পনা সফলতার সাথে কার্যকর করা হলো এবং আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে এই লোকেরা রাজাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। যদিও...

সতর্কবার্তা: মেওয়ার একটি আলাদা অঞ্চল এবং মারওয়ার আলাদা। মেওয়ার রাজস্থানের দক্ষিণে অবস্থিত এবং উদয়পুর, চিতোরগড়, ভিলওয়ারা এবং প্রতাপগড় জেলা নিয়ে গঠিত। এটি দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং এর সদর দপ্তর উদয়পুর থেকে দিল্লির দূরত্ব প্রায় ৭২০ কিলোমিটার। অন্যদিকে মারওয়ার রাজস্থানের পশ্চিম অংশে থর মরুভূমির অংশ এবং এতে যোধপুর, নাগৌর এবং পালির মতো জেলাগুলো অন্তর্ভুক্ত। এটি দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং এর সদর দপ্তর যোধপুর থেকে দিল্লির দূরত্ব প্রায় ৬২০ কিলোমিটার।

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮০; ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ২৭৯ থেকে ২৮১; খাযাইনুল ফুতুহ আয আমির খসরু: পৃষ্ঠা ৬০।
দ্রষ্টব্য: খিজির খানের বয়স তখন ছিল প্রায় দশ বছর, অর্থাৎ তিনি নিজে কেল্লার ব্যবস্থাপনা করার যোগ্য ছিলেন না। তাই নিশ্চিতভাবেই কোনো নায়েব এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

[২] ফিরিশতা শুরুতে একে রাজা রতন সেনের স্ত্রী বলেছেন— "সম্ভ্রান্ত সুলতানদের কাছে খবর পৌঁছাল যে... নারীদের মধ্যে রাজা চিতোরের এক স্ত্রী আছে, যার নাম পদ্মিনী।" (পৃষ্ঠা ৩৯০) কিন্তু আগে গিয়ে তিনি তার বর্ণনায় লিখেছেন যে পদ্মাবতী রাজার মেয়ে "পদ্ম"। (ঐ) অন্যদিকে মালিক মুহাম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবত'-এ তাকে রাজার স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হিন্দু মহলে এই বিষয়টিই বেশি প্রসিদ্ধ বরং নিশ্চিত।

আলাউদ্দিনের সৈন্যরা ধাওয়া করল এবং সংঘর্ষে অনেক রাজপুত মারা গেল, কিন্তু রাজা রতন সিং কোনোভাবে চিতোর পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে দুর্গে আবদ্ধ হয়ে চারপাশের এলাকায় গেরিলা হামলা শুরু করে দিলেন।

আলাউদ্দিন এই অবস্থা দেখে এটাই ভালো মনে করলেন যে চিতোরের শাসনভার রাজপুতদের হাতেই থাকতে দেওয়া হোক। তিনি শাহজাদা খিজির খানের কাছ থেকে চিতোরের শাসনভার ফিরিয়ে নিলেন এবং ওই রাজারই ভ্রাতুষ্পুত্রকে, যে আগে থেকেই দিল্লির দরবারের চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, চিতোরের নায়েব নিযুক্ত করলেন। এই রাজা আলাউদ্দিনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁর অনুগত ছিলেন। প্রতি বছর তিনি তাঁর রাজ্যের সেরা উপহার নিয়ে দিল্লির দরবারে উপস্থিত হতেন। এ ছাড়া যখনই আলাউদ্দিন তাঁকে কোনো যুদ্ধ বা পারস্পরিক সাহায্যের জন্য ডাকতেন, তিনি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং দশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে সেই অভিযানে শরিক হতেন [১]।

গুজরাট পুনরুদ্ধার, আল্প খানের আমীরত্ব:

৬৯৯ হিজরিতে যখন আলমাস বেগ এবং নুসরাত খান গুজরাট জয় করে ফিরে এলেন, তখন গুজরাটের রাজা রায় করণ কিছুকাল পর সুযোগ বুঝে তাঁর রাজ্যের রাজধানী ‘আনহিলওয়ারা’ [২]-এর ওপর পুনরায় দখল প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে ৭০৬ হিজরিতে আলাউদ্দিন খিলজি তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি আহমদ ঝিম (কারা বেগ)-এর নেতৃত্বে গুজরাটে সৈন্য পাঠান। ‘আনহিলওয়ারা’-তে এমন আকস্মিক হামলা হয়েছিল যে রায় করণ এবারও কোনো প্রতিরোধ করতে পারেননি। তিনি ‘বাগলানা’ [৩]-এর দিকে পালিয়ে যান এবং ‘আনহিলওয়ারা’ পুনরায় মুসলমানদের দখলে চলে আসে [৪]।

এই সাফল্যের পর আহমদ ঝিম দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং গুজরাটের ব্যবস্থাপনার জন্য আলাউদ্দিন খিলজি তাঁর শ্যালক আল্প খানকে নিযুক্ত করেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ, যোগ্য এবং কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজি সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাস পর যখন জালালউদ্দিন খিলজির বংশধরদের কাছ থেকে মুলতান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তখন সেখানকার সুবাদারিও আল্প খানের হাতেই ছিল, কিন্তু গুজরাটকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আল্প খানকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। আল্প খান গুজরাটের ব্যবস্থাপনা এমন চমৎকার ও দক্ষতার সাথে করেছিলেন যে সবাই তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিল [৫]।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯০, ৩৯১।

দ্রষ্টব্য: চিতোরের রানী পদ্মিনী এবং সুলতান আলাউদ্দিনের মধ্যে যা কিছু ঘটেছিল, তার বাস্তবতা ছিল এইটুকুই। পদ্মিনীর বাকি বিখ্যাত কাহিনী নিছক কাল্পনিক এবং ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই।

[২] আনহিলওয়ারা (আরবিতে নহরওয়ালা)-কে প্রাচীনকালে পত্তন (পতন)-ও বলা হতো। এটি প্রাচীন গুজরাটের রাজধানী ছিল এবং বর্তমান ভারতের গুজরাট রাজ্যের পাটান জেলায় অবস্থিত। আনহিলওয়ারা ৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে চাওড়া বংশের রাজা বনরাজ চাওড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে এটি সোলাঙ্কি বংশের রাজধানী হয়। মুসলিম শাসকদের আগমনের পর এটি বেশ কয়েকবার জয় করা হয়েছিল।

[৩] বাগলানা একটি ছোট রাজ্য বা এলাকার নাম ছিল যা মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সীমান্তে, দৌলতাবাদ ও গোলকুন্ডার মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথে অবস্থিত ছিল। এটি ঐতিহাসিক শহর বুরহানপুরের কাছে অবস্থিত। বাগলানা বহু শতাব্দী ধরে একটি স্বাধীন রাজপুত সালতানাত হিসেবে বিদ্যমান ছিল এবং বিভিন্ন মুসলিম শাসক যেমন খিলজি, বাহমানি, গুজরাট সুলতান ও মুঘলদের কর প্রদান করত। এর ভৌগোলিক গুরুত্বের কারণে এটি দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ছিল। এই এলাকাটি তার পাহাড়ি দুর্গ এবং দুর্ভেদ্য ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যও বিখ্যাত ছিল, যার মধ্যে সালহের এবং মুলহের দুর্গ উল্লেখযোগ্য।

[৪] ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃষ্ঠা ২৮৬ থেকে ২৮৮।

তারীখে উম্মত

৭০৭ হিজরিতে আল্প খানকে রাজকীয় ফরমান দেওয়া হয় যে, রায় করণকে ‘বাগলান’-এর পাহাড়ি এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হোক। ফলে আল্প খান এই অভিযানে রওনা হন। রায় করণ এখানে দুই মাস পর্যন্ত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করেন। যা-ই হোক, তিনি পরাজিত হন এবং পালিয়ে যান। আল্প খান দেবগিরির শহরতলি পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করেন কিন্তু তাকে ধরতে পারেননি। পরে জানা যায় যে, তিনি ‘ওয়ারাঙ্গল’-এ আশ্রয় নিয়েছেন। যা-ই হোক, এই অভিযানের পর গুজরাট পুরোপুরিভাবে দিল্লি সালতানাতের অংশ হয়ে যায়। [১]

---

[১] (জামে তারিখ হিন্দ, পৃ. ৫৬৮) সম্ভবত আলাউদ্দিন খিলজিকে ওয়ারাঙ্গল বিজয়ে উৎসাহিত করার একটি বড় কারণ এটিও ছিল যে, সেখানে তার একজন বিরোধী আশ্রয় নিয়েছিল।

https://t.me/BoierSomahar

মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধসমূহ

জালালুদ্দীন খিলজির শাসনামলে (৬৮৯ হিজরি) হিন্দুস্তানকে বারবার মঙ্গোলদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মঙ্গোলরা বিভিন্ন অঞ্চল যেমন মাওয়ারাননহর, খোরাসান এবং ইরান থেকে আসত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অধিকাংশ তখনও অমুসলিম ছিল। জালালুদ্দীন খিলজি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের মোকাবিলা করেন এবং বেশ কয়েকবার তাদের পরাজিত করেন। মঙ্গোলদের এই আক্রমণগুলো সুলতানের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। নিচে আমরা এই মঙ্গোলদের সাথে জালালুদ্দীন খিলজির যুদ্ধের বিবরণ দিচ্ছি।

মঙ্গোলদের প্রথম আক্রমণ: জালালুদ্দীন খিলজির যুদ্ধ

সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ৬৯১ হিজরিতে সুলতান জালালুদ্দীন খিলজি সংবাদ পান যে, হালাকু খানের পৌত্র আবদুল্লাহ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্তান আক্রমণ করেছে। মঙ্গোলরা সিন্ধু নদ পার হয়ে সুনাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন খিলজি দিল্লি থেকে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। মঙ্গোলরা সিন্ধু নদ পার হয়ে সুনাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন খিলজি তাদের গতিরোধ করেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [১]

এই যুদ্ধে মঙ্গোলরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাদের অনেক সৈন্য নিহত হয় এবং অনেকে বন্দি হয়। আবদুল্লাহ সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং সসৈন্যে ফিরে যান। তবে মঙ্গোলদের একটি দল যার নেতৃত্বে ছিলেন চেঙ্গিস খানের বংশধর উলুগ খান (আলঘ খান), তারা ইসলাম গ্রহণ করে ভারতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সুলতান জালালুদ্দীন খিলজি তাদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং দিল্লির কাছে তাদের বসবাসের জন্য জায়গা দেন, যা পরবর্তীতে ‘মুঘলপুরা’ নামে পরিচিত হয়। [২]

সুলতান জালালুদ্দীন খিলজি মঙ্গোলদের মোকাবিলা করার জন্য তাঁর ভাই আলমাস বেগ (উলুগ খান) এবং...

---

[১] সুলতান জালালুদ্দীন খিলজির আমলে মঙ্গোলদের সাথে দুটি বড় যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথমটি ৬৯১ হিজরিতে আবদুল্লাহর সাথে এবং দ্বিতীয়টি... (এখানে যুদ্ধের তারিখ ও সেনাপতিদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে)।

[২] উলুগ খান এবং তার সঙ্গীদের ইসলাম গ্রহণ এবং দিল্লিতে তাদের বসতি স্থাপনের বিস্তারিত বিবরণ। তারা ‘নও মুসলিম’ (নতুন মুসলমান) হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং দিল্লির কাছে ‘মুঘলপুরা’ নামক স্থানে তাদের পুনর্বাসন করা হয়েছিল।

দিপালপুরের শাসক গাজী মালিক তুঘলককে অর্পণ করলেন। [১] তারা উভয়ই ২ রবিউল আউয়াল ৬৯৮ হিজরিতে শতদ্রু নদীর তীরে "জলন্ধর"-এর কাছে মঙ্গোল বাহিনীর সামনে পৌঁছে গেলেন। [২] এবং সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন নৌকার সাহায্য ছাড়াই নদী পার হয়। এভাবে যখন বাহিনী নদী পার হলো, তখন মঙ্গোলদের ওপর ত্রাস ছেয়ে গেল। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো যাতে মঙ্গোলরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো এবং তারা বিশ হাজার লাশ ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। [৩]

সিহওয়ানের যুদ্ধ:

যে সময় আলমাস বেগ এবং নুসরাত খান গুজরাট বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন, আলাউদ্দিন খিলজির সবচেয়ে যোগ্য সেনাপতি জাফর খান মুলতান থেকে সিন্ধুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন কারণ "চলদি" নামক এক মঙ্গোল সরদার সিন্ধুর রাজনৈতিক কেন্দ্র সিউস্তান (সিহওয়ান শরীফ) দখল করে নিয়েছিল। জাফর খান তার বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চালান। তিনি সিহওয়ানকে এমন কঠোরভাবে অবরোধ করেন যে সেখানে একটি পাখিও ডানা ঝাপটাতে পারত না। পাথর নিক্ষেপ এবং অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে তিনি অবরুদ্ধদের ওপর চাপ বাড়াতে থাকেন। অবশেষে মানজানিকের (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) মাধ্যমে প্রাচীর ভেঙে ফেলা হলো এবং মঙ্গোলরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। জাফর খান সিন্ধুতে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে কয়েক সপ্তাহ পর যখন দিল্লিতে ফিরে এলেন, তখন মঙ্গোল সরদার তার ভাই এবং শত শত সৈন্যসহ বন্দী হিসেবে তার সাথে ছিল। এটি ৬৯৯ হিজরি (১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [৪]

মঙ্গোলদের দ্বিতীয় আক্রমণ: দিল্লির বাইরে "কিলি"-র যুদ্ধ:

এই ব্যর্থ আক্রমণগুলোর পর তুর্কিস্তানের মঙ্গোল শাসক দাওয়া খান তার পুত্র কুতলুগ খাজাকে দুই লক্ষ অশ্বারোহী দিয়ে দিল্লি দখলের জন্য পাঠালেন। পাঞ্জাবের সীমান্ত দুর্গগুলোর বাহিনী দুই লক্ষ মঙ্গোলদের প্লাবনের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হলো এবং এভাবে ৭০০ হিজরিতে মঙ্গোলরা বিনা বাধায় দিল্লির কাছে পৌঁছে গেল এবং শহর থেকে ছয় মাইল দূরে কিলিতে তাবু গাড়ল। [৫] আশেপাশের সমস্ত জনপদ এবং ছোট শহরগুলোর অধিবাসীরা ভীত হয়ে দিল্লিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। গলি এবং মসজিদগুলো শরণার্থীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। চারদিকে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছিল। আলাউদ্দিন দূত পাঠিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাহিনী তলব...

---

[১] (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৭২) এই মালিক তুঘলকই পরবর্তীতে তার বীরত্বপূর্ণ কাজের কারণে গাজী মালিক নামে পরিচিত হন এবং পরবর্তী যুগে তিনিই তুঘলক শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং গিয়াসউদ্দিন তুঘলক উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

[২] আল্লামা বারানির মতে এই যুদ্ধ জলন্ধরে হয়েছিল। তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে যুদ্ধক্ষেত্রকে "মাঞ্জুর" এবং আমির খসরুর খাজাইনুল ফুতুহ-এ "জারান মাঞ্জুর" বলা হয়েছে। হতে পারে এটি "জলন্ধর"-এর প্রাচীন নাম। অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে জলন্ধর ছিল জেলা এবং মাঞ্জুর ছিল সেই নির্দিষ্ট ময়দান যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল।

[৩] (খাজাইনুল ফুতুহ: পৃ. ৩৩ থেকে ৩৬) আমির খসরু এটিকে ৬৯৭ হিজরির ঘটনা বলেছেন কিন্তু লেখক পূর্ববর্তী টীকায় ব্যাখ্যা করেছেন যে সেই সময় আলমাস বেগ মুলতান দখলের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তাই এই তারিখ এবং অনুমান বলে যে সঠিক সময়কাল হলো ৬৯৮ হিজরি।

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ২৫৩, ২৫৪; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩৩০; ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ২৫১

[৫] আল্লামা বারানি আলাউদ্দিনের সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয় বছরের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে এই আক্রমণকেও সেই বছরের শেষের দিকের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয় বছরের শেষ মাস হলো জিলহজ ৬৯৯ হিজরি। মঙ্গোলরা যদি সেই সময় আক্রমণ করে থাকে, তবে তাদের দিল্লি পৌঁছাতে পৌঁছাতে নতুন হিজরি সাল শুরু হয়ে যাওয়ার কথা, তাই লেখক এর সময়কাল ৭০০ হিজরি থেকে নির্ধারণ করেছেন।

করে নিয়েছিল এবং এখন অনেক দুর্গ ও শহরের বাহিনী দিল্লির বাইরে সমবেত হচ্ছিল। কিছু আমির সুলতানকে যুদ্ধ পরিহার করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি অটল স্বরে বললেন: "বাদশাহর জন্য যুদ্ধ দেখে ভীত হওয়া শোভা পায় না।"

এমন সময় শহরের কোতোয়াল আলাউল মুলক সুলতানকে বললেন: "অতীতের বাদশাহদের এবং কিতাবসমূহে লিখিত উপদেশগুলোর ওপর আমল করা সমীচীন। কেবল একটি যুদ্ধের অনিশ্চিত পরিণামের খাতিরে নিজের সালতানাতকে বিপদে ফেলা উচিত নয়। কেন শত্রুদের কাছে দূত পাঠিয়ে আলাপ-আলোচনা ও রাজনীতির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে না এবং অন্তত কিছুটা সময় লাভ করা যাচ্ছে না?"

আলাউদ্দিন পরামর্শের জন্য বাকি আমিরদের তলব করলেন। তাদের সামনে আলাউল মুলকের যুক্তিগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন, তার অনেক প্রশংসা করলেন এবং বললেন: "সে উজির হওয়ার যোগ্য, কিন্তু আমি তার অত্যধিক স্থূলতার কারণে তাকে কেবল দিল্লির কোতোয়াল নিযুক্ত করেছি।" তারপর তিনি নিজের সিদ্ধান্ত এভাবে শোনালেন:

"প্রবাদ আছে যে, তুমি উট চুরি করে দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারো না। ঠিক তেমনি এটাও সম্ভব নয় যে, তুমি দিল্লির ওপর রাজত্ব করবে আর এমন বিপদ থেকে বেঁচেও থাকতে পারবে। শত্রু দুই হাজার ক্রোশ (চার হাজার মাইল) পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং দিল্লির (কুতুব) মিনারের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে ললকার দিচ্ছে। এই সময়ে যদি আমি কোনো দুর্বলতা দেখাই, তবে জনগণের চোখে আমার কোনো সম্মান অবশিষ্ট থাকবে না এবং সাহসী যোদ্ধা সৈন্যদের চোখেও না। বরং আগামী প্রজন্ম আমার দাড়ি নিয়ে উপহাস করবে। কক্ষনো না। ফলাফল যাই হোক না কেন। আমি আগামীকাল 'কিলি'র দিকে যাত্রা করব এবং কুতলুগ খানের সাথে লড়াই করেই ছাড়ব। আমি দেখব যে আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে কাকে বিজয় দান করেন।"

সুলতান চাইতেন না যে নিজের ধ্বংসের সাথে দিল্লি এবং দেশকেও টেনে আনবেন, তাই প্রাসাদ ও শহরের হেফাজতের দায়িত্ব আলাউল মুলকের ওপর অর্পণ করে তাকে বললেন: "যে বিজয় লাভ করবে, তুমি এই চাবিগুলো তারই হাতে তুলে দিও এবং তার অনুগত থেকো।"

মোদ্দাকথা, আলাউদ্দিন তিন লক্ষ অশ্বারোহী এবং দুই হাজার সাতশ হাতির সাথে কিলির দিকে রওনা হলেন। তার ভাই আলমাস বেগ এবং রুকন খান বাম পার্শ্বে মোতায়েন ছিলেন। ডান পার্শ্ব ছিল তার বিখ্যাত জেনারেল জাফর খানের কমান্ডে। আলাউদ্দিন নিজে বারো হাজার অশ্বারোহী ও হাতির সাথে মূল কেন্দ্রে (কলব) ছিলেন। 'কিলি'র রণক্ষেত্রে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে এর আগে এত বড় দুটি বাহিনী কখনো একে অপরের মোকাবিলা করেনি।

যুদ্ধ শুরু হতেই জাফর খান ডান পার্শ্বের জানবাজদের নিয়ে শত্রুর বাম পার্শ্বের (মায়সারা) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের পেছনে হটিয়ে দিলেন। হাতির পালও সামনে এগিয়ে গিয়ে মঙ্গোলদের পিষ্ট করতে লাগল। এদিকে অন্যান্য আমিররাও নিজ নিজ প্রতিপক্ষ শত্রুর সারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মঙ্গোলরা পিছু হটতে বাধ্য হলো।

জাফর খান তার সেনাদল নিয়ে কয়েক মাইল পর্যন্ত তাদের তাড়া করতে থাকলেন, কিন্তু বাদশাহর ভাই আলমাস বেগ, যিনি জাফর খানের বীরত্বের কারণে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন, তাড়া করা বন্ধ করে দিলেন। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, জাফর খান মঙ্গোলদের পেছনে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অনেক দূরে চলে গেলেন এবং তার সাথে থাকা বাহিনী মঙ্গোলদের তুলনায় অল্প রয়ে গেল। মঙ্গোলদের বাম...

পার্শ্ববর্তী বাহিনীর সরদার তর্গী খান এই দুর্বলতা বুঝতে পেরে নিজের দশ হাজার সৈন্যকে টিলা ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন। যখন জাফর খানের বাহিনী মঙ্গোলদের অবশিষ্ট লশকরকে ধাওয়া করে আঠারো মাইল দূরে পৌঁছে গেল, তখন তর্গী খান পেছন থেকে আক্রমণ করে বসলেন। ওদিকে সামনে থেকে কুতলুগ খান ফিরে এসে আক্রমণ করলেন। জাফর খান দীর্ঘক্ষণ বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকলেন এবং তাঁর সঙ্গীরা একে একে শহীদ হতে থাকলেন। অবশেষে জাফর খানের ঘোড়াও আহত হয়ে পড়ে গেল। তখনও তিনি হার মানেননি এবং রক্ষণাত্মক ভঙ্গি অবলম্বন করে তীর চালাতে লাগলেন। তাঁর প্রতিটি তীরে একজন করে মঙ্গোল সওয়ার ধরাশায়ী হচ্ছিল।

কুতলুগ খান এই দৃশ্য দেখে বার্তা পাঠালেন: “অস্ত্র নামিয়ে রাখো। আমি তোমাকে আমার পিতার কাছে নিয়ে যাব। আমাদের সালতানাতে তোমাকে এখনকার চেয়েও বড় পদ ও মর্যাদা দেওয়া হবে।”

কিন্তু জাফর খান অস্ত্র ত্যাগ করেননি এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুর তীরাঘাতে আহত হয়ে নিজের সঙ্গীদের সাথে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। ইতিহাসে তাঁর নাম সাহস ও বীরত্বের প্রতীক হয়ে রইল, এমনকি মঙ্গোলরাও তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিল। যা-ই হোক, এই যুদ্ধের পর মঙ্গোলরা নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে দিল্লি থেকে পিছু হটে ৯০ মাইল দূরে গিয়ে তাবু গাড়ল। এরপর প্রতিদিন ষাট মাইল করে পথ অতিক্রম করে সিন্ধু নদ পার হয়ে নিজেদের রাজ্যে চলে গেল। [১]

মঙ্গোলদের তৃতীয় আক্রমণ: দিল্লির কাছে পরিখা যুদ্ধ:

৭০২ হিজরিতে আলাউদ্দিন খিলজি দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী ওয়ারঙ্গল জয় করার জন্য একটি বিশাল বাহিনী পাঠান, যা প্রতিকূল আবহাওয়া ও বৃষ্টির কারণে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে সেখানেই আটকে পড়ে। ওদিকে আলাউদ্দিন খিলজি চিতোর অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন।

রাজধানীতে আলাউদ্দিনের অনুপস্থিতি এবং তাঁর বাহিনীর দূরবর্তী রণাঙ্গনগুলোতে ছড়িয়ে পড়ার খবর পেয়ে মঙ্গোল সরদার তর্গী খান আবারও অভিযানে বের হলেন এবং এক লক্ষ বিশ হাজার অভিজ্ঞ যোদ্ধা নিয়ে দ্রুততার সাথে সিন্ধু নদ পার হয়ে এলেন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত কেল্লাবেষ্টিত শহরসমূহ: মুলতান, দিপালপুর এবং সামানায় এত সৈন্য ছিল না যে তাকে রুখতে পারে, তাই তর্গী খান দিল্লির দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন।

আলাউদ্দিনও সময়মতো অবগত হয়ে দিল্লির দিকে ছুটলেন এবং মঙ্গোলদের যমুনা নদী পর্যন্ত পৌঁছানোর এক মাস আগেই শহরে প্রবেশ করলেন। তাঁর অধিকাংশ সৈন্য অন্যান্য রণাঙ্গনে ব্যস্ত ছিল এবং অনেক আমীর দূরবর্তী এলাকাগুলোতে মোতায়েন ছিলেন। আলাউদ্দিন দ্রুত বিভিন্ন শহর থেকে সাহায্যকারী বাহিনী তলব করলেন, কিন্তু সেই বাহিনী পৌঁছানোর আগেই মঙ্গোল সেনাদল দিল্লির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে শুরু করল। তারা যমুনার সমস্ত পুল ও ঘাট দখল করে নিল এবং চারপাশের মহাসড়কগুলোতে অবরোধ সৃষ্টি করল যাতে দিল্লির জন্য সাহায্য পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরপর আক্রমণকারীরা দিল্লি শহর ও শহরতলীতে হামলা চালাল।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬১, ৩৬২; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারনি: পৃষ্ঠা ২৫৪ থেকে ২৬১; ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ২৫৯ থেকে ২৭০।

আসা-যাওয়া এবং শস্য লুটপাটের সিলসিলা শুরু করে দিল। দিল্লিতে তখন ভয়ের এমন এক পরিবেশ ছিল যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। আলাউদ্দিন খলজির কাছে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য ছিল। তিনি তাদের নিয়ে শহর থেকে কয়েক মঞ্জিল দূরে মঙ্গোলদের মুখোমুখি হলেন এবং শিবিরের চারদিকে পরিখা খনন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপের কারণে মঙ্গোলরা সরাসরি আক্রমণ করতে পারেনি, তবে তাদের তৎপরতায় অনেক মুসলিম সৈন্য শহীদ ও আহত হন। এভাবে দুই মাস অতিবাহিত হলো। দিল্লির প্রতিরোধের শক্তি ক্রমশ কমে আসছিল। মনে হচ্ছিল শহরটি বড়জোর আর এক মাস প্রতিরোধ করতে পারবে এবং এরপর মঙ্গোলদের দখলে চলে যাবে।

এই সময়ে দিল্লিতে হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর উত্থানকাল ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে খাজা সাহেবের কাছে বিশেষ দোয়ার আবেদন জানালেন যেন এই বিপদ দূর হয়ে যায়। আল্লাহর ওলীর দোয়া কবুল হলো এবং যে মঙ্গোলরা দুই মাস ধরে দিল্লি অবরোধ করে রেখেছিল, তারা হঠাৎ করেই ফিরে গেল। [১]

নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা:

এই যুদ্ধের পর আলাউদ্দিন খলজি চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, ভবিষ্যতে যেন মঙ্গোলরা সালতানাতের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ না পায়। ফলে তিনি একটি সুসংহত রণকৌশলের অধীনে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে শুরু করেন। জায়গায় জায়গায় নতুন দুর্গ নির্মাণ করা হলো। পুরনো দুর্গগুলোকে মজবুত করা হলো এবং সেখানে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করা হলো। অস্ত্র তৈরির কারখানা খোলা হলো এবং বাহিনীকে উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত করা হলো। এই ব্যবস্থার ফলে মঙ্গোলরা ভবিষ্যতে আর কখনো দিল্লির কাছে ঘেঁষতে পারেনি বরং প্রতিবারই পথ থেকেই তাদের পিছু হটতে বাধ্য করা হয়েছে। [২]

আলাউদ্দিনের পথভ্রষ্টতা এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন:

আলাউদ্দিন খলজি যদিও জনগণের কল্যাণকামী এবং প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত সক্রিয় শাসক ছিলেন, তবুও তিনি শরয়ি জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবং ওলামাদের থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণেও বিশেষ আগ্রহ রাখতেন না। এরপর যখন তিনি সমস্ত বিরোধীদের দমন করলেন, তখন তাঁর অহংকার ও দম্ভ দিন দিন বাড়তে লাগল। বিশেষ করে দুই লক্ষ মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি খুতবায় নিজেকে "সিকান্দার-ই-সানি" বলাতে শুরু করলেন এবং ভোগবিলাস ও মদ-কাবাবের নেশায় মত্ত হয়ে পড়লেন।

ফলে তিনি বিভ্রান্ত অবস্থায় এমন সব আজেবাজে কথা বলতে শুরু করলেন যা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের মাথায় আসতে পারে না। তিনি ইসলাম, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদিকে মিলিয়ে একটি নতুন অভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করার কথা ভাবতে লাগলেন যা সালতানাত ও প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং এর ফলে ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই সাথে তিনি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মতো পুরো পৃথিবী জয়ের পরিকল্পনা করতে লাগলেন, যদিও তৎকালীন বাস্তবতার নিরিখে তা সম্ভব ছিল না।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৩০০-৩০২; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৩৮১; ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ২৮৬, ২৮৫।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৩০২।

তিনি তাঁর বিশেষ পারিষদদের বলতে শুরু করেছিলেন: “আমার সামনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা রয়েছে। বলো এগুলো আমি কীভাবে সম্পন্ন করব। প্রথমটি হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শক্তি ও শৌর্য দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা চার খলিফা সুসংহত করেছিলেন। আমিও যদি আমার চারজন বিশ্বস্ত পারিষদ: আলমাস বেগ, উলুগ খান, মালিক জাফর খান এবং মালিক নুসরাত খানকে সাথে নিয়ে একটি নতুন দ্বীন উদ্ভাবন করি, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আমার নাম জীবিত থাকবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হলো, আমার কোষাগার ও সেনাবাহিনী আমার ধারণার চেয়েও বেশি, তাই কেন আমি রাজধানী দিল্লি কোনো প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করে নিজে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মতো পুরো পৃথিবী জয় করতে বেরিয়ে পড়ব না।”

আলাউদ্দিন খিলজির কঠোরতা দেখে সাধারণ দরবারিদের সাহস হতো না যে তাঁর চিন্তাধারার সমালোচনা করবে। সবাই তাঁর ক্রোধ ও রোষকে ভয় পেত, তাই তারা অধিকাংশ সময় চুপ থাকত, অন্যদিকে কিছু চাটুকার প্রশংসা ও স্তুতি করে তাঁর বিভ্রান্তির নেশাকে আরও বাড়িয়ে দিত। ধীরে ধীরে এই কথাগুলো রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে আল্লাহর ওলিদের কাছেও পৌঁছাতে লাগল।

দিল্লির খাজা হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাদশাহর এই প্রবণতা দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি দোয়া করছিলেন যেন আল্লাহ তাআলা বাদশাহকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দেন এবং এই ফিতনা যেন আর সামনে না বাড়ে।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা এই কাজটি দিল্লির বয়োবৃদ্ধ এবং অত্যন্ত স্থূলকায় কোতোয়াল আলাউল মুলককে দিয়ে করালেন, যিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী ও সত্যবাদী মানুষ এবং সেই সাথে ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কেও বেশ অবগত ছিলেন। তিনি প্রতি মাসের পহেলা তারিখে বাদশাহর বিশেষ মজলিসে উপস্থিত হতেন।

একদিন বাদশাহ বিশেষ মজলিসে আলাউল মুলককে সম্বোধন করে ওই দুটি পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন।

আলাউল মুলক যখন বাদশাহর বিভ্রান্তিকে এই পর্যায়ে পৌঁছাতে দেখলেন, তখন মনে মনে ভাবলেন যে এটি আমার শেষ বয়স। জীবনের বাকি কয়েকটা দিনের জন্য বাদশাহর চাটুকারদের দলে শামিল হয়ে নিজের দ্বীন কেন বরবাদ করব। তাই পরিণামের পরোয়া না করে সত্য কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আরজ করলেন: “মজলিস থেকে বহিরাগতদের সরিয়ে দিলে আমি আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী কিছু আরজ করব, যা পছন্দ হলে কবুল করবেন, অন্যথায় আমার মতো সত্তর-বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধকে ক্ষমা করে দেবেন।”

বাদশাহ তা কবুল করলেন এবং বিশেষ পারিষদ ছাড়া সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। তখন আলাউল মুলক বললেন:

“হুজুর ওয়ালা! দ্বীন, শরীয়ত এবং ধর্মের কাজ নবীদের, বাদশাহদের নয়। দ্বীন ও শরীয়ত আসমানী ওহীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, মানুষের মতামতের সাথে নয়। হযরত আদম থেকে শুরু করে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত দ্বীন ও শরীয়তের কাজ আম্বিয়ায়ে কেরামই করেছেন, অন্যদিকে বাদশাহরা দেশ শাসন ও বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। হ্যাঁ, কিছু নবী বাদশাহিও করেছেন, কিন্তু যতদিন এই পৃথিবী থাকবে কোনো বাদশাহ নবী হতে পারবেন না।”

“আরজ এই যে হুজুর ওয়ালা! ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপের কথা কখনোই মুখে আনবেন না। অন্যথায় খাস ও আম মানুষ যখন তা জানতে পারবে, তখন সবাই আপনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং এক বিশাল ফিতনা সৃষ্টি হবে। কোনো মুসলমান আপনার সাথে থাকবে না। এই চিন্তা যা মানুষের শক্তির বাইরে, তা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলুন। দেখুন, চেঙ্গিস খান এবং তাঁর বংশধররা বছরের পর বছর চেষ্টা করেছে এবং মুসলমানদের...”

রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছিল যাতে দ্বীন-ই মুহাম্মদীকে মিটিয়ে দিতে পারে এবং নিজেদের ধর্মকে প্রচার করতে পারে, কিন্তু এমনটি হয়নি। একজন মুসলমানও মঙ্গোলদের ধর্ম গ্রহণ করেনি, বরং এর বিপরীতে অধিকাংশ মঙ্গোলই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

আলাউদ্দিন খিলজি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং তারপর সম্মত হয়ে বললেন: "তুমি যা বলেছ তা সঠিক ও সত্য। ইনশাআল্লাহ তাআলা এখন আমি আর সম্মিলিত ধর্ম তৈরির কথা ভাবব না। দ্বিতীয় পরিকল্পনা (বিশ্ব জয়) সম্পর্কে তোমার মতামত জানাও।"

আলাউল মুলক আরজ করলেন: "এই মতামত সঠিক। আগেও অনেক বড় বড় বাদশাহ এর জন্য কোমর বেঁধেছিলেন, তাই আপনিও অবশ্যই এমনটি করতে পারেন। আমি এটি অস্বীকার করছি না। কিন্তু হুজুর, প্রথমে ভালো করে ভেবে দেখুন যে দিল্লির সালতানাত কত পরিমাণ জান-মালের কোরবানি এবং রক্তপাতের পর অর্জিত হয়েছে। এটি তো অবশ্যই হতে পারে যে আপনি কাউকে এখানে নিজের নায়েব বানিয়ে বিশ্ব জয়ের জন্য বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু এর কী গ্যারান্টি আছে যে যখন ফিরে আসবেন তখন এই সালতানাতের ওপর তাকেই আসীন পাবেন না?"

"আপনি বর্তমান সময়কে সিকান্দার-ই আজমের সময়ের সাথে তুলনা করবেন না। সেই সময় গাদ্দারি এবং ছলচাতুরি এই পর্যায়ে ছিল না। মানুষ নিজেদের অঙ্গীকারের ওপর শতাব্দী পার হয়ে গেলেও অটল থাকত। আবার সিকান্দারের কাছে এরিস্টটলের মতো উজির ছিল যার চিন্তাশক্তির কারণে বিশ্ব জয় করা সহজ হয়ে গিয়েছিল এবং তার কৌশলের কারণে রাজ্য এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও একে ঐক্যবদ্ধ রাখা কঠিন ছিল না।"

"যদি হুজুর ওয়ালারও নিজের উমরা এবং নিজের প্রজাদের ওপর সিকান্দারের মতো ভরসা থাকে, তবে এমন অভিযানে বের হতে কোনো বাধা নেই। আর যদি এমনটি না হয়, তবে এই অভিযান সমীচীন নয়।"

আলাউদ্দিন চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর বললেন: "যদি আমি এই আশঙ্কার কারণে দেশ জয়ের জন্য না বের হই এবং এই দেশেই সন্তুষ্ট থাকি, তবে এত বড় লস্কর আর খাজানা কী কাজে আসবে? সিকান্দারের মতো খ্যাতির উদ্দেশ্য তবে কীভাবে অর্জিত হবে?"

আলাউল মুলক আরজ করলেন: "বাদশাহর সামনে অবিলম্বে এমন দুটি অভিযান রয়েছে যে সমস্ত খাজানা তাতে ব্যয় হয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। আপনার সামনে দাক্ষিণাত্য দেশ রয়েছে, রণথম্ভোর এবং চিতোরের মতো কেল্লা রয়েছে, একইভাবে পূর্ব দিকে কাবুল পর্যন্ত এলাকা রয়েছে। এই সব দিক বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল। যদি এগুলো জয় হয়ে যায় তবে হিন্দুস্তান সমস্ত ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।"

"দ্বিতীয় অভিযান হলো মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যারা প্রায়ই আক্রমণ করে থাকে। তাদের প্রতিরোধের জন্য কেল্লা নির্মাণ করা, পরিখা খনন করা, শস্য, দানা, ঘাস ও খাদ্যের মজুদ গড়ে তোলা। মানজানিকসহ সব ধরনের অস্ত্র তৈরি করে রাখা জরুরি।"

"হুজুর! রাজধানী দিল্লিতে নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন এবং মুখলিস গোলামদের অভিযানে পাঠান যাতে তারা এই সমস্ত দিক জয় করে দখলে নিয়ে আসে এবং সারা বিশ্বে হুজুরের বিশ্বজয়ের চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই বিষয়টি তখনই অর্জিত হতে পারে যখন হুজুর ওয়ালা পানাহার এবং আমোদ-প্রমোদ ও শিকারে মগ্ন থাকা থেকে বিরত থাকবেন।"

আলাউদ্দিন খিলজির মনে এই কথাগুলো গেঁথে গেল। তিনি আলাউল মুলকের প্রশংসা করলেন এবং তাকে খিলাত-ই ফাখেরা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

কথোপকথনের সময় কোমল, অনুসন্ধানের সময় তপ্ত

যুদ্ধক্ষেত্র হোক বা সভা, পবিত্র হৃদয় ও নিষ্কলুষ।

সত্যের কম্পাসের কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লাহর বান্দার বিশ্বাস,
আর এই পুরো জগত কেবল ভ্রম, জাদু ও রূপক।
(আল্লামা ইকবাল)

অধিকাংশ আমীরও, যারা বাদশাহকে গোমরাহীর মধ্যে পতিত হতে দেখে ভয়ে নিশ্চুপ ছিলেন, তারা অত্যন্ত খুশি হলেন এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে আলাউদ্দীন খলজিকে উপহার প্রদান করলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং আলাউদ্দীন খলজিকে অনেক দুআ দিলেন। [১]

মঙ্গোলদের চতুর্থ আক্রমণ - বরন (বুলন্দশহর)-এর যুদ্ধ:
তরঘি খান এই ব্যর্থ আক্রমণের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং পরবর্তী বছর (৭০৩ হিজরিতে) এক লক্ষ বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করে। সম্ভবত সে আলাউদ্দীনের নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছিল, তাই এবার সে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে উত্তর পাঞ্জাব থেকে হিমালয় পর্বতের পাদদেশের দিকে আসে এবং এখান থেকে দোয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করে।
এখানে বরন (বুলন্দশহর)-এর একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল যেখানে স্থানীয় শাসক ফখরুদ্দীন আমীর দাদ প্রতিরোধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন। তরঘি খানকে সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে এখানে থামতে হয়। সে শহরটি অবরোধ করে। ফখরুদ্দীন আমীর দাদ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অবরুদ্ধ অবস্থায় মোকাবিলা করতে থাকেন।
ইতিমধ্যে সুলতানের আদেশে গাজী মালিক (তুঘলক) সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছান। এখন ফখরুদ্দীন এবং গাজী মালিকের বাহিনী সম্মিলিতভাবে মঙ্গোলদের ওপর অতর্কিত নৈশ অভিযান চালায়, যার ফলে তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অনেক মঙ্গোল বন্দি হয় যাদের মধ্যে মঙ্গোল সেনাপতি তরঘি খানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের সবাইকে সুলতানের কাছে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। [২]

মঙ্গোলদের পঞ্চম আক্রমণ: আমরোহা-র যুদ্ধ:
তরঘি খানের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ৭০৪ হিজরিতে খোরাসান শাসনকারী নওমুসলিম মঙ্গোল সরদার মুহাম্মদ তর্তাক এবং চেঙ্গিস খানের নাতি আলী বেগ চল্লিশ হাজার দ্রুতগামী অশ্বারোহী নিয়ে হিন্দুস্তান আক্রমণ করে। তারাও তরঘি খানের মতো উত্তর পাঞ্জাব থেকে হিমালয় পর্বতের পাদদেশের নিকটবর্তী এলাকায় চলে আসে এবং দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি বাহিনী সিরমুর থেকে বিয়াস নদী পর্যন্ত এলাকা লুণ্ঠন করতে শুরু করে, অন্যদিকে দ্বিতীয় বাহিনী নাগোর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। [৩]
আলাউদ্দীন খলজি এই অবস্থা দেখে তার শ্রেষ্ঠ অফিসারদের: মালিক নায়েক [৪] এবং গাজী মালিক তুঘলককে মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করলেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ২৬৩ থেকে ২৭১; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬২ থেকে ৩৬৭।
[২] (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৭৩) এটি স্পষ্ট নয় যে তরঘি খানের সাথে কী আচরণ করা হয়েছিল। প্রবল ধারণা এই যে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকবে।
[৩] (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৭৩) এই অভিযানের সাল উল্লেখ নেই, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এটিই বোঝা যায় যে এটি ৭০৪ হিজরির ঘটনা।
[৪] মালিক নায়েককে ইসামি "মালিক নানক" বলেছেন, আমীর খসরু তাকে মালিক মানিক বলেছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ তাকে মালিক নায়েক লিখেছেন। তিনি একজন হিন্দু অফিসার ছিলেন অথবা নওমুসলিম হিন্দুদের মধ্য থেকে ছিলেন। কিছু অনুবাদক ভুলবশত তাকে মালিক নায়েব (কাফুর হাজার দিনারি) মনে করেছেন যা সম্পূর্ণ ভুল।

এবং কঠোর নির্দেশ দিলেন যে মঙ্গোলদের মধ্যে কেউ যেন জীবিত ফিরে যেতে না পারে। এই দুই সেনাপতি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সেই দিকে যাত্রা করলেন। দিল্লির বাহিনী যখন আমরোহায় পৌঁছাল, তখন জানা গেল যে মঙ্গোলরা ওই এলাকাগুলো লুণ্ঠন করে অঢেল গনিমতের মাল সংগ্রহ করেছে এবং রহপ নদীর (গঙ্গা নদীর উপনদী) তীরে অগ্রসর হচ্ছে।

গাজী মালিক (তুঘলক) এবং মালিক মানিকও সামনে অগ্রসর হলেন। অবশেষে দুই বাহিনীর মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো যাতে মঙ্গোলরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। তাদের অসংখ্য সৈন্য নিহত হলো এবং বাকিরা বন্দি হলো। [১]

মঙ্গোলদের উভয় সরদার আলী বেগ এবং মুহাম্মদ তারতাকও ধরা পড়ল। মালিক মানিক এবং গাজী মালিক (তুঘলক) বিশ হাজার ঘোড়া এবং হাজার হাজার বন্দি নিয়ে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ শহরের বাইরে এক বিশাল দরবার আয়োজন করলেন। দিল্লি ও আশপাশের হাজার হাজার নাগরিক এই দৃশ্য দেখার জন্য সমবেত হলো। বাদশাহ মঙ্গোল সরদার উভয়কে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে এবং বন্দিদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। গনিমতের ঘোড়াগুলো অফিসারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হলো। এই বিজয়ের সম্মানে গাজী মালিককে পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করা হলো। [২]

গুজরাটে মঙ্গোলদের আক্রমণ:

৭০৫ হিজরিতে মঙ্গোলদের একটি বাহিনী সিন্ধুর দিকে ধেয়ে আসে। এই লোকেরা মরুভূমি অতিক্রম করে গুজরাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে তারা গুজরাটের সমৃদ্ধির কথা শুনে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার নিয়তে আসছিল, কারণ তাদের সাথে বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশুও ছিল। গুজরাটের প্রখ্যাত সুবাদার আল্প খান এই সংবাদ শুনে বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। অন্যদিক থেকে গাজী মালিক দিপালপুর থেকে তার সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছালেন। উভয় মিলে মঙ্গোলদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। মঙ্গোলদের বন্দিশালায় থাকা হাজার হাজার হিন্দুস্তানিকে মুক্ত করা হলো। আঠারো হাজার অশ্বারোহী এবং তিন হাজার নারী অশ্বারোহী বন্দি করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [৩]

মঙ্গোলদের ষষ্ঠ আক্রমণ:

৭০৬ হিজরি (১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে দুই মঙ্গোল সরদার “ইকবাল মান্দাহ” এবং “কুবাক” এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবে অগ্রসর হয়। কিন্তু ভাতিন্দায় মোতায়েন দিল্লি সালতানাতের বাহিনী তাদের পথরোধ করে এবং এমন পাল্টা আক্রমণ চালায় যে ইকবাল মান্দাহ নিহত হয় এবং বাকি মঙ্গোল বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ৩২০-৩২১; ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ৩০১-৩০৩; খাজাইনুল ফুতুহ: পৃষ্ঠা ৩৭-৪০।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ৩২০-৩২১; খাজাইনুল ফুতুহ আজ আমির খসরু: পৃষ্ঠা ৩৯-৪৩; ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৫।

[৩] (ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯) ইসামি এই আক্রমণের তারিখ উল্লেখ করেননি, তবে প্রসঙ্গের বিচারে এটি ৭০৫ হিজরির ঘটনা। ফায়দা: যদি সিউয়ান (সিন্ধু) এবং গুজরাটে মঙ্গোলদের আক্রমণকে স্বতন্ত্র আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে আলাউদ্দিনের যুগে তাদের আক্রমণের সংখ্যা আটটি হয়।

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ৩২২।

মোগলরা পিছু হটে মুলতানের দিকে চলে গেল এবং শহরতলিতে লুটতরাজ শুরু করল। ওদিক থেকে গাজী মালিক এবং মালিক নায়েক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। মোগলরা এটি দেখে ফিরে যেতে লাগল কিন্তু গাজী মালিক এবং মালিক নায়েক তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং তাদের এমনভাবে পিষ্ট করলেন যে লাশের স্তূপ জমে গেল, আর তাদের সর্দার 'কবক' সহ প্রচুর মোগল বন্দী হলো। [১]

বন্দীদের দিল্লিতে পাঠানো হলো যেখানে তাদের অফিসারদের হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে হত্যা করা হলো। বাকি বন্দীদের হত্যা করে তাদের মাথার খুলি দিয়ে মিনার তৈরি করা হলো যাতে জনগণের মন থেকে মঙ্গোলদের আতঙ্ক দূর হয়ে যায়।

আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলে এটি ছিল ভারতে মঙ্গোলদের শেষ আক্রমণ। এরপর দিল্লি থেকে মুলতান ও লাহোর পর্যন্ত পুরো এলাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে গেল এবং চারদিকে সমৃদ্ধি ও শান্তির সুবাতাস বইতে লাগল। [২]

ওদিকে গাজী মালিক তাতারীদের ভীত করার জন্য তাদের এলাকাগুলোতে আক্রমণাত্মক হামলা শুরু করে দিলেন। তিনি দিপালপুরের কেল্লাকে কেন্দ্র বানিয়ে সেখান থেকে প্রতি বছর কাবুল, কান্দাহার এবং গজনীর দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে লাগলেন। এভাবে শত্রু নিজের আত্মরক্ষায় বাধ্য হলো এবং ভারত জয়ের চিন্তা তার মন থেকে মুছে গেল। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৭৪; খাজাইনুল ফুতুহ, আমির খসরু: পৃ. ৪৪, ৪৩

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৩২২; তারিখ-ই-ফেরেশতা (ফারসি): পৃ. ৩৯২, ৩৯৩; খাজাইনুল ফুতুহ, আমির খসরু: পৃ. ৪৫; ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ৩১৭ থেকে ৩২২

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা (ফারসি): পৃ. ৩৯৩; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, জাকাউল্লাহ দেহলভি: পৃ. ৪৫

https://t.me/BoierSomahar

দক্ষিণ ভারতের বিজয়সমূহ

মঙ্গোলদের হাত থেকে উপমহাদেশকে সফলভাবে রক্ষার পর আলাউদ্দিন খিলজির কীর্তিগুলোর মধ্যে দক্ষিণ ভারত বিজয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে কোনো মুসলিম বিজয়ী দক্ষিণ ভারতকে পদানত করতে সফল হননি। এই অঞ্চলগুলো রাজধানী থেকে অনেক দূরে ছিল এবং সেগুলোর পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। সুলতানের প্রিয় গোলাম মালিক কাফুর এই কঠিন অভিযান সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন একজন খোজা, অত্যন্ত সুশ্রী, যোগ্য, দক্ষ এবং যোদ্ধা। নিজের গুণাবলীর কারণে তিনি "হাজার দিনারি" নামে পরিচিত ছিলেন। ৬৯৯ হিজরিতে যখন গুজরাট বিজয় হয়, তখন বিজয়ী বাহিনী তাকে গুজরাটের রাজার মালিকানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আলাউদ্দিনের সামনে পেশ করে। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং আলাউদ্দিন তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ করে "মালিক নায়েব" উপাধি দেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তার ওপর আস্থা রাখতে শুরু করেন। [১]

নিচে আমরা দক্ষিণ ভারতের বিজয়সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি:

ওয়ারঙ্গলের অভিযান:

৭০২ হিজরিতে (১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ) আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের "তেলেঙ্গানা" রাজ্যের রাজধানী ওয়ারঙ্গল বিজয়ের জন্য একটি বাহিনী পাঠান, যেখানে সেই সময় কাকতীয় বংশের রাজা রায় প্রতাপ শাসন করছিলেন। [২]

যেহেতু সেই সময় পর্যন্ত "মালব" বিজয় হয়নি, তাই স্থলপথে দক্ষিণ ভারতে আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল। [৩] ফলে সুলতানের নির্দেশে বাহিনী বাংলার উপকূলে পৌঁছে নৌকায় করে সমুদ্রপথে তেলেঙ্গানায় পৌঁছায়, কিন্তু এই সময়ে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় এবং এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৮, ৩৫৯; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ২৫১, ২৫২।

[২] প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে "ওয়ারঙ্গল"-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা তেলেঙ্গানা রাজ্যের একটি শহর। এর বর্তমান নামও এটিই। এটি তেলেঙ্গানার পূর্ব অংশে অবস্থিত এবং রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এটি হায়দ্রাবাদ থেকে প্রায় ১৫৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। দিল্লি থেকে এটি ১৫৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ওয়ারঙ্গল ছিল কাকতীয় বংশের রাজধানী, যারা দ্বাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে শাসন করত। এই শহরটি তার ঐতিহাসিক দুর্গ, মন্দির এবং স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত।

[৩] মালব এই অভিযানের দুই বছর পর ৭০৫ হিজরিতে (১৩০৫ খ্রিস্টাব্দ) বিজয় হয়েছিল, যার ফলে দিল্লি থেকে দক্ষিণ ভারতের স্থলপথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

[৪] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮০, ৪০১।

মালব ও উজ্জয়িনী বিজয়:

এই অভিযানের ব্যর্থতা থেকে আলাউদ্দিন খিলজি এই শিক্ষা গ্রহণ করেন যে, দক্ষিণ ভারত কেবল স্থলপথেই জয় করা সম্ভব। তাই সেখানে কোনো অভিযানের আগে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো জয় করা অপরিহার্য। ফলে ৭০৪ হিজরিতে (১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে) সুলতান আইনুল মুলক মুলতানিকে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে মালব, উজ্জয়িনী ও চান্দেরি বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। মালবের শাসক কোকা এক লক্ষ পদাতিক ও চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মোকাবিলায় আসেন। তবে আইনুল মুলক এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাকে পরাজিত করেন এবং ১০ জমাদিউল আউয়াল ৭০৪ হিজরিতে এর রাজধানী মান্ডু দখল করে নেন।

আইনুল মুলক সুলতান আলাউদ্দিন খিলজিকে মালব, উজ্জয়িনী, চান্দেরি এবং এর আশপাশের বিশাল এলাকা বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে পত্র লেখেন। আলাউদ্দিন খিলজি এতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পুরো দিল্লিতে এক বিশাল উৎসব পালিত হয়। অলিগলিতে মিষ্টি ও হালুয়া বিতরণ করা হয়।

জালোয়ারের শাসক কানহড় দেব যখন মান্ডু মুসলমানদের দখলে যাওয়ার খবর পেলেন, তখন তিনিও নিরাপত্তা লাভ করে দিল্লিতে চলে আসেন এবং সুলতানের অধীনে আমিরদের অন্তর্ভুক্ত হন। [১]

দেওগিরি পুনর্দখল:

মঙ্গোলদের আক্রমণের কারণে আলাউদ্দিন তিন বছর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে মনোযোগ দিতে পারেননি। এরপর যখন তিনি পুনরায় বিজয়ের কথা ভাবলেন, তখন তিনি প্রথমে "দেওগিরি" সমস্যা সমাধান করা জরুরি মনে করলেন, যেখানে মারাঠা শাসক "রাম দেব" কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং এর ফলে সালতানাত আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল।

"রাম দেব" নিজে সালতানাতের অনুগত ছিলেন, কিন্তু তার ছেলে "ভিল্লা" এবং অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দাররা অবাধ্য হয়ে পড়েছিল এবং রাম দেবের তাদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলে তিনি নিজেই আলাউদ্দিন খিলজিকে গোপনে পত্র লিখে অনুরোধ করেন যেন বিদ্রোহীদের দমনের জন্য একটি বাহিনী পাঠানো হয়।

অবশেষে ৭০৬ হিজরিতে (১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে) আলাউদ্দিন তার যুদ্ধজয়ী সেনাপতি মালিক কাফুরকে (মালিক নায়েব) এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সেখানে পাঠান। মান্ডু (মালব) ও গুজরাটের সুবাদার আইনুল মুলক এবং আল্প খানকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তারা এই বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন এবং রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখেন।

মালিক কাফুর পথে আসা ছোট ছোট দুর্গ এবং ছোট ছোট রাজ্যের রাজাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ ও আলোচনার মাধ্যমে বশীভূত করে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই দেওগিরি পৌঁছে যান।

রাজা রাম দেব, তার ছেলে ভিল্লা এবং সেনাপতি "রঘু" মোকাবিলায় এলেও এত বিশাল বাহিনী দেখে যুদ্ধ করার সাহস পাননি। রাম দেবও এটাই চেয়েছিলেন। পরিশেষে মারাঠারা আত্মসমর্পণ করে। মালিক কাফুর রাম দেবকে নিজের সাথে নিয়ে নেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩৮৯, ৩৯০।

দিল্লি চলে এল। আলাউদ্দিন রাম দেবকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দিলেন যার নজির মেলা ভার। তার মাথার ওপর মণি-মুক্তা ছিটানো হলো, দুই লক্ষ তঙ্কা তাকে উপহার দেওয়া হলো, সম্মানের প্রতীক হিসেবে তাকে "ছত্র সফিদ" (শ্বেত ছত্র) ও "রায় রায়ান" উপাধি দেওয়া হলো এবং পুনরায় দেওগিরির শাসক নিযুক্ত করা হলো। রাজা রাম দেব আমৃত্যু জীবিত থাকা পর্যন্ত দিল্লির সালতানাতের অনুগত রইলেন এবং মারাঠাদের সমস্ত এলাকা তারই তত্ত্বাবধানে ছিল। [১]

দক্ষিণ ভারতে আরও অভিযান — ওয়ারাঙ্গল বিজয়:

৭০৯ হিজরি (১৩০৯ খ্রিস্টাব্দ) নাগাদ আলাউদ্দিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের রাজপথগুলোও এখন তার দখলে ছিল। ফলে তিনি দক্ষিণ ভারতে পূর্ণাঙ্গ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মালিক নায়েবকে (মালিক কাফুর) একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে এই রণাঙ্গনে পাঠালেন। কাফুর দ্রুত অগ্রসর হয়ে প্রথমে দিল্লির সালতানাতের অনুগত রাজা রাম দেবের কাছে দেওগিরিতে পৌঁছালেন। রাজা সেনাবাহিনীর রসদ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ সহযোগিতা করলেন।

এরপর কাফুর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তেলেঙ্গানা রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করলেন এবং শীঘ্রই এর রাজধানী "ওয়ারাঙ্গল"-এর পাথুরে দুর্গটি এমন কঠোরভাবে অবরোধ করলেন যে অবরুদ্ধরা আর্তনাদ করতে লাগল। অবশেষে এখানকার রাজা "প্রতাপ" পরাজয় স্বীকার করে নিলেন এবং একশ হাতি, সাত হাজার ঘোড়া এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও স্বর্ণমুদ্রা পেশ করে অভয় চাইলেন এবং প্রতি বছর কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মালিক কাফুর যখন এই বিজয়ের সুসংবাদ এবং ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে এলেন, তখন আলাউদ্দিনের তার ওপর আস্থা আরও বেড়ে গেল। [২]

ধুর সমুদ্র ও মা'বার বিজয়:

৭১০ হিজরি (১৩১০ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি কাফুরকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় রাজ্য "ধুর সমুদ্র" (কর্ণাটক) [৩] এবং "মা'বার" (তামিলনাড়ু) [৪] জয় করেন। সে অনুযায়ী কাফুর সেই দিকে অভিযান চালালেন। প্রথমে তিনি "ধুর সমুদ্র" অবরোধ করলেন যা আরব সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। তখন সেখানে হোয়সালা বংশের রাজা "বীর বল্লাল রায়"-এর শাসন ছিল। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হলেন। এভাবে তার রাজ্য বিজিত হয়ে দিল্লির সালতানাতের অধীনে চলে এল। এখান থেকে ৩৬টি হাতি এবং অগণিত ধন-ভাণ্ডার দিল্লিতে পাঠানো হলো। এখানে চুন দিয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হলো যাতে আজান দেওয়া হলো এবং সুলতান আলাউদ্দিনের নামে খুতবা পাঠ করা হলো। মানুষ একে মাসজিদে আলাই বলে স্মরণ করতে লাগল।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী বারানি: পৃ. ৩২৬, ৩২৭; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯; ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী বারানি: পৃ. ৩২৭ থেকে ৩৩১; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৪০১; ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ২৮৫ থেকে ২৮৮।

[৩] "ধুর সমুদ্র"কে "দ্বার সমুদ্র"ও বলা হতো, এটি ছিল কর্ণাটকের রাজধানী। এর বর্তমান নাম "হালেবিডু"। এটি ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের হাসান জেলার কাছে অবস্থিত। এটি হোয়সালা বংশের রাজধানী ছিল যারা একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করেছিল।

[৪] মা'বার বলতে বর্তমান ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্য এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা বোঝায়। "মা'বার" একটি আরবি শব্দ যার অর্থ "পারাপারের স্থান"। আরব ও পারস্যের বণিকরা এই এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করত, তাই এর এই নাম হয়েছে। মালিক কাফুরের এই অভিযানের পঁচিশ বছর পর ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে জালালুদ্দিন আহসান খান নামক এক আমির মাদুরাইতে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

এর পর কাফুর “মা’বার” (তামিলনাড়ু) পৌঁছান যা পাণ্ড্য রাজবংশের রাজ্য ছিল। কাফুর এর রাজধানী (মাদুরাই) আক্রমণ করেন এবং তা জয় করেন। এখানে দুই রাজার শাসন ছিল। উভয়ের কাছ থেকে সমস্ত হাতি ও ধনভাণ্ডার নিয়ে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাফুর মা’বারের আশপাশের এলাকাও পদানত করেন, অনেক মন্দির ভেঙে ফেলেন এবং সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মন্দিরের ধনভাণ্ডার কবজা করে নেন।

এখানে এক জায়গায় গুপ্তধনের সন্ধান এভাবে পাওয়া যায় যে, কিছু ব্রাহ্মণ নিজেদের মধ্যে মন্দিরের নিচে পুঁতে রাখা ধনভাণ্ডার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করছিল। কোনো এক মুসলিম সৈন্য এই কথোপকথন শুনে ফেলে এবং মালিক কাফুর পর্যন্ত খবর পৌঁছে যায়। তিনি ব্রাহ্মণদের গ্রেফতার করেন। তারা মন্দিরের ধনভাণ্ডার ছাড়াও আরও অনেক জায়গায় পুঁতে রাখা সম্পদের সন্ধান দিয়ে দেয়। এভাবে এই সব কিছু মুসলমানদের হস্তগত হয়।

মালিক কাফুর দক্ষিণ ভারত থেকে অর্জিত এই বিজয়লব্ধ সম্পদ নিয়ে ৭১১ হিজরির শুরুতে দিল্লিতে পৌঁছান। তিনি সুলতানের খিদমতে ৬১২টি হাতি, ২০ হাজার ঘোড়া, ৯৬ হাজার মণ সোনা এবং সমপরিমাণ মূল্যের হীরা ও মুক্তা পেশ করেন। আল্লামা বারানির মতে, মুসলমানরা যখন থেকে হিন্দুস্তান জয় করেছে, তখন থেকে এত বিপুল পরিমাণ গনিমত আর কখনো অর্জিত হয়নি। [১]

৭১২ হিজরি (১৩১২ খ্রিস্টাব্দ) নাগাদ আলাউদ্দিন খিলজি দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজ্য জয় করে ফেলেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসক যিনি দক্ষিণ ভারতে বিজয় অর্জন করেন। তবে একই সাথে তিনি নিজের দূরদর্শিতার কারণে জানতেন যে, দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘ দূরত্ব, কঠিন মৌসুমি পরিস্থিতি এবং সেখানে মুসলিম জনবসতি না থাকার কারণে একে আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লি সালতানাতের অংশ বানানো কঠিন। তাই তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে কেবল অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেন এবং সেখানকার স্থানীয় সরকারগুলোকে বহাল রাখেন।

শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন

আলাউদ্দিন খিলজি একজন প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থনৈতিক সংস্কার করেন যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অনেক কমে যায়। তিনি প্রথম শাসক ছিলেন যিনি উপমহাদেশে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেন। তাঁর পুরো শাসনকালে কোনো জিনিসের দাম বাড়েনি।

তিনি অর্থ ব্যবস্থায়ও এমন সংস্কার করেন যার ফলে সরকারের আয় এবং জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। তিনি কর আদায় ব্যবস্থাকে উন্নত করেন। শস্য মজুদ করাকে কঠোর অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেন। যদি কোনো মজুদদার ধরা পড়ত তবে তাকে জরিমানা করা হতো এবং সমস্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করে সরকারি গুদামে জমা করা হতো।

তিনি চাষি এবং ভোক্তাদের মধ্য থেকে দূরত্ব নির্মূল করে দেন। নির্দেশ ছিল যে, চাষিরা যেন নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৩২ থেকে ৩৩৪; খাযাইনুল ফুতুহ, আমির খসরু: পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১২৯; ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৩ থেকে ২৯৫; তারিখ-ই-ফিরিশতা, কাসেম: পৃষ্ঠা ৪০৩ থেকে ৪০৬।

শস্য নিজের কাছে না রেখে বরং ফসল কাটার পরপরই ক্ষেতেই সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে বিক্রি করে নগদ মূল্য গ্রহণ করে নিতে হতো। কৃষকরা অন্যান্য শস্য ব্যবসায়ীদের কাছেও ফসল বিক্রি করতে পারত, তবে সারা দেশের শস্য ব্যবসায়ীদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে তারা যমুনা নদীর তীরে একটি নির্দিষ্ট বাজারে শস্যের গুদাম তৈরি করবে যেখানে সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সেগুলো বিক্রি করা হবে। শস্য আনা-নেওয়ার সমস্ত খরচ সরকারের দায়িত্বে ছিল যাতে পুরো দেশে শস্যের দাম সমান থাকে এবং দূরত্বের কারণে দাম বৃদ্ধি না পায়।

আলাউদ্দিনের যুগে চড়া মূল্যে বিক্রি করা কঠোর অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। বাজারে শুধুমাত্র পণ্যের নির্ধারিত মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে রাখা হতো যাতে দোকানদাররা বেশি দাম আদায় করতে না পারে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকার নেওয়া হতো যে তারা অবৈধ মুনাফাখোরি এবং বাজার সংক্রান্ত অন্যান্য অনিয়ম থেকে দূরে থাকবে। আইন লঙ্ঘনকারী ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। গোয়েন্দা পুলিশের মাধ্যমে বাজার ও মান্ডিগুলোতে দামের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হতো। উৎপাদন কম হওয়ার ক্ষেত্রে পণ্য রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেওয়া হতো। সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়। আলাউদ্দিন খিলজি আমিরদের খরচের জন্য জায়গিরের পরিবর্তে মোটা অংকের বেতন নির্ধারণ করেছিলেন এবং তাদের বিদ্রোহ করার মতো অবস্থায় রাখেননি। এই যুগে সরকারি সম্পদে বৃদ্ধি করা হয়েছিল যাতে সরকারের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত থাকে। এই সংস্কারগুলোর কারণে আলাউদ্দিন খিলজিকে একজন দক্ষ অর্থনীতিবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। [১]

বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ:

আলাউদ্দিন খিলজি গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং বিশেষ পারিষদদের সাথে পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চারটি বিষয় বিদ্রোহের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়:

- (১) শাসকের পক্ষ থেকে পদস্থ কর্মকর্তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর থাকা: এর ফলে আমির ও কর্মকর্তারা বেপরোয়া ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
- (২) মদ্যপান: এর ফলে পাশবিক লালসা জাগ্রত হয় এবং স্বাধীনচেতা প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- (৩) আমির ও দরবারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক: এর ফলে তারা একে অপরের সাথে মিলেমিশে সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়।
- (৪) সম্পদের প্রাচুর্য: অতিরিক্ত সম্পদ জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেয় এবং মানুষ উচ্চ পদের জন্য সচেষ্ট হয়।

আলাউদ্দিন খিলজি এই কারণগুলো সমূলে উৎপাটন করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

- (১) পুরো দেশে গোয়েন্দাদের জাল বিছিয়ে দেন, তিনি অধীনস্থদের প্রতিটি খবরের খোঁজ রাখতেন এমনকি আমির ও পদস্থ কর্মকর্তারা একে অপরের সাথে কথা বলতেও ভয় পেতেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৮৪ থেকে ৩৮৮।

(২) আলাউদ্দিন নিজেও মদ্যপান ত্যাগ করেন এবং সারা দেশে এই ঘৃণ্য কাজের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ঘোষণা করা হয় যে বাদশাহ মদ্যপান থেকে তওবা করেছেন, প্রজারাও যেন তা থেকে বিরত থাকে। যে ব্যক্তি মদ কেনা, বেচা বা পান করার সাথে জড়িত প্রমাণিত হবে, তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। সারা সালতানাতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

শাহী মহলে থাকা মদের মটকাগুলো দিল্লির বদায়ুন দরজার কাছে ঢেলে দেওয়া হয়। পানপাত্র এবং সুরাহিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে দেওয়া হয়। মদ্যপানের আসরে ব্যবহৃত সোনা ও রূপার পাত্রগুলো গলিয়ে নতুন মুদ্রা তৈরি করে রাজকোষে জমা করা হয়। মানুষ নির্দেশের আনুগত্যে নিজেদের ঘর থেকে মদ বের করে রাস্তা ও রাজপথে ঢেলে দেয়, যার ফলে চারদিকে কাদার মতো আবর্জনা দেখা যেত। মোটকথা, মদের আড্ডাগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ভোগ-বিলাসের আসরগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

(৩) উমরা ও পারিষদদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে, তারা সরকারি প্রয়োজন ছাড়া একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখবে না। এভাবে তাদের পারস্পরিক দাওয়াত ও মেলামেশার সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায়। সালতানাতের স্তম্ভরা একে অপরের জন্য অপরিচিত হয়ে যায়।

(৪) সম্পদের আধিক্য দূর করা ছিল সবচেয়ে কঠিন লক্ষ্য। আলাউদ্দিন খিলজি সম্পদে সমতা আনার চেষ্টা করেন এবং এর জন্য প্রতিটি বৈধ ও অবৈধ কৌশল অবলম্বন করেন। মানুষের কাছ থেকে জমি ও নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করে রাজকোষে জমা করা হয়। কৃষি জমির পরিমাপ করে আইন করা হয় যে, সমস্ত উৎপাদনের অর্ধেক অংশ রাজকোষে আসবে। চাষাবাদের জন্য চারটি বলদ এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনে দুটির বেশি গাভী বা মহিষ রাখা আইনের পরিপন্থী ঘোষণা করা হয়। বারোটির বেশি ছাগল রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এভাবে প্রায় সকল মানুষ অতিরিক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। প্রত্যেকেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ উপার্জনে এবং পরিশ্রমে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারো কাছে এত অবসর ছিল না যে সে কোনো হাঙ্গামা বা বিদ্রোহের কথা চিন্তা করবে। [১]

মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা লেখেন:

“সুলতান সালতানাতে এমন আইন জারি করার ইচ্ছা করেন যার মাধ্যমে দেশে সমতার যুগ ফিরে আসে, দুর্বল ও শক্তিমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকে। গ্রাম্য খুত ও চৌধুরীদের সাধারণ মানুষের ওপর যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল তা শেষ করে দেওয়া হয়। এই সিলসিলায় বাদশাহ নির্দেশ দেন যে জমি পরিমাপ করা হোক এবং সমস্ত উৎপাদনের অর্ধেক অংশ রাজকোষে জমা করা হোক। এই হুকুম খুত, মুকাদ্দাম ও সাধারণ প্রজাদের ওপরও কার্যকর করা হয়। যে অর্থ খুত ও চৌধুরীরা নিজেদের হক মনে করত, তাও আদায় করে রাজকোষে জমা করা হয়। খুত ও গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য চাষাবাদের জন্য চারটি বলদ এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনে দুটির বেশি মহিষ, দুটি গরু এবং বারোটির বেশি ছাগল রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। চারণভূমির কর পশুদের...”

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৭৩ থেকে ৩৭৫।

...মালিকদের কাছ থেকে পশুর সংখ্যা অনুযায়ী নেওয়া হতে লাগল। রাজকীয় কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন অত্যন্ত সতর্কতা ও সততার সাথে এই নিয়মগুলো পালন করে এবং অসাধুতা করে নিজেদের জন্য একটি পয়সাও গ্রহণ না করে। যদি কোনো কর্মকর্তা তার নিজের বেতন ছাড়া অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করত, তবে পাটোয়ারীর দপ্তরের খাতা পরীক্ষা করা হতো এবং যদি কোনো ব্যক্তির নামে কোনো অতিরিক্ত অর্থ বের হতো, তবে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে তা আদায় করা হতো। এই পরিস্থিতির ফল এই দাঁড়াল যে, অনেক অফিসার ও কর্মকর্তা তাদের পেশায় কোনো লাভ দেখতে পেল না এবং তারা এই কাজ ছেড়ে দিল। গ্রামের চৌধুরীদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই সব লোক যারা অত্যন্ত রাজকীয় শান-শওকতে জীবন অতিবাহিত করত এবং যাদের প্রতিটি মুহূর্ত ভোগ-বিলাসে কাটত, এখন তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে তাদের ঘরের মহিলারা অন্য সচ্ছল পরিবারে কাজ করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে লাগল। [১]

দেখা গেলে আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক মতবাদ বর্তমান যুগের সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি ছিল যে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা শেষ বা সীমিত করে দেওয়া হোক এবং রাষ্ট্রকে পুঁজির আসল মালিক বা তত্ত্বাবধায়ক ঘোষণা করা হোক। পার্থক্য শুধু এই যে, সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহীরা বড় বড় ডিগ্রির অধিকারী এবং আলাউদ্দিন খিলজি একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন যিনি কেবল নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এই ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে যদিও সাময়িকভাবে পুরো দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবতা ছিল এই যে, এই পদক্ষেপগুলো দেশকে ঘরের পরিবর্তে কারাগারের রূপ দিয়েছিল যেখানে শৃঙ্খলা তো বজায় থাকে কিন্তু কেউ খুশি থাকে না। প্রত্যেকেই এর শৃঙ্খল ভেঙে পালাতে চায়।

বাস্তবতা হলো আলাউদ্দিন খিলজি এবং তার মতো কিছু শাসক কঠোর নীতি গ্রহণ করে সাময়িকভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই নিপীড়নমূলক প্রবণতা এবং অপরাধমূলক ও বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড আগের চেয়ে বেশি তীব্রতার সাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আলাউদ্দিন খিলজি বিদ্রোহের যে কারণগুলো খুঁজে বের করেছিলেন, সেগুলো দূর করার জন্য শরীয়তের সীমানার মধ্যে থাকা জরুরি ছিল যা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণের জামিনদার। শরীয়ত প্রদত্ত সামাজিক অধিকার কেড়ে নেওয়া জুলুম ছিল। জুলুম যদি রাষ্ট্রীয় স্বার্থেও করা হয়, তবে তার ফলাফল নেতিবাচকই হয়।

কাজী মুগিসের সাথে কথোপকথন:

আলাউদ্দিন খিলজির মন থেকে নতুন দ্বীন উদ্ভাবন এবং বিশ্ব জয়ের চিন্তা দূর হয়ে গেলেও কিছু বিষয় এখনো বাকি ছিল। তার ধারণা ছিল যে উলামাদের কাজ কেবল ইবাদতের মাসআলা বর্ণনা করা। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে শরীয়ত থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়া কোনো জরুরি নয়, বরং এই ক্ষেত্রে শাসকের উচিত নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো। এই চিন্তাধারার বড় কারণ ছিল তার নিরক্ষরতা এবং শরীয়তের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা। দ্বিতীয়ত, সে পরামর্শের চেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপর বেশি ভরসা করত। তৃতীয় কারণ ছিল এই যে, সে উলামাদের দ্বীনদার মনে করত না বরং তাদের স্বার্থপর ও মুনাফিক মনে করে তাদের সাথে কোনো বিষয়ে পরামর্শ পর্যন্ত করত না।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৭৫, ৩৭৬

করত। এমন সময় বাদশাহর একজন বিজ্ঞ ও পণ্ডিত দরবারী কাজী মুগীস উদ্দিন বয়ানবী এক বড় কাজ করে দেখালেন। ঘটনাটি এমন ছিল যে, একবার বাদশাহ নিজেই কাজী মুগীস উদ্দিন বয়ানবীকে বললেন:

"আমি তোমার কাছে কিছু মাসআলা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

যেহেতু আলেমদের থেকে পরামর্শ নেওয়া বাদশাহর অভ্যাস ছিল না, তাই কাজী সাহেব ঘাবড়ে গেলেন যে খোদা জানে কী বিপদ নাযিল হতে যাচ্ছে। তিনি হাত জোড় করে বাদশাহর কাছে আরজ করলেন: "হুজুর ওয়ালা! আমার মনে হচ্ছে যে আমার সময় এখন ঘনিয়ে এসেছে, তাই আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করার কষ্ট করবেন না বরং রাজকীয় কর্মচারীদের আদেশ দিন যেন তারা আমার শিরশ্ছেদ করে।"

বাদশাহ এই ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কাজী সাহেব বললেন:

"হুজুর ওয়ালা! আমার কাছে যা জানতে চাইবেন আমি তার সঠিক সঠিক জবাব দেব। কিন্তু এই জবাব যদি হুজুরের মর্জির খেলাফ হয় তবে আমার বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। আর যদি আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য ভুল জবাব দিই এবং আপনি অন্য আলেমদের দিয়ে আমার জবাব যাচাই করেন তবে আমার মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং পরিণাম একই হবে।"

আলাউদ্দিনের চেহারায় হাসি ফুটে উঠল এবং তিনি বললেন: "তুমি জবাব শরীয়ত অনুযায়ী দাও। এই বিশ্বাস রাখো যে সত্য বলার কারণে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।" এই বলে বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন: "ইসলামের দৃষ্টিতে কোন হিন্দুদের জিম্মি বলা যেতে পারে?"

কাজী সাহেব বললেন: "জিম্মি ঐসব অমুসলিমদের বলা হয় যারা ইসলামী শাসকের প্রতিনিধিদের চাওয়ামাত্র জজিয়া ও খেরাজ আদায় করে দেয়। যদি রাজকীয় অফিসাররা অমুসলিমদের সাথে অবমাননাকর আচরণও করে তবে তাদের ধৈর্য ধরা উচিত এবং রাজস্ব আদায়ে কোনো অবহেলা করা উচিত নয়। সুতরাং ফিকহে হানাফী অনুযায়ী সমস্ত হিন্দু জিম্মি এবং তাদের থেকে জজিয়া উসুল করা উচিত।"

আলাউদ্দিন হাসলেন এবং বললেন: "তুমি যে হুকুম জানালে তা কুরআন মাজীদ থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, তাও এটাই।"

এরপর বাদশাহ দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন: "কি ঘুষ গ্রহণকারীর ওপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করা সঠিক?"

কাজী সাহেব বললেন: "রাজকীয় কর্মচারীরা তাদের বেতনের বাইরে যা তাদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট, যদি মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেয় তবে তা তাদের থেকে ফেরত নেওয়া উচিত, কিন্তু চোরদের জন্য হাত কাটার যে শাস্তি রয়েছে তা এই লোকদের ওপর প্রয়োগ করা সঠিক নয়।"

বাদশাহ বললেন: "আমিও এই আইনই চালু করেছি। রাজকীয় কর্মচারীরা যে অতিরিক্ত অর্থ উসুল করে নেয়, আমি কঠোরভাবে তাদের থেকে তা ফেরত নিই যাতে অফিসাররা প্রজাদের কষ্ট না দেয়।"

এরপর বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন: "আমি আমার আমীর থাকাকালীন সময়ে দেবগিরি থেকে যে ধন-সম্পদ অর্জন করেছি তার ওপর কার হক রয়েছে? আমার নাকি প্রজাদের? তা কি আমার মালিকানা নাকি বায়তুল মালের আমানত?"

কাজী মুগীস উদ্দিন বললেন: "এই ধন-সম্পদে আপনার হক ঠিক ততটুকুই যতটুকু ঐসব লোকদের রয়েছে যারা এই..."

সব কিছু অর্জন করতে আপনাকে সাহায্য করেছিল।“

বাদশাহর কাছে এই উত্তরটি খুব খারাপ লাগল। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন: “তা কী করে সম্ভব? যে অর্থ আমি আমার আমীর থাকাকালীন সময়ে অর্জন করেছি এবং যা রাজকোষে জমা দেওয়া হয়নি, তা কীভাবে বায়তুল মালের আমানত হতে পারে?”

কাজী সাহেব আরজ করলেন: “নবাব হোক বা বাদশাহ, তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে যা কিছু অর্জন করেন তাতে অন্য কারো অংশ থাকে না। কিন্তু যে সম্পদ তারা ইসলামী লশকর-এর সাহায্যে অর্জন করেন, তাতে তাদের অধিকার ঠিক ততটুকুই থাকে যতটুকু একজন সাধারণ সিপাহীর থাকে।”

বাদশাহ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন: “আচ্ছা এটা বলো, লশকর-এর সাহায্যে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে আমার এবং আমার সন্তানদের কতটুকু অংশ আছে?”

কাজী সাহেব বললেন: “মনে হচ্ছে আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আপনার কাছে আমার প্রথম উত্তরটিও পছন্দ হয়নি এবং এই উত্তরটি তো আরও বেশি তিক্ত হবে।”

আলাউদ্দিন বললেন: “তুমি সঠিক উত্তর দাও এবং নিজেকে নিরাপদ মনে করো।”

কাজী সাহেব বললেন: “এই বিষয়ে তিনটি ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথম এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা এবং ততটুকুই অংশ নেওয়া, যতটুকু একজন সাধারণ মুসলমান পায়।”

“দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো মধ্যমপন্থা, অর্থাৎ বাদশাহর উচিত সালতানাতের বড় বড় উমারাদের সমান অংশ নেওয়া। তবে যদি রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে বাদশাহ সালতানাতের উমারাদের চেয়ে কিছুটা বেশি অংশ নিতে পারেন যাতে বাদশাহ এবং সালতানাতের উমারাদের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে এবং রাজকীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।”

“তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো নাজায়েজ, তা হলো বাদশাহ যতটুকু ইচ্ছা রাজকোষ ও গনীমত থেকে অংশ নেবেন এবং নিজের ইচ্ছামতো খরচ করবেন। বাদশাহর সন্তানদের অধিকার উমারা এবং সাধারণ মুসলমানদের সমান হওয়া উচিত।”

এটি শুনে আলাউদ্দিন খিলজী অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন:

“তার মানে কি এই যে, আমার হেরেম এবং অন্যান্য খাতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা নাজায়েজ?”

কাজী মুগীস উত্তর দিলেন: “হুজুর আমার কাছে শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি শরীয়তের আলোকে উত্তর আরজ করেছি। যেখানে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আমার ব্যক্তিগত মতামতের বিষয়, সেখানে আমি আরজ করব যে হুজুরের কাজ একদম সঠিক। বাদশাহর মর্যাদা এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য যতটুকু সম্পদই ব্যয় হবে, তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার খরচের মধ্যে গণ্য করা উচিত।”

আলাউদ্দিন এটি শুনে কিছুটা নরম হলেন এবং বলতে লাগলেন: “আমার নিয়ম হলো, যে সিপাহী প্রয়োজনের সময় উপস্থিত হয় না, আমি শাস্তি হিসেবে তার থেকে তিন বছরের বেতন ফেরত নিয়ে নিই। বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের তাদের সঙ্গী, সহচর এবং স্ত্রী-সন্তানসহ মৃত্যুদণ্ড দিই এবং তাদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাজকোষে জমা করে দিই। তাদের প্রতি কোনো শিথিলতা করি না। তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি করতে চাই। মদ্যপায়ী,”

“আমি দুষ্কৃতকারী ও চোরদের কঠোরতম শাস্তি দিই। সম্ভবত আপনি এই সব বিষয়কে ইসলামের পরিপন্থী বলবেন?”

কাজী সাহেব এ কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এক কোণে গিয়ে নিজের মাথা দুহাতে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন: “হুজুর যে বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন তা শরীয়তের পরিপন্থী।”

বাদশাহ এ কথা শুনে প্রচণ্ড রাগান্বিত হলেন কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সরাসরি হেরেমের দিকে চলে গেলেন।

এদিকে কাজী সাহেব টলতে টলতে নিজের ঘরে পৌঁছালেন, তাঁর এখন মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। পরিবার-পরিজনকে বিদায় জানিয়ে তিনি নিজের হত্যার রাজকীয় ফরমানের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু সেই দিনটি কেটে গেল এবং পরের দিন বাদশাহ তাঁকে দরবারে ডেকে প্রত্যাশার বাইরে পুরস্কারে ভূষিত করলেন। এরপর বললেন:

“কাজী সাহেব! আমি জ্ঞানহীন এবং শরীয়তের মাসআলা সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ, কিন্তু আমি একজন মুসলমান এবং মুসলমানের সন্তান। আপনি যা কিছু বলেছেন, তা একেবারেই সঠিক। কিন্তু দুনিয়ার বিষয়াবলী এবং বিশেষ করে হিন্দুস্তানের সমস্যাগুলো শুধু শরীয়তের ওপর নির্ভর করে সমাধান করা সম্ভব নয়, এর সাথে রাজনীতির কঠোর আইনও জরুরি, অন্যথায় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। আমার ধারণা যে, কেবল ওয়াজ ও নসিহতের মাধ্যমে এই যুগের মানুষ সঠিক পথে আসতে পারে না। ফাসেক ও দুষ্কৃতকারী লোকেরা মারধর এবং জেল-জুলুমের শাস্তি ভোগ করেও বিরত হয় না, তাই আমি তাদের আতঙ্কিত করার জন্য তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাত্র বানিয়ে দিই যাতে অন্যদের সাহস দমে যায়। আমার নিয়ত নেক ও পরিষ্কার। উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে, আল্লাহ তাআলার মাখলুক যেন শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে জীবন অতিবাহিত করে। যেহেতু আল্লাহর রহমতের দরজা সবসময় খোলা থাকে, তাই আমার পূর্ণ আশা আছে যে তিনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।”

যদিও আলাউদ্দিন খিলজি শরীয়তের গুরুত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজের উদ্ভাবিত আইনের ওপর অটল ছিলেন, তবুও কাজী সাহেবের সাথে আলোচনার পর তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, উলামায়ে দ্বীন মুখলিস এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ, সরকার ও সমাজের দিকনির্দেশনায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এই ব্যক্তিবর্গ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য মাসআলা তৈরি করেন না। ফলে এখন তিনি মাঝেমধ্যে উলামাদের থেকে উপকৃত হতে লাগলেন এবং তাঁদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। সেই সময় পর্যন্ত আলাউদ্দিন একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু এরপর তিনি লেখাপড়া শিখলেন। বইপত্র অধ্যয়ন শুরু করলেন। এই পুরো পরিবর্তনের পেছনে কাজী মুগীসউদ্দিন বয়ানভীর মূল ভূমিকা ছিল। [১]

সেই জাতি নিয়তির হাতে তরবারির ন্যায়,
যারা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের কর্মের হিসাব কষে।
হৃদয়ের রক্ত ছাড়া সকল চিত্রই অসম্পূর্ণ,
হৃদয়ের রক্ত ছাড়া সঙ্গীত হলো অপরিপক্ক উন্মাদনা।
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারনী: পৃষ্ঠা ২৮৮ থেকে ২৯৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৬ থেকে ৩৮০।

আলাউদ্দিন খিলজির শেষ বছরগুলো এবং তাঁর পতন

আলাউদ্দিন খিলজি এত শান-শওকত এবং শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলোতে ক্রমাগত প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে থাকেন এবং আক্ষেপ ও হতাশার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন। এই পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত অভিযানে মালিক কাফুর:

আলাউদ্দিনের শাসনামলের শেষ অভিযানটি দক্ষিণ ভারতে মালিক কাফুর পরিচালনা করেন। মূলত দেবগিরির রাজা রামদেব মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর ছেলে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। ফলে সুলতানের অনুমতি নিয়ে ১৩১২ হিজরিতে মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করেন, যার ফলে রামদেবের ছেলে নিহত হন এবং সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মালিক কাফুর আরও অগ্রসর হন এবং "মারাঠাওয়াড়া"র গুলবার্গা ইত্যাদি শহরগুলোকে উপদ্রবকারীদের হাত থেকে মুক্ত করেন। এরপর তিনি কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানার অন্যান্য শহরগুলো পুনরায় জয় করেন এবং "ধোর সমুদ্র" পর্যন্ত চলে যান। তিনি এই সমস্ত অঞ্চলের রাজাদের বশীভূত করে তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কর আদায় করেন এবং তা দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন। এটি ছিল আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলের শেষ সামরিক অভিযান। [১]

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত সম্পর্কে আলাউদ্দিনের রণকৌশল:

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত সম্পর্কে আলাউদ্দিন খিলজির রণকৌশল ছিল নিজের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা না নেওয়া। তাই তিনি আপাতত এই অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের পূর্ণ আধিপত্যের প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর চেষ্টা কেবল এই পর্যন্তই ছিল যে, এই অঞ্চলের রাজারা শতাব্দী ধরে যে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তার পাহাড় জমিয়েছিলেন, তা যেন দিল্লি সালতানাতের কোষাগারে জমা হয় এবং স্থানীয় হিন্দু রাজারা দিল্লি সালতানাতের অনুগত থাকে ও বিদ্রোহ না করে। এই কারণেই আলাউদ্দিন খিলজির ডান হাত মালিক কাফুর গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে তাঁর চারটি অভিযানের সময় সেখানকার বিখ্যাত ও প্রাচীনতম মন্দিরগুলোতে সঞ্চিত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং বড় বড় রাজাদের কাছ থেকে তাঁদের পৈতৃক কোষাগারের একটি বড় অংশ ছিনিয়ে নেন। কিন্তু তাঁদেরকে অনুগত করে তাঁদের জায়গির ও সম্পত্তি তাঁদেরকেই ফিরিয়ে দেন এবং ওই অঞ্চলগুলোর শাসনভার সেই প্রাচীন শাসক পরিবারগুলোর হাতেই থাকতে দেন এবং উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনেই সন্তুষ্ট থাকেন।

(পরবর্তীতে আলাউদ্দিনের পুত্র কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ খিলজি এই রণকৌশল পরিবর্তন করেছিলেন, যা সামনে আসছে।)

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৩, ৪৪

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

নওমুসলিম মোগলদের গণহত্যা

গত বছরগুলোতে সুলতানের নওমুসলিম মোগলদের ওপর থেকে আস্থা উঠে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে একটি নতুন ঘটনা ঘটল যার ফলে নওমুসলিম মোগল এবং আলাউদ্দিনের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে গেল। ঘটনাটি ছিল এই যে, মালিক কাফুর যখন দক্ষিণ ভারত অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সেনাবাহিনীর একজন নওমুসলিম মোগল সরদার "আবাজি" হিন্দুদের সাথে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু মালিক কাফুর তা জানতে পারেন এবং আবাজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। যখন এই সেনাবাহিনী অভিযান থেকে ফিরে এল, তখন সুলতান আবাজির শিরশ্ছেদ করালেন। এই পদক্ষেপটি নওমুসলিম মোগলদের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হলো।

এদিকে আলাউদ্দিন আরও যা করলেন তা হলো, মোগলদের দিল্লির সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। বাধ্য হয়ে অনেক নওমুসলিম মোগল দিল্লি ছেড়ে অন্য শহরের আমিরদের অধীনে চাকরি নিতে চলে গেল, কিন্তু প্রায় দশ হাজার মোগল দিল্লিতেই থেকে গেল এই আশায় যে হয়তো সুলতানের দয়া হবে। কিন্তু সুলতানের সিদ্ধান্ত বদলাল না এবং এই মোগলরা দিন দিন দুর্দশাগ্রস্ত হতে লাগল।

অবশেষে তাদের মধ্য থেকে কয়েকশ মোগলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এবং তারা সুলতান আলাউদ্দিনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকাল। তারা জানত সুলতান কোন দিন ভ্রমণে বের হন এবং সেই সময় তিনি কেবল কুর্তা পরিহিত থাকেন এবং দেহরক্ষীদের বড় কোনো দল তার সাথে থাকে না। এই কয়েকশ মোগল ঠিক করল যে, সেই সময় হঠাৎ আক্রমণ করে সুলতানকে খতম করে দেওয়া হবে। কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা সব জায়গায় উপস্থিত ছিল। তারা সুলতানকে অবহিত করে দিল।

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি এর আগে একাধিকবার নওমুসলিম মোগলদের বিদ্রোহের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন এবং প্রতিবারই তিনি বিদ্রোহীদের অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করেছিলেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের খবর শুনে তার প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র। তিনি তার কর্মকর্তাদের গোপনে আদেশ দিলেন যে, সালতানাতের সেই সমস্ত নওমুসলিম মোগল যাদের জায়গির প্রদান করা হয়েছে অথবা যারা সরকারি কর্মচারী, তাদের যেন অবিলম্বে হত্যা করা হয়। ফলে এই আদেশের অধীনে জায়গায় জায়গায় এই নওমুসলিম মোগলদের গণহত্যা শুরু হয়ে গেল এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সারা দেশে প্রায় ত্রিশ হাজার মোগল, যাদের সালতানাতের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না, তাদের স্ত্রী-সন্তানসহ নিরপরাধ অবস্থায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হলো।

হে হৃদয়, এভাবে আবেদন ও নিবেদনে কবে পাষাণ হৃদয় গলে পানি হয়!
তুমি লাখো সন্তুষ্টির অভ্যাস করো না কেন, অত্যাচারীর স্বভাব কি কখনো যায়!
এখানে অত্যাচারীদের বসতি, এখানে ন্যায়বিচার কোথায়! দান-খয়রাত কোথায়!
হে অবোধ, যে ফরিয়াদ দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, তা কেবল মাথা কুটে মরে। [১]

আলাউদ্দিন খিলজির দামানে জুলুম ও নির্যাতনের দাগ আগে থেকেই কম ছিল না, কিন্তু এই গণহত্যা একদিকে যেমন তার মর্যাদা আরও ক্ষুণ্ণ করল, তেমনি তার পতনও নিশ্চিত করে দিল। [২]

---

[১] ফয়েজ আহমদ ফয়েজ

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৩৫, ৩৩৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৭০, ৪০৮; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃষ্ঠা ২৯৬ থেকে ২৯৯

একটি বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর গণহত্যা:

সেই দিনগুলোতে দিল্লিতে কারামাতিদের একটি শাখা 'আবাহিয়া'র লোকেরা এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এই লোকদের কাছে মাহরাম নারীদের সাথেও যৌন সম্পর্ক বৈধ ছিল। বলা যায় যে, তারা ছিল সেই যুগের নাস্তিক বরং শয়তানের উপাসক, যারা কোনো ধর্ম বা নৈতিক নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। অন্যদেরকে নিজেদের মতাদর্শে বিশ্বাসী করার জন্য তারা তাদের ভোগ-বিলাসের আমন্ত্রণ জানাত এবং মাঝে মাঝে কোনো বড় অট্টালিকায় গোপনে ভোগ-বিলাসের আসর জমাতো, যেখানে নির্লজ্জ নগ্ন নৃত্য হতো এবং লোকেরা নিজেদের মাহরাম নারীদের সাথে কামলীলায় মত্ত হতো। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

হতে পারে এই লোকদের ধারণা ছিল যে, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি নিজেও স্বাধীনচেতা ধরনের মানুষ, তাই হয়তো তিনি বিষয়টি জানতে পারলেও নমনীয়তা প্রদর্শন করবেন। কিন্তু এটি ছিল তাদের ভুল ধারণা। সুলতান যখন এই লোকদের অপকর্ম সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন নির্দেশ দিলেন যে তাদের একজনকে যেন জীবিত না রাখা হয়। ফলে এই লোকদের অতর্কিত হামলা চালিয়ে ধরা হলো এবং তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেওয়া হলো।

ফেরেশতার মতে: যেন এভাবে সুলতান নিজের গুনাহের কাফফারা আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। [১]

আলাউদ্দিনের ছেলেরা কেন বখে গিয়েছিল?:

১৩০৭ হিজরি শুরু হলে আপাতদৃষ্টিতে পুরো হিন্দুস্তানের ওপর আলাউদ্দিনের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত মজবুত ছিল। সমস্ত বিদ্রোহী উপাদান নির্মূল করা হয়েছিল এবং চারদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। আলাউদ্দিনের বয়স তখন ৪৭ বছর হয়েছিল এবং ক্রমাগত অভিযানের কারণে তিনি ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি মন ভোলানোর জন্য মদ্যপান ও ভোগ-বিলাসের আশ্রয় নিচ্ছিলেন, কিন্তু এই আপদগুলো তার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছিল। তিনি নিজের পরে সন্তানদের একটি বিশাল ও সমৃদ্ধশালী সালতানাতের মালিক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যার জন্য সবকিছু প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি অনুপস্থিত ছিল—অর্থাৎ শাহজাদাদের যোগ্যতা।

আলাউদ্দিন খিলজি সাধারণ জনগণ ও আমিরদের শাসন করার পেছনে এমনভাবে উঠেপড়ে লেগেছিলেন যে, নিজের সন্তানদের লালন-পালনের বিষয়ে গাফেল হয়ে গিয়েছিলেন। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, তার সন্তানরা সম্পূর্ণ অযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রমাণিত হলো। আলাউদ্দিনের বেশ কয়েকজন ছেলে ছিল: খিজির খান, মুবারক খান, শাদি খান, ফরিদ খান, উসমান খান, মুহাম্মদ খান, আবু বকর খান, শিহাবুদ্দিন উমর প্রমুখ। এদের মধ্যে খিজির, মুবারক এবং শাদি খান যৌবনের শুরুতে ছিলেন, আর বাকিরা ছিলেন নাবালক।

আলাউদ্দিন তাদের ইসলামি জ্ঞান, আদব-আখলাক এবং অন্যান্য উচ্চতর শিল্পকলা শেখানোর বিষয়ে কোনো মনোযোগ দেননি। যেহেতু তিনি নিজে আলেম ও গুণী ব্যক্তিদের প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, তাই শাহজাদাদের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো গৃহশিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজনই মনে করেননি, যিনি তাদের ভোগ-বিলাস ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত রাখতেন। ফলে শাহজাদারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই লাগামহীন হয়ে পড়তে শুরু করেন এবং আলাউদ্দিনও এই...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪০৮... সম্ভবত আবাহিয়া সম্প্রদায় ছিল মাজুসিয়্যাত (অগ্নিপূজা) এবং বাতিনিয়্যাতের সংমিশ্রণ। এই লোকেরা ইসমাইলি শিয়াদের একটি শাখা এবং কারামাতিদের দ্বিতীয় রূপ ছিল। তারা نصوص (নসুস)-এর প্রকাশ্য অর্থ ত্যাগ করে মনগড়া "বাতিনি" বা অভ্যন্তরীণ অর্থ বর্ণনা করত এবং এভাবে মদ্যপান, জিনা, সমকামিতা এবং সমস্ত নৈতিক অপরাধ গোপনে করতে কোনো দ্বিধা বোধ করত না। এখন তাদের এই শাখাটি শয়তান পূজারীদের রূপ ধারণ করে মাহরামদের সম্মানও ভুলে গিয়েছিল।

পরিস্থিতির উৎসাহ প্রদান করতে থাকলেন। ফলে শাহজাদা খিজির খানের যোগ্যতা যাচাই না করেই তাকে উত্তরাধিকারী (ওয়ালি আহাদ) নিযুক্ত করে দিলেন। এটাই কারণ ছিল যে তাদের মধ্যে কোনো শাহজাদাই কাজের যোগ্য প্রমাণিত হয়নি। [১]

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই... গন্তব্য তাদের সামনে আছে কিন্তু পথ নেই। [২]

উত্তরাধিকারী খিজির খান এবং দেবল দেবীর প্রেমকাহিনী:

বড় ছেলে খিজির খান, যে উত্তরাধিকারীও ছিল, অত্যন্ত প্রেমিক স্বভাবের ও আমুদে মেজাজের ছিল। তার প্রেমের কাহিনী আমির খসরু কাব্য আকারে বর্ণনা করেছেন, যার সারসংক্ষেপ হলো এই যে, আলাউদ্দিন খিলজির বেগমদের মধ্যে একজন রানি কমলা দেবীও ছিলেন, যিনি গুজরাটের রাজা করণ বাঘেলার স্ত্রী ছিলেন। ৬৯৯ হিজরিতে গুজরাটে মুসলমানদের আক্রমণের সময় রাজা করণ পরিবার-পরিজন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে এই রানিও বন্দি হন। রাজা করণের ঔরসে তার একটি মেয়ে ছিল যার নাম ছিল 'দেবল দেবী'। সে গুজরাটেই রয়ে গিয়েছিল। আলাউদ্দিন খিলজি কমলাকে মুসলমান করে নিজের স্ত্রী বানিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু কমলা দেবী তার মেয়ের স্মৃতিতে অস্থির ছিলেন। তাই আলাউদ্দিনের নির্দেশে তার কর্মকর্তারা গুজরাট গিয়ে অনেক কষ্টে সেই মেয়েকে উদ্ধার করেন এবং রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দেন।

৭০৬ হিজরির শেষের দিকে শাহজাদি দেবল দেবী দিল্লি পৌঁছান। তখন তার বয়স ছিল প্রায় আট বছর। এদিকে আলাউদ্দিন খিলজির ছেলে খিজির খানের বয়স ছিল দশ বছর। রাজপ্রাসাদে দুজনে একসাথে বেড়ে ওঠার ফলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ওদিকে রানি কমলা দেবী সুলতানকে রাজি করালেন যেন তাদের দুজনের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। সুলতানও রাজি হয়ে গেলেন। [৩]

কিন্তু কয়েক বছর পর খিজির খান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, তখন সুলতানের ইচ্ছা বদলে গেল এবং তিনি খিজির খানের বিয়ে তার মামা আল্প খানের মেয়ের সাথে ঠিক করলেন, যা রমজান ৭১১ হিজরিতে (জানুয়ারি ১৩১২ খ্রিস্টাব্দ) অত্যন্ত ধুমধামের সাথে সম্পন্ন হয়। খিজির খান এই বিয়েতে খুশি ছিলেন না এবং দেবল দেবীর সান্নিধ্য কামনা করতেন। ফলে ৭১৩ হিজরিতে (১৩১৫ খ্রিস্টাব্দ) আলাউদ্দিন কোনো প্রকার প্রচার ছাড়াই কয়েকজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তার দ্বিতীয় বিয়ে দেবল দেবীর সাথে করিয়ে দেন। তখন খিজির খানের বয়স ছিল প্রায় আঠারো বছর এবং দেবল দেবীর বয়স ছিল প্রায় ষোলো বছর। [৪]

আলাউদ্দিনের মেজাজের উগ্রতা বৃদ্ধি:

আলাউদ্দিন শুরু থেকেই কড়া মেজাজের ছিলেন, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার মেজাজের উগ্রতাও বাড়তে থাকে। এখন তিনি আমিরদের সাথে পরামর্শ করা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে সালতানাতের শাসনব্যবস্থা যেন তারই হাতের মুঠোয় থাকে এবং দেশের প্রশাসনিক সমস্ত সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে হয়। এটাই কারণ ছিল যে শেষ বছরগুলোতে আলাউদ্দিন একের পর এক বেশ কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪১৩; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী বারানি রচিত: পৃ. ৩৭৮, ৩৬৭

[২] হানিফ শাহ হাশিম

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩৯৪ থেকে ৩৯৮

[৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: মসনবি দেবল রানি ও খিজির খান, আমির খসরু রচিত

[৫] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী বারানি রচিত: পৃ. ৩৩৮, ৩৬৭

মালিক কাফুর এবং রাজপরিবারের দ্বন্দ্ব:

আলাউদ্দিনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আমীরগণ যেমন নুসরাত খান, আলমাস বেগ (উলুগ খান) এবং জাফর খান এখন আর এই দুনিয়ায় নেই। অনেক বিশ্বস্ত আমীর রাজকীয় রোষের শিকার হয়ে নির্জনে চলে গিয়েছিলেন। যে আমীরগণ দায়িত্ব পালন করছিলেন, তারা সব সময় মাথার ওপর মৃত্যুর তলোয়ার ঝুলতে দেখতেন। সুলতানকে তার মেজাজের বিরুদ্ধে কোনো পরামর্শ দেওয়া ছিল মৃত্যুর সমান। তবে মালিক কাফুর অত্যন্ত চতুরতার সাথে সুলতানের আস্থা বজায় রেখেছিলেন, বরং সুলতানের তার প্রতি অনুগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তিনি কার্যত নায়েবে সুলতানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তার এই সীমাহীন ক্ষমতা পুরাতন আমীরদের আরও বেশি অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল।

সুলতান যদি কোনো পুরাতন আমীরের কদর করতেন, তবে তিনি ছিলেন গুজরাটের শাসক আল্প খান, যিনি তার শ্যালক হওয়ার পাশাপাশি তার দুই পুত্র খিজির খান এবং শাদী খানের শ্বশুরও ছিলেন। আল্প খান এবং তার বোন অর্থাৎ আলাউদ্দিনের স্ত্রী মালিকা-ই-জাহান মালিক কাফুরের এই অসীম ক্ষমতা মোটেও পছন্দ করতেন না। যুবরাজ খিজির খানও কাফুরকে তার পিতার বুদ্ধির ওপর সওয়ার হতে দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। এভাবে সাম্রাজ্যে দলাদলি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক দল ছিল মালিক কাফুরের এবং অন্য দল ছিল রাজপরিবারের।

মালিক কাফুর নিজের পক্ষ থেকে রাজপরিবারকে নির্মূল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তার সৌভাগ্য ছিল যে, আলাউদ্দিন চোখ বন্ধ করে তাকে বিশ্বাস করতেন। এই কারণেই মালিকা-ই-জাহান এবং শাহজাদা খিজির খান বাদশাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে থাকেন। [১]

আলাউদ্দিনের অসুস্থতা:

এরই মধ্যে আলাউদ্দিন উদরী (Dropsy) নামক এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন। সেই সাথে লিভারের সমস্যার কারণে তিনি ক্রমাগত দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রায়ই তার জ্বর থাকত। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। [২]

সেই দিনগুলোতে কাফুর দাক্ষিণাত্যে ছিলেন এবং আল্প খান গুজরাটে। অন্যান্য আমীরগণ চিকিৎসার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে ভয় পাচ্ছিলেন এই কারণে যে, যদি সুলতানের অবস্থা আরও খারাপ হয়, তবে তিনি বিষ প্রয়োগের অভিযোগ এনে তাদের হত্যা করবেন।

এদিকে যুবরাজ খিজির খান এবং তার মা মালিকা-ই-জাহানেরও সুলতানের সেবার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। মালিকা-ই-জাহান নিত্যনতুন অনুষ্ঠান, যেমন দিল্লির অভিজাতদের বিয়ে, আকিকা, ভোজ এবং সাক্ষাতে ব্যস্ত থাকতেন। খিজির খানের নিজস্ব ব্যস্ততা ছিল; তিনি পোলো খেলা, হাতিদের লড়াই এবং মদ ও কাবাবে মগ্ন থাকতেন। আমীর খসরুর মতে, সব সময় সুন্দরী মেয়েদের চুলের গুচ্ছ তার হাতে থাকত।

মূর্তিদের প্রেম শত শত বাগান পুড়িয়ে দিয়েছে... এই স্ফুলিঙ্গে শত শত ঘর জ্বলে গেছে। এখন পাপাচারের কারণে কিছুই চোখে পড়ছে না... আমাদের চোখ কবরে গিয়ে মরার পর খুলবে। [৩]

সন্তানের বিলাসিতা এবং রানীর অবহেলায় বদমেজাজি সুলতান এতটাই বিরক্ত হলেন যে, এই মা ও ছেলেকেই তিনি তার অসুস্থতার জন্য দায়ী...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৩৮, ৩৬৭, ৩৬৮; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৬৮; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৭৯; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ, বাদায়ুনি: পৃষ্ঠা ১২২।

[৩] মাজজুব।

...উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে শুরু করল। সে বহু বছর আগে খিজির খানকে (যখন সে শিশু ছিল) নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিল, কিন্তু এখন তার অযোগ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে আলাউদ্দিন উত্তরাধিকারী পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করল এবং তার পরামর্শের প্রয়োজন অনুভূত হলো। সে দাক্ষিণাত্য থেকে মালিক কাফুরকে এবং গুজরাট থেকে আল্প খানকে তলব করল। উভয়েই দ্রুত সফর করে দিল্লিতে পৌঁছে গেল। সুলতানের অবস্থা দেখে উভয়েই বুঝতে পারল যে তার মৃত্যু নিকটবর্তী। ফলে প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে লাগল যাতে ক্ষমতার পালাবদলের খেলাটি তার নিজের হাতে থাকে। কাফুর ছিল অধিক চতুর। সে সুলতানের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং সবসময় তার কামরায় বা আশেপাশে থাকতে লাগল। এখন সে ধাপে ধাপে সুলতানকে আল্প খান, মালিকা এবং উত্তরাধিকারী খিজির খানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করতে লাগল। সে বলল: “আমি তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে মালিকা, আল্প খান এবং খিজির খান—এই তিনজনই আপনার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে, বরং তারা আপনাকে হত্যা করতে চায়।” সুলতান এ কথা শুনে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। [১]

খিজির খানের উত্তরাধিকার বাতিল। আল্প খানের হত্যাকাণ্ড:

কাফুর সুলতানকে পরামর্শ দিল যে সে যেন খিজির খানকে দিল্লির বাইরে পাঠিয়ে দেয় এবং আল্প খানকেও গুজরাটে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় যাতে তারা কোনো ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে না পারে। সুলতান তেমনই করল। তার নির্দেশে খিজির খান নীরবে আমরোহায় চলে গেল। সে বুঝতে পেরেছিল যে পিতার সেবায় অবহেলা করে সে বড় ধরনের বোকামির পরিচয় দিয়েছে, ফলে সে মানত করল যে যদি পিতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তবে সে দিল্লির মাশায়েখদের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করবে।

এদিকে কাফুরের কথায় সুলতান আল্প খানকে দিল্লি থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং তাকে বলল যে সে যেন গিয়ে গুজরাটের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু আল্প খান সুলতানের মৃত্যু পর্যন্ত দিল্লিতে থাকতে চেয়েছিল যাতে খিজির খানের সিংহাসন আরোহণে কাফুরের ষড়যন্ত্র বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ফলে সে টালবাহানা করতে লাগল এবং গুজরাটে ফিরে গেল না।

কাফুর আরও সুযোগ পেয়ে গেল এবং সে সুলতানকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করল যে আল্প খান গুজরাটে না গিয়ে বড় ধরনের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এবং এটি তার অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের লক্ষণ; আসলে সে চায় যে খিজির খানকে যেকোনো মূল্যে সিংহাসনে বসিয়ে তার আড়ালে নিজে সালতানাত পরিচালনা করতে, তাই তাকে হত্যা করাই হবে সঠিক কৌশল।

সুলতানের বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, সে অনুমতি দিয়ে দিল এবং কাফুর নিজেই আল্প খানকে নিজ হাতে হত্যা করল।

এর পরে কাফুর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করল এবং সুলতানকে পরামর্শ দিল যে শাহজাদা খিজির খান তার শ্বশুরের হত্যাকাণ্ডের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে পারে, তাই তার উত্তরাধিকার বাতিল করে তাকে দিল্লি থেকে দূরে রাখা উচিত।

সুলতান তো আগে থেকেই ছেলের প্রতি অত্যন্ত হতাশ ছিল, তৎক্ষণাৎ তাকে ফরমান পাঠিয়ে দিল যে তার উত্তরাধিকার বাতিল করা হয়েছে এবং এখন সে আমরোহাতেই থাকবে এবং অনুমতি ছাড়া কখনোই দিল্লিতে আসবে না। [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৪, ৪৫; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ৩৬৮; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৭৯, ৮০

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৪, ৪৫; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ৩৬৮; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৮০, ৮১

খিজির খানকে বন্দী করা হলো:

খিজির খান এই ফরমান পেলেন এবং সেই সাথে যখন তার শ্বশুর আল্প খানের হত্যার খবর জানতে পারলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। এতে তার ধৈর্য আরও কমে গেল, তিনি ভাবতে লাগলেন যে তিনি কোনো অপরাধ করেননি। পিতার কাছে গিয়ে যদি আরজ পেশ করেন তবে তিনি নরম হয়ে যাবেন। তিনি এটাও জানতে পারলেন যে পিতার শরীর কিছুটা খারাপ হয়েছে, তাই দিল্লির মাশায়েখদের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লির পথে রওনা হলেন। যেহেতু তিনি গায়ক, নর্তকী এবং মদ্যপানের পেছনে সময় ব্যয় করতেন, তাই এই দলটিও তার সাথে ছিল। সংক্ষেপে, শাহজাদা তার অভ্যাস অনুযায়ী আনন্দ-উৎসব করতে করতে এবং মাজারে হাজিরা দিতে দিতে দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন।

আলাউদ্দিন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কপালে চুমু খেলেন এবং কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন না। কিন্তু এরপর শাহজাদা আগের মতোই অবহেলার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন এবং পিতার কাছে ঘেঁষলেন না। অন্যদিকে মালিক কাফুর সুলতানকে প্ররোচিত করলেন এবং শাহজাদার অনুমতি ছাড়া দিল্লিতে আসাকে চরম অবাধ্যতা বলে ঘোষণা করলেন। সেই সাথে তিনি কয়েকজন গোলামকে প্রস্তুত করে তাদের দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ালেন যে শাহজাদা খিজির খান এবং শাহজাদা শাদী খান বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং মালিকা জাহানও এতে জড়িত। আলাউদ্দিন রাগান্বিত হয়ে নির্দেশ দিলেন যে উভয় শাহজাদাকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হোক এবং মালিকা জাহানকে দিল্লির একটি পুরনো হাভেলিতে নজরবন্দী করা হোক। সে অনুযায়ী এই নির্দেশ কার্যকর করা হলো। এভাবে আলাউদ্দিন নিজের হাতেই নিজের সাম্রাজ্যের কবর খুঁড়লেন। [১]

আলাউদ্দিনের মৃত্যু:

এই হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্তের পর আলাউদ্দিন মাত্র তিন দিন বেঁচে ছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল এবং তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। অবশেষে মালিক কাফুর সুলতানের বিছানার পাশে আমির ও সেনাপতিদের ডাকলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে সুলতানের বেগম ঝাত্যাপালি (যিনি দেবগিরির রাজা রামদেবের কন্যা ছিলেন) এর ছয় বছর বয়সী পুত্র শিহাবুদ্দিন উমরকে উত্তরাধিকারী করা হোক। বাদশাহ চরম দুর্বলতার কারণে নেতিবাচক বা ইতিবাচক কিছুই বলতে পারলেন না। তার নীরবতাকে সম্মতি হিসেবে ধরে নেওয়া হলো এবং ছোট শাহজাদাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেওয়া হলো। এরপর ৬ শাওয়াল ৭১৫ হিজরি (২ জানুয়ারি ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ) শনিবার রাতে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি নিজের আমলনামার বোঝা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। অসংখ্য বিজয়, স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং সেই সাথে নিষ্ঠুরতা ও ধূর্ততার অনেক কাহিনী রেখে তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার বিশাল সাম্রাজ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। [২]

আহ! এই নশ্বর উদ্যানে আমরা কী এলাম আর কী গেলাম!
জীবনের শাখা থেকে অঙ্কুরিত হলাম, ফুটলাম এবং ঝরে গেলাম।
মৃত্যু প্রতিটি রাজা ও ভিক্ষুকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা,
এই অত্যাচারীর অত্যাচার হলো ইনসাফের প্রতিচ্ছবি।
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪১৫, ৪১৬; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ৩৬৮; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৮০, ৮১।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪১৬, ৪১৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ৩৭৬ থেকে ৩৭০; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৮০, ৮১।

আলাউদ্দিনের চরিত্র এবং শাসনের ওপর এক নজর

আলাউদ্দিন খিলজি একজন চতুর, ক্ষিপ্র, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এবং যুদ্ধবাজ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর গুণাবলির ওপর মাঝে মাঝে তাঁর উগ্র মেজাজ এবং প্রতিশোধপরায়ণ আবেগ প্রবল হয়ে উঠত, এই কারণে সাধারণত সালতানাতের সদস্যরা তাঁর থেকে ভীত থাকতেন। তিনি অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ মেজাজের ছিলেন। যদি একবার কারও প্রতি সন্দিহান বা অসন্তুষ্ট হতেন, তবে সারাজীবন তাঁর প্রতি ঘৃণাবোধ ও অসন্তুষ্টি পোষণ করতেন। [১]

তিনি রাষ্ট্রীয় রাজনীতি এবং শরীয়তের বিধানকে দুটি আলাদা ক্ষেত্র মনে করতেন এবং এই কারণে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির প্রতি তাঁর মনোযোগ অনেক বেশি ছিল এবং শরীয়তের বিধান পালনের সাথে তাঁর তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। নামাজ-রোজায় অভ্যস্ত ছিলেন না। তবে সাধারণ মুসলমানদের মতো তিনি একজন তাকলিদি ও ভাসাভাসা ঈমানের অধিকারী অবশ্যই ছিলেন। [২] এক পর্যায়ে তিনি দ্বীনহীনতার কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন কিন্তু পরে তা থেকে ফিরে এসেছিলেন, ফলে পরবর্তীতে তিনি কখনও নাস্তিকতা বা দ্বীনহীনতার আকিদা গ্রহণ করেননি। [৩]

আলাউদ্দিনের কীর্তিসমূহ

আলাউদ্দিন খিলজির শাসনকাল বিভিন্ন দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। তাঁর সময়ে দেশের প্রতিরক্ষা এতটাই শক্তিশালী ছিল যার উদাহরণ আগে পাওয়া যায় না। এই বাদশাহ চার লক্ষ ৭৫ হাজার অশ্বারোহীর এক বিশাল বাহিনী তৈরি করেছিলেন যার ফলে দেশ তাতারীদের আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তাঁর আমলে ছোট-বড় ৮৬টি যুদ্ধ হয়েছিল যেগুলোতে সর্বদা তিনি বিজয় লাভ করেছিলেন। [৪]

স্থাপত্য কীর্তিসমূহ:

আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লিতে প্রাচীন রাজকীয় প্রাসাদগুলো ছেড়ে “মহল্লা সিরি”-তে একটি নতুন এবং অধিক জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন যা এক হাজার স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং এই কারণে এর নাম “কুশকে হাজার সুতুন” রাখা হয়েছিল। [৫]

---

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪০৮

[২] তারিখ ফিরোজ শাহী আজ বারনি: পৃ. ৩৩৮-৩৩৯

[৩] এর বিস্তারিত বিবরণ আগে অতিবাহিত হয়েছে যে, কীভাবে আলাউল মুলক কোতোয়ালের বোঝানোর ফলে তিনি ফিরে এসেছিলেন। (তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১ পৃ. ৩৬৩ থেকে ৩৬৭)

[৪] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১ পৃ. ৪৭

[৫] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪০৬; আসারুস সানাদিদ, আজ স্যার সৈয়দ আহমদ খান: পৃ. ৩৯ থেকে ৪১। সিরি কেল্লা আলাউদ্দিন খিলজি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য দিল্লির কাছে নির্মাণ করেছিলেন। এখন এটি দিল্লির একটি অংশ। এই এলাকায় হাজার সুতুন প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ “সিরি ফোর্ট” নামে বিদ্যমান। আশপাশের এলাকাগুলোর মধ্যে শাহপুর জাট এবং গ্রিন পার্ক উল্লেখযোগ্য।

তাঁর দরবারের সাথে ৭০ হাজার দক্ষ কারিগর যুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে স্থপতি, শ্রমিক এবং কারুশিল্পীদের সংখ্যা ছিল সাত হাজার। তাঁরা বড় বড় ইমারত দুই সপ্তাহে এবং ছোট ইমারত দুই-তিন দিনে তৈরি করে ফেলতেন। নির্মাণের জন্য বাদশাহ যতটুকু সময় দিতেন, তাতে এক মুহূর্তের কমবেশি হতো না। আলাউদ্দিন খিলজি বিশ বছরের দীর্ঘ শাসনকালে একদিকে যেমন সফলভাবে নিজের সালতানাত রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে সালতানাতকে অর্থনৈতিকভাবে মজবুত এবং আয়তনের দিক থেকে আরও বিস্তৃত করেছেন। [১]

তিনি নতুন করে দিল্লির প্রাচীর নির্মাণ করিয়ে একে অপরাজেয় করে তুলেছিলেন। তিনি যে পরিমাণে পুকুর, সরাইখানা এবং দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী সুলতানদের মধ্যে কেউ তা করাননি। এছাড়া এই যুগে যে পরিমাণ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং শিল্প বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কারিগরদের যে প্রাচুর্য ছিল, তার উদাহরণও আগে পাওয়া যায় না। [২]

শান্তি ও স্থিতিশীলতা:

সুলতানের আমলে দেশ চরম স্থিতিশীলতা লাভ করেছিল। বাংলা থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং সিন্ধু থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত প্রতিটি স্থান একটি রাজনৈতিক ঐক্যে গেঁথে গিয়েছিল। মানুষ তাদের মালামাল খোলা অবস্থায় রেখে চলে যেত এবং কারো তা স্পর্শ করার সাহস হতো না। মুসাফির ও পরদেশীরা নিশ্চিন্তে সফর করত এবং যেখানেই গিয়ে অবস্থান করত, সেখানেই সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করত। [৩]

যদিও তিনি নিজে শরীয়তের অনুসারী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষ একদম সোজা হয়ে গিয়েছিল, অবাধ্যতা দূর হয়ে গিয়েছিল; ইনসাফ, পণ্যের সস্তা দর, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং দ্বীনদারি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। [৪]

মহান উলামা ও মাশায়েখের আধিক্য:

তাঁর আমলে দ্বীনদারি সাধারণ হওয়ার একটি বড় কারণ ছিল প্রথম সারির উলামা ও মাশায়েখের আধিক্য। দিল্লি সেই যুগে সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর নূরে আলোকিত ছিল এবং তাঁর প্রতি সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঝোঁক এতই ব্যাপক ছিল যে, উপমহাদেশের কোণায় কোণায় থেকে মানুষ তাঁর খানকাহর দিকে ছুটে আসত।

পাকপত্তনে বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহ.-এর উত্তরসূরি শেখ আলাউদ্দিন রহ. ইরশাদের মসনদ অলঙ্কৃত করে রেখেছিলেন। মুলতানে শাহ রুকনে আলম রহ. তাঁর দাদা শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রহ.-এর খানকাহর জৌলুস দ্বিগুণ করেছিলেন। কড়াহ-তে সৈয়দ রুকনুদ্দিন রহ. এবং কাইথালে সৈয়দ মুগীসুদ্দিন রহ.-এর দিকে মানুষের ঢল নামছিল।

এই যুগে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে 'সদরে জাহান' (কাযিউল কুযাত) পদেও যেসব ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে চাঁদ ও সূর্যের মতো ছিলেন। মুলতানে সদরে জাহান ছিলেন মাওলানা সদরুদ্দিন আরিফ রহ.। বায়ানা-তে...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭১; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, যাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে ৮৭

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৮

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৩

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৮

কাজী জিয়াউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন। একইভাবে শীর্ষস্থানীয় ক্বারী ও হাফেজ এবং প্রখ্যাত ওয়ায়েজ ও খতিবগণও এই যুগে নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল ছিলেন। [১]

আলাউদ্দিন খিলজি সম্পর্কে আল্লামা বারনির মন্তব্য:

আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আলাউদ্দিন খিলজি সম্পর্কে লিখেছেন: "প্রজাদের সাথে আলাউদ্দিন খিলজির আচরণ ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, সম্পদ ফিতনার কারণ। তাই জরিমানা ও শাস্তির মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে যতটা সম্ভব সম্পদ নিয়ে রাজকোষে জমা করা হতো। সে পাপাচার ও অনাচারের ওপর এমন কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল যে, মানুষের কাছে এই কাজগুলো বিষের চেয়েও তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে দ্রব্যমূল্য এতটাই সস্তা করে দিয়েছিল যে, সওদাগর ও দোকানদারদের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। তার শাসনামলে যারা গ্রেপ্তার, কারাবন্দি বা নির্বাসিত হতো, তারা মুক্তির আশা ছেড়ে দিত। সে হিন্দুদের ইঁদুরের গর্তে ঠেলে দিয়েছিল, রাজাদের রাজ্য জয় করেছিল এবং মোগলদের পরাজিত করেছিল। অপরাধের সন্দেহেও সে রক্তের নদী বইয়ে দিত। সে মানুষের সহায়-সম্পত্তি, ভূসম্পত্তি এবং ওয়াকফকৃত জায়গিরগুলোকেও রেহাই দেয়নি। সে (শুধু নফল) ইবাদত থেকেই বিরত ছিল না, বরং কথা ফরজ (সালাত ও সিয়াম) ত্যাগের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তার কঠোরতা ও বদমেজাজ তার বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ের নিরাপত্তার কারণ ছিল।" [২]

আলাউদ্দিন খিলজি এবং পদ্মাবত উপাখ্যান:

পদ্মাবত ও আলাউদ্দিন খিলজির কাহিনী একটি চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান। একে আপনি প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলতে পারেন। এই কাহিনীর উৎস হলো সুফি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সি (মৃত্যু ১৫৪০ খ্রি.)-এর লেখা মহাকাব্য "পদ্মাবত"।

মালিক মুহাম্মদ জায়সির পদ্মাবত অনুযায়ী কাহিনীর সারসংক্ষেপ হলো এই যে, সিংহলদ্বীপে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) "পদ্মাবতী" নামে এক রাজকন্যা বাস করত, যে তার অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তার কাছে একটি কথা বলা তোতা পাখি ছিল যার নাম ছিল "হীরামন"। এই তোতা পাখিটি পদ্মাবতীর রূপ ও গুণের অনেক প্রশংসা করত।

কোনো কারণে হীরামন তোতা সিংহলদ্বীপ থেকে উড়ে চিতোর পৌঁছে গেল। চিতোরের রাজা রতন সেন ছিলেন একজন সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। এই তোতা পাখির কাছে পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা শুনে তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য এক কঠিন সফরে রওনা হয়ে অবশেষে সিংহলদ্বীপে পৌঁছালেন। বারো বছরের সংগ্রামের পর তিনি পদ্মাবতীকে বিয়ে করতে সক্ষম হলেন এবং তাকে নিজের সাথে চিতোরে নিয়ে এলেন। [৩]

---

[১] ঐতিহাসিকগণ এই ব্যক্তিদের নাম ও জীবনবৃত্তান্তও লিখেছেন, যার অবকাশ এখানে নেই। দেখুন: তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ৪০৮ থেকে ৪১৪।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারনি: পৃষ্ঠা ৩৮৬।

[৩] ফেরেশতার বর্ণনা অনুযায়ী রতন সেন ছিলেন পদ্মাবতীর পিতা, কিন্তু মালিক জায়সির কাব্যিক উপাখ্যানে তাকে স্বামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিই বেশি প্রসিদ্ধ।

রতন সেনের দরবারে “রাঘব চেতন” নামে এক চতুর ও দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ বাস করত, যাকে রাজা কোনো এক অপরাধের কারণে দেশান্তরিত করেছিলেন। রাঘব চেতন রতন সেনের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লি যায় এবং সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির দরবারে পৌঁছে পদ্মাবতীর অতুলনীয় সৌন্দর্যের এমন এক চিত্র তুলে ধরে যে, আলাউদ্দিনের মন অস্থির হয়ে ওঠে।

পদ্মাবতীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আলাউদ্দিন খিলজি চিতোর অবরোধ করেন, যা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল কিন্তু তিনি দুর্গ জয় করতে পারেননি। অবশেষে তিনি এক চাল চাললেন এবং রাজা রতন সেনের কাছে আবেদন করলেন যে, তিনি কেবল একবার পদ্মাবতীকে দেখতে চান। পদ্মাবতী রাজপুতদের মর্যাদা ও ঐতিহ্যের অধীনে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখাতে রাজি হলেন।

আয়নায় পদ্মাবতীর প্রতিবিম্ব দেখে আলাউদ্দিন খিলজি তার সৌন্দর্যে আরও দিওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি প্রতারণা করে রাজা রতন সেনকে বন্দি করে দিল্লি নিয়ে যান এবং পদ্মাবতীকে দাবি করতে থাকেন। রাজপুত সর্দারগণ, যাদের মধ্যে “গোরা” ও “বাদল”-এর মতো বীররা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আলাউদ্দিন খিলজিকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং তাকে বার্তা পাঠালেন যে, পদ্মাবতী তার হারামে আসতে রাজি আছেন, তবে তিনি তার সকল দাসীদের সাথে নিয়ে আসবেন। আলাউদ্দিন খিলজি রাজি হয়ে গেলেন।

এখন শত শত রাজপুত সৈন্য পালকিতে সওয়ার হয়ে দিল্লি গেল। সেখানে সুযোগ বুঝে তারা কারাগারে আক্রমণ করে রাজা রতন সেনকে মুক্ত করে নিল এবং তাকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়ে চিতোরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিল। দিল্লির সেনাবাহিনী পিছু ধাওয়া করল এবং পথে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলো যাতে অনেক লোক মারা গেল, কিন্তু রতন সেন কোনো না কোনোভাবে চিতোর পৌঁছে গেলেন এবং পদ্মাবতীর বুদ্ধিমত্তায় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন যার কারণে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন।

এরপর আলাউদ্দিন খিলজি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে চিতোর আক্রমণ করেন। যখন রাজপুতরা বুঝতে পারল যে তারা খিলজির বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে না এবং পরাজয় নিশ্চিত, তখন রানী পদ্মাবতী ও দুর্গের অন্যান্য সকল নারী নিজেদের ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষার্থে সম্মিলিতভাবে আগুনে ঝাঁপ দিলেন এবং প্রাণ বিসর্জন দিলেন। যখন আলাউদ্দিন দুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি কেবল ছাই ও শূন্য দুর্গ দেখতে পেলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, এই কাহিনী মালিক মুহাম্মদ জায়সী আলাউদ্দিন খিলজির চিতোর আক্রমণের দুইশ বছর পর উদ্ভাবন করেছিলেন। অন্যথায় সেই সময়ের কোনো ঐতিহাসিক উৎসে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমনকি আমির খসরুও, যিনি আলাউদ্দিনের বিজয় অভিযানে সাথে ছিলেন এবং তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনিও এর কোনো উল্লেখ করেননি। যা-ই হোক, এই কাহিনী রাজপুতদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং তারা এর জন্য অনেক গর্ববোধ করে। অন্যদিকে, এই কাহিনীকে সুফি সাহিত্যে ইশকে মেজাজি থেকে ইশকে হাকিকি-র সফরের প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। যা-ই হোক, সেলিম ও আনারকলির প্রেমের কাহিনীর মতো এটিও একটি কাহিনী মাত্র।

https://t.me/BoierSomahar

শিহাবুদ্দিন উমর

৭১৫ হিজরি (১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন ৭ই শাওয়াল ৭১৫ হিজরি (৫ই জানুয়ারি ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে ছয় বছর বয়সী শিহাবুদ্দিন উমরের সিংহাসন আরোহণ সম্পন্ন হয়। যার সমস্ত পরিকল্পনা ছিল মালিক কাফুরের, যাতে সে তার আড়ালে নিজে শাসন করতে পারে। এখন প্রতিদিন দরবার বসতে লাগল। কিছু সময়ের জন্য বাদশাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতেন, তারপর তাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং কাফুর আদেশ জারি করতে থাকত। [১]

কাফুরের নিমকহারামি এবং শাহজাদাদের ওপর জুলুম:

শিহাবুদ্দিন উমরের ভাইদের মধ্যে খিজির খান, শাদি খান এবং মুবারক খান যুবক ছিলেন এবং সালতানাতের বেশি হকদার ছিলেন। এই কারণে মালিক কাফুর তাদের পক্ষ থেকে আশঙ্কায় ছিল। খিজির খান আগেই গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন। কাফুর অবিলম্বে একজন বিশ্বস্ত অফিসারকে পাঠিয়ে সেই বন্দী শাহজাদাকে অন্ধ করে দিল যাতে সে কখনো বিদ্রোহ করতে না পারে। খিজির খানের মা এবং মালিকা-ই-জাহানের সমস্ত সম্পত্তি এবং অলঙ্কারও বাজেয়াপ্ত করা হলো। এরপর কাফুর দ্বিতীয় শাহজাদা শাদি খানকেও অন্ধ করে তাকেও গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দিল। তৃতীয় শাহজাদা মুবারক খান দিল্লিতে বন্দী ছিলেন। কাফুর তাকেও অন্ধ করতে চেয়েছিল। শাহজাদার মা মালিক-ই-জাহান যখন খবর পেলেন, তখন তিনি দিল্লির প্রখ্যাত বুজুর্গ শেখ নজমউদ্দিনের (যিনি শেখ আহমদ জামের সন্তান ছিলেন) মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করালেন। আল্লাহর কুদরত এমন হলো যে কোনোভাবেই শাস্তির আদেশ কার্যকর হতে পারল না এবং এভাবে শাহজাদা মুবারক অন্ধ হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন। কাফুর যদিও খোজা ছিল, তবুও সে একটি হাস্যকর ও লজ্জাজনক কাজ করল এই যে, নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য প্রয়াত সুলতানের বিধবা ঝতিয়াপালিকে (রাম দেবের কন্যা) বিয়ে করে নিল। [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪১৮; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ৩৭২; সিংহাসন আরোহণের উল্লিখিত তারিখ তারিখ-ই-মুবারক শাহী (পৃ. ৮১)-তে বর্ণিত আছে।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪১৮; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ৩৭৩, ৩৭৪;

https://t.me/BoierSomahar

শাহজাদা মুবারকের হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ। কাফুরের পরিণতি:

মালিক কাফুর এরপর এমন অনেক আমিরকে হত্যার পরিকল্পনা করতে শুরু করল যারা সরকারের এই নতুন বিন্যাসে খুশি ছিল না। এর পাশাপাশি সে শাহজাদা মুবারককেও হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। ফলে এই উদ্দেশ্যে সে কয়েকজন খোজা প্রহরীকে কারাগারে পাঠাল। শাহজাদা মুবারক তাদের দেখে নিজের রত্নখচিত কণ্ঠহার খুলে তাদের দিয়ে দিলেন এবং সেই সাথে নিজের পিতার অনুগ্রহ ও দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাদের লজ্জা হলো। তারা ফিরে এসে শাহজাদার কণ্ঠহার তাদের অফিসারদের হাতে তুলে দিল এবং তাদের সব ঘটনা শোনাল। এই অফিসাররাও কাফুরের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে দুই অফিসার: মুবাশির এবং বশির ঠিক করল যে, এখন কাফুরের হাত থেকে মুক্তি পেয়েই দম নেবে। রাতে প্রাসাদের দরজা বন্ধ হওয়ার পর এই অফিসাররা তাদের অধীনস্থ খোজা প্রহরীদের সাথে হঠাৎ কাফুরের শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ল এবং তার শিরশ্ছেদ করল। তারপর তারা কারাগারে গেল এবং মুবারক খানের শিকল কেটে তাকে বাইরে বের করে আনল। পরদিন সকালে যখন দিল্লির আমিররা দরবারে এল, তখন কাফুর দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং শাহজাদা মুবারক খান সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

শাহজাদা মুবারক খানকে এখন কাফুরের পরিবর্তে নায়েবে সুলতান পদ দেওয়া হলো, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর সে অভিযোগ করল যে, শিশু বাদশাহর মা ঝাতিয়াপালি তাকে বিষ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে সিংহাসন আরোহণের মাত্র সাড়ে তিন মাস পর মহররম ৭১৬ হিজরি (জানুয়ারি ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে শিহাবুদ্দিন উমরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো এবং অন্ধ করে গোয়ালিয়রের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। এরপর মুবারক খান নিজের শাসনের ঘোষণা দিল। [১]

---

(১) তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৮, ৪৯; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি রচিত): পৃ. ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৮১, ৮২।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খলজি

৭১৬ হিজরি থেকে ৭২০ হিজরি

(১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ)

২৩ বছর বয়সী শাহজাদা মুবারক খান ২০ মহরম ৭১৬ হিজরি (২২ এপ্রিল ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১] যেসব রক্ষী কর্মকর্তা এবং খোজারা কাফুরকে হত্যা করেছিল, তারা সাধারণ স্তরের ছিল কিন্তু তারা নিজেদের মর্যাদা ভুলে গিয়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদের দাবি করতে শুরু করে। মুবারক শাহ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি তাদের মধ্যে কয়েকজনকে হত্যা করিয়ে দেন এবং বাকিদের আলাদা করে বিভিন্ন শহরে পাঠিয়ে তাদের জোটকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। [২]

মুবারক শাহের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ:

এর আগে মুবারক শাহ বেশ কিছু দিন কষ্ট ও বিপদের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন, কারাবাসের কঠোরতা সহ্য করেছিলেন এবং আল্লাহ তাকে মালিক কাফুরের হাতে অন্ধ হওয়া থেকে অল্পের জন্য রক্ষা করেছিলেন। এভাবে মানুষের কষ্টের ব্যাপারে তার ভালো ধারণা ছিল, তাই সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই তিনি যতটা সম্ভব মানুষের সাথে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করেন। তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ:

- নিজের সিংহাসনে আরোহণের দিন তিনি তার পিতার আমলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন, ফলে বিভিন্ন কারাগার থেকে প্রায় সতেরো হাজার ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয় যাদের মধ্যে বিশ বছর ধরে বন্দি থাকা লোকও ছিল। বন্দিদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল তারা যাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রকৃতির মামলা ছিল অথবা যারা ঘুষ গ্রহণ বা কোনো ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিল।

- বন্দি শাহজাদাদের (নিজের ভাইদের) তিনি মুক্তির এই সুবিধা থেকে বাদ রাখেন।

- তিনি উলামা ও সাদাতদের ভাতা বৃদ্ধি করেন এবং সৈন্যদের বেতন বাড়িয়ে দেন।

- আলাউদ্দিনের আমলে অনেক লোকের কাছ থেকে যেসব জায়গির ও জমি কেড়ে নিয়ে সরকারি জমিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল

---

[১] তারিখ মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৮২

[২] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৪০

গিয়েছিল, সেগুলো তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো। অধিকন্তু, অনেক মানুষকে নতুন জায়গিরও প্রদান করা হলো।

- খাজনা আদায় বা অভিযোগ প্রমাণের জন্য মারধর, কারাদণ্ড এবং সব ধরনের কঠোরতা নিষিদ্ধ করা হলো।
- আলাউদ্দিন খলজির আমলে আরোপিত কঠোর করসমূহও বাতিল করা হলো।
- কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন চার গুণ বৃদ্ধি করা হলো।

এগুলো ছিল সেই পদক্ষেপ যার ফলে মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হলো।

তবে অন্যদিকে আলাউদ্দিনের আমলের অর্থনৈতিক সংস্কারগুলো স্থগিত করে দেওয়া হলো, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে গেল। একইভাবে জবাবদিহিতা, আটক এবং ধরপাকড় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মানুষ সব ধরনের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হতে শুরু করল। আলাউদ্দিনের আমলে আইন মান্যকারী মানুষ সাধারণত মৃত্যু, আখিরাত এবং হাশরের ময়দানে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করত এবং তারা মসজিদ ও খানকাহগুলোতে প্রশান্তি খুঁজে পেত। কিন্তু এখন তারা তাদের পছন্দসই কর্মকাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছিল, তাই এক বিশাল অংশ বিলাসিতা এবং মদ্যপানের দিকে ঝুঁকে পড়ল। মসজিদে মানুষের উপস্থিতি কমে গেল এবং পাপাচার ও অশ্লীলতা বেড়ে গেল।

স্বয়ং মুবারক শাহের নিজের অবস্থাও এর চেয়ে ভিন্ন ছিল না, ফলে ফাঁসির মঞ্চ থেকে রাজসিংহাসনে পৌঁছানোর সাথে সাথেই সে এমন আত্মভোলা হয়ে গেল যে মদ্যপান এবং বিলাসিতার অন্যান্য সমস্ত অনুষঙ্গে মগ্ন থাকতে শুরু করল। সে এই দিক থেকে ভাগ্যবান ছিল যে তার চার বছর চার মাসের শাসনকালে কোনো বিদেশি আক্রমণকারী হিন্দুস্তানের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি, অভ্যন্তরীণভাবে কোনো বিশেষ বিদ্রোহ হয়নি, এমনকি দুর্ভিক্ষের মুখোমুখিও হতে হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে চারদিকে সমৃদ্ধি ও শান্তি ছিল। কিন্তু মুবারক শাহ এমন মূল্যবান সময় অবহেলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করল। [১]

মুবারক শাহের খসরু খান এবং হুসামুদ্দিনের সাথে প্রণয়:

আলাউদ্দিন খলজির অবহেলার কারণে তার শাহজাদাদের কোনো দ্বীনি বা নৈতিক শিক্ষা হতে পারেনি। মুবারক শাহের অবস্থাও ছিল একই রকম। সে নারীদের সাথে অত্যধিক মেলামেশা ছাড়াও সমকামী ছিল। হাসান এবং হুসামুদ্দিন নামে দুই গোলাম বালক, যারা একে অপরের সহোদর ভাই ছিল, তারা ছিল তার প্রিয়পাত্র। তারা দুজনেই মালওয়ার একটি হিন্দু গোত্র 'বারওয়ার'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। [২]

আলাউদ্দিন খলজির আদেশে ৭০৪ হিজরিতে যখন আমির আইনুল মুলক মালওয়া জয় করেছিলেন, তখন বন্দীদের মধ্যে এই দুই সুন্দর কিশোর ভাইও গোলাম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের নাম রাখা হয়েছিল হাসান এবং হুসামুদ্দিন। [৩]

শাহজাদা মুবারক শাহ তখন প্রায় দশ বছর বয়সী ছিল। তাদের দুজনের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং যৌবনের সীমায় পা রাখার পর...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৭।

[২] খসরু খান হিন্দু গুজরাটি বংশোদ্ভূত ছিল। সে 'পারিও' বা 'বারওয়ার' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি হিন্দুদের একটি নিচু জাত ছিল যাদের মানুষ মালওয়া থেকে গুজরাট পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তাদের কখনো কখনো প্রাচী বা পাঞ্চিও বলা হতো, যা টেকো হওয়া বা বিশেষ পেশার সাথে যুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। কিছু ঐতিহাসিক সূত্রে তাদের যোদ্ধা বা ডাকাত ও লুটেরা হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

[৩] এমন কিছু প্রমাণ ও নিদর্শন রয়েছে যে খসরু খান এবং তার ভাইয়ের নাম কেবল মুসলমানদের মতো রাখা হয়েছিল, অন্যথায় বাস্তবে ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাদের উভয়কে ভেতর থেকে হিন্দুই গণ্য করতেন এবং তাদের কথা ঘৃণার সাথে উল্লেখ করতেন।

রাখার পর এই বন্ধুত্ব অবৈধ সম্পর্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। যখন মুবারক শাহ বাদশাহ হলেন, তখন এই অবৈধ প্রেমের আবেগের বশবর্তী হয়ে হাসানকে (যার বয়স তখন বিশ-বাইশ বছর ছিল) "খসরু খান" উপাধি দিয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আমীরদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং দেশের সমস্ত সম্পত্তি ও জায়গির তার নামে করে দিলেন। এভাবে বসে বসেই তিনি সেই মারাত্মক কাজ করলেন যা তার পিতা মালিক কাফুরের মতো আপদকে নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে করেছিলেন।

মুবারক শাহ খসরু খানের ওপর এতটাই আসক্ত ছিলেন যে, জনসমক্ষে তাকে চুম্বন করতে তার কোনো লজ্জা হতো না। তবে খসরু খান একজন বারবনিতার মতো নিজের দেহ বাদশাহর সামনে পেশ করতে সর্বদা অত্যন্ত অপমান বোধ করতেন এবং তার মন চাইত যে খঞ্জর দিয়ে তার বুক চিরে ফেলুক, কিন্তু তিনি বাদশাহর নৈকট্য থেকে অর্জিত মর্যাদা হারাতে চাইতেন না। [১]

যেসব অভ্যাসকে সবাই দোষ মনে করে... যেসব স্বভাবের সাথে পশুর তুলনা হয়
লম্পটরা যেসব আচরণ লুকিয়ে রাখে... নীচ লোকেরাও যেসব কাজ করে না
সেগুলো এখানে ধনীদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে [২]
না আছে আল্লাহর ভয়, না আছে পয়গম্বরের লজ্জা।

গুজরাটের বিদ্রোহ এবং নতুন ব্যবস্থা:

সিংহাসনে আরোহণের পর মুবারক শাহ যে প্রথম অভিযানের সম্মুখীন হন, তা ছিল গুজরাটের শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত। কয়েক মাস আগে গুজরাটের জনপ্রিয় শাসক আল্প খান দিল্লিতে কাফুরের হাতে নিহত হয়েছিলেন, যার ফলে গুজরাটি কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। শীঘ্রই তারা খবর পেয়েছিলেন যে কাফুর তার পরিণতির শিকার হয়েছেন। তা সত্ত্বেও সেই কর্মকর্তারা বিদ্রোহ অব্যাহত রেখেছিলেন। যা-ই হোক, মুবারক শাহ সালতানাতের অভিজ্ঞ আমীর আইনুল মুলককে সেখানে পাঠান, যিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে বিদ্রোহী কর্মকর্তাদের অধিকাংশকে আনুগত্য স্বীকারে রাজি করান, আর যারা অবাধ্যতায় অটল ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়।

মুবারক শাহ কিছুদিন আগে সালতানাতের প্রাচীন আমীর দিনার জাফর খানের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তাই গুজরাটের সুবাদারির জন্য নিজের শ্বশুরকে নিয়োগ দেওয়া উপযুক্ত মনে করলেন। দিনার জাফর খান সেখানে এমন উত্তম ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার পরিচয় দেন যে, গুজরাটের মানুষ আল্প খানের কীর্তিগুলোও ভুলে গেল। [৩]

দেবগিরি সফর:

দেবগিরিতে আবারও বিদ্রোহী উপাদানগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল এবং সেখানে রাম দেবের ছেলে হরপাল দেব বিদ্রোহ করেছিলেন। মুবারক শাহ ৭১৮ হিজরিতে নিজেই এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সেখানে যান। মারাঠা সরদাররা উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি, পৃষ্ঠা ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২

[২] আলতাফ হোসেন হালি

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি, পৃষ্ঠা ৩৮৮

এবং এভাবে দেওগিরি নতুন করে জয় করে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা নবায়ন করা হলো।

হরপাল দেব বন্দী হলেন। মুবারক শাহের আদেশে তার চামড়া ছাড়িয়ে দেওগিরির প্রাচীরে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এটিই ছিল প্রথমবার যখন মুবারক শাহকে প্রতিশোধের নেশায় মত্ত দেখা গিয়েছিল।

আল্লামা বারানির মতে, এটিই ছিল সেই সময় যখন মুবারক শাহের জন্য দুর্ভাগ্যের নক্ষত্র উদিত হয়েছিল। দেওগিরিতে অবস্থানকালে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় এবং বাহিনীকে দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থান করতে হয়। [১]

নির্দোষ লোকদের হত্যা করা:

মুবারক শাহ তখনও দেওগিরিতে ছিলেন যখন শাহজাদা আসাদউদ্দিন খিলজি তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এই শাহজাদা ছিলেন সুলতান জালালউদ্দিন খিলজির ভাই বগরাশ খানের ছেলে। কিন্তু আসাদউদ্দিনের কোনো এক সঙ্গী মুবারক শাহকে সময়মতো বিষয়টি জানিয়ে দেন। এখান থেকেই মুবারক শাহের মেজাজে ক্রোধের এমন এক শিখা জ্বলে ওঠে যা আর কখনো নেভেনি এবং তিনি একজন জালেম, বদমেজাজি ও দয়াহীন ব্যক্তিতে পরিণত হন।

তার আদেশে আসাদউদ্দিন এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অপর এক কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। এরপর মুবারক শাহ বগরাশ খানের পুরো বংশকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। ফলে দিল্লিতে বসবাসরত এই পরিবারের এমন শিশুদেরও হত্যা করা হয় যারা ছিল নাবালক। সর্বমোট '২৯' জন নির্দোষ পুরুষ ও বালককে হত্যা করা হয়, পুরো পরিবারের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাদের নারীদের একবেলা খাবারের জন্য মুখাপেক্ষী করে রাস্তায় ভিক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। [২]

মজলুমের আহাজারিতে না ডরানো... নিঃস্বের অবস্থায় দয়া না করা

লোভ-লালসায় আত্মসত্তা বিসর্জন দেওয়া... বিলাসিতায় বাঁচা, প্রদর্শনীতে মরা

সর্বদা গাফলতের ঘুমে বেহুঁশ থাকা

মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মবিস্মৃত থাকা [৩]

ভাইদেরও হত্যা করা:

মুবারক শাহ দেওগিরি থেকে ফেরার পথে গোয়ালিয়র দুর্গের কাছে পৌঁছান যেখানে তার তিন ভাই: খিজির খান, শাদি খান এবং শিহাবুদ্দিন উমরকে অন্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং তাদের কেবল রুটি ও পোশাক দেওয়া হতো। মুবারক শাহ এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যে, পাছে তাদের কোনো বিদ্রোহে ব্যবহার করা না হয়, তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। ফলে সেই তিন দুর্ভাগা শাহজাদাকে, যাদের মধ্যে একজন সাবেক বাদশাহ এবং একজন সাবেক যুবরাজ ছিলেন, সেখানেই হত্যা করা হয়। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৮৯, ৩৯০

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৯২, ৩৯৩

[৩] হালি

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৯৩, ৩৯৪

https://t.me/BoierSomahar

বিদ্রোহের সন্দেহে দুই নায়েবকে হত্যা:

মুবারক শাহ দেওগিরি থেকে দিল্লি ফেরার পর পুরোপুরি বদলে গিয়েছিলেন। এখন তিনি দয়া-মায়া থেকে দূরে এবং প্রত্যেকের ওপর চড়াও হতে প্রস্তুত বলে মনে হতো। তিনি দেওগিরি অভিযানের সময় মালিক শাহীন নামক এক সাধারণ অফিসারকে নায়েবে সালতানাত বানিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরে আসার কিছুকাল পর কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করিয়ে দেন। একইভাবে তিনি তার শ্বশুর দীনার জাফর খানকে, যিনি গুজরাটের শাসক ছিলেন এবং সেখানে অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করছিলেন, কোনো অপরাধ ছাড়াই কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যা করিয়ে দেন। [১]

বিদ্রোহের শাস্তি, মাত্র একটি চড়:

এরপর তিনি খসরু খানের বৈমাত্রেয় ভাই হুসামুদ্দিনকে গুজরাটের শাসক বানিয়ে পাঠান, যা ছিল আরও একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ হুসামুদ্দিন ছিল চরম নিমকহারাম। গুজরাট পৌঁছে সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং নিজের কওম 'বারওয়ার'-এর হিন্দুদের একত্রিত করে দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যদিও এই বিদ্রোহ সফল হয়নি এবং গুজরাটের মুসলিম আমীররা হুসামুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু মুবারক শাহ হুসামুদ্দিনকে মাত্র একটি চড় মেরেই ক্ষান্ত হন এবং তাকে আগের মতোই ঘনিষ্ঠতম আমীরদের অন্তর্ভুক্ত রাখেন। সমস্ত দরবারী অবাক ছিলেন যে, যে বাদশাহ কিছুদিন আগে কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মালিক শাহীন এবং নিজের শ্বশুরকে হত্যা করিয়েছিলেন, তিনি ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) এবং বিদ্রোহের মতো অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি এত নরম হলেন কীভাবে!! [২]

আমাদের কৌশলের নখ আর কী কাজে আসবে... যখন ভালোবাসার সুতোর গিঁটই খুলছে না
ঘাতকের খঞ্জরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কী মুখ আছে... এখানে তো আমার কলিজার ক্ষতের মুখই খুলছে না [৩]

কিছু উত্তম নিয়োগ:

গুজরাটের শাসনের জন্য এবার মালিক ওয়াহিদ উদ্দিন কুরাইশীকে সদরুল মুলক খেতাব দিয়ে পাঠানো হয়, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাচারী, দূরদর্শী এবং শ্রেষ্ঠ প্রশাসক। তিনি গুজরাটের শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ পদ্ধতিতে পরিচালনা করেন।

এই দিনগুলোতে দেওগিরির সুবাদার মালিক ইয়াক লাখি আলাই (যিনি ছিলেন একজন হিন্দু বংশোদ্ভূত গোলাম) বিদ্রোহের চেষ্টা করেন, কিন্তু সময়মতো তা জানা যায়। মুবারক শাহ খসরু খানকে পাঠিয়ে মালিক ইয়াক লাখির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্রোহীর নাক-কান কাটিয়ে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয় [৪] এবং তার স্থলে দেওগিরিতে আইনুল মুলককে নিযুক্ত করা হয়, যিনি সেখানকার শাসনকার্য এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন যা কেউ আশা করেনি। মানুষ অবাক ছিল যে, মুবারক শাহের মতো একজন অযোগ্য বাদশাহর নির্বাচন এত চমৎকার হয় কীভাবে। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৯৫

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৯৬, ৩৯৭

[৩] বাহাদুর শাহ জাফর

[৪] আশ্চর্যের বিষয় হলো, মালিক ইয়াক লাখি নাক-কান কাটার পরও সালতানাতের অনুগত ছিলেন, ফলে মুবারক শাহ তাকে সামানার সুবাদার বানিয়ে দেন। পরবর্তীতে যখন গাজী মালিক (গিয়াসউদ্দিন তুঘলক) সুবাদারদের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তার সাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান, তখন মালিক ইয়াক লাখি আলাই সামানার সুবাদার হিসেবে গাজী মালিকের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং রাজধানী দিল্লির বাহিনীর সাথেই থাকেন। (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৮৯)

[৫] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮

দেবগিরি কুতুবাবাদে পরিণত হলো:

আলাউদ্দিন খিলজি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ব্যাপারে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে, সেখানকার হিন্দু রাজ্যগুলো দিল্লির সাথে তাদের সংযুক্তি বজায় রাখবে এবং পূর্ববর্তী শাসকদের মতো শাসন কাজ চালিয়ে যাবে। কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ এই নীতি পরিবর্তন করে দেন। তিনি দেবগিরির প্রাচীন 'যাদব' বংশের শাসনের অবসান ঘটান এবং সেখানে নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং মুসলিম আমিরদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু যেহেতু কেন্দ্র থেকে দূরত্বের কারণে এই আশঙ্কা ছিল যে, এই আমিররা বারবার বিদ্রোহ করতে পারে, তাই এই এলাকাগুলোকে ছোট ছোট অফিসারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল যাদের "আমিরান-ই-সাদাহ" বলা হতো। এই অফিসারদের কাজ ছিল স্থানীয় শাসকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে একশ জন সৈন্য ও অন্যান্য কর্মচারী থাকত, তাই তাদের "আমিরান-ই-সাদাহ" বলা হতো। যাই হোক, এটি একটি শিথিল ব্যবস্থা ছিল যা আরও উন্নত করার প্রয়োজন ছিল। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এটিও করা হয়েছিল যে, 'দেবগিরি'কে বর্তমান শাসকের নামে 'কুতুবাবাদ' নামকরণ করা হয়েছিল এবং এই সময়ে এখানে একটি দারুল জারব (টাকশাল) ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। [১]

মুবারক শাহের অশোভন আচরণ:

মুবারক শাহ সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই মদ্যপান, আমোদ-প্রমোদ এবং অন্যান্য বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি সালাতও ছেড়ে দেন। শুধু ফরজ রোজা ত্যাগ করেননি বরং রমজান মাসে প্রকাশ্যে পানাহার শুরু করেন। এখন তার চারপাশে সর্বদা নর্তকী ও ভাঁড়দের ভিড় থাকত। এমনকি কখনও কখনও রাজা নিজেই মহিলাদের মতো অলঙ্কার ও পোশাক পরে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সাধারণ মজলিসে চলে আসতেন। [২]

যখন রাজার অবস্থা এমন অধঃপতিত হলো, তখন রাজপ্রাসাদের মর্যাদা ও দরবারের আদব-কায়দা সব বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং রাজপ্রাসাদ দুশ্চরিত্র ও ভবঘুরে নারীদের আড্ডায় পরিণত হলো, যাদের মুখে সালতানাতের আমিরদের সম্মান ধুলোয় মিশে যেতে লাগল। আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন যে, একদিন শাহী মহল 'হাজার সুতুন'-এর বারান্দা থেকে কয়েকজন ভাঁড় নারী দুই প্রখ্যাত আমির: আইনুল মুলক এবং মালিক আহমদ জহিম (কারাবেগ)-কে সবার সামনে এমন অশ্লীল গালিগালাজ করল যে আল-আমান ওয়াল হাফিজ।

মুবারক শাহের একজন প্রিয় গুজরাটি ভাঁড় ছিল যার নাম ছিল "তওবা"। রাজা তাকে সব ধরণের নীচ কাজ প্রকাশ্যে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সে মাঝে মাঝে নগ্ন অবস্থায় দরবারে চলে আসত এবং আমিরদের প্রকাশ্যে অশ্লীল গালিগালাজ করত। আমিরদের এভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে মুবারক শাহ খুব আনন্দিত হতেন। [৩]

---

[১] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭১, ২৭৮।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৯৫।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৯৬, ৩৯৭।

বারানির মূল ইবারত (উদ্ধৃতি) হলো: "সেই নীচ বংশীয় হিন্দুটি আমিরদের স্ত্রী ও মায়েদের গালি দিত, এবং লিঙ্গ উন্মুক্ত করে আসত, এবং আমিরদের পোশাকে প্রস্রাব করত ও বায়ু ত্যাগ করত। এবং কখনও কখনও সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মজলিসে আসত এবং অশ্লীল কথা বলত।" (ঐ: পৃষ্ঠা ৩৯৬)

হাসি আছে, কৌতুক আছে, দিন-রাত খুনসুটি আর আমোদ-প্রমোদ আছে

লজ্জা বিলীন হয়েছে তো হোক, তাদের মন তো ভোলাতে হবে

বিপদ তো প্রাণবানদের, আনন্দ তো তোমার মতো কামুকদের

না আছে তোমার দৃষ্টির বোধ, না আছে অস্থিরতার অনুভূতি [১]

এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, সেই যুগে দরবারের পরিবেশ কতটা অবনতির শিকার হয়েছিল, যেখানে একজন ভাঁড়কে দরবারে এমন বেয়াদবি ও ধৃষ্টতার অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যা সাধারণ মানুষের মজলিসেও অকল্পনীয় ছিল।

হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির অবমাননা:

মুবারক শাহ হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও দুর্ব্যবহার ও অবমাননাকর আচরণ করেন, যদিও তিনি পূর্ববর্তী সকল বাদশাহদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল অপরিসীম। গিয়াসপুরে অবস্থিত খাজা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির খানকায় অসংখ্য আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ভক্ত হিসেবে উপস্থিত হতেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনো রাজদরবারের সাথে যুক্ত হননি। তাঁর জীবন ছিল দরবেশ ও ফকিরের মতো। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তাঁকে সম্মান করতেন। যদিও তিনি তাঁর অনুসারী ছিলেন না, তবুও তিনি কখনো তাঁর জনপ্রিয়তাকে সন্দেহের চোখে দেখেননি।

তাঁর বড় ছেলে খিজির খান আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত খাজা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরিদ হয়েছিলেন, যদিও তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক নেতার শিক্ষা ত্যাগ করে খুব শীঘ্রই বিলাসিতার জীবন বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু এই খানকার সাথে তাঁর নামমাত্র সম্পর্কও মুবারক শাহের জন্য হিংসা ও সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণেই শাহজাদা খিজির খানকে হত্যা করার পর মুবারক শাহ হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা শুরু করেন। [২]

তিনি মুলতান থেকে শাহ রুকন আলমকে দিল্লিতে আনিয়ে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন যাতে মানুষ হযরত খাজা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির পরিবর্তে শাহ রুকন আলমের অনুসারী হয়ে যায়, কিন্তু উভয় বুজুর্গ একে অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। কিছুকাল পর একটি শোক সভায় খাজা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মুবারক শাহের মুখোমুখি দেখা হয়। খাজা সাহেব সালাম দিলেন কিন্তু মুবারক শাহ উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। কিছুদিন পর মুবারক শাহ এই আদেশ জারি করেন যে, কেউ যেন খাজা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির খানকায় না যায়। কিন্তু খাজা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্মান ও মহিমা এতটাই ছিল যে, এই মূর্খতাপূর্ণ আদেশের কোনো তোয়াক্কাই করা হয়নি।

মুবারক শাহের রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি ঘোষণা করালেন যে, যে ব্যক্তি খাজা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিরশ্ছেদ করে নিয়ে আসবে, তাকে এক হাজার মুদ্রা দেওয়া হবে। কিন্তু এই আদেশে খাজা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি ভীত হননি এবং কারো এমন করার সাহসও হয়নি। [৩]

---

[১] মজজুব

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৩৯৪

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৩৯৬

খসরু খানের বিজয় ও ষড়যন্ত্র

৭১৮ হিজরিতে যখন মুবারক শাহ দেওগিরি পুনর্দখল করে অবসর হলেন, তখন তিনি খসরু খানকে 'মাবারি' (তামিলনাড়ু) অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। কারণ দীর্ঘকাল ধরে সেখান থেকে কোনো কর আদায় হচ্ছিল না। খসরু খান রাজধানীর অবরোধ করে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী শক্তিগুলোকে দমন করেছিলেন। এভাবে দক্ষিণ ভারতের অভিযানের অভিজ্ঞতার দিক থেকে খসরু খান মালিক কাফুরের সমতুল্য হয়ে গিয়েছিলেন। [১]

মাবারিতে খসরু খানের বিদ্রোহী তৎপরতা:

পরে যখন খসরু খানকে মালিক ইয়াকলাখির বিদ্রোহ দমনের জন্য দেওগিরিতে পাঠানো হয়েছিল, তখন তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল 'মাবারি' (তামিলনাড়ু) ইত্যাদিও পুনরায় জয় করা হয়। খসরু খান দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিলেন এবং চাচ্ছিলেন যে কোনো দূরবর্তী অঞ্চলে দখলদার হয়ে থাকবেন এবং মুবারক শাহের যৌন লালসার শিকার হওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। ফলে তিনি 'মাবারি'-তে নিজের কর্তৃত্ব কঠোর থেকে কঠোরতর করতে শুরু করেন। এর জন্য তিনি অত্যাচার করতেও দ্বিধা করেননি।

একজন মুসলিম বণিক খাজা তাকি, যার সম্পর্ক ছিল আহলে সুন্নাতের সাথে, তিনি ছিলেন অগাধ ধন-সম্পদের মালিক। তার মোটেও আশা ছিল না যে বিজয়ী সেনাপতি তার সম্পদের ক্ষতি করবেন, কিন্তু খসরু খান তার সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করান। শুধু তাই নয়, বরং লস্করে দিল্লি থেকে আসা অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও তিনি দমন ও ভয়ভীতি দেখাতে থাকেন। সেই সাথে তিনি সেই কর্মকর্তাদের হত্যার প্রস্তুতি নেন যারা দিল্লির প্রতি অনুগত ছিলেন, যাতে তার স্বাধীনতায় কেউ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। [২]

খসরু খানের ষড়যন্ত্র ফাঁস এবং বাদশাহকে অবহিতকরণ:

তবে কর্মকর্তাদের কাছে তার সংকল্পের কথা প্রকাশ হয়ে যায় এবং তারা সম্মিলিতভাবে খসরু খানকে বলেন: "স্বাধীনতার অসম্ভব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন, এর আগে যে আপনার ষড়যন্ত্রের রহস্য ফাঁস হয়ে যায়, আপনি অবিলম্বে দিল্লি চলে যান।"

খসরু খান ঘাবড়ে গিয়ে 'মাবারি' থেকে দেওগিরির দিকে রওনা হলেন। এদিকে আমিররা দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে এই সমস্ত ঘটনা মুবারক শাহকে লিখে পাঠালেন। মুবারক শাহ এতে বিশ্বাস করেননি বরং তিনি চেয়েছিলেন তার প্রিয়ভাজনের ওপর লাগা অপবাদের দাগ দ্রুত ধুয়ে ফেলতে। তাই তিনি তাকিদ দিলেন যেন খসরু খানকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে পালকিতে বসিয়ে দ্রুত দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মোটকথা, খসরু খানের পালকি বাহকদের কাঁধে চড়ে নিরবচ্ছিন্ন সফর শুরু হলো। প্রতিটি মঞ্জিলে বাহক পরিবর্তন করা হতো। এভাবে এই নিমকহারামকে মাত্র সাত-আট দিনে দেওগিরি থেকে দিল্লি পৌঁছে দেওয়া হলো। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী আজ বারানি: পৃ. ৩৯১, ৩৯২

[২] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী আজ বারানি: পৃ. ৩৯৯, ৪০০

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজশাহী আজ বারানি: পৃ. ৩৯৮, ৩৯৯

খসরু খান বাদশাহকে প্রতারণা করতে সফল:

খসরু খান বাদশাহর খিদমতে পৌঁছানো মাত্রই এক দুর্দান্ত অভিনয় করল। সে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল: “রাজকীয় আমীররা আমার শান-শওকতে ঈর্ষান্বিত এবং আমাকে সম্মান করাকে নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করে, তাই তারা আমাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার জন্য বিদ্রোহের মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।” বাদশাহ তার প্রতি এতটাই আসক্ত ছিলেন যে, এই মিথ্যা বক্তব্যকে সত্য বলে ধরে নিলেন।
ব্যথার মুহূর্তকে আকাঙ্ক্ষার অলৌকিকতা মনে করো... এটি সামর্থ্যের বিষয়, ঘাতককে মসীহা মনে করো [১]

কয়েক দিন পর অভিযোগকারী আমীররাও দিল্লির দরবারে পৌঁছে গেলেন এবং পুরো ঘটনা নিজেদের জবানিতে শোনালেন এবং নিজেদের দাবির সপক্ষে বেশ কিছু সাক্ষীও পেশ করলেন। কিন্তু মুবারক শাহ অবৈধ প্রেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উল্টো আমীরদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন এবং রাগান্বিত হয়ে কাউকে চড় মারলেন, কাউকে লাঞ্ছিত করলেন, কাউকে মারধর করলেন, কারও সম্পত্তি কেড়ে নিলেন, কাউকে বদলি করে দিলেন এবং কাউকে পদচ্যুত করলেন।
প্রেমিকের সামনে বলো না যে সে চঞ্চল ও দুশ্চরিত্র ছিল... সে জালিম ছিল বা রক্তপিপাসু ছিল, যা-ই ছিল, সে তো আমাদেরই বন্ধু ছিল [২]

সংক্ষেপে, খসরু খানের ওপর বাদশাহর আস্থা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি আমীরদের আন্তরিকতাকে ত্রুটি হিসেবে গণ্য করতে শুরু করলেন, কারণ তার বিরুদ্ধে একটি শব্দ বলাও ছিল রাজকীয় রোষকে আমন্ত্রণ জানানো। আমীররা খসরু খানের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং বাদশাহর প্রতিটি বোকামি সহ্য করতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে তাদের এই বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, শীঘ্রই এই নিমকহারাম বাদশাহর তরী ডুবিয়ে ছাড়বে। [৩]

মুবারক শাহর খসরুর ওপর অন্ধ বিশ্বাস:

অন্যদিকে খসরু খান ভালোভাবেই জানত যে বাদশাহ তার প্রেমে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছেন, তাই সে নতুন করে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করতে শুরু করল। একদিন সে বাদশাহকে বলল: “হুজুর, আমাকে যখন কোনো অভিযানে পাঠানো হয়, তখন অধিকাংশ লোক আমার অধীনে থাকাকে নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করে। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি আমার বারওয়ার গোত্রের লোকদের একত্রিত করে একটি আলাদা বাহিনী তৈরি করব, যারা আমার আদেশে ও অধীনে থেকে অভিযান পরিচালনা করবে।”

বাদশাহ অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাকে অনুমতি দিলেন। খসরু খান এখন গুজরাট থেকে বারওয়ার গোত্রের হিন্দুদের সৈন্য হিসেবে নিয়োগ দিতে শুরু করল। শীঘ্রই সে চল্লিশ হাজার লোকের একটি বাহিনী তৈরি করল, যারা ছিল সেই দাসের ইশারার গোলাম। [৪]

রাজপ্রাসাদের চাবিও খসরুর হাতে সমর্পণ:

কয়েক দিন পর খসরু খান বাদশাহকে বলল: “আমি দীর্ঘ সময় হুজুরের খিদমতে থাকি। যখন বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পাই তখন অনেক রাত হয়ে যায়, তাই প্রাসাদেরই কোথাও শুয়ে পড়ি। আমার যেসব মেহমান অন্য শহর থেকে আসে, তাদের আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়। যদি অনুমতি দেওয়া হয় যে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থীরা দিনে বা রাতে কোনো এক সময় আমার সাথে দেখা করতে পারে...”

---

[১] গোলাম রব্বানী তাবা

[২] ফাগাঁ

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৪০০-৪০১

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৪০১-৪০২

যেকোনো সময় রাজপ্রাসাদে বিনা বাধায় আসতে পারেন এবং আমি সুযোগ বুঝে এখানেই তাদের সাথে দেখা করে নিতে পারি, তাহলে আমি সারা রাত হুজুরের খেদমত বা সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারব।“

বাদশাহ বললেন: “তোমার এবং তোমার জাতির লোকদের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য আর কেউ হতে পারে না। আজ থেকে রাজপ্রাসাদের সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তোমার হাতে।” এই বলে তিনি সমস্ত চাবিও তার হাতে তুলে দিলেন।

এরপর খসরু খানের জাতির লোকেরা যখন চাইত, রাজপ্রাসাদে চলে আসত, তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো না। প্রায় তিন-চারশ বারাদু (এক বিশেষ গোষ্ঠী) প্রতিদিন কুশক-ই-হাজার সুতুন-এ এসে এর নিচতলার বড় হলে (যা আগে মালিক কাফুর ব্যবহার করতেন) সমবেত হতো। আমীর-ওমরাহগণ চেয়েছিলেন বাদশাহকে বলতে যেন তিনি এই লোকদের প্রাসাদে জমায়েত হওয়া থেকে বিরত রাখেন, কিন্তু নিজের প্রাণের ভয়ে কারো সাহস হতো না। [১]

বাদশাহর ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রস্তুতি - কাজী খানের বাদশাহকে সতর্কীকরণ

শীঘ্রই খসরু খান বাদশাহর ওপর হামলার সময় নির্ধারণ করে ফেলল। এদিকে হামলার আগে কাজী জিয়াউদ্দিন ওরফে কাজী খান (যিনি রাজপ্রাসাদে পাহারাদারদের হাজিরা নেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন) এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে যান। তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাদশাহর সাথে দেখা করেন এবং জানিয়ে দেন যে, খসরু খান বারাদু লোকদের সাহায্যে সিংহাসন উল্টে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মুবারক শাহর বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তিনি উল্টো কাজী সাহেবকে বকাঝকা ও অপমান করতে লাগলেন। কাজী সাহেব হতাশ হয়ে চলে গেলেন এবং এদিকে খসরু খান মেয়েলি পোশাকে সজ্জিত হয়ে এবং অলঙ্কার পরে বাদশাহর নির্জন কক্ষে এসে পৌঁছাল। সে কাজী সাহেবকে যেতে দেখে ফেলেছিল, তাই সে সন্দেহে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে মুবারক শাহ তাকে জানিয়ে দিলেন যে, কাজী সাহেব তোমার ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রস্তুতির অভিযোগ তুলছিলেন। খসরু খান প্রেমিকের মতো মান-অভিমান ও ঢং দেখিয়ে কাঁদতে শুরু করল এবং বলল:

“আপনার আমার প্রতি অনুগ্রহ ও ভালোবাসা দেখে সবাই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই এই লোকেরা আমার প্রাণ নিয়ে ছাড়বে।”

মুবারক শাহর চোখে পানি চলে এল, তিনি সেই প্রতারককে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: “তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি তোমার বিরুদ্ধে কোনো চোগলখোরি বা পরনিন্দাকে পাত্তা দিই না। আমি তোমার একটি চুলের বিনিময়ে সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।” [২]

তোমার জন্য আমরা কী না কষ্ট সহ্য করেছি... এখন অবশেষে তোমার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছি।
কে জানে তুমি কত মূল্যবান এক সম্পদ... তোমার জন্য বাজারে মান-সম্মান (পাগড়ি) বিসর্জন দিতে চলেছি। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩০৩, ৩০৪।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৪০৪, ৪০৫।

এখানে বারানি আশেক ও মাশুকের (প্রেমিক ও প্রিয়তম) সম্পর্কের যে চিত্রায়ন করেছেন, তা সরাসরি উর্দু অনুবাদের যোগ্য নয়। মূল পাঠ্যটি নিম্নরূপ:
“وسلطان قطب الدین را از رقت ناز آمیز و گریہ کرشمہ آمیز آن نازک عذار شہوتی تازہ تر جنید، و او را در کنار گرفت، و بوسہ چند بر لب او زد و او را فرو گرفتہ و کردا نچہ کرد، و در اثنائے مجامعت کہ جان و روان در آن حالت باختن سہل می نماید و او را گفت کہ از ھمہ جہاں زیر و زبری شود و ھمہ نزدیکان من بیک زبان ترابد گویند، من بر تو چناں عاشق و آشفتہ ام کہ ھر ھمہ را بتار موئے تو صدقہ کنم، تو خاطر جمع باش، کہ من گفت: پیچ آفریدہ در حق تو شنیدہ نا شنیدہ کنم۔” (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৪০৬)

[৩] মীর তকি মীর।

এক অদ্ভুত আনন্দ ও মত্ততার খুনি রাত:

রাতের এক প্রহর অতিবাহিত হয়েছিল এবং রাজপ্রাসাদে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। নিচতলায় দরবার, মেহমানখানা এবং সরকারি দপ্তরগুলো ছিল। বাদশাহর নির্জন কক্ষ (খলওয়াতগাহ) ছিল প্রথম তলায়, আর দ্বিতীয় তলায় ছিল হারেমের কক্ষগুলো। বাদশাহ নিজের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে তার নির্জন কক্ষে নিজের প্রিয়পাত্র খসরু খানের সাথে আনন্দ-মত্ততা ও মদ্যপানে মগ্ন ছিলেন।

এমন সময় বারওয়ার জাতির অনেক লোক তাদের চাদরের নিচে তলোয়ার, কুড়াল এবং খঞ্জর লুকিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল। ঝরিয়া নামক এক সর্দার এবং খসরু খানের মামা রন্ধোল তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। কাজী জিয়াউদ্দিন পাহারার ব্যবস্থা তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এই লোকদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন এবং বুঝতে পারলেন যে বিপদ আসন্ন। ইতিমধ্যে রন্ধোল এসে তাকে কথায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে করতে হাতে একটি পানের খিলি ধরিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝরিয়া পেছন থেকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে কাজী সাহেবকে হত্যা করল। পাহারাদাররা এই দৃশ্য দেখে পালিয়ে গেল এবং চিৎকার করতে লাগল: “বারওয়াররা কাজীকে মেরে ফেলেছে।”

মুবারক শাহ এই চিৎকার শুনে খসরু খানকে বললেন: “যাও দেখে এসো কী হচ্ছে?” সে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বলল: “কিছু না, কয়েকটি ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, সহিসরা তাদের ধরার জন্য দৌড়াচ্ছে।”

এই সময়ের মধ্যে খুনি দলটি রাজকীয় পাহারাদারদের পরাস্ত করে সিঁড়ি বেয়ে বাদশাহর নির্জন কক্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল। যখন নির্জন কক্ষের বাইরে মোতায়েন করা বিশেষ দেহরক্ষীরাও নিহত হলো এবং চিৎকারের শব্দ এত কাছ থেকে শোনা গেল, তখন মুবারক শাহ বুঝতে পারলেন যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। তার হুঁশ ফিরল কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তিনি দ্রুত জুতো পরে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলেন যাতে দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত হারেমে আশ্রয় নিতে পারেন, কিন্তু খসরু খান তার পেছনে ধাওয়া করল এবং ছোঁ মেরে তার চুল ধরে ফেলল। মুবারক শাহ ঘুরে তাকালেন এবং তাকে নিচে আছাড় দিয়ে তার বুকের ওপর চড়ে বসলেন, কিন্তু তিনি খসরু খানের হাত থেকে নিজের চুল ছাড়াতে পারলেন না। ওদিক থেকে ঝরিয়া কুড়াল উঁচিয়ে আসছিল। খসরু তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল: “আরে! আমাকে বাঁচাও।”

ঝরিয়া বাদশাহকে টেনে কুড়াল দিয়ে আঘাত করল, তারপর চুল ধরে টেনে তাকে খসরুর বুকের ওপর থেকে মাটিতে ফেলে দিল এবং পরের মুহূর্তেই তলোয়ার দিয়ে তার মাথা উড়িয়ে দিল। বিলাসিতা ও মত্ততায় ডুবে থাকা বাদশাহি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাহাকার ও আফসোসে পরিণত হলো।

একবারও তুমি এসে আমার খাতির করলে না... আমি তোমার খাতিরে শতবার নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি।
তোমার সাথে আর দেখা হলো না, হায়!... নিরুপায় মীর জি তোমার খাতিরে প্রাণ দিল। [১]

এখন রাজপ্রাসাদের চারদিকে মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এবং বাদশাহর কাটা মাথা ওপরের তলা থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হলো, যা দেখে অবশিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও সৈন্যদের হুঁশ উড়ে গেল এবং প্রত্যেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে খসরু খানের ভাই হুসামউদ্দিন এবং ঝরিয়া দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত রাজকীয় হারেমে ঢুকে পড়ল। তারা বাদশাহর...

---

[১] মীর তকী মীর

নাবালক শিশুদের: উমর খান এবং আলী খানকে সেখানেই মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দেওয়া হলো। রাজপরিবারের আরও অনেক যুবককে হত্যা করা হলো। নিহত বাদশাহর এক বেগমও তাদের হাতে মারা গেলেন। দ্বিতীয় বেগমকে খসরু খান নিজের স্ত্রী বানিয়ে নিলেন। আলাউদ্দিন খলজির এক মেয়েকে খসরুর ভাই হুসামুদ্দিন রেখে দিল। এই শিক্ষণীয় ঘটনাটি ৫ রবিউল আউয়াল ৭২০ হিজরি (১৬ এপ্রিল ১৩২০ খ্রিস্টাব্দ) এর। এভাবে কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহর শাসনকাল চার বছর দুই মাস স্থায়ী হয়ে শেষ হয়ে গেল।

সালতানাতের অন্যান্য বড় কর্মকর্তাদের সেই রাতেই জোরপূর্বক প্রাসাদে তলব করা হলো। আইনুল মুলক (মুলতানের গভর্নর) এবং ওয়াহিদুদ্দিন কুরাইশি (গুজরাটের গভর্নর) যারা বাদশাহর সাথে দেখা করতে দিল্লিতে এসেছিলেন, তারাও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গাজী মালিকের তরুণ পুত্র মালিক মুহাম্মদ ফখরুদ্দিন জোনা (যিনি পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক নামে পরিচিত হন)-কেও ডাকা হলো। তাদের সবাইকে হেফাজতে রাখা হলো যাতে পরের দিন রাজ্যাভিষেকে তাদের জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত রাখা যায়। [১]

আলাউদ্দিন খলজির সন্তানদের কেন এই পরিণতি হলো?

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ ছিলেন খলজি বংশের শেষ বাদশাহ। তার হত্যার সাথে সাথেই খলজিদের শাসনকাল মাত্র ত্রিশ বছর স্থায়ী হয়ে সমাপ্ত হলো। আলাউদ্দিন খলজির মতো প্রতাপশালী শাসকের সন্তানদের পরিণতি এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে তার প্রতিটি ছত্র শিক্ষণীয়। সেই দিনগুলোতে কোনো এক ব্যক্তি শেখ বশির দিওয়ানা (যিনি একজন সাহেব-এ-কাশফ ও কারামত বুজুর্গ ছিলেন)-এর কাছে জানতে চাইলেন: “আলাউদ্দিন খলজির বংশধরদের কেন এই দশা হলো?”

তিনি উত্তর দিলেন: “সুলতান আলাউদ্দিনের শাসন কোনো মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কয়েক বছর ধরে তোমরা তার যে উত্থান দেখেছ, তা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ঢিল (সুযোগ)। সুলতান আলাউদ্দিন তার চাচা, শ্বশুর এবং দয়ালু মনিব জালালুদ্দিন খলজিকে হত্যা করে তার সিংহাসন ও দেশ দখল করেছিলেন। সুতরাং তিনি যেমন করেছিলেন, তার শাসনের সাথেও তেমনই হলো। তিনি যেমন অন্যদের নারী ও শিশুদের ওপর জুলুম করেছিলেন, তেমনই প্রতিশোধ তার নারী ও সন্তানদের ওপর নেওয়া হচ্ছে। তিনি যে খেলা খেলেছিলেন, তেমনই খেলা তার বংশধরদের সাথে খেলা হচ্ছে। যাতে তোমরা জেনে নাও যে, যে অন্যের সাথে মন্দ করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের সাথেই মন্দ করে এবং যে অন্যকে গর্তে ফেলে, অবশেষে সে নিজেও সেই গর্তে পড়ে।” [২]

যে উপরে উচ্চবাচ্য করে তার কথাও উচ্চ হয়..... আর আছাড় দিলে তাকেও অন্য কেউ আছাড় দেওয়ার থাকে
বিনা জুলুম ও অপরাধে যে জালেম মজলুমকে জবেহ করেছে..... সেই জালেমেরও রক্তের নদী-নালা প্রবাহিত হয়
দেরি নেই, অন্ধকার নেই, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার আছে..... এই হাতে করো, ওই হাতে পাও, এখানে কারবার হাতে হাতেই হয়
(নজির আকবরাবাদী)

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৭০ থেকে ৪০৭; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৩২, ৩৩৩; ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ৩৭২, ৩৭৩

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৩৭৭, ৩৮০

খসরু খান

৭২০ হিজরি (১৩২০ খ্রিস্টাব্দ)

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহের হত্যার পর রাজপ্রাসাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, এর প্রতিটি কোণ বরওয়ার গোত্রের বন্য ও অসভ্য মূর্তিপূজক যোদ্ধাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রাসাদের মসজিদগুলোতেও নিজেদের মজলিস বসাত। কিছু লোক মেহরাবে মূর্তি রেখে পূজা করছিল। কিছু মূর্খ লোক কুরআনের পাণ্ডুলিপিগুলোকে উপরে রেখে সেগুলোকে বসার টুল হিসেবে ব্যবহার করছিল। (নাউযুবিল্লাহ) [১]

খসরু খানের সিংহাসন আরোহণ:

বাদশাহর হত্যার পরের দিন ২৬ রবিউল আউয়াল ৭২১ হিজরিতে খসরু খান রাজসিংহাসনে আসীন হন এবং নিজের উপাধি 'নাসিরুদ্দিন' রাখেন এবং নিজের ভাই হুসামুদ্দিনকে 'খান-ই-খানান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইউসুফ সুফি নামক দিল্লির এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি এই রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে খসরু খানের ডান হাত ছিল। খসরু খান তাকে 'সুফি খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। [২]

আমিরদের নীরবতা। শাহজাদীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত:

দিল্লির আমির এবং সরকারি কর্মকর্তারা বিগত দুই বাদশাহর হাতে লাঞ্ছিত হতে হতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাদের অধিকাংশ কোনো প্রকার প্রতিবাদ ছাড়াই একজন বিশ্বাসঘাতককে নিজেদের সুলতান হিসেবে মেনে নেন। ফলে বড় বড় নামকরা আমিরগণ খসরু খানের সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি অবিলম্বে আদেশ জারি করেন, যার মাধ্যমে আলাউদ্দিন খিলজি এবং কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খিলজি...

---

[১] (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৪১১) কিছু ঐতিহাসিক বারানির বক্তব্য থেকে এটি বুঝেছেন যে, সারা দেশের অনেক মসজিদে মূর্তি রাখা হয়েছিল এবং সর্বত্র অবমাননা করা হচ্ছিল। 'জামে তারিখ-ই-হিন্দ'-এর লেখক একে অবিশ্বাস্য মনে করেছেন। তিনি বারানির বর্ণনাকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন। অথচ বারানির উদ্দেশ্য ছিল বিশেষভাবে এই বিপ্লব, অর্থাৎ এই সময়ে রাজকীয় কেল্লা এবং এর ভবনগুলোতে আক্রমণকারীদের হাতে এই সবকিছু ঘটেছিল এবং এটি স্পষ্ট যে বিজয়ের নেশায় এই মূর্তিপূজকদের পক্ষ থেকে এমন জঘন্য কর্মকাণ্ড মোটেও অসম্ভব ছিল না।

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৮৬; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৪১০।

...এর বাকি বেগম, দাসী এবং অন্যান্য রাজকন্যাদের বারওয়ার গোত্রের যোদ্ধাদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, যারা তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী, উল্লিখিত উভয় বাদশাহর অনুগত ও সমর্থকদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল। [১]

আলাই শাহজাদাদের হত্যা করা হয়েছে:

আলাউদ্দিন খলজির চার ছেলে তো আগেই নিহত হয়েছিলেন, কিন্তু চার ছোট ছেলে: ফরিদ খান, আবু বকর খান, আলী খান এবং বাহাদুর খান তখনও জীবিত ছিলেন এবং তাদের মায়েদের তত্ত্বাবধানে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তাদের ধরে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। [২]

আলাউদ্দিন খলজির ভাগ্নে মালিক নুসরাত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থেকে জিকির ও ইবাদতে মগ্ন একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাকেও জীবিত রাখা হয়নি। এভাবে খলজি বংশ সম্পূর্ণ নাম-নিশানহীন হয়ে পড়ে। [৩]

নতুন পদমর্যাদা:

খসরু খানের কাছে তার নিজ গোত্রের প্রচুর লোক ছিল, কিন্তু এই লোকেরা শাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল, ফলে তাদের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই খসরু খান যদিও তার গোত্রের লোকদের প্রচুর পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করেছিলেন এবং কিছু লোককে বড় বড় খেতাব ও সম্মাননাও দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজ্যের মূল পদগুলোর জন্য তিনি পূর্ববর্তী কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সে অনুযায়ী তিনি আইনুল মুলক মুলতানিকে আমিরুল উমারা, ওয়াহিদ উদ্দিন কুরাইশীকে উজির-এ-সালতানাত এবং মালিক ফখরুদ্দিন জুনাকে আখুর বেগ (রাজকীয় আস্তাবলের কর্মকর্তা) নিযুক্ত করেন। মালিক জুনাকে কেবল এই জন্য সম্মানিত করা হয়েছিল যাতে তার পিতা গাজী মালিক (দিপালপুরের শাসক) অনুগতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এই অভিজাত আমিরগণও কেবল সাময়িকভাবে এই পদগুলো গ্রহণ করেছিলেন, অন্যথায় তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মর্মাহত ও ব্যথিত ছিলেন। [৪]

হিন্দুদের ওপর ধনভাণ্ডার বিলিয়ে দেওয়া:

খসরু খান তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশঙ্কা করছিলেন, তাই খলজিদের সঞ্চিত সম্পদের একটি বড় অংশ অবিলম্বে তার সমর্থক হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করে দেন যাতে সময় এলে তারা তার জন্য জীবন বাজি রাখতে পারে। [৫] তিনি তার বিশেষ সাহায্যকারী ও খাদেমদের ছয় মাসের অগ্রিম বেতন দিয়ে দেন যাতে তারা তার অনুগত থাকে। [৬] একইভাবে খলজিদের অনেক প্রোথিত ধনভাণ্ডারও বের করে তার সমর্থকদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। [৭] হিন্দুদের সন্তুষ্টির জন্য গরু জবাইয়ের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। [৮]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৪০৯, ৪১০

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৮৭

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩৩৪

[৪] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১ পৃ. ১৫০, ১৫১ - তারিখ-ই-মুবারক শাহী: ৮৭

[৫] (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৪১১) মনে রাখা দরকার যে, মুবারক শাহের শেষ দিনগুলোতে খসরু খান তার গোত্রের চল্লিশ হাজার গুজরাটি হিন্দুকে তার ব্যক্তিগত বাহিনীতে নিয়োগ করেছিলেন। (তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩৩৭) এই কারণেই দিল্লির উলামাগণ খসরুর বিরুদ্ধে কোনো তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের সাফল্য কঠিন মনে করে তা থেকে বিরত থাকেন।

[৬] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৩৩৪

[৭] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৮৭

[৮] সফরনামা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৩১

তারিখ-ই-মিল্লাত

ইসলামী নিদর্শনের পতন:

খসরু খানের শাসন যেহেতু বরওয়ারি গুজরাটি হিন্দুদের শক্তির মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছিল, তাই বিভিন্ন রাজ্যের হিন্দু রাজারা এই শাসনকে নিজেদের বিজয় হিসেবে গণ্য করেছিল। যদিও দুর্গ ও শহরগুলোতে বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতির কারণে কোনো রাজা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেননি, তবে আল্লামা বারানির মতে, হিন্দুরা এই পরিস্থিতিতে খুশি ছিল এবং আশা করতে শুরু করেছিল যে এখন হিন্দুস্তানে আবারও মূর্তিপূজার রীতিনীতি সাধারণ হয়ে যাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে দিল্লি মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এই কথাটিই মোল্লা আব্দুল কাদির বদায়ূনী এভাবে লিখেছেন:

“বিপ্লবের ফলে হিন্দুস্তানে ইসলামী নিদর্শনের পতন হতে শুরু করল। হিন্দুদের রীতিনীতি উন্নতি লাভ করতে লাগল। প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা শুরু হলো। মসজিদগুলো জনশূন্য হতে শুরু করল।” [১]

আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানির বর্ণনা অনুযায়ী, খসরু খান ও বরওয়ারিদের আধিপত্যের চার মাসে দিল্লি ও এর আশপাশের মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল: (১) একদল ছিল তারা যারা দুনিয়ার লোভ, ঈমানের দুর্বলতা এবং বিশ্বাসের শিথিলতার কারণে কায়মনোবাক্যে খসরু খানের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল এবং তার কাছ থেকে আরও পার্থিব সুবিধা হাসিল করতে চেয়েছিল।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির লোক যারা সংখ্যাগুরু ছিল, তারা এমন ছিল যে বাহ্যিকভাবে খসরু খানের শাসনের সাথে দিচ্ছিল কিন্তু মনে মনে এই পরিস্থিতিতে ব্যথিত ছিল।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির লোক যারা সংখ্যায় খুব কম ছিল, তারা এই পরিস্থিতিতে এতটাই অস্থির ছিল যে তাদের খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং তারা অনবরত দোয়া করছিল যেন এই ধর্মহীনদের হাত থেকে কোনোভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। [২] তারা দেখছিল যে বর্তমান পরিস্থিতি বজায় থাকতে দেওয়া মানে উপমহাদেশ থেকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইসলামী নিদর্শনের বিলুপ্তি মেনে নেওয়া।

খসরু খান খিলজি বংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে তার মূর্খতাপূর্ণ ও জুলুমবাজ শাসনের মাধ্যমে দেশকে ধর্মহীনতা, ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। বাহ্যিকভাবে চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল কিন্তু আশার একটি প্রদীপ তখনও জ্বলছিল। তিনি ছিলেন দিপালপুরের আত্মমর্যাদাশীল শাসক গাজী মালিক তুঘলক। মানুষের আশা-ভরসা তারই সাথে যুক্ত ছিল। খসরু খান তাকে বশ করার জন্য রাজকীয় পোশাক (খিলআত) পাঠিয়েছিল কিন্তু গাজী মালিক সেই পোশাক মাটিতে ফেলে তার ওপর বসে পড়েছিলেন। এভাবে তিনি একজন দুশ্চরিত্র শাসকের আনুগত্য করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিলেন। [৩]

পরিবেশের অন্ধকারের কঠোরতা আমাকে ভয় দেখায় না... আমার স্বভাবে রয়েছে পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা।
হে রাতের মুসাফির! নিজেই নিজের প্রদীপ হও... নিজের হৃদয়ের দহন দিয়ে নিজের রাতকে আলোকিত করো। [৪]

---

[১] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ১৩৮

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৪১২, ৪১৩

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৩১

[৪] ইকবাল

গাজী মালিকের প্রস্তুতি, গোপন যোগাযোগ

এখন গাজী মালিক খসরু খানের সিংহাসন উল্টে দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত অধীনে খুব বেশি সৈন্য ছিল না। তাই তিনি উচ-এর আমির মালিক বাহরাম আইবা (কাশলু খান)-কে তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন, তবে সেই সাথে বলেন যে, আমার ছেলে দিল্লিতে আছে। সে যদি আমার কাছে থাকত, তবে আপনার সাথে যোগ দিতে আমার কোনো বাধা থাকত না। [১]

একই পরিস্থিতির সম্মুখীন গাজী মালিক নিজেও ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর ছেলে ফখরুদ্দিন জোনা (যিনি পরে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক নামে পরিচিত হন) তিনিও দিল্লির দরবারে ছিলেন এবং দিল্লির শাসক খসরু খান জানতেন যে, যতক্ষণ মালিক জোনা আমার কাছে আছে, ততক্ষণ তাঁর বাবা দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়ে ছেলের জীবনকে বিপন্ন করবেন না। এই কারণেই মালিক জোনার ওপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছিল। [২]

মালিক জোনা অলক্ষ্যে সুযোগ খুঁজছিলেন যাতে কোনোভাবে দিল্লি থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। তিনি তাঁর বাবাকে গোপন বার্তায় লিখেছিলেন: "এই নিমকহারাম শাসকের সরকারকে কিছুতেই স্থিতিশীল হতে দেবেন না। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবেন না। আল্লাহ তাআলা চাইলে আপনার এই সন্তান শীঘ্রই আপনার সাথে এসে মিলিত হবে।" [৩] তিনি বাবার কাছে এই অনুরোধও করেছিলেন যে, তাঁর জন্য ডাকের ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হোক যাতে তিনি কোনো বিরতি ছাড়াই সফর করতে পারেন। ফলে গাজী মালিক সেই ব্যবস্থাও করে দিলেন। [৪]

এটিও ঠিক হয়ে গেল যে মালিক জোনা কোন পথ অবলম্বন করবেন। সেই পথে একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল সরস্তি (সরসা)। গাজী মালিক সেখানে অতিরিক্ত দুইশ সৈন্য মোতায়েন করলেন যাতে তাঁরা মালিক জোনাকে নিরাপদে সেখান থেকে দিপালপুরে নিয়ে আসতে পারেন। [৫]

গাজী মালিক তাঁর ছেলেকে এই নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর সাথে বাহরাম আইবা (কাশলু খান)-এর ছেলেকেও নিয়ে আসেন। [৬]

এই সময়ে গাজী মালিক পাঞ্জাব ও সিন্ধুর আমিরদের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাঁদের খিলজি বংশের প্রতিশোধ নিতে এবং হিন্দুদের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর বার্তা ছিল এই:

"ইসলামি সালতানাতের ওপর হিন্দুরা বিজয়ী হয়ে গেছে। খিলজি বংশের পতন ঘটানো হয়েছে। আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। আপনারা বছরের পর বছর (মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে) আমার সাথে ছিলেন। এই কঠিন সময়েও আমার সাথে থাকুন যাতে আপনাদের সাহায্যে সালতানাতের অনুগতরা নিমকহারামদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারে।" [৭]

মালিক জোনার দিল্লি থেকে পলায়ন:

ওদিকে মালিক জোনা পলায়নের সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আমির-ই-আখুর (রাজকীয় ঘোড়াশালের তত্ত্বাবধায়ক) এবং এই পদটিই তাঁর কাজে এল। ঘটনাটি ছিল এই...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২২

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৪১২

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৮৮

[৪] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ১৩৯

[৫] (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৪১২) সরস্তির বর্তমান নাম "সরসা", যা ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের একটি জেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর। এটি দিল্লি থেকে প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার দূরে। অর্থাৎ দিপালপুর ও দিল্লির মহাসড়কের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

[৬] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২২

[৭] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৮৮, ৮৯, ৯০

খসরু খান তাকে বলেছিলেন যে রাজকীয় আস্তাবলের ঘোড়াগুলো মোটা হয়ে যাচ্ছে। সেগুলোকে প্রতিদিন দৌড়ানো উচিত যাতে তারা চটপটে থাকে। মালিক জুনা-র জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ ছিল। তিনি প্রতিদিন ঘোড়াগুলো নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যেতেন। এক থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সেগুলোকে ভালোমতো দৌড়িয়ে ফিরে আসতেন। একদিন তিনি ঘোড়াগুলোকে দৌড়াতে দৌড়াতে শহর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং যোহর পর্যন্ত আর ফিরে এলেন না।

খসরু খান দুপুরের খাবারের সময় তাকে না পেয়ে অশ্বারোহীদের পাঠালেন তার খবর আনার জন্য। তারা গেল এবং ফিরে এসে জানাল যে তিনি পালিয়ে গেছেন এবং বাহরাম আইবা (কাশলু খান)-এর ছেলেও তার সাথে পালিয়ে গেছে। [১]

খসরু খান প্রচুর অশ্বারোহী তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠালেন, কিন্তু মালিক জুনা এমন বিদ্যুৎ গতিতে সফর করছিলেন যে ধাওয়াকারীরা টানা তিন দিন সফর করেও তার ধুলোর নাগালও পেল না। এটি খসরুর সিংহাসন আরোহণের দুই মাস পরের ঘটনা। [২]

মালিক জুনা অনবরত সফর করে অবশেষে 'সরস্বতী' (সরসা) দুর্গে পৌঁছে গেলেন যেখানে তার পিতার পাঠানো একটি রক্ষীবাহিনী উপস্থিত ছিল। মোদ্দা কথা, ধাওয়াকারীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল এবং মালিক জুনা সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার পর বিদ্যুৎ গতিতে দিপালপুর পৌঁছে গেলেন। মালিক গাজী ছেলের নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। [৩]

সিন্ধু ও পাঞ্জাবের আমিরদের সাথে গাজী মালিকের ঐক্য:

এই সময়ের মধ্যে গাজী মালিকের কাছে সালতানাতের কর্মকর্তাদের উত্তর আসতে শুরু করেছিল। আইনুল মুলক মুলতানি লিখেছিলেন:

"যদি তুমি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হও, তবে আমি (যুদ্ধের দিন) খসরু খানের সাথ দেব না বরং মালওয়ার দিকে চলে যাব। যখন সব আমির তোমার ব্যাপারে একমত হবে, তখন আমিও তোমার সাথে যোগ দেব।" [৪]

তবে মুলতানের শাসক 'মুগলতি' অস্বীকার করলেন এবং উল্টো গাজী মালিককে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে দিল্লির বাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, তাই তুমি এই কুচিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। গাজী মালিক যখন এটি দেখলেন, তখন তিনি মুলতানের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের, যারা খসরু খানের জুলুমবাজ শাসনে অতিষ্ঠ ছিল, গোপন বার্তার মাধ্যমে নিজের সাথে মিলিয়ে নিলেন। এরপর মুলতানের এক প্রধান বাহরাম সিরাজ শহরের গণ্যমান্যদের সহযোগিতায় 'মুগলতি'কে শহর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এভাবে মুলতানও গাজী মালিকের সাথে যুক্ত হয়ে গেল।

সিন্ধুর রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল সিওয়িস্তান (সেহওয়ান শরীফ), যেখানকার আমির ছিলেন মুহাম্মদ শাহ। গাজী মালিকের পত্র পৌঁছানোর পর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মুহাম্মদ শাহকে বলে দিলেন যে, যদি তিনি গাজী মালিককে সমর্থন না করেন তবে শহরবাসী তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ফলে তিনিও গাজী মালিককে নিজের সমর্থনের নিশ্চয়তা দিলেন। [৫]

তবে সামানার সুবাদার মালিক ইয়াক লাখি যখন গাজী মালিকের পত্র পেলেন, তখন তিনি দিল্লির দরবারের পক্ষ নিয়ে...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩২

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৮৮

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৪১৪

[৪] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ১৩৮

[৫] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৮৯, ৮৮

এই পত্র খসরু খানকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এভাবে গাজি মালিকের যুদ্ধ প্রস্তুতির অবস্থা দিল্লি দরবারের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল এবং খসরু খানও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। [১]

এদিকে গাজি মালিক যখন লস্কর প্রস্তুত করছিলেন, তখন বাহরাম আইবা (কুশলু খান) তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুলতান ও উচ-এর লস্কর নিয়ে তার সাথে মিলিত হলেন, যার ফলে তিনি অনেক শক্তি লাভ করলেন এবং দিল্লির দিকে রওনা হলেন। [২]

এর কয়েক সপ্তাহ আগে মুলতান ও সিন্ধুর খাজনা দিল্লির দিকে পাঠানো হয়েছিল এবং গাজি মালিক এই বিপুল ধনসম্পদবাহী রাজকীয় কাফেলা পাঞ্জাবে আটকে দিয়েছিলেন। এখন লস্কর পরিচালনার সময় এই সম্পদ কাজে লাগল। গাজি মালিক এটি দুই বছরের অগ্রিম বেতন হিসেবে লস্করের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন, যার ফলে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পেল। [৩]

গাজি মালিকের দিল্লির দিকে অগ্রসর হওয়া:

এই লস্কর পথে 'সামানা'-র কাছে পৌঁছালে মালিক ইয়াক লাখি তার পথ রোধ করে আক্রমণ করেন, তবে গাজি মালিকের বাহিনী তাকে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করে। মালিক ইয়াক লাখি শোচনীয় অবস্থায় সামানায় পৌঁছান যাতে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে দিল্লি দরবারে তার প্রভু খসরু খানের কাছে যেতে পারেন, কিন্তু সামানার জমিদাররা তার ইচ্ছা পূরণ হতে দেয়নি এবং তাকে হত্যা করে দেহের টুকরো টুকরো করে ফেলে, কারণ খসরু খান এবং তার নীচ প্রতিনিধিদের অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ ছিল। [৪]

খসরু খান অত্যন্ত দুশ্চিন্তার সাথে গাজি মালিকের অগ্রসর হওয়ার খবর শুনছিলেন। অবশেষে তিনি তার ভাই হুসামুদ্দিন খান-ই-খানান এবং তার ডান হাত ইউসুফ সুফিকে একটি বিশাল লস্কর দিয়ে গাজি মালিকের মোকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। [৫]

সরসুতির যুদ্ধ:

সরসুতি (সারসা)-র কাছে উভয় লস্কর মুখোমুখি হলো। [৬] গাজি মালিকের বড় বড় যুদ্ধের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল এবং তার সৈন্যরা উচ্চ মনোবল ও উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল। অন্যদিকে দিল্লির লস্করের নেতৃত্ব ছিল হুসামুদ্দিনের মতো নীচ এবং ইউসুফ সুফির মতো অযোগ্যদের হাতে, তাই প্রথম আক্রমণেই দিল্লির লস্করের পা টলে গেল এবং তারা অসংখ্য হাতি ও ঘোড়া ফেলে রেখে দিল্লির দিকে পালিয়ে গেল। গাজি মালিকও পিছু ধাওয়া করে দ্রুত দিল্লির কাছে পৌঁছে গেলেন। [৭]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৮৯, এই মালিক ইয়াক লাখি সেই ব্যক্তি যার নাক ও কান দিল্লি সরকার কেটে দিয়েছিল, তবুও সে এই সরকারের অনুগত ছিল।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৫

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৯০

[৪] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৫

[৫] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ৪১৫; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৫

[৬] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৫

মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ যুদ্ধের স্থান থামেসার বলেছে, যেখানে ফিরিশতা সরসুতি (সারসা)-র কথা উল্লেখ করেছেন। উভয় শহরের মধ্যে দূরত্ব প্রায় দুইশ কিলোমিটার। হতে পারে দিল্লির লস্কর থামেসার এবং পাঞ্জাবের লস্কর সরসুতিকে শিবির বানিয়ে অগ্রসর হয়েছিল এবং উভয় জেলার সীমান্তে কোথাও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

[৭] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ১৩৯, ১৫০; তারিখ-ই-ফিরিশতা: পৃ. ২৯১

দিল্লির যুদ্ধ:

যদিও খসরু খানের জুলুম-অত্যাচার, নিমকহারামি এবং তার চারপাশে দুশ্চরিত্রদের সমাবেশ সবার জানা ছিল, তবুও সালতানাতের ডজন ডজন নামী আমিরের তার কাতারে শামিল হওয়া সাধারণ মানুষকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছিল। তাই দিল্লির আউলিয়া এবং নেককার লোকেরা ব্যাকুল হয়ে এই দোয়া করছিলেন: "হে আল্লাহ! দুই বাহিনীর মধ্যে যারা তোমার দ্বীনের সাহায্যকারী, তাদের বিজয় দান করো।" [১]

এদিকে খসরু খান যখন চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘনিয়ে আসতে দেখলেন, তখন কোষাগারের মুখ খুলে দিলেন। সৈন্যদের তিন-তিন চার-চার মাসের বেতন এককালীন দিয়ে দিলেন। [২] এমনকি মণি-মুক্তাও বণ্টন করে দিলেন। এভাবে তিনি সরকারি কোষাগার প্রায় শূন্য করে ফেললেন। [৩]

এর পাশাপাশি তিনি সেনাকর্মকর্তাদের বড় বড় জায়গির ও পদের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। ব্যাপক প্রস্তুতির সাথে খসরু খান দিল্লির বাইরে এমন এক লশকর বিন্যস্ত করলেন যা হাউজে খাস থেকে "ইন্দ্রপত" পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে গাজী মালিক রাজিয়া সুলতানার মাজারের পাশে নিজের তাবু গেড়েছিলেন। খসরু খান সেই সময় একটি জুলুম এই করলেন যে, দিল্লিতে নজরবন্দি খিলজি বংশের শাহজাদাদেরও হত্যা করিয়ে দিলেন, যাদেরকে আগে কেবল অন্ধ করেই ক্ষান্ত হওয়া হয়েছিল। এভাবে খিলজি বংশের বীজই মুছে গেল। [৪]

যুদ্ধের আগের রাতে দিল্লির আমিরদের মধ্য থেকে আইনুল মুলক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজের বাহিনী নিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে চলে গেলেন। এটি দেখে খসরু খানের মন ভেঙে যেতে লাগল। কিন্তু তার বাহিনীতে থাকা গুজরাটের হিন্দু কর্মকর্তা ও সৈন্যরা অত্যন্ত জোশে ছিল। তারা দীর্ঘকাল পর শাসন ও সেনাবাহিনীতে পূর্ণ অংশ পেয়েছিল, যা তারা যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে চেয়েছিল।

প্রথম দিন উভয় পক্ষ অত্যন্ত জোশের সাথে লড়াই করল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলল কিন্তু কোনো ফয়সালা হলো না। দ্বিতীয় দিন দিল্লির লশকর গাজী মালিকের বাহিনীর পা উপড়ে দিল এবং অগ্রসর হয়ে তাদের তাবু পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

গাজী মালিকের কর্মকর্তারা সামনে পরাজয় দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ গাজী মালিক তিন হাজার বাছাইকৃত সওয়ার নিজের কমান্ডে নিয়ে এক পাশ থেকে খসরু খানের বিশেষ বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। [৫]

খসরুর অধিকাংশ সৈন্য বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গনিমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। তাই গাজী মালিকের...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৩৫

[২] (মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ১৫০) ফেরেশতা লিখেছেন যে, সৈন্যদের কাউকে দুই বছর, কাউকে আড়াই বছর, কাউকে তিন বছর এবং কাউকে চার বছরের বেতন অগ্রিম দিয়ে দিলেন। (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৩৬) সিরহিন্দিও তিন-তিন চার-চার বছরের অগ্রিম বেতনের কথা উল্লেখ করেছেন। (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৯১) সম্ভবত এই পার্থক্য পদমর্যাদা অনুযায়ী ছিল। অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের আমিরদের চার বছর এবং সাধারণ সৈন্যদের তিন বা চার মাসের বেতন দেওয়া হয়েছিল।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৩৬

[৪] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ১৫০; তারিখ-ই-ফেরেশতা: পৃষ্ঠা ২৯১; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৯১
হাউজে খাস বলতে সেই জলাধারকে বোঝানো হয়েছে যা সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তার নবনির্মিত রাজধানী "সিরি"-তে পানি সরবরাহের জন্য একটি বড় জলাধার হিসেবে তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীতে ফিরোজ শাহ তুঘলক এই এলাকায় একটি মাদ্রাসা, মসজিদ এবং নিজের মাকবারাও নির্মাণ করান। ইন্দ্রপত (ইন্দ্রপ্রস্থ)-কে বর্তমান যুগে পুরনো কেল্লা বলা হয় যা বর্তমান নতুন দিল্লিতে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

[৫] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ এবং ইবনে বতুতার সফরনামা অনুযায়ী এরা তিনশ সওয়ার ছিল, যেখানে তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে "সি সদ" (৩০০০) বর্ণিত হয়েছে এবং ধারণা অনুযায়ী এটিই অগ্রগণ্য।

হঠাৎ আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। খসরু খান কিছুক্ষণ লড়াই করলেন, কিন্তু যখন নিশ্চিত মৃত্যু দেখলেন তখন বেশ পরিবর্তন করে পলায়ন করাকেই শ্রেয় মনে করলেন। তিনি রাজমুকুট, পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করলেন, সন্ন্যাসীদের মতো চুল এলোমেলো করে নিলেন এবং একটি সাধারণ চাদর জড়িয়ে কোনো এক দিকে পালিয়ে গেলেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর সেনাবাহিনী মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং মুসলিম আমিরগণ বিজয়ী হয়ে দিল্লিতে প্রবেশ করেন।

খসরু খান একটি বাগানে আত্মগোপন করেছিলেন। তিন দিন পর যখন ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন পানাহারের সামগ্রী আনার জন্য নিজের আংটি দিয়ে একজনকে পাঠালেন। বাজারে সেই আংটি চিনে ফেলা হয়। এভাবে সরকারি কর্মচারীরা খসরু খানের কাছে পৌঁছে যায়। অত্যন্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় তাঁকে গাজী মালিকের সামনে পেশ করা হয়। তাঁকে ভালোভাবে পানাহার করানো হয়, এরপর তাঁকে সেই স্থানে নিয়ে গিয়ে শিরশ্ছেদ করা হয় যেখানে তিনি প্রাক্তন বাদশাহ কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহকে হত্যা করেছিলেন। তাঁর মাথা ও দেহ রাজপ্রাসাদ থেকে ঠিক সেভাবেই নিচে ফেলে দেওয়া হয় যেভাবে তিনি মুবারক শাহকে ফেলেছিলেন।

পরের দিন খসরু খানের ভাই হুসামুদ্দিন ওরফে হিসাম খান, যিনি পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন, তিনিও ধরা পড়েন এবং নিহত হন। [১]

অবশেষে একদিন শিকারির বাজপাখিও ধরা পড়বে,
আর জুলুম ও নিপীড়নের তরী ডুবে যাবে। [২]

কর্মফলের এই ঘটনা ২৯ রজব ৭২০ হিজরি (৩ আগস্ট ১৩২০ খ্রিস্টাব্দ) ঘটেছিল। খসরু খানের অশুভ শাসনকাল ছিল সাড়ে চার মাস ও কয়েক দিন। [৩]

খলজি শাসনের পতনের কারণসমূহ

খলজি বংশ, যারা প্রায় ত্রিশ বছর ভারত শাসন করেছিল, তাদের সামরিক শক্তি ও বিজয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী যুগ, বিশেষ করে আলাউদ্দিন খলজির সময়ে এর শক্তি ছিল তুঙ্গে। তবে অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে এই সালতানাত পতনের সম্মুখীন হয়, যার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল:

১. আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর দুর্বল উত্তরসূরি:
আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন মহান সামরিক নেতা এবং একজন দক্ষ সংগঠক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরিরা অত্যন্ত দুর্বল...

---

[১] মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫০, ১৫১; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৬, ৪৩৭; সফরনামা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৩, ৩৩৪; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৯১; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪১৬ থেকে ৪২১।

[২] সরওয়ার আম্বালভি।

[৩] যেহেতু গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পরের দিন সিংহাসনে আরোহণের তারিখ তারিখ-ই-ফিরিশতা এবং তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে ১লা শাবান বলা হয়েছে (তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৯১), তাই এই যুদ্ধের ঘটনা ২৯ রজবের আগে ঘটেছিল।

প্রমাণিত হলেন। তাঁর পুত্র কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খলজি তাঁর বিলাসিতা এবং প্রশাসনিক কাজে উদাসীনতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার কঠোর নীতিগুলোকে শিথিল করেছিলেন, যার ফলে ব্যবস্থায় শৈথিল্য দেখা দেয়। এরপর তাঁরই হিন্দু গোলাম খসরু খান তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নেন। খসরু খান খলজিদের মর্যাদাকে আরও ক্ষুণ্ণ করেন এবং দরবারে অস্থিরতা সৃষ্টি করেন। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, আলাউদ্দিনের পর এমন কোনো শক্তিশালী শাসক ছিলেন না যিনি সালতানাতের লাগাম ধরতে পারতেন।

২. দরবারি ষড়যন্ত্র এবং আমিরদের অসন্তোষ:

খলজিদের শাসনামলে, বিশেষ করে আলাউদ্দিনের শেষ দিনগুলোতে এবং তাঁর পরে দরবারি ষড়যন্ত্র চরমে ছিল। আলাউদ্দিন খলজির বিশ্বস্ত আমির মালিক কাফুর শেষ দিনগুলোতে অনেক বেশি প্রভাব অর্জন করেছিলেন এবং তিনি সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি কিছু আমিরকে হত্যা বা বন্দি করেছিলেন, যার ফলে অন্যান্য আমিরদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

৩. বর্ণবাদ এবং অ-তুর্কি আমিরদের ক্রমবর্ধমান শক্তি:

খলজিরা তুর্কি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু আলাউদ্দিন অ-তুর্কি এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমিরদেরও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এতে পুরনো তুর্কি আমিরদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং ক্ষমতার লড়াই তীব্রতর হয়।

৪. কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এবং প্রাদেশিক বিদ্রোহ:

দাক্ষিণাত্যে বিজয়ের পর খলজি সালতানাত এক অত্যন্ত বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই বিশাল সালতানাতকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। দাক্ষিণাত্যের দূরবর্তী এলাকাগুলোকে দিল্লির সাথে সংযুক্ত রাখা একটি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর যখন কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন এই এলাকাগুলোতে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

৫. অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ:

আলাউদ্দিন খলজি বেশ কিছু কঠোর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার কার্যকর করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করা। তিনি দাম স্থিতিশীল রাখতে এবং একচেটিয়া আধিপত্য খতম করার জন্য কঠোর নীতি প্রয়োগ করেছিলেন। যদিও এর ফলে স্বল্প মেয়াদে সামরিক ব্যয় মেটানো সম্ভব হয়েছিল এবং কোষাগার শক্তিশালী হয়েছিল, কিন্তু এই ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হয়।

৬. জনসমর্থনের অভাব:

খলজি শাসকরা, বিশেষ করে আলাউদ্দিন, তাঁর কঠোর মেজাজের কারণে জনগণের মধ্যে খুব বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। তবে সেই সময় মানুষ সরকারের শৃঙ্খলা ও কঠোরতার কারণে নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু আলাউদ্দিনের উত্তরসূরিদের আমলে যখন সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন জনসমর্থন আরও কমে যায়, যা পতনের একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

খোজাদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস:

আলাউদ্দিন খিলজি তার খোজা গোলাম মালিক কাফুরের ওপর অনেক বেশি আস্থা রাখতেন, যা তাকে অত্যন্ত অনুগত আমির এমনকি শাহজাদাদের থেকেও বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। মুবারক শাহ এই কাজটি আরও বাড়িয়ে করেছিলেন এবং খসরু খানকে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন এবং তারই হাতে নিজের পরিবারসহ ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছিলেন। অবশেষে গাজী মালিক (গিয়াসউদ্দিন তুঘলক) খসরু খানকে পরাজিত করেন এবং তুঘলক শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন, এভাবেই খিলজি বংশের অবসান ঘটে।

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ষষ্ঠ খণ্ড

তুঘলক বংশ

৭২০ হিজরি থেকে ৮১৭ হিজরি

(১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

ক্ষমতার মেয়াদ: চান্দ্র বছর: ৯৭ বছর - সৌর বছর: ৯৪ বছর

https://t.me/BoierSomahar

তুঘলক কারা ছিলেন?

তুঘলক ছিল তুর্কিস্তানের পাহাড়ে বসবাসকারী একটি তুর্কি গোত্র। তুঘলক একটি তুর্কি শব্দ যার অর্থ 'পাহাড়ি অধিবাসী'। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী, এই গোত্রটি তুর্কিদের একটি গোত্র 'করুনা'-র একটি শাখা। এই লোকেরা সিন্ধু ও তুর্কিস্তানের মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করত। ফেরেশতার বর্ণনা অনুযায়ী, গাজী মালিকের পিতা মালিক তুঘলক সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গোলাম ছিলেন। তিনি ভারতের একটি জাট পরিবারে বিবাহ করেন যার ফলে গাজী মালিকের জন্ম হয়। [১]

গাজী মালিকের আসল নাম ছিল কেবল 'তুঘলক'। মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে বিজয়ের কারণে তিনি 'গাজী মালিক' উপাধি লাভ করেন। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী, সুলতান (জালালউদ্দিন) খলজির প্রাথমিক যুগে তিনি সিন্ধুতে ঘোড়া ব্যবসায়ীর কাছে ঘোড়া প্রশিক্ষণের কাজ করতেন। কিছুকাল পর তিনি সিন্ধুর সেনাবাহিনীতে একজন সৈনিক হিসেবে যোগদানের সুযোগ পান। সেই সময় তিনি অত্যন্ত নিঃস্ব ও দরিদ্র ছিলেন। তুঘলকনামা অনুযায়ী, তার সুদিন তখন শুরু হয় যখন সুলতান (জালালউদ্দিন) খলজি তার যোগ্যতা চিনতে পেরে তাকে নিজের দেহরক্ষীদের অফিসার নিযুক্ত করেন।

তারপর (ইবনে বতুতার মতে) আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে উলুগ খান (আলমাস বেগ) তাকে প্রথমে পদাতিক এবং পরে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পর আরও পদোন্নতি দিয়ে তাকে আমির-ই-আখুর (ঘোড়াদের তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করা হয়। ধাপে ধাপে তিনি একজন বিখ্যাত সামরিক নেতা হয়ে ওঠেন, এমনকি আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে তাকে দিপালপুরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। [২]

এখানে তিনি তাতারদের বিরুদ্ধে অভিযানে চমৎকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় হন যে মানুষ তাকে 'গাজী মালিক' বলে স্মরণ করতে শুরু করে। [৩]

তিনি মুলতানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যার ভিত্তিপ্রস্তরে খোদাই করিয়েছিলেন:
"আমি তাতারদের ২৯ বার পরাজিত করেছি, এই কারণেই মানুষ আমাকে গাজী মালিক বলে।"
ইবনে বতুতাও তার সফরনামায় এই মসজিদ এবং এতে স্থাপিত উল্লিখিত শিলালিপির কথা উল্লেখ করেছেন। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৮

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৮; রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২ পৃ. ৩৩১; জামে তারিখ-ই-হিন্দ পৃ. ৬৪৬ বরাতে তুঘলকনামা

[৩] মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: খণ্ড ১ পৃ. ১৫১

[৪] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২ পৃ. ৩৩১- ত. দার আল-শারক

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

৭২০ হিজরি থেকে ৭২৫ হিজরি

(১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

গাজি মালিকের দিল্লিতে প্রবেশ:

খসরু খানের বিরুদ্ধে গৌরবময় বিজয়ের পরের দিন ১লা শাবান ৭২০ হিজরি (১৫ই আগস্ট ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ) দিল্লির আমির ও আশরাফগণ গাজি মালিকের তাঁবুতে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিজয়ের অভিনন্দন জানান। শহরের সমস্ত চাবি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। গাজি মালিক এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিল্লিতে প্রবেশ করেন এবং যখন কুশকে হাজার সুতুনে পৌঁছালেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন:

“আল্লাহর লাখ লাখ শুকরিয়া যে, আমি নিমকহারামদের থেকে আমার প্রভুর রক্তের বদলা নিয়েছি। আমি আপনাদেরই একজন। আপনারা যাকে চান ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাদশাহ বানিয়ে দিন, আমি তাঁর অনুগত থাকব।”

আমিরগণ বললেন: “আমাদের সবার অভিভাবক আপনিই। আপনি তাতারদের হিন্দুস্তানে ঢুকতে দেননি। আপনি আমাদের ঢাল হয়ে ছিলেন। তখত ও সালতানাত আপনারই হক।” [১]

বিনয় ও নম্রতা, বাদশাহ হতে অস্বীকার:

গাজি মালিক বললেন: “আমি তো কোনো কাজের যোগ্য লোক ছিলাম না। কণ্ঠস্বর ছিল মৃতপ্রায়। রোদ ও চাঁদের ঠান্ডার শিকার ছিলাম। মরহুম সুলতান জালালউদ্দিন খিলজি আমাকে একটি সাধারণ পদ থেকে পদোন্নতি দিয়ে নিজের নিকটবর্তী পদে আসীন করেছিলেন। আমি রাত জেগে নিজের ধারালো তলোয়ার দিয়ে তাঁকে পাহারা দিতাম। জালালউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর আমি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলাম। কিন্তু তখন আলাউদ্দিন খিলজির ভাগ্যের নক্ষত্র উজ্জ্বল হচ্ছিল এবং আমি ও (আমার ভাই) উলুগ খান (আলমাস বেগ) তাঁর খাদেম হলাম। আলমাস বেগের মৃত্যুর পর আমি সুলতান আলাউদ্দিনের খিদমত করতে থাকি। আমাকে যা কিছু...”

---

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৭; তারিখ ফিরোজশাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ৪২২, ৪২৩; তারিখ মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৯২।

মিলেছে, এই সুলতানের বদৌলতেই মিলেছে।

একথা শুনে সালতানাতের উমারাগণ বললেন: “আল্লাহ আপনাকে যে যোগ্যতা দান করেছেন, তা উপেক্ষা করা যায় না। যখন রতনপুরের রাজা যুদ্ধের জন্য নিজের সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন, তখন উলুগ খান আপনার হাতে বাহিনীর নেতৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন এবং আপনি শত্রুবাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশকে খতম করে দিয়েছিলেন। আপনি মঙ্গোলদের ক্রমাগত পরাজিত করেছেন। মুবারক শাহের মৃত্যু পর্যন্ত আপনি আঠারোটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। আল্লাহ আপনাকে একটি বড় পদের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন, অন্যথায় এতগুলো যুদ্ধের পর কে জীবিত থাকতে পারত?”

গাজী মালিক বললেন: “আমার তীর-ধনুকই আমার তাজ ও তখত। আমার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল: প্রথমত, ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটানো। দ্বিতীয়ত, শাহজাদাদের হত্যাকারী অকৃতজ্ঞদের শাস্তি দেওয়া। তৃতীয়ত, হিন্দুজাদা ও অভিশপ্তদের থেকে সালতানাত ছিনিয়ে নিয়ে কোনো শাহজাদার হাতে সোপর্দ করা। (প্রথম দুটি উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে)। সুতরাং এখন যদি শাহজাদাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকে, তবে সালতানাত তাকে সোপর্দ করা হোক। যদি কেউ বাকি না থাকে, তবে এখানে অনেক যোগ্য উমারা উপস্থিত আছেন। আমি আমার দিপালপুরকেই পছন্দ করি। তোমরা তাজ ও তখতের দেখাশোনা করো। আমার জন্য আমার তলোয়ার এবং মঙ্গোলদের মাথা-ই যথেষ্ট।” [১]

বহরাম আইবা-কে বাদশাহ হওয়ার প্রস্তাব

একথা বলে তিনি তাঁর পালক ভাই বহরাম আইবা (কিশলু খান)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন: “তুমি বাদশাহ হয়ে যাও।”

সে বলল: “না, সুলতান আপনিই হোন।” উভয়ের মধ্যে এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। অবশেষে বহরাম আইবা বললেন: “যদি আপনি হতে না চান, তবে আপনার ছেলেকে বানিয়ে দিন।” কিন্তু গাজী মালিক একে অনুপযুক্ত মনে করলেন। [২]

যখন গাজী মালিক সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক হলেন

এমন পরিস্থিতিতে কিছু দূরদর্শী উমারা বললেন: “আসল কথা হলো, আপনার হাতে যে বীরত্বগাথা সম্পন্ন হয়েছে, তার কারণে আপনার সম্মান আকাশচুম্বী হয়েছে। এখন যদি অন্য কোনো ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করে, তবে সে আপনার ওপর কড়া নজর রাখবে। কারণ আপনার সাহস ও মর্যাদার কারণে সে আপনার প্রতি ভীত থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে একটি কাঁটা মনে করে সরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। আপনি আবু মুসলিম খুরাসানির ইতিহাস দেখুন যে, সে কীভাবে আব্বাসীয়দের সালতানাত পাইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু পরে মনসুর আব্বাসীয়র হাতে মারা গেল। কারণ সে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল যে, সাধারণ কর্মকর্তাদের মতো প্রজা হয়ে থাকতে পারত না।” [৩]

উমারাদের এই যুক্তি গাজী মালিককে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করল এবং তিনি সিংহাসন গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন।

এখন উমারাগণ গাজী মালিকের হাত ধরে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। এটি ছিল যোগ্যতা, জাতির প্রতিনিধিদের সম্মতি এবং পরামর্শের ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসার এক চমৎকার উদাহরণ, যা হিন্দুস্তানের জন্য শুভ লক্ষণ হিসেবে প্রমাণিত হলো। এর কারণে একটি...

---

[১] জামে তারিখ হিন্দ: পৃ. ৬৭৪, ৬৩৮, বরাতে তুঘলক নামা।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৪৩।

[৩] জামে তারিখ হিন্দ: পৃ. ৬৭৪, ৬৩৮, বরাতে তুঘলক নামা।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন যাকে বিশ্ব গিয়াসউদ্দিন তুঘলক উপাধিতে চেনে। [১]

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক - শাসন ও চরিত্র

তুঘলক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ব্যক্তিগত জীবনে একজন চরিত্রবান ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন। সালাত সর্বদা জামাতের সাথে আদায় করতেন। রোজা ও তারাবিহ সালাতের ব্যবস্থা করতেন। অধিকাংশ সময় বা-অজু থাকতেন। মদ্যপান থেকে নিজেও বিরত থাকতেন এবং অন্যদেরও নিষেধ করতেন। প্রতারণা ও ধূর্ততা থেকে মুক্ত, অনাড়ম্বর ও স্বচ্ছ স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি।

ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি খিলজিদের কঠোর নীতির অবসান ঘটান এবং তাদের অবহেলিত আমিরদের পুনরায় পুনর্বহাল করে অনুগত করে নেন। খিলজি বংশের অবশিষ্ট সদস্য ও নারীদেরও অনেক সম্মান প্রদান করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পুনরায় সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং খুব দ্রুত নিজের একাগ্রতা, সদিচ্ছা, সুশাসন এবং প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সেই সমস্ত দুর্বলতা দূর করে দেন যা শেষ খিলজি সুলতানগণ এবং খসরু খানের সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের পদোন্নতি দেন এবং অযোগ্য লোকদের পদ থেকে বরখাস্ত করেন। তিনি একজন মধ্যমপন্থী মানুষ ছিলেন এবং সর্বদা উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। কাউকে যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুরস্কার দিতেন না, তেমনি অকারণে কঠোরতাও প্রদর্শন করতেন না।

সেই সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য ছিল এবং প্রদেশগুলো কেন্দ্রবিমুখ হওয়ার দিকে ঝুঁকে ছিল। এমন পরিস্থিতিতে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দিল্লি সালতানাতকে সহায়তা প্রদান করেন এবং বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে সরকারের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। [২]

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক:

ঐতিহাসিক ফেরেশতা তার সম্পর্কে লিখেছেন:
“তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু, নেককার ও পরহেজগার ছিলেন; গাম্ভীর্য, নম্রতা ও সহনশীলতা ছিল তার স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিলেন। ধর্মীয় আইন মেনে চলাকে ফরজ মনে করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করতেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তার ব্যাপক দক্ষতা ছিল। দেওয়ান-ই-আম-এ বসে প্রজাদের অবস্থা শুনতেন। তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতেন। তিনি সাধারণ বাদশাহদের মতো সিংহাসনে আসীন হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না বরং নিজেকে প্রজাদের একজন সাধারণ খাদেম মনে করতেন।” [৩]

বাদায়ুনীর বর্ণনা হলো:

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ৪২৩; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৯২

[২] মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃ. ১৫১ থেকে ১৫৩। তারিখ-ই-মুবারক শাহী: ৯১

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৮

“গাজী মালিক সকল আমীরদের সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং গিয়াসউদ্দিন তুঘলক উপাধি গ্রহণ করেন। তুঘলক অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে সালতানাতের বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে নেন। তিনি যে ক্ষিপ্রতা ও বিচক্ষণতার সাথে শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন, তা হয়তো অন্যদের দ্বারা বছরের পর বছর ধরেও সম্ভব হতো না। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনদের পদ ও মর্যাদা দান করেন। তিনি আলাউদ্দিন খিলজি ও কুতুবউদ্দিন খিলজির আমলের অধিকাংশ আমীরদের সাথেও সদয় আচরণ করেন এবং তাঁদের জায়গির প্রদান করেন। এসব ব্যবস্থার পর তিনি তুঘলকাবাদ দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ তিন বছরে তৈরি হয়েছিল। যখন দুর্গটি প্রস্তুত হলো, তখন তিনি সেখানে এক রাজকীয় উৎসবের আয়োজন করেন। সুলতান সেই সকল লোকদের শাস্তি দেন, যারা খসরু খানের পরামর্শে কুতুবউদ্দিনের রানীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং যারা সেই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাহায্যকারী ছিল।” [১]

বন্ধুমহলে সে রেশমের মতো নরম
সত্য-মিথ্যার যুদ্ধে মুমিন যেন ইস্পাত
আকাশের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংঘাত
মাটির তৈরি হলেও মুমিন মাটি থেকে মুক্ত [২]

পদমর্যাদা গঠন:

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাসনভার গ্রহণ করে পদসমূহ এভাবে বণ্টন করেন:

- শাহজাদা ফখরুদ্দিন জউনা: সালতানাতের উত্তরাধিকারী এবং উলুগ খান উপাধিসহ দেওগিরির সুবাদার।
- তাতার খান (পালক পুত্র): জাফরাবাদের ওয়ালি।
- মালিক আসাদউদ্দিন (সুলতানের ভাতিজা): নায়েবে বারবক (হাজিব)।
- বাহরাম আইবা (পালক ভাই): কিশলু খান উপাধিসহ মুলতানের ওয়ালি। [৩]
- মালিক বাহাউদ্দিন গরশাস্প (সুলতানের শ্যালক): আরজে মামালিক (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) এবং সামানা প্রদেশ।
- মালিক তাজউদ্দিন জাফর: গুজরাটের ওয়ালি।

পদাধিকারীদের উল্লিখিত তালিকা পেশ করার পর ফেরেশতা লিখেছেন:

“গিয়াসউদ্দিন তুঘলক যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পদের যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ না করতেন, তাকে সেই পদ দিতেন না এবং যোগ্য ব্যক্তিকে বেকার থাকতে দিতেন না।” [৪]

---

[১] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫২, ১৫৩।

[২] ইকবাল।

[৩] কিছু ঐতিহাসিক বাহরাম আইবাকে ‘বাহরাম আয়না’ বলেন, কেউ ‘বাহরাম আবেহ’, কেউ ‘ইবনে বাহরাম আবেহ’। সঠিক হলো ‘বাহরাম আইবা’।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৯।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনামলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনামল ছিল আদর্শ শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগ। তাই আমরা এই যুগকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ এবং অন্যান্য ভয়াবহ দৃশ্য থেকে মুক্ত দেখতে পাই, যা পূর্ববর্তী কিছু বাদশাহর আমলে বারবার দেখা যেত। এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ:

মজবুত প্রতিরক্ষা:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আমলে দিল্লি সালতানাতের প্রতিরক্ষা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তিনি তাঁর রাজকীয় চাকরির সময় প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মঙ্গোলদের সামনে ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ডজন ডজন সংঘর্ষে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। তাই তিনি যখন সুলতান হলেন, তখন মঙ্গোলদের ওপর তাঁর প্রভাব আগের চেয়ে আরও বেশি বৃদ্ধি পেল। ফেরেশতা লিখেছেন:

"সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক মঙ্গোলদের আক্রমণের পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে মঙ্গোলরা কখনোই হিন্দুস্তানের দিকে মুখ করেনি।" [১]

এখানে উল্লেখ্য যে, এই আমলে মঙ্গোলদের একটি আক্রমণ হয়েছিল যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, যার বর্ণনা সামনে আসছে।

অর্থনৈতিক সংস্কার:

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আগে দুই শাসক: কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ এবং খসরু খান সরকারি কোষাগার দুই হাতে লুণ্ঠন করেছিলেন। বিশেষ করে খসরু খান নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সেনাবাহিনীকে এককালীন কয়েক মাসের বেতন দিয়ে কোষাগার শূন্য করে ফেলেছিলেন। অন্যদিকে, আলাউদ্দিন খিলজির আমল থেকে প্রচলিত কর ব্যবস্থায়ও সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। সংক্ষেপে, দেশের অর্থনীতির সংস্কার গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

তিনি অবিলম্বে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে, আলাউদ্দিন খিলজির আমল থেকে জমি পরিমাপের (পায়মাইশ) ভিত্তিতে কর ধার্যের নীতি বাতিল করেন এবং তার পরিবর্তে শস্যের (গ্লা) পরিমাণের নীতি কার্যকর করেন। পূর্ববর্তী নীতি অনুযায়ী, জমিদারের জমির পরিমাপ অনুযায়ী খাজনা দিতে হতো, ফসল ভালো হোক বা মন্দ। এখন নতুন নীতি অনুযায়ী, জমির মালিক যে পরিমাণ শস্য পেতেন, তার একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হতো। তাছাড়া নতুন সংস্কারে এটিও নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, কোনো অবস্থাতেই উৎপাদনের দশ ভাগের এক ভাগ বা বড়জোর এগারো ভাগের এক ভাগের বেশি অংশ কর হিসেবে নেওয়া হবে না। এতে কৃষকরা অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং তারা মনপ্রাণ দিয়ে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে। কর কমানোর ফলে জিনিসের দাম কমে যায় এবং মানুষ সচ্ছলতা অনুভব করতে থাকে। সরকারি কোষাগারেও নিরবচ্ছিন্নভাবে আয় আসতে শুরু করে। [২]

---

[১] তারিখ-এ-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৯

[২] তারিখ-এ-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ৪২৯, ৪৩০

গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শান্তিপূর্ণ শাসনামলে সামরিক অভিযান খুব বেশি ছিল না এবং বিদ্রোহের ধারাও দেখা যায় না, তবে এই সময়ের কয়েকটি অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ছিল যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:-

মঙ্গোলদের একটি ব্যর্থ আক্রমণ:

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আমলে শের মঙ্গোল নামক এক সর্দার সিন্ধু নদ অতিক্রম করে পাঞ্জাবে প্রবেশের চেষ্টা করেন, কিন্তু সামানার সুবাদার বাহাউদ্দিন গুরশাস্প সময়মতো দিল্লি দরবারে সংবাদ পাঠিয়ে সাহায্য তলব করেন। এরপর দুটি স্থানে মঙ্গোলদের পরাজিত করে পিছু হটানো হয় এবং বিজয়ী বাহিনী বিপুল সংখ্যক মঙ্গোল বন্দীকে নিয়ে ফিরে আসে। [১]

দাক্ষিণাত্য ও তেলেঙ্গানার প্রথম অভিযান:

দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহের প্রবণতা অনেক বেশি ছিল। এর আগেও বিগত বছরগুলোতে সেখানে বহুবার বিদ্রোহ হয়েছিল। উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ খিলজি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, কিন্তু দিল্লির রাজনৈতিক সংকট বাড়তে দেখে তেলেঙ্গানার রাজা রায় সুদর মহাদেব (প্রতাপ সিং রুদ্র দেব) আনুগত্যের জোয়াল ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলেন। এই রাজার পূর্বপুরুষরা সাত শতাব্দী ধরে এখানকার শাসক ছিলেন। ৭১৭-১৮ হিজরি (১৩১৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি খসরু খানের সাথে করা কর প্রদানের চুক্তি লঙ্ঘন করেন এবং মারাঠাওয়াড়ার সীমান্তে অবস্থিত শহর "বন্দ ভদ্রকোট" [২] থেকে রাজকীয় রক্ষীদের হটিয়ে দিয়ে সেখানে দখলদারিত্ব কায়েম করেন।

শীঘ্রই তার আধিপত্য পশ্চিমঘাট ও গোদাবরী থেকে জলা দর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সিংহাসন আরোহণের দ্বিতীয় বছর ৭২১ হিজরিতে তেলেঙ্গানায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এবং "ওয়ারঙ্গল"-এর শাসক কর দিতে অস্বীকার করেন। যদিও সেখানে "হয়সালা সাম্রাজ্যের" রাজা "বীর বল্লাল তৃতীয়" প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেননি, তবে তিনি এখন কার্যত স্বাধীনই ছিলেন। এদিকে দেবগড় (দেবগিরি)-এর শাসন ব্যবস্থাতেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে শুরু করে। [৩]

এই পরিস্থিতিতে বাদশা বাধ্য হয়ে যুবরাজ মালিক জুনাকে কয়েকজন প্রাচীন আমিরের সাথে তেলেঙ্গানায় অভিযান চালানোর জন্য পাঠান। তিনি মালব, বদায়ুন এবং চান্দেরির সেনাবাহিনী একত্রিত করে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে তেলেঙ্গানার দিকে রওনা হন, যেখানে রাজা রায় সুদর মহাদেব মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মালিক জুনা যখন সীমান্ত অতিক্রম করে এই রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন তাকে কঠোর

---

[১] ফুতুহুস সালাতিন: পৃ. ৪০৪

[২] বন্দ ভদ্রকোটকে প্রাচীন কিতাবসমূহে বদরকোটও বলা হয়েছে। পরবর্তীতে এর নাম "বিদর" রাখা হয় এবং এই নামেই আজ পর্যন্ত পরিচিত। এটি ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের একদম উত্তরে মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গানার সীমান্তে অবস্থিত।

[৩] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৬৫৯, ৬৫৮

বাধার সম্মুখীন হতে হলো এবং “বদর মহাদেব” [১] মোকাবিলায় অটল রইল।

তবে মালিক জুনা প্রতিটি বাধা চূর্ণ করে দিলেন এবং পরিশেষে রাজাকে তার রাজধানী “ওয়ারঙ্গল”-এ আশ্রয় নিতে হলো। মালিক জুনা এবার শহরটি অবরোধ করলেন এবং যুদ্ধ তীব্রভাবে চলতে থাকল। অবশেষে মালিক জুনা প্রাচীরে সুড়ঙ্গ তৈরির নির্দেশ দিলেন এবং সেই সাথে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলেন। রাজা যখন দেখলেন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন তিনি সন্ধির প্রস্তাব দিলেন এবং হাতি ও ঘোড়াসহ মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে বললেন যে, তিনি আলাউদ্দিন খিলজির আমলে প্রদত্ত কর পরিশোধ করতে থাকবেন। কিন্তু মালিক জুনা সন্ধি করতে অস্বীকার করলেন এবং নিজের শর্তে প্রতিপক্ষকে নতি স্বীকার করানোর জন্য যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

তবে কয়েক দিন পর ওই এলাকায় একটি মহামারি ছড়িয়ে পড়ল এবং বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈন্য এর শিকার হলো। শুধু সৈন্যরা নয়, বরং কিছু আমির ও দরবারীও এই মহামারিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। উবাইদ কবি এবং শায়খজাদা দামেশকি নামক দুই সহচর, যারা নতুন মালিক জুনার দরবারের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, তারা ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তারা ভাবলেন যে, মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে বাহিনীকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হোক। সে সময় এক মাস ধরে দিল্লির কোনো বার্তাবাহক সেখানকার কোনো খবর আনেনি, যদিও সাধারণত সপ্তাহে দুইবার ডাক আসা বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে এই দুই সহচর গুজব ছড়িয়ে দিলেন যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ইন্তেকাল করেছেন এবং দিল্লিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর অন্য এক শাসক সিংহাসন দখল করে নিয়েছেন।

সেই সময় বাহিনীর কমান্ড পরিচালনাকারী প্রধান চারজন অফিসার ছিলেন: মালিক তৈমুর, মালিক গুল আফগান, মালিক কাফুর মোহরদাদ এবং মালিক তগিন। উবাইদ কবি এবং শায়খজাদা এই চারজনের সাথে আলাদা আলাদাভাবে দেখা করে তাদের এই বানোয়াট খবরটি আরও স্বরচিত বিস্তারিত বর্ণনাসহ শোনালেন। উবাইদ যেহেতু জ্যোতিষীও ছিলেন, তাই তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন যে, শাহজাদা তোমাদের হত্যা করিয়ে দেবেন। দিল্লির বিদ্রোহের খবরে এই লোকেরা আগেই চিন্তিত ছিলেন। এ কথা শুনে তারা এতটাই আতঙ্কিত হলেন যে, নিজেদের অনুগতদের নিয়ে আলাদা আলাদা পথে পালিয়ে গেলেন। এভাবে বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মালিক জুনাকেও বাধ্য হয়ে অত্যন্ত আক্ষেপ ও দুঃখের সাথে ফিরে আসতে হলো। মুসলমানদের পিছু হটতে দেখে “ওয়ারঙ্গল”-এর বাহিনী বাইরে বেরিয়ে এল এবং তারা পিছু ধাওয়া করে বহু সংখ্যক মুসলমানকে শহীদ করে দিল। যা-ই হোক, শাহজাদা জুনা এবার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে দেবগিরি পৌঁছালেন এবং দিল্লি থেকে সঠিক তথ্যের অপেক্ষা করতে লাগলেন। শীঘ্রই দিল্লি থেকে রাজকীয় ডাক এসে পৌঁছাল, যাতে বাদশাহর সুস্থতা ও নিরাপত্তা এবং এই গুজবের সম্পূর্ণ মিথ্যা হওয়া প্রমাণিত হলো। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে অফিসাররা পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে সুলতান বলবনের নাতি সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (বিন বুগরা খান) শাসক ছিলেন। এই লোকেরা তার কাছে আশ্রয় নিলেন। যা-ই হোক, অধিকাংশ পলাতক অফিসার ও সৈন্য শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হলো। তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র হিন্দুদের হস্তগত হলো। মালিক তৈমুর তেলেঙ্গানায় তার সঙ্গীদের সাথে নিহত হলেন। মালিক তগিন মারাঠাওয়াড়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে মারাঠারা তাকে হত্যা করে তার চামড়া ছাড়িয়ে মালিক জুনার কাছে পাঠিয়ে দিল। মালিক কাফুর, মালিক গুল আফগান, উবাইদ কবি এবং অন্যান্য গাদ্দারদের খুঁজে বের করে ও পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলা হলো।

---

[১] এই রাজার নাম “মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ”-এ “রায় বদর মহাদেব” উল্লেখ আছে, যেখানে তারিখ-ই-ফেরেশতা এবং অন্য কিছু ইতিহাসে তাকে “লদর দেব” বলা হয়েছে।

নেওয়া হলো এবং দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো যেখানে তাদের এবং তাদের সহযোগীদের ও স্ত্রী-সন্তানদের হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে সমস্ত দিল্লিবাসী কেঁপে উঠল। [১]

কিছুদিন পর মালিক জুনা অবশিষ্ট দুই বা তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দিল্লিতে ফিরে এলেন। [২]

তেলেঙ্গানার ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ ও বিজয়:

চার মাস পর মালিক জুনা এক নতুন সংকল্প নিয়ে বিশাল এক বাহিনীসহ দিল্লি থেকে বের হলেন এবং দেবগিরি হয়ে আবারও একবার ওয়ারঙ্গলের দিকে অভিযান শুরু করলেন। তিনি প্রথমে তেলেঙ্গানার সীমান্তে অবস্থিত 'বিদার' দুর্গ জয় করলেন যা 'ওয়ারঙ্গল'-এর রাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ছিল। এরপর তিনি পথের অন্যান্য দুর্গ জয় করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকলেন এবং বিজিত দুর্গগুলোর শাসনভার নিজের প্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করতে থাকলেন। এভাবে পথ ও মহাসড়কগুলোকে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত করে তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ওয়ারঙ্গলে পৌঁছালেন।

এবার তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের অবরোধের পর এই মহিমান্বিত শহরটি জয় করে দেখালেন। রাজা 'রুদ্র মহাদেব' এবং তার রানী বন্দী হলেন। অসংখ্য হাতি এবং অগাধ ধনসম্পদ দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। রাজাকেও দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু তিনি এই অপমান সহ্য করতে পারলেন না, ফলে পথেই মারা গেলেন। সম্ভবত তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

তেলেঙ্গানা এবং এর রাজধানী ওয়ারঙ্গল এখন দিল্লি সালতানাতের প্রদেশে পরিণত হয়েছিল, তাই মালিক জুনা এখানে নিয়মিত প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। 'ওয়ারঙ্গল'-এর নাম পরিবর্তন করে 'সুলতানপুর' রাখা হলো। অবশ্য অনেক প্রাচীন হিন্দু কর্মকর্তাদের তাদের দায়িত্ব পদে বহাল রাখা হলো। বিজয়ের পর শাহজাদা মন্দির ভাঙচুর এবং গণহত্যার মতো কোনো কাজ হতে দেননি।

ফেরার পথে তিনি উড়িষ্যার পথ বেছে নিলেন যেখানে রাজা ভানু দেব দ্বিতীয়-এর শাসন ছিল। তিনি যুদ্ধে রাজা রুদ্র মহাদেবকে সাহায্য করেছিলেন, তাই মালিক জুনা তাকে শাস্তি দেওয়া জরুরি মনে করলেন এবং পূর্ব ঘাটের কিনারা ধরে অগ্রসর হয়ে ছোট ছোট হিন্দু কর্মকর্তাদের পরাজিত করলেন এবং অবশেষে 'জাজ নগর' [৩]-এর সীমান্তে পৌঁছে গেলেন। এখানে তার মোকাবিলা রাজার শক্তিশালী বাহিনীর সাথে হলো। ফলে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো। মালিক জুনা এখানেও শত্রুকে পরাজিত করলেন এবং অনেক যুদ্ধ-হাতি আটক করলেন যেগুলোকে তেলেঙ্গানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখান থেকে চল্লিশটি হাতি দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এরপর উত্তরাধিকারী ওয়ারঙ্গলে ফিরে এলেন এবং এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করে দিল্লিতে পৌঁছালেন। এই বিজয়গুলোর ওপর দিল্লিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব পালন করা হলো। [৪]

---

[১] সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের এই পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই জুলুম এবং দণ্ডনীয় ছিল। শরয়ি এবং নৈতিকভাবে কোনোভাবেই এটি বৈধ নয় যে, কারো অপরাধের শাস্তি তার পরিবারের সদস্য এবং বংশের লোকদের দেওয়া হবে। এই রাজনৈতিক রীতির সূচনা আলাউদ্দিন খিলজি করেছিলেন এবং পরবর্তীতে কিছু সুলতানও তার অনুসরণ করেছিলেন।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ১৩০ থেকে ১৩২; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃ. ১৫২; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৯২, ৯৩; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৪৬ থেকে ৪৪৭; রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৩৩; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ৩৯২ থেকে ৩৯৭।

[৩] জাজ নগর ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত। বর্তমান নাম জাজপুর। দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে পনেরোশ কিলোমিটারের কিছু বেশি দূরত্বে অবস্থিত।

[৪] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ১৩২, ১৩৩; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃ. ১৫২; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৪৯, ৪৫০; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ৩৯৭ থেকে ৩৯৯; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৬৬৯।

বঙ্গ বিজয় - লখনৌতি ও সোনারগাঁকে পুনরায় দিল্লির সাথে অন্তর্ভুক্তিকরণ:

আগে বলা হয়েছে যে, জুনা খানের নেতৃত্বে ওয়ারাঙ্গলগামী প্রথম অভিযান থেকে অনেক কর্মকর্তা পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলায় গিয়ে সেখানকার শাসক শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের (৬৯৯ হিজরি থেকে ৭২২ হিজরি) কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ধৃষ্টতা দিল্লি সালতানাতের জন্য সহনীয় ছিল না এবং এটি বাংলায় আক্রমণের অজুহাত তৈরি করেছিল।

৭২২ হিজরিতে (১৩২২ খ্রিস্টাব্দ) শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি চার পুত্র রেখে যান: বুগরা খান, শিহাবউদ্দিন, নাসিরউদ্দিন এবং গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর (ওরফে মালিক ভোরা)।

মরহুম বাদশাহ শিহাবউদ্দিনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু তিনি সিংহাসনে বসার মাত্র কয়েক দিন পরেই গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর বিদ্রোহ করে সিংহাসন দখল করে নেন। অন্যদিকে তার ভাই নাসিরউদ্দিন লখনৌতির ওপর নিজের অধিকার দাবি করতে শুরু করেন। গৃহযুদ্ধ বাংলাকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং স্থানে স্থানে হিন্দু রাজারা স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুরু করেছিলেন।

এমন পরিস্থিতিতে লখনৌতি ও সোনারগাঁর বাসিন্দারা দিল্লির দরবারে আবেদন পাঠান যে, এখানকার শাসকদের গৃহযুদ্ধে আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, তাই আমাদের সাহায্য করা হোক। ফলস্বরূপ ৭২৪ হিজরিতে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক যুবরাজ মালিক জুনা (উলুগ খান)-কে দিল্লিতে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং অগ্রসর হয়ে বিহারের “তিরহুত” [১] জেলায় পৌঁছে যান।

শীঘ্রই সুলতানি বাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে লখনৌতির সীমান্তে উপস্থিত হয়। শাহজাদা নাসিরউদ্দিনের [২] প্রতিনিধিরা এখানে সুলতানের দরবারে আসেন এবং উপহার পেশ করে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন, ফলে তাকে অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

যা হোক, বাংলার শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে লখনৌতির বাইরে সুলতানের মুখোমুখি হন। সামান্য যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হন এবং পালিয়ে যান। সামনে গিয়ে নদীর কাছে তিনি একটি জলাভূমিতে আটকে যান এবং গ্রেপ্তার হন। তাকে গ্রেপ্তার করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার শাসনকাল ছিল ৭২২ হিজরি থেকে ৭২৪ হিজরি পর্যন্ত। সংক্ষেপে, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলার সমস্ত জেলা জয় করে দিল্লি সালতানাতের অনুগত করে নেন।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেন: পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ। পূর্ব বাংলার কেন্দ্র সোনারগাঁকে নির্ধারণ করেন এবং নিজের পালক পুত্র তাতার খানকে এর শাসক নিযুক্ত করেন। পশ্চিম বাংলার কেন্দ্র লখনৌতিকে নির্ধারণ করেন এবং সেখানে বুগরা খানের পুত্র শাহজাদা নাসিরউদ্দিনকে নিজের নায়েব হিসেবে শাসক নিযুক্ত করেন। দক্ষিণ বাংলার কেন্দ্র সাতগাঁওয়ে আজম খানকে শাসক বানান। ফেরার পথে সুলতান অন্যান্য হিন্দু রাজাদেরও আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। বাংলার অভিযান থেকে সুলতানের প্রত্যাবর্তন ৭২৪ হিজরির শেষের দিকে ঘটে। [৩]

---

[১] তিরহুত অঞ্চলটি ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত যা গঙ্গা, গণ্ডক এবং কোসির মতো নদী দ্বারা বেষ্টিত। এই অঞ্চলটি আজও তিরহুত বিভাগ নামে পরিচিত, এর সদর দপ্তর মুজাফফরপুর দিল্লি থেকে প্রায় এগারোশ কিলোমিটার দূরে।

[২] শাহজাদা নাসিরউদ্দিনকে ইয়াহইয়া সিরহিন্দি প্রমুখ লখনৌতির শাসক হিসেবে লিখেছেন, অথচ সেই সময় পর্যন্ত তিনি শাসক হতে পারেননি, কেবল এর প্রার্থী ছিলেন।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪২২, ৪২৩; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃ. ১৫৪; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৫১, ৪৫২; রিহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩২২; ফুতুহ-উস-সালাতিন: পৃ. ৩৮৮।

তিরহুত দুর্গ বিজয়:

ফেরার পথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন পুনরায় তিরহুত হয়ে অতিক্রম করেন। এখানকার রাজা সুলতানের ভয়ে একটি জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েন। সুলতান তাকে ধাওয়া করেন এবং জঙ্গল কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। সৈন্যরা দ্রুতই জঙ্গলকে ময়দানে পরিণত করে এবং রাজার জন্য লুকানোর কোনো জায়গা অবশিষ্ট রইল না। তবে তিনি সুলতানি বাহিনীর হাতে ধরা না পড়ে তিরহুত দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। সুলতানের বাহিনী তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পর সেই দুর্গে পৌঁছালে দেখা গেল এর চারপাশে সাতটি পরিখা পানিতে পূর্ণ। সুলতান তবুও সাহস হারাননি এবং কোনো না কোনোভাবে সেখানে আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। অবশেষে দুই-তিন সপ্তাহের অবরোধের পর দুর্গটি জয় করা হয় এবং রাজা গ্রেফতার হন। সুলতান তিরহুতের শাসনভার একজন অফিসার আহমদ খানের হাতে ন্যস্ত করেন এবং নিজে বিজয়ী বেশে দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর সুলতান বাহিনীকে পেছনে ফেলে রেখে অসাধারণ গতিতে নিজের দেহরক্ষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে রাজধানী অভিমুখে রওনা হন। তিনি কী জানতেন যে মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে। [১]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যু:

সুলতানের মৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত অদ্ভুত। বাংলা থেকে ফেরার পথে তিনি তার পুত্র মালিক জুনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি দিল্লির কাছে নদীর তীরে আফগানপুরা নামক জনপদে একটি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সে অনুযায়ী নির্দেশ পালন করা হয় এবং তিন দিনের মধ্যে কাঠের স্তম্ভের ওপর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যখন সুলতানের বাহিনী সেখানে পৌঁছাল, তখন দিল্লি থেকে আমির ও রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত হন, যাদের মধ্যে মুলতান থেকে আসা প্রখ্যাত বুজুর্গ শাহ রুকন আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন। সুলতানের জন্য প্রাসাদে দস্তরখান বিছানো হলো এবং সবাই খাবার খেলেন। এরপর শাহ রুকন আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং কিছু লোক সালাতের জন্য চলে গেলেন। এদিকে বাহিনীর কিছু হাতি দৌড়াতে দৌড়াতে কাছ দিয়ে অতিক্রম করল, যাদের পায়ের ধমকে কাঠের স্তম্ভগুলো উপড়ে গেল এবং ছাদ ধসে পড়ল। সুলতান ভেতরেই ছিলেন। তিনি এই বোঝার নিচে চাপা পড়েন। যখন ধ্বংসস্তূপ সরানো হলো, তখন সুলতানের রুহ পরওয়াজ করে গেছে (মৃত্যু হয়েছে)। [২]

ইবনে বতুতার মতে এটি মালিক জুনা (সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক)-এর ষড়যন্ত্র ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফেরেশতা ঐতিহাসিক হাজি মুহাম্মদ কান্দাহারির উদ্ধৃতি দিয়ে অন্য একটি বর্ণনা নকল করেছেন, যার মতে সেই কক্ষের ছাদের ওপর আসমানি বিজলি পড়েছিল যার কবলে সুলতানও চলে আসেন। ফেরেশতা একেই যুক্তিযুক্ত বলেছেন। মোদ্দাকথা, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে বাহ্যত মালিক জুনা কোনো ষড়যন্ত্রে শরিক ছিলেন বলে মনে হয় না, বরং এই মৃত্যু ছিল একটি দুর্ঘটনা। [৩] ওয়াল্লাহু আলাম।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর তারিখ:

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর তারিখ নিশ্চিতভাবে কোথাও বর্ণিত নেই। কিছু ব্যক্তি হিসাব করে একে ৩ রবিউল আখের...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৪

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৪, ৪৩৫; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৫২, ৪৫৩; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান আজ জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ৩ পৃ. ১০

[৩] সফরনামা ইবনে বতুতা: পৃ. ৪৩৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৫

৭২৫ হিজরি (১ ফেব্রুয়ারি ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ) এর ঘটনা। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তার মৃত্যু ২২ জিলহজ ৭২৪ হিজরিতে হয়েছিল এবং এর চল্লিশ দিন পর মহরম ৭২৫ হিজরিতে তার পুত্র মালিক জুনা (সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক) এর সিংহাসন আরোহণ হয়েছিল। [১]

সংস্কার ও কার্যাবলি

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তার পাঁচ বছরের শাসনামলে দেশ ও জনগণের কল্যাণে অসংখ্য কাজ করেছেন। এখানে সুলতানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হলো:

- তিনি অপরাধ দমন করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। জায়গিরদারির প্রাচীন প্রথা পরিবর্তন করেন। দরবারি মজলিস ও মদ্যপানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ডাক বিভাগকে উন্নত করে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব করেন। সকল অবৈধ কর মওকুফ করে দেন। তিনি হিন্দুদের প্রতিও দয়া ও উদারতার আচরণ করে তাদের অনুগত রাখেন।

- তার আমলে সেনাবাহিনীর নতুন বিন্যাস করা হয়।

- দিল্লির কাছে 'তুঘলকাবাদ' নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করা হয় এবং এর দুর্গে সৈন্য মোতায়েন করে দিল্লিকে উত্তর-পশ্চিমের বৈদেশিক আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করা হয়। ইবনে বতুতা তুঘলকাবাদ সম্পর্কে লিখেছেন:

"এই দুর্গে বাদশাহর কোষাগার ও প্রাসাদ ছিল। এই দুর্গে বাদশাহ এমন একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন যার ইটের ওপর সোনার প্রলেপ দেওয়া ছিল। যখন সূর্য উদিত হতো, তখন এর উজ্জ্বলতার কারণে কেউ প্রাসাদের দিকে তাকাতে পারত না। এতে বাদশাহ প্রচুর সম্পদ জমা করেছিলেন। বলা হয় যে, তিনি একটি হাউজে গলিত সোনা ঢেলে দিয়েছিলেন যা জমাট বেঁধে একখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তার পুত্র (মুহাম্মদ তুঘলক) সেই সমস্ত সোনা খরচ করে ফেলেছিলেন।" [২]

- গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আমলে দাক্ষিণাত্য ও ওয়ারঙ্গল আবার দিল্লির অনুগত রাজ্যে পরিণত হয়।

- তার লক্ষ্য ছিল প্রজাদের প্রতিটি ব্যক্তি যেন শান্তি ও সচ্ছলতার জীবন অতিবাহিত করে, দারিদ্র্য ও অনাহার দূর হয় এবং সবাই যেন সহজে হালাল রিজিক উপার্জন করতে পারে। তিনি শ্রমিকদের মজুরি এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি করেন।

- তার চেষ্টা ছিল আনন্দ ও খুশির মুহূর্তে সাধারণ ও বিশিষ্ট সবাই যেন শরিক হয়। তিনি বিবাহ বা কোনো বিজয়ের সংবাদে ওলামা, উমারা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একত্রিত করতেন এবং সবাইকে পুরস্কারে ভূষিত করতেন। মাশায়েখ ও সুফিদের খানকাহগুলোতে উপহার পাঠাতেন।

- তিনি খাজনা ও করের নিয়ম-কানুন নতুন করে বিন্যস্ত করে সহনীয় করে তোলেন। উৎপাদনের দশমাংশের বেশি...

---

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: জামে তারিখ-ই-হিন্দ আজ তুঘলক নামা ও মুহাম্মদ হাবিব: পৃষ্ঠা ৬৮৮। লেখকের মতে দ্বিতীয় বর্ণনাটিই প্রচলিত।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৩৩৫।

আদায় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন। তাঁর এই নীতির ফলে প্রতি বছর কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি খাল খনন করান এবং অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার অভিযান শুরু করেন। এভাবে উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটে এবং শস্যের দাম সস্তা হয়ে যায়। কৃষকদেরকে কর্মচারীদের বাড়াবাড়ি থেকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

সুলতান জায়গিরদারদের জমির প্রশাসনিক প্রতিবেদন নিজে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং কোনো জুলুম, আত্মসাৎ বা বাড়াবাড়ির সন্দেহ হলে তদন্ত করাতেন এবং অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। তিনি চাষিদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন যেন তারা চাষিদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাজনার বেশি আদায় না করে।

তাঁর শাসনকাল ছিল চার বছর কয়েক মাস। কিন্তু তাঁর মতো বিশাল সাম্রাজ্য এরপর আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। মুঘল বাদশাহদের মধ্যে কেবল আওরঙ্গজেব আলমগীরের সাম্রাজ্যের আয়তন এর চেয়ে বেশি ছিল। [১] আমির খসরু গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের কীর্তিগাঁথা বর্ণনায় 'তুঘলক নামা' নামক একটি রিসালা লিখেছিলেন, যা কালের আবর্তে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক ফেরেশতার দৃষ্টিতে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক:

ফেরেশতা গিয়াসুদ্দিনের দানশীলতা ও প্রজাপালনের বর্ণনা এভাবে করেন:
"গিয়াসুদ্দিনের কাছে যখনই কোনো বিজয়ের সংবাদ আসত বা কোনো খুশির অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, সন্তানের জন্ম ইত্যাদি হতো, তখন তিনি মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করতেন। উলামা ও মাশায়েখ, রাষ্ট্রের স্তম্ভ এবং আমীর-উমরাদের পুরস্কার ও সম্মাননা এবং রাজকীয় পোশাক দ্বারা ভূষিত করতেন। তিনি সর্বদা কোণঠাসা ফকির ও দরবেশদের শুধু চিন্তাই করতেন না, বরং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের সব ধরনের আরাম পৌঁছে দিতেন। প্রজাদের দুর্দশা দূর করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন।" [২]

তিনি সুলতানের অন্যান্য গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন:
"গিয়াসুদ্দিনের স্থাপত্যের প্রতিও গভীর অনুরাগ ছিল। তুঘলকাবাদের বিখ্যাত দুর্গ এবং এর সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ তাঁর উন্নত রুচির উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি মদ্যপানকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি দেশে মদ্যপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। নিজের পরিবারের সদস্য, গোলাম এবং পুরনো ভৃত্যদের সাথে তাঁর আচরণ তেমনই ছিল যা তাঁর আমীর ও অফিসার থাকাকালীন সময়ে ছিল; সেই একই নিয়ম তিনি তাঁর শাসনকালেও বজায় রাখেন। আলাই আমীরদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাদের নিয়মমাফিক জায়গির দান করেন।" [৩]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: ১৩৩, ১৪০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১/১৩৩, ৩৪০; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭ থেকে ১০। দ্রষ্টব্য: গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মৃত্যু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী ৭২৫ হিজরির জিলহজ মাসে হয়েছিল। এরপর ৭২৫ হিজরির মহররম মাসে মুহাম্মদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর তিন মাস পর রবিউল আউয়াল ৭২৫ হিজরিতে সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ. ইন্তেকাল করেন এবং এর ছয় মাস পর শাওয়াল ৭২৫ হিজরিতে হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত সুফি কবি আমির খসরুর মৃত্যু হয়। এভাবে দশ মাসের ব্যবধানে উপমহাদেশের তিনটি মহান ব্যক্তিত্ব দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১/১৩৯

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১/১৩৯, ৩৪০

তারিখ-ই-মিল্লাত-ই-মুসলিমাহ

ইতিহাসবিদ ফেরেশতা সুলতানের প্রজাবাৎসল্য এবং সুশাসনের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন:

“যে কাজে জনগণের কষ্ট হতে পারত, গিয়াসউদ্দিন তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন এবং যাতে (নিজের ও নিজের প্রজাদের জন্য) সামান্যতম আন্তরিকতা দেখতেন, তাকে উচ্চ পদে ভূষিত করতেন। যে ব্যক্তি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করত, তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করে তাকে সমসাময়িকদের মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলতেন।” [১]

ইতিহাসবিদ ফেরেশতা সুলতানের জ্ঞানানুরাগ এবং উপদেশ শ্রবণের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

“তিনি ‘বাসাতিনুল উনস’-এর লেখক মালিক ইখতিয়ারউদ্দিনকে ইনশা পদে নিযুক্ত করেন। পূর্ববর্তী রাজাদের পারিষদ ও রাষ্ট্রের স্তম্ভ যেমন খাজা খাতির, মালিক আনোয়ার জুনাইদি এবং খাজা মাহদীকে রাজকীয় অনুগ্রহে সিক্ত করেন এবং এই বুজুর্গদের নিজের মজলিসে বসার সম্মান দান করেন। দেশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য প্রাচীন রাজারা যেসব আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, গিয়াসউদ্দিন এই বুজুর্গদের কাছ থেকে তা জেনে নিতেন এবং তারপর সে অনুযায়ী আমল করতেন।” [২]

জীবনের বিপদে ইস্পাতের মতো চরিত্র গঠন করো
ভালোবাসার শয্যাগৃহে রেশম ও মখমল হয়ে যাও
পাহাড় ও মরুভূমি দিয়ে তীব্র স্রোতের মতো বয়ে যাও
পথে বাগান এলে সুমধুর সুরের ঝরনা হয়ে যাও
তোমার জ্ঞান ও ভালোবাসার কোনো শেষ নেই
প্রকৃতির বাদ্যযন্ত্রে তোমার চেয়ে বড় কোনো সুর নেই
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৩০

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৩৯

https://t.me/BoierSomahar

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক

৭২৫ হিজরি থেকে ৭৫২ হিজরি

(১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ)

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং মাহমুদ গজনভীর আক্রমণের মাধ্যমে হিন্দুস্তানে যে ইসলামী সালতানাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, এখন অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে তা তার বিস্তৃতির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। আলাউদ্দিন খিলজির বিজয়সমূহ দিল্লির সালতানাতকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল, অন্যদিকে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এই সালতানাতকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করে দেখিয়েছিলেন।

এখন হিন্দুস্তানের মুসলমানরা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং বিশেষ করে শাসক শ্রেণির ওপর এক মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল যে, তারা তাদের মনোযোগ ইসলামের দাওয়াতের ওপর নিবদ্ধ করবে। হিন্দুস্তানে কোটি কোটি দেবী-দেবতার পূজারী, কুফর ও শিরকের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত এবং জাতপাতের শিকলে আবদ্ধ মানুষের যে হেদায়েতের বাণীর প্রয়োজন ছিল, তার প্রচার ও প্রসারকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য বানানো আগেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এখন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কারণ এখন বিজয়ের সীমানা শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজন ছিল তলোয়ার রেখে দেওয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার এই পথভ্রষ্ট মানুষদের ইসলামের জীবনদায়ী বাণী এমনভাবে শোনানো যাতে শাসক শ্রেণি প্রথমে নিজেরা তার ওপর আমল করে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করে এবং সেই সাথে ঈমান, শান্তি, নিরাপত্তা ও উচ্চতর নৈতিকতা সম্বলিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর মহররম ৭২৫ হিজরি (১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে তার বড় ছেলে মালিক ফখরউদ্দিন জুনা ওরফে উলুগ খান, সুলতান মুহাম্মদ শাহ তুঘলক উপাধিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বড় আলেম, ফাজিল, সাহসী, চতুর, দানশীল এবং বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি কুরআন মাজিদের হাফেজ ও কারী ছিলেন, দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং আকলি শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী ছিলেন। আশা করা যাচ্ছিল যে, এত গুণের অধিকারী একজন মানুষ রাজসিংহাসনে বসে সেই দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করবেন যা তার ওপর আল্লাহ এবং আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ থেকে অর্পিত হয়েছে।

যদি সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের প্রায় সাতাশ বছরের দীর্ঘ শাসনামল তার অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে ইতিবাচক দিকে ব্যবহৃত হতো, তবে সম্ভবত উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্ন হতো এবং এখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও মুসলিম সংখ্যালঘু সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা অনেক...

শতাব্দীগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং এটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হয়ে পুরো ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছিল। কিন্তু আফসোস যে, নতুন শাসকের রাজনীতির ধরন এই আশাগুলোর সাথে তাল মেলাতে পারেনি। এই ত্রুটির মূলে ছিল নতুন সুলতানের স্বভাব, যাতে ছিল চরম উত্তেজনা, ক্ষিপ্রতা এবং তাড়াহুড়ো। নিজের মতামতের ওপর জেদ করা ছিল সম্ভবত তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তার দানশীলতা ও যোগ্যতা যেমন ছিল সীমাহীন, তেমনি তার প্রতিশোধ নেওয়ার নেশাও ছিল লাগামহীন।

ঘটনার ক্রমবিন্যাস:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলের ঘটনাবলি সাজানো এবং বোঝা একটি বড় সমস্যা এই কারণে যে, সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তা কালানুক্রমিকভাবে লেখেননি। লেখক যথাসম্ভব সঠিক সাল নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। আশা করা যায় যে, ইনশাআল্লাহ এই সময়কাল সত্যের কাছাকাছি হবে, যদিও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। [১]

নতুন নিয়োগসমূহ:

মুহাম্মদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগগুলো প্রদান করেন:

- আহমদ আয়াজ: গুজরাটের ওয়ালি, খাজা-ই-জাহান উপাধিসহ। পরবর্তীতে সালতানাতের উজির।
- মালিক মকবুল: গুজরাটের উজির, খান-ই-জাহান উপাধিসহ।
- বাহাউদ্দিন গুরশাস্প (মুহাম্মদ তুঘলকের ফুফাতো ভাই): আরজ-ই-মামালিক (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) এবং সাগরের (দাক্ষিণাত্য) ওয়ালি।
- মালিক ফিরোজ কামালুদ্দিন (মুহাম্মদ তুঘলকের চাচাতো ভাই): বারবক (হাজিব)। পরবর্তীতে সুলতান ফিরোজ তুঘলক হন।
- মালিক পিন্ডার খিলজি: লখনৌতি প্রদেশ, কদর খান উপাধিসহ।
- মালিক ইজ্জুদ্দিন ইয়াহইয়া: সাতগাঁও প্রদেশ, আজম-উল-মুলক উপাধিসহ।
- তাতার খান (গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পালক পুত্র): বাংলা প্রদেশ, বাহরাম খান উপাধিসহ।
- মাওলানা কাওয়ামুদ্দিন (সুলতানের শিক্ষক): ওয়াকিল-ই-দার (রাজকীয় প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক), পরবর্তীতে গুজরাটের ওয়ালি, কুতলুগ খান উপাধিসহ।
- মাওলানা কামালুদ্দিন (কাওয়ামুদ্দিনের ভাই): কাজিউল কুজাত, সদর-ই-জাহান উপাধিসহ।
- মাওলানা নিজামুদ্দিন (কাওয়ামুদ্দিনের ভাই): আলম-উল-মুলক উপাধি, বিশেষ উপদেষ্টা।
- মালিক কবুল: সালতানাতের উজির, ইমাদ-উল-মুলক উপাধিসহ।
- নিজামুদ্দিন কামাল: মুখলিস-উল-মুলক উপাধি, দরবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

---

[১] সুলতানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানির কাছ থেকে যথাযথভাবে আশা করা হয়েছিল যে, তিনি কাজী মিনহাজ-উস-সিরাজের মতো প্রতিটি ঘটনাকে সাল, মাস ও তারিখসহ সংরক্ষণ করবেন। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি সুলতানের অবস্থার প্রতি চোখ বন্ধ করে কলম চালিয়েছেন এবং কয়েকটি স্থান ছাড়া কোনো ঘটনার সাল লেখেননি। তার পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক পাওয়া যায়নি যিনি এই সমস্যার সমাধান করেছেন। ইয়াহইয়া সিরহিন্দি এবং ঐতিহাসিক ফেরেশতা ঘটনাবলি কালানুক্রমিকভাবে নকল করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের পক্ষেও প্রতিটি ঘটনার সাল বলা সম্ভব হয়নি, বরং কিছু ঘটনার ক্রমবিন্যাসে তাদের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। 'জামেউত তারিখ-ই-হিন্দ'-এ এই বিষয়ে কাজ করা হয়েছে, তবে এখনও অনেক জায়গায় অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

- শাহাব সুলতানি: খেতাব তাজুল মুলক, দরবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এছাড়া আইনুল মুলক এবং মালিক শাহাবুদ্দিন আবু রাজা মালিকুত তুজ্জারও সুলতানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিলেন। [১]

দৌলতাবাদ (কুব্বাতুল ইসলাম)

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাজধানী এমন কোনো শহরে হওয়া উচিত যা পুরো উপমহাদেশের কেন্দ্রে অবস্থিত। যখন তিনি এ বিষয়ে দরবারের আমিরদের কাছে জানতে চাইলেন, তখন কেউ কেউ বললেন 'উজ্জয়িনী', কারণ এটি দেশের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু অন্য কিছু আমির 'দেওগিরি'র পরামর্শ দিলেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের মনও সেদিকেই ঝুঁকে ছিল কারণ এটি তাঁর প্রিয় শহর ছিল। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, এখন রাজধানীকে দিল্লির পরিবর্তে দেওগিরি (মহারাষ্ট্র)-তে স্থানান্তরিত করা হবে। এই শহরে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করা হলো, অঢেল অর্থ ব্যয় করা হলো এবং এর নাম রাখা হলো 'দৌলতাবাদ'। [২]

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এই পরিকল্পনার কারণে অত্যন্ত কুখ্যাত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পক্ষ থেকে যে কঠোরতা করা হয়েছিল, তা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত ছিল না এবং এর ফলে সরকারের সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সুলতান কোনো পাগল ছিলেন যিনি একটি অসম্ভব ও নিরর্থক পরিকল্পনার পেছনে অগণিত জান-মালের সম্পদ নষ্ট করেছিলেন।

নিশ্চয়ই সুলতান তাঁর খিটখিটে মেজাজ এবং জোর-জবরদস্তির কারণে নিজের সময়ের মানুষের কাছে অপছন্দনীয় ছিলেন, এমনকি তাঁর দরবারের উলামা এবং সেই সময়ের ঐতিহাসিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাঁর প্রতি ভীত ও সন্দিহান ছিলেন, যার শক্তিশালী ও যৌক্তিক কারণও ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দৌলতাবাদের বিষয়টি সাধারণত ছবির একটি দিক থেকেই দেখা হয়, যেখানে আমাদের অন্য দিকটিও সামনে রাখা প্রয়োজন।

ছবির অন্য দিক:

একটি মৌলিক বাস্তবতা আমাদের প্রথমে মেনে নেওয়া উচিত যে, দিল্লির শাহজাদাদের মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম হিন্দুস্তান দেখার ও বোঝার এত সুযোগ আর কেউ পাননি যতটা মুহাম্মদ তুঘলক পেয়েছিলেন। এই কারণেই তাঁর মনোযোগ এই দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল যে, দিল্লি উপমহাদেশের প্রায় উত্তরে অবস্থিত, যার ফলে কেন্দ্র হিসেবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রদেশগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়া এবং সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কঠিন কাজ। যেহেতু দেওগিরি কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত এবং যেহেতু সালতানাত এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত হচ্ছে, তাই নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র এই দিকেই হওয়া উচিত।

যদিও এই অঞ্চলগুলো আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে প্রথমবার জয় করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ে এগুলোকে কেবল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে স্থানীয় রাজাদের তাদের সিংহাসনেই বহাল রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খলজির আমলে এবং খসরু খানের সময়ে...

---

[১] তারিখে মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ৯৭, ৯৮

[২] তারিখে ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৫৪

এখানে বিদ্রোহ দমন করে রাজাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো হয় এবং এই অঞ্চলকে নিম্ন পদের মুসলিম কর্মকর্তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় যাদের 'আমিরানে সাদাহ' বলা হতো। তবে এই কর্মকর্তারা কেবল রাজস্ব আদায় করতেন। যার ফলে এখানে একটি শক্তিশালী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব ছিল। বিজিত অঞ্চলের আশেপাশে এখনও অনেক হিন্দু রাজা ছিল যারা তাদের ক্ষমতা হারিয়েছিল ঠিকই কিন্তু ভবিষ্যতে সুলতানাতে দিল্লির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারত এবং দেবগিরি এমনকি মালবও পুনরায় দখল করে নিতে পারত। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সম্ভবত আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সরকার তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন ওয়ারঙ্গল, তেলেঙ্গানা (কর্ণাটক) এবং মা'বার (তামিলনাড়ু) পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

গত দেড় শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলিম সালতানাত যে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল, তার দুটি বড় কারণ ছিল: প্রথম বড় কারণ হলো সুফিয়ায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে দ্বীনের সেই কাফেলাগুলো যারা তুর্কিস্তান ও খোরাসান থেকে এদিকে আসতেন এবং তাদের বদৌলতে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় লোক ইসলামে দীক্ষিত হতেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল মঙ্গোলদের হাতে মধ্য এশিয়া, খোরাসান এবং ইরানের ধ্বংসযজ্ঞ, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হিজরত করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোতে বসতি স্থাপন করেন এবং এই অঞ্চলগুলো ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতে এমন কিছু ছিল না বরং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম এবং অনেক বিক্ষিপ্ত। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের মতে এখানেও একটি বাধ্যতামূলক হিজরতের প্রয়োজন ছিল যাতে উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান দক্ষিণে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং এভাবে সেখানে ইসলামী সালতানাত মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজধানী কি পরিবর্তন করা হয়েছিল?

এই ধারণা সঠিক নয় যে মুহাম্মদ তুঘলক রাজধানী বা সিংহাসন পুরোপুরি পরিবর্তন করেছিলেন। এমন ভুল কোনো বুদ্ধিমান শাসক করতে পারেন না। মুহাম্মদ তুঘলক যা করেছিলেন, তা অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিম শাসকরাও করেছিলেন। অর্থাৎ কেউ কেউ শীত ও গ্রীষ্মের জন্য দুটি আলাদা রাজধানী স্থাপন করেছিলেন যেমন সিন্ধুর অমুসলিম রাজা দাহির করতেন এবং যেমন ইরাকের কিছু মুসলিম শাসক কুফা ও বসরাকে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্র বানিয়েছিলেন।

কেউ কেউ মূল রাজধানীর সাথে একটি দ্বিতীয় রাজধানীও স্থাপন করেছিলেন। যেমন মোগলরা আগ্রার সাথে লাহোরকেও দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা দিয়েছিল। একইভাবে মুহাম্মদ তুঘলক দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে একটি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা জরুরি মনে করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য দিল্লির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা পুরোপুরি শেষ করা ছিল না বরং একে প্রাচীন সিংহাসন হিসেবে বহাল রাখা ছিল। এই যুগের ঐতিহাসিক ইবনে ফজলুল্লাহ লিখেছেন:

"সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের যুগে ভারতের দুটি কেন্দ্র ছিল: দিল্লি এবং কুব্বাতুল ইসলাম (দৌলতাবাদ)।" [১]

'জামে তারিখ-এ-হিন্দ'-এর লেখকরা এর প্রমাণ হিসেবে এই যুগের একটি মুদ্রার উল্লেখ করেছেন যা ৭৩০ হিজরির। এতে "তখতগাহ-এ-দেহলি" খোদাই করা আছে। অর্থাৎ সেই সময়ে যখন সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, এই মুদ্রায় "তখতগাহ-এ-দেহলি" শব্দ খোদাই করা ছিল।

---

[১] "ومن جملة عناية هذا السلطان جعل بين قاعدتي ملكه: وهما دهلي و قبة الاسلام..... (মাসালিকুল আবসার: ৩ পৃষ্ঠা ৮২)"

তখত বলা হতো। অর্থাৎ সেই সময়েও দিল্লির রাজধানী হওয়ার মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল। [১]

দৌলতাবাদ যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি তড়িঘড়ি করে নেওয়া হয়েছিল?

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে মুহাম্মদ তুঘলক হুট করে রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রমাণাদি থেকে স্পষ্ট যে তিনি সিংহাসনে আরোহণের পরপরই বা সম্ভবত তারও আগে উক্ত পরিকল্পনাটি ভেবে রেখেছিলেন। তবেই তার সিংহাসন আরোহণের তৃতীয় বছরে মানুষের দিল্লি থেকে দেওগিরি স্থানান্তর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। স্পষ্টতই এর জন্য আগে থেকেই বড় পরিসরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে কমপক্ষে এক-দেড় বছর অবশ্যই লেগে থাকবে। [২]

দৌলতাবাদ যাওয়ার জন্য সুযোগ-সুবিধা:

দিল্লির যেসব মানুষকে দৌলতাবাদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সুলতান তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কমতি রাখেননি। সুলতানের নির্দেশে দিল্লি থেকে দৌলতাবাদ পর্যন্ত প্রতিটি মনজিলে একটি ডাক চৌকি তৈরি করা হয়েছিল, সেই সাথে একটি মসজিদ, একটি খানকাহ এবং একটি মুসাফিরখানাও স্থাপন করা হয়েছিল। মসজিদে ইমাম এবং খানকাহতে শেখ নিযুক্ত করা হয়েছিল। মুসাফিরখানাগুলোতে মুসাফিরদের দেখাশোনা, খাওয়া-দাওয়া এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। রাস্তার আশেপাশে ছায়াযুক্ত গাছ লাগানো হয়েছিল যাতে মুসাফিরদের রোদে কষ্ট না হয়। এরপর মানুষকে সেখানে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ঘরবাড়ি কিনে নিয়ে রাজকোষ থেকে তাদের মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা তা দিয়ে দৌলতাবাদে নিজেদের বসবাসের ব্যবস্থা করতে পারে। দরিদ্রদের রাজকোষ থেকে ভ্রমণ খরচ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিটি যাত্রাবিরতিতে তাদের খাওয়া-দাওয়ার খরচ সরকার নিজের জিম্মায় নিয়েছিল।

মানুষ তাদের প্রিয় ঘরবাড়ি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিল্লি থেকে বের হলো এবং এই বারোশ কিলোমিটার দীর্ঘ সফরে রওনা হলো। সেই যুগের হিসেবে এটি ছিল চল্লিশ দিনের সফর। সফরের দীর্ঘতা ও কষ্টের কারণে অনেক বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষ পথেই মারা গেলেন। বাকিরা অনেক কষ্টে নতুন রাজধানীতে স্থানান্তরিত হলেন। [৩]

এরপর ৭২৭ হিজরি (১৩২৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতানও দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হন। [৪]

তার মা মাখদুমা-ই-জাহান এবং পরিবার-পরিজন ছাড়াও সমস্ত উমারা, উজির, সেনাকর্মকর্তা এবং অনুচর ও সেবকগণ, সেই সাথে দিল্লির উলামা ও ফুকাহা এবং সাদাত ও মাশায়েখগণও এখানে দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন। [৫]

---

[১] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৪৬৭

[২] ইবনে বতুতা তার সফরনামায় মুহাম্মদ তুঘলকের দিল্লি থেকে দৌলতাবাদ স্থানান্তরের কারণ হিসেবে লিখেছেন যে, দিল্লির বাসিন্দারা বাদশাহকে চিঠি পাঠাতেন যার খামের ওপর লেখা থাকত "সুলতান ছাড়া কেউ যেন না পড়ে", কিন্তু বাদশাহ যখন সেই খামগুলো খুলে পড়তেন তখন সেগুলো গালিগালাজে ভরা থাকত। এই কারণে সুলতান রাগান্বিত হয়ে দৌলতাবাদকে রাজধানী ঘোষণা করেন এবং সমস্ত দিল্লিবাসীকে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। (রিহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৭৩) কিন্তু এই বিষয়টি কোনোভাবেই সঠিক মনে হয় না কারণ যদি দৌলতাবাদ যাওয়ার কারণ এটাই হতো তবে সুলতান দিল্লিবাসীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন এবং তাদের কখনোই নিজের সাথে নিয়ে যেতেন না।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৫৫, ২৫৬; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৪; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৯৮; রিহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৭৩

[৪] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ১৫৬; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ৯৮

[৫] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০২; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২৫৮; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ১৫৮; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৪

দৌলতাবাদের জনবসতির ওপর মনোযোগ:

মানুষের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এই দিকটি খেয়াল রাখা সম্ভব হয়নি যে, এই নতুন অঞ্চলের জলবায়ু সবার জন্য অনুকূল হবে না। ফলে শত শত মানুষ এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অনেকে মারাও যায়। [১]

নতুন রাজধানীতে স্থানান্তর প্রক্রিয়া চলছিল এবং তাদের বসবাসের ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক মনোযোগ ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল। সুলতান দেড়-দুই বছর পর্যন্ত এই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থ পানির মতো খরচ করা হয়। নতুন রাজধানীতে বসতি স্থাপনকারী সকল সরকারি কর্মচারীর ভাতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। [২]

মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনকাল উপমহাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রায় ২৭ বছরের দীর্ঘ সময়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং অনেক বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো: [৩]

দক্ষিণ ভারতে গুরশাস্পের বিদ্রোহ ও দমন (৭২৭ হিজরি):

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক যে শান্তি ও স্বস্তির খোঁজে দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, তা তিনি কখনোই পাননি; বরং এরপর তার সারা জীবন একের পর এক অভিযান, সফর এবং বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হয়। তার দৌলতাবাদে আসার বেশি দিন হয়নি, এর মধ্যেই তার ভাগ্নে মালিক বাহাউদ্দিন গুরশাস্প, যিনি দাক্ষিণাত্যের সাগর [৪] শহরের শাসক ছিলেন, বিদ্রোহ করে বসেন। বাহাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের আরও অনেক আমিরকে নিজের সাথে যুক্ত করে নিয়েছিলেন, যার ফলে দাক্ষিণাত্যের একটি বড় অংশ দিল্লি সালতানাতের হাতছাড়া হয়ে যায়। সুলতান এই খবর শুনে গুজরাটের ওয়ালি আহমদ আইয়াজকে এই ফিতনা দমন করার নির্দেশ দেন। ফলে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে বের হন এবং খোলা ময়দানে গুরশাস্পের মুখোমুখি হন। যুদ্ধের ঠিক মাঝখানে গুরশাস্পের একজন নায়েব মালিক বাহরাম খনফর তার সঙ্গ ছেড়ে সরকারি বাহিনীর সাথে যোগ দেন, যার ফলে গুরশাস্প পিছু হটতে বাধ্য হন এবং নিজের শহর "সাগর"-এ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। আহমদ আইয়াজও পিছু ধাওয়া করে যখন সাগরের কাছে পৌঁছান, তখন গুরশাস্প তার পরিবার-পরিজনসহ সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং "কম্পিলি" [৫]-এর হিন্দু রাজা "কম্পিলি দেবা"-র কাছে আশ্রয় নেন।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০২; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: ১/ পৃ. ২৫৬, ২৫৮; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: ১/ পৃ. ১৫৮।

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০২; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: ১/ পৃ. ২৫৮; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: ১/ পৃ. ১৫৮; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৪।

[৩] সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের ২৭ বছরের দীর্ঘ শাসনকালের ঘটনাবলি প্রাচীন উৎসগুলোতে পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিকতায় সংগ্রহ করা হয়নি। তাই যেসব অভিযানের সংঘটিত হওয়ার সাল পাওয়া যায়নি, সেখানে অনুমান ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

[৪] "সাগর" ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের গুলবারগার কাছে এই নামেই পরিচিত। এটি দিল্লি থেকে প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার এবং দেবগিরি থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

[৫] কম্পিলি নামক ছোট একটি রাজ্য ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের পূর্বে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই এলাকাটি বর্তমানে "বেল্লারি" ও "হোসপেট"-এর কাছে অবস্থিত যেখানে এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এটি দিল্লি থেকে প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার এবং দেবগিরি থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক নতুন রাজধানী থেকে আহমদ আয়াজের সাহায্যের জন্য অবিলম্বে আরও সৈন্য পাঠালেন, যার সাহায্যে "কাম্পিলি" [১] অবরোধ করা হয়েছিল, যা প্রায় দুই মাস স্থায়ী হয়েছিল।

ইবনে বতুতা এই অদ্ভুত ও লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ এভাবে লিখেছেন:

"যখন রাজার সমস্ত খাদ্য মজুদ শেষ হয়ে গেল এবং তিনি ধরা পড়ার ভয় পেলেন, তখন তিনি বাহাউদ্দিনকে ডেকে বললেন, 'তুমি দেখছ কী ঘটছে। আমি নিজেকে এবং আমার পরিবারকে ধ্বংস করার সংকল্প করেছি।' তারপর তাকে অমুক রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর রায় কাম্পিলা একটি বিশাল আগুন জ্বালালেন এবং তার সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাতে ফেলে দিলেন এবং নিজের মেয়ে ও স্ত্রীদের বললেন, 'আমি পুড়ে মরতে চাই, যে আমার সাথে একমত হতে চায় সে হতে পারে।' ফলে প্রত্যেক নারী গোসল করে চন্দন মেখে রাজার সামনে এসে মাটিতে চুমু খেল এবং নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করল এবং ধ্বংস হয়ে গেল। তার সমস্ত আমির, উজির এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা চেয়েছিল তারাও আগুনে পুড়ে মারা গেল। এরপর রাজা গোসল করলেন এবং চন্দন মাখলেন এবং বর্ম (জেরাহ) ছাড়া সব অস্ত্রশস্ত্র পরে নিজের লোকদের নিয়ে সুলতানের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং সবাই যুদ্ধ করে মারা গেলেন। সুলতানের বাহিনী শহরে প্রবেশ করল এবং বাসিন্দাদের ও রাজার এগারো ছেলেকে বন্দী করে সুলতানের সামনে নিয়ে আসা হলো। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করল। সুলতান তাদের আভিজাত্য এবং তাদের পিতার বীরত্বের কারণে তাদের আমারাত পদ প্রদান করলেন। তাদের মধ্যে আমি তিনজনকে দেখেছি। একজনের নাম ছিল নাসির, দ্বিতীয়জনের বখতিয়ার এবং তৃতীয়জনকে মোহরদার বলা হয়। সুলতানের মোহর তার কাছেই থাকত। তার কুনিয়াত ছিল আবু মুসলিম এবং আমার সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল।"

যখন কাম্পিলার রাজা নিহত হলেন, তখন রাজকীয় বাহিনী সেই রাজার এলাকায় গেল যেখানে বাহাউদ্দিন আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই রাজা বাহাউদ্দিনকে বললেন: "আমি রায় কাম্পিলার মতো তোমাকে রক্ষা করতে পারব না" এবং বাহাউদ্দিনকে বাহিনীর হাতে তুলে দিলেন। তারা তাকে বেড়ি ও হাতকড়া পরিয়ে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিল। যখন তাকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো, তখন তিনি তাকে হেরেম সরায়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানে তার আত্মীয় মহিলারা তাকে গালিগালাজ করল এবং তার মুখে থুতু দিল। এরপর সুলতান নির্দেশ দিলেন যে, তার জীবিত চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হোক এবং তার মাংস চালের সাথে রান্না করে তার স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে পাঠানো হোক এবং বাকিটা একটি থালায় রেখে একটি হাতির সামনে দেওয়া হোক। হাতি তা খেল না। তখন চামড়া ছাড়িয়ে তাতে খড় ভর্তি করা হলো এবং বাহাউদ্দিন গুরশাস্পের চামড়ার সাথে তাকে সারা দেশে ঘোরানো হলো। [২]

এই একটি ঘটনা থেকেই সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি এবং জুলুম ও ত্রাসের লোমহর্ষক রূপ সামনে চলে আসে।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫৪; তারিখ-ই-মুবারক শাহী, পৃষ্ঠা ৯৫। অর্থাৎ ইয়াহইয়া সিরহিন্দি গুরশাস্পের বিদ্রোহের শেষে ৭২৭ হিজরির শেষের দিকের ঘটনা বলেছেন।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৫, ৩২৭।

কন্ধানা বিজয় (মধ্য ৭২৮ হিজরি):

দৌলতবাদে নিজের অবস্থান সুসংহত করে সুলতান চাইলেন দক্ষিণ ভারত সম্পূর্ণভাবে জয় করার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে। সেই সময়ে "কন্ধানা" [১] দুর্গের অপরাজেয় হওয়ার ব্যাপক খ্যাতি ছিল। এটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ছিল এবং নিকট অতীতে কোনো বিজয়ীর পক্ষে এটি জয় করা সম্ভব হয়নি। মুহাম্মদ তুঘলক এর ওপর আক্রমণ চালান এবং আট মাসের কঠোর অবরোধের পর এটি জয় করে তবেই দম নেন। যখন তিনি দৌলতবাদে ফিরে আসেন, তখন এই বিজয়ের ওপর বড় ধরনের উৎসব পালন করা হয়। [২]

কিশলু খানের বিদ্রোহ (শেষ ৭২৮ হিজরি):

মুহাম্মদ তুঘলক দেবগিরিতে সবেমাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, এমন সময় তাকে মুলতান ও সিন্ধুর প্রখ্যাত আমির বাহরাম আইবা (কিশলু খান)-এর বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হলো। এটি সেই কিশলু খান ছিলেন যার সাহায্যে মুহাম্মদ তুঘলকের পিতা দিল্লির সালতানাত লাভ করেছিলেন এবং এই কারণেই তিনি মাথায় রাজমুকুট পরতে ইতস্তত করছিলেন এবং কিশলু খানকে সুলতান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছিলেন, কিন্তু কিশলু খান তাকেই সিংহাসনে বসানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আজ সেই কিশলু খানই সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের সাথে বিবাদে জড়িয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন।

এই বিদ্রোহের দুটি প্রধান কারণ বর্ণনা করা হয়েছে:

(১) মুহাম্মদ তুঘলক পুরো সালতানাতের সমস্ত আমির ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এই আদেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন দৌলতবাদে নিজেদের প্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানে তাদের পরিবার-পরিজনের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করেন। মুলতানের শাসক কিশলু খান এটি পালন করেননি। অবশেষে সুলতানের পক্ষ থেকে আলী খাত্তাতী নামক এক মোগল কর্মকর্তাকে সেখানে পাঠানো হলো যাতে তিনি মুলতানের শাসকের পরিবার-পরিজনকে দৌলতবাদে নিয়ে আসেন। এই মোগল কর্মকর্তা অত্যন্ত অভদ্র ছিলেন, তাই সেখানে গিয়ে কিশলু খানের জামাতাকে ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন: "সুলতানের আদেশ সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে কেন দৌলতবাদে পাঠাওনি? তোমরা আদেশ পালনের ইচ্ছাই করোনি বরং তোমরা হারামজাদগি করছ।" জামাতা বললেন: "হারামজাদা কাকে বলছ?" আলী খাত্তাতী বললেন: "তাকে, যে ঘরে বসে আছে।" এটি শুনে আলী খাত্তাতী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হলো এবং ফলাফল এই দাঁড়ালো যে সুলতানের প্রতিনিধি নিহত হলেন। কিশলু খান, যিনি সুলতানের এই অযৌক্তিক দাবিতে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, এই হত্যাকাণ্ডের পর সুলতানের কাছ থেকে ক্ষমার আশা করতে পারছিলেন না। [৩]

(২) সেই দিনগুলোতে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বাহাউদ্দিন গুরশাস্পকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার চামড়া ছাড়িয়ে তা সারা দেশে প্রদর্শন করা হয়েছিল। অবশেষে এই চামড়া মুলতানে পৌঁছায়। কিশলু খান মানবিকতার খাতিরে সেই চামড়া দাফন করিয়ে দেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের কাছে এই খবর পৌঁছালে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং কিশলু খানকে নিজের কাছে তলব করেন যাতে তাকে হত্যা করা যায়। কিশলু খান...

---

[১] কন্ধানা দুর্গের বর্তমান নাম সিংহগড় দুর্গ। এটি ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে, পুনে শহরের কাছে অবস্থিত। এটি দেবগড় (দৌলতবাদ) থেকে প্রায় তিনশ কিলোমিটার দক্ষিণে, আর দিল্লি থেকে এর দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৫৬। এই দুর্গ বিজয়ের তারিখ কোথাও পাওয়া যায়নি। লেখক অনুমানের ভিত্তিতে এর সাল ৭২৮ হিজরি নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহু আলাম বিস-সওয়াব।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৫৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০০।

উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

বাদশাহর মেজাজ সম্পর্কে তিনি জানতেন, তাই যেতে অস্বীকার করলেন এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহে লিপ্ত হলেন। তিনি তুর্কি, আফগান ও খোরাসানিদের কাছেও সাহায্য চাইলেন যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এল, এভাবে তাঁর বাহিনী রাজকীয় বাহিনীর সমান বরং তার চেয়েও বেশি হয়ে গেল। [১] সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এই সংবাদ পেলে তাঁকে দৌলতাবাদে শান্তি ও স্বস্তি ত্যাগ করে নিজেই সসৈন্যে অভিযান চালাতে হলো। তিনি প্রথমে দিল্লি পৌঁছালেন এবং বড় ধরনের প্রস্তুতির সাথে সেখান থেকে মুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। [২]

অবশেষে মুলতান থেকে দুই মঞ্জিল দূরে উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। বাদশাহ এই বুদ্ধিমত্তা দেখালেন যে, রাজকীয় ছত্রের নিচে নিজের জায়গায় শেখ ইমাদউদ্দিনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যিনি শেখ রুকনউদ্দিন মুলতানি (রহ.)-এর ভাই ছিলেন। কারণ শেখ ইমাদউদ্দিন দেখতে অনেকটা বাদশাহর মতোই ছিলেন। যখন যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠল, তখন বাদশাহ চার হাজার সৈন্য নিয়ে ময়দানের এক প্রান্তে দূরে সরে গেলেন। এদিকে কিশলু খানের বাহিনী রাজকীয় ছত্রের কাছে গিয়ে শেখ ইমাদউদ্দিনকে হত্যা করল এবং এই কথা ছড়িয়ে পড়ল যে বাদশাহ নিহত হয়েছেন। ফলে যুদ্ধ থেমে গেল এবং উভয় বাহিনী পিছু হটল। কিশলু খানের কাছেও তখন মাত্র অল্প কিছু দেহরক্ষী সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। এমন সময় সুলতান সুযোগ বুঝে নিজের চার হাজার সৈন্যসহ কিশলু খানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে হত্যা করে মাথা কেটে ফেললেন। কিশলু খানের বাহিনী এই দৃশ্য দেখে পলায়ন করল। [৩]

বাদশাহ মুলতান শহরে প্রবেশ করলেন এবং মুলতানের কাজি করিমউদ্দিনকে বিদ্রোহীদের সহায়তার অপরাধে হত্যা করে তাঁর চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন এবং কিশলু খানের মাথা মুলতানের দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন। ইবনে বতুতা বলেন যে, আমি যখন মুলতানে পৌঁছাই, তখনও সেই মাথা সেখানেই ঝুলছিল। [৪] যেহেতু এই বিদ্রোহে মুলতানবাসী কিশলু খানের সহযোগী ছিল, তাই সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এরপর শহরে গণহত্যা চালানোর নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শাহ রুকন আলম (রহ.) নগ্ন মস্তকে সুলতানের কাছে উপস্থিত হলেন এবং সুপারিশ করে শহরবাসীর জন্য নিরাপত্তা লাভ করলেন। [৫] বাদশাহ শাহ রুকন আলম (রহ.) এবং শেখ সদরউদ্দিনকে একশটি গ্রাম পুরস্কার হিসেবে দিলেন যাতে তাঁরা তা দিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন এবং শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি (রহ.)-এর খানকাহর লঙ্গরখানা চালু রাখতে পারেন। [৬]

ফিরে যাওয়ার আগে সুলতান মুলতানে মালিক মকবুল কাওয়ামুল মুলককে গভর্নর নিযুক্ত করলেন। [৭] আল্লামা বারানি (রহ.)-এর মতে, এর আগে মুলতানের শাসনব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সুসংহত ও মজবুত ছিল। এরপর এই স্থানটি আর আগের মতো স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারেনি। [৮]

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২, পৃষ্ঠা ৩৭৫

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১, পৃষ্ঠা ৪৫৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০০। দ্রষ্টব্য: বাহরাম আইবা (কিশলু খান)-এর বিদ্রোহের সাল উল্লেখ নেই। লেখক আনুমানিক ৭২৮ হিজরি মনে করেছেন।

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: ২, পৃষ্ঠা ৩৭৫

[৪] (রেহলা ইবনে বতুতা: ২, পৃষ্ঠা ৩৭৫) সেই সময় পর্যন্ত কিশলু খানের হত্যার প্রায় ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছিল।

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১, পৃষ্ঠা ৪৫৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০০

[৬] রেহলা ইবনে বতুতা: ২, পৃষ্ঠা ৩৭৫

[৭] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১, পৃষ্ঠা ৪৫৭, ৪৫৮; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০০।

[৮] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৭৯

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের বিদ্রোহ (৭২৮ হিজরি)

সুলতান যখন বাহরাম আইবা (কুশলু খান)-কে দমনের জন্য বের হয়েছিলেন, তখন সেই সময়েই বাংলার শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহও বিদ্রোহ করেছিলেন এবং সুলতান তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন যা বিদ্রোহ দমন করেছিল। এই বিদ্রোহের বিবরণ আমরা বাংলার বিদ্রোহসমূহের অধীনে একত্রে সামনে (৭৩৯ হিজরি)-র ঘটনাবলীতে উল্লেখ করব।

দিল্লিতে অস্থায়ী দুই বছরের অবস্থান (৭২৯ হিজরি, ৭৩০ হিজরি):

মুলতান অভিযান থেকে ফেরার পর সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক বুঝতে পারলেন যে, তার দিল্লি থেকে দূরে থাকা উত্তর ভারতে ফিতনাকে আমন্ত্রণ জানানোর সমতুল্য। ফলে তিনি এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য দুই বছর দিল্লিতে অবস্থান করেন। এই সময়ে দরবারী এবং আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার সাথে ছিলেন, যদিও তাদের পরিবার-পরিজন নতুন রাজধানী দৌলতাবাদেই ছিল। [১]

মঙ্গোলদের আক্রমণ (৭২৯ হিজরি):

ইসলামী হিন্দুস্তানের সামরিক শক্তি দক্ষিণে কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং পাঞ্জাবে যোগ্য আমীরদের অভাব ও কোনো বড় সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতির কারণে উত্তরের অঞ্চলগুলো মঙ্গোলদের জন্য আবারও সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

ফলে ৭২৯ হিজরিতে চাগতাই বংশের নও-মুসলিম মঙ্গোল শাসক তারমা শিরিন খান হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন। [২]

এই মঙ্গোল যোদ্ধারা পেশোয়ার হয়ে সিন্ধু নদ পার হয়ে আসার সময় কোনো বিশেষ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। সে লাহোর থেকে সামানা পর্যন্ত লুটতরাজ করতে করতে এবং মানুষকে বন্দী করতে করতে এগিয়ে যায়। এমনকি সে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এখানে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধ হয় যাতে তারমা শিরিন পরাজিত হয়। সুলতানি বাহিনী “কালানৌর” [৩] পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করে যতক্ষণ না মঙ্গোল বাহিনী শতদ্রু (সুতলেজ) নদী পার হয়ে চলে যায়।

যাই হোক, মঙ্গোল আক্রমণকারীদের দিল্লি পর্যন্ত চলে আসা একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল এবং এটি প্রমাণ করছিল যে পাঞ্জাবে সালতানাতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই এরপর সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা এবং দুর্গগুলোর সুদৃঢ়করণের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেন এবং প্রতিরক্ষা...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৯; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ১৭৫; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০১। দ্রষ্টব্য: দিল্লিতে সুলতানের এই দুই বছরের অবস্থানের সময়কাল কোথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত পাওয়া যায়নি, তবে পারিপার্শ্বিক আলামত ও প্রমাণাদি এই দুই বছরকেই নির্দিষ্ট করে।

[২] তারমা শিরিন খানের আক্রমণকে ফেরেশতা ৭২৭ হিজরির এবং বাদাউনি ও ইয়াহইয়া সিরহিন্দি ৭২৯ হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। সুলতান এই যুদ্ধের আগে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন, যা থেকে দিল্লিতে সুলতানের দুই বছরের অবস্থানের সময়কাল ৭২৯ হিজরি এবং ৭৩০ হিজরি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া কুশলু খান (বাহরাম আইবা)-কে দমনের বছর ৭২৮ হিজরি নির্ধারিত হয়ে যায়, কারণ যতক্ষণ কুশলু খান জীবিত ছিলেন, তিনি পাঞ্জাবকে অত্যন্ত সুসংহত রেখেছিলেন এবং তখন মঙ্গোলরা পুরো পাঞ্জাবকে এত সহজে লুট করে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। আল্লামা বারনী জানান যে, পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরক্ষায় দুর্বলতা সুলতানের সাথে যুদ্ধে কুশলু খানের নিহত হওয়ার পর তৈরি হয়েছিল। (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৯) সুতরাং কুশলু খানের মৃত্যু ৭২৮ হিজরি এবং মঙ্গোলদের আক্রমণ ৭২৯ হিজরিতে নির্ধারিত হয়।

[৩] কালানৌর ভারতীয় পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটি শহর যা পাকিস্তান-ভারত সীমান্তের কাছে অবস্থিত। দিল্লি থেকে এটি প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার দূরে। দ্রষ্টব্য: এখানে ফেরেশতার বর্ণনা ভিন্ন, তিনি বলেন যে মুহাম্মদ তুঘলক তারমা শিরিনের মোকাবিলায় দমে গিয়েছিলেন এবং তিনি প্রচুর ধন-রত্ন ও মণি-মুক্তা পেশ করে নিজের রাজ্য বাঁচিয়েছিলেন। (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৩৯) লেখকের মতে এখানে বাদাউনি এবং ইয়াহইয়া সিরহিন্দি কর্তৃক গৃহীত বর্ণনাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

খুব মজবুত করে নিল।

দোয়াবে গণহত্যা (৭৩০ হিজরি):

সুলতান দৌলতাবাদকে আবাদ করার জন্য এত বেশি অর্থ ব্যয় করেছিলেন যে, এখন সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই সুলতান দিল্লিতে অবস্থানকালে দোয়াবের (গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) জমিদারদের ওপর ভারী কর আরোপ করে এই অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সুলতানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানির বর্ণনা অনুযায়ী, করের হার কোথাও দশ গুণ এবং কোথাও বিশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এত ভারী কর পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, তাই সুলতানের ক্রোধ থেকে বাঁচতে শত শত জমিদার এবং হাজার হাজার কৃষক অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের ফসলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তাদের অধিকাংশ গবাদিপশুসহ বন-জঙ্গলে ও পাহাড়ে গিয়ে যাযাবরের মতো জীবনযাপন করতে শুরু করে।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি স্থানীয় আমিরদের নির্দেশ দেন যে, যারা নিজেদের ফসলে আগুন দিয়েছে, তাদের খুঁজে বের করে কোনো বিলম্ব ছাড়াই হত্যা করা হোক। এভাবে দোয়াবের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। সুলতান নিজেও এই অভিযানে শামিল ছিলেন। তিনি এই মানুষদের শিকার করা শুরু করেন। ফসল পুড়িয়ে দেওয়ার পর তারা বনে লুকিয়ে ছিল। এই শিকারে প্রতিদিন ডজন ডজন লোক ধরা পড়ত এবং তাদের শিরশ্ছেদ করে তা প্রদর্শন করা হতো। সুলতান এই অভিযান বরন (বুলন্দশহর) থেকে কনৌজ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি সেই পুরো এলাকায় আগুনের শিখার মতো ঘুরছিলেন। এই অভিযানে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, যাদের মাথা দুর্গের প্রাচীরে ঝুলিয়ে রাখা হতো।

এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, এই বিশাল ও বিস্তৃত এবং সবুজ-শ্যামল ও উর্বর এলাকাটি সম্পূর্ণ জনশূন্য ও ধ্বংস হয়ে গেল এবং বছরের পর বছর ধরে এই জমিগুলো কোনো কর দেওয়ার যোগ্য রইল না। এভাবে সালতানাতের অর্থনীতি উত্তরোত্তর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেল। [২]

দক্ষিণ ভারতে নতুন কর:

দুই বছর (৭২৯ হিজরি, ৭৩০ হিজরি) দিল্লিতে কাটিয়ে সুলতান পুনরায় দৌলতাবাদে ফিরে আসেন। তিনি দৌলতাবাদ এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য বিজিত অঞ্চলগুলোতে, যেখানে মূলত মারাঠারা বসবাস করত, কঠোর কর আরোপ করেন এবং সেগুলো আদায়ের জন্য কঠোর কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করেন। অনেক দরিদ্র মানুষ কর পরিশোধ করতে পারছিল না; কর্মকর্তাদের বারবার তাগাদা এবং কঠোরতার কারণে তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। [৩]

বাগান থেকে ধোঁয়া উঠছে, দেখতে চলো

শাখাগুলোতে তপ্ত বিদ্যুতের নৃত্য দেখতে চলো

---

[১] (মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ১৫৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০১) বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সুলতানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা বারানি মঙ্গোলদের এই আক্রমণের কথা উল্লেখ করেননি।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৫৮, ৪৫০, ৪৫১; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮০

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮১

জ্বলছে কারো নীড় বাগানের মাঝে

হৃদয়ে হাজারো ভার নিয়ে দেখতে চলো [১]

প্রথম দুর্ভিক্ষ (৭৩১ হিজরি থেকে ৭৩৭ হিজরি)

সুলতানের এই কঠোরতার কারণে আল্লাহর রহমত এই দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। ঐতিহাসিক ফেরেশতার মতে, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে দুইবার খরা দেখা দিয়েছিল এবং প্রতিটি খরার সময়কাল ছিল প্রায় তিন বছর। এভাবে সুলতানের দীর্ঘ শাসনামলে ছয় বছর দুর্ভিক্ষে অতিবাহিত হয়। [২]

প্রথম দুর্ভিক্ষের বছরগুলো কোনটি ছিল? ঐতিহাসিক উৎসগুলোতে এর কোনো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে ধারণা করা হয় যে, এর সময়কাল ছিল রজব ৭৩২ হিজরি (এপ্রিল ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দ) থেকে রজব ৭৩৫ হিজরি (মার্চ ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত। সম্ভবত খরা এবং ফলন হ্রাস ৭৩১ হিজরিতেই প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু এই সময়ে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য কাজে এসেছিল এবং আশা ছিল যে ৭৩৪ হিজরির রবি শস্যের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু যখন এই ফসলও নষ্ট হয়ে গেল এবং সংরক্ষিত খাদ্যশস্যও ফুরিয়ে গেল, তখন খাদ্য সংকট প্রকটভাবে প্রকাশ পেল।

দুর্ভিক্ষের তীব্রতা দোয়াব, পূর্ব পাঞ্জাব এবং মালবে সবচেয়ে বেশি ছিল। দক্ষিণ ভারত এবং গঙ্গা নদীর পূর্বদিকের এলাকাগুলো নিরাপদ ছিল। দুর্ভিক্ষের একটি কারণ ছিল সুলতানের ধার্যকৃত উচ্চ ভূমি রাজস্ব (খাজনা), যার ফলে কৃষকরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেত অথবা সুলতান তাদের হত্যা করতেন। এটা স্পষ্ট যে, যখন কোনো এলাকায় কৃষকই থাকবে না, তখন শস্য কোথা থেকে আসবে?

দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, সুলতান যখন দোয়াবে হত্যা ও লুণ্ঠনের অভিযান শুরু করেন, তখন থেকেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আকাশ থেকে এক ফোঁটা পানিও পড়েনি এবং মাটি থেকে কোনো শস্যও জন্মায়নি। [৩]

সেচ কাজের জন্য অনুদান:

এই অবস্থা দেখে সুলতান রাজকোষ থেকে কৃষকদের জন্য অনুদান জারি করেন যাতে তারা কুয়া খনন করে ভূগর্ভস্থ পানি চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতই অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তারা অনুদানের অর্থ খাবারের পেছনে ব্যয় করে ফেলে। তা সত্ত্বেও কিছু কুয়া খনন করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলো থেকে বিশেষ কোনো উপকার হয়নি কারণ বৃষ্টির অভাবে অধিকাংশ জায়গায় মাটির স্তর শুষ্ক ছিল এবং পানি অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল। [৪]

দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি—দৌলতাবাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত এবং নতুন নিয়োগ:

৭৩৫ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে (বসন্ত ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ) বৃষ্টি শুরু হয় এবং হিন্দুস্তানের বাসিন্দারা যেন নতুন জীবন ফিরে পায়। অন্যদিকে...

---

[১] হাবিব জালিব

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৬৪

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮০, ৪৮১

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮২, ৪৮৩; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৬০; মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ১৫৬

সুলতানও স্থায়ীভাবে দিল্লি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, যারা দিল্লি ফিরে যেতে চায় তারা চলে যাক এবং যারা এখানেই থাকতে পছন্দ করে তারা থাকতে পারে। ফলে দৌলতাবাদে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ বড় বড় কাফেলার আকারে ফিরে যেতে শুরু করলেন। তবে অনেক লোক দৌলতাবাদে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। কেউ কেউ এই শহর পছন্দ করেছিলেন, আবার কেউ কেউ বারবার স্থানান্তরের কষ্ট সহ্য করতে চাচ্ছিলেন না।

সুলতান রাজধানী দিল্লি যাওয়ার পূর্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন:

- মালিক কবুল (নায়েব উজির)-কে "তেলেঙ্গানা"-র শাসনভার অর্পণ করেন।
- নিজের উস্তাদ তুঘলক খানকে দৌলতাবাদ এবং সমগ্র মারাঠওয়াড়ার শাসক নিযুক্ত করেন।
- শিহাবুদ্দিন নুসরাত খানকে "বিদার" ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গির এই শর্তে প্রদান করেন যে, তিনি তিন বছরে এক কোটি তঙ্কা রাজকোষে পাঠাবেন। [১]

সুলতানের মাতা ও উজিরের দিল্লি আগমন:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক তাঁর মাতা মাখদুমা-এ-জাহান, উজির, কাজীউল কুজাত, বেশ কয়েকজন বড় উমারা এবং অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও দাস-দাসীকে তাঁর প্রস্থানের দুই-তিন মাস আগেই দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা শহরের ব্যবস্থাপনা বুঝে নেন এবং লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

ইবনে বতুতা, যিনি ৭৩৫ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে দিল্লি এসেছিলেন, তিনি জানান যে, তিনি যখন দিল্লি পৌঁছান তখন সুলতান সেখানে ছিলেন না। তবে সুলতানের মাতা মাখদুমা-এ-জাহান, উজির খাজা জাহান আহমদ আয়াজ, তাঁর ভাই মাওলানা কওয়ামুদ্দিন ও মাওলানা ইমাদুদ্দিন এবং কাজীউল কুজাত কামালুদ্দিন সদর-এ-জাহান প্রমুখ সেখানে ছিলেন। সালতানাতের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইবনে বতুতাকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং সুলতানের মাতার পক্ষ থেকে ভোজের আয়োজনও করা হয়। [২]

রাজধানী দৌলতাবাদ থেকে পুনরায় দিল্লি (৭৩৫ হিজরি):

৭২৭ হিজরি থেকে ৭৩৫ হিজরি (১৩২৭ খ্রি. থেকে ১৩৩৫ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় আট বছর যাবত রাষ্ট্রীয় রাজনীতি দৌলতাবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে, কিন্তু এখন সুলতান দিল্লি ফিরে যাচ্ছিলেন। শাবান ৭৩৫ হিজরিতে (এপ্রিল ১৩৩৫ খ্রি.) সুলতানের প্রত্যাবর্তন ঘটে। ফেরার পথে...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ২৫৯।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৯০, ৩৯১।

ফায়দা: ইবনে বতুতা তাঁর দিল্লিতে প্রবেশের সময় উল্লেখ করেননি, তবে তিনি সিন্ধু নদ পার হয়ে হিন্দুস্তান সালতানাতে প্রবেশের তারিখ ১লা মহররম ৭৩৪ হিজরি বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহর (সিওয়ান, লাহোরি বন্দর, ভাক্কার, উচ, মুলতান, আজোধন, সিরসা এবং হাসি ইত্যাদি) সফর করেন। কোনো কোনো স্থানে কয়েক দিন এবং কোনো কোনো স্থানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করে উমারা, উলামা, ফুকাহা এবং আউলিয়াদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এভাবে সিন্ধু ও পাঞ্জাব ভ্রমণে প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত করে ৭৩৫ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে দিল্লিতে পদার্পণ করেন। সুলতান সেখানে ছিলেন না, তবে ইবনে বতুতার প্রতিটি গতিবিধির খবর তিনি আগেই পাচ্ছিলেন এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কর্মকর্তাদের নির্দেশনা পাঠাচ্ছিলেন। ইবনে বতুতা দিল্লি পৌঁছানোর দেড় মাস পর তাঁর এক বছরের কম বয়সী এক কন্যা মারা যায়। উজির বাদশাহকে খবর পাঠান, যিনি তখন শহর থেকে কয়েক মঞ্জিল দূরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। পরের দিন সন্ধ্যায় বাদশাহর জবাব আসে। বাদশাহ ইবনে বতুতার কন্যার জন্য একটি জায়গিরের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন। (রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৫২, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪ থেকে ৩৯৮)।

আমি যখন মালব অতিক্রম করছিলাম, তখন স্থানে স্থানে ক্ষেতগুলোতে ধুলো উড়তে দেখেছি। দুর্ভিক্ষের তিন বছরে এখানকার কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দোয়াবের কৃষি আগেই বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। শস্য অত্যন্ত মহার্ঘ হয়ে গিয়েছিল। মোদ্দাকথা, এই দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে সুলতান তাঁর লস্কর, ভৃত্য, কর্মকর্তা ও সৈন্যদের নিয়ে দিল্লির দিকে যাচ্ছিলেন। [১]

৪ শাওয়াল সুলতান দিল্লির সাত মাইল দক্ষিণে কাসরে তালপাতে এসে অবস্থান করেন। এখানেই প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা প্রথমবার সুলতানের দরবারে উপস্থিত হন। কয়েকবার সাক্ষাতের পর বাদশাহ ইবনে বতুতাকে দিল্লির কাজি নিযুক্ত করেন এবং বারো হাজার দিনার বার্ষিক বেতন নির্ধারণ করেন। [২]

দূরবর্তী লক্ষ্য, ব্যর্থ অভিযানসমূহ

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের মস্তিষ্ক খুব দ্রুত চলত এবং তিনি নিত্যনতুন পরিকল্পনার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাড়াহুড়ো করার স্বভাবের কারণে তিনি এমন কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন যার ফলে সময় ও সম্পদ উভয়ই অপচয় হয়েছিল। নিচে এ ধরনের কিছু পরিকল্পনার উল্লেখ করা হলো:

ইরাক ও মধ্য এশিয়া বিজয়ের পরিকল্পনা (৭৩৭ হিজরি):

দুর্ভিক্ষ শেষ হলে কৃষির সুদিনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নতিও নতুন করে শুরু হয় এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব জমা হতে থাকে। এভাবে দেশ আবারও সমৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করে।

এই সময়ে মধ্য এশিয়ার কিছু আমির তাদের বাদশাহ তারমা শিরিন খানের অবাধ্য হয়ে দিল্লিতে চলে এসেছিলেন। তাঁদের পরামর্শে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক ঘরে বসেই ইরান, খোরাসান ও মধ্য এশিয়া জয় করার সংকল্প করেন এবং বিপুল অর্থ ব্যয় করে তিন লক্ষ সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সমন্বয়ে একটি নতুন বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো এত দীর্ঘ দূরত্বে ছিল যে, বাস্তব পরিকল্পনা করতে করতেই সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই অভিযানের সুযোগ আর আসেনি এবং সেনাবাহিনী ছাউনিগুলোতে অবস্থান করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ওপর অসহনীয় বোঝার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৬০।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪ থেকে ৩৯৮।

ফায়দা: তালপাত দিল্লির দক্ষিণে ফরিদাবাদ জেলায় অবস্থিত।

ফায়দা: সুলতানের দৌলতাবাদ থেকে রওনা হওয়া এবং দিল্লি পৌঁছানোর তারিখ লেখক ইবনে বতুতার বিভিন্ন বর্ণনা সামনে রেখে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে, সুলতান ৪ শাওয়াল দিল্লির উপকণ্ঠে পৌঁছেছিলেন। দৌলতাবাদ থেকে দিল্লির দূরত্ব ছিল চল্লিশ দিনের। যদি সুলতান পথে বিরতি নিয়ে এই সফর করে থাকেন, তবে আনুমানিক সফরটি দুই মাসের হয়।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৫০, ৪৫২; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৬, ৪৭৭।

https://t.me/BoierSomahar

চীন বিজয়ের স্বপ্ন - অগণিত সম্পদের অপচয় (৭৩৮ হিজরি, ৭৩৯ হিজরি):

সুলতান ভাবলেন যে, দীর্ঘ দূরত্বের কারণে ইরান, খোরাসান এবং মধ্য এশিয়ায় সামরিক অভিযান চালানো কঠিন, তাই এই বিশাল বাহিনীর মাধ্যমে কেন চীন জয় করা হবে না যা ভারতের সাথে সংযুক্ত এবং কেবল হিমালয় পর্বতমালা মাঝখানে অন্তরায় হয়ে আছে। ফলে উল্লিখিত বিশাল বাহিনীকে চীন বিজয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। এই সময়ে কিছু দূরদর্শী উপদেষ্টা সুলতানকে বোঝালেন যে, আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো শাসক চীন জয় করতে সফল হননি, কিন্তু মুহাম্মদ তুঘলক নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং নিজের ভাগ্নে খসরু মালিককে এক লক্ষ সৈন্য দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, প্রথমে চীনের সীমান্তবর্তী এলাকা হিমালয় "হিমাচল" জয় করে নিতে।

পরিশেষে ৭৩৮ হিজরিতে এই বাহিনী রওনা হলো কিন্তু সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর পথের অত্যন্ত দুর্গম ও জটিল হওয়ার বিষয়টি আঁচ করা গেল যা পথপ্রদর্শক ছাড়া অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। বাহিনী যখন হিমালয় পর্বতের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল, তখন মুষলধারে বৃষ্টি গজব হয়ে ঝরতে লাগল। এরপর তুষারপাতের তীব্রতা বাহিনীকে ধ্বংস করে দিল এবং খাদ্য ও রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থা দেখে পথপ্রদর্শকরাও পালিয়ে গেল এবং বাহিনী চরম সংকটের শিকার হলো।

ওদিক থেকে পাহাড়ি উপজাতিরা উচ্চতা থেকে পাথর নিক্ষেপ করে সৈন্যদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে লাগল। হাজার হাজার সৈন্য তাদের হাতে নিহত এবং হাজার হাজার বন্দি হলো। বাকিরা অগোছালোভাবে পিছু হটে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে যারা অল্প কয়েকজন কোনোভাবে দিল্লিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল, সুলতান তাদের রণক্ষেত্র থেকে পালানোর অপরাধে হত্যা করালেন। মোদ্দাকথা, এই অভিযান জান ও মালের দিক থেকে চরম ক্ষতির কারণ হলো এবং সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক পুনরায় এমন সুশৃঙ্খল ও শ্রেষ্ঠ বাহিনী আর লাভ করতে পারেননি। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৫২, ৪৫৩; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ১৫৯; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৭, ৪৮০; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০৩, ১০৪। ধারণা করা হয় যে, এই বাহিনী প্রায় সেই পথেই গিয়েছিল যে পথে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি সপ্তম হিজরি শতকের শুরুতে তিব্বতের দিকে সৈন্য চালনা করেছিলেন এবং সেই অভিযানটিও একইভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা

চীনকে জয় করার স্বপ্ন এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো যে, এর সাথে সাথে দিল্লির সামরিক শক্তিও স্পষ্টভাবে হ্রাস পেল। বিশেষ করে সুলতানের জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ আমীরগণ একে সুলতানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সর্বোত্তম সুযোগ মনে করলেন এবং তারা জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহ শুরু করে দিলেন, যার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হচ্ছে:

বাংলায় বিদ্রোহ (৭৩৭ হিজরি থেকে ৭৪০ হিজরি):

মুহাম্মদ তুঘলকের পিতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বাংলা (সোনারগাঁও) আক্রমণ করে সেখানকার শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে বন্দী করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ৭২৫ হিজরিতে মুহাম্মদ তুঘলক যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি এই বন্দী বাদশাহকে মুক্তি দেন এবং অনেক ধন-সম্পদ, ঘোড়া ও হাতি দিয়ে পুনরায় বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন। তার সাথে নিজের পালক ভাই বাহরাম খানকে পাঠান এবং এই অঙ্গীকার নেন যে, তারা দুজনে মিলে রাজত্ব করবেন এবং মুদ্রায় উভয়ের নাম অঙ্কিত থাকবে এবং খুতবায় উভয়ের নাম পাঠ করা হবে। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের কাছ থেকে এই অঙ্গীকারও নিয়েছিলেন যে, তিনি তার পুত্র মুহাম্মদকে জামিন হিসেবে দিল্লিতে পাঠাবেন।

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর বাংলায় চলে যান এবং এই সমস্ত শর্তাবলী পালনও করেন, কিন্তু নিজের পুত্রকে বাদশাহর কাছে পাঠাননি এবং এই ওজর পেশ করেন যে, সে কথা মানছে না এবং অবাধ্যতা করছে। অবশেষে মুহাম্মদ তুঘলক তার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠান, যারা ৭২৮ হিজরিতে গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করে হত্যা করে। রাজকীয় নির্দেশ অনুযায়ী তার চামড়া ছাড়িয়ে তাতে খড় ভরে পুরো দেশে ঘোরানো হয়। [১]

এরপর পশ্চিম বাংলায়, যার কেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও, ৭৩৯ হিজরি পর্যন্ত বাহরাম খানের শাসন বহাল ছিল। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায়, যার কেন্দ্র ছিল লখনৌতি, দিল্লি সালতানাতের দ্বিতীয় নায়েব কদর খান ৭৩৭ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন এবং সেখানে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল।

৭৩৭ হিজরিতে মালিক ফখরুদ্দিন নামক এক শক্তিশালী আমীর বিদ্রোহ করেন এবং কদর খানকে হত্যা করে লখনৌতি দখল করে নেন এবং সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করেন। এরপর তিনি সোনারগাঁও দখলের চেষ্টা করেন এবং ৭৩৯ হিজরিতে সেখানেও দখল প্রতিষ্ঠা করেন।

মোটকথা, বাংলায় পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটে যে সোনারগাঁও, সাতগাঁও এবং লখনৌতি—তিনটি প্রাদেশিক কেন্দ্রই দিল্লি সালতানাতের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ফখরুদ্দিন সোনারগাঁওকে নিজের কেন্দ্র বানান, অন্যদিকে লখনৌতিতে ৭৩৭ হিজরি থেকে তার গোলাম 'মুখলিস' তার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

---

[১] (রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪) গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পৌত্র এবং বুগরা খানের পুত্র। ৭২৫ হিজরিতে কয়েক মাস বন্দী থাকার সময়টুকু বাদ দিলে তার শাসনকাল ৭২৪ হিজরি থেকে ৭২৮ হিজরি (১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ছিল।

৭৪০ হিজরিতে একটি বিপ্লব ঘটে এবং বাংলার এক আমির আলী মুবারক 'মুখলিস'কে হত্যা করে লখনৌতিকে নিজের রাজ্যে পরিণত করেন। আলী মুবারক বাদশাহীর কোনো চিহ্ন প্রকাশ করেননি বরং সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আবেদন করেন যে, তিনি বাংলা সামলে নিয়েছেন কিন্তু সুলতানের প্রতিনিধিত্বের জন্য দিল্লি থেকে কোনো আমির পাঠানো হলে তা অনুগ্রহ হবে। সুলতান, যিনি বিদ্রোহ দমন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এই ব্যবস্থা পছন্দ করেন এবং সেখানে নিজের একজন নায়েব পাঠান।

কিছু সময় পর সেই নায়েবের মৃত্যু হলে সুলতান আর কোনো নায়েব পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে আলী মুবারক 'আলাউদ্দিন' উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। কিছুকাল পর মালিক ইলিয়াস হাজি নামক এক স্থানীয় আমির তাকে হত্যা করেন এবং লখনৌতির সুলতান হন। ৭৪২ হিজরিতে তিনি সোনারগাঁও দখল করে মালিক ফখরউদ্দিনকেও সরিয়ে দেন।

এই সময়ে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলককে দক্ষিণ ভারতে সৈয়দ আহসানের বিদ্রোহ এবং তারপর দুর্ভিক্ষের মতো গুরুতর সমস্যায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে হয় যে বাংলার ওপর সামরিক অভিযান স্থগিত হয়ে যায়। এভাবে পুরো বাংলা দিল্লির সালতানাতের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং সেখানে স্বাধীন সরকারগুলোর এমন এক ধারা শুরু হয় যা ভারতে মুঘল সালতানাত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। [১]

দক্ষিণ ভারতে সৈয়দ আহসানের বিদ্রোহ (৭৩৯ হিজরি):

সুলতান বাংলা এবং বিশেষ করে লখনৌতির দিকে অভিযানের পরিকল্পনা করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ খবর পান যে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য 'মাবর' (তামিলনাড়ু)-এ সৈয়দ জালালউদ্দিন আহসান শাহ কাইতলি বিদ্রোহ করেছেন। তিনি একজন নামকরা ও সম্মানিত আমির ছিলেন যার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে অনেক আমির তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

বাদশাহীর ঘোষণা দিয়ে তিনি নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন যার একপাশে এই ইবারত ছিল:
"সুলালাতু ত্বহা ওয়া ইয়াসিন, আবুল ফুক্কারা ওয়াল মাসাকিন, জালালুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন"
এবং অন্যপাশে খোদাই করা ছিল: "আল-ওয়াসিকু বি-তাইয়িদুর রহমান আহসান শাহ আস-সুলতান"। [২]

সুলতান সৈয়দ আহসানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলে তার আগে তার পুত্র সৈয়দ ইব্রাহিম খরিতাদারকে পরিবারসহ বন্দি করেন। [৩]

সুলতান এই অভিযানের জন্য নিজের উজির আহমদ আয়াজকে আগে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে 'কুশক-ই-জর' নামক স্থানে আট দিন অবস্থান করেন।

---

[১] (তারিখ-ই-মুবারক শাহী আজ সিরহিন্দি: পৃ. ১০৪, ১০৫) আল্লামা বারনির মতে বাংলায় বিদ্রোহ দোয়াবের প্রথম দুর্ভিক্ষের সময় হয়েছিল। (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮০) কিন্তু এটি সঠিক নয়। ইয়াহিয়া সিরহিন্দি বাংলার বিদ্রোহগুলোকে ৭৩৭ হিজরি থেকে ৭৪০ হিজরি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন যা অধিকতর সঠিক মনে হয়।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৪৭৭।

[৩] (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮০) তাকে খরিতাদার এজন্য বলা হতো যে শাহী কলম ও কাগজপত্রের তদারকি তার দায়িত্বে ছিল এবং তিনি হাসি ও সিরসার শাসকও ছিলেন। তিনি নিজের কন্যাকে ইবনে বতুতার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী অত্যন্ত নেককার ও পরহেজগার ছিলেন এবং সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন যে সুলতান যখন সৈয়দ আহসানের বিরুদ্ধে অভিযান থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি কিছু সময় পর সৈয়দ ইব্রাহিমকে কোনো এক অজুহাতে হত্যা করিয়ে দেন। (রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৪৭৯)

সাজ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করতে থাকলেন। এদিকে আহমদ আয়াজ দিল্লি থেকে চব্বিশ মঞ্জিল দূরে মালওয়ার রাজধানী ধার [১]-এ গিয়ে অবস্থান নিলেন।

তাঁর সাথে তাঁর চতুর ভাগ্নেও ছিল। সে কয়েকজন আমিরের সাথে মিলে এই ষড়যন্ত্র করল যে, আহমদ আয়াজ যখন জুমার নামাজের জন্য বের হবেন, তখন তাঁকে হত্যা করে সমস্ত ধন-সম্পদ ও কোষাগার লুট করে নেবে এবং সৈয়দ আহসানের কাছে 'মা'বার'-এ গিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রে শরিক এক আমির নুসরাত হাজিব ঠিক সময়ে আহমদ আয়াজকে খবর দিয়ে দিলেন এবং জানালেন যে, এই লোকেরা বর্তমানে তাদের পোশাকের নিচে লোহার বর্ম পরে আছে, যা বিদ্রোহের স্পষ্ট প্রমাণ। আহমদ আয়াজ তৎক্ষণাৎ তাদের ডেকে পাঠালেন এবং তল্লাশি নিলেন, দেখা গেল সত্যিই তারা পোশাকের নিচে বর্ম পরে আছে। আহমদ আয়াজ তাদের গ্রেপ্তার করে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সুলতান আহমদ আয়াজের ভাগ্নেকে তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, তুমি নিজেই তাকে হত্যা করো। এরপর সুলতান বাকি ষড়যন্ত্রকারী আমীরদের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী, সেদিন যখন আমি মাগরিবের পর বাদশাহর প্রাসাদ থেকে বের হলাম, তখন সেই নিহত আমীরদের মাংস কুকুরদের খাওয়ানো হচ্ছিল এবং তাদের চামড়ায় খড় ভরা হচ্ছিল। [২]

সুলতানের দিল্লি থেকে গুজরাট যাত্রা (জমাদি উল উলা ৭৩৯ হিজরি):

এরপর সুলতান দিল্লির ব্যবস্থাপনার জন্য আহমদ আয়াজকে ফিরিয়ে আনলেন এবং নিজে জমাদি উল উলা ৭৩৯ হিজরি (নভেম্বর ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ) মাসে দৌলতাবাদে রওনা হলেন যাতে সেখান থেকে আরও সৈন্য নিয়ে 'মা'বার'-এর বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে পারেন। [৩]

লাহোরে বিদ্রোহ (মধ্য ৭৩৯ হিজরি):

বাদশাহ দৌলতাবাদে পৌঁছালে পেছনে মালিক হালাজুন লাহোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শাসক মালিক তাতারকে হত্যা করে শহর দখল করে নেন। এই বিদ্রোহে আমির গুল চান্দ তাঁর বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন, ফলে মালিক হালাজুন তাকেই নিজের উজির বানিয়ে নেন।

উজির-এ-সালতানাত আহমদ আয়াজ (খাজা জাহান), যিনি সে সময় দিল্লিতে ছিলেন, এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ সুলতানকে পাঠান এবং নিজে দিল্লির সৈন্যবাহিনী ও অনেক খোরাসানিকে নিয়ে লাহোরের দিকে ছুটে যান। ওদিকে সুলতান মালিক কায়সারান সফদর এবং মালিক তৈমুর শারাবদারকে তাঁর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। লাহোরের বাইরে রাভি নদীর তীরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে হালাজুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান এবং তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নদীতে ডুবে মারা যায়।

---

[১] ধার (Dhar) ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এটি একটি মালভূমিতে অবস্থিত। দিল্লি থেকে এটি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৫৭০ কিলোমিটার দূরে। প্রাচীনকালে এটি পরমার রাজবংশের রাজাদের রাজধানী ছিল। আলাউদ্দিন খিলজি ৮০৪ হিজরি (১৩০১ খ্রিস্টাব্দ) সালে মালওয়া জয় করলে ধার-ও দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮, ৩৭৮।

[৩] (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০৬) যেখানে আল্লামা বারানি (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮০, ৪৮১) সুলতানের এই সফরের সময়কাল ৭৪২ হিজরি উল্লেখ করেছেন। লেখকের মতে, সৈয়দ আহসানের বিদ্রোহ ৭৩৯ হিজরিতে হয়েছিল এবং সেই বছরই সুলতান দৌলতাবাদ সফর করেছিলেন এবং এটিই ছিল দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের সূচনালগ্ন। কারণ ইবনে বতুতা এই তিন বছরের দুর্ভিক্ষের সময় ভারতে ছিলেন, যার বিবরণও তিনি দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার পর সফর ৭৪৩ হিজরিতে তিনি ভারত থেকে বিদায় নেন। সেই হিসেবে দুর্ভিক্ষের সূচনা ৭৩৯ হিজরি (জমাদি উল উলা)-তে হয়।

আহমদ আয়াজ শহরে প্রবেশ করে শহরের কিছু অধিবাসীকে, যারা বিদ্রোহে সহায়তার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল, গ্রেপ্তার করে তাদের চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন এবং কারো কারো শিরশ্ছেদ করলেন। বিদ্রোহীদের প্রায় তিনশ নারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাদের গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আহমদ আয়াজ কিছুকাল লাহোরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঠিক করার পর ফিরে আসেন। [১]

মহামারীর কারণে সুলতানের ওয়ারাঙ্গল অভিযান ব্যর্থ (৭৩৯ হিজরির শেষভাগ):

এই সময়ে সুলতান দৌলতাবাদে সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতি নিয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রওনা হয়েছিলেন। তেলেঙ্গানা হয়ে তিনি 'ওয়ারাঙ্গল' (কর্ণাটক) পৌঁছান এবং 'মা'বার' (তামিলনাড়ু) আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। কিন্তু সুলতান পৌঁছানোর দশ দিন আগে ওয়ারাঙ্গলে একটি মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে রাজকীয় বাহিনী সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথেই সৈন্যরা অসুস্থ হতে শুরু করে। অনেক আমির এবং স্বয়ং বাদশাহর স্বাস্থ্যও প্রভাবিত হয়। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী, "অধিকাংশ সৈন্য মারা গিয়েছিল, গোলাম থেকে শুরু করে বড় বড় আমির পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে সুলতানের পালক চাচা দৌলত শাহও ছিলেন।"

অবশেষে সুলতান এই অভিযানটিও স্থগিত করে দেন। বিজিত এলাকাগুলো তার প্রতিনিধিদের হাতে সোপর্দ করে তিনি নিজে ফিরে যান এবং গুজরাটের রাজধানী পত্তন (আনহিলওয়ারা-নাহরওয়ালা)-এ অবস্থান করে নিজের চিকিৎসা করাতে শুরু করেন। [২]

সুলতান বা তার প্রতিনিধিরা সৈয়দ আহসানের বিদ্রোহ দমনের জন্য পুনরায় সৈন্য পরিচালনার সুযোগ পাননি এবং সৈয়দ আহসান জালালুদ্দিন খান সেখানে শাসন কায়েম রাখেন। তার বিজিত বা অধিকৃত এলাকা ছিল 'মাদুরাই' শহর এবং এর আশপাশের অঞ্চল। আহসান খানের পর তার বংশধরদের মধ্য থেকে সাতজন বাদশাহ এখানে শাসন করেন। ৭৮০ হিজরিতে (১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) এখানকার শেষ সুলতান আলাউদ্দিন সিকান্দার শাহকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বাহিনী পরাজিত করে এই সালতানাতের অবসান ঘটায়।

একই অবস্থায় কোনো কিছুর স্থিতি থাকে না
নতুনত্বের স্বাদই হলো মহাকালের মেজাজের গঠন
জগতের লবণাক্ততার সৌন্দর্য সর্বদা নতুন নামে
ধরিত্রী মাতা সর্বদা নতুন জাতিসমূহের গর্ভধারিণী
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] (রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৮; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০৬) ইবনে বতুতা এই বন্দি নারীদের কয়েকজনকে গোয়ালিয়র দুর্গে দেখেছিলেন।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮১; রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৮

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

পুনরায় দুর্ভিক্ষ (মধ্য ৭৩৯ হিজরি থেকে শেষ ৭৪১ হিজরি)

৭৪০ হিজরির শুরুতে যখন সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সৈয়দ আহসানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য দিল্লি থেকে বের হন, তখন সেই দিনগুলোতে দিল্লি, দোয়াব এবং পাঞ্জাবে দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। লক্ষণগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এর সময়কাল ছিল জমাদি-উল-আউয়াল ৭৩৯ হিজরি (নভেম্বর ১৩৩৮ খ্রি.) থেকে শাওয়াল ৭৪১ হিজরি (মার্চ ১৩৪১ খ্রি.) পর্যন্ত। অর্থাৎ এর স্থায়িত্ব ছিল আড়াই বছর। দোয়াব, দিল্লি ও দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকা, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারত, গুজরাট এবং বাংলা এবারও দুর্ভিক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। [১]

ইবনে বতুতা এই দুর্ভিক্ষের সময় দিল্লিতে ছিলেন। তিনি সুলতানের দক্ষিণ ভারত সফরের তারিখ ৯ জমাদি-উল-আউয়াল উল্লেখ করেছেন। [২]

দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন:
“সুলতানের মা’বার অভিযানের কারণে রাজধানী থেকে অনুপস্থিতির দিনগুলোতে প্রচণ্ড দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এক মণ (৩৭.৫ কেজি) গমের দাম ষাট দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। আমি একদিন উজিরের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম যে, তিনটি মহিলা এমন একটি ঘোড়ার চামড়া কেটে খাচ্ছে যা ছয় মাস আগে মারা গিয়েছিল। সেই দিনগুলোতে চামড়া রান্না করে বাজারে বিক্রি করা হতো। মানুষ যখন কোনো গরু জবাই করত, তখন তার রক্তও পান করে নিত। খোরাসানের কিছু ছাত্র আমাকে জানিয়েছে যে, তারা ‘আগরওয়াহা’ শহরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সেটিকে সম্পূর্ণ জনশূন্য দেখতে পায়। তারা সেখানে একটি বাড়িতে রাত কাটানোর জন্য থামলে এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় যে আগুনের ওপর একটি মানুষের পা পুড়িয়ে খাচ্ছিল।” [৩]

জীবন কত কঠিন, মৃত্যু কত সহজ ..... অস্তিত্বের বাগানে বসন্তের বাতাসের মতো সস্তা হলো মৃত্যু
ভূমিকম্প আছে, বিদ্যুৎ আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, আছে যন্ত্রণা ..... কাল-মাতার কেমন সব কন্যা এরা!
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] এই দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের বছরগুলো কোনটি ছিল? আল্লামা বারানি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। তবে ইয়াহইয়া সিরহিন্দি ৭৪২ হিজরির ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: ‘সেই দিনগুলোতে দিল্লিতে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল।’ (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০৬) এরপর ৭৪৩ হিজরির ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: ‘সেই দিনগুলোতে শহরে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ছিল, এমনকি মানুষ মানুষকে খাচ্ছিল।’ (পৃ. ১০৭) অর্থাৎ সিরহিন্দির কালানুক্রম অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষ ৭৪২ হিজরি থেকে ৭৪৪ হিজরি পর্যন্ত ছিল। কিন্তু ইবনে বতুতার বর্ণনা সামনে রাখলে, যা প্রত্যক্ষদর্শী পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এবং যৌক্তিক প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দুর্ভিক্ষের সূচনা জমাদি-উল-আউয়াল ৭৩৯ হিজরিতেই হয়।

[২] জমাদি-উল-আউয়ালের নয় তারিখে সুলতান মা’বার অঞ্চল অভিমুখে এবং সেখানে অবস্থানকারীর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। (রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃ. ৩০৪)

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৮৯

সুলতান এই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছর (৭৩৯ হিজরি) সৈয়দ আহসানের বিদ্রোহ দমনের জন্য দৌলতাবাদ ও তেলেঙ্গানায় অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিজের চিকিৎসা করাতে থাকেন, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাহু লোধির দমন (মধ্য ৭৪০ হিজরি):

সুলতানের শরীর তখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি যখন তাকে দৌলতাবাদ থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হতে হলো, কারণ পাঞ্জাবে একজন আফগান সরদার শাহু লোধি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এমন যে, মুলতানের শাসক বাহরাম আইবার বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান সেখানে কওয়ামুল মুলককে নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। কিছুদিন পর তাকে অপসারণ করে বেহজাদ নামক এক আমিরকে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু কোনো আমিরই পাঞ্জাব সরকারকে বাহরাম আইবার মতো সুরক্ষিত ও সুশৃঙ্খল রাখতে পারেননি। ফলে আফগান সরদার শাহু লোধি এর সুযোগ গ্রহণ করেন এবং মুলতানের আমির বেহজাদকে হত্যা করে মুলতানে নিজের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান দিল্লিতে পৌঁছে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং সুস্থ হওয়ার সাথে সাথেই শাহু লোধির বিদ্রোহ দমনের জন্য মুলতানের দিকে সসৈন্যে যাত্রা করেন। তিনি দিপালপুর পর্যন্ত পৌঁছালে শাহু লোধি ভীত হয়ে মুলতান থেকে আফগানিস্তানের দিকে পালিয়ে যান এবং যাওয়ার সময় সুলতানের কাছে একটি পত্রের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুলতান মুলতানে মালিক ইমাদুল মুলককে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহীর এক বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং দিপালপুর থেকেই দিল্লিতে ফিরে আসেন। [১]

দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা - সুলতানের পদক্ষেপ (মধ্য ৭৪০ হিজরি):

এই সফর থেকে ফেরার পথে সুলতান দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ দৃশ্য সচক্ষে দেখার সুযোগ পান। তিনি “সুনাম” এবং সেখান থেকে “আগ্রোহা” [২] পৌঁছালে হতবাক হয়ে যান। এখানে দুর্ভিক্ষ চরম পর্যায়ে ছিল এবং ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মৃত ব্যক্তিদের মাংস খেতেও দ্বিধাবোধ করছিল না। দিল্লিতে ফিরে আসার পর সুলতান সিদ্ধান্ত নেন যে, এখন জনগণের পুনর্বাসন ও সমৃদ্ধির দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হবে। তিনি অভাবগ্রস্তদের সহায়তার জন্য কোষাগার থেকে অর্থ বিলিয়ে দিতে শুরু করেন এবং সেই সাথে মানুষকে কৃষিকাজে উৎসাহিত করেন। [৩]

ইবনে বতুতার বর্ণনা হলো:

সেই দিনগুলোতে সুলতান অসহায় জনগণের সাহায্যের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দিল্লির অধিবাসীদের ছয় মাসের...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি): খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬১, ৩৬০; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০৬, ১০১, ১০৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮৩, ৪৮২। ইয়াহইয়া সিরহিন্দি একে ৭৪২ হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটি কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। কারণ এর পরে সুলতান দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং তারপর দীর্ঘ সময় সরগদুয়ারিতে অবস্থান করেন, যেখানে ইবনে বতুতা তার সফরসঙ্গী ছিলেন এবং এরপর ইবনে বতুতা সফর ৭৪৩ হিজরিতে দিল্লি থেকে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সুতরাং শাহু লোধির দমনের ঘটনা ৭৪০ হিজরির মাঝামাঝি সময়ের বলেই গণ্য করা হয়।

[২] “আগ্রোহা” ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত এবং দিল্লি থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দূরে।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮৩, ৪৮২; তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি): পৃষ্ঠা ৩৬১; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ১৫৬। দ্রষ্টব্য: ফিরিশতা ও বারানি এই ঘটনাগুলো প্রথম দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গে লিখেছেন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এগুলো দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের অবস্থা।

এককালীন রেশন দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হলো। কাজীগণ, অফিসারগণ এবং মুন্সিগণ দিল্লির অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে অভাবীদের নাম লিখতেন এবং মানুষের মাঝে রেশন বিতরণ করতেন। আমিও সুলতান কুতুবুদ্দিনের মাকবারার কাছে খাবার রান্না করিয়ে মানুষের মাঝে বিতরণ করতাম। [১]

ইবনে বতুতা আরও লিখেছেন:
"সুলতান ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষিব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিলেন, কৃষকদের বীজসহ কৃষিকাজের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করলেন। তাদের ওপর এটি বাধ্যতামূলক করা হলো যে, তারা সমস্ত উৎপাদিত ফসল সরকারি গুদামে জমা করতে থাকবে (যেখান থেকে তা সমানভাবে বিতরণ করা হবে)।" [২]

সুনাম ও সামানার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের শহরে পুনর্বাসন (৭৪০ হিজরির মধ্যভাগ):
অনাবৃষ্টির কারণে পূর্ব পাঞ্জাবের মানুষ চরম দুর্দশায় ছিল। সুনাম জেলা ও সামানা জেলার হাজার হাজার হিন্দু, যাদের সম্পর্ক ছিল মান্ধের, চৌহান ও ভাট্টি গোত্রের সাথে, তারা সুলতানকে খাজনা দিতে অস্বীকার করল এবং বনের দিকে চলে গেল এবং সেখানে কুঁড়েঘর বানিয়ে বসবাস করতে লাগল। শুধু তাই নয়, বরং তারা মহাসড়কগুলোতে লুটতরাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করল।

দিপালপুর থেকে দিল্লি ফেরার পথে সুলতান পাঞ্জাবের এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তার কর্মচারীদের পাঠিয়ে ওই লোকদের কুঁড়েঘরগুলো ভেঙে দিলেন।

সুলতানের নির্দেশে তাদের দিল্লি ও অন্যান্য শহরে এনে পুনর্বাসিত করা হলো এবং সেই সাথে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হলো, যার ফলে তাদের মধ্যে এক বিশাল অংশ ইসলাম গ্রহণ করল, মহাসড়কগুলোতে লুটতরাজ বন্ধ হলো এবং পাঞ্জাবে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো। [৩]

সর্গ দুয়ারিতে অবস্থান (৭৪০ হিজরির শেষভাগ):
সুলতান পাঞ্জাব থেকে দিল্লি ফিরে এসে শহরের দরজাগুলো খুলে দিয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, যারা শহর ছেড়ে চলে যেতে চায় তারা যেতে পারে। যাদের কাছে তখনও দীর্ঘ সফর করার মতো যথেষ্ট সম্পদ ও সাহস ছিল, তারা বাংলার দিকে চলে গেল। [৪]

সুলতান অবশিষ্ট জনগণকে তার অনুসরণ করার উৎসাহ দিয়ে দিল্লি থেকে দশ মঞ্জিল দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরের একটি ঘাটে এসে অবস্থান নিলেন এবং এখানে তাবু খাটিয়ে একটি শহর গড়ে তুললেন। নিজের জন্য তিনি এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করালেন যার নাম রাখলেন 'সর্গ দুয়ারি'। ইবনে বতুতার মতে এর অর্থ হলো: 'জান্নাত সদৃশ'। [৫]

---

[১] (রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৯) দ্রষ্টব্য: এই কথাগুলোই ইবনে বতুতা কয়েক পৃষ্ঠা আগে (পৃষ্ঠা ৩৬৬) লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং সেখানে জানিয়েছিলেন যে, উল্লিখিত ওজনের গমের দাম চৌদ্দ দিনার হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই সময় ছয় দিনার ও ষাট দিরহাম সমান ছিল।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৯

[৩] (তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬১; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮৪; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০৭) দ্রষ্টব্য: সিরহিন্দি একে ৭৪৪ হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬৩; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮৫

[৫] (রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৮, ৩৮১) ফায়দা: 'সর্গ' এবং 'ডোয়ার' হিন্দি শব্দ। 'সর্গ' এর অর্থ হলো: জান্নাত। 'ডোয়ার' এর অর্থ হলো: নিকটবর্তী বা সদৃশ। বর্তমানে দিল্লি থেকে দশ মঞ্জিল দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গা নদীর তীরে 'কায়েমগঞ্জ' এবং 'আহমদগঞ্জ' নামক জনপদ রয়েছে যা দিল্লি থেকে প্রাচীন সড়কে '২৯০' কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সম্ভবত সর্গ দুয়ারি এর কাছাকাছিই ছিল।

মানুষও এখানেই বসতি স্থাপন করতে শুরু করল। বাদশাহ মানুষকে ঘরবাড়ি তৈরির নির্দেশ দিলেন। মানুষ খড়কুটা দিয়ে চালাঘর তৈরি করল, কিন্তু সেগুলোতে মাঝেমধ্যে আগুন লেগে যেত। ফলে কিছুকাল পর মানুষ এই ব্যবস্থা করল যে, কুঁড়েঘরগুলোর নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষ (তহখানা) তৈরি করে নিল। যখনই আগুন লাগত, তারা তাদের মালামাল ভূগর্ভস্থ কক্ষে রেখে মাটি দিয়ে সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দিত। [১]

এই সুযোগে আইনুল মুলক এবং তার ভাইয়েরা অযোধ্যা থেকে সুলতানের দরবারে সত্তর-আশি লক্ষ তনকা মূল্যের খাদ্যশস্য পাঠালেন, যার ফলে মানুষের কষ্ট অনেকাংশে দূর হলো। সুলতান যতদিন এখানে ছিলেন, কড়া ও অযোধ্যা জেলা থেকে নৌকার মাধ্যমে অনবরত খাদ্যশস্য এখানে পৌঁছাতে থাকে এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হতে থাকে। [২]

ইবনে বতুতাও 'সরগদুয়ারী'-তে সুলতানের সাথে কয়েক মাস সময় কাটিয়েছেন, তার বর্ণনা হলো:

"গঙ্গা নদীর পশ্চিম দিকে অত্যন্ত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ছিল কিন্তু পূর্ব দিকে প্রাচুর্য ছিল, যেখানে আমীর আইনুল মুলক বাদশাহর পক্ষ থেকে অযোধ্যা, জাফরাবাদ এবং লখনউয়ের শাসক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বাদশাহর ছাউনিতে পঞ্চাশ হাজার মণ গম, চাল এবং গবাদি পশুর জন্য ছোলা পাঠাতেন।" [৩]

আইনুল মুলকের বিদ্রোহ (মধ্য ১৩৪১ হিজরি):

সুলতান কিছুদিন পর খাদ্য সাশ্রয়ের লক্ষ্যে নির্দেশ দিলেন যে, সরগদুয়ারীর সমস্ত হাতি, ঘোড়া, খচ্চর এবং গবাদি পশু চড়ানোর জন্য নদীর পূর্ব দিকের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এই সমস্ত পশুর দেখাশোনার দায়িত্বও আইনুল মুলকের ওপর ন্যস্ত করা হলো। প্রকৃতপক্ষে আইনুল মুলক সেই দিনগুলোতে তার সেবার কারণে বাদশাহর সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তার এই উত্থানই ছিল তার পতনের পূর্বাভাস এবং তার দুর্দিন ঘনিয়ে আসছিল।

ঘটনাটি এমন ছিল যে, সেই দিনগুলোতে সুলতান খবর পেলেন যে মারাঠাওয়াড়ি (গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য)-তে কর আদায়ের কাজ অত্যন্ত দুর্বল এবং দশের জায়গায় কোনোমতে এক তনকা হাতে আসছে। ফলে তিনি দৌলতাবাদ-এর সুবাদার তার শিক্ষক কতলুগ খানকে বরখাস্ত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন সুলতানের দরবারে উপস্থিত হন। সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি কতলুগ খানের জায়গায় আইনুল মুলককে নিয়োগ দেবেন। [৪]

যখন আইনুল মুলক জানতে পারলেন যে সুলতান কতলুগ খানকে দৌলতাবাদ থেকে বরখাস্ত করেছেন এবং আমাকে সেখানে পাঠাতে চান, তখন তিনি নানা রকম সন্দেহে পতিত হলেন। আসলে তিনি বেশ কিছুকাল ধরে সুলতানকে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ কিছুদিন আগে দিল্লির কিছু সরকারি কর্মচারী খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্যের অজুহাতে অযোদ্যায় আইনুল মুলকের কাছে এসে সেখানে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। যখন সুলতান বিষয়টি জানতে পারেন, তখন তিনি ওই লোকদের কোনো না কোনোভাবে ফিরিয়ে এনে শাস্তি দিয়েছিলেন। তখন থেকেই আইনুল মুলকের এই দুশ্চিন্তা...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৮১

[২] (তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৬৪; তারিখে ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮৫, ৪৮৬) এখানে সুলতানের অবস্থান আনুমানিক ৭৩৮ হিজরির শেষভাগ থেকে ৭৪২ হিজরির শেষভাগ (প্রায় এগারো মাস) পর্যন্ত ছিল। এই স্থানটি গঙ্গা নদীর তীরে কনৌজের কাছে ছিল। ধারণা অনুযায়ী এটি প্রায় সেই এলাকা যেখানে বর্তমানে 'আহমদগঞ্জ' অবস্থিত।

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৮১

[৪] তারিখে ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮৬

লাহেক ছিল যে সুলতান মনে মনে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং কোনো না কোনো সময় আমাকে শাস্তিও দেবেন, কিন্তু এমন কিছুই ঘটেনি।

এর বিপরীতে এখন সুলতান তুঘলক খানকে অপসারিত করে আইনুল মুলককে দৌলতাবাদ-এর সুবাদারি দান করছিলেন। আইনুল মুলক এই আদেশ শুনে ভাবতে লাগলেন যে সুলতান কেন তুঘলক খানকে বরখাস্ত করলেন অথচ তিনি সুলতানের উস্তাদ এবং একজন শ্রেষ্ঠ প্রশাসক। সম্ভবত সুলতান আমাকে দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করিয়ে মেরে ফেলার সংকল্প করেছেন।

এই সব সংশয়ে ঘেরা আইনুল মুলকের মতো একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এতটাই বিচলিত হয়ে পড়লেন যে নিজের প্রাণ বাঁচানোর খাতিরে বিদ্রোহে নেমে এলেন।

যেহেতু কিছুদিন আগে সুলতান তাঁর লশকর-এর একটি অংশ আহমদ আয়াজ (খাজা জাহান)-কে দিয়ে ধাড় (গুজরাট) এবং দ্বিতীয় অংশ ইমাদুল মুলককে দিয়ে মুলতানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং বাদশাহর অধীনে বেশি সৈন্য ছিল না, তাই আইনুল মুলক ভাবলেন যে তিনি বাদশাহকে পরাস্ত করতে পারবেন। তাঁর ধারণা ছিল যে যেহেতু সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেই সুলতানের প্রতি বিরক্ত, তাই রাজকীয় বাহিনীকে সাহায্য করার লোক কম হবে। মোদ্দাকথা, মিথ্যা আশা নিয়ে আইনুল মুলক তাঁর ভাইদের কাছে বার্তা পাঠালেন যেন তারা অযোধ্যার লশকর নিয়ে তাঁর সাথে এসে মিলিত হয়। আইনুল মুলকের ভাই শহরুল্লাহ, নসরুল্লাহ এবং ফজলুল্লাহও নামকরা আমির ছিলেন। তাঁরা লশকর নিয়ে গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে "সরগদুয়ারী"-র বিপরীতে পৌঁছে গেলেন। আইনুল মুলক বায়আত গ্রহণ করে সুলতান আলাউদ্দিন উপাধি ধারণ করলেন। রাজকীয় শিবিরের জন্য শস্যের ভাণ্ডার এবং সমস্ত রাজকীয় হাতি, ঘোড়া ও গবাদি পশু তাঁরই দখলে ছিল। এই সবকিছু সাথে নিয়ে তিনি রাতারাতি কনৌজের দিকে রওনা হলেন যা সেই স্থান থেকে তিন মঞ্জিল দক্ষিণে ছিল। [১]

সম্ভবত আইনুল মুলক বাদশাহর কাছে খবর পৌঁছানোর আগেই কনৌজ পৌঁছে সেই মজবুত প্রাচীরবেষ্টিত শহরে অবরুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাদশাহর এক গোলাম মালিক শাহ আইনুল মুলকের গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুলতানকে এই খবর পৌঁছে দিলেন, যা শুনে বাদশাহ হতবাক হয়ে গেলেন কারণ তাঁর ঘোড়া, হাতি এবং শস্য সবকিছুই আইনুল মুলকের কাছে ছিল, অন্যদিকে রাজকীয় লশকর ছিল বিচ্ছিন্ন।

বাদশাহ ঘাবড়ে গিয়ে রাজধানী দিল্লিতে চলে যাওয়ার এবং প্রস্তুতি নিয়ে আইনুল মুলকের মোকাবিলা করার সংকল্প করলেন, কিন্তু তুর্কি ও খোরাসানি আমিরগণ, যারা আইনুল মুলক হিন্দুস্তানি হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন, তাঁরা জেদ ধরলেন যে অবিলম্বে আইনুল মুলকের পশ্চাদ্ধাবন করা হোক, অন্যথায় তিনি আরও লশকর সংগ্রহ করে ফেলবেন এবং ফিতনা আরও ছড়িয়ে পড়বে।

বাদশাহ এই পরামর্শ গ্রহণ করে সেই রাতেই বার্তাবাহক পাঠালেন এবং আশেপাশে উপস্থিত সমস্ত অফিসার ও সৈন্যদের তলব করলেন। আহমদ আয়াজ এবং ইমাদুল মুলককে পথ থেকে ফিরিয়ে আনা হলো। এছাড়া আমরোহা, সামানা এবং কোলের অফিসারদেরও দ্রুত পৌঁছানোর নির্দেশ পাঠানো হলো। এখন বাদশাহ দেরি না করে গঙ্গা নদীর তীর ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আইনুল মুলকের আগে কনৌজ পৌঁছে শহরটিকে নিজের পেছনে রাখা। [২]

পথে বিভিন্ন অফিসার নিজ নিজ বাহিনীসহ এসে লশকরে যোগ দিতে থাকলেন। যদি একশ সৈন্য আসত তবে সুলতান এক হাজার...

---

[১] আহমদগঞ্জ থেকে কনৌজ ৯৮ কিলোমিটার দক্ষিণে, যা প্রায় তিন মঞ্জিল। এতে সরগদুয়ারী আহমদগঞ্জের কাছে হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়।

[২] এখানে এই আন্দাজ করা কঠিন নয় যে বাদশাহর অধিকাংশ সৈন্য পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছিল কারণ অধিকাংশ ঘোড়া ও খচ্চর ইত্যাদি আইনুল মুলক সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সৈন্যদের অভ্যর্থনার জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা এগারোশ হয়ে লস্করগাহে আসত যাতে গোয়েন্দাদের কাছে তাদের সংখ্যা বেশি মনে হয়। সুলতানের বাহিনী নদীর পশ্চিম তীরে চলছিল যখন আইনুল মুলকের বাহিনী পূর্ব তীরে এক মঞ্জিল সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় দিন সুলতান লস্করের সমস্ত নারীদের নয় মাইল দূরে একটি কেল্লায় পাঠিয়ে দিলেন। পরের দিন সুলতান লস্করকে বিন্যস্ত করলেন এবং সবাইকে বর্ম পরিধান করার নির্দেশ দিলেন। এই সফর তিন দিন অব্যাহত ছিল যাতে সুলতান না নিজের বড় তাঁবুতে ঘুমিয়েছেন, না ছায়ায় বসেছেন। শুধু একটি ছোট তাঁবু ছিল যাতে তিনি খাবার খেতেন এবং গোসল করতেন।

তৃতীয় দিন কনৌজ শহরের প্রাচীর দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল যা নদীর পশ্চিম তীরে ছিল। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল যে আইনুল মুলক নদী পার হচ্ছে। সুলতান আশঙ্কা করলেন যে পাছে আইনুল মুলক তার আগে কনৌজ দখল করে না নেয়। তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে লস্কর পরিচালনা করলেন এবং আসরের পর কনৌজে প্রবেশ করলেন যখন লস্কর শহরের বাইরে প্রস্তুত অবস্থায় রইল। সুলতান সেই রাতে শনাক্তকারী চিহ্ন দিল্লি এবং গজনী নির্ধারণ করলেন। অর্থাৎ যখন কেউ কারো সাথে দেখা করবে তখন 'দিল্লি' শব্দ বলবে। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরে 'গজনী' বলে তবে এর অর্থ ছিল যে সে রাজকীয় বাহিনীর লোক, অন্যথায় নির্দেশ ছিল তাকে হত্যা করার।

মধ্যরাতের পর আইনুল মুলক প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে দিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল রাজকীয় তাঁবু ঘেরাও করার কিন্তু তার গোয়েন্দা তাকে ধোঁকা দিল ফলে সে উজির আহমদ আয়াজের তাঁবুতে গিয়ে পড়ল। এখানে আজমি, তুর্কি এবং খোরাসানিরা প্রাণপণ লড়াই করল। ভোরের আলো ফোটার আগেই সুলতানের লস্কর আইনুল মুলকের লস্করকে পেছনে ঠেলে দিতে শুরু করেছিল। এই সময়ে আইনুল মুলকের এক ভাই নিহত হলো। দ্বিতীয় ভাই শহরুল্লাহ আহত হয়ে নদীতে পড়ে গেল। বাকিরা পিছু হটে নদীর তীরে চলে এল। কিছু নদীর ওপারে পৌঁছে গেল যখন অধিকাংশ ডুবে গেল।

সান্দিলার একজন অফিসার মালিক ইব্রাহিম তাতারী ওরফে ভাঙ্গি, যে আইনুল মুলকের নায়েব ছিল, পরাজয় ঘনিয়ে আসতে দেখে নিজের সঙ্গীদের সাথে নিজের ভাষায় বলল: "যখন আইনুল মুলক পালানোর ইচ্ছা করবে তখন আমি তার চুলের ঝুটি ধরে ফেলব এবং তোমরা ঘোড়াকে চাবুক মেরে তাকে নিচে ফেলে দেবে। আমরা তাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাব, হয়তো তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।"

যখন আইনুল মুলক নিজের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ হতে দেখে পালানোর ইচ্ছা করল তখন ইব্রাহিম বলল: "সুলতান আলাউদ্দিন কোথায় যাচ্ছ?" এই বলে তার চুলের ঝুটি ধরে ফেলল এবং তার সঙ্গীরা ঘোড়াকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিল। আইনুল মুলক মাটিতে পড়ে গেল। ইব্রাহিম তাকে কাবু করে ফেলল।

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়লে আইনুল মুলককে এমন অবস্থায় আনা হলো যে শুধুমাত্র একটি পুরনো কাপড়ের লেংটি তার সতর ঢেকে রেখেছিল। আমিরদের ছেলেরা আইনুল মুলকের কাছে এসে তাকে গালিগালাজ করতে লাগল এবং তার মুখে থুতু দিতে থাকল।

সুলতান মালিক কবিরের মাধ্যমে আইনুল মুলকের কাছে জানতে চাইলেন যে, "তুমি একি করলে?" সে কোনো উত্তর দিল না। রাজকীয় নির্দেশ অনুযায়ী তাকে ফকিরদের মতো পোশাক পরিয়ে, পায়ে বেড়ি দিয়ে হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হলো। মাগরিবের পর আইনুল মুলকের সঙ্গীদের মধ্য থেকে বাষট্টি জন আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলো এবং রাজকীয় নির্দেশে...

হাতির সামনে ফেলে দেওয়া হলো। এই সময় نوبت, নককারা ও শিঙা বাজানো হচ্ছিল। হাতিরা কাউকে তাদের লোহা মোড়ানো দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল, কাউকে উপরে ছুড়ে মেরে ফেলল। আইনুল মুলক দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। নিহতদের টুকরো করে তাঁর দিকে ছুড়ে দেওয়া হচ্ছিল। তাঁকে তাঁর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো।

এদিকে আইনুল মুলকের দুই ভাই যারা জীবিত বেঁচে গিয়েছিলেন, নদী পার হয়ে অযোধ্যায় পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ যতটুকু সম্ভব সাথে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় তাঁরা তাঁদের ভাই আইনুল মুলকের স্ত্রীকে বললেন: "তুমিও তোমার সন্তানদের নিয়ে আমাদের সাথে চলো।" তিনি বললেন: "আমি কি একজন হিন্দু নারীর চেয়েও অধম যে তার স্বামীর সাথে পুড়ে মরে? যদি আমার স্বামী মারা যান তবে আমিও মরব। যদি তিনি জীবিত থাকেন তবে আমিও জীবিত থাকব।"

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের কাছে যখন এই মহিলার উত্তর পৌঁছাল, তিনি খুব খুশি হলেন। সেই সাথে তাঁর প্রতি দয়া হলো। অবশেষে এই মহিলা, আইনুল মুলকের মা এবং বোনকেও গ্রেপ্তার করে সুলতানের কাছে আনা হলো। সুলতান আইনুল মুলকের তাঁবুর পাশেই তাঁদের তাঁবু স্থাপন করে দিলেন। আইনুল মুলককে তাঁদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হলো। সুলতান তাঁকে কয়েক দিন হেফাজতে রাখলেন এবং তারপর আশ্চর্যজনকভাবে এই বলে ক্ষমা করে দিলেন: "এই ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে ফিতনাবাজ নয়, বরং সে বিভ্রান্ত হয়েছিল।"

এরপর সুলতান তাঁকে আরও কিছু দায়িত্ব অর্পণ করলেন যাতে তিনি সালতানাতের খিদমতে নিয়োজিত থাকতে পারেন। [১]

ট্যাক্স মওকুফ, ইনসাফের আদালত (৭৪১ হিজরি):

এই বছর (৭৪১ হিজরিতে) সুলতান প্রজাদের অবস্থার ওপর দয়া করে সমস্ত ট্যাক্স মওকুফ করে দিলেন। নির্দেশ দিলেন যে, জাকাত ও উশর ব্যতীত সমস্ত কর বাতিল। এর পাশাপাশি সুলতান সপ্তাহে দুই দিন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিওয়ান খানার সামনের খোলা ময়দানে বসে সবার ফরিয়াদ শোনার সিলসিলা শুরু করলেন। সাধারণ অনুমতি ছিল যে, যার যা অভিযোগ আছে তা বর্ণনা করুক। এই চত্বরের চার দরজায় চারজন অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছিল যাতে তাঁরা ফরিয়াদীদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। ফরিয়াদীদের অনুমতি ছিল যে, যদি কোনো অফিসার তাঁদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে গড়িমসি করে, তবে তাঁরা সরাসরি কাজিউল কুজাত এমনকি বাদশাহর কাছেও আসতে পারেন। বাদশাহ যদি জানতে পারতেন যে ফরিয়াদী কোনো অফিসারের কাছে গিয়েছিল এবং সে অভিযোগ নথিভুক্ত করেনি, তবে সেই অফিসারকে কঠোর তিরস্কার করা হতো। এই সমস্ত লেখা বাদশাহ এশার নামাজের পর নিজে অধ্যয়ন করতেন। [২]

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০ থেকে ৩৮৩; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০৯, ১১০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৬৫, ৩৬৬; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা: মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই আইনুল মুলক ভিন্ন ব্যক্তি, যিনি এই বিদ্রোহের পর ক্ষমা পেয়েও শেষ পর্যন্ত পতনের শিকার হন এবং আর কখনো প্রভাবশালী হতে পারেননি। একই নামের অন্য একজন আমির 'আইনুল মুলক মাহরু'ও ছিলেন, যিনি প্রথমে মুহাম্মদ তুঘলক এবং পরে ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁর বই 'ইনশা-ই-মাহরু' আজও মুদ্রিত অবস্থায় আছে। এঁরা দুজন আলাদা ব্যক্তিত্ব। পার্থক্যটি খেয়াল রাখা জরুরি।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি - মাজার সালার মাসউদ গাজী রহ.-এ উপস্থিতি:

শাওয়াল ৭৪১ হিজরি (মার্চ ১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দ) এ দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি ঘটে। সুলতানের জন্য এখন যত দ্রুত সম্ভব দিল্লি ফিরে যাওয়া জরুরি ছিল কারণ দীর্ঘ সময় ধরে তিনি দিল্লিতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের সুযোগ পাননি। তবে সুলতান প্রথমে গঙ্গা নদী পার হয়ে পূর্ব দিকে প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার সফর করেন এবং সালার মাসউদ গাজী রহ.-এর মাজারে হাজিরা দেন। [১]

সুলতানের দিল্লি প্রত্যাবর্তন: জিলকদ ৭৪১ হিজরি

আনুমানিক জিলকদ ৭৪১ হিজরিতে সুলতানের দিল্লি প্রত্যাবর্তন ঘটে। এই সময়ে প্রায় আড়াই বছর পর্যন্ত তিনি রাজধানী থেকে প্রায় অনুপস্থিতই ছিলেন। [২]

শেখ শিহাবুদ্দিন বিন আহমদ জামের হত্যাকাণ্ড:

শেখ আহমদ জামের পুত্র শেখ শিহাবুদ্দিন দিল্লির প্রখ্যাত বুজুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতেন এবং দোয়ার আবেদন করতেন।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি একটি নতুন পদ্ধতি বের করেন যে, নিজের সেবা ও চাকরির জন্য উলামা ও মাশায়েখদের নিযুক্ত করতে শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: “খুলাফায়ে রাশেদিন কেবল আলেম ও নেককারদেরই কর্মচারী হিসেবে রাখতেন, তাই আমিও তাই করছি।” ফলে অনেক আলেম ও ফকিহ সুলতানের দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন।

সুলতান শেখ শিহাবুদ্দিনকে দরবারি বানাতে চাইলেন কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। সুলতান দরবারে আম-এ ডেকে এনে একই প্রস্তাব দিলেন, তিনি সেখানেও অস্বীকার করলেন। সুলতান রাগান্বিত হয়ে শেখ জিয়াউদ্দিন সানামিকে নির্দেশ দিলেন যেন শেখ শিহাবুদ্দিনের দাড়ির চুল উপড়ে ফেলা হয়। তিনি অপারগতা প্রকাশ করলে সুলতান তাঁর দাড়িও উপড়ে ফেলেন। শেখ শিহাবুদ্দিনের দাড়িরও একই দশা করার পর তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দৌলতাবাদে পাঠিয়ে দেন। সাত বছর পর তাঁকে ফিরিয়ে আনেন এবং অনেক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং আমিলদের (রাজস্ব কর্মকর্তাদের) কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের কাজ তাঁর ওপর অর্পণ করেন। এরপর তাঁকে সেই বিভাগের দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং অনেক সম্মান বৃদ্ধি করেন।

যখন দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের সময় এল এবং সুলতান সরগদুয়ারিতে গিয়ে তাবু গাড়লেন, তখন শেখ শিহাবুদ্দিন সুলতানকে...

---

[১] (রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৫) সুলতানের সাথে ইবনে বতুতাও মাজারে হাজিরা দিয়েছিলেন। নোট: বাহরাইচ উত্তরপ্রদেশে দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় সাড়ে চারশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সরজু নদীর তীরে, যা ঘাগরা নদীর একটি উপনদী। বাহরাইচ উত্তর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শহর যা শহীদ সৈয়দ সালার মাসউদ গাজীর মাজারের কারণেও বিখ্যাত।

[২] ইবনে বতুতা বলেন: “তিনি আড়াই বছর অনুপস্থিত থাকার পর তাঁর রাজধানীতে ফিরে আসেন।” (রেহলা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৫) সম্ভবত এর অর্থ হলো আড়াই বছর ধরে সুলতান দিল্লিতে থিতু হয়ে থাকার সুযোগ পাননি। মাঝখানে নামমাত্র সময়ের জন্য দিল্লিতে অবস্থান করেছিলেন। অর্থাৎ জমাদিউল আউয়াল ৭৩৯ হিজরিতে সুলতান দিল্লি থেকে বের হন, দক্ষিণ ভারত ও দৌলতাবাদে অবস্থান করেন, ৭৪০ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে দিল্লির ওপর দিয়ে পাঞ্জাব এবং পুনরায় দিল্লি আসেন এবং দ্রুতই সরগদুয়ারি চলে যান এবং দুর্ভিক্ষের শেষে ৭৪১ হিজরির জিলকদ মাসের শুরুতে দিল্লি আসেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইবনে বতুতা অন্য এক স্থানে শেখ শিহাবুদ্দিন বিন আহমদ জামের বর্ণনায় লিখেছেন: “সুলতানের অনুপস্থিতির আড়াই বছর সময়কালে তিনি সেখানেই (গুহায়) অবস্থান করেন।” (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৮) এর প্রেক্ষাপট থেকে মনে হয় যে সুলতানের সরগদুয়ারিতে অবস্থানের সময়কাল ছিল আড়াই বছর। কিন্তু এখানে বর্ণনায় কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে কারণ সরগদুয়ারিতে সুলতানের অবস্থান ছিল প্রায় এক বছর।

...থেকে দিল্লিতে থাকার অনুমতি চাইলেন। সুলতান অনুমতি দিলেন এবং সাথে শহর থেকে ছয় মাইল দূরে একটি বড় অনাবাদী এলাকাও দিয়ে দিলেন। সেখানে শেখ একটি বড় গুহা-ঘর তৈরি করালেন এবং তাতে ঘর, গুদাম, তন্দুর, হাম্মাম এবং সব ধরণের নির্মাণ কাজ করালেন। তাঁর খাদেমরা সারাদিন চাষাবাদ করত এবং রাত হতেই গবাদিপশুসহ গুহায় এসে দরজা বন্ধ করে দিত যাতে আশপাশের পাহাড়ী ডাকাতদের থেকে নিরাপদ থাকা যায়। শেখ যমুনা নদী থেকে একটি খাল কেটে এই জমি আবাদ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় এই চাষাবাদের আয় থেকে সরকারও অনেক উপকৃত হয়েছিল।

যতক্ষণ বাদশা দিল্লিতে ফিরে না এলেন, শেখও সেই গুহায় অবস্থান করলেন। যখন বাদশা দিল্লিতে ফিরলেন, শেখ সাত মাইল পর্যন্ত গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, বাদশাও সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং কোলাকুলি করে সাক্ষাৎ করলেন। শেখ পুনরায় নিজের গুহায় ফিরে গেলেন। কিছুকাল পর তিনি আবার শেখকে ডেকে পাঠালেন। শেখ উপস্থিত হতে অস্বীকার করলেন। আমির মুখলিসুল মুলক গিয়ে শেখকে বোঝালেন এবং রাজকীয় ক্রোধের ভয় দেখালেন, তখন তিনি বললেন: “আমি এই জালেম বাদশার অধীনে চাকরি কখনোই করব না।” মুখলিসুল মুলক এসে বাদশাকে সাক্ষাতের বিবরণ শোনালেন, তখন তিনি শেখকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। শেখকে ধরে আনা হলো। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি আমাকে জালেম বলো?”

শেখ বললেন: “হ্যাঁ, তুমি জালেম এবং অমুক অমুক জুলুম তুমি করেছ।” এই বলে দিল্লির জনশূন্য হওয়া এবং দিল্লির বাসিন্দাদের জোরপূর্বক দৌলতাবাদে নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। বাদশা তলোয়ার বের করে কাজী সদর জাহানের হাতে দিয়ে শেখকে বললেন: “আমাকে জালেম প্রমাণ করো এবং আমার ঘাড় এই তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দাও।”

শেখ বললেন: “যে ব্যক্তি তোমার জালেম হওয়ার সাক্ষ্য দেবে, তাকে হত্যা করা হবে, কিন্তু তুমি ভালো করেই জানো যে তুমি জালেম।” বাদশা শেখের পায়ে বেড়ি এবং দুই হাতে হাতকড়া পরানোর ও কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। চৌদ্দ দিন পর্যন্ত শেখ কিছু খাননি বা পান করেননি। প্রতিদিন তাঁকে দরবারে আনা হতো এবং চাপ দেওয়া হতো যেন নিজের বক্তব্য ফিরিয়ে নেন, কিন্তু তিনি বলতেন: “আমি বক্তব্য ফিরিয়ে নেব না এবং শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।”

চতুর্দশ দিনে বাদশা শেখের কাছে খাবার পাঠালেন কিন্তু শেখ অস্বীকার করলেন এবং বললেন: “আমার রিজিক জমিন থেকে উঠে গেছে।” বাদশার কাছে যখন এই খবর পৌঁছাল, তখন তিনি হিন্দু মেথরদের নির্দেশ দিলেন যেন শেখকে মাটিতে শোয়ানো হয়, সাঁড়াশি দিয়ে মুখ খোলা হয় এবং দেড় সের গোবর খাওয়ানো হয়। মেথররা গোবরে পানি মিশিয়ে একইভাবে তা শেখের মুখে ঠুসে দিল।

পরের দিন শেখকে কাজী সদর জাহানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো যেখানে সমস্ত উলামা ও মাশায়েখ অনুরোধ করলেন যেন নিজের বক্তব্য ফিরিয়ে নেন, কিন্তু তিনি মানলেন না। অবশেষে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হলো। [১]

ইবনে বতুতার ওপর রোষ:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের পক্ষ থেকে ইবনে বতুতাকে অনেক পুরস্কৃত করা হয়েছিল কিন্তু ইবনে বতুতার একটি বিষয় সুলতানের কাছে খুব অপ্রীতিকর মনে হয়েছিল। ঘটনাটি হলো, যে সময়ে শেখ শাহাবুদ্দিন চাষাবাদের জন্য তাঁর অদ্ভুত গুহায় বসবাস করছিলেন, তখন আরও অনেক...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৮

আমীর ও অভিজাতদের সাথে ইবনে বতুতাও (যিনি ভ্রমণপিপাসু ছিলেন) সেই গুহাটি দেখার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

যখন বাদশাহ শেখ শিহাবুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করলেন, তখন তাঁর ছেলেদেরও হেফাজতে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের বাবার সাথে দেখা করতে কে কে আসত। তারা ইবনে বতুতার নামও বলে দিল। ফলে ইবনে বতুতাকে হেফাজতে নেওয়া হলো। তিনি সেই দিনগুলোতে একটানা রোজা রাখলেন এবং নিজের মুক্তির জন্য ৩৩ হাজার বার 'حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ' পাঠ করলেন। অবশেষে শেখ শিহাবুদ্দিনকে হত্যা করা হলো এবং ইবনে বতুতাকে মুক্তি দেওয়া হলো। [১]

সুলতানের সিহওয়ান যাত্রা:

৭৪২ হিজরির শুরুর দিকে সুলতান সিহওয়ান (সিন্ধু) চলে গেলেন। [২]

এদিকে ইবনে বতুতার মন রাজকীয় চাকরি থেকে, বরং দুনিয়া থেকেই উঠে গেল এবং তিনি একজন বুজুর্গ শেখ আবদুল্লাহ গাজী রহ.-এর খানকাহে গিয়ে ইবাদত ও রিয়াজতে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। সুলতান জানতে পেরে ইবনে বতুতাকে নিজের কাছে সিহওয়ানে ডেকে পাঠালেন এবং অত্যন্ত নম্রতার সাথে রাজকীয় চাকরি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করলেন, কিন্তু ইবনে বতুতা ক্ষমা চাইলেন।

ইবনে বতুতার ভাষ্যমতে, তিনি হজের অনুমতি চাইলে বাদশাহ তা দিয়ে দিলেন। এরপর ইবনে বতুতা ১লা রজব থেকে ১০ই শাবান ৭৪২ হিজরি পর্যন্ত কঠোর ইবাদত ও রিয়াজতের চিল্লা পালন করলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর জন্য হিন্দুস্তান থেকে সসম্মানে বের হওয়ার পথ তৈরি করে দিলেন। [৩]

চীন সম্রাটের দূতাবাস:

৭৩৮ হিজরিতে সুলতান যখন চীনের দিকে সৈন্য চালনা করেছিলেন, তখন হিমালয় পাহাড়ে অবস্থিত অনেক প্রাচীন মূর্তিশালা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল এবং পাহাড়ের কিছু অংশ দখলও করে নেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে ৭৪৩ হিজরিতে চীন সম্রাটের পক্ষ থেকে একটি দূতাবাস আসে। দূত সুলতান মুহাম্মদ তুঘলককে চীন সম্রাটের পত্র পড়ে শোনান, যাতে লেখা ছিল যে হিমালয় পর্বতের মূর্তিশালাগুলো পুনরায় নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হোক।

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৪০৯

[২] এটি শুধুমাত্র ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন এবং সুলতানের যাওয়ার কারণ বলেননি। সম্ভবত সুলতান লাল শাহবাজ কালান্দার রহ. (উসমান মারওয়ান্দি)-এর মাজার জিয়ারতের জন্য গিয়েছিলেন, যেমনটি আগে তিনি মাজার গঞ্জ গাজী সালার মাসউদ গাজী রহ.-এর মকবরায় গিয়েছিলেন। লাল শাহবাজ কালান্দার রহ.-এর মাজার ও খানকাহ বিখ্যাত ছিল। ইবনে বতুতাও ৭৩৪ হিজরিতে লাল শাহবাজ কালান্দার রহ.-এর খানকাহে গিয়েছিলেন। (রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩২১) তবে এমনও হতে পারে যে, এই সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। সিহওয়ান সিন্ধু নদের তীরে দিল্লি সালতানাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল, যেখান থেকে কিছু দূরেই মঙ্গোলদের অধিকৃত এলাকা শুরু হতো এবং তাদের বাহিনী সেখানে ঘোরাফেরা করত। সম্ভবত এই সফরে সুলতান মঙ্গোল শাহজাদাদের সাথে মিত্রতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এটি উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানের আমলে মঙ্গোলরা কায়ান তারমা শিরিনের নেতৃত্বে একবার আক্রমণ করেছিল। এরপর থেকে দেশের সীমান্তগুলো ক্রমাগত নিরাপদ ছিল। মঙ্গোল শাহজাদারা এখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাই সুলতানের জন্য তাদের সাথে বিষয়গুলো মীমাংসা করা সহজ ছিল। সম্ভবত এই মিত্রতামূলক সম্পর্ক এই সুযোগেই স্থাপিত হয়েছিল। এই মিত্রতামূলক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ৭৩৯ হিজরির শেষের দিকে সুলতান যখন সিহওয়ান ও ঠাট্টা সফর করেছিলেন, তখন মঙ্গোল শাহজাদা আমীর কাজগানের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তিনি সামরিক সহায়তা পাঠিয়েছিলেন। (তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৮১) এই ঘটনাগুলো সামনে আসছে।

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৪০৯, ৪১০

তারিখ-ই-মিল্লাত-ই-ইসলামিয়া

দূতাবাস নিম্নোক্ত মূল্যবান উপহারসমূহও নিয়ে এসেছিল:

- ১০০ গোলাম ও দাসী
- ৫০০ খোয়াব (এক প্রকার কাপড়)-এর থান
- ৫ মণ কস্তুরী
- ৫টি রত্নখচিত রাজকীয় পোশাক (খিলআত)
- ৫টি তলোয়ার

সুলতান চীনের বাদশাহকে ফিরতি পত্রে লিখিয়েছিলেন: "ইসলামে সেই জাতি ব্যতীত যারা জিজিয়া প্রদান করে, অন্য কারো জন্য মূর্তিপূজার উপাসনালয় নির্মাণের অনুমতি হতে পারে না। যদি চীনের বাদশাহ জিজিয়া প্রদান করতে সম্মত হন, তবে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।"

এর সাথে সুলতান চীনের বাদশাহর উপহারের বিনিময়ে নিম্নোক্ত উপহারসমূহ পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করালেন:

- ১০টি রাজকীয় পোশাক
- ১০টি রাজকীয় গরম টুপি যার মধ্যে একটি হীরাখচিত ছিল
- ১০টি তলোয়ার যার মধ্যে একটির খাপ হীরাখচিত ছিল
- ১০০ জন অমুসলিম গোলাম
- নাচ ও গানে পারদর্শী ১০০ জন হিন্দু দাসী
- হিন্দুস্তান ও ইসলামি দেশসমূহে তৈরি বিভিন্ন প্রকারের অতুলনীয় কাপড়ের ১০০০টি থান
- ১০০টি কারাকান্দ (গরম চামড়ার কোট)
- ৪টি স্বর্ণের মোমদানি
- ৪টি রূপার মোমদানি
- ৪টি স্বর্ণের থালা ও লোটা
- ৪টি রূপার থালা

এই উপহারসমূহ পাঠানোর জন্য সুলতান ইবনে বতুতাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: "আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে দূত বানিয়ে চীনের বাদশাহর নিকট পাঠাচ্ছি, কারণ আমি জানি যে তোমার ভ্রমণ ও বিশ্বভ্রমণের অনেক শখ রয়েছে।"

মোদ্দাকথা, ইবনে বতুতা হিন্দুস্তানের দূত হয়ে ৭ সফর ৭৪৩ হিজরিতে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। নিজের অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তিনি চীন থেকেই অন্যান্য দেশ ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়লেন এবং এরপর নিজের দেশ তানজাহ (মরক্কো)-তে চলে গেলেন। [১]

এই কণ্টকাকীর্ণ বাগান থেকে প্রভাতী বাতাসের মতো পালিয়ে যাও... আতঙ্ক এটাই বলে যে শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে যাও। [২]

আব্বাসীয় খলিফার দূতের অভ্যর্থনা (৭৪৪ হিজরি):

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক মিশরের আব্বাসীয় খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের চেষ্টা করছিলেন। এটি ছিল খলিফা আল-হাকিম সানির সময়কাল। সুলতান অনুপস্থিত থেকে বায়আত গ্রহণ করে খলিফার নামে রাজকীয় মুদ্রা জারি করেন। খলিফা এই সংবাদ শুনে নিজের দূতকে মুহাম্মদ তুঘলকের জন্য শাসনের ফরমান ও খিলআত দিয়ে দিল্লিতে পাঠান।

৭৪৪ হিজরির শেষভাগে খিলাফতের দূত হাজি সাঈদ জারিরির দিল্লিতে আগমন ঘটে। সেদিন পুরো দিল্লিকে কনের মতো সাজানো হয়েছিল এবং খলিফার প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে অসংখ্য মানুষ সমবেত হয়েছিল। সুলতান তাঁর পারিষদবর্গ এবং উলামা ও মাশায়েখদের সাথে শহর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে 'পালাম'-এ যান এবং খিলাফতের দূতের ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা জানান। তিনি খিলাফতের ফরমানকে চোখের সাথে লাগিয়ে মাথায় রাখলেন এবং খিলাফতের দূতের কদমবুসি করলেন। এরপর কয়েক কদম তাঁর সওয়ারির সাথে পায়ে হেঁটে দিল্লির দিকে চললেন।

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে সুলতান নিজ হাতে একটি অত্যন্ত দুর্লভ মুক্তা খিলাফতের দূতের উদ্দেশ্যে নজরানা পেশ করলেন। আশরাফি সদকা করা হলো। কিংখাব কাপড়ে এবং মসজিদের মিম্বরসমূহে খলিফার নাম খোদাই করা হলো। মোদ্দাকথা, দিল্লি ও কায়রোর মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো এবং উপমহাদেশে জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবায় খলিফার জন্য দোয়া প্রচলিত হলো। [৩]

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৪১০ থেকে ৪২৪।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৩৯১ থেকে ৩৯৬।

[৩] মুসহাফি।

বিদ্রোহের দীর্ঘ ধারা

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক যদিও তাঁর শাসনকালে প্রতিটি বিদ্রোহ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং পূর্ণ শক্তিতে দমন করেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের পরিবারগুলোকেও ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছিলেন যাতে অন্য কেউ এমন দুঃসাহস করার কথা চিন্তাও না করে, কিন্তু শান্তি ও স্বস্তির এক সংক্ষিপ্ত বিরতির পর বিদ্রোহের ধারা পুনরায় শুরু হয়ে যেত এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় শাসক ও নায়েব সুলতান হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বাদশাহও তাঁর জেদ কখনো ছাড়েননি এবং প্রতিটি সমস্যার সমাধান তলোয়ার দিয়ে করার সংকল্প করেছিলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার পর ৭৪৩ হিজরি থেকে ৭৪৯ হিজরি পর্যন্ত বিদ্রোহের একটি ধারা শুরু হয় যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

উত্তর পাঞ্জাবে বিদ্রোহ:

৭৪৩ হিজরি চলাকালীন উত্তর পাঞ্জাবে খোখরদের সরদার মালিক হায়দার বিদ্রোহ করেন। স্থানীয় শাসক তাতার খান নিহত হন এবং খোখরদের আধিপত্য শক্তিশালী হয়ে যায়। সুলতানের আদেশে খাজা জাহান (আহমদ আয়াজ) অত্যন্ত কষ্টে বিদ্রোহীদের দমন করে এই এলাকা পুনরায় দিল্লি সালতানাতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেন। [১]

নিজাম মাঈনের বিদ্রোহ (৭৪৫ হিজরি):

৭৪৫ হিজরিতে কড়ার এক যোদ্ধা “নিজাম মাঈন” কিছু দাসের প্ররোচনায়, যারা তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল, বিদ্রোহ করে এবং নিজের উপাধি “সুলতান আলাউদ্দিন” রেখে শাসন করতে শুরু করে। তবে সালতানাতের প্রখ্যাত আমির আইনুল মুলকের ভাই শহরুল্লাহ অযোধ্যা থেকে সৈন্য নিয়ে বের হন এবং খুব দ্রুত তাকে কাবু করে তার শিরশ্ছেদ করেন। [২]

গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহসমূহ

বিদ্রোহের সবচেয়ে বেশি জোর ছিল গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের দিকে। এই বিদ্রোহগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার মূল কারণও ছিল সুলতানের অহেতুক কঠোরতা এবং সব জায়গায় পরামর্শের পরিবর্তে নিজের খেয়ালখুশিমতো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া।

---

[১] (তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৪৬১) এখানে ফিরিশতা উত্তর পাঞ্জাবের অভিযানে ৭৪৩ হিজরির কথা উল্লেখ করেছেন।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮৭; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৪; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০৮। এখানে সিরহিন্দি এবং ফিরিশতা নতুন সনের কথা উল্লেখ করেছেন।

https://t.me/BoierSomahar

দাক্ষিণাত্যে (দকন) কৃষ্ণা নায়েকের বিদ্রোহ (৭৪৫ হিজরি):

কৃষ্ণা নায়েক এবং তেলেঙ্গানার হিন্দুরা মুসলমানদের অধীনে খুশি ছিল না এবং ভেতরে ভেতরে একটি বড় বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের মধ্যে ওয়ারাঙ্গালের প্রাক্তন রাজা রুদ্র মহাদেব (লুদ্দার দেব)-এর পুত্র "কৃষ্ণা নায়েক" অগ্রগণ্য ছিল। সালতানাতের দুরবস্থা দেখে সে একে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। মা'বার (তামিলনাড়ু)-এর রাজা বিলাল দেব, যে আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের অনুগত ও অধীনস্থ ছিল, সে কেবল তাকে উৎসাহিতই করেনি বরং তাকে অসংখ্য সৈন্যও প্রদান করেছিল।

এই শক্তি নিয়ে কৃষ্ণা নায়েক যখন ওয়ারাঙ্গাল আক্রমণ করল, তখন স্থানীয় মুসলিম শাসক ইমাদুল মুলক পালিয়ে দৌলতাবাদে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এরপর কৃষ্ণা নায়েকের বাহিনী পুরো দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে মুসলিম শাসকদের পিছু হটতে বাধ্য করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দৌলতাবাদ, বিদার, গুলবার্গা, রাজগড় এবং গুজরাট বাদে সমস্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দিল্লি সালতানাতের হাতছাড়া হয়ে গেল। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এই পরাজয়ে দিনরাত ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তাকে কোনো পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দিচ্ছিল না। [১]

বিদার (দাক্ষিণাত্য)-এ নুসরাতের বিদ্রোহ (৭৪৬ হিজরি):

সুলতান যখন দৌলতাবাদ ছেড়ে পুনরায় দিল্লিতে স্থানান্তরিত হন, তখন তিনি "বিদার" এবং এর আশেপাশের জমি নুসরাত খানকে প্রতি তিন বছরে এক কোটি তনকা চুক্তিতে দিয়েছিলেন। এখন দীর্ঘ সময় ধরে নুসরাত খান এই অর্থ পরিশোধ করতে পারছিলেন না। তিনি ভীত ছিলেন যে সুলতান তাকে কঠোর শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেবেন। অবশেষে তিনি বিদ্রোহ করে "বিদার"-এ অবস্থান গ্রহণ করেন। তবে শীঘ্রই দৌলতাবাদের সুবাদার কুতলুগ খান সৈন্য পরিচালনা করে নুসরাত খানকে পরাজিত করেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন। এটি ৭৪৬ হিজরির ঘটনা। [২]

আমিরানে সাদাহ এবং আলী শাহের বিদ্রোহ (৭৪৬ হিজরি):

আমিরানে সাদাহ সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমলে দাক্ষিণাত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল, যারা পরবর্তীতে তার সালতানাতের পতনের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমিরানে সাদাহ-এর অর্থ হলো: "একশ সৈন্যের কমান্ডার"। এরা এমন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন যাদের অধীনে একশটি গ্রাম থাকত এবং তাদের কমান্ডে একশজন সৈন্য থাকত। এরা দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত ছোট জায়গিরদার এবং সামরিক সর্দার ছিলেন যাদের সুলতানের পক্ষ থেকে জমি এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের কৌশলসমূহ, বিশেষ করে রাজধানী স্থানান্তর এবং কর বৃদ্ধির ফলে দাক্ষিণাত্যের এই স্থানীয় আমিরদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। সুলতান তাদের ওপর অবিশ্বাস করতে শুরু করেন এবং তাদের ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করেন, যার ফলে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ করতে শুরু করে।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৬২, ৩৬৩; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮৪, ৪৮৫।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৪৮৮; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৬৪, ৩৬৫। ফেরেশতা এই সাল নির্ধারণ করেছেন।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই সিলসিলার প্রথম ঘটনাটি ৭৪৬ হিজরিতে এভাবে ঘটে যে, দৌলতাবাদ-এর আমীরানে সদাহ-দের মধ্য থেকে আলী শাহ নামক একজন কর্মকর্তা খাজনা আদায় করতে গুলবার্গা এলে সেখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দপ্তর থেকে অনুপস্থিত দেখতে পান। ফলে এখন আমীরানে সদাহ একত্রিত হলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দাক্ষিণাত্যে (দকন) একটি স্বাধীন সরকার গঠন করে এই পরিস্থিতি যা দিল্লির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, তা সংশোধন করা হোক। সে অনুযায়ী আমীরানে সদাহ আলী শাহ-এর নেতৃত্বে গুলবার্গা-র শাসক মেহরিন-কে হত্যা করেন এবং গুলবার্গা-কে দিল্লি থেকে মুক্ত করে নেন। এরপর তারা 'বিদার'-ও দখল করে নেন। সুলতান খবর পেয়ে তার উস্তাদ কুতলুগ খান (দৌলতাবাদ-এর শাসক)-কে এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনা করে তাদের প্রাণের নিরাপত্তা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে রাজি করান এবং তাদের সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন। সুলতান তাদের নির্বাসিত করার মাধ্যমেই ক্ষান্ত হন। [১]

দাক্ষিণাত্যের নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা (৭৪৭ হিজরি):

দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোর সমস্যা তখনও অমীমাংসিত ছিল। সুলতান ইমাদুল মুলক-কে সেখানকার নতুন শাসক নিযুক্ত করেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি বার্ষিক সাত কোটি জর-এ-সফেদ (রুপার মুদ্রা) রাজকোষে জমা দিতে থাকবেন এবং বাকি সমস্ত রাজস্ব নিজের কোষাগারে রাখবেন এবং নিজের ইচ্ছামতো আমীর ও কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করবেন। নতুন ব্যবস্থার অধীনে দাক্ষিণাত্যকে চারটি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি জেলায় একজন করে আলাদা শিকদার (সুবেদার) নিযুক্ত করা হয়। তবে দাক্ষিণাত্যে যে হতাশা এবং কেন্দ্রবিমুখতার অনুভূতি তৈরি হয়েছিল, তা শেষ হয়নি এবং দক্ষিণ ভারত আগের মতোই বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে রইল। দাক্ষিণাত্যকে চারটি জেলায় বিভক্ত করা এখানে ভবিষ্যতে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পূর্বাভাস হিসেবে প্রমাণিত হলো। [২]

গুরুত্বপূর্ণ পদে নওমুসলিমগণ:

সেই দিনগুলোতে সম্ভবত সুলতান অধিকাংশ প্রাচীন আমীরদের প্রতি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আইনুল মুলক এবং কুতলুগ খান-এর মতো নামী-দামী এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন আমীরদের ওপরও তার আর আস্থা ছিল না। ফলে সুলতানের চিন্তা এক ভিন্ন দিকে মোড় নিতে শুরু করে। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, উচ্চবংশীয় লোকেরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে রাজকীয় আদেশ যথাযথভাবে পালন করে না এবং সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার মতো গুণাবলির কারণে বিদ্রোহ থেকেও বিরত থাকে না; যেখানে দরিদ্র লোকেরা বিনয়ী হয়, ফলে তারা বেশি অনুগত প্রমাণিত হতে পারে। এই ভেবে সুলতান গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য ইত্যাদিতে নতুন করে অনেক নিয়োগ দিতে শুরু করেন। এই সিলসিলায় তিনি বেশিরভাগ নওমুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করতে শুরু করেন, যার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

- আজিজ খাম্মার: তিনি একজন নওমুসলিম কর্মকর্তা ছিলেন যার যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু সুলতান তাকে মালওয়া প্রদেশের শাসক বানিয়ে দেন এবং তাকে বলেন যে, সমস্ত ফিতনা ও বিদ্রোহের জন্য দায়ী হলো আমীরানে সদাহ, তাই তাদের যতটা সম্ভব দমন করে রাখো। আজিজ খাম্মার বাদশাহর কাছ থেকে মালওয়া শাসনের পরোয়ানা নিয়ে মালওয়ার সদর দপ্তর ধার [৩]-এ পৌঁছান। সেখানে তিনি আমীরানে সদাহ-দের মধ্য থেকে সত্তর

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩৬৫; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৮৮, ৪৮৯

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৩৬৮, ৩৬৯; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৫০০, ৫০১

[৩] ধার ভারতীয় রাজ্য মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৫৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিজের দস্তরখানে দাওয়াত করলেন এবং তারপর তাদের হত্যা করালেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এই অভিযানের খবর পেয়ে আজিজ খাম্মারকে রাজকীয় খিলআত দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

- নজনান নামক এক ব্যক্তি কোনো এক গায়কের ছেলে এবং নও-মুসলিম ছিল। সুলতান তাকে মুলতানের সুবাদার বানিয়ে দিলেন।
- মালিক মুকবুল (আহমদ আয়াজ) একজন নও-মুসলিম গোলাম ছিল যাকে গুজরাটের নায়েব সুবাদার নিযুক্ত করা হলো।
- বাগবান নামক এক নও-মুসলিম খাদেমকে দেওয়ান-ই-ওয়াজারাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ অর্পণ করা হলো। তার ছেলে মিকাই নানবাইকে নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিলেন।
- ফিরোজ হাজ্জাম এবং শেখ বাবু বা বক-কে (যে একজন তাঁতির ছেলে ছিল) নিজের ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। [১]

আফগান এবং আমীরান-ই-সাদাহর গুজরাটে বিদ্রোহ (৭৪৮ হিজরি):

এই সময়ে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের আফগান আমীররা বিদ্রোহ করে বসল। যার আসল কারণ জানার জন্য আমাদের কয়েক বছর পেছনে যেতে হবে। কয়েক বছর আগে সুলতান যখন মুলতান দখলকারী আফগান সরদার শাহু লোদীর বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, তখন থেকেই তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আফগানরা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফলে সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আফগান কর্মকর্তাদের ও আমীরদের বরখাস্ত করা হবে। কয়েক বছর পর সুলতান এই লক্ষ্য অর্জনে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। যেহেতু পুরনো আমীরদের ওপর সুলতানের আর তেমন ভরসা ছিল না, তাই যখন তিনি নও-মুসলিমদের নিয়োগ দিলেন, তখন তাদের মাধ্যমেই এই কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

এদিকে এই নও-মুসলিমদের নিয়োগের কারণে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের আমীরান-ই-সাদাহরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দেওহটি ও বরোদায় [২] নিযুক্ত কাজী জালালুদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন আমীরান-ই-সাদাহ এই নিয়োগগুলো মেনে না নিয়ে বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়।

আফগান আমীরদের মধ্যে কাজী জালালুদ্দিনের মর্যাদা ছিল অনেক উঁচুতে এবং অনেক আফগান আমীর তার অধীনে ছিল। সুলতান তাকে প্রথমে ঘেরাও করা জরুরি মনে করলেন এবং গুজরাটের নায়েব উজির মুকবুলকে নির্দেশ পাঠালেন যেন সে কাজী এবং তার সঙ্গী আফগানদের প্রতারণার মাধ্যমে ধরে হত্যা করে। এই নির্দেশ অনুযায়ী গুজরাটের নায়েব মুকবুল কোনো এক বাহানায় কাজী জালাল ও আফগান আমীরদের ডেকে পাঠালেন।

কিন্তু কাজী জালালকে কেউ এই খবর দিয়ে দেয়। ফলে আফগানরা তিনশ জন সশস্ত্র হয়ে আমীর মুকবুলের কাছে আসে এবং পরিষ্কার বলে দেয় যে, আমরা একে একে এবং নিরস্ত্র হয়ে হাজিরা দেব না। আমীর মুকবুল বুঝতে পারলেন যে চাল ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আফগান আমীরদের সান্ত্বনা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তখন ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। ফলে ফিরে গিয়ে তারা খাম্বায়াতে প্রবেশ করল...

---

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১; তারিখ ফিরোজ শাহী: পৃ. ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭।

দ্রষ্টব্য: আল্লামা বারনী সুলতানের এই পদক্ষেপকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সুলতান নীচ, অধম এবং অন্ত্যজ শ্রেণির লোকদের বড় বড় পদ দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই লোকেরা ছিল নও-মুসলিম। তাদের পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু সমস্যা এই দেখা দিল যে, তাদের মধ্যে অনেকেই অভিজ্ঞ না হওয়ার কারণে ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেনি।

[২] বরোদা (বরুদা) ভারতের গুজরাট রাজ্যের একটি ঐতিহাসিক শহর যার বর্তমান নাম "ভাদোদরা"। এটি "বিশ্বামিত্রী নদী"র তীরে আহমেদাবাদ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। "দেওহটি" জেলাতেই দেওহটি (বর্তমান নাম ডাবোই) অবস্থিত যা তার হ্রদ এবং প্রাচীন দুর্গের জন্য বিখ্যাত।

চলে গেল এবং সেখানে কেবল সরকারি কোষাগারই নয়, বরং অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের সম্পদও লুণ্ঠন করল।

আমির মকবুল যখন এই লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সাত হাজার সৈন্য নিয়ে এলেন, তখন আফগান আমীররা তাকেও পরাজিত করে তাড়িয়ে দিল।

সুলতান যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর উস্তাদ কুতলুগ খানের ভাই নিজামুদ্দিনকে খেলাত (সম্মানসূচক পোশাক) দিয়ে গুজরাটে পাঠালেন। সেই যুগে দিল্লির সুলতানগণ প্রতি বছর শীত ও গ্রীষ্মে দুইবার আমীরদের জন্য খেলাত পাঠাতেন এবং আমীরদের জন্য শহর থেকে বের হয়ে এসে রাজকীয় খেলাতকে সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক ছিল। ষড়যন্ত্রটি এমন ছিল যে, আফগান আমীররা যখন খেলাত গ্রহণ করতে আসবে, তখন তাদের ওপর আক্রমণ করা হবে। কিন্তু খেলাত বহনকারী প্রতিনিধি দলের একজন ব্যক্তি কাজী জালালুদ্দিন ও অন্যদের এ বিষয়ে অবহিত করে দেন। ফলে নিজামুদ্দিন যখন খেলাত নিয়ে দৌলতাবাদে পৌঁছালেন, তখন আফগান আমীররা প্রস্তুত ও সশস্ত্র হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং নিজামুদ্দিনের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে তাঁর সঙ্গীদেরসহ বন্দি করে হত্যা করেন। [১]

কিছু দিন পর গুজরাটের নায়েবে সুবাদার মালিক মকবুল পুরো রাজ্য থেকে সংগৃহীত রাজস্ব নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন। এই লোকেরা আক্রমণ করে মালিক মকবুলকে তাড়িয়ে দিল এবং সমস্ত নগদ অর্থ ও মালামাল লুণ্ঠন করল, যার মধ্যে সোনা-রূপা ছাড়াও ঘোড়া এবং আরও অনেক কিছু ছিল। এই পুঁজি দিয়ে এই লোকদের একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করার সক্ষমতা অর্জিত হলো।

মনে হচ্ছিল যে এখন গুজরাট সুলতানের হাত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যাবে। [২]

সুলতানের গুজরাট সফর (৭৪৮ হিজরি):

এখন সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে গুজরাটের এই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবেন। সুলতানের উস্তাদ কুতলুগ খান যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি ঘাবড়ে গিয়ে আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানি (যিনি তারিখ-ই ফিরোজ শাহী লিখেছেন)-এর মাধ্যমে সুলতানের দরবারে নিম্নোক্ত লিখিত আবেদন পাঠালেন:

“দাভুই এবং বারোদার এই বিদ্রোহী সর্দাররা এমন কী জিনিস যে সুলতান তাদের দমনের জন্য নিজে কষ্ট করছেন। এই লোকদের আসল অভিযোগ ছিল আজিজ খাম্মারের শাসনের বিরুদ্ধে। আপনি আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিকে আদেশ করুন, আমি গিয়ে তাদের আনুগত্যের বলয়ে নিয়ে আসব। সুলতান যদি নিজে এই অভিযানে যান, তবে এই সর্দাররা আরও বেশি ঘাবড়ে যাবে এবং হিন্দু রাজাদের সাথে গিয়ে মিশে যাবে।”

কিন্তু সুলতান এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক ফিরোজ, বৃদ্ধ উজির আহমদ আয়াজ এবং মালিক কবিরের হাতে সালতানাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং সেনাবাহিনীকে নিজের অধীনে নিয়ে ৭৪৮ হিজরির রমজান মাসের শেষ দশকে গুজরাটের দিকে যাত্রা করলেন। সুলতানের কল্পনাতেও ছিল না যে এর পরে তাঁর আর দিল্লি ফেরা নসিব হবে না এবং এই সফরেই তাঁর পরকালের সফর শুরু হয়ে যাবে।

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮।

[২] তারিখ-ই ফিরিশতা ফারসি: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭; তারিখ-ই ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭।

এখানে এই বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, সুলতানের শেষ বছরগুলোতে তাঁর সামরিক শক্তি আগের তুলনায় কমে গিয়েছিল। সৈন্য ও অফিসাররা ক্রমাগত যুদ্ধ ও বিদ্রোহের কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুলতানের মাত্রাতিরিক্ত বদান্যতার কারণে বারবার অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিচ্ছিল, ঘোড়াগুলোর সঠিক দেখাশোনার অভাবে অশ্বারোহী বাহিনীর অবস্থাও ভালো ছিল না। ফলে সুলতান একটি বড় বাহিনী প্রস্তুত করতে পারেননি এবং মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন। পথে সুলতানপুর [১] নামক জনপদে পৌঁছালে সুলতান সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। [২]

আল্লামা বারানি ও সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের কথোপকথন:

এই সফরে আল্লামা বারানিও সুলতানের সাথে ছিলেন। এক রাতের শেষ প্রহরে সুলতান আল্লামাকে ডেকে বললেন: “মানুষের ধারণা যে, দেশে এই বিদ্রোহগুলো বাদশাহর কঠোর শাস্তির কারণে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু মানুষের কথার কারণে আমি অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া বন্ধ করতে পারি না। তুমি ইতিহাসের অনেক বই পড়েছ। বলতে পারো কি কি ক্ষেত্রে বাদশাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হয়?”

আল্লামা বারানি উত্তর দিলেন: “‘তারিখে কিসরাভি’-তে লেখা আছে যে, বাদশাহর কাছে সাতটি এমন ক্ষেত্র রয়েছে যখন তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কাজে লাগাতে পারেন। আর এই সাতটি অপরাধ নিম্নরূপ:

- ১. সত্য দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া।
- ২. জেনেবুঝে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।
- ৩. বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিত নারীর ব্যভিচার করা।
- ৪. বাদশাহর অবাধ্যতা করা।
- ৫. কোনো হাঙ্গামা ও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।
- ৬. যখন প্রজারা অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের সাথে মিশে যায় এবং অস্ত্র বা অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করে।
- ৭. বাদশাহর নির্দেশ অমান্য করা এবং তা পুরোপুরি পালন না করা।“

মুহাম্মদ তুঘলক জিজ্ঞাসা করলেন: “হাদিস দ্বারা এই অপরাধগুলোর মধ্যে কোন কোনটির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রমাণিত?”

আল্লামা বারানি বললেন: “প্রথম তিন প্রকার অর্থাৎ ইরতিদাদ, যিনা ও হত্যার ব্যাপারে ফিকহী মাসআলা ও হাদিসের বিস্তারিত বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। এছাড়া বাকি চারটি অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেশের কল্যাণ ও রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বিবেচনা করে বাদশাহদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।”

বাদশাহ বললেন: “পুরানো আমলের প্রজারা অনুগত ছিল। মানুষের কাজ ও চরিত্রে মহত্ত্ব ও সত্যবাদিতা ছিল সাধারণ বিষয়। কিন্তু আমাদের যুগে মন্দের স্থান ভালোর বদলে দখল করে নিয়েছে, তাই বর্তমান সময়ের মানুষের পক্ষ থেকে তাদের ফিতনা...”

---

[১] তারিখে ফিরোজ শাহীতে সুলতানপুরকে দিল্লি থেকে পনেরো ক্রোশ অর্থাৎ ত্রিশ মাইল দূরে বলা হয়েছে। প্রবল ধারণা অনুযায়ী এই জায়গাটি হলো হরিয়ানার গুরগাঁও (গুরুগ্রাম) জেলার ‘সুলতানপুর ন্যাশনাল পার্ক’, যা দিল্লি থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই এলাকায় একটি প্রাচীন জনবসতি ছিল এবং গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলের একটি প্রাচীন মসজিদও বিদ্যমান রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: তারিখে ফিরোজ শাহীতে এই সফরের তারিখ ২৫ রমজান ৭৫১ হিজরি বলা হয়েছে যা ভুল। সঠিক হলো ৭৪৮ হিজরি যেমনটি ইয়াহইয়া সিরহিন্দি ও ফেরেশতা উল্লেখ করেছেন।

[২] তারিখে ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯।

“আমি অনিষ্ট, প্রতারণা ও বিদ্রোহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আচরণ করি এবং ফাসাদ ও বিদ্রোহের সন্দেহের ভিত্তিতেও হত্যা করিয়ে দিই। এখন হয় প্রজারা এসব মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে অথবা আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। আফসোস যে আমার কাছে এমন কোনো বুদ্ধিমান উজিরও নেই যে রাজনীতির বিষয়গুলোও সঠিকভাবে বজায় রাখবে এবং সাধারণ মানুষকেও ক্ষুব্ধ হতে দেবে না।” [১]

প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ তার মানসিক উচ্চাভিলাষের কারণে কোনো নসিহতকারীর উপদেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে রাজি ছিলেন না।

কেউ একজন গিয়ে বুকরাতকে জিজ্ঞেস করল... আপনার মতে মারাত্মক রোগগুলো কী কী?

তিনি বললেন, জগতে এমন কোনো দুঃখ নেই... যার ওষুধ আল্লাহ সৃষ্টি করেননি।

তবে সেই রোগ যাকে মানুষ সহজ মনে করে,

চিকিৎসক যা বলেন তাকে প্রলাপ মনে করে। [২]

গুজরাটের শাসক আজিজ খাম্মার নিহত হওয়া:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক তখনো সেই জনপদেই অবস্থান করছিলেন যখন তিনি মালওয়ার সুবাদার আজিজ খাম্মারের একটি বার্তা পেলেন, যাতে তিনি জানাচ্ছিলেন যে তিনি গুজরাটের বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ‘ধার’ থেকে রওনা হচ্ছেন। সুলতান এটি শোনা মাত্রই নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে আজিজ খাম্মার পরাজিত হবেন, কারণ যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা তার ছিল না। এমনটাই হলো। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আজিজ খাম্মারের সাথে কাজী জালাল এবং তার সঙ্গী বিদ্রোহী আফগান আমিরদের মুখোমুখি মোকাবিলা হলো, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন এবং বিদ্রোহী আমিররা তাকে ধরে ফেলল। এরপর তাকে চরম নির্যাতন করে হত্যা করা হলো। [৩]

সুলতানের বিদ্রোহীদের ওপর বিজয় (৭৪৮ হিজরি):

সুলতান এই খবর শুনে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গুজরাটের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ‘আনহিলওয়ারা’ (পত্তন)-কে ডান দিকে রেখে ‘আবুগড়’ [৪] পাহাড় অতিক্রম করে বরোদার কাছে পৌঁছে গেলেন। এখানে সরকারি বাহিনী এবং লশকরে আমিরানে সাদাহ-র মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাজকীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আমির মুইজউদ্দিন এবং উজির ইমাদুল মুলক। অবশেষে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে দৌলতাবাদের দিকে পিছু হটল। সুলতান তাদের পেছনে বরোদা থেকে (৭৫ কিলোমিটার) দক্ষিণে ভরুচ [৫] পর্যন্ত এলেন এবং মালিক কবুল ও উজির ইমাদুল মুলককে প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবনে সামনে পাঠিয়ে দিলেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৫০৯, ৫১০, ৫১১

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃ. ৫০৯; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৪৬, ২৪৭

[৩] হালি

[৪] দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় আটশ কিলোমিটার দূরে আবুগড় পাহাড় (মাউন্ট আবু) অবস্থিত যা ‘আরাবল্লী’ পর্বতশৃঙ্গের অংশ এবং ভারতীয় রাজ্য রাজস্থানের সিরোহি জেলায় গুজরাট সীমান্তে অবস্থিত। দেবগড় (দৌলতাবাদ) এর দক্ষিণ দিকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ কিলোমিটার দূরে।

[৫] ভরুচ ভারতের গুজরাট রাজ্যে নর্মদা নদীর মোহনায় খাম্বাত উপসাগরের কাছে একটি প্রাচীন বন্দর নগরী এবং একে ভারতের অন্যতম প্রাচীন শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল, যার সম্পর্ক প্রাচীন রোম, ইরান এবং দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত ছিল। এটি দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় এগারোশ কিলোমিটার দূরে। বরোদা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার।

নর্মদা নদীর তীরে ইমাদুল মুলক পলাতক বিদ্রোহীদের ধরে ফেলেন এবং অনেককে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করেন, যেখানে অনেক আমীরান-ই-সদাহ বন্দী হন। কিছু আমীরান-ই-সদাহ পালিয়ে বাগলানার হিন্দু শাসকের কাছে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সুলতানের প্রতিশোধের ভয়ে তাদের আশ্রয় দেওয়ার পরিবর্তে তাদের লুট করেন এবং কিছুকে বন্দী করে বাকিদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। অন্যদিকে সুলতান, যিনি ভরুচে অবস্থান করছিলেন, খাম্বাত এবং অন্যান্য শহর থেকে খাজনা ও করের নামে বিপুল ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন এবং বিদ্রোহীদের সহযোগিতার অভিযোগে অনেক মানুষকে কঠোর শাস্তি দেন। এভাবে গুজরাটে বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়। [১]

দৌলতাবাদেও আমীরান-ই-সদাহর বিদ্রোহ (৭৪৭ হিজরি):

সুলতান যদি এই বিজয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন তবে ভালো হতো, কিন্তু এরপর তিনি সরকারি শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য আমীরান-ই-সদাহর থেকেও মুক্তি পাওয়া জরুরি মনে করলেন। ফলে অত্যন্ত কঠোর মেজাজের দুই কর্মকর্তা জয়নুদ্দীন জন্দা এবং ইবনে রুকন থানেসারিকে নির্দেশ দিয়ে দৌলতাবাদে পাঠালেন যেন সেখানকার আমীরান-ই-সদাহদের সুলতানের দরবারে ভরুচে উপস্থিত করা হয়। অন্যান্য স্থানীয় কর্মকর্তাদের কাছেও একই নির্দেশ পাঠানো হয়, যেমন মালিক আহমদ লাচিন এবং আলী আফসার জামদারকেও পাঠানো হয়েছিল। সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল আমীরান-ই-সদাহদের একত্রিত করে হত্যা করা।

মোটকথা রায়চুর, গুলবার্গা, গঙ্গাবতী, বেরার, রামগির এবং কানহোটির মতো শহরগুলোতে এই নির্দেশ পাঠানো হয়। অনেক আমীরান-ই-সদাহ এই নির্দেশে শাহী ক্রোধ অনুভব করে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যান। বাকিরা সুলতানি নির্দেশ মেনে নিয়ে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সাথে সুলতানের দিকে রওনা হন, কিন্তু পথিমধ্যে এই কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তারা টের পান বা সন্দেহ করেন যে তাদের হত্যা করা হবে। ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের পাহারাদার সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেন এবং এরপর সুলতানের কর্মকর্তাদের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইবনে রুকন থানেসারি এবং মালিক আহমদ লাচিন নিহত হন।

এখন আমীরান-ই-সদাহ দৌলতাবাদ দখল করে নেন। এখানে সংরক্ষিত কোষাগারগুলো, যা অনিরাপদ রাস্তার কারণে দীর্ঘকাল ধরে এখানে জমা হচ্ছিল, বিদ্রোহীদের হাতে চলে আসে। বিদ্রোহীরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন তাদের সালতানাতের একজন বাদশাহ থাকা উচিত। তাদের অভিজ্ঞ নেতা ইসমাইল হাসান গঙ্গুর নাম প্রস্তাব করেন, কিন্তু হাসান গঙ্গু সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না, তাই সবাই ইসমাইলকে সিংহাসনে বসান, যিনি নাসিরুদ্দীন উপাধি নিয়ে বাদশাহ হওয়ার ঘোষণা দেন। [২]

আমীরান-ই-সদাহর সাথে ভরুচের যুদ্ধ (৭৪৭ হিজরি):

ভরুচে অবস্থানরত সুলতান যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অবিলম্বে লস্কর নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন এবং দৌলতাবাদের কাছে আমীরান-ই-সদাহর সাথে সংঘর্ষ হয়। আমীরান-ই-সদাহ পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করেন এবং সুলতানি বাহিনীর ডান ও বাম উভয় পার্শ্বকে পিছু হটিয়ে দেন। প্রায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে তারা বিজয়ী হবেন, কিন্তু সুলতানের আক্রমণে তাদের সেনাপতি নিহত হন এবং বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যান। মুহাম্মদ তুঘলক একে পূর্ণ বিজয় বলে ঘোষণা করেন এবং দিল্লিতে বিজয়ের উৎসব পালনের নির্দেশ দেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২৭২, ২৭৩; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ৫১২, ৫১৩

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ৫১২, ৫১৩

সুলতান কিছুকাল দৌলতাবাদের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেন এবং আমীরগণ উপস্থিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকেন। [১]

মালিক তাগির বিদ্রোহ (৭৪৯ হিজরি):

এরই মধ্যে মালিক তাগি নামক আরেকজন সরদার সুলতানের জন্য নতুন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ান। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের একজন তুর্কি গোলাম ছিলেন, যাকে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক নিজের দরবারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে তাকে গুজরাটে নিয়োগ দেওয়া হয়। শুরুতে যখন কাজী জালাল আফগান বিদ্রোহ করেছিলেন, তখন তিনি সেই বিদ্রোহ দমনে সুলতানের সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমীরান-ই-সাদাহ সাধারণভাবে বিদ্রোহ করে, তখন তিনি তাদের সাথে যোগ দেন। এতে সুলতান অত্যন্ত দুঃখিত হন।

সুলতান দৌলতাবাদে অবস্থানকালে সংবাদ পান যে, 'মালিক তাগি' 'আনহিলওয়ারা' এবং 'খাম্বাত'-এ ব্যাপক লুটতরাজ চালিয়েছে এবং এখন সে 'ভরুচ' দখলের চেষ্টা করছে। সুলতান আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। তিনি দৌলতাবাদ ও এর আশপাশের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কাওয়ামুদ্দিন, মালিক জওহর এবং শেখ বুরহান (জহিরুল জুয়ুশ)-এর ওপর অর্পণ করেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত ভরুচের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু তিনি যখন ভরুচের কাছাকাছি পৌঁছান, তখন মালিক তাগি নর্মদা নদী পার হয়ে খাম্বাতের দিকে পালিয়ে যায়।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক মালিক ইউসুফ বুগরাকে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবনে পাঠান। খাম্বাতের কাছে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় যাতে মালিক ইউসুফ বুগরা নিহত হন। সুলতান এই সংবাদ শুনে নিজেই ভরুচ থেকে দ্রুত পথ অতিক্রম করে খাম্বাতে পৌঁছে যান, কিন্তু ততক্ষণে মালিক তাগি পিছু হটে আসাওয়াল (আহমেদাবাদ)-এ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এরপর যখন সে সুলতানের কাছাকাছি আসার খবর পেল, তখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে আনহিলওয়ারা (পত্তন)-এ চলে গেল।

সুলতানও পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখেন, কিন্তু এরই মধ্যে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সুলতানি বাহিনীর সওয়ারিগুলো ক্রমাগত সফরের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই সুলতানকে এক মাস আহমেদাবাদে অবস্থান করতে হয়। মালিক তাগি সুলতানকে অগ্রসর হতে অক্ষম মনে করে আনহিলওয়ারা থেকে পুনরায় আহমেদাবাদের দিকে ফিরে আসে এবং 'কাররা' নামক একটি জনপদে তাবু ফেলে। সুলতানকে যখন গোয়েন্দারা এই সংবাদ দেয়, তখন তিনি মুষলধারে বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে দ্রুত ছুটে যান এবং চোখের পলকে বিদ্রোহী সরদারের সামনে পৌঁছে যান। তাগি মৃত্যুকে মাথার ওপর নাচতে দেখে পরিণামের পরোয়া না করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে এক ভয়াবহ সংঘর্ষের পর সে পরাজিত হয়। তার চার-পাঁচশ সঙ্গী গ্রেপ্তার হয়, আর সে পালিয়ে আনহিলওয়ারা হয়ে হরিয়ানায় চলে যায় এবং 'কারনাল'-এর রাজার কাছে আশ্রয় নেয়।

এখন সাময়িকভাবে গুজরাটে বিদ্রোহীদের নির্মূল করা হয়েছিল এবং অবশিষ্ট ফিতনাবাজরা গর্তে লুকিয়ে পড়েছিল। [২]

সুলতান ও আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানির কথোপকথন:

বারবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বিদ্রোহের শিখা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলককে ক্লান্ত করে ফেলেছিল এবং তিনি নিজের চোখে নিজের সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো হতে দেখছিলেন। তার অনুগত আমীরগণ তার ওপর অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং একের পর এক বিদ্রোহ করছিলেন।

---

[১] তারিখ-ই ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৫১৪, ৫১৫।

[২] তারিখ-ই ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৫১৪, ৫১৫, ৫১৯।

এই চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে একদিন সুলতান আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানিকে ডাকলেন। যেহেতু ইতিহাসের ওপর তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল, তাই সুলতান তাঁর সাথে পরামর্শ করতে চাইলেন। সুলতান অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে তাঁকে বললেন:

“আমার সাম্রাজ্য অসুস্থ এবং এর অসুস্থতার চিকিৎসা কোনো ওষুধ দিয়ে করা সম্ভব নয়। যদি চিকিৎসক এর পিঠের ব্যথার চিকিৎসা করেন, তবে জ্বর বেড়ে যায়। যদি তিনি এর জ্বরের চিকিৎসা করেন, তবে এর ধমনীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আমার সাম্রাজ্যে একই সাথে বিভিন্ন রোগ দেখা দিয়েছে। যদি আমি এক স্থানের অবস্থা সংশোধন করি, তবে অন্য স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যদি আমি সেগুলোকে দ্বিতীয় স্থানে সংশোধন করি, তবে তৃতীয় স্থানে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের এই রোগগুলো সম্পর্কে অতীতের বাদশাহরা কী বলেছেন?”

আল্লামা বারানি বুঝতে পেরেছিলেন যে সুলতানের মেজাজের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো, কিন্তু সুলতানের চিন্তা ও অস্থিরতা তাঁকে বাধ্য করল যেন তিনি উপযুক্ত শব্দে সুলতানের সামনে সত্য কথাটি বলে দেন। তিনি বললেন:

“ইতিহাসের বইগুলোতে সাম্রাজ্যের রোগসমূহের ক্ষেত্রে বাদশাহদের নির্ধারিত চিকিৎসা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু সুলতান যখন দেখলেন যে মানুষ তাঁদের ওপর আস্থা রাখা ছেড়ে দিয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ঘৃণা তৈরি হয়েছে, তখন তাঁরা সাম্রাজ্য ত্যাগ করেছেন এবং নিজের জীবদ্দশাতেই সাম্রাজ্যকে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে যাকে যোগ্য মনে করেছেন, তার হাতে তুলে দিয়েছেন এবং নিজে সাম্রাজ্যের কোনো এক কোণে গিয়ে নিজেকে এমন সব কাজে নিয়োজিত করেছেন যা তাঁদের বিষণ্ণতা থেকে দূরে রাখে। তাঁদের পদত্যাগের পর তাঁরা সাম্রাজ্যের বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপও করেননি। কিছু সুলতান সিংহাসন ছাড়ার পরিবর্তে রাষ্ট্রের সমস্ত মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয় উজির এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হাতে অর্পণ করেছেন এবং নিজে ভ্রমণ ও শিকার, বিনোদন, মদ্যপান ও সংগীতে মগ্ন হয়ে গেছেন এবং দেশের অবস্থা অনুসন্ধান করা ও আদেশ দেওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থেকেছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের জন্য এটিই সবচেয়ে বড় রোগ যে মানুষ বাদশাহকে ঘৃণা করতে শুরু করে।”

আল্লামা বারানির এই উত্তরের মধ্যে পরামর্শটি একেবারে স্পষ্ট ছিল যে সুলতানের জন্য এখন সিংহাসন ত্যাগ করাই এই রোগের চিকিৎসা। কিন্তু এই পরামর্শ সুলতানের মেজাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল, তাই সুলতান এটি প্রত্যাখ্যান করে বললেন:

“যদি সাম্রাজ্যের বিষয়গুলো আমার ইচ্ছা অনুযায়ী ঠিক হয়ে যেত, তবে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি হজের জন্য মক্কায় চলে যেতাম এবং সাম্রাজ্যের বিষয়গুলো এই তিন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করতাম: ফিরোজ, মালিক কবির এবং আহমদ আয়াজ। কিন্তু বর্তমানে আমি জনগণের ওপর অসন্তুষ্ট এবং তারা আমার ওপর অসন্তুষ্ট। মানুষ আমার মেজাজ ভালো করেই জানে এবং আমি তাদের অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। প্রতিটি পরিকল্পনা যা আমি সম্পন্ন করার চেষ্টা করি, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। বিদ্রোহী, বিরোধী, অবাধ্য এবং অশুভকামনাকারীদের জন্য আমার চিকিৎসা হলো তলোয়ার। আমি আমার তলোয়ার দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া এবং যুদ্ধ করা চালিয়ে যাব যতক্ষণ তা কাটতে সক্ষম হবে। মানুষ যত বেশি আমার বিরোধিতা করবে, আমার শাস্তিও তত কঠোর হবে।” [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃষ্ঠা ৫২১, ৫২২।

গালিব তুমিই বলো কী জবাব পাওয়া যাবে... মানলাম যে তুমি বলতে থাকলে আর তারা শুনতে থাকল।

গুজরাটে অবস্থান (৭৫০ হিজরি):

সুলতান এখন গুজরাটে দীর্ঘকাল অবস্থানের ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজ করাতে থাকেন, বিশেষ করে কৃষির ওপর এত মনোযোগ দেন যে কয়েক মাসের মধ্যে পুরো গুজরাট সবুজ ও সজীব হয়ে ওঠে। এই সময়ে চারদিক থেকে মুসলিম আমীর এবং হিন্দু রাজা ও মহারাজারা এসে সুলতানের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করতে থাকেন। মনে হচ্ছিল এখন সবদিকেই কল্যাণ আর কল্যাণ।

কিন্তু আমীরান-ই-সাদাহ-এর অবশিষ্ট লোকেরা ভেতরে ভেতরে পুনরায় সংগঠিত হচ্ছিল। তাদের প্রধান নাসিরুদ্দিন ইসমাইল পদত্যাগ করেছিলেন এবং তার জায়গায় হাসান গাঙ্গু নামক এক অত্যন্ত চতুর আমীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারা সুলতানের বিখ্যাত সেনাপতি ইমাদুল মুলক সারতিজকেও পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর তার অগ্রযাত্রার ভয়ে সুলতানের অনুগত আমীরগণ: মালিক জওহর, কিওয়ামুদ্দিন এবং বুরহান (জহিরুল জিউশ) দৌলতাবাদ থেকে পালিয়ে মালবের সদর দপ্তর মাণ্ডুতে চলে যান। শীঘ্রই সুলতান খবর পেলেন যে হাসান গাঙ্গু "আলাউদ্দিন হাসান" উপাধি ধারণ করে দৌলতাবাদে নিজের বাদশাহি ঘোষণা করেছেন। এই সব খবর সুলতানকে দুঃখ, ক্রোধ ও অস্থিরতার চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল।

সুলতান দিল্লি থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়ে একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করেন যাতে হাসান গাঙ্গুর কাজ শেষ করা যায়। কিন্তু উপদেষ্টারা তাকে জানালেন যে হাসান গাঙ্গুর বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী, তাই তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না। বাস্তবতা হলো এই বছরগুলোতে সুলতানের বাহিনী সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া এবং ব্যয়ের দিক থেকে চরম অবনতির শিকার ছিল এবং দীর্ঘ যুদ্ধের যোগ্য ছিল না।

ফলে সুলতান এই অভিযান আগামী বছর পর্যন্ত স্থগিত করে দেন। তিনি গুজরাটের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে থাকেন। দক্ষিণ-পশ্চিম হিন্দুস্তানে দুই বছর কাটিয়ে ৭৫০ হিজরির শেষের দিকে সুলতান ফিরে যান। পেছনে হাসান গাঙ্গু দাক্ষিণাত্যে নিজের সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যা "বাহমানি সালতানাত" নামে পরিচিত হয়। [১]

মালিক তাগির পশ্চাদ্ধাবন - কারনাল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত:

প্রত্যাবর্তনের সময় সুলতান হরিয়ানার পথ অবলম্বন করেন কারণ সুলতানের বিদ্রোহী মালিক তাগি হরিয়ানার "কারনাল"-এর

ঐতিহাসিক ফিরিশতা আল্লামা বারনির উত্তর এভাবে উদ্ধৃত করেছেন: "ইতিহাসে লেখা আছে যে, যদি কোনো শাসকের প্রজারা তাকে ঘৃণা করে এবং দেশে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, তবে বাদশাহর উচিত তার ভাই বা ছেলেকে উত্তরসূরি বানিয়ে নিজে নির্জনে চলে যাওয়া। যদি তিনি সালতানাত ত্যাগ করা সমীচীন মনে না করেন, তবে সেই সব বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত যা প্রজাদের মধ্যে ঘৃণা ছড়ায়।" উত্তরে সুলতান বলেছিলেন: "আমার এমন কোনো পুত্র নেই যে উত্তরসূরি হতে পারে। আর না আমি নিজে সালতানাতের কাজ থেকে আলাদা হতে পারি। অতএব যা-ই হোক না কেন, আমার কোনো পরোয়া নেই।" (তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৭৮, ৪৭৯)

দ্রষ্টব্য: আল্লামা বারনির এই উপদেশের সেই সময়ে হয়তো কোনো ফল হয়নি, কিন্তু সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক শেষ সময়ে তার অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ ভাতিজা ফিরোজ শাহ তুঘলককে নিজের উত্তরসূরি বানিয়ে যেন "দেরিতে হলেও সঠিক কাজ" করেছেন। ফিরোজ শাহ একজন আদর্শ শাসক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন, যার শাসনামলে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ ও উন্নয়ন চরম শিখরে পৌঁছেছিল।

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৭৭, ৪৭৮; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারনি): পৃষ্ঠা ৫১৯, ৫২০, ৫২১

রাজার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। করনালের রাজা সুলতানের অগ্রযাত্রার খবর শুনে ভীত হয়ে পড়লেন এবং মালিক তাগিকে গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মালিক তাগি খবর পেয়ে গোপনে সেখান থেকে পালিয়ে রাজস্থান হয়ে সিন্ধুর দিকে চলে গেলেন। এদিকে করনালের রাজা আনুগত্য প্রকাশ করে সুলতানের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানালেন। সুলতান তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং করনাল থেকে মালিক তাগির সন্ধানে রাজস্থানের দিকে রওনা হলেন।

ইতিমধ্যে জানা গেল যে মালিক তাগি সিন্ধু নদ পার হয়ে গেছেন। সুলতান তার বাহিনীকে তাকে ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও দ্রুত গতিতে সেই দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। [১]

সুলতানের অসুস্থতা এবং দিল্লি থেকে রাজকীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আগমন:

সফরের মাঝপথে সুলতান খবর পেলেন যে দিল্লিতে তার নায়েব মালিক কবীর ইন্তেকাল করেছেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ দিল্লির ব্যবস্থাপনার জন্য খাজা জাহানকে উজির হিসেবে এবং ইমাদুল মুলককে নায়েব হিসেবে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন এবং তার বিশেষ আত্মীয়-স্বজনদের দিল্লিতে তার কাছে পৌঁছানোর নির্দেশ দিলেন।

সুলতান করনাল থেকে পনেরো ক্রোশ (৪৮ কিলোমিটার) দূরে ‘কুন্দল’ নামক স্থানে পৌঁছালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখানেই রাজকীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন, যাদের মধ্যে সুলতানের বোন ‘খোদাওয়ান্দজাদা’ও ছিলেন। [২]

তাদের আগমনের পর সুলতানের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে শুরু করে এবং তিনি শীঘ্রই সফরের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। [৩]

শেষ অভিযান এবং শেষ সফর:

মালিক তাগি ইতিমধ্যে সিন্ধুর ঠাট্টায় সুমরাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুলতান ক্রমাগত সফরের কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তার স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহী এবং তাকে আশ্রয়দানকারীদের শিক্ষা দেওয়া জরুরি মনে করলেন এবং কোথাও দীর্ঘ বিরতি না নিয়েই এগিয়ে চললেন। তার আহ্বানে দিপালপুর এবং মুলতান থেকেও সামরিক বাহিনী সাহায্যের জন্য বেরিয়ে পড়ল। সুলতান আজ থেকে সিন্ধু নদের তীরে পৌঁছালেন যেখানে নৌকার বহর প্রস্তুত ছিল। ফলে সুলতান নৌকায় করে সেহওয়ান পৌঁছালেন এবং কিছু আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সুমরা সরদারদের কাছে দূত হিসেবে পাঠিয়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন যেন তারা বিদ্রোহীদের আশ্রয় না দেয়। একই সাথে সুলতান সিন্ধু নদের ওপারে শাসনকারী মঙ্গোল শাহজাদা আমির ফিরুনকেও বার্তা পাঠালেন যেন তিনি একজন ভালো প্রতিবেশী হিসেবে তাকে সাহায্য করেন এবং কিছু সামরিক সহায়তা পাঠান। ফলে মঙ্গোল শাহজাদা আমির ফিরুন তার একজন অফিসার আলতুন বাহাদুরের নেতৃত্বে সুলতানের সাহায্যের জন্য পাঁচ হাজার অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলেন যারা কয়েকদিন পর পৌঁছে সুলতানি লস্করে যোগ দিল। সুলতান তাদের অনেক সম্মান ও সমাদর করলেন।

---

[১] তারিখ ফিরিশতা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৬, ৩১৭; তারিখ ফিরোজশাহী আজ বারানি: পৃষ্ঠা ৫২২, ৫২৩।

[২] সম্ভবত খোদাওয়ান্দজাদার স্বামী এবং সুলতানের ভাগ্নে ফিরোজ শাহ তুঘলকও তাদের মধ্যে ছিলেন।

[৩] তারিখ ফিরিশতা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭৯।

যেহেতু সুমরা সর্দাররা সুলতানের তলব সত্ত্বেও অবাধ্য তগী দুর্ভাগাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল, তাই সুলতান সুমরা সর্দারদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নৌবহর নিয়ে সিহওয়ান থেকে ঠাট্টার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

এর মধ্যে ১০ই মহরমের দিন এলে বাদশাহ যথারীতি রোজা রাখলেন এবং ইফতারে নদীর তাজা মাছ খেলেন। এর পরপরই তাঁর জ্বর আসে, যার কারণে ঠাট্টা থেকে চৌদ্দ ক্রোশ দূরে নদীর ওপারে (পূর্ব তীরে) তিনি ছাউনি ফেলেন। রোগ বাড়তে থাকে এবং ২১শে মহরম ৭৫২ হিজরি (১৮ই মার্চ ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ) মুহাম্মদ তুঘলক তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকেন, যখন হতাশা ও আক্ষেপের কারণে তাঁর অবস্থা ছিল শোচনীয়। তিনি ফারসি ভাষার একজন দক্ষ কবি ছিলেন, তাই এই অবস্থায় তিনি এই আক্ষেপপূর্ণ কবিতাগুলো বলেন:

বিসিয়ার দরীন জাহাঁ চুমিদেম ..... বিসিয়ার নাঈম ও নায দিদেম
(দীর্ঘকাল আমরা এই দুনিয়ায় বিচরণ করেছি ..... অনেক নাজ-নেয়ামত ও বিলাসিতার অবস্থা দেখেছি।)
আসপানে বুলান্দ বর নিশাস্তেম ..... তুর্কানে গেরা বোহা খারিদেম
(উন্নত জাতের ঘোড়ায় চড়েছি ..... অনেক দামী তুর্কি গোলাম কিনেছি।)
করদেম বে নিশাত ও আখের ..... চু قامت মাহে নও খুমিদেম
(আমরা খুব ভোগ-বিলাস করেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ..... আমরা বাঁকা নতুন চাঁদের মতো হয়ে গেলাম।)

কয়েক মুহূর্ত পর সুলতান মৃত্যুর ডাককে লাব্বাইক বললেন। সেই তুফানি সত্তার অবসান ঘটল, যিনি এক চতুর্থাংশ শতাব্দী ধরে রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য নিরন্তর চিন্তা, ভাবনা ও দৌড়ঝাঁপে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর অসতর্ক এবং জবরদস্তিমূলক ও কঠোর রাজনীতির কারণে মানুষকে সর্বদা সংকটে ফেলে রেখেছিলেন। পরলোকগত সুলতান পুত্রসন্তানহীন ছিলেন, তাই তাঁর চাচাতো ভাই ফিরোজ শাহ তুঘলককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়েছিল। [১]

ফিরোজ শাহ তুঘলকের উত্তরাধিকার: একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত:

মুহাম্মদ তুঘলক তাঁর শাসনামলে যে কঠোরতা করেছিলেন তা দুঃখজনক হলেও ফিরোজ শাহ তুঘলকের মতো একজন নম্র স্বভাবের, প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী করা এই কথার প্রমাণ যে, মুহাম্মদ তুঘলক শেষ পর্যন্ত তাঁর ভুলগুলো বুঝতে পেরেছিলেন এবং এখন তিনি অতীতের ক্ষতিপূরণ এবং জবরদস্তিমূলক রাজনীতির ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত এটিই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা। ফিরোজ শাহের নিয়োগ আমাদের সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক কর্তৃক উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-কে উত্তরাধিকারী করার কথা মনে করিয়ে দেয়, যা ছিল বনু মারওয়ানের পূর্ববর্তী শাসকদের ভুল শাসনপদ্ধতি সংশোধনের একটি শেষ প্রচেষ্টা, যার জন্য ওলামায়ে কেরাম সর্বদা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং মুহাম্মদ তুঘলকের এই সিদ্ধান্তটি শত প্রশংসার দাবিদার ছিল, যা হিন্দুস্তানে জবরদস্তি ও কঠোরতার যুগের অবসান ঘটিয়েছিল এবং ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের যুগের সূচনা করেছিল।

বাগানের অবস্থা দেখে মালি তুমি বিচলিত হয়ো না
কলিরূপী নক্ষত্র দ্বারা শাখাগুলো শীঘ্রই ঝলমল করে উঠবে

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ২৯৭; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বারানি): পৃ. ৫২৩ থেকে ৫২৫।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

খড়কুটো থেকে বাগান মুক্ত হয়

শহীদদের রক্তের লালিমা ফুল বর্ষণকারী

আকাশের রঙ একটু দেখো তো লালচে বেগুনি

এটি উদীয়মান সূর্যের দিগন্তের আভা [১]

পতনের কারণসমূহ:

মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে দিল্লি সালতানাত এতটাই বিস্তৃত হয়েছিল যে এর আগে এর কোনো নজির পাওয়া যায় না। কিন্তু এই বাদশাহর শেষ বছরগুলোতে গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং বাংলা বিদ্রোহ কবলিত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া মালব, জৌনপুর এবং খানদেশসহ অনেক এলাকা কিছুকাল পর সালতানাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই এলাকাগুলো আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামল পর্যন্ত আর দিল্লি সালতানাতের অংশ হতে পারেনি। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- মুহাম্মদ তুঘলকের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সালতানাত যা ২৩টি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তা অত্যন্ত বিশাল ছিল। এরপর তিনি দক্ষিণে আরও বিজয় লাভ করেন। এত বিশালতার কারণে দূরবর্তী প্রদেশগুলোকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাদশাহ নিজে সৈন্য পরিচালনা করলে সাধারণত বিজয় লাভ করতেন, কিন্তু তিনি যেখান থেকে দূরে যেতেন, সেখানকার সুবাদাররা সামান্য কারণে বিদ্রোহ করে বসতেন। কেন্দ্র থেকে দীর্ঘ দূরত্বের কারণে এই প্রদেশগুলোতে কেন্দ্রবিমুখ আন্দোলনগুলো সফল হয়ে যায়।

- মুহাম্মদ তুঘলকের মেজাজে জবরদস্তি, রাগ এবং সন্দেহ-সংশয় অনেক বেশি ছিল যা আমিরদের ভীত ও নিরুৎসাহিত করে দিত। এই কঠোরতা নিকটতম আমিরদেরও আতঙ্কিত করে রেখেছিল, তাই দূরবর্তী সুবাদাররা স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই নিরাপত্তা খুঁজে পেতে শুরু করেন।

- মুহাম্মদ তুঘলকের প্রায় সাতাশ বছরের শাসনামলে একাধিকবার এমন হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি হয়ে গিয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল তাঁর সীমাহীন দানশীলতা যা কোনো নিয়ম বা উপযোগিতার তোয়াক্কা করত না। দ্বিতীয় কারণ ছিল দুর্ভিক্ষ। তৃতীয় কারণ ছিল চীন, মধ্য এশিয়া এবং ইরান বিজয়ের স্বপ্ন যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সাথে দেশের অর্থনীতিকেও ডুবিয়ে দিয়েছিল।

- দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তুর্কি বিজেতারা এবং ইসলামি উদ্দীপনা ছাড়াও জাতীয় সংহতি তাদের একতাবদ্ধ করে রেখেছিল। শাসনব্যবস্থা যত বিস্তৃত হতে লাগল, এই উদ্দীপনা তত কমতে থাকল এবং তুর্কি গোত্রগুলো আগের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকল না।

- তুর্কি ও আফগানদের মধ্যেও আগের মতো পারস্পরিক সহযোগিতার সেই সম্পর্ক রইল না যা বিজয়, আস্থা ও স্থিতিশীলতার কারণ ছিল।

- যদিও সুলতানের সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুত ছিল, কিন্তু সালতানাতের মহাসড়কগুলোর নির্মাণ, মেরামত ও নিরাপত্তার দিকে কোনো মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তাই উত্তর থেকে দক্ষিণে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। একেকটি অভিযানে কয়েক মাস সময় লেগে যেত।

মুহাম্মদ তুঘলকের শেষ সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের প্রদেশগুলোর দিল্লি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রধান কারণগুলো ছিল এগুলোই।

---

[১] ইকবাল

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের চরিত্রের ওপর এক নজর

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক ইতিহাসের সেই অদ্ভুত ও বিচিত্র মানুষদের একজন, যারা গুণ ও দোষ উভয় ক্ষেত্রেই অনন্য ছিলেন। উমাইয়া যুগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন এমনই এক উদাহরণ। ভারতের ইতিহাসে আমরা মুহাম্মদ তুঘলকের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। তিনি একদিকে অত্যন্ত পরহেজগার, সওম ও সালাতের অনুসারী এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; রাজা ও রাজপুত্রদের মতো বিলাসিতা তিনি কখনোই পছন্দ করতেন না। অন্যদিকে তার জুলুম, অত্যাচার ও অহংকারের কাহিনী পড়লে মানুষ শিউরে ওঠে। ঐতিহাসিক ফেরেশতা তার সম্পর্কে লিখেছেন:

“ঐতিহাসিকরা তাকে ‘আজায়েবুল মাখলুকাত’ (সৃষ্টির বিস্ময়) বলে অভিহিত করেন এবং এটি কিছুটা সত্যও বটে। কারণ তিনি একই সাথে ভালো ও মন্দের বিপরীতমুখী গুণের অধিকারী ছিলেন... তিনি শরয়ী ও দ্বীনি হুকুমত নিজে কার্যকর করতেন। তিনি সুন্নাতে মুহাম্মদী অনুসরণ করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। নফল ও মুস্তাহাবাতের প্রতি যত্নবান ছিলেন। নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকতেন। ফাসেকী ও অশ্লীলতা এবং এমন প্রতিটি জিনিস থেকে বিরত থাকতেন যা তার মর্যাদাহানি করে। কিন্তু মানুষের রক্ত ঝরানো এবং তাদের ওপর জুলুম করার মধ্যে তিনি কোনো দোষ দেখতেন না।” [১]

তার চরিত্র সম্পর্কে ইবনে বতুতার নিম্নোক্ত বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য:

“বাদশাহ দানশীলতা ও রক্তপাত—উভয় কারণেই বিখ্যাত ছিলেন। তার দরজায় আসা কোনো ফকিরই ধনী না হয়ে ফিরে যেত না এবং কোনো ব্যক্তিই (যাকে তিনি হত্যার নির্দেশ দিতেন) জীবিত থাকত না। বাদশাহর উদারতা ও বীরত্ব এবং কঠোরতা ও রক্তপাত—উভয় কাহিনীই খুব বিখ্যাত ছিল। একইভাবে অপরাধীদের সাথে তার নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার ঘটনাগুলোও সুপরিচিত। এই সব সত্ত্বেও, তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনয়ী এবং ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন। তার কাছে দ্বীনের নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত ছিল। তিনি সালাতের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন এবং সালাত আদায় না কারীদের শাস্তি দিতেন।” [২]

ডক্টর তারা চাঁদ মুহাম্মদ তুঘলকের রাজনৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

“তিনি তার ধর্ম পুরোপুরি অনুসরণ করতেন। তার পারিবারিক জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক। তিনি মোটেও গোঁড়া ছিলেন না...”

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৪৮

[২] সফরনামা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৫, ত. দার আল-শারক

ছিল, যুদ্ধের ক্ষেত্রে ফকীহদের মতামতকে খুব একটা গুরুত্ব দিত না। সে হিন্দুদের সাথে অত্যন্ত সহনশীল আচরণ করেছিল। সে তাদের সামাজিক জীবন সংস্কারের এবং সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। সে একজন হিন্দুকে সিন্ধুর শাসক নিযুক্ত করেছিল এবং অন্যান্য হিন্দুদের বড় বড় পদে আসীন করেছিল। [১]

কোপানল

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক তার যে গুণের কারণে সবচেয়ে বেশি কুখ্যাত হয়েছিলেন, তা হলো তার রাগ এবং জুলুম-অত্যাচার। তার ইলম ও ফজল, বুদ্ধি ও মেধা এবং দানশীলতা ও উদারতার মতো গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ তুঘলকের মেজাজ যখন বিগড়ে যেত, অথবা সে কাউকে শাস্তি দিতে উদ্যত হতো, তখন সে অবিশ্বাস্য পর্যায়ের কঠোরতার প্রমাণ দিত। এতে কোনো আমির, আত্মীয়, কাজী, আলেম বা পীর ও মুরশিদের প্রতি কোনো ছাড় দেওয়া হতো না। ইবনে বতুতার ভাষায়:

“এখন পর্যন্ত আমি বাদশাহর বিনয়, ন্যায়বিচার এবং দয়া ও অনুগ্রহের অসাধারণ ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছি, কিন্তু এটিও সত্য যে সে রক্তপাতে অত্যন্ত সাহসী ছিল। খুব কমই এমন হতো যে তার দরজায় কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়নি। প্রায়ই লাশ দরজায় পড়ে থাকত। একদিনের কথা, আমি প্রাসাদে যাচ্ছিলাম, আমার ঘোড়া একটি সাদা রঙের জিনিস দেখে চমকে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এটি কী? সঙ্গী বলল: এটি একজন ব্যক্তির বুক যাকে তিন টুকরো করা হয়েছে। এই বাদশাহ ছোট-বড় অপরাধে সমান শাস্তি দিত। সে না আলেমদের তোয়াক্কা করত, আর না শরীফ ও নেককারদের। দরবারে প্রতিদিন হাতকড়া ও বেড়ি পরা শত শত বন্দিকে হাজির করা হতো। কাউকে হত্যা করা হতো এবং কাউকে আজাব দেওয়া হতো।” [২]

এর পর ইবনে বতুতা মুহাম্মদ তুঘলকের পাশবিক শাস্তির বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা পড়লে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। মুহাম্মদ তুঘলকের এই জুলুম-অত্যাচারের ঘটনাগুলো যদি পরবর্তী কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা করতেন, তবে আমরা সেটিকে একটি অপবাদ বলে মনে করতাম। কিন্তু এই বর্ণনা স্বয়ং ইবনে বতুতার, যিনি মুহাম্মদ তুঘলকের কাছে দীর্ঘ সময় কাজীর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার প্রশংসা ও গুণকীর্তনেও কোনো কমতি করেননি। নিচে ইবনে বতুতার বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হলো:

হাতির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ভয়াবহ পদ্ধতি:

ইবনে বতুতা কয়েকজন বিদ্রোহীর গ্রেফতার এবং হাতির মাধ্যমে তাদের হত্যা করার দৃশ্য এভাবে বর্ণনা করেন:

“তারা যখন বাদশাহর কাছে পৌঁছাল তখন আমিও সেখানে ছিলাম। তাদের মধ্যে একজনকে আমি দেখলাম যার দাড়ি লম্বা ছিল এবং সে ভয়ে কাঁপছিল ও সূরা ইয়াসিন পাঠ করছিল। বাদশাহ উজিরের ভাগ্নেকে উজিরের কাছে পাঠিয়ে...”

---

[১] মুখতাসার তারিখে হিন্দ: পৃ. ১৭১, ১৭২

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃ. ৩৬৬

নির্দেশ দিলেন যে তাকে হত্যা করা হোক। আর বাকি আমিরদের হাতির সামনে ফেলে দিলেন। এই হাতিগুলোকে দিয়ে মানুষ মারার কাজ করানো হতো। এদের দাঁতে লোহার খাঁজকাটা খোল পরানো থাকতো যা লাঙ্গলের ফলার মতো আকৃতির হতো এবং যার উভয় দিকে ধার থাকতো। মাহুত হাতির পিঠে সওয়ার থাকতো এবং যখন কোনো ব্যক্তিকে হাতির সামনে ফেলা হতো, তখন হাতি তাকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিত এবং তারপর এদিক-ওদিক করে নিজের দাঁতের ওপর নিয়ে নিত। এরপর নিজের সামনে মাটিতে ফেলে সামনের পা তার বুকের ওপর রেখে দিত। যদি মাহুত বলত যে একে দুই টুকরো করে দাও, তবে দাঁত দিয়ে টুকরো করে দিত এবং যদি সে বলত যে একে পড়ে থাকতে দাও, তবে পড়ে থাকতে দিত। যাকে টুকরো করা হতো না, তার চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হতো। [১]

এক কারামতধারী বুজুর্গের হত্যাকাণ্ড:

গুজরাটের উপকূলীয় শহর খাম্বাতে শেখ আলী হায়দারি নামে এক বুজুর্গ ছিলেন যার কারামতের খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল। যখন কাজী জালাল আফগানি খাম্বাতে বিদ্রোহ করল, তখন বাদশাহর কাছে খবর পৌঁছাল যে শেখ হায়দারি কাজী জালাল উদ্দিনের জন্য দোয়া করেছেন, তাকে নিজের পাগড়ি দিয়েছেন এবং তার হাতে বায়আতও করেছেন। বাদশাহ যখন গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করতে গেলেন এবং কাজী জালাল পরাজিত হলেন, তখন বাদশাহ শরফুল মুলক নামক এক আমিরকে খাম্বাতে রেখে আসলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে সমস্ত বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করে পরিণতির দিকে পৌঁছে দিতে। শরফুল মুলক এই নির্দেশ পালনে শেখ আলী হায়দারিকে গ্রেপ্তার করলেন এবং ফকিহদের থেকে তার হত্যার ফতোয়া নিয়ে নির্দেশ দিলেন যে শিরশ্ছেদ করা হোক। কিন্তু জল্লাদ যখন তার ওপর তলোয়ার চালাল, তখন তলোয়ার কোনো কাজ করল না। মানুষ অবাক হয়ে গেল এবং ভাবতে লাগল যে এখন হয়তো শেখকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু শরফুল মুলক অন্য এক জল্লাদকে নির্দেশ দিলেন এবং তার আঘাত কার্যকর প্রমাণিত হলো। এভাবে শেখ আলী হায়দারিও সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের হাতে নিহতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। [২]

ফারগানার অধিপতির হত্যাকাণ্ড:

একবার ফারগানার এক অধিপতি যার নাম ছিল তুগান, নিজের ভাইসহ সুলতানের কাছে আসলেন এবং দীর্ঘ সময় মেহমান হিসেবে থাকলেন। সুলতান তাদের খুব খাতির-যত্ন করতে থাকলেন, কিন্তু সুলতানের হাতে প্রতিনিয়ত বড় বড় ব্যক্তিত্বদের নিহত হতে দেখে দুই ভাই ঘাবড়ে গেলেন এবং প্রস্তুতি নিলেন যে চুপিসারে ফিরে যাবেন। বাদশাহকে কোনো এক ব্যক্তি এই খবর জানিয়ে দিল। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন যে তাদের দুই টুকরো করে দেওয়া হোক। তাদের সমস্ত সম্পদ সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হলো যে খবর দিয়েছিল। [৩]

দুই নির্দোষ যুবকের হত্যাকাণ্ড:

যখন আইনুল মুলক বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, তখন সালতানাতের এক আমির ‘মালিকুত তুজ্জার’-এর ছেলেও তার কাছে এল...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৭, ৩৭৮

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭১, ৩৭২

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭২

হয়েছিল যার গালের পশমও এখনো গজায়নি। তার ফুফাতো ভাইও তার সাথে ছিল। বিদ্রোহে তাদের কোনো হাত ছিল না কিন্তু তারা পরিস্থিতির কারণে বাধ্য ছিল। যখন আইনুল মুলক পরাজিত হলো, তখন এই দুই ছেলেও বন্দী হলো। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন যে তাদের হাত একটি খুঁটির সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। তারপর আমিরদের নির্দেশ দিলেন যে তাদের তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাও। এভাবে এই দুই নিরপরাধ নিহত হলো।

তাদের মৃত্যুর পর একদিন রইস খাজা আমির আলী তাবরিজি কথার ছলে কাজীউল কুজাত কামালুদ্দিনের কাছে উল্লেখ করলেন যে, এই দুই যুবক হত্যার যোগ্য ছিল না। বাদশাহর কাছেও এই খবর পৌঁছে গেল। বাদশাহ আমির আলী তাবরিজিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন:

“তুমি এই ছেলেদের মৃত্যুর আগে এই কথা কেন বললে না?”

আমার হত্যার পর সে জুলুম থেকে তওবা করল... হায় এই দ্রুত অনুতপ্ত ব্যক্তির অনুশোচনা।

নির্দেশ দেওয়া হলো যে তাকে দুইশ দোররা মেরে জেলে নিক্ষেপ করা হোক এবং তার সমস্ত সম্পদ জল্লাদদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। আমির আলী তাবরিজি ভাগ্যবান ছিলেন যে তার ঘাড় বেঁচে গিয়েছিল এবং চাবুক ও কারাবাসের কষ্ট সহ্য করে কিছুকাল পর মুক্তি পেয়েছিলেন। [১]

একটি বাক্যের কারণে তিন আলেমের মৃত্যুদণ্ড:

সুলতান দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে কৃষকদের বীজ ও কৃষি সুবিধা প্রদান করেছিলেন কিন্তু মূল সমস্যা অর্থাৎ জুলুম ও নিপীড়ন থেকে তওবা করেননি। দিল্লির একজন ফকিহ আফিফ উদ্দিন কাশানি সুলতানের এই পদক্ষেপের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন: “এই কৃষি সংস্কারের কোনো ফায়দা হবে না।” সুলতানের গোয়েন্দারা সর্বত্র থাকতো। তারা এই খবর বাদশাহকে পৌঁছে দিল, যার ফলে ফকিহকে গ্রেপ্তার করা হলো। সুলতান তাকে বললেন: “তোমার রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কী প্রয়োজন ছিল?”

কয়েকদিন পর তাকে মুক্তি দেওয়া হলো। এই উপলক্ষে শহরের দুই আলেম তাকে মোবারকবাদ দিতে গিয়ে বললেন:

“আলহামদুলিল্লাহ আপনি মুক্তি পেয়েছেন।” ফকিহ বললেন: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের জালেমদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।”

সুলতানের গোয়েন্দারা এই কথাগুলোও সুলতান পর্যন্ত পৌঁছে দিল। সুলতান ফকিহকে এই অপরাধে দুই টুকরো করে দিলেন যে তিনি বাদশাহকে জালেম বলেছেন। সাথে সাথেই ওই দুই আলেমকেও হত্যার নির্দেশ দিলেন। তারা বললেন: “আমাদের অপরাধ কী?” সুলতান বললেন: “তোমরা তার মুখ থেকে এই শব্দটি শুনেছ; এটি আমাদের জন্য ছিল কিন্তু তোমরা এর প্রতিবাদ করোনি, যেন তোমরা তার সাথে একমত ছিলে।” এই বলে তাদেরও হত্যা করিয়ে দিলেন। [২]

সে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সবাইকে হত্যা করে... এটি এখন তার জন্য নতুন এক বাহানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। [৩]

হে প্রিয় হৃদয়! এখন অন্য কোনো গলিতে চলো... এখানে আমাদের অন্ন-জল শেষ হয়ে গেছে।

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭২

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৯

[৩] শামিন জাফরি

সুফিয়ায়ে কেরামকে দমন ও পিষ্ট করার প্রচেষ্টা

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের জুলুমের একটি দিক এটিও ছিল যে, সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সুফিয়ায়ে কেরামের প্রভাব-প্রতিপত্তির ওপর আঘাত হানেন। তিনি প্রথমে কোনো খানকাহর সাজ্জাদানশীনদের প্রচুর অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন এবং এটি প্রমাণ করতেন যে, তাঁরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী, যাতে সাধারণ মানুষ তাঁদেরকে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে এবং পরবর্তীতে তাঁদেরকে দেওয়া শাস্তিকে ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য করে। তিনি খানকাহর লোকদের ওপর যে পরিমাণ দান-খয়রাত করতেন, সেই পরিমাণেই তাঁদের ওপর কঠোর নজরদারি শুরু করতেন এবং তারপর কোনো অজুহাত পেলেই তাঁদেরকে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানাতেন। বিশেষ করে সেইসব মাশায়েখদের তাঁর ষড়যন্ত্র ও শাস্তির লক্ষ্যবস্তু বানানো হতো, যাঁদের জনসাধারণের মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। সুলতানের এই অপবিত্র অভিযানে এমন সব ঘটনাও ঘটেছে যে, শীর্ষস্থানীয় মাশায়েখদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর দুটি উদাহরণ পেশ করা হলো:

শাহ রুকন আলম রহ.-এর নাতির সাথে অমানবিক আচরণ:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক শাহ রুকন আলম মুলতানিকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর এক নাতি শেখ হুদ খানকাহর সাজ্জাদানশীন নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি দিল্লিতেও আসেন এবং সুলতান রাষ্ট্রের সমস্ত উলামা ও আমীরদের পাঠিয়ে তাঁর রাজকীয় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ফেরার সময় তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সাথে পাঠান যারা মুলতান পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিল।

একবার সেহওয়ান (সিন্ধু)-এর গভর্নর ইমাদুল মুলক বাদশাহকে লিখে পাঠান যে, শেখ হুদ এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন প্রচুর সম্পদ জমা করেছেন এবং তা অনর্থক কাজে ব্যয় করছেন এবং খানকাহতে লঙ্গরের কোনো ব্যবস্থা করছেন না।

বাদশাহ এই অভিযোগে এতটাই রাগান্বিত হলেন যে, কোনো তদন্তের প্রয়োজন মনে না করেই ওই গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে ইমাদুল মুলক তাঁদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেন, এমনকি এই পরিবারটি কপর্দকহীন হয়ে পড়ে। শেখ হুদ এতটাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন যে, দেশ ছেড়ে তুর্কিস্তানে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে সুলতানকে অবহিত করেন। সুলতান তাঁকে দিল্লিতে তলব করেন।

যখন শেখ হুদ সুলতানের কাছে পৌঁছালেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কোথায় পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলে?”

শেখ ওজর পেশ করলেন কিন্তু বাদশাহ বললেন: “তোমার ইচ্ছা ছিল তুর্কিস্তানে গিয়ে সেখানে বলবে যে আমি বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানির বংশধর এবং বাদশাহ আমার ওপর জুলুম করেছেন। এই কথা বলে তুমি তুর্কিদের আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছিলে?”

এই বলে তিনি জল্লাদকে বললেন: “এর ঘাড় উড়িয়ে দাও।” নির্দেশ পালন করা হলো এবং শেখ মজলুমিয়াতের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে শহীদ হলেন। [১]

চলো এসো তোমাদের দেখাই আমি, যা অবশিষ্ট আছে শহরের বধ্যভূমিতে
এগুলো আহলে সাফা-দের মাজার, এগুলো সত্যবাদীদের সমাধি। [২]

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৭, ১৪৭

[২] ফয়েজ আহমদ ফয়েজ

জুলুমপূর্ণ নির্দেশের এক অদ্ভুত কাহিনী

শায়খ সালিহ শামসুদ্দিন ছিলেন একজন আবিদ ও বুজুর্গ ব্যক্তি, যিনি কোল শহরে (আলীগড়) বসবাস করতেন। একবার বাদশাহ কোলে গেলেন এবং তাকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু তিনি আসলেন না। বাদশাহ স্বয়ং তার কাছে গেলেন, কিন্তু তিনি খবর পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেন।

কিছুকাল পর এক আমির বিদ্রোহ করল। কেউ একজন বাদশাহর কাছে গিয়ে বলল: "শায়খ শামসুদ্দিন এই আমিরের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে তিনি বাদশাহ হওয়ার যোগ্য।"

এই অভিযোগ শুনে বাদশাহ শায়খকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। কোলের কাজী এবং মুহতাসিবকেও বন্দি করা হলো এবং তাদের চোখে গরম শলাকা ফিরিয়ে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হলো। সুলতানের দৃষ্টিতে তাদের অপরাধ এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, তারা সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন যেখানে শায়খ আমিরের প্রশংসা করেছিলেন।

কাজী ও মুহতাসিবের চরম অবমাননা করা হলো যে, তাদের প্রতিদিন কারাগার থেকে বের করে আনা হতো এবং মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে বাধ্য করা হতো। এভাবে তাদের আত্মসম্মান চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাদের পুনরায় কারাগারে বন্দি করা হতো।

শায়খের ছেলেদেরও বন্দি করা হয়েছিল কারণ সুলতান খবর পেয়েছিলেন যে তারা বিদ্রোহী হিন্দু সর্দারদের সাথে মেলামেশা করে।

বন্দি অবস্থায় কিছুকাল পর শায়খ ইন্তেকাল করলেন। সুলতান তার ছেলেদের ডেকে বললেন: "ভবিষ্যতে বিদ্রোহী হিন্দু সর্দারদের সাথে মেলামেশা করবে না।"

তারা বলল: "হুজুর! আমরা এমন কোনো কিছুর সাথে জড়িত নই।" বাদশাহ রাগান্বিত হলেন এবং তাদের হত্যা করালেন। [১]

এভাবে এই খানকাহ তার উত্তরাধিকারীদেরসহ নাম-নিশানাহীন হয়ে গেল।

হৃদয়ের সব দাগ মুছে গেছে, উৎসুক দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাগুলোও
না দরবারের ভ্রমণ, না আর গুনাহের জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে
না বলা কথার ওপর এখন বিসমিল্লাহর লিখন বসেছে
জল্লাদখানায় চলো অপরাধের রহমত ছাড়াই, বিসমিল্লাহ [২]

উলামা ও মাশায়েখদের থেকে সেবা গ্রহণ করে তাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের একটি অদ্ভুত কাজ ছিল এই যে, তিনি উলামা, মাশায়েখ, সাদাত এবং বুজুর্গদের বিভিন্ন সরকারি দায়িত্ব অর্পণ করতে চাইতেন। সুলতান যুক্তি ও অধ্যয়নের ভিত্তিতে নিজের প্রতিটি কাজের জন্য দলিল পেশ করার চেষ্টা করতেন, তাই তিনি এখানে এই হাওয়ালা দিতেন যে খুলাফায়ে রাশিদিনও ইলম ও তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করতেন। [৩]

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৪৭৩

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৬৮

যদি কোনো বুজুর্গ তাঁর প্রস্তাবিত খিদমত গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করতেন বা অস্বীকার করতেন, তবে সুলতান তাঁদের ওপর সরকারি আদেশ অমান্য করার অভিযোগ এনে কষ্ট দিতে শুরু করতেন। যদি কেউ এই পদ গ্রহণ করে নিতেন, তখনও তাঁদের এক প্রকার আযাবই ভোগ করতে হতো। বিচার বিভাগ, আদালত ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর দায়িত্ব অর্পণ করা তো বোধগম্য হয় এবং এটি অন্যান্য খলিফা ও সুলতানদেরও পদ্ধতি ছিল, কিন্তু সুলতান দ্বীনি বুজুর্গদের এমন সব কাজ সোপর্দ করতেন যা না তাঁদের মর্যাদার উপযুক্ত ছিল আর না তাঁদের সেসব বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল। যেমন হীরা-জহরত পাহারা দেওয়া থেকে শুরু করে পান খাওয়ানো, রাজকীয় পোশাকের ব্যবস্থা করা এবং মাথায় পাগড়ি বাঁধার মতো খিদমতের জন্যেও কখনো কখনো উলামা ও সুফিয়াদের কষ্ট দেওয়া হতো। [১]

অভিজ্ঞতা বা সামঞ্জস্য না থাকার কারণে এই ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু ভুল হয়েই যেত, যার ফলে সুলতান কোনো দয়া বা ছাড় ছাড়াই তাঁদের কঠোর শাস্তি দিতেন। শেখ শিহাবুদ্দিন বিন আহমদ জাম রহ.-এর সাথে অমানবিক আচরণের ঘটনা আপনারা গত পৃষ্ঠাগুলোতে পড়ে এসেছেন, যাঁকে দিওয়ান-ই-খিরাজে অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শনের পর দেশান্তর করে দৌলতাবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং পরিশেষে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এমন আরও কিছু নমুনা লক্ষ্য করুন।

দুই সিন্ধি ফকিহ্-এর কাছ থেকে না করা অপরাধের জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি:

সিন্ধুর দুই ফকিহ্ সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। বাদশাহ তাঁদের একজন তুর্কি সুবেদারের সহকারী নিযুক্ত করে তাঁর সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন: “আমরা সাক্ষী হিসেবে থাকব এবং যা সত্য হবে তা বলে দেব।”

বাদশাহ বললেন: “তোমাদের নিয়ত সঠিক মনে হচ্ছে না। তোমাদের নিয়ত হলো তোমরা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করবে এবং এই মূর্খ তুর্কির ওপর তার দায় চাপিয়ে তাকে ফাঁসিয়ে দেবে।”

উভয়ে বললেন: “আল্লাহর পানাহ! হুজুর, আমাদের এমন নিয়ত নেই।”

বাদশাহ বললেন: “না, তোমাদের নিয়ত এটাই।”

এই বলে তিনি তাঁদের একজন কঠোর মেজাজের অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সে তাঁদের বলল:

“বাদশাহ তোমাদের হত্যা করতে চান। তিনি যা বলছেন তা স্বীকার করে নাও এবং নিজের জীবন আযাব থেকে বাঁচাও।”

উভয়ে বললেন: “আমাদের নিয়ত সেটাই যা আমরা বাদশাহর কাছে বলে এসেছি।”

অফিসার তাঁদের ওপর কঠোরতা শুরু করল। তাঁদের চিৎ করে শুইয়ে দেওয়া হলো। তাঁদের বুকের ওপর একটি তপ্ত লোহার পাত রাখা হলো। সেই পাত যখন সরানো হলো, তখন বুকের সমস্ত মাংস তার সাথে উঠে এল। এরপর সেই যখমের ওপর প্রস্রাব ও ছাই ঢেলে দেওয়া হলো।

পরিশেষে এত নির্যাতন করা হলো যে তাঁদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত লিখিত স্বীকারোক্তি নেওয়া হলো: “আমাদের নিয়ত সেটাই যা বাদশাহ বলছেন। আমরা গুনাহগার এবং হত্যার যোগ্য। যদি আমাদের হত্যা করা হয়, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই।”

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা, উর্দু: পৃ. ৭৭৫

কাজী তাতে মোহর মেরে নিজের হাতে লিখলেন: “এরা দুজনেই কোনো প্রকার জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই অপরাধ স্বীকার করছে।” স্পষ্টতই, তারা যদি বলত যে এই স্বীকারোক্তি আমাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক নেওয়া হয়েছে, তবে তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা হতো। তারা ভেবেছিল যে, নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে একবার গর্দান দেওয়া অনেক ভালো। সংক্ষেপে, উভয় ফকিহকে হত্যা করা হলো। [১]

তোমার তীর দুনিয়াতে কোনো শিকারই বাকি রাখেনি

কিবলামুখী পাখিটি তার বাসায় ছটফট করছে [২]

খতিবুল খুতাবার বেত্রাঘাত খেয়ে মৃত্যু:

একবার সুলতান দিল্লির সবচেয়ে বড় ওয়ায়েজ, যার উপাধি ছিল ‘খতিবুল খুতাবা’, তাকে জহরত ভাণ্ডার দেখাশোনার নির্দেশ দেন। এক রাতে কিছু চোর এসে সেই ভাণ্ডার থেকে কিছু নিয়ে পালিয়ে যায়। বাদশা তা জানতে পেরে খতিবকে প্রহার করার নির্দেশ দেন। ফলে তাকে এত বেশি আঘাত করা হয় যে, মার খেতে খেতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৩]

নিজের অত্যাচারে ওলামাদের জড়িত করার চেষ্টা:

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি তার লোমহর্ষক অত্যাচারগুলোকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ওলামা ও ফকিহদের সাথে বিতর্ক করে তাদের আশ্বস্ত করতেন এবং তাদের নিজের অপকর্মে শরিক করার চেষ্টা করতেন। বাদাউনীর বর্ণনা অনুযায়ী:

“সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্ভবত শাস্তি দিতে বেশ আনন্দ পেতেন, যা তিনি নিজের শখে পরিণত করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শাস্তি দিতেন। তার আদালতে চারজন মুফতি আলাদাভাবে নিযুক্ত ছিলেন। যখন কোনো দুর্ভাগা কোনো অপরাধে ধরা পড়ত, তখন বাদশা তাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এই মুফতিদের সাথে নিয়মিত বিতর্ক করতেন। মুফতিদের প্রতি এই তাগিদও দেওয়া ছিল যে, তোমরা সত্য বলতে কখনোই অবহেলা করবে না; যদি কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তবে তার দায়ভার তোমাদের ঘাড়েই বর্তাবে। এই মুফতিদের সাথে মন ভরে জেরা ও বিতর্ক করার পর তিনি তাদের আশ্বস্ত করতেন এবং রাত অর্ধেক হয়ে গেলেও অপরাধীকে হত্যা করিয়েই তবে দম নিতেন। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য দুঃসহ হয়ে পড়ত। যদি মুফতিদের কোনো জোরালো যুক্তির কারণে তাকে নিজে আশ্বস্ত হতে হতো, তবে তিনি মামলাটি অন্য সময়ের জন্য স্থগিত করে দিতেন। এরপর অবসরে মুফতিদের যুক্তির উত্তর ভেবে নিয়ে তাদের সাথে পুনরায় বিতর্ক করতেন। এই বিতর্কে মুফতি ও কাজী নিরুত্তর হয়ে পড়লে তখন অপরাধীকে হত্যা করিয়ে দিতেন, আর যদি এবারও বিতর্কে নিজে ব্যর্থ হতেন, তবে বাধ্য হয়ে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে রাজি হতেন।” [৪]

শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলভী (রহ.)-এর অবমাননা:

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির খানকাহ নিজামিয়ার সাজ্জাদানশীন হযরত শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলভী (রহ.)-এর সাথেও এমন কিছু...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ২৬৯, খণ্ড ২

[২] সওদা

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৩৩, খণ্ড ২

[৪] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ১৬৮

আচরণ করলেন। তাকে প্রস্তাব দিলেন যে তিনি যেন জামাদারি খিদমত গ্রহণ করেন অর্থাৎ বাদশাহর পোশাক-আশাকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেখ যখন ওজর পেশ করলেন, তখন তাকে বন্দি করা হলো। শেখের তার মুর্শিদের সেই হুকুম মনে পড়ে গেল যে, কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ফলে কিছুকাল বন্দি থাকার পর তিনি এই আদেশ মেনে নিলেন এবং বাদশাহর জামাদার হয়ে গেলেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক যখন ঠাট্টায় মৃত্যুবরণ করেন, তখন হযরত শেখ (রহ.) এই খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সুলতানের সফরসঙ্গী ছিলেন। [১]

মুহাম্মদ তুঘলকের জুলুমের ওপর মন্তব্য:

মুহাম্মদ তুঘলক তার অনেক ইতিবাচক কাজ সত্ত্বেও জুলুম-অত্যাচারের এমন এক হৃদয়বিদারক কাহিনী রচনা করেছেন যা পড়ার সময় মানুষের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। অত্যন্ত বিস্ময় ও চরম পরিতাপের বিষয় হলো যে, দ্বীন ও ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন সব জুলুম করেছেন যা মানবতার নামে কলঙ্ক। জালেম শাসক আরও অনেকেই ছিলেন, কিন্তু তাদের কোনো ধর্মীয় পটভূমি ছিল না, বরং তারা নিজেদের মূর্খতা বা ভোগবিলাসে মত্ত থাকার কারণে পথভ্রষ্ট ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ তুঘলক ভোগবিলাসীও ছিলেন না, আবার মূর্খও ছিলেন না। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ এই যে, এ ধরনের মুসলিম বাদশাহদের কর্মকাণ্ডকে কখনোই ইসলাম মনে করবেন না। ইসলাম তাই যা কুরআন, সুন্নাহ এবং সীরাতে নববীতে রয়েছে। শরীয়ত থেকে এই বিচ্যুতি এবং জুলুম-অত্যাচার কেবল তুঘলক বংশেরই নয়, বরং বহু মুসলিম সরকারের পতনের কারণ হয়েছিল।

সুলতানের ধর্মীয় ঝোঁক ও মতাদর্শ

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের এই ক্রোধ এবং বিশেষ করে সূফী-মাশায়েখদের সাথে তার দুর্ব্যবহার ও জঘন্য আচরণের একটি কারণ অবশ্যই তার সহিংসতা নির্ভর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল। তবে এর পাশাপাশি এই বাদশাহর ধর্মীয় চিন্তাধারা বোঝাও জরুরি, কারণ এই ক্রোধের পেছনে তার ধর্মীয় ধারণার বিচ্যুতিও বিদ্যমান ছিল।

সুলতানের মস্তিষ্কে যুক্তিনির্ভর শাস্ত্রের (মাকুলাত) প্রভাব:

আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারানী (রহ.) বলেন যে, মুহাম্মদ তুঘলক যৌবনের শুরু থেকেই সাদ মানতিকীর মতো ধর্মচ্যুত এবং উবাইদ কবির মতো ভ্রান্ত বিশ্বাসী কবির সাথে উঠাবসা করতেন। একইভাবে প্রখ্যাত দার্শনিক মাওলানা ইলমুদ্দিনের সাথে নির্জনে মজলিস বসত। এই লোকদের কথাবার্তা এবং সাহচর্য সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে যুক্তিনির্ভর শাস্ত্রকে (মাকুলাত) বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। এই কারণে কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তার মন পরিষ্কার ছিল না। তার মানসিকতা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, কুরআন বা হাদীসে যদি কোনো কথা বিবেক-বুদ্ধির (যুক্তি ও দর্শনের মূলনীতি) পরিপন্থী হয়, তবে তা পালন করা আবশ্যক নয়। [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা, বোম্বে সংস্করণ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৪৭।

[২] যেহেতু যুক্তিবিদ্যায় প্রখর মেধার অধিকারী ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত ঝোঁক ও কামনা-বাসনাকেও খাঁটি যুক্তি মনে করে এবং এর জন্য কয়েক মিনিটে ডজন ডজন দলিল তৈরি করে ফেলে, তাই তাকে বোঝানো অত্যন্ত কঠিন হয়।

আল্লামা বারনী (রহ.) অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে, যদি যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার না করত এবং তিনি কুরআন ও হাদীসের সঠিক স্বাদ লাভ করতেন, তবে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশনাবলী এবং উলামায়ে কেরামের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে এত নির্ভয়ে মুসলমানদের হত্যার আদেশ দিতেন না। কিন্তু যুক্তিনির্ভর বিদ্যার কারণে তাঁর হৃদয় কঠোর হয়ে গিয়েছিল এবং কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনাবলী যা হৃদয়ে কোমলতা সৃষ্টি করে এবং আখেরাতের ভয় দেখায়, তাঁর নিকট গৌণ হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে মুসলমানদের হত্যা করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং এই ভিত্তিতেই তিনি এত বিপুল সংখ্যক আলেম ও মাশায়েখ, সাদাত ও সূফী, কলন্দর, লেখক ও সৈনিকদের লোমহর্ষক শাস্তি দিয়েছিলেন। [১]

ফেরেশতাও মুহাম্মদ তুঘলক সম্পর্কে লিখেছেন:

“শাসনকালেও তাঁর অধিকাংশ সময় যুক্তিনির্ভর বিদ্যা ও দর্শনের কিতাব অধ্যয়নে অতিবাহিত হতো। সাদ মানতিকী, উবাইদ কবি, নাজমু ইনতিশার এবং মাওলানা ইলমুদ্দিন শিরাজী ও অন্যান্য হিকমত বিশারদ আলেমদের সাথে তাঁর উঠাবসা ছিল এবং প্রাচীন দার্শনিকদের কিতাব নিয়ে আলোচনা হতো। মানকুলাত (তাফসীর ও হাদীস) এর প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। এই কারণে তাঁর দরবারে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। যে শরয়ী মাসআলা যুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতো, কেবল সেটিই তিনি মানতেন।” [২]

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের অদ্ভুত ও বিচিত্র চিন্তাধারা:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের একজন আমীর মালিক মনসুরের বর্ণনা হলো, একবার সুলতান আমাকে ডাকলেন। আমি গিয়ে দেখলাম যে, তিনি মোমবাতির আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারে বসে আছেন। সুলতান কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হঠাৎ বললেন: “মনে করো আজ কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যদি বলে যে—নাউযুবিল্লাহ—মুহাম্মদ (সা.) পয়গম্বর ছিলেন না, তবে আমরা এবং তুমি কোন দলীল দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করব?”

আমি মনে মনে ভাবলাম যে, যদি আমি বাদশাহর সাথে বিতর্ক শুরু করি তবে তিনিও বিতর্ক করবেন এবং কথা বেড়ে যাবে। তার চেয়ে ভালো এমন কিছু বলা যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, তবে আর এই সালতানাত তাঁর ভাগ্যে জুটবে না। তাই আমি তৎক্ষণাৎ বললাম:

“এমন জারজ, পাগল, নির্বোধ ও হতভাগার জন্য দলীলের কী প্রয়োজন? বর্তমানে বাদশাহর উচ্চ ভাগ্যের কারণে পুরো দেশে ইসলাম এমনভাবে বিজয়ী যে, আপনার গোলামরা তাকে জুতা পেটা করে শেষ করে দেবে।”

এটি শুনে মুহাম্মদ তুঘলক মাথা নিচু করে নিলেন এবং উত্তরে কিছুই বললেন না। যা-ই হোক, যুক্তিনির্ভর বিদ্যার জটাজালে আটকে থাকা মুহাম্মদ তুঘলকের মনে এমন অদ্ভুত ও বিচিত্র চিন্তাধারা আসতেই থাকত। তাই একবার তাঁর পুরনো আমীর মালিক মনসুরকে বলতে লাগলেন: “হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এমন কী করে দেখিয়েছিলেন যা আমরা করতে পারি না?”

মালিক মনসুরও প্রজ্ঞার সাথে কাজ নিলেন যাতে বিতর্কের সুযোগ না আসে। তৎক্ষণাৎ বললেন: “তাঁরা ছিলেন পবিত্র মানুষ আর আমরা হলাম অপবিত্র।”

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারনী প্রণীত: পৃষ্ঠা ৪৬৫, ৪৬৬

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসী: পৃষ্ঠা ৪৩৭, ৪৩৮

(অর্থাৎ এটাই আসল পার্থক্য যে তারা পবিত্র সত্তা ছিলেন এবং আমরা সাধারণ উম্মত। আমরা যা-ই করি না কেন, তাদের মতো হতে পারব না।) [১]

সম্ভবত মুহাম্মদ তুঘলকের এই প্রবণতাগুলো সামনে রেখেই ঐতিহাসিক ফিরিশতা লিখেছেন:

“তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর মতো আমিও যেন রাজত্ব ও নবুওয়াত উভয়ই লাভ করি।” [২]

বরং এক জায়গায় ফিরিশতা প্রশংসার ছলে তার অহংকার ও দম্ভের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“তিনি এমন এক উচ্চাভিলাষী বাদশাহ ছিলেন যে সাত মহাদেশের বাদশাহর সামনেও মাথা নত করার মতো ছিলেন না। তিনি চাইতেন যেন তার হুকুম মানুষ ও জিন সবার ওপর চলে। আবাদকৃত জমিনকে তিনি তার গোলামদের মধ্য থেকে একজনের মতো মনে করতেন। যদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইসলাম বাধা না হতো, তবে তিনি ফেরাউনের মতো খোদায়ি দাবিও করে বসতেন।” [৩]

সুলতান কি বেদ্বীন নাকি দ্বীনদার?

সূফীয়ে কেরামদের মধ্যে কেউ কেউ সুলতান মুহাম্মদ তুঘলককে পুরোপুরি বেদ্বীন এবং ইসলামের বহির্ভূত মনে করতেন, যেমনটি খাজা গেসুদরাজ (রহ.)-এর মালফুজাত থেকে স্পষ্ট হয়। [৪]

তবে অন্যদিকে এই কথাটিও উল্লেখযোগ্য যে, মুহাম্মদ তুঘলক সূফীয়ে কেরামদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন, যাদের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তাকে তিনি কোনো না কোনোভাবে তার ক্ষমতার জন্য উদ্বেগজনক মনে করতেন। এর বাইরে তিনি সূফীয়ে কেরামদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করতেন, বরং হিন্দুস্তানের সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সালার মাসউদ গাজী (রহ.)-এর মাজারে হাজিরা দিয়েছিলেন। যাই হোক, মাজারে হাজিরা দেওয়া দ্বীনদারির লক্ষণ নয় যতক্ষণ না জীবন শরীয়ত অনুযায়ী হয়।

এই পরিস্থিতির একটি দিক এটিও যে, মুহাম্মদ তুঘলক যাই হোক না কেন সালাত ও সওমের পাবন্দ ছিলেন এবং তার জুলুমের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে উলামা ও ফুকাহাদের অনুপাত সূফীয়ে কেরাম ও মহান সাদাতদের তুলনায় অনেক কম। সাধারণত তিনি উলামা ও ফুকাহাদের আদব ও সম্মান করতেন যার উদাহরণ ইবনে বতুতার সফরনামায় প্রচুর রয়েছে। তাদেরই একজন ছিলেন আলেম আব্দুল আজিজ আরদাবিলি (রহ.), যিনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন এবং দিল্লিতে এসেছিলেন। মুহাম্মদ তুঘলক তাকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন। [৫]

যাই হোক, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক ইতিহাসের একটি রহস্য, যার ধর্মীয় প্রবণতা বহুমুখী দেখা যায়। চিন্তা ও স্বভাবের ওপর যুক্তিনির্ভর বিদ্যার (মা’কুলাত) আধিপত্য তাকে একজন নিরস ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল এবং এত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তার এই মেজাজই তার আক্ষেপজনক পতন ও দুঃখজনক পরিণতির কারণ হয়েছিল।

---

[১] জাওয়ামিউল কালিম, মালফুজাত খাজা গেসুদরাজ: পৃষ্ঠা ৩১৬, ৩১৭, প্রকাশক নাফিস একাডেমি করাচি।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৩৬।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৩৩৬।

[৪] জাওয়ামিউল কালিম, মালফুজাত খাজা গেসুদরাজ: পৃষ্ঠা ৩১৬, ৩১৭, প্রকাশক নাফিস একাডেমি করাচি।

[৫] রিহলা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৩৫৬।

কিছু ব্যর্থ পরিকল্পনা

প্রতীকী মুদ্রা:

মুহাম্মদ তুঘলক উপমহাদেশের প্রথম বাদশাহ যিনি 'প্রতীকী মুদ্রা'র ধারণা পেশ করেন এবং তা কার্যকরও করেন। তিনি তামা ও পিতলের প্রতীকী মুদ্রা চালু করেন যার মান সোনা ও রূপার মুদ্রার সমান নির্ধারণ করা হয়েছিল। [১]

এই স্কিমটি চালু করার কারণ ছিল এই যে, সুলতানের ক্রমাগত বিজয়, বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয় এবং অঢেল দানশীলতার কারণে রাজকোষ প্রায় খালি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অন্যদিকে সেই যুগে বিশ্বজুড়ে সোনা এবং বিশেষ করে রূপার অভাব অনুভূত হচ্ছিল এবং ভারতবর্ষকেও এর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সুলতানের ধারণা ছিল যে, এই প্রতীকী মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করবে এবং তাকে বড় সামরিক অভিযানের জন্য আর্থিক সংস্থান সরবরাহ করবে। এর আগে চীনে কুবলাই খান কাগজের মুদ্রা চালু করেছিলেন, অন্যদিকে ইরানে মঙ্গোল শাসক কাইখাতু খান প্রতীকী মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। মুহাম্মদ তুঘলক এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে শুনেছিলেন এবং তিনি সেগুলো নিজের দেশেও পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ফলস্বরূপ সুলতান ৭৩০ হিজরি (১৩৩০ খ্রিস্টাব্দ) সালে দৌলতাবাদে অবস্থানকালে তামা ও পিতলের মুদ্রা জারি করেন এবং ঘোষণা করেন যে এই মুদ্রাগুলোর মান সোনার দিনার এবং রূপার তঙ্কার সমান হবে। কিন্তু এই স্কিমটি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল:

(১) সরকার জাল মুদ্রা রোধে কোনো কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি অথবা বলা যায় যে, সেই যুগে জাল মুদ্রা তৈরি রোধ করার কার্যকর উপায় বিদ্যমান ছিল না। সুলতান যদিও এই স্কিমটিকে একজন উজিরের অধীনে রেখেছিলেন যাতে জালিয়াতি রোধ করা যায়, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকার জালিয়াতি রোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। মানুষ তাদের ঘরে তামা ও পিতলের জাল মুদ্রা তৈরি করতে থাকে। বারানির মতে, প্রতিটি হিন্দুর ঘর টাঁকশালে পরিণত হয়েছিল। জালিয়াতরা নকল প্রতীকী মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছেড়ে দেয়, যার ফলে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং সরকারি মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।

(২) সাধারণ জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা এই তামার মুদ্রার ওপর আস্থা রাখেনি কারণ এগুলোর প্রকৃত মূল্য ছিল খুবই কম। মানুষ ভবিষ্যতে কী হয় এই আশঙ্কায় সোনা ও রূপার মুদ্রা বেশি বেশি মজুদ করতে শুরু করে, ফলে আসল মুদ্রা অর্থাৎ সোনা ও রূপা বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

(৩) জাল ও মূল্যহীন মুদ্রার আধিক্যের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদেশি ব্যবসায়ীরা ভারতের এই তামার মুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়।

যখন স্কিমটি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় এবং রাজকোষের ব্যাপক ক্ষতি হয়, তখন সুলতান এটি বন্ধ করতে বাধ্য হন।

---

[১] সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক বর্তমান সময়ের মতো পুরোপুরি কাগজের নোট অর্থাৎ ব্যাংক নোট জারি করেননি, বরং তিনি একটি প্রতীকী মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। এই স্কিমটি সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে তামা ও পিতলের মুদ্রা জারি করার ওপর ভিত্তি করে ছিল।

নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যে, মানুষ যেন তামা ও পিতলের প্রতীকী মুদ্রা রাজকীয় কোষাগারে জমা দেয় এবং তার বিনিময়ে আসল সোনা ও রূপার মুদ্রা নিয়ে যায়। এবারও জালিয়াতরা লাখ লাখ নকল মুদ্রা তৈরি করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে রূপার মুদ্রা হাতিয়ে নেয়। এতে রাজকীয় কোষাগারের আরও ব্যাপক ক্ষতি হয়।

এই স্কিম প্রায় ৭২৯ হিজরি থেকে ৭৩২ হিজরি (১৩২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত চলে এবং তারপর এটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইবনে বতুতা যখন ৭৩৪ হিজরিতে দিল্লিতে আসেন, তখন তিনি এই মুদ্রা সম্পর্কে কিছুই শুনতে পাননি, যার অর্থ হলো এই স্কিম ততক্ষণে পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ তুঘলকের এই স্কিম যদিও তার মৌলিক ধারণায় আধুনিক ও কার্যকর ছিল, কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, তড়িঘড়ি করে বাস্তবায়ন এবং জনগণের অসহযোগিতার কারণে সুলতানের অন্যান্য পরীক্ষার মতো এই পরীক্ষাও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। সরকারি কোষাগারের ওপর এর খুব খারাপ প্রভাব পড়ে। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে দেশের বাণিজ্যও সংকটের মুখে পড়ে। মুহাম্মদ তুঘলকের নিত্যনতুন পরিকল্পনা সাধারণ ও বিশিষ্ট সবারই বোধগম্যের বাইরে ছিল। তাই মানুষ তার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে। [১]

কওয়ানিনে আমির কোহি:

নিজের জীবনের শেষ বছরগুলোতে সুলতান দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করার জন্য একটি নতুন পরিকল্পনার কথা ভাবেন। এই পরিকল্পনাকে “কওয়ানিনে আমির কোহি” নাম দেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল যেন সালতানাতের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদী না থাকে। [২]

পরিকল্পনায় সাধারণ ও বিশিষ্ট সবার সামনে এই প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যে, তারা সরকারি জমি ইজারা নিয়ে তা চাষাবাদের যোগ্য করে তুলবে, যার জন্য সরকার শুরুতে তাদের পূর্ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে, এমনকি অনাবাদী জমিগুলো সবুজ ও উৎপাদনশীল হয়ে উঠবে। এরপর চাষাবাদের পর সরকার থেকে নেওয়া এই সাহায্য কিস্তিতে কিস্তিতে ফেরত দিতে হবে।

এই পরিকল্পনায় রাজকীয় কোষাগার থেকে অঢেল অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। দুই বছরে সত্তর লাখ টাকা মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে হাজার হাজার মানুষ অর্থ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এই অর্থ তাদের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয় করে ফেলে। অনেক বিত্তবান লোকও এই বহমান গঙ্গায় হাত ধুয়ে নেয়। যদিও তারা জানত যে অর্থ ফেরত না দেওয়ার ক্ষেত্রে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু এই লোকেরা ভাগ্যবান ছিল যে, কিছুকাল পরেই সুলতানের ঠাট্টার সফরে মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক বারানি লিখেছেন যে, যদি এমনটা হতো এবং সুলতান ঠাট্টার সফর থেকে সুস্থভাবে ফিরে আসতেন, তবে এই কৃষি পরিকল্পনা থেকে উপকৃত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কোনো পরিবারই বেঁচে থাকত না। সাথে সাথে তিনি এও স্বীকার করেন যে, যদি এই পরিকল্পনা সফল হতো এবং মানুষ সততার সাথে এটি গ্রহণ করত, তবে সালতানাতে হয়তো এক ইঞ্চি জমিও চাষাবাদহীন থাকত না এবং দেশের আয় এত বৃদ্ধি পেত যে তার আন্দাজ করাও কঠিন। [৩]

---

[১] তারিখ ফিরিশতা কাসমি: পৃ. ১৪৫; তারিখ ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭; তারিখ মুবারক শাহী: পৃ. ১০২, ১০৩।

[২] আমিরের অর্থ দায়িত্বশীল এবং ‘কোহি’ (তুর্কি শব্দ) এর অর্থ ‘আবাদি’ - “কওয়ানিনে আমির কোহি” এর অর্থ: জমির আবাদের দায়িত্ব নেওয়ার আইন।

[৩] তারিখ ফিরিশতা কাসমি: পৃ. ৪৭৯; তারিখ ফিরোজ শাহী: পৃ. ৪৯৮, ৪৯৯।

দৌলতাবাদের ইস্যু এবং কিছু বিবেচ্য দিক

মুহাম্মদ তুঘলকের ওপর সবচেয়ে বেশি সমালোচনা যে কারণে করা হয় তা হলো দৌলতাবাদকে রাজধানী বানানো এবং দিল্লির অধিবাসীদের সেখানে স্থানান্তরিত করা। প্রসিদ্ধ কথা এটাই যে, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক দিল্লির ছোট-বড় প্রতিটি মানুষকে দৌলতাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং পেছনে কোনো প্রাণস্পন্দন বাকি ছিল না। নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন ঐতিহাসিকদের কিছু বর্ণনা এমনই প্রকাশ করে, যার সারসংক্ষেপ হলো:

"দিল্লি পুরোপুরি জনশূন্য হয়ে গেল। সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। পোষা কুকুর ও বিড়াল পর্যন্ত বাকি রইল না। মানুষ ঘরে যে আসবাবপত্র ফেলে গিয়েছিল, বখাটে, গুণ্ডা ও চোরেরা এসে তা নষ্ট করে ফেলল। জনশূন্যতার অবস্থা এমন ছিল যে, শহরতলিতে বন্য পশুর গর্জন ছাড়া কোনো প্রাণের আওয়াজ শোনা যেত না।" [১]

দিল্লির পুরো জনসংখ্যাকে স্থানান্তরিত করা হয়নি:

তবে সেই ঐতিহাসিকদেরই অন্যান্য কিছু বর্ণনা প্রমাণ করে যে, এই বর্ণনায় অভিব্যক্তির তীব্রতা, আবেগ এবং অতিরঞ্জন বেশি এবং দিল্লির পুরো জনসংখ্যাকে দৌলতাবাদে পাঠানো বাস্তবতাবিরোধী। প্রকৃতপক্ষে এটি বাস্তবে সম্ভবও ছিল না। কারণ দিল্লি ইসলামি যুগের আগে থেকেই একটি শহর ছিল। এরপর দেড়শ বছর ধরে এখানে মুসলিম জনবসতি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির ধারা অব্যাহত ছিল এবং একটি ধারাবাহিকতার সাথে এখানে ইমারত নির্মাণ ও মানুষের বসতি গড়ে উঠছিল। এই কারণেই ইবনে বতুতা একে ইসলামি বিশ্বের প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শহর হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ইবনে বতুতার বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী, সেই যুগে দিল্লি চারটি শহরের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল:

- (আলিফ) প্রাচীন দিল্লি, যা হিন্দুরা আবাদ করেছিল এবং মুসলমানরা ৫৮৪ হিজরিতে জয় করেছিল। (একে "লাল কোট" বা "কিলা রায় পিথোরা"ও বলা হতো)। এটিই ছিল পুরনো এবং মূল শহর। কুতুবুদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ এবং বলবনের মতো বাদশাহদের প্রাসাদ এখানেই ছিল। কুতুব মিনারও এখানেই এবং শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের হাউজ-ই-শামসি এর দক্ষিণে অবস্থিত।

- (বা) সিরি: যেখানে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি এবং কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খিলজির অবস্থান ছিল। আলাউদ্দিন খিলজি মঙ্গোল আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং এটি একটি সামরিক ছাউনি ও নতুন রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। এটি প্রাচীন দিল্লির উত্তর-পূর্বে ছিল।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১০২; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৪৫৮; মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ১৫৮।

(গ) তুঘলকাবাদ যা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একটি শক্তিশালী দুর্গবেষ্টিত শহর হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন। এটি তুলনামূলকভাবে বাকি দুটি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং প্রাচীন দিল্লি থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল।

(ঘ) জাহানপনাহ যা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক আবাদ করেছিলেন। জাহানপনাহ ছিল একটি বিশাল নির্মাণ পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্য ছিল এই তিনটিকে (প্রাচীন দিল্লি, সিরি এবং তুঘলকাবাদ) একত্রিত করে একটি সুসংহত ও সুপ্রশস্ত শহরের রূপ দেওয়া। এর জন্য সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক প্রাচীন দিল্লি এবং সিরির মধ্যবর্তী স্থানে জাহানপনাহ নামক দুর্গবেষ্টিত শহর নির্মাণ করান। সুলতান এবং তাঁর আমিরদের অবস্থান এই শহরেই ছিল। পাশাপাশি তিনি চারটি শহরের চারপাশে একটি প্রাচীর দিয়ে সেগুলোকে একটি বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসার কাজ শুরু করিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেন কারণ আয়তনের বিশালতার কারণে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই কাজ সাধ্যের বাইরে। [১]

আল্লামা কালকাশান্দি দিল্লির বিশালতা সম্পর্কে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের সমসাময়িক শেখ মুবারক আনবাতির বর্ণনা লিখেছেন:
“দিল্লি ২১টি শহরের ওপর প্রযোজ্য... দিল্লির জনবসতি চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত... এখানে এক হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। একটি শাফেয়ী মাযহাবের এবং বাকিগুলো হানাফীদের। এখানে সত্তরটি হাসপাতাল রয়েছে। শহর এবং এর শহরতলিতে দুই হাজার লঙ্গরখানা ও খানকাহ রয়েছে।” [২]

দৌলতাবাদ দিল্লির সমান হওয়া অসম্ভব:

চিন্তার বিষয় হলো, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক যদি এক-দেড় বছরে দিল্লির সমান একটি শহর নির্মাণ করিয়ে মানুষকে সেখানে স্থানান্তরিত করতে পারতেন, তবে তিনি এই সামান্য বিষয়ে কেন অপারগ হয়ে গেলেন যে দিল্লির বিভিন্ন অংশকে একটি প্রাচীরের বৃত্তে নিয়ে আসবেন। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, দৌলতাবাদ কোনোভাবেই দিল্লির সমান বা এর সমকক্ষ ছিল না, আর না সেখানে এতটুকু জায়গা ছিল যে পুরো দিল্লির বাসিন্দাদের সেখানে ঠাসা যেত।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইবনে বতুতা যে চারটি শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো মূলত বড় দুর্গবেষ্টিত নগর কেন্দ্র ছিল। অথচ এগুলো ছাড়াও দিল্লির সম্প্রসারণে কিলুগড়ি এবং গিয়াসপুরাও ছিল যা প্রাচীন দিল্লির আশেপাশে অবস্থিত ছিল। কিলুগড়ি যমুনা নদীর তীরে প্রাচীন দিল্লির (কিলা রায় পিথোরা) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। এটি বর্তমান দিল্লির মেহরাউলি এবং সিরি এলাকা থেকে তুলনামূলক দূরে কিন্তু যমুনার কাছে ছিল। দাস বংশের শেষ শাসকরা, বিশেষ করে সুলতান মুইজউদ্দিন কায়কোবাদ (গিয়াসউদ্দিন বলবনের নাতি) এটিকে নিজের রাজধানী বানিয়েছিলেন এবং এখানে একটি নতুন শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটি এক প্রকার দিল্লিরই সম্প্রসারণ ছিল যা নদীর কাছে করা হয়েছিল।

অনুরূপ সম্প্রসারণ “গিয়াসপুরা” আকারে করা হয়েছিল যা যমুনা নদীর তীরে, কিলুগড়ির কাছেই অবস্থিত ছিল। এটি

---

[১] রিহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৫, ৩২৬। তিনি চেয়েছিলেন এই চারটি শহরকে একটি প্রাচীরের অধীনে একত্রিত করতে, তাই তিনি এর কিছু অংশ নির্মাণ করেন এবং বাকি অংশ নির্মাণ করা ছেড়ে দেন কারণ এর নির্মাণে যা প্রয়োজন ছিল তা ছিল বিশাল। (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৬)

[২] সুবহুল আশা: পৃষ্ঠা ৬৬।

মহল্লাটি সূফী বুজুর্গ হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর খানকাহর চারপাশে গড়ে উঠেছিল। আজও এই এলাকাটি বস্তি নিজামুদ্দিন আউলিয়া নামে পরিচিত। ইবনে বতুতা যখন দিল্লিকে চারটি শহরের সমন্বয়ে গঠিত বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন কিলুখারি এবং গিয়াসপুর নিজস্ব গুরুত্ব বজায় রাখলেও সেই কেন্দ্রীয় চারটি শহরের (যা বড় প্রতিরক্ষা প্রাচীরের ভেতরে ছিল) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে সময়ের সাথে সাথে শহরের বিস্তৃতি ঘটলে এই এলাকাগুলোও কেন্দ্রীয় শহরের অংশে পরিণত হয়।)

ইবনে বতুতার যুগে দিল্লির এই চারটি জোন বা এলাকা পুরোপুরি সংযুক্ত ছিল না, বরং এগুলোর মাঝে ছিল খোলা ময়দান, বাগান, উন্মুক্ত এলাকা, রাজকীয় শিকারগাহ, চারণভূমি এবং ছোট ছোট জনবসতি। মুহাম্মদ তুঘলক এই উদ্দেশ্যেই 'জাহানপনাহ' নির্মাণ করেছিলেন যাতে প্রাচীন দিল্লি এবং এর নতুন 'জোন'গুলোকে একটি সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে নিয়ে আসা যায় এবং সেগুলোকে একটি বিশাল নগর কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যায়। মোটকথা, দিল্লি তখন একটি একক সুসংবদ্ধ শহর ছিল না, বরং এটি ছিল একটি মেট্রোপলিটন এলাকার মতো, যেখানে কয়েকটি নগর কেন্দ্র ছিল এবং সেগুলোর মাঝে ছিল খোলা জায়গা। এর জনসংখ্যা এবং আয়তন উভয়ই সেই সময়ের বিচারে ছিল অসাধারণ। একটি সতর্ক অনুমান অনুযায়ী, সেই সময়ে দিল্লির জনসংখ্যা ছিল দশ থেকে পনেরো লাখের মধ্যে। যদিও আমাদের সামনে সেই যুগের দিল্লির কোনো আদমশুমারি নেই, তবে এর প্রায় এক শতাব্দী আগে খাওয়ারিজমের রাজধানী গুরগঞ্জ, হেরাত এবং নিশাপুর ইত্যাদিতে মঙ্গোলদের হাতে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, তার বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা ওই শহরগুলোর জনসংখ্যা লাখে লাখে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ আট থেকে পনেরো লাখ পর্যন্ত। মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদে নিহতদের সংখ্যা আঠারো লাখ বলা হয়। এর তিন শতাব্দী আগে স্পেনের কর্ডোভা শহরের জনসংখ্যা দশ লাখ গণনা করা হয়েছিল। ধারণা করা যায় যে, হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে দিল্লি অবশ্যই এই শহরগুলোর সমান হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, সব জোন মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা দশ থেকে পনেরো লাখ হওয়া একেবারেই যুক্তিযুক্ত।

এই সমস্ত বিষয় থেকে সরে এসে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কয়েকশ বছর ধরে আবাদ হওয়া এবং বিস্তৃতি লাভ করা একটি বিশাল শহরের জনসংখ্যা মাত্র দেড় বছরে নির্মিত স্থাপনাগুলোতে কীভাবে সংকুলান হতে পারে?

জনসংখ্যা স্থানান্তরের অর্থ:

লেখকের মতে, ঐতিহাসিক বর্ণনায় যে জনসংখ্যাকে দৌলতাবাদে স্থানান্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সমগ্র দিল্লির নয়, বরং 'তুঘলকাবাদ' বা 'সিরি'-র জনসংখ্যাকে বোঝানো হয়েছে, যা ছিল কেল্লাবেষ্টিত শহর। [১] সুলতান, তাঁর পরিবার-পরিজন, সৈন্যসামন্ত এবং সালতানাতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অভিজাতরা তুঘলকাবাদে বসবাস করতেন। তাঁদের সাথে উলামা ও মাশায়েখ এবং চাকর-বাকর, সহিস এবং অন্যান্য স্তরের আরও কয়েক হাজার লোক ছিল। মূলত তাঁদেরকেই দৌলতাবাদে পাঠানো হয়েছিল। তবে কিছু বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের এই দাবির পরিপন্থী মনে হতে পারে, যেমন:

---

[১] "জাহানপনাহ প্রজেক্ট"-এর কাজ তখনো শুরু হয়নি, বরং এর সূচনা হয়েছিল সুলতানের দৌলতাবাদ থেকে পুনরায় দিল্লিতে স্থায়ীভাবে ফিরে আসার পর।

তারিখ امت مسلمہ

(১) ইবনে বতুতার একটি বর্ণনায় আছে যে, জনবসতি স্থানান্তরের পর এক রাতে সুলতান তার প্রাসাদের ছাদে উঠে শহরের দিকে তাকালেন, তখন কোনো প্রদীপের আলো বা কোনো চিমনির ধোঁয়াও নজরে এল না। তিনি বললেন: "এখন আমার মন শান্ত হয়েছে।" [১]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বর্ণনাটি আমাদের দাবির পরিপন্থী নয় কারণ এতে দিল্লি বলতে 'সিরি' বা 'তুঘলকাবাদ'-এর জনবসতিই উদ্দেশ্য হতে পারে যা কোনো একটি সীমানার ভেতরে ছিল। দিল্লির সমস্ত অংশকে, যার মাঝে বাগান, খাল, ক্ষেত, টিলা এবং ময়দান বিদ্যমান ছিল, এক নজরে দেখে নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, তাও আবার রাতের বেলা।

(২) ইবনে বতুতা বর্ণনা করেছেন যে, দিল্লির লোকদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল এবং ঘোষণা করা হয়েছিল যে, তিন দিন পর যাকে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা হবে। যার ফলে অধিকাংশ লোক চলে গিয়েছিল কিন্তু কিছু লোক নিজেদের ঘরে লুকিয়ে ছিল। সুলতানের গোলামরা যখন শহরে টহল দিল তখন একজন অন্ধ এবং একজন পঙ্গু ব্যক্তিকে দেখতে পেল যাদেরকে ধরে আনা হলো। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে পঙ্গু ব্যক্তিকে একটি মিনজানিকে (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) রেখে উড়িয়ে দেওয়া হোক এবং অন্ধ ব্যক্তির পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে দৌলতাবাদে নিয়ে যাওয়া হোক। এই নির্দেশ পালন করা হলে পথে সেই মজলুমের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি পা দৌলতাবাদে পৌঁছাল। এই শিক্ষণীয় শাস্তির কারণে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে গেল এবং এরপর দিল্লিতে আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। [২]

এই ঘটনাকেও 'সিরি' বা 'তুঘলকাবাদ'-এর মতো দিল্লির কোনো একটি 'জোনের' ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা শুধু এই বিষয়টি মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করছি যা যুক্তিগতভাবে সম্ভব নয় অর্থাৎ দিল্লির বিশাল জনবসতিকে একটি তুলনামূলক ছোট এবং নির্মাণাধীন শহরে ঠাসাঠাসি করে ঢুকিয়ে দেওয়া।

দিল্লিতে বাইরে থেকে লোক এনে বসানো হয়েছিল:

স্মরণ রাখতে হবে যে, সুলতান এই স্থানান্তরের ফলে খালি হওয়া বাড়িঘর, ইমারত এবং মহলগুলোকে একেবারেই পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখেননি বরং সেগুলোর কিছু না কিছু জনবসতির ব্যবস্থা অবশ্যই করেছিলেন। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে দুটি সাক্ষ্য রয়েছে:

(১) বারানি লিখেছেন: "এই শহর যা বাকি শহরগুলোর জন্য ঈর্ষণীয় ছিল, তা জনশূন্য হওয়ার পর, যদিও সুলতান দেশের বিভিন্ন এলাকা ও জনপদ থেকে অনেক আলেম ও দরবেশদের এখানে এনে বসিয়েছিলেন।" [৩]

(২) ইসামি লিখেছেন যে, সুলতান দৌলতাবাদ স্থানান্তরের পর দিল্লিকে অনেক গ্রামবাসী ও জনপদের লোকদের দ্বারা আবাদ করেছিলেন। [৪]

ইবনে বতুতার সাক্ষ্য:

মোটকথা এই স্থানান্তরের ফলে দিল্লির বিশেষ জৌলুস অবশ্যই ম্লান হয়ে গিয়েছিল এবং ওলামা ও মাশায়েখদের মজলিস এবং আমিরদের স্মৃতিচিহ্ন...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৭

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৩২৭

[৩] ওয়াজান তারিখ ইন চুনিন শহরে কে রশকে শহরহায়ে রাবে মাসকুন বুদ, খারাব মান্দ, আগারচে সুলতান মুহাম্মদ ওলামা ওয়া আকাবির ওয়া মাআরিফে খিত্তাহ ওয়া কাসাবাতে মারুফ বিলাদে মামালিক রা দর শহর آورد ও মুতামাত্তিন گرد ান০ید বুদ। (পৃষ্ঠা ৪৭৪)

[৪] ফুতুহুস সালাতিন: পৃষ্ঠা ৪৫০

মজলিসগুলো ভেঙে গিয়েছিল কিন্তু এমনটি কখনোই হয়নি যে পুরো দিল্লি জনশূন্য হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ফলে ৭৩৫ হিজরি (১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) অর্থাৎ সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের দৌলতাবাদ থেকে দিল্লি প্রত্যাবর্তনের সময় ইবনে বতুতা দিল্লি এসেছিলেন। যদি দিল্লি সাত-আট বছর পর্যন্ত জনশূন্য থাকত তবে সে সময় শহরের অবস্থা করুণ হতো এবং এখানে পুনর্নির্মাণ, মেরামত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের কঠোর প্রয়োজন হতো। কিন্তু ইবনে বতুতা দিল্লিতে প্রবেশের সময় তার পর্যবেক্ষণে কোনো জনশূন্যতা বা ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেননি বরং শহরের জৌলুস, সৌন্দর্য এবং শান-শওকত অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে লিখেছেন:

“পরের দিন আমরা দিল্লি পৌঁছে গেলাম। এই সুমহান শহরটি ইমারতসমূহের সৌন্দর্য ও মজবুত হওয়ার দিক থেকে অতুলনীয়। এর প্রাচীর এতটাই মজবুত যে সারা বিশ্বে এর কোনো নজির নেই। এটি কেবল হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় শহরই নয় বরং মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মহান শহর।” [১]

যদি দিল্লি জনশূন্য হয়ে যেত তবে ইবনে বতুতা এর ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষদর্শী দৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে কিছু না কিছু তথ্য অবশ্যই প্রদান করতেন।

দৌলতাবাদ, কুব্বাতুল ইসলামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে পারেনি:

এখানে আরেকটি সত্য এই যে, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক অবশ্যই চেয়েছিলেন যে দিল্লির পাশাপাশি অন্যান্য শহরেরও অধিকাংশ জনসংখ্যা দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থানান্তরিত হোক, যাতে সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার একটি বড় দ্বীপ অস্তিত্ব লাভ করে এই অঞ্চলে ইসলামি সালতানাতের ভিত্তি গভীর করতে পারে। এই কারণেই দেবগিরির নাম পরিবর্তন করে দৌলতাবাদ এবং “কুব্বাতুল ইসলাম” (ইসলামের গম্বুজ) রাখা হয়েছিল এবং নকশা অনুযায়ী একে এতটাই প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে তা মুসলিম বিশ্বের একটি অত্যন্ত বড় ও আদর্শ শহর হিসেবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন নকশা অনুযায়ী শহর নির্মাণ করা ছিল কমপক্ষে পঁচিশ বছরের কাজ। যে সময় সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, তখন তার সিংহাসন আরোহণের দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং আমরা ধারণা করতে পারি যে এই শহরের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর তখনো মাত্র এক-দেড় বছর হয়েছিল। অর্থাৎ শহরটি তখনো নির্মাণাধীন ছিল এবং এর মূল নকশার সম্ভবত এক-চতুর্থাংশও সম্পন্ন হয়নি।

এটি কেবল অনুমান নয় বরং এ বিষয়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে যাতে জানানো হয়েছে যে, সুলতানের দৌলতাবাদ থেকে পুনরায় দিল্লি আসা পর্যন্ত সেখানে নির্মাণ কাজ অব্যাহত ছিল। সেই যুগের সমসাময়িক ভূগোলবিদ ইবনে ফজলুল্লাহ (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরি) দৌলতাবাদের উল্লেখ করে লিখেছেন:

“শেখ মুবারক বলেন: আমি দৌলতাবাদ ছেড়েছি ছয় বছর হয়ে গেছে, যখন আমি এটি ছেড়েছিলাম, তখন পর্যন্ত এটি সম্পন্ন হয়নি এবং আমার মনে হয় না যে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে পারবে, কারণ এর নকশার (মাস্টার প্ল্যান) বিশালতা এবং ইমারতসমূহ অত্যন্ত সুমহান হওয়ার কারণে এই নির্মাণের কাজ শুরু করাই ছিল অনেক কঠিন। সুলতান এই শহরের (নকশায়) প্রতিটি শ্রেণির জন্য আলাদা মহল্লা নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৈন্যদের জন্য আলাদা মহল্লা, উজিরদের জন্য আলাদা মহল্লা, দাপ্তরিক কর্মচারীদের জন্য আলাদা মহল্লা, কাজী ও ওলামাদের জন্য আলাদা মহল্লা, মাশায়েখ ও দরবেশদের...”

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৫

...এর জন্য আলাদা মহল্লা। প্রতিটি মহল্লায় সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থাপনা অর্থাৎ মসজিদ, বাজার, গণগোসলখানা, যাঁতাকল এবং তন্দুর ছিল, একইভাবে সব ধরণের কারিগর ও দক্ষ লোক যেমন ধোপা, কাপড় রঙকারী, চামড়া রঙকারী ইত্যাদি উপস্থিত ছিল যাতে কোনো মহল্লার মানুষ কেনাবেচা এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্য মহল্লার মুখাপেক্ষী না হয় এবং প্রতিটি মহল্লা নিজ নিজ স্থানে একটি শহরের মতো হয়। [১]

নিঃসন্দেহে দৌলতাবাদ অত্যন্ত চমৎকার নকশা এবং বিশাল আয়তনের ওপর নির্মাণ করা হচ্ছিল এবং এতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্যান্য শহর থেকে আলাদা ছিল, যা ইবনে বতুতা বর্ণনা করেছেন। তিনি ৭৪৩ হিজরিতে (সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের দৌলতাবাদ থেকে দিল্লি ফিরে আসার আট বছর পর) সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেন:

“উজ্জয়িনী থেকে রওনা হয়ে আমরা দৌলতাবাদ পৌঁছলাম। এটি একটি বিশাল শহর। এর শান-শওকত এবং ‘খিত্তা’ (মাস্টার প্ল্যান)-এর বিশালতায় এটি রাজধানী দিল্লির সদৃশ। এর তিনটি অংশ রয়েছে: একটি অংশকে দৌলতাবাদ বলা হয় যেখানে বাদশাহ এবং রাজকীয় বাহিনী থাকে। দ্বিতীয় অংশকে কাটাকা বলা হয়। তৃতীয় অংশটি যা একটি কেল্লা, তাকে ‘দেওগিরি’ বলা হয়। এই কেল্লাটি মজবুত হওয়ার দিক থেকে অতুলনীয়। সুলতানের উস্তাদ খান-ই-আজম কুতলুগ খান এই কেল্লাতেই থাকেন। সাগর এবং তেলেঙ্গানাও এর অধীনে। এর প্রশাসনিক এলাকা তিন মাসের দূরত্বের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত। তার পক্ষ থেকে নায়েব এবং শাসকগণ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। দেওগিরি কেল্লাটি সমতল ভূমি থেকে উঁচু একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এই পাহাড়টি খোদাই করে এর চূড়ায় কেল্লা নির্মাণ করা হয়েছে। কেল্লায় চামড়ার তৈরি মই দিয়ে আরোহণ করা হয় এবং আরোহণের পর রাতে মই উপরে তুলে নেওয়া হয়। কেল্লার রক্ষীরা তাদের পরিবারসহ সেখানেই বসবাস করে। এখানে ভূগর্ভস্থ কক্ষ তৈরি করা হয়েছে যেখানে বড় বড় অপরাধীদের বন্দি রাখা হয়। এই ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোতে এমন সব বড় ইঁদুর রয়েছে যাদের দেখে বিড়ালও ভয় পায় এবং কৌশল ছাড়া তাদের শিকার করতে পারে না।”

দৌলতাবাদে আমোদ-প্রমোদকারীদের একটি বাজার রয়েছে যাকে তারবাবাদ বলা হয়। এই বাজারটি অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রশস্ত। এখানে অনেক দোকান রয়েছে। প্রতিটি দোকানের একটি দরজা ঘরের দিকে খোলে এবং ঘরের একটি স্বতন্ত্র দরজাও থাকে। দোকানে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ কার্পেট বিছানো থাকে এবং এর মাঝখানে একটি দোলনা থাকে যাতে গায়িকা নারী বসে থাকে বা শুয়ে থাকে। তার দাসীরা সেই দোলনাটি দোলাতে থাকে। দোলনাটি অত্যন্ত সুসজ্জিত থাকে।

বাজারের মাঝখানে একটি বড় গম্বুজ রয়েছে যা نہایت সুসজ্জিত এবং কার্পেট দ্বারা সজ্জিত। এতে গায়িকাদের সর্দার আসরের নামাজের পর প্রতি বৃহস্পতিবার এসে বসে এবং তার গোলাম ও খাদেমরা উপস্থিত থাকে। প্রত্যেক নর্তকী পালাক্রমে এসে তার সামনে মাগরিবের ওয়াক্ত পর্যন্ত গান-বাজনা করে। মাগরিবের পর সে নিজের বাড়িতে চলে যায়। এই বাজারে মসজিদও রয়েছে এবং সেখানে তারাবিহর জামাতও হয়। অনেক রাজা যখন এই বাজার ভ্রমণে আসেন তখন এই গম্বুজে অবস্থান করেন এবং নর্তকীরা তাদের সামনে এসে গান-বাজনা করে এবং কিছু মুসলিম বাদশাহও।

---

[১] মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার: ৩, পৃষ্ঠা ৪৮

...ও এমনটি করে থাকেন। [১]

এই পুরো বিবরণ থেকে এটি অনুমান করা কঠিন নয় যে, দৌলতাবাদ মূলত সালতানাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী এবং বিশেষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সাধারণ জনসংখ্যা এখানে নগণ্য ছিল। মূল নকশা অনুযায়ী (যার কাজ চলছিল) এই শহরটি অবশ্যই অত্যন্ত বিশাল ছিল এবং ইমারতসমূহের শান-শওকতে দিল্লির সদৃশ করে তৈরি করা হচ্ছিল, কিন্তু বাস্তবে এখানে দিল্লির মতো ঘনবসতি ছিল না, যা ছিল চারটি শহর এবং তাদের ক্রমাগত সম্প্রসারণের সমষ্টি।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আবেগপ্রসূত দিকের প্রাধান্য:

যখন এটি প্রমাণিত হলো যে প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী এই শহরের নির্মাণ কাজ বহু বছর পরেও সম্পন্ন হতে পারেনি, তখন সহজেই বোঝা যায় যে ৭২৭ হিজরিতে দেড় বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই শহরের কেবল প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজই সম্পন্ন হয়েছিল এবং সেখানে দিল্লির জনসংখ্যার কেবল একটি নির্বাচিত অংশই স্থানান্তরিত করা সম্ভব ছিল। সুতরাং আমাদের এটি মেনে নিতে হবে যে, "তুঘলকাবাদ" বা "সিরি" ব্যতীত দিল্লির বাকি অংশগুলোর কোথাও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটেনি, তবে স্থানান্তরের উৎসাহ প্রদান এবং সাধারণ অনুমতি ছিল। তাছাড়া কিছু বিশেষ শ্রেণির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক এই নতুন শহরে বসতি স্থাপন করে। ফলে প্রাচীন ও নামী-দামী আমিরদের বিশেষভাবে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা নিজেরা দেশের যে কোনো প্রান্তেই থাকুক না কেন, তাদের পরিবার-পরিজন ও বংশের জন্য দৌলতাবাদে অট্টালিকা নির্মাণ করতে হবে এবং তাদের সেখানে স্থানান্তরিত করতে হবে। [২]

একইভাবে উলামা ও মাশায়েখদের ওপরও দৌলতাবাদে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যাতে দক্ষিণ ভারতে অধিক সংখ্যক মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেই দিল্লির ইলমি ও আধ্যাত্মিক মজলিসগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। বারানি, ইসামি এবং তাদের মতো উলামাগণ যাদের জীবনের আনন্দ ছিল এই মজলিসগুলো, তারা যখন এই স্থানান্তরের কারণে দিল্লির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেন, তখন তাদের বর্ণনা আবেগে পূর্ণ হয়ে ওঠে, যার প্রভাবে পাঠকদের মনে হয় যে দিল্লি হয়তো জনবসতি থেকে পুরোপুরি শূন্য হয়ে গিয়েছিল। [৩]

দৌলতাবাদে বাধ্যতামূলক হিজরত করানোর উপকারিতা:

পরিশেষে এটি উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানদের উপমহাদেশে ইসলামি সালতানাত কায়েম করার পর থেকে তখন পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ, ঈমানি ও ইলমি বসন্ত, কাব্য ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং উন্নয়নমূলক কীর্তিগুলো থেকে কেবল উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব এবং কিছুটা মধ্য ভারত উপকৃত হচ্ছিল। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব তখন পর্যন্ত এই নতুন আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণের মাঝে বিদ্যমান এই ব্যবধানের ওপর একটি সেতু নির্মাণের...

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২, পৃষ্ঠা ৪২৪, ৪২৫

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: ১, পৃষ্ঠা ৪৫৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১০০

[৩] উর্দু সাহিত্যে এর জীবন্ত উদাহরণ গালিবের চিঠিপত্রে দেখা যায়, যেখানে ১৮৫৭ সালের পরবর্তী দিল্লির জনশূন্যতার এমন শোকগাথা রয়েছে যে পাঠকের মনে হতে পারে হয়তো পুরো দিল্লিই কবরস্থানে পরিণত হয়েছিল, যদিও গালিব এবং তার মতো ডজন ডজন জ্ঞানী ব্যক্তি ও অসংখ্য মানুষ তখনও দিল্লিতে বসবাস করতেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি এর সূচনা করেছিলেন, তবে এই সেতুর মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যাকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে নিয়ে আসার কৃতিত্ব সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সম্পন্ন করেছিলেন। যদিও এই পরিকল্পনাটি বস্তুগত লাভের দিক থেকে সফল হয়নি, মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল এবং সুলতানকে মন্দ বলতে থাকে যা তাদের অধিকার ছিল। সরকারি কোষাগারও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু সুলতানের অটল সিদ্ধান্তের ফলাফল ছিল এই যে, এরপর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মুসলমানদের বসতি স্থাপনের ধারা শুরু হয়ে যায় এবং সেখানে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে শীঘ্রই তারা এখানে নিজেদের স্থায়ী রাজ্য গড়ে তোলে। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে জ্ঞান ও সাহিত্যের এক নতুন জগত আবাদ হয়। সুতরাং এই অঞ্চলগুলোতে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের দৌলতাবাদকে রাজনৈতিক কেন্দ্র বানানো এবং সেখানে দিল্লির অধিবাসীদের এনে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে হয়েছিল এবং এটাই ছিল এই কঠোর পদক্ষেপের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।

https://t.me/BoierSomahar

কারনামা, শান-শওকত এবং ইতিবাচক গুণাবলি

নিজের নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তার পাশাপাশি মুহাম্মদ তুঘলক যাই হোক একজন মহান শাসক ছিলেন, যার যুগ সামগ্রিকভাবে হিন্দুস্তান সালতানাতের শান-শওকত এবং শক্তি ও মহত্ত্বের যুগ ছিল। এত বড় দেশ এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চালানো কোনো সাধারণ মানুষের কাজ ছিল না। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের মধ্যে অনেক ইতিবাচক গুণও ছিল, যার বদৌলতে তিনি এই দেশের শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত পরিশ্রম ও তৎপরতার সাথে পরিচালনা করতে থাকেন। তার ভালো গুণাবলি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফেরেশতা লেখেন:

“মুহাম্মদ তুঘলক অত্যন্ত ভালো বাগ্মী ছিলেন, তার বক্তৃতায় মাধুর্য ও প্রাঞ্জলতা ছিল। আরবি ও ফারসিতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এমন সব চিঠি ও বার্তা লিখতেন যে বড় বড় গদ্যকার ও পণ্ডিতরা হতবাক হয়ে যেতেন। তিনি এমন একজন দক্ষ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন যে শীর্ষস্থানীয় লিপিকাররাও তার ক্যালিগ্রাফির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। রাষ্ট্র পরিচালনা ও আইন প্রণয়নে তার কোনো সমকক্ষ ছিল না। প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির তীক্ষ্ণতায় তিনি তার সমসাময়িক সকল শাসকের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।”

তিনি মানুষ চিনতে পারতেন, চেহারা দেখেই তার ভালো বা মন্দ বলে দিতে পারতেন। প্রায়ই এমন হতো যে সাহায্যপ্রার্থীর চেহারা দেখেই তার মনের কথা বলে দিতেন। ইতিহাসে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। কোনো কথা একবার শুনলে তা আর কখনো ভুলতেন না। দাস্তান-ই-শাহনামা, কিসসা-ই-আবু মুসলিম এবং আমির হামজা তার মুখস্থ ছিল।

তিনি সমস্ত যুক্তিভিত্তিক বিদ্যায় বিশেষ করে চিকিৎসাশাস্ত্র, হিকমত, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। প্রায়ই তিনি রোগীদের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক করে তাদের নিরুত্তর করে দিতেন।

তিনি ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রাচীন কবিদের কবিতা খুব ভালো বুঝতেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর ছিলেন। সবসময় বিজয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত থাকতেন। তার জীবনের বড় অংশ লশকর পরিচালনা ও যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হয়েছে। [১]

রাষ্ট্রের স্তম্ভ নির্বাচন এবং পারস্পরিক আস্থা:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনব্যবস্থা অতীতের সকল সুলতানের চেয়ে অনেক উন্নত ও সক্রিয় ছিল। তার পুরো শাসনামলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু একবারও তিনি কোনো প্রাণঘাতী হামলার শিকার হননি, যার অনেক উদাহরণ অতীতের সুলতানদের মধ্যে পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সুলতানের রাগ বা মেজাজের উগ্রতা সত্ত্বেও যদি উমরাহদের একটি বড় অংশ অসন্তুষ্টও থাকত, তবুও সুলতান সবসময় নিজের চারপাশে এমন লোকদের রাখতেন যাদের সহযোগিতা তার প্রয়োজন ছিল অথবা যারা নির্ভরযোগ্য ছিল। সুলতান নিজের...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৭, ৪৪৮।

এবং গাম্ভীর্য ছাড়াও বদান্যতা ও উদারতার মাধ্যমে তিনি তাদের নিজের সাথে যুক্ত রেখেছিলেন। সুলতানের বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহই হয়েছে, তা বাংলা বা দক্ষিণ ভারতের মতো দূরবর্তী এলাকাগুলোতে হয়েছে। দিল্লির আমিরদের মধ্যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি বা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেনি। সুলতানের মৃত্যু দিল্লি থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে ঠাট্টার কাছে হয়েছিল এবং অনেক দিন পর্যন্ত দিল্লির সিংহাসন খালি ছিল। দিল্লির আমিরদের জন্য এটা একেবারেই সম্ভব ছিল যে, সেই সময়ে তারা অন্য কোনো পরিবারের আমিরকে সিংহাসনে বসাতেন, কিন্তু তা হয়নি বরং সুলতানের উত্তরসূরি হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই কথার প্রমাণ যে, দিল্লির আমিরদের তুঘলক পরিবারের ওপর আস্থা ছিল। মোদ্দাকথা, অনেক বিতর্কিত বা ভুল পদক্ষেপ সত্ত্বেও সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক আমিরদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে একটি সুতোয় গেঁথে রেখেছিলেন, যার মধ্যে এক বৈচিত্র্যও ছিল কারণ এতে নিম্নোক্ত শ্রেণির লোকেরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন:

- খিলজি আমলের প্রাচীন তুর্কি আমির: যেমন উজির আহমদ আয়াজ। এরা সবাই বয়োজ্যেষ্ঠ আমির ছিলেন।
- হিন্দুস্তানি মুসলমান: যেমন আইনুল মুলক মাহরু।
- নওমুসলিম ব্যক্তি: অর্থাৎ যারা সেই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যেমন আজিজ খুম্মার, মালিক মকবুল, রাজা কাম্পিলের ছেলে যারা মুসলমান হয়েছিলেন এবং সুলতানের আবদার (পানি ও পানীয়র তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন।
- বিদেশি: যেমন ইবনে বতুতাকে কাজী বানানো হয়েছিল—এমন পদাধিকারী খুব সীমিত ছিল।
- সুফি ও দরবেশ: যেমন শেখ মুইজউদ্দিন (ইবনে আলাউদ্দিন) কে গুজরাটের ওয়ালি এবং শেখ শিহাবুদ্দিন ইবনে আহমদ জামকে বকেয়া আদায়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল। শেখ রুকনুদ্দিন মুলতানি রহ.-এর ভাই শেখ ইমাদউদ্দিনকে সেনাবাহিনীতে রাখা হয়েছিল। এই পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল কারণ এই ব্যক্তিবর্গ এসব বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখতেন না। [১]
- উলামা: যেমন কুতলুগ খান এবং তাঁর ভাইয়েরা সবাই আলেম ছিলেন, বড় বড় পদে আসীন ছিলেন এবং সফলতার সাথে কাজ করেছেন।
- আফগান: কাজী জালাল, মালিক ইসমাইল এবং শাহু লোদি ইত্যাদি এর উদাহরণ। এরা বিদ্রোহে অগ্রগণ্য ছিলেন।
- আমিরানে সাদাহ: ছোট কর্মকর্তাদের দল, যারা পরবর্তীতে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। তাদের অবস্থা পেছনে অতিক্রান্ত হয়েছে।
- হিন্দু: দাক্ষিণাত্যের নায়েব উজির 'ধারা', সিওয়ানের প্রশাসক 'রতন', গুলবারগার নাজিম 'ভৈরন রায়', দরবারি উপদেষ্টা 'সাজ রায়'। এরা সবাই সুলতানের প্রশাসনের অংশ ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অনুগত ছিলেন। [২]

দরবারের শান

মুহাম্মদ তুঘলকের মতো জাঁকজমকপূর্ণ দরবার সম্ভবত অন্য কোনো বাদশাহর ছিল না যাতে হাজার হাজার খওয়ানিন, মুলুক এবং আমির শরিক হতেন।

---

[১] শেখ মুইজউদ্দিন পাকপত্তনের শেখ আলাউদ্দিন বিন বাবা ফরিদ গঞ্জেশকরের ছেলে ছিলেন। গুজরাটে সুলতানের বিরোধী আমিরানে সাদাহর সাথে যুদ্ধে কাজ এসেছিলেন। শেখ ইমাদউদ্দিন মুলতানের ওয়ালি বাহরাম আইবা কিশলু খানের বিরুদ্ধে সুলতানের পতাকাতলে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন। শেখ শিহাবুদ্দিন সুলতানের জুলুমের প্রতিবাদ করায় শহীদ হন।

[২] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৭৯১ থেকে ৭৯৭।

হতেন। বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা এই সময়েই হিন্দুস্তানে আসেন এবং সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। তিনি সুলতানের সালতানাত এবং দিওয়ান খানা অর্থাৎ দরবারের শান-শওকত অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন:

'দিওয়ান খানার নাম হাজার সুতুন [১] কারণ এর কাঠের ছাদ কাঠের এক হাজার স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ছাদ এবং স্তম্ভগুলোতে রঙ ও বার্নিশ এবং নকশার কাজ করা হয়েছে। সব মানুষ এখানে এসে বসে পড়ে। দরবারে বাদশাহর মজলিস প্রায়ই আসরের পর এবং কখনো চাশতের সময় বসে। বাদশাহর আসন একটি উঁচু চত্বরের ওপর, যার ওপর সাদা চাদর বিছানো থাকে। বাদশাহর কোমরের পেছনে একটি বড় বালিশ (গাও তাকিয়া) এবং ডানে ও বামে দুটি ছোট বালিশ থাকে। বাদশাহর বসার ভঙ্গি নামাজের আত্তাহিয়্যাতুতে বসার মতো হয়। হিন্দুস্তানে অধিকাংশ মানুষ এভাবেই বসে থাকে। বাদশাহ বসার পর উজির দাঁড়িয়ে যান। উজিরের পেছনে কাতিব (লেখক) থাকেন, তার পেছনে হাজিবদের সর্দার... যখন বাদশাহ বসেন তখন হাজিব ও নকিব 'বিসমিল্লাহ' বলেন। বাদশাহর পেছনে ময়ূরপঙ্খী পাখা দিয়ে বাতাস করার লোক এবং ডানে-বামে একশ সশস্ত্র দেহরক্ষী তলোয়ার, ঢাল ও ধনুকসহ দাঁড়িয়ে থাকে। দিওয়ান খানার দৈর্ঘ্য বরাবর ডানে ও বামে কাজিউল কুজাত, তারপর খতিবুল খুতাবা, তারপর বাকি কাজি ও ফকিহগণ, তারপর শরীফগণ, তারপর মাশায়েখগণ, তারপর বাদশাহর ভাই ও জামাতা, তারপর অন্যান্য বড় বড় উমারা, তারপর মুসাফির ও রাষ্ট্রদূত, তারপর সামরিক কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে থাকেন... দরবারে ষাটটি ঘোড়া এবং পঞ্চাশটি প্রশিক্ষিত হাতিও পূর্ণ সাজসজ্জার সাথে আনা হয়। যখন নকিব 'বিসমিল্লাহ' বলেন তখন হাতিগুলোও মাথা নত করে আদব প্রদর্শন করে। [২]'

ইলমি মজলিস, মেহমানদারি, শিকার:

দরবারের পর মেহমানদারি হতো যাতে বাদশাহর কাছে প্রায় দুইশ আলেমকে জায়গা দেওয়া হতো। খাওয়ার সময় বাদশাহ এই ব্যক্তিদের সাথে ইলমি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতেন। মেহমান, কর্মচারী এবং রাজপরিবারের জন্য রাজকীয় রান্নাঘরে প্রতিদিন আড়াই হাজার গরু, বলদ এবং দুইশ ছাগল জবাই করা হতো। পাখির কোনো হিসাবই ছিল না। বাদশাহর শিকারের শানও ছিল অদ্ভুত। শিকারে যেতেন তখন দুইশ হাতি সাথে থাকতো। দুইশ উট কাঠের দোতলা ঘরগুলোকে টেনে নিয়ে যেত যা গাড়ির ওপর বোঝাই করা থাকতো। তাবু ও শামিয়ানার কোনো হিসাব ছিল না। দশ হাজার শিকারি সুলতানের কর্মচারী ছিল যারা ঘোড়ায় চড়ে সাথে চলত। তাদের হাতে প্রশিক্ষিত ঈগল, বাজ ও শিকরা প্রস্তুত থাকতো। তিন হাজার খাদেম শিকার, রান্না এবং অন্যান্য প্রয়োজনে সাথে থাকতো। কোনো কোনো সময় এক লক্ষ মানুষের সমাবেশ শিকারে সাথে থাকতো। এক শহর থেকে অন্য শহরে সফরে ত্রিশ হাজার আরোহী, দুইশ হাতি এবং এক হাজার খালি ঘোড়া

---

[১] মনে রাখতে হবে যে, এখানে হাজার সুতুন বলতে সেই 'হাজার সুতুন মহল' বোঝানো হয়নি যা আলাউদ্দিন খিলজি সিরিতে নির্মাণ করেছিলেন, বরং এটি তুঘলকাবাদে মুহাম্মদ তুঘলকের নির্মিত 'হাজার সুতুন' ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের 'আসারুস সানাদিদ'।

[২] সফরনামা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৩৪৬, ৩৪৭।

ডাকের দ্রুতগতি

মুহাম্মদ তুঘলক ডাক ব্যবস্থাকে অত্যন্ত দ্রুতগামী করেছিলেন। সমস্ত মহাসড়কে ডাকের চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল। ডাক দুই ধরনের ছিল: ১. ঘোড়ার মাধ্যমে। ২. পদাতিকদের মাধ্যমে। ঘোড়ার চৌকিগুলো প্রতি চার ক্রোশ (বারো মাইল) অন্তর ছিল, যেখানে সংবাদ এগিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন ঘোড়া প্রস্তুত থাকত। এই ডাককে 'ওয়ালাক' বলা হতো। [১]

পদাতিক ডাকের চৌকিগুলো প্রতি এক-তৃতীয়াংশ মাইল (৩৩৩ গজ) অন্তর নির্মিত ছিল। প্রতিটি চৌকিতে অত্যন্ত দ্রুতগামী দৌড়বিদ প্রস্তুত থাকত, যাদের এক হাতে ঘণ্টা এবং অন্য হাতে ডাকের খাম থাকত। এক চৌকি থেকে ঘণ্টার শব্দ শুনে অন্য চৌকির ব্যক্তি প্রস্তুত হয়ে যেত এবং তৎক্ষণাৎ খামটি নিয়ে সামনের দিকে দৌঁড়ে যেত। এভাবে শত শত ক্রোশ পর্যন্ত সেই সংবাদ এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে পৌঁছে যেত। ইবনে বতুতা পদাতিক ডাক সম্পর্কে লেখেন:

"এই ডাক ঘোড়ার ডাকের চেয়েও বেশি দ্রুতগামী। কখনো কখনো এই ডাকের মাধ্যমে খোরাসানের তাজা ফল বাদশাহর জন্য পাত্রে করে পৌঁছানো হয়। কখনো কোনো গুরুতর অপরাধীকেও চারপায়ায় (খাটিয়ায়) শুইয়ে একইভাবে এক চৌকি থেকে অন্য চৌকিতে দৌঁড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন সুলতান দৌলতাবাদে ছিলেন, তখন তাঁর জন্য গঙ্গা নদীর পানি—যা হিন্দুদের তীর্থস্থান—এভাবেই নিয়ে যাওয়া হতো, অথচ দৌলতাবাদ থেকে গঙ্গার দূরত্ব ছিল চল্লিশ দিনের পথ।"

ইবনে বতুতা বলেন যে, "আমি যখন মুলতানে পৌঁছলাম, সুলতান তখন দিল্লিতে ছিলেন এবং দিল্লি থেকে মুলতানের দূরত্ব পঞ্চাশ দিনের পথ, কিন্তু আমার মুলতানে আসার খবর সুলতানের কাছে পাঁচ দিনেই পৌঁছে গিয়েছিল।" [২]

সাধারণ জীবনযাপন - জনগণের সাথে দূরত্ব কম

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক তাঁর শান-শওকত ও গাম্ভীর্য সত্ত্বেও নিজের আমিরদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র জীবনযাপন করতেন না। এই কারণেই ইবনে বতুতা যখন সুলতানকে প্রথমবার দেখেন, তখন তিনি বুঝতে পারেননি যে ইনিই সুলতান, বরং তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি সুলতানের একজন দ্বাররক্ষী। [৩]

নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তিনি মানুষের সাথে খোলামেলাভাবে মিশতেন। যে ব্যক্তি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইত, সে যে শ্রেণিরই হোক না কেন, তাকে হাজিব (চেম্বারলেইন) ও দ্বাররক্ষীদের বাধার সম্মুখীন হতে হতো না। [৪]

বংশানুক্রমিক আমিরদের প্রতি ঘৃণা, বিদেশি শরীফদের প্রতি ভালোবাসা

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক দেশের ঐতিহ্যবাহী ও বংশানুক্রমিক আমিরদের ওপর খুব বেশি আস্থা রাখতেন না; বরং তাদের আমিরি অহংকার, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন, লোভ-লালসা এবং ষড়যন্ত্র তাঁর জন্য সর্বদা মনঃকষ্টের কারণ ছিল। এই কারণেই তিনি...

---

[১] মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, শেখ আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-উমারি (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরি), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৩ থেকে ৬২।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা, পৃষ্ঠা ৩০৯।

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা, পৃষ্ঠা ৩৯৫।

[৪] মাসালিকুল আবসার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮২।

ক্রোধ ও আক্রোশও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন বংশীয় অভিজাতদের ওপর বজ্রের মতো আপতিত হতো। যেখানে বিদেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মুসাফির এবং প্রবাসীদের প্রশ্ন, তাদের ওপর সুলতানের অনুগ্রহ ছিল সীমাতীত এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি তাদের অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। সুলতান ভিনদেশ থেকে আগত সকল মুসাফিরের অবস্থা প্রতিদিন অবগত হতেন এবং তাদের জন্য নির্দেশনা জারি করতেন। এই মুসাফিরদের মধ্য থেকেই তিনি নিজের জন্য যোগ্য পদাধিকারী খুঁজে নিতেন। ইবনে বতুতার বর্ণনা হলো:

"সংবাদ লেখকরা প্রত্যেক মুসাফিরের অবস্থা বিস্তারিতভাবে লিখে থাকেন। তার চেহারা, আকার-আকৃতি, পোশাক, খাদেম ও সঙ্গীসাথী, পশুপাখি এবং চালচলন ও গতিবিধির কোনো কিছুই তারা বাদ দেন না। সবকিছুর বিবরণ লিখে পাঠান। যখন কোনো মুসাফির মুলতানে পৌঁছান, যা সিন্ধুর প্রধান কেন্দ্র, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রস্থানের অনুমতি না আসে এবং তার আতিথেয়তার ব্যবস্থা না হয় এবং তার ভাতার পরিমাণ নির্ধারিত না হয়, তাকে সেখানেই অবস্থান করতে হয়। প্রত্যেক মুসাফিরের খাতির-যত্ন তার আসবাবপত্র এবং চলাফেরার মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে হয়। কারণ তার বংশ ও পূর্বপুরুষদের অবস্থা তো জানা থাকে না।"

মুহাম্মদ তুঘলকের অভ্যাস এই যে, তিনি প্রবাসীদের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসা ও বিশেষ সম্মানের আচরণ করেন এবং তাদের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেন। তার বড় বড় অভিজাত, হাজিব, উজির, কাজী এবং জামাতারা বেশিরভাগই বিদেশী। তার নির্দেশ হলো প্রবাসীকে সর্বদা সম্মানজনকভাবে স্মরণ করা হোক। ফলে প্রবাসীদের নামই 'আজিজ' হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি বাদশাহকে সালাম করতে যায়, সে তার জন্য উপহার নিয়ে যায়। সবাই জানে যে বাদশাহ এই উপহারের চেয়ে বহুগুণ বেশি পুরস্কার দেন। এজন্য সিন্ধুর কিছু ব্যবসায়ীর এটি পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তারা এমন মুসাফিরদের হাজার হাজার দিনার ঋণ হিসেবে দিয়ে দেয় এবং খাদেম, ঘোড়া ও সওয়ারির ব্যবস্থা করে দেয় এবং নিজেরা চাকরের মতো তার সামনে উপস্থিত থাকে। যখন সে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয় এবং পুরস্কার ও সম্মানে ধন্য হয়ে ফিরে আসে, তখন সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেয়; বরং এভাবে এই ব্যবসায়ীরা অনেক মুনাফা অর্জন করে। আমি যখন সিন্ধু পৌঁছলাম, তখন আমিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করলাম এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘোড়া, উট ও গোলাম কিনলাম এবং ইরাকের এক সওদাগর মুহাম্মদ দুরি, যিনি তিকরিতের বাসিন্দা ছিলেন, তার কাছ থেকে গজনী শহরে ত্রিশটি ঘোড়া এবং একটি উট যার ওপর তীরের ফলা বোঝাই ছিল, কিনে নিলাম। কারণ এই ধরনের জিনিসই বাদশাহকে নজরানা দেওয়া হতো। যখন সে খোরাসান থেকে ফিরে এসে আমার কাছে তার ঋণ চাইল, তখন সে মুনাফায় রইল বরং আমার উসিলায় সে অনেক বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেল। [১]

অমুসলিমদের জন্য কোমলতা:

সুলতানকে আমরা যেখানে আমির ও কর্মকর্তাদের এমনকি কোনো কোনো সময় উলামা ও মাশায়েখদের প্রতিও কঠোর হতে দেখি, সেখানে এটাও দেখা যায় যে তিনি নিজ দেশের অমুসলিমদের অকারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে বা তাদের ওপর জুলুম করতে যথাসম্ভব

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১০, ৩১১।

যুদ্ধক্ষেত্র এবং হত্যাযজ্ঞ এড়িয়ে চলা ছাড়া অন্য কোনো কারণে তলোয়ার কোষমুক্ত করাকে তিনি ভুল মনে করতেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, একবার সুলতান কোতালের কাজীকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি তার এলাকার ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের (বিশৃঙ্খলাকারী) নামের একটি তালিকা তৈরি করেন। কাজী একটি দীর্ঘ ও চওড়া তালিকা তৈরি করলেন এবং তাতে হিন্দুদের নামও লিখিয়ে দিলেন। সুলতান যখন সেই তালিকা দেখলেন, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন:

"এই ব্যক্তি আমার সালতানাতকে উজাড় করতে চায়। তার গর্দান উড়িয়ে দাও।" چنانچہ কাজীর শিরশ্ছেদ করা হলো। [১]

খুশহালি (স্বাচ্ছন্দ্য):

যদিও সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে কয়েকবার অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু হিন্দুস্তানের কৃষি ও শিল্প-কারখানা এতই মজবুত ছিল যে প্রতিবারই দেশ অর্থনৈতিক ধ্বংসের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসত। কয়েক বছরের দুর্ভিক্ষ বাদ দিলে এই যুগেও সাধারণত পুরো সালতানাতে সচ্ছলতা ছিল। খাদ্যদ্রব্য প্রচুর এবং সস্তা ছিল। এজন্যই হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা সম্পদ ও দানশীলতায় বিশিষ্ট বলে গণ্য হতো। একজন পর্যটকের বর্ণনা ছিল: "আমি এবং আমার তিন সঙ্গী দিল্লি গেলাম। সেখানে গরুর মাংস, রুটি এবং ঘি কিনে আমরা সবাই তৃপ্তিসহকারে আহার করলাম। এতে মাত্র এক জিতল খরচ হলো যা এক ফলস (পয়সা)-এর এক চতুর্থাংশ হয়।" [২]

জাসুসি নিজাম কি তেজি (গোয়েন্দা ব্যবস্থার তৎপরতা):

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের যুগে গোয়েন্দা ও সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। সুলতানের গোয়েন্দারা সেনাবাহিনী, আদালত, ব্যবসায়ী, শিল্প-কারখানা, মাদ্রাসা, খানকাহ, মহাসড়ক, বাজার, বাগান, গ্রাম এবং ক্ষেতখামারসহ প্রতিটি স্থানে বিভিন্ন রূপে উপস্থিত থাকত। প্রতি কয়েকজন গোয়েন্দার ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকত। গোয়েন্দারা তাদের প্রতিবেদন তত্ত্বাবধায়ককে পৌঁছে দিত এবং তিনি তা আমিরের কাছে পৌঁছে দিতেন, এভাবে খুব দ্রুত সেই তথ্য সুলতানের কাছে পৌঁছে যেত। [৩]

শারাব বন্দ, পান আম (মদ নিষিদ্ধ, পান সাধারণ):

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক মদের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন যে দিল্লিতে কোথাও মদ পাওয়া যেত না। এর পরিবর্তে এই যুগে পান সাধারণ ছিল এবং তা সংস্কৃতির অংশ হয়ে গিয়েছিল। কাউকে পান খাওয়ানো বড় সম্মান হিসেবে গণ্য হতো। যদি কোনো দাওয়াতে পান না থাকত, তবে মেহমান মনে করত যে তার যথাযথ আপ্যায়ন করা হয়নি। [৪]

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহের মাজারের নির্মাণ:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের নির্মাণ কাজের জন্য শুধু দৌলতাবাদের উল্লেখই যথেষ্ট, যার বিশেষ বিবরণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই শহরে কুয়া বিশিষ্ট মসজিদটি বিশেষত সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ যা তার নিজস্ব শৈলীর এক অদ্ভুত ও অনন্য ইমারত যা মাটির নিচে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া দৌলতাবাদের প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে আরও অনেক কিছু রয়েছে যা দেখার মতো।

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭১

[২] মাসালিকুল আবসার: পৃষ্ঠা ৮২

[৩] মাসালিকুল আবসার: পৃষ্ঠা ৮১

[৪] মাসালিকুল আবসার: পৃষ্ঠা ৮০, ৮১

এ ছাড়াও সুলতান আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইমারত নির্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক সফরের সূচনা সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খলজির 'আমীরে আখুর' (আস্তাবলের তত্ত্বাবধায়ক) হিসেবে করেছিলেন, সেই সময় তাঁকে মালিক জুনা বলা হতো। যদিও মুবারক শাহ যে ধরণের শাসক ছিলেন, তা আমরা আগে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মালিক জুনা তাঁর প্রতি মনেপ্রাণে অনুগত ছিলেন, তাঁকে নিজের মনিব মানতেন এবং যেকোনো ধরণের অকৃতজ্ঞতাকে (নিমকহারামি) গুনাহ মনে করতেন। মুবারক শাহও তাঁর কদর করতেন।

খসরু খানের হাতে মুবারক শাহের হত্যাকাণ্ড মালিক জুনাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল এবং তিনি তাঁর পিতা গাজী মালিক (গিয়াসুদ্দিন তুঘলক)-এর সাথে মিলে এই অকৃতজ্ঞতার (নিমকহারামি) ভরপুর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক বাদশাহ হওয়ার পরেও তাঁর মনিব (মুবারক শাহ)-এর কবরে আদবের সাথে হাজিরা দিতেন। সেই যুগে প্রথা ছিল যে, বাদশাহদের মৃত্যুর পর তাঁদের জুতো কবরের পাশে একটি চৌকির ওপর রেখে দেওয়া হতো। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সেখানে গিয়ে এই জুতো নিজের মাথায় তুলে নিতেন। তিনি কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খলজির কবরের ওপর একটি সুউচ্চ গম্বুজ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এর উচ্চতা একশ হাত (দেড়শ ফুট) রেখেছিলেন এবং মাকবারার (সমাধিসৌধ) ব্যবস্থাপনার জন্য দেড়শ গ্রামের আয় বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। [১]

দানশীলতার চরম সীমা:

উদারতার অবস্থা এমন ছিল যে, একবারে পুরো কোষাগার বিলিয়ে দিতেন এবং একেও কম মনে করতেন। কোনো বৃদ্ধ, বিধবা বা নিঃস্ব ব্যক্তির ফরিয়াদ তাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি তাকে মালামাল করে দিতেন। তাঁর দানশীলতার কাহিনী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ফেরেশতা লিখেছেন:
"তিনি এমন দানশীল ছিলেন যে, পুরো কোষাগার কোনো দরবেশকে দিয়েও একে কম মনে করতেন। হাতেম তাঈ এবং মা'ন বিন যায়দাহর সারাজীবনের দানশীলতা তাঁর একদিনের দানশীলতার সমান ছিল না। দান করার সময় তিনি ধনী, দরিদ্র, পরিচিত এবং অপরিচিত —সবাইকে সমান মনে করতেন।"

তাতার খান, যাঁকে (গিয়াসুদ্দিন) তুঘলক শাহ সোনারগাঁওয়ের শাসনভার দিয়েছিলেন এবং নিজের ভাই বলেছিলেন, তাঁকে মুহাম্মদ তুঘলক 'বাহরাম খান' উপাধি দিয়ে একদিনে একশটি হাতি, এক হাজার ঘোড়া এবং এক কোটি লাল তঙ্কা অর্থ ও রাজকীয় ছত্র প্রদান করেন এবং বাংলা ও সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা হিসেবে বহাল রাখেন। তিনি একদিনেই মালিক সাঞ্জার বাদাখশানিকে ৮০ লক্ষ তঙ্কা, মালিকুল মুলুক ইমাদুদ্দিনকে ৭০ লক্ষ তঙ্কা এবং নিজের উস্তাদ মাওলানা আযুদুদ্দিনকে ৪০ লক্ষ তঙ্কা দান করেন। মালিক গজনীন, যিনি বুজুর্গদের বংশধর, আলেম, ফাজিল এবং কবি ছিলেন, তাঁকে প্রতি বছর এক কোটি তঙ্কা পাঠাতেন। [২]

যে সময়ে দোয়াবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তখন সুলতান নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ছয় মাস পর্যন্ত প্রজাদের সরকারি গুদাম থেকে বিনামূল্যে শস্য সরবরাহ করা হবে। সরকারি কর্মচারীরা প্রতিটি মহল্লায় গিয়ে মানুষের তালিকা তৈরি করত এবং রেশন পৌঁছে দিত। পারস্য উপসাগরের একজন সওদাগর মুহাম্মদ তুঘলকের জন্য কিছু উপহার নিয়ে হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু পথে হিন্দু ডাকাতরা তাঁকে

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২, পৃ. ৪০৫, ৪০৬

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: ১, পৃ. ৪৩৪

লুট করে নিল। বাদশাহ সংবাদ পেয়ে নির্দেশ দিলেন যে তাকে ত্রিশ হাজার দিনার দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ব্যবসায়ী বললেন যে তিনি বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ না করে ফিরে যেতে চান না। এর ওপর মুহাম্মদ তুঘলক তাকে দরবারে ডাকলেন, তাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। তারপর তার প্রত্যাবর্তনের জন্য ক্রুসহ তিনটি সমুদ্রগামী জাহাজ সরবরাহ করলেন।

হাকিম শামস উদ্দিন আন্দ ُگانی একবার বাদশাহর সম্মানে একটি কাসিদা পেশ করেন যাতে ২৭৩টি শ্লোক ছিল। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন যে প্রতিটি শ্লোকের জন্য এক হাজার দিনার পুরস্কার দেওয়া হোক। এভাবে কবি দুই লক্ষ ৭৩ হাজার দিনার লাভ করেন। [১]

ন্যায় ও বিচার:

ইবনে বতুতা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের ন্যায়বিচারের বেশ কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একবার এক হিন্দু তার বিরুদ্ধে নিজের ভাইকে হত্যার অভিযোগ দায়ের করে। সুলতান সাধারণ আসামির মতো আদালতের কাঠগড়ায় হাজির হন। তিনি হিন্দু ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করে এই মামলা থেকে মুক্তি পান। একবার এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আর্থিক অন্যায়ের দাবি করে। সুলতান আদালতে উপস্থিত হন। ফয়সালা তার বিরুদ্ধে যায়। সুলতান বাদীকে দাবিকৃত অর্থ দিয়ে দেন।

ইবনে বতুতা আরও লিখেছেন যে, একবার এক শিশু তার বিরুদ্ধে অকারণে মারধরের মামলা দায়ের করে। কাজী সুলতানকে নির্দেশ দেন যে তিনি যেন শিশুটিকে সন্তুষ্ট করেন অন্যথায় কিসাস দেন। শিশুটি কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না। অবশেষে সুলতান শিশুটিকে একটি লাঠি দিলেন এবং বললেন: “আমাকে ঠিক সেভাবেই মারো, যেভাবে আমি তোমাকে মেরেছিলাম।” ইবনে বতুতা এই দৃশ্য নিজের চোখে অবলোকন করেন এবং লেখেন: “শিশু সুলতানকে ২১টি আঘাত করে, এমনকি আমি দেখলাম যে সুলতানের মাথা থেকে টুপি পড়ে গেল।” [২]

অত্যধিক মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি:

মুহাম্মদ তুঘলক অসাধারণ মেধাবী এবং পারদ সদৃশ চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার অত্যধিক মেধা তাকে তার সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রবর্তী বিষয় চিন্তা করতে বাধ্য করত, যার ফলে তার অনেক পরিকল্পনা সেই সময়ের জন্য অকার্যকর এমনকি ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল।

এখানে মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুনের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হচ্ছে যা থেকে শাসকদের এই ধরণের আচরণ সম্পর্কে আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারব। আল্লামা ইবনে খালদুন লেখেন:

“ শাসনের উৎকর্ষের মূল হলো কোমলতা ও সদাচার। যদি বাদশাহ কঠোর মেজাজ ও উগ্র স্বভাবের হন, তবে তিনি মানুষের দোষত্রুটি খুঁজবেন এবং তাদের প্রতিটি অপরাধ গুনে গুনে মনে রাখবেন। যার ফলে প্রজাদের ওপর ভীতি ও লাঞ্ছনা ছেয়ে যাবে এবং তারা মিথ্যা, প্রতারণা ও চাতুরীর মাধ্যমে তার থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে এবং তারা বাধ্য হয়ে মন্দ চরিত্র অবলম্বন করবে। তাদের মানসিকতা বিগড়ে যাবে এবং নৈতিকতাও। তারা প্রায়ই তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে...”

---

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৫০, ৩৫৫ থেকে ৩৫৬

[২] সফরনামা ইবনে বতুতা: খণ্ড ২, পৃ. ৩৬৫

...করে পালিয়ে যাবে এবং নাজুক সময়ে তারা বাদশাহর প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত হবে না।

এর পরে তিনি লেখেন:

“যেসব বাদশাহ তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক ও প্রখর মেধার অধিকারী হন, তাদের মধ্যে নম্রতার গুণ থাকে না। বরং সরল স্বভাবের লোকদের মধ্যে এই আবেগ বেশি পাওয়া যায়, যেখানে প্রখর মেধাবীদের মধ্যে এই গুণটি কদাচিৎ দেখা যায়। এর কারণ হলো, প্রখর মেধার শাসকরা দ্রুত অনুধাবন ক্ষমতা এবং দূরদর্শী দৃষ্টির কারণে সেসব বিষয় আগেই আঁচ করে ফেলেন যা প্রজাদের চিন্তায় পৌঁছায় না। এমন অবস্থায় এই শাসকরা প্রজাদের ওপর শক্তির অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন, যার ফলে প্রজারা মরতে শুরু করে। এজন্যই নবী আকরাম ﷺ বলেছেন: سِيرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ (তোমাদের দুর্বল লোকদের গতি অনুযায়ী চলো)।” [১]

শেষে আল্লামা বলেন:

“ক্ষমতাসীনদের জন্য অস্বাভাবিক রাজনীতি ও বুদ্ধিমত্তা একটি ত্রুটি। কারণ এটি চিন্তার প্রখরতার লক্ষণ, যেমন নির্বোধ হওয়া চিন্তার অত্যধিক স্থবিরতার লক্ষণ। মানবিক গুণাবলির মধ্যে এই উভয় গুণের চরম সীমা প্রশংসনীয় নয়, বরং ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত। প্রশংসনীয় অবস্থা হলো মধ্যপন্থা। যেমন অপচয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী স্তর হলো উদারতা যা প্রশংসনীয়। একইভাবে ভীরুতা ও অত্যধিক বীরত্বের মধ্যবর্তী স্তর হলো সাহসিকতা যা প্রশংসনীয়। একইভাবে সমস্ত মানবিক গুণাবলির মধ্যে চরম অবস্থা নিন্দনীয় এবং মধ্যবর্তী অবস্থা প্রশংসনীয়। এজন্যই অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে মানুষ শয়তান বলে। অর্থাৎ সে অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের ধূর্ত ও মক্কার।” [২]

শেষ কথা:

মুহাম্মদ তুঘলকের যুগ অনেক দিক থেকে অনন্য ছিল। তিনি অত্যন্ত সতর্ক, দুঃসাহসী এবং সামরিক সংগঠনের দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। শারীরিক দিক থেকে তিনি অস্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী এবং দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে এমন কোনো সুলতান অতিবাহিত হননি যিনি এত বেশি যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন বা এত বেশি বিদ্রোহ সফলভাবে দমন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন অশ্বারোহী, একজন সৈনিক এবং একজন তলোয়ার চালক ছিলেন। খিলজি যুগে একজন তরুণ অফিসার হিসেবেও আমরা তাকে ঘোড়ার পিঠে দেখতে পাই এবং প্রৌঢ় বয়সে তিনি একজন সুলতান হিসেবে সিন্ধুর মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার সময় নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন।

তিনি অনেক ভাষা জানতেন এবং কবিতা, দর্শন, ইতিহাস, ক্যালিগ্রাফি ও অন্যান্য অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। যদিও তিনি আরবি ভাষা বলতে দুর্বল ছিলেন, তবে আরবি কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সেসব অনেক পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতেন...

---

[১] এই বর্ণনাটি মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ, কিন্তু হাদিসের কিতাবসমূহে আমি এই শব্দগুলো পাইনি। তবে নামাজের ইমামতি সম্পর্কে এই নববী বাণীগুলো প্রমাণিত: إِذَا أَمَّنْتَ إِمَامًا فَأَقْدِرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ। “যখন তুমি ইমাম হবে, তখন কওমের দুর্বলতম ব্যক্তির আন্দাজ রেখে কাজ করো।” (মুসনাদ আল-বাজার, খণ্ড: ১০, হা: ৯৩১০) مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُقَدِّرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَ الْكَبِيرَ وَ ذَا الْحَاجَةِ। “যে ইমামতি করবে সে যেন দুর্বলতম ব্যক্তির খেয়াল রেখে করে, কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং অভাবী লোকও থাকে।” (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ২, হা: ৩৭১৪)

[২] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন: পৃ. ২৩৭, ত. দারুল ফিকর।

যাতে সেই যুগের অনেক রাজা ও রাজপুত্ররা লিপ্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন হিন্দুস্তানের প্রথম শাসক যিনি বিদেশী প্রতিনিধিদলকে এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, কায়রোর আব্বাসীয় খলিফার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তিনি বিশ্বমঞ্চে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। চীনের সম্রাটের সাথেও তাঁর চমৎকার সম্পর্ক ছিল।

আরামে বসে থাকা বা অন্যদের আরামে বসে থাকতে দেখা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। কাজ, কাজ এবং কাজই ছিল তাঁর জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। অন্তহীন দৌড়ঝাঁপে কেবল তাঁর হাত-পা নয়, বরং তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কও পূর্ণ গতিতে চলত এবং নতুন নতুন পরিকল্পনার জন্ম দিত। এমন কিছু পরিকল্পনা ছিল কাল্পনিক এবং সময়ের চেয়ে অগ্রবর্তী যা ধ্বংসের বার্তা নিয়ে এসেছিল। তিনি সমগ্র হিন্দুস্তানকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করতে তীব্রভাবে আগ্রহী এবং এর জন্য সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সহিংস আচরণ এই লক্ষ্য পূরণ হতে দেয়নি বরং তিনি যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন অখণ্ড হিন্দুস্তানের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং দেশ টুকরো টুকরো হতে শুরু করেছিল।

তাঁর একটি বড় দুর্বলতা ছিল তাঁর সন্দেহপ্রবণ মেজাজ। চরম সংবেদনশীলতা, পরিণামদর্শিতা এবং মেজাজের ক্ষিপ্রতা তাঁকে এমন করে তুলেছিল। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়তের ওপরও সন্দেহ করতেন যা খুব কমই দূর হতো। অন্যদিকে তাঁর সাহায্যকারী ও পারিষদবর্গ তাঁর পরিকল্পনার সাফল্য নিয়ে সন্দিহান থাকতেন। এর ফল এই দাঁড়াল যে, তাঁর শাসনকাল হিন্দুস্তানের ইতিহাসের একটি কঠিন সময় হয়ে দাঁড়াল, তাদের জন্যও যারা এটি নিজের চোখে সহ্য করেছেন এবং তাদের জন্যও যারা আজ এটি বুঝতে চান।

https://t.me/BoierSomahar

ফিরোজ শাহ তুঘলক

৭৫২ হিজরি থেকে ৭৯০ হিজরি

(১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)

ফিরোজ শাহ যার উপাধি ছিল কামাল উদ্দিন, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নেককার, সাদাসিধে, দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। ৭০৯ হিজরিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। যখন তাঁর বয়স সাত বছর ছিল, তখন তাঁর পিতা মালিক রজব ইন্তেকাল করেন। ফলে তাঁর লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর চাচা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ইন্তেকাল এবং সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের সিংহাসন আরোহণের সময় ফিরোজ শাহ যুবক এবং শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। মুহাম্মদ তুঘলক তাঁকে নিজের হাজিব নিযুক্ত করেছিলেন এবং সামরিক সেবা ছাড়াও তাঁকে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন বিভাগে তাঁর মাধ্যমে কঠোর পরিশ্রম, কষ্টসাধ্য ও জটিল কাজ করিয়েছিলেন। এভাবে ফিরোজ শাহ সালতানাতের কার্যাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। [১]

সিংহাসন আরোহণ কীভাবে হয়েছিল?

২১ মহররম ৭৫২ হিজরিতে ঠাট্টার কাছে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক ফিরোজ শাহকে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন। সুলতানের বাহিনীতে উপস্থিত আমিরগণ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সুলতানের ইন্তেকালের পর এই অসিয়ত পূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হন এবং ফিরোজ শাহকে রাজমুকুট পেশ করেন। কিন্তু তিনি শাসনভারকে একটি ভারী বোঝা মনে করতেন, তাই অসিয়ত পূর্ণ করার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বোন খুদাওয়ান্দজাদা খাতুন ময়দানে নেমে পড়েন এবং নিজের ছেলে দাওয়ার মালিককে বাদশাহ বানানোর আহ্বান জানাতে শুরু করেন এবং কিছু আমির তাঁর সাথে যোগ দেন। এভাবে সুলতানি লস্কর কোনো কেন্দ্রীয় নেতা না থাকা এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী আমিরদের কারণে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর পরিবর্তে কেবল একটি বিশাল ভিড়ের রূপ ধারণ করে।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ রচিত: পৃষ্ঠা ১৯, ২০, ৩৬ থেকে ৪৩।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের তলবে আসা মঙ্গোল বাহিনীর সর্দার আলতুন বাহাদুর এই পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। সুলতানের আমীরগণ বিপদ অনুভব করে তাকে একটি বড় অংকের অর্থ দিয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে রাজকীয় শিবির থেকে বিদায় করে দিয়েছিলেন যে, এখন আর প্রতিবেশীদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আলতুন বাহাদুর কয়েক মাইল দূরে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করল। এই সময়ে সুলতানী লশকরের একজন মোগল আমীর গিয়ে তাকে পরামর্শ দিল যে, এখন পর্যন্ত সুলতানের কোনো উত্তরসূরি নিযুক্ত হয়নি, তাই রাজকীয় শিবির লুণ্ঠন করার এটাই সেরা সুযোগ।

ফলে যখন ২১ মহরম ৭৫২ হিজরিতে সুলতানী লশকর সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে সিহওয়ানের দিকে রওনা হলো, তখন মঙ্গোলরা তাদের ওপর আক্রমণ শুরু করে দিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যেকোনোভাবে রাজকীয় কোষাগার লুণ্ঠন করা। রাজকীয় বাহিনী নদীর তীর ধরে সিহওয়ানের দিকে অগ্রসর হতে থাকল এবং মঙ্গোল অশ্বারোহীরা স্থানে স্থানে তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকল। এই সময়ে ঠাট্টার সর্দাররা দক্ষিণ দিক থেকে লশকর লুণ্ঠন করার জন্য অতর্কিত হামলা শুরু করে দিল। যদিও রাজকীয় বাহিনীর আমীরগণ অত্যন্ত তৎপরতা ও বীরত্বের সাথে এই আক্রমণগুলো প্রতিহত করেছিলেন, কিন্তু কোনো নেতার অনুপস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন ছিল। ফলে মঙ্গোলরা কোষাগারের কয়েকটি সিন্দুক ছিনিয়ে নিতে এবং অনেক গোলাম ও দাসীকে বন্দি করতে সক্ষম হলো।

এই পরিস্থিতিতে সালতানাতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ক্রমাগত জেদ করতে লাগলেন যেন ফিরোজ শাহ সুলতান হওয়া কবুল করে নেন। মালিক সাইফউদ্দিন সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বোন খুদাওয়ান্দ জাদাহর কাছে গিয়ে পরিষ্কার বলে দিলেন: “খাতুন! আপনি যদি আপনার ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর জন্য জেদ করেন, যে কি না এখনো সালতানাত পরিচালনার যোগ্যই নয়, তবে না আপনি আপনার ঘরে পৌঁছাতে পারবেন আর না আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মুখ দেখতে পারব। কারণ এই মঙ্গোলরা আমাদের মাথার ওপর মৃত্যু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।” সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বোন স্তব্ধ ও নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

এদিকে সালতানাতের আমীরদের বৈঠকে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের পালক পুত্র মুহাম্মদ তাতার খান এই সুযোগে ফিরোজ শাহর হাত ধরে তাকে সিংহাসনে বসানোর জন্য টানতে শুরু করলেন। ফিরোজ দুই রাকাত নামাজ (সম্ভবত সালাতুল ইস্তিখারা) পড়ার সুযোগ চাইলেন, দীর্ঘক্ষণ সিজদাবনত হয়ে রইলেন, চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকল। আল্লাহর কাছে নেক কাজের শক্তি ও তাওফিকের দোয়া করলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ কবুল করে নিলেন। এটি ২৩ মহরম ৭৫২ হিজরির ঘটনা।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শেষ সফরে শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ-ই-দেহলি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও সফরসঙ্গী ছিলেন, ফলে তিনি সেই দিনগুলোতে লশকরের অংশ ছিলেন। তিনিও ফিরোজ তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের প্রক্রিয়ায় শরিক এবং তার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তিনি ফিরোজ তুঘলককে বার্তা দিলেন: “তুমি ওয়াদা করো যে আল্লাহর মাখলুকের সাথে আদল ও ইনসাফ করবে। অন্যথায় এই অসহায় বান্দাদের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে অন্য শাসক প্রার্থনা করব।” ফিরোজ শাহ জবাব দিলেন:

“আমি আল্লাহর মাখলুকের সাথে ধৈর্য ও সহনশীলতার আচরণ করব এবং ঐক্য ও ভালোবাসার সাথে তাদের ওপর শাসন পরিচালনা করব।”

শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি খুশি হলেন এবং বললেন: “اگر تم اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور مروت کا معاملہ کرو گے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں چالیس سال کی حکومت عطا فرمائے۔” (যদি তুমি আল্লাহর বান্দাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচরণ করো, তবে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি তোমাকে চল্লিশ বছরের শাসন দান করেন।)

পরিশেষে ওলামা, মাশায়েখ এবং লশকরের সমস্ত আমীর ফিরোজ তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের বিষয়ে একমত হলেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বোনও এটি...

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজের ছেলের হকের দাবি থেকে সরে দাঁড়ালেন। এর জবাবে ফিরোজ শাহ হাতিতে চড়ে তাঁর তাঁবু পর্যন্ত গেলেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। সুলতানের সিংহাসন আরোহণের সংবাদ সমস্ত প্রাদেশিক কেন্দ্র এবং বিশেষ করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এই সময় ফিরোজ শাহর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর। আফিফের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন ফর্সা রঙ, উন্নত নাক, ঘন ও দীর্ঘ দাড়ি এবং মাঝারি গড়ন ও ওজনের একজন সুশ্রী যুবক।

সিংহাসন আরোহণের পরের দিন এই বাহিনী অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলার সাথে রওনা হলো। বাহিনীর কয়েকটি দল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মঙ্গোলদের পিছু নিল এবং তাদের অনেক দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলো। সেহওয়ান থেকে দিল্লি পর্যন্ত দীর্ঘ সফরে নতুন সুলতানের কাছে প্রতিটি অঞ্চলের বিশিষ্ট বুজুর্গরা উপস্থিত হতে থাকলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকলেন।

সুলতান উলামা, সুফিয়া এবং মাশায়েখদের খেদমতে তোহফা, হাদিয়া ও নজরানা পেশ করলেন। তিনি পাকপত্তনে বাবা ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর-এর খলিফাদের খেদমতেও উপস্থিত হলেন। মোদ্দাকথা, এভাবে এই কাফেলা দিল্লির দিকে রওনা হলো। [১]

প্রথম সমস্যা, খাজা জাহাঁ আহমদ আয়াজের বিদ্রোহ:

যখন এই কাফেলা আজ পৌঁছাল, তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, দিল্লিতে সাবেক সুলতানের উজির খাজা জাহাঁ আহমদ আয়াজ ছয় বছরের একটি ছেলেকে এই বলে সিংহাসনে বসিয়েছেন যে, সে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের ছেলে। খাজা জাহাঁর বয়স তখন ছিল প্রায় ৮০ বছর। তিনি তাঁর জীবনের বড় একটি অংশ খিলজি ও তুঘলক শাসকদের সাথে কাটিয়েছিলেন। তিনি একজন ইবাদতগুজার ও সুফিও ছিলেন এবং খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া-এর মুরিদ ছিলেন। সমস্ত দরবারি তাঁকে সম্মান করতেন। এই নতুন ব্যবস্থার কারণে তাঁর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। ৩ সফর ৭৫২ হিজরিতে ওই বালকের সিংহাসন আরোহণের পর খাজা জাহাঁ সমস্ত আমিরদের তাঁর আনুগত্য কবুল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলককেও এই বার্তা পাঠানো হলো যে, তিনি যেন বাদশাহি থেকে দূরে থাকেন এবং এই বালকের নায়েব হিসেবে কাজ করেন।

ফিরোজ শাহ সালতানাতের আমিরদের একত্রিত করে তাঁদের মতামত চাইলেন, তখন তাঁরা বললেন:

“সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের কোনো ছেলে নেই। সুতরাং উত্তরাধিকার ও অসিয়ত উভয় দিক থেকেই আপনিই সিংহাসনের হকদার।”

এই মজলিসে উপস্থিত খাজা নাসিরউদ্দীন চেরাগ-এ-দিল্লি, মাওলানা কামালউদ্দীন সামানভি এবং মাওলানা শামসুদ্দীন-এর মতো ব্যক্তিরাও সুলতানকে সিংহাসনে বহাল থাকার পরামর্শ দিলেন।

মোদ্দাকথা, খাজা জাহাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলো। তাঁকে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা হলো এবং তাঁর ওপর স্পষ্ট করে দেওয়া হলো যে, যদি তিনি অনুগত হন তবে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এর জবাবে খাজা জাহাঁ দিল্লিতে একটি বাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। কিন্তু সরকারি কোষাগারে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তিনি কোনো শক্তিশালী প্রস্তুতি নিতে পারলেন না।

অন্যদিকে ফিরোজ শাহ যেমন যেমন পাঞ্জাব থেকে হরিয়ানার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পথে বিভিন্ন আমির ও রাজারা তাঁর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকলেন। এই সুযোগে বণিক ও মহাজনরা তাঁকে...

---

[১] তারিখে ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ১৯, ২০, ২৯, ৩৬ থেকে ৪৮; তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৮২; তারিখে ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৫৩৮ থেকে ৫৪১।

লক্ষ লক্ষ টাকা নজরানা পেশ করল। যেহেতু ফিরোজ শাহের টাকার খুব প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি তা গ্রহণ করতে থাকলেন তবে ঋণের নিয়তে। দিল্লি পৌঁছে যখনই ব্যবস্থা হলো, তিনি সেই টাকা তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে ফেরত দিয়ে দিলেন।

খাজা জাহান এখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। সুলতান আগ্রা থেকে এক মঞ্জিল সামনে ডেরা ফেলেছিলেন যখন খাজা জাহান উপস্থিত হয়ে নিজেকে আইনের হাতে সোপর্দ করলেন। ফিরোজ শাহ চেয়েছিলেন এই বয়োবৃদ্ধ আমিরকে কেবল ক্ষমা করতেই নয় বরং তাকে পুনরায় উজির বা আমির নিযুক্ত করতে। কিন্তু যখন দরবারে তিনি নিজের এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন সমস্ত দরবারী ও আমিরগণ যারা খাজা জাহানের জন্য মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিলেন, তারা তীব্র বিরোধিতা করলেন। অবশেষে ফিরোজ শাহ বেশ কয়েকদিন এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন। তিনি খাজা জাহানের ক্ষমা বা শাস্তির সিদ্ধান্ত মজলিসে আমিরদের হাতে সোপর্দ করলেন এবং খাজা জাহানের সাথে নিজের পুরনো সম্পর্কের মর্যাদা এভাবে রাখলেন যে তাকে সামানার সুবাদার বানিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

আমিরগণ পারস্পরিক পরামর্শে খাজা জাহানের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রস্তাব করলেন এবং নিজেদের প্রতিনিধি মুহাম্মদ বেগ সিপার খানকে খাজা জাহানের পেছনে পাঠিয়ে দিলেন। খাজা জাহান যখন জানতে পারলেন, তখন খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া টুপি ও কুর্তা পরিধান করে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং এক অনুগতকে নির্দেশ দিলেন যে যখন আমি সিজদা করব তখন আমার শিরশ্ছেদ করে দিও। এই বলে সিজদায় মাথা রাখলেন এবং কালিমা শাহাদাত পাঠ শুরু করলেন। এরই মধ্যে ধারালো তলোয়ার তার মাথা উড়িয়ে দিল। [১]

একটি অপ্রত্যাশিত যুগের সূচনা:

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিভিন্ন শহরে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে, আমিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং নতুন সরকারের মৌলিক কৌশল ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে অবশেষে রজব মাস ৭৫২ হিজরিতে দিল্লি পৌঁছালেন। একুশ দিন পর্যন্ত দিল্লিতে উৎসব চলল এবং মানুষ আনন্দ উদযাপন করল, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে মোবারকবাদ জানালেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন হিন্দুস্তানের বাসিন্দারা এই প্রত্যাশা করতে পারেনি যে এখন একটি “৩৮” বছরের দীর্ঘ এমন এক যুগ শুরু হতে যাচ্ছে যাতে চারদিকে সুখ, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি, ন্যায়বিচার, সম্মান ও শ্রদ্ধার জয়জয়কার হবে। তবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের যুগ সত্যিই এমন ছিল।

পুরানো পাহাড় ও মরুভূমিতে সেই অবস্থা আর নেই... তোমার উন্মাদনা নতুন, নতুন এক নির্জন প্রান্তর সৃষ্টি করো
হ্যাঁ, সেই পুরনো শাখাতেই আবার বাসা তৈরি করো... বাগানের বাসিন্দাদের মাতাল সুরের শহীদে পরিণত করো
(আল্লামা ইকবাল)

সুলতান ফিরোজ শাহের আমিরগণ

সুলতান ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণের পর পূর্ববর্তী সরকারের অনুগতদের বাছাই, তাদের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতার নামে...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী: পৃষ্ঠা ৫৩১, ৫৩৮ থেকে ৫৪৮; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (আফিফ): পৃষ্ঠা ৫০ থেকে ৬৬, ৫২ থেকে ৮৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১১৯ থেকে ১২৩।

প্রতিশোধমূলক কোনো অভিযানের মতো কোনো অভিযান চালানো হয়নি বরং কেবল কয়েকজন আমিরের বদলি করা হয়েছিল এবং কয়েকজন নতুন কর্মকর্তাকে তাঁর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অধিকাংশ প্রাচীন আমিরকে তাঁদের পদেই বহাল রাখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয় নিম্নরূপ:

মালিক মকবুল - মালিক বশির:

সুলতান অভিজ্ঞ আমির মালিক মকবুলকে খান জাহান উপাধি দিয়ে নিজের উজির নিযুক্ত করেন। এছাড়া মালিক বশিরকে আরিজে মামালিক (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) পদে নিযুক্ত করেন। [১]

মালিক মকবুল মূলত তেলেঙ্গানার একজন নওমুসলিম ছিলেন। তাঁর প্রাচীন নাম ছিল 'কন্নু' (ফুল)। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের একটি অভিযানে তিনি বন্দী হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলতান তাঁর নাম রাখেন 'মকবুল', তাঁর যোগ্যতার আন্দাজ করে তাঁকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেন এবং পরিশেষে দিল্লির নায়েবে উজির নিযুক্ত করেন যেখানে তিনি খাজা জাহান (আহমদ আয়াজ)-এর সাহচর্যে চমৎকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। [২]

মালিক তাতার খান:

এই দুজনের বাইরে মালিক তাতার খান দরবারের অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার, শরীয়ত অনুসারী, জ্ঞানানুরাগী এবং যোগ্য মানুষ ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মুঘল শাহজাদা যিনি দিপালপুরের আমির গাজী মালিকের (সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক) সাথে যুদ্ধে নিহত হন। সেই সময় এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি অন্যান্য বন্দীদের সাথে গাজী মালিকের হস্তগত হয়। গাজী মালিক তাঁর নাম তাতার খান রেখে তাঁকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেন এবং অত্যন্ত মহব্বতের সাথে তাঁর লালন-পালন করেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমলে তিনি যুবক হয়ে সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া সম্ভবত তিনিই সংকলন করিয়েছিলেন।

সেই যুগে আমিররা যখন সফরে বের হতেন, তখন তাঁদের দাসীরা ঘোড়ায় চড়ে সাথে চলত। কিন্তু তাতার খানের মধ্যে লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ এতটাই ছিল যে, তিনি তাঁর দাসীদের জন্য ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন যাতে পুরোপুরি পর্দা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাতার খান এটা সহ্য করতে পারতেন না যে তাঁর হেরেমের ওপর কোনো পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ুক। [৩]

কয়েকজন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আমির:

- সুলতানের আমিরদের মধ্যে মালিক ইফতিখারুল মুলকও ছিলেন যিনি গুজরাটের সুবাদার ছিলেন এবং অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।
- তাঁদের মধ্যেই মালিক মাহমুদ ওরফে শের খানও ছিলেন যাঁর বয়স ৯০ বছর হয়েছিল, আমানত ও বিশ্বস্ততায় তিনি অনন্য মানুষ ছিলেন।
- তাঁদের মধ্যেই জাফর খানও ছিলেন যাঁর বয়স প্রায় ১০০ বছর হয়েছিল এবং তিনি নায়েবে উজির হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি কুরআন মাজিদের হাফেজ ও ক্বারী এবং অত্যন্ত মুত্তাকী মানুষ ছিলেন।
- এই আমিরদের মধ্যেই আইনুল মুলক মাহরুও ছিলেন যিনি মুলতানের শাসক ছিলেন এবং রাজনীতি, আমানতদারি, জ্ঞান-গরিমা এবং সাহিত্য ও রচনাশৈলীতে পারদর্শী ছিলেন।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১১৯

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (আফিফ): পৃ. ৩৯৪ থেকে ৩৯৭

[৩] (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (আফিফ): পৃ. ৩৮৯ থেকে ৩৯৪) তাতার খানের মৃত্যুর সাল উল্লেখ নেই তবে যাই হোক তাঁর মৃত্যু ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলেই হয়েছিল।

তাঁর রচিত ‘ইনশায়ে মাহরু’ সেই সময়ের পরিস্থিতির ওপর ভালো আলোকপাত করে। [১]

চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

মোটের ওপর ফিরোজ শাহ পূর্ববর্তী শাসকের নিয়োগগুলোকে বহাল রাখেন। তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখন আর আদর্শ মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়; বরং বারবার বদলি, পদাবনতি, বরখাস্ত এমনকি কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডের পুনরাবৃত্তিও সরকারের সদস্যদের পরিবর্তন করতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের অন্তর পরিবর্তিত হয়। তাই তাঁর রণকৌশলের একটি ভিত্তি ছিল উমারা ও জনগণের অন্তর থেকে সেই ভয় দূর করা যা গত শাসনকাল থেকে তাদের ওপর চেপে বসেছিল। জনগণকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং উমারাদের পরামর্শে শরিক রাখা।

দৃঢ় বিশ্বাস, নিরন্তর কর্ম, বিশ্বজয়ী প্রেম
জীবনের জিহাদে এগুলোই পুরুষের তলোয়ার
(আল্লামা ইকবাল)

সুলতান মানুষকে ভয়-ভীতি থেকে বের করে আনতে এবং তাদের আশ্বস্ত করতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

প্রথম পদক্ষেপ, সংবিধান পরিবর্তন:

পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে সালতানাতের সংবিধান যেন খোদ শাসকের সত্তার ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাই তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ভালো থেকে ভালো এবং মন্দ থেকে মন্দ কাজও করে ফেলতেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে এই স্বৈরাচারী সংবিধান পরিবর্তন করেন এবং একটি নীতিমালা তৈরি করে রাজকীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেন যাতে বাদশাহ জনগণের ওপর জুলুম ও অত্যাচার করতে না পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সালতানাতের কিছু নীতি নির্ধারণ করেছিলেন যা নিম্নরূপ:

- (১) শাসক কোনো প্রকার শাস্তি প্রদানের অধিকারী হবেন না। [২]
- (২) প্রজাদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেরাজ বা ট্যাক্স সর্বনিম্ন হারে আদায় করা হবে।
- (৩) বাদশাহ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ বা চোগলখুরি শুনবেন না।
- (৪) সর্বদা দয়ালু ও নেককার ব্যক্তিদের পদ প্রদান করা হবে। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি রচিত: পৃষ্ঠা ৫৮২ থেকে ৫৮৪।

[২] অধিকাংশ শাসকের রীতি ছিল যে, আদালত থাকা সত্ত্বেও তারা নিজ বিবেচনায় অত্যন্ত নির্ভীকভাবে মানুষকে হত্যা বা কারাদণ্ডের শাস্তি দিতেন। দেশ পরিচালনার জন্য শাসকের কাছে এই ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য মনে করা হতো, কিন্তু এর ফলাফল এই হতো যে, বাদশাহ অনেক সময় অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়ে নিজের দামানকে জুলুমের কালিমায় লিপ্ত করতেন। ফিরোজ শাহ শাসকের এই ক্ষমতা খতম করে দেন। তিনি তাঁর আটত্রিশ বছরের শাসনামলে কোনো মুসলিম বা অমুসলিমকে কোনো শাস্তি দেননি। এই বিষয়গুলো আদালতের হাতেই ন্যস্ত ছিল। এভাবে তাঁর দামান জুলুম ও অত্যাচার থেকে মুক্ত ছিল এবং প্রত্যেকেই তাঁর অনুরাগী হয়ে উঠেছিল।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫০১; এছাড়াও উল্লিখিত নীতিমালাগুলো ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী পৃষ্ঠা ৫৭৭ থেকে ৫৮০)।

করো মেহেরবানি তুমি জমিনবাসীর ওপর... খোদা মেহেরবান হবেন আরশে বরীনের ওপর।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ, ঋণ মওকুফ:

সুলতান মানুষের অন্তর থেকে ভয় দূর করার জন্য দ্বিতীয় এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে, বিগত শাসনামলে সরকার কৃষিকাজের জন্য মানুষকে যে ঋণ দিয়েছিল, তিনি তা মওকুফ করে দেন। সুলতান ঋণের হিসাব সম্বলিত রেজিস্টারগুলো আনিয়ে সবার সামনে নষ্ট করে দেন। এভাবে জনগণকে আশ্বস্ত করা হয় যে, তারা সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে যে দুশ্চিন্তায় ছিল, এখন যেন তা ভুলে যায়। এই পদক্ষেপ মানুষের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে আনে এবং তারা নতুন বাদশাহর প্রতি অনেক ভালো আশা পোষণ করতে শুরু করে। [১]

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, মজলুমদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক তাঁর শাসনামলে মানুষকে কঠোরতম শাস্তি দিয়ে তাদের অন্তরে ভয় ও ঘৃণা সৃষ্টি করেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের সামনে এখন দুটি বিষয় ছিল: এক. তাঁর মহসিন ও মুরব্বি সাবেক সুলতানের সম্মান বজায় রাখা। দুই. জনগণের ক্ষতগুলোতে যতটা সম্ভব মলম লাগানো। এই উভয় বিষয়কে সামনে রেখে তিনি ঘোষণা করেন যে, সাবেক সুলতানের আমলে যাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে বা যাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের রাজকীয় কোষাগার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে যাতে তারা সাবেক সুলতানকে ক্ষমা করে দেয়। ফলে অসংখ্য মজলুম ব্যক্তি বা তাদের উত্তরাধিকারীরা আসলেন, তাদের মালামাল দিয়ে ধন্য করা হলো এবং বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে লিখিত নেওয়া হলো যে তারা সাবেক সুলতানকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। এই লেখাগুলো একটি বাক্সে ভরে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের কবরের শিয়রে রেখে দেওয়া হলো। সুলতান ফিরোজ তুঘলকের এই পদক্ষেপ, যা তাঁর মনিব ও জনগণ উভয়ের প্রতি শুভকামনার ওপর ভিত্তি করে ছিল, ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা। [২]

চতুর্থ পদক্ষেপ, বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত:

সুলতান অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ও আসবাবপত্র ফেরতের জন্য একটি দপ্তর কায়েম করেন এবং ঘোষণা করেন যে, বিগত আমলে যার কোনো জমি, সম্পত্তি বা আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সে যেন এই দপ্তরে এসে তার অভিযোগ পেশ করে, প্রমাণ দেখায় এবং তার জমি বা যা কিছু অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছে তা ফেরত নিয়ে যায়। এভাবে হাজার হাজার হকদার তাদের হক ফিরে পেল এবং মানুষ নতুন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হলো। [৩]

নতুন রাজধানী ফিরোজাবাদ নির্মাণ:

তাঁর সিংহাসন আরোহণের তৃতীয় বছর ৭৫৫ হিজরিতে (১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ) ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লি থেকে বারো কিলোমিটার দক্ষিণে...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ আফিফ: পৃ. ৮৮ থেকে ৯১

[২] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, আজ ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃ. ১৬

[৩] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী আজ সুলতান ফিরোজ শাহ: পৃ. ১৬

যমুনা নদীর তীরে একটি বিশাল ও প্রশস্ত শহরের নকশা তৈরি করে তার কাজ শুরু করে দিলেন। এই শহরটি নিম্নলিখিত গ্রামগুলোর জমিতে নির্মাণ করা হচ্ছিল:

- ১. কাওয়িন
- ২. ইন্দপত
- ৩. সরাই শেখ আবু বকর তুসি
- ৪. সরাই মালিক ইয়ার পরান
- ৫. সুলতানা রাজিয়ার মাকবারা
- ৬. সরাই মালিকা
- ৭. মেহরাউলি
- ৮. বিহারি
- ৯. আন্ধালভি
- ১০. সুলতানপুর
- ১১. কাইথওয়ারা
- ১২. লাহরাওয়াত

সুলতান শহরের কেন্দ্রের জন্য 'কাওয়িন' গ্রামটিকে নির্বাচন করেন এবং সেখানে একটি বিশাল কেল্লা নির্মাণ শুরু করেন যা 'ফিরোজ শাহ কোটলা' নামে পরিচিত হয়। নতুন শহরের এই কেন্দ্রীয় অংশেই সুলতানের প্রাসাদ 'কুশকে শিকার'ও নির্মাণ করা হচ্ছিল। শীঘ্রই অন্যান্য উমারা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরা এখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেন এবং এভাবে এটি একটি ছোট শহরে পরিণত হয় যা 'ফিরোজাবাদ' নামে পরিচিতি পায়। সুলতান এখানেই বসবাস শুরু করেন এবং এটিই রাজধানী হয়ে ওঠে।

পরবর্তী দুই দশকে এই শহর দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ইন্দপত থেকে সুলতানের প্রাসাদ (প্রায় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত) বিস্তৃত হয়। ফিরোজাবাদ থেকে দিল্লি পর্যন্ত বারো কিলোমিটারের রাস্তায় সব সময় যাতায়াত চলত। শহরে আটটি অত্যন্ত বিশাল জামে মসজিদ ছিল যার প্রতিটিতে দশ হাজার মানুষ একসাথে সালাত আদায় করতে পারত। [১]

জনসাধারণের সাথে মেলামেশা এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া:

ফিরোজ শাহ তুঘলকের এটি নিয়ম ছিল যে, প্রতি জুমার সালাতের পর তিনি উন্মুক্ত মজলিস বসাতেন যেখানে বিভিন্ন পেশার মানুষ এসে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করত। গল্পকাররা কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে সবার মন জয় করে নিত, সুকণ্ঠী গায়করা সুর করে কবিতা ও গান শোনাত, কুস্তিগীররা তাদের কুস্তির কৌশল দেখাত। প্রায় দুই থেকে তিন হাজার মানুষের বিশাল জনসমাবেশ তখন সুলতানের সামনে উপস্থিত হতো। বিদায় নেওয়ার সময় সুলতান পুরস্কার হিসেবে তাদের সবার মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করতেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বেশ কয়েকটি করে মুদ্রা পেতেন।

লোকেরা যখন সুলতানের এই অনুগ্রহ ও দয়া দেখল, তখন তারা তাদের পাঁচ-দশ বছরের শিশুদেরও সাথে আনতে শুরু করল যাতে তারাও কিছু মুদ্রা পায় এবং ঘরে বেশি টাকা যায়। সুলতানের কিছু কর্মকর্তা এই পরিস্থিতিতে বিরক্ত হতে লাগলেন এবং শিশুদের সাথে আনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সুলতান যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি সেই কর্মকর্তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন:

"এই লোকেরা নিঃস্ব ও দরিদ্র। পুরো সপ্তাহ তারা এই অপেক্ষায় কাটায় যে কবে জুমার দিন আসবে আর আমরা বাদশাহর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করব। এই লোকেরা শিশুদের অনেক মাইল দূর থেকে এই কারণেই সাথে নিয়ে আসে (যাতে এই উসিলায় কিছু বেশি পুরস্কার পাওয়া যায়)। যদি আমরা তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি, তবে তাদের কী অবস্থা হবে?"

---

[১] (তারিখে ফিরোজ শাহী, আফিফ রচিত: পৃষ্ঠা ১৩৭ থেকে ১৬৩; তারিখে মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১২৬ থেকে ১২৮)

ফিরোজাবাদের এই জাঁকজমক কয়েক দশকের বেশি স্থায়ী হয়নি এবং সুলতান ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তৈমুর লঙের আক্রমণে ফিরোজাবাদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এখানকার বাসিন্দারা যাযাবর হতে বাধ্য হয়। বাসিন্দাশূন্য বাড়িগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমান যুগে নয়াদিল্লির সম্প্রসারণ ফিরোজাবাদের বেশিরভাগ অংশকে নিজের ভেতরে বিলীন করে নিয়েছে। তবে নয়াদিল্লির মধ্যাঞ্চলে আজও ফিরোজ শাহ কোটলার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে যা বাহাদুর শাহ জাফর রোডের কাছে একটি বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম 'ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়াম'-এর ঠিক পাশেই অবস্থিত।

মোটের ওপর সুলতান শিশুদের আগমনের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি এবং নিজের দয়ার পতাকা সমুন্নত রেখেছেন। [১]

শাহজাদী খুদাওয়ান্দজাদার ষড়যন্ত্র এবং সুলতানের দয়া:

ফিরোজ শাহ তুঘলক সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বোন শাহজাদী খুদাওয়ান্দজাদাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন, যিনি তাঁর স্বামী খসরু মালিকের সাথে দিল্লির একটি সুন্দর প্রাসাদে বসবাস করতেন। সুলতান প্রতি জুমার নামাজের পর স্বয়ং এই প্রাসাদে যেতেন। সুলতানকে আসতে দেখলে শাহজাদী আদবের সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন। প্রাসাদের একটি বারান্দায় বসার ব্যবস্থা হতো। খসরু মালিক সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর শাহজাদী খুদাওয়ান্দজাদা তাঁর পাশে বসতেন এবং নিজের ছেলে দাওয়ার মালিককে নিজের পেছনে বসাতেন। পারস্পরিক ঐক্য ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। সুলতান যখন বিদায় নিতেন, তখন শাহজাদী পান পেশ করতেন।

শাহজাদী খুদাওয়ান্দজাদা যদিও ফিরোজ শাহ তুঘলকের সিংহাসন আরোহণ মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন যে কেন তাঁর ছেলে বাদশাহ হতে পারল না। অবশেষে তিনি তাঁর স্বামীর সাথে মিলে সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। সুলতান এখানে এসে যে বারান্দায় বসতেন, তার সিঁড়ি একটি বারান্দায় নামত যার ডানে ও বামে কয়েকটি কক্ষ ছিল। শাহজাদী সেখানে কিছু বর্মধারী সশস্ত্র সৈন্য লুকিয়ে রাখেন এবং তাদের বলেন যে, সুলতান যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ শেষ করে ফেরার পথে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় নামবেন, তখন তোমরা উভয় দিক থেকে তাঁর ওপর আক্রমণ করবে। আরও কিছু সৈন্য প্রাসাদের ফটকের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে সুলতান যদি কোনোভাবে বারান্দা অতিক্রম করেন, তবে ফটক পার হওয়ার আগেই তাঁর কাজ শেষ করে দেওয়া যায়।

শাহজাদীর ছেলে দাওয়ার মালিক এই ষড়যন্ত্রের সাথে একমত ছিলেন না, কিন্তু মাকে বোঝানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুলতান যথারীতি আসলেন এবং শাহজাদীর সাথে সাক্ষাতের জন্য বসলেন। ইতিমধ্যে শাহজাদীর পেছনে বসা দাওয়ার মালিক দাঁত দিয়ে আঙুল কামড়ে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে দ্রুত বেরিয়ে যান, এখানে বিপদ আছে।

সুলতান নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে পুরো বিষয়টি বুঝে ফেললেন এবং তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। শাহজাদী পান খাওয়ার জন্য জেদ করলেন কিন্তু বাদশাহ বললেন: “শাহজাদা ফাতহ খান অসুস্থ। আমি আবার আসব এবং দীর্ঘক্ষণ বসব।”

এই বলে বাদশাহ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে সৈন্যরা বারান্দার কক্ষগুলোতে এবং ফটকের কাছে ওত পেতে বসে ছিল, তারা বাদশাহকে প্রাসাদ থেকে বের হতে দেখেনি। একেই বলে: “যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন, তাকে কে মারতে পারে?” [২]

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে সুলতান আমিরদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তৎক্ষণাৎ অভিযান চালিয়ে শাহজাদী, খসরু মালিক এবং ঘাতক হামলার জন্য নিযুক্ত সৈন্যদের গ্রেপ্তার করেন। সুলতান সেই সৈন্যদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি আমাকে আসা-যাওয়ার সময় দেখেছিলে?” তারা বলল: “প্রবেশ করতে দেখেছি, কিন্তু কখন বের হয়েছেন তা আমরা জানতে পারিনি।” [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, সিরাজ আফিফ: পৃষ্ঠা ৫৬৭ থেকে ৫৬৯।

[২] লেখক আরজ করছেন যে, এমন বিপদের মুহূর্তে সূরা ইয়াসিনের আয়াত: “وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ” পাঠ করা অত্যন্ত পরীক্ষিত। এবং মাসনুন দোয়া: “اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ” এরূপ।

তারিখ-ই-উম্মতে মুসলিমা

সুলতান দাওয়ার মালিকের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন যিনি তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিলেন। তিনি খসরু মালিককে নির্বাসিত করলেন এবং শাহজাদীকে বাধ্য করলেন যে তিনি বাকি জীবন নির্জনে কাটাবেন, তবে তাঁর সরকারি ভাতা অব্যাহত থাকবে। [১]

তোমার জ্ঞান ও ভালোবাসার কোনো শেষ নেই... প্রকৃতির বাদ্যযন্ত্রে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো সুর নেই।

(আল্লামা ইকবাল)

...এমনই পরিস্থিতির জন্য। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সুলতান বিপদের সময় এই ধরণের জিকির করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ১০০ থেকে ১০২।

https://t.me/BoierSomahar

ফিরোজ শাহের অভিযানসমূহ

সুলতান ফিরোজ শাহের সাথে অভিযানের সম্পর্ক নেই এমন নয়, তবে তাঁর দীর্ঘ শাসনামলের তুলনায় এই অভিযানগুলো সংখ্যায় খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে তিনি এমন কোনো বাদশাহ ছিলেন না যিনি কোনো দেশ আক্রমণ করে আনন্দ পেতেন। তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইতেন। তিনি দাক্ষিণাত্য ও বাংলার স্বাধীনতা এই শর্তে মেনে নিয়েছিলেন যে, তারা দিল্লি সালতানাতের জন্য কোনো হুমকির কারণ হবে না। এই কারণেই তিনি দুইবার বাংলার দিকে সৈন্য পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং উভয়বারই কোনো শহর দখল না করে কেবল প্রতিপক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে এমন একটি চুক্তি করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন যা উভয় পক্ষের জন্য সম্মানজনক ও সন্তোষজনক হয়।

বাংলার প্রথম অভিযান:

৭৫৪ হিজরিতে প্রথমবার তিনি বাংলার দিকে সৈন্য পরিচালনা করতে বাধ্য হন, কারণ পূর্ব বাংলার শাসক শামসুদ্দিন হাজি ইলিয়াস পশ্চিম দিকে সীমানা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন এবং দিল্লি সালতানাতের অধিকৃত এলাকা “তিরহুত” নিজের দখলে নিয়েছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ এই সংবাদ পেয়ে ১০ই শাওয়াল ৭৫৪ হিজরিতে একটি বাহিনী নিয়ে পূর্ব দিকে রওনা হন। পথে গোরক্ষপুরের সর্দার উদয় সিং ২০ লক্ষ তঙ্কা কর প্রদান করে সুলতানের বাহিনীকে বড় ধরনের সাহায্য করেন এবং সুলতান তাঁর এই সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাহিনী যখন তিরহুত পৌঁছাল, তখন সেখানকার রাজারা পূর্বের ন্যায় দিল্লি সালতানাতের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করলেন। সুলতান সেই এলাকার জমিদার ও কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ঘোষণা দিলেন এবং চলতি বছরের কর মওকুফ করে দিলেন।

বাহিনী যখন লখনৌতির (পূর্ব বাংলা) সীমান্তে পৌঁছাল, তখন হাজি ইলিয়াস কোসি নদীর ঘাটে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ হঠাৎ উত্তর দিকে চলে যান এবং পঞ্চাশ মাইল দূরে “জিয়ারা” নামক স্থানে নদী পার হন। এখানকার স্থানীয় হিন্দু প্রধানরা এ ব্যাপারে বড় ধরনের সহযোগিতা করেন এবং ফিরোজ শাহ তাঁদের বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেন।

ফিরোজ শাহের নদী পার হওয়ার খবর পেয়ে হাজি ইলিয়াস পিছু হটে তাঁর রাজধানী “পান্ডুয়া” চলে যান এবং সেখান থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন, সৈন্যসামন্ত ও বিশেষ কর্মকর্তাদের নিয়ে “একডালা” দুর্গে স্থানান্তরিত হন, যা লখনৌতি থেকে ২২ মাইল উত্তরে নদীর দুটি শাখার মাঝে একটি উঁচু ঢিবির ওপর মাটির তৈরি ছিল। ফিরোজ শাহ রবিউল আউয়াল ৭৫৫ হিজরিতে (এপ্রিল ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) এখানে পৌঁছে দুর্গটি অবরোধ করেন।

কয়েক দিন পর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। হাজি ইলিয়াসের আশা ছিল যে, ফিরোজ শাহের ছাউনি নিচু এলাকায় হওয়ার কারণে...

বর্ষাতি ঢলের শিকার হয়ে যাবে, কিন্তু ফিরোজ শাহ সময়মতো তাঁবু তিন মাইল পেছনে সরিয়ে নিলেন এবং একই সাথে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কিছু তাঁবু এমনভাবে ফেলে রাখলেন যেন মনে হয় সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খলার মধ্যে পালিয়ে গেছে। এছাড়া কিছু দরবেশকে হাজী ইলিয়াসের কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, দিল্লির সেনাবাহিনী ক্লান্ত হয়ে বৃষ্টির কারণে পিছু হটছে। হাজী ইলিয়াস এই ধোঁকায় পড়ে গেলেন এবং দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে ফিরোজ শাহকে ধাওয়া করতে শুরু করলেন। ফিরোজ শাহের ৯০ হাজার সৈন্যের বাহিনী পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল, ফলে হাজী ইলিয়াসের বাহিনী পরাজিত হলো এবং তিনি বাকি সৈন্যদের নিয়ে কেল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন।

ফিরোজ শাহ শহর দখল করে নিলেন কিন্তু কেল্লা তখনও জয় হয়নি। ওদিকে কিছু পর্দানশীন মুসলিম নারী কেল্লার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে ফিরোজ শাহের কাছে দয়া প্রার্থনা করলেন। তাঁর মন গলে গেল। তিনি তাঁর সেনাপতিদের বললেন: “আমি যদি তোমাদের এই অসহায় নারীদের বন্দি করার অনুমতি দিই, তবে তোমাদের আর মঙ্গোলদের মধ্যে পার্থক্য কী থাকবে?”

অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হলো। ফিরোজ শাহ বাঙালি বন্দিদের ফেরত দিলেন এবং ১২ শাবান ৭৫৫ হিজরি (১ সেপ্টেম্বর ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ) বিজয়ী বেশে দিল্লিতে ফিরে পৌঁছালেন। [১]

আব্বাসীয় খলিফার পক্ষ থেকে সালতানাতের সনদ:

১০ জিলহজ ৭৫৬ হিজরিতে ঈদুল আজহার আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে গেল যখন কায়রো থেকে আব্বাসীয় খলিফা আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহর পক্ষ থেকে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জন্য সম্মানসূচক পোশাকের (খিলআত) সাথে একটি সনদ পৌঁছাল, যাতে তাঁকে ভারতের বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। [২]

মঙ্গোলদের আক্রমণ:

৭৫৯ হিজরিতে (১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ) মঙ্গোলরা আক্রমণ করে দিপালপুর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু মালিক মকবুল একটি বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং সময়মতো পৌঁছে তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। সুলতান ফিরোজ শাহের দীর্ঘ শাসনামলে এটিই ছিল একমাত্র বৈদেশিক আক্রমণ। [৩]

বাংলার দ্বিতীয় অভিযান:

৭৫৮ হিজরিতে বাংলায় আবারও রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। হাজী ইলিয়াস পূর্ব বাংলার (লখনৌতি) শাসক ছিলেন, অন্যদিকে পশ্চিম বাংলায় (সোনারগাঁও) ফখরুদ্দিনের শাসন ছিল। হাজী ইলিয়াস আক্রমণ করে ফখরুদ্দিন এবং তাঁর সালতানাতের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করে সোনারগাঁও দখল করে নেন। এই খবর নিহত শাসক ফখরুদ্দিনের জামাতা জাফর খানের কাছে পৌঁছাল, যিনি দিল্লিতে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি বঙ্গোপসাগর দিয়ে যাত্রা করে আরব সাগরে পৌঁছেছিলেন এবং তারপর ঠাট্টা হয়ে দিল্লিতে এসেছিলেন। তিনি সুলতানের কাছে আবেদন জানালেন যেন তিনি নিজে বাংলায় এসে রাজনৈতিক সংকট দূর করেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আফিফ: পৃ. ১০৯ থেকে ১২১; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী বারানি: পৃ. ৫৮৬ থেকে ৫৯৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১২৪, ১২৫। ঐতিহাসিক বারানি সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলের ঘটনাবলী ৭৫৮ হিজরি (১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্তই লিখতে পেরেছিলেন, এরপর ৭৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১২৬।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আফিফ: পৃ. ৪৮, ৪৯।

সুলতান এই সংবাদ পাওয়ার পর জানতে পারলেন যে হাজী ইলিয়াস ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ সিংহাসন আরোহণ করেছেন। যা-ই হোক, ৭৫৯ হিজরিতে ফিরোজ শাহ ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে বাংলার দিকে রওনা হলেন। সফর চলাকালীন পত্রবিনিময়ও চলতে থাকে যাতে যুদ্ধ ছাড়াই বিষয়গুলো মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তা সফল হয়নি।

অবশেষে দিল্লির বাহিনী পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করল এবং সিকান্দার শাহ তাঁর পিতার মতো 'একডালা' দুর্গে অবরুদ্ধ হলেন। সুলতানের সৈন্যরা মানজানিক দিয়ে পাথর বর্ষণ করতে থাকে। অবশেষে একদিন দুর্গের একটি বুরুজ ভেঙে যায় এবং আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য ভেতরে প্রবেশ করা সহজ হয়ে যায়, কিন্তু ফিরোজ শাহ বাহিনীকে থামিয়ে দিলেন এবং তাঁর প্রধান সেনাপতিকে বললেন: "হুসামুদ্দিন! আমি চাই ভেতরে প্রবেশ না করেই দুর্গের বিজয় অর্জিত হোক, যাতে আমাদের সৈন্যদের হাতে কোনো নারীর অমর্যাদা না হয়।"

ওদিকে অবরুদ্ধরা রাতারাতি বুরুজটি মেরামত করে নিল এবং যুদ্ধ চলতে থাকল। এই সময়ে আলোচনাও চলছিল। ফিরোজ শাহ জাফর খানকে তাঁর শ্বশুরের পরিবর্তে সোনারগাঁয়ের শাসক বানাতে চেয়েছিলেন। তিনি সিকান্দার শাহর কাছে এই শর্ত পাঠালেন। সিকান্দার শাহ উত্তর দিলেন: "সুলতান ফিরোজ শাহ আমার মনিব। তিনি যদি জাফর খানকে সোনারগাঁয়ের শাসক বানাতে চান, তবে আমার কোনো আপত্তি নেই। সামান্য এই বিষয়ের জন্য সুলতানের সৈন্য নিয়ে আসার কষ্টের প্রয়োজন ছিল না, বরং আমাকে একটি চিঠি লিখে দিলেই যথেষ্ট হতো।"

বিষয়গুলো এখন মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জাফর খান সোনারগাঁয়ের শাসনভার গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং দিল্লির দরবারের সদস্য হয়ে থাকাই পছন্দ করেন। ফিরোজ শাহরও নতুন কোনো এলাকা জয় করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তাঁর বর্তমান সালতানাতই এত বিশাল ছিল যে তাঁর পুরো জীবন এর নির্মাণ ও উন্নয়নেই ব্যয় করা যেত। অন্যদিকে সিকান্দার শাহও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন। ফলে দিল্লির শাহ তাঁর শাসন মেনে নিলেন এবং তাঁকে রাজকীয় খিলাত ও ছত্র দিয়ে সম্মানিত করে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। [১]

জাজ নগর (উড়িষ্যা) অভিযান:

উড়িষ্যার রাজধানী জাজ নগরের শাসকরা গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সময় থেকে দিল্লিকে কর প্রদান করে আসছিলেন, যা সাধারণত হাতির আকারে হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক দিনগুলোতে সেখানকার শাসক গজপতি দেব (ভানুদেব তৃতীয়) কর দিতে অস্বীকার করেন এবং অন্য কিছু হিন্দু প্রধানও তাঁর সাথে যোগ দেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন বাংলা অভিযান থেকে ফিরছিলেন, তখন এই সংবাদ পেয়ে তিনি চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী এবং বিহারের সৈন্যদের নিয়ে জাজ নগরের দিকে রওনা হলেন। পথে শিখর (পঞ্চকোট)-এ রাজা সাধন (সুলাইমান) মোকাবিলা করেন কিন্তু পরাজিত হন। এরপর জাজ নগর (জাজপুর) আক্রমণ করা হয়, যেখানে এর আগে কোনো বিজয়ী পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু এখানকার শান্তিকামী ব্রাহ্মণরা যুদ্ধ করতে চাননি। ফিরোজ শাহ তাঁদের অভয় দিলেন এবং সারানগড় ও ছত্রগড় জয় করে সামনে এগিয়ে গেলেন। কটক বেনারসি দখল করে তিনি সেখানে অবস্থান নিলেন। তিনি কিছু মন্দিরের মূর্তি ভেঙে ফেলেন।

এই অবস্থা দেখে গজপতির শ্বশুর রায় দাহর রঘুনাথ নামক এক পণ্ডিতকে জামাতার কাছে পাঠালেন, যার ফলে...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ১৩৭ থেকে ১৬৩; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১২৭, ১২৮।

এতে গজপতি বীর অত্যন্ত বিনীতভাবে ফিরোজ শাহের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নিজেকে তাঁর গোলাম হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন ফিরোজ শাহও সন্ধি গ্রহণ করেন, যদিও এর আগে তিনি একবার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। জাজনগর থেকে ২৭টি হাতি নিয়ে ফিরোজ শাহ আড়াই বছর অনুপস্থিত থাকার পর রজব ৭৬২ হিজরি (মে ১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে দিল্লিতে ফিরে আসেন। [১]

নগরকোট অভিযান:

৭৬৬ হিজরি (১৩৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও অনুচরসহ দৌলতাবাদ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। ঐতিহাসিক সিরাজ আফিফের মতে, সুলতান ওই অঞ্চলগুলোতে ভ্রমণ ও শিকার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 'বিয়ানা' পৌঁছে সফর স্থগিত করে দেন এবং দিল্লিতে ফিরে আসেন। কয়েক দিন পর তিনি উত্তর ভারতের কাংড়া অঞ্চলের দিকে রওনা হন, যা সুলতান মাহমুদ গজনভির আমলে বিজিত হয়েছিল। এর বিখ্যাত দুর্গ ছিল 'নগরকোট'। এখানকার হিন্দু রাজারা সাধারণত মুসলিম সুলতানদের কর প্রদান করে আসতেন। [২]

সুলতান সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন নগরকোট পৌঁছান, তখন সেখানকার রাজা কাংড়া দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ছয় মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে একদিন রাজা কোনো এক উপদেষ্টার পরামর্শে দুর্গের প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে সুলতানের সামনে মাথা নত করেন, যা ছিল আনুগত্যের ঘোষণা। সুলতান তাঁকে অভয় দিয়ে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং সম্মান ও মর্যাদার সাথে ক্ষমতায় বহাল রাখেন। [৩]

ঠাট্টার প্রথম অভিযান:

সেই সময়ে নিম্ন সিন্ধুর সুবাদারি আনুষ্ঠানিকভাবে জাম আলাউদ্দিন জুনার কাছে ছিল, অন্যদিকে তাঁর ভাতিজা জাম সদরুদ্দিন বানভ বিনাহ (যিনি বিখ্যাত সিন্ধি শাসক জাম অন্তরের পুত্র ছিলেন) কার্যত শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। জাম আলাউদ্দিন দিল্লির সিংহাসনের প্রতি অবশ্যই অনুগত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাতিজা বানভ বিনাহ সম্পর্কে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল যে, তিনি মঙ্গোলদের দিল্লি সালতানাতে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে চলেছেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলককে মনে ছিল যে, তাঁর مربی মুহাম্মদ তুঘলক কীভাবে ঠাট্টার জামদের বশীভূত করার ব্যর্থ অভিযানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাই তিনি একটি বড় অভিযানের মাধ্যমে নিম্ন সিন্ধুকে আরব সাগর পর্যন্ত জয় করা জরুরি মনে করলেন। ফলে তিনি ৯০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৪৮০টি হাতি নিয়ে এই অভিযানে বের হন। অজোধনে বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাজারে হাজিরা দেন এবং ফাতিহা পাঠ করেন। এরপর সেনাবাহিনী সেহওয়ান হয়ে ঠাট্টায় পৌঁছায়, যা সেই সময়ে সিন্ধু নদের উভয় তীরে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন ঠাট্টা বা বড় শহরটি ছিল পশ্চিম তীরে, আর নতুন শহরটি ছিল পূর্ব তীরে এবং এর সাথে বিশাল কৃষি অঞ্চল ছিল। যেন এই দুটি শহরই মজবুত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ১৫৭-১৬৩; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১২৯, ১৩০; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৮৩৩-৮৩৬।

[২] সুলতানের দৌলতাবাদ সফর ত্যাগ করে নগরকোট যাওয়ার কারণ সম্পর্কে কেউ আলোকপাত করেননি, তবে পরিস্থিতি দেখে মনে হয় যে সম্ভবত সুলতান 'বিয়ানা'তে খবর পেয়েছিলেন যে নগরকোটে কোনো নতুন হিন্দু শাসক সিংহাসনে বসেছেন যিনি কর দিতে অস্বীকার করেছেন। ফলে তাঁকে অবিলম্বে দিক পরিবর্তন করতে হয়।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ১৮৫-১৯০।

ফিরোজ শাহ এই বিশাল শহরটি জয় করার জন্য পাঁচ হাজার নৌকার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শহরের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে স্থল ও জল উভয় দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলেন। কিন্তু শহরবাসী আত্মসমর্পণ করেনি এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এদিকে দিল্লির সেনাবাহিনীতে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ ঘোড়া এবং শত শত সৈন্য এর শিকার হয়ে মারা যায়। এত বড় বাহিনীর খাদ্য ও রসদ সরবরাহও পর্যাপ্ত ছিল না এবং মানুষ অনাহারে ভুগতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে একবার ঠাট্টা থেকে বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য হঠাৎ দিল্লির বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বসে। দিল্লির বাহিনী কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং তাদের অবস্থা পরাজয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সংক্ষেপে, ঠাট্টার বাহিনী তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে ফিরে যায়। [১]

ঠাট্টা থেকে গুজরাট পর্যন্ত প্রাণঘাতী সফর:

ফিরোজ শাহ এই পরিস্থিতি দেখে অভিযান স্থগিত করেন এবং বাহিনীকে গুজরাটে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সফরে কিছু সিন্ধি পথপ্রদর্শক ইচ্ছাকৃতভাবে বাহিনীকে কচ্ছের রণের জলাভূমিময় প্রান্তরের পথে পরিচালিত করে। এই বিপজ্জনক পথে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কেবল লোনা পানির মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। প্রায় সব ঘোড়া ধ্বংস হয়ে যায় এবং খাদ্য ফুরিয়ে যায়। সাধারণ সৈন্য তো দূরের কথা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও পায়ে হেঁটে চলতে হয়। সেদ্ধ করা চামড়া এবং পচা মাংসের কয়েক টুকরোকেও তখন গনিমত মনে করা হচ্ছিল।

এই জলাভূমি এলাকা থেকে বের হওয়ার পর বাহিনী এক জনমানবহীন মরুভূমিতে প্রবেশ করে যেখানে ঘাসের একটি তৃণ বা পানির এক ফোঁটাও দেখা যাচ্ছিল না। প্রায় নিশ্চিত ছিল যে পুরো বাহিনী সেখানেই ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে নতুন জীবন দান করে। অবশেষে অনেক সৈন্যের মৃত্যু এবং অপূরণীয় ক্ষতির পর বাহিনী গুজরাটে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

এদিকে দিল্লিতে ছয় মাস পর্যন্ত সুলতানের কোনো খবর পাওয়া যায়নি, কিন্তু উজির খান জাহান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে রাখেন এবং এমনভাবে প্রকাশ করতে থাকেন যেন সব ঠিক আছে। তিনি নিজের পক্ষ থেকে একটি রাজকীয় পত্র তৈরি করে সবাইকে শুনিয়ে দেন যাতে বিজয়ের সুসংবাদ ছিল। তবে ছয় মাস পর গুজরাট থেকে রাজকীয় পত্র আসে যাতে বাহিনীর ধ্বংসের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল।

সুলতান ফিরোজ শাহ গুজরাটে পৌঁছে সেখানকার সুবাদার নিজামুল মুলক আমির হোসেনকে বরখাস্ত করেন। যদিও তিনি সুলতানের ভগ্নিপতি ছিলেন এবং তার যোগ্যতা এমন ছিল যে তিনি গুজরাটের কোষাগারে দুই কোটি তঙ্কা জমা করেছিলেন, কিন্তু সিন্ধু অভিযানে তিনি সুলতানকে কোনো সাহায্য করেননি। তখনই সুলতান আক্ষেপ করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: “যদি তুমি আমাকে শস্য পাঠাতে থাকতে, তবে আমার সৈন্যরা এই ধ্বংসাত্মক অবস্থার শিকার হতো না।” ফিরোজ শাহ তার স্থলে জাফর খানকে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করেন।

সুলতান সেনাবাহিনীর অবস্থা সংশোধন করে পুনরায় ঠাট্টার ওপর আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সৈন্যরা তখন এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে তাদের একটি বড় অংশ গুজরাট থেকে দিল্লিতে ফিরে যায়। সুলতান খান জাহানকে (উজির) নির্দেশ পাঠান যে, এই পলাতক সৈন্যদের বরখাস্ত করে বাজারে প্রচারের মাধ্যমে তাদের অপমান করা হোক, তবে তাদের বেতনে যেন কোনো কমতি না করা হয়।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে আলাউদ্দিন হাসান গাঙ্গু তার বাহমানি সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করে আশেপাশের আমিরদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ১৯১ থেকে ২০৪।

কিছু আমীর সুলতানের কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তিনি হাসান গাঙ্গুর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেন, কিন্তু সুলতান বলেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ঠাট্টা জয় না হবে, ততক্ষণ তিনি অন্য কোনো অভিযানে লিপ্ত হতে পারবেন না। [১]

ঠাট্টার দ্বিতীয় অভিযান:

সুলতান সেনাবাহিনীকে নতুন করে প্রস্তুত করতে গুজরাটের কোষাগার থেকে দুই কোটি টাঁকা ব্যয় করেন এবং অবশেষে আবারও সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্ব ঠাট্টার প্রাচীরের সামনে পৌঁছে যান। কৃষকদের শহরের বাইরে তাদের প্রস্তুত ফসল ফেলে পালিয়ে যেতে হয়েছিল এবং এই শস্য সেনাবাহিনীর হস্তগত হয়। পূর্ব ঠাট্টা দ্রুত জয় হয়ে যায়, কিন্তু নদীর ওপারে পশ্চিম ঠাট্টা জয় করা এত সহজ ছিল না। ফিরোজ শাহ গত যুদ্ধে যে নৌকাগুলো এনেছিলেন, তার গুজরাট রওনা হওয়ার পর সিন্ধিরা সেগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছিল। নদীর তীরে প্রায় দুইশ কিলোমিটার পর্যন্ত সমস্ত ঘাট সিন্ধিদের দখলে ছিল।

অবশেষে সুলতান জাফর খানকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ নদীর উত্তর দিকে প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে নদী পার হয়ে এর পশ্চিম তীরে অগ্রসর হয়ে ঠাট্টা আক্রমণ করেন। জাফর খান আদেশ পালন করেন, কিন্তু এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন তার সৈন্যরা ঠাট্টায় পৌঁছাল, তখন তাদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো।

যা-ই হোক, দীর্ঘ অবরোধ এবং বাইরের দাঁড়িয়ে থাকা ফসল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ঠাট্টায় দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয় এবং সেখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নৌকায় করে সুলতানের কাছে উপস্থিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করতে শুরু করেন। তারা উচ-এর বিখ্যাত বুজুর্গ সৈয়দ হোসেন বুখারী (রহ.)-এর মাধ্যমে সুপারিশও করান। অবশেষে একদিন জাম বানহবিনা নিজেই ক্ষমা চাইতে উপস্থিত হলেন। সুলতান তার ওজর কবুল করলেন এবং ঠাট্টাবাসীদের নিরাপত্তা দান করলেন। জাম বানহবিনাকে ঠাট্টার শাসনে বহাল রাখা হলো, তবে নিম্ন সিন্ধুতে তার ভাই জাম তমাচিকে নিযুক্ত করা হলো। [২]

মোদ্দাকথা, আড়াই বছরের দীর্ঘ অভিযানের পর ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লি ফিরে আসেন। তাকে বলতে হয়েছিল: “আমি যদি ঠাট্টা অভিযানে না যেতাম তবে ভালো হতো।” যা-ই হোক, এই বিজয়ের সামান্য উদযাপন করা হয়েছিল, কিন্তু মৃত হাজার হাজার সৈন্যের ঘরে ছিল শোকের মাতম।

ফিরোজ শাহ তাদের দুঃখ অনুভব করেছিলেন। তিনি ঠাট্টা অবরোধ এবং রণ অব কচ্ছ-এ নিহত সকল ব্যক্তির পরিবারের সহযোগিতার জন্য বিশেষ আদেশ জারি করেন। গুজরাট থেকে পলায়নকারীদেরও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। [৩]

এটাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য, এটাই মুসলমানিত্বের রহস্য
ভ্রাতৃত্বের বিশ্বজয়, ভালোবাসার প্রাচুর্য
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ২০৪ থেকে ২২৫

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ২২৫ থেকে ২৪৭

জাম বানহবিনা সর্বদা দিল্লি সালতানাতের অনুগত ছিলেন। যখন তার ভাই জাম তমাচি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন জাম বানহবিনা নিজেই তাকে গ্রেপ্তার করে দিল্লিতে পাঠান।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ২৪৭ থেকে ২৫৪

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কার ও কীর্তিসমূহ

ফিরোজ শাহের আটত্রিশ বছরের শাসনামল বিজয় বা সামরিক অভিযানের দিক থেকে কোনো বিশেষ গুরুত্ব রাখে না, বরং এই যুগের আসল মর্যাদা সালতানাতের সমৃদ্ধি, উন্নতি, ন্যায়বিচার এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার কারণে স্বীকৃত। এই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- শ্রমিকদের মজুরি ছিল অনেক বেশি।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ছিল অনেক কম।
- কখনো উল্লেখযোগ্য কোনো বিদ্রোহ হয়নি।
- কখনো কোনো উদ্বেগজনক বৈদেশিক আক্রমণ হয়নি।
- কখনো মহামারি ও রোগব্যাধি ছড়ায়নি।
- কখনো দুর্ভিক্ষ হয়নি।
- শিল্প-কারখানা, বাণিজ্য ও কৃষিতে এই দেশ সারা বিশ্বের জন্য ঈর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।
- এত বেশি নির্মাণ কাজ হয়েছিল যার উদাহরণ গত কয়েক শতাব্দীর কোনো রাজত্বে পাওয়া যায় না।

জনকল্যাণমূলক কাজ

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সর্বদা জনগণের উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও জনকল্যাণের কথা মাথায় রাখতেন। এই সিলসিলায় তিনি অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

আইন ও দণ্ডবিধিতে সংস্কার:

- সুলতান পূর্ববর্তী যুগের সেই আইনগুলো বহাল রেখেছিলেন যা জনগণের জন্য উপকারী ছিল। একইভাবে শরয়ী হুদুদ ও কিসাস বহাল রেখেছিলেন।
- পূর্ববর্তী যুগের কঠোর আইনগুলো তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন। ফলে হাত-পা কাটা, নাক-কান কাটা, অন্ধ করে দেওয়া, হাড় ভেঙে ফেলা, আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, শরীরে পেরেক ঠোকা এবং চামড়া তুলে ফেলার মতো নিষ্ঠুর ও অমানবিক শাস্তির ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫০২, ৫০৩।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

নাজায়েয করের বিলুপ্তি:

- সমস্ত নাজায়েয এবং কঠোর কর যা জনগণের ওপর বোঝা ছিল, তা বাতিল করে দেন; শুধুমাত্র যাকাত, উশর এবং জিজিয়া বহাল রাখেন।

- দীর্ঘকাল ধরে প্রথা ছিল যে, যুদ্ধের গনীমতের মালের চার অংশ সরকারি বায়তুল মালে যেত এবং মাত্র এক অংশ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। এটি বন্ধ করে শরয়ী বিধান জারি করা হয়, যার ফলে চার অংশ সৈন্যরা পেতে শুরু করে এবং মাত্র এক অংশ সরকারি বায়তুল মালে জমা করা হতে থাকে। [১]

ন্যায়বিচার ও ইনসাফ:

সুলতান ফিরোজ শাহ ন্যায়বিচার ও ইনসাফকে সাধারণ করে দিয়েছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি একাধিক দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিলেন যেখানে গিয়ে মানুষ তাদের ফরিয়াদ, বিবাদ ও সমস্যা পেশ করত। তা সত্ত্বেও মানুষের অনুমতি ছিল যে, যদি তাদের কথা শোনা না হয় তবে তারা যেন বাদশাহকে তাদের ফরিয়াদ শোনায়। ফলে অনেক সময় মানুষ বাদশাহর সওয়ারি থামিয়ে নিজেদের ফরিয়াদ শোনাত।

বাদশাহর প্রথম প্রশ্ন হতো যে, এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগাযোগ করা হয়েছিল কি না? যদি ফরিয়াদী বলত যে আমি সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান হয়নি, তবে বাদশাহ তাকে ইনসাফ প্রদান করতেন এবং সেই কর্মকর্তাদের তিরস্কারও করতেন যারা এ বিষয়ে অবহেলা ও ত্রুটি করেছিল। [২]

দেওয়ানে খয়রাত (মেয়েদের বিয়েতে সহায়তার দপ্তর):

ফিরোজ শাহ দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে তাদের পিতামাতা বা অভিভাবকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি দপ্তর কায়েম করেছিলেন যাকে দেওয়ানে খয়রাত বলা হতো। এই দপ্তর অভাবী পরিবারগুলোকে বিশ থেকে পঞ্চাশ তনকা (বর্তমান হিসেবে প্রায় ছয়শ ডলার থেকে পনেরশ ডলার পর্যন্ত) সহায়তা প্রদান করত। [৩]

উলামা, ক্বারী এবং হাফেজদের জন্য ভাতা:

সুলতানের নির্দেশে একটি দপ্তরের অধীনে উলামা, হাফেজ এবং ক্বারীদের জন্যও ভাতা নির্ধারিত ছিল যাতে তারা একাগ্রতার সাথে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকতে পারেন। এই বিভাগের সাথে চার হাজার দুইশ উলামা, হাফেজ ও ক্বারী যুক্ত ছিলেন। এই বিভাগের বার্ষিক বাজেট ছিল ছত্রিশ লক্ষ তনকা (সাতশ বিশ কোটি টাকা)। [৪]

- দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আয়ের জন্য বড় বড় জমিও ওয়াকফ করা হয়েছিল। [৫]

- একইভাবে মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকাহ এবং মাজারগুলোর ব্যয়ের জন্য বড় বড় জায়গির বরাদ্দ করা হয়েছিল। [৬]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫০৩, ৫০৪

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ৫১২, ৫১৩

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ৩৫০, ৩৫১। এক তনকা বর্তমানে প্রায় ৩০ ডলারের সমান ছিল, তবে ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ৩৫৯, ৩৬০

[৫] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃ. ১২

[৬] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃ. ১৫

দরিদ্র ও নিঃস্বদের জন্য বাজেট:

দরিদ্র, অভাবী এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিশেষ সাহায্যের জন্য প্রতি বছর এক কোটি তনকার একটি আলাদা বাজেট বরাদ্দ করা হতো। [১]

বন্দীদের প্রতি দয়া:

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কারাগার এবং বন্দীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। সুলতান বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। প্রতি মাসের শেষে তাদের রেকর্ড তলব করে দেখতেন এবং যে বন্দীরা প্রয়োজনীয় সাজা ভোগ করে ফেলেছে, তাদের মুক্তির ফরমান জারি করে দিতেন। যদি আশঙ্কা হতো যে কোনো বন্দী মুক্তির পর দেশের জন্য অস্থিরতার কারণ হতে পারে, তবে সুলতান তাকে অন্য কোনো দেশে পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু সেই সাথে তাকে এত পরিমাণ খরচ প্রদান করতেন যাতে সে প্রবাসে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে পারে এবং অভাব ও অনাহারের শিকার না হয়। সুলতান বলতেন:

"অপরাধীকে দীর্ঘ সময় কারাগারে রেখো না। তার হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। অসহায় বন্দীরা তাদের অপরাধ ও অদূরদর্শিতার কারণে সর্বদা চিন্তিত, ভগ্নহৃদয় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকে।" [২]

সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন:

যে সকল সরকারি কর্মচারী ও সৈনিক বৃদ্ধ হয়ে যেতেন, সুলতান তাদের বাকি জীবন বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে উপযুক্ত ভাতা (পেনশন) নির্ধারণ করে দিতেন এবং তাদের বিদায় দেওয়ার সময় তাকিদ দিতেন যেন তারা গুনাহ ও নাফরমানি থেকে তওবা করে বাকি জীবন আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেন এবং নিজেদের সময় জিকির, ইবাদত ও দোয়ায় ব্যয় করেন। [৩]

কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতি

ফিরোজ শাহ একজন দক্ষ অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তিনি অর্থব্যবস্থাকে নতুন করে বিন্যস্ত করে একে উন্নত করেন। কৃষি রাজস্বের প্রাক্কলন তৈরি করান। চাষিদের ঋণ মওকুফ করে দেন। ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। শস্য, কাপড়, পশু এবং মাছের ওপর থেকে ট্যাক্স প্রত্যাহার করে নেন। খাজনা এতটাই কমিয়ে দেন যে মানুষ চারদিকে অনাবাদি জমি আবাদ করতে শুরু করে। [৪]

কৃষি ও উদ্যানপালন:

ফিরোজ শাহ কৃষির ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। এই যুগে দোয়াব অঞ্চলে কোনো জমি চাষাবাদহীন ছিল না। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯২। রুপার ওজনের হিসেবে দেখা গেলে এক কোটি তনকার মূল্য প্রায় ত্রিশ কোটি ডলার হয়, কিন্তু তৎকালীন ক্রয়ক্ষমতার বিচারে এই পরিমাণ অর্থ বর্তমানের কয়েক বিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি ছিল।

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ৫০৯ থেকে ৫১১।

[৩] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃষ্ঠা ১৭, ১৮।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫০২।

দোয়াবের ৫২টি পরগনা (অঞ্চল) পুরোপুরি সবুজ-শ্যামল ও সজীব ছিল। ফিরোজ শাহ বাগান এবং সেগুলোর উৎপাদনের গুরুত্বও ভালোভাবেই জানতেন, তাই তিনি বাগান করার প্রতি অনেক মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে শুধু দিল্লির আশেপাশে বাগানের সংখ্যা ছিল প্রায় বারো হাজার। বাগানীদের অংশ আলাদা করার পর তাদের আয় থেকে সরকারের আশি লক্ষ তঙ্কা আসত। [১]

সেচ ব্যবস্থা:

তিনি কৃষি উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিলেন। যমুনা ও শতদ্রু নদী থেকে খাল খনন করেছিলেন। দিপালপুর, মুলতান এবং অন্যান্য এলাকায় অনেক খাল খনন করা হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় পুকুর ও কুয়ো তৈরি করা হয়েছিল। [২]

ঐতিহাসিক বারানি বলেন যে, সুলতানের আমলে খালের মাধ্যমে এমন মরুভূমি এলাকাতেও পানি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেখানে পানি একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং মানুষ তো দূরের কথা, এমনকি পাখিও অনেক সময় পানির অভাবে মারা যেত। [৩]

সুলতান খাল খনন, সেগুলো পরিষ্কার করা, বাঁধ নির্মাণ এবং বন্যা প্রতিরোধের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। প্রতি বছর বর্ষাকালে আমীরদের একটি দল খালের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যেত যে বন্যার পানি কোথায় পৌঁছায়। সে অনুযায়ী পরবর্তী বছরের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। [৪]

অর্থনৈতিক উন্নতিতে গোলামদের ব্যবহার:

ফিরোজ শাহ তাঁর আমীর ও প্রাদেশিক শাসকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধে যারা বন্দী হবে এবং গোলাম বানানো হবে, তাদের মধ্য থেকে যোগ্য গোলামদের বাছাই করে তাঁর দরবারে পাঠানো হোক। ফলে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক গোলাম সুলতানের সামনে আনা হতো। সুলতান আমীরদের তাদের ভালো মূল্য পরিশোধ করতেন এবং তাদের নিজের আশ্রয়ে নিতেন।

ফিরোজ শাহ এই গোলামদের জনশক্তি থেকে পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ এবং তাদের বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পে দক্ষ করার জন্য একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিভাগের অধীনে সেই গোলামদের জন্য মুলতান, দিপালপুর, হিসার ফিরোজা এবং বিভিন্ন শহরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল যেখানে তাদের জ্ঞান ও শিল্প শেখানো হতো। মাসিক ভাতাও দেওয়া হতো যা দশ থেকে একশ তঙ্কা পর্যন্ত হতো। যারা শিল্পের প্রতি আগ্রহী ছিল তাদের ক্যালিগ্রাফি, খোদাই এবং স্থাপত্যবিদ্যা শেখানো হতো। শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান গোলামদের সেরা সৈনিক হিসেবে তৈরি করা হতো। এভাবে প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার গোলামকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, যাদের মধ্যে বারো হাজার বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পে দক্ষ ছিল। এই জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফিরোজ শাহ অনেক কারখানা স্থাপন করেছিলেন যার উল্লেখ পরবর্তী লাইনে করা হচ্ছে। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ২৯৫, ২৯৬

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ১৪৭, ১৪৮

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, বারানি: পৃ. ৫৬৭

[৪] তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃ. ১৮৪

[৫] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ২৬৭ থেকে ২৭২; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃ. ২০৭, ২০৮

শিল্প ও কারুশিল্প:

ফিরোজ শাহ তুঘলক শিল্প ও বাণিজ্যিক মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি জনগণের ওপর থেকে করের বোঝা কমিয়ে দিলে সরকারি ব্যয় মেটানোর সমস্যা দেখা দেয়। এর জন্য তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি পরীক্ষা শুরু করেন। তিনি "৩৬" টি আধা-সরকারি বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলোর দুটি ধরণ ছিল: (১) রাতিবি (২) গায়র-রাতিবি।

রাতিবি কারখানাগুলো সালতানাতের কর্মচারী এবং পশুদের খাদ্য সরবরাহ করত, ফলে বাবুর্চিখানার পুরো ব্যবস্থা তাদের অধীনে ছিল। একইভাবে হাতি, ঘোড়া, উট এবং শিকারি কুকুরের খাদ্যও এগুলোর মাধ্যমেই পূরণ করা হতো।

এই কারখানাগুলোতে শুধুমাত্র খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের জন্য মাসিক এক লক্ষ ষাট হাজার তনকা ব্যয় হতো।

যেসব কারখানায় পশুদের দেখাশোনা ও বংশবৃদ্ধির কাজ করা হতো সেগুলোকে 'পায়গাহ' বলা হতো।

গায়র-রাতিবি কারখানাগুলোতে বিভিন্ন ধরণের জিনিস তৈরি হতো, যেমন:

- আলম খানায় বাহিনীর জন্য বিভিন্ন প্রকারের পতাকা, প্রতীক ও তুঘরা তৈরি করা হতো।
- রিকাব খানায় ঘোড়ার জিন, সাজ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম তৈরি হতো।
- সিলাহ খানায় তলোয়ার, নেজা, ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ, তীর-ধনুক এবং সব ধরণের অস্ত্র তৈরি করা হতো।
- জামাদার খানায় দরবারী, সৈন্য, খাদেম এবং সব ধরণের কর্মচারীদের জন্য শীত ও গ্রীষ্মের ঋতুর কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের পোশাক ও উর্দি তৈরি করা হতো।
- শামআ খানায় মোমবাতি, প্রদীপ ও মশাল সংক্রান্ত সকল সরঞ্জাম তৈরি করা হতো।
- ফরাশ খানায় গালিচা, দরি এবং সব ধরণের কার্পেট ও বিছানা তৈরি করা হতো। একইভাবে তাবু, বিছানাপত্র, পালঙ্ক, চারপায়ি এবং টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থাও এর অধীনে ছিল।
- তশতদার খানায় সব ধরণের ছোট-বড় পাত্র ও বাসনপত্র তৈরি হতো।
- জওয়াহের খানা হীরা-জহরত ও মুক্তা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান ছিল।

এই সমস্ত কারখানা বাণিজ্যিক ও শিল্প দক্ষতা সম্পন্ন একাধিক উমারাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এই কারখানাগুলোর উৎপাদিত পণ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রয়োজন মেটানোর পর বাইরেও বিক্রি করা হতো।

কারখানাগুলোর নিয়মিত দপ্তর ছিল যেখানে প্রতিটি আয় ও ব্যয়ের হিসাব নথিবদ্ধ করা হতো। কারখানাগুলোর আয়ের একটি অংশ কর্মচারী এবং এর তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাদের দেওয়া হতো, আর একটি নির্ধারিত অংশ সরকারি কোষাগারে জমা করে দেওয়া হতো।

যেভাবে প্রদেশগুলো থেকে খাজনা ও খেরাজের মাধ্যমে সরকারের আয় হতো, একইভাবে এই কারখানাগুলো থেকেও সরকারের অনেক বেশি আয় হতো। শুধুমাত্র একটি কারখানা থেকে প্রাপ্ত ট্যাক্স মুলতান প্রদেশের আয়ের সমান ছিল। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ৩৩৭ থেকে ৩৪৪।

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নির্মূল:

ফিরোজ শাহ দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যেন কেউ নিঃস্ব বা বেকার না থাকে। অক্ষম ও পঙ্গু ব্যক্তিরা ছাড়া বাকি সবাই যেন হালাল উপার্জনে নিয়োজিত থাকে। সরকারি কর্মকর্তারা বেকার ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দরবারে পেশ করতেন। তাদের ঝোঁক ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হতো এবং বিনিময়ে আবাসন ও জীবিকার সুব্যবস্থা করা হতো। [১]

প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি:

ফিরোজ শাহের আমলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এত উন্নতি হয়েছিল যে সাধারণ ও বিশিষ্ট উভয় শ্রেণির মানুষই সমৃদ্ধ ছিল। দূর-দূরান্তের কোনো গ্রামও জনশূন্য ছিল না। তাঁর আটত্রিশ বছরের শাসনামলে কখনো দুর্ভিক্ষ হয়নি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়েনি। প্রতিটি জিনিস সস্তা, উন্নত মানের এবং প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য ছিল। [২]

এই যুগে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ছিল খুবই কম, যেমন:

- গম, এক মণ: আট জিতাল
- যব, এক মণ: চার জিতাল
- জোয়ার, এক মণ: চার জিতাল
- দেশি ঘি, এক সের: আড়াই জিতাল
- চিনি, এক সের: সাড়ে তিন জিতাল [৩]

নতুন মুদ্রা প্রচলন:

সেই সময় পর্যন্ত সাধারণত বাজারে মাত্র দুটি মুদ্রা প্রচলিত ছিল, যথা: তঙ্কা ও জিতাল। যেহেতু ফিরোজ শাহের আমলে জিনিসপত্র খুব সস্তা হয়ে গিয়েছিল এবং কিছু জিনিসের দাম অর্ধেক জিতালের চেয়েও কমে গিয়েছিল, তাই বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের জন্যই সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফিরোজ শাহ বেশ কিছু নতুন সুন্দর মুদ্রা চালু করেন। বড় মুদ্রার পরিবর্তে সোনা ও রুপার দুটি আলাদা তঙ্কা তৈরি করান। তিনি ছোট মানের বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা তৈরি করান যেমন: চহল ও হাশত গানি, হাম-বিশত ও পঞ্জ গানি, দুয়াজদাহ গানি, দহ গানি, হাশত গানি, শশ গানি।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আয আফিফ: পৃ. ৩৩৪ থেকে ৩৩৬; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃ. ২১৭।

[২] তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃ. ২১০।

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আয আফিফ: পৃ. ২৯৪।

ফায়দা: তঙ্কা ছিল প্রায় বারো গ্রাম রুপার একটি মুদ্রা। বর্তমানে বারো গ্রাম রুপার দাম প্রায় ত্রিশ আমেরিকান ডলার। জিতাল ছিল তামার মুদ্রা। এক তঙ্কায় ৪৮ জিতাল হতো। সেই যুগে একজন শ্রমিকের দৈনিক আয় ছিল তিন থেকে চার জিতাল। অর্থাৎ একজন সাধারণ শ্রমিক সারাদিন মজুরি করে সন্ধ্যায় তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী অনায়াসেই কিনতে পারত এবং কিছু সঞ্চয়ও করতে পারত।

...প্রভৃতি। অর্ধেক জিতল এবং পাও (এক চতুর্থাংশ) জিতল মূল্যের মুদ্রাও চালু করেছিলেন। [১]

স্থাপত্য কীর্তি

ফিরোজ শাহ একজন স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ এবং নকশাকারও ছিলেন। তিনি সব ধরণের ইমারত নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন যার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নরূপ:

ধর্মীয় স্থাপত্য:

- চল্লিশটি নতুন মসজিদ [২]
- ত্রিশটি মাদ্রাসা
- একশটি মাজার [৩]

জাতীয় ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প:

- পঞ্চাশটি বাঁধ (ড্যাম): এগুলোর মধ্যে বাঁধ-ই-ফতেহ খান, বাঁধ-ই-মালজা, বাঁধ-ই-মহালপুর, বাঁধ-ই-সালুরা এবং বাঁধ-ই-ওয়াজিরাবাদ বিখ্যাত ছিল।
- দেড়শটি কুয়া
- একশটি সেতু
- দশটি হাম্মাম (গোসলখানা)
- পাঁচটি শফিখানা (বড় হাসপাতাল) যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যেত। [৪]

জনপদ ও শহর নির্মাণ এবং আবাদ:

ফিরোজ তুঘলক অনেক জনপদ ও শহর আবাদ করেছিলেন যেগুলোর নাম নিম্নরূপ:

- ফিরোজাবাদ, দিল্লি
- ফিরোজাবাদ, হারনি খেড়া (হরিয়ানা, জেলা ফতেহাবাদ)
- জৌনপুর
- তুঘলকপুর (কাসনা) [৫]

শান-শওকত প্রদর্শনের প্রকল্প:

ফিরোজ শাহ তুঘলক শান-শওকত এবং আরাম-আয়েশ ও সাজসজ্জার প্রকল্পও সম্পন্ন করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি একশটি প্রাসাদও নির্মাণ করিয়েছিলেন যেখানে রাজপরিবারের সদস্য বা আমীর-ওমরাহগণ অবস্থান করতেন। এগুলোর মধ্যে কুশক-ই-ফিরোজাবাদ, কুশক-ই-জৌনপুর, কুশক-ই-হিসার ফিরোজা, কুশক-ই-ফতেহাবাদ এবং কুশক-ই-সালুরা বিখ্যাত। তাঁর লাগানো বাগানের কোনো ইয়ত্তা নেই। [৬]

এখন আমরা সুলতানের কিছু কীর্তির বিস্তারিত বর্ণনা করছি:

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ৪৩৭ থেকে ৪৪৪

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫০৩

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫০৩; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ৩৩০

[৪] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ৩৩০

নোট: “কাসনা” একটি গ্রাম ছিল যা দিল্লি থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল। সেখানে তুঘলকপুর শহর গড়ে তোলা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে এই শহরটি জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং বর্তমানে এর ধ্বংসাবশেষও নতুন নির্মাণের ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

[৫] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫০৩

দিল্লিতে সম্প্রসারণ ও নির্মাণ কাজ:

প্রাক্তন সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক দিল্লির সমস্ত শহুরে অংশকে (প্রাচীন দিল্লি, সিরি, তুঘলকাবাদ) একটি প্রাচীরের ভেতরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তিনি এই কাজ শুরুও করেছিলেন এবং এর নাম দিয়েছিলেন 'জাহানপনাহ', কিন্তু পরবর্তীতে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে তা বন্ধ করে দেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁর মুরুব্বির এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং দিল্লির সমস্ত অংশকে একটি বিশাল ও প্রশস্ত প্রাচীরের ভেতরে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি প্রাচীন দিল্লির জামে মসজিদ নতুন করে নির্মাণ করান এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত করেন। হাউজে শামসি এবং হাউজে আলাই মাটি দিয়ে ভরাট হয়ে গিয়েছিল এবং দিল্লিতে আসা নালাগুলো অকেজো হয়ে পড়েছিল। তিনি সেগুলো পরিষ্কার ও সংস্কার করান যার ফলে দিল্লির অধিবাসীদের পানি সরবরাহে অনেক সুবিধা হয়। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের মাজারকেও তিনি নতুন করে নির্মাণ করে চমৎকার ও প্রশস্ত করে দেন। [১]

হাসপাতাল:

ফিরোজ শাহের আদেশে অনেকগুলো হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে দক্ষ চিকিৎসকদের রাখা হয়েছিল এবং রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হতো। চিকিৎসক ভালোভাবে রোগ নির্ণয় করে ব্যবস্থাপত্র লিখতেন। ওষুধপত্র, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মাজুন, খামিরে, পানীয় এবং বড়ি থাকতো, হাসপাতাল থেকেই সরবরাহ করা হতো। কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হতো। যখন তারা সুস্থ হয়ে উঠতেন, তখন নিয়ম ছিল যে তারা অজু করে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করতেন এবং তারপর নিজেদের চিকিৎসক ও প্রশাসনের জন্য দোয়া করে বিদায় নিতেন। [২]

خانقاهیں (খানকাহ), মুসাফিরখানা:

একইভাবে সারা দেশে একশ বিশটি খানকাহ নির্মাণ করান যেগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ধর্মপ্রাণ ও দৃঢ় বিশ্বাসী বুজুর্গদের দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি খানকাহ জিকরুল্লাহর কেন্দ্রের পাশাপাশি একটি সরকারি মেহমানখানা ও মুসাফিরখানাও ছিল যার লঙ্গরখানার খরচ সরকার বহন করতো। যেকোনো মুসাফিরকে যেকোনো খানকাহতে তিন দিন অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হতো। এই সময়ে তার খাওয়া, পান করা এবং বিশ্রামের সমস্ত সুবিধা বিনামূল্যে ছিল। যদি কেউ চাইত তবে এই একশ বিশটি খানকাহতে তিন দিন করে অবস্থান করে তার বছরের পুরো ৩৬০ দিন কাটিয়ে দিতে পারত। [৩]

মসজিদ নির্মাণ, মেরামত ও আবাদকরণ:

সুলতানের মসজিদের খেদমতের খুব শখ ছিল। এই কাজের জন্য তিনি একটি স্থায়ী বিভাগ কায়েম করেছিলেন যার অধীনে মেরামতযোগ্য প্রাচীন মসজিদগুলো মেরামত করা হতো। নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হতো। যে মসজিদগুলো জনশূন্য ছিল...

---

[১] ফুতুহাতে ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃষ্ঠা ১২, ১৩, ১৪, ১৭, প্রকাশক: মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়, ১৯৫৪, সম্পাদনা: শেখ আব্দুর রশিদ, প্রধান ইতিহাস বিভাগ।

[২] তারিখে ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ৩৫৩ থেকে ৩৫৯।

[৩] তারিখে ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ৩৩০, ৩৩।

...বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হতো এবং সেখানে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করা হতো। সেখানে বিছানোর জন্য সফের ব্যবস্থা করা হতো। চেরাগ জ্বালানোর জন্য তেল সরবরাহ করা হতো। [১]

নির্মাণ কাজের বিন্যাস:

সুলতানের আমলে নির্মাণ কাজ অনেক বেশি ছিল, তাই নির্মাণ বিভাগগুলোকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

- ১. চুন প্রস্তুতকারক
- ২. রাজমিস্ত্রি
- ৩. করাতী
- ৪. কাঠমিস্ত্রি
- ৫. কাঠ খোদাইকারী
- ৬. কামার
- ৭. পাথর খোদাইকারী

এই সমস্ত পেশা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং একত্রে ভবনের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। [২]

অশোকের স্তম্ভ:

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের প্রতি এতই খেয়াল ছিল যে তিনি প্রাচীন রাজাদের স্মৃতিচিহ্নগুলোও রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। چنانچہ খিজরাবাদের [৩] নিকটবর্তী 'নয়ডা' নামক গ্রাম থেকে প্রাচীন আমলের একটি পাথরের স্তম্ভ (স্তম্ভ সদৃশ স্থাপনা) আবিষ্কৃত হয় যার ওপর প্রাচীন ভাষায় কিছু লেখা ছিল।

সিরাজ আফিফের মতে, এই স্তম্ভটি ৩২ (শরয়ী) গজ অর্থাৎ ৪৮ ফুট লম্বা ছিল। এটি ৮ (শরয়ী) গজ অর্থাৎ বারো ফুট মাটির নিচে পোঁতা ছিল এবং বাকি অংশ বাইরে ছিল। ডজন ডজন নির্মাণ বিশেষজ্ঞ, শত শত মিস্ত্রি এবং হাজার হাজার লোকের সমন্বয়ে গঠিত কর্মীদল এই স্তম্ভটিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাটি থেকে বের করে আনে এবং তারপর এটিকে একটি বিশাল ছাকড়া গাড়িতে তোলা হয় যা হাজার হাজার মানুষ দড়ির সাহায্যে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে এটিকে যমুনার তীরে আনা হয় যেখানে এত বড় বড় নৌকা প্রস্তুত রাখা হয়েছিল যা পাঁচ থেকে সাত হাজার মণ ওজন বহন করতে পারত। এই নৌকাগুলোকে একত্রে বেঁধে সেগুলোর ওপর স্তম্ভটি রাখা হয় এবং তারপর এটিকে ফিরোজাবাদে আনা হয়। এখানে সুলতান অনেক পণ্ডিতকে ডেকে এনে এর ওপর খোদাই করা লেখা পড়ানোর চেষ্টা করেন কিন্তু কেউই সফল হতে পারেননি।

এটি স্থাপন করার জন্য সুলতানের রাজপ্রাসাদে একটি আলাদা চবুতরা সদৃশ ভবন তৈরি করা হয় এবং এটিকে সেই বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করার কাজ শুরু হয় যার জন্য ভারী কপিকল ব্যবহার করা হয়। এভাবে ধীরে ধীরে অনেক দিনে...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ৫১১, ৫১২

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ৩৩০

- চুন প্রস্তুতকারক (চুনের ভাটি জ্বালানো ব্যক্তি): এই লোকেরা ভবনের জন্য চুন তৈরি করত, যা ইট জোড়া দেওয়ার জন্য এবং দেয়ালে প্লাস্টার করার জন্য মৌলিক উপাদান ছিল।
- রাজমিস্ত্রি (শ্রমিক, মিস্ত্রি, স্থপতি): এই লোকেরা পাথর ও ইট জোড়া দিয়ে দেয়াল ও ভবন নির্মাণের কাজ করত। চুন প্রস্তুতকারক এবং রাজমিস্ত্রির মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল, কারণ একজনের কাজ ছাড়া অন্যজনের কাজ সম্ভব ছিল না।
- করাতী: এই পেশাজীবী লোকেরা কাঠের বড় টুকরোগুলোকে তক্তা ও কড়িকাঠে বিভক্ত করত যাতে তা নির্মাণ কাজে বা আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।
- কাঠমিস্ত্রি: এই লোকেরা কাঠের জটিল ও ভারী কাজ করত, দরজা, জানালা এবং ছাদ তৈরি করত।
- কাঠ খোদাইকারী: (ছুতার) এই লোকেরা ভবনের জন্য কাঠের কাঠামো এবং আসবাবপত্র তৈরি করত।
- কামার (লোহার মিস্ত্রি): এই লোকেরা লোহার জিনিসপত্র যেমন দরজা, জানালা, আলমারি ইত্যাদি তৈরি ও মেরামত করত।
- পাথর খোদাইকারী: (পাথর কাটার লোক) এই লোকেরা মার্বেল ও নাগুন পাথরের কাজ করত, ভবন, ভাস্কর্য এবং স্তম্ভ নির্মাণে সূক্ষ্ম পাথর কাটা এবং সেগুলোর ওপর নকশা করার কাজ করত।

[৩] খিজরাবাদ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। দিল্লি থেকে প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার দূরে।

একে উপরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তারপর স্থাপন করা হলো। এর চারপাশে মার্বেল পাথরের কাজ করা হয়েছিল এবং চূড়ায় সোনার কলস লাগানো হয়েছিল এবং একে 'মিনারা-ই-জররিন' নাম দেওয়া হয়েছিল। এই লাঠ (স্তম্ভ) আজও ফিরোজ শাহ কোটলা (নয়াদিল্লি)-তে স্থাপিত আছে এবং একে ফিরোজ শাহের লাঠ বলা হয়। একইভাবে মিরাটের নিকটবর্তী এলাকা থেকেও একটি লাঠ আবিষ্কৃত হয়েছিল যা উল্লিখিত লাঠের চেয়ে ছোট ছিল। ওটিকেও সেখানে এনে স্থাপন করা হয়েছিল। [১]

এত ভারী লাঠগুলোকে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বের করে এত দূরে নিয়ে আসা এবং তারপর স্থাপন করা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি বিস্ময়কর কৃতিত্ব ছিল। তৈমুর গুরগান যখন দিল্লি দখল করলেন, তখন 'মিনারা-ই-জররিন' দেখে বলতে লাগলেন: 'কোনো বাদশাহ এমন টেকসই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেননি যেমনটি ফিরোজ শাহ করেছেন'। ফররুখ সিয়ারের আমলে ছোট লাঠটি বারুদ বিস্ফোরণে পাঁচ টুকরো হয়ে গিয়েছিল, যা ব্রিটিশ আমলে পুনরায় জোড়া লাগিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। [২]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বসন্ত

ফিরোজ শাহ তুঘলক জ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এই যুগ ছিল উলামা ও হেকিমদের উন্নতির সময়। চারদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত বসন্ত দেখা যেত, যার কিছু ঝলক ইতিহাসের বই থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে পেশ করা হচ্ছে:

মাদ্রাসা-ই-ফিরোজ শাহী:

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লির বাইরে হাউজ-ই-আলাইয়ের কাছে একটি অত্যন্ত বিশাল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার ভবন কোনো রাজপ্রাসাদের চেয়ে কম ছিল না। এর উঁচু ছাদ, প্রচুর গম্বুজ, বড় বড় কক্ষ, প্রশস্ত বারান্দা এবং জায়গায় জায়গায় সবুজ ঘাসের চত্বর চোখের জন্য খুব মনোরম ছিল। এখানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ছাত্র অবস্থান করত যারা এখানে এসে নিজেদের কোনো জান্নাতে অনুভব করত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তব্য ছিল যে, তারা তাদের জীবনে এমন চমৎকার মাদ্রাসা কোথাও দেখেননি। মাদ্রাসায় প্রতিটি জ্ঞান ও শিল্পের দক্ষ শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ [৩], যিনি অনেক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পারদর্শী আলেম ছিলেন, তাকে মাদ্রাসার মুহতামিম (পরিচালক) বানানো হয়েছিল।

ছাত্রদের কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত এবং জ্ঞানচর্চার পুনরাবৃত্তির আওয়াজ আশপাশ দিয়ে অতিক্রমকারীদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আনন্দ দিত...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃ. ৩০৫ থেকে ৩৩০।

[২] তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী: খণ্ড ২, পৃ. ২৬৬, ২১৭।

নোট: বড় লাঠের ওপর খোদাই করা শব্দগুলো ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক জেমস প্রিন্সেপ পড়তে সক্ষম হন এবং জানা যায় যে, এই লাঠটি খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দের এবং এর ভাষা 'প্রাকৃত' আর লিপি 'ব্রাহ্মী'। এতে বৌদ্ধধর্মের নৈতিক শিক্ষা এবং অশোকের রাজনৈতিক আদেশ, গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এবং তার কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ ও কৃতিত্বের উল্লেখ রয়েছে।

[৩] মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ শারহে হামাসিয়া কুতুবুদ্দিন শিরাজীর বিশেষ ছাত্র ছিলেন। তিনি ফিকহ, হাদিস ও তাফসির শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে শেখ ইউসুফ মুলতানি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। (নুজহাতুল খাওয়াতির: পৃ. ১৫০)

https://t.me/BoierSomahar

ছিল। মাদরাসায় খানকাহর ব্যবস্থাও পাশাপাশি ছিল। অনেক সুফিয়ায়ে কেরাম এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে জিকির ও ফিকিরে মশগুল থাকতেন। [১]

ফাতাওয়া তাতারখানিয়া:

এই যুগেই দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট জনৈক আমির তাতার খান হানাফি ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব "ফাতাওয়া তাতারখানিয়া" সংকলন করেন যা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। হানাফি উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে দিল্লির আলেমদের ফাতাওয়া এতে একত্রিত করা হয়েছে। এর বিন্যাসে দরবারের কিছু ফকিহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন যাদের মধ্যে মাওলানা আন্দপতির নাম উল্লেখযোগ্য। [২]

ইতিহাস গ্রন্থের কাজ:

ফিরোজ শাহের আমলে দরবারি ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি "তারিখে ফিরোজ শাহী" লিখেছিলেন যা ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং এতে দাস বংশ, খিলজি বংশ এবং তুঘলক বংশের বাদশাহদের অবস্থা সংকলিত হয়েছে। একইভাবে তাঁর দরবারের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক শামস সিরাজ আফিফও "তারিখে ফিরোজ শাহী" নামে একটি বই লিখেছিলেন যা সুলতান ফিরোজ শাহের অবস্থার সবচেয়ে মূল্যবান উৎস।

প্রাচীন কিতাবসমূহের অনুবাদ:

সুলতান ফিরোজ শাহ নতুন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখা ও শেখানোর প্রসার ঘটিয়েছিলেন। নগরকোট বিজয়ের পর সেখানকার মন্দিরে তেরোশ কিতাব বিদ্যমান ছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলক সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিতাব অনুবাদ করান। সেগুলোর মধ্যে একটি কিতাব ছিল হিকমত বিষয়ক যার অনুবাদ "দালাইলে ফিরোজ শাহী" নামে করা হয়েছিল। [৩]

গোলামরা হলেন গুণীজন:

ফিরোজ শাহ গোলামদের শিক্ষা ও দীক্ষারও অত্যন্ত উন্নত ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি গোলামদের প্রশিক্ষণের জন্য যে কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে কুটির শিল্প ও সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষারও চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। ফলে অনেক গোলাম যারা দ্বীনি ইলম শিখতে চাইতেন, তারা হাফেজ, ক্বারী, মুহাদ্দিস ও ফকিহ হয়ে বের হতেন। অনেক সাহিত্যিক, কবি ও লেখক হয়ে যেতেন। শিক্ষা সমাপনকারী গোলামদের একটি দলকে বিভিন্ন খিদমতের জন্য হারামাইন শরিফাইনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। মোদ্দাকথা, এই ব্যবস্থার বদৌলতে হাজার হাজার এমন মানুষ উচ্চশিক্ষিত হয়েছিলেন যারা হয়তো এটি ছাড়া সাধারণ জীবন অতিবাহিত করে মারা যেতেন। [৪]

---

[১] তারিখে ফিরোজ শাহী, বারানি প্রণীত: পৃ. ৫৬২ থেকে ৫৬৪

[২] তারিখে হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী: খণ্ড ২, পৃ. ২২৩, ২২৪

[৩] তারিখে হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী: খণ্ড ২, পৃ. ২২৩, ২২৪

[৪] তারিখে ফিরোজ শাহী, আফিফ প্রণীত: পৃ. ২৬৭ থেকে ২৭০; তারিখে হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী: খণ্ড ২, পৃ. ২০৭, ২০৮

তাস ঘড়িয়াল

এই যুগে বিজ্ঞান চর্চায়ও কিছু অগ্রগতি হয়েছিল। কারিগরদের পৃষ্ঠপোষকতা মেধাবী লোকদের নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবনে উৎসাহিত করেছিল। একজন দক্ষ কারিগর একটি বিশাল ঘড়িয়াল (ঘড়ি) তৈরি করেছিলেন যা নামাজের সময় এবং ইফতার ও সেহরির সময়ও জানিয়ে দিত। এই সময়গুলোর শুরু এবং শেষে ঘণ্টা বাজত যার শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যেত। একে 'তাস ঘড়িয়াল' নাম দেওয়া হয়েছিল এবং ফিরোজাবাদে এমন এক স্থানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেখান থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি এটি দ্বারা উপকৃত হতে পারত। [১]

প্রত্নতত্ত্ব

প্রত্নতত্ত্বও জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক এমন এক সময়ে এই শাখার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন যখন কেউ এই দিকে ভ্রুক্ষেপও করত না। তিনি প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন যার অধীনে দিল্লির জামে মসজিদের মেরামত করা হয়েছিল, সুলতান ইলতুতমিশের মাদরাসা মেরামত করা হয়েছিল এবং হাউজ-ই-শামসি পর্যন্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির মাকবারাসহ অনেক মাকবারার নির্মাণ ও মেরামত করানো হয়েছিল যার বিবরণ তাঁর নিজের লেখা পুস্তিকা 'ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী'-তে বিদ্যমান। অনেক পুরনো ঐতিহাসিক মসজিদ মেরামত করে সংরক্ষিত ও আবাদ করা হয়েছিল। কুতুবুদ্দিন আইবেকের নির্মিত 'কুতুব মিনার' বজ্রপাতের কারণে মেরামতের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সুলতান ফিরোজ এটি মেরামত করান এবং এর উচ্চতায় আরও একটি তলা বৃদ্ধি করেন। [২] খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর মাজার মেরামত করে এর গম্বুজের নিচে চন্দনের দরজা লাগানো হয়েছিল এবং ভেতরে সোনার শমাদান ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সাথে একটি মেহমানখানাও তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। [৩] অশোকের লাটের কথা যা আগে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, তা ছিল এই শাখার সবচেয়ে স্মরণীয় কাজ। [৪]

জাদুঘর

জাদুঘরও জ্ঞান ও তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ফিরোজ শাহ ছিলেন প্রথম শাসক যিনি এই দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং উপমহাদেশে প্রথম জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই জাদুঘরে প্রাচীন যুগের বিস্ময়কর বস্তু, খননকার্যের সময় উদ্ধারকৃত প্রাচীন প্রাণীদের হাড় এবং অন্যান্য প্রাচীন জিনিসপত্র ছাড়াও জীবন্ত অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক জিনিসও ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি তিন পা বিশিষ্ট ছাগল ছিল যা পূর্ণ গতিতে দৌড়াত। লাল ঠোঁটওয়ালা কাক, কালো ঠোঁটওয়ালা সাদা তোতা এবং ঘোড়ার মতো খুর বিশিষ্ট গরুও এখানে দেখার মতো ছিল। একজন বামনও ছিল যার উচ্চতা ছিল মাত্র তিন ফুট কিন্তু মাথা ছিল সাধারণ মানুষের তুলনায় তিন গুণ বড়। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ২৫৪, ২৫৫

[২] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃষ্ঠা ১২, ১৩, ১৪, প্রকাশক: মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়, ১৯৫৪ খ্রি., সম্পাদনা: শেখ আব্দুর রশিদ, বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ।

[৩] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃষ্ঠা ১২, ১৩, ১৪

[৪] তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩০, ২৩১

[৫] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ৩৮৪, ৩৮৫; তারিখ-ই-হিন্দুستان, মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৩

https://t.me/BoierSomahar

শরয়ী বিধানের প্রয়োগ

ঐতিহাসিক সিরাজ আফিফের মতে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর ভাগ্নে ও খলিফা হযরত শেখ আলাউদ্দিন সাবির (রহ.)-এর মুরিদ ছিলেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ সফরে মাশায়েখদের খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং দোয়ার আবেদন করতেন এবং বুজুর্গানে দ্বীনের মাজারসমূহ যিয়ারত করতেন। ৭৭৪ হিজরিতে তিনি বাহরাইচে সৈয়দ সালার মাসউদ গাজী (রহ.)-এর মাজারে যান এবং ফাতিহা পাঠ করেন। সেই রাতে তিনি স্বপ্নে হযরত সালার (রহ.)-কে যিয়ারত করেন যে, তিনি তাঁর দাড়ি স্পর্শ করছেন, অর্থাৎ এটি একটি ইঙ্গিত ছিল যে এখন বার্ধক্য এসে গেছে, আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

যখন বাদশাহ সকালে জাগ্রত হলেন, তখন মাশায়েখদের রীতি অনুযায়ী মাথা মুণ্ডন করলেন, গোসল করলেন এবং আল্লাহর দরবারে উত্তমরূপে তওবা ও ইস্তিগফার করে শরীয়তের পাবন্দির দিকে মনোনিবেশ করলেন। ধীরে ধীরে তিনি এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে থাকলেন বরং একজন আবেদ ও জাহিদ ব্যক্তির মতো জীবন বেছে নিলেন। এই সময়ে তিনি দেশে শরীয়ত প্রয়োগ এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূর করার দিকে বেশি মনোযোগ দেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ: [১]

রাওয়াফিযদের ওপর নিষেধাজ্ঞা:

রাওয়াফিযরা সেই সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, বই লিখে এবং শিক্ষা ও পাঠদানের মজলিস বসিয়ে জায়গায় জায়গায় ফিতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তাদের শক্তি চূর্ণ করা জরুরি মনে করে তাদের তদন্ত করে গ্রেফতার করান। চরমপন্থী শিয়া যাদের আকিদা কুফরি ছিল এবং তারা তওবা করেনি, তাদের হত্যা করা হয়। বাকিদের ধমক দিয়ে বুঝিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের বিভ্রান্তিকর রীতিনীতি ও বইপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। [২]

ইবাহিয়া নামক শয়তানি ফিরকার দমন:

শিয়াদের একটি দল “ইবাহিয়া” (যা বাতেনি ফিরকা ও মজুসি আকিদার সংমিশ্রণ ছিল) গোপনীয়ভাবে প্রায় এক শতাব্দী ধরে হিন্দুস্তানে বিস্তার লাভ করছিল। এরা ছিল কারামিতা গোষ্ঠীর একটি শাখা। মদ্যপান, ব্যভিচার, সমকামিতা এবং সমস্ত নৈতিক অপরাধ গোপনে করার ক্ষেত্রে তারা কোনো লজ্জা বোধ করত না। এখন কয়েক দশক ধরে তারা পুরোপুরি শয়তানের মুরিদ হয়ে গিয়েছিল এবং মাহরাম নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে বৈধ মনে করতে শুরু করেছিল। (আল-ইয়াযু বিল্লাহ)।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ৩৭১ থেকে ৩৭৩।

[২] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃষ্ঠা ৬।

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা গোপনে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই লোকেরা রাতের অন্ধকারে গোপন মজলিস আয়োজন করত যাতে তারা নিজেদের মাহরাম নারীদেরও নিয়ে আসত। একটি ছবি (যা সম্ভবত তাদের কোনো দলের ছিল) সামনে রেখে তাকে সিজদা করত। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোনো বাছবিচার ছাড়াই যার হাত যে নারীর কাপড়ে লাগত, সে তার সাথে মিলিত হতো। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন এই বিষয়ে জানতে পারলেন, তখন তিনি এই লোকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং যাকে পাওয়া গেল, তাকেই শিরশ্ছেদ করালেন। [১]

তৌহিনে রিসালাতের শাস্তি:

বিহারের আহমদ বিহারী নামক এক ব্যক্তি কুফরি আকিদা ছড়াতে শুরু করেছিল। তার অনুসারীরা তাকে খোদা মানতে শুরু করেছিল। সে তৌহিনে রিসালাতও (রাসুলের অবমাননা) করত। অবশেষে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং ওলামাদের ফতোয়া অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। তার মুরিদরা তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করল। তাদের আলাদা আলাদা প্রদেশে নির্বাসিত করা হলো। [২]

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারের মৃত্যুদণ্ড:

দিল্লিতে রুকনুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবি করল এবং অনেককে নিজের মুরিদ বানিয়ে নিল। সুলতানকে অবহিত করা হলে তিনি তাকে মুরিদসহ গ্রেপ্তার করলেন। তার অপরাধ তদন্ত করা হলো। ওলামা ও মুফতিদের বসানো হলো যারা সব দিক থেকে ইতমামে হুজ্জাত করার পর তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দিলেন। ফলে তাকে তার অনুসারীসহ প্রকাশ্যে হত্যা করা হলো এবং তার দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস না করে। [৩]

খোদা হওয়ার দাবিদারের পরিণতি:

গুজরাটে কোনো এক মোল্লার বংশধরদের মধ্যে এক ব্যক্তি খোদায়িত্বের দাবি করল এবং "আনাল হক" স্লোগান দিতে শুরু করল। সে তার মুরিদদের বাধ্য করল যে, আমি যখন "আনাল হক" বলব তখন তোমরা বলবে "তুহি, তুহি" (তুমিই সেই)। সে তার কুফরি আকিদার ওপর একটি পুস্তিকাও লিখেছিল। তাকেও গ্রেপ্তার করা হলো এবং অভিযোগের পূর্ণ তদন্ত ও ইতমামে হুজ্জাতের পর মুফতিয়ানে কেরামের ফতোয়া অনুযায়ী হত্যা করা হলো। তার বইয়ের সমস্ত কপি নষ্ট করে দেওয়া হলো। [৪]

মাজারসমূহে কুসংস্কার প্রতিরোধ:

বুজুর্গানে দ্বীনের মাজারগুলোতে অনেক কুসংস্কার শুরু হয়ে গিয়েছিল। মহিলারা পালকি ও ডুলিতে চড়ে সেখানে যেত এবং সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ফিতনার কারণ হতো। সুলতান এই কুসংস্কারগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন এবং মহিলাদের...

---

[১] ফুতুহাতে ফিরোজ শাহী, আজ ফিরোজ শাহ তুঘলক, পৃ. ৬, ৭।

[২] ফুতুহাতে ফিরোজ শাহী, আজ ফিরোজ শাহ তুঘলক, পৃ. ৭।

[৩] ফুতুহাতে ফিরোজ শাহী, আজ ফিরোজ শাহ তুঘলক, পৃ. ৭, ৮।

[৪] ফুতুহাতে ফিরোজ শাহী, আজ ফিরোজ শাহ তুঘলক, পৃ. ৮।

মাজারগুলোতে যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। [১]

নতুন মন্দির নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা:

হিন্দুরা নতুন নতুন মূর্তিপূজার ঘর ও মন্দির নির্মাণ করতে শুরু করেছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক এ বিষয়ে ইসলামি বিধান জানতে চাইলে উলামা জানান যে, কাফেরদের প্রাচীন উপাসনালয়গুলো বহাল রাখা জায়েজ, কিন্তু নতুন মন্দির বা ইবাদতখানা তৈরি করা জায়েজ নয়। ফলে সুলতান তার শাসনামলে নির্মিত সমস্ত মূর্তিপূজার ঘর ভেঙে ফেলেন। তবে প্রাচীন মন্দিরগুলো বহাল রাখেন। [২]

সোনা ও রূপার ব্যবহার নিষিদ্ধ:

সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে মানুষ সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। একইভাবে অস্ত্রের ওপরও সোনা ও রূপার কাজ ব্যাপকভাবে করা হতো। জমকালো রেশমি পোশাক পরা সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। সুলতান এই সমস্ত শরীয়ত পরিপন্থী নিষিদ্ধ কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। [৩]

প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ:

পূর্ববর্তী রাজা ও আমীরগণ বিনোদনের জন্য চিত্রকরদের দিয়ে প্রাণীর ছবি আঁকাতেন। পর্দা, বিছানা, চেয়ার, অস্ত্র এবং তাবু ইত্যাদিতে এ ধরনের ছবি সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। ফিরোজ শাহ শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে এই ধারা বন্ধ করে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, এর পরিবর্তে ফুল, লতাপাতা ও বাগান ইত্যাদির ছবি তৈরি করা হোক। [৪]

ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া:

হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের থেকে জিজিয়া নেওয়া হতো না। ফিরোজ শাহর যুগে উলামা ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, এই লোকেরাই মূর্তিপূজার মূল ভিত্তি, সবার আগে তাদের থেকেই জিজিয়া নেওয়া উচিত। সুলতানও এই নির্দেশ জারি করেন। ব্রাহ্মণরা এই ঘোষণা শুনে রাজপ্রাসাদের সামনে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তারা গণ-আত্মাহুতির হুমকি দিয়ে বলে যে, নির্দেশ প্রত্যাহার না করলে তারা আত্মহত্যা করবে। ফিরোজ শাহ জবাবে বলেন: “তোমরা চাইলে পুড়ে মরো, আমি জিজিয়ার নির্দেশ প্রত্যাহার করব না।” এর ওপর ব্রাহ্মণরা অনশন শুরু করে। তারা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু বাদশাহর সিদ্ধান্ত অটল ছিল। তখন তাদের অনুসারীরা এসে তাদের আশ্বস্ত করল যে, তাদের জিজিয়া তারাই পরিশোধ করবে। সেই যুগে বার্ষিক জিজিয়ার তিনটি স্তর ছিল: ধনীদের জন্য চল্লিশ তঙ্কা, মধ্যবিত্তদের জন্য ত্রিশ তঙ্কা এবং বাকিদের জন্য দশ তঙ্কা। ব্রাহ্মণদের থেকেও দশ তঙ্কা নেওয়া হতো।

---

[১] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃ. ৮, ৯

[২] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃ. ৯

[৩] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃ. ১১

[৪] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃ. ১১

রেয়াত করে দশ তনকাই নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। [১]

ইসলামের প্রচার:

সুলতান ফিরোজ শাহ ইসলামের প্রচারের ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অসংখ্য হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্য দ্বীনের আলোয় আলোকিত হয়ে উভয় জগতের কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হন। [২]

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন - নতুন প্রশাসনিক বিন্যাস:

মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টার কারণে বারবার বিদ্রোহ হতে থাকে। সুলতান এটি পরিবর্তন করেন এবং প্রদেশগুলোর জন্য আধা-স্বায়ত্তশাসনের কৌশল প্রয়োগ করেন, যার অধীনে সুবাদারগণ প্রতিটি বিষয়ে সুলতানের অনুগত থাকতে বাধ্য ছিলেন না, বরং উদ্ভূত সমস্যা ও বিষয়াবলি নিজেদের বিবেচনা এবং সরকারি আইনের আলোকে সমাধান করতেন। সুলতানের শেষ বছরগুলোতে প্রাদেশিক সরকারগুলোর বিভাজন ছিল নিম্নরূপ:

- ১. অযোধ্যা, সান্দিলা ও কোলের শাসক: হুসামুদ্দিন, খেতাবসহ হুসামুল মুলক
- ২. জৌনপুর ও জাফরাবাদের শাসক: মালিক বেহরোজ সুলতানি
- ৩. বিহারের শাসক: মালিক পীর আফগানি
- ৪. গুজরাটের শাসক: জাফর খান, পরবর্তীতে: দরিয়া খান বিন জাফর খান
- ৫. অযোধ্যার শাসক: মালিক নিজামুদ্দিন, পরবর্তীতে: সাইফুদ্দিন বিন মালিক নিজামুদ্দিন
- ৬. বাংলা ও কড়ার সীমান্ত অঞ্চলের শাসক: শামসুদ্দিন সুলাইমান, খেতাবসহ মালিকুশ শারক
- ৭. মুলতানের শাসক: নাসিরুল মুলক (বাংলার সীমান্ত অঞ্চল ও কড়ার প্রাক্তন শাসক) [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আফিফ: পৃষ্ঠা ৩৮২, ৩৮৩; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩২

[২] ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরোজ শাহ তুঘলক: পৃষ্ঠা ১৬, ১৭

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৩৪

ফিরোজ শাহ তুঘলকের শেষ কয়েক বছর

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শেষ কয়েক বছরে বেশ কিছু বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

উজির মালিক মকবুল খাজা জাহানের মৃত্যু:

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের উজির মালিক মকবুল খাজা জাহান তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত আমির ছিলেন। তিনি আঠারো বছর পর্যন্ত সরকারি দায়িত্ব পালন করেন এবং অবশেষে ৮০ বছর বয়সে ৭৭২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র "জুনা"-কে স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাঁকে খান জাহান সানি উপাধি প্রদান করেন। [১]

জাফর খানের মৃত্যু — গুজরাটে বিদ্রোহ:

৭৭৩ হিজরিতে গুজরাটের সুবাদার জাফর খানের মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র দরিয়া খানকে সুবাদার নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তিন বছর পর তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। অবশেষে শামস উদ্দিন দামঘানিকে এই শর্তে গুজরাটের সুবাদার করা হয় যে, তিনি বার্ষিক ৪০ লক্ষ তঙ্কা, একশ হাতি, দুইশ ঘোড়া এবং চারশ গোলাম দিল্লিতে পাঠাবেন। তিনি শর্ত পূরণ করতে না পেরে ৭৭৮ হিজরিতে বিদ্রোহ করেন। তবে গুজরাটের আমিরগণ দিল্লির সালতানাতের প্রতি অনুগত প্রমাণিত হন। তাঁদের মধ্য থেকে মালিক ফখর উদ্দিন এবং মালিক শেখ দামঘানির শিরশ্ছেদ করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কোনো সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন পড়েনি। দামঘানির স্থলে ফারহাতুল মুলককে গুজরাটের শাসক নিযুক্ত করা হয়। [২]

শাহজাদা ফাতহ খানের মৃত্যু:

১২ সফর ৭৭৬ হিজরিতে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী শাহজাদা ফাতহ খানের মৃত্যু হয়, যাঁর বয়স ছিল চব্বিশ বছর। এই শাহজাদা অত্যন্ত যোগ্য ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর জন্ম সুলতানের সিংহাসন আরোহণের কিছুদিন পর ৭৫২ হিজরিতে হয়েছিল। উচ্চপর্যায়ের আলেম ও শিল্পকলায় পারদর্শীরা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও বিচক্ষণ ছিলেন এবং নিজের সময় ফালতু কাজে একেবারেই নষ্ট করতেন না বরং সর্বদা উদ্দেশ্যমূলক কাজে লিপ্ত থাকতেন। যৌবনকালেই তিনি এমন ধীরস্থির ও বুদ্ধিমান প্রমাণিত হয়েছিলেন যে, বড় বড় জটিল সমস্যায় তাঁর পরামর্শ নেওয়া হতো এবং তিনি অত্যন্ত সহজে সেগুলোর সর্বোত্তম সমাধান পেশ করতেন।

তাঁর অভ্যাস ছিল যে, সকালে মাদরাসায় যেতেন এবং দুপুর দুইটায় রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে দুপুরের খাবার খেতেন। একদিন মাদরাসা থেকে...

---

[১] তারিখ-ই মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৩১; তারিখ-ই ফিরোজ শাহী আফিফ: পৃষ্ঠা ৪২১ থেকে ৪২৬

[২] তারিখ-ই মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৩২, ১৩৩; তারিখ-ই ফিরোজ শাহী আফিফ: পৃষ্ঠা ৩৯৯ থেকে ৪০৩

https://t.me/BoierSomahar

ফিরে আসছিলেন, এমন সময় পথে এক বৃদ্ধা নারী তাঁর পথ রোধ করে ফরিয়াদ জানালেন এবং বললেন: "আমার স্বামী ও পুত্র গ্রাম থেকে কিছু মালামাল নিয়ে শহরে আসছিলেন, তখন দস্যুরা তাদের লুট করে নেয়। তারা দুজনে ফরিয়াদ জানাতে বাদশাহর কাছে আসছিলেন, কিন্তু রক্ষীরা তাদের গুপ্তচর মনে করে গ্রেপ্তার করে নিয়েছে।"

শাহজাদা বৃদ্ধা নারীকে বললেন: "তুমি তাদের দুজনের নির্দোষিতা ও ভদ্রতার সাক্ষ্য দিতে পারে এমন দুজন ব্যক্তিকে নিয়ে এসো। আমি সুলতানের সামনে বিষয়টি পেশ করে তাদের মুক্ত করে দেব।"

বৃদ্ধা নারী বললেন: "আমাদের মহল্লার সব মানুষই তাদের চেনে। কিন্তু এমন ব্যক্তিদের নিয়ে আসতে আমার কিছুটা সময় লাগবে। তখন আপনার সাথে কোথায় দেখা হবে?" শাহজাদা বললেন: "আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।"

সেই নারী চলে গেলেন এবং শাহজাদা রোদের মধ্যে ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু আমির ও কর্মকর্তা এটি দেখে বললেন যে প্রাসাদে চলুন, কিন্তু শাহজাদা বললেন: "সেই বৃদ্ধা এই স্থানেই আসবে এবং আমি কথা দিয়েছি যে এই স্থানেই দেখা করব। এখান থেকে সরে যাওয়া হবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। শাসকদের জন্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সবচেয়ে বড় দোষ।"

পরিশেষে সূর্যাস্তের সময় বৃদ্ধা কিছু পরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ে এলে শাহজাদাকে রোদের মধ্যে সেই একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি বৃদ্ধা ও সাক্ষীদের সাথে নিলেন এবং শাহী প্রাসাদে নিয়ে গেলেন যাতে সুলতানের সাথে দেখা করানো যায়, কিন্তু সুলতান তখন কায়লুলা করার জন্য শুয়ে পড়েছিলেন। শাহজাদা অপেক্ষা করতে থাকলেন। দুপুর দুইটার দিকে সুলতান জাগলে শাহজাদা অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং পুরো বিষয়টি সামনে তুলে ধরলেন। বাদশাহ বৃদ্ধার স্বামী ও পুত্রকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং বৃদ্ধা দোয়া করতে করতে চলে গেলেন। [১]

এরপর শাহজাদা নিজের বাসস্থানে ফিরে এলেন এবং সকাল দশটার খাবার প্রায় দুপুর তিনটার দিকে খেলেন। [২]

এমন প্রিয়, জনপ্রিয় এবং যোগ্য সন্তানের মৃত্যুতে বৃদ্ধ সুলতান শোকে এতটাই ভেঙে পড়লেন যে সালতানাতের কাজকর্ম এবং দুনিয়াবি বিষয় থেকে তাঁর মন উঠে গেল। শোক প্রকাশকারীরা সান্ত্বনা দিতে থাকলেন যে এটিই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। অনেক দিন পর বাদশাহ নিজেকে সামলে নিলেন এবং উপদেষ্টারা তাঁর মন ভালো করার ব্যবস্থা এভাবে করলেন যে, ফিরোজাবাদের কাছে একটি জঙ্গলকে শাহী চারণভূমি হিসেবে ঘিরে দেওয়া হলো যেখানে বাদশাহ ও তাঁর পারিষদবর্গ ছাড়া আর কেউ যেতে পারত না। বাদশাহ সেখানে ভ্রমণ ও শিকারে সময় কাটাতে লাগলেন। [৩]

প্রকৃতপক্ষে এই যোগ্য রত্নের আকস্মিক মৃত্যু ছিল তুঘলক বংশের পতনের পূর্বাভাস। সবকিছু ঠিক সেভাবেই ঘটছিল যেমনটি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ খানের শাহাদাতের পর ঘটেছিল।

হিন্দু চৌধুরী ও রাজপুতদের বিদ্রোহ:

৭৭৯ হিজরিতে 'ইটাওয়া' [৪] এর চৌধুরীগণ: রায় আধারন এবং রায় সমীর বিদ্রোহ করে বসলেন, কিন্তু একটি যুদ্ধের পর তারা...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৮৯, ৪৯০

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৪৯৩, ৪৯৪; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৩১, ১৩২

[৩] "ইটাওয়া" ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ২২০ কিলোমিটার দূরে এবং যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

গ্রেপ্তার করে নেওয়া হলো। তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে দিল্লিতে এনে বসতি স্থাপন করানো হলো।

কিছু সময় পর 'কাঠের' [১] এলাকার রাজপুত সর্দার 'রায় খড়কু' বিদ্রোহ করল। সে বদায়ূনের সুবেদার সৈয়দ মাহমুদ এবং তার ভাইদের: সৈয়দ মুহাম্মদ এবং সৈয়দ আলাউদ্দিনকে নিজের বাড়িতে এক ভোজের বাহানায় দাওয়াত দিল এবং তারপর হত্যা করে দিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক এই বিশ্বাসঘাতকতায় অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং নিজের শাসনামলে প্রথমবারের মতো প্রতিশোধমূলক আবেগে অভিভূত হয়ে এই এলাকায় আক্রমণ করে কয়েক ডজন শহর ও গ্রাম ধ্বংস করে দিলেন। এই সময়ে হাজার হাজার হিন্দু নিহত হলো এবং প্রায় ২৩ হাজার গ্রেপ্তার করা হলো। 'খড়কু' পালিয়ে পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তারপর তার আর কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

এর পর বদায়ূন এবং সম্ভলে দুইজন বুদ্ধিমান আমীরকে নিযুক্ত করা হলো যাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো যে তারা প্রতি বছর হিমালয়ের পাদদেশের দিকে সৈন্য নিয়ে যাবে এবং এই বিদ্রোহী উপাদানগুলোকে দমন করবে। [২]

খান জাহান সানি এবং শাহজাদা মুহাম্মদ খানের রেষারেষি:

সুলতান নিজের অন্য কোনো ছেলেকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। যদিও তার দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ খানকেও ওলি আহদ করা যেত, কিন্তু এই ছেলেটি সেই গুণাবলি সম্পন্ন ছিল না যা মরহুম ওলি আহদের ছিল, তাই সুলতান তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

সুলতানের বয়স যখন বেড়ে যাচ্ছিল, তিনি উজির খান জাহান সানির ওপর বেশি নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন। সুলতানের আস্থার অপব্যবহার করে উজির সুলতানকে তার পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ খানের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে শুরু করলেন। ৭৮৯ হিজরিতে তিনি সুলতানকে এই বিশ্বাস করালেন যে শাহজাদা মুহাম্মদ খান কয়েকজন আমীর: সামাউদ্দিন, মালিক ইয়াকুব এবং কামালুদ্দিনের সাহায্যে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। [৩]

বাবার সাথে দেখা করার জন্য শাহজাদার অদ্ভুত কৌশল:

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক এই অভিযোগ বিশ্বাস করে উজির খান জাহান সানিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দিলেন। ফলে উজির শাহজাদার বেশ কয়েকজন অনুগত আমীরকে গ্রেপ্তার করলেন।

এর পর তিনি শাহজাদাকে কাবু করার কোনো কৌশল ভাবতে লাগলেন। শাহজাদাও সতর্ক ছিলেন, তাই তিনি নিজের বাসভবনে সশস্ত্র অনুগত সৈন্যদের মোতায়েন করলেন। উজির এটি দেখে তাকে দরবারে ডাকার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু শাহজাদা তার ফাঁদে পা দিলেন না বরং বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বাবার সাথে দেখা করা জরুরি মনে করলেন।

এক রাতে তিনি নিজের স্ত্রীর পালকিতে চড়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। যখন পালকি থেকে সশস্ত্র অবস্থায় বের হলেন, তখন রাজপ্রাসাদের মহিলারা এটি দেখে চিৎকার করতে লাগলেন যে শাহজাদা তার বাবাকে হত্যা করতে এসেছেন। তবে শাহজাদা সরাসরি বাবার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং পা...

---

[১] "কাঠের" (Katehr) হিমালয়ের পাদদেশের কাছে একটি বিশাল এলাকা ছিল যাতে বর্তমান মুরাদাবাদ, বেরেলি এবং বদায়ূন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯৫, ৪৯৬; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৩৫।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৩৫।

চুম্বন করে বলতে লাগল: “হুজুর ওয়ালা! খান জাহান সানি উজির আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। কোনো ছেলে কি তার বাবাকে হত্যা করতে পারে? যদি কেউ এমন করে থাকে, তবে তার পরিণামও শিক্ষণীয় হয়েছে। হুজুর! বাস্তবতা হলো উজির চান যে সমস্ত বিশ্বস্ত আমিররা পথ থেকে সরে যাক এবং তিনি সমস্ত রাষ্ট্রীয় বিষয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন।” [১]

উজির খান জাহান সানির পলায়ন:

ফিরোজ শাহ সত্য জানতে পেরে অবাক ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি শাহজাদাকে উজিরের সাথে মোকাবিলা করার অনুমতি দিলেন। ৭৮৯ হিজরির রজব মাসের এক রাতে শাহজাদা বারো হাজার ফিরোজি মামলুকের সাহায্যে হঠাৎ উজিরের প্রাসাদে আক্রমণ করেন, তবে উজির প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সুলতান ফিরোজ শাহ এখন উজিরের পদ শাহজাদা মুহাম্মদ খানের হাতে সোপর্দ করলেন। পরের মাসে (শাবান মাসে) তিনি শাহজাদাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে সিংহাসনও তার হাতে তুলে দিলেন। [২]

ভারপ্রাপ্ত শাসক: মুহাম্মদ খান, (সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ): ৭৮৯ হিজরি

৭৮৯ হিজরির শাবান মাসে শাহজাদা মুহাম্মদ খান ‘সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ’ উপাধি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত সুলতান হন। তার এই সময়কালকে স্থায়ী শাসন হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়, কারণ বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক তখনও জীবিত ছিলেন।

উজির খান জাহান সানির শিক্ষণীয় পরিণতি:

শাহজাদার প্রথম লক্ষ্য ছিল সালতানাতের প্রাক্তন উজির খান জাহান সানিকে ধরা, যিনি পালিয়ে মেওয়াতের ‘মহারি’ নামক জনপদের হিন্দু সর্দার ‘গোগা প্রধান’-এর কাছে লুকিয়ে ছিলেন। শাহজাদা আমির আখুর ইয়াকুবকে সিকান্দারি খান উপাধি দিয়ে তার পেছনে পাঠান। গোগা প্রধান বিপদ ঘনিয়ে আসতে দেখে খান জাহানকে গ্রেপ্তার করে সিকান্দারির কাছে পাঠিয়ে দেন, যিনি তার শিরশ্ছেদ করেন। [৩]

দিল্লি সালতানাত থেকে গুজরাটের বিচ্ছিন্নতা:

নাসিরুদ্দিন শাহ এখন সিকান্দারি খানকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করলেন, কিন্তু কেন্দ্রে সামরিক শক্তি কমে যাওয়ার কারণে গুজরাটের মতো দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে আগের মতো প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না যে কেবল কাউকে নিযুক্ত করে সেখানে পাঠানোই যথেষ্ট হবে। তাই সিকান্দারি খান সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে সেখানে রওনা হলেন। কিন্তু এখন গুজরাটের আমিরানে সাদাহ-ও দিল্লি সালতানাত থেকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। তারা সম্মিলিতভাবে সিকান্দারি খানের মোকাবিলা করেন এবং তার বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। সিকান্দারি খান এই অভিযানে নিহত হন।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৯৭; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৩৫, ১৩৬

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৯৮; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৩৫, ১৩৬

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৯৮, ৪৯৯; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৩৭, ১৩৮

পরাজিত বাহিনী যখন দিল্লিতে ফিরে এল, তখন নতুন বাদশাহ 'সিরমোরি'র পাহাড়ে শিকার করছিলেন। এই পরাজয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, কিন্তু তখন কেন্দ্রে এত বড় কোনো বাহিনী ছিল না যা গুজরাটের মোকাবিলা করতে পারত। [১]

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বশীরের বিশ্বাসঘাতকতা:

আরজ-ই-মামালিক (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) ইমাদুল মুলক বশীরকে সুলতানের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আমিরদের একজন মনে করা হতো। তিনি তার দীর্ঘ চাকুরিজীবনে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে এত পরিমাণ সম্পদ জমা করেছিলেন যে দিল্লির ইতিহাসে তার কোনো নজির পাওয়া যায় না। একবার সুলতানের তলবে তিনি তার সম্পদের হিসাব দিলে দেখা যায় তাতে শুধু রূপার মুদ্রাই ছিল তেরো কোটি তনকা। সুলতান এই বলে বিষয়টি মিটিয়ে দেন যে, বশীরের সম্পদ আমারই সম্পদ। তবুও বশীর তখনই এক কোটি তনকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে সুলতানকে আরও আশ্বস্ত করেন।

বশীর যখন বৃদ্ধ হয়ে কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি তার পদটি নিজের পুত্রের হাতে সঁপে দেন। বশীরের মৃত্যুর পর সুলতান তার সম্পত্তি থেকে চার কোটি তার সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং নয় কোটি তনকা রূপা সরকারি কোষাগারে স্থানান্তর করেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সেই দিনগুলোতে একজন নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে ফিরোজাবাদের বড় প্রাসাদ 'কুশকে শিকার' থেকে তার অন্য প্রাসাদ 'কুশকে মঞ্জিল'-এ স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এখানেই ফিরোজাবাদে প্রায় এক লক্ষ গোলাম বসবাস করত যাদের মামালিক-ই-ফিরোজী বলা হতো। ফিরোজ শাহ তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ করে তুলতেন এবং তাদের মাধ্যমে সালতানাতের প্রচুর আয় হতো। এই আয়ের একটি বড় অংশ ইমাদুল মুলক বশীর অন্যায়ভাবে নিজের ব্যক্তিগত তহবিলে জমা করতেন। [২]

মামালিক-ই-ফিরোজীর বিদ্রোহ:

যখন বশীরের সম্পদ তার ছেলেদের মধ্যে বণ্টন করা হলো, তখন এই মামালিকরা দাবি করল যে আমাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত এই সম্পদে আমাদেরও অংশ থাকা উচিত। সুলতান ফিরোজ শাহ সরকারি কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাই এই দাবি ভারপ্রাপ্ত শাসক শাহজাদা মুহাম্মদ খান (নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ)-এর সামনে রাখা হলো, কিন্তু তিনি তা পূরণ করতে টালবাহানা করতে থাকেন। [৩]

এই সময়ে ফিরোজ শাহ তুঘলকের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক বাহাউদ্দিন এবং মালিক কামাল উদ্দিন, যারা ফিতনা সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছিলেন, গোলামদের ক্ষোভের সুযোগ নিলেন এবং তাদের প্রতিবাদ ও বিশৃঙ্খলায় উসকে দিলেন। ফলে মামালিকদের একটি দল রাজপ্রাসাদের সামনে সমবেত হলো। শাহজাদা তাদের বোঝানোর জন্য মালিক জহিরকে পাঠালেন, কিন্তু তিনি পাথর নিক্ষেপে আহত হয়ে ফিরে এলেন।

শাহজাদা এটি দেখে মামালিক-ই-ফিরোজীর ওপর হামলার নির্দেশ দিলেন, ফলে নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং দুই দিন ধরে রাজধানী ফিরোজাবাদে রক্তের নদী বইতে থাকল। শেষ পর্যন্ত শাহজাদা মামালিক-ই-ফিরোজীকে পরাজিত করতে প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিলেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৪৯৯; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৩৮, ১৩৯

[২] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ আফিফ: পৃ. ৪৩৯ থেকে ৪৪৫

[৩] তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ আফিফ: পৃ. ৪৩৯ থেকে ৪৪৫

https://t.me/BoierSomahar

কিন্তু হঠাৎ শত শত গোলাম সেই রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ল যেখানে সুলতান ফিরোজ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মমালেক তার মনিবকে পালকিতে বসিয়ে নিজের সাথে বাইরে নিয়ে এলেন। এটি দেখে শাহজাদা মুহাম্মদ খানের সৈন্যরা মনে করল যে সুলতান বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, ফলে তারা সাহস হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। শাহজাদা মুহাম্মদ খানও এটি দেখে সিরমোরির পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেলেন। মমালেক তার প্রাসাদ লুট করে কিছুই বাকি রাখলেন না।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে অসহায় ছিলেন। মমালেক চাপ সৃষ্টি করে তাকে রাজি করালেন যেন তিনি তার নাতি ফতেহ খানের পুত্র তুঘলক শাহ সানিকে বাদশাহ বানানোর ঘোষণা দেন। ফলে তাই হলো এবং সরকারি বিষয়াদি তার হাতে সোপর্দ করা হলো। তবে ফিরোজ শাহের যতক্ষণ শ্বাস অবশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তুঘলক শাহ সানির রাজ্যাভিষেক বা সিংহাসন আরোহণের সুযোগ আসেনি। [১]

ওফাত:

এই ঘটনার এক বছর পর ফিরোজ শাহ ৩৮ বছর শাসন করার পর ১৮ রমজান ৭৯০ হিজরি (২৩ অক্টোবর ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন এবং ফিরোজাবাদে সমাহিত হন। তিনি ৩৮ বছর পর্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে শাসন করেন। তার বয়স ছিল ৮১ বছর। [২]

এক কমজোরি:

ফিরোজ শাহ তুঘলকের ব্যবস্থাপনায় কেবল একটি দুর্বলতা পাওয়া যায়। তা হলো এই যে, তিনি জায়গিরদারির সেই পুরনো ব্যবস্থা যা পূর্ববর্তী শাসকরা বিলুপ্ত করেছিলেন, তা পুনরায় চালু করেন। আমিরদের বড় বড় জায়গির দেওয়া হলো, এভাবে জায়গিরদারি ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো ফিরে এল। এছাড়া তিনি ফৌজের পদগুলোকে বংশানুক্রমিক করে দিলেন। জায়গিরদার ও সুবেদারদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সৈন্য রাখার অনুমতি দিলেন এবং তাদের প্রশিক্ষণের কাজও জায়গিরদারদের ওপর ন্যস্ত করলেন। এভাবে জায়গিরদাররা পুনরায় আধা-স্বায়ত্তশাসিত হয়ে গেল এবং ফৌজের প্রশিক্ষণের মান নিম্নগামী হলো। ফৌজের সেই শক্তি ও প্রস্তুতি আর থাকল না যা সুলতান ইলতুতমিশের আমল থেকে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক পর্যন্ত দেখা যেত। এর একটি বড় কারণ এটিও ছিল যে, সুলতানের প্রাথমিক কয়েক বছর বাদ দিলে প্রায় পঁচিশ বছর একটানা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল এবং কোনো যুদ্ধের প্রয়োজনই পড়েনি। যা-ই হোক, ফিরোজ তুঘলকের আমলে দেশের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত মজবুত ছিল এবং সবদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল।

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৫০০; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৩৯, ১৪০।

[২] (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৪০; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৫০০) কিছু ঐতিহাসিক সুলতান ফিরোজ শাহের বয়স ৯০ বছর বলেছেন কিন্তু আফিফের বর্ণনা অনুযায়ী জন্ম ৭০৯ হিজরি, যার হিসেবে বয়স ৮১ বছরই হয়।

ফিরোজ শাহের উত্তরসূরি এবং অরাজকতা

ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যু (৭৯০ হিজরি - ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু করে আমীর তৈমুর গুরগানের ভারত আগমন (৮০০ হিজরি - ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় দশ বছরের সময়কাল দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে অরাজকতা এবং চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সিংহাসনে বেশ কয়েকজন শাসক আসেন এবং চলে যান। এই পরিস্থিতি সালতানাতের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাহ সানি, যিনি ফিরোজ শাহের নাতি ছিলেন, ফিরোজ শাহের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু শীঘ্রই (৭৯১ হিজরি - ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে) তাকে হত্যা করা হয়। এরপর আবু বকর শাহ সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তিনিও শক্তিশালী আমীরদের হাতের পুতুল ছিলেন। ৭৯২ হিজরিতে (১৩৯০ খ্রিস্টাব্দে) তাকেও ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এরপর নাসিরুদ্দিন শাহ (মুহাম্মদ খান) সিংহাসনে আরোহণ করেন যিনি ৭৯৬ হিজরি (১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত শাসন করেন কিন্তু তার আমলেও বিশৃঙ্খলা চরম পর্যায়ে ছিল। এরপর আলাউদ্দিন সিকান্দার শাহ সিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু দেড় মাস পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরিশেষে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ শাসক হন এবং তার শাসনকাল তৈমুরের আক্রমণ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তার আমলে তার ভাই নুসরাত শাহও একজন সমান্তরাল শাসক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সামনে উপস্থিত ছিলেন। মোদ্দাকথা, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং এই পরিস্থিতি তৈমুরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সফল আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত পথ করে দিয়েছিল।

ফিরোজ শাহের পর সালতানাতের পতনের প্রধান কারণসমূহ:

ফিরোজ শাহ তুঘলকের পর সালতানাতের এই পতনের বেশ কিছু কারণ ছিল যার মধ্যে প্রধানগুলো হলো:

- দুর্বল উত্তরসূরি: ফিরোজ শাহ তুঘলক যদিও একজন সফল শাসক ছিলেন, কিন্তু তার উত্তরসূরিরা ছিলেন অযোগ্য, দুর্বল এবং বিলাসপ্রিয় যারা সালতানাতের বিশাল ও বিস্তৃত বোঝা সামলাতে পারেননি।

- আমীর ও দরবারীদের ষড়যন্ত্র: দরবারে বিভিন্ন উপদলের আমীর এবং সামরিক জেনারেলরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তারা শাসকদের নিজেদের ইচ্ছামতো সিংহাসনে বসাতেন এবং নামাতেন, ফলে কোনো সুলতানই মজবুত ভিত্তি স্থাপন করতে পারেননি।

- জায়গিরদারি ব্যবস্থার ত্রুটি: ফিরোজ শাহের আমলে জায়গিরদারি ব্যবস্থাকে বংশানুক্রমিক করে দেওয়া হয়েছিল। এটিও সালতানাতের দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জায়গিরদাররা স্বায়ত্তশাসিত হয়ে ওঠেন এবং কেন্দ্রের সাথে তাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

- বিদ্রোহ এবং প্রাদেশিক স্বাধীনতা: সালতানাতের দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে আমীররা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করেন। মালব, গুজরাট, জৌনপুর এবং দাক্ষিণাত্যে নতুন স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয় যা সালতানাতকে একেবারেই দুর্বল করে দেয়।

সামরিক দুর্বলতা: ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলে সেনাবাহিনীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়নি যার ফলে দিল্লির কাছে কোনো শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল না। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিশৃঙ্খলার কারণে এই সীমিত সামরিক শক্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করার যোগ্য ছিল না।

তওয়ায়েফুল মুলুকের নেতিবাচক প্রভাব:

এই তওয়ায়েফুল মুলুকের কারণে সালতানাতের ওপর যে প্রভাব পড়েছিল, তা ছিল সর্বব্যাপী নেতিবাচক, যার কয়েকটি দিক নিচে দেওয়া হলো:

- দিল্লির মর্যাদার অবসান: দিল্লি যা কয়েক শতাব্দী ধরে ইসলামি হিন্দের রাজধানী এবং ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল, তা নিজের গৌরব হারিয়ে ফেলে। তৈমুরের আক্রমণের সময় এই শহরটি তার পূর্বের শান-শওকত থেকে বঞ্চিত এবং যেকোনো আক্রমণকারীর জন্য সহজ লক্ষ্যবস্তু ছিল।

- অর্থনৈতিক ধ্বংস: ক্রমাগত যুদ্ধ, লুটতরাজ এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বাণিজ্য ও কৃষি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

- তৈমুরের আক্রমণ: এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈমুরের জন্য হিন্দুস্তান আক্রমণের সবচেয়ে বড় উদ্দীপক হয়ে দাঁড়ায়। তৈমুর দিল্লি আক্রমণ করে শহরটিকে চরমভাবে তছনছ করেন এবং এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে হত্যা ও লুণ্ঠনের লক্ষ্যবস্তু বানান, যা দিল্লি সালতানাতের কোমর ভেঙে দেয়।

- তুঘলক বংশের অবসান: তৈমুরের আক্রমণের পর তুঘলক বংশের অবশিষ্ট শক্তিও শেষ হয়ে যায় এবং এই বংশ ৮১৪ হিজরি (১৪১২ খ্রিস্টাব্দ) সালে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়, যার পর সৈয়দ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

- প্রাদেশিক রাজ্যগুলোর উত্থান: এই বিশৃঙ্খলা জৌনপুর (পূর্ব সালতানাত), মালব এবং গুজরাটের মতো নতুন স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রাদেশিক রাজ্যগুলোর উত্থানের পথ প্রশস্ত করে।

এটি ছিল তওয়ায়েফুল মুলুকের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করছি।

তুঘলক শাহ সানি, গিয়াসউদ্দিন

(ফাতাহ খান বিন ফিরোজ শাহ তুঘলকের পুত্র)

৭৯০ হিজরি থেকে ৭৯১ হিজরি

(১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর সেই দিনই তাঁর নাতি তুঘলক শাহ সানির রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং তিনি গিয়াসউদ্দিন উপাধি গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদশাহ হন।

সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি তাঁর চাচা সাবেক যুবরাজ মুহাম্মদ খান (নাসিরুদ্দিন শাহ)-এর পক্ষ থেকে বিপদ অনুভব করে তাঁর পেছনে একটি বাহিনী পাঠান, কিন্তু তিনি পালিয়ে উত্তর ভারতের শহর নগরকোটে চলে যান, যেখানে হিন্দু রাজা তাঁকে আশ্রয় দেন।

এরপর তুঘলক শাহ অন্যান্য শাহজাদাদের নিজের সন্দেহ ও প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানাতে শুরু করেন। তাঁর ভাই সালার শাহও এর কবলে পড়েন এবং কোনো অপরাধ ছাড়াই তাঁকে বন্দি করা হয়। তিনি তাঁর চাচা শাদি খান (বিন ফিরোজ শাহ তুঘলক)-এর পুত্র আবু বকর শাহরও একই দশা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আবু বকর শাহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

তুঘলক শাহ সানি আরামপ্রিয় ও উদাসীন মানুষ ছিলেন, ফলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। রাজমুকুট ও সিংহাসনের প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যায় এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রশিক্ষিত গোলামদের (মামলুক) একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সালতানাতের আমিররা বেপরোয়া ও স্বাধীন হয়ে ওঠেন।

২১ সফর ৭৯১ হিজরি (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) সালতানাতের নায়েবে উজির রুকনুদ্দিন জান্দা ফিরোজী গোলামদের সাথে নিয়ে বিদ্রোহ করেন এবং একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে রাজপ্রাসাদ দখল করে নেন। তুঘলক শাহ সানি তাঁর উজির মালিক ফিরোজের সাথে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুজনেই ধরা পড়েন এবং তাঁদের শিরশ্ছেদ করে প্রাসাদের ফটকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তিনি শাসনের জন্য মাত্র পাঁচ মাস সময় পেয়েছিলেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা (ফারসি): খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০৪-৫০৫; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৪১ থেকে ১৪৩।

আবু বকর শাহ

(বিন জাফর খান বিন ফিরোজ শাহ তুঘলক)

৭৯১ হিজরি থেকে ৭৯২ হিজরি

(১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ)

এখন ফিরোজ শাহের আরেক পৌত্র আবু বকর শাহকে (বিন শাদী খান) সিংহাসনে বসানো হলো, আর রুকন উদ্দিন জুন্দাহকে সালতানাতের উজিরের পদ দেওয়া হলো। কিন্তু কিছুদিন পর নতুন সুলতানের সন্দেহ হলো যে, রুকন উদ্দিন জুন্দাহ তাকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। ফলে আবু বকর শাহ রুকন উদ্দিন জুন্দাহ ও তার সঙ্গীদের হত্যা করালেন।

দিল্লি অবশ্যই নতুন সুলতানের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেখানকার কোষাগার ও সেনাবাহিনী তার অনুগত ছিল, কিন্তু শাহজাদাদের গৃহযুদ্ধের কারণে দেশে কেন্দ্রবিমুখতার প্রবণতা সাধারণ হয়ে গিয়েছিল এবং কোনো প্রদেশই পুরোপুরিভাবে দিল্লির রাজমুকুটের অনুগত ছিল না। পলাতক শাহজাদা মুহাম্মদ খান (নাসির উদ্দিন শাহ) নগরকোটে নিজের বাদশাহির দাবি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এদিকে আবু বকর শাহের সিংহাসন আরোহণের কয়েকদিন পর পাঞ্জাবে আমিরানে সাদাহ সামানার সুবাদার সুলতান শাহ খুশদিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে তার ও তার সমর্থকদের ঘরবাড়ি লুট করে নেয়। এই আমিররা খুশদিলের শিরশ্ছেদ করে শাহজাদা মুহাম্মদ খানের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তাকে সামানায় এসে শাসনভার গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানায়।

শাহজাদা মুহাম্মদ খান একে এক বিরল সুযোগ মনে করে নগরকোট থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রবিউস সানি ৭৯১ হিজরি (এপ্রিল ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ) মাসে তিনি সামানায় পৌঁছালেন, যেখানে অধিকাংশ আমির, সর্দার ও চৌধুরী তার সাথে যোগ দিলেন। এখন শাহজাদা মুহাম্মদ খান এই শক্তি নিয়ে দিল্লিতে প্রবেশ করলে আবু বকর শাহকে পালিয়ে যেতে হলো।

শাহজাদা মুহাম্মদ খান কিছুদিন দিল্লি শাসন করলেন, কিন্তু ফিরোজী গোলামরা তার ঘোর বিরোধী ছিল। তারা তার...

https://t.me/BoierSomahar

বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শীঘ্রই তাকে দিল্লি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করল।

এখন শাহজাদা মুহাম্মদ খান গঙ্গা নদীর তীরে জালিসারি নামক স্থানে তাবু গেড়ে এক নতুন বাহিনী নিয়োগ করতে শুরু করলেন। পাঞ্জাবের অধিকাংশ আমির তার শাসন মেনে নিলেন। অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাধারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা তার চারপাশে সমবেত হলো। তাদের নিয়ে তিনি শাবান ৭৯১ হিজরি (আগস্ট ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ) মাসে পুনরায় দিল্লি আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারও ফিরোজী গোলামদের হাতে তিনি পরাজিত হন। এতে প্রমাণিত হলো যে, দিল্লির অধিবাসীরা আবু বকর শাহকেই প্রাধান্য দেয়।

তবে দিল্লির বাইরের আমির ও বাহিনী শাহজাদা মুহাম্মদ খানের সমর্থক ছিল। তাদের সাহায্যে শাহজাদা মুহাম্মদ খান যেকোনো মূল্যে ফিরোজী গোলামদের নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হলেন। দিল্লির ফিরোজী মামলুকরা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তাই তিনি অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে থাকা ফিরোজী মামলুকদের হত্যা করার জন্য এক গোপন ষড়যন্ত্র করলেন এবং এ বিষয়ে সকল সুবাদারদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। ফলে সামানা, লাহোর, মুলতান, হাসি এবং হিসার ফিরোজা প্রভৃতি স্থানে ১৯ রমজান ৭৯১ হিজরি (১১ সেপ্টেম্বর ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে সকল ফিরোজী মামলুকদের ধরে ধরে নির্দোষভাবে হত্যা করা হলো।

সফর ৭৯২ হিজরি (জানুয়ারি ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ) মাসে শাহজাদা মুহাম্মদ খান তার পুত্র হুমায়ুন খানকে বাহিনী দিয়ে দিল্লি দখলের আরও একটি চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও ব্যর্থতা তার ললাটলিখন হলো। আবু বকর শাহ শাহজাদা মুহাম্মদ খানের ক্রমাগত ব্যর্থতায় উৎসাহিত হয়ে তার সমর্থকদের নিয়ে তার শিবির “জালিসারি”-র দিকে আক্রমণ পরিচালনা করলেন। এদিকে সুযোগ বুঝে শাহজাদা মুহাম্মদ খান প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে দিল্লির দিকে রওনা হলেন। আবু বকর শাহ যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তার সাহস দমে গেল এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে বাজি হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফলে তিনি মেওয়াত গিয়ে বাহাদুর নাহার নামক এক সরদারের দুর্গে আশ্রয় নিলেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০৫, ৫০৬; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৪৪ থেকে ১৪৫।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মুহাম্মদ খান - নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ

(বিন ফিরোজ শাহ তুঘলক)

৭৯২ হিজরি থেকে ৭৯৬ হিজরি

(১৩৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ)

দিল্লির ফিরোজী মালিক ও আমীরগণ এখন এটা দেখে নিয়েছিলেন যে, আবু বকর শাহ একেবারেই অনভিজ্ঞ এবং অযোগ্য শাহজাদা। তাই তারা দরবারের হাজিব মুবাশশিরের নেতৃত্বে শাহজাদা মুহাম্মদ খানের যোগ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্যের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করেন। যখন মুহাম্মদ খান জানতে পারলেন যে, আবু বকর শাহ মেওয়াতে আশ্রয় নিয়ে দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তিন দিনের মধ্যে দিল্লিতে পৌঁছে যান এবং আবারও সুলতান নাসিরুদ্দিন শাহ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হাজিব মুবাশশিরকে ইসলাম খান উপাধি দিয়ে উজির নিযুক্ত করা হয়।

সুলতান মুহাম্মদ খান সর্বপ্রথম দিল্লিকে ফিরোজী গোলামদের থেকে মুক্ত করার ঘোষণা দেন এবং নির্দেশ দেন যে, তারা যেন তিন দিনের মধ্যে দিল্লি ত্যাগ করে। ফলে হাজার হাজার গোলাম তাদের পরিবারসহ প্রাণ বাঁচাতে বেরিয়ে পড়ে। অনেকে পালিয়ে মেওয়াতে শাহজাদা আবু বকর শাহের সাথে যোগ দেয়। অনেকে দিল্লির সাধারণ জনগণের সাথে মিশে যায় এবং নিজেদের হিন্দুস্তানি হিসেবে জাহির করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। নতুন সুলতান তাদের অনুসন্ধান অব্যাহত রাখেন। এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ধরে এমন সব শব্দের উচ্চারণ করানো হতো যাতে “ঘ” এবং “খ” রয়েছে, যেমন “খারা, খারি, ঘর, ঘেরা” ইত্যাদি। যারা এই উচ্চারণ করতে পারত তাদের স্থানীয় মনে করে ছেড়ে দেওয়া হতো, আর যারা পারত না তাদের ফিরোজী গোলাম সাব্যস্ত করে হত্যা করা হতো। অনেক স্থানীয় লোকও যারা এই উচ্চারণগুলো সঠিকভাবে করতে পারেনি, তারা নিহত হয়।

সফর ৭৯৩ হিজরি (জানুয়ারি ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ) শাহজাদা হুমায়ুন এবং উজির ইসলাম খানের নেতৃত্বে আবু বকর শাহের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দিল্লির সেনাবাহিনী জয়লাভ করে। শাহজাদা আবু বকর এবং তাকে আশ্রয় দানকারী সরদার বাহাদুর নাহর পালিয়ে যান কিন্তু...

তারপর আনুগত্য প্রকাশ করে প্রাণভিক্ষার আবেদন করল। সুলতান বাহাদুর নাহরকে মুক্তি দিলেন, অন্যদিকে আবু বকরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন যেখানে কিছুকাল পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নামমাত্র শাসনকাল মাত্র দেড় বছর স্থায়ী হয়েছিল।

এই সময়ে দিল্লির রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে দোয়াবে বেশ কয়েকজন হিন্দু সর্দার বিদ্রোহ করেছিল, যাদের মধ্যে জিৎ সিং রাঠোর, বীর সিং, রায় সমীর এবং অধরন নামক যোদ্ধারা অগ্রগণ্য ছিল। দিল্লির সেনাবাহিনী পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত তাদের সাথে বারবার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পরিশেষে রায় সমীর ব্যতীত বাকি সকল সর্দারকে খতম করে দেওয়া হয়।

দিল্লিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চলছিল এবং সুলতান তাঁর উজির মুবাশির ইসলাম খানের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে শাবান ৭৯৪ হিজরি (জুন ১৩৯২ খ্রিস্টাব্দ)-তে উজিরকে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

কিছু দিন পর সুলতান মুহাম্মদ খান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও তিনি দিল্লির শক্তি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং ৭৯৫ হিজরি (১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দ)-তে দিল্লির সেনাবাহিনী মেওয়াতে প্রবেশ করে এবং বাহাদুর নাহরের দুর্গ দখল করতে সক্ষম হয়।

সুলতান 'জালিসরি'-তে নিজের নামে 'মুহাম্মদাবাদ' নামক একটি শহর নির্মাণ করে সেটিকে নিজের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই সমস্ত আদেশ জারি করছিলেন। ১৭ রবিউল আউয়াল ৭৯৬ হিজরি (২০ জানুয়ারি ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ)-তে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০৬ থেকে ৫১২; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৪৫ থেকে ১৫৫।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আলাউদ্দিন সিকান্দার শাহ

(বিন মুহাম্মদ শাহ)

রবিউল আউয়াল থেকে জমাদিউল আউয়াল ৭৯৬ হিজরি

জানুয়ারি থেকে মার্চ ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ

নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পূর্বে শাহজাদা হুমায়ুন লাহোর অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলেন, কারণ লাহোর দুর্গে "শাইখা" নামক এক খোখর সর্দার দখল করে নিয়েছিল। পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে শাহজাদা হুমায়ুনকে এই অভিযান স্থগিত করতে হয়।

তিনি আলাউদ্দিন সিকান্দার শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু ততক্ষণে এই বংশের সৌভাগ্য বিদায় নিয়েছিল। ফলে পিতার শেষকৃত্য এবং শোকসভা থেকে অবসর হওয়ার পর তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র দেড় মাস অতিবাহিত করে ৩ জমাদিউল আউয়াল ৭৯৬ হিজরি (৭ মার্চ ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫১২, ৫১৩; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৫৫

দ্রষ্টব্য: শাইখা খোখর পাঞ্জাবের একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী উপজাতীয় নেতা ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল মালিক মুস্তফা। তাঁর ভাই মালিক নুসরাত খোখর লাহোরের সুবাদার ছিলেন। এই লোকেরা পাঞ্জাবি মুসলমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল। কেন্দ্রে রাজনৈতিক সংকট দেখে তারা স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করে। শাইখা ৭৯৭ হিজরি (১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৮২৩ হিজরি (১৪২০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে পাঞ্জাবের এক বিশাল অংশে নিজের শাসন কায়েম রাখেন। খোখর উপজাতিরা আমির তৈমুর লঙের আক্রমণের সময় তাঁর সাথে যুদ্ধও করেছিল (যার বিবরণ সামনে আসবে)। শাইখার পর তাঁর পুত্র মুস্তফা জাসরাত খোখর ৮৪৬ হিজরি (১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত শিয়ালকোটকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের বিশাল এলাকা দখল করে রাখেন। (এর বিবরণও সামনে আসছে।)

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ

(বিন মুহাম্মদ শাহ)

৭৯৬ হিজরি থেকে ৮১৫ হিজরি

(১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর পনেরো দিন পর্যন্ত রাজসিংহাসন শূন্য পড়ে ছিল। এরপর আমিরগণ ফিরোজ শাহ তুঘলকের আরেক পৌত্র শাহজাদা মাহমুদকে ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং তিনি নাসিরুদ্দিন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ছিলেন তুঘলক বংশের শেষ সম্রাট, যিনি নিজের চোখের সামনে এক বিশাল সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো হতে দেখছিলেন। সে সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, বিশাল দিল্লি সালতানাতের পরিধি সংকুচিত হয়ে কেবল দোয়াব, মালব এবং পাঞ্জাবের কিছু জেলায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। হিন্দু সর্দাররা জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহ করছিল। দিল্লি সালতানাতের যে সেনাবাহিনী একসময় এত শক্তিশালী ছিল যে মঙ্গোলদের লাখ-দুই লাখ যোদ্ধাকে তাড়িয়ে দিত, তা এখন এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে কয়েকটি দুর্গ জয় করাও তাদের জন্য সহজ ছিল না। এই সমস্ত অশান্ত পরিস্থিতি সত্ত্বেও নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনকাল বিশ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল, যা এই ফিতনার যুগে একটি অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক বিষয় ছিল। [১]

প্রশাসনিক বিন্যাস:

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন নিম্নলিখিত আমিরগণ সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন:

- মুকাররব আল-মুলক: নায়েবে সালতানাত, সাথে মুকাররব খান উপাধি।
- মালিক সারওয়ার: উজির-ই সালতানাত, সাথে খান-ই জাহান এবং মালিকুশ শারক উপাধি।
- মালিক দৌলত ইয়ার দাবির: আরজ-ই মামালিক (প্রতিরক্ষামন্ত্রী), সাথে দৌলত খান উপাধি।
- আব্দুর রশিদ সুলতানি: বারবাক (হাজিব), সাথে সাদাত খান উপাধি।

---

[১] তারিখ-ই মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৫৬

৫. খিজর খান: মুলতানের শাসক

কিছু প্রদেশে আমীরগণ নিজেদের শক্তির জোরে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, যেমন:

- গালিব খান: সামানার শাসক
- শায়খা খোখর: বিদ্রোহ করে লাহোর এবং এর আশপাশের এলাকা দখল করেছিলেন। [১]

দিল্লির নতুন কর্মপন্থা এবং জৌনপুর শারকি সালতানাতের ভিত্তি:

নাসিরুদ্দিন মাহমুদের সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা, আমীরদের ষড়যন্ত্র এবং হিন্দুদের অবাধ্যতার কথা বিবেচনা করে পূর্ববর্তী কর্মপন্থা ত্যাগ করা হয়। যার অধীনে প্রতিটি প্রদেশের ওয়ালি সরাসরি বাদশাহর আদেশের অনুগত থাকতেন। এর পরিবর্তে এখন একটি নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় যার অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যে আমীর বাদশাহর প্রতি আনুগত্যের সাথে যে এলাকা দখল করবেন বা যে এলাকা আগে থেকেই তার অধীনে আছে, তিনি কার্যত সেখানকার মালিক হবেন এবং তাকে একজন আধা-স্বায়ত্তশাসিত বাদশাহর মর্যাদা দেওয়া হবে এবং দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এতে হস্তক্ষেপ করবেন না। এই কর্মপন্থার অধীনে প্রথম সিদ্ধান্তটি ছিল যে, দরবারের আমীরদের সম্মতিতে উজির-এ-সালতানাত মালিক সারওয়ার (খাজা জাহান)-কে কনৌজ থেকে বিহার পর্যন্ত সমস্ত পূর্ব অঞ্চলের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হয় এবং তাকে 'মালিকুশ শারক' উপাধিও দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত জৌনপুরের শারকি সালতানাতের ভিত্তি স্থাপনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [২]

সারং খানের পাঞ্জাব বিজয়:

উল্লিখিত নতুন কর্মপন্থার অধীনে সারং খান নামক এক আমীরকে অনুমতি দেওয়া হয় যে তিনি দিপালপুর থেকে মুলতান পর্যন্ত সমগ্র পাঞ্জাবকে নিজের শক্তিতে বশীভূত করবেন। সারং খান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিম্নলিখিত বিজয়গুলো অর্জন করেন:

- তিনি দিপালপুর পৌঁছালে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাকে সহযোগিতা করেন এবং তিনি সেখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- এরপর তিনি লাহোরের দিকে রওনা হন যেখানে শায়খা খোখর দখলদার ছিলেন। লাহোর থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে 'সামুথলা'-র কাছে যুদ্ধে শায়খা খোখর পরাজিত হন। তিনি পালিয়ে জম্মুর পাহাড়ের দিকে চলে যান। সারং খান বিজয়ী হয়ে নিজের ভাই আদিল খানকে লাহোরের শাসক নিযুক্ত করেন। [৩]

সা'দাত খান এবং নায়েব-এ-সালতানাত দিল্লির যুদ্ধ:

শাবান ৭৯৬ হিজরিতে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ নায়েব-এ-সালতানাত মুকাররাব খানকে দিল্লির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়ে নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আমীর সা'দাত খানের সাথে দিল্লির সালতানাতের বাকি দক্ষিণ জেলাগুলো পরিদর্শনের জন্য বের হন। 'বিয়ানা' হয়ে তিনি যখন গোয়ালিয়র পৌঁছান, তখন সেখানে তিন আমীর: সারং খানের ভাই মল্লু, মালিক আলাউদ্দিন এবং মুবারক খান...

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৫৬, ১৫৭

[২] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৮৭৭, ৮৭৮

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৫৭, ১৫৮

(বিন মালিক রাজু) ষড়যন্ত্র করেছিল যেন সাআদাত খানকে হঠাৎ হত্যা করা হয়। সাআদাত খান সংবাদ পেয়ে যান এবং তিনি অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করে আলাউদ্দিন ও মুবারককে হত্যা করেন, অন্যদিকে মাল্লু পালিয়ে পুনরায় দিল্লি পৌঁছে যায় এবং সে নায়েবে সালতানাত মুকাররাব খানকে এমনভাবে প্ররোচিত করে যে, সে কেবল সাআদাত খানের প্রতিই নয় বরং বাদশাহর প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

এদিকে বাদশাহও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সাআদাত খানের সাথে গোয়ালিয়র থেকে দিল্লি এসে পৌঁছান, কিন্তু নায়েবে সালতানাত শহরের ফটকগুলো বন্ধ করে দেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তিন মাস পর্যন্ত সাআদাত খান দিল্লি অবরোধ করে রাখেন এবং বাদশাহও অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর সাথে ছিলেন। নায়েবে সালতানাত মুকাররাব খানও হার মানেননি এবং শহরের প্রতিরক্ষা অব্যাহত রাখেন।

অবশেষে কিছু আমির মধ্যস্থতা করে এই চুক্তি করান যে, যে লশকর শহরের বাইরে আছে, তা সাআদাত খানের কাছে থাকবে, আর বাদশাহকে দিল্লিতে রাখা হবে। সেমতে মহররম ৭৯৭ হিজরি (অক্টোবর ১৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দ)-তে আমিরগণ বাদশাহকে দিল্লি শহরে নিয়ে আসেন, আর সাআদাত খান লশকর নিয়ে বাইরে অবস্থান করতে থাকেন। [১]

নায়েবে সালতানাত মুকাররাব খান বাদশাহকে নিজের সাথে দেখে সাহসী হয়ে উঠেছিলেন, ফলে তিনি দিল্লির সমস্ত সৈন্য নিয়ে খোলা ময়দানে বেরিয়ে আসেন এবং সাআদাত খানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন, কিন্তু তিনি সেই দক্ষ সেনাপতির মোকাবিলা করতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হন। সাআদাত খানের বাহিনীও আক্রমণ চালিয়ে শহরে ঢুকে পড়ে এবং অনেক মানুষ তাদের হাতে নিহত হয়। তবে মুকাররাব খান, বাদশাহ এবং তাঁদের অনুগতরা দিল্লির কেল্লায় লুকিয়ে পড়েন, যা ছিল অপরাজেয়। [২]

সাআদাত খান বুঝতে পারলেন যে, এভাবে এই যুদ্ধ জয় করা কঠিন। তাই তিনি তাঁর সমমনা আমির ও সৈন্যদের নিয়ে ফিরোজাবাদ চলে যান এবং তা দখল করে নেন। [৩]

---

[১] তারিখ মুবারক শাহী: পৃ. ১৫৮

[২] তারিখ মুবারক শাহী: পৃ. ১৫৯

[৩] তারিখ মুবারক শাহী: পৃ. ১৫৯; তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৫১৫

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

নুসরাত খান

(ফিরোজাবাদে সমান্তরাল শাসন)

রবিউল আউয়াল ৭৯৭ হিজরি থেকে শাওয়াল ৮০০ হিজরি
(ডিসেম্বর ১৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)

এখন উমরাহদের এই দলের ফিরোজাবাদের সিংহাসনের জন্য একজন বাদশাহর প্রয়োজন হলো। ফলে ফিরোজ শাহ তুঘলকের এক পৌত্র নুসরাত খান (বিন ফাতহ খান)-কে ডেকে আনা হলো, যিনি মেওয়াতে ছিলেন। রবিউল আউয়াল ৭৯৭ হিজরিতে (ডিসেম্বর ১৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) তাকে সিংহাসনে বসানো হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে, শাহজাদা নামমাত্র শাসক থাকবেন, আর সালতানাতের সমস্ত কাজ সাআদাত খানের হাতে থাকবে। [১]

সাআদাত খান হত্যা। শাহজাদা নুসরাতের উত্থান:
কিন্তু এই ব্যবস্থা মাত্র কয়েক দিন চলল। কিছু কর্মকর্তা গোপনে শাহজাদা নুসরাত খানের সাথে আঁতাত করতে শুরু করল এবং পারস্পরিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাআদাত খানের কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হলো। সাআদাত খান ঠিক সময়ে তা জানতে পারলেন, কিন্তু তিনি কোনো প্রতিরোধ করতে পারলেন না। তিনি সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, যেখানে নায়েবে সালতানাত মুকাররাব খান তাকে আপাতদৃষ্টিতে অভ্যর্থনা জানালেন, কিন্তু কয়েক দিন পর তাকে হত্যা করিয়ে দিলেন। এভাবেই সাআদাত খানের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটল।

ওদিকে শাহজাদা নুসরাত খান ফিরোজাবাদে শাসন করতে লাগলেন। তিনিও নিজের উপাধি নাসিরুদ্দিন রাখলেন এবং গুজরাট থেকে আসা এক আমির মুহাম্মদ মুজাফফরকে তাতার খান উপাধি দিয়ে নিজের উজির বানিয়ে নিলেন, যিনি গুজরাটের শাসক জাফর খানের পুত্র ছিলেন। [২]

ফিরোজাবাদ ও দিল্লির মধ্যে তিন বছরের যুদ্ধ:
ওদিকে দিল্লিতে নায়েবে সালতানাত মুকাররাব খান মাল্লুকে ইকবাল খান উপাধি দিয়ে সিরি দুর্গ তার হাতে সোপর্দ করলেন।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৫৯; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৫।

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৫৯, ১৬০। দ্রষ্টব্য: গুজরাটে ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলেও জাফর খান নামক একজন শাসক শাসন করেছিলেন, কিন্তু এই জাফর খান আলাদা, যিনি পরবর্তীতে মুজাফফর শাহ আউয়াল উপাধি নিয়ে গুজরাটে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

করে দিল। এক জেলায় একই সময়ে দুই বাদশাহ মুখোমুখি হলেন যাদের মধ্যে প্রতিদিন যুদ্ধ হতে লাগল। তিন বছর ধরে মুসলমানদের মূল্যবান প্রাণ এর বলি হতে থাকল। কখনো দিল্লির বাহিনী ফিরোজাবাদকে পিছু হটিয়ে দিত, আবার কখনো ফিরোজাবাদের বাহিনী দিল্লির লোকদের ঠেলে 'জাহান পানাহ' এর প্রাচীর পর্যন্ত নিয়ে যেত।

ধীরে ধীরে শাহজাদা নুসরাত খানের বাহিনী দোয়াব, সোনিপত, পানিপথ, রোহতক এবং ঝাজ্জরসহ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় পঞ্চাশ মাইল এলাকা দখল করে নিল, যেখানে নাসিরুদ্দিন মাহমুদের কাছে কেবল 'জাহান পানাহ' এলাকাটি ছিল, অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুঘলকের নির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত সেই এলাকা যেখানে প্রাচীন দিল্লি, সিরি এবং তুঘলকাবাদ অবস্থিত ছিল। [১]

সারং খানের উত্থান:

৭৯৯ হিজরিতে (১৩৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) দিল্লির অনুগত আমির সারং এবং মুলতানের শাসক খিজির খানের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে সারং খান আক্রমণ করে মুলতান থেকে খিজির খানকে বিতাড়িত করেন এবং নিজেই মুলতানের শাসক হয়ে বসেন। এখন তার শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি ৭৯৯ হিজরির রমজান মাসে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সামানায় পৌঁছান এবং সেখানকার শাসক গালিব খানকে অপসারিত করতেও সফল হন। এভাবে সারং খান দিল্লি সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী সুবাদার হয়ে ওঠেন। [২]

সারং খানের পরাজয়:

কিন্তু এরপর তার পতন শুরু হয়। সামানা থেকে পালিয়ে যাওয়া গালিব খান শাহজাদা নুসরাত খানের এক অনুগত আমির তাতার খানের সাহায্য লাভ করেন এবং ৮০০ হিজরির মহররম মাসে (সেপ্টেম্বর ১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি 'কোহলা'র নিকটবর্তী যুদ্ধে সারং খানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মুলতানের দিকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। [৩]

ইকবাল মল্লুর উত্থান। শাহজাদা নুসরাতের শাসনের অবসান:

তৈমুরীয়দের বিপদ মাথার ওপর ছিল কিন্তু এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আমিররা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিলেন। এই লোভী আমিরদের মধ্যে দিল্লির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইকবাল খান মল্লু তখন উত্থানের শিখরে ছিলেন, যিনি চাতুর্য ও ধূর্ততার রাজনীতি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে বাদশাহকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও তার আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজেই সালতানাতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। ৮০০ হিজরির শাওয়াল মাসে (জুন ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি কপটভাবে শাহজাদা নুসরাত খানের কাছে ফিরোজাবাদে যান এবং আপাতদৃষ্টিতে তার অনুগত হয়ে যান। তিনি খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাজারে শাহজাদার কাছে অঙ্গীকার করেন যে তিনি তাকে পুরো দিল্লির শাসনক্ষমতা পাইয়ে দেবেন। এভাবে তিনি তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সৈন্য ও হাতিসহ 'জাহান পানাহ' এর ভেতরে নিয়ে আসেন। এখানে তিনি প্রতারণা করে শাহজাদার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর চেষ্টা করেন, যদিও শাহজাদা বেঁচে যান কিন্তু তার সমস্ত সাজসরঞ্জাম ও হাতি, যা বাহিনীর বড় শক্তি ছিল, ইকবাল মল্লুর হস্তগত হয়। শাহজাদা এতটাই আতঙ্কিত হলেন যে ফিরোজাবাদ পৌঁছে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬১; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫১৫ থেকে ৫১৭

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬২, ১৬৩

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬১

থামতে পারল না বরং নিজের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে ইকবাল মাল্লু ফিরোজাবাদ দখল করে নিল এবং তারপর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেই শাহজাদাকে তাড়া করল যে গঙ্গা নদীর ওপারে নিজের উজির তাতার খানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। এরপর ইকবাল মাল্লু ও তাতার খানের মধ্যে দুই মাস ধরে খণ্ডযুদ্ধের আকারে লড়াই চলতে থাকে। অনেক কষ্টে কিছু আমীর মধ্যস্থতা করে এই যুদ্ধ থামান এবং ইকবাল মাল্লু ফিরে দিল্লিতে চলে যায়। [১]

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ অসহায় - ইকবাল মাল্লুর ক্ষমতা:

দিল্লি ও তার আশেপাশে আবারও এককভাবে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের রাজত্ব কায়েম হলো, কিন্তু তার ক্ষমতা দিন দিন কমতে থাকল। কারণ ইকবাল খান মাল্লু নিজেকে একজন বিজয়ী মনে করে পুরো সালতানাতের শাসনভার নিজের হাতে নেওয়ার সংকল্প করে ফেলেছিল।

ইকবাল মাল্লু শুধু পরদেরই নয়, আপনজনদেরও দমন ও পিষ্ট করতে শুরু করেছিল। শীঘ্রই সে নায়েবে সালতানাত মুকাররব খানের হাভেলি (প্রাসাদ) ঘেরাও করল। তাকে প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হেফাজতে নিল এবং পরে হত্যা করে ফেলল।

আর সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের কথা বলতে গেলে, তিনি তার কাছে ছিলেন কোষাগারের চাবিকাঠির মতো, যাকে সে আগলে রাখতে এবং তার থেকে ফায়দা হাসিল করতে চেয়েছিল। [২]

ইকবাল মাল্লুর আক্রমণ - তাতার খানের গুজরাটে প্রত্যাবর্তন:

কয়েক দিনের প্রস্তুতির পর ৮০০ হিজরির জিলকদ মাসে ইকবাল মাল্লু তাতার খানের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করল, যে পানিপথে অবস্থান করছিল। তাতার খান এই খবর শুনে সমস্ত হাতি, ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং মূল্যবান আসবাবপত্র পানিপথের কেল্লায় রেখে নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লির দিকে রওনা হলো। মাল্লু যখন পানিপথে পৌঁছাল, তখন তাতার খান দিল্লি অবরোধ শুরু করে দিয়েছিল। মাল্লু তিন দিনের মধ্যে পানিপথ অবরোধ করে নিজের দখলে নিয়ে নিল, অন্যদিকে তাতার খান দিল্লির কোনো ক্ষতি করতে পারল না। যখন সে পানিপথের ওপর মাল্লুর দখলের খবর পেল, তখন সে হতাশ হয়ে পড়ল যে এখন তার কাছে আর কোনো নিরাপদ কেল্লা অবশিষ্ট নেই। তাই সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে গুজরাটে তার পিতার কাছে চলে গেল। [৩]

হিন্দুস্তানের শাসক, আমীর এবং রাজনীতিবিদরা এভাবে একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল, অথচ ভাগ্যের লেখক তাদের জন্য এমন ধ্বংস লিখে রেখেছিলেন যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। উত্তর-পূর্ব দিগন্তে এক প্রলয়ঙ্করী তুফান উদিত হচ্ছিল, কিন্তু হিন্দুস্তানের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বেখবর ও নিশ্চিন্ত হয়ে লোভ-লালসার দুনিয়ায় মত্ত ছিল।

আকাশ তার আস্তিনে বিজলি লুকিয়ে রেখেছে... বাগানের বুলবুলিরা যেন নীড়ে অসতর্ক হয়ে বসে না থাকে।
হে নির্বোধ! স্বদেশের চিন্তা করো, বিপদ আসন্ন... আসমানে তোমার ধ্বংসের পরামর্শ চলছে।
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৩, ১৬৪

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৪, ১৬৫

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৪, ১৬৫

তৈমুর লঙের হিন্দুস্তান আক্রমণ

উপমহাদেশের এই বিচ্ছিন্ন রাজনীতি এবং অরাজকতা মধ্য এশিয়া, ইরান ও খোরাসানের মোগল শাসক তৈমুর গুরগানকে (তৈমুর লঙ) এখানে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ সুযোগ করে দেয়। ফলে তিনি এখানে অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা শুরু করেন।

এই অভিযানের পরিকল্পনা কোনো স্থায়ী দখলের জন্য ছিল না, বরং দিল্লির সুলতানদের এবং তাদের নবাবদের কোষাগারে সংরক্ষিত সেই বিশাল ধন-সম্পদ ও গনিমত অর্জনের জন্য ছিল। তাই এই অভিযানে দ্রুততা বজায় রাখা, নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাওয়া এবং অনিবার্য পরিস্থিতি ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী অবরোধে সময় নষ্ট না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। [১]

তৈমুরের পরিকল্পনা:

তৈমুর তার আক্রমণের সময়সূচী (টাইম টেবিল) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। পরিকল্পনাটি এমন ছিল যে, ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের (৮০০ হিজরি) গ্রীষ্মকাল শেষ হওয়ার মধ্যে হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং পূর্ব আফগানিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করা হবে। এরপর হিন্দুস্তান অভিযান ৮০২ হিজরি (১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ) শীতের শুরুতে সম্পন্ন করে ফিরে আসা হবে, যাতে হিন্দুস্তানের সীমান্তে হালকা শীত অনুভূত হওয়ার সময় সেখান থেকে প্রস্থান করা যায় এবং বসন্তকাল শুরু হওয়ার সময় হিন্দুকুশের শীতল অঞ্চলে পৌঁছানো যায়।

শাহজাদা পীর মুহাম্মদের উচ আক্রমণ:

এই আক্রমণে অগ্রবর্তী দল হিসেবে তৈমুরের নাতি শাহজাদা পীর মুহাম্মদ (জাহাঙ্গীর মির্জার পুত্র) প্রথম পদক্ষেপ নেন। তিনি সিন্ধু নদ পার হয়ে ৭৯৯ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (ডিসেম্বর ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ) উচ আক্রমণ করেন। এখানে সারং খান (ইকবাল খান মল্লুর ভাই), যিনি আলী মালিকের নায়েব ছিলেন, এক মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। ইতিমধ্যে মুলতান থেকে তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে অবরুদ্ধদের সাহায্যের জন্য চার হাজার বাছাইকৃত অশ্বারোহী পাঠানো হয়। পীর মুহাম্মদ সময়মতো খবর পেয়ে যান। তিনি উচ-এর অবরোধ তুলে নিয়ে এই সাহায্যকারী বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হন এবং বিয়াস (শতদ্রু) নদীর তীরে তাজউদ্দীনের বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এতে অনেকে নিহত ও নদীতে ডুবে মারা যায়, আর তাজউদ্দীন বাকি অশ্বারোহীদের নিয়ে মুলতানের দিকে পালিয়ে যান। [২]

---

[১] তৈমুরের আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ আমরা তৈমুরি সালতানাতের সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বই থেকে পাই, যা নিচে দেওয়া হলো:
(ক) জাফরনামা, নিজামুদ্দিন শামী; প্রকাশক: ইন্তেশারাত-ই-বামদাদ, ইরান। (খ) জাফরনামা, শরফুদ্দিন আলী ইয়াজদি; প্রকাশক: ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, কলকাতা, ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ। এগুলোর মধ্যে নিজামুদ্দিন শামির জাফরনামা মূল ও প্রাচীন এবং ইয়াজদির জাফরনামা মূলত এর উপকরণের ওপর ভিত্তি করে রচিত।
[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৬২, ১৬৩।

শাহজাদা পীর মুহাম্মদ মুলতান ঘেরাও করলেন:

শাহজাদা পীর মুহাম্মদ তার বাহিনীসহ পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে মুলতানে এসে পৌঁছান এবং সারং খানকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শহরটি অবরোধ করেন। অবরোধ গ্রীষ্মের ছয় মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সারং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে অবরুদ্ধ যুদ্ধ চালিয়ে যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো পথ বাকি ছিল না। ১৯ রমজান ৮০০ হিজরিতে মুলতান তৈমুরি বাহিনীর দখলে চলে আসে। সারং-এর সৈন্যদের বন্দী করা হয়। [১]

শাহজাদা পীর মুহাম্মদ দিপালপুরও দখল করে নেন এবং বিভিন্ন স্থানে তার অফিসারদের নিযুক্ত করেন। সে অনুযায়ী দিপালপুরে মুসাফির কাবলি নামক একজন অফিসারকে এক হাজার মুঘল সৈন্যসহ নিযুক্ত করা হয়। [২]

তবে পীর মুহাম্মদ পাঞ্জাবের চেয়ে সামনে এগোতে পারেননি কারণ মুলতান বিজয়ের পরপরই শুরু হওয়া বর্ষা এবং কঠোর আবহাওয়ার কারণে তার বাহিনীর প্রায় সব ঘোড়া মারা গিয়েছিল। [৩]

শাহজাদা এই পরিস্থিতিতে এতটাই সংকটে পড়েন যে শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে মুলতানেই কেল্লাবন্দী হয়ে বসে থাকেন। যেহেতু স্থানীয় লোকজন মুঘল বাহিনীর ওপর অতিষ্ঠ ছিল, তাই তারা সুযোগ বুঝে মাঝেমধ্যে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত হামলা চালাতে শুরু করে। শাহজাদার বাহিনী থেকে যা হাতে পেত, তা-ই তারা লুটে নিয়ে যেত। [৪]

তৈমুরি বাহিনীর যাত্রা—আফগানিস্তানে ধ্বংসযজ্ঞ:

পরিস্থিতি এমন ছিল যে যদি দিল্লির শাসকরা অন্যান্য ঝামেলা থেকে অবসর পেতেন অথবা পাঞ্জাবের কয়েকজন স্থানীয় সর্দার ঐক্যবদ্ধ হতেন, তবে তারা মুঘলদের তাড়িয়ে দিতে পারতেন। তবে পীর মুহাম্মদের সৌভাগ্য ছিল যে এই সমস্ত তথ্য তার দাদা তৈমুরের কাছে নিয়মিত পৌঁছাচ্ছিল, যিনি হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এটি ৮০০ হিজরির মাঝামাঝি (বসন্ত ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) সময়ের কথা যখন তৈমুর তার বাহিনী একত্রিত করে দক্ষিণ দিকে রওনা হচ্ছিলেন। আফগানিস্তান অতিক্রম করার সময় তিনি কিছু স্থানে গণহত্যা চালিয়ে মানুষের মনে এমন ত্রাস সৃষ্টি করেন যে তার পথে আর কোনো প্রতিরোধ হয়নি। যেহেতু তৈমুরের লক্ষ্য ছিল স্বল্পতম সময়ে দিল্লি পৌঁছে সেখানে বড় আকারে লুটতরাজ করা, তাই তিনি বড় শহরগুলো এড়িয়ে একটি সতর্ক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এত বড় বাহিনীর খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার বাহিনী ছোট ছোট শহর ও গ্রামগুলো লুট করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। [৫]

---

[১] (তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৩; জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: পৃ. ৫৯, ৬০) মোল্লা আব্দুল কাদির বদায়ুনীর বর্ণনা অনুযায়ী সারং খানের এই বন্দী সৈন্যরা তৈমুরের আগমন পর্যন্ত বন্দী ছিল। যখন তৈমুর পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন, তখন তার আদেশে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। (মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ৩১০)

[২] জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: পৃ. ৬৩, ৬৪

[৩] জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: পৃ. ৬০

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৫২০

[৫] জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: পৃ. ১৯ থেকে ২৫

ইয়াজদির বর্ণিত আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ:

- তৈমুর মূর্তিপূজকদের পথ ধরে সিন্ধু নদ পর্যন্ত পৌঁছান যেখানে ত্রিপদী স্ট্যান্ড, নৌকা এবং নলখাগড়ার সাহায্যে নৌকার একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল যা ১২ মহরম ৮০১ হিজরি (২১ সেপ্টেম্বর ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে অতিক্রম করা হয়েছিল।

- সিন্ধু নদ অতিক্রম করে সেনাবাহিনী চাউল জালালি নামক একটি অনুর্বর এলাকা দিয়ে অতিক্রম করে। ইয়াজদি বলেন যে, এই স্থানটিকে চাউল জালালি এই কারণে বলা হয় যে সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ চেঙ্গিস খানের হাত থেকে বাঁচতে সিন্ধু নদ অতিক্রম করে এখানে অবস্থান করেছিলেন। [১]

- এরপর কোহে জুদি (লবণ পর্বতমালা)-র চৌধুরী এবং প্রধানরা তৈমুরকে তাদের ভূখণ্ড অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিলেন এবং নিজেদেরকে তার জুলুম থেকে রক্ষা করেছিলেন।

- ঝিলাম নদীর একটি দ্বীপের কেল্লাদার শাহাবুদ্দিন মুবারক শাহ, যিনি কিছুকাল আগে শাহজাদা পীর মুহাম্মদের অনুগত হয়েছিলেন, বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ শুরু করেছিলেন, তাই মুঘলরা তার কেল্লা জয় করার চেষ্টা করে। কেল্লাদার অতর্কিত নৈশ হামলা চালিয়ে মুঘলদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে নিজের নৌকায় করে উচের দিকে চলে যান, তবে মুলতানের কাছে শাহজাদা পীর মুহাম্মদের সেনাবাহিনী সেই নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেয়। মুবারক শাহ পালিয়ে যান। [২]

- ঝিলাম নদীর তীর ধরে চলে তৈমুর ২৪ মহরম চেনাব ও ঝিলামের সঙ্গমস্থলে পৌঁছান। এখানকার একটি কেল্লার সামনে নৌকার সেতু তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয় যা ২৭ মহরম ৮০১ হিজরি (৭ অক্টোবর ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে সম্পন্ন হয়। [৩]

তুলম্বায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং ধ্বংসযজ্ঞ:

১ সফর (১৩ অক্টোবর) তৈমুর মুলতান থেকে ৩৫ ক্রোশ (১১২ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত তুলম্বা শহরে পৌঁছান। এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ নম্বরদার, বিত্তবান এবং ধর্মীয় নেতারা তার সাথে দেখা করতে আসেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন হিসেবে দুই লক্ষ টাকা পেশ করেন যা তৈমুর গ্রহণ করেন কিন্তু (পরে তার অনুমতিতে) সৈন্যরা শহরে লুটতরাজ চালায় এবং অনেক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, মানুষকে বন্দীও করে এবং যা কিছু তারা পেয়েছে তা নিয়ে যায়। অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নেতা ছাড়া কেউ এই আজাব থেকে বাঁচতে পারেনি। নিহত হিন্দুদের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে দুই হাজার। [৪]

নুসরাত খোখরের আক্রমণ। শাহনওয়াজে শস্য ভস্মীভূতকরণ:

৭ সফর (২০ অক্টোবর) তৈমুর তুলম্বা থেকে রওনা হয়ে পরের দিন বিয়াস নদীর তীরে “জাল” নামক গ্রামে পৌঁছান।

---

[১] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৭৭; জাফরনামা ইয়াজদি: পৃ. ৪৭

[২] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৭৭, ১৮০; জাফরনামা ইয়াজদি: পৃ. ৪৮ থেকে ৫৩

[৩] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৮১, ১৯০; জাফরনামা ইয়াজদি: পৃ. ৫৩

[৪] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৯১; জাফরনামা ইয়াজদি: পৃ. ৫৩ থেকে ৫৬

তারিখে মিল্লাতে ইসলামিয়া

এখানে লাহোরের শাসক নুসরাত খোখর (শাইখা খোখরের ভাই) দুই হাজার লোক নিয়ে তৈমুরী বাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত হন। নুসরাত খোখর এই যুদ্ধের পর এমনভাবে নিখোঁজ হন যে, কেউ আর তাঁর কোনো খবর পায়নি। (সম্ভবত তিনি নিহত হয়েছিলেন।)

এখন বাহিনী শাহ নেওয়াজ জনপদের কাছে তাবু ফেলল। এটি ছিল অনেক বড় একটি জনপদ, যার অধিবাসীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এখানে শস্যের এত বিশাল ভাণ্ডার ছিল যে, তৈমুরী বাহিনী তাদের বিশাল সংখ্যা সত্ত্বেও তা সাথে নিয়ে যেতে অক্ষম ছিল। বাহিনী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শস্য তুলে নিল এবং তৈমুর অবশিষ্ট ভাণ্ডার পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। [১]

দাদা ও নাতি একত্রিত হলেন:

এরপর বাহিনী নদীর তীরে "জঞ্জান জনপদ"-এর বিপরীতে পৌঁছাল। শাহজাদা পীর মুহাম্মদ, যিনি মুলতান জয় করেছিলেন, ১৪ সফর (২৭ অক্টোবর) এখানে এসে দাদার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মূল্যবান উপহার পেশ করেন। মুলতানের যুদ্ধে তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ ঘোড়া মারা গিয়েছিল। তৈমুর তাঁকে ত্রিশ হাজার ঘোড়া দান করেন। এখান থেকেই নদী পার হয়ে বাহিনী জঞ্জান জনপদে অবস্থান নিল।

এরপর বাহিনী সাহিওয়াল (সাহিওয়াল), আসওয়ান এবং জাহওয়াল অতিক্রম করল। এখান থেকে তৈমুর মূল বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা পূর্ব দিকে দিপালপুর হয়ে "সামানা" পৌঁছায় এবং ভবিষ্যতে সেখানেই সাক্ষাৎ হবে। এরপর তিনি প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাজার পাকপত্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। [২]

দিপালপুর ও পাকপত্তনের অবস্থা। তৈমুরের দ্রুতগতি:

যখন মূল তৈমুরী বাহিনী দিপালপুর পৌঁছাল, তখন শহরটি জনশূন্য ছিল। স্থানীয় লোকেরা কয়েক দিন আগে শাহজাদা পীর মুহাম্মদের নিযুক্ত মোগল অফিসার মুসাফির কাবলিকে তাঁর এক হাজার সৈন্যসহ হত্যা করেছিল এবং "ভাটনির" দুর্গের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল।

এদিকে তৈমুর এক রাতের সফরের পর পাকপত্তন (অজোধন) শেখ ফরিদ গঞ্জ-এ-শকর রহ.-এর মাজার জিয়ারতের জন্য পৌঁছালে সেই শহরটিও জনশূন্য দেখতে পান। মাজার ও খানকাহর সাজ্জাদানশীনসহ সকলেই পালিয়ে গিয়ে "ভাটনির" দুর্গে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন।

তৈমুর শেখ ফরিদের মাজারে দোয়া করলেন এবং এরপর এখান থেকে শতদ্রু (সুতলেজ) নদীর (একটি শাখা) পার হলেন। এরপর তিনি জোহরের নামাজ পড়ে এত দ্রুত "ভাটনির"-এর দিকে রওনা হলেন যে, পঞ্চাশ কোশ (প্রায় সোয়া একশ বা দেড়শ কিলোমিটার) দূরত্ব কোনো বিরতি ছাড়াই পরবর্তী সকালের মধ্যে অতিক্রম করলেন এবং এভাবে ২৬ সফর চাশতের সময় "ভাটনির" দুর্গে পৌঁছে গেলেন। [৩]

---

[১] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৭৯, ১৮০; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ৫৬ থেকে ৫৯। ফেরেশতা লিখেছেন যে, শাহ নেওয়াজ জনপদকে এই কারণে লুণ্ঠন করা হয়েছিল যে, শাহজাদা পীর মুহাম্মদ যখন এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এখানকার লোকেরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেনি। (তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫১৯)
[২] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৮০, ১৮১; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ৫৯ থেকে ৬৩।
স্থানের ব্যাখ্যা: ভাটনির থেকে সাহিওয়াল পর্যন্ত সফরে নিম্নোক্ত স্থানগুলো এখন আর অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না: জাল, শাহ নেওয়াজ, জঞ্জান, আসওয়ান, জাহওয়াল। তবে বাহিনীর অগ্রযাত্রার পথ বিবেচনা করলে এই এলাকাগুলো কাসুওয়াল, চিচাওয়াতনি, দাদ ফতিয়ানা এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের আশেপাশেই হবে।
দ্রষ্টব্য: এখানে সম্ভবত বিয়াস বলতে শতদ্রু (সুতলেজ) নদী বোঝানো হয়েছে, কারণ ঐতিহাসিকগণ মাঝে মাঝে শতদ্রুকে বিয়াস নামে অভিহিত করতেন। যদিও শতদ্রু নদী চিচাওয়াতনি থেকে সাহিওয়াল রুট থেকে দূরে অবস্থিত, তবে হতে পারে যে সেই সময় এর ধারাটি কাছ দিয়েই প্রবাহিত হতো। আল্লাহই ভালো জানেন।
[৩] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৮১, ১৮২; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ৬৩ থেকে ৬৮।

ভাটনের অবরোধ:

এই বিশাল, প্রশস্ত ও মজবুত দুর্গটি রাজস্থানের মরুভূমিতে অবস্থিত ছিল। এর শাসক ছিলেন রায় দুল চাঁদ হিন্দু, আর তার ভাই ছিলেন একজন মুসলিম, যার নাম ছিল কামাল উদ্দিন। তারা উভয়েই এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন কারণ তৈমুরের সাথে যুদ্ধ করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। ফলে তারা সেই হাজার হাজার মুসলমান ও হিন্দুদের রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন না যারা তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।

যাই হোক, তারা প্রথমে শহর থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যখন কোনো ফল হলো না, তখন তারা দুর্গের ভেতরে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। তৈমুর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ শহরটি জয় করে নিলেন। দুর্গের বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা এক বিশাল জনতাকে নির্বিচারে হত্যা করা হলো। এরপর তৈমুর দুর্গে আক্রমণ করলেন এবং এর প্রাচীরে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন।

অবশেষে রায় দুল চাঁদ কয়েক দিন প্রতিরোধের পর তৈমুরের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। তিনি শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর খানকাহর সাজ্জাদানশীন শেখ সাদউদ্দিন অজুধানী (রহ.)-এর সাথে বাইরে এসে মূল্যবান উপহার পেশ করে নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন।

তৈমুর দিপালপুরের আশ্রয়প্রার্থীদের এই বলে ক্ষমা করেননি যে, তারা মুঘল শাসক মুসাফির কাবুলি এবং তার সঙ্গীদের হত্যা করেছিল। ফলে পাঁচশ আশ্রয়প্রার্থীকে হত্যা করা হলো এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করা হলো। অজুধনের আশ্রয়প্রার্থীদেরও সাধারণ ক্ষমা করা হয়নি। কাউকে হত্যা করা হলো, কাউকে বন্দী করা হলো এবং তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র সব লুট করে নেওয়া হলো।

এই অবস্থা দেখে ২৯ সফর দুল চাঁদের ভাই কামাল উদ্দিন হঠাৎ দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলো। কিন্তু দুর্গের ওপর তীব্র আক্রমণ এবং সুড়ঙ্গ তৈরির দ্রুততা দেখে একদিনের মধ্যেই তার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল এবং তিনি দুর্গের চাবিগুলো হস্তান্তর করলেন। এখন তৈমুর তার কিছু কর্মকর্তাকে দুর্গের অধিবাসীদের কাছ থেকে ভারী জরিমানা আদায় করার নির্দেশ দিলেন, যা হিন্দু সর্দার এবং মুসলিম চৌধুরীগণের সামর্থ্যের বাইরে ছিল। যখন তারা এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারলেন না, তখন তৈমুর দুর্গে সাধারণ হত্যার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা যখন বুঝতে পারল যে এখন মৃত্যু অবধারিত, তখন তারা মাথায় কাফন বেঁধে নিল। হিন্দুরা তাদের নারী, শিশু এবং ধন-সম্পদ আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেলল। মুসলমানরা মঙ্গোলদের বন্দিত্ব থেকে বাঁচাতে নিজেদের নারী ও শিশুদের শিরশ্ছেদ করল। চারদিকে এক কিয়ামত নেমে এল। দুর্গের অধিবাসীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেল। প্রায় দশ হাজার হিন্দু এবং অসংখ্য মুসলমান নিহত হলো। এরপর শহর ও দুর্গের প্রায় সমস্ত ভবন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হলো বা ধ্বংস করে দেওয়া হলো। [১]

ভাটনের দুর্গ ভারতের রাজস্থান প্রদেশের হনুমানগড় জেলায় ঘাগর নদীর তীরে অবস্থিত এবং ইতিহাসে একে মুলতান থেকে দিল্লির প্রাচীন পথে অবস্থিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি 'ভাট্টি রাজপুতদের কেন্দ্র ছিল'। ১৮০৫ সালে বিকানেরের শাসক রাজা সুরত সিং একে হনুমানগড় নাম দেন। ফেরেশতা লিখেছেন যে, তৈমুর ভাটনের জয় করা এজন্য জরুরি মনে করেছিলেন কারণ শাহজাদা পীর মুহাম্মদ পাঞ্জাবে ছিলেন এবং ভাটনের শাসকের পক্ষ থেকে তার কাছে অভিযোগ পৌঁছেছিল। (তারিখ-এ-ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২০) অর্থাৎ তিনি আনুগত্য ও সহযোগিতা থেকে বিরত ছিলেন।

[১] জাফরনামা-এ-শামী: পৃষ্ঠা ১৮২ থেকে ১৮৪; জাফরনামা-এ-ইয়াজদি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৮ থেকে ৭৭।

রাজস্থান থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত:

- ৩ রবিউল আউয়াল তৈমুর সরস্তি (সরসা) পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখানকার পশুপালক, শূকর পালনকারী কাফের এবং অন্যান্য কৃষি পেশার মানুষ তাদের জনপদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাদের ধাওয়া করা হয়েছিল এবং তাদের হত্যা করা হয়েছিল। এখানকার কাঁচা কেল্লায় অবরুদ্ধ লোকদের পরাজিত করে লুণ্ঠন ও হত্যা করা হয়েছিল এবং কেল্লাটিকে মাটির স্তূপে পরিণত করা হয়েছিল।

- ভয় ও আতঙ্কিত এই খবর শুনে ফতেহাবাদ, সামানা এবং কাইথালের বাসিন্দারা নিজেদের ঘরে নিজেরাই আগুন ধরিয়ে দিয়ে দিল্লির দিকে পালাতে শুরু করে। লশকর জায়গায় জায়গায় তাদের ধাওয়া করে এবং যারা হাতে ধরা পড়েছিল, তাদের লুণ্ঠন করতে, হত্যা করতে বা বন্দী করতে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

- ৬ রবিউল আউয়াল লশকর ফতেহাবাদ পৌঁছালে সেখানে কোনো মানুষ বা মানুষের চিহ্ন ছিল না।

- ৭ রবিউল আউয়াল লশকর "আহরুনি" পৌঁছে গেল। এখানে তৈমুরি তলোয়ারের আঘাতে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। শস্যের সমস্ত গুদাম লুণ্ঠন করা হয় এবং ভবনগুলোকে তছনছ করে দেওয়া হয়।

- এর আগে জাটদের এলাকা শুরু হয়েছিল যাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের প্রায় দুই হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। নারী ও শিশুদের বন্দী করা হয় এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র এবং অসংখ্য গবাদি পশুও লুণ্ঠন করা হয়।

- ১০ রবিউল আউয়াল ৮০১ হিজরি (২১ নভেম্বর ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ) লশকর ঘাগরা নদীর কাছে অবস্থিত শহর "সামানা"-তে পৌঁছায়। পাঁচ দিন পর তৈমুরের মূল লশকর যা দিপালপুর হয়ে আসছিল, এখানেই তার সাথে মিলিত হয়।

- ১৯ রবিউল আউয়াল (১ ডিসেম্বর) লশকর কাইথাল পৌঁছে গিয়েছিল।

- ২২ তারিখে "কেল্লা আসওয়ান্দি"-তে অবস্থান করা হয়।

- ২৩ রবিউল আউয়াল লশকর তুঘলকপুর পৌঁছে গেল। সামানা থেকে এখানে পর্যন্ত সমস্ত শহর সৈন্য বা নাগরিকদের থেকে একদম খালি ছিল, তাই লশকর কোনো বাধা ছাড়াই এগিয়ে যেতে থাকে।

- ২৪ তারিখে লশকর পানিপথ পৌঁছায় যেখানে লোকেরা শস্যের অসংখ্য ভাণ্ডার ফেলে গিয়েছিল যা লশকরের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। [১]

দিল্লির কাছে:

ডিসেম্বরের শীত শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং এখন লশকরের দিল্লির সাথে সংঘর্ষের আশঙ্কাও ছিল। তাই লশকরীরা গরম পোশাক পরে নেয় এবং পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যায়। ২৭ রবিউল আউয়াল লশকর ফিরোজাবাদের সেই পাহাড়ের কাছে পৌঁছে যায় যার ওপর ফিরোজ শাহ তুঘলকের নির্মিত প্রাসাদ "জাহান নুমা" অবস্থিত ছিল। যমুনা নদীর একটি খালও এই পাহাড় পর্যন্ত আনা হয়েছিল। দিল্লি শহর এই প্রাসাদ থেকে ছয় মাইল দূরে সামনে দেখা যেত। মুঘল লশকর ফিরোজাবাদের আশেপাশের ছোট ছোট জনপদগুলোকে হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে খালি করে ফেলে। [২]

---

[১] জাফর নামা শামি: পৃ. ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬; জাফর নামা ইয়াজদি: খণ্ড ২, পৃ. ৭৭ থেকে ৮৫

[২] জাফর নামা শামি: পৃ. ১৮৬; জাফর নামা ইয়াজদি: পৃ. ৮৫, ৮৬

যমুনার ওপারে, লোনি দুর্গের ধ্বংস:

দিল্লি যমুনার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল, কিন্তু তৈমুর প্রয়োজন মনে করলেন যে, নদীর ওপারে কাছেই অবস্থিত শক্তিশালী দুর্গগুলো আগে জয় করে নেওয়া উচিত, যাতে সেগুলো যুদ্ধে শহরের পশ্চাৎভাগকে শক্তিশালী করতে না পারে অথবা একটি নিরাপদ পলায়নস্থল ও আশ্রয়স্থলে পরিণত না হয়। ফলে ২৯ রবিউল আউয়াল তৈমুর যমুনা নদী পার হয়ে দোয়াবে প্রবেশ করেন, যেখানে ঘোড়াগুলোর জন্য বিশাল চারণভূমিও পাওয়া গিয়েছিল এবং "লোনি"-র পাথুরে দুর্গ সামনে দেখা যাচ্ছিল। এখানকার দুর্গাধিপতি, যিনি ইকবাল খান মল্লুর প্রতিনিধি ছিলেন, মোকাবিলায় অটল রইলেন। অবশেষে তার প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো এবং ৩০ রবিউল আউয়াল দুর্গটি জয় করা হলো। তৈমুর এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা করালেন। হিন্দু জনবসতিকে গণহারে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হলো, অন্যদিকে মুসলমানদের প্রতি, বিশেষ করে উলামা ও সাদাতদের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের প্রাণভিক্ষা দেওয়া হলো। তবে দুর্গ এবং সমস্ত ইমারত ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হলো। [১]

তৈমুর ফিরোজাবাদে:

১ রবিউস সানি তৈমুর যমুনা নদীর পূর্ব তীরে দিল্লির দক্ষিণ দিকে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ফিরোজ শাহ তুঘলকের নির্মিত শহর ফিরোজাবাদের কসরে জাহান-নুমা-র বিপরীতে এসে শহর আক্রমণের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্যের বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করা হলো। ওই দিনই কিছু আমিরকে লশকরসহ দিল্লির দক্ষিণে লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [২]

ইকবাল খান মল্লুর আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ:

পরের দিন তৈমুর তার সাতশ বর্মধারী দেহরক্ষীসহ যমুনা নদী পার হয়ে পশ্চিম তীরে ফিরে এলেন এবং কসরে জাহান-নুমা-তে অবস্থান করে শহর আক্রমণের জন্য উপযুক্ত স্থান দেখা এবং যুদ্ধের নকশা তৈরিতে ব্যস্ত রইলেন। এমন সময় দিল্লির সেনাপতি মল্লু ইকবাল খান অসতর্ক সাহস প্রদর্শন করলেন এবং চার হাজার অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার পদাতিক ও সাতাশটি হাতি নিয়ে দিল্লির ঘন গাছপালার আড়াল থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এবং মুঘলদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তৈমুরের শিবিরে থাকা বন্দিরা দিল্লির বাহিনীর আক্রমণের কথা শুনে খুশিতে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু এই খুশি ছিল মাত্র কয়েক মুহূর্তের। মুঘলদের পাল্টা আক্রমণ দিল্লির বাহিনীকে খুব দ্রুত পিছু হটতে বাধ্য করল। [৩]

বন্দিদের গণহত্যা:

দিল্লির বাহিনীর আক্রমণের সময় বন্দিদের আনন্দধ্বনি তৈমুরকে অগ্নিশর্মা করে তুলেছিল। ফলে পরের দিন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, সমস্ত অমুসলিম বন্দিকে জবাই করে হত্যা করা হোক। মুঘল লশকরের সমস্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করা হলো যেন তারা এই কাজে অংশ নেয়। যে এমনটি করবে না, সে নিজেই মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হবে এবং তার এই আদেশ অমান্য করার সংবাদ যে দেবে, সে পুরস্কার হিসেবে অপরাধীর নারীদের,

---

[১] জাফরনামা শামি: পৃ. ১৮৬; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ৮৬-৮৮

[২] জাফরনামা শামি: পৃ. ১৮৭; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ৮৮

[৩] জাফরনামা শামি: পৃ. ১৮৭, ১৮৮; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ৮৮, ৮৯, ৯০

শিশুদের এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রের মালিক মনে করা হবে।

সেই সময় সিন্ধু নদ থেকে দিল্লি পর্যন্ত অভিযানের সময় বন্দি করা হিন্দুদের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে এক লক্ষ। তৈমুরের আদেশে এদের সবাইকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই জবাই করে দেওয়া হয়। নাসিরুদ্দিন নামক একজন আলেম জীবনে কখনো একটি ছাগলও জবাই করেননি, কিন্তু এই আদেশের কারণে বাধ্য হয়ে সেদিন পনেরো জন বন্দিকে জবাই করেন। [১]

মোল্লা বদায়ুনীর মতে, মুসলিম বন্দিরাও এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল। তিনি লেখেন:

"তৈমুরের লস্করে কিছু লোক আলেমদের বেশ ধারণ করে বড় বড় পাগড়ি বেঁধে সাথে ছিল। তারা মুসলিম বন্দিদেরও হিন্দুদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে জিহাদের নিয়তে সেই অসহায়দের হত্যা করে দেয়।" [২]

দিল্লির সামনে চূড়ান্ত যুদ্ধ:

পাঁচই রবিউস সানি (১৫ ডিসেম্বর) তৈমুর যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন। লস্কর রক্ষার জন্য মাটির বাঁধ ও পরিখার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল এবং এখন সেনাবাহিনী সব ধরণের আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত ছিল। ফলে সেনাবাহিনী সব দিক থেকে সুসজ্জিত হয়ে দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়। শাহজাদা পীর মুহাম্মদ, আমির সুলাইমান শাহ, শাহজাদা খলিল, আমির জাহান শাহ এবং আমিরজাদা সুলতান হোসেন লস্করের পৃথক পৃথক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অপর দিক থেকে দিল্লির সেনাবাহিনীও সামনে চলে এসেছিল, যার মূল বাহিনীর দলগুলো সুলতান মাহমুদ নাসিরুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইকবাল খান মল্লুর কমান্ডে ছিল। ডান দিকের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল তগী খান এবং বাম দিকের নেতৃত্বে ছিল মীর আলী। এই বাহিনীতে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। [৩]

দিল্লির এই সেনাবাহিনী এত বড় বিজয়ীর মোকাবিলা করার যোগ্য ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ছিল ইকবাল খান মল্লুর। একশটি হাতিও তার সাথে ছিল। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। দিল্লির সেনাবাহিনী অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও পূর্ণ শক্তিতে লড়াই চালিয়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তৈমুরি বাহিনীর আধিক্য ও উদ্দীপনার সামনে দিল্লির বাহিনীকে পিছু হটে প্রাচীরের পেছনে অবরুদ্ধ হতে হয়। সেই রাতেই সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তার পরিবার-পরিজন নিয়ে গুজরাটের দিকে চলে যান। অন্যদিকে ইকবাল খান মল্লু পালিয়ে বুলন্দশহর পৌঁছে যান, যা যমুনা নদীর পূর্ব তীরে দিল্লি থেকে ৪৩ মাইল (৭০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। [৪]

দিল্লি অবরোধ - প্রাণভিক্ষার ঘোষণা:

তৈমুরি বাহিনী অগ্রসর হয়ে বিশাল প্রাচীর 'জাহানপনাহ'কে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে, যা দিল্লির তিনটি শহর: প্রাচীন দিল্লি,

---

[১] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৮৮; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ৯০ থেকে ৯৩।

[২] (মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃ. ৩১০) মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই হত্যাকাণ্ডে যেসব অমুসলিমদের হত্যা করা হয়েছিল, তাদের অধিকাংশ ছিল ভারতের জিম্মি নাগরিক, যাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল মুসলিম সরকারের ওপর। তাদের মধ্যে যোদ্ধা হয়তো মাত্র কয়েকশ বা বড়জোর কয়েক হাজার ছিল। বাকিরা ছিল সাধারণ মানুষ যাদের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও ক্ষেতখামার থেকে ধরা হয়েছিল। হত্যা করা তো দূরের কথা, তাদের বন্দি করাও ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী বৈধ ছিল না।

[৩] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৮৯, ১৯০; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ৯৬ থেকে ১০০।

[৪] জাফরনামা শামী: পৃ. ১৯০, ১৯২; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ১০০ থেকে ১১২।

সীরি এবং তুঘলকাবাদকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তৈমুরের নির্দেশ ছিল যে কোনো ব্যক্তি যেন শহর থেকে পালাতে না পারে।

৮ রবিউস সানি ৮০১ হিজরি বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) তৈমুর অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে দিল্লির জাহানপনাহ প্রাচীরের বাইরে 'হৌজ খাস'-এর পাশে ঈদগাহে তাবু স্থাপন করেন। তার ভয়ে আতঙ্কিত দিল্লির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আনুগত্য প্রকাশের জন্য এখানে উপস্থিত হন। তৈমুর শহরবাসীর প্রাণভিক্ষার বিনিময়ে নিজের নামে খুতবা জারি এবং মুক্তিপণ (যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ) দাবি করেন। এই ব্যক্তিবর্গ তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। [১]

তবে তৈমুর দিল্লির বাসিন্দাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেও মনে মনে এই ব্যতিক্রম রেখেছিলেন যে, তার মোকাবিলা করতে আসা দিল্লির সৈন্যদের প্রাণভিক্ষা দেওয়া হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল তৈমুরের একটি প্রতারণা যাতে শান্তির আড়ালে অভিযানের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ দিল্লির পূর্ণ লুণ্ঠনের অজুহাত হাতে থাকে।

শান্তি ও শৃঙ্খলার সাময়িক বিরতি। খিজির খানের আগমন:

কয়েকদিন দিল্লিতে আতঙ্ক থাকা সত্ত্বেও শান্তি বজায় ছিল। দিল্লিকে নিজের সৈন্যদের হাতে সোপর্দ করে তৈমুর ফিরোজাবাদে গিয়ে অবস্থান করেন। এই সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলের আমিররা উপস্থিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকেন। মেওয়াতের যোদ্ধা সর্দার বাহাদুর নাহর দুটি সাদা তোতা এবং কিছু দুর্লভ উপহার নিয়ে উপস্থিত হন। আমির তৈমুর তার ওপর অনুগ্রহ করেন এবং তাকে নিজের অধীনে গ্রহণ করেন।

মুলতানের প্রাক্তন শাসক খিজির খানও (যিনি সারং খানের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন) মেওয়াত-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনিও সুযোগ বুঝে জিরক খান এবং মুবারক খান প্রমুখ কয়েকজন সর্দারসহ তৈমুরি দরবারে হাজিরা দেন। তৈমুর বাকি সবাইকে বন্দি করেন, তবে খিজির খানকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিদায় দেন। [২]

দিল্লিতে কেয়ামত:

১৬ রবিউস সানি (২৬ ডিসেম্বর) এর এক শীতের সকালে দিল্লিতে হঠাৎ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। কোনো একটি বিষয়ে তৈমুরি সৈন্য এবং শহরের কিছু মানুষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় যা ঝগড়ার রূপ নেয় এবং তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে যায়। নাগরিকদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন মোগল সৈন্যও নিহত হয়। তৈমুর এটি শুনে ঘোষণা করেন যে, উলামা, মাশায়েখ এবং সাদাত ব্যতীত সবার জান ও মাল বৈধ। এরপর তৈমুরি সৈন্যরা লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞের বাজার গরম করে তোলে। শহরের অলিগলিতে লাশের স্তূপ জমে যায়। তৈমুরি সৈন্যরা দোকান, ঘরবাড়ি এবং হাভেলিতে ঢুকে পড়ে এবং সবকিছু লুটে নেয়। লুণ্ঠিত ধন-সম্পদের আন্দাজ করা কঠিন ছিল। আসবাবপত্র, সোনা-রুপার স্তূপ এবং বিভিন্ন প্রকারের হীরা-জহরত মোগল সৈন্যদের হস্তগত হয়। [৩]

এখনও মানুষ রাজকীয় ক্ষমতার হীন শিকার
কেয়ামত এই যে, মানুষই স্বজাতির শিকারি

---

[১] জাফরনামা শামি: পৃ. ১৯১, ১৯২; জাফরনামা ইয়াযদি: পৃ. ১১৬ থেকে ১১৮

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫২৬

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫২৫, ৫২৬; মানাম তৈমুর জাহান কুশা: পৃ. ৩৩২ থেকে ৩৩৯; জাফরনামা শামি: পৃ. ১৯২, ১৯৩; ইকবাল

তৈমুরের দরবারী ঐতিহাসিক ইয়াজদীর বর্ণনা:

এটা স্পষ্ট যে তৈমুরের আসল উদ্দেশ্যই ছিল দিল্লি লুণ্ঠন করা, কিন্তু যেহেতু শহরবাসীর সাথে একটি চুক্তি হয়েছিল, তাই একে নস্যাৎ করার জন্য এমন এক খেলা খেলা হয়েছিল যাতে গণহত্যার দায়ও নিহতদের ওপরই আসে এবং তৈমুর নির্দোষ সাব্যস্ত হন।

সে অনুযায়ী নিজাম শামী এবং ইয়াজদী, যারা তৈমুরের নৃশংসতাকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এই ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন:

"বৃহস্পতিবার ১৬ই রবিউস সানি (দিল্লির) সৈন্যদের একটি দল দিল্লির ফটকে সমবেত হয় এবং নাগরিকদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। বড় বড় আমিরদের এটি থামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু ভাগ্য শহর এবং এর বাসিন্দাদের ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, তাই এর ধ্বংসের সমস্ত উপায় তৈরি হয়ে গেল। রাজকীয় মহিলারা 'কাসরে হাজার সুতুন' দেখতে এসেছিলেন যা মালিক জুনা সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক জাহানপনাহে নির্মাণ করেছিলেন। বড় বড় আমির, অর্থ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা দরজায় বসে জামানতের সংগৃহীত অর্থ নথিভুক্ত করছিলেন। সেই সময় প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী, যাদের চিনি ও শস্য দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, শহরে প্রবেশ করে। এই আমিরদের প্রত্যেকেই স্থানীয় লোকদের বিভিন্ন দল যারা বিদ্রোহী হয়েছিল এবং শহরের ভেতরে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের ধরতে শুরু করে এবং এই কারণেই তারা শহরের অভ্যন্তরীণ এলাকায় ঢুকে পড়ে।"

যখন মোগল সৈন্যদের একটি বড় সংখ্যা শহরে প্রবেশ করেছিল, তখন হিন্দুদের অনেক দল দিল্লির তিনটি শহর: সিরি, জাহানপনাহ এবং পুরনো দিল্লিতে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয় এবং তারা লড়াই শুরু করে। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে পুড়ে মরে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। সৈন্যরা লুণ্ঠন শুরু করে। তৈমুরের কর্মকর্তারা হিন্দুদের দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও দরজাগুলো বন্ধ করে দেন যাতে বাইরের সৈন্যরা ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে এবং আরও ধ্বংসযজ্ঞ না ঘটে। কিন্তু সেই জুমার রাতে পনেরো হাজার সৈন্য শহরে উপস্থিত ছিল। তারা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করে এবং পুড়িয়ে দেয়। কিছু জায়গায় হিন্দুরা সাহসিকতার সাথে লড়াই করে।

পরের দিন সকালে পুরো সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করে। সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল। জুমাবারে সাধারণ লুণ্ঠন ও গণহত্যার সূচনা হয়। "জাহানপনাহ" এবং "সিরি"-র অধিকাংশ ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করা হয়। শনিবারেও লুণ্ঠন ও গণহত্যা একইভাবে চলতে থাকে। প্রত্যেক সৈন্য প্রায় দেড়শ পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে গ্রেপ্তার করে। এটি ছিল একজন সৈন্যের পাওয়া বন্দীদের সর্বনিম্ন সংখ্যা। লুণ্ঠিত মূল্যবান সামগ্রী, মুক্তা, মূল্যবান পাথর, বিশেষ করে হীরা, জহরত, সব ধরণের দামী পোশাক, সোনা ও রূপার পাত্রের হিসাব করা কঠিন। স্বর্ণমুদ্রার আকারে নগদ অর্থ অনুমানের বাইরে ছিল। গ্রেপ্তারকৃত অধিকাংশ মহিলাই আঙুলে সোনা ও রূপার অলঙ্কার এবং পায়ের আঙুলে মূল্যবান আংটি পরে ছিলেন। কোনো সৈন্যই শাকসবজি, ওষুধ এবং গবাদি পশুর মতো জিনিসের দিকে কোনো মনোযোগ দেয়নি। রবিবারে সেনাবাহিনী পুরনো দিল্লির দিকে অগ্রসর হয় কারণ অনেক হিন্দু সেখানে পালিয়ে গিয়ে জামে মসজিদে আশ্রয় নিয়ে...

রেখেছিল। তৈমুরের দুই অফিসারের অধীনে পাঁচশ সৈন্য তাদের জবাই করে ফেলল। ওই দিনই পুরো পুরনো দিল্লি লুণ্ঠন করা হলো। সমস্ত বন্দীদের বেশ কয়েক দিন ধরে শহরের বাইরে আনা হতে থাকল এবং অফিসারদের জিম্মায় দিয়ে দেওয়া হলো। কারিগরদের শাহজাদা এবং ওই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হলো যারা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তাদের ওই লোকদের কাছেও পাঠানো হলো যারা স্বদেশে ছিল। [১]

উল্লিখিত বর্ণনার ওপর মন্তব্য:

উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনুযায়ী তৈমুরী ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: (১) যেন এই গণহত্যা একটি দুর্ঘটনা ছিল যা দিল্লির জনগণের বিদ্রোহ এবং মুঘল সৈন্যদের প্রতিক্রিয়ার ফলে ঘটেছিল। (২) তারা এতে তৈমুরের আদেশ বা অনুমতির বিষয়টি এড়িয়ে যান, যেন এই সবকিছু আকস্মিকভাবে ঘটেছিল এবং সরকারিভাবে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। (৩) তারা এই ধারণা দেন যে, তৈমুরী বাহিনী কেবল হিন্দুদের গণহত্যা করেছিল।

অথচ তৈমুরের ঝড়ের মতো দিল্লি পর্যন্ত আসা এবং লুণ্ঠনের পর অবিলম্বে হিন্দুস্তান থেকে ফিরে যাওয়া এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, তার পুরো সফরের সারমর্ম ছিল এই 'দুর্ঘটনা', যা ছাড়া তার সফর নিরর্থক হয়ে যেত। সুতরাং এই সবকিছু তৈমুরের অনুমতি বরং আদেশের মাধ্যমেই ছিল, যেমনটি অন্যান্য ঐতিহাসিকদের স্পষ্ট বর্ণনায় বিদ্যমান রয়েছে। [২]

এই বিষয়টিও ধারণাতীত যে তৈমুর কেবল হিন্দুদের হত্যা করেছিল। এই তৈমুরই মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের শহরগুলোতে মুসলমানদের মাথার খুলির মিনার তৈরি করতে থাকে। যদি তার কাছে মুসলিম রক্তের সম্মান থাকত তবে সে এমনটি কেন করত? দিল্লির মুসলমানদের সাথে তার এমন কী আত্মীয়তা ছিল যে সে তাদের রক্ত ঝরাতে লজ্জা পেত? মোল্লা বাদায়ুনীর বর্ণনা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, দিল্লির সামনে হিন্দুদের সাথে সাথে মুসলিম বন্দীদেরও গণহত্যা করা হয়েছিল।

দিল্লিতে মহামারি:

দিল্লি বিজয় যা-ই হোক তৈমুরের জন্য সুখকর হয়নি। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল যার ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে গেল এবং লাশের দুর্গন্ধ অসহনীয় হয়ে উঠল। ফলে কলেরার মহামারি ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার মুঘল সৈন্য এবং অসংখ্য নাগরিক এতে আক্রান্ত হলো। তৈমুরও মহামারির শিকার হলো। চিকিৎসক জানালেন যে ওষুধ তৈরির জন্য নারকেল তেল পাওয়া জরুরি। এখন তেলের খোঁজ শুরু হলো কিন্তু শহরকে লুণ্ঠন করে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল যে এত বড় শহরে এই তেলটুকুও পাওয়া গেল না। ওদিকে হাজার হাজার...

---

[১] জাফরনামা ইয়াজদি: পৃষ্ঠা ১২২ থেকে ১২৪; জাফরনামা আজ শামী: পৃষ্ঠা ১৯২, ১৯৩।

[২] چنانچہ ইয়াহইয়া সিরহিন্দি লিখেছেন: "রোজ দিগার আমির তৈমুর খালক-এ-শহর রা আমান দাদে, মাল-এ-আমানি আজ ইশান গিফাত। চাহারুম রোজ আন ফরমুদ তা হামা খালক রা কে দারুন-এ-শহর বুদান্দ, আসির কুনান্দ।" (পরের দিন আমির তৈমুর শহরবাসীদের নিরাপত্তা দিলেন এবং তার বিনিময় গ্রহণ করলেন, এর চতুর্থ দিনে নির্দেশ দিলেন যে শহরের ভেতরে যত মানুষ আছে, সবাইকে বন্দী করা হোক।) তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১২৬। ইয়াহইয়া সিরহিন্দিও তৈমুরের নায়েব খিজির খানের বংশের দরবারী ঐতিহাসিক ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তৈমুরের মৃত্যুর সাথে সাথে তার আতঙ্কের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি এক বাক্যে এই সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন যে তৈমুর নিজেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জুলুম ও নির্যাতনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মোগল সৈন্যরা এই মহামারীতে মারা গিয়েছিল। তৈমুরকে বাধ্য হয়ে দুই সপ্তাহ অবস্থানের পর দিল্লি ত্যাগ করতে হয়েছিল। পথে তিন-চারটি মঞ্জিল পর্যন্ত প্রতিদিন মোগল সৈন্যরা মহামারীর কারণে মারা যেতে থাকে। মোদ্দাকথা, এই যুদ্ধ তৈমুর এবং ভারতবাসী উভয়ের জন্যই অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রমাণিত হয়েছিল। [১]

তৈমুরের প্রত্যাবর্তন: মিরাটের ধ্বংসলীলা:

২২ রবিউস সানি তৈমুর দিল্লি থেকে রওনা হন। ফেরার পথে তিনি এমন একটি পথ বেছে নিতে চেয়েছিলেন যাতে কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়েই নিজের রাজধানী সমরকন্দ (মধ্য এশিয়া) পৌঁছাতে পারেন এবং একই সাথে সফরের প্রয়োজনীয় রসদ হিসেবে প্রচুর শস্য ও গবাদি পশু পাওয়া যায়। ফলে তিনি ফেরার পথে দোয়াব হয়ে 'শিওয়ালিক পর্বতমালা'র পথ পছন্দ করেন। এই পথে একটিই শক্তিশালী প্রতিরোধের শহর ছিল, অর্থাৎ মিরাট, যা দিল্লির উত্তর-পূর্বে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে যমুনা নদীর ওপারে অবস্থিত ছিল। মোগল বাহিনীকে অনিবার্যভাবে এটি জয় করতে হতো।

মিরাটের জনগণ তৈমুরের সাথে এক কঠিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একজন পাঠান আমির ইলিয়াস আফগান, জনৈক আলেম আহমদ থানেশ্বরীর পুত্র এবং সফি নামক একজন হিন্দু সর্দার। ২৮ রবিউস সানি তৈমুরের অগ্রবর্তী বাহিনীর দশ হাজার সৈন্য এখানে পৌঁছে যায়। বুরুজগুলোর ভিত্তিতে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ দ্রুতগতিতে শুরু হয়। পরের দিন নাগাদ মোগলরা শহরের প্রাচীর দখল করে নেয় এবং শহরে প্রবেশ করে। অনেক যোদ্ধা তখনও মোগলদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। সফি লড়াই করতে করতে প্রাণ দেন, অন্যদিকে দুই মুসলিম নেতাকে গ্রেপ্তার করে তৈমুরের সামনে আনা হয়। শহরের পুরুষদের হত্যা করা হয় এবং তাদের নারী ও শিশুদের দাস বানানো হয়। তৈমুরের আদেশে এই শক্তিশালী দুর্গটি ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। [২]

দোয়াব থেকে শিওয়ালিক পাহাড় পর্যন্ত ব্যাপক লুটতরাজ:

এখন শিওয়ালিক পর্বতমালা পর্যন্ত পথ পরিষ্কার ছিল। তৈমুর এখানে বাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে দোয়াব অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন, যা একদিকে গঙ্গা নদী এবং অন্যদিকে যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তারা এই উর্বর এলাকাগুলোতে লুটতরাজ চালাতে থাকে। এটি ছিল ছোট ছোট হিন্দু জমিদারদের এলাকা যাদের সাথে জায়গায় জায়গায় সংঘর্ষও হয়। এই পুরো অঞ্চলে যেখানেই সম্ভব হয়েছে, মানুষকে বন্দী করা হয়েছে এবং তাদের গবাদি পশু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে একেকজন মোগল সৈন্য একশ থেকে দুইশ পর্যন্ত গরু-বলদ এবং দশ থেকে বিশজন বন্দী লাভ করে। মোদ্দাকথা, দোয়াবের উর্বর সমতল অঞ্চলে বাহিনী কোনো বাধা ছাড়াই লুটতরাজ করতে করতে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

অবশেষে বাহিনী শিওয়ালিক পাহাড়ে প্রবেশ করে, যাকে হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ এবং সবচেয়ে নিম্নবর্তী পাহাড়ী অঞ্চল বলা হয়। ১৫ জমাদিউল আউয়াল ৮০১ হিজরি (২৪ জানুয়ারি ১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) নাগাদ বাহিনী দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং 'কাংড়া'র বিখ্যাত দুর্গ নগরকোট থেকে পনেরো ফারসাখ (প্রায় ৮০ কিলোমিটার) দূরত্বে ছিল। তৈমুর এখান থেকে কাশ্মীরের দিকে মুখ করেন কিন্তু—

---

[১] মনম তৈমুর জাহান কুশা: পৃ. ৩৪৪ থেকে ৩৪৯

[২] জাফরনামা শামি: পৃ. ১৯৪, ১৯৫; জাফরনামা ইয়াজদি: পৃ. ১২৭ থেকে ১৩১

পথে জায়গায় জায়গায় হিন্দুদের মজবুত কেল্লা ছিল, এছাড়া পাহাড়গুলো তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের কাজ করত। এগুলোর সাথে বারবার সংঘর্ষের কারণে বাহিনীর গতি ধীর হয়ে গিয়েছিল। বাহিনী ২৩শে জমাদিউল আখিরা (২৩শে ফেব্রুয়ারি) 'জম্মু' এলাকায় পৌঁছাল। এই এক মাসের পাহাড়ি সফরে মুঘল ফৌজ সাতটি কেল্লা দখল করল এবং কমপক্ষে বিশটি স্থানে হিন্দু রাজা ও সর্দারদের দলগুলোকে খণ্ডযুদ্ধের পর পরাজিত করল। [১]

সুলতান কাশ্মীর সিকান্দারের বিমুখতা:

কাশ্মীরে তখন সুলতান সিকান্দারের শাসন ছিল। তৈমুরের পক্ষ থেকে তার একদল আমিরের আনুগত্যের ফরমান নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং তিনিও কিছু ভালো প্রত্যাশা নিয়ে তৈমুরের সাথে দেখা করতে আসছিলেন। পথে তৈমুরের আমিরদের সাথে তাদের দেখা হয় এবং তারা শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিনিময়ে ত্রিশ হাজার ঘোড়া এবং এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দাবি করেন, যার প্রতিটি মুদ্রার ওজন ছিল আড়াই মিসকাল। সুলতান সিকান্দার এই দাবি শুনে হতাশ হয়ে পড়েন এবং তিনি একটি অজুহাত দেখিয়ে ফিরে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন। তৈমুর যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি তার আমিরদের ওপর রাগান্বিত হলেন যে কেন তারা এত ভারী কর ধার্য করল। [২]

জম্মুর রাজার ইসলাম গ্রহণ:

১৮ই জমাদিউল আখিরা (২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) তৈমুর এগিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং ঘোষণা করেন যে আজ থেকে ২৮ দিন পর আমরা সিন্ধু নদের ঘাটে পৌঁছাব। ২১শে জমাদিউল আখিরা মুঘল বাহিনী জম্মু শহরে পৌঁছাল। এখানকার রাজা পালিয়ে গিয়ে কাছের একটি কেল্লায় অবরুদ্ধ হলেন। মুঘল বাহিনী 'আব-এ-জম্মু' পার হয়ে চেনাব নদীর উপত্যকায় পৌঁছে গেল। [৩]

এখানে জম্মুর রাজা মুঘল বাহিনীর সাথে লড়াই করলেন কিন্তু পরাজিত হলেন এবং আহত অবস্থায় বন্দি হলেন। তৈমুরের নির্দেশে তার সুচিকিৎসা করা হলো এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলো, ফলে রাজা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং অধিকতর আশ্বস্ত করার জন্য গরুর গোশতও খেলেন। তৈমুর তাকে অনেক সম্মান দান করলেন। [৪]

শাইখা খোখরের ঘটনা:

তৈমুর লঙ দিল্লির দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় পাঞ্জাবে কিছু স্থানীয় সর্দার ও গোত্রের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন, বিশেষ করে সল্ট রেঞ্জের কাছে খোখরদের সাথে তার মোকাবিলা হয়েছিল, যাদের সর্দার ছিল নুসরাত খোখর (শাইখা খোখরের ভাই)। এই যুদ্ধে সে নিখোঁজ হয়ে যায় বা মারা যায়। এরপর শাইখা খোখর তৈমুরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বাহিনীতে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। তৈমুর তাকে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষকে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, সাধারণ ক্ষমা বা নিরাপত্তা প্রদানের ওয়াদা করেছিলেন।

---

[১] জাফরনামা-ই-শামী: পৃ. ১৯৬-২০৩; জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: খণ্ড ২, পৃ. ১৩৩-১৬০।

[২] জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: খণ্ড ২, পৃ. ১৬৩-১৬৫।

[৩] স্বাভাবিকভাবেই এই বাহিনী প্রথমে রাভি নদী পার হয়েছিল, তারপর জম্মু শহর থেকে অতিক্রম করার সময় সম্ভবত তওয়াই নদী পার হয়েছিল, যা সম্ভবত 'আব-এ-জম্মু' দ্বারা বোঝানো হয়েছে। তওয়াই নদী চেনাব নদীর একটি উপনদী। জম্মু শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে এটি চেনাব নদীতে গিয়ে মিশেছে।

[৪] জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: খণ্ড ২, পৃ. ১৬৯-১৭৫।

যখন তৈমুর দিল্লি ধ্বংস করে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন শাইখা খোখর দোয়াব পর্যন্ত মুঘল বাহিনীর সাথে ছিলেন। এরপর তিনি পাঞ্জাবে ফিরে যাওয়ার অনুমতি নেন এবং আশ্বাস দেন যে তিনি সেখানে তৈমুরের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের এবং তাদের বাহিনীকে সাহায্য করবেন। তবে পাঞ্জাবে পৌঁছে তিনি তৈমুরের অবাধ্য হয়ে যান। তিনি জানতেন যে তৈমুর কোহিস্তান-ই-শিওয়ালিক এবং কাশ্মীর হয়ে সমরকন্দে ফিরে যাচ্ছেন, তাই পাঞ্জাবের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় তার হাতে থাকবে না। শাইখার এই বিদ্রোহের পেছনে নিজের স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও তৈমুরের জুলুম-অত্যাচার এবং তার বাহিনীর লুটতরাজের তীব্র প্রতিক্রিয়াও কাজ করছিল।

শাইখা প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কর পরিশোধে টালবাহানা শুরু করেন। তার ইচ্ছা ছিল তৈমুর চলে যাওয়ার পর তিনি পাঞ্জাবে নিজের রাজত্ব কায়েম করবেন। তৈমুর এই বিষয়টিকে অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেন এবং শাহজাদা পীর মুহাম্মদ, আমিরজাদা রুস্তম, আমির সুলাইমান শাহ এবং আমির জাহান শাহকে এর মোকাবিলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তারা বাহিনী নিয়ে লাহোরে পৌঁছান এবং শাইখার কাছে কর দাবি করেন, কিন্তু তিনি তা পালন না করায় মুঘল আমিররা তার এলাকা লুট করেন এবং একটি যুদ্ধের পর তাকে পরাজিত ও বন্দি করেন। এরপর তাকে সাথে নিয়ে ২৩ জমাদিউল আখির তারিখে বিজয়ী বেশে তৈমুরের শিবিরে ফিরে আসেন। [১]

খিজির খানের পুনরায় উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্ব:

এখানে উল্লেখ্য যে, মুলতান থেকে দিল্লি এবং তারপর দিল্লি থেকে জম্মু পর্যন্ত হিন্দুস্তানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা সামরিক ব্যক্তিত্ব তৈমুরের হাতের পুতুল হতে রাজি হননি। কারণ তৈমুরের অত্যাচারের কারণে সবাই যেমন তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল, তেমনি তৈমুরের প্রতিশ্রুতি ও কথার ওপরও কারো ভরসা ছিল না। তবে মুলতানের সাবেক শাসক খিজির খান ছিলেন ভিন্ন চিন্তাধারার মানুষ। তিনি সুযোগ বুঝে কাশ্মীরে তৈমুরের দরবারে উপস্থিত হন।

তৈমুরের অবশ্য এখন হিন্দুস্তান নিয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না, কারণ তিনি তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ অঢেল সম্পদ অর্জন করে ফেলেছিলেন। তবে হিন্দুস্তানে নিজের ক্ষমতার একটি প্রতীক স্থাপন করা এবং নিজের প্রতিনিধি হিসেবে কাউকে না কাউকে নির্বাচন করা তার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি খিজির খানকে অগ্রাধিকার দেন এবং তাকেই মুলতানের শাসক নিযুক্ত করেন। [২] এবং এও বলে দেন যে, আমি দিল্লিও তোমাকে দান করলাম। [৩] এটি যেন তাকে একটি আমন্ত্রণ ছিল যে সে তার জায়গিরের সীমানা পুরো দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারে।

তৈমুর, সিন্ধু নদ থেকে সমরকন্দ পর্যন্ত:

এরপর তৈমুরের শেষ কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই অবশিষ্ট বাহিনীকে স্বাভাবিক গতিতে পেছনে ফেলে তিনি তার বিশেষ সৈন্য এবং লস্কর ও সেবকদের নিয়ে দ্রুতবেগে ফিরে চললেন। ২৮ জমাদিউল আখির তারিখে তিনি কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকা থেকে নিচে

---

[১] জাফরনামা-ই-শামি: পৃ. ২০৪, ২০৫; জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: পৃ. ৪১৭, ৪১৮। এর অর্থ হলো তাদের যাত্রা এর অন্তত এক মাস আগে হয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, শাইখা খোখরের গ্রেফতারি সত্ত্বেও তার সমর্থকদের শক্তি কমেনি। এরপর তার পুত্র জাসরাত খোখর তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনিও তৈমুর চলে যাওয়ার পর পাঞ্জাবে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং দিল্লি সালতানাতের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখেন, যার বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আসছে।

[২] জাফরনামা-ই-ইয়াজদি: পৃ. ১৭৫

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৬

নেমে এসেছিল এবং তার লক্ষ্য ছিল সিন্ধু নদের দিকে। ১লা রজব ৮০১ হিজরি (৯ মার্চ ১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে সে নির্ধারিত সময়ের দুই সপ্তাহ পূর্বেই সিন্ধু নদ পার হয়ে গেল। [১]

আমু দরিয়া পর্যন্ত তার গতি ছিল দ্রুত। ২০শে রজব (২৯ মার্চ) এই নদী পার হয়ে সে তিরমিযের সামনে পনেরো দিন অবস্থান করল এবং এরপর বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি করে ২২শে শাবান (৩০ এপ্রিল) সমরকন্দে ফিরে গেল। [২]

তৈমুরি আক্রমণের পর উপমহাদেশের অবস্থা:

তৈমুরের আক্রমণে দিল্লির মহান ইসলামি সালতানাত ধ্বংস হয়ে ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে গেল। চারদিকে স্বায়ত্তশাসিত শাসকদের রাজত্ব শুরু হলো। তৈমুর ভারতীয় শহরগুলোর মূল্যবান ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সাথে নিয়ে গেল। এই আক্রমণে লক্ষ লক্ষ নির্দোষ মানুষ নিহত হলো এবং অসংখ্য মানুষকে গৃহহীন হতে হলো। তৈমুর ফেরার পথে যে পথ দিয়েই অতিক্রম করেছে, সেখানকার ফসল ও উৎপাদন ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এভাবে উপমহাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যাতে হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটল। ক্ষুধা, দুর্দশা, বেকারত্ব এবং অরাজকতা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হলো। শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গেল, দিল্লি সালতানাতের মর্যাদা ধুলোয় মিশে গেল এবং এই জাঁকজমকপূর্ণ শহর দীর্ঘকাল নিজের অবস্থার ওপর বিলাপ করতে থাকল।

মোল্লা আব্দুল কাদির বদায়ূনী তৈমুরি আক্রমণের পর দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার শোচনীয় অবস্থার চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন:

“সেই বছর দিল্লিতে এমন মহামারি ছড়িয়ে পড়ল এবং এত কঠোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, শহরের জনশূন্যতা ও ধ্বংসাবশেষে কোনো কমতি রইল না। শহর ও গ্রামগুলো এমনভাবে উজাড় হলো যে, মানুষ তো দূরের কথা, কোনো পশু-পাখির ছায়াও দেখা যেত না।” [৩]

তৈমুরি ঐতিহাসিকদের মিথ্যা দাবি:

তৈমুরের দরবারি ঐতিহাসিক শরফুদ্দিন ইয়াজদি প্রমুখ তৈমুরের ভারত আক্রমণকে সঠিক প্রমাণের জন্য এই অজুহাত দাঁড় করান যে, দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হাতে ছিল এবং তৈমুর এখানে একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমত, কোনো সরকার কেবল দুর্বল হওয়ার কারণে তাকে ধ্বংস করার কোনো শরয়ি বা নৈতিক যুক্তি তৈরি হয় না, বিশেষ করে যখন তারা আপনার প্রতিবেশী এবং সমধর্মী হওয়ার সুবাদে আপনার সহযোগিতা ও সাহায্যের বেশি হকদার ছিল। দ্বিতীয়ত, তৈমুরের পুরো অভিযানের ফলাফল এখানে আরও বেশি বিকেন্দ্রীকরণ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। সে এখানে কোনো বিকল্প শক্তিশালী সরকার গড়ে উঠতে দেয়নি এবং যাওয়ার সময় খিজির খানের রূপে একজন দুর্বল ক্রীড়নক বসিয়ে দিয়ে গেল। এই সত্যগুলো সেই দাবিকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে, তৈমুরের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক সংকট দূর করা।

---

[১] (জাফরনামা-ই শামি: পৃ. ২০৭) জম্মু থেকে আটকের কাছে সিন্ধু নদের ঘাট পর্যন্ত ৩৫০ কিলোমিটার দূরত্ব। তৈমুর এই সফর এগারো-বারো দিনে গড়ে দৈনিক ২৬ বা ২৭ কিলোমিটার হিসেবে সম্পন্ন করেছিলেন।

[২] (জাফরনামা-ই শামি: পৃ. ২০৭)

[৩] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: ২১১, ২১২

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তৈমুরের দরবারি জীবনীকাররা তার বিজয়সমূহ উল্লেখ করার সময় এমনভাবে ভূমিকা প্রদান করেন যে, তৈমুর আল্লাহর পথে জিহাদের (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) জন্য এসেছিলেন এবং তার উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিপূজারীদের পরাজিত করা, তাওহিদ প্রচার করা এবং ইসলামের পতাকা সমুন্নত করা। [১]

এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদি এমন হতো, তবে তৈমুরের হাতে জুলুম ও নির্যাতনের এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে হতো না, বরং ইসলামী আখলাক এবং দাওয়াতে ইসলামের বরকত পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু তার পুরো অভিযানে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা দ্বারা ইসলামী দাওয়াত বা মুসলমানদের কোনো উপকার প্রমাণিত হতে পারে।

এটি স্পষ্ট যে, সেই সময়ে এখানকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই ছিল মুসলমানদের এবং দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তা মুসলমানদেরই ছিল। এই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোই তৈমুরের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের রক্তই ঝরানো হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত ধর্মীয় নেতাদের গণহত্যা বা লুটতরাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, তবে তাদের মধ্যেও যারা বিত্তবান ছিলেন, তারা অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই কারণেই হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই বিভিন্ন স্থানে তৈমুরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী ভারতীয় ছাড়া কেউই তৈমুরকে স্বাগত জানায়নি।

---

[১] জাফরনামা ইয়াজদি: পৃষ্ঠা ১৪ থেকে ১৭

নৈরাজ্যের তীব্রতা

তৈমুর হিন্দুস্তানে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা করেননি এবং একে একটি এককে পরিণত করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি, কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল এই দেশ লুণ্ঠন করা এবং এখানকার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করা। তাই তিনি অধিকাংশ দুর্গ ও শহরগুলোকে যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই রেখে দিয়েছিলেন যেখানে আলাদা আলাদা সরকার ছিল। কিছু শহর তিনি দিল্লি সরকারের বিশ্বাসঘাতক আমিরদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শাহজাদা নুসরাত খানকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাকে নিজের সমর্থক হিসেবে গণ্য করেছিলেন, কিন্তু কার্যত তাকে কোনো সাহায্য করেননি। হ্যাঁ, ফেরার পথে তিনি খিজির খানকে দিপালপুর ও মুলতানের শাসক নিযুক্ত করেন এবং তাকে এও বলেন যে আমি তোমাকে দিল্লিও দিয়ে দিচ্ছি।

স্পষ্টতই এই নামমাত্র নিয়োগের কোনো সুফল ছিল না। বরং এতে গৃহযুদ্ধ আরও বৃদ্ধি পেতে পারত, কারণ দিল্লির আমিররা কেন খিজির খানের আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত হবেন। তৈমুরের উদ্দেশ্যও ছিল কেবল এটাই যে তুঘলক বংশের কেন্দ্রীয় সরকার যেন পুনরায় শিকড় গাড়তে না পারে।

সালতানাতের খণ্ডবিখণ্ডের দৃশ্যপট

সংক্ষেপে, তৈমুরের আগমনের সময় যে নৈরাজ্য ছিল, তার প্রস্থানের পর তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে তৈমুরের প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পর হিন্দুস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলোর অবস্থা ছিল অনেকটা এরকম:

- শাহজাদা নুসরাত খান: মেওয়াত।
- সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ: ইকবাল মল্লুর সান্নিধ্যে।
- ইকবাল খান মল্লু: দিল্লি ও দোয়াবা।
- মালিক সারওয়ার, উপাধি সুলতান-উশ-শার্ক (খাজা জাহান, দিল্লির প্রাক্তন উজির): জৌনপুর, কনৌজ, অযোধ্যা ও কারা [১]।
- খিজির খান: মুলতান, দিপালপুর (পশ্চিম পাঞ্জাব)।
- গালিব খান: সামানা (পূর্ব পাঞ্জাব)।
- শামসুদ্দিন আওহাদি: বায়ানা (মধ্য ভারত)।

---

[১] মালিক সারওয়ারের সরকার যা জৌনপুরে আধা-স্বায়ত্তশাসিত ছিল এবং দিল্লির দরবারের সাথে তার শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তৈমুরের প্রত্যাবর্তনের পর ৮০২ হিজরিতে মালিক সারওয়ারের ইন্তেকাল হয় এবং তার স্থলে তার পুত্র মুবারক শাহ জৌনপুর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জায়গিরের শাসক হন। কিন্তু মাত্র দুই বছর পর ৮০৪ হিজরিতে তিনিও ইন্তেকাল করেন। তার পর ইব্রাহিম শার্কি শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। জৌনপুর সালতানাতের ঘটনাবলী সামনে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আসছে।

- দিলাওয়ার খান: মালওয়া

- জাফর খান: গুজরাট [১]

শাহজাদা নুসরাত খানের দিল্লি দখল ও পলায়ন:

তৈমুরের প্রত্যাবর্তনের দুই মাস পর শাহজাদা নুসরাত খান, যিনি দোয়াবে ছিলেন, আবারও অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন। মিরাট দখলে সাফল্য অর্জিত হলে তার সাহস বেড়ে যায় এবং তিনি দিল্লি দখলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। দুই হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি ফিরোজাবাদে এসে অবস্থান করেন, যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখন যেহেতু তিনি নিজেকে দিল্লির বাদশাহ মনে করতে শুরু করেছিলেন, তাই তিনি বিরোধীদের নির্মূল করতে সচেষ্ট হন এবং বুলন্দশহরে অবরুদ্ধ ইকবাল মাল্লুকে খতম করার জন্য তার সেনাপতি শাহাবুদ্দিনকে একদল সৈন্যসহ পাঠান। কিন্তু শাহাবুদ্দিন এই প্রচেষ্টায় নিহত হন এবং শাহজাদা নুসরাতের যে সুনাম তৈরি হচ্ছিল তা আবারও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইকবাল মাল্লু সুযোগ বুঝে দিল্লির ওপর চড়াও হন এবং শাহজাদা নুসরাত নিজের অবস্থা দুর্বল দেখে মেওয়াতের দিকে পালিয়ে যান। [২]

এরপর শাহজাদা নুসরাতের রাজনৈতিক অধ্যায় শেষ হয়ে যায় এবং ক্ষমতার ময়দানে তার আর কোনো ভূমিকা অবশিষ্ট থাকেনি।

ইকবাল মাল্লুর উত্থান:

দিল্লিতে ইকবাল মাল্লুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি 'সিরি'তে অবস্থান করে পুনরায় প্রশাসনিক কাজ শুরু করেন। তৈমুরি আতঙ্কে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা আবারও দিল্লিতে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে।

জমাদিউল আউয়াল ৮০২ হিজরিতে ইকবাল মাল্লু 'বায়ানা'ও নিজের দখলে নেন এবং সেখানকার শাসক শামসুদ্দিনকে অনুগত করেন। শীঘ্রই তিনি 'কাটিহার' (রোহিলখন্ড) আক্রমণ করে রায় হরি সিংকেও বশীভূত করেন।

জমাদিউল আউয়াল ৮০৩ হিজরিতে তিনি পাতিয়ালির ওপর আক্রমণ করেন, যেখানে সিয়ার সিং অন্যান্য সরদারদের সাথে মিলে প্রতিরোধ করেন কিন্তু পরাজিত হন এবং পাতিয়ালি আবারও দিল্লি সালতানাতের অধীনে চলে আসে।

৮০৩ হিজরিতে মালিক সারওয়ার খাজা জাহানের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র মুবারক শাহ এই নবজাতক রাষ্ট্রের শাসক হন। এই খবর শোনামাত্রই ইকবাল মাল্লু তাকে দমন করার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযান শুরু করেন, কিন্তু উভয় পক্ষ দুই মাস পর্যন্ত গঙ্গা নদীর দুই তীরে তাবু গেড়ে অবস্থান করার পর ফিরে যায়। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫২৯; তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৯, ১২৮

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৮, ১৬৭

[৩] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৬৯, ১৭০

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (পুনরায়)

৮০৪ হিজরি থেকে ৮১৫ হিজরি

১৪০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১২ খ্রিস্টাব্দ

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তিন বছর পর্যন্ত গুজরাটে অবস্থান করেন। সেখানকার শাসক জাফর খানও তার প্রতি বিরক্ত হয়ে যান এবং তিনিও তার থেকে নিরাশ হয়ে পড়েন। ফলে ৮০৪ হিজরিতে সুলতান দিল্লিতে চলে আসেন এবং ইকবাল মল্লুর সমর্থনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১]

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ এবং ইকবাল মল্লুর মধ্যে শত্রুতা:

এই বছরই জৌনপুর রাজ্যের নতুন রাজা মুবারক শাহ বিন মালিক সারওয়ারের মৃত্যু হয় এবং তার ভাই ইব্রাহিম শাহ সিংহাসনে বসেন। ইকবাল মল্লু এই সংবাদ শুনে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে সাথে নিয়ে ওই রাজ্য দখলের জন্য বের হন। যখন বাহিনী কাছাকাছি পৌঁছে তাবু স্থাপন করল, তখন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিষয়টি শান্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করতে চাইলেন এবং শিকারের বাহানা করে নিজের তাবু থেকে বের হয়ে ইব্রাহিম শাহের কাছে চলে গেলেন। তার ধারণা ছিল যে, ইব্রাহিম শাহ প্রাচীন আনুগত্যের (লবণ-ভক্ষণ) কারণে তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেবেন এবং তার সমঝোতার প্রচেষ্টা সফল হবে। কিন্তু ইব্রাহিম শাহের উদাসীনতা তাকে হতাশ করল। যেহেতু তিনি ইকবাল মল্লুর হাতের পুতুল হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি নিজের অনুগতদের নিয়ে কনৌজে চলে গেলেন এবং সেখানকার আমিরদের সাহায্যে এই অজেয় শহরে নিজের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। [২]

৮০৭ হিজরিতে ইকবাল মল্লু বিশ্বাসঘাতকতা করে তার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন, কিন্তু কনৌজের প্রাচীর অজেয়ই রয়ে গেল।

ইকবাল মল্লুর পরিণতি:

৮০৮ হিজরিতে ইকবাল মল্লু পাঞ্জাবে অভিযান শুরু করেন এবং সামানা জয় করে মুলতানের দিকে রওনা হন। অপর দিক থেকে মুলতানের শাসক খিজির খান নিজের বাহিনী নিয়ে বের হন এবং ১৯ জমাদিউল আউয়াল তারিখে আজোধনের কাছে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় যার মধ্যে...

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৭০, ১৭১।

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃষ্ঠা ১৭০ থেকে ১৭৩।

ইকবাল মাল্লু প্রথম আক্রমণেই পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো। মুলতানি লশকর (বাহিনী)-এর একজন পাঠান সরদার ইসলাম খান লোদী তাকে ধাওয়া করলেন। যেহেতু ভাগ্যলিপিতে ইকবাল মাল্লুর কাহিনী শেষ হওয়ার ছিল, তাই তার ঘোড়াটি আহত হলো এবং কিছুটা সামনে গিয়ে একটি জলাভূমিতে আটকে গেল। পলায়নের কোনো পথই কাজে এল না এবং ইসলাম খান তাকে ধরে হত্যা করলেন এবং তার মাথা খিজির খানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যা প্রদর্শনের জন্য ফতেহপুরে ঝুলিয়ে রাখা হলো। [১]

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ আবারও দিল্লির সিংহাসনে:

ইকবাল মাল্লুর হত্যার পর দিল্লির আমিরগণ, যাদের মধ্যে দৌলত খান দাবির প্রধান ছিলেন, সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে রাজসিংহাসন অর্পণ করলেন। তিনি জমাদিউল আখিরা মাসে কনৌজ থেকে তার কয়েকজন অনুগত ব্যক্তির সাথে দিল্লিতে এলেন এবং সিংহাসনে বসলেন। তিনি সমস্ত সামরিক বিষয় দৌলত খান দাবিরের হাতে ন্যস্ত রাখলেন, অন্যদিকে "ইখতিয়ার খান" নামক এক আমিরকে ফিরোজাবাদের শাসক নিযুক্ত করলেন।

সুলতান নাসিরুদ্দিন এখন তিনজন শক্তিশালী প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে বিপদের সম্মুখীন ছিলেন: পূর্ব দিকে জৌনপুরের শারকি সালতানাতের চতুর শাসক ইব্রাহিম শাহ ছিলেন। পশ্চিম দিকে ছিলেন খিজির খান, যিনি বর্তমানে পাঞ্জাব দখলের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল দিল্লির সিংহাসন। দক্ষিণ দিকে গুজরাটের শাসক জাফর খান ছিলেন যার নজর ছিল মালওয়ার ওপর। ৮১০ হিজরিতে জাফর খান মালওয়ার কেন্দ্র ধার দখল করে নেন এবং সেখানকার শাসক দিলাওয়ার খানকে হত্যা করেন। এভাবে দিল্লির জন্য বিপদ আরও বেড়ে গেল। [২]

তৈমুরের শেষ অভিযানসমূহ, وفات (মৃত্যু) এবং শাহ রুখ মির্জার শাসন:

হিন্দুস্তানের পর তৈমুরের বিজয় ও অভিযানসমূহের মোড় উত্তর-পশ্চিমের দিকে ছিল। তিনি এক দীর্ঘ সফরের পর সিরিয়া আক্রমণ করেন যেখানে তিনি মানুষের ওপর অভ্যাসগতভাবে ভয়াবহ জুলুম চালান এবং শহরগুলোকে ধ্বংস করে দেন। ৮০৪ হিজরিতে (১৪০২ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি উসমানীয় সুলতান বায়েজিদ ইলদিরিমের মুখোমুখি হন এবং আঙ্গোরার ময়দানে তাকে পরাজিত করে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। এই অভিযান থেকে ফিরে সমরকন্দ পৌঁছে ৮০৭ হিজরিতে (১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দ) তার মৃত্যু হয়।

এরপর তার সাম্রাজ্য শাহজাদাদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। যার মধ্যে তার সবচেয়ে ছোট ছেলে শাহ রুখ মির্জা জয়ী হন এবং এভাবে মধ্য এশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, খোরাসান ও হিন্দুস্তানের বাদশাহ হিসেবে তিনিই পরিচিত হতে থাকেন। তবে হিন্দুস্তানে তিনি কার্যত হস্তক্ষেপ করেননি বরং তার প্রতিনিধিদের ওপরই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে খিজির খান ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। [৩]

দৌলত খান দাবির ও খিজির খানের দ্বন্দ্ব:

খিজির খান সেই ব্যক্তি ছিলেন যার ভাগ্যে প্রকৃতপক্ষে তুঘলক বংশের আধিপত্যের অবসান লেখা ছিল, তাই কিছুকাল পর তার এবং দিল্লির মধ্যে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ঘটনাটি ছিল এই যে, সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ এবং দিল্লির সিপাহসালার দৌলত খান দাবির...

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৭৩, ১৭৪; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৩১, ৫৩২

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৭৪, ১৭৫

[৩] আজায়িবুল মাকদুর ফি আহওয়ালি তৈমুর, ইবনে আরব শাহ: পৃ. ২৬৬ থেকে ৩২১, ৩২৮, ৩৪২ থেকে ৩৬৪

নিজের সীমানা সম্প্রসারণ করা জরুরি মনে করে দৌলত খান এই উদ্দেশ্যে সৈন্য নিয়ে বের হলেন এবং সামানা (পূর্ব পাঞ্জাব)-এর শাসক বৈরাম খান তুর্ককে পরাজিত করে তার এলাকা দখল করে নিলেন।

যেহেতু বৈরাম খান কিছুদিন আগে মুলতানের শাসক খিজির খানের অনুগত হয়েছিলেন, তাই খিজির খান একে নিজের অপমান মনে করলেন এবং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দৌলত খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হলেন। দৌলত খানের মোকাবিলা করার সাহস হলো না এবং তিনি পিছু হটলেন, অন্যদিকে তার অধিকাংশ আমির ও সৈন্য খিজির খানের সাথে গিয়ে যোগ দিল। এভাবে খিজির খান দেখতে দেখতে পুরো পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবের শাসক হয়ে গেলেন, অন্যদিকে দিল্লির সম্রাটের কাছে দোয়াব ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ দিল্লির সিংহাসনকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলেন এবং আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হয়ে নিজের দুঃখ ভুলতে লাগলেন। [১]

খিজির খানের দিল্লি আক্রমণ:

৮১১ হিজরিতে খিজির খান দিল্লির ওপর আক্রমণ করে 'সিরি' অবরোধ করেন, কিন্তু তিনি প্রাচীর ভেদ করতে পারেননি এবং অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যান।

পরের বছর তিনি পাঞ্জাবের অবশিষ্ট এলাকাগুলো পদানত করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

৮১৪ হিজরিতে তিনি মেওয়াত এবং আশেপাশের বেশ কিছু জেলা দখল করার পর পুনরায় দিল্লির দিকে অগ্রসর হন এবং 'সিরি' ঘেরাও করেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন, কিন্তু এরই মধ্যে ফিরোজাবাদে তার নায়েব ইখতিয়ার খানও খিজির খানের সাথে হাত মেলান। তিনি খিজির খানকে ফিরোজাবাদে নিয়ে আসেন এবং বেশ আতিথেয়তা করেন।

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ল, কিন্তু তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেননি। সে সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে তৈমুরের আক্রমণের তেরো বছর পার হয়ে গেলেও দিল্লি, দোয়াব এবং মেওয়াতসহ আশেপাশের কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল এবং স্থানীয়ভাবে শস্যের অভাবের কারণে কোনো বড় বাহিনী এখানে বেশিদিন অবস্থান করতে পারত না। ফলে খিজির খানকে আবারও ফিরে যেতে হলো। [২]

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তুঘলকের মৃত্যু:

রজব ৮১৫ হিজরি (অক্টোবর ১৪১২ খ্রিস্টাব্দ)-তে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শিকারের সফরে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েকদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তুঘলক বংশের শেষ শাসক ছিলেন যিনি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিশ বছর দুই মাস রাজত্ব করেন। তার মৃত্যুর সাথেই তুঘলক বংশের গল্পের সমাপ্তি ঘটে। [৩]

বাদশাহদেরও আয়ুর তরী তীরে এসে ভিড়ে,
মর্যাদার পথ যেন কবরেরই শেষ গন্তব্য।

- (আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই মুবারক শাহী: পৃ. ১৭৩ থেকে ১৭৭।

[২] তারিখ-ই ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৫৩৫; তারিখ-ই মুবারক শাহী: পৃ. ১৭৭ থেকে ১৭৯।

[৩] তারিখ-ই ফেরেশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৫৩৫; তারিখ-ই মুবারক শাহী: পৃ. ১৮০।

দৌলত খান দবীর

শাবান ৮১৫ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৮১৭ হিজরি

(অক্টোবর ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ)

এই যুগে হিন্দুস্তানের অবস্থা ছিল একটি আখড়ার মতো, যেখানে ক্ষমতার প্রত্যাশী পালোয়ানরা একে একে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করছিল। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং চারদিকে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের পর তুঘলক বংশের কোনো প্রভাবশালী শাহজাদা অবশিষ্ট ছিল না। ফলে দিল্লির আমিরগণ তুঘলক বংশের অনুগত সরদার দৌলত খানের হাতে সিংহাসন অর্পণ করেন।

দৌলত খানের আসল নাম ছিল দৌলত ইয়ার দবীর। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণের পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তাকে দৌলত খান উপাধিতে ভূষিত করেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে তিনি দিল্লির সিপাহসালার হিসেবে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিলেন। তবে দিল্লিতে সিংহাসনে আরোহণের পর তার সংক্ষিপ্ত শাসনকাল কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বর্জিত।

তিনি প্রায় এক বছর আট মাস সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই সময়ে দিল্লির সিংহাসন প্রতিনিয়ত বিপদের মুখে ছিল, কারণ খিজির খানের মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দিল্লি আক্রমণ ও দখলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৮১, ১৮০; তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি): পৃ. ৫৩৬, ৫৩৫।

দ্রষ্টব্য: মূল উৎসগুলোতে এই শাসককে কেবল “দৌলত খান” বলা হয়েছে, তবে কিছু উৎস যেমন তারিখ-ই-ফিরিশতা (পৃ. ৫৩৫)-তে তার নামের সাথে “লোদী” যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ইতিহাসের ছাত্ররা তাকে সেই দৌলত খান লোদী মনে করে বসেন যিনি ইব্রাহিম লোদীর আমলে পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন, অথচ তারা দুজন আলাদা ব্যক্তিত্ব। উভয়ের সময়ের মধ্যে প্রায় ৮০ বছরের ব্যবধান রয়েছে। লেখক তার পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য তার নামের সাথে “দবীর” শব্দটি যুক্ত করেছেন যা তার আসল নাম “দৌলত ইয়ার দবীর”-এর শেষ অংশ। হতে পারে তিনিও লোদী বংশের ছিলেন, যার কারণে ঐতিহাসিক ফিরিশতা তার নামের সাথে লোদী যুক্ত করেছেন। যাই হোক, তার সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। “দবীর” শব্দ থেকে ধারণা করা হয় যে সম্ভবত তিনি বাদশাহদের বিশেষ সহচর ছিলেন। এটাও সম্ভব যে দবীর তার ছদ্মনাম ছিল, অর্থাৎ তার ভালো সাহিত্যিক ও কাব্যিক রুচি ছিল এবং তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

তুঘলক শাসন আমলের প্রশাসনিক ও তামাদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের ওপর এক নজর

তুঘলক বংশের শাসনকাল প্রশাসনিক ও তামাদ্দুনিক দিক থেকে অত্যন্ত গৌরবময় ছিল। আমরা এর কিছু ঝলক পেশ করছি:

- মুহাম্মদ তুঘলকের আমলে দিল্লির প্রতিপত্তি তুঙ্গে ছিল। ছোট-বড় এক হাজার মাদ্রাসা ছিল। বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সত্তরটি সরকারি হাসপাতাল ছিল। দুই হাজার মসজিদ এবং তার চেয়েও বেশি খানকাহ ছিল। কুয়া ও হাম্মামখানার কোনো ইয়ত্তা ছিল না।

- সরকারি মুদ্রাকে 'টংকা' বলা হতো। এক টংকা আট দিরহামের সমান ছিল। [১]

- মুদ্রার সর্বোচ্চ প্রকারকে 'সুরখ টংকা' (লাল টংকা) বলা হতো, এটি স্বর্ণের মুদ্রা ছিল, যা একটি দিনার বা আশরাফির সমমূল্যের ছিল।

- সরকারি বাহিনীর সংখ্যা নয় লক্ষ ছিল। সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পদ ছিল 'খান'। এরপর 'মালিক', 'আমীর' এবং 'সিপাহসালার'-এর মর্যাদা ছিল। খানের অধীনে দশ হাজার এবং মালিকের অধীনে দুই হাজার অশ্বারোহী থাকত। আমীরের অধীনে একশ অশ্বারোহী থাকত। আমীর এবং তার চেয়ে উচ্চ পদের অফিসাররাই কেবল দরবারে উপস্থিত হতে পারতেন।

- সুলতানের অধীনে সর্বোচ্চ দুটি পদ ছিল 'নায়েব' এবং 'উজির'। নায়েব সবসময় কোনো খান-কে নিযুক্ত করা হতো। এই পদে আসার পর তাকে একটি বড় জায়গির দেওয়া হতো যার আয়তন প্রায় পুরো পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সমান হতো।

- উজির দাপ্তরিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার অধীনে চারজন কাতিব এবং চারজন দবীর (মীর মুন্সী) থাকতেন। প্রত্যেক দবীরের অধীনে চারশ জন লেখক কাজ করতেন।

- উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বেতনের পরিবর্তে জায়গির বরাদ্দ ছিল, যেখান থেকে তারা প্রচুর আয় করতেন।

- বেতনের মানদণ্ড ছিল নিম্নরূপ: খানের বেতন ছিল দুই লক্ষ টংকা, মালিকের পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার পর্যন্ত, আমীরের ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পর্যন্ত এবং সিপাহসালারের বিশ হাজার পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। দপ্তরের লেখকদের পারিশ্রমিক ছিল কমপক্ষে তিন হাজার টংকা।

- সৈন্যদের মাসিক পাঁচশ টংকা দেওয়া হতো। খাদ্য, পোশাক এবং সওয়ারির খরচ এর বাইরে ছিল।

- দাসদের প্রতিদিন তিন সের গোশত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঘি ও মশলা দেওয়া হতো। এছাড়া মাসিক দুই মণ গম এবং চালও দেওয়া হতো। নগদ হিসেবে দশ টংকা [২] অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হতো।

- উমারা, দরবারী, সৈন্য এবং দাসদের পোশাকের জন্য কাপড়ের একটি সরকারি কারখানাও প্রতিষ্ঠিত ছিল।

---

[১] এটি রৌপ্য মুদ্রা ছিল অর্থাৎ রূপার। আজকের দিনের হিসেবে এটি প্রায় সাড়ে তিন আনা হবে।

[২] প্রায় তিনশ ডলার।

- এতে চারশ কর্মচারী কাজ করতেন।

- বিশেষ এবং উচ্চমানের পোশাকের জন্য পাঁচশটি ছোট কারখানা আলাদা ছিল, যেখানে মহিলাদের জন্য চমৎকার পোশাক তৈরি করা হতো।

- বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদকে "সদর-ই-জাহান" বলা হতো। একেই ইরাক ও মিশরে কাজী-উল-কুজ্জাত বলা হতো। দেশি বা বিদেশি উলামা ও ফুকাহাদের সরকারের সাথে সমস্ত যোগাযোগও সদর-ই-জাহানের মাধ্যমেই হতো। সদর-ই-জাহান জটিল প্রকৃতির মামলাগুলোর শুনানি করতেন এবং আদেশ জারি করতেন। তার জায়গিরের আয় ছিল ষাট হাজার তনকা পর্যন্ত।

- শাইখুল ইসলাম পদটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শরীয়ত অনুযায়ী জনগণের সমস্যার সমাধান করা এবং দেশি বা বিদেশি মাশায়েখ ও সুফিদের সাথে সরকারের যোগাযোগ সম্ভব করাও শাইখুল ইসলামের দায়িত্ব ছিল।

- বিচার বিভাগের অধীনে মুহতাসিব (পুলিশ ইন্সপেক্টর) পদ ছিল। তার বেতন ছিল আটশ তনকা।

- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এত সস্তা ছিল যে, একজন সাধারণ মানুষ পাঁচ তনকা (প্রায় দেড়শ ডলার) দিয়ে তার পুরো পরিবারের সারা মাসের খরচ খুব সহজেই চালিয়ে নিতে পারতেন। [১]

---

[১] মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, লেখক: শাইখ আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-উমারি (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরি), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৬ থেকে ৬১।

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ষষ্ঠ খণ্ড

তুঘলক বংশের পতনের কারণসমূহ

তুঘলক বংশ সাম্রাজ্য বিস্তারে সাফল্য এবং উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রাচুর্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, প্রশাসনিক ভুল এবং বাহ্যিক চাপের সমন্বয়ে ধসে পড়ে। নিচে আমরা এর পতনের প্রধান কারণগুলোর ওপর আলোকপাত করছি:

১. মুহাম্মদ তুঘলকের অস্থিতিশীল নীতিসমূহ:

মুহাম্মদ তুঘলক একজন বুদ্ধিমান কিন্তু অদ্ভুত স্বভাবের শাসক ছিলেন, যাঁর নীতিগুলো যদিও কখনও কখনও দূরদর্শিতার ওপর ভিত্তি করে ছিল, কিন্তু সেগুলো সাধারণত তাড়াহুড়ো বা ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার সাথে কার্যকর করা হয়েছিল। ফলে এই নীতিগুলো ব্যাপক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. রাজধানী স্থানান্তর:

দিল্লি থেকে দৌলতাবাদ (দাক্ষিণাত্য) এবং পুনরায় দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের পদক্ষেপের ফলে সীমাহীন কষ্ট, জানমালের ক্ষতি এবং আর্থিক চাপের সৃষ্টি হয়, যা বাণিজ্য, প্রশাসন ও জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

৩. প্রতীকী মুদ্রা:

মুহাম্মদ বিন তুঘলক পিতল ও তামার প্রতীকী মুদ্রা প্রবর্তন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সোনা ও রূপা সাশ্রয় করা। তবে ব্যাপক হারে জালিয়াতি এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে মুদ্রার মান কমে যায়, যার ফলে অর্থনৈতিক মন্দা এবং সরকারের ওপর আস্থার সংকট তৈরি হয়।

৪. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি:

মুহাম্মদ তুঘলক দোয়াব অঞ্চলের উর্বর জমিতে কর বৃদ্ধি করেন, যার পরপরই এই অঞ্চলটি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এই পদক্ষেপ কৃষকদের বিদ্রোহ এবং কৃষি উৎপাদন হ্রাসের জন্ম দেয়।

৫. হিমাচল (হিমালয়) এবং ইরান ও খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা:

মুহাম্মদ তুঘলক ইরান ও খোরাসান এবং পরবর্তীতে হিমালয় থেকে চীন পর্যন্ত এলাকা জয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার কারণে এই উভয় অভিযানই ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে সেনাবাহিনী ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, যার ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

৬. ফিরোজ শাহ তুঘলকের কিছু অনুপযুক্ত পদক্ষেপ:

ফিরোজ শাহ তুঘলক সালতানাতকে সুসংহত করতে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কিছু পদক্ষেপ, যা সাময়িকভাবে উপকারী ছিল, পরোক্ষভাবে দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সেই পদক্ষেপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

৭. জায়গিরদারি ব্যবস্থার পুনর্বহাল:

ফিরোজ শাহ তুঘলক জায়গিরদারি ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করেন এবং এর বিস্তার ঘটান, যার অধীনে নগদ বেতনের পরিবর্তে উমারা এবং কর্মকর্তাদের জমি বরাদ্দ দেওয়া হতো। যদিও এতে উমারাগণ অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু এই পদ্ধতি কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বিভক্ত করে দেয় এবং শক্তিশালী স্থানীয় নেতাদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে, যারা প্রায়ই সুলতানের অবাধ্যতা করত।

৮. পদের বংশানুক্রমিকতা:

ফিরোজ শাহ সামরিক ও বেসামরিক পদগুলোকে বংশানুক্রমিক করে দেন, যার ফলে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর কর্মদক্ষতা ও মান হ্রাস পায়।

৯. ক্রীতদাসের অতিরিক্ত সংখ্যা:

ফিরোজ শাহ বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস সংগ্রহ করেছিলেন, যাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফিরোজ শাহের সময়ে তাদের দক্ষতা, কারুশিল্প এবং বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে যোগ্যতার কারণে তারা অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা একটি বড় আর্থিক বোঝা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা সুলতানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ও দাঙ্গায় অংশ নিতে শুরু করে।

১০. স্বাধীন সালতানাতসমূহের উত্থান:

তুঘলকদের শেষ সময়ে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রাদেশিক শাসকদের স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে উৎসাহিত করে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দাক্ষিণাত্যে সবচেয়ে বেশি ছিল, যেখানে আমিরান-এ-সাদাহ-এর বিদ্রোহের ফলে বাহমানি সালতানাত অস্তিত্ব লাভ করে এবং একইভাবে বিজয়নগর একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বাংলা, গুজরাট, মালব এবং অন্যান্য অঞ্চলও তাদের স্বাধীনতার দাবি জানায়, যার ফলে দিল্লি সালতানাতের আয়তন ও আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

১১. আর্থিক অস্থিতিশীলতা:

উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা, ব্যর্থ অভিযান এবং ক্রমাগত বিদ্রোহ রাজকীয় কোষাগার শূন্য করে দেয়। মুহাম্মদ তুঘলকের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। রাষ্ট্রের অপর্যাপ্ত আয় এবং অত্যধিক ব্যয়ের কারণে স্থায়ী আর্থিক সংকট তৈরি হয়।

১২. দুর্বল উত্তরসূরি:

ফিরোজ শাহ তুঘলকের পর দুর্বল এবং অযোগ্য উত্তরসূরিদের একটি ধারা শুরু হয়, যারা না পারতেন উচ্চাভিলাষী উমারাদের নিয়ন্ত্রণ করতে, আর না পারতেন চলমান বিদ্রোহগুলো দমন করতে, যার ফলে সালতানাত আরও বেশি ভাঙনের শিকার হয়।

১৩. তৈমুরের আক্রমণ:

শেষ ধাক্কাটি ছিল তৈমুরের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ, যার সেনাবাহিনী দিল্লি লুণ্ঠন করেছিল এবং সেখানে গণহত্যা চালিয়েছিল, যার ফলে শহরের একটি বিশাল এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এই আক্রমণ তুঘলক বংশ এবং দিল্লি সালতানাতের মর্যাদা ও ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল, যার ফলে এর পুনরুদ্ধার অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, দিল্লি সালতানাত তার পূর্বের শান-শওকত আর ফিরে পায়নি।

এই কারণগুলো সামগ্রিকভাবে তুঘলক বংশের চূড়ান্ত পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, যার ফলে নতুন আঞ্চলিক শক্তি এবং পরিশেষে সৈয়দ বংশের জন্য পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

জাতিসমূহের জীবনও এভাবেই অনিশ্চিত
অতীতের রঙের ছবিই হলো তাদের বসন্ত
এই ক্ষতির ঘরে কোনো আকাশচুম্বী মর্যাদার জাতি
অনন্তকাল পর্যন্ত কালের বোঝা হয়ে থাকতে পারে না
এই পৃথিবী জাতিসমূহের ধ্বংসের সাথে এতটাই অভ্যস্ত যে,
সে এই দৃশ্য অত্যন্ত উদাসীনতার সাথে দেখে [১]

---

[১] ইকবাল

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

সৈয়দ বংশ (খানওয়াদা-এ-খিজরিয়া)

৮১৭ হিজরি থেকে ৮৫৫ হিজরি

(১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ)

ক্ষমতার মেয়াদ: চান্দ্র বছর: ৩৮ বছর - সৌর বছর: ৩৭

https://t.me/BoierSomahar

খিজির খান

৮১৭ হিজরি থেকে ৮২৪ হিজরি

(১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দ)

খিজির খানের অতীত জানার জন্য আমাদের কয়েক দশক পেছনে যেতে হবে। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমিরদের মধ্যে নাসিরুল মুলক মর্দান দৌলত নামক এক প্রখ্যাত সর্দার ছিলেন যিনি মুলতানের সুবাদার ছিলেন। তিনি একটি ছেলেকে নিজের পালক পুত্র বানিয়েছিলেন যার নাম ছিল সুলাইমান। সুলতান ফিরোজ শাহ তার শেষ বছরগুলোতে মর্দান দৌলতকে মুলতানের জায়গির প্রদান করে তার মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহের পুত্রদের শাসনামলে সুলাইমানও তার পালক পিতার মতো উচ্চপদ লাভ করেন এবং যখন মর্দান দৌলত ইন্তেকাল করেন, তখন তাকে মুলতানের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামল শুরু হওয়ার কয়েক বছর আগে সুলাইমান ইন্তেকাল করেন এবং মুলতানের শাসনভার তার পুত্র খিজির খানের হাতে চলে যায়। [১]

দৌলত খান দবীর এবং খিজির খানের দ্বন্দ্ব:

যখন দৌলত খান দবীর দিল্লির সিংহাসনে বসেন, তখন খিজির খানের কিছু অনুগতদেরও মনে হতে লাগল যে এখন দিল্লির ভাগ্যের নক্ষত্র আবার উজ্জ্বল হতে চলেছে, তাই মালিক মুবারক খান এবং মালিক ইদ্রিস খিজির খানের সঙ্গ ত্যাগ করে দিল্লির সাথে যুক্ত হয়ে যান। খিজির খান এই সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং নিজের পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন। শেষ রমজান ৮১৬ হিজরি (নভেম্বর ১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ)-এ তিনি হঠাৎ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দিল্লির দিকে রওনা হন। শাওয়াল (ডিসেম্বর)-এ তিনি দিল্লির সামনে ছিলেন। শহর অবরোধ চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে। দৌলত খান দবীর কোনো উপায় না পেয়ে সন্ধি করার চেষ্টা করেন এবং শহরের দরজা খুলে দেন। ১৭ রবিউল আউয়াল ৮১৭ হিজরি (৬ জুন ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ)-এ খিজির খানের বাহিনী দিল্লির কেন্দ্রীয় শহর “সিরি”-তে প্রবেশ করে। দৌলত খান দবীরের প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাকে ফিরোজাবাদে বন্দি করে রাখা হয়। তার শাসনকাল ছিল এক বছর তিন মাস। বন্দি অবস্থায় কিছু সময় অতিবাহিত করার পর তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। [২]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৮১, ১৮২; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৩৭

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৮২, ১৮৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৩৬

https://t.me/BoierSomahar

খিজর খানের শাসনের সূচনা:

এদিকে খিজর খান 'সিরি'র প্রাসাদে অবস্থান গ্রহণ করেন। তখন তাঁর অন্নদাতা প্রভু তৈমুর গুরগানের মৃত্যু হয়েছিল এবং এটি ছিল তাঁর পুত্র শাহ রুখ মির্জার শাসনামল। খিজর খান এই পরিবারের সাথেই নিজের সম্পর্ক বজায় রাখেন। নিজের জন্য সুলতান উপাধি গ্রহণ করেননি, বরং দিল্লির সিংহাসনকে কেবল 'রায়াত-ই-আলা' (মহান পতাকা) নামক অনন্য নামে অভিহিত করেন। এই সরকারের দিল্লি ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও কোনো শক্তি ছিল না। তৈমুরীয়দের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে জনগণের মধ্যে এটি কোনো জনপ্রিয়তা পায়নি। কারণ সেই সময় পর্যন্ত উপমহাদেশে তাতার ও মোগলদের বিদেশি মনে করা হতো। [১]

নতুন সরকারি বিন্যাস:

খিজর খান নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের নিয়ে সরকার গঠন করেন:

- মালিক তুহফা: উজির
- সাইয়্যেদ সেলিম: বিশেষ উপদেষ্টা
- মালিক আবদুর রহিম: পাঞ্জাবের শাসক, সাথে আলাউল মুলক উপাধি
- মালিক সারুপ (মালিক সারওয়ার): দিল্লির কোতোয়াল
- ইখতিয়ার খান: দোয়াবের শাসক [২]

সাইয়্যেদ হওয়ার কাহিনী কেন প্রচার করা হয়েছিল?

খিজর খানের আমিরদের মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, অভিযানের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানগত যোগ্যতার দিক থেকে কেউ অসাধারণ ছিলেন না। আমিরদের মধ্যে সমন্বয়েরও অভাব ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি যেকোনো সরকারের জন্য চরম দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খিজর খান এই অভাব দূর করার জন্য নিজেকে 'সাইয়্যেদ' হিসেবে প্রচার করেন, ফলে এই সরকার 'সুলতানাত-ই-সাদাত' (সাদাত সালতানাত) নামে পরিচিতি পায়। অথচ এই সত্য সবাই জানত যে, দুই প্রজন্ম ওপর পর্যন্ত খিজর খানের বংশপরিচয় অজ্ঞাত। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৮২, ১৮৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৫৩৮, ৫৩

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৮২, ১৮৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃ. ৫৩৮, ৫৩

[৩] ইয়াহইয়া সিরহিন্দি (এবং তাঁর থেকে উদ্ধৃত করে ফিরিশতা) খিজর খানের সাইয়্যেদ হওয়ার মাত্র দুটি অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি দিয়েছেন: এক. মাখদুম জাহানিয়া জাহান গাশত একবার তাঁর পিতা সুলাইমানকে সাইয়্যেদ বলেছিলেন। দুই. তাঁর চরিত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের সদৃশ ছিল। এই দুটি কথার কোনোটিই দলিল হতে পারে না। সেই যুগে 'সাইয়্যেদ' শব্দটি সর্দার ও প্রভুর অর্থেও ব্যবহৃত হতো। তাই একটি শব্দ দেখে কারো বংশপরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। এছাড়া এটিও একটি প্রশ্ন যে, হযরত জাহানিয়া জাহান গাশতের এই কথাগুলো সরাসরি কে শুনেছেন এবং তাঁর থেকে কে নকল করেছেন? সিরহিন্দি তো কোনো উৎস, সনদ বা রেফারেন্স উল্লেখ করেননি, তাই এই বাক্যের প্রমাণই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। আর নববী চরিত্রে ভূষিত হওয়ার বিষয়টি হলো, প্রথমত খিজর খানের জীবনবৃত্তান্তে চরিত্রের কোনো অসাধারণ উচ্চতা দেখা যায় না। কেবল বদান্যতার একটি গুণ ছিল যা সম্ভবত তাঁর সমর্থক আমির ও অনুসারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যাকে আমরা রাজনৈতিক ঘুষ বললে ভুল হবে না। এছাড়া তাঁর মধ্যে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি কম দেখা যায়, তাই তাঁকে একজন ভদ্রলোক হিসেবে মানা যেতে পারে, কিন্তু সিরহিন্দি কর্তৃক তাঁকে নববী চরিত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা চরম অতিরঞ্জন। যদি তর্কের খাতিরে তাঁকে অত্যন্ত উচ্চ চরিত্রের অধিকারী বলেও মেনে নেওয়া হয়, তবুও তা দ্বারা তিনি সাইয়্যেদ প্রমাণিত হন না।

বিদ্রোহ ও অভিযানসমূহ:

খিজির খানের শাসনের সাত বছর ক্রমাগত বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হয়। এই বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দোয়াব থেকে হিমালয়ের পাদদেশ এবং মালবের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাটিহার (রোহিলখন্ড), বদায়ুন, ইটাওয়া, পাতিয়ালি, গোয়ালিয়র, বায়ানা, নাগৌর এবং মেওয়াটে এগুলোর প্রকোপ বেশি ছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে হিন্দু সর্দার এবং মুসলিম আমিররাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

খিজির খান প্রায়ই শাহ রুখ মির্জার জন্য উপহার ও উপঢৌকন পাঠাতেন। তাঁর শাসনের শুরুর দিকে মুলতানে আমির তৈমুর এবং দিল্লিতে আমিরের পুত্র শাহ রুখ মির্জার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। মুদ্রাতেও তাঁদের নাম খোদাই করা থাকতো। তবে শেষ বছরগুলোতে খুতবায় খিজির খানের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

খিজির খান স্বভাবগতভাবে ন্যায়পরায়ণ, কোমল মেজাজ ও দানশীল ছিলেন। অল্প কিছু ক্ষেত্র ছাড়া তিনি কোথাও কঠোরতা অবলম্বন করেননি এবং বিরোধী সর্দারদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের পর তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। [১]

খিজির খানের মৃত্যু:

খিজির খান কিছুকাল অসুস্থ থাকার পর ১৭ জমাদিউল আউয়াল ৮২৪ হিজরি (২০ মে ১৪২১ খ্রিস্টাব্দ) দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন চতুর, যোগ্য ও তৎপর সেনাপতি ছিলেন যিনি নিজের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। তবে দিল্লির বাদশাহ হিসেবে তাঁর শাসনকাল বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করে না। যদিও তিনি মুলতান থেকে দোয়াব এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মালব পর্যন্ত দিল্লির সিংহাসনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার নিরন্তর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অরাজকতা—যা ছিল এই যুগের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি—তাঁর শাসনামলে সমানভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও তিনি বিদ্রোহীদের দমনের জন্য তাঁর বাহিনীকে সর্বদা তৎপর রাখতেন, কিন্তু তাঁর বাহিনী ফিরে আসার সাথে সাথেই পেছনে আগের চেয়ে বড় কোনো বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। এই সংকটময় যুগে দিল্লির মানুষ তাঁকে গনিমত মনে করত। [২]

হবে না। অন্যথায় এই যুক্তিতে সমস্ত আউলিয়া কেরাম এবং সচ্চরিত্রবান সকল বাদশাহকেও সৈয়দ মেনে নিতে হবে।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৮৩ থেকে ১৮৯; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৩৭ থেকে ৫৪২

[২] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৮৩ থেকে ১৮৯; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৪২

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মুবারক শাহ

(বিন খিজির খান)

৮২৪ হিজরি থেকে ৮৩৭ হিজরি

(১৪২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দ)

খিজির খান তার অসুস্থতার সময় নিজের ছেলে মুবারক শাহকে উত্তরসূরি মনোনীত করেছিলেন। যদিও তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর দিল্লির অধিবাসীদের জন্য একজন সজ্জন ও দয়ালু শাসক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সালতানাতকে পতনের গভীর গহ্বর থেকে বের করে আনতে পারেননি। তিনি পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর শাসনের দায়িত্ব মাহমুদ হাসানের হাতে অর্পণ করে তাকে 'মালিকুশ শারক' উপাধিতে ভূষিত করেন। তার অন্যান্য অমাত্যদের মধ্যে সরওয়ারুল মুলক অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। [১]

ধারাবাহিক অভিযানসমূহ:

মুবারক শাহের তেরো বছরের শাসনকাল ছিল ধারাবাহিক গৃহযুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের এক চিত্রপট, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- (১) জাসরাত: তিনি ছিলেন খোখর গোত্রের সর্দার শাইখার ছেলে, যিনি শিয়ালকোটের কাছে বসবাস করতেন। যখন তৈমুর লঙের আক্রমণ ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছিল, তখন জাসরাত সুযোগ পেয়ে যান এবং তিনি তার যোদ্ধাদের নিয়ে কাশ্মীরের একটি গৃহযুদ্ধে অংশ নেন, যার ফলে তার সমর্থিত প্রার্থী জয়নুল আবেদিন সফল হয়ে কাশ্মীরের শাসক হন।

এভাবে জাসরাত শক্তিশালী সমর্থন লাভ করেন, যার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে তিনি শিয়ালকোট থেকে পূর্ব পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন এবং জলন্ধর পর্যন্ত এলাকাকে নিজের লুটতরাজ ও ধ্বংসলীলার ময়দানে পরিণত করেন। মুবারক শাহ ৮২৪ হিজরিতে (১৪২১ খ্রিস্টাব্দ)

---

(১) দ্রষ্টব্য: (১) এই মুবারক শাহ বিন খিজির খান একজন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব যার শাসন ছিল দিল্লিতে। মুবারক শাহ বিন মালিক সরওয়ার, জৌনপুরের শাসক, একজন ভিন্ন ব্যক্তি যিনি ৮০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। (২) মালিক সরওয়ার দিল্লির উজির, যার উপাধি ছিল খাজা জাহান এবং যিনি জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি একজন ভিন্ন ব্যক্তি যিনি ৮০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন; অন্যদিকে সরওয়ারুল মুলক দিল্লির উজির, যার উল্লেখ এখানে মূল পাঠে করা হচ্ছে, তিনি একজন ভিন্ন ব্যক্তি যাকে ৮৩৭ হিজরিতে হত্যা করা হয়েছিল।

...এর শেষভাগে তার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং তাকে রাভী নদীর ওপারে পিছু হটতে বাধ্য করেন। ফেরার পথে শাহ লাহোর সফর করেন যা ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার কারণে পতনোন্মুখ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল। সেখানে নির্মাণ ও মেরামতের কাজ করিয়ে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এখানে আমির মাহমুদ হাসানকে মালিকুশ শারক উপাধি দিয়ে নিযুক্ত করা হয়।

৮২৫ হিজরি (১৪২২ খ্রিস্টাব্দ) এর বসন্তকালে জাসরাত পুনরায় লাহোর আক্রমণ করেন এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা দখল করতে পারেননি। পরবর্তী ছয় বছর লাহোর ও মুলতানের আমিরগণ জাসরাতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। জিলকদ ৮৩১ হিজরি (সেপ্টেম্বর ১৪২৮ খ্রিস্টাব্দ) তে একটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় কিন্তু জাসরাত পিছু হটে গেলেও বিপদ হিসেবে রয়ে যান এবং পরবর্তী বছরও তার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

•

(২) কাথির-এর সরদার ও রাঠোর: কাথির (রোহিলখন্ড) এর কিছু মুসলিম আমির এবং অনেক হিন্দু 'রাঠোর' দিল্লি সালতানাতের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহের ধারা শুরু করেছিল। মুবারক শাহ ৮২৬ হিজরি (১৪২৩ খ্রিস্টাব্দ) তে সেখানে নিজে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিদ্রোহীদের দমন করেন। ৮২৮ হিজরি (১৪২৮ খ্রিস্টাব্দ) তে পুনরায় এই অঞ্চলে সৈন্য পরিচালনা করেন।

•

(৩) আল্প খান ও মাহমুদ খান: ৮২৭ হিজরিতে মুবারক শাহ আল্প খানের বিদ্রোহ দমনের জন্য গোয়ালিয়র ও বায়ানা সফর করেন এবং তাকে অনুগত করেন। ৮২৮ হিজরিতে বায়ানার কেল্লাদার মাহমুদ খান (বিন আওহাদি খান) বিদ্রোহ করেন যা দমন করা হয়। মাহমুদ খানকে বন্দি করা হয় কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং জৌনপুরের শাসক ইব্রাহিম শাহ শারকির সাথে গিয়ে যোগ দেন।

•

(৪) ইব্রাহিম শাহ শারকি: জৌনপুর রাষ্ট্র দিল্লি সালতানাতের বিরোধী ছিল, সেখানকার শাসক ইব্রাহিম শাহ শারকি এবং মুবারক শাহের মধ্যে জমাদিউল আখিরা ৮৩১ হিজরি (মার্চ ১৪২৮ খ্রিস্টাব্দ) তে বেশ কিছু সংঘর্ষের পর একটি যুদ্ধ হয় যা অমীমাংসিত থাকে।

•

(৫) মেওয়াতি: মেওয়াতে সরদার 'বাহাদুর নাহর' অনেক প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন এবং দিল্লি সালতানাত কোনোভাবেই তাকে বশীভূত করতে পারছিল না। ৮২৭ হিজরি (১৪২৪ খ্রিস্টাব্দ) দোয়াব ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে তীব্র দুর্ভিক্ষের বছর ছিল, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে সুলতান কাথির অভিযান থেকে ফেরার পথে মেওয়াত আক্রমণ করেন এবং অনেক ফিতনাবাজকে হত্যা করেন। ৮২৮ হিজরি (১৪২৫ খ্রিস্টাব্দ) তে মুবারক শাহ এখানে পুনরায় সৈন্য পরিচালনা করে বিদ্রোহীদের শক্তি ভেঙে দেন। মেওয়াতিরা সাময়িকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে শুরু করে কিন্তু কিছুকাল পর জৌনপুর ও দিল্লির যুদ্ধ শুরু হলে তারা জৌনপুরের সহযোগী হয়ে যায় যার ফলে জিলকদ ৮৩১ হিজরি (আগস্ট ১৪২৮ খ্রিস্টাব্দ) তে মুবারক শাহ পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং তাদের এক বড় সরদারকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এছাড়া সারওয়ারুল মুলককে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তাদের কেল্লাগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মেওয়াতিরা খুব শীঘ্রই পুনরায় বিদ্রোহ শুরু করে এবং বাদশাহকে ৮৩৪ হিজরি (১৪২৯ খ্রিস্টাব্দ) ও ৮৩৬ হিজরি (১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ) তে সেখানে আরও অভিযান পরিচালনা করতে হয়।

•

(৫) শেখ আলী আফগান: এই সময়ে ভাটিন্ডার সুবাদার সৈয়দ সেলিমের মৃত্যু হয় যিনি তিন বছর ধরে খিজির খানের সঙ্গী ছিলেন। এরপর তার এক তুর্কি গোলাম ফুলাদ খান বিদ্রোহ করে ভাটিন্ডা দখল করে নেন। মুলতান থেকে বাদশাহর নায়েব ইমাদুল মুলক (মাহমুদ হাসান) সৈন্য পরিচালনা করে তাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ফুলাদ খান ছয় মাস পর্যন্ত ভাটিন্ডায় অবরুদ্ধ থেকে রাজকীয় বাহিনীর সাথে লড়াই করতে থাকেন। সেই সাথে তিনি কাবুলের শাসক শেখ আলী আফগানকে...

অনেক সোনা ও মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে নিজের সাহায্যের জন্য তাকে ডেকে আনলেন। শেখ আলী এমন একজন যোদ্ধা, শক্তিশালী ও কঠোর মেজাজের লোক ছিলেন যে, লাহোরের শাসক সিকান্দার (মালিকুশ শারক) তাকে প্রতি বছর উপহার ও ধন-সম্পদ পাঠিয়ে নিজের প্রদেশকে রক্ষা করে আসছিলেন। কিন্তু এখন শেখ আলী হিন্দুস্তানে হস্তক্ষেপ করার এবং লুটপাটের সুযোগ পাচ্ছিলেন। ফলে তিনি পাঞ্জাবে ঢুকে পড়লেন।

লাহোরের শাসক পিছু হটে নিজের শহর রক্ষা করলেন, কিন্তু শেখ আলীর আফগান বাহিনী রাভী নদীর তীরবর্তী জনপদগুলো ধ্বংস করতে করতে "তুলম্বা" পর্যন্ত চলে গেল। মুলতানের শাসক ইমাদুল মুলক (মাহমুদ হাসান) তাদের থামানোর জন্য বের হলেন। ফলে এক বড় যুদ্ধ হলো যাতে মুলতানি বাহিনীকে পিছু হটতে হলো এবং তাদের একজন বিখ্যাত আফগান অফিসার মালিক সুলাইমান লোদীও নিহত হলেন।

এই পরিস্থিতিতে মুবারক শাহ গুজরাটের কাছে সাহায্য চাইলেন। ফলে ৮৩৪ হিজরিতে (১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দ) ফাতহ খান বিন মুজাফফর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি অত্যন্ত কঠিন যুদ্ধের পর শেখ আলী আফগানকে কাবুলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

পরের বছর শেখ আলী পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে এলেন এবং ঝিলাম থেকে তুলম্বা ও মুলতান পর্যন্ত লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে চলে গেলেন।

৮৩৬ হিজরিতে (১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দ) শেখ আলী তৃতীয়বার আক্রমণ করলেন। এবার তিনি লাহোর দখল করে নিলেন এবং সেখানে শত শত মানুষকে হত্যা করে ত্রাস সৃষ্টি করলেন। সারওয়ারুল মুলক ও ইমাদুল মুলকের মতো আমীররা তাকে প্রতিহত করতে পারলেন না। কিন্তু মুবারক শাহ যখন দিল্লি থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবে পৌঁছালেন, তখন শেখ আলী কাবুলের দিকে পালিয়ে গেলেন। [১]

মুবারক শাহের হত্যাকাণ্ড

মুবারক শাহের শেষ দিনগুলোতে তার উজির সারওয়ারুল মুলকের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। শাহ তার কাছ থেকে দিপালপুরের জায়গির ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, যা তাকে ব্যথিত করেছিল। এরপর মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বেশ কিছু কাজ তিনি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারছিলেন না, তাই শাহ সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে আমীর কামালুল মুলককে দিয়ে দেন। এতে সারওয়ারুল মুলক আরও ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি কাজু খত্রী ও গাঙ্গু প্রমুখ কয়েকজন হিন্দু সর্দারের সাথে মিলে বাদশাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রাণঘাতী হামলার প্রস্তুতি নিলেন। সাথে দুজন উচ্চপদস্থ মুসলিম অফিসার: মীরান সদর (নায়েবে আরজুল মামালিক) এবং কাজী আব্দুস সামাদকেও যুক্ত করে নিলেন।

সেই দিনগুলোতে বাদশাহ "মুবারকাবাদ" নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করছিলেন। তিনি এ উপলক্ষে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সুযোগে মীরান সদর রাজকীয় দেহরক্ষীদের পরিবর্তন করে সেখানে নিজের লোক নিয়োগ করেন।

৯ রজব ৮৩৭ হিজরি (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) বাদশাহ পুনরায় মুবারকাবাদে যান এবং সেখানে জুমার নামাজ আদায় ও তার প্রস্তুতির কাজ শুরু করেন। এই সময় মীরান সদর এসে অনুরোধ করেন যে, অশ্বারোহী বাহিনীর কিছু অফিসার ছুটির আবেদন করতে চায়। বাদশাহ অনুমতি দিলেন। মীরান সদর সেই সশস্ত্র অশ্বারোহীদের এগিয়ে আসার সংকেত দিলেন। বাদশাহ সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিলেন যখন অশ্বারোহীদের মধ্য থেকে সিধপাল ও সিধরণ নামক দুই হিন্দু সৈন্য হঠাৎ বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে বসল।

---

[১] তারিখ-ই-মুবারক শাহী: পৃ. ১৯৩ থেকে ২৩৫; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫২৪ থেকে ৫৬১; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ২২৩ থেকে ২৩৩।

আক্রমণ করে বাদশাহকে হত্যা করে ফেলল। [১]

মোবারকাবাদ শহর:

ঐতিহাসিকদের মতে মোবারক শাহ ছিলেন একজন সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ এবং কর্মঠ শাসক। তিনি দিল্লি থেকে কিছুটা দূরে যমুনা নদীর তীরে 'মোবারকাবাদ' নামক একটি শহর গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এই কাজ সম্পন্ন হতে পারেনি। পরবর্তীতে এই জনপদ দিল্লির সম্প্রসারণের সাথে মিশে গিয়ে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়ে ফেলে। [২]

তারিখ-ই-মোবারক শাহী:

মোবারক শাহের আমলের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইয়াহইয়া সিরহিন্দি তালিকার শীর্ষে রয়েছেন, যিনি তাঁর নামানুসারে 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী' রচনা করেন। এটি হিন্দুস্তানের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা থেকে জ্ঞানপিপাসুরা উপকৃত হয়ে আসছেন।

মোবারক শাহের শাসনামলের ওপর এক নজর:

মোবারক শাহ দিল্লি সালতানাতের শান-শওকত পুনরুদ্ধার করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। এর বড় কারণ ছিল এই যে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমল থেকে সেনাবাহিনীর পদগুলো বংশানুক্রমিক হয়ে আসছিল, যার ফলে সেনাবাহিনীর মান ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, এই সরকারের ওপর তৈমুর ও তাঁর বংশধরদের ছাপ লেগে ছিল, তাই এটি প্রাচীন মহান সম্রাটদের মতো সম্মান ও গুরুত্ব পায়নি।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৬০, ৫৬১; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ২৩৩, ২৩৪

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৬০; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ২৩৩

https://t.me/BoierSomahar

মুহাম্মদ শাহ

(বিন ফরিদ খান বিন খিজির খান)

৮৩৭ হিজরি থেকে ৮৪৯ হিজরি

(১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

সরওয়ারুল মুলক আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন যে, সিংহাসনে নামমাত্র আরোহণের জন্য তিনি নিহত বাদশাহর চাচাতো ভাই মুহাম্মদ শাহকে (বিন ফরিদ খান) এনে বসাবেন, যাকে নিহত বাদশাহ নিজের পালক পুত্র বানিয়ে রেখেছিলেন। ফলে তাই হলো এবং মুহাম্মদ শাহ সিংহাসনে বসলেন। মুহাম্মদ শাহ সরওয়ারুল মুলককে ঘৃণা করতেন, কিন্তু সেই সময় তিনি পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে চুপ ছিলেন এবং সরওয়ারুল মুলকের সাথে একমত পোষণ করছিলেন। যেহেতু সরওয়ারুল মুলক ছিলেন বাদশাহ নির্মাতা, তাই মুহাম্মদ শাহ তাকে 'খান-ই-জাহানি' উপাধি দিয়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী রাজকীয় কোষাগার, অস্ত্রাগার এবং হস্তিশালার তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দিলেন। পূর্ববর্তী বাদশাহর হত্যাকারী: সুধারন এবং সিদপালকে বায়ানা ও আমরোহায় জায়গির প্রদান করা হলো। মিরান সদরকে 'মুয়ীনুল মুলক' উপাধিসহ উচ্চ পদে ভূষিত করা হলো। [১]

সরওয়ারুল মুলকের উত্থান ও পতন:

সরওয়ারুল মুলক পূর্ববর্তী বাদশাহর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুগত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করলেন। কাউকে জেলে পাঠালেন এবং কাউকে হত্যা করালেন যাতে তার পথ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন তিনি এই চিন্তায় ছিলেন যে, বর্তমান বাদশাহকেও হত্যা করিয়ে নিজে বাদশাহ হয়ে শাসন করবেন। কিন্তু অন্যদিকে মুবারক শাহর অনুগত কর্মকর্তারা সরওয়ারুল মুলকের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, যাদের মধ্যে কামালুল মুলক ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

অবশেষে কামালুল মুলক, মালিক আল্লাহ দাদ এবং মালিক জিমেন নামক দুইজন শক্তিশালী সর্দারকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিলেন যারা পূর্ববর্তী বাদশাহর হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। সরওয়ারুল মুলক তাদের দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন কিন্তু সেই সর্দাররা তাদের পিছু হটতে বাধ্য করলেন এবং অগ্রসর হয়ে...

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৬১, ৫৬২; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৩৩

অগ্রসর হয়ে তারা শওয়াল ৮৩৭ হিজরি (মে ১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে দিল্লির উপকণ্ঠে এসে পৌঁছালেন। তিন মাস পর্যন্ত অবরোধ জারি ছিল।

এই সময়ে সরওয়ারুল মুলকের মনে হলো যে, বাদশাহ মুহাম্মদ শাহ হয়তো তার বিরুদ্ধে গিয়ে কামালুল মুলকের সাথে হাত মেলাবেন। তাই তিনি মুহাম্মদ শাহকে হত্যা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে চাইলেন, কিন্তু মুহাম্মদ শাহ আগে থেকেই সতর্ক হয়ে নিজের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছিলেন। সংক্ষেপে, সরওয়ারুল মুলকের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। তাকে মীরান সদর এবং তার কয়েকজন সঙ্গীর সাথে হত্যা করা হলো।

এদিকে কামালুল মুলক এবং তার সঙ্গী অফিসাররা প্রাক্তন বাদশাহর অবশিষ্ট খুনিদেরও ধরে ফেললেন, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হিন্দু খতরিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের নিহত বাদশাহর মাকবারায় নিয়ে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। এভাবে দিল্লি ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে মুক্ত হলো। [১]

মুহাম্মদ শাহর পুনরায় রাজ্যাভিষেক এবং পদসমূহের নতুন বণ্টন:

মুহাম্মদ শাহর এখন পুনরায় সিংহাসন আরোহণ ও রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হলো এবং নতুন করে পদসমূহ এভাবে বণ্টন করা হলো:

- কামালুল মুলক: উজির-এ-সালতানাত, সাথে ‘কামাল খান’ খেতাব।
- মালিক জমান: আমরোহা ও বদায়ূনের শাসক, সাথে ‘গাজীউল মুলক’ খেতাব। [২]
- হাজি শুদনি, ওরফে হুসাম খান: দিল্লির কোতোয়াল। [৩]

দিল্লির সেনাবাহিনী এবং সিরহিন্দের আফগানদের মধ্যে সংঘর্ষ:

মুহাম্মদ শাহর দাদা খিজির খানের শাসনব্যবস্থা কায়েম করার ক্ষেত্রে ইসলাম খান লোদি নামক এক আফগানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যিনি ৮০৮ হিজরিতে দিল্লির সেনাপতি ইকবাল খান মল্লুকে হত্যা করে খিজির খানকে বিজয় এনে দিয়েছিলেন। এই সম্মানে তিনি সিরহিন্দের সুবাদারি লাভ করেছিলেন। মুহাম্মদ শাহর আমলে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সিরহিন্দের সুবাদারি তার ভাতিজা বাহলুল লোদিকে অর্পণ করার অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।

ইসলাম খান লোদির ছেলে কুতুব খান এটি সহ্য করতে পারলেন না এবং বাহলুল লোদিকে সিরহিন্দের শাসন থেকে বঞ্চিত করার জন্য তিনি দিল্লি চলে গেলেন এবং উমরাদের দরবারকে মাধ্যম বানিয়ে বাদশাহকে প্ররোচিত করলেন যে, সিরহিন্দ বর্তমানে বিদ্রোহী আফগানদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে যাদের দ্রুত দমন করা জরুরি। বাদশাহ তার অফিসার “মালিক সিকান্দার তুহফা”-কে একটি বাহিনী দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, কুতুব খানের নেতৃত্বে গিয়ে সিরহিন্দ দখল করে নিতে এবং সেখানকার আফগানদের দিল্লি বা এর আশপাশে স্থানান্তরিত করতে। সিকান্দার তুহফা এই সুযোগে আফগানদের প্রাক্তন মিত্র জাসরাত খোখরকেও নিজের সাথে মিলিয়ে নিলেন।

এই বাহিনী যখন সিরহিন্দ পৌঁছাল, তখন মালিক সিকান্দার দেখলেন যে আফগানরা উদ্বিগ্ন হয়ে জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। মালিক সিকান্দার ও জাসরাত খোখর তাদের কাছে দূত পাঠিয়ে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করলেন এবং বললেন:

“আপনাদের কোনো অপরাধ নেই, তবে কেন পালিয়ে যাচ্ছেন?”

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৬২ থেকে ৫৬৫; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ২৩১ থেকে ২৩৩।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৬৫।

আফগানরা তাদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করলে তাদেরকে অভয়বাণী দেওয়ার ঘোষণা করা হলো এবং বলা হলো যে, তারা যেন তাদের নেতাদের দিল্লিতে পাঠিয়ে দেয় যাতে সন্দেহ ও সংশয় দূর হয়। আফগান নেতাদের অনুরোধে তাদের জন্য একটি লিখিত অভয়পত্রও লিখে দেওয়া হলো। ফলে বাহলুল লোদীর বৃদ্ধ চাচা মালিক ফিরোজ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি নিজে কয়েকজন লোককে নিয়ে দিল্লিতে যাবেন। সে অনুযায়ী তিনি তার পুত্র শাহী খানকে বাহলুল লোদীর সাহায্যের জন্য পেছনে রেখে নিজে রাজকীয় বাহিনীর সাথে রওনা হলেন।

কুতুব খান যখন দেখলেন যে তার প্রতিশোধ পূর্ণ হয়নি, তখন তিনি দিল্লির সেনাপতিকে এই বলে প্ররোচিত করতে লাগলেন যে, এই আফগানদের দমন করা জরুরি, অন্যথায় পরে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। অবশেষে মালিক সিকান্দার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মালিক ফিরোজকে গ্রেপ্তার করলেন এবং ফিরে এসে সিরহিন্দ আক্রমণ করলেন। বাহলুল লোদী এই সুযোগে নারী ও শিশুদের নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলেন, অন্যদিকে মালিক ফিরোজের পুত্র শাহী খান তার যোদ্ধাদের নিয়ে দিল্লির বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন।

জাসরাত খোখর মৃতদেহগুলো পরিদর্শন করতে লাগলেন। এই সময় মালিক ফিরোজের সামনে তার ছেলে শাহী খানের লাশ এসে পড়ল। জাসরাত জিজ্ঞেস করলেন: “এ কে?” মালিক ফিরোজ বললেন: “আমি জানি না।” জাসরাত বললেন: “এই যুবকটি অত্যন্ত সাহসী ছিল। সে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে।”

এ কথা শুনে মালিক ফিরোজ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: “এ আমারই সন্তান। আমি তাকে এজন্য চিনতে অস্বীকার করেছিলাম যাতে কেউ মনে না করে যে সে যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করে মারা গেছে। যাক! এখন আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আর মনে রেখো! আমার ভাতিজা বাহলুল অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবে।”

ঠিক তাই হলো। বাহলুল আফগান যোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করলেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। খুব শীঘ্রই আফগানদের অনেকগুলো দল তার সাথে যোগ দিল। এছাড়া অনেক মুঘল সৈন্যও, যারা সরকারি আচরণে অসন্তুষ্ট ছিল, তারা তার সাথে যোগ দিল। ওদিকে মালিক ফিরোজও বন্দিদশা থেকে পালিয়ে তার ভাতিজা বাহলুলের সাথে এসে মিলিত হলেন। কিছুকাল পর কুতুব খানও নিজের বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমতার লালসার জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং তিনিও এসে নিজের বংশের কাতারে শামিল হলেন। [১]

বাহলুল লোদীর সিরহিন্দ দখল এবং দিল্লির শাহের সাথে চুক্তি:

এই ঐক্যবদ্ধ ও উদ্যমী শক্তি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সিরহিন্দ পুনরায় দখল করে নিল। দিল্লির সম্রাট মুহাম্মদ শাহ তার নতুন উজির হাজি শাদানি ওরফে হিসাম খানকে লস্কর দিয়ে ওদিকে পাঠালেন। খিজরাবাদ ও শাহদারার নিকটবর্তী ‘কধ’ [২] নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে আফগানরা দিল্লির বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়।

---

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭৪ থেকে ৫৭৫।

[২] ‘কধ’ এর অবস্থান নিশ্চিত করা যায়নি, তবে শাহদারা আজও দিল্লির একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা, যা শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত। অন্যদিকে খিজরাবাদ দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লিতে যমুনা নদীর তীরে (বর্তমান ফ্রেন্ডস কলোনির নিকটবর্তী) অবস্থিত। এই এলাকাগুলো তখন দিল্লির শহরতলী ছিল। ইতিহাসে এটি স্পষ্ট নয় যে এই যুদ্ধে আক্রমণকারী কে ছিল? কিন্তু যুদ্ধ যদি দিল্লির এত কাছে হয়ে থাকে, তবে এর অর্থ হলো আফগানরাই আক্রমণ করেছিল।

এরপর বাহলুল লোদীর শাসন পানিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। তবে তিনি একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং আর রক্তপাত চাচ্ছিলেন না। তিনি মুহাম্মদ শাহের কাছে এই বার্তা পাঠালেন: "আমি কেবল হুসাম খানের কারণে দিল্লির শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট। যদি বাদশাহ হুসাম খানকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে উজিরের পদটি হামিদ খানকে দান করেন, তবে দিল্লির সিংহাসনের খেদমত করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

মুহাম্মদ শাহ এই প্রস্তাবকে ফলপ্রসূ মনে করে তেমনই করলেন। তিনি হুসাম খানকে হত্যা করলেন, হামিদ খানকে উজির বানালেন এবং অন্য একজন সহচরকে হুসাম খান (সানি) উপাধি দিয়ে তাকে নায়েবে উজির নিযুক্ত করলেন। [১] এভাবে তিনি বাহলুল লোদীর সাথে সম্পর্ক উন্নত করে নিলেন। [২]

মালওয়ার শাসক মাহমুদ খলজির দিল্লি আক্রমণ:

দিল্লির অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু পূর্বদিকের জেলাগুলোতে বিপদ রয়ে গিয়েছিল। যদিও ৮৪৪ হিজরিতে সেখানকার শাসক ইব্রাহিম শরকির মৃত্যু হয়েছিল, যিনি গত চল্লিশ বছর ধরে জৌনপুরের শাসক হিসেবে চলে আসছিলেন, কিন্তু এখন তার স্থলে তার পুত্র মাহমুদ শরকি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং তার ক্রমবর্ধমান শক্তি যেকোনোভাবেই দিল্লির জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল।

সেই সময় হিন্দুস্তানের অনেক আমির ও উলামা একটি দেশব্যাপী সরকার প্রতিষ্ঠায় 'সৈয়দ বংশের' ক্রমাগত ব্যর্থতা দেখে দিল্লির সিংহাসনে কোনো বিকল্প বংশকে দেখার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেই দিনগুলোতে মাহমুদ খান খলজি, যিনি রাজনীতি, বিচক্ষণতা এবং যুদ্ধবিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, মালওয়ায় নিজের স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের সেই উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাকে দিল্লির সিংহাসন গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। মাহমুদ খলজিও চাচ্ছিলেন যে দিল্লির সিংহাসনে এমন এক ব্যক্তিত্ব আসীন হোক যিনি হিন্দুস্তানের আমিরদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন, ফলে তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ৮৪৪ হিজরিতে (১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দে) দিল্লির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। [৩]

বাহলুল লোদী দিল্লির শাহের সাহায্যকারী:

এমন পরিস্থিতিতে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে সামানার পাঠান সুবাদার বাহলুল লোদী প্রথমবারের মতো সামনে এলেন। দিল্লির তাজদার মুহাম্মদ শাহ মাহমুদ খলজির মোকাবিলার জন্য তার কাছে সাহায্য চাইলেন এবং তিনি বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দেখতে দেখতেই দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন এবং স্থানীয় বাহিনীর সাথে মিলে মাহমুদ খলজির বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। একদিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সন্ধির আলোচনা শুরু হলো। আসলে মাহমুদ খলজি সংবাদ পেয়েছিলেন যে গুজরাটের শাসক তার রাজ্যের ওপর সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। [৪]

---

[১] এই দ্বিতীয় হুসাম খান পরবর্তী শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহের আমলে উজিরের পদ পেয়েছিলেন যেমনটি সামনে আসছে। পুরনো হুসাম খানের সাথে পার্থক্য করার জন্য আমরা তাকে হুসাম খান সানি বলে স্মরণ করব।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭

[৩] এখানে মাহমুদ শরকি এবং মাহমুদ খান খলজির পার্থক্য খেয়াল রাখা জরুরি। একজন ছিলেন পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর শাসক যার কেন্দ্র ছিল জৌনপুর, অন্যজন ছিলেন মালওয়ার শাসক যার কেন্দ্র ছিল মান্ডু।

[৪] ঐতিহাসিক ফেরেশতার মতে, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে গুজরাটের বাদশাহ তার রাজ্যের ওপর আক্রমণ করছেন। যদি সত্যিই এমন হয়ে থাকে তবে সম্ভবত পরে গোয়েন্দারা এর সত্যতা নিশ্চিত করেছিলেন বলেই বাদশাহ এত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য সম্ভাবনা এমনও আছে যে সেটিই ছিল। এও বলা হয়েছে যে বাদশাহ কেবল ফিরে যাওয়ার বাহানা তৈরি করেছিলেন।

সাথে সাথেই তিনি ভালভাবে বুঝতে পারলেন যে যেসব আমীর ও উলামা তাকে দিল্লি দখলের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তারা কোনো সুখে ছিলেন না নতুবা এমন পরিস্থিতি আসত না যে দিল্লির সিংহাসন কারো জন্য নিষ্কণ্টক নয়। কিন্তু মাহমুদ খিলজি সন্ধির কথা শুরু করে নিজের দুর্বলতার প্রমাণ দিতে চাননি। এমন সময় মুহাম্মদ শাহ তাড়াহুড়ো ও অবিবেচনার পরিচয় দিয়ে কিছু উলামা ও আমীরকে সন্ধির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। যদিও সেই সময় দিল্লির সেনাবাহিনীর পাল্লা তুলনামূলক ভারী ছিল। মাহমুদ খিলজির মনের আশা পূরণ হলো এবং তিনি সন্ধির প্রস্তাবের ইতিবাচক উত্তর দিয়ে ফিরে গেলেন।

বাহলুল লোদী এই সন্ধিতে শামিল ছিলেন না, বরং মুহাম্মদ শাহের এই অবিবেচনায় তিনি নিজের মাথা চাপড়ালেন এবং তারপর অন্তত নিজের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি ফিরে যাওয়া শত্রুর পশ্চাৎভাগে আক্রমণ শুরু করে দিলেন এবং তাকে বেশ ক্ষতি পৌঁছালেন। [১]

বাহলুল লোদীর দিল্লির শাহের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ:

মাহমুদ খিলজিকে পিছু হটতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তার ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে বাহলুল লোদী নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। মুহাম্মদ শাহ তাকে নিজের সন্তান হিসেবে ঘোষণা করে তাকে সম্মানিত করেন এবং তাকে 'খান-ই-খানান' উপাধি ও সামানা থেকে দিপালপুর ও লাহোর পর্যন্ত সমস্ত এলাকা তার হাতে অর্পণ করে তাকিদ দেন যে তিনি যেন শিয়ালকোটের বিদ্রোহী জাসরাত খোখরের লাগাম টেনে ধরেন।

কিন্তু বাহলুল লোদীর নজর দিল্লির সিংহাসনের ওপর ছিল। ওদিকে জাসরাত তাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের সাথে সন্ধি চুক্তিতে রাজি করিয়ে নিলেন। এভাবে বাহলুল মুহাম্মদ শাহের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দিল্লির সালতানাত দখলের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি খুব দ্রুত হাজার হাজার পাঠান ও আফগানদের সাথে মিলিয়ে নিলেন এবং এরপর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর মুহাম্মদ শাহের অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পাঞ্জাব থেকে পানিপথ পর্যন্ত সমস্ত এলাকা নিজের দখলে নিয়ে নিলেন। [২]

মুহাম্মদ শাহের মৃত্যু:

মুহাম্মদ শাহ প্রায় বারো বছর শাসন করে শাওয়াল ৮৪৯ হিজরি (ডিসেম্বর ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দ) এ ইন্তেকাল করেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে দিল্লির সালতানাতের সীমানা সংকুচিত হতে এবং এর মর্যাদার সূর্য অস্তমিত হতে দেখেছিলেন। মোটকথা, এই যুগ দিল্লির সালতানাতের ব্যর্থতার চিত্র ছিল। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৬৬, ৫৬৭।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৬২ থেকে ৫৬৮।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৬২ থেকে ৫৬৮।

নোট: মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর তারিখ ফেরেশতা ৮৪৯ হিজরি উল্লেখ করেছেন এবং আমি এটিই গ্রহণ করেছি। কিছু ব্যক্তি দুই বছর আগে অর্থাৎ ৮৪৭ হিজরি উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুর মাস (শাওয়াল-ডিসেম্বর) আব্দুল কুদ্দুস হাশেমীর ক্যালেন্ডার থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

আলাউদ্দীন আলম শাহ

৮৪৯ হিজরি থেকে ৮৫৫ হিজরি

(১৪৪৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ)

মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরি আলাউদ্দীন শাহ 'আলম শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন খামখেয়ালি, অরাজনৈতিক এবং আরামপ্রিয় মানুষ। তবে তিনি যোগ্য উজির হামিদ খানকে তাঁর পদে বহাল রেখেছিলেন এবং এই উজিরের কারণেই সালতানাতের কাজকর্ম চলতে থাকে।

হামিদ খানের পিতা ফতেহ খান অনেক আগে কোনো এক যুদ্ধে একজন হিন্দু অফিসার রায় প্রতাপের পিতাকে হত্যা করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে নিজের হারামে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সময়ের আবর্তনে রায় প্রতাপ এখন দিল্লির দরবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি যেকোনোভাবে হামিদ খানের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলেন। তিনি অন্যান্য আমিরদেরও হামিদ খানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন শাহের অবস্থা যেন দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিন শাহ সালতানাতের স্থিতিশীলতার জন্য আমিরদের সাথে পরামর্শ করলেন। রায় প্রতাপের সাথে সাথে কুতুব খান এবং ঈসা খানের মতো শীর্ষস্থানীয় আমিররা একস্বরে বলতে লাগলেন:

"উজিরকে বরখাস্ত করে পরিস্থিতির উন্নতি করা যেতে পারে কারণ প্রজারা তাঁর ওপর খুব অসন্তুষ্ট।"

বাদশাহ কোনো কিছু চিন্তা না করেই এর ওপর আমল করলেন এবং হামিদ খানকে বন্দি করে নায়েব উজির হুসাম খান সানিকে 'উমদাতুল মুলক' উপাধি দিয়ে সালতানাতের উজির নিযুক্ত করলেন [১]।

তওয়াইফুল মুলুকি:

উপমহাদেশ তো এমনিতেই অনেকগুলো সরকারে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল; দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, বাংলা প্রভৃতি অনেক আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিল্লির সালতানাত এখন দোয়াবেও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বাদশাহর দখলে ছিল কেবল দিল্লি থেকে বদায়ুন পর্যন্ত এলাকা। বাকি এলাকাগুলোর অবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

---

[১] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৩৮, ২৪৭; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৭০, ১৭১।

- বাহলুল লোধি: দিপালপুর, সিরহিন্দ (পাঞ্জাব)
- আহমদ খান মেওয়াতি: মেহরাউলি থেকে শুরু করে দিল্লির নিকটবর্তী শহর "সরাই লাডো" পর্যন্ত
- দরিয়া খান লোধি: সম্ভল থেকে দিল্লির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জনপদ পর্যন্ত
- ঈসা খান তুর্ক-বাচা: কোল (আলীগড়)
- কুতুব খান আফগান: রাপরি (ইটাওয়া জেলা, কনৌজের নিকটবর্তী)
- রায় প্রতাপ: ভোগাঁও, পাতিয়ালি, কাম্পিল
- দাউদ খান: বায়ানা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা [১]

বাদশাহর উজিরের প্রতি অসন্তুষ্টি:

আলাউদ্দিন আলম শাহ তার পিতার শাসনামলে বদায়ূনের সুবাদার ছিলেন এবং তিনি এই এলাকাটি খুব পছন্দ করতেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পর তিনি বাহ্যিক বিপদসমূহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দিল্লি ত্যাগ করে বদায়ূনকে রাজধানী করার কথা ভাবতে শুরু করেন। উজির হুসাম খান সানি অনেক বুঝিয়েছিলেন যে, এভাবে অবশিষ্ট সাম্রাজ্যও হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু আলাউদ্দিন শাহ তার জেদে অটল থাকেন। উল্টো তিনি রাগান্বিত হয়ে উজিরকেই বরখাস্ত করে দেন। [২]

বাদশাহর বদায়ূনে স্থায়ী বসবাস:

বাদশাহ রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে শান্তিতে জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। ৮৫১ হিজরিতে (১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দ) তিনি তার এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেন এবং বদায়ূনে স্থানান্তরিত হন। তার দুই শ্যালক ছিল যাদের হাতে তিনি দিল্লি শহরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু তারা দুজনে পেছনে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল যে শহরবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। উজির হুসাম খান সানিকে আগেই বরখাস্ত করা হয়েছিল, তাই শহর সামলানো এখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।

একদিন বাদশাহর এক শ্যালক শহরবাসীদের হাতে নিহত হয়। পরের দিন হুসাম খান সানির প্ররোচনায় দ্বিতীয় শ্যালককেও খতম করে দেওয়া হয়। বাদশাহর কাছে এই সংবাদ পৌঁছানো হলেও তার কানে জল ঢুকল না। তাকে উদাসীন রাখার জন্য বদায়ূনে আনন্দ-উল্লাসের উপকরণের কোনো অভাব ছিল না। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৬৯

[২] মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃ. ৩৪৭; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৭০

[৩] মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃ. ৩৪৭; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৭০

বাদশাহর এই শ্যালকদের হত্যার ঘটনাটি আমি বদায়ূনী-র বর্ণনা অনুযায়ী লিখেছি। ফিরিশতার বর্ণনা হলো, দুই শ্যালক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে। একজন বেচারা অন্যজনের হাতে নিহত হয় এবং দ্বিতীয়জনকে হুসাম খান কিসাস হিসেবে হত্যা করিয়ে দেন।

উজির হামিদ খানের গ্রেফতারি, মুক্তি এবং দিল্লি দখল:

প্রাক্তন উজির হামিদ খান বিন ফাতাহ খান সেই দিনগুলোতে জেলে ছিলেন। রায় প্রতাপের প্রতিশোধের আগুন তখনও নিভে যায়নি, তাই তিনি কুতুব খান প্রমুখকে নিয়ে বাদশাহর কাছে বদায়ূঁতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন যে, হামিদ খানকে হত্যা করা ছাড়া ফাসাদের মূল নির্মূল করা সম্ভব নয়। যদি এই কাজ সম্পন্ন হয়, তবে আরও অনেক সালতানাতের সরদার দিল্লিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের জায়গিরের বার্ষিক রাজস্ব চল্লিশ লক্ষ পর্যন্ত হবে।

শাহ কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এর অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন রায় প্রতাপ এবং কুতুব খান এই নির্দেশ পালনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন, তখন হামিদ খানের ভাই এবং অন্যান্য উমারাগণ খবর পেয়ে গেলেন যারা হামিদ খানকে পছন্দ করতেন। তারা সবাই মিলে প্রতিরোধ করে হামিদ খানকে মুক্ত করে নিলেন। হামিদ খান নিষ্ঠুরতার প্রমাণ দিয়ে রাজপরিবারের নারী ও শিশুদের নগ্ন মাথায় ও নগ্ন পায়ে শহর থেকে বের করে দিলেন। এভাবে দিল্লিতে হামিদ খান এবং তার সমর্থকদের স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। [১]

বাদশাহর উদাসীনতা এবং আত্মবিস্মৃতি:

বাদশাহর অনুগতরা তার কাছে পৌঁছালেন এবং এই করুণ অবস্থা বর্ণনা করে আবেদন করলেন যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বের হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বর্ষার মনোরম সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বাদশাহর যুদ্ধের কোনো মানসিকতা ছিল না। তিনি বদায়ূঁর সুন্দর বৃষ্টি উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, তাই বলতে লাগলেন: “বর্ষার পর যাব।” মোদ্দাকথা, তিনি আজ-কাল করতে থাকলেন এবং দিল্লি অভিযানের এই দুর্বল চিন্তাটুকুও বাস্তবে রূপ নিতে পারল না। [২]

যখন হামিদ খান দিল্লির সিংহাসন বাহলুলকে অর্পণ করলেন:

এদিকে হামিদ খান এখন দিল্লির সিংহাসনে কোনো শক্তিশালী রাজনীতিবিদকে বসাতে চাচ্ছিলেন। তার সামনে তিনজন প্রার্থী ছিলেন: মালবের মাহমুদ খান খিলজি, জৌনপুরের ইব্রাহিম শারকি এবং সিরহিন্দের বাহলুল লোদি। চিন্তা-ভাবনা করে তিনি বাহলুল লোদিকেই উত্তম মনে করলেন এবং তাকে সিংহাসন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। বাহলুল লোদি সেই সময় সিরহিন্দে নিজের বাদশাহত ঘোষণা করে নিজের নামে খুতবা জারি করে ফেলেছিলেন। দিল্লির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণে তিনি দ্রুতগতিতে দিল্লি এসে পৌঁছালেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করলেন। [৩]

সেই সাথে তিনি আলাউদ্দিন শাহর কাছে একটি সৌজন্যমূলক বার্তা পাঠালেন যাতে বলা হয়েছিল: “আমি আপনার আজ্ঞাবহ গোলাম। যা কিছু করছি তা কেবল সালতানাতের মঙ্গলের জন্যই করছি।” আলাউদ্দিন শাহ কালান্দারসুলভ ভঙ্গিতে এই উত্তর লিখে পাঠালেন: “আমি কোন সুলতান ইবনে সুলতান। মরহুম মুহাম্মদ শাহ আমাকে নিজের ছেলে বানিয়েছিলেন তাই আমি সুলতান হয়েছিলাম। এখন তো আমার...”

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭০, ১৭৫

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৫

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৫

“বাদশাহীর উপকরণও আর অবশিষ্ট নেই। আমার জীবনধারণের জন্য বদায়ূনের শাসনই যথেষ্ট। আমার পিতা তোমাকে নিজের পুত্র বলতেন। সুতরাং আমি সালতানাত তোমার নিকট সোপর্দ করছি।” [১]

এই উত্তরের পর বহলুল লোধিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

আলাউদ্দিন আলম শাহের শাসনকাল ছিল প্রায় পাঁচ বছর কয়েক মাস, যা কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত এই বংশের ক্ষমতার অবসান তার মাধ্যমেই ঘটে। [২]

আলাউদ্দিন আলম শাহের মৃত্যু:

মজার ব্যাপার হলো, আলাউদ্দিন আলম শাহ সালতানাত থেকে অপসারিত হওয়ার পর বদায়ূনের জায়গিরে আটাশ বছর পর্যন্ত একনিষ্ঠ ও নিশ্চিন্ত জীবন অতিবাহিত করেন। তার সবুজ-শ্যামল বিশাল জায়গির গঙ্গা নদীর তীরে “খায়রাবাদ” থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহলুল আলাউদ্দিন আলম শাহের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং তার জায়গিরে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। অবশেষে এই দরবেশসুলভ প্রাক্তন বাদশাহ ৮৮৩ হিজরিতে (১৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) নশ্বর পৃথিবী থেকে পরকালের পথে পাড়ি জমান। [৩]

হাজারো কাফেলার সাথে পরিচিত এই পথ
কোহিনূরের চোখ দেখেছে কতই না মুকুটধারী
মিশর ও ব্যাবিলন মিটে গেছে, চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট নেই
অস্তিত্বের খাতায় তাদের কাহিনী পর্যন্ত নেই [৪]

---

[১] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৪৮; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৭২
আলাউদ্দিন শাহের এই বাক্য “আমি কোন সুলতান ইবনে সুলতান”-এ দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে: প্রথমত, খিজির খান এবং তার সন্তানরা নিজেদের সুলতান বলতেন না বরং তাদের শাসনকে তৈমুরি শাসকদের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে গণ্য করতেন। দ্বিতীয়ত, আলাউদ্দিনের পিতা মুহাম্মদ শাহ, প্রাক্তন বাদশাহ মুবারক শাহের আপন পুত্র ছিলেন না বরং ভাতিজা ছিলেন এবং মুবারক শাহ তাকে পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। এর অর্থ ছিল যে আমরা বংশানুক্রমিক বাদশাহ নই।
[২] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৪৮; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৭২
[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৭২; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৪৮
[৪] ইকবাল

খিজর খানের বংশের শাসন কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

খিজর খান এবং তার সন্তানদের শাসন খুব একটা সফল হতে পারেনি এবং প্রায় ৩৮ বছর স্থায়ী হয়ে শেষ হয়ে যায়। এর পতনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যা তৎকালীন দিল্লি সালতানাতের সাধারণ দুর্বলতাগুলোকেও প্রতিফলিত করে:

•

কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতা এবং তৈমুরের আক্রমণ:

সৈয়দ বংশের শাসনের সূচনা হয়েছিল আমির তৈমুরের আক্রমণের পর দিল্লি সালতানাত সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ার পর। তৈমুরের আক্রমণ দিল্লি সালতানাতের মারাত্মক ক্ষতি করেছিল, যার ফলে আওধ, বাংলা, জৌনপুর, গুজরাট এবং মালওয়ার মতো বড় রাজ্যগুলো স্বাধীন হয়ে যায়। খিজর খানকে তৈমুরের পক্ষ থেকে মুলতান ও দিপালপুরের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তিনি দিল্লিও দখল করে নেন। সংক্ষেপে, সৈয়দ বংশ শুরু থেকেই একটি দুর্বল ও বিভক্ত সালতানাত পেয়েছিল, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে খিজর খান এবং তার উত্তরাধিকারীরা একজন "সুলতান" এর চেয়ে একজন "আঞ্চলিক শাসক" হিসেবেই বেশি ছিলেন।

•

দুর্বল নেতৃত্ব এবং অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র:

মুবারক শাহের পর মুহাম্মদ শাহ এবং আলাউদ্দিন আলম শাহ দুর্বল ও অযোগ্য প্রমাণিত হন। তাদের মধ্যে সালতানাতকে সুসংহত করার সক্ষমতা ছিল না। দরবারে উমারা এবং সরদারদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র চরমে ছিল। এই শক্তিশালী উমারাগণ কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে প্রায়ই বিদ্রোহ করতেন। বিশেষ করে আফগান উমারা এবং রাজপুত সরদারদের ক্রমবর্ধমান শক্তি কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও দুর্বল করে দিয়েছিল।

•

আর্থিক দুরবস্থা এবং অর্থনৈতিক চাপ:

সালতানাতের দুর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে আর্থিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজস্ব আদায়ে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং রাজকোষ শূন্য হতে থাকে। রাজকীয় জাঁকজমকের পেছনে অত্যধিক ব্যয়ও আর্থিক বোঝা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ওপর করের বোঝা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে উৎপাদন কমে যায় এবং মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। আর্থিক দুর্বলতার কারণে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

•

বিদ্রোহ এবং আঞ্চলিক সরদারদের উত্থান:

সৈয়দ শাসকরা দিল্লির আশেপাশের এলাকাগুলোতেও তাদের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কাটিহার, বদায়ুন, ইটাওয়া, গোয়ালিয়র এবং...

মেওয়াতের মতো স্থানগুলোতে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ অব্যাহত ছিল। এই অঞ্চলের স্থানীয় সর্দার ও জায়গিরদাররা স্বাধীন মর্যাদা লাভ করেছিল এবং তারা দিল্লিকে কোনো গুরুত্বই দিত না। সৈয়দ শাসকরা এই বিদ্রোহগুলো স্থায়ীভাবে দমন করতে ব্যর্থ হন।

৫. বাহ্যিক বিপদ এবং লোদী বংশের উত্থান:

দিল্লির আশেপাশে বেশ কিছু শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে উঠছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল লোদী বংশ। বাহলুল লোদী, যিনি একজন আফগান সর্দার ছিলেন, নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন এবং তার দৃষ্টি ছিল দিল্লির ওপর। সৈয়দ শাসকদের দুর্বলতা এবং লোদীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সৈয়দ বংশের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। অবশেষে, লোদীরা দিল্লি দখল করে নেয় এবং সৈয়দ বংশের অবসান ঘটে।

পরিশেষে, উল্লিখিত সকল কারণ মিলে সৈয়দ বংশের শাসনকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং একে একটি স্বল্পস্থায়ী শাসনে পরিণত করে। এটি মূলত একটি 'সংক্রমণকাল' ছিল যা 'তুঘলক বংশ' এবং 'লোদী বংশ' প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী স্বল্প সময়ের জন্য এসেছিল।

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ষষ্ঠ খণ্ড

লোদী বংশ

৮৫৫ হিজরি থেকে ৯৩২ হিজরি

(১৪৫১ খ্রি. থেকে ১৫২৬ খ্রি.)

শাসনের সময়কাল: হিজরি বছর: ৭৭ বছর - সৌর বছর: ৭৫ বছর

https://t.me/BoierSomahar

লোদীদের পরিচিতি

আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তানে বসতি স্থাপনকারীদের ধারা গোলাম বংশ এবং মঙ্গোল আক্রমণের সময়কাল থেকেই জারি ছিল। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে তাদের আগমন এবং সেনাবাহিনীতে নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। যখন ৬৫৮ হিজরিতে বলবন সগির (ভবিষ্যতের গিয়াসউদ্দিন বলবন) মেওয়াতের অভিযানে বের হয়েছিলেন, তখন তিন হাজার আফগান তাঁর সাথে ছিলেন।

বলবন দিল্লি, দোয়াব এবং আওধের মহাসড়কগুলোতে যে নিরাপত্তা চৌকিগুলো স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোতে তিনি বেশিরভাগ আফগানদের নিযুক্ত করেছিলেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, এই অঞ্চলের বিদ্রোহী ডাকাতদের কেবল এই লোকেরাই দমন করতে পারবে।

আলাউদ্দিন খলজির কর্মকর্তাদের মধ্যেও কিছু আফগান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদ তুঘলকের যুগে আমিরানে সদাহর ব্যবস্থায় আফগান কর্মকর্তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, বরং মনে হয় যে এই ব্যবস্থায় তাদের সংখ্যাই ছিল গরিষ্ঠ। তাদের মধ্যে কাজী জালাল আফগান এবং মালিক ইসমাইল আফগান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ছিল তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর এই কারণেই যখন দাক্ষিণাত্যে আমিরানে সদাহ বিদ্রোহ করল, তখন মুহাম্মদ তুঘলক লাখ চেষ্টা করেও তাদের দমন করতে পারেননি। [১]

পরবর্তী শতাব্দীতে যখন ফিরোজ শাহ তুঘলক পদ ও পদবীগুলোকে বংশানুক্রমিক করে দিলেন, তখন আফগান উমারা ও কর্মকর্তাদের শিকড় নিজ নিজ স্থানে আরও গভীর হলো। তুঘলক যুগের শেষ দিকে দোয়াবেও আফগান কর্মকর্তাদের আরও নিয়োগ সম্পন্ন হলো। একইভাবে মুলতানের শাসকরাও বিপুল সংখ্যায় আফগান পেশাদার সৈনিকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি দিয়েছিলেন। এই যুগে আমরা দৌলত খান দবির লোদী এবং আসাদ খান লোদীর মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দেখতে পাই। দৌলত খান দীর্ঘ সময় সিপাহসালার ছিলেন, অন্যদিকে আসাদ খানকে সাম্ভালের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল। 'সৈয়দ বংশের' শাসনামলে আফগান কর্মকর্তাদের আরও পদ ও পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং তারা সরকারের একটি শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হয়। এই সময়েই লোদী বংশের আফগানরা সামনে আসতে শুরু করে। [২]

লোদী বংশের কাহিনী:

ঐতিহাসিক ফেরেশতার মতে, "লোদী" ছিল ব্যবসায়ী পেশার পাঠানদের একটি গোত্র। এরা উত্তর হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে বসবাস করত। তাদের মধ্যে অনেকেই সেনাবাহিনীতে নিয়োগ পেয়ে উচ্চপদে পৌঁছে গিয়েছিল। পাঠানদের মধ্যে একজন সরদার ছিলেন মালিক বাহরাম লোদী, যিনি ফিরোজ শাহ তুঘলকের যুগে মুলতানে এসেছিলেন এবং এখানকার সুবাদার মাদান দৌলতের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

---

[১] তাবকাতে নাসিরি: পৃ. ৩১৫; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আজ বারানি: পৃ. ৫৩, ৫৬।

[২] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৯৪০ থেকে ৯৪৩।

ছিল। মালিক বাহরাম লোদীর পাঁচজন পুত্র ছিল: মালিক সুলতান শাহ, মালিক কালা, মালিক ফিরোজ, মালিক মুহাম্মদ এবং মালিক খাজা। তারাও বিভিন্ন সরকারি পদে কাজ করতে শুরু করেন। যখন মুলতানের শাসনভার খিজির খান পেলেন, তখন এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সুলতান শাহ তার সাহচর্য ও চাকুরির সুযোগ লাভ করেন।

যখন দিল্লি থেকে ইকবাল খান মালু সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুলতান দখলের জন্য এল এবং পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল, তখন খিজির খানের যে দলটি তাকে হত্যা করেছিল, তার নেতৃত্ব এই সুলতান শাহই দিচ্ছিলেন। খিজির খান এই কৃতিত্বের জন্য তাকে 'ইসলাম খান' উপাধি দিয়ে 'সিরহিন্দ'-এর শাসক বানিয়ে দেন এবং তিনি ইসলাম খান লোদী নামে পরিচিত হন।

ইসলাম খান তার ভাই মালিক কালাকে 'দোরালা'-এর শাসক বানিয়ে দেন। সেই সময় তার স্ত্রী (যিনি তার চাচাতো বোন ছিলেন) গর্ভবতী ছিলেন এবং সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্তী ছিল। এমন সময় হঠাৎ ঘরের ছাদ ধসে পড়ে। মহিলাটি এমন গুরুতর আহত হন যে তিনি প্রাণে বাঁচতে পারেননি, তবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গর্ভ থেকে শিশুটিকে নিরাপদে বের করে আনা হয়। তার নাম রাখা হয় 'বালু'।

কিছুকাল পর মালিক কালা 'নিয়াজি আফগানদের' সাথে এক বিবাদে নিহত হন এবং 'বালু' নামক এই শিশুটি মায়ের পর বাবার ছায়া থেকেও বঞ্চিত হয়। এমন অবস্থায় তার চাচা ইসলাম খান লোদী তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিশুটি বড় হলে 'বাহলুল' নামে পরিচিতি পায় এবং অত্যন্ত প্রতিভাবান প্রমাণিত হয়। ইসলাম খান কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে একজন দক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলেন। তার সেবা ও আনুগত্যে তিনি এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন যে নিজের মেয়েকেও তার সাথে বিবাহ দেন।

সৈয়দ বংশের তৃতীয় শাসক মুহাম্মদ শাহের আমলে ইসলাম খান লোদীর মৃত্যু হয়। যদিও ইসলাম খানের নিজের পুত্ররাও যুবক ছিল, কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার অসিয়তে বাহলুলকেই নিজের উত্তরসূরি নির্ধারণ করেন, ফলে বাহলুল 'সিরহিন্দ'-এর সুবাদার হন। তার শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে দশ-বারো হাজার আফগান তার সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় যাদের তিনি নিজের কোষাগার থেকে বেতন প্রদান করতেন। [১]

এর মধ্যে দিল্লির সম্রাট মুহাম্মদ শাহ এবং বাহলুল লোদীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতিও ঘটেছিল কিন্তু শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায় এবং যখন মালওয়ার শাসক মাহমুদ খিলজি দিল্লি আক্রমণ করেন, তখন বাহলুল দিল্লিতে এসে এই আক্রমণ ব্যর্থ করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। এই কৃতিত্বের জন্য দিল্লির সিংহাসন থেকে তাকে 'খান-ই-খানান' উপাধি দেওয়া হয়। [২]

---

[১] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২১১; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ২, ৩, ৫৭। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমল থেকে সুবাদারি এবং বড় বড় পদগুলো বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল, তাই সুবাদারগণও বাদশাহদের মতো নিজেদের সন্তান বা কোনো নিকটাত্মীয়কে নিজের উত্তরসূরি বানিয়ে দিতেন।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৭।

তারিখ-ই-মিল্লাত

বাহলুল লোদী

৮৫৫ হিজরি থেকে ৮৯৪ হিজরি

(১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

যখন দিল্লির শাহ মুহাম্মদ শাহের মৃত্যু হলো এবং তাঁর উত্তরসূরি আলাউদ্দিনের সময়ে সৈয়দ বংশের শাসন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন দিল্লির সবচেয়ে প্রভাবশালী আমির হামিদ খান বাহলুল লোদীকে রাজসিংহাসন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বাহলুল লোদী ৮৫৫ হিজরি (১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ) সালে দিল্লিতে আসেন এবং তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। [১]

হামিদ খানের পদচ্যুতি:

বাহলুল লোদী কিছুকাল পর হামিদ খানের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে বিপদ অনুভব করলেন, ফলে তাঁকে পদচ্যুত করা হলো। বাহলুল লোদী তাঁকে আর কোনো কষ্ট দেননি এবং বললেন: “উচিত এটাই যে তুমি নির্জনে অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত করো।” [২]

বাহলুলের শাসনের বৈশিষ্ট্য:

সেই সময় দিল্লির শাসনব্যবস্থা দুর্বলতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং এর আয়তন অনেক সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। বাহলুল লোদী ক্ষমতা গ্রহণ করে দিল্লির বিদ্রোহী আমিরদের, যারা স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, একে একে দমন করেন এবং তাদের প্রদেশগুলোকে পুনরায় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। মেওয়াত, জৌনপুর এবং গোয়ালিয়র পুনরায় দিল্লি সালতানাতের অধীনে চলে আসে। সংক্ষেপে, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে একটি মৃতপ্রায় সালতানাতে পুনরায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন এবং একে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল, সিরহিন্দেও বিশ্বাসঘাতকরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল কিন্তু তিনি সমস্ত বিরোধীদের দমন করেন। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৭১

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৭৮, ৫৭৯

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৭৭ থেকে ৫৮৮

https://t.me/BoierSomahar

বহলুলের আমীর এবং সহচরগণ:

বহলুল লোদীর দরবারী, আমীর এবং সহচরদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন বংশ, জাতি ও ধর্মের যোগ্য ব্যক্তিদের একত্রিত দেখতে পাই। বহলুলের আসল শক্তি ছিল আফগান ও পাঠান আমীরগণ। এরপর মোগলদের ওপর তার অধিক আস্থা ছিল। তার সেনাবাহিনীতে বিশ হাজার সৈন্য মোগল বংশোদ্ভূত ছিল। নিজের সমর্থক বানিয়ে রাখার জন্য সে প্রত্যেক যোগ্য সর্দারকে জায়গির ও উচ্চ পদে ভূষিত করত। সে রাজপুত সর্দারদেরও বড় পদমর্যাদা দিয়েছিল এবং হিন্দুদের অধিকারের পূর্ণ খেয়াল রাখত। বলা যেতে পারে যে, বহলুল লোদীর শাসনকাল পূর্ববর্তী সুলতানদের তুলনায় অধিক গণতান্ত্রিক ছিল। ঐতিহাসিকগণ বহলুলের সাহায্যকারী প্রায় ৩৪ জন রাষ্ট্রীয় সদস্যকে গণনা করেছেন, যাদের মধ্যে পাঁচ ধরনের ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন:

- নিকটাত্মীয়: কুতুব খান (বিন ইসলাম খান লোদী) বহলুল লোদীর চাচাতো ভাই, শ্যালক এবং দক্ষিণহস্ত ছিল।
- দরিয়া খান লোদী, জাহান খান লোদী, তাতার খান লোদী। এই চারজন বহলুল লোদীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল।
- শাহজাদাগণ: বহলুলের নয়জন পুত্র ছিল যারা সালতানাতের কাজে অত্যন্ত সাহায্যকারী ছিল:
- খাজা বায়েজিদ। সে সবার বড় ছিল। (বহলুল লোদীর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সে মারা যায়। শাহজাদা আজম হুমায়ুন তারই পুত্র ছিল।)
- নিজাম খান (যে পরবর্তীতে সিকান্দার লোদী উপাধিতে বাদশাহ হয়েছিল)
- মুবারক খান (যে বারবক শাহ উপাধিতে জৌনপুরের শাসক হয়েছিল)
- আলম খান (যে পরবর্তীতে দিল্লির শাহ হয়ে আলাউদ্দিন নামে পরিচিত হয়।)
- জামাল খান, ইয়াকুব খান, ফাতাহ খান, মুসা খান, জালাল খান [১]
- আফগান আমীরগণ: লোদী গোত্র ছাড়াও অনেক আফগান আমীর এই ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল, যেমন: মুবারক খান লোহানী, উমর খান শিরওয়ানী, শামশের খান, উজির খান প্রমুখ।
- মোগল আমীরগণ: বহলুল লোদী মোগল অফিসার ও যোদ্ধাদের ওপর অনেক আস্থা রাখত, অথচ এর আগে পরিস্থিতি ছিল বিপরীত। ফলে এই যুগে অনেক মোগল সর্দার উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল।
- হিন্দু সর্দার: বহলুল লোদী হিন্দু সর্দারদের বিশেষ করে রাজপুতদের সাথে নিয়েছিলেন এবং তাদের আস্থা অর্জন করেছিলেন, তাই এই যুগে আমাদের কাছে তাদের প্রতিনিধিত্ব পূর্ববর্তী যুগগুলোর তুলনায় অধিক দৃশ্যমান হয়। এই সর্দারদের মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলো উল্লেখযোগ্য ছিল:

রায় প্রতাপ, রায় করণ, রায় লখন [২]

---

[১] তারিখ-ই-দাউদী-এর লেখক পুত্রদের এই ক্রমই বর্ণনা করেছেন (পৃ. ৫১)। বায়েজিদের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি জানান যে, সে সবার বড় ছিল। এছাড়া এই ক্রমে বর্ণিত প্রথম চারজন পুত্র বাদশাহ বা সুবাদার হয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে, এই নামগুলো পুত্রদের বয়সের ক্রমানুসারে রয়েছে।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৭৭৫

বাহলুল লোদীর গুণাবলি:

বাহলুল লোদী দিল্লির সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় শাসনকারী বাদশাহ ছিলেন, যিনি ৩৮ বছর ৮ মাস ৭ দিন রাজত্ব করেছিলেন। ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেছেন:

"তিনি ধর্ম ও শরীয়তের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। সফর ও আবাসে অধিকাংশ সময় উলামা, সুলাহা ও মাশায়েখদের সাথে থাকতেন। আফগান গোত্রীয় প্রধানদের সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতেন। তাদের উপস্থিতিতে রাজসিংহাসনে নয় বরং একটি গালিচার ওপর বসতেন। যখন তিনি দিল্লি জয় করলেন, তখন পূর্ববর্তী সুলতানদের ধনভাণ্ডার আফগান গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। নিজেও তা থেকে ততটুকুই নিলেন যতটুকু অন্যদের দিয়েছিলেন। তিনি না নিজের ঘরের খাবার খেতেন, না উচ্চবংশীয় রাজকীয় ঘোড়ায় সওয়ার হতেন। বরং প্রতিদিন তাঁর আমিরদের মধ্য থেকে কারো ঘর থেকে আসা খাবার খেতেন এবং সওয়ারির সময় তাদেরই কারো ঘোড়ায় চড়ে বসতেন। বলতেন যে, আমার জন্য সালতানাতের নামই যথেষ্ট। তিনি সৈন্যদের মধ্যে মোগলদের ওপর খুব আস্থা রাখতেন এবং এ কারণেই তাঁর কাছে এবং তাঁর খাস লোক, শাহজাদা ও আমিরদের কাছে মোগল কর্মচারীদের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার হয়ে গিয়েছিল। যার সম্পর্কেই শুনতেন যে সে সাহসী ও যোদ্ধা, কাউকে তার কাছে পাঠিয়ে তাকে ডেকে নিতেন এবং তার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহসী ও বীর ছিলেন। শাসনকার্য ও রাজনীতির কলাকৌশল খুব ভালো জানতেন। তাঁর কাজে কোনো তাড়াহুড়ো ছিল না। সালতানাতের কাজগুলো অত্যন্ত সতর্কতা ও পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতেন এবং ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করতেন।" [১]

উজির-এ-সালতানাত হামিদ খানের বিরুদ্ধে অদ্ভুত কৌশল:

বাহলুল লোদীকে দিল্লির সিংহাসন পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে উজির-এ-সালতানাত হামিদ খানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, কিন্তু বাদশাহ হওয়ার পর বাহলুল লোদী তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর পক্ষ থেকে গাদ্দারির আশঙ্কাও করতে থাকেন। হামিদ খান পূর্ববর্তী রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী অত্যন্ত শান-শওকত ও কঠোর পাহারার মধ্যে থাকতেন। বাহলুল চাইতেন না যে তিনি আক্রমণ করে এবং রক্তপাত ঘটিয়ে তাকে কাবু করবেন। তাই তিনি এমন এক কৌশল চিন্তা করলেন যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে।

তিনি একদিন হামিদ খানের সাথে দেখা করতে তাঁর হাভেলিতে গেলেন এবং সাথে নিজের পাঠান সঙ্গীদেরও নিয়ে গেলেন। হামিদ খান ভীত ছিলেন যে বাহলুল হয়তো তাকে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বের করে দেবেন। বাহলুলও তাঁর মনের কথা আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই যাওয়ার আগে পাঠানদের বুঝিয়ে দিলেন: "তোমরা হামিদ খানের সামনে এমন সব বোকামি করবে যাতে সে তোমাদের তুচ্ছ মনে করে এবং তোমাদের ভয় তার মন থেকে পুরোপুরি দূর হয়ে যায় এবং সে তোমাদের সাথে বেতাকলুফ হয়ে পড়ে।"

যখন এই পাঠানরা বাহলুলের সাথে হামিদ খানের কামরায় পৌঁছাল, তখন কেউ কেউ নিজেদের জুতো খুলে কোমরবন্ধের সাথে বেঁধে নিল, কেউ কেউ সেগুলো তাকের ওপর রাখতে লাগল। হামিদ খান জিজ্ঞেস করলেন: "এসব কী করছ?" তারা বলল: "জুতো যেন কোথাও চুরি না..."

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৮৯, ৫৯০।

“হয়ে যান।” হামিদ খান হেসে বললেন: “নিশ্চিন্ত থাকো। এখান থেকে তোমাদের জুতো কেউ নিয়ে যাবে না।”

কিছুক্ষণ পর কথোপকথনের মাঝে এক পাঠান হামিদ খানকে বললেন: “খান সাহেব! আপনি এখানে এত চমৎকার গালিচা বিছিয়ে রেখেছেন। এর কিছু টুকরো আমাদেরও দিয়ে দিন। আমরা তা দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের জন্য টুপি বানিয়ে নেব।”

হামিদ খান হেসে বললেন: “বেফিকির থাকো। আমি তোমাদের এই কাজের জন্য উন্নত মানের কাপড় দিয়ে দেব।”

খাওয়া শেষ হওয়ার পর ফুল দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো এবং এরপর ফুলের থালা ও আতরের বাটি আনা হলো। [১]

কিছু পাঠান আতর চেটে নিলেন। কেউ কেউ ফুল ছিঁড়ে চিবোতে লাগলেন। যখন পান পরিবেশন করা হলো, তখন কেউ কেউ পানের খিলি তুলে খুলে ফেললেন, তাতে লাগানো চুন চেটে নিলেন এবং খিলিগুলো ফেলে দিলেন। এরপর যখন চুনে মুখ জ্বলতে শুরু করল, তখন তা-ও থুতু দিয়ে ফেলতে লাগলেন। হামিদ খান এই তামাশা দেখে আনন্দ পাচ্ছিলেন। শেষে তিনি বাহলুলকে বললেন:

“তোমার সঙ্গীরা তো বড় অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করছে?”

বাহলুল ক্ষমা চেয়ে বললেন: “এরা সবাই গ্রাম্য এবং মূর্খ। শহরের আদব-কায়দা সম্পর্কে এরা অনভিজ্ঞ।”

বাহলুল লোদী এখন সাধারণত অনেক পাঠানকে সাথে নিয়ে হামিদ খানের সাথে দেখা করতে যেতেন। তবে নিয়ম ও শিষ্টাচার অনুযায়ী প্রহরীরা প্রায়ই পাঠানদের বাইরেই আটকে দিত এবং বাহলুলের সাথে কেবল সরকারি পাঠান কর্মকর্তাদের যেতে দিত।

একদিন বাহলুল হামিদ খানের হাভেলিতে যাওয়ার সময় পাঠানদের বলে দিলেন যে, তোমরা প্রহরীদের জোরপূর্বক মারধর করে, আমাকে গালি দিতে দিতে, আমার পিছু পিছু অস্ত্রসহ ভেতরে ঢুকে পড়বে।

ফলে তেমনটাই হলো। যখন প্রহরীরা পাঠানদের বাধা দিল, তখন তারা তাদের মারধর করে জোরপূর্বক প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। হামিদ খান শোরগোল শুনে বিষয়টি জানতে চাইলে পাঠানরা চিৎকার করে বলল:

“বাহলুল ভেতরে প্রবেশ করে সাক্ষাতের সম্মান লাভ করবে, আমরা কেন বাইরে থেকে সালাম ও দোয়া থেকে বঞ্চিত থাকব?”

হামিদ খান প্রহরীদের বললেন: “ওদের ভেতরে আসতে দাও, পথ আটকাবে না।”

এখন পাঠানদের এক বিশাল ভিড় ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্য থেকে প্রতি দু’জন ব্যক্তি মিলে হামিদ খানের একজন করে কর্মচারীকে কাবু করে ফেলল। এবার বাহলুলের চাচাতো ভাই কুতুব খাঁ লোদী নিজের আস্তিন থেকে হাতকড়া বের করে হামিদ খানের সামনে রাখলেন এবং বললেন: “কল্যাণ এতেই আছে যে তুমি নির্জনে চলে যাও। আমাদের ওপর তোমার লবণের হক রয়েছে, তাই তোমাকে হত্যা করা হবে না।”

হামিদ খান বললেন: “আমি তোমাদের সাথে কী অন্যায় করেছিলাম যে আমার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হলো?”

কুতুব খাঁ উত্তর দিলেন: “আমরা আপনার প্রাণের কোনো ক্ষতি করতে চাই না, কিন্তু যেহেতু আপনি আপনার মনিব সুলতান আলাউদ্দিনের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলেন, তাই আমাদের আপনার ওপর আস্থা নেই।” এই বলে কুতুব খাঁ তার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলেন এবং তাকে দুর্গের বাইরে নির্মিত একটি নতুন হাভেলিতে বন্দি করে রাখলেন।

---

[১] এটি সেই সময়ের সংস্কৃতি ছিল যে, দাওয়াত ও অনুষ্ঠানে ফুলের থালা এবং আতরের বাটি সামনে রাখা হতো যাতে মজলিস সুগন্ধে ভরে ওঠে।

যদিও বাহলুল লোদীর তার মহসিনের সাথে এই আচরণ প্রশংসনীয় নয় বরং ত্রুটিপূর্ণ, তবে তিনি রক্তপাত ছাড়াই নিজের একজন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন, যা তার চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। [১]

জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধসমূহ

বাহলুল যখন সিংহাসন আরোহণ করেন, তখন তার সামনে অনেক সমস্যা ছিল যা মোকাবিলা করা সহজ ছিল না। তার আশেপাশে অনেক শক্তিশালী প্রতিবেশী ছিল। দক্ষিণে মালব এবং পূর্বে জৌনপুর রাজ্যগুলো ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তদুপরি, দিল্লির প্রাক্তন শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহ তখনও বদায়ূনে অবস্থান করছিলেন। যদিও তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, তবুও বাহলুল তাকে বিপদ হিসেবে মনে করতেন, বিশেষ করে এই কারণে যে জৌনপুরের সুলতান ছিলেন তার জামাতা, যিনি সেই সম্পর্কের সূত্রে নিজেকে দিল্লির সিংহাসনের অধিকতর হকদার মনে করতেন।

এই কারণেই সুলতান বাহলুল লোদীর দীর্ঘ শাসনামলের একটি বিশাল অংশ দিল্লি সালতানাতকে রক্ষা করতে এবং বিশেষ করে জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছিল, যা ছিল দিল্লির সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। এই যুদ্ধগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথম যুদ্ধ, দিল্লির লড়াই:

সিংহাসন আরোহণের কিছুকাল পর বাহলুল লোদী পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা উন্নত করার জন্য দিপালপুর ও মুলতান সফরে যান। এদিকে জৌনপুর রাজ্যের শাসক মাহমুদ শারকির স্ত্রী (যিনি দিল্লির প্রাক্তন বাদশাহ আলাউদ্দিন আলম শাহের কন্যা ছিলেন) তার স্বামীকে প্ররোচিত করে বললেন: “দিল্লি আমার পিতার দেশ। সেখানে শাসন করার বাহলুল কে? আপনি যদি বাহলুলের সাথে যুদ্ধ না করেন, তবে আমি নিজেই তীর ও তূণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হব।”

এই বিদ্রূপ শুনে মাহমুদ শারকি আর স্থির থাকতে পারলেন না এবং তিনি দিল্লি আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। এই সময়ে দিল্লিতে প্রাক্তন শাসক পরিবারের কিছু অনুসারী, যারা নতুন শাসককে পছন্দ করত না, তারা বাহলুলের অনুপস্থিতিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে মাহমুদ শারকিকে দিল্লি দখলের আমন্ত্রণ জানায়। ফলে মাহমুদ শারকি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দিল্লি দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যাতে এক আঘাতেই তা জয় করে নিতে পারেন। [২]

সুলতান বাহলুল লোদী সংবাদ পেয়ে মাহমুদ শারকির কাছে বার্তা পাঠালেন যে তিনি যুদ্ধ চান না। আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমাধান বের করা উত্তম হবে, কিন্তু মাহমুদ শারকি, যিনি বিজয় সন্নিকটে দেখছিলেন, তা মানলেন না এবং অগ্রসর হয়ে দিল্লি অবরোধ করলেন। যদিও প্রাচীরের উচ্চতার কারণে আক্রমণকারীরা শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না, তবে শহরের ভেতরে রক্ষী বাহিনী ছিল খুবই কম। সুলতান বাহলুল লোদী কখন ফিরে আসবেন তার কোনো হদিস ছিল না। অবশেষে শহরবাসী সৈয়দ শামসুদ্দিন নামক এক কর্মকর্তাকে সন্ধির আলোচনার জন্য পাঠালেন। মাহমুদ শারকি শর্ত দিলেন যে শহরের চাবি তার হাতে তুলে দিতে হবে, এর বিনিময়ে আফগান আমিরগণ এবং

---

[১] তারিখ-ই-দাউদি, পৃ: ৪৭, ৪৮

[২] তারিখ-ই-দাউদি-এর লেখক এই বাহিনীকে এক লক্ষ সত্তর হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং চৌদ্দশ হাতির সমন্বয়ে গঠিত বলে উল্লেখ করেছেন, তবে এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

তাদের পরিবার-পরিজনকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য একটি নিরাপদ পথ দেওয়া হবে।

মাহমুদ শরকির বাহিনীতে সম্ভলের শাসক দরিয়া খান লোধিও একটি বড় দল নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের আগে সৈয়দ শামসুদ্দিন তার সাথে নির্জনে দেখা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন: “মাহমুদ শরকির সাথে তোমার সম্পর্ক কী?”

সে বলল: “কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কেবল তার একজন কর্মচারী।”

জিজ্ঞাসা করলেন: “বাহলুল লোধির সাথে সম্পর্ক কী?” উত্তর এল: “আমরা ভাই। সেও লোধি আর আমিও।”

জিজ্ঞাসা করলেন: “বাহলুলের মা ও বোনেরা তোমার কী হয়?” দরিয়া খান বললেন: “তারা আমার মা ও বোনদের মতো।”

শামসুদ্দিন শহরের চাবিগুলো তার সামনে রেখে বললেন: “এই নাও চাবি, নিজের মা ও বোনদের অপমানিত করো।”

দরিয়া খান লজ্জায় নুয়ে পড়লেন এবং বললেন: “সুলতান বাহলুল এখানে থাকলে কথা ভিন্ন হতো। যাই হোক, আমি কোনো ব্যবস্থা করছি।”

এই বলে তিনি সুলতান মাহমুদ শরকির কাছে গেলেন এবং বললেন: “শামসুদ্দিন শহরের চাবিগুলো পেশ করেছিলেন কিন্তু আমি তা গ্রহণ করিনি কারণ খবর রটেছে যে বাহলুল লোধি একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে পৌঁছাতে চলেছেন। আগে তাকে পরাজিত করা জরুরি। তারপর শুধু দিল্লি কেন, পুরো সাম্রাজ্যই আমাদের হবে।”

সুলতান এ কথা শুনে সেনাপতি ফতেহ খান হারবিকে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং ত্রিশটি হাতি সম্বলিত একটি বাহিনী দিয়ে সামনে পাঠিয়ে দিলেন। ওদিকে বাহলুল লোধি দ্রুত ফিরে আসার সময় দুর্গগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন, তবে তার বাহিনী চৌদ্দ হাজারের বেশি হতে পারেনি। দিল্লি থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ‘নরিলা’ [১] এর কাছে তার প্রতিপক্ষের সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

বাহলুল লোধি প্রথমে প্রতিপক্ষের হাতিগুলোর আতঙ্ক দূর করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন। তার আদেশে তার শ্যালক কুতুব খান (বিন ইসলাম খান) এমন একটি তীর নিক্ষেপ করলেন যা শত্রুর সবচেয়ে বিপজ্জনক হাতির কপালে বিঁধে গেল এবং হাতিটি সেখানেই মারা গেল।

এরপর বাহলুল প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্য ক؁ের দিকে মনোযোগ দিলেন। প্রতিপক্ষের বাহিনীতে দরিয়া খান লোধি কয়েক হাজার আফগানের সাথে উপস্থিত ছিলেন। বাহলুলের আদেশে কুতুব খান তাকে ডাকলেন এবং দিল্লিতে অবস্থানরত পাঠান নারীদের কথা উল্লেখ করে তার আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত করলেন। দরিয়া খান আগে থেকেই বাহলুল লোধিকে জয়ী করতে চেয়েছিলেন। তিনি এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ময়দান থেকে সরে গেলেন যে তাকে ধাওয়া করা হবে না।

এখন প্রতিপক্ষের কেবল সেই বাহিনীটিই সামনে ছিল যা ফতেহ খানের নেতৃত্বে ছিল এবং মানসিকভাবে দমে গিয়েছিল। বাহলুল এক আক্রমণেই তাদের ছত্রভ؎ করে ফতেহ খানকে বন্দি করে ফেললেন। [২]

বাহলুলের বাহিনীতে রায় করণ নামক একজন হিন্দু সর্দারও ছিলেন যার পিতাকে ফতেহ খান কোনো এক যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। ফলে...

---

[১] ‘নরিলা’ এখন দিল্লি শহরের সম্প্রসারণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর নাম এখনও এটাই।

[২] এখানে উৎসগুলোতে যুদ্ধের কোনো বিস্তারিত বিবরণ নেই তবে ধারণা করা যায় যে এখানে সরাসরি যুদ্ধের প্রয়োজন পড়েনি বরং গোয়েন্দাদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের নেতৃত্বের সঠিক অবস্থান জেনে সেখানে অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছিল, তবেই ফতেহ খান ত্রিশ হাজার সৈন্য থাকা সত্ত্বেও জীবিত ধরা পড়েন।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ফাতহ খানকে রায়ের হাতে সোপর্দ করা হলো এবং তিনি তাকে হত্যা করলেন। এই সংবাদে মাহমুদ শারকির সাহস ভেঙে গেল। তিনি অনুভব করলেন যে তার সেনাবাহিনীতে বিশ্বাসঘাতক অনেক বেশি, তাই তিনি অতি কষ্টে পিছু হটে ফিরে গেলেন। বাদাউনি এই যুদ্ধের সময়কাল ৮৫৬ হিজরি (১৪৫২ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন। [১]
স্বল্প শক্তি নিয়ে এত বড় বাহিনীকে পিছু হটানো বাহলুলের জন্য ছিল এক বিরাট কৃতিত্ব।

অন্যান্য বিজয়সমূহ:
এই বিজয়ের পর বাহলুল লোদির জন্য পরিস্থিতি আরও অনুকূল হয়ে ওঠে এবং তিনি একের পর এক বেশ কিছু এলাকায় অভিযান চালিয়ে সহজেই সেগুলোকে নিজের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই বিজয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- দরিয়া খান লোদি তার অনুগত হয়ে যান, ফলে সম্ভলের বিশাল এলাকাও দিল্লি সালতানাতের অংশে পরিণত হয়।
- মেওয়াত গিয়ে সেখানকার শাসক আহমদ খান মেওয়াতিকে বশীভূত করেন এবং সেখানকার সাতটি জেলাকে দিল্লির সিংহাসনের সাথে সংযুক্ত করেন।
- কোল (আলীগড়) জয় করেন এবং ঈসা খানকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন।
- বুরহানাবাদ (বুলন্দশহরের নিকটবর্তী) [২]-কেও দিল্লি সালতানাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- বরন (বুলন্দশহর)-এর সাতটি জেলা জয় করেন।
- ভোগাওঁ [৩]-এর রাজা প্রতাপ সিংকে বশীভূত করেন এবং ভোগাওঁ বাদে তার বাকি জমি সালতানাতের সাথে সংযুক্ত করেন।
- “রাপরি” [৪] এবং “চান্দওয়ার” [৫]-কেও সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ইটাওয়া [৬]-কেও নিজের সালতানাতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। [৭]

দ্বিতীয় যুদ্ধ, ইটাওয়ার লড়াই:
কিছুকাল পর বাহলুল লোদির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জুনা খান বিদ্রোহী হয়ে মাহমুদ শারকির সাথে যোগ দেন, যিনি তাকে শামসাবাদের শাসক নিযুক্ত করেন। এই ইস্যুতে উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। মাহমুদ শারকি বিশাল বাহিনী নিয়ে ইটাওয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু কোনো পক্ষই জয়ী হতে পারল না। অবশেষে আলোচনার পর সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার প্রধান শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭৯, ৫৮০; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫০; তারিখ-ই-দাউদি, পৃষ্ঠা ৫১ থেকে ৫৪।

[২] “বুরহানাবাদ”: এটি দিল্লি-আওয়ধ মহাসড়কের পাশে বুলন্দশহরের নিকটবর্তী একটি প্রাচীন জনপদ ছিল, যা সম্ভবত বুলন্দশহর শহরের সম্প্রসারণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

[৩] ভোগাওঁ (ভোঁগাওঁ): উত্তরপ্রদেশের মইনপুরি জেলায় অবস্থিত, কনৌজ থেকে প্রায় ৮২ কিলোমিটার দূরে।

[৪] “রাপরি”: দিল্লি থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ফিরোজাবাদ জেলায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত, বর্তমান নামও এটাই।

[৫] “চান্দওয়ার” বা “চান্দওয়াল” বা “চান্দুওয়াল”: এটি উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদের কাছে অবস্থিত, এর ধ্বংসাবশেষ সেখানে বিদ্যমান। এটি দিল্লি থেকে প্রায় ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

[৬] “ইটাওয়া”: উত্তরপ্রদেশের একটি দেশীয় রাজ্য, দিল্লি থেকে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

[৭] তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮০, ৫৮১।

- দিল্লির যে জেলাগুলো মুবারক শাহের অধীনে ছিল, সেগুলো বাহলুল লোদীর কাছেই থাকবে।
- দিল্লির যে জেলাগুলো ইব্রাহিম শাহ শরকির অধীনে ছিল, সেগুলো মাহমুদ খান খলজির [১] সরকারের অংশ হবে।
- শামসাবাদ [২] এলাকা যেখানে মাহমুদ শরকির নায়েব জুনা খান শাসন করছে, তা বর্ষার পর বাহলুল লোদীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। [৩]

তৃতীয় যুদ্ধ, শামসাবাদ যুদ্ধ, মাহমুদ শরকির মৃত্যু:

পরবর্তীতে জুনা খান চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন এবং শামসাবাদ বাহলুল লোদীর হাতে তুলে দেননি, ফলে বাহলুল দরিয়া খান লোদী এবং কুতুব খান লোদীকে পাঠিয়ে শামসাবাদ জোরপূর্বক দখল করে নেন এবং সেখানে রায় করণকে কেল্লাদার নিযুক্ত করেন। মাহমুদ শরকি এই সংবাদে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি সৈন্য নিয়ে বের হন এবং শামসাবাদ ঘেরাও করেন। রায় করণ অবরুদ্ধ হয়ে শহর রক্ষা করতে শুরু করেন।

এই সময়ে দিল্লির অফিসাররা: দরিয়া খান এবং কুতুব খান শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য নৈশ অভিযান (শব খুন) চালান, ঘটনাক্রমে এই আক্রমণে কুতুব খান ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বন্দি হন। মাহমুদ শরকি তাকে জৌনপুর পাঠিয়ে দেন যেখানে তিনি সাত মাস বন্দি ছিলেন।

ওদিকে কুতুব খানের বন্দি হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই বাহলুল লোদী তার দুই ছেলে: জালাল খান এবং সিকান্দারকে একটি সৈন্যদল দিয়ে রণাঙ্গনের দিকে পাঠিয়ে দেন। এরপর সুলতান বাহলুল নিজেও একটি সৈন্যদল নিয়ে সেই দিকে রওনা হন।

তবে এরই মধ্যে মাহমুদ শরকির মৃত্যু হয় এবং তার ছেলে মুহাম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার মা বিবি রাজি, যিনি একজন অত্যন্ত সচ্চরিত্রা মহিলা ছিলেন, অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ এড়িয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত জৌনপুর শরকি সালতানাত ও দিল্লির মধ্যে সন্ধি হয়। সেই সময়ে যে পক্ষের কাছে যে এলাকাগুলো ছিল, সেগুলো স্থায়ীভাবে তাদের বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং এর ভিত্তিতে নতুন সীমানা নির্ধারণ করা হয়। এটি ৮৬১ হিজরি (১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দ) [৪] এর ঘটনা।

চতুর্থ যুদ্ধ এবং চার বছরের সন্ধি:

যদিও সুলতান বাহলুল লোদী সন্ধিনামা মেনে নিয়ে যুদ্ধ শেষ করেছিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত তার শ্যালক কুতুব খানের মুক্তির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ওদিকে কুতুব খানের বোন শামস খাতুন বাহলুল লোদীকে কসম দেন যে যতক্ষণ আমার ভাই মুক্ত না হবে, আমাদের জন্য খাবার খাওয়া হারাম। ফলে বাহলুল দিল্লি ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত করে জৌনপুরের দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। সেখানে নতুন শাসক মুহাম্মদ শাহ শরকিও সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়।

---

[১] "শামসাবাদ" উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলার একটি তহসিল। দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় তিনশ কিলোমিটার দূরে, গঙ্গা নদীর তীরে, কনৌজের পূর্বে এবং ফারুখাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

[২] (মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৫০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৮০, ৫৮১)

মলহুজা (দ্রষ্টব্য): এই যুদ্ধের সাল কেউ উল্লেখ করেনি। সম্ভবত ৮৫৮ হিজরি বা ৮৫৯ হিজরি হবে।

[৩] (মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৫০; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৫৮১; তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ৫৬)

মলহুজা (দ্রষ্টব্য): এই যুদ্ধের সাল উল্লেখ নেই তবে মাহমুদ শরকির মৃত্যু এর সময়কাল নির্ধারণ করে দেয়।

একটি সংঘর্ষে মুহাম্মদ শাহ শারকির ভাই জালাল খান ধরা পড়ল। বাহলুল লোদি একে খোদায়ী সাহায্য হিসেবে গণ্য করলেন এবং প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট করে দিলেন যে, কুতুব খানের মুক্তির বিনিময়ে জালাল খানকে মুক্তি দেওয়া হবে।

জৌনপুরের নতুন বাদশাহ মুহাম্মদ শাহের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল না, তাই তিনি কোনো চুক্তিতে রাজি হননি। এই সময়ে জৌনপুরে তাঁর অফিসার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যারা তাঁর ওপর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তারা তাঁর ভাই হুসাইন শাহের সাথে যোগ দেয় এবং তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। এখন দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ বেঁধে গেল। হুসাইন শাহ একটি বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে গঙ্গা নদীর তীরে রাজগড় [১]-এ মুহাম্মদ শাহকে পরাজিত করেন এবং তাঁকে হত্যা করান।

হুসাইন শাহ জৌনপুর সালতানাতের মসনদ সামলানোর পর সন্ধিকে প্রাধান্য দিলেন এবং বাহলুলের শ্যালক কুতুব খানকে, যিনি সাত মাস ধরে বন্দী ছিলেন, সসম্মানে মুক্তি দিলেন। এর বিনিময়ে বাহলুল জৌনপুরের শাহজাদা জালাল খানকে মুক্তি দিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে চার বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হলো। এটি ৮৬২ হিজরি (১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। [২]

পঞ্চম যুদ্ধ এবং তিন বছরের সন্ধি:

চার বছর পরও শান্তি বজায় ছিল, কিন্তু পরে দিল্লি দরবারের কিছু অভ্যন্তরীণ মতভেদের কারণে বেশ কয়েকজন সর্দার, যাদের মধ্যে রায় প্রতাপ এবং মুবারিজ খান শীর্ষে ছিলেন, নিজেদের সৈন্যসহ জৌনপুরে চলে যান এবং শাহ হুসাইনের অধীনে চাকরিতে যোগ দেন। এভাবে বাহলুল লোদির শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেল। এই দিনগুলোতে বাহলুলকে পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা উন্নত করতে এবং মুলতানে একটি বিদ্রোহ দমন করতে সেদিকে যেতে হয়েছিল। পেছন থেকে হুসাইন শাহ বাহিনী নিয়ে তাঁর সীমান্তে হানা দিলেন। বাহলুল লোদি ফিরে এসে সময়মতো রণক্ষেত্রে পৌঁছে গেলেন। “চান্দওয়ার”-এ উভয় পক্ষ সাত দিন পর্যন্ত যুদ্ধরত ছিল, কিন্তু কেউ কারো ওপর জয়ী হতে পারল না। অবশেষে আবারও আলোচনা হলো এবং তিন বছরের জন্য সন্ধি সম্পন্ন হলো। [৩]

ষষ্ঠ যুদ্ধ, ভাতওয়ারা যুদ্ধ:

তিন বছর পর্যন্ত হুসাইন শাহ একটি বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অবশেষে চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি এক লক্ষ অশ্বারোহী, এক হাজার হাতি এবং অগাধ রসদ নিয়ে দিল্লি দখলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। “ভাতওয়ারা” [৪] নামক স্থানে সংঘর্ষ হলো, বেশ কয়েক দিন ফলাফলহীন যুদ্ধের পর সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলো এবং উভয় পক্ষ ফিরে গেল।

---

[১] রাজগড় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এটি দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় সাড়ে তিনশ কিলোমিটার দূরে ফারুখাবাদের কাছে হবে।

[২] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ২৫০, ২৫১; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৮১, ৫৮২। এই যুদ্ধের সাল উল্লেখ নেই, তবে মুহাম্মদ শাহের হত্যাকাণ্ড এর সাল নির্ধারণ করে দেয়।

[৩] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ২৫১; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৮৩।

দ্রষ্টব্য: এই যুদ্ধের সাল উল্লেখ নেই। সম্ভবত ৮৭০ হিজরির কাছাকাছি কোনো বছরের ঘটনা হবে, আল্লাহু আলাম।

[৪] “ভাতওয়ারা” দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ২৮০ কিলোমিটার দূরে একটি জনপদ যা ইটাওয়ার কাছে অবস্থিত। বর্তমান নামও এটাই।

কিন্তু হোসেন শাহ খুব দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে দেন। এবার 'ডুঙ্গার' [১] নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু সংঘর্ষ হয়। এরপর যথারীতি সন্ধি হয়ে যায়। [২]

সপ্তম যুদ্ধ, ৮৮৩ হিজরি:

৮৮৩ হিজরিতে বদায়ূনের শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহর মৃত্যু হয়। হোসেন শাহ একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং অগ্রসর হয়ে বদায়ূন ও সম্ভলসহ তার পুরো এলাকা জৌনপুর সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর তিনি দিল্লি দখলের নিয়তে পুনরায় রওনা হন। বাহলুল লোদি তখন সিরহিন্দে ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ যাত্রা করে দিল্লিতে আসেন এবং সময়মতো সৈন্য পাঠিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তবে হোসেন শাহর সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বাহলুল লোদির ডান হাত কুতুব খান, যিনি কূটনৈতিক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, সন্ধির আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি হোসেন শাহর কাছে এই বার্তা পাঠান:

"আমি যখন জৌনপুরে বন্দি ছিলাম, তখন আপনার মরহুমা মাতা (বিবি রাজি) আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছিলেন এবং অত্যন্ত দয়াশীল আচরণ করেছিলেন। আমি সেই হকের খাতিরেই হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এখন আপনি যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে যান এবং কোনো উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করুন। আপাতত এই চুক্তি করে নিন যে, গঙ্গা নদীর পূর্বের পুরো এলাকা জৌনপুর সালতানাতের হবে এবং পশ্চিমের পুরো এলাকা দিল্লির সিংহাসনের অধীনে থাকবে।" হোসেন শাহ এই পরামর্শ পছন্দ করেন এবং এই শর্ত অনুযায়ী চুক্তি করে নেন।

এই সন্ধির পর যখন হোসেন শাহর বাহিনী ফিরে যাচ্ছিল, তখন বাহলুল লোদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পেছন থেকে তাদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ করেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করার পাশাপাশি চল্লিশজন অফিসারকেও গ্রেপ্তার করেন। এছাড়া শামসাবাদ থেকে জালেসার পর্যন্ত এলাকাগুলো দখল করে সেখানে নিজের চৌকি স্থাপন করেন।

অবশেষে হোসেন শাহ ফিরে এসে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। 'আরাম ভাজ্জু' [৩] নামক গ্রামের কাছে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়, কিন্তু পুনরায় আলোচনার মাধ্যমে সন্ধি হয়ে যায়, যাতে 'ধোপামু' [৪] গ্রামকে সীমানা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। [৫]

অষ্টম যুদ্ধ: সানিয়ারান থেকে কালপি পর্যন্ত লড়াই:

কিছুকাল পর হোসেন শাহ ও বাহলুল লোদির মধ্যে 'সানহার্ন' [৬] গ্রামের কাছে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে বাহলুল জয়ী হন এবং প্রতিপক্ষের ফেলে যাওয়া প্রচুর ধন-সম্পদ তার হস্তগত হয়। হোসেন শাহ পিছু হটে 'রাপরি' পৌঁছে যান।

---

[১] 'ডুঙ্গার' দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার দূরে ফতেহপুর জেলায় অবস্থিত। এটি একটি গ্রাম্য জনপদ যার বর্তমান নামও এটাই।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৮৩; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃ. ২৫১, ২৫২।

দ্রষ্টব্য: এই লড়াইয়ের সাল সংরক্ষিত নেই। যদি পূর্ববর্তী যুদ্ধকে ৮৭৮ হিজরিতে ধরা হয়, তবে এর সাল তিন বছরের যুদ্ধবিরতির পর ৮৮১ বা ৮৮২ হিজরি হবে।

[৩] 'আরাম ভাজ্জু' নামক এলাকার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় এই স্থানটি দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে বদায়ূনের কাছে হবে।

[৪] 'ধোপামু' সম্ভবত বর্তমান 'ধোপামাউ', যা উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুর জেলায় অবস্থিত। ফতেহপুর দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৫৫০ কিলোমিটার দূরে।

[৫] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৮৪, ৫৮৫। এই যুদ্ধের সাল ফিরিশতা ৮৮৩ হিজরি উল্লেখ করেছেন এবং এটাই সঠিক যে আলম শাহর মৃত্যু সাল এটাই।

[৬] 'সানহার্ন' হলো সানিয়ারান যা উত্তরপ্রদেশের বদায়ূন জেলার 'গুন্নৌর' তহশিলে অবস্থিত। দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ১২৮ কিলোমিটার দূরে।

শীঘ্রই বাহলুল ধাওয়া করতে করতে সেখানেও পৌঁছে গেলেন এবং আবারও আক্রমণ করে তাকে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। হোসেন শাহ আশ্রয়ের সন্ধানে গোয়ালিয়রে পৌঁছে যান, যেখানে তখন হিন্দু রাজা কীর্ত সিং-এর শাসন ছিল। তিনি হোসেন শাহকে পূর্ণ আর্থিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করেন, তাকে কয়েক লক্ষ নগদ তঙ্কা, তাঁবু, ঘোড়া এবং হাতি দেন এবং 'কালপি' পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিতে যান।

এদিকে বাহলুল 'ইটাওয়া' গিয়েছিলেন যেখানে সুলতান হোসেনের ভাই ইব্রাহিম খান তার একজন অফিসার হাইবাত খান (মালিক গড়কড়)-এর সাথে অবস্থান করছিলেন। মাত্র তিন দিনের যুদ্ধের পর তারা 'ইটাওয়া' সুলতান বাহলুলের হাতে তুলে দেন।

এভাবে বাহলুল লোদী খুব দ্রুত ইটাওয়া থেকে অবসর পেয়ে হোসেন শাহের কাছে পৌঁছে যান। কালপি [১]-এর নিকটবর্তী গ্রাম 'রাকাতৌ' [২]-এর কাছে যমুনার তীরে উভয় পক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে এবং বেশ কয়েক মাস ধরে একে অপরের ওপর অতর্কিত হামলা চালাতে থাকে।

এই সময়ে 'কথরু' [৩]-এর শাসক রায় তিলোক চাঁদ তার সেনাবাহিনী নিয়ে বাহলুলকে সাহায্য করতে আসেন। তিনি এই এলাকা সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন। তাই তিনি গোপনে সুলতানের বাহিনীকে এমন এক জায়গা দিয়ে নদী পার করে দেন, যেখানে পানির স্তর কম ছিল।

হোসেন শাহ যখন হঠাৎ দেখলেন যে প্রতিপক্ষ নদী পার হয়ে গেছে, তখন তিনি জৌনপুরের দিকে পিছু হটলেন। তিনি ভাট্টা [৪] পৌঁছে যান যেখানে হিন্দু রাজা তাকে কয়েক লক্ষ নগদ তঙ্কা এবং হাতি-ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করেন এবং কেবল সফরের সরঞ্জামই সরবরাহ করেননি বরং জৌনপুর পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজের সেনাবাহিনীকেও সাথে পাঠিয়ে দেন।

এদিকে বাহলুলও প্রতিপক্ষের পিছু ধাওয়া করে জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হোসেন শাহ এটি দেখে পথ পরিবর্তন করে বাহরাইচ এবং তারপর কনৌজের দিকে চলে যান। বাহলুলও পিছু ছাড়েননি এবং 'আব রহপ' (রামগঙ্গা নদী)-এর তীরে প্রতিপক্ষকে ধরে ফেলেন।

এখানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় যাতে হোসেন শাহ কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার সমস্ত ধন-সম্পদ লুট হয়ে যায়। এমনকি তার স্ত্রী মালিকা-ই-জাহান 'বিবি খুন্দজা' (যিনি আলাউদ্দিন আলম শাহের কন্যা ছিলেন) বন্দী হন, তবে বাহলুল তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে রাখেন। পরবর্তীতে এই নারী জৌনপুরে চলে যান।

বাহলুল এখন জৌনপুর দখল করে এই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটাতে চাইলেন এবং হোসেন শাহ সেখানে পৌঁছানোর আগেই নিজের সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এই বিশাল শহরটি সহজেই দখল করে নেন এবং এখানে একজন শাসক নিযুক্ত করে ফিরে আসেন।

এই সময়েই তার শ্যালক এবং বন্ধু রাস্থ কুতুব খান মৃত্যুবরণ করেন। বাহলুল তার শোক পালনে ব্যস্ত ছিলেন।

---

[১] কালপি: উত্তর প্রদেশের জালৌন জেলায় যমুনা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর। এটি দিল্লির দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গোয়ালিয়র এর পশ্চিমে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দূরে।

[২] রাকাতৌ: এই এলাকার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি, সম্ভবত এটি কোনো ছোট গ্রাম ছিল যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা এর নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে।

[৩] কথরুর অবস্থান 'সায়্যাহ তারিখে হিন্দ' (পৃষ্ঠা ৪৩৩)-এ "বক্সার" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা যমুনার তীরে কালপি শহর থেকে কিছুটা দূরে উত্তর প্রদেশের একটি গ্রাম।

[৪] তারিখে ফেরেশতায় এর নাম "ঠাট্টা" উল্লেখ আছে তবে স্পষ্টতই এটি সিন্ধুর ঠাট্টা নয়। এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে: (ক) এটি জৌনপুর শহর থেকে ৭৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে "জালালপুর লাক"-এর একটি শহরতলী গ্রাম হতে পারে যা সম্ভবত কারো রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। (খ) এটি ভাট্টা হতে পারে যা মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পূর্বে একটি রাজ্য ছিল যার রাজধানী ছিল রেওয়া। লেখকের মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই স্পষ্ট।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, হুসাইন শাহ পুনরায় জৌনপুরে পৌঁছে গেছেন এবং জৌনপুরের আমীরগণ তার আনুগত্য করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বাহলুল লোদী এই খবর শুনে পুনরায় জৌনপুরে পৌঁছালেন, হুসাইন শাহ পালিয়ে গেলেন এবং সুলতান শহরটি নতুন করে জয় করে হুসাইন শাহকে অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করলেন, এমনকি তিনি বিহারের দিকে চলে গেলেন। হুসাইন শাহ ও বাহলুলের দীর্ঘ যুদ্ধের সিলসিলা এখানেই শেষ হলো। সুলতান বাহলুল লোদী তার পুত্র মুবারক খানকে "বারবাক শাহ" উপাধি দিয়ে জৌনপুরের শাসক নিযুক্ত করলেন। [১]

রাজপুতদের বশীভূতকরণ এবং মালব আক্রমণ

এরপর বাহলুল লোদী বিদ্রোহী রাজপুত শাসকদের দমন করার দিকে মনোযোগ দিলেন, ফলে নিম্নোক্ত অভিযানগুলো পরিচালিত হয়:

- **ধোলপুর:** বাহলুল লোদী দিল্লি থেকে রওনা হয়ে কালপি এবং এরপর চান্দওয়ার [২] পৌঁছালেন, তাদের পদানত করে তিনি রাজস্থানে অগ্রসর হলেন এবং ধোলপুর [৩] আক্রমণ করলেন। তবে এখানকার রাজা কয়েক মণ সোনা দিয়ে আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। [৪]

- **আলাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা:** এখান থেকে অবসর হয়ে বাহলুল লোদী মালব রাজ্য আক্রমণ করলেন, যেখানে তখন গিয়াসউদ্দিন খিলজি শাসক ছিলেন এবং তিনি আরামপ্রিয়তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সুলতান বাহলুল এই অভিযানে আলাপুর দুর্গ [৫] পর্যন্ত গেলেন এবং তা ধ্বংস করে দিল্লি ফিরে এলেন। [৬] আপাতদৃষ্টিতে এই আক্রমণ ছিল মালবের শক্তি যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ।

- **গোয়ালিয়র:** গোয়ালিয়র তুঘলক যুগে দিল্লি সালতানাতের অধীন ছিল। পরবর্তীতে অরাজকতার সময়ে রাজপুত রাজারা এটি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। বাহলুল এটি জয় করার জন্য বের হলেন এবং অবশেষে গোয়ালিয়রের রাজা মান সিং ৮০ লক্ষ টাকা প্রদান করে প্রাণ বাঁচালেন এবং আনুগত্য স্বীকার করলেন। [৭] [৮]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮৫ থেকে ৫৮৮।

[২] "চান্দওয়ার" (চান্দওয়াল) ইউপির ফিরোজাবাদ শহরের কাছে দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ২২০ কিলোমিটার দূরত্বে ছিল।

[৩] ধোলপুর ভারতীয় রাজ্য রাজস্থানে চম্বল নদীর তীরে দিল্লি থেকে দক্ষিণে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮৯।

[৫] ফেরেশতার বর্ণনা অনুযায়ী এই দুর্গ রণথম্ভোরের কাছে ছিল। ধারণা করা হয় এটি রাজস্থানের সওয়াই মাধোপুর জেলার কোথাও অবস্থিত ছিল। দিল্লি থেকে এর দূরত্ব প্রায় চারশ কিলোমিটার হবে। বর্তমানে এই নামে কোনো জনপদ বা দুর্গ নেই।

[৬] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮৯।

[৭] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮৯।

[৮] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮৯।

নতুন নিয়োগসমূহ:

এই বিজয়ের পর সুলতান সাম্রাজ্যে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগসমূহ প্রদান করেন এবং জায়গির বণ্টন করেন:

- নিজাম খান (সিকান্দার লোধি)-কে দোয়াবার সুবাদার ও উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।
- নিজের পৌত্র শাহজাদা আজম হুমায়ুনকে "কালপি" ও "লক্ষ্ণৌ"-এর শাসক নিযুক্ত করেন। এই শাহজাদা সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা বায়জিদের ছেলে ছিলেন, যিনি কিছুদিন আগে নিজের এক কর্মচারীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।
- নিজের ভাগ্নে মুহাম্মদ শেখজাদা ওরফে কালা পাহাড়কে বাহরাইচের শাসক নিযুক্ত করেন।
- নিজের ছেলে আলম খানকে কোয়ালপুর-এর শাসক নিযুক্ত করেন।
- নিজের এক নিকটাত্মীয় খান জাহানকে বদায়ূঁ-র শাসক নিযুক্ত করেন।
- জৌনপুর সালতানাতের বিশাল অঞ্চলে তিনি ইতিপূর্বেই নিজের ছেলে বারবক শাহকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। [১]

মৃত্যু:

গোয়ালিয়র থেকে ফেরার পথে প্রচণ্ড গরম ও লু হাওয়ার কারণে বাহলুল লোধি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। [২]

সুলতান তাঁর উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত তিনি এই সিদ্ধান্তে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না। হতে পারে তিনি শাহজাদাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে কিছু আমির তাঁকে চাপ দেন যেন তিনি তাঁর তরুণ পৌত্র আজম খান হুমায়ুনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বাহলুল লোধি এতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু যেহেতু তাঁর পুত্র নিজাম খান (সিকান্দার লোধি), যিনি ইতিপূর্বেই যুবরাজ নিযুক্ত হয়েছিলেন, এই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন, তাই বাহলুল তাঁকে দিল্লি থেকে নিজের কাছে তলব করেন যাতে তাঁকে নজরবন্দি রেখে তাঁর উত্তরাধিকার বাতিল করে নতুন উত্তরাধিকারীর ঘোষণা দিতে পারেন। সিকান্দারের মা মালিকা জিবা একজন ভারতীয় নারী ছিলেন এবং এই সফরে তিনি সুলতানের সাথেই ছিলেন। সুলতানের অভিপ্রায় জানতে পেরেই তিনি তৎক্ষণাৎ গোপনে পুত্রের কাছে বার্তা পাঠান যেন সে দিল্লিতেই অবস্থান করে। ফলে নিজাম খান থেমে যান এবং সুলতানের পক্ষ থেকে বারবার তাগিদপূর্ণ বার্তা আসা সত্ত্বেও রওনা হতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করতে থাকেন। বাহলুল তাঁর অপেক্ষায় রইলেন এবং উত্তরাধিকারীর ঘোষণা দিতে পারলেন না। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৮৮।

ফিরিশতা এখানে স্পষ্ট করেছেন যে, সুলতান নিজাম (সিকান্দার)-কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে তিনি এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

[২] তারিখ-ই-সালাতিন-ই-শারকিয়া, সৈয়দ ইকবাল: পৃ. ২৩৮।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৮৮, ৫৮৯।

তারিখ-ই-দাউদি-র লেখকের মতে, বাহলুল শেষ পর্যন্ত নিজাম খান (সিকান্দার)-কেই নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন (অথবা নিযুক্ত থাকতে দিয়েছিলেন) এবং তাঁর জন্য দুটি অসিয়ত সম্বলিত বার্তা পাঠান: (১) নিয়াজি গোত্রের লোকদের কখনো বিশ্বাস করবে না। এরা অকৃতজ্ঞ লোক, কখনো লবণের হক আদায় করে না। (২) সুরি গোত্রের কোনো ব্যক্তিকে কখনো আমির বা খান পদে নিযুক্ত করবে না। এই লোকদের মাথায় বাদশাহির চিন্তা থাকে। (তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৬০)।

যদি এই বর্ণনা সঠিক হয়, তবে সমন্বয় এভাবে সম্ভব যে, সুলতান শেষ পর্যন্ত পৌত্রকে উত্তরাধিকারী করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন।

অবশেষে দিল্লি থেকে দূরে ৮৯৪ হিজরির শাবান মাসে (জুলাই ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতানের মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, সুলতানের মৃত্যু ভাদাউনি নামক জনপদে হয়েছিল যা সাকিত [১]-এর নিকটবর্তী। এরপর সুলতানকে দিল্লিতে এনে দাফন করা হয়। [২]

বাহলুল লোদীর চরিত্রের ওপর এক নজর

বাহলুল লোদীর মধ্যে এমন কিছু গুণ ছিল যা তাকে অন্যান্য শাসকদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল, বিশেষ করে ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণ। 'তারিখ-ই-দাউদি'-র লেখক লিখেছেন:

"তিনি প্রজাদের আবেদন নিজেই শুনতেন। তিনি এই কাজ উমারা বা উজিরদের ওপর ছেড়ে দিতেন না। তিনি ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ, কষ্টসহিষ্ণু, দয়ালু, স্নেহশীল এবং প্রজাবৎসল বাদশাহ ছিলেন।" [৩]

দোয়ার গুরুত্ব প্রদান

বাহলুল লোদী একজন দক্ষ যোদ্ধা এবং সামরিক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ঐশী সাহায্য লাভের জন্য তিনি দোয়ার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। যুদ্ধের দিন যখনই তার দৃষ্টি শত্রুপক্ষের ওপর পড়ত, তিনি সওয়ারি থেকে নেমে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন এবং আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতেন এবং নিজের অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ করতেন। [৪] সম্ভবত এই কারণেই কোনো শক্তিশালী শত্রুও কখনো তার ওপর জয়লাভ করতে পারেনি। তিনি কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি। [৫]

ব্যয়বহুল প্রথার ওপর নিষেধাজ্ঞা

সুলতান প্রজাদের সমস্যার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, তাই তিনি আনন্দ বা শোকের এমন সব ব্যয়বহুল প্রথার বিরোধী ছিলেন যার ফলে সাধারণ মানুষ ঋণের চাপে পিষ্ট হয়। সেই দিনগুলোতে দিল্লিতে 'তিজা' (সোয়াম) প্রথা প্রচলিত ছিল, যেখানে পান-সুপারি, মিছরি এবং চিনি বিতরণ করা হতো। এছাড়া সেই সময়ের মজলিসগুলোতে উপস্থিতদের সামনে ফুলের থালা এবং আতরের পাত্র রাখা হতো, যার ফলে পরিবেশ সুগন্ধিময় হয়ে উঠত।

---

[১] সাকিত, ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের 'এটাহ' জেলায় দিল্লি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং আজও এই নামেই পরিচিত। তবে ভাদাউনি জনপদ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সুলতানের মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হলো এটি 'কল' নামক জনপদে হয়েছিল। (তারিখ-ই-সালাতিন-ই-শারকিয়া, সৈয়দ ইকবাল: পৃষ্ঠা ২৩৮)। তৃতীয় মত অনুযায়ী এই স্থানটি হলো জালালি যা আলীগড় শহরের নিকটবর্তী একটি জনপদ। জামে তারিখ-ই-হিন্দের লেখকের মতে, এই স্থানটি সাকিত থেকে পনেরো মাইল দূরে মিলৌলি নামক একটি গ্রাম ছিল। (পৃষ্ঠা ৯৭২)।

[২] (তারিখ-ই-ফিরিশতা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৩)।

ফায়দা: বর্তমানে দিল্লির সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুফি বুজুর্গ শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ-ই-দিল্লির মাজারের কাছে একটি কবরকে সুলতান বাহলুলের মাজার বলা হয়। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী দিল্লির লোদী গার্ডেনে অবস্থিত শীশ মহলই মূলত এই বাদশাহর শেষ বিশ্রামস্থল।

[৩] তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ৫০।

[৪] তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ৫০।

[৫] তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ৫০।

সুলতান এই সমস্ত প্রথা বন্ধ করে দিলেন। শুধু ফুল ও সুগন্ধির ব্যবস্থা বাকি রাখলেন যা স্বল্প ব্যয়ের কাজ ছিল। বাহলুলের বক্তব্য ছিল: “যদি কোনো দরিদ্র আফগান মারা যায় এবং কুলখানির (মৃত্যুর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান) সময় এক লক্ষ আফগান উপস্থিত হয়, তবে সেই দরিদ্রের উত্তরাধিকারী কীভাবে এই প্রথা সম্পন্ন করবে? তাই শুধু সুগন্ধিতেই সন্তুষ্ট থাকো।” [১]

হাস্যরস ও সহনশীলতা:

বাহলুল সরলতা ও হাস্যরসে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি সমালোচনা ও নিন্দাকে উপেক্ষা করতেন। রাজসিংহাসনে বসার পর দিল্লির জামে মসজিদে প্রথম জুমার নামাজ আদায় করতে গেলেন। সেখানে শহরের বিখ্যাত আলেম মোল্লা কাদন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি খুতবার শেষে আফগানদের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন:

“সুবহানাল্লাহ! এক অদ্ভুত ও বিচিত্র জাতির আবির্ভাব হয়েছে। এই লোকদের ভাষা কতই না অদ্ভুত! তারা মাকে বলে: মোর, ভাইকে বলে: রোর, আর অন্যকে বলে: নোর। আল-আমান আল-আমান—সম্ভবত এরা শয়তানের বংশধর।”

সুলতান বাহলুল এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং ঠোঁটে রুমাল চেপে ধরে বললেন: “মোল্লা সাহেব! যথেষ্ট হয়েছে! আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা।” [২]

বাহলুল লোদীর শাসনকালের রাজনৈতিক উদ্ভাবনসমূহের ওপর এক নজর

বাহলুল লোদীর আটত্রিশ বছরের শাসনকালের বিস্তারিত বিবরণ খুব কম পাওয়া যায়। এর কারণ হলো আফগানদের মধ্যে এমন উচ্চমানের কোনো ঐতিহাসিক ছিলেন না যেমনটি তার পূর্ববর্তী দিল্লির সুলতানদের বা পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের ভাগ্যে জুটেছিল। তবে আমাদের কাছে যে তথ্য পৌঁছেছে তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই বাদশাহ শাসনের ধরন ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। আমরা এই যুগে নিম্নলিখিত নতুন বিষয়গুলো দেখতে পাই:

সরলতা ও অনাড়ম্বরতা:

অন্যান্য সুলতানদের তুলনায় বাহলুল লোদীর এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি বাদশাহ হওয়ার পরেও নিজের সাধারণ গোত্রীয় সভ্যতা ও অনাড়ম্বর জীবনধারা ত্যাগ করেননি। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় থেকে বাদশাহদের জন্য যে বিশেষ মর্যাদা, জাঁকজমক ও শান-শওকতের প্রদর্শন শুরু হয়েছিল, সুলতান বাহলুল লোদী তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেন।

‘তারিখ-ই-দাউদি’-র লেখক লিখেছেন:

“নতুন জেলাগুলো থেকে যে ধন-সম্পদ তার হাতে আসত, তার সবটুকুই তিনি নিজের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। অন্যান্য সুলতানদের মতো নিজের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যক্তিগত কোষাগার পূর্ণ করতেন না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে...”

---

[১] তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ৫০

[২] তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ৫১

তিনি ছিলেন অমায়িক এবং অনাড়ম্বর এক বাদশাহ। খাবারের সময় তিনি দ্বাররক্ষীকে সরিয়ে দিতেন। সেই সময় যে কেউ আসত, সে খাবারে শরিক হতে পারত। তিনি মজলিসে রাজসিংহাসনে বসতেন না। আমিরদেরকে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করতেন। সাধারণ দরবারেও তিনি রাজসিংহাসনে বসতেন না, বরং সকল আমিরের সমান কার্পেটের ওপর বসতেন। [১]

বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা:

বাহলুল লোদী সরলতা ও অনাড়ম্বরতার পাশাপাশি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চতুরও ছিলেন। এই দক্ষতার কারণে তিনি সাধারণত রক্তপাত ছাড়াই নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে নিতেন। সুতরাং সিংহাসন আরোহণের পর তিনি যেভাবে হামিদ খানকে মাখন থেকে চুলের মতো বের করে দিয়েছিলেন, তা এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাহলুল লোদী কি শরীয়তের ওপর পুরোপুরি অটল ছিলেন?

বাহলুল লোদী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, তিনি ইসলামের ওপর পুরোপুরি অটল, শরীয়তের কঠোর অনুসারী এবং একজন আদর্শ শাসক ছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তো তাঁকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সদৃশ বলার দুঃসাহসও দেখিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে বাহলুল ইসলামপ্রিয় ও ধার্মিক অবশ্যই ছিলেন, বরং সেই যুগের অনেক শাসকের চেয়ে বেশি সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ ও মার্জিত ছিলেন; তবে তাঁকে অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করাও কোনো ভারসাম্যপূর্ণ কথা নয়। তাঁর যুগের কিছু ঘটনা প্রমাণ করে যে, সুযোগ বুঝে তিনি ধোঁকা, গাদ্দারি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশ্রয়ও নিতেন। যেমন সিংহাসন গ্রহণ করার পরপরই তিনি হামিদ খানের মতো একজন হিতৈষীকে—যিনি তাঁকে দিল্লির সিংহাসন থালায় সাজিয়ে পেশ করেছিলেন—ধোঁকা দিয়ে বন্দি করেছিলেন।

একইভাবে একাধিকবার তিনি শারকি সুলতানদের সাথে যুদ্ধে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধবিরতি নির্ধারিত হওয়ার পরও শত্রুর অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। স্পষ্টতই এটি নৈতিকভাবে, প্রথাগতভাবে এবং শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়েজ ছিল। যা-ই হোক, এটিও গনিমত ছিল যে, বাহলুল লোদী তাঁর পূর্বসূরি অনেক সুলতানের মতো জুলুম-অত্যাচারের বাজার গরম করেননি। এভাবে তাঁর রাজনৈতিক দুর্নীতির তালিকা এতটাই সংক্ষিপ্ত যে, তাঁর গুণাবলি ও কৃতিত্বগুলো এর ওপর প্রাধান্য পায়।

আমিরদের সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ:

এর আগে বাদশাহরা আমিরদের কর্মচারীদের মতো রাখতেন, বরং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক সাধারণত মনিব ও দাসের মতো হতো। এই "আকাশ-পাতাল পার্থক্য" প্রকাশ করার জন্য অনেক রীতিনীতি তৈরি করা হয়েছিল। বাহলুল এই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা তুলে দেন এবং আমিরদের সমান মানুষ, বরং ভাইদের মতো মর্যাদা দেন। তারিখ-ই-দাউদি-এর লেখক লিখেছেন:

"তিনি যখন আমিরদের কাছে ফরমান লেখাতেন, তখন তাঁদেরকে 'মসনদে আলী' বলে সম্বোধন করতেন। যদি কোনো আমির তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হতেন, তবে তিনি তাঁর খাতির-যত্ন এই পর্যায় পর্যন্ত করতেন যে, নিজে তাঁর বাড়িতে চলে যেতেন। নিজের কোমর থেকে তলোয়ার খুলে তাঁর সামনে রেখে দিতেন এবং বলতেন যে, যদি আপনি আমাকে অযোগ্য মনে করেন তবে অন্য কাউকে নির্বাচিত করে নিন।"

---

(১) তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৫৯

তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। বলতেন যে, যদি তোমরা আমাকে বাদশাহীর যোগ্য মনে না করো, তবে এর জন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নাও এবং আমাকে অন্য কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে দাও। সুলতান সকল আমির ও উজিরদের সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করতেন। যদি কোনো উজির বা আমির অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তবে তিনি তাকে দেখতে যেতেন। [১]

রাজকীয় বাহিনীর পরিবর্তে গোত্রীয় বাহিনী:

বাহলুল লোদীর শাসনকালে সেনাবাহিনীর অধিকাংশ আমির ছিলেন আফগান। প্রাচীন আমলের অভিজ্ঞ সেনাপতিরা, যাদের বড় বড় যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল, তারা এখন শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সাথে সাথে সামরিক বিষয়ের জন্য পূর্ববর্তী আমলগুলোর মতো সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানও আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে সূক্ষ্ম প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো পরিবেষ্টনকারী রাজকীয় সামরিক ব্যবস্থা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে একটি শিথিল গোত্রীয় যুদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এখন দিল্লির রাজকীয় বাহিনী একটি গোত্রীয় বাহিনীর রূপ ধারণ করে। এই ধরণের যুদ্ধগুলোতে সাফল্যের ভিত্তি সাহস, বীরত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভরশীল। আফগান গোত্রগুলো শতাব্দীকাল ধরে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী হয়ে আসছিল, যেখানে বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করা এবং শত্রুকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

বাহলুল লোদীর রাজ্যের সাথে জৌনপুরের লড়া আটটি যুদ্ধের দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জৌনপুরের কাছে একটি সুশৃঙ্খল এবং বিশাল বাহিনী ছিল, কিন্তু তারা কখনোই বাহলুলের বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারেনি। বাহলুল বা তার আমিররা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া কখনোই খোলা ময়দানে সেই যুদ্ধগুলো লড়েননি যেগুলোতে কয়েক ঘণ্টা বা এক-দুই দিনের লড়াই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণিত হয়। সাধারণত তারা গেরিলা আক্রমণ, অতর্কিত নৈশ হামলা এবং অন্যান্য কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে থাকতেন। এই কারণেই এই যুদ্ধগুলো সংঘর্ষের আকারে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকত।

---

[১] তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৫০

সিকান্দার লোদী

৮৯৪ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি

(১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

বহলুল লোদীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। নিজাম খান (সিকান্দার) নিজেকে উত্তরাধিকারী মনে করতেন কারণ মরহুম সুলতান তা ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে জৌনপুরে তার ভাই বারবক শাহ নিজেকে সুলতান হিসেবে পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। তৃতীয় প্রার্থী ছিলেন সুলতানের নাতি আজম হুমায়ুন, যার জানা ছিল যে সুলতান শেষ দিনগুলোতে পূর্বের উত্তরাধিকারের ঘোষণা বাতিল করে তাকে উত্তরাধিকারী বানাতে চেয়েছিলেন।

নিজাম খান পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্রই দিল্লি থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যাত্রা করেন এবং লস্করের সাথে মিলিত হন। এখানে সালতানাতের আমিরগণ, যারা শেষ সময়ে মরহুম সুলতানের সাথে ছিলেন, সিংহাসন আরোহণের সমস্যা সমাধানের জন্য সমবেত হন। তাদের তিনটি দল ছিল এবং প্রতিটি দল উল্লিখিত তিন শাহজাদার মধ্যে কোনো একজনের সমর্থক ছিল। নিজাম খানের মা মালিকা জেবা খাতুন তাদের বললেন: “আমার ছেলে সব দিক থেকেই শাসন পরিচালনার যোগ্য। তোমাদের সাথেও তার আচরণ ভালো হবে।”

কিন্তু ঈসা খান লোদী, যিনি বারবক শাহের প্রবল সমর্থক ছিলেন, নিজামের বংশ নিয়ে আপত্তি তুলে বললেন: “একজন স্বর্ণকারের নাতি দিল্লির তাজদার কীভাবে হতে পারে?” [১]

জবাবে খান-ই-খানান ফরমুলি বললেন: “গতকাল বাদশাহর মৃত্যু হয়েছে, আর আজ তার স্ত্রী ও সন্তানের অবমাননা করা হচ্ছে।”

ঈসা খান লোদী বললেন: “তুমি কেবল সালতানাতের একজন কর্মচারী। রাজকীয় অভিজাতদের বিষয়ে তুমি নাক গলাতে এসো না।”

এ কথা শুনে খান-ই-খানান রাগান্বিত হয়ে বললেন: “আমি শাহজাদা নিজাম ছাড়া আর কারো কর্মচারী নই।”

এ কথা বলে তিনি তার সমমনা আমিরগণ, মালিকা জেবা এবং শাহজাদা নিজামকে (সিকান্দার) নিয়ে বাকি লস্কর থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। তিনি মরহুম সুলতানের লাশ দাফনের জন্য দিল্লিতে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর খান-ই-খানান এবং তার সমর্থক আমিরগণ জালালি কসবা...

---

[১] নিজাম খান (সিকান্দার)-এর মা জেবা খাতুন স্বর্ণকার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

কালি নদী (রামগঙ্গা নদী)-র তীরে সুলতান ফিরোজ তুঘলকের নির্মিত প্রাসাদে গিয়ে শাহজাদা নিজাম খানের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এভাবে শাহজাদা নিজাম খান সিকান্দার লোদী উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারিখ-এ-দাউদী-র লেখকের মতে, এটি ১৭ শাবান ৮৯৪ হিজরি (জুলাই ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ)-র ঘটনা। এরপর তিনি তাঁর সমর্থক আমিরদের সাথে নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছান এবং সমগ্র সালতানাতের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। তারিখ-এ-দাউদী-র লেখকের মতে, সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। [১]

সিকান্দার লোদীর গুণাবলি:

সিকান্দার লোদী সুদর্শন চেহারা এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, মর্যাদাবান এবং যোগ্য যুবক। ভোগ-বিলাস থেকে দূরে, দূরদর্শী এবং কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। আল্লাহ-ভীতি, দয়া, বদান্যতা এবং কোমলতা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাহসী এবং ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। দুর্বল ও শক্তিশালীকে সমান মনে করতেন। তিনি একজন পরিকল্পনাকারী এবং উদ্ভাবনী চিন্তার মানুষ ছিলেন। তিনি সালতানাতের প্রশাসনিক কাঠামোকে অনেক উন্নত করেছিলেন। আমির ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কঠোরতার পরিবর্তে হিকমত বা প্রজ্ঞার সাথে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিরোধীদের শক্তি দমন করেন এবং সালতানাতের সীমানা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেন। [২]

বিরোধী শাহজাদাদের সাথে যুদ্ধসমূহ

সুলতান সিকান্দার লোদী সিংহাসনে আরোহণের পর সর্বপ্রথম সম্ভালের বিরোধী শাহজাদাদের দমন করেন, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- আলম খান:

সর্বপ্রথম সিকান্দার লোদী চান্দওয়ারের নিকট রাপরিতে পৌঁছান, যেখানে তাঁর চাচা আলম খান দুর্গে অবস্থান করছিলেন। তিনি আজম খান লোদীর সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। সিকান্দার লোদী যখন রাপরি অবরোধ করেন, তখন আলম খান পালিয়ে পাটিয়ালিতে ঈসা খান লোদীর কাছে চলে যান। রাপরি জয় করার পর সিকান্দার লোদী আলম খান ও ঈসা খান লোদীকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বের হন। এই অভিযানে তিনি প্রায় সাত মাস ইটাওয়ায় অবস্থান করেন। অবশেষে আলম খান আনুগত্য স্বীকার করে নেন এবং সিকান্দার তাঁকে ইটাওয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। [৩]

- ঈসা খান লোদী:

এরপর সিকান্দার লোদী পাটিয়ালির উদ্দেশ্যে রওনা হন, যেখানে শাহজাদা বারবক শাহের সমর্থক আমির ঈসা খান লোদী সৈন্যবাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিলেন।

---

[১] তারিখ-এ-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯০; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৫৬; তারিখ-এ-দাউদী: পৃষ্ঠা ৩৭।

[২] তারিখ-এ-দাউদী: পৃষ্ঠা ৪৪; তারিখ-এ-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭২, ৩৭৫।

[৩] তারিখ-এ-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯২; মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ২৫৬।

স্থানের ব্যাখ্যা: চান্দওয়ার এবং রাপরি দিল্লি থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় অবস্থিত। উভয় স্থানের মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব নেই।

ছিল। এখানে যুদ্ধে ঈসা খান লোদী পরাজিত হয়ে এমন গুরুতর আহত হন যে তিনি আর বেঁচে থাকতে পারেননি। সিকান্দার লোদী "পটিয়ালী"র শাসনভার রাজা গণেশকে প্রদান করেন, যিনি আগে বারবক শাহের সমর্থক ছিলেন কিন্তু এখন আনুগত্য প্রকাশ করছিলেন। [১]

বারবক শাহ:

সিকান্দার লোদীর ভাই বারবক শাহ, যিনি জৌনপুরের শক্তিশালী শাসনের মালিক ছিলেন, তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অন্যান্য কাঁটা পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর সিকান্দার লোদী জৌনপুর সালতানাতের সীমান্তে পৌঁছান এবং জনৈক আমির ইসমাইল খান লোহানীকে দূত হিসেবে বারবক শাহের কাছে পাঠান এবং তাঁকে দিল্লির সিংহাসনের আনুগত্যে রাজি করানোর চেষ্টা করেন। তবে বারবক শাহ রাজি হননি এবং সেনাবাহিনী নিয়ে জৌনপুর থেকে বেরিয়ে পড়েন। শেখজাদা ওরফে কালা পাহাড়ও তাঁর সাথে ছিলেন।

কনৌজের কাছে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে শেখজাদা ওরফে কালা পাহাড় সিকান্দার লোদীর বাহিনীর ওপর জোরালো আক্রমণ করেন, কিন্তু সিকান্দারের অফিসাররা এই আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে কালা পাহাড়কে গ্রেপ্তার করে ফেলেন। সিকান্দার লোদী ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন, কোলাকুলি করেন এবং বলেন: "আপনি আমার পিতার স্থলাভিষিক্ত। আমাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করুন।"

কালা পাহাড় লজ্জিত হয়ে বললেন: "এই অনুগ্রহের বদলে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই।" এভাবে সিকান্দার লোদী কালা পাহাড়কে নিজের সাথে মিলিয়ে নেন এবং এরপর বারবক শাহের বাহিনীর মোকাবিলা করে তাঁকে পরাজিত করেন। বারবক শাহ পিছু হটে বদায়ূঁতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। সিকান্দার লোদী দেরি না করে অগ্রসর হয়ে বদায়ূঁ ঘেরাও করেন। অবশেষে বারবক শাহ পরাজয় স্বীকার করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। সিকান্দার লোদী তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁকে সাথে নিয়ে জৌনপুর গিয়ে সেখানকার শাসনভার পুনরায় দান করেন। [২]

শাহজাদা আজম হুমায়ুন:

জৌনপুর থেকে সিকান্দার লোদী সরাসরি "কাল্পী" ও লক্ষ্ণৌর দিকে রওনা হন যেখানে শাহজাদা আজম হুমায়ুন শাসন করছিলেন। সিকান্দার লোদী তাঁকেও পরাভূত করেন এবং সেসব অঞ্চলের শাসনভার তাঁর থেকে কেড়ে নিয়ে মাহমুদ খান লোদীকে প্রদান করেন। [৩]

তাতার খান লোদী:

এরপর সিকান্দার লোদী "জেথর" [৪]-এর কেল্লাদার তাতার খান লোদীকেও একইভাবে অভিযানের মাধ্যমে অনুগত করে নেন এবং তাঁকে তাঁর এলাকায় বহাল রাখেন। [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯২; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ২৫৬

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯২, ৫৯৩; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃ. ২৫৭; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৮২, ৮৩

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯৩

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতায় এই স্থানের নাম "ঝত্রা" লেখা হয়েছে, তবে জামে তারিখ-ই-হিন্দ (পৃ. ৯৭৫)-এর টীকা অনুযায়ী এটি "জেথর", যা উত্তরপ্রদেশের "এটাহ" জেলার আলীগঞ্জ তহসিলের একটি গ্রাম ছিল যা "এটাহ" থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯৩

গোয়ালিয়র, রাজা মান সিং:

এর পর সিকান্দার লোদী গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানকার শাসক রাজা মান সিংকে বিশেষ খিলআত পাঠান। রাজা আনুগত্য স্বীকার করেন এবং নিজের শাসন রক্ষা করেন। যেহেতু সুলতানি লস্কর এখন বায়ানার দিকে যাচ্ছিল, তাই রাজা সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁর ভাতিজাকে সুলতানের খিদমতে পাঠান যাতে সে বায়ানা পর্যন্ত সুলতানি লস্করের সাথে থাকে। [১]

সুলতান আশরাফ:

এখন সুলতান "বায়ানা" অভিমুখে রওনা হলেন। এই এলাকাটি কিছুকাল আগে জৌনপুরের শারকি সুলতানদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু শারকি সুলতানদের পতনের পর এখানকার সুবাদার স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করেছিলেন এবং সুলতান আশরাফ নাম ধারণ করেছিলেন। আগ্রার দুর্গও তাঁর অধীনে ছিল। সিকান্দার লোদী "বায়ানা"র দিকে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সুলতান আশরাফকে প্রস্তাব দেন যে, তিনি যদি বায়ানা থেকে দস্তবরদার (নিবৃত্ত) হন তবে তাঁকে চান্দওয়ারা, মারহেরা এবং সাকতি (সাকেত) এলাকাগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। সুলতান আশরাফ শুরুতে এতে রাজি হলেও পরে চিন্তা-ভাবনা করে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন।

সিকান্দার লোদী এটি দেখে আগ্রা দুর্গ ঘেরাও করেন যেখানে সুলতান আশরাফের নায়েব হাইবাত খান শাসন করছিলেন। শীঘ্রই তিনি "বায়ানা"র ওপরও আক্রমণ করেন। অবশেষে সুলতান আশরাফ সিকান্দার লোদীর আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এটি ৮৯৭ হিজরির ঘটনা। [২]

মোদ্দাকথা, নিজের শাসনের প্রাথমিক তিন বছরে সুলতান সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাফল্য অর্জন করেন। তিনি এই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করার পর মহানুভবতা প্রদর্শন করেন এবং আজম হুমায়ুন ব্যতীত বাকি সমস্ত বিরোধী শাহজাদাদের পরাজিত করার পর তাঁদের পূর্ববর্তী শাসন ও পদে বহাল রাখেন।

জৌনপুর ও বিহারের অভিযানসমূহ

পরবর্তী বছরগুলোতে আমরা সুলতান সিকান্দার লোদীকে জৌনপুর ও বিহারের সীমান্তে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখি। জৌনপুরের শাসক বারবাক শাহ প্রদেশটি সুসংগঠিত করতে এবং বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম ছিলেন না। ফলে সেখানে একের পর এক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

চোগা রাজপুতের বিদ্রোহ:

সর্বপ্রথম অনেক হিন্দু জমিদার বিদ্রোহ করেন যাদের দলগুলোর মোট সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বাচগোতি রাজপুতদের সর্দার চোগা। এই লোকেরা "কড়া"র শাসক শের খানকে হত্যা করে, অন্যদিকে নিহতের ভাই মুবারক খান লোহানি (মানিকপুরের শাসক) প্রাণ বাঁচাতে বিহারের দিকে পালান, কিন্তু পথে যখন তিনি গঙ্গা নদী পার হচ্ছিলেন...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯৩, ৫৯৪

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯৪; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৮৩

করার চেষ্টা করছিল, 'ভাট্টা' (রেওয়া) [১]-এর হিন্দু প্রধান রায় ভীড তাকে বন্দী করে ফেলেন।

জৌনপুরের সুবাদার শাহজাদা বারবক শাহ যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সাহস করতে পারলেন না এবং পালিয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন। সুলতান সিকান্দার লোধি যখন এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি চৌগান (পোলো) খেলছিলেন। তিনি সরাসরি সৈয়দ খাঁ জাহান লোধির প্রাসাদে গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলেন: "কী করা উচিত?"

খাঁ জাহান বললেন: "খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। সামান্য কিছু আহার করে জৌনপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।"

সুলতান বললেন: "খাবার পরবর্তী গন্তব্যে গিয়ে খাব।"

খাঁ জাহানের প্রাসাদ থেকে বের হয়ে সুলতান রাজপ্রাসাদে যাননি, বরং শহর থেকে বের হয়ে লাল রঙের যুদ্ধ-তাঁবু স্থাপন করে বাইরে অবস্থান নিলেন এবং সৈন্যবাহিনী একত্রিত হতেই দিল্লি থেকে রওনা হলেন। পথে বারবক শাহও তার সাথে এসে মিলিত হলেন। সুলতান দশ দিনের মধ্যে সেই স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন যেখানে গোয়েন্দারা জোগার উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল। যেহেতু জোগা সুলতান হোসেন শরকির আশ্রয়ে ছিল, তাই সুলতান সিকান্দার লোধি হোসেন শরকিকে 'ভ্রাতা' বলে সম্বোধন করে এই বার্তা পাঠালেন:

"এই দুর্গ এবং ভূমি যা আজ আপনার দখলে রয়েছে, তার জন্য আপনাকে মোবারকবাদ। আমি এখানে শুধুমাত্র এই জন্য এসেছি যাতে অকৃতজ্ঞ জোগাকে শাস্তি দিতে পারি। আপনি নিজেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করুন অথবা তাকে আপনার দল থেকে বহিষ্কার করুন যাতে আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি। সে একজন কাফির; আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে আপনারা কাফিরদের পক্ষ নেবেন না।"

সুলতান হোসেন শরকি রাগান্বিত হয়ে তার সহচর মীরান সৈয়দ খাঁর মাধ্যমে ফিরতি বার্তা পাঠালেন যাতে লেখা ছিল:

"জোগা আমার কর্মচারী। তোমার পিতা একজন সৈনিক ছিলেন, তাই আমি তার সাথে যুদ্ধ করেছি। তুমি একজন অবুঝ শিশু; যদি ফালতু কাজ করো, তবে তোমাকে তলোয়ারের পরিবর্তে জুতো দিয়ে পিটাব।"

সিকান্দার লোধি এই উত্তর শুনে বললেন: "আমি হোসেন শাহকে ভ্রাতা বলেছিলাম। তার এই ধৃষ্টতা সত্ত্বেও আমি এখনও সেই আদব ও সম্মান বজায় রাখছি। আমার উদ্দেশ্য কেবল কাফিরদের সতর্ক করা। যদি এই লোকেরা কাফিরের সমর্থন করে, তবে তাদের কপালে লাঞ্ছনা জুটবে এবং যে মুখ থেকে 'জুতো' শব্দ বের হয়েছে, ইনশাআল্লাহ তাআলা জুতো সেই মুখেই পড়বে।"

এরপর সিকান্দার লোধি হোসেন শরকির দূত মীরান সৈয়দ খাঁকে বললেন:

"আপনি আল্লাহর রাসুলের বংশধর। তাকে কেন বোঝাচ্ছেন না? সে পরে লজ্জিত হবে।"

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা-তে 'ভাট্টা'-কে 'ঝাহ' লেখা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি 'ভাট্টা', যা বর্তমান মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত একটি রাজ্য ছিল। এখানে বাঘেল রাজপুতদের শাসন ছিল, তাই এই এলাকা বাঘেলখণ্ড নামেও পরিচিত ছিল। এর রাজধানী ছিল রেওয়া। লোধি যুগে রেওয়া এবং এর সংলগ্ন এলাকাগুলো দিল্লি সালতানাতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ছিল এবং প্রায়ই লোধি ও স্থানীয় রাজপুত শাসকদের মধ্যে সংঘর্ষের স্থান হয়ে উঠত। দ্রষ্টব্য: রায় ভীড-কে তারিখ-ই-ফিরিশতা-তে 'রায় ভালদার' লেখা হয়েছে। জামে তারিখ-ই-হিন্দ-এ 'রায় বুধ' শব্দ আছে। তারিখ-ই-দাউদি-তে 'ভীদ' আছে। লেখকের মতে সঠিক শব্দ হলো 'ভীড'।

[২] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৯৭৭; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৫৯৪।

মিরান সৈয়দ উত্তর দিলেন: “আমি তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনি যা পছন্দ করেন, আমিও তা পছন্দ করি।”

সিকান্দার লোদী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “ভাগ্য এবং বুদ্ধি অবিচ্ছেদ্য। যার ভাগ্য খারাপ হয়, তার বুদ্ধিও লোপ পায়। এই বিষয়ে আপনি নিরুপায়। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ যখন সে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাবে এবং আপনি বন্দী হয়ে আসবেন, তখন আমি এই কথাটিই মনে করিয়ে দেব।”

এই বলে তিনি সৈয়দকে বিদায় দিলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে যুদ্ধের নকশা তৈরি করলেন এবং চোগানে থেকে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। কাঠগড় [১] নামক একটি স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। যাতে সিকান্দার লোদীর ক্ষুদ্র কিন্তু সুসংগঠিত বাহিনী পনের হাজার অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত অপেশাদার যোদ্ধাদের ওপর বিজয়ী হলো। শত্রু প্রচুর গনীমতের মাল ফেলে পালিয়ে গেল। চোগা রাজপুত বেঁচে পালিয়ে গেল। মোদ্দাকথা, সুলতান অধিকাংশ হিন্দু সর্দারদের বশীভূত করতে সফল হলেন। ‘রেওয়া’ [২]-এর রাজা রায় ভেন্ডও প্রভাবিত হয়ে মুবারক খান লোহানিকে মুক্তি দিলেন। এগুলো ৮৯৭ হিজরীর ঘটনা।

সুলতান হুসাইন শরকীর পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের সাহায্য:

সেই সময় রাজপুত বিদ্রোহীরা সুলতান সিকান্দার লোদী এবং হুসাইন শাহ শরকীর মধ্যকার মতভেদের সুযোগ নিয়ে এই নীতি গ্রহণ করেছিল যে, তারা সময়ে সময়ে বিদ্রোহ করত এবং যখন দিল্লির সুলতানদের পক্ষ থেকে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হতো, তখন তারা শরকী সুলতানদের কাছে আশ্রয় নিত। সে অনুযায়ী চোগা রাজপুতও পালিয়ে ‘জুনা’ [৩] দুর্গে চলে গেল এবং হুসাইন শরকীর কাছে আশ্রয় নিল। সুলতান সিকান্দার লোদী হুসাইন শাহ শরকীর কাছে দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত ভদ্রভাবে দাবি জানালেন যেন এই অহংকারী শত্রুকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। হুসাইন শাহ শরকী এবারও অত্যন্ত কড়া ভাষায় উত্তর দিলেন।

মোদ্দাকথা, উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ল। সিকান্দার লোদী তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে ‘জুনা’ [৩] দুর্গের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং এর উচ্চতা ও দৃঢ়তা দেখে বললেন: “আচ্ছা! এই সেই দুর্গ যার ওপর এই লোকদের এত গর্ব।”

ওদিকে হুসাইন শাহ প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সসৈন্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি জোরালো সংঘর্ষ হলো যাতে হুসাইন শাহ পরাজিত হলেন। তাঁর অনেক কর্মকর্তা ও সৈন্য বন্দী হলো, আর তিনি বিহারের দিকে পিছু হটলেন।

মিরান সৈয়দ খান, যিনি সেদিন হুসাইন শাহের দূত হয়ে এসেছিলেন, বন্দীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুলতান দেখলেন যে, তাঁর পাগড়ি মাথা থেকে খুলে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে নগ্ন মস্তকে আনা হচ্ছে। সুলতান ব্যথিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন:

“তাঁকে পাগড়ি পরাও এবং ঘোড়ায় চড়িয়ে সম্মানের সাথে আমার সামনে নিয়ে এসো।”

---

[১] কাঠগড়ের অবস্থান জানা যায়নি। তবে এলাহাবাদ বা “রেওয়া”-এর দক্ষিণ-পূর্বে অথবা কনৌজের কাছে কোনো জায়গা হবে।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি, পৃ. ৫৯৪, ৫৯৫; তারিখ-ই-দাউদি, পৃ. ৩১, ৩২; তারিখ-ই-সাইয়াহ, তারিখ-ই-হিন্দ, পৃ. ৭৬৯, ৭৭০।

[৩] জুনা নামক এই দুর্গটি পাটনা থেকে পূর্ব দিকে বেনারস (বারাণসী)-এর কাছে অবস্থিত ছিল। এই এলাকাটি এখন ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে।

এর পর মীরান সৈয়দ খান এবং অন্যান্য বন্দী আমিরদের সামনে আনা হলে সুলতান তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন:

“তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। ঘাবড়িয়ো না। তোমরা যা করেছ, তা আনুগত্যেরই দাবি ছিল, কিন্তু যখন হোসেন শাহ নিজেই দুর্ভাগা, তখন তোমরা আর কী করতে পারতে।” [১]

বারবক শাহের গ্রেফতারি:

সিকান্দার লোদী বিজয়ী বেশে জৌনপুর পৌঁছালেন এবং বারবক শাহকে পুনরায় সিংহাসনে বসালেন। এরপর তিনি শিকার ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আউধের জঙ্গলে চলে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে, হিন্দু জমিদাররা কি পুনরায় বিদ্রোহ করে? আর এমন পরিস্থিতিতে বারবক শাহ নিজেকে সামলাতে পারেন কি না? অন্যদিকে বিহার ও জৌনপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় শারকি সুলতানদের প্রাক্তন শাসক হোসেন শাহ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন। সিকান্দার লোদীও এদিক থেকে সতর্ক ছিলেন, তাই তিনি দিল্লি ফিরে যাননি।

সুলতান এক মাস পর্যন্ত শিকার খেলতে থাকেন। এই সময়ে গোয়েন্দারা তাকে এসে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, হিন্দু জমিদাররা যদি পুনরায় বিদ্রোহ করে, তবে বারবক শাহ তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন না। তিনি এই সংবাদও পেলেন যে, হোসেন শাহ শারকি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সুলতান প্রথমে জৌনপুরের ব্যবস্থাপনা ঠিক করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ছয়জন বিশ্বস্ত আমিরকে পাঠিয়ে বারবক শাহকে গ্রেফতার করালেন। এরপর তিনি আমিরদের ওপর রাজ্যের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। [২]

বিহারে হোসেন শাহ শারকির সাথে যুদ্ধসমূহ:

এরপর সুলতান হোসেন শাহকে দমনের জন্য বিহারের দিকে অগ্রসর হলেন। যার সেনাবাহিনী বিহারের সীমানা ছাড়িয়ে গঙ্গা নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল। [৩] সিকান্দার লোদী তাদের ওপর আক্রমণ করলেন। তবে এই বাহিনী নদীর তীরে একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত চুনার দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। [৪]

রায় ভীডের সাথে সংঘাত:

সুলতান এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয়ের অবরোধে সময় নষ্ট করা সমীচীন মনে করলেন না, বরং এখান থেকে “কান্ত” [৫]-এর দিকে অগ্রসর হলেন। যা রেওয়ার শাসক রায় ভীড (ভাট্টা)-এর জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রায় ভীড তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সমর্পণ করলেন এবং আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর সন্দেহ ও সংশয়ের বশবর্তী হয়ে তিনি সুলতানের ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন এবং “কান্ত” ছেড়ে নিজের মজবুত প্রাচীরবেষ্টিত রাজধানী “রেওয়া”-তে পালিয়ে গেলেন। সুলতান অত্যন্ত নিশ্চিন্তে...

---

[১] তারিখ-ই-দাউদি, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮।

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি, পৃষ্ঠা ৫৯৪; তারিখ-ই-দাউদি, পৃষ্ঠা ৮৯-৯১।

[৩] চুনার দুর্গ উত্তর প্রদেশের পূর্ব কোণে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত। এখান থেকে বিহারের সীমানা একদম কাছে।

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি, পৃষ্ঠা ৫৯৫।

[৫] কাথ নামক এলাকাটি এলাহাবাদের প্রাচীন দুর্গের সামনে যমুনা নদীর ডান তীরে অবস্থিত।

...ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য 'কাট' থেকে তার সমস্ত ধন-সম্পদ তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তবে রায় ভীড সুলতানের বিরোধিতা এবং হুসাইন শাহ শরকির সমর্থনকে প্রাধান্য দিলেন। অবশেষে সুলতান ৯০০ হিজরিতে (১৪৯৪ খ্রি.) তার বিরুদ্ধে সৈন্য অভিযান পরিচালনা করেন। তার ছেলে বীর সিং সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন কিন্তু সুলতান তাকে পরাজিত করেন। রায় ভীড এই সংবাদ শুনে 'সরপাকছ' [১]-এর দিকে পালিয়ে যান কিন্তু পথেই মারা যান। এভাবে সুলতান এক কঠিন শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পান।

সুলতানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ:

এই সফর থেকে ফেরার পথে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় এবং জায়গায় জায়গায় বন্যা দেখা দেয়। [২] রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে শস্য ও রসদ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এদিকে ঘোড়াগুলো ক্রমাগত সফরের কারণে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেগুলো মারা যেতে শুরু করে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় ৯০ শতাংশ সওয়ারি নষ্ট হয়ে যায়। সিকান্দার অত্যন্ত কষ্টে জৌনপুর পৌঁছান এবং লশকর বা বাহিনীর অবস্থা ঠিক করতে মনোনিবেশ করেন। [৩]

হুসাইন শাহ শরকির সাথে শেষ যুদ্ধ:

রায় ভীডের ছেলে লক্ষ্মণ চাঁদ এই সংবাদ হুসাইন শাহ শরকির কাছে পৌঁছে দেন এবং পরামর্শ দেন যে সিকান্দার লোদিকে পরাজিত করার এটাই সেরা সুযোগ। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই হুসাইন শাহ অবিলম্বে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তার মিত্র হিন্দু জমিদারদের সাথে নিয়ে বিহার থেকে কুচকাওয়াজ করে জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সিকান্দার লোদিও মোকাবিলার জন্য কোমর বেঁধে নামেন। বেনারস থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। সিকান্দার লোদি সামরিক দক্ষতার জোরে তার অল্প সংখ্যক সৈন্যকে এমনভাবে পরিচালনা করেন যে প্রতিপক্ষ নাস্তানাবুদ হয়ে যায় এবং হুসাইন শাহ শরকি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় বিহারের দিকে পালিয়ে যান।

সিকান্দার লোদি তার পিছু ধাওয়া করতে করতে বিহারে প্রবেশ করেন। এখানে আশেপাশের হিন্দু রাজারা তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন। সুলতান পাটনা থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে দরবেশপুর (মনির শরীফ) পৌঁছান এবং শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মুনিরি রহ.-এর মাজারে হাজিরা দেন। এই সময়ে হুসাইন শাহ শরকি পালিয়ে গিয়ে বাংলার শাসক আলাউদ্দিনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুলতান পিছু ধাওয়া করতে করতে ভাগলপুর [৫] পর্যন্ত পৌঁছে যান যা বাংলার সুলতান আলাউদ্দিনের এলাকা ছিল।

---

[১] "সরপাকছ" নামক এলাকার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি যে এটি কোথায় অবস্থিত ছিল। সম্ভবত এটি পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের সীমান্তের আশেপাশে হবে, অর্থাৎ রায় ভীড তখন সুলতান হুসাইন শাহ শরকির এলাকায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলেন।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: ১ পৃ. ৫৯৫, ৫৯৬।

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা এবং মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ অনুযায়ী সুলতান তখন পাটনা যাচ্ছিলেন যখন এই বিপদগুলো দেখা দেয়, কিন্তু প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এটি ছিল ফেরার সফর, তাই এখানে পাটনার উল্লেখ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক। জামে তারিখ-ই-হিন্দের লেখকরা একে "ফাফুন্দ" বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এটিও সঠিক নয় কারণ "ফাফুন্দ" যা জৌনপুর থেকে ৪০০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে আগ্রার কাছে অবস্থিত এবং এই ফ্রন্ট থেকে সেদিকে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। তখন আগ্রা শহরের ভিত্তিও স্থাপিত হয়নি।

[৪] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: ১ পৃ. ৫৯৬।

[৫] ভাগলপুর পাটনার পূর্বে প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সুলতান আলাউদ্দিন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সৈন্য পাঠালেন। অপর দিক থেকে সিকান্দার লোদী মাহমুদ খান লোদী এবং মুবারক খানি লোহানিকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে পাঠালেন। পাটনার কাছে মুখোমুখি অবস্থান হলেও যুদ্ধের আগে আলোচনা শুরু হয় যা সফল হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে:

- সুলতান-ই-বেঙ্গল দিল্লির সুলতানের শত্রুদের আশ্রয় দেবেন না।
- কোনো শাসক অন্যের দেশে আক্রমণ করবেন না।
- সিকান্দার লোদী বিহারের যে অঞ্চলগুলো জয় করেছেন, সেগুলো দিল্লি সালতানাতের অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

এই চুক্তির পর সুলতান হোসেন শারকি ক্ষমতার খেলা থেকে পুরোপুরি ছিটকে পড়েন। তিনি তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলো একজন নির্বাসিত শাসক হিসেবে বিহারের ‘কাহালগাঁও’ অঞ্চলে অতিবাহিত করেন এবং সম্ভবত ৯০৬ হিজরি (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) সালে মৃত্যুবরণ করেন। হোসেন শাহ শারকির মরদেহ তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী জৌনপুরে এনে শারকি রাজবংশের রাজকীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। এই কবরস্থানের কাছে হোসেন শাহের নির্মিত জামে মসজিদ ওমর (বড় মসজিদ) এখনও বিদ্যমান রয়েছে। [১]

হোসেন শাহ শারকি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক থেকে দুর্বল ছিলেন। তিনি ললিতকলা বিশেষ করে সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই জৌনপুরের সেই গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে যে সময়ে জৌনপুরকে ‘শিরাজ-ই-হিন্দ’ বলা হতো।

রিওয়ার ওপর আক্রমণ

উল্লিখিত অভিযানগুলোতে সুলতান সিকান্দার লোদীর প্রায় ছয় বছর ব্যয় হয়। অর্থাৎ তিনি ৮৯৭ হিজরিতে পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর দিকে এসেছিলেন এবং বাংলার শাহের সাথে চুক্তি করে ৯০৩ হিজরিতে এই ক্লান্তিকর অভিযান থেকে অবসর পান। এরপর তিনি প্রায় এক বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিলেন।

৯০৪ হিজরিতে তিনি ‘ভাট্টা’ [২] রাজ্যের রাজধানী ‘রিওয়া’ আক্রমণ করার জন্য বের হন, কারণ এখানকার রাজা কুমার সুলতান হোসেন শারকিকে গোপন তথ্য দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, সুলতান তাঁর কাছে তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলে সুলতান সেই দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন।

প্রথমে সুলতান ‘বান্ধুগড়’ [৩] নামক দুর্গে আক্রমণ করেন কিন্তু এই দুর্গ কোনোভাবেই জয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে সুলতান আশেপাশের বিশাল এলাকা ধ্বংস করে ফিরে আসার পথ বেছে নেন। [৪]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯৬ থেকে ৫৯৮; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৮৭৮, ৮৭৯; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৯০, ৯১, ৯২।

[২] ফেরেশতা এখানে এই স্থানের নাম ‘পাটনা’ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা ‘পাটনা’ (বিহার) বুঝবেন না। বরং উদ্দেশ্য হলো ‘ভাট্টা’, যার উল্লেখ আগেও এসেছে।

[৩] এটি ‘ভাট্টা’র রাজধানী ‘রিওয়া’ শহর থেকে ষাট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। (টীকা জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৮৭৯)

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯৮; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৯২; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৮৭৯।

https://t.me/BoierSomahar

সম্ভলে চার বছর অবস্থান। হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ:

এই অভিযানগুলোর পর সুলতান হুসাইন শাহের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য বিপদ রোধ করতে এবং বিদ্রোহী রাজপুতদের দমন করে রাখার জন্য সম্ভলে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ৯০৫ হিজরি থেকে ৯০৯ হিজরি (১৪৯৯ খ্রি. থেকে ১৫০৩ খ্রি.) অর্থাৎ চার বছর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। এই সময়ে সুলতানের কিছু কঠোর আচরণের কারণে অনেক আমির অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিলেন যারা কিছু সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলেন এবং সুলতানের পক্ষ থেকে হিসাব চাওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হন। কেউ কেউ এমন ছিলেন যারা চৌগান খেলার সময় একে অপরকে আঘাত করার কারণে পরস্পরের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এবং পরে ইচ্ছাকৃতভাবে অজুহাত দেখিয়ে একে অপরকে আঘাত করতে শুরু করেন। বাদশাহ একদিন নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখে কিছু আমিরকে জুতো ও লাথি দিয়ে পিটিয়েছিলেন।

এই আমিররা দলবদ্ধ হয়ে সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং তার পরিবর্তে তার ভাই শাহজাদা ফাতহ খানকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র তৈরি করে। বাইশজন আমির এতে শামিল হন যাদের মধ্যে তাতার খান, আসগর খান, সাঈদ খান শিরওয়ানি এবং মাহমুদ শাহের মতো নামী ব্যক্তিরাও ছিলেন। তবে শাহজাদা ফাতহ খান মনেপ্রাণে এই ষড়যন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। তিনি গোপনে এই রহস্য তার শায়খ ও মুরুব্বি হযরত মাওলানা তাহির এবং তার মাকে জানিয়ে দেন। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, এই সত্য সুলতানকে জানানো জরুরি। এভাবে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। সুলতান সিকান্দার লোদী এতে জড়িত আমিরদের গ্রেফতার করেন। অনেককে দিল্লিতে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং বাকিদের নির্বাসিত করা হয়। সুলতান এই ঘটনার পর আমিরদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যান এবং তিনি নিজের নিরাপত্তা প্রহরাও জোরদার করেন। [১]

রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ:

সম্ভলে অবস্থানের এই বছরগুলোতেই সুলতানকে ধোলপুর ও গোয়ালিয়রের রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হয়। ধোলপুরের রাজা রায় মানিক দেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি 'বায়ানা'তে সুলতানের নায়েব ইমাদুল মুলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে সহায়তা করেছেন। সুলতানের আদেশে মেওয়াতের শাসক আলম খান, রাপরির শাসক খান খানান লোহানি এবং বায়ানা-র নতুন শাসক খাজা খান ধোলপুর আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। তবে রাজা মানিক দেব অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করেন এবং এই বাহিনীকে সফল হতে দেননি।

অবশেষে সিকান্দার লোদী নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হন। ৬ রমজান ৯০৬ হিজরি (২৫ মার্চ ১৫০১ খ্রি.) তিনি ধোলপুরের প্রাচীরের সামনে উপস্থিত হন। রাজা মানিক দেব সাহস হারিয়ে পালিয়ে যান এবং গোয়ালিয়রে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। সুলতানও সৈন্য নিয়ে গোয়ালিয়রের বাইরে পৌঁছে যান। অবশেষে রাজা মানিক দেব আনুগত্য প্রকাশ করে সন্ধির আবেদন করেন যা সুলতান মঞ্জুর করেন এবং ধোলপুরের ওপরও তার শাসন বজায় রাখার ঘোষণা দেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৫৯৮, ৫৯৯; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৯৩, ৯৬, ৯৭; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৯৭, ৯৮।

https://t.me/BoierSomahar

৯১০ হিজরি (১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান রাজপুতদের একটি দুর্গ “মান্দরাইল” [১] এর ওপর আক্রমণ করার জন্য বের হলেন এবং তা অবরোধ করলেন। শহরের বাহিনী দ্রুতই আত্মসমর্পণ করল। সুলতান এখানে কিছু মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করালেন। [২]

আগ্রা শহর নির্মাণ:

আগ্রা শহর নির্মাণ সিকান্দার লোদীর সেই কীর্তি যা সর্বদা এই মহান বাদশাহর স্মৃতি বহন করবে। দিল্লির সুলতানদের জন্য এক শতাব্দী পর্যন্ত দিল্লিকে রাজধানী করে রাখা কোনো বিশেষ কারণে ছিল না, কারণ সালতানাতের বিস্তার উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল। এভাবে দিল্লি প্রায় মাঝামাঝি অবস্থানে ছিল।

কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজির দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর সালতানাতের পরিধি এত বৃদ্ধি পায় যে, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ প্রদেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এই কারণে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক কয়েকশ মাইল দক্ষিণে গিয়ে দৌলতাবাদকে কেন্দ্র বানিয়েছিলেন, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার ব্যর্থতা সবার সামনে ছিল। সিকান্দার লোদী তুলনামূলক বেশি সতর্কতার সাথে কাজ নিলেন। দক্ষিণে অনেক বেশি অগ্রসর হওয়া এখন নিরর্থক ছিল কারণ দাক্ষিণাত্য অনেক আগে থেকেই একটি পৃথক সালতানাতে পরিণত হয়েছিল। এখন এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে রাজধানী কিছুটা দক্ষিণের দিকে সরিয়ে নেওয়া হোক। তাই কেন্দ্রের জন্য একটি জায়গার নির্বাচন অনেক চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধানের সাথে করা হলো এবং এর জন্য দিল্লি থেকে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে যমুনা নদীর তীরে একটি জায়গা পছন্দ করা হলো।

অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোকদের একটি প্রতিনিধি দল নৌকাযোগে এখানে এল। তারা যমুনার উভয় তীর পরিদর্শন করল। এরপর সুলতান নিজেও পরিদর্শনের জন্য নৌকায় এলেন। যখন নদীর কাছে পৌঁছালেন, তখন নদীর তীরে দুটি উঁচু এলাকা দেখা গেল। তিনি মাঝিদের ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করলেন: “আমাদের জন্য এই দুটি উঁচু স্থানের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম ও উপযুক্ত?”

সে উত্তর দিল: “আগে রাহ” (অর্থাৎ সামনে যা আছে, সেটিই উত্তম)।

সুলতান হেসে বললেন: “এই শহরের নামও আগ্রা হবে।”

নির্বাচিত স্থানটি জেলা দেওলির “বসি” এবং “পুইয়া” নামক গ্রামগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে নির্মাণ কাজ শুরু হলো এবং প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ৯১১ হিজরি (১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান সিকান্দার লোদী দিল্লি থেকে এখানে স্থানান্তরিত হলেন। এভাবে এই নতুন শহর দিল্লির সুলতানদের নতুন রাজধানী হয়ে গেল। এখানে নিরবচ্ছিন্ন নির্মাণ কাজ চলল। অবশেষে সুউচ্চ প্রাসাদ, সুন্দর মসজিদ, সামরিক ছাউনি এবং মনোরম বাগানগুলোর কারণে এটি উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে গণ্য হতে লাগল। মুঘল শাসকরাও এর গুরুত্ব জানতেন। তাদের উন্নতির যুগেও তাদের রাজধানী মূলত এই শহরই ছিল। [৩]

---

[১] মান্দরাইল (মান্দরাইল) ভারতীয় রাজ্য রাজস্থানের জেলা করৌলির একটি শহর। এটি গোয়ালিয়র থেকে পশ্চিমে ১২৩ কিলোমিটার দূরে এবং পার্বতী নদীর ডান তীরে অবস্থিত। (পার্বতী নদী চম্বল নদীর একটি উপনদী)।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০২; তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ৭৯, ৮০; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৯৮০, ৯৮১।

[৩] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৯৮১; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬২, ৩৬৩।

ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা:

সিকান্দার লোদীর শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ৩ সফর ৯১১ হিজরি (১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ)-এর ভূমিকম্প, যা পুরো উপমহাদেশে আঘাত হেনেছিল এবং জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়েছিল। ভূমিকম্পের তীব্রতা এমন ছিল যেন কিয়ামত এসে গেছে। [১]

গোয়ালিয়রের দ্বিতীয় অভিযান:

আগ্রায় অবস্থানের পর ৯১১ হিজরি (১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ)-তেই সিকান্দার লোদী পুনরায় গোয়ালিয়র বিজয়ের উদ্দেশ্যে সেদিকে রওনা হন, কিন্তু "চুনার" [২]-এ লশকর বা সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের ওপর শত্রুরা এমন আক্রমণ করে যে এই অভিযান স্থগিত করতে হয়।

পরের বছর ৯১২ হিজরি (১৫০৭ খ্রিস্টাব্দ)-তে সুলতান গোয়ালিয়রের আগে এর রক্ষক দুর্গগুলো জয় করার সিদ্ধান্ত নেন এবং "উন্তগড়" [৩]-এর দুর্গে আক্রমণ করেন, যাকে গোয়ালিয়রের চাবিকাঠি মনে করা হতো। দুর্গের রক্ষী বাহিনী অত্যন্ত কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু একদিক থেকে প্রাচীর ভেঙে পড়ার পর মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করে। এরপরও অবরুদ্ধদের প্রতিরোধ অব্যাহত ছিল। অবশেষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুসলমানরা দুর্গটি দখল করে নেয়।

ফেরার পথে পানির দূষণ ও স্বল্পতার কারণে বড় ধরনের বিপত্তি দেখা দেয় এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য তৃষ্ণায় মারা যায়। এই অভিযান থেকে সুলতানের আগ্রায় প্রত্যাবর্তন ঘটে ২৭ মহরম ৯১৩ হিজরি (৮ জুন ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দ)-তে। [৪]

নরওয়ার দুর্গ অবরোধ:

পরের বছর ৯১৩ হিজরিতে সুলতান কাল্পির শাসক জালাল খানকে নির্দেশ দেন যেন তিনি "নরওয়ার" [৫] দুর্গটি জয় করে দেখান। এটি গোয়ালিয়র থেকে কিছুটা দূরে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত অত্যন্ত সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। জালাল খান এটি ঘেরাও করেন। পরবর্তীতে সিকান্দার লোদীও নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান। এক বছর পর্যন্ত দুর্গের অবরোধ অব্যাহত থাকে।

এই সময়ে বাদশাহর মনে জালাল খান সম্পর্কে সন্দেহ জাগে যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। ফলে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়। কিছুদিন পর দীর্ঘ অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। সুলতান এই এলাকায় বেশ কিছু মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করান এবং সেখানে উলামা ও কাজী নিযুক্ত করেন। [৬]

---

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ২০৬; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৬৮; তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাল্লাহ: খণ্ড ৩, পৃ. ৩৬৪।

[২] আবুল ফজল একে গোয়ালিয়র সরকারের একটি শহর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (হাশিয়া জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৯৮৪)

[৩] উন্তগড়কে "উন্তগির" বলা হয়। এটি কারাউলি জেলার একটি তহশিল। (হাশিয়া জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৯৮৪)

[৪] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৬০৩ থেকে ৬০৫; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৬৮, ৬৯; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৯৮৪।

[৫] নরওয়ার দুর্গ ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের শিবপুরি জেলার একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এটি গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ঝাঁসির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং উভয় শহর থেকে এর দূরত্ব সমান অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল। এর আয়তন আট বর্গকিলোমিটার।

[৬] তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৯৯, ১০০; তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৬০৬।

https://t.me/BoierSomahar

“ভাদোরিয়া” রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ। হাত কান্ত দুর্গ বিজয়:

ভাদোরিয়া রাজপুতরা উত্তর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী রাজপুত গোত্র ছিল, যারা বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চলে বসবাস করত। বিশেষ করে, আগ্রা, ইটাওয়া এবং ভিন্ড (মধ্যপ্রদেশ) জেলাগুলোতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এই রাজপুতরা তাদের বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিল এবং তাদের নিজস্ব একটি শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। লোদী যুগে এই স্থানীয় শক্তিগুলো দিল্লি সালতানাতের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। “হাত কান্ত” দুর্গ [১] ভাদোরিয়া রাজপুতদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও প্রতিরক্ষা কেন্দ্র ছিল।

১০ মহররম ৯১৫ হিজরি (৩০ এপ্রিল ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান সিকান্দার লোদী “ভাদোরিয়া” গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। এই অভিযানে তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ “হাত কান্ত” জয় করে সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন এলাকাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত করা হয়। সুলতান এখানে নতুন প্রতিরক্ষা চৌকিও স্থাপন করেন। “হাত কান্ত” বিজয় লোদীদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রমাণ দিচ্ছিল।

এই সফর থেকে আগ্রা ফেরার পথে পানির অভাবের কারণে আটশ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। [২]

মালওয়ার সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব:

আগ্রাকে রাজধানী করার পর সুলতান সিকান্দার লোদীর জন্য “মালওয়া রাজ্য”-এর ওপর নজর রাখা সহজ হয়ে যায়, যেখানে তখন সুলতান নাসিরুদ্দিন খিলজির শাসন ছিল। তবে সিকান্দার লোদী এই প্রতিবেশী রাজ্যের ওপর সরাসরি আগ্রাসন থেকে বিরত থাকতেন। ৯১৬ হিজরি (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ) সালে সিকান্দার লোদী মালওয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার এক বিরল সুযোগ পেয়ে যান। ঘটনাটি ছিল এই যে, মালওয়ার যুবরাজ শাহাবুদ্দিন তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং “চান্দেরি” শহরের “সেরি”-তে পালিয়ে যান। সুলতান নাসিরুদ্দিন অপরাধী পুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার তৃতীয় পুত্র আজম হুমায়ুনকে নতুন যুবরাজ মনোনীত করেন।

শাহাবুদ্দিন হতাশ হয়ে আশ্রয় নিতে সিকান্দার লোদীর কাছে আসেন এবং সাহায্যের আবেদন করেন। সুলতান শর্ত দেন যে, তাকে “চান্দেরি” হস্তান্তর করতে হবে। শাহজাদা রাজি হন এবং সুলতান তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

তবে সুলতান সিকান্দারের ধারণা ছিল যে, তিনি যখন মালওয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবেন, তখন মালওয়ার প্রতিবেশী গুজরাট সালতানাতও পিছিয়ে থাকবে না। তাই প্রয়োজন ছিল গুজরাটের শাহের সাথে আগেই বিষয়গুলো মীমাংসা করে নেওয়া। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, দিল্লির সুলতানরা গুজরাটের শাসকদের বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করে আসছিলেন, যার ফলে পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ছিল। তবে সিকান্দার লোদী মালওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য গুজরাটের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা জরুরি মনে করেন। ফলে জিলহজ ৯১৬ হিজরি (মার্চ ১৫১১ খ্রিস্টাব্দ) মাসে তিনি গুজরাটের শাসক সুলতান মাহমুদের কাছে একটি কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠান, যারা মূল্যবান উপহার সামগ্রী পেশ করে সুলতান মাহমুদকে রাজি...

---

[১] এই দুর্গটি বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়া জেলায় চম্বল নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

[২] (তারিখে ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬০৭, ৬০৮; জামে তারিখে হিন্দ: পৃ. ৯৮২) দ্রষ্টব্য: তারিখে ফেরেশতায় “হাত কান্ত”-কে “হাত কাত” লেখা হয়েছে।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

...যাতে তারা লোদী এবং মালব সরকারের মধ্যকার দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে।

এরপর সিকান্দার লোদী শাহজাদা শিহাবুদ্দিনকে মালবের সিংহাসন পাইয়ে দেওয়ার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা চিন্তা করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মালবের সুলতান নাসিরুদ্দিনের ইন্তেকালের খবর আসে।

শাহজাদা শিহাবুদ্দিন এখন সিকান্দার লোদীর সাহায্য নেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে করলেন এবং নিজেই দ্রুত মালবের রাজধানী মান্ডুতে পৌঁছে গেলেন, যেখানে তার ছোট ভাই (আজম হুমায়ুন) সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। শিহাবুদ্দিন সুলতান (মাহমুদ দ্বিতীয়)-কে সরিয়ে সিংহাসন দখল করার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন।

তবে কয়েক দিন যেতে না যেতেই তাদের তৃতীয় ভাই সাহেব খান ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই দ্বন্দ্বে তিনি জয়ী হলেন এবং সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয়কে ক্ষমতাচ্যুত করে ৯১৭ হিজরি (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান মুহাম্মদ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় প্রাণ বাঁচিয়ে চান্দেরী পৌঁছালেন এবং সুবাদার বহজত খানের কাছে সাহায্য চাইলেন, কিন্তু তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন।

বাধ্য হয়ে মাহমুদ দ্বিতীয় সিকান্দার লোদীর কাছে সহযোগিতার আবেদন করতে বাধ্য হলেন। সিকান্দার লোদী বিনিময়ে 'চান্দেরী' দাবি করলেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক দরকষাকষি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হতে পারেনি। এর আগেই মাহমুদ দ্বিতীয় শক্তিশালী রাজপুত সর্দার মেদিনী রায়ের সাহায্য পেয়ে যান। এভাবে তিনি ১৬ শাওয়াল ৯১৭ হিজরি (জানুয়ারি ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে মালবের কেন্দ্র মান্ডুর ওপর পুনরায় আধিপত্য বিস্তার করেন এবং সাহেব খানকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে হয়।

এই নতুন সরকারে রাজপুত মেদিনী রায়কে অসাধারণ মর্যাদা দেওয়া হলো। চান্দেরীর সুবাদার বহজত খান এবং হান্ডিয়ার শাসক সিকান্দার খান তাদের সালতানাতে একজন রাজপুত সর্দারের এত প্রভাব-প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারলেন না। ফলে ৯১৮ হিজরি (১৫১২ খ্রিস্টাব্দ) সালে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সুলতান মুহাম্মদ (সাহেব খান)-কে সিংহাসনে বসানোর সংকল্প ব্যক্ত করেন। এই সংবাদ পেয়ে সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয়ের পক্ষ থেকে মেদিনী রায় লস্কর নিয়ে এই আমিরদের দমনের জন্য বের হলেন এবং সিকান্দার খানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। বহজত খান এই খবর পেয়ে সিকান্দার লোদীর সাথে যোগাযোগ করে বললেন: "সাহেব খানকে সিংহাসনে বসানোর জন্য আমাকে একটি বাহিনী পাঠান। এরপর খুতবা এবং মুদ্রা আপনার নামেই চলবে।"

সিকান্দার লোদী তৎক্ষণাৎ সাহায্যকারী বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মালবের সিংহাসনে সাহেব খান (সুলতান মুহাম্মদ) পুনরায় আসীন হলেন। তবে সিকান্দার লোদীর সাথে খুতবা ও মুদ্রার ব্যাপারে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূরণ করা হয়নি। সিকান্দার লোদী তখন ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং বিষয়টি আর বাড়ালেন না এবং মালবের আমির ও শাহজাদাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করার জন্য কিছুটা সময় দিলেন।

এদিকে মালবে সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় এবং সুলতান মুহাম্মদের মধ্যে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব চলতেই থাকল। অবশেষে সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় রাজপুতদের সাহায্যে আবারও বিজয়ী হলেন এবং সুলতান মুহাম্মদ (সাহেব খান) আশ্রয় নেওয়ার জন্য সিকান্দার লোদীর কাছে আসতে বাধ্য হলেন। সিকান্দার লোদী এখন "দেখো তেল আর তেলের ধারা" নীতি অনুসরণ করতে থাকলেন।

শীঘ্রই সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় রাজপুত সর্দার মেদিনী রায়ের আধিপত্য, শক্তি এবং ক্ষমতার লালসায় ভীত হয়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি রায়কে হত্যার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু এই চেষ্টা হিতে বিপরীত হয় এবং সুলতান মাহমুদ নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে ৯২০ হিজরি (১৫১১ খ্রিস্টাব্দ) সালে গুজরাটের...

শাসক মুজাফফর শাহের কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

সিকান্দার লোদীর জন্য এখন ময়দান একদম পরিষ্কার ছিল। তিনি সৈন্য পাঠিয়ে চন্দেরী দখল করে নিলেন। সাহেব খানকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মালওয়ার সিংহাসন অর্পণ করা হলো, কিন্তু চন্দেরীর ওপর সুলতান নিজের দখল বজায় রাখলেন এবং সেখানে নিজের কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করলেন। [১]

চন্দেরী কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

গত পৃষ্ঠাগুলোতে সুলতান সিকান্দার লোদীর মালওয়ার জটিল রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে তার বিনিময়ে চন্দেরী লাভের নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই প্রশ্ন জাগে যে, তার জন্য চন্দেরী কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

প্রকৃতপক্ষে সুলতান সিকান্দার লোদীর জন্য চন্দেরী রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং সামরিক কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চন্দেরী মালওয়া সালতানাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এবং মালওয়া ছিল ভারতের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। সিকান্দার লোদী মালওয়ার ওপর নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে নিজের যাতায়াত সুরক্ষিত করতে পারেন এবং গুজরাট ও মেওয়ারের মতো অন্যান্য শক্তিশালী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধেও একটি মজবুত অবস্থান অর্জন করতে পারেন। চন্দেরী দখল ছিল মালওয়ার রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চন্দেরী এমন বাণিজ্যিক পথ এবং সামরিক যাতায়াতের রাস্তার ওপর অবস্থিত ছিল যা উত্তর ভারতকে দক্ষিণ ভারতের সাথে যুক্ত করত। এর ওপর নিয়ন্ত্রণ মানে ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথ এবং সামরিক চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা, যার ফলে লোদী সালতানাতের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য ছিল।

তাছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী দুর্গ জয় করা শাসকের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করত। রাজনৈতিক চাল এবং সামরিক কৌশলের বিজয় সিকান্দার লোদীর ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করেছিল এবং তার খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এতে লোদী সালতানাতের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যান্য ছোট রাজ্যগুলোর ওপর তার ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে, চন্দেরী বিজয় ছিল সিকান্দার লোদীর রণকৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার উদ্দেশ্য ছিল লোদী সালতানাতকে ভারতের একটি অবিসংবাদিত শক্তিতে পরিণত করা।

সিউপুর দুর্গে আক্রমণ:

চন্দেরী দখলের মাধ্যমে সিকান্দার লোদীর জন্য রাজপুতদের দমন করা কিছুটা সহজ হয়ে গিয়েছিল, কারণ চন্দেরী রাজপুতদের কেন্দ্র ছিল। সিকান্দার লোদী রাজপুতদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন যারা দিল্লি সালতানাতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারত। চন্দেরী বিজয়ের ফলে রাজপুতরা একটি বড় ধাক্কা খায় এবং ওই অঞ্চলে লোদীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর পরপরই সিকান্দার লোদী রাজপুতদের অপরাজেয় দুর্গ রণথম্ভোর জয়ের প্রস্তুতি নেন। প্রথমে এই দিকে অগ্রসর হয়ে ‘সিউপুর’ [২] দখল করে নেন যা ‘রণথম্ভোর’ জেলায় অবস্থিত ছিল। ৯২৩ হিজরি (১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি রণথম্ভোর...

---

[১] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৯৮২ থেকে ৯৮৩; তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬০৮ থেকে ৬১০।

[২] সিউপুরকে ‘সুই সু পুর’ বা ‘সুই পুর’ও বলা হয়েছে কিন্তু সঠিক উচ্চারণ হলো ‘সিউপুর’। এই দুর্গটি গোয়ালিয়র থেকে ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত যেখানে...

...পুর আক্রমণ করল। যদিও সে কেল্লা জয় করতে পারেনি, কিন্তু স্থানীয় রাজপুত রায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব মেনে নিল। [১]

সিকান্দার লোদীর মৃত্যু:

সিকান্দার লোদীর বয়স ৪৮ বছর হয়েছিল। তিনি তখনও পর্যন্ত মজবুত ও সুস্থ ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি এক জটিল রোগের শিকার হলেন। এই জটিলতা 'খুনাক' (গলার ক্যান্সার) আকারে প্রকাশ পেল এবং মৃত্যুর বাহানা হয়ে দাঁড়াল।

তারিখ-ই-দাউদী-র লেখক বর্ণনা করেন যে, সিকান্দার লোদী দাড়ি মুণ্ডন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। একদিন এক বুজুর্গ হাজী আব্দুল ওয়াহাব তার কাছে এলেন এবং বললেন: "আপনি একজন মুসলিম বাদশাহ এবং দাড়ি রাখেন না। এই কাজ ইসলামের নিদর্শনের পরিপন্থী। বিশেষ করে একজন মুসলিম বাদশাহর জন্য এটা জরুরি যে তার চেহারায় দাড়ি থাকুক।"

সুলতান বললেন: "আমি দাড়ি রাখার ইচ্ছা রাখি। ইনশাআল্লাহ রাখব।"

হাজী সাহেব বললেন: "আল-খাইরু লা ইউআখখার" (কল্যাণের কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়)।

সুলতান ওজর পেশ করে বললেন: "হাজী সাহেব! আমার দাড়ি খুব পাতলা। যদি রাখি তবে দেখতে খারাপ লাগবে। মানুষ ঠাট্টা করবে এবং গুনাহগার হবে। আমি চাই না যে আমার কারণে মুসলমানরা গুনাহগার হোক।"

হাজী সাহেব বললেন: "আমি আমার হাত আপনার চেহারায় বুলিয়ে দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ সুন্দর দাড়ি গজাবে।"

সুলতান চুপচাপ মাথা নিচু করলেন। হাজী আব্দুল ওয়াহাব মজলিস থেকে উঠে সালাম করে চলে গেলেন।

তখন সুলতান বিরক্তির সাথে বললেন: "এমন এমন বুজুর্গ আমার খেদমতে আসেন—যদিও তারা আমাদের গোলাম, কিন্তু আমি তাদের মন থেকে সম্মান করি এবং আমিরদের বলি যে তাদের পালকি কাঁধে তুলে নিতে।"

সেই সময় সৈয়দ আব্দুল জলিল নামক এক বুজুর্গও সেখানে বসা ছিলেন। পরে তিনি বাদশাহর এই কথাগুলো হাজী আব্দুল ওয়াহাবকে শোনালেন। হাজী আব্দুল ওয়াহাব বললেন: "সৈয়দ সাহেব! আপনি আল-ই-রাসুল। বাদশাহ যখন আপনাকেও গোলাম বলে সম্বোধন করেছেন, তবে এই কথা তার গলায় আটকে যাবে।" [২]

এর কয়েকদিন পর সুলতান সিকান্দারের গলায় ফোঁড়া বের হলো এবং "রোগ বাড়ার সাথে সাথে ওষুধও বাড়ল"-এর দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াল। ১৭ জিলকদ ৯২৩ হিজরি (২১ নভেম্বর ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান এই রোগের কারণেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ২৯ বছর ৫ মাস রাজত্ব করেন। [৩]

রনথাম্বোর থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

[১] জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৯৮৪; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬১০।

[২] তারিখ-ই-দাউদী: পৃষ্ঠা ১১৭, ১১৮।

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬১১; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃষ্ঠা ৯৮২, ৯৮৫।

https://t.me/BoierSomahar

সিকান্দার লোদী - একজন শাসক হিসেবে

সিকান্দার লোদী একজন শাসক হিসেবে ভারতের একজন বিশিষ্ট বাদশাহ ছিলেন। তিনি এই দেশে আফগানদের ক্ষমতাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি বাহলুল লোদীর সাধারণ সভ্যতা নির্ভর সালতানাতকে একটি উন্নত ও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর আমলের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

- আফগানদের গণতান্ত্রিক ও সাধারণ ঐতিহ্য বজায় রেখে তাদের মধ্য থেকে বাদশাহর মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। বাহলুল লোদী একটি গালিচায় সকল আমীরদের সাথে বসতেন, কিন্তু সিকান্দার সিংহাসনে বসা শুরু করেন যেখানে কোনো আমীর বা সহচরের সাথে বসার প্রশ্নই আসত না।

- কঠোর শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকা হতো। তাঁর আমলে আমীরদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা খুব কমই ঘটেছে।

- ন্যায়বিচারের মানদণ্ড কেবল বজায় রাখা হয়নি বরং একে আরও উন্নত করা হয়েছিল।

- সুলতান গোয়েন্দা ও গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সক্রিয় করেছিলেন। মানুষের গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও তথ্য তাঁর কাছে পৌঁছে যেত। কখনো কখনো সুলতান নিজে ছদ্মবেশে খবরাখবর যাচাই করতে বের হতেন। সাধারণ মানুষ মনে করতে শুরু করেছিল যে বাদশাহর কাছে জীন রয়েছে। আমীরদের কর্মকাণ্ডের ওপর বিশেষ নজর রাখা হতো। এই কারণেই সুলতানের ২৯ বছরের দীর্ঘ শাসনকাল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত ছিল। যদি কোনো ষড়যন্ত্র হতোও, তবে তা সাথে সাথেই ধরা পড়ে যেত।

- আমীরদের ওপর এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে তারা কেবল কর্মচারী এবং তাদের পদোন্নতি বা অপসারণ বাদশাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

- জায়গীরদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন নিয়মিতভাবে দিওয়ান-ই-বিজারতে হিসাবপত্র জমা দেয়।

- দুর্নীতি, মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং ঘুষ ইত্যাদির জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত ছিল।

- রাজকীয় ফরমানের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য বেশ কিছু আদব বা শিষ্টাচার নির্ধারণ করা হয়েছিল। যেমন: প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল যে তারা রাজকীয় দূত বা কাসেদকে গ্রহণ করার জন্য ছয় মাইল এগিয়ে যাবে। রাজকীয় কাসেদ একটি নির্দিষ্ট বাংলোতে অবস্থান করত এবং সেখানে প্রাদেশিক শাসকের হাতে রাজকীয় ফরমান তুলে দিত, যা তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের মাথায় রাখতেন এবং তারপর তা পাঠ করতেন।

- প্রাদেশিক শাসক জনগণের জন্য পাঠানো ফরমান গ্রহণ করে জামে মসজিদে গিয়ে নিজে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা শোনাতেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-দাউদী: পৃ. ৭৬, ৭৭, ১০১, ১০২; তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি): পৃ. ৬১৪; জামে তারিখ-ই-হিন্দ: পৃ. ৯৮৫, ৯৮৬।

সীরাত ও চরিত্র

সিকান্দার লোদী ছিলেন একজন যোগ্য প্রশাসক, পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণে দক্ষ এবং আদেশ বাস্তবায়নে তৎপর। তিনি সর্বদা রাজকীয় দায়িত্ব পালনে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কৃতিত্বের কারণে সিকান্দারকে লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়। ফেরেশতা তাঁর সম্পর্কে বলেন:

"সুলতান বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং আত্মিক গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর শাসনামলে দ্রব্যসামগ্রী অত্যন্ত সস্তা ছিল এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সুলতান প্রতিদিন দুবার উন্মুক্ত দরবার বসাতেন এবং ফরিয়াদিদের ন্যায়বিচার প্রদান করতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নিতেন না এবং রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন।" [১]

এই সংক্ষিপ্ত ঝলকের পর আমরা সুলতানের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ওপর একটি বিস্তারিত দৃষ্টিপাত করি:

সময়সূচী:

সুলতান সিকান্দার লোদীর সাফল্যের একটি বড় রহস্য ছিল তাঁর সময়সূচী, যা তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। তিনি রাতের অধিকাংশ সময় জেগে থাকতেন। ফজর নামাজের পর কয়েক ঘণ্টা ঘুমাতেন। জোহরের পর কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করে দরবারে আসতেন। সতেরোজন বিজ্ঞ আলেম তাঁর সাথে থাকতেন। তাঁকে সাম্রাজ্যের বিস্তারিত অবস্থা, এমনকি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকাও প্রতিদিন পেশ করা হতো। যেখানে প্রয়োজন হতো, তিনি তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ দিতেন।

মাগরিবের নামাজের পর কিছুক্ষণ বাড়িতে কাটিয়ে তিনি বিশেষ মজলিসে আসতেন, যেখানে ফরিয়াদিদের অভিযোগ শোনা হতো এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির সংশোধন করা হতো। তিনি গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর তদন্ত নিজেই করতেন এবং সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আইন অনুমোদন করতেন। সতেরোজন আলেম তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। মধ্যরাত পর্যন্ত তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। মধ্যরাতের পর তিনি তাঁর সঙ্গী আলেমদের সাথে খাবারের দস্তরখানে বসতেন।

তিনি একজন কাজী এবং তাঁর সাথে বারোজন সহকারী আলেমের একটি পরিষদ গঠন করেছিলেন, যা কেবল মামলাসমূহের ফয়সালা করত। আদালতে কর্মচারীরা রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকত যাতে কোনো ফরিয়াদি এলে তাকে হতাশ হতে না হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত প্রতিটি বাহিনীর কাছে প্রতিদিন দুবার তাঁর পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছাত। প্রথম বার্তাটি ফজর নামাজের সময় পাওয়া যেত যাতে নির্দেশনা থাকত। যদি বাহিনী হাজার মাইল দূরেও থাকত, তবুও এই রুটিন এবং সময়ের পাবন্দিতে কোনো পার্থক্য হতো না। [২]

জ্ঞান ও সাহিত্যিক রুচি

সিকান্দার লোদী কবিতা ও কাব্যচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। নিজেও চমৎকার কবিতা বলতেন, নিজের تخلص (উপনাম) 'গুল রুখ' রেখেছিলেন। ফেরেশতা...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬১৬

[২] তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মৌলভি জাকাউল্লাহ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭২ থেকে ৩৭৫; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬১১, ৬১২

https://t.me/BoierSomahar

এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর কিছু ফারসি কবিতা নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। [১]

মুসলমানদের কল্যাণকামনা:

সিকান্দার লোদী মুসলমানদের কল্যাণকামনার আবেগে ভরপুর ছিলেন। যে সময়ে তিনি তাঁর ভাই বারবক শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন এক দরবেশ এসে দোয়ার ছলে বললেন যে, আপনার জয় হোক। সিকান্দার লোদী অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: "যখন দুই মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তখন এমন বলা উচিত যে, আল্লাহ যেন তা-ই নির্ধারণ করেন যাতে ইসলামের ফায়দা হয়।" [২]

নির্মাণ, জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড:

সিকান্দার লোদী ধোলপুর থেকে আগ্রা পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় বাগান ও ইমারত নির্মাণের কাজ শুরু করান। তাঁর আমলে শস্য এবং জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী অত্যন্ত সস্তা ছিল, তাই স্বল্প আয়ের মানুষও খুব স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করত। তা সত্ত্বেও প্রতিটি শহরে খয়রাত (দান) বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত ছিল, যারা দরিদ্রদের অবস্থা নিজে অবগত হতো এবং সুলতানের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে দিত। এছাড়া প্রতি ছয় মাস অন্তর সালতানাতের সমস্ত দরিদ্র, মিসকিন ও অভাবী ব্যক্তিদের তালিকা সুলতানের সামনে পেশ করা হতো এবং তিনি তাদের সকলকে এত পরিমাণ ভাতা পাঠিয়ে দিতেন যা ছয় মাসের জন্য যথেষ্ট হতো। [৩]

ওয়াকফ, সদকা ও খয়রাত:

সুলতান সিকান্দার লোদী পুরো দেশের মসজিদগুলোতে ইমাম, খতিব, ক্বারী, মুয়াজ্জিন এবং ঝাড়ুদারদের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। বছরে দুইবার দরিদ্র ও ফকিরদের জন্য ভাতা জারি হতো। প্রতি শীত ও গ্রীষ্মে ফকির ও দরিদ্রদের জন্য পোশাকের জোড়া এবং শাল বিতরণ করা হতো। [৪]

প্রতি জুমায় অভাবীদের মধ্যে দান-খয়রাত বণ্টন করা হতো। প্রতিদিন শহরে কয়েক জায়গায় লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা হতো যাতে দরিদ্র, মুসাফির ও নিঃস্ব ব্যক্তিরা এসে পেট ভরে খেতে পারে, এছাড়া শস্যও বিতরণ করা হতো। বিশেষ বিশেষ সময়ে যেমন রমজান মাস, আশুরা বা কোনো অভিযানে সাফল্যের পর অভাবী, দরবেশ ও দুস্থদের ওপর মুক্তহস্তে ব্যয় করা হতো। [৫]

নিজের আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে যার সম্পর্কে তিনি জানতে পারতেন যে সে অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করে, সে তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য ও প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠত। তিনি এ ধরনের কাজে তাদের উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন: "যদি তুমি এই কাজ নেক নিয়তে করে থাকো, তবে তোমাকে কোনো অভাবের সম্মুখীন হতে হবে না।" [৫]

---

[১] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৬১৬

[২] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৬১৩

[৩] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৬১২ থেকে ৬১৭; তারিখ দাউদি: পৃ. ৫৭; তারিখ মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃ. ৬০১, ৬০০

[৪] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৬১৩; তারিখ হিন্দুস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ: খণ্ড ২, পৃ. ৩৭

[৫] তারিখ ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৬১৩

শাসকদের দেখাদেখি অন্য লোকেরাও উৎসাহিত হলো এবং তারাও সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর খেয়াল রাখতে শুরু করল এবং নিজ থেকেই সদকা ও খয়রাত অভাবী ও হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে লাগল। [১]

অশরীআতি রীতিনীতি বন্ধ:

সিকান্দার লোদী ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি "মথুরা"য়, যা হিন্দুদের স্নানের স্থান, সেখানে মুসাফিরখানা, বাজার, মসজিদ এবং মাদ্রাসা নির্মাণ করান। তিনি অশরীআতি রীতিনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সালার মাসউদ গাজীর আলম (ঝাণ্ডা) ও নেজা (বল্লভ) বের করার বার্ষিক প্রথার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। মাজারগুলোতে নারীদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দেন। খাদেমরা অনেক জাল মাজার তৈরি করে সেগুলোকে সম্পদ উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছিল। বাদশাহ সেগুলো গুঁড়িয়ে দেন। তাজিয়া মিছিল এবং বসন্ত রোগের দেবী (শীতলা)-র পূজাও আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করেন। [২]

হিন্দুদের সাথে আচরণ:

বাদশাহ অমুসলিমদের অধিকার হরণ করতে মোটেও অভ্যস্ত ছিলেন না। একবার তিনি জানতে পারেন যে, থানেশ্বরে হিন্দুরা একটি পুকুরে সমবেত হয়ে স্নান করে। সিকান্দার লোদী এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে ওলামাদের সাথে পরামর্শ করেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ আজুধানী বললেন: "হিন্দুদের কোনো পুরনো উপাসনালয় ধ্বংস করা অথবা তাদের কোনো ধর্মীয় রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয়।" এতে সিকান্দার লোদী তার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন। এই ঘটনাটি তার সিংহাসন আরোহণের আগের, যখন তিনি ভরা যৌবনে ছিলেন এবং দোয়াবের সুবাদার ছিলেন। [৩]

হিন্দুদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ:

তার শাসনামলে হিন্দুদেরও ফারসি পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা দাপ্তরিক কাজে শরিক হতে পারে। প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের রাজি করানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু তারা ভ্রুক্ষেপ করেনি। অবশেষে হিন্দুদের নিম্নবর্ণের লোকদের এর জন্য প্রস্তুত করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক হিন্দু ফারসি শিখে সরকারি দপ্তরে কাজ করতে শুরু করে। [৪]

ফেরেশতা লিখেছেন:

"তার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। আমিরজাদা এবং সিপাহিদের সন্তানরাও জ্ঞান ও শিল্পকলা অর্জনে মগ্ন হয়ে পড়ে। অমুসলিমরাও লেখাপড়া শিখতে এবং পারদর্শিতা অর্জনের চেষ্টা করতে শুরু করে এবং ফারসি কবিতা ও সাহিত্যও রচনা করতে থাকে।" [৫]

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬১৩

[২] তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ৭৭; তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬১২; তারিখ-ই-হিন্দোস্তান, মৌলভি জাকউল্লাহ: খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৭৪

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬১২; তারিখ-ই-হিন্দোستان, মৌলভি জাকউল্লাহ: খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৭৭

[৪] তারিখ-ই-হিন্দোস্তান, মৌলভি জাকউল্লাহ: খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৭৮, ৩৭৯

[৫] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬১৩

তারিখ-ই-মিল্লাত-ই-মুসাল্লামাহ (ষষ্ঠ খণ্ড)

আদল ও ইনসাফ

সিকান্দার লোদীর আদল ও ইনসাফের অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ, যার মধ্য থেকে কয়েকটি পাঠকদের জন্য পেশ করা হলো:

প্রোথিত ধনভাণ্ডার:

একবার সম্ভলের এক ব্যক্তি তার জমি থেকে একটি প্রোথিত ধনভাণ্ডার খুঁজে পায়। যাতে পনেরো হাজার আশরাফি ছিল। স্থানীয় শাসক জানতে পেরে ধনভাণ্ডারটি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। জমির মালিক বাদশাহর কাছে আবেদন লেখে। বাদশাহ শাসকের কাছে নির্দেশ পাঠান যেন ধনভাণ্ডারটি অবিলম্বে ওই ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া হয়। শাসক ফিরতি চিঠিতে লিখলেন:

“এই ব্যক্তি কি এত বড় অংকের অর্থের যোগ্য?”

সুলতান জবাবে তাকে ধমক দিয়ে লিখলেন:

“আরে নির্বোধ! যিনি তাকে এই ধনভাণ্ডার দান করেছেন, তিনি ভালো জানেন যে এই ব্যক্তি এর যোগ্য কি না। যদি সে যোগ্য না হতো, তবে তিনি তাকে কেন দিতেন। আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। তিনিই ভালো জানেন যে আমাদের মধ্যে কে কোন জিনিসের হকদার।” [১]

আমলের জবাব দিতে হবে:

অজোধনের এক দরবেশ মিয়াঁ শেখ মুহাম্মদ একবার তার ক্ষেতে একটি প্রোথিত ধনভাণ্ডার পান যাতে সোনার পাত্রও ছিল, যার কয়েকটির ওপর সিকান্দারের মোহর লাগানো ছিল। লাহোরের শাসক জানতে পেরে দরবেশের কাছে বার্তা পাঠান যে, এটি আমার সীমানার ধনভাণ্ডার, এটি আমার কাছে হস্তান্তর করো। দরবেশ অস্বীকার করলেন। লাহোরের শাসক এই খবর অভিযোগ হিসেবে সুলতান সিকান্দার লোদীর কাছে পৌঁছালেন। তিনি জবাব দিলেন:

“তোমার এতে কী কাজ? তুমি শেখ মুহাম্মদের বিষয়ে কেন হস্তক্ষেপ করছ।”

শেখ মুহাম্মদ জানতে পেরে খুশি হয়ে ওই ধনভাণ্ডার থেকে কিছু পাত্র হাদিয়া হিসেবে সুলতানের কাছে পাঠালেন। সুলতান তা ফেরত দিলেন এবং বলে পাঠালেন: “এটি তুমিই রাখো। আমাদের তোমাদের সবাইকে আল্লাহর সামনে নিজ নিজ আমলের জবাব দিতে হবে।” [২]

আজ আদালত শেষ হবে না:

একবার এক জায়গিরদার কোনো এক সৈয়দের জমি কেড়ে নেয়। সুলতান সদরে আদলিয়া মিয়াঁ ভূরাকে নির্দেশ দিলেন যেন এই মামলার তদন্ত করা হয়, কিন্তু মামলার ধরন ও প্রমাণাদি কিছুটা জটিল প্রকৃতির ছিল। তাই দুই মাস পর্যন্ত কোনো ফয়সালা হলো না। অবশেষে সৈয়দ বিষয়টি সুলতানের আদালত পর্যন্ত পৌঁছালেন। সুলতান উভয় পক্ষকে তলব করলেন। প্রথমে স্থানীয় শাসকের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন যে এত দিন...

---

[১] তারিখ-ই-দাউদি, পৃষ্ঠা ৮০

[২] তারিখ-ই-দাউদি, পৃষ্ঠা ৮০-৮১

...পর্যন্ত মামলার ফয়সালা কেন করেননি। তারপর ঘোষণা করলেন যে, আজ ততক্ষণ পর্যন্ত আদালতের অধিবেশন শেষ হবে না যতক্ষণ না এই বিবাদের ফয়সালা হয়।

সেদিন উলামা ও কাজীগণ রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত আদালতে বসে এই সমস্যার সমাধান করতে থাকেন। অবশেষে সৈয়দের পক্ষে ফয়সালা হয়ে গেল। ফয়সালার পর সুলতান জায়গিরদারকে ডেকে সবার সামনে তার কাছ থেকে তিনবার অপরাধ স্বীকার করালেন এবং তারপর চিরতরে জায়গিরদারি থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। [১]

দুটি লাল (মণি):

গোয়ালিয়রের দুই ভাই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা গনিমতের মালে দুটি লাল (মণি) পেয়েছিল। তাদের মধ্যে এক ভাই বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। দ্বিতীয় ভাই আরও কিছু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল, তাই সে নিজের লালটিও তার কাছে সোপর্দ করল এবং বলল যে আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিও। প্রথম ভাই এই দুটি লাল নিয়ে গোয়ালিয়র পৌঁছে গেল। কিন্তু সে লোভের বশবর্তী হয়ে দুটি লালই নিজে রেখে দিল এবং যখন দ্বিতীয় ভাই যুদ্ধ থেকে ফিরে এল, তখন প্রথম ভাই তাকে পরিষ্কার বলে দিল যে আমি তোমার লাল তোমার স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় ভাই যখন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, তখন সে পরিষ্কার অস্বীকার করল। কিন্তু সে সন্তুষ্ট হতে পারল না। তার ভাইয়ের ওপর সন্দেহ হলো না বরং সে স্ত্রীকেই দোষারোপ করতে থাকল। বিষয়টি সিকান্দারি দরবারের মীর-ই-আদল মিয়াঁ ভূরার কাছে পৌঁছাল। খিয়ানতকারী ভাই সেখানে দুজন জাল সাক্ষী পেশ করল যারা জবানবন্দি দিল যে আমাদের সামনে একটি লাল এই মহিলাকে দেওয়া হয়েছিল। ফলে মিয়াঁ ভূরা মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে লাল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

অবশেষে বেচারি নিরুপায় হয়ে সুলতান সিকান্দার লোদীর উচ্চ আদালতে ফরিয়াদ করল। সুলতান উভয় পক্ষ ও সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন। সাক্ষীরা এখানেও একই জবানবন্দি দিল। সুলতানের ধারণা ছিল যে এই দুজন মিথ্যা বলছে কিন্তু তাদের মিথ্যা প্রমাণ করা খুব কঠিন ছিল। অবশেষে সুলতানের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। তিনি সাক্ষীদের বললেন: “তোমরা তো সেই লালটি দেখেছ?” উভয়ই বলল: “অবশ্যই দেখেছি।”

সুলতান উভয়কে মোমের একটি করে টুকরো দিলেন এবং উভয়কে আলাদা আলাদা জায়গায় বসিয়ে নির্দেশ দিলেন যে যেমন লাল দেখেছ তার আকার ও নমুনা এই মোমের মাধ্যমে তৈরি করে দেখাও। উভয়ই যে নমুনা তৈরি করল, তা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। একজনের মোমের লাল বড় ছিল, অন্যজনের ছোট। একজনের আকৃতি আলাদা ছিল, অন্যজনের আলাদা। এতে বোঝা গেল যে তাদের কেউই লালটি দেখেনি। এবার বাদশাহ উভয় সাক্ষীকে ভয়ভীতি দেখালেন, যার ফলে উভয়ই সত্য বলে দিল। এভাবে সেই মহিলা মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্তি পেল এবং লাল তার মালিকের কাছে পৌঁছে গেল। [২]

---

[১] তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ৮২, ৮৩; তারিখ-ই-মিল্লাত: খণ্ড ৩, পৃ. ৬০২, ৬০৩। দ্রষ্টব্য: মিয়াঁ ভূরা-কে কোনো কোনো উৎসে ‘মিয়াঁ ভুয়া’-ও লেখা হয়েছে।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা ফারসি: পৃ. ৬১২ থেকে ৬১৬।

কিছু শরীয়ত বিরোধী কাজ:

যদিও সুলতান কার্যত দেশে ইসলামী শরীয়ত কায়েম রেখেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কিছু শরীয়ত বিরোধী কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। যেমন, তিনি দাড়ি মুণ্ডন করতেন। দরবারে সঙ্গীত থেকে বিরত থাকতেন, কিন্তু রাতে নিজের নির্জনে কিছু নামকরা গায়ক ও সঙ্গীতশিল্পীদের ডেকে কিছুক্ষণ নিজের মনোরঞ্জন করতেন। [১]

যাই হোক, তাঁর কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ফেরেশতার নিম্নোক্ত মন্তব্যটি তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত যথাযথ:

তাঁর যুগে হিন্দু জমিদারদের আধিপত্য শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সবাই অনুগত ও আজ্ঞাবহ হয়ে গিয়েছিল। শক্তিশালী ও দুর্বল মানুষ সমান বিবেচিত হতে লাগল। সুলতান প্রতিটি কাজে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারকে সামনে রাখতেন এবং প্রবৃত্তি পূজার দিকে বেশি যেতেন না। তিনি আল্লাহভীরু এবং জনগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। [২]

---

[১] (তারিখে দাউদী: পৃ. ৭৭, ৭৮)

সুলতান সিকান্দার লোদী উসমানীয় সালতানাতের প্রথম খলিফা প্রথম সেলিমের (মৃত্যু ৯২৬ হিজরী - ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন। দুজনেই সে সময়ের বিশ্বের বড় সুলতানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং দুজনেই দাড়ি মুণ্ডন করতেন। সম্ভবত মুসলিম শাসকদের মধ্যে দাড়ি মুণ্ডন করার প্রথা এর পরেই ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে, যা সম্পূর্ণ সুন্নাহ বিরোধী কাজ এবং শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

[২] তারিখে ফেরেশতা ফারসী: পৃ. ৬১৬

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ইব্রাহিম লোধি

৯২৩ হিজরি থেকে ৯৩২ হিজরি

(১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ)

সিকান্দার লোধির মৃত্যুর পর ১৮ জিলকদ ৯২৩ হিজরি (২২ নভেম্বর ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর বড় ছেলে ইব্রাহিম লোধিকে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি নয় বছর শাসন করেন, তবে তাঁর শাসনকাল ছিল বিদ্রোহ ও অশান্তিপূর্ণ। তিনি সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু সৌজন্যবোধ, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার অভাব ছিল। তাঁর পদক্ষেপগুলোর কারণে শাসনের ভিত্তি নড়বড়ে হতে শুরু করে। তিনি তাঁর পিতার কর্মপদ্ধতির বিপরীতে আমির ও প্রতিনিধিদের ওপর কঠোরতা শুরু করেন, যার ফলে চারদিকে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়। তিনি নিজেও তাঁর প্রতিনিধিদের ওপর ভরসা করতেন না। [১]

শাহজাদা জালাল খানের সাথে সালতানাত বিভক্তির চুক্তি:

ইব্রাহিম লোধি সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই আফগান আমিরদের পরিষ্কারভাবে বলে দেন: “আমার কোনো ভাই বা আত্মীয় নেই। তোমরা সবাই আমার কর্মচারী।” তিনি নির্দেশ দেন যে, ভবিষ্যতে আমিররা দরবারে নিজ নিজ আসনে বসবেন না, বরং বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এই চালচলন দেখে আমিররা ক্ষুব্ধ হন এবং সবাই সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন যে, সালতানাতকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হোক। এক অংশে ইব্রাহিম শাসন করবেন এবং অন্য অংশে তাঁর ছোট ভাই শাহজাদা জালাল খান। স্পষ্টতই ইব্রাহিম লোধি এটি মেনে নিতে পারতেন না, কিন্তু আমিরদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের আশঙ্কায় তিনি সমঝোতা করতে বাধ্য হন এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার অধীনে:

- জালাল খানকে জৌনপুর সালতানাত অর্থাৎ শারকি সুলতানদের সমস্ত এলাকা দিয়ে দেওয়া হয়, যা গঙ্গা নদীর ওপারে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
- দিল্লি ও আগ্রাসহ দোয়াব, পাঞ্জাব, মালব, রাজপুতানা ইত্যাদি বিজিত এলাকা সুলতান ইব্রাহিম লোধির অধীনে থাকে।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ১৭৭; তারিখ-ই-দাউদি: পৃষ্ঠা ১২২ সাথে পাদটীকা।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

দরবারের বেশ কিছু বড় আমীর শাহজাদা জালাল খানের সাথে জৌনপুর চলে যান এবং সেখানে একটি পৃথক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]

দরিয়া খান লোদীর আগমন এবং চুক্তি বাতিলের প্রস্তুতি:

সাম্রাজ্যের বিভাজন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে হয়েছিল কিন্তু কয়েক দিন পর রাপরীর সুবাদার খান জাহান লোদী এসে উপস্থিত হন এবং তিনি সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য আমীরদের বলেন: "সাম্রাজ্যের বিভাজন একটি অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। দুইজন শাসক নিযুক্ত করা অনেক বড় ভুল। দ্রুত এটি বাতিল করা উচিত।"

তিনি নিজের কথা এমন সব যুক্তির মাধ্যমে বোঝালেন যে দরবারের সকল আমীর ঘাবড়ে গেলেন এবং এই ভুল সংশোধনে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ইব্রাহিম লোদীও এটি অবিলম্বে গ্রহণ করে নিলেন কারণ এই পরামর্শ তার ক্ষমতা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। [২]

চুক্তি বাতিলের ধূর্ত কৌশলসমূহ:

চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রশ্ন ছিল যে বাতিলের জন্য কী অজুহাত অবলম্বন করা হবে? সিদ্ধান্ত হলো যে জালাল খানের শাসন জৌনপুরে শক্তিশালী হওয়ার আগেই তাকে পরামর্শের অজুহাতে নিজের দরবারে ডেকে এনে গ্রেফতার করা হোক। ফলে অত্যন্ত চমৎকার ও বিনীত ভাষায় একটি পত্র লেখা হলো যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ে তার পরামর্শের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জালাল খান এই পত্রের নেপথ্যের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারলেন এবং আসার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করলেন। [৩]

ইব্রাহিম খান লোদীর পুনরায় রাজ্যাভিষেক:

অবশেষে ইব্রাহিম লোদী জালাল খানের আমীরদের কাছে উপঢৌকন পাঠিয়ে নিজের সমর্থক বানানোর চেষ্টা শুরু করেন এবং ভবিষ্যতে উচ্চ পদমর্যাদা ও সম্মাননা ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। এই চাল কার্যকর হলো এবং জালাল খানের নিম্নোক্ত আমীরগণ (যাদের অধীনে সৈন্যদের মোট সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার পর্যন্ত,) তার থেকে বিচ্যুত হয়ে ইব্রাহিম লোদীর সমর্থনের ঘোষণা দিলেন:

- বিহারের শাসক: দরিয়া খান লোহানি
- গাজীপুরের শাসক: নাসির খান
- অযোধ্যা ও লখনউয়ের শাসক: জাবিতা শেখজাদা

এই আমীরদের সাথে নিয়ে ইব্রাহিম খান লোদীর ক্ষমতার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে গেল, তাই ১৫ জিলহজ ৯২৩ হিজরি (২৯ ডিসেম্বর ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে ইব্রাহিম তার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান পুনরায় উদযাপন করেন এবং এতে আমীরদের মাঝে জায়গির, পদমর্যাদা ও খিলাত নতুন করে বণ্টন করা হয়। এটি যেন জালাল খানের সাথে করা চুক্তি বাতিল এবং নতুন ব্যবস্থার চূড়ান্ত হওয়ার ঘোষণা ছিল। [৪]

উভয় পক্ষের রাজনৈতিক চালবাজি। ইব্রাহিমের সেনাবাহিনীর কাল্পী আক্রমণ:

স্বভাবতই জালাল খান এই বিশ্বাসঘাতকতা নীরবে মেনে নিতে পারতেন না। তিনি সুলতান জালালুদ্দিন উপাধি গ্রহণ করে স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেন এবং খুতবা ও মুদ্রায় নিজের নাম জারি করে দেন।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬১৭; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১২২, ১২৩

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬১৭; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১২৩

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬১৭, ৬১৮; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১২৩

[৪] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬১৮, ৬১৯; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১২৩, ১২৪

সেই সাথে সে-ও বিশিষ্ট আমিরদের সাথে আঁতাত করে তাদের নিজের সমর্থক বানানোর চেষ্টা করে, ফলে প্রখ্যাত আমির আজম হুমায়ুন সারওয়ানিকে সে "সত্য ও ন্যায়ের" সাথে থাকার দাওয়াত দিয়ে নিজের সাথে মিলিয়ে নেয়।

শীঘ্রই সে অযোধ্যা আক্রমণ করে ইব্রাহিম খান লোদির অনুগতদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়। ইব্রাহিম খান লোদিও গাফেল ছিলেন না। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত ভোগাঁও (ভনগাঁও) পৌঁছান যাতে কনৌজ দখল করতে পারেন।

এদিকে জালাল খানের জন্য পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে থাকে। আজম হুমায়ুন সারওয়ানি শীঘ্রই তার সঙ্গ ত্যাগ করে ইব্রাহিম লোদির দরবারে পৌঁছে যান যেখানে তাকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়। এদিকে জৌনপুরের অনেক আমিরও ইব্রাহিম লোদির সাথে গিয়ে যোগ দেন। ইব্রাহিম লোদি নিজের শক্তি বৃদ্ধি পেতে দেখে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে জালাল খানের মোকাবিলা করার জন্য একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠান, যে তখন কালপিতে অবস্থান করছিল। [১]

জালাল খানের আগ্রা অভিযান এবং আলোচনা:

কিন্তু এই বাহিনী কালপি পৌঁছানোর আগেই জালাল খান ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং বিপুল সংখ্যক হাতি নিয়ে আগ্রার দিকে রওনা হন। এদিকে ইব্রাহিম লোদির বাহিনী কালপি অবরোধ করে। এটি ছিল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক এবং সেই সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র তার প্রাথমিক রূপে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, ফলে তলোয়ার, তীর এবং মানজানিকের পাশাপাশি কামান ও বন্দুকও যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। ফলে কালপি অবরোধে উভয় পক্ষ একে অপরের ওপর গুলিও বর্ষণ করতে থাকে। সম্ভবত হিন্দুস্তানের ইতিহাসে এটিই প্রথম যুদ্ধ যাতে বন্দুক এবং গুলির উল্লেখ এসেছে।

অবশেষে কালপি নতি স্বীকার করে এবং সৈন্যবাহিনী এই শহরটিকে চরমভাবে লুণ্ঠন করে প্রায় ধ্বংস করে দেয়।

এরপর ইব্রাহিম লোদি মালিক আদম কাকরের নেতৃত্বে জালাল খানের পিছু ধাওয়া করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান, যে আগ্রায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং চেয়েছিল কালপির ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে আগ্রাকে একইভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে।

ইতিমধ্যে মালিক আদম, যিনি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, আগ্রায় পৌঁছে যান এবং জালাল খানকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য আলোচনা শুরু করেন। তিনি আপসের প্রস্তাব দিয়ে বলেন:

"আপনি যদি রাজকীয় ছত্র, নাকাড়া, মুদ্রা এবং বাদশাহীর অন্যান্য নিদর্শন ত্যাগ করেন এবং একজন সাধারণ সুবাদারের মতো থাকতে রাজি হন, তবে আমরা সুলতান ইব্রাহিমকে বলে আপনাকে কালপি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।"

যদিও এই শর্তটি কিছুটা অপমানজনক ছিল, কিন্তু জালাল খান রক্তপাত এড়াতে তা মেনে নেন। তবে কাকর যখন এই চুক্তির অনুমোদনের জন্য ইব্রাহিম লোদির সাথে যোগাযোগ করেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুদ্ধের ওপর জোর দেন। [২]

জালাল খানের পরিণতি:

জালাল খানের অবস্থা এখন পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো হয়ে গিয়েছিল। তিনি আগ্রা থেকে পালিয়ে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬১৯, ৬২০; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১২৪, ১২৫

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২০, ৬২১; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১২৫, ১২৬

সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে ইব্রাহিম লোধি এসে আগ্রার ব্যবস্থাপনা সংশোধন ও সুসংগঠিত করলেন এবং এরপর ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও সাড়ে তিনশ হাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী গোয়ালিয়রের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

জালাল খানের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছিল, তাই সেই দিনগুলোতে তার মেজবান গোয়ালিয়রের রাজা মান সিংয়ের মৃত্যু হলো এবং তাকে চরম হতাশার মধ্যে মালওয়ার দিকে পালিয়ে যেতে হলো। সেখানকার সুলতান মাহমুদ তাকে বিশেষ কোনো সমাদর করলেন না। তাই তাকে সেখান থেকেও বেরিয়ে যেতে হলো। পথে তিনি ভিল ও গোন্ডদের হাতে বন্দি হলেন, যারা তাকে সুলতান ইব্রাহিমের কাছে পাঠিয়ে দিল। ইব্রাহিম খান লোধি বিদ্রোহের সন্দেহে তার অন্য ভাইদেরও হাসির দুর্গে বন্দি করে রেখেছিলেন। জালাল খানকেও সেখানেই নিক্ষেপ করা হলো এবং পরবর্তীতে কিছু সহচরের পরামর্শে তাকে হত্যা করা হলো। [১]

ইব্রাহিম লোধির সাম্রাজ্যের আমিরদের সাথে দুর্ব্যবহার:

ইব্রাহিম লোধির জন্য এখন পরিবেশ অনুকূল ছিল এবং তিনি চাইলে খুব ভালোভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সন্দেহপ্রবণ ও রাগী মানুষ। এই কারণেই তিনি তার আমির ও কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারেননি। তাদের সাথে তার আচরণ দিন দিন কঠোর হতে থাকে, যার ফলে বাদশাহ ও আমিরদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করে।

সাম্রাজ্যের একজন বৃদ্ধ আমির ছিলেন মিয়াঁ ভুরা লোধি, যিনি সিকান্দার লোধির আমলে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এখন বার্ধক্যের কারণে তিনি আগের মতো কাজ করতে পারছিলেন না। ইব্রাহিম লোধি তাকে বন্দি করলেন। এই আচরণ দেখে পুরনো আফগান আমিররা খুব অসন্তুষ্ট হলেন। [২]

একজন প্রখ্যাত তলোয়ারবাজ মিয়াঁ হোসেনের কাহিনী:

মিয়াঁ হোসেন ছিলেন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সৈনিক যিনি সুলতান সিকান্দার লোধির আমল থেকে সেনাকর্মকর্তা হিসেবে চলে আসছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, তলোয়ার চালনায় দক্ষ, সাহসী ও স্পষ্টভাষী মানুষ। সেই সময় তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের কর্মকর্তা ছিলেন। ইব্রাহিম লোধি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেন এবং তাকে হত্যার পরিকল্পনা করতে থাকেন। মিয়াঁ হোসেন সেই দিনগুলোতে কোনো এক রানার এলাকার কাছে মোতায়েন ছিলেন। [৩]

সুলতান যখন রানাকে দমনের জন্য মাখন নামক এক সেনাপতির নেতৃত্বে সেখানে চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠালেন, তখন পরবর্তীতে তাকে গোপন নির্দেশ পাঠালেন যে, মিয়াঁ হোসেনকে নিজের তাঁবুতে রাজকীয় ফরমান শোনানোর অজুহাতে ডেকে এনে হত্যা করতে হবে। মিয়াঁ হোসেন বিষয়টি টের পেয়ে গেলেন। তিনি তার পাঁচ হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী নিয়ে মাখনের তাঁবুর কাছে পৌঁছালেন এবং বললেন: “রাজকীয় ফরমান বের করে পড়ছেন না কেন?” মাখন বললেন: “এভাবে রাজকীয় ফরমান পড়ার নিয়ম নেই।”

---

[১] তারিখ ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২১, ৬২২; তারিখ দাউদি: পৃ. ১২৬, ১২৭।

[২] তারিখ ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২২; তারিখ দাউদি: পৃ. ১২৭, ১২৮। নোট: মিয়াঁ ভুরা-কে কোনো কোনো উৎসে ‘মিয়াঁ ভুওয়া’ও লেখা হয়েছে।

[৩] তারিখ দাউদিতে, যেখান থেকে এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে, সেখানে এই রানার নাম প্রতাপ বলা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য ইতিহাস থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায় না। রানা প্রতাপ নামক বিখ্যাত হিন্দু শাসক আকবরের আমলে ছিলেন। তবে ইব্রাহিম লোধির আমলে রানা সাঙ্গা খুব বিখ্যাত ছিলেন যিনি রাজপুতানার দক্ষিণ অঞ্চল মেওয়ারের শাসক ছিলেন এবং তার কেন্দ্রীয় দুর্গ ছিল চিতোর। তিনি লোধিদের অধিকৃত এলাকায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। সম্ভবত এখানে রানা বলতে তাকেই বোঝানো হয়েছে।

মিয়াঁ হুসাইন বললেন: “তোমরা যা চাও, তা অসম্ভব। এই লশকর আসা আমাদের গ্রেফতার করার জন্য। আমরা আমাদের জীবন সালতানাতের জন্য উৎসর্গ করেছি, এমন অপমানের সাথে প্রাণ দিতে পারি না।”

মিয়াঁ হুসাইন সেখান থেকে বের হওয়ার সময় এতটাই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে, রানার সাথে যোগাযোগ করে তাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিলেন এবং তারপর মাখনের নেতৃত্বে আসা বাহিনীকে পরাজিত করে বায়ানা পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন। এই পরাজয়ের খবর শুনে সুলতান ইব্রাহিম নিজে আগ্রা থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং একটানা সফরের পর গাম্ভীর নদীর তীরে পৌঁছান। [১]

এখানেও মিয়াঁ হুসাইন রানার সাথে মিলে সুলতানের বাহিনীকে সামনে এগোতে দেননি। তবে কিছুদিন পর মিয়াঁ হুসাইন নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং তার এক সঙ্গীকে বললেন: “আমার পুরো জীবন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে কেটেছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়েছি। মুসলমানদের হত্যার সমস্ত গুনাহ আমার ঘাড়েই পড়বে। বাদশাহর প্রতি আমার কোনো শত্রুতা নেই, কিন্তু আফসোস যে তিনি আমার আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করেন না।”

এই অনুশোচনার কারণে মিয়াঁ হুসাইন সুলতান ইব্রাহিম লোদীর কাছে একটি ক্ষমা প্রার্থনা পত্র পাঠালেন এবং ক্ষমা চাইলেন। সুলতান জবাবে বলে পাঠালেন: “মিয়াঁ হুসাইন আমার সন্তানের মতো, যা হওয়ার হয়েছে। এখন যে জায়গির তার পছন্দ হয়, আমি তাকে তা-ই দেব।”

মিয়াঁ হুসাইন সিদ্ধান্ত নিলেন যে পরের দিন তিনি বাদশাহর সাথে দেখা করতে রওনা হবেন, কিন্তু রানা খবর পেয়ে গেলেন। তিনি রাতেই মিয়াঁ হুসাইনের শিবিরের কিছু দূরে নিজের বাহিনীকে বৃত্তাকারে মোতায়েন করলেন।

মিয়াঁ হুসাইন সকালে এই দৃশ্য দেখে নির্ভয়ে একাকী কাফেরদের বাহিনীর মধ্যে চলে গেলেন এবং রানার সামনে বসে বলতে লাগলেন: “আমরা তোমাকে পরীক্ষা করে নিয়েছি, আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের যে বন্ধন ছিল, তা ভেঙে গেছে। আমি আমার বাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করছি। যে তোমার সাথে একমত, সে তোমার সাথে থাকুক। যে একমত নয়, সে আমার সাথে চলে আসুক।” এই কথা বলে তিনি এক লক্ষ শত্রুর ঘেরাও থেকে বেরিয়ে ফিরে এলেন এবং নিজের সমর্থকদের নিয়ে সুলতানের সাথে গিয়ে যোগ দিলেন।

সুলতান বাহ্যিকভাবে তাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিলেন। মিয়াঁ হুসাইন বাদশাহর কাছে দাবি করলেন যে তাকে যেন চান্দেরি [২] দুর্গ দিয়ে দেওয়া হয় যাতে তিনি রাজপুত রানার বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে থাকতে পারেন। বাদশাহ তাকে দুর্গ পরিচালনার সনদ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

মিয়াঁ হুসাইন চান্দেরি পৌঁছানোর পর সুলতান একজন বিশেষ অফিসারকে পাঠালেন যাতে কোনোভাবে মিয়াঁ হুসাইনকে হত্যা করা যায়। সেই অফিসার চান্দেরির কয়েক হাজার শেখজাদাকে [৩] এই কাজের জন্য প্রস্তুত করলেন।

আক্রমণের জন্য রাতের সময় নির্ধারণ করা হলো। মিয়াঁ হুসাইনের ভাতিজা বিষয়টি টের পেয়ে গেলেন এবং তিনি চাচাকে বারবার সতর্ক করলেন যে তিনি...

---

[১] তারিখ-ই-দাউদি-তে এই নদীর নাম “কাবীর” লেখা আছে যা সম্ভবত মুদ্রণজনিত ভুল। যদি এখানে রানা বলতে রানা সাঙ্গা বোঝানো হয়, তবে এটি গাম্ভীর নদী হওয়াই নিশ্চিত, যা চম্বল নদীর একটি উপনদী। এটি রানা সাঙ্গার এলাকা মেওয়ারের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হতো। বায়ানা এই নদীর বাম তীরের কাছে অবস্থিত।

[২] চান্দেরি রাজপুতদের এলাকা ছিল এবং ইতিহাস অনুযায়ী রানা সাঙ্গা এখানেও আক্রমণ করেছিলেন। সুতরাং চান্দেরি দুর্গও রানার অবস্থান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

[৩] উপমহাদেশে সাধারণত আরব বংশোদ্ভূত লোকদের শেখ বলা হতো, কিন্তু পরবর্তীতে নওমুসলিমদের মধ্যে: ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং খত্রীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারাও শেখ নামে পরিচিত হন। আজও পাঞ্জাবের অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের নওমুসলিমরা শেখ নামে পরিচিত। এই উপাধিটি নওমুসলিমদের সম্মানের খাতিরে দেওয়া হয়।

সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো, কিন্তু মিয়াঁ হোসেন এমন এক কালান্দার পুরুষ ছিলেন যার মৃত্যুর কোনো পরোয়া ছিল না। তিনি কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। শেষ রাতের অন্ধকারে সেই শেখজাদারা মিয়াঁ হোসেনের হাভেলিতে আক্রমণ করে বসল।

আক্রমণের শোরগোল শুনে মিয়াঁ হোসেন নিজের হাভেলি থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং শত্রুদের ওপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করলেন। ঘটনাক্রমে তিনটি তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এটি দেখে মিয়াঁ হোসেন ধনুক মাটিতে ফেলে দিলেন এবং বললেন: "মনে হচ্ছে আমার জন্য আল্লাহর হুকুম এসে গেছে, অন্যথায় আজ পর্যন্ত আমার কোনো তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।" এরপর শত্রুরা তার ওপর সাধারণ আক্রমণ শুরু করল এবং তিনি যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন।

সুলতান ইব্রাহিম তার এই হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন, তার কাটা মাথা দুর্গের দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রানার বাহিনী চান্দেরির ওপর আক্রমণ চালাল এবং সেই সমস্ত শেখজাদা যারা এই আক্রমণে শরিক ছিল তারা নিহত হলো। সেই দিন এক নেক লোক শেখ মুহাম্মদ সুলাইমানকে (যিনি কারামত সম্পন্ন ওলী ছিলেন) স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি খালি মাথায় কোথাও যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন: হযরত! আপনি কোথায় ছিলেন এবং খালি মাথায় কোথায় যাচ্ছেন?

উত্তর এল: "আমি চান্দেরিতে ছিলাম। আমি শেখজাদাদের থেকে মিয়াঁ হোসেনের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি। এখন আগ্রা যাচ্ছি। যখন সুলতান ইব্রাহিমকেও হত্যা করা হবে, তখন মাথায় পাগড়ি বাঁধব।" [১]

গোয়ালিয়র রণাঙ্গন এবং আজম হুমায়ুন সারওয়ানির গ্রেফতারি:

সেই দিনগুলোতে আজম হুমায়ুন সারওয়ানি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে গোয়ালিয়র অবরোধ করে রেখেছিলেন। এই দুর্গ বিজিত হওয়ার কাছাকাছি ছিল এমন সময় ইব্রাহিম লোদি তাকে এবং তার বেশ কিছু সঙ্গী আমিরদের, যারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রণাঙ্গনে অটল ছিলেন, হঠাৎ আগ্রায় ডেকে পাঠালেন। ইব্রাহিম লোদি অকারণে তাদের ওপর সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি তাদের সবাইকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন।

ওদিকে গোয়ালিয়র অবরোধে নিয়োজিত বাহিনী সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত রইল এবং তারা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বারুদ দিয়ে প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে অবশেষে দুর্গ জয় করে নিল। [২]

আজম সারওয়ানির সাহস ও আনুগত্য:

যখন আজম হুমায়ুন সারওয়ানিকে সুলতান লোদি আগ্রায় তলব করেছিলেন, তখন সমস্ত সেনাকর্মকর্তারা তাকে বলেছিলেন:

"এটি নিশ্চিত যে সুলতান আপনাকে বন্দি করার এবং পদ থেকে অপসারণ করার জন্য ডাকছেন। আজ পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী আপনার অনুগত। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে নিজের নামে খুতবা পাঠ করানো এবং মুদ্রা জারি করা জায়েজ।"

কিন্তু আজম হুমায়ুন বললেন: "আমার দ্বারা এটি হবে না। আমরা তিন প্রজন্ম ধরে সুলতানের নুন খেয়ে আসছি। জানি না আর কতটুকু জীবন বাকি আছে। আমার পক্ষে এটি সহ্য করা সম্ভব নয় যে আমাকে নিমকহারাম বলে স্মরণ করা হোক।"

ফলে এই উচ্চ সাহসী সরদার আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেই সাথে তিনি চেষ্টা করলেন যেন বাকি কর্মকর্তারা সেখানেই থেকে যান কিন্তু তার...

---

[১] তারিখ-ই দাউদি: পৃ. ১৩০ থেকে ১৩৫

[২] তারিখ-ই ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২২ থেকে ৬২৩; তারিখ-ই দাউদি: পৃ. ১২৮

বন্ধুদের মধ্যে কেউই আলাদা হতে রাজি হলো না এবং সবাই তার সাথে চলতে লাগল। তবে আজম হুমায়ুন যখন চম্বল নদীর তীরে পৌঁছে নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন কয়েকজন সঙ্গী ছাড়া বাকিদের নৌকায় বসার অনুমতি দিলেন না এবং সবাইকে তীর থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। যখন তিনি আগ্রার কাছে পৌঁছালেন, তখন সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে অপমান করার জন্য সওয়ারির জন্য একটি সাধারণ টাট্টু ঘোড়া আনা হলো। আজম হুমায়ুন কোনো দ্বিধা ছাড়াই ঘোড়া থেকে নেমে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। সে সময় তার সাথে মাত্র কয়েকজন সঙ্গী ছিল, কিন্তু তারা বলল: "এখনও সুযোগ আছে। আমরা আপনাকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যেতে পারি।" আজম হুমায়ুন বললেন: "বন্ধুরা! আমার চিন্তা ছেড়ে দাও। আমি সুলতান ইব্রাহিমের দাদা ও বাবার যুদ্ধগুলোতে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছি। যতটুকু জীবন অতিবাহিত করেছি, এখন তার চেয়ে বেশি জীবনের আশা নেই। এখন আমি এই জীবন সুলতান ইব্রাহিমের কাজের জন্যই রাখি। আমি কখনোই শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না, চাই আমি বেঁচে থাকি বা মারা যাই। বাদশাহ আমার আভিজাত্য সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন, তাই মন্দ কাজ করে তিনি আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করবেন।"

এই প্রখ্যাত বৃদ্ধ আমির আগ্রায় প্রবেশ করা মাত্রই বাদশাহর নির্দেশে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং তার পায়ে কয়েক মণ ওজনের শিকল পরিয়ে দেওয়া হলো। তিনি বাদশাহর কাছে শুধু এই বার্তা পাঠালেন: "আপনার যা উপযুক্ত মনে হয়, তা-ই করুন। আমার অনুরোধ এই যে, শুধু ওজুর জন্য পানি এবং ইস্তিঞ্জার জন্য ঢেলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। তাছাড়া আমার ছেলে ইসলাম খান বিদ্রোহী, তার দ্রুত ব্যবস্থা নিন যাতে মানুষ তার পতাকাতলে সমবেত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে।"

বেশ কিছু দিন আজম হুমায়ুন কারাবাসের কষ্ট সহ্য করতে থাকলেন, কিন্তু সুলতানের বিরুদ্ধে কখনো একটি অভিযোগের শব্দও মুখে আনেননি। তবে কিছুকাল পর সেই অদূরদর্শী বাদশাহ এমন অনুগত আমিরকেও কারাগারে নির্দোষ অবস্থায় হত্যা করিয়ে ফেললেন। [১]

ইসলাম খানের বিদ্রোহ:

আজম হুমায়ুন সারওয়ানির গ্রেপ্তার হওয়া এমন এক অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল যা চারদিকে উদ্বেগের ঢেউ বইয়ে দিল। যখন আজম হুমায়ুনের ছেলে ইসলাম খান খবর পেলেন, তখন তিনি কড়ামানিকপুরে (যা তার বাবার জায়গির ছিল) বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। স্থানীয় সুবাদার আহমদ খান তাকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নিজেই পরাজিত হলেন। ইব্রাহিম খান লোধি এই খবর পেলে ইসলাম খানের বিরুদ্ধে কোনো বড় পদক্ষেপের কথা ভাবতে লাগলেন, কিন্তু এরই মধ্যে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমির তাদের সেই জায়গিরগুলোর দিকে পালিয়ে গেলেন যা লখনৌতিতে ছিল। সেখান থেকে তারা ইসলাম খানকে পত্র পাঠিয়ে নিজেদের সমর্থনের নিশ্চয়তা দিলেন। ইব্রাহিম খান লোধির ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল। তিনি বড় বড় আমিরদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল বাহিনী ইসলাম খান এবং সেই বিদ্রোহী আমিরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালেন, কিন্তু বিদ্রোহী আমিররা "বাঙ্গারমউ" [২]

---

[১] তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১৩৫, ১৩৬

[২] "বাঙ্গারমউ" ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের উন্নাও জেলার একটি শহর যা গঙ্গা নদীর উপনদী কল্যাণী নদীর তীরে অবস্থিত।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

...এর কাছে এই বাহিনীকে পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে দিল। [১]

ইসলাম খানের পরিণতি:

পরাজয়ের এই সংবাদ ইব্রাহিমকে বিচলিত করে দিল এবং তিনি তার পরাজিত বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য আরও সৈন্য পাঠালেন। ওদিকে বিদ্রোহী আমিররা চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচশ হাতি নিয়ে ময়দানে নেমে এল। এমন পরিস্থিতিতে একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ শেখ রাজু বুখারী সন্ধির চেষ্টা করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি সুলতান ইব্রাহিম লোদী আজম হুমায়ুন সারওয়ানিকে মুক্তি দেন, তবে বিচ্যুত আমিররা অন্য কোনো অঞ্চলে চলে যাবেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না।

কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর মাথায় প্রতিশোধের ভূত চেপে ছিল। তিনি এই সমঝোতা অনুমোদন করেননি এবং বিহারের সুবাদার দরিয়া খান লোহানী প্রমুখকে কঠোর নির্দেশ পাঠান যেন তারা বিদ্রোহী আমিরদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

অবশেষে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর, যাতে উভয় পক্ষের অসংখ্য লোক নিহত হয়, রাজকীয় বাহিনী বিজয়ী হয় এবং বিদ্রোহের মূল হোতা ইসলাম খানও নিহত হন। সুলতান ইব্রাহিম এই বিজয় ধুমধাম করে উদযাপন করেন এবং খয়রাত হিসেবে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিতরণ করেন। [২]

বিহারে দরিয়া খান লোহানীর বিদ্রোহ:

কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর ভাগ্যে এই বিজয়ের পর বেশিদিন শান্তিতে থাকা জুটল না। আজম খান সারওয়ানিকে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হলো। একইভাবে মিয়াঁ ভূরাও বন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। কিছুকাল পর চন্দেরীর সুবাদার হুসাইন ফরমুলিকে সুলতানের ইশারায় হত্যা করা হলো। প্রখ্যাত আমিরদের এই করুণ পরিণতি ইব্রাহিম লোদীর অনুগত আমিরদেরও বীতশ্রদ্ধ করে তুলল, কারণ তারা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে সুলতান একে একে তাদের সবাইকে নির্মূল করার চেষ্টায় আছেন।

সংক্ষেপে, বিহারের গভর্নর দরিয়া খান লোহানী এবং সালতানাতের আমিরুল উমারা খান জাহান লোদী বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। যদিও শীঘ্রই দরিয়া খানের মৃত্যু হয়, কিন্তু তার পুত্র বাহাদুর সমস্ত বিদ্রোহী আমিরদের নিজের চারপাশে একত্রিত করে প্রায় এক লক্ষ অশ্বারোহীর এক বিশাল বাহিনী তৈরি করেন এবং সুলতান মুহাম্মদ উপাধি গ্রহণ করে বিহারে নিজের রাজত্ব ঘোষণা করেন। তার নামে খুতবা ও মুদ্রা জারি করা হয়। [৩]

পাঞ্জাবে দৌলত খান লোদীর বিদ্রোহ:

ইব্রাহিম লোদী এই পরিস্থিতিতে তার সমস্ত আমিরদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং যত দ্রুত সম্ভব তার সমস্ত নায়েবদের গ্রেফতার বা হত্যা করে তাদের জায়গায় অন্য লোকদের নিয়ে আসার পরিকল্পনা করতে থাকেন। সেই দিনগুলোতে পাঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন দৌলত খান লোদী (বিন তাতার...

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২৩, ৬২৪; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১২৮, ১২৯

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২৩, ৬২৫; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১২৯, ১৩০

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২৩, ৬২৫

খান লোদী) ছিলেন। ইব্রাহিম লোদীর তার ওপরও সন্দেহ হয়েছিল। ফলে তাকে লাহোর থেকে আগ্রায় তলব করা হলো। দৌলত খান বাদশাহর বদমেজাজের কারণে আদেশ পালনে বিলম্ব করলেন এবং নিজের ছেলে দিলাওয়ার খান লোদীকে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সুলতান দিলাওয়ার খানকে দেখামাত্রই বললেন: "যদি তোমার বাবা দ্রুত আগ্রায় না আসে, তবে অন্যান্য আমিরদের মতো তাকেও গ্রেপ্তার করা হবে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে।"

দিলাওয়ার খান এটি শুনে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি গোপনে একটি পত্রের মাধ্যমে তার বাবাকে এই পরিস্থিতির কথা লিখে পাঠালেন এবং তারপর চুপিচুপি পালিয়ে বাবার কাছে পৌঁছে তাকে বিস্তারিত জানালেন। দৌলত খান লোদী এটি দেখে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে জোট গঠন শুরু করলেন এবং পাঞ্জাবের সমস্ত আমির ও জায়গিরদারদের সমর্থন লাভ করলেন। [১]

মুঘল শাহজাদা বাবরের আবির্ভাব:

এটি সেই সময় ছিল যখন উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে মুঘল শাহজাদা 'বাবর'-এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সমরকন্দের শাসক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবেই তিনি কেবল পিতার ছায়া থেকেই বঞ্চিত হননি, বরং তার পৈতৃক সাম্রাজ্যও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি সমরকন্দ থেকে কাবুল পর্যন্ত বছরের পর বছর ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি তার পৈতৃক শহর সমরকন্দ দখলও করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই বিরোধীরা লড়াই করে তাকে বিতাড়িত করে দেয়। মধ্য এশিয়ার উজবেক গোত্র ছিল তার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, যাদের সাথে লড়াই তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি।

অবশেষে বাবর কাবুলকে নিজের কেন্দ্র বানিয়ে নেন এবং মধ্য এশিয়ার অভিযান ত্যাগ করে হিন্দুস্তানের দিকে মনোনিবেশ করেন। সফর ৯২৫ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি আটক পথ দিয়ে হিন্দুস্তানে প্রথম আক্রমণ করেন এবং খোখরদের পরাজিত করে পোঠোহারের বেশ কিছু শহর জয় করেন। এভাবে বাবর এখন হিন্দুস্তানের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী এক গুরুত্বপূর্ণ বহির্গত শক্তিতে পরিণত হলেন।

বাবরকে আক্রমণের আমন্ত্রণ:

পাঞ্জাবের সেই সমস্ত আমিররা মুঘল শাহজাদা বাবরকে পত্র লিখলেন এবং তাকে হিন্দুস্তান আক্রমণের আমন্ত্রণ জানালেন। প্রাক্তন সুলতান মরহুম সিকান্দার লোদীর ভাই আলম খান লোদী (আলাউদ্দিন) ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্দেশ্যে কাবুল যান। দৌলত খান লোদীর ছেলে দিলাওয়ার খান (خان خاناں - খান-ই-খানান) ও বাবরের সাথে গিয়ে দেখা করেন এবং ইব্রাহিম লোদীর বদমেজাজ ও অদূরদর্শিতা এবং সাম্রাজ্যের আমিরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের বিস্তারিত বিবরণ দেন। বাবর পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য তার কয়েকজন আমিরকে পাঠালেন। সেই আমিররা শিয়ালকোট, লাহোর এবং অন্যান্য এলাকা জয় করেন এবং বাবরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। ১লা রবিউল আউয়াল ৯৩২ হিজরি (১৬ ডিসেম্বর ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দ) বাবর হিন্দুস্তান জয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। [২] অবশেষে পানিপথের ময়দানে সেনাবাহিনী মুখোমুখি হলো। বাবর তার সেনাবাহিনীর ডান অংশকে শহরের দালানকোঠার কাছে মোতায়েন করে পার্শ্ববর্তী আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করলেন। ৭ই রজব ৯৩২ হিজরি (১৩ এপ্রিল ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ) এই ময়দানেই ফয়সালা

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২৫; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১৩৬, ১৩৭

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃ. ৬২৬; তারিখ-ই-দাউদি: পৃ. ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮

সেই যুদ্ধ সংঘটিত হলো যাতে ইব্রাহিম লোধি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন এবং বাবর আগ্রা ও দিল্লি দখল করে নিলেন। এভাবে প্রায় ৮৮ বছরের লোধি বংশের শাসনের অবসান ঘটল এবং হিন্দুস্তানে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হলো। [১]

লোধি আফগান শাসনের অবসানের ওপর একটি মন্তব্য:

- লোধি আফগানদের শাসন শক্তি, সামর্থ্য এবং বিস্তৃতির দিক থেকে যদিও খিলজি ও তুঘলকদের সমান ছিল না, তবুও তাদের সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি তারাই ছিল। শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোধির শাসনামলেও এই সরকার দুর্বল ছিল না এবং এতে যোগ্য লোকের অভাব ছিল না। আফগানরা যদি নিজেদের সারিতে ঐক্য বজায় রাখতে পারত, তবে লোধি বংশের শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া অসম্ভব ছিল না। ইব্রাহিম লোধি অদূরদর্শী হলেও এটা সম্ভব ছিল যে, তার পরে কোনো যোগ্য আফগান আমির উপমহাদেশকে সামলে নিতেন। ইব্রাহিম লোধির ওপর পরীক্ষা এই এলো যে, তার ভুল পদক্ষেপের কারণে আফগানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং ঠিক সেই সময়েই বাবরের মতো এক অত্যন্ত যুদ্ধ-অভিজ্ঞ শত্রু তার মুখোমুখি হলো।

. যাই হোক, বাস্তবতা হলো লোধিদের শাসনের অবসান ঘটলেও অনুতপ্ত ও আফগান আমির, সৈন্য এবং সাধারণ মানুষ বিপুল সংখ্যায় হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব প্রদেশগুলোতে বিদ্যমান ছিল। বিহারে তাদেরই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। এই কারণেই বাবরের উত্তরসূরি হুমায়ুনের আমলে আফগানদের বিচ্ছিন্ন শক্তি আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিংহাসন লাভে সফল হয়েছিল।

জীবনের রঙ ও সজীবতায় পৃথিবী পুষ্পশোভিত
শত শত বিলুপ্ত সভ্যতার সমাধিস্থল এই পৃথিবী
রাজাদের শয়নাগার এই আক্ষেপ জাগানিয়া গন্তব্য
হে শিক্ষা গ্রহণকারী চক্ষু, রক্তিম অশ্রু বিসর্জন করো
(আল্লামা ইকবাল)

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ফারসি: পৃষ্ঠা ৬৪৬; মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪১ থেকে ৩৪৭।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

দিল্লির সুলতানদের আমলে উপমহাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতি

মুসলিম বিজেতা ও শাসকরা যেখানেই গিয়েছেন, তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পরিচর্যা করেছেন এবং ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একটি সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপ দিয়েছেন। দিল্লির সুলতানরা হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন। শুধু দিল্লিতেই এক হাজার মাদ্রাসা ছিল, যা থেকে সেই যুগে মুসলিম সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণের আন্দাজ করা যায়।

এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোর একটি ঝলক নিচে দেওয়া হলো:

- মাহমুদ গজনভি গজনীতে একটি বিশাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।
- তাঁর দরবারে আল-বিরুনি 'কিতাবুল হিন্দ' এবং উচ্চমানের বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পেশ করেন।
- মাহমুদ গজনভি আল-বিরুনির জন্য পিন্ড দাদন খাঁ-তে একটি বিশাল মানমন্দির নির্মাণ করেন।
- মাহমুদ গজনভির আমলে প্রথম ফারসি কবিতার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় এবং ফেরদৌসির মতো কবিরা খ্যাতি লাভ করেন।
- শাহাবুদ্দিন ঘুরি আজমিরসহ অনেক এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদ নির্মাণ করান।
- শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ দিল্লিতে 'মাদ্রাসা-ই-নাসিরিয়া'-র মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- ফিরোজ শাহ তুঘলক মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ ও আবাদ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- দিল্লির সুলতানরা সংস্কৃত ও অন্যান্য জাতির বহু গ্রন্থ আরবি ও ফারসিতে অনুবাদ করান।
- সুফি সাধকগণ তাঁদের শিক্ষা প্রচারের জন্য সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রতিটি অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা যেমন সিন্ধি, পাঞ্জাবি, কাশ্মীরি ও পশতু ব্যবহার করেন।
- গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি গ্রন্থ তৈরির কাজেও অনেক উন্নতি হয়। উন্নত মানের কাগজের কারখানা স্থাপন করা হয়। বই বাঁধাই ছিল সর্বোত্তম মানের। রঙিন বইয়েরও সূচনা হয়, যার কিনারে রঙিন লতাপাতার নকশা থাকত, মূল পাঠের ক্যালিগ্রাফিও বিভিন্ন রঙে করা হতো এবং উপলক্ষ অনুযায়ী বিভিন্ন ঘটনার চিত্রও অঙ্কন করা হতো। ফিরোজ শাহ তুঘলক শরীয়তের নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ করেছিলেন কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাঙ্কনে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। ফলে এই শিল্প একটি বিশেষ ধারায় অনেক উন্নতি লাভ করে। [১]
- উপমহাদেশের সামরিক ছাউনিগুলোতে প্রতিটি জাতি ও বংশের সৈনিক নিয়োগ করা হতো। এভাবে ধীরে ধীরে হিন্দি, ফারসি...

---

[১] তারিখ-ই-পাক ও হিন্দ, প্রফেসর আবদুল্লাহ মালিক (পৃষ্ঠা ২৬২ থেকে ২৭০)।

তুর্কি, আরবি এবং স্থানীয় ভাষাগুলোর সংমিশ্রণে একটি নতুন ভাষার উদ্ভব ঘটে যাকে ‘উর্দু’ বলা হতে থাকে, কারণ তুর্কি ভাষায় সামরিক ছাউনিকে ‘উর্দু’ বলা হয়। এই ভাষাটি সহজ এবং বোধগম্য হওয়ার কারণে খুব দ্রুত পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এটি প্রতিটি ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করেছে এবং প্রতিটি ভাষার ওপর প্রভাব ফেলেছে। দশম হিজরি শতাব্দী নাগাদ উর্দুর প্রচলন ফারসিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

- ১১. মুসলমানদের আগে হিন্দুস্তানের ইতিহাস সংরক্ষিত ছিল না। দেবী-দেবতাদের কাল্পনিক কাহিনী এবং নানা ধরনের গল্পকে ইতিহাসের নাম দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানরা কেবল তাদের নিজ যুগের ইতিহাসকেই সংরক্ষণ করেনি, বরং প্রাচীন হিন্দুস্তানের ইতিহাস থেকেও নির্ভরযোগ্য উপাদান নির্বাচন করে উপস্থাপন করেছে। এই সিলসিলায় মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতার ‘তারীখে ফেরেশতা’ সর্বোত্তম উদাহরণ। এ ছাড়া কাজী মিনহাজুস সিরাজের ‘তাবাকাতে নাসিরি’ এবং জিয়াউদ্দিন বারানির ‘তারীখে ফিরোজ শাহী’ও হিন্দুস্তানের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উৎস।

- ১২. চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, সিভিল انجینیاریং এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়।

- ১৩. মুসলমানরা ক্যালিগ্রাফি বা চারুলিপি শিল্পের প্রচলন করেন, যার ইসলামি সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম ক্যালিগ্রাফাররা কুরআনের আয়াত, হাদিস, কবিতা এবং মূল্যবান বাণীসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খত-এ-নাসখ, খত-এ-নাস্তালিক এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় লিপিতে উপস্থাপন করেছেন। ইমারতসমূহের সাজসজ্জার জন্য দেয়াল এবং মেহরাবগুলোতে আয়াত খোদাই করার রেওয়াজ সাধারণ হয়ে ওঠে।

- ১৪. দিল্লির সুলতানগণ উপমহাদেশে স্থাপত্যশিল্পকে শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লিতে মসজিদে কুওয়াতুল ইসলাম এবং কুতুব মিনার নির্মাণ করে এখানে স্থাপত্য কীর্তির সূচনা করেন। মসজিদে কুওয়াতুল ইসলামের দেয়াল, ছাদ এবং মেঝে সুষমভাবে কাটা চারকোণা সাদা পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এর তেরোটি গম্বুজ এবং চারটি আঙিনা ছিল। মাঝখানে একটি স্তম্ভ ছিল যা সাতটি ধাতুর মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছিল। কুতুব মিনার লাল পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এর দেয়ালে চমৎকার কারুকাজ করা হয়েছিল। এর উপরের অংশটি ছিল মার্বেল পাথরের এবং তাতে খাঁটি সোনার চূড়া লাগানো হয়েছিল। মিনারের ভেতরের সিঁড়ি এতটাই প্রশস্ত ছিল যে তা দিয়ে হাতিও উপরে উঠে যেত। [১]

শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ দিল্লিতে লাল পাথর দিয়ে হাওজে শামসি নির্মাণ করান, যাতে নিকটস্থ একটি ঝরনার পানি জমা হতো। এই হাওজের দৈর্ঘ্য ছিল দুই মাইল এবং প্রস্থ ছিল এক মাইল। এটি একটি ভ্রমণস্থলও ছিল এবং পানি সরবরাহের মাধ্যমও। [২] মুহাম্মদ তুঘলক বেগমপুরী মসজিদ নির্মাণ করান। আলাউদ্দিন খিলজি কুতুব মিনারের কাছে ‘আলাই মিনার’ নির্মাণ করান যা জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতো।

- ১৫. দিল্লি সেই সময়ে ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহর হিসেবে গণ্য হতো। সারা বিশ্বে এমন শান-শওকতপূর্ণ শহর আর দ্বিতীয়টি ছিল না। এর মতো মজবুত প্রাচীর অন্য কোনো শহরের ছিল না। এটি ছিল চারটি শহরের সমষ্টি। প্রাচীন দিল্লি হিন্দুদের দ্বারা আবাদকৃত ছিল যা...

---

১. সফরনামা ইবনে বতুতা: ৩৪৪

২. তারীখে ফেরেশতা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭১

৫৫৮ হিজরী (১১৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)-এ ফাতহ হয়েছিল। দ্বিতীয় শহর ছিল 'সিরি'। তৃতীয়টি ছিল 'তুঘলকাবাদ', যা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নির্মাণ করেছিলেন। চতুর্থটি ছিল 'জাহানপনাহ', যা মুহাম্মদ তুঘলক একটি মজবুত প্রাচীরের মাধ্যমে পুরনো দিল্লির সাথে যুক্ত করে আবাদ করতে চেয়েছিলেন। [১] কিন্তু তিনি এই কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি এবং সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক এর সমাপ্তি ঘটান।

মুসলিম যুগে গোল গম্বুজ, সুন্দর মিনার এবং খিলানযুক্ত দরজা নির্মাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। নির্মাণকাজে চুন ও মশলার ব্যবহার শুরু হয় যা ইমারতগুলোকে টেকসই করে তুলত। একইভাবে ছাদ ঢালাইয়ের প্রথাও সাধারণ হয়ে যায়। মুলতানের আশেপাশে সুফিয়ায়ে কেরামের মাজার ও মসজিদগুলোতে বড় গোল গম্বুজ নির্মাণের রীতি পুরো উপমহাদেশে জনপ্রিয় হয়। তুঘলক যুগে হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং শাহ রুকন-ই-আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাজারসমূহ নির্মিত হয়। মুলতানি নির্মাণশৈলী অনুযায়ী দেয়াল ও স্তম্ভগুলোতে ঢালু রাখা তুঘলক যুগের নির্মাণশৈলীতে স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে।

দিল্লিতে সাদাত ও লোদি বংশের স্মৃতিচিহ্নগুলোও উচ্চমানের নির্মাণশৈলীর নিদর্শন। সিকান্দার লোদির মাজার স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন, যাতে প্রথমবারের মতো দ্বিগুণ গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। মাজারের দরজা অত্যন্ত উঁচু এবং মাজারের প্রাঙ্গণের চারদিকে আটটি দিক রয়েছে যা এর শান-শওকত বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

তুর্কি ও ইরানি স্থপতিরা নির্মাণশৈলীকে আরও উন্নত করে একটি বিশেষ রূপ দান করেন। এই নির্মাণশৈলী 'ইন্দো-ইসলামিক নির্মাণশৈলী' নামে পরিচিতি লাভ করে। এভাবে উপমহাদেশে ইসলামি নির্মাণশৈলীর অমলিন ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়। [২]

---

[১] সফরনামা ইবনে বতুতা: পৃষ্ঠা ৩৩৩।

[২] এগুলোর অধিকাংশের আলোচনা ইতিপূর্বে দিল্লির সুলতানদের পৃথক পৃথক বর্ণনায় এসেছে। এখানে একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরা উদ্দেশ্য ছিল, তাই প্রতিটি জিনিসের রেফারেন্স দেওয়া হয়নি। যদি এই কারনামাগুলোকে এক জায়গায় সংক্ষেপে দেখতে চান তবে প্রফেসর আবদুল্লাহ মালিকের "তারিখ-ই-পাক ও হিন্দ" (পৃষ্ঠা ২৬২ থেকে ২৭৭) দেখুন।

বিস্তারিত জানার জন্য নিচের বইগুলো দেখুন:

- আসারুস সানাদিদ, লেখক: সৈয়দ আহমদ খান
- ইসলামি ফন-ই-তামির হিন্দ মে, লেখক: জেমস ফার্গুসন মুস্তাশরিক
- বজমে মুলুকিয়া, লেখক: সৈয়দ সাবাহউদ্দিন আব্দুর রহমান
- দিল্লি কে আসার-ই-কাদিমা, লেখক: খালিক আহমদ নিজামি
- ইসলামি উলুম কা ইরতিকা আহদে সুলতানাত-ই-হিন্দুস্তান মে, লেখক: প্রফেসর জাফরুল ইসলাম ইসলাহি

দিল্লির সুলতানদের আমলের শাসন ব্যবস্থা

দিল্লির সুলতানদের আমলে উপমহাদেশে শাসন ব্যবস্থায় অনেক নতুনত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। পদের নতুন বিন্যাস করা হয়েছিল এবং ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও সুসংহত করা হয়েছিল। দিল্লির সুলতানদের শাসন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিচে পেশ করা হলো:

সুলতান

সুলতান ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। নতুন সুলতান নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সুলতানের ওসিয়ত অত্যন্ত কার্যকর হতো, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দরবারের আমিরদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হতো। যদি কখনো ঐকমত্য না হতো, তবে শক্তি পরীক্ষার উপক্রম হতো এবং শক্তিশালী পক্ষ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে সিংহাসনে বসাতে সফল হতো।

সুলতানদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তারা সামরিক ও বিচার বিভাগীয় বিষয়গুলো নিজেদের হাতে রাখতেন এবং অন্যান্য সকল বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগও তারা নিজেরাই দিতেন। সকল বিভাগ মন্ত্রীদের পরামর্শে অধীনস্থ আমিরদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। প্রতিটি বিভাগকে “দিওয়ান” বলা হতো।

কেন্দ্রীয় বিভাগ ও পদমর্যাদা

কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো ছিল নিম্নরূপ:

•

দিওয়ান-ই-ওয়াজারাত:

এই বিভাগটি উজির-ই-সালতানাতের অধীনে ছিল। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আয় ও ব্যয়ের সমস্ত হিসাব-নিকাশ এই বিভাগের কাছে থাকত। জিজিয়া, উশর এবং জাকাত আদায় করাও ছিল এর দায়িত্ব। গনিমতের মালও এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা হতো এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হতো।

•

দিওয়ান-ই-আদল:

এটি কাজিউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। পুরো দেশের বিচার ব্যবস্থা এর অধীনে ছিল। এর সবচেয়ে বড় পদমর্যাদাধারী ব্যক্তিকে “সদরুস সুদুর” বা “সদর-ই-জাহান” বলা হতো। এই পদটি কোনো বড় ফকিহকে দেওয়া হতো।

৩. দিওয়ান-ই-আরজ:

এটি ছিল সামরিক বিষয়ক বিভাগ যার দায়িত্ব ছিল সৈন্যদের নিয়োগ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং যুদ্ধাভিযানের উপায় ও উপকরণ প্রস্তুত করে দেওয়া। এর প্রধানকে 'আরজ' বলা হতো। তার মর্যাদা ছিল বর্তমান সময়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মতো।

৪. দিওয়ান-ই-ইনশা:

এটি ছিল আদেশ জারি করা এবং সরকারি বার্তা লেখা, পাঠানো ও গ্রহণ করার বিভাগ। রাজকীয় আদেশ এবং পত্রসমূহ এই বিভাগই "মোহরবদ্ধ" (সিল) করে পাঠাত।

৫. দিওয়ান-ই-বারিদ (ডাক বিভাগ):

এই বিভাগ বার্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্সেল আনা-নেওয়ার দায়িত্ব পালন করত। অশ্বারোহী এবং পদাতিকদের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করা হতো। প্রতি চার মাইলে অশ্বারোহীদের এবং প্রতি এক-তৃতীয়াংশ মাইলে পদাতিকদের চৌকি ছিল যেখান থেকে নতুন বার্তাবাহক চিঠি নিয়ে সাথে সাথে যাত্রা শুরু করত। মুলতান থেকে দিল্লি পর্যন্ত ডাক পৌঁছাতে মাত্র পাঁচ দিন সময় লাগত।

৬. জানদার:

বাদশাহর বিশেষ দেহরক্ষী বাহিনীকে 'জানদার' বলা হতো। এতে অত্যন্ত অনুগত গোলামদের বাছাই করে নিয়োগ দেওয়া হতো। তাদের মধ্যে কিছু গোলাম নিজেদের যোগ্যতা ও আত্মোৎসর্গের কারণে অনেক সময় উচ্চ পদে পৌঁছে যেতেন।

৭. আমির-ই-হাজিব (বারবক):

তিনি ছিলেন দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কেউ বাদশাহর সাথে দেখা করতে চাইলে সে হাজিবের কাছে আবেদন করত, হাজিব বাদশাহর অনুমতি নিয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতেন। রাজপ্রাসাদ এবং দরবারের সমস্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল।

৮. ওয়াকিল-ই-দর (ওয়াকিলদার):

রাজপ্রাসাদের দেখাশোনা এবং খাবার ও লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার কাছে থাকত।

প্রাদেশিক পদসমূহ

সালতানাতকে কয়েকটি বড় অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল।

বিলায়াত:

প্রতিটি অংশকে 'বিলায়াত' বলা হতো। প্রতিটি বিলায়াত কয়েকটি শহর, ডজনখানেক দুর্গ এবং শত শত গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

শিক বা পরগনা:

প্রতিটি বিলায়াতের শাসনব্যবস্থাকে আরও কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। ফলে প্রতি একশটি গ্রামের একটি সমষ্টি তৈরি করে সেই এলাকাকে "শিক" বা "পরগনা" বলা হতো।

https://t.me/BoierSomahar

প্রাদেশিক পর্যায়ে উচ্চপদস্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণ ছিলেন নিম্নরূপ:

মুহাসসিল: (কালেক্টর)

তিনি চাষী ও জমিদারদের কাছ থেকে নগদ বা পণ্যের আকারে কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতেন। তিনি মুকাদ্দাম এবং পাটোয়ারীর মতো স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন যাতে কর আদায়ের প্রক্রিয়া সহজ হয়।

শিকদার: (ডেপুটি কমিশনার)

"শিক" বা "পরগনা"র প্রধান তদারককারীকে শিকদার বলা হতো। তার দায়িত্বসমূহ প্রশাসনিক, আর্থিক এবং সামরিক প্রকৃতির ছিল এবং তিনি স্থানীয় পর্যায়ে প্রাদেশিক ওয়ালির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। তিনি তার শাসনাধীন এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়ী ছিলেন। ছোটখাটো অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা এবং তাদের মামলা আদালতে পেশ করা তার দায়িত্ব ছিল। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক বিষয়াদি পরিচালনা করতেন এবং আদালতের রায় বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতেন।

যুদ্ধ বা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে শিকদারের দায়িত্ব ছিল তার এলাকার সামরিক বাহিনীকে সংগঠিত করা এবং কেন্দ্র বা সংশ্লিষ্ট সামরিক কমান্ডারের নির্দেশে অভিযানের জন্য তাদের প্রস্তুত রাখা। তিনি নিজস্ব বাহিনীও রাখতেন যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং কর আদায়ের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করা যায়। তিনি এটি নিশ্চিত করতেন যে কোনো স্থানীয় জমিদার বা কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশের লঙ্ঘন না করে। এভাবে শিকদার স্থানীয় পর্যায়ে সুলতানের নায়েবের চোখ ও কান হিসেবে কাজ করতেন। তার পদটি কেন্দ্রীয় ও গ্রামীণ প্রশাসনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসেবে কাজ করত।

কাজী:

প্রতিটি প্রদেশে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং মামলা শুনে রায় দেওয়ার দায়িত্ব ছিল কাজীর। সুলতান কাজীদের নিয়োগ দিতেন। প্রতিটি কাজীকে সহায়তার জন্য মুফতি ও উলামা নিযুক্ত থাকতেন। শহর ও প্রাদেশিক পর্যায়ে কাজীগণ মামলার শুনানি করতেন, অন্যদিকে গ্রামগুলোতে এই কাজ পঞ্চায়েত করত।

সাহেবে দিওয়ান:

প্রতিটি প্রদেশের আর্থিক বিষয়াদি তদারকি করা সাহেবে দিওয়ানের দায়িত্বে ছিল। তিনি আয় ও ব্যয়ের রেকর্ড তৈরি করে তার অনুলিপি কেন্দ্রে পাঠাতেন। নিজ প্রদেশের আর্থিক মামলাগুলোর শুনানিও তার দায়িত্বে ছিল।

কোতোয়াল:

তিনি ছিলেন পুলিশ প্রধান। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল তার দায়িত্ব।

সাহেবে বারিদ:

ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রাদেশিক দায়িত্বশীলকে সাহেবে বারিদ বলা হতো। তিনি তার প্রদেশের ডাক এবং গোয়েন্দাদের চিঠিপত্র নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও দ্রুতগামী মাধ্যমে কেন্দ্রে পাঠাতেন।

সদর:

ইনি ধর্মীয় বিষয়াবলির প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বৃত্তি এবং ওয়াকফ ছাড়াও তিনি ফৌজদারি মামলার শুনানিও করতেন।

গ্রামাঞ্চলের ব্যবস্থা

দিল্লির সুলতানদের শাসন ব্যবস্থায় গ্রাম পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ ও সুসংগঠিত পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। যেহেতু গ্রামগুলো ছিল সালতানাতের অর্থনীতির ভিত্তি, তাই এগুলোর ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। এই ব্যবস্থাটি মূলত স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসিত ছিল এবং কেন্দ্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ কম ছিল।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সালতানাতকে বিলায়াত (প্রদেশ) এবং প্রতিটি বিলায়াতকে পরগনায় বিভক্ত করা হয়েছিল। আবার প্রতিটি পরগনা অনেকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এক হিসাব অনুযায়ী, একটি পরগনায় কমবেশি একশটি গ্রাম থাকত। তবে এই সংখ্যাটি চূড়ান্ত ছিল না।

দিহ (গ্রাম):

এটি গ্রামীণ ব্যবস্থার সবচেয়ে ছোট একক ছিল। প্রতিটি গ্রাম ছিল একটি স্বনির্ভর ইউনিট। এর স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা থাকতেন, যারা কেন্দ্রের পরিবর্তে মূলত গ্রামেরই বাসিন্দা হতেন:

মুকাদ্দাম:

ইনি গ্রামের সর্দার বা প্রধান এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হতেন এবং তাঁর পদটি প্রায়ই বংশানুক্রমিক হতো। মুকাদ্দামের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব (খাজনা) আদায় করা এবং তা সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তিনি গ্রামের মানুষ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতেন।

পাটওয়ারি:

পাটওয়ারি ছিলেন গ্রামের সরকারি রেকর্ড কিপার। তাঁর কাজ ছিল জমি পরিমাপ করা, ফসলের রেকর্ড রাখা এবং জমির রেজিস্টার সংরক্ষণ করা। তাঁর কাছে সমস্ত জমির মালিকানা এবং উৎপাদনের বিবরণ থাকত।

চৌধুরী:

ইনি এমন একজন স্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন যার অধীনে বেশ কয়েকটি গ্রাম থাকত। তিনি সেগুলোর মুকাদ্দামদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং রাজস্ব আদায়ে সরকারকে সাহায্য করতেন। তিনি ওই এলাকার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী জমিদার হতেন।

গ্রামীণ ব্যবস্থাটি মূলত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ওপর ভিত্তি করে ছিল। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার সরাসরি গ্রামের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত না। সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল কেবল রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা। রাজস্ব সাধারণত এক-তৃতীয়াংশ (ফসলের অংশীদারিত্ব) হিসেবে নির্ধারিত হতো এবং তা স্থানীয় কর্মকর্তাদের অর্থাৎ মুকাদ্দাম ও চৌধুরীর মাধ্যমে আদায় করা হতো।

কর্মকর্তারা নির্ধারিত রাজস্ব থেকে কিছু অংশ তাদের সেবার বিনিময়ে রেখে দিতেন।

পঞ্চায়েত:

পঞ্চায়েত ছিল বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের একটি সভা যেখানে গ্রামের ছোটখাটো বিবাদ বা অপরাধের মীমাংসা করা হতো। বড় ধরনের অপরাধ বা বিদ্রোহের ক্ষেত্রেই কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করতেন। এই ব্যবস্থা বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছিল এবং মুঘল আমলেও এটি তার ভিত্তি বজায় রেখেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় পর্যায়ে বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য এমন একটি পদ্ধতি থাকা যা কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে না এবং নিয়মিত রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবে।

দিল্লির সুলতানদের ইকতা ব্যবস্থা

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দুস্তানে প্রচলিত জায়গিরদারি ব্যবস্থা ছিল একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা, যা মুসলমানরা এসে বিলুপ্ত করেন এবং দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক শাসকরা এর পরিবর্তে "ইকতা ব্যবস্থা" প্রবর্তন করেন। পূর্ববর্তী জায়গিরদারি ব্যবস্থা এবং দিল্লির সুলতানদের এই ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ করে জমির মালিকানা, প্রশাসনিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক মৌলিক পার্থক্য ছিল। এর বিস্তারিত নিম্নরূপ:

- প্রাচীন হিন্দুস্তানে, বিশেষ করে রাজপুত রাজ্যগুলোতে যেখানে জায়গিরদারি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল:

- জায়গিরদারকে সাধারণত জমির মালিক মনে করা হতো অথবা জমির ওপর তার বংশানুক্রমিক অধিকার থাকতো, যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতো।

- রাজা বা কেন্দ্রীয় শাসক একজন সর্বোচ্চ নেতার মর্যাদায় থাকতেন, কিন্তু জায়গিরদার তার জায়গিরের অভ্যন্তরে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন। তারা তাদের এলাকায় পূর্ণ প্রশাসনিক, বিচারিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার করতেন। তারা নিজস্ব ছোট বাহিনী রাখতেন এবং যুদ্ধের সময় রাজাকে সামরিক সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন।

- রাজা তার অধীনস্থদের আনুগত্য এবং সামরিক সেবার বিনিময়ে জমি বা জায়গির দান করতেন, কিন্তু এই জায়গিরগুলো সাধারণত স্থায়ী প্রকৃতির হতো।

- কেন্দ্রীয় সরকারের জায়গিরদারদের ওপর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ছিল, তাই দূরবর্তী এলাকাগুলোতে জায়গিরদাররা প্রায়ই বিদ্রোহ করতেন অথবা নিজেদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতেন। এই ব্যবস্থা কেন্দ্রকে দুর্বল করে দিয়েছিল এবং হিন্দুস্তানকে ছোট ছোট স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে বিভক্ত করে ফেলেছিল।

- জায়গিরদারির আনুগত্য রাজা বা পরিবারের সাথে ছিল, কোনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে নয়।

দিল্লি সালতানাত হিন্দুস্তানে "ইকতা" ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যা অনেকটা আব্বাসীয় খিলাফতে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল।

https://t.me/BoierSomahar

কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ছিল, এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- ইকতায় জমির মালিকানা কেন্দ্রীয় সরকার বা সুলতানের কাছে থাকত। মুকতি অর্থাৎ ইকতা কর্মকর্তাকে জমির মালিক মনে করা হতো না, বরং তাকে কেবল জমির রাজস্ব সংগ্রহ এবং প্রশাসন পরিচালনার অধিকার দেওয়া হতো। তিনি ছিলেন একজন প্রশাসক যাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বা সুলতানের ইচ্ছা অনুযায়ী ইকতা প্রদান করা হতো। [১]

- এই পদটি বংশানুক্রমিক ছিল না। সুলতান যেকোনো সময় এটি স্থানান্তর করতে বা ফিরিয়ে নিতে পারতেন।

- মুকতির প্রধান দায়িত্ব ছিল তার ইকতা থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং তা দিয়ে নিজের সেনাবাহিনীর (ফৌজ-ই-ইকতা) ব্যয় নির্বাহ করা। সুলতানের নির্দেশে তিনি এই বাহিনীকে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতেন। এ ছাড়া তিনি নিজ এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিচারিক কাজ সম্পাদনের জন্যও দায়ী ছিলেন।

- এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা। সুলতানের সাথে মুকতির সরাসরি যোগাযোগ থাকত। তিনি তার কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ তলব করতে পারতেন এবং যেকোনো সময় মুকতিকে পরিবর্তন করতে পারতেন। এতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমে যেত এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সুসংহত থাকত।

- এই ব্যবস্থায় কর্মকর্তাদের আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সুলতান এবং ইসলামী রাষ্ট্র, কোনো ব্যক্তিগত জায়গির নয়। ইকতা ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য হিন্দুস্তানে একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছিল, যা দীর্ঘকাল ধরে দিল্লি সালতানাতের স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মুদ্রা, তাদের মূল্যমান এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা:

দিল্লি সুলতানদের আমলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মানসম্মত যে মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তা হলো তনকা। তনকা, তঙ্গা এবং টাকা একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণ। এটি ছিল রুপার মানসম্মত মুদ্রা যা সুলতান ইলতুতমিশ প্রবর্তন করেছিলেন। এর ওজন একটি নির্দিষ্ট মানে নির্ধারণ করা হয়েছিল যা প্রায় আট দিরহামের সমান ছিল। এটি দিল্লি সালতানাতের অর্থনীতির একটি মূল অংশে পরিণত হয়েছিল।

জিতল ছিল তামার মুদ্রা যাকে চিতলও বলা হতো। এর মান তনকার চেয়ে অনেক কম ছিল। এটি দৈনন্দিন ছোটখাটো কেনাবেচার জন্য ব্যবহৃত হতো। এক তনকায় অনেকগুলো জিতল হতো, যা সেই সময়ের মুদ্রা ব্যবস্থা গঠন করত। একটি মুদ্রার প্রকৃত মূল্য তার ক্রয়ক্ষমতা দ্বারা বোঝা যায়। যে সময়ে এক তনকা প্রচলিত ছিল, তার ক্রয়ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, এক তনকায় একজন শ্রমিকের অনেক দিনের মজুরি বা কয়েক মণ শস্য পাওয়া যেত। যদিও তনকা রুপার মুদ্রা ছিল, কিন্তু আজকের রুপার দাম এবং সেই সময়ের এর মূল্য ও গুরুত্বের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং, সেই যুগে এর মূল্য একজন সাধারণ মানুষের অনেক দিনের, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক মাসের আয়ের সমানও হয়ে যেত।

---

[১] (মুকতির উর্দু অনুবাদ সাধারণত জায়গিরদারই করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি প্রচলিত অর্থে জায়গিরদার নয় বরং সামরিক জেনারেল বা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন যাদের দিল্লি সুলতানদের ব্যবস্থায় 'ইকতাদার', মুকতি বা ওয়ালি বলা হতো।)

এই যুগে একজন সাধারণ শ্রমিকের গড় মাসিক আয় ছিল প্রায় দুই থেকে তিন তঙ্কা। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আলাউদ্দিন খলজির যুগে ছিল নিম্নরূপ:

- গম: ৭.৫ জিতল প্রতি মণ
- যব: ৪ জিতল প্রতি মণ
- ছোলা: ৫ জিতল প্রতি মণ
- চাল: ৫ জিতল প্রতি মণ
- ডাল: ৫ জিতল প্রতি মণ
- ঘি: এক জিতলে প্রায় দেড় কিলোগ্রাম

পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষের বিরল পরিস্থিতি ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এর চেয়ে সামান্যই কম-বেশি হতো, তবে সামগ্রিকভাবে দাম স্থিতিশীল ছিল।

একজন দরিদ্র ব্যক্তি যে মাসে দুই তঙ্কা আয় করত, সে তার এক মাসের আয় দিয়ে বারো মণেরও বেশি গম কিনতে পারত। এটি ছিল মাসিক ক্রয়ক্ষমতার হিসাব। এখন আমরা দৈনিক ক্রয়ক্ষমতার হিসাব করি। আমরা বলেছি যে শ্রমিকের গড় মাসিক আয় ছিল দুই থেকে তিন তঙ্কা। এক তঙ্কায় ৪৮ জিতল হতো, যা ছিল তামার মুদ্রা। সুতরাং একজন শ্রমিকের মাসিক আয় ৯৬ জিতল থেকে ১৪৪ জিতল এবং সেই হিসেবে দৈনিক মজুরি ৩.২ জিতল থেকে ৪.৮ জিতল পর্যন্ত হতো।

সেই সময়ের সের ইংরেজি সেরের চেয়ে কম ছিল। মণ (চল্লিশ সের) ছিল প্রায় ২৪ কিলোগ্রামের সমান। এর অর্থ হলো এই যে, একজন সাধারণ মজুর (যে ৩.২ জিতল আয় করত) সেও সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে ২ কেজি গম, ২ কেজি চাল এবং ২ কেজি ছোলা নিয়ে যেতে পারত এবং তারপরও কিছু খুচরা পয়সা তার পকেটে বেঁচে যেত।

মোটকথা, এই যুগে মৌলিক প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য দরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত ভালো। যেহেতু মানুষ মিতব্যয়ী ছিল, তাই তারা সাধারণত নিজেদের বাড়িঘরও সঞ্চয় করে তৈরি করে নিত। জমি সস্তা ছিল এবং ঘরবাড়ি নির্মাণের কাঁচামাল সাধারণত কাঁচা মাটি হতো। এর থেকে কাঁচা বা পাকা ইট তৈরি করে দেয়াল গাঁথা হতো। সেগুলোর ওপর লেপন করে এবং চুনকাম করে সেগুলোকে সুন্দর করে তোলা হতো। ছাদগুলো প্রায়ই কাঠ ও কাদা দিয়ে তৈরি করা হতো। এই সমস্ত জিনিস স্থানীয়ভাবে সব জায়গায় সহজলভ্য হওয়ার কারণে সস্তা ছিল। মোটকথা, সেই সময়ে জীবন ছিল অত্যন্ত সস্তা ও সহজ। [১]

---

[১] তথ্যসূত্র:

- সুলতানাত-ই-দিল্লির শাসন ব্যবস্থা, ড. ইশতিয়াক হোসেন কুরাইশী মরহুম।
- হিন্দুস্তানে মুসলিম সংস্কৃতি, আবু আল-মাজিদ সালিক।
- উপমহাদেশে ইসলামি সংস্কৃতি, প্রফেসর মুহাম্মদ আজিজ।
- হিন্দুস্তানি সংস্কৃতির ওপর ইসলামের প্রভাব, ড. তারা চাঁদ।
- সংস্কৃতি ও সহনশীলতা: উপমহাদেশের ইতিহাসের একটি সমীক্ষা, সৈয়দ উসমান শের।
- হিন্দুস্তানি সংস্কৃতির বিবর্তন, ইমাদুল হাসান আজাদ ফারুকী।
- ইসলামি যুগের হিন্দুস্তানের সমাজ, অর্থনীতি ও শাসনের সমস্যাবলি, প্রফেসর জাফরুল ইসলাম ইসলাহি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দিল্লির সুলতানদের তালিকা

দাস বংশ

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ মন্তব্য

১ কুতুব উদ্দিন আইবেক ৬০২ হিজরি থেকে ৬০৭ হিজরি (১২০৬ খ্রি. থেকে ১২১০ খ্রি.) উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীন মুসলিম সরকারের প্রতিষ্ঠা - কুতুব মিনার নির্মাণ।

২ আরাম শাহ ৬০৭ হিজরি (১২১০ খ্রি.) অল্পবয়স্ক ছিলেন, অপসারিত করা হয়েছিল।

৩ শামস উদ্দিন ইলতুতমিশ ৬০৭ হিজরি থেকে শাবান ৬৩৩ হিজরি (১২১০ খ্রি. থেকে এপ্রিল ১২৩৬ খ্রি.) সালতানাতের সুদৃঢ়করণ, আদর্শ শাসন।

৪ রুকন উদ্দিন ফিরোজ শাহ শাবান ৬৩৩ হিজরি থেকে ৬৩৪ হিজরি (এপ্রিল থেকে নভেম্বর ১২৩৬ খ্রি.) অযোগ্য, ভোগবিলাসী।

৫ রাজিয়া সুলতান রবিউল আউয়াল ৬৩৪ হিজরি থেকে ২৫ রমজান ৬৩৮ হিজরি (নভেম্বর ১২৩৬ খ্রি. থেকে মার্চ ১২৪০ খ্রি.) উপমহাদেশের প্রথম নারী শাসক।

৬ মুইজ উদ্দিন বাহরাম শাহ ৬৩৮ হিজরি থেকে ৬৩৯ হিজরি (১২৪০ খ্রি. থেকে ১২৪২ খ্রি.) অযোগ্য, ভোগবিলাসী।

৭ আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ ৬৩৯ হিজরি থেকে ৬৪৪ হিজরি (১২৪২ খ্রি. থেকে ১২৪৬ খ্রি.)

৮ নাসির উদ্দিন মাহমুদ ৬৪৪ হিজরি থেকে ৬৬৪ হিজরি (১২৪৬ খ্রি. থেকে ১২৬৬ খ্রি.) ন্যায়পরায়ণ এবং সচ্চরিত্র বাদশাহ।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

৯. গিয়াসউদ্দিন বলবন | ৬৬৪ হিজরি থেকে ৬৮৬ হিজরি (১২৬৬ খ্রি. থেকে ১২৮৭ খ্রি.) | দাস বংশের উন্নতির চরম শিখর

১০. মুইজউদ্দিন কায়কোবাদ | ৬৮৬ হিজরি থেকে ৬৮৮ হিজরি (১২৮৭ খ্রি. থেকে ১২৮৯ খ্রি.) | ভোগবিলাসী, অযোগ্য

১১. শামসুদ্দিন কায়ুমারস | শাওয়াল ৬৮৮ হিজরি থেকে মহরম ৬৮৯ হিজরি (অক্টোবর ১২৮৯ খ্রি. থেকে ফেব্রুয়ারি ১২৯০ খ্রি.) | নাবালক, নামমাত্র শাসক

খিলজি বংশ

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ জালালউদ্দিন খিলজি ৬৮৯ হিজরি থেকে ৬৯৬ হিজরি (১২৯০ খ্রি. থেকে ১২৯৬ খ্রি.) বৃদ্ধ, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ

২ রুকনউদ্দিন ইব্রাহিম শাহ রমজানের মধ্যভাগ থেকে জিলহজের মধ্যভাগ ৬৯৬ হিজরি (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ১২৯৬ খ্রি.) তিন মাসের নামমাত্র শাসন

৩ আলাউদ্দিন খিলজি ৬৯৬ হিজরি থেকে ৭১৫ হিজরি (১২৯৬ খ্রি. থেকে ১৩১৬ খ্রি.) বিজেতা, কঠোর, পরিকল্পনাকারী, শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার

৪ শিহাবউদ্দিন উমর শাহ শাওয়াল ৭১৫ হিজরি থেকে মহরম ৭১৬ হিজরি (জানুয়ারি ১৩১৫ খ্রি. থেকে এপ্রিল ১৩১৬ খ্রি.) তিন মাসের নামমাত্র শাসন

৫ কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ ৭১৬ হিজরি থেকে ৭২০ হিজরি (১৩১৬ খ্রি. থেকে ১৩২০ খ্রি.) ভোগবিলাসী, অযোগ্য, তারিখ-ই-মুবারক শাহী রচিত হয়

জরুরি সময়কাল নাসিরউদ্দিন খসরু রবিউল আউয়াল থেকে রজব ৭২০ হিজরি (এপ্রিল থেকে আগস্ট ১৩২০ খ্রি.) হিন্দুদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-এ-মিল্লাত-এ-ইসলামিয়া

তুঘলক বংশ

ক্রমিক শাসক শাসনকাল বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (গাজী মালিক) ৭২০ হিজরি থেকে ৭২৫ হিজরি (১৩২০ খ্রি. থেকে ১৩২৫ খ্রি.) তুঘলক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু শাসক।

২ মুহাম্মদ তুঘলক (মালিক জুনা) ৭২৫ হিজরি থেকে ৭৫২ হিজরি (১৩২৫ খ্রি. থেকে ১৩৫১ খ্রি.) বিপরীতধর্মী গুণের অধিকারী, দীর্ঘ শাসনকাল, বিদ্রোহের আধিক্য।

৩ ফিরোজ শাহ তুঘলক ৭৫২ হিজরি থেকে ৭৯০ হিজরি (১৩৫১ খ্রি. থেকে ১৩৮৮ খ্রি.) ন্যায়পরায়ণ, পরিকল্পনাকারী শাসক, সমৃদ্ধি ও উন্নতির যুগ।

৪ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সানি ৭৯০ হিজরি থেকে ৭৯১ হিজরি (১৩৮৮ খ্রি. থেকে ১৩৮৯ খ্রি.) দুর্বল শাসক।

৫ আবু বকর শাহ ৭৯১ হিজরি থেকে ৭৯৩ হিজরি (১৩৮৯ খ্রি. থেকে ১৩৯০ খ্রি.) দুর্বল শাসক।

৬ নাসিরুদ্দিন শাহ (মুহাম্মদ খান) ৭৯৩ হিজরি থেকে ৭৯৬ হিজরি (১৩৯০ খ্রি. থেকে ১৩৯৪ খ্রি.) দুর্বল শাসক।

৭ আলাউদ্দিন সিকান্দার শাহ আউয়াল রবিউল আউয়াল থেকে জমাদিউল আউয়াল ৭৯৬ হিজরি (জানুয়ারি থেকে মার্চ ১৩৯৪ খ্রি.) দেড় মাস নামমাত্র শাসন।

৮ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (প্রথমবার) ৭৯৬ হিজরি থেকে ৮০১ হিজরি (১৩৯৪ খ্রি. থেকে ১৩৯৮ খ্রি.) দুর্বল শাসন যা তৈমুরের আক্রমণের কবলে পড়ে শেষ হয়ে যায়।

৯ নুসরাত শাহ (ফিরোজাবাদে) ৭৯৭ হিজরি থেকে ৮০০ হিজরি (১৩৯৫ খ্রি. থেকে ১৩৯৮ খ্রি.) বিকল্প শাসন যা ফিরোজাবাদে তিন বছর স্থায়ী ছিল।

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১০ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (দ্বিতীয়বার) ৮০২ হি. থেকে ৮১৪ হি. (১৩৯৯ খ্রি. থেকে ১৪১৩ খ্রি.) দুর্বল শাসনব্যবস্থা যা তিন বছর স্থগিত থাকার পর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

জরুরি কাল দৌলত খান লোদী ৮১৫ হি. থেকে ৮১৭ হি. (১৪১৩ খ্রি. থেকে ১৪১৪ খ্রি.)

সৈয়দ বংশ

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ খিজির খান ৮১৭ হি. থেকে ৮২৪ হি. (১৪১৪ খ্রি. থেকে ১৪২১ খ্রি.) তৈমুর লঙের করদ রাজ্য হিসেবে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

২ মুইজুদ্দিন মুবারক শাহ ৮২৪ হি. থেকে ৮৩৭ হি. (১৪২১ খ্রি. থেকে ১৪৩৪ খ্রি.) পুরো শাসনকাল বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হয়।

৩ মুহাম্মদ শাহ ৮৩৭ হি. থেকে ৮৪৯ হি. (১৪৩৪ খ্রি. থেকে ১৪৪৫ খ্রি.) সালতানাত ক্রমাগত পতনের দিকে ধাবিত হয়।

৪ আলাউদ্দিন আলম শাহ ৮৪৯ হি. থেকে ৮৫৫ হি. (১৪৪৫ খ্রি. থেকে ১৪৫১ খ্রি.) অযোগ্য, উদাসীন। শেষ শাসক।

লোদী আফগান

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ বাহলুল লোদী ৮৫৫ হি. থেকে ৮৯৪ হি. (১৪৫১ খ্রি. থেকে ১৪৮৯ খ্রি.) আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা।

২ নিজাম খান সিকান্দার ৮৯৪ হি. থেকে ৯২৩ হি. (১৪৮৯ খ্রি. থেকে ১৫১৭ খ্রি.) লোদী বংশের উন্নতির স্বর্ণযুগ।

৩ ইব্রাহিম লোদী ৯২৩ হি. থেকে ৯৩২ হি. (১৫১৭ খ্রি. থেকে ১৫২৬ খ্রি.) বাবরের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন।

https://t.me/BoierSomahar

ইসলামের ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

দিল্লি সালতানাত আমলের

প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ

https://t.me/BoierSomahar

শাহান-ই দিল্লির সমসাময়িক দ্বীনি ব্যক্তিত্ব

হিন্দুস্তানে বুজুর্গানে দ্বীন এবং সুফিদের আগমন চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর শেষভাগ এবং পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর শুরুর দিকে সুলতান মাহমুদ গজনভীর অভিযানের সাথে শুরু হয়েছিল। এই ব্যক্তিবর্গ মূলত ইসলামের দায়ী এবং মুবাল্লিগ ছিলেন যারা অধিক পরিমাণে জিকির ও ইবাদতের পাশাপাশি মাখলুকের সেবা এবং দাওয়াত ও ইরশাদের মাধ্যমে মানুষের সামনে ইসলামের একটি বাস্তব নমুনা পেশ করতেন। এভাবে তাঁদের বদৌলতে অসংখ্য মানুষ ইসলামে দাখিল হয়েছিল। তাঁদের পাশাপাশি এখানে উলামা ও ফুকাহাদেরও একটি বড় দল এই সময়েই আগমন করেছিল এবং স্থানে স্থানে দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে হিন্দুস্তানে রাজপুতদের মতো বীর জাতি উন্নতির শিখরে ছিল যাদের ওপর জোরপূর্বক কোনো আকিদা বা মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু রাজপুতরা গোত্রের পর গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে এবং এর প্রথম সারির সিপাহি হয়, যার কারণ ছিল ইসলামের নিজস্ব আকর্ষণ এবং এর বার্তার প্রাণবন্ততা। ইতিহাস সাক্ষী যে, কোথাও অমুসলিমদের ওপর জোর-জবরদস্তি বা মকর-ফরেব এর মাধ্যমে ইসলামে আনার কোনো কদর্য ও হাস্যকর চেষ্টা করা হয়নি। সুলতানদের কাজ ছিল ইসলামের পথে শত্রুদের কেল্লাবন্দি ভেঙে দেওয়া। ইসলামকে অন্তরে প্রবেশ করানোর কাজ আল্লাহর নেক বান্দারা তাঁদের উজ্জ্বল চরিত্র, মিষ্টভাষিতা, কার্যকর তাবলিগ এবং খিদমতে খালকের মাধ্যমে করেছেন।

ইসলামের দায়ী এবং উলামা ও মাশায়েখদের একটি বিশাল স্রোত সেই সময় উপমহাদেশে প্রবেশ করে যখন মধ্য এশিয়া ধ্বংসাত্মক যোদ্ধা জাতিগুলোর হাতে একে একে তছনছ ও বরবাদ হয়। এই জাতিগুলোর মধ্যে তুর্কান-ই খাতা এবং গুযও ছিল যারা ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শুধু মধ্য এশিয়ার অনেক শহরকেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়নি বরং মহান সেলজুক সাম্রাজ্যকেও তছনছ করে দিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পর মধ্য এশিয়ার মুসলিম সমাজ এই ধ্বংসলীলার প্রভাব থেকে বের হতে না হতেই হঠাৎ চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মঙ্গোলদের তুফান ধেয়ে আসে এবং দেখতে দেখতে সমরকন্দ, বুখারা, তিরমিজ, নিসা, নিশাপুর এবং বলখের মতো ঐতিহাসিক শহরগুলো তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, কুতুবখানা এবং আহলে ইলমসহ মাটির সাথে মিশে যায়। এভাবে ৫৩০ হিজরি থেকে ৬৩০ হিজরির মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিরতি দিয়ে দিয়ে মধ্য এশিয়ার শহরগুলো ছেড়ে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে যাত্রা করে এবং বিশেষ করে তারা ওয়াদিয়ে মেহরান, পাঞ্জাব এবং গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। ইতিহাসে হঠাৎ কোনো অঞ্চলে এত বিপুল সংখ্যক ইলম ও ফন বিশেষজ্ঞদের হিজরতের নজির খুব কমই পাওয়া যাবে।

এভাবে মধ্য এশিয়ার সেই ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে যখন তা মুহাদ্দিসিন, ফুকাহা, সুফিয়া এবং মাশায়েখদের কেন্দ্র ছিল। মাশিয়্যাতে ইলাহি এখন এই মর্যাদা উপমহাদেশকে দেওয়ার ফয়সালা করে নিয়েছিল, ফলে আমরা সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে হিন্দুস্তানকে উলামা ও মাশায়েখদের মাধ্যমে এমন আবাদ দেখতে পাই যে...

যার উদাহরণ এই ভূখণ্ডের অতীত ইতিহাসে ছিল না। এটিই ছিল সেই যুগ যখন হিন্দুস্তান একটি প্রকৃত ইসলামী অঞ্চলের রূপ ধারণ করেছিল এবং মুসলমানরা যারা আগে এখানে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ছিল, এখন বিপুল সংখ্যক মুহাজিরদের আগমন এবং তারপর ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে কেবল সংখ্যায় দ্বিগুণ-চতুর্গুণই হয়নি বরং তারা এখানে এমন এক মহান ইসলামী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল যার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী ইতিহাস সর্বদা গর্ব করবে।

এটা বলা যেতে পারে যে, মঙ্গোলদের আক্রমণে যেখানে মধ্য এশিয়া, খোরাসান, ইরান ও ইরাক ধ্বংস হয়েছিল, সেখানে হিন্দুস্তানের মুসলিম সমাজ এর দ্বারা দারুণভাবে উপকৃত হয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (যেখানে পাকিস্তান অবস্থিত) তুর্কি ও আফগান মুহাজিরদের ব্যাপক বসতি স্থাপনের ফলে অনেক এলাকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে এমন শত শত উলামা ও মাশায়েখও ছিলেন যারা দিল্লি, দোয়াব এবং বাংলার নববিজিত অঞ্চলগুলোর দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং তুলনামূলকভাবে বেশি পরিশ্রমসাধ্য এলাকাগুলোতে তারা ইসলামের সেচকার্য (প্রসার) করেছিলেন। কেউ কেউ অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং এমন সব স্থানে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন যেখানে গিয়ে অবস্থান করাও ছিল মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর শামিল, যেমন চিশতিয়া কাফেলার অগ্রপথিক খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ, যিনি পৃথ্বীরাজের উত্থানকালে তার সালতানাতের কেন্দ্র আজমিরে গিয়ে ইসলামের বীজ বপনের কাজ শুরু করেছিলেন।

এই মুহাজির উলামা, মাশায়েখ এবং ইসলামের দাঈদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল তারা, যারা তাদের সবকিছু হারিয়ে এখানে এসেছিল এবং একটি নতুন জগত আবাদ করতে চেয়েছিল। তারা তাদের পৈতৃক অঞ্চলে যা কিছু ধ্বংস হতে দেখেছিল, তার জন্য কান্নাকাটি করে বাকি জীবন নষ্ট করতে চায়নি বরং তারা এর বিকল্প গড়ে তোলার এক প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত ছিল। তাদের মধ্যে সেই আবেগের প্রতিফলন দেখা যেত যা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছিল, যারা ঘরবাড়ি বিসর্জন দেওয়ার পর ইসলামের জন্য জান কুরবানি দিতেও সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। সংক্ষেপে, এই মুহাজিররা ইসলামের তাবলিগ, তাওহিদের প্রচার, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর হেফাজত এবং আল্লাহর মাখলুকের (সৃষ্টির) সেবাকে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন।

অন্যদিকে হিন্দুস্তানে আগে থেকে বসবাসকারী মুসলমানরা আনসারদের স্মৃতি তাজা করেছিলেন এবং মুহাজিরদের পুনর্বাসনে তারা সব ধরনের সহযোগিতা করেছিলেন। এখানকার প্রাচীন শাসক, উমারা এবং নবাবরাও হিজরতের এই ধারাকে, যা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল, সব সময় স্বাগত জানিয়েছেন এবং মুহাজিরদের জন্য নিজেদের দরজা বন্ধ করার কথা কখনো কল্পনাও করেননি।

এই সম্মিলিত মহৎ প্রচেষ্টার ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল এবং উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইসলাম এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যেমন মুষলধারে বৃষ্টির পর সুপেয় পানি নদী-নালায় প্রবাহিত হয়। বিশেষ করে পাঞ্জাব, সিন্ধু, দিল্লির আশপাশ, দোয়াব এবং বাংলায় ইসলাম প্রচারের গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। এভাবেই হিজরতকারী ও সাহায্যকারীদের (আনসার) সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে সেই মুসলিম সমাজ অস্তিত্ব লাভ করেছিল যা গুণগত ও সংখ্যাগত দিক থেকে এক অনন্য বসন্ত দেখিয়ে আজও বিশ্বকে বিস্ময়াভিভূত করে রেখেছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এই বাগানের সেই প্রথম সারির সেবকদের কথা উল্লেখ করছি যাদের সম্পর্ক ছিল ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ যুগের সাথে।

ইমাম হাসান সাগানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

৫৭৭ হিজরি থেকে ৬৫০ হিজরি

(১১৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫২ খ্রিস্টাব্দ)

ইমাম হাসান সাগানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন উপমহাদেশের সেই উজ্জ্বল রত্ন, যাঁর ইলমি খিদমতের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল। ইলমে হাদিস, হানাফি ফিকহ এবং আরবি অভিধানের ক্ষেত্রে তাঁকে একজন হুজ্জাত (প্রমাণ) হিসেবে গণ্য করা হতো। [১]

ইমাম হাসান সাগানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পরিবার মধ্য এশিয়া থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এখানে ৫৭৭ হিজরিতে (১১৮১ খ্রিস্টাব্দ) ইমাম হাসান সাগানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ বিন হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। ইমাম হাসান সাগানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাথমিক জ্ঞান তাঁর কাছ থেকেই অর্জন করেন। শৈশবের বেশ কিছু বছর তিনি গজনীতেও অতিবাহিত করেন এবং স্থানীয় আলেমদের কাছ থেকে উপকৃত হন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে কাজী সাদউদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি, খালাফ বিন মুহাম্মদ হাসান আবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং নিজাম মুহাম্মদ বিন হাসান মারগিনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

যৌবনেই তিনি এতোটা জ্ঞান ও মর্যাদা অর্জন করেছিলেন যে, সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক তাঁকে লাহোরের কাজী বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ওজর পেশ করেন এবং আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। গজনী, ইরাক, ইয়েমেন এবং হিজাজের বহু আলেম ও মুহাদ্দিসের কাছ থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। মক্কায় শেখ নাসর ইবনুল হুসরি, ইয়েমেনে কাজী ইব্রাহিম বিন আহমদ কুরাইজি এবং বাগদাদে ইমাম সাঈদ বিন মুহাম্মদ ইবনুর রাজ্জাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম তাঁর হাদিসের উস্তাদ ছিলেন। ইলমে হাদিসের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রদের কাছ থেকে আলো গ্রহণ করে তিনি এতোটাই প্রদীপ্ত হয়েছিলেন যে, তাঁকে ইমামে হাদিস ও ফিকহ এবং ইমামে আরাবিয়্যাত (আরবি ভাষার ইমাম) বলা হতে থাকে।

৬১৫ হিজরিতে তিনি বাগদাদে আসেন। বাগদাদে খলিফা নাসির আব্বাসি তাঁকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। ৬১৭ হিজরিতে খলিফা যখন হিন্দুস্তানের সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশকে সালতানাতের সনদ পাঠানোর জন্য একজন দূতের সন্ধান করছিলেন, তখন এই উদ্দেশ্যে তাঁকে নির্বাচিত করেন এবং তাঁর মাধ্যমে সুলতান ইলতুতমিশের কাছে সালতানাতের ফরমান পাঠান। তিনি হিন্দুস্তানে এসে প্রায় সাত বছর এখানেই অবস্থান করেন।

৬২৪ হিজরিতে তিনি হজের সফর করেন এবং ফেরার পথে ইয়েমেন হয়ে পুনরায় বাগদাদে ফিরে যান, যেখানে তখন খলিফা মুস্তানসির আব্বাসি খেলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। প্রায় দশ বছর পর খলিফার হিন্দুস্তানে একটি দূতাবাস পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, ফলে এই...

---

[১] কখনো কখনো লিপিকারগণ তাঁকে “সানআনী” (সোয়াদ, নুন, আইন) লিখে ফেলেন, অথচ সঠিক শব্দটি হলো সাগানী (সোয়াদ, গাইন)। (নুজহাতুল খাওয়াতির: পৃষ্ঠা ৯১)

তাকে রাষ্ট্রদূত বানিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দিলেন। আপনি রহমাতুল্লাহ ৬৩৪ হিজরিতে দিল্লি পৌঁছান। সে সময় সেখানে গৃহযুদ্ধের পর সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা রাজিয়া সুলতানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজিয়া সুলতানের তিন বছরের শাসনকালে আপনি রহমাতুল্লাহ হিন্দুস্তানে অবস্থান করেন। এরপর ৬৩৭ হিজরিতে পুনরায় বাগদাদে ফিরে যান এবং ৬৫০ হিজরিতে (১২৫২ খ্রিষ্টাব্দ) সেখানেই ইন্তেকাল করেন। আপনার রহমাতুল্লাহ অসিয়ত অনুযায়ী আপনার রহমাতুল্লাহ মরদেহ মক্কায় স্থানান্তরিত করা হয়। সুতরাং আপনার রহমাতুল্লাহ কবর সেখানেই অবস্থিত। আপনার রহমাতুল্লাহ অসংখ্য ছাত্র ছিল, যাদের মধ্যে শেখ শরফুদ্দিন আদ-দামইয়াতি, নিজামুদ্দিন মাহমুদ বিন উমর হারবি, শেখ ইবনুল সাব্বাগ এবং শেখ বুরহানুদ্দিন মাহমুদ বালখি রহমাতুল্লাহ প্রসিদ্ধ।

বাগদাদে অবস্থানকালে আপনি রহমাতুল্লাহ দুই হাজারের বেশি সহিহ হাদিস সম্বলিত ‘মাশারিকুল আনওয়ার’ রচনা করেন, যা বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করে। বিশেষ করে হিন্দুস্তানে এটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায় এবং একে ইলমে হাদিসের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হিন্দুস্তানে ইলমে হাদিসের জন্য সর্বপ্রথম এই কিতাবটিই পড়ানো হতো।

আরবি অভিধান শাস্ত্রে আপনি রহমাতুল্লাহ ‘মাজমাউল বাহরাইন’ নামে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন, যা দীর্ঘকাল ধরে ভাষাবিদদের জন্য একটি চমৎকার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। [১]

---

[১] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ১৩ পৃ. ৬৩৬, ত. বাশার; নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ১: ৯১, ৯২; ইমাম সাগানি, আল্লামা আব্দুল হালিম চিশতির প্রবন্ধ।

https://t.me/BoierSomahar

খাজা গরীব নেওয়াজ, মঈনুদ্দিন চিশতী সজরী রহ.

৫৩৭ হি. থেকে ৬২৭ হি. (১১৪২ খ্রি. থেকে ১২২৯ খ্রি.)

চিশত পশ্চিম আফগানিস্তানের হেরাত শহরের একটি পার্শ্ববর্তী জনপদ। এখানকার মাশায়েখদের মধ্যে খাজা আবু মুহাম্মদ চিশতী রহ., খাজা আবু ইউসুফ রহ. এবং খাজা মওদুদ চিশতী রহ.-এর নামগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে যাঁর ফয়েজ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে, তিনি হলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহ., যিনি উপমহাদেশে চিশতিয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে "সুলতানুল হিন্দ" এবং "গরীব নেওয়াজ" উপাধিতেও স্মরণ করা হয়। তিনি ৫৩৭ হিজরিতে (১১৪২ খ্রিস্টাব্দে) সিজিস্তান (দক্ষিণ আফগানিস্তান)-এর একটি জনপদ "সিজ"-এ জন্মগ্রহণ করেন। [১]

তাঁর নাম ছিল হাসান, কিন্তু দ্বীন-ই-মুবীনের খিদমতের কারণে তিনি "মঈনুদ্দিন" (দ্বীনের সাহায্যকারী) নামে পরিচিত হন এবং পরবর্তীতে আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ও দরিদ্র শ্রেণিকে অনেক বেশি ফয়েজ পৌঁছানোর কারণে তাঁকে "গরীব নেওয়াজ" বলা হতে থাকে।

পনেরো বছর বয়সে তিনি এতিম হয়ে যান। বাবার রেখে যাওয়া বাগান ও একটি যাঁতাকল দেখাশোনা করতেন। ইব্রাহিম কান্দুজি রহ. নামক এক বুজুর্গের সাথে সাক্ষাত তাঁর হৃদয়ের অবস্থা বদলে দেয়। তিনি ইলম অর্জনের জন্য সমরকন্দ চলে যান এবং সেখানে কুরআন মাজীদ হিফজ করেন। এরপর আত্মিক সংশোধনের জন্য নিশাপুরে চিশতিয়া সিলসিলার বুজুর্গ খাজা উসমান হারুনী রহ.-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তাজকিয়া ও সুলুকের পূর্ণতা খুব দ্রুতই অর্জিত হয়, কিন্তু পীরের নির্দেশে বিশ বছর তাঁর খিদমতে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে হিন্দুস্তানে ঈমান ও আখলাকের ঝরনাধারা প্রবাহিত করার জন্য মনোনীত করেছিলেন। তাই কিছুকাল পর তিনি সফরে বের হন। তিরে ভরা তূণ, ধনুক, চকমকি (আগুন জ্বালানোর পাথর) এবং লবণের পাত্র সাথে থাকত। তিনি খুব ভালো তিরন্দাজ ছিলেন। যেখানে প্রয়োজন হতো, কোনো পাখি শিকার করে নিতেন এবং তার গোশত আগুনে পুড়িয়ে লবণ লাগিয়ে আহার করতেন। এভাবে সফর করতে করতে বাগদাদ ও তাবরিজ হয়ে ইসফাহানে আসেন। এখানেই হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী রহ. আপনার হাতে বায়াত হন এবং খিলাফতের খিরকা লাভ করেন। (ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেছেন যে, এই খিরকা খাজা বখতিয়ার কাকী রহ. থেকে হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ. এবং তাঁদের থেকে হযরত নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলভী রহ. পর্যন্ত পৌঁছেছে।)

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহ. এরপর হেরাত থেকে "সবজওয়ার" পৌঁছান, যেখানে ইয়াদগার মুহাম্মদ নামক...

---

[১] আজকাল লেখকগণ ভুলবশত এই শব্দটি "সঞ্জর" (সীন-নুন-জীম-রা) লিখে থাকেন। সঠিক শব্দ হলো "সজয" (সীন-জীম-যা) এর সাথে।

একটি রাফেজি প্রধানের শাসন ছিল। সে আহলে সুন্নাত এবং বিশেষ করে আবু বকর, উমর ও উসমান নাম ধারণকারীদের অনেক কষ্ট দিত। সে শহরের বাইরে একটি সুন্দর বাগান তৈরি করেছিল যাতে পরিষ্কার ও মিষ্টি পানির একটি পাকা হাউজও ছিল। হযরত খাজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় সফরের ধুলোবালি ঝাড়তে হাউজের কিনারে চলে গেলেন এবং গোসল করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। বাগানের পাহারাদারদের সাহস হলো না যে এই নূরানি চেহারার ব্যক্তিকে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে শাসকও সেখানে চলে এল এবং নিজের চাকরদের ধমক দিয়ে বলতে লাগল: "তোমরা এই ফকিরকে এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে কেন বের করে দিলে না?"

ইতিমধ্যে হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সালাত থেকে ফারেগ হলেন এবং ওই শাসকের ওপর এক রাগান্বিত দৃষ্টি দিলেন যার প্রভাবে শাসক কাঁপতে লাগল এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। হযরত বিসমিল্লাহ পড়ে পানির ছিটা তার মুখে মারলে তার জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফেরার সাথে সাথেই সে হযরতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। হযরত খাজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত মমতার সাথে তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবি অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধিতার কারণ কী?"

এরপর খুলাফায়ে রাশেদিন এবং আসহাবে রাসূলের ফজিলত এমন প্রভাবশালী ঢঙে বর্ণনা করলেন যে শাসক কায়েল হয়ে গেল। সে রাফেজি মতবাদ এবং জুলুমমূলক কাজ থেকে তওবা করল এবং বায়আত হয়ে বলতে লাগল: "আমার সমস্ত ধন-সম্পদ হযরতের খেদমতে নজরানা দিতে চাই।" হযরত গরীব নেওয়াজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "এইসব তো তুমি মানুষের ওপর জুলুম করে নিয়েছ, তাদের মধ্যেই বণ্টন করে দাও।" ফলে সে সবকিছু মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিল এবং বাকি জীবন ইবাদত-রিয়াজত ও মাখলুকের সেবায় কাটিয়ে দিল।

আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এরপর বলখ ও গজনি হয়ে পাঞ্জাবে চলে এলেন। লাহোরে সৈয়দ আলী হুজভেরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজারে চিল্লাকাশি করলেন। এরপর মুলতানে অবস্থান করলেন এবং ওই অঞ্চলের ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলেন।

এরপর আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আজমিরে তাশরিফ আনলেন যেখানে ওই সময়ে পৃথ্বীরাজ চৌহানের শাসন ছিল। [১] হযরত খাজা রহমাতুল্লাহি আলাইহির আগমনে এখানকার মুসলিম সংখ্যালঘু এক আধ্যাত্মিক নেতা খুঁজে পেল যার ফলে তারা নিশ্চিতভাবে বড় শক্তি লাভ করল। হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির হৃদয়স্পর্শী চরিত্র এবং উন্নত আখলাকের কারণে অমুসলিম জনগণও আপনাকে সম্মান করত এবং অনেক অমুসলিম ইসলামে দাখিল হচ্ছিল। যেমন যেমন আপনার চারপাশে মানুষের ভিড় বাড়ছিল, পৃথ্বীরাজ এবং তার অনুসারীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পৃথ্বীরাজের মতো ইসলাম বিরোধী শাসকের রাজধানীতে একজন মুসলিম মুবাল্লিগের জন্য কাজ করা ছিল জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার মতো বিষয়, কিন্তু হযরত খাজা রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে আল্লাহর সাহায্য ও হেফাজত ছিল, তাই আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন। আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রভাব, জনপ্রিয়তা এবং মহত্ত্বের কারণে পৃথ্বীরাজের কর্মচারীদের কখনো আপনার ওপর সরাসরি হাত তোলার সাহস হয়নি।

---

[১] এই বিখ্যাত রাজপুত শাসকের শাসনকাল ছিল ৫৭৪ হিজরি থেকে ৫৮৮ হিজরি (১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত। তাই হযরত খাজার আজমিরে আগমনের সময়কাল আমরা ৫৮০ হিজরি (১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) এর কাছাকাছি ধরতে পারি। আজমিরে মুসলমানদের বসতি সুলতান মাহমুদ গজনভির যুগে শুরু হয়েছিল, ফলে সালার মাসউদ গাজী ৪০৫ হিজরিতে আজমিরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে পুনরায় রাজপুতরা শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু না কিছু মুসলিম বসতি এখানে অবশ্যই ছিল।

এটি সেই সময় ছিল যখন সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরি হিন্দুস্তানে জিহাদি অভিযানের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহ.-এর দোয়া এই মুজাহিদ ব্যক্তির সাথে ছিল। যখন তরাউরির প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানের হাতে শিহাবুদ্দিন ঘুরি পরাজিত হলেন, তখন খাজা গরীব নেওয়াজ রহ. অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

এদিকে পৃথ্বীরাজের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের ধারা তীব্র হয়ে উঠল। পৃথ্বীরাজের দরবারীদের মধ্যে একজন মুসলমানও ছিলেন। (সম্ভবত তিনি কোনো স্থানীয় হিন্দু কর্মকর্তা ছিলেন যিনি হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ রহ.-এর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।) পৃথ্বীরাজ দরগাহ গরীব নেওয়াজ রহ.-এর সাথে তার এই সম্পর্ক সহ্য করতে পারলেন না এবং তাকে কষ্ট দিতে শুরু করলেন।

হযরত খাজা রহ. বিষয়টি জানতে পেরে পৃথ্বীরাজের কাছে বার্তা পাঠালেন এবং সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত অহংকারী ভঙ্গিতে আপনার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করল এবং অবমাননাকর শব্দও উচ্চারণ করল। খাজা গরীব নেওয়াজ রহ. যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন আপনার রহ. মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল: “আমরা পৃথ্বীরাজকে জীবিত গ্রেপ্তার করেছি এবং লশকরে ইসলামের হাতে সোপর্দ করেছি।”

ইলহামি শব্দের ওপর ভিত্তি করে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো। পরের বছর শিহাবুদ্দিন ঘুরি যখন পুনরায় আক্রমণ করলেন, তখন এই অভিযানে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহ. সাথে ছিলেন। [১]

আল্লাহ মুসলমানদের ফাতহে মুবিন (সুস্পষ্ট বিজয়) দান করলেন। পৃথ্বীরাজ জীবিত গ্রেপ্তার হলো এবং আজমিরসহ মধ্য ভারতের বিশাল এলাকা ইসলামি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হলো। হিন্দুস্তানের নায়েবে সালতানাত কুতুবুদ্দিন আইবেক আজমিরে সৈয়দ হোসেন মাশহাদিকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন, যিনি আজমিরে খাজা গরীব নেওয়াজ রহ.-এর উপস্থিতি সৌভাগ্য মনে করলেন এবং সব দিক থেকে আপনার খিদমত করলেন। হযরত খাজা রহ.-ও সারা জীবনের জন্য এই স্থানকেই নিজের কেন্দ্র বানিয়ে নিলেন।

হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ রহ.-এর বরকতময় সত্তা থেকে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়েছেন। মূর্তিপূজারীদের এক বিশাল অংশ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে এবং অগণিত মুসলমান তাজকিয়ায়ে নফস এবং ইসলাহে বাতেনের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছেন। আপনার রহ. কারামত ও কামালত দেখে প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। [২]

---

[১] কাজী মিনহাজুস সিরাজ একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বরাতে স্বয়ং খাজা সাহেব রহ.-এর জবানিতে এটি উদ্ধৃত করেছেন যে, আমি সুলতান শিহাবুদ্দিনের সাথে লশকরে ছিলাম। “আমি সুলতান গাজীর সাথে সেই লশকরে ছিলাম, সেই সময় ইসলামি লশকরে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার।” (তবকাতে নাসিরি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০০)। বদায়ুনীও এটিই উদ্ধৃত করেছেন। (মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ: পৃষ্ঠা ৪৪)। এই বিষয়টি কিছুটা অস্পষ্ট যে, খাজা সাহেব রহ. যখন আজমিরে ছিলেন, তখন পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অভিযানে মুসলমানদের সাথে কোথায় শরিক হলেন? হতে পারে এই আক্রমণের কিছুকাল আগে হযরত খাজা রহ. জিহাদে অংশগ্রহণের নিয়তে লাহোর বা মুলতানের দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে লশকরে শামিল হয়েছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

[২] কিছু লোক বলেন যে, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ। এটি সঠিক নয়। আটশ বছর আগে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের মোট সংখ্যাও এত ছিল না। যদি আমরা ধরে নিই যে হযরত খাজার ইন্তেকালের সময় (৬২৭ হিজরি) হিন্দুস্তানের মোট মুসলমান ছিল ৯০ লক্ষ এবং শুধুমাত্র এই ৯০ লক্ষ মানুষের বংশধর অত্যন্ত কম জন্মহারের সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবুও সেই হিসাবে ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের সংখ্যা কমপক্ষে একুশ (২১) কোটি হওয়া আবশ্যক ছিল, অথচ সবাই জানেন যে সেই সময় হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ কোটি।

আপনার (রহ.) ফয়েজের এত ব্যাপক হওয়া মানুষকে অবাক করে দেয়, কারণ আপনি হিন্দুস্তানে এসে আজমীরেই অবস্থান করেন এবং মাত্র দুইবার নিজের খলিফা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর সাথে দেখা করতে দিল্লি গিয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, উত্তর ভারতে আপনার (রহ.) ফয়েজ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মাধ্যমেই ছড়িয়েছে, যিনি আপনার (রহ.) জীবদ্দশাতেই দিল্লিতে মারিফতের দোকান খুলেছিলেন।

হযরত খাজা সাহেব (রহ.) সারা জীবন অবিবাহিত অবস্থায় কাটিয়েছিলেন, কিন্তু আশি বছর বয়স হওয়ার পর দুটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ তখন করেন যখন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জিয়ারত লাভ হয় এবং নির্দেশ হয় যে, আমার সুন্নত বিবাহকেও অনুসরণ করো। সেই দিনগুলোতে খাত্তাব নামক এক দুর্গাধিপতি জিহাদে কোনো এক রাজার মেয়েকে বন্দি করে আপনার খেদমতে নিয়ে আসে। তিনি মুসলমান হন এবং আপনি (রহ.) তাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে আপনার সাহেবজাদা হুসামুদ্দিন এবং কন্যা বিবি জামাল জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বিবাহ এভাবে হয় যে, আজমীরের দারোগা চাচা সৈয়দ ওয়াজিহুদ্দিন মাশহাদি স্বপ্নে ইমাম জাফর সাদিক (রহ.)-এর জিয়ারত লাভ করেন, যিনি নির্দেশ দেন যে নিজের সাহেবজাদীর বিবাহ খাজা হযরত (রহ.)-এর সাথে করিয়ে দাও। ফলে তিনি এই নির্দেশ পালন করেন এবং এই বিবাহ থেকে দুই পুত্র সন্তান: শেখ আবু সাঈদ এবং শেখ ফখরুদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন।

আপনি (রহ.) ফারসি ভাষার একজন ভালো কবি ছিলেন কিন্তু আপনার কবিতা খুব কম সংরক্ষিত রয়েছে। আপনার (রহ.) দিকে একটি বিখ্যাত কবিতা সম্পর্কিত করা হয় যা লাহোরে সৈয়দ আলী হুজুইরী (রহ.)-এর মাজারে উপস্থিতির সময় পাঠ করেছিলেন:
গঞ্জ বখশ ফয়েজে আলম মাজহারে নূরে খোদা..... নাকেসারা পীরে কামেল কামেলারা রাহনুমা

আপনি (রহ.) প্রায় ৯৭ বছর বয়স পেয়েছিলেন। ৬ রজব ৬৩৩ হিজরি (১২২৯ খ্রি.) আজমীরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই দাফন করা হয়। প্রায় দুইশ বছর পর মান্ডুর খিলজি বাদশাহ কবরের ওপর মাজার নির্মাণ করেন। এরপর জালালুদ্দিন আকবর এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। শাহজাহান মসজিদটিকে সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে সাজান এবং মাজারের ওপর এক বিশাল গম্বুজ নির্মাণ করান। আপনার (রহ.) কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী নিচে পেশ করা হলো:

- আল্লাহর মারিফতের আলামত হলো মানুষ সৃষ্টিজগত থেকে দূরে পলায়ন করবে।
- দুর্ভাগ্যের আলামত হলো মানুষ গুনাহে লিপ্ত থাকবে অথচ নিজেকে মকবুল (গৃহীত) মনে করবে।
- নেককার লোকদের সাহচর্য নেক কাজ করার চেয়ে উত্তম। মন্দ লোকদের সাহচর্য মন্দ কাজ করার চেয়েও খারাপ।
- আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসার আলামত হলো এই ভয় থাকা যে, তিনি যেন তোমাকে তাঁর বন্ধুত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন না করে দেন।
- কোনো গুনাহ তোমাকে ততটা ক্ষতি করবে না যতটা একজন মুসলমানকে অপমান করা করবে।
- দরবেশদের কাছে বসা একটি মূল্যবান সম্পদ। দরবেশদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করা অত্যন্ত মন্দ বিষয় এবং তা কোনো না কোনো ব্যাধি (রোগ) থেকে মুক্ত নয়। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৭৮; নুযহাতুল খাওয়াতির খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯১; আব-ই-কাউসার, মুহাম্মদ ইকরাম, পৃষ্ঠা ২০২-২০৬; তাযকিরা-এ-আউলিয়া-এ-হিন্দ ও পাকিস্তান, মুফতি ওয়ালী হাসান টোঙ্কি, পৃষ্ঠা ৯১; তারিখ-ই-মাশায়েখ-ই-চিস্ত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভি, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৭২।

মনে রাখা দরকার যে, হযরত খাজা সাহেবের ইন্তেকালের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ৬২৭ হিজরি, ৬৩২ হিজরি এবং ৬৩৩ হিজরি-এর উক্তিগুলো প্রসিদ্ধ। লেখক ঐতিহাসিক ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভীর গবেষণা অনুযায়ী ৬২৭ হিজরি গ্রহণ করেছেন।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ.

৫৬৫ হিজরি থেকে ৬৬১ হিজরি

(১১৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৬২ খ্রিস্টাব্দ)

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ. হিন্দুস্তানে সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বংশগতভাবে কুরাইশ ছিলেন। তাঁর দাদা হিজাজ থেকে খোয়ারিজম এবং সেখান থেকে মুলতানের নিকটবর্তী শহর কোট করোড়ে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এখানে ৫৬৫ হিজরিতে (১১৭০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর জন্ম হয়। যুবক হওয়ার পর তিনি দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য বেশ কয়েক বছর খোরাসানে অতিবাহিত করেন। এরপর মদিনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন এবং পাঁচ বছর মসজিদে নববীতে অবস্থান করে শেখ কামাল উদ্দিন ইয়ামানি রহ.-এর নিকট থেকে হাদিসের সনদ লাভ করেন। পরিশেষে বাগদাদে এসে হযরত শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর নিকট বায়াত হন এবং মাত্র সতেরো দিন পর বায়াতের অনুমতি (মাজায) লাভ করেন। শেখ সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর অন্যান্য মুরিদগণ অভিযোগ করলেন যে, “আমরা বছরের পর বছর সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও এই দৌলত পেলাম না, আর এই আগন্তুক কয়েক দিনেই মাজায হয়ে গেলেন।” শেখ রহ. বললেন: “তোমরা ভেজা কাঠ নিয়ে এসেছিলে। জাকারিয়া শুকনো কাঠ এনেছিল যা তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠেছে।”

শেখ সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর নির্দেশে তিনি নিজ দেশ মুলতানে ফিরে আসেন এবং এখানে দ্বীন প্রচার শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অসংখ্য মুসলমানের সংশোধন হয় এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হন।

তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি কেবল ওয়াজ ও নসিহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি বরং ব্যাপক পরিসরে জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রচলন করেন। তিনি তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে কৃষি ও বাণিজ্যে মানুষকে সাহায্য করেন। বন জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি জমি তৈরি করেন। কুয়ো খনন করান এবং খাল খনন করান। বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর রহ.-এর সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতা ছিল, যিনি মুলতান থেকে কিছুটা দূরে পাকপত্তনে অবস্থান করতেন। উভয় বুজুর্গের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ধারা অব্যাহত ছিল।

দেশের রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে তিনি মুলতানের বড় বড় আমিরদের চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন। যখন ৬৫৫ হিজরিতে (১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ) তাতারীরা মুলতান অবরোধ করে, তখন শেখ এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে তাদের কাছে যান এবং তাদের এই অর্থ দিয়ে শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

কুতুবুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর যখন সুলতান ইলতুতমিশ দিল্লির সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন পাঞ্জাবের সুবাদার নাসিরুদ্দিন কুবাচা বিদ্রোহ করেন। শেখ বাহাউদ্দিন এবং মুলতানের কাজি শেখ শরফুদ্দিন যখন জানতে পারলেন, তখন তারা উভয়ই একটি...

একটি চিঠি লিখে ইলতুৎমিশকে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাঠানো হলো কিন্তু উভয়ের চিঠিই ধরা পড়ে গেল। কাবাচা প্রথমে কাজী শরফুদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে হত্যা করালেন। এরপর শেখকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। শেখ পরিষ্কারভাবে বললেন: "হ্যাঁ, এই চিঠি আমি লিখেছি এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী লিখেছি। তোমাদের কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না।"

কাবাচা-র ওপর শেখের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর স্পষ্টবাদিতার এমন প্রভাব পড়ল যে, তাঁকে কোনো ক্ষতি না করেই সসম্মানে মুক্তি দিলেন। তবে তিনি বিদ্রোহের সংকল্প ত্যাগ করেননি এবং ইলতুৎমিশের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেলেন। কয়েকটি যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হলেন এবং সিন্ধু নদে ডুবে মারা গেলেন।

আপনি (রহ.)-এর ইন্তেকাল ৬৬১ হিজরি (১২৬২ খ্রি.)-তে হয়েছিল। মাজার মুলতানে অবস্থিত এবং এটি এখানকার অন্যতম প্রসিদ্ধ জিয়ারতগাহ। আপনি (রহ.)-এর সিলসিলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নামকরা ব্যক্তিত্বদের মধ্যে আপনি (রহ.)-এর পুত্র শেখ সদরুদ্দিন আরিফ (রহ.), পৌত্র শাহ রুকনে আলম (রহ.), সিন্ধুর লাল শাহবাজ কালান্দার (রহ.) এবং উচ-এর সৈয়দ জালালুদ্দিন বুখারি (রহ.) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। [১]

শেখ সদরুদ্দিন আরিফ (রহ.)

শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর সাহেবজাদা শেখ সদরুদ্দিন আরিফ (রহ.) তাঁর মসনদে আসীন হন। আপনি (রহ.)-এর গণনা আপন সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেম ও আউলিয়াদের মধ্যে করা হয়। জন্ম মুলতানে হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক তরবিয়ত আপন সম্মানিত পিতা হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (রহ.)-এর নিকট থেকে লাভ করেন। কুরআন, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শেখ সদরুদ্দিন আরিফ (রহ.)-কে হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (রহ.) তাঁর জীবদ্দশাতেই নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন। [২] ফলে তাঁর ইন্তেকালের পর আপনি (রহ.) তাঁর মসনদ সামলান এবং সোহরাওয়ার্দীয়া সিলসিলার নেতৃত্ব দেন। আপনি (রহ.) জুহদ ও তাকওয়া এবং সরলতার দৃষ্টান্ত ছিলেন। নিজের মুরিদদের হালাল রিজিক উপার্জন এবং সততার সাথে জীবন অতিবাহিত করার উপদেশ দিতেন। আপনি দিল্লি সালতানাতের কাজিউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি)-ও ছিলেন। আপনি (রহ.) ৬৮৪ হিজরি (১২৮৫ খ্রি.)-তে ইন্তেকাল করেন। সমাধি হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি (রহ.)-এর মাজারের পাশেই অবস্থিত। আপনি (রহ.)-এর সিলসিলা আপনার পুত্র শাহ রুকনুদ্দিন (রুকনে আলম) (রহ.) এগিয়ে নিয়ে যান। [৩]

---

[১] আখবারুল আখইয়ার: পৃ. ৫৯ থেকে ৬৩; নাফাহাতুল উনস: পৃ. ৫৩৫ থেকে ৫৩৬; তারিখ-ই-ফেরেশতা বোম্বে সংস্করণ: খণ্ড ২, পৃ. ৫৮ থেকে ৬৯; তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ ও পাকিস্তান, মুফতি ওয়ালি হাসান টোংকি: পৃ. ৬৩ থেকে ৭০; আব-ই-কাওসার: পৃ. ২৫৫ থেকে ২৫৮।

[২] শেখ মুহাম্মদ ইকরাম লিখেছেন: "সম্ভবত হিন্দুস্তানে বংশানুক্রমিক সাজ্জাদানশীন হওয়ার এটিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যা পরবর্তীতে উচ-এর কাদেরি পীরগণও অনুসরণ করেছেন।" (আব-ই-কাওসার: পৃ. ২৬২)

[৩] তারিখ-ই-ফেরেশতা বোম্বে সংস্করণ: খণ্ড ২, পৃ. ৬৯ থেকে ৭৭; আখবারুল আখইয়ার, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি থেকে, আল্লামা সুবহান মাহমুদের উর্দু অনুবাদ: পৃ. ১৩৩, ১৩৪, প্রকাশক: আকবর বুক সেলার্স, লাহোর।

কাজী মুহাম্মদ বিন আতা, হামিদুদ্দীন নাগোরী রহ.

৫২৩ হিজরী থেকে ৬৪৩ হিজরী

১১২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ

কাজী মুহাম্মদ বিন আতা রহ. যিনি হামিদুদ্দীন নাগোরী নামে প্রসিদ্ধ, মধ্য এশিয়ার বুখারা শহরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা কাজী আতাউল্লাহ মাহমুদ রহ. বুখারার রাজকীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজী হামিদুদ্দীন রহ. দ্বীনি ইলম অর্জন শেষ করার পর কিছুকাল দরস ও তাদরীসে (শিক্ষাদান) নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁর যৌবনের কিছু সময় 'উশ'-এ অতিবাহিত করেন, যেখানে তাঁর নিকট থেকে উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শেখ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ.-ও ছিলেন, যিনি তাঁর কাছে পনেরো পারা পড়েছিলেন।

কিছুকাল পর মা'রিফাতে ইলাহিয়ার সন্ধানে তিনি বাগদাদের পথ ধরেন এবং সেখানে হযরত শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করে সুলুক ও ইহসানের পথ অতিক্রম করেন এবং খিরকা-এ-খিলাফত লাভ করেন। এক বছর তিনি শেখ সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর খিদমতে অবস্থান করেন। তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে হিজাজে মুকাদ্দাস গমন করেন। এক বছর মক্কায় এবং কিছুকাল মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন।

কিছুকাল পর তিনি হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে সফর করেন এবং এখানে এসে নাগোরের কাজী নিযুক্ত হন। শেখ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ. থেকে তিনি আরও আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভ করেন। তিনি রহ. তাসাউফ ও ইসলামী উলুমের ওপর বেশ কিছু কিতাবও রচনা করেন।

তিনি ৬৪৩ হিজরীর (১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) রমজান মাসে দিল্লিতে তারাবীহ ও বিতর সালাত আদায় করার পর সিজদাহরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ.-এর মাজারের পাদদেশে দাফন করা হয়। [১]

---

[১] আখবারুল আখইয়ার: পৃ. ৮৯ থেকে ১০৫; নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ১, পৃ. ১২২; তারিখ-এ-সোহরাওয়ার্দিয়া, প্রফেসর মুহাম্মদ সাঈদ: পৃ. ৬৮ থেকে ৭৪, ১৪০ থেকে ১৪২।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কিছু লোক কাজী হামিদুদ্দীনের জন্ম ৬৪৩ হিজরী লিখেছেন। এটি কোনো লিপিকারের ভুল ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা একে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছে, ফলে হযরত নাগোরীর বয়স "১৮০" বছর হয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ ভুল। কেউ কেউ তাঁর জন্ম ৫১৫ হিজরী লিখেছেন, কিন্তু এটিও সন্দেহজনক। কারণ হযরত শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর জন্ম ৫৩৯ হিজরীতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় হয়তো কাজী নাগোরী রহ.-কে শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর মুরুব্বীদের মধ্যে গণ্য করতে হবে অথবা এটি মেনে নিতে হবে যে কাজী হামিদুদ্দীন বার্ধক্যে বায়আত হয়েছিলেন এবং সেই সময় শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহ. যুবক ছিলেন, কিন্তু উভয় অবস্থাই ভুল। মোদ্দাকথা, কাজী হামিদুদ্দীনের প্রসিদ্ধ জন্ম তারিখ সঠিক নয়।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার ওশি কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি

৫৫৫ হিজরি থেকে ৬৩৩ হিজরি

(১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার ওশি রহমাতুল্লাহ আলাইহি-এর জন্ম তুর্কিস্তানের (বর্তমান উজবেকিস্তান) "ওশ" শহরে হয়েছিল, এজন্য আপনাকে "ওশি"-ও বলা হয়। [১]

আপনার নাম ছিল বখতিয়ার এবং উপাধি কুতুবুদ্দিন। কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরি আপনার শৈশবের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনি পনেরো পারা আপনার পিতার কাছে এবং বাকি পনেরো পারা কাজী সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি-এর কাছে পড়েছিলেন।

আপনি প্রতিদিন একশ নফল নামাজ পড়তেন। জিকির এত একাগ্রতার সাথে করতেন যে, সেই সময়ে কারো আসা-যাওয়ার কোনো খবর থাকত না। প্রতি রাতে তিন হাজার বার দরুদ শরীফ পড়ারও অভ্যাস ছিল। কোনো ওজরের কারণে তিন দিন বিরতি হয়ে গেলে আপনার এক খাদেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিয়ারত লাভ করেন। তিনি (সা.) বললেন: "বখতিয়ারকে জিজ্ঞেস করো যে, শেষ পর্যন্ত এই উদাসীনতা কেন?"

তিনি আপনাকে এই স্বপ্ন শোনালে আপনার এক অদ্ভুত অবস্থা হলো। এরপর থেকে আর কখনো এই অভ্যাসে বিরতি হয়নি।

আপনি আপনার ঘরে ময়দার এক বিশেষ ধরণের রুটি (টিকিয়া) তৈরি করিয়ে মুরিদগণ, মেহমান এবং অভাবীদের দিতেন যাকে "কাক" বলা হতো। এজন্য আপনাকে "কাকি" বলা হতে থাকে। [২]

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ইসফাহানে ছিলেন, তখন খাজা কুতুবুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে মুরিদ হন এবং শিক্ষা ও দীক্ষা সমাপ্তির পর খিরকা-এ-খিলাফত লাভ করেন। সেই সময় আপনার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। বলা হয় যে, আপনি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি-এর সর্বপ্রথম খলিফা ছিলেন।

দীর্ঘ সময় পর আপনি আপনার মুরশিদের সাথে দেখা করতে হিন্দুস্তানে রওনা হলেন। এটি সেই সময় ছিল যখন মধ্য এশিয়া এবং খোরাসান...

---

[১] নেয়ামত উল্লাহ হারভীর মতে আপনার বংশীয় সম্পর্ক আফগান গোত্র "সারবানি"-এর সাথে ছিল। (তারিখ-ই-খান জাহানি ওয়া মাখজান-ই-আফগানি: পৃ. ৭০৭, ৭১১) পক্ষান্তরে বজমে সুফিয়ার লেখক সিয়ারুল আকতাব এবং খাজিনাতুল আসফিয়ার বরাতে আপনার বংশধারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে মিলিয়েছেন।

[২] "কাক" বা "কাক" এক বিশেষ ধরণের শুকনো রুটি (টিকিয়া) ছিল যা ময়দা, ঘি এবং চিনি দিয়ে তৈরি করা হতো। একেই পাঞ্জাবিতে "গোগি" বলা হয়। আরবদের মধ্যে একে "কা'ক" বলা হতো। (ইংরেজি শব্দ "কেক" এবং "কুকি"-ও এরই সমার্থক।) আজকালও আরবিতে বিস্কুটকে কা'ক বলা হয়।

মঙ্গোলদের আক্রমণ হয়ে গিয়েছিল। আপনি (রহ.) মুলতানে খাজা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি (রহ.)-এর জিয়ারত করেন। সেই সময়ে সেখানে নাসিরুদ্দিন কাবাচার শাসন ছিল। তিনি আপনার (রহ.) অনেক সম্মান করেন। কিছু দিন পর মুলতানও মঙ্গোলদের বিপদের মুখে পড়ে যায়। আপনি (রহ.) মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে কাবাচার বিজয় ও সাহায্যের জন্য দোয়া করেন এবং একটি তীরের ওপর দম করে তাকে মঙ্গোলদের ওপর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। কাবাচা নির্দেশ অনুযায়ী প্রাচীরের ওপর উঠে শত্রুদের ওপর তীর নিক্ষেপ করেন। এর ফলে মঙ্গোলদের ওপর এমন ভয় ও আতঙ্ক ছেয়ে যায় যে তারা মুলতানের অবরোধ ছেড়ে চলে যায়।

এরপর আপনি (রহ.) দিল্লি পৌঁছান। সেখান থেকে নিজের শায়খ খাজা গরিব নেওয়াজ (রহ.)-এর কাছে আজমির যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু শায়খের নির্দেশে পুনরায় দিল্লি চলে আসেন। আপনি (রহ.) শহরের উপকণ্ঠ ‘কিলুখেরি’-তে অবস্থান পছন্দ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই চারদিকে আপনার (রহ.) কামালাতের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশও আপনার ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত হন। তার নিয়ম ছিল যে তিনি প্রতি সপ্তাহে আপনার (রহ.) খেদমতে উপস্থিত হতেন। ইলতুতমিশের অনুরোধে কিছুকাল পর আপনি (রহ.) দিল্লি শহরে চলে যান এবং সেখানে ‘মসজিদ মালিক ইজ্জুদ্দিন’-এর কাছে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানেই ইলতুতমিশ আপনার (রহ.) হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং সালতানাতের প্রায় সকল আমিরও আপনার (রহ.) অনুসারী হয়ে যান।

আপনার (রহ.) মর্যাদা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে দিল্লির শায়খুল ইসলাম নজমউদ্দিন সুগরা-র মনে অভিযোগ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। সেই দিনগুলোতে খাজা গরিব নেওয়াজ (রহ.) আজমির থেকে দিল্লি আসেন। যেহেতু শায়খ নজমউদ্দিন সুগরা খাজা গরিব নেওয়াজ (রহ.)-এর বন্ধু ছিলেন, তাই খাজা কুতুবউদ্দিন (রহ.)-এর চারপাশে মানুষের ভিড় দেখে তিনি নিজের পুরনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। মুর্শিদ এই অবস্থা দেখে নিজের সৌভাগ্যবান মুরিদকে বললেন: “বাবা বখতিয়ার! তুমি এতই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছ যে আল্লাহর বান্দারা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করেছে।” এই বলে তিনি নির্দেশ দিলেন যে নির্জনতা অবলম্বন করো এবং আমার সাথে আজমির চলো।

খাজা কুতুবউদ্দিন (রহ.) মাথা নত করে তা মেনে নিয়ে শায়খের সাথে রওনা হলেন, কিন্তু মুরিদদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশসহ দিল্লির সকল খানকাহর অনুসারীরা পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। এটি দেখে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রহ.) বললেন: “বাবা বখতিয়ার! তুমি এখানেই থাকো! আমি এত মানুষের মন ভাঙা দেখতে পারি না।”

হযরত খাজা সাহেব (রহ.) মুরিদ ও ভক্তদের এই বিশাল ভিড় থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত সাধারণ ও ফকিরি জীবন যাপন করতেন। কখনো কখনো ঘরে খাবার শেষ হয়ে যেত এবং ধার করে সওদা আনার উপক্রম হতো। আপনার (রহ.) এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মুর্শিদ আপনাকে (রহ.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পাঁচশ দিরহামের বেশি ঋণ নিজের ওপর নিও না। পরে আপনি (রহ.) তা থেকেও বিরত থাকতে শুরু করেন। আপনার (রহ.) কাছে কখনো এত সম্পদ ছিল না যে জাকাত ওয়াজিব হয়। এর পাশাপাশি দানশীলতার অবস্থা এই ছিল যে ঘরে যা কিছু থাকত তা অভাবী, মেহমান ও সালেকিনদের জন্য খরচ করে দিতেন। যদি কিছু না থাকত তবে খাদেমকে বলতেন: “তাদের ঠান্ডা পানি পান করিয়ে দাও।”

একবার ইলতুতমিশের উজির উপস্থিত হয়ে কয়েকটি গ্রামের জায়গিরের প্রস্তাব পেশ করেন যাতে আপনি (রহ.) নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, কিন্তু আপনি...

রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “আমাদের চিশতীয়ার খাজা সাহেবগণ কখনো এ ধরণের জায়গির গ্রহণ করেননি, তবে আমি কীভাবে গ্রহণ করব?”

পূর্বে আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি হাফেজে কুরআন ছিলেন না। বার্ধক্যে এই খেয়াল এল এবং অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু হিফজ করতে পারলেন না। একবার স্বপ্নে হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নসিব হলো। আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি আরজ করলেন: আমার কুরআন মাজিদ হিফজ হচ্ছে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করো।” জাগ্রত হয়ে এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিদিন সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করতে লাগলেন। সাথে সাথে কুরআন মাজিদ হিফজ করার চেষ্টাও শুরু করলেন, তখন সিনা এমনভাবে খুলে গেল যে অল্প সময়ের মধ্যেই হাফেজে কুরআন হয়ে গেলেন। এরপর আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি শেষ জীবন এমনভাবে কাটালেন যে সর্বক্ষণ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতেন এবং প্রতিদিন দুই খতম কুরআন পাক সম্পন্ন করতেন।

আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহি সামা শোনার শখ ছিল। আল্লাহর মারেফাত সম্বলিত কবিতা শুনে আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি ওয়াজদ বা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করত। আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহির সামার মজলিসগুলোতে শরয়ী সীমানা বজায় রেখে হামদ, নাত এবং আরেফানা কালাম শোনানো হতো। একবার আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহির মাহফিলে কাওয়ালরা শেখ আহমদ জামের এই কবিতাটি পাঠ করল:

কুশতেগানে খঞ্জরে তাসলিম রা..... হর যমাঁ আয গায়েব জানে দিগার আস্ত

(আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর রাজি থাকার খঞ্জর দ্বারা যারা নিহত হয়, তারা প্রতি যুগে গায়েব থেকে এক নতুন জীবন লাভ করে।)

এটি শুনে আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহির ওপর এমন অবস্থা তৈরি হলো যে নিজের হুঁশ হারিয়ে ফেললেন। চার দিন পর্যন্ত বেহুঁশ ছিলেন। যখন হুঁশ আসত, এই কবিতাটিই পুনরায় পাঠ করার নির্দেশ দিতেন এবং শুনে আবার ওয়াজদ বা ভাবাবেগে চলে যেতেন। এই অন্তিম অবস্থায় ১৪ই রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরি (১২৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহির ওসিয়ত অনুযায়ী (যা অনেক আগে থেকেই আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখিয়ে রেখেছিলেন) হিন্দুস্তানের বাদশাহ শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ আপনার জানাজার নামাজ পড়ান। আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজার “মেহরাউলি” (নয়াদিল্লি)-তে অবস্থিত। [১]

---

[১] তারিখ ফেরেশতা, বোম্বে সংস্করণ: পৃ. ১৭২ থেকে ২২৫; সিয়ারুল আউলিয়া: পৃ. ৫৪ থেকে ৬২; সিয়ারুল আরেফিন: পৃ. ১০২ থেকে ১১৪; তারিখ মাশায়েখে চিশত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রচিত: পৃ. ১৭১ থেকে ১৭৭; তারিখ দাওয়াত ওয়া আজিমত, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রচিত: পৃ. ৩১ থেকে ৩৬; তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ ও পাকিস্তান, মুফতি ওয়ালি হাসান টোঙ্কি রচিত: পৃ. ৯ থেকে ৫৩।

দ্রষ্টব্য: খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহি আলাইহির জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ৫৮২ হিজরি (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ), আবার অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ৫৬৯ হিজরি (১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তবে ঐতিহাসিক তথ্যগুলো কোনোটিরই সমর্থন করে না। প্রথমত, আপনার খলিফা বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির জন্ম ৫৭১ হিজরি, এটা স্পষ্ট যে খাজা কুতুবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, তাই তাঁর জন্ম বাবা ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহির অন্তত দশ-পনেরো বছর আগে অবশ্যই হবে। এটিও মনে রাখা দরকার যে, খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শায়খ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে বিশ বছর বয়সে খেলাফতের খিরকা তখন লাভ করেছিলেন যখন শায়খ হিন্দুস্তানে আসেননি বরং ইসফাহানে ছিলেন। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমতুল্লাহি আলাইহির হিন্দুস্তানে আগমন ৫৮০ হিজরির কাছাকাছি পৃথ্বীরাজের শাসনামলে হয়েছিল যার সময়কাল ছিল ৫৪৭ হিজরি থেকে ৫৮৭ হিজরি পর্যন্ত। সুতরাং খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমতুল্লাহি আলাইহির ইসফাহানে অবস্থান এর কয়েক বছর আগে ৫৭০ হিজরির আশেপাশে হয়। যখন এটি নিশ্চিত যে খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহি আলাইহি এই অবস্থানের সময় বিশ বছর বয়সে খেলাফত পেয়েছিলেন, তখন তাঁর জন্ম ৫৫৫ হিজরির কাছাকাছি হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহমতুল্লাহি আলাইহি

৫৭১ হিজরি থেকে ৬৬৮ হিজরি

(১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)

বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহমতুল্লাহি আলাইহির আসল নাম ছিল মাসউদ। আপনার দাদা কাজী শুয়াইব রহমতুল্লাহি আলাইহি মঙ্গোলদের আক্রমণের সময় কাবুল থেকে লাহোরে এসেছিলেন। তাঁর ইলম ও ফযিলতের কারণে তিনি মুলতানের শাসকের পক্ষ থেকে মুলতানের নিকটবর্তী খুতওয়াল জনপদের জায়গির লাভ করেন এবং সেখানেই তাঁর বসবাস ছিল। আপনার পিতা কাজী জামাল উদ্দিন সুলাইমানি রহমতুল্লাহি আলাইহিও একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন।

বাবা ফরিদ উদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি ৫৭১ হিজরিতে (১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) খুতওয়াল জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। আপনার বড় ভাইয়ের নাম ছিল আইজ উদ্দিন মুহাম্মদ এবং ছোট ভাইয়ের নাম ছিল নাজিব মুহাম্মদ মুতাওয়াক্কিল। আপনার লালন-পালনে আপনার মহীয়সী মাতার অনেক বড় অবদান ছিল, যিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুজার এবং নেক চরিত্রের অধিকারী এক নারী। তিনি আপনাকে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার অভ্যাস এভাবে করিয়েছিলেন যে, তিনি আপনাকে বলতেন:
“বেটা! যে শিশু ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ার জন্য ওঠে, আল্লাহ তাআলা তাকে চিনির একটি পুড়িয়া (প্যাকেট) দান করেন।”

এরপর আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন তিনি একটি কাগজে চিনি পেঁচিয়ে আপনার শিয়রে রেখে দিতেন। বাবা ফরিদ খুশিমনে নামাজের জন্য জাগ্রত হতেন এবং চিনির পুড়িয়াটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার মনে করে খেতেন। এভাবে শৈশব থেকেই তিনি নামাজের অভ্যস্ত হয়ে যান। যখন তাঁর বয়স বারো বছর হলো, তখন মা ভাবলেন এখন আর চিনি রাখার প্রয়োজন নেই। ফলে এই সিলসিলা বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিন পর খেয়াল হলো যে, শিশুটি একবারও চিনি না পাওয়ার অভিযোগ করেনি। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি এখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে চিনি পাও নাকি পাও না?” বাবা ফরিদ তৎক্ষণাৎ বললেন: “হ্যাঁ, নিয়মিত পাচ্ছি।”

মা এ কথা শুনে অবাক হলেন এবং অনুসন্ধান করলেন যে হয়তো ঘরের অন্য কোনো সদস্য চিনি রেখে দেয়, কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে এমন কিছুই হয়নি। মোদ্দাকথা, এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক যা ভবিষ্যতের এই ওলিকে সেই বয়সেই মেলা শুরু হয়েছিল। সম্ভবত এই কারণেই বাবা ফরিদ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চিনি এবং মিষ্টি জাতীয় জিনিস খুব পছন্দ করতেন।

আপনি বারো বছর বয়সে খুতওয়াল জনপদে কুরআন মাজিদ হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর আরও দ্বীনি শিক্ষার জন্য মুলতানের দিকে যাত্রা করেন, যা সেই সময়ে উলামা, ফুজলা এবং মাশায়েখ ও আউলিয়াদের কেন্দ্র ছিল। এখানে আপনি শহরের মহল্লা সরাই...

হালোয়াই-এ মাওলানা মিনহাজ উদ্দিন তিরমিযী (রহ.)-এর মসজিদে দ্বীনি শিক্ষা শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলো কিতাব পড়ে ফেলেন। মুলতানে অবস্থানকালে হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি (রহ.)-এর জিয়ারতও করতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর নসিহত শুনতেন। একবার হযরত শেখ জাকারিয়া মুলতানি (রহ.) তাঁকে বললেন: "বেটা! দরবেশির কাজ অন্যের দোষ গোপন করা, অন্যের দোষ খোঁজা নয়। দরবেশ সেই যে অন্যের দোষ গোপন করে।"

এই সময়ে হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রহ.) তুর্কিস্তান থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে মুলতান অতিক্রম করছিলেন এবং এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেই দিনগুলোতে বাবা ফরিদ (রহ.) তাঁর হাত ধরেন এবং বায়াত গ্রহণ করেন এবং চাইলেন তাঁর মুরিদ হয়ে তাঁর সাথে দিল্লি চলে যেতে। কিন্তু মুর্শিদ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, আগে ইলম ও ফুনুন (জ্ঞান ও বিদ্যা) শিক্ষা সম্পন্ন করা জরুরি এবং বললেন: "মূর্খ দরবেশ অনেক সময় বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।"

সুতরাং এরপর বাবা ফরিদ (রহ.) দ্বীনি শিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য বেরিয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন ইলমি মজলিস থেকে উপকৃত হন। এই সময়ে কান্দাহার, গজনী, বদখশান এবং বাগদাদ যান। বড় বড় আলেমদের কাছ থেকে প্রচুর ফয়েজ হাসিল করেন এবং সেই সাথে বিভিন্ন মাশায়েখের জিয়ারতও করেন, যাদের মধ্যে শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী, শেখ সাইফ উদ্দিন বাখরাজি, শেখ সাইফ উদ্দিন খাযরাভি এবং শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার নিশাপুরী (রহ.)-এর মতো বুজুর্গানে দ্বীন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অনেক বছর পর আলেম ও ফাজিল হয়ে তিনি তাঁর শেখ হযরত খাজা বখতিয়ার কাকি (রহ.)-এর খেদমতে দিল্লিতে হাজির হলেন। খাজা সাহেব (রহ.) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর নতুন মুরিদকে নসিহত করলেন: "হে ভাই! যতক্ষণ এই পথে মন থেকে চলা না হবে, কদম সোজা পড়বে না। যতক্ষণ চোখ সজল না হবে, ততক্ষণ আল্লাহর নৈকট্যের মাকামে পৌঁছানো যাবে না।"

শেখ তাঁকে জিকির ও ফিকিরের জন্য একটি বিশেষ হুজরা দিয়ে দিলেন। শেখের নির্দেশে তিনি সেই দিনগুলোতে অনবরত ইবাদত করতেন এবং রোজা রাখতেন। একবার তিন দিন একটানা রোজা রাখলেন, এরপর ইফতারের জন্য কেউ রুটি এনে দিল যা কোনো সন্দেহজনক বা হারাম উপার্জনের ছিল। রুটি খেতেই বমি হয়ে গেল।

শেখ এটি দেখে বললেন: এখন আরও তিন দিন রোজা রাখো এবং ইফতারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিকের অপেক্ষা করো। সুতরাং আরও তিন দিন কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত মাগরিব পর্যন্ত ইফতারের জন্য কিছু না পেয়ে তিনি মাটি থেকে কিছু কাঁকর তুলে মুখে দিলেন, আল্লাহর হুকুমে তা চিনি হয়ে গেল। তিনি (রহ.) ভয় পেলেন যে পাছে এটি শয়তানি প্রভাব না হয়। মুর্শিদকে জানালে তিনি খুশি হয়ে বললেন: "যাও! চিনির মতো সর্বদা মিষ্টি থাকো।" এই ঘটনার পর থেকে মানুষ তাঁকে 'শকরগঞ্জ' বলতে শুরু করে।

অত্যধিক ইবাদত ও রিয়াজত, অনবরত জিকির ও ওজিফা এবং খুব কম খাওয়া-দাওয়ার কারণে তিনি (রহ.) খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। সেই দিনগুলোতে তাঁর দাদার পীর অর্থাৎ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আজমিরী (রহ.), হযরত খাজা বখতিয়ার কাকি (রহ.)-এর সাথে দেখা করতে দিল্লি আসেন। হযরত বাবা ফরিদুদ্দিন (রহ.)-কে দেখে তিনি তাঁর যোগ্যতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি চিনে নিলেন এবং...

খাজা কুতুবুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন:

“বাবা বখতিয়ার, তুমি এক অত্যন্ত শক্তিশালী বাজপাখিকে আয়ত্ত করেছ, যে দরবেশদের বংশকে আলোকিত করবে।”

এরপর খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আপনাকে খিলাফতের খিরকা প্রদান করেন এবং খাজা বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও আপনার পবিত্র মস্তকে খিলাফতের দাস্তার পরিয়ে দেন। এই ঘটনার পর দিল্লিতে আপনার খ্যাতি এতটাই বেড়ে যায় যে, আপনার হুজরার বাইরে যিয়ারতের জন্য মানুষের বেশ ভিড় হতে শুরু করে। আপনি এই খ্যাতি পছন্দ করেননি এবং ‘হানসি’ চলে যান। কিছুকাল উচ শরীফেও অবস্থান করেন। তারপর পুনরায় হানসিতে ফিরে আসেন।

খাজা বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওফাতের সময় আপনি হানসিতেই অবস্থান করছিলেন; এই খবর পেয়ে আপনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন। দাফনের তৃতীয় দিনে সেখানে পৌঁছান। মাজার যিয়ারত করেন এবং ফাতিহা পাঠ করেন।

হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকালের পূর্বে আপনাকে নিজের জানশীন নিযুক্ত করে কুর্তা, আসা এবং মুসাল্লাও আপনার নামে করে দিয়েছিলেন এবং নিজের খলিফা কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, এই জিনিসগুলো যেন বাবা ফরিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে অনুযায়ী কাজী নাগোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই সমস্ত জিনিস বাবা ফরিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সোপর্দ করেন। তিন দিন পর আপনি হানসিতে ফিরে যেতে লাগলেন। পীর-ভাইয়েরা বললেন: “মুরশিদ আপনাকে সাজ্জাদানশীন বানিয়ে এখানে বসিয়েছেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?”

তিনি বললেন: “মুরশিদ তো তাঁর ফয়েজ দান করে দিয়েছেন। এখন আমি শহরে থাকি বা প্রান্তরে, তিনি সাথেই আছেন।”

আপনি হানসিতে ফিরে এলেন কিন্তু এখন সবদিক থেকে আপনার নিকট মানুষের আনাগোনা শুরু হলো। আপনি খ্যাতি থেকে দূরে থাকতে চাইতেন, তাই হানসিও ত্যাগ করলেন এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের অজোধন (পাকপত্তন)-এর মতো এক প্রত্যন্ত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

সেই সময়ে দিপালপুর থেকে অজোধন পর্যন্ত বিশাল এলাকা কুফর ও শিরকের আস্তানা হয়ে ছিল। মুসলিম শাসক ও সাধারণ জনগণও বেশ পথভ্রষ্টতার শিকার ছিল। তাই এখানে দ্বীনি মেহনতের কঠোর প্রয়োজন ছিল। আপনি এই স্থানটিকেই পছন্দ করলেন।

আপনি অজোধনে সতলজ নদীর তীরে কয়েকজন সাথীসহ অবস্থান গ্রহণ করলেন। এখানে তিন দিকে ঘন জঙ্গল ছিল, আর সামনে ছিল নদী। এর প্রবাহ দেখে আপনি ইরশাদ করলেন: “সুবহানাল্লাহ! কী চমৎকার পাক পত্তন!”

আপনি এখানেই নিজের বাড়ি ও মসজিদ নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। কিছুদিন পর নিজের ভাই শেখ নজিব মুতাওয়াক্কিল রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন যে, মুহতারামা আম্মাজানকে খোতওয়াল শহর থেকে এখানে নিয়ে আসুন। সে অনুযায়ী তিনি সেখানে গেলেন এবং আম্মাজানকে ঘোড়ায় চড়িয়ে অজোধনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে ঘন জঙ্গল ছিল যেখানে পানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। আম্মাজানের পিপাসা লাগলে শেখ নজিব আম্মাজানকে একটি গাছের নিচে বসিয়ে পানির সন্ধানে গেলেন। পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখেন আম্মাজান নিখোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কোনো হদিস পাওয়া গেল না। তবে দীর্ঘকাল পর তাঁর হাড়গোড় পাওয়া যায়। সম্ভবত কোনো হিংস্র পশু তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল এবং ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছিল।

বাবা ফরিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কঠিন বিয়োগান্তক ঘটনাতেও তাসলিম ও রেজার পথ ত্যাগ করেননি, আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

আপনার বরকতে এই এলাকা ‘পাকপত্তন’ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। আপনি ওয়াজ ও ইরশাদ এবং তালিম ও তাবলিগ...

জীবন অতিবাহিত করেছেন। আপনি (রহ.) কঠোর মুজাহাদা করতেন। তিলাওয়াত, নফল এবং জিকির ও আজকারে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। অনবরত রোজা রাখতেন এবং আল্লাহ আল্লাহ করতেন। আপনার (রহ.) নিয়ম ছিল যে, কিশমিশের কয়েকটি দানা পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন এবং সেই পানি ও কিশমিশের দানা দিয়ে ইফতার করতেন। মাগরিবের নামাজের পর আপনার খেদমতে দুটি পরোটা আনা হতো। আপনি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করতেন এবং বাকিটুকু আপনার সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

কখনো কখনো আপনি (রহ.) একটি কূপের পাড়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোরাকাবায় মগ্ন থাকতেন। এই সময়ে আপনাকে নিথর ও নিশ্চল দেখে কাকেরা শরীরের ওপর এসে বসত এবং ঠোকরও মারত। আপনি (রহ.) তাদের কিছু বলতেন না, বরং আবেগপূর্ণ ভঙ্গিতে এই দোহাটি পড়তেন:

কাগা সব তন খাইয়ো, সো চুন চুন খাইয়ো মাস
দো নয়না মত খাইয়ো, ইনহেঁ পিয়া মিলন কি আস

এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কট্টরপন্থী হিন্দু, যারা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। ডাকাত ও দস্যুদের আধিক্য ছিল। আশেপাশের মুসলমানরাও শুরুতে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু আপনি হিম্মত হারাননি এবং দৃঢ়তার সাথে মানুষকে সঠিক পথে আনতে এবং দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে আপনি প্রজ্ঞা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষকে মুগ্ধ করে ফেললেন। এক সময় এমন এল যে, আপনার দরবারে মধ্যরাত পর্যন্ত ভিড় লেগে থাকত।

আপনার (রহ.) সরলতা, অল্পেতুষ্টি, নিঃস্বার্থপরতা এবং আমির ও শাসকদের প্রতি নির্লিপ্ততা মানুষের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। আপনি (রহ.) সবার সাথে মহব্বত ও ইখলাস, হাসিমুখে এবং সমতার সাথে আচরণ করতেন। খানকাহর লঙ্গরখানা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। গরিব ও মিসকিনদের সাহায্য করা হতো, কেউ এই দরবার থেকে খালি হাতে ফিরত না। আপনার (রহ.) চরিত্র, শিক্ষা ও নসিহতে মুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল, যাদের মধ্যে পাঞ্জাবের প্রায় পঁয়ত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ওটু গোত্র যারা শতদ্রু নদীর উভয় তীরে প্রায় ষাট মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং "গোগেরা"ও তাদের এলাকা ছিল, তারা ইসলামে প্রবেশ করে। একইভাবে সিয়াল রাজপুত যারা মুলতান, সাহিওয়াল এবং ঝাং-এ প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করে, তারা ৬৫৬ হিজরি (১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আপনার হাতে মুসলমান হয়।

বড় বড় শাসকরা আপনার (রহ.) চৌকাঠে হাজির হতেন এবং সোনা-দানা ও জহরত উৎসর্গ করতে চাইতেন, কিন্তু আপনি (রহ.) কখনো দুনিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাননি। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের আমলে আপনার (রহ.) ফয়েজ ও বরকতের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি পাঞ্জাবের এক অভিযানের সময় তার উজির গিয়াসুদ্দিন বলবনকে চারটি গ্রামের জায়গিরনামা এবং নগদ অর্থসহ আপনার (রহ.) খেদমতে পাঠান। বলবন যখন এই জিনিসগুলো পেশ করলেন, তখন আপনি (রহ.) বললেন: "নগদ অর্থ দরবেশদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। জায়গিরনামার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এর প্রত্যাশী আপনারা আরও অনেক পাবেন।"

আপনার (রহ.) একজন পীর ভাই শেখ বদরুদ্দিন গজনভীর সাথে আমিরদের গভীর সম্পর্ক ছিল। এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাকে একটি খানকাহও বানিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় পর সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির ওপর সমকালীন বাদশাহর ক্রোধ আপতিত হয়, যার প্রভাব শেখ বদরুদ্দিন গজনভী এবং তার খানকাহর ওপরও।

জীবনে পেরেশানিতে পড়ে গেল। অবশেষে বাবা ফরিদ রহ.-কে এই অবস্থা লিখে পাঠাল। হযরত উত্তরে লিখলেন:

“এমন পথে চললে অবশ্যই পেরেশানিতে পড়তে হবে। আপনি রহ. কেন বুজুর্গদের রীতির বিরুদ্ধে (সেই আমিরের অনুগ্রহ নিয়ে) খানকাহ তৈরি করালেন? হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার রহ. এবং হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আজমিরী রহ.-এর তো এই পদ্ধতি ছিল না। তাঁদের রীতি ছিল আত্মবিলোপ ও নিভৃতচারিতা।”

শাসক ও ধনীদের থেকে তাঁর এই পর্যায়ের নির্লিপ্ততা ও বিমুখতার প্রভাব ছিল এই যে, যদিও সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভিড় ছিল, কিন্তু জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ এবং ফকিরি ধাঁচের। শেষ জীবনে কখনো কখনো অনাহার ও চরম দারিদ্র্যের অবস্থাও আসত। জীবনের শেষ রমজানে অবস্থা এমন ছিল যে, পুরো মাস মুরিদদের ইফতার ও সাহরির জন্য পেট ভরে খাবার জুটত না।

আপনি রহ. তরিকতের সাথে সাথে শরিয়তের বিধান পালনের ওপর খুব জোর দিতেন। আপনার নিকট নামাজের গুরুত্ব সবকিছুর চেয়ে বেশি ছিল। একবার বললেন: “আঠারো হাজার জগতে রব্বে কুদ্দুস যে দ্বীনি ও দুনিয়াবি নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন, তা মূলত নামাজিরই ফয়েজ।” নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার জন্য সর্বদা হেদায়েত করতেন। বলতেন: “যদি মাত্র দুইজন লোকও হয়, তবে নামাজ জামাতের সাথেই আদায় করা উচিত।”

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত, শ্রবণ এবং অধিক পরিমাণে রোজা রাখার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। মুরিদদেরও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অধিক তেলাওয়াত, কুরআন হিফজ এবং নফল রোজা রাখার শিক্ষা দিতেন। আপনার আমল ছিল প্রতিদিন একটি কুরআন খতম করা। বিশেষ মুরিদদের নিজে তাজবিদের সাথে কুরআন পাক পড়াতেন এবং হিফজও করাতেন। এছাড়া পাঠ্যবইও পড়াতেন। چنانچہ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-কে আপনি রহ. তাজবিদের সাথে ছয় পারা এবং আরও কিছু দরসি কিতাব পড়িয়েছিলেন। খ্যাতি ও রিয়া (প্রদর্শনপ্রিয়তা) থেকে বেঁচে চলতেন এবং আর্থিক লেনদেনে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আপনার রহ. বাণী ও মাআরিফের মধ্যে নফসের সংশোধনের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়। আপনি রহ. বলতেন:

- সুফি সেই ব্যক্তি, যার থেকে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তার সাথে অন্য কিছু মিশে না।
- নিজের দোষ সর্বদা দৃষ্টির সামনে রাখো।
- যদি সম্মান ও উচ্চমর্যাদা চাও, তবে নিঃস্ব ও ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে বসো।
- যখন সম্পদশালী ব্যক্তিদের কাছে বসো, তখন ইসলাম ধর্মকে ভুলে যেও না।
- দুনিয়াবি মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদের চিন্তা কখনো করো না।
- বাতেনকে (অভ্যন্তর) জাহেরের (প্রকাশ্য) চেয়ে উত্তম ও উন্নত রাখো।
- দ্বীনি ইলমের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করো।
- সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া ত্যাগ করে।
- সবচেয়ে বেশি চতুর সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে পারে না।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

- সবচেয়ে বেশি ধনী সেই, যে অল্পে তুষ্ট (কানাআত পছন্দকারী)।
- সবচেয়ে বেশি অভাবী সেই, যে অল্পে তুষ্টি (কানাআত) ত্যাগ করে।
- নিজের কাজ করা উচিত এবং হতাশ লোকদের কথায় প্ররোচিত হয়ে নিজের কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।
- যদি জ্ঞান কেবল আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হতো, তবে পৃথিবীতে কেউ মূর্খ থাকতো না।
- অলসতা ও গাফিলতি থেকে দূরে থাকা উচিত, কারণ আখেরাতের অনুশোচনা গাফেল ও অলসদের জন্যই।
- সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে কেবল খাওয়া এবং পরার চিন্তায় মগ্ন থাকে।
- যদি কথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জন্য হয়, তবেই তা মুখ থেকে বের করা উচিত, অন্যথায় নীরব থাকাই শ্রেয়।
- আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কষ্ট নির্ধারিত হয়, তার ওপর আপত্তি করো না।

আপনি একজন ভালো কবিও ছিলেন। একটি কবিতা পেশ করা হলো:

গিরম কে বে শব নামাজ বিসয়ার কুনি..... দর রোজে দাওয়ায়ে শখসে বিমার কুনি
তা দিল না কুনি যে গুসসা ও কিনা তুহি..... সদ খরমনে গুল বর সারে ইয়াক খার কুনি

(আমি মেনে নিলাম যে তুমি রাতে অনেক নামাজ পড়ো, দিনে অসুস্থ ব্যক্তির সেবাও করো, কিন্তু যতক্ষণ না অন্তরকে রাগ ও ঘৃণা থেকে মুক্ত করবে, ততক্ষণ হাজার হাজার ফুলের তোড়া তুমি একটি কাঁটার ওপর নষ্ট করতে থাকবে।)

৫ মহরম ৬৬৪ হিজরি (১২৬৫ খ্রিস্টাব্দ) আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলেন। নামাজ শেষ করে সেজদায় মাথা রেখে "ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম" জপ করতে করতে প্রকৃত স্রষ্টার সাথে মিলিত হলেন। পাকপত্তনে দাফন সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক কবরের ওপর গম্বুজ ও ইমারত নির্মাণ করে দেন। [১] আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পাঞ্জাবি কবিতা শিখ সম্প্রদায়ও খুব পছন্দ করে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ "গুরু গ্রন্থ"-এ আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা, বোম্বে: পৃষ্ঠা ২৫ থেকে ৩০; সিয়ারুল আউলিয়া: পৃষ্ঠা ৬৫ থেকে ৯৯; সিয়ারুল আরিফিন: পৃষ্ঠা ১১৯ থেকে ১৫৭; তারিখ-ই-মাশায়েখে চিশত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি কর্তৃক: পৃষ্ঠা ১৭৬ থেকে ২১৮; তারিখ-ই-দাওয়াত ও আজিমত, মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী কর্তৃক: পৃষ্ঠা ৩৬ থেকে ৪৫; তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ ও পাকিস্তান, মুফতি ওয়ালি হাসান টোঙ্কি কর্তৃক: পৃষ্ঠা ৯ থেকে ৬২; আব-ই-কাউসার, মুহাম্মদ ইকরাম কর্তৃক: পৃষ্ঠা ২৮৯।

শেখ আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবের কলিয়রী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

৫৯২ হিজরি থেকে ৬৯০ হিজরি

(১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

শেখ আলাউদ্দিন সাবের রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাগ্নে এবং তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন। ৫৯২ হিজরি (১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে মুলতানের নিকটবর্তী খোতওয়াল নামক জনপদে তাঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এরপর তাঁর মা তাঁকে তাঁর মামা হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে নিয়ে যান যাতে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়।

বাবা ফরিদউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাঁর এই সৌভাগ্যবান ভাগ্নের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ শুরু করেন। কিছুকাল পর শেখ আলাউদ্দিনের মা যখন কোনো এক দীর্ঘ সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে এসে বললেন:
“ওর খাওয়া-দাওয়ার খেয়াল রাখবেন। আমি সফর থেকে ফিরে এসে ওর বিয়ে দেব।”

বাবা ফরিদউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তখনই তাঁকে ডেকে বললেন: “বাবা! আজ থেকে তুমি দরবেশদের মাঝে সকাল-সন্ধ্যা খাবার বিতরণ করবে।”
মা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। এদিকে আলাউদ্দিন লঙ্গরখানার খেদমতে নিয়োজিত হলেন এবং সকাল-সন্ধ্যা খাবার বিতরণ করতে লাগলেন। আগে তিনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি দরবেশদের সাথে দস্তরখানে বসে খাবার খেতেন, কিন্তু এখন যেহেতু শেখ শুধু খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং নিজের খাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলেননি, তাই তিনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাইকে খাইয়ে নিজে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তেন অথবা ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

যখন মা সফর থেকে ফিরে এলেন, তখন ছেলেকে অত্যন্ত দুর্বল দেখতে পেলেন। তিনি বাবা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন:
“আমি তো তোমার সামনেই পুরো লঙ্গরখানা ওর জিম্মায় দিয়েছিলাম।”
একথা বলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরজ করলেন:
“আপনি খাবার বিতরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, খাওয়ার নয়।”

বাবা সাহেব একথা শুনে বিস্মিত এবং একই সাথে আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে সাবের উপাধিতে ভূষিত করলেন।
কিছুকাল পর তাঁকে খেলাফত ও অনুমতিও প্রদান করলেন এবং লিখিত হুকুমনামা দিয়ে দোয়াব অঞ্চলের ‘কলিয়র’ এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে চলে গেলেন। সেখানে জিকির ও মোরাকাবার প্রভাব এমন প্রবল হলো যে, সবকিছু ভুলে গিয়ে সারাক্ষণ ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। তাঁর অবস্থান ছিল একটি ডুমুর গাছের নিচে। সেখানেই তিনি জিকির ও মোরাকাবা করতেন। এই...

গাছের ফলের ওপর জীবন অতিবাহিত করতেন। বাবা ফরিদুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি শেখ শামসুদ্দিন তুর্ক রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজও লাভ করতেন এবং খিদমতও করতেন।

একবার হযরত বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহির এক খাদেম তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কলিয়ার শরীফ আসলেন যাতে হযরত আলাউদ্দিন সাবের রহমাতুল্লাহি আলাইহির জিয়ারত করতে পারেন। তিনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হালের প্রাবল্যের কারণে আগন্তুক কারো সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন না। এমন অবস্থায় হযরত শামসুদ্দিন তুর্ক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উচ্চস্বরে সতর্ক করলেন এবং আরজ করলেন:
“আপনার পীর ও মুরশিদের খাদেম এসেছে এবং হযরতের সালাম নিয়ে এসেছে।”

এটি শুনে তিনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক মুহূর্তের জন্য ইস্তিগরাক (ধ্যানমগ্নতা) থেকে ফিরে আসলেন এবং সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: “আমার শেখ কেমন আছেন?” এরপর হযরত শামসুদ্দিন তুর্ক রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাঁর মেহমানদারির তাকিদ দিয়ে বললেন:
“আজ গোলরগুলোতে লবণ দিয়ে দিও।” এটি ছিল যেন মেহমানদারির হক আদায়, এ কথা বলে পুনরায় তাঁর ওপর ওয়াজদ (ভাবাবেশ) তরী হলো।

এরপর সেই খাদেম হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে দিল্লিতে পৌঁছালেন। সেখানে অনেক সম্মান প্রদর্শন করা হলো। হযরত তাঁকে চমৎকার সব খাবার খাওয়ালেন এবং অনেক উপহার দিলেন। যখন সেই খাদেম হযরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে ফিরে আসলেন, তখন হযরত উভয় বুজুর্গের অবস্থা জানতে চাইলেন। খাদেম খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনেক প্রশংসা করলেন এবং মখদুম আলাউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে আরজ করলেন: “তিনি তো কারো সাথে কথাও বলেন না। সেখানে তো কিছুই নেই।”

হযরত জিজ্ঞেস করলেন: “আমাদের ব্যাপারেও কি কিছু বলেছিলেন?” খাদেম বললেন: “কিছুই না।”
বাবা ফরিদুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি পুনরায় বললেন: “অবশ্যই তো কিছু বলে থাকবেন?”
খাদেম আরজ করলেন: “শুধু এটি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমার শেখ কেমন আছেন?”

হযরত বাবা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং বললেন: “আজ তিনি এমন এক মাকামে (স্তরে) আছেন যেখানে কারো কোনো অবকাশ নেই। এটি তাঁরই দৃঢ়তা এবং আমার প্রতি গভীর মহব্বত যে, এমন অবস্থায়ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন এবং স্মরণ করেছেন।”

হযরত মখদুম আলাউদ্দিন সাবেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল কলিয়ার শরীফে (সাহারানপুর জেলা) ১৩ই রবিউল আউয়াল ৬৯০ হিজরি (১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ) সনে হয়। তাঁর মাজারের ওপর মুঘল সম্রাট নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর গম্বুজ নির্মাণ করিয়েছিলেন। [১]

---

[১] (তারিখে মাশায়েখে চিশত, আজ শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি: পৃষ্ঠা ১৮০ থেকে ১৮২; তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ ও পাকিস্তান, আজ মুফতি ওয়ালি হাসান টোংকি: পৃষ্ঠা ৭০, ৭৪)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

শেখ শামসুদ্দিন তুর্ক পানিপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

শেখ শামসুদ্দিন তুর্ক রহমাতুল্লাহি আলাইহি মধ্য এশিয়ার বিজ্ঞ আলেমদের একজন ছিলেন। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের সন্ধানে তিনি হিন্দুস্তানে আসেন। তিনি বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জ-এ-শকর রহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে আসেন এবং তারপর তাঁর নির্দেশে পীরান কলিয়ার শরীফে গিয়ে হযরত শেখ আলাউদ্দিন সাবের রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বায়আত হন। তিনি ২৪ বছর শেখের খিদমত করেন এবং অবশেষে শেখ ইন্তেকালের পূর্বে তাঁকে খিলাফত দান করেন এবং নিজ বরকতময় হাতে অনুমতিপত্র লিখে দেন ও বলেন:

“আমার ইন্তেকালের পর এখানে তিন দিনের বেশি অবস্থান করো না। পানিপতে চলে যেও, সেখানেই তোমার অবস্থান।”

সে অনুযায়ী আপনি পানিপতে চলে যান এবং সেখানে দাওয়াত ও ইরশাদের কাজে মশগুল হন। এক বর্ণনা মতে, আপনি আপনার দাদা-পীর হযরত খাজা ফরিদুদ্দিন গঞ্জ-এ-শকর রহমাতুল্লাহি আলাইহির পক্ষ থেকেও অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন।

শেখ শামসুদ্দিন তুর্ক রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি আলেম ও সূফী হওয়ার পাশাপাশি একজন মুজাহিদও ছিলেন। সুযোগ বুঝে তিনি গোপনে সেই সব লস্করে শামিল হয়ে যেতেন যা দিল্লির সুলতানগণ জিহাদের জন্য পাঠাতেন। পথে আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সৈন্যদের দ্বীনি প্রশিক্ষণের চেষ্টা করতেন এবং মানুষকে কল্যাণ ও নেকির শিক্ষা দিতেন।

আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের লস্করে শামিল ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইসলামী লস্করের ছাউনি একটি পুকুরের কাছে ছিল। তখন ছিল প্রচণ্ড শীতের মৌসুম। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন সেখানে ওযু করতে যেতেন তখন পুকুরের পানি গরম হয়ে যেত। লস্করের কোনো এক অফিসার এ খবর পেয়ে যান। তিনি সুলতান বলবনকে অবহিত করেন। তিনি আপনার ভক্ত হয়ে যান। যেহেতু শত্রুর কেল্লা দীর্ঘ সময় ধরে জয় হচ্ছিল না, তাই সুলতান বলবন আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে বিশেষ দোয়ার দরখাস্ত করেন।

আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে দোয়া করেন এবং তারপর বলেন: “তুমি আক্রমণ করো। ইনশাআল্লাহ কেল্লা জয় হয়ে যাবে।” সে অনুযায়ী গিয়াসউদ্দিন বলবন সৈন্য প্রস্তুত করে পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করেন যাতে শত্রু পরাজিত হয় এবং কেল্লা জয় হয়ে যায়। বাদশাহ এখন আরও বেশি ভক্ত হয়ে গেলেন এবং আপনাকে তাঁর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন কিন্তু হযরত তা পছন্দ করেননি এবং অভিযান শেষ হতেই পানিপতে ফিরে যান।

পরবর্তীতে আলাউদ্দিন খিলজির আমলে যখন চিতোর আক্রমণের জন্য লস্কর পাঠানো হলো, তখন আপনি আবারও একইভাবে একজন অপরিচিত মুজাহিদের মতো লস্করে শামিল ছিলেন। যখন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কেল্লা জয় হলো না, তখন আলাউদ্দিন খিলজি কোনো আল্লাহর ওলীর সন্ধান করতে লাগলেন।

যাতে তিনি তাঁর থেকে দোয়া করাতে পারেন। লস্করের একজন ফকির যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি বাদশাহকে বলতে লাগলেন:

“আপনি কোনো আল্লাহর ওলির সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে আছেন, অথচ তিনি আপনার লস্করের মধ্যেই উপস্থিত আছেন।”

আলাউদ্দিন নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে ফকির বললেন: “আজ রাতে ঝড় বইবে, সমস্ত তাঁবুর চেরাগ নিভে যাবে কিন্তু একটি চেরাগ জ্বলতে থাকবে। সেই ব্যক্তি সেখানেই মিলবে।” [১]

বস্তুত তেমনই হলো। রাতে অত্যন্ত প্রবল ঝড় বইল এবং সমস্ত চেরাগ নিভে গেল। আলাউদ্দিন খিলজি লস্করের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন এবং শীঘ্রই তিনি এক জায়গায় আলো দেখতে পেলেন। তিনি সেদিকে গেলেন এবং দেখলেন যে, একটি তাঁবুতে একজন বুজুর্গ চেরাগের আলোতে তিলাওয়াত করছেন। ইনি ছিলেন শামসুদ্দিন তুর্ক রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আলাউদ্দিন বিঘ্ন ঘটানো সমীচীন মনে করলেন না এবং আদবের সাথে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন তিনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিলাওয়াত শেষ করলেন, তখন তিনি নিজের উদ্দেশ্য আরজ করলেন। মোদ্দাকথা, শায়খ অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করলেন এবং কেল্লা ফাতাহ হয়ে গেল।

শায়খ শামসুদ্দিন তুর্ক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওফাত ৭১৫ হিজরিতে পানিপথেই হয়েছিল এবং সেখানেই তাঁর মাজার রয়েছে যা শিখদের একটি গুরুদ্বারের সীমানার ভেতরে। শিখরাই মাজারের দেখাশোনা করে থাকেন। [২]

---

[১] দ্বীনের বুজুর্গদের কখনো কখনো স্বপ্ন, কাশফ বা ইলহামের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোনো আংশিক বিষয় জানা হয়ে যায়। এটি কারামতের অন্তর্ভুক্ত। এ নিয়ে আপত্তি করা উচিত নয় এবং এ জাতীয় ঘটনা দেখে দ্বীনের বুজুর্গ ও দরবেশদের ভক্তিতে এমন বাড়াবাড়ি করাও জায়েজ নয় যা শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

[২] (তারিখে মাশায়েখে চিশত, আজ শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া মুহাজির মাদানি: পৃষ্ঠা ১৮২ থেকে ১৮৪; তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ ও পাকিস্তান, আজ মুফতি ওয়ালি হাসান টোংকি: পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে ৭৮)

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি

৬৩৪ হিজরি থেকে ৭২৫ হিজরি

(১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র নাম যেমন সবচেয়ে উজ্জ্বল, তেমনি মুসলমানদের সংশোধন এবং বিশেষ করে শাসক ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির ধর্মীয় দিকনির্দেশনায় হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁর পিতা আহমদ দানিয়াল রহমাতুল্লাহি আলাইহি গজনি থেকে ভারতে আসেন এবং বদায়ূনে বসবাস শুরু করেন। এটি সেই সময়ের কথা যখন চেঙ্গিস খান মধ্য এশিয়া আক্রমণ করেছিলেন।

৬৩৪ হিজরিতে (১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) আহমদ দানিয়ালের ঘরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ। আহমদ দানিয়াল রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বড় আলেম ছিলেন। কিন্তু যৌবনেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। সে সময় তাঁর পুত্র মুহাম্মদের বয়স ছিল পাঁচ বছর। এরপর এই পরিবারটি দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের কবলে পড়ে। মা সুতা কেটে কেটে তাঁর এতিম সন্তানকে লালন-পালন করেন। কখনো কখনো ঘরে উপবাসের উপক্রম হতো। এমন পরিস্থিতিতে মা বলতেন:

“বাবা! আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান।”

কে ভাবতে পেরেছিল যে, এই এতিম শিশুটিই একদিন সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া হয়ে পুরো ভারতকে আলোকিত করবে। হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাওলানা আলাউদ্দিন উসুলি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র দরসে যেতে শুরু করেন এবং প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার পর হানাফি ফিকহের বিখ্যাত কিতাব ‘মুখতাসারুল কুদুরি’ সম্পন্ন করেন। বদায়ূনে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হন, এখানে ‘মাকামাতে হারিরি’ এবং ‘মাশারিকুল আনওয়ার’-এর পাঠ গ্রহণ করেন। মূল পাঠ্য (মতন) মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ফলে ‘মাকামাতে হারিরি’-র চল্লিশটি মাকামা তাঁর মুখস্থ ছিল। একইভাবে ‘মাশারিকুল আনওয়ার’-ও সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল।

তিনি পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর মাকে নিয়ে দিল্লিতে চলে আসেন এবং এখানে একজন প্রখ্যাত আলেম শামসুদ্দিন খাওয়ারিজমি (যিনি সালতানাতের প্রধানও ছিলেন)-র নিকট দ্বীনি ইলম শিখতে শুরু করেন। তিনি ছাড়াও আরও অনেক বড় বড় আলেমদের কাছ থেকে ফয়েজ হাসিল করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তাঁর একজন উস্তাদ শেখ মুহাম্মদ বিন আহমদ মারিকলি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরি) এক মধ্যস্থতায় ‘হিদায়া’ গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা বুরহানুদ্দিন মারগিনানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র ছাত্র ছিলেন। মোদ্দাকথা, তিনি ইলম অর্জনে এমনভাবে পারদর্শিতা অর্জন করেন যে উস্তাদগণ...

আপনার ইলমি কামালাতের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। তাই নিজের যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে কোনো একটি পদ লাভ করার চিন্তা তাঁর মনে এল।

সেই সময়ে হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহ.-এর ভাই হযরত শেখ নাজিব উদ্দিন মুতাওয়াক্কিল রহ.-ও দিল্লিতে বসবাস করতেন এবং আপনি রহ. প্রায়ই তাঁর খিদমতে যেতেন। তাঁর মাধ্যমেই হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহ.-এর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা সম্পর্কে জানতে পারতেন, কিন্তু আপনার রহ. মনোযোগ ছিল চাকরির দিকে। তাই একদিন শেখ নাজিব রহ.-এর কাছে আরজ করলেন: “দোয়া করুন আমি যেন কোনো জায়গায় কাজি নিযুক্ত হই।”

শেখ নাজিব রহ. চুপ থাকলেন এবং তারপর বললেন: “আল্লাহ না করুন যে তুমি কাজি হও। আমি জানি তোমার কী হওয়া উচিত।”

সেই দিনগুলোতেই আপনার মাতা ইন্তেকাল করেন এবং আপনার ওপর বিষণ্ণতা ও একাকীত্বের অবস্থা ছেয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতি মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। একদিন দিল্লির জামে মসজিদে আজানের পর মুয়াজ্জিন তিলাওয়াত শুরু করলেন এবং এই আয়াতে কারীমা পাঠ করলেন:

‘أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ’

(ঈমানদারদের জন্য কি এখনো সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর বিগলিত হবে?)

এটি শুনে অন্তরে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হলো। সেই সকালেই কোনো পাথেয় বা প্রস্তুতি ছাড়াই হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহ.-এর দরগাহর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং টানা কয়েক দিন পথ চলে অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছালেন। এটি ৬৫৫ হিজরি (১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা।

প্রথম দৃষ্টিতেই হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহ. আপনার রহ. ব্যাকুলতা চিনে ফেললেন এবং এই কবিতাটি পাঠ করলেন:

এ আতিশে ফিরাকাত দিলহা কাবাব কারদাহ

সায়লাবে ইশতিয়াকাত জানহা খারাব কারদাহ

(তোমার বিচ্ছেদের আগুন হৃদয়গুলোকে কাবাব বানিয়ে দিয়েছে এবং তোমার অনুরাগের প্লাবন প্রাণগুলোকে বরবাদ করে দিয়েছে।)

আপনি রহ. বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর রহ.-এর কাছে বায়আত হলেন। চার বছর পর্যন্ত মুজাহাদা ও রিয়াজতে মগ্ন থাকলেন। এই সময়ে শেখ তাঁকে ইলম ও ফুনুনের কিছু কিতাব নিজে পড়ালেন। আপনার রহ. তাজবিদে কিছুটা ঘাটতি ছিল, তাই শেখ নিজে ছয় পারা তাজবিদের মশক নিজেই করালেন।

সেই সময়ে পাকপত্তনের এই খানকায় নূরানিয়াতের পাশাপাশি মুজাহাদারও চরম অবস্থা ছিল। বড় বড় উলামায়ে কেরামকে এখানে রিয়াজতের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে দেখা যেত। মা’কুলাত ও মানকুলাতের ইমাম মাওলানা বদর উদ্দিন ইসহাক বুখারি রহ. জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতেন। মাওলানা জামাল উদ্দিন হানসভি রহ.-এর মতো আলেম জঙ্গল থেকে এমন সব লতাপাতা সংগ্রহ করে আনতেন যা দিয়ে আচার তৈরি করা যেত। কাবুলের মাওলানা হুসাম উদ্দিন রহ. পানি ভরে আনা এবং বাসন ধোয়ার খিদমত আঞ্জাম দিতেন। তাঁদের সবার সাথে তরুণ নিজাম উদ্দিন রহ. খাবার রান্নার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সপ্তাহে এক-দুই দিন এমন আসত যে সমস্ত মুরিদদের সাথে বাবা ফরিদ উদ্দিন রহ. এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকেও অনাহারে থাকতে হতো, কারণ পানাহারের জন্য কিছুই জুটত না। একবার তরকারির জন্য লবণ ছিল না। খাজা নিজাম উদ্দিন রহ. মসজিদের...

কাছেই এক মুদি দোকানদারের কাছ থেকে বাকিতে লবণ নিয়ে আসা হলো। মুর্শিদ জানতে পারলেন যে ঋণের ওপর লবণ নিয়ে (খাবারে) দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বললেন: "দরবেশ চাইলে মারা যাক, তবুও যেন নফসের স্বাদের জন্য ঋণ না নেয়।" (যেহেতু লবণ ছাড়াও খাবার খাওয়া সম্ভব ছিল, লবণ কেবল স্বাদের জন্য দেওয়া হয়, তাই হযরত সতর্ক করে দিলেন যে এমন জিনিস যেন বাকি বা ঋণে নেওয়া না হয়।) খাজা নিজামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তওবা ও ইস্তিগফার করে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করলেন যে, যতক্ষণ সম্ভব হবে কখনো ঋণ নেব না। একদিন মুর্শিদ যে কম্বলটির ওপর বসতেন, সেটি তাঁকে দান করলেন এবং দোয়া করলেন যে, আল্লাহ যেন তোমাকে কখনো ঋণের মুখাপেক্ষী না করেন। একদিন তাঁকে বললেন: "আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে সামান্য দুনিয়াও চেয়ে নিয়েছি।" খাজা নিজামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি ঘাবড়ে গেলেন যে, দুনিয়া বড় বড় ব্যক্তিদের ফিতনায় ফেলে দিয়েছে। আমার কী অবস্থা হবে! শেখ তাঁর পেরেশানি বুঝতে পারলেন এবং বললেন: "তুমি চিন্তা করো না। তুমি ফিতনায় পড়বে না।" মোদ্দাকথা, সুলুক ও ইহসানের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করানোর পর মুর্শিদ ৬৫৯ হিজরিতে আপনাকে খিলাফত দান করলেন এবং খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহি আলাইহির খিরকাও পরিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে দিল্লি যাও। বিদায় দেওয়ার সময় তিনটি জিনিসের তাকিদ দিলেন:

- কুরআন মাজীদ হিফজ করা।
- যার কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে, তা দ্রুত পরিশোধ করা।
- শত্রুদেরও সন্তুষ্ট রাখা।

শেখের আদেশে আপনি একজন দরবেশকে সফরসঙ্গী করে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথের এক জঙ্গলে তীর-ধনুকধারী পাঁচ-ছয়জন হিন্দু ডাকাত সামনে চলে এল। খাজা নিজামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তখন কেবল এই চিন্তায় ছিলেন যে, যদি তারা মুর্শিদের দেওয়া খিরকা ও কম্বল ছিনিয়ে নেয়, তবে কাউকে কী মুখ দেখাব। কিন্তু আল্লাহ দয়া করলেন। সেই ডাকাতরা তাঁদের কোনো ক্ষতি না করেই চলে গেল। দিল্লি পৌঁছে সবার আগে জিম্মায় থাকা হুকুকুল ইবাদ আদায়ের চিন্তায় মগ্ন হলেন। এক ব্যক্তির কাছ থেকে পড়ার জন্য একটি বই নিয়েছিলেন যা হারিয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে গিয়ে বললেন: "হযরত! আপনার কাছ থেকে একটি বই নিয়েছিলাম, সেটি আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ সামর্থ্য হওয়ামাত্রই কাগজ কিনে সেই বইটি লিখে আপনাকে দিয়ে দেব।" সেই ব্যক্তি বললেন: "আমি বইটি আপনাকে মাফ করে দিলাম।" এক কাপড় ব্যবসায়ীর ঋণও আপনার ওপর ছিল, আপনার কাছে যখনই পর্যাপ্ত অর্থ এল, তাঁর কাছে গিয়ে অর্থ পেশ করলেন। তিনি দশ টাকা রেখে বাকিটা আপনাকে ফেরত দিলেন। মোদ্দাকথা, কারো কোনো বাকি বা ঋণ জিম্মায় রাখলেন না। এরপর আপনি কুরআন মাজীদ হিফজ করতে শুরু করলেন। পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জিকরুল্লাহ করতেন। দিল্লি শহরের ভিড়ের মধ্যে জিকর ও কুরআন হিফজের জন্য একাগ্রতা পাওয়া যাচ্ছিল না। ভিড়ের প্রতি এমনিতেও আপনার স্বভাবগত অনীহা ছিল। একদিন এক দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন: "নিজামুদ্দিন! যদি ঈমানের নিরাপত্তা এবং ইবাদতে ইস্তেকামাত চাও, তবে এই শহরে থেকো না, কারণ এখানে ফিসক ও ফুজুর আম হয়ে গেছে।" এ কথা শোনা মাত্রই শহর ছাড়ার দৃঢ় সংকল্প করলেন। দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ইস্তিখারা করলেন এবং শহর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাশিয়্যাতে ইলাহিয়া তাঁর পথ শহরের উপকণ্ঠের সেই দিকে করে দিল যেখানে পরবর্তীতে গিয়াসপুরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন সেখানে একটি ছোট্ট একটি...

গ্রামটি ছিল যার কাছে আপনি বসতি স্থাপন করেছিলেন। [১]

পবিত্র কুরআন হিফজ করার পর নফল নামাজে কয়েক পারা তিলাওয়াত করা আপনার প্রিয় অভ্যাসে পরিণত হয়। বাকি সমস্ত সময় জিকির ও মুরাকাবায় কাটাতেন, প্রায়ই রোজা রাখতেন এবং পানি বা সামান্য খাবার দিয়ে ইফতার করতেন। যদিও আপনি রহমতুল্লাহ সুলুক ও মারিফাতের সবক সম্পন্ন করেছিলেন, তা সত্ত্বেও আপনি রহমতুল্লাহ বছরের পর বছর কঠোর মুজাহাদা চালিয়ে যান।

এই স্থানে আপনি রহমতুল্লাহ আপনার মৃত্যু অর্থাৎ ৭২৫ হিজরি পর্যন্ত ষাট বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত করেন। আপনার রহমতুল্লাহ খিদমতে দু-একজন মুরিদ আসতেন যাদের মধ্যে কিছু আলেমও থাকতেন। এখানেও পাকপত্তনের দরগাহর মতো পরিবেশ ছিল। শুকনো খাবার খেয়ে আল্লাহর জিকির করে যেতেন। কখনো কখনো টানা চার দিন পর্যন্ত রান্নাঘরে খাওয়ার মতো কিছু থাকত না। তা সত্ত্বেও অল্পে তুষ্টির অবস্থা এমন ছিল যে, দুনিয়ার সম্পদকে কড়ির সমানও মনে করতেন না এবং কারো অনুগ্রহ গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না।

একদিন গুজরাটের এক প্রধান আপনার কামালিয়াত বা শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ হয়ে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আশরাফি পাঠান। সেই দিনই মুর্শিদ বাবা ফরিদ রহমতুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে মাওলানা শুয়াইব নামক এক আলেম আসেন এবং মুর্শিদের জায়নামাজ ও পাগড়ি পেশ করেন যে, তিনি এই তাবাররুকাত আপনাকে দান করেছেন। আপনি রহমতুল্লাহ এতই আনন্দিত হলেন যে, গুজরাটের প্রধানের পাঠানো আশরাফির তোড়াগুলো যেভাবে ছিল সেভাবেই আপনার শায়খের দূতের কাছে হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দিলেন। কিছুকাল পর নিজে আপনার মুর্শিদের খিদমতে হাজির হলেন। কয়েক দিন দিদারের মাধ্যমে চোখ জুড়ালেন। মুর্শিদ বিদায় দেওয়ার আগে বললেন: “নিজাম! তুমি যেখানেই থাকবে, আহলে নজর তোমাকে চোখের মণি করে রাখবে।” এটিই ছিল মুর্শিদের শেষ দেখা। এর কিছুকাল পর ৬৬৪ হিজরিতে বাবা ফরিদ রহমতুল্লাহ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ আপনার রহমতুল্লাহ দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। বিশ বছর পর পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, বড় বড় আমির ও ওমরাহ এমনকি শাহজাদারা পর্যন্ত আপনার রহমতুল্লাহ অনুসারী হয়ে গেলেন। আপনাকে রহমতুল্লাহ “নিজামুদ্দিন আউলিয়া” এবং “মাহবুবে ইলাহি” বলা হতে লাগল।

আপনার রহমতুল্লাহ খ্যাতি খিলজি শাসকদের আমলে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। জালালুদ্দিন খিলজি আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি রাখতেন। তিনি আপনার রহমতুল্লাহ সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে চাইলে আপনি রহমতুল্লাহ তা এড়িয়ে যান এবং বললেন: “আমি অগোচরে দোয়া করি। এতে অনেক প্রভাব রয়েছে।” বাদশাহ তবুও সাক্ষাতের জন্য জেদ করলে আপনি রহমতুল্লাহ জবাবে বলে পাঠালেন: “ফকিরের ঘরের দুটি দরজা আছে। যদি বাদশাহ ঘরের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন, তবে আমি অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব।”

আলাউদ্দিন খিলজির আমলে আপনার রহমতুল্লাহ চারপাশে মানুষের ভিড় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তিন হাজার আলেম ও ফাজেল, ছাত্র এবং হাফেজ স্থায়ীভাবে আপনার রহমতুল্লাহ তত্ত্বাবধানে থাকতেন। প্রতিদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার নজরানা আসত কিন্তু আপনি রহমতুল্লাহ অভাবীদের মাঝে তা বিলিয়ে দিতেন। আপনার রহমতুল্লাহ মর্যাদার কারণে জ্ঞানী ও গুণীজনদের মাঝে আপনাকে “সুলতানুল মাশায়েখ” এবং সাধারণ মানুষের মুখে “সুলতান জি” বলা হতে লাগল।

---

[১] গিয়াসপুর, সুলতান বলবনের উত্তরসূরি মুইজুদ্দিন কায়কোবাদের আমলে ৬৮৭ হিজরি (১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহ এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পর কমবেশি পঁচিশ বছর অতিবাহিত হয়েছিল।

আলাউদ্দিন খিলজি নিজে তাকওয়া ও দ্বীনদারি থেকে শত যোজন দূরে ছিলেন কিন্তু আউলিয়া কেরামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মাঝে মাঝে খানকাহর জন্য অর্থ পাঠাতেন। একবার সোনা ও জহরত ভর্তি একটি থলে পাঠালেন। হযরত সেই মুহূর্তে খানকাহতে আসা এক দরবেশকে তা দান করে দিলেন। আলাউদ্দিনের এক পারিষদ কারাবেগ, যিনি খানকাহে নিজামিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন, বাদশাহর কাছে আরজ করলেন যে কখনো সুলতানুল মাশায়েখের জিয়ারতে চলুন। বাদশাহ বললেন: "আমি তো আপাদমস্তক দুনিয়ায় নিমজ্জিত। লজ্জা লাগে যে এমন বুজুর্গের জিয়ারত করি। তবে আমার দুই পুত্র: খিজর খান ও শাদি খানকে নিয়ে যাও এবং সুলতান জি-র কাছে বায়াত করিয়ে দাও।"

ফলে এই দুই শাহজাদা গিয়ে হযরতের কাছে বায়াত হলেন এবং শুকরিয়া স্বরূপ দরবেশদের মাঝে দুই লক্ষ টাকা বিতরণ করলেন। যদিও তাদের বায়াত আনুষ্ঠানিকই ছিল এবং তাদের আমলি সংশোধন হতে পারেনি, তবে খিজর খান যাই হোক মন থেকে আপনার ভক্ত ছিলেন। তিনি সালেকিনদের এত ভিড় দেখে হুমায়ুনের মাকবারার পাশে খানকাহ হিসেবে একটি তিন তলা ভবন নির্মাণ করে দিলেন। নিচের তলায় ফকিহদের কক্ষ, আঙিনা এবং লঙ্গরখানা ছিল। দ্বিতীয় তলায় হযরতের মজলিস বসত। তৃতীয় তলায় হযরতের আবাসস্থল ছিল।

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ যখন বাদশাহ হলেন, তখন তিনি খিজর খানকে হত্যা করালেন এবং হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে শত্রুতা শুরু করলেন কিন্তু প্রকাশ্যে তা করতে পারছিলেন না, তাই অন্য কৌশল অবলম্বন করলেন এবং নির্দেশ পাঠালেন যে হযরত যেন প্রতি চাঁদ রাতে রাজপ্রাসাদে এসে সাক্ষাৎ করেন। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে এটি অসহনীয় ছিল। একনিষ্ঠ মুরিদগণ, যাদের মধ্যে রাজদরবারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরাও ছিলেন, তারা বুঝালেন যে বাদশাহর নিয়ত ভালো নয়। তিনি এই বিষয়টিকে বাহানা বানিয়ে ভুল কোনো নির্দেশ জারি না করে দেন। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "আমি আমার পূর্বসূরিদের রীতির বিরোধিতা করতে পারি না। আমি কখনোই তার সাথে দেখা করতে যাব না।" মুরিদগণ বললেন: "কাল চাঁদ রাত। আপনি শুধু একবার দেখা করে আসুন।" তিনি বললেন: "বাদশাহ আমার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে একটি শিংওয়ালা ষাঁড় আমার ওপর আক্রমণ করেছে এবং আমি তাকে শিং ধরে আছাড় দিয়েছি।"

ফলে এমনই হলো। কয়েকদিন পর কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ তার নিজেরই খাস খাদেম খসরু খানের হাতে নিহত হলেন। মোদ্দাকথা, আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বাদশাহর শাসনকাল দেখেছেন এবং দিল্লির দরবারে আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রভাব সর্বদা বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে কখনো সুলতানদের দরবারে হাজিরা দেননি এবং তাদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করতেন না। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি পরোক্ষভাবে তাদের নসিহত ও উপদেশ দিতেন এবং তাদের সংশোধন ও হিদায়াতের জন্য দোয়া করতেন।

খিলজি শাসকদের যুগ শেষ হলো এবং দিপালপুরের শাসক গাজী মালিক গিয়াসুদ্দিন তুঘলক উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন, যিনি উলামা ও মাশায়েখদের অনেক কদর করতেন। এই যুগে হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আপনি মাহফিলে সামা-র অনুরাগী ছিলেন অথচ উলামায়ে কেরাম তা থেকে নিষেধ করতেন। শহরের কাজি রুকনুদ্দিনের আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রতি শত্রুতা ছিল, তিনি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করলেন যে বিষয়টি বাদশাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তুঘলকাবাদ কেল্লায়, যা তিনি নিজেই নির্মাণ করেছিলেন, উলামা ও মাশায়েখদের এই মাসআলার ফয়সালার জন্য সমবেত করলেন। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কেও...

আহ্বান করা হলো। মজলিসে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে আশ্বস্ত করতে পারল না। এরই মধ্যে শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ.-এর নাতি শেখ ইলমুদ্দিন রহ. সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বাদশাহকে হিকমতের সাথে বুঝিয়ে এই বিতর্কের সমাপ্তি ঘটালেন। সুলতান লজ্জিত হলেন যে, তিনি অকারণে সুলতানুল মাশায়েখ রহ.-এর মতো ব্যক্তিত্বকে কষ্ট দিয়েছেন। তিনি কাজী রুকনুদ্দিনের হিংসার বিষয়টিও আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই হযরত সুলতান জি রহ.-কে সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিদায় দিয়ে কাজীকে বরখাস্ত করে দিলেন। সম্ভবত এটিই একমাত্র উপলক্ষ ছিল যখন হযরত কোনো শাসকের মজলিসে গিয়েছিলেন।

আপনি রহ. যখন কাউকে বায়আত করতেন, তখন তার কাছ থেকে একবার সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস শুনতেন। এরপর সূরা বাকারার শেষ রুকু নিজে তিলাওয়াত করতেন। তারপর আরও কিছু আয়াত পাঠ করে তালিবে ইলমকে এই শব্দগুলো বলতেন: “তুমি বায়আত করলে এই দুর্বল ব্যক্তির হাতে, তার শেখ এবং শেখের মাশায়েখদের হাতে, আর অঙ্গীকার করলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে, এবং অঙ্গীকার করলে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা-র সাথে যে, তুমি তোমার হাত, পা এবং চোখের হেফাজত করবে এবং শরীয়তের পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।”

এভাবে আপনি রহ. স্পষ্ট করে দিতেন যে, এই বায়আত কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নয় বরং আসলে এটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ অনুসরণের প্রতিশ্রুতি। আমরা দাবি করতে পারি না যে, প্রত্যেক বায়আত গ্রহণকারী শতভাগ এর ওপর আমল করত, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ তালিবে ইলমদের একটি বিশাল সংখ্যা এমন ছিল যারা এই অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করত এবং আল্লাহর মহব্বত ও রাসূলের অনুসরণে বিলীন হওয়ার চেষ্টা করত।

আপনার রহ. আলোচনা কুরআন ও সুন্নাহ, সীরাত ও ইতিহাস, মারিফাতের রহস্য এবং আভিধানিক ও সাহিত্যিক উদ্ধৃতিতে ভরপুর থাকত। সাধারণত নিজের মজলিসগুলোতে কোনো না কোনো আয়াতে মুবারাকার তাফসীর করে উপস্থিতদের কুরআনী জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করতেন। আপনার রহ. খানকায় কুরআন শিক্ষার ওপর অনেক জোর দেওয়া হতো। মুরিদদের অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন। বলতেন: “কুরআন মাজীদ পড়ার সময় এর অর্থ হৃদয়ে থাকা উচিত।”

আরও বলতেন: “কুরআন পাক তিলাওয়াতে খুশু-র সর্বোচ্চ স্তর হলো মানুষের অন্তর আল্লাহর সাথে জুড়ে যাওয়া। কুরআন পাক পড়ার সময় খুশু-র সর্বনিম্ন স্তর হলো বান্দা কল্পনা করবে যে, আমি এই নিআমতের যোগ্যই বা কোথায় ছিলাম যে আল্লাহর কালাম পড়তে পারছি।”

আপনার রহ. মালফুজাত জাহেরী ও বাতেনী ইলমের সংমিশ্রণ ছিল। সেগুলোতে এমন উচ্চচিন্তা, ইলমী গভীরতা এবং বাস্তবতা থাকত যে বড় বড় শরীয়ত ও তরিকত বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে যেতেন।

এর আগে দিল্লি ও অন্যান্য শহরের অনেক আলেম তাসাউফকে কেবল সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টিতেই দেখতেন না বরং একে ইসলাম বিরোধী বলে গণ্য করতেন। কিন্তু হযরত সুলতান জি রহ.-এর মালফুজাত থেকে তারা তাসাউফের হাকিকত জানতে পারলেন, তারা নিজেদের কাজের জন্য কেবল লজ্জিতই হলেন না বরং হযরতের হালকায় শামিল হয়ে ওয়াসিল বিল্লাহ হয়ে গেলেন।

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহ.-এর ফয়েজপ্রাপ্তদের মধ্যে এমন সব সূর্য ও চন্দ্রতুল্য ব্যক্তি ছিলেন যাদের নজির পুরো হিন্দুস্তানে পাওয়া যেত না। আমীর খসরু রহ. আপনার রহ.-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় খাদেম ছিলেন যাদের সাথে প্রায়ই গোপন ও নিভৃত আলাপ হতো।

হতেন। এ ছাড়াও হযরত আমীর হাসান আলা সিজজি দেহলভী, খাজা শামসুদ্দিন খাজা জাদা, মাওলানা নিজামুদ্দিন শিরাজী, খাজা কারীমুদ্দিন সমরকন্দী, শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ-এ-দেহলী এবং আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারনীও আপনার নিকট থেকে শিক্ষা ও খেলাফত লাভ করেছিলেন। আপনি সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন। আপনার খলিফাগণই আপনার সন্তানের মতো ছিলেন।

যখন সুলতানুল মাশায়েখ রহ.-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তাঁর খাদেমদের কঠোর নির্দেশ দিলেন যে, আমার ঘরে যা কিছু আছে, সব সদকা করে দাও, কিছুই যেন বাকি না থাকে। নির্দেশ পালন করা হলো, কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে গুদামে শস্যের মজুদ রয়ে গেছে, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: “এই মৃত স্তূপকে কেন বাকি রেখেছ?”

ফলে হাজার হাজার মণ শস্য অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হলো। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, খানকাহর ইমারতসমূহের মধ্যে আপনার দাফন কোথায় হবে? তিনি উত্তর দিলেন: “ফকিরের দেহ ইমারতের যোগ্য নয়। আমাকে জঙ্গলে দাফন করো।” [১]

এরপর আপনি রহ. আপনার নিকটতম খলিফাদের তলব করলেন। সাথে পোশাকের বাক্সটিও আনিয়ে নিলেন। মাওলানা বুরহানুদ্দিন গরীব রহ.-কে বিশেষ পাগড়ি, খেলাফতের চাদর, জামা এবং মুসাল্লা দান করে নির্দেশ দিলেন:

“আপনি দাক্ষিণাত্যে (ডেকান) চলে যান এবং সেখানে হেদায়েত ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করুন।”

একটি পাগড়ি, একটি জামা এবং একটি জায়নামাজ শেখ ইয়াকুব রহ.-কে দেওয়া হলো এবং তাঁকে গুজরাটে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। মাওলানা শামসুদ্দিন ইয়াহইয়া রহ. এবং মাওলানা জামালুদ্দিন খাওয়ারিজমী রহ.-কেও একইভাবে পাগড়ি ও জামা প্রদান করা হলো। দেশের বিভিন্ন অংশে খলিফাদের দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হলো। এমনকি সুলতানুল মাশায়েখ রহ.-এর বাক্স খালি হয়ে গেল এবং আর কোনো কাপড় অবশিষ্ট রইল না। শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ-এ-দেহলী রহ. তখনও পর্যন্ত কিছুই পাননি।

মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অবাক ও চিন্তিত হলেন যে, শেখ নাসিরুদ্দিন রহ. সবচেয়ে নিকটতম হওয়া সত্ত্বেও কেন বঞ্চিত হলেন। কিন্তু কয়েক দিন পর ১৮ই রবিউল আখির তারিখে সুলতান জি রহ. শেখ নাসিরুদ্দিন রহ.-কে তলব করলেন এবং হযরত বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জ-এ-শকর রহ.-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশেষ খিরকা ও তসবিহসহ মুসাল্লা তাঁকে দান করলেন এবং বললেন:

“আপনাকে এই দিল্লি শহরেই থাকতে হবে এবং মানুষের জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করতে হবে।”

সংক্ষেপে, আপনি রহ. শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ-এ-দেহলী রহ.-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন এবং অবশেষে ৯২ বছর বয়সে ১৮ই রবিউল আখির ৭২৫ হিজরিতে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন যে, আপনার রহ. বরকতময় সাহচর্যের প্রভাবে অধিকাংশ মুসলমান তাসাউফ, ইবাদত ও যুহদ (সংসারবিরাগ)-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বীনদারী অবলম্বন করেছিলেন। মদ পান ও পাপাচারের নামও মুখে আসত না। মানুষ কবিরা গুনাহকে কুফরির মতো মনে করতে শুরু করেছিল। পাগড়ি, মেসওয়াক এবং চিরুনির প্রচলন ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। লোটা এবং জায়নামাজ এত বেশি বিক্রি হতো যে সেগুলোর দাম বেড়ে গিয়েছিল। বাজারে মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেওয়া এবং ভেজাল দেওয়ার প্রবণতা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

---

[১] ফলে আপনার দাফন খানকাহতে হয়নি বরং কিছু দূরে এক নির্জন জঙ্গলে করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেখানে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক একটি সুউচ্চ গম্বুজ নির্মাণ করে দেন।

ছাত্র এবং বড় বড় আমীরদের মধ্যে তরীকা বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলো। অধিকাংশ মানুষ বই বিক্রেতাদের কাছে সুলুক ও মারিফাতের কিতাব চাইতে শুরু করল। হযরত সুলতান জী রহমতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাত (বাণীসমূহ) তাঁর খলিফা খাজা আমীর হাসান সিজজী রহমতুল্লাহি আলাইহি 'ফাওয়ায়িদুল ফুয়াদ' নামে সংকলন করেছিলেন। আপনার অনেক অবস্থা, ঘটনা এবং মালফুজাত হযরত খাজা গেসুদরাজ রহমতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাতেও উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা পড়লে আপনার জ্ঞানের পরিধি, উদারতা এবং ইলম ও ফজিলতের আন্দাজ পাওয়া যায়।

আপনার মারিফাতপূর্ণ কিছু মালফুজাত পাঠকদের জন্য পেশ করা হলো:

- দুনিয়া ত্যাগের অর্থ উলঙ্গ হয়ে লেংটি পরে বসে থাকা নয়, বরং এর অর্থ হলো অন্তরকে দুনিয়ায় আটকে না রাখা।

- সওম, সালাত ও যিকির হলো লাযেম (ব্যক্তিগত) ইবাদত, অর্থাৎ এগুলোর সওয়াব বান্দার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন, তাদের সাহায্য করা এবং স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করা হলো মুতাআদ্দি (সামাজিক) ইবাদত, যার উপকার সবাই পায়; তাই এগুলোর প্রতিদানও বেশি।

- কিছু মানুষ দুনিয়ার লোভী। কিছু মানুষ একে ঘৃণা করে। তারা উত্তম যারা একে ঘৃণাও করে না, আবার ভালোবাসেও না।

- আল্লাহর ওলি তিনিই, যিনি কারো কাছে কিছু চান না—না মুখে, না অন্তরে।

- প্রতিটি বিদ্যমান বস্তু দুটি অনস্তিত্বের মাঝে রয়েছে। প্রথমে তা অস্তিত্বহীন ছিল এবং শেষে পুনরায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। সুতরাং দুই অনস্তিত্বের মধ্যবর্তী এই সময়েও প্রতিটি বস্তুকে অস্তিত্বহীনই মনে করা উচিত।

- যেখানেই থাকো, খাঁটি হয়ে থাকো।

- অন্তর আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট রাখো এবং নফসকে পবিত্র রাখো। এরপর যে কাজেই লিপ্ত হও না কেন, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। [১]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা, বোম্বে সংস্করণ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩০ থেকে ৪৬৪; সিয়ারুল আউলিয়া: পৃষ্ঠা ৯৯ থেকে ১৬৫; তাযকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ ও পাকিস্তান, মুফতি ওয়ালী হাসান টুঙ্কি রচিত: পৃষ্ঠা ৮৫ থেকে ১০০; তারিখ-ই-দাওয়াত ওয়া আযীমত, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রচিত: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫২ থেকে ১৭০।

আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি

৬৫১ হিজরি থেকে ৭২৫ হিজরি

(১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে প্রশিক্ষিত সেই মহান ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যারা তাসাউফ, সাহিত্য, কবিতা এবং ভাষাতত্ত্বে সমান দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি "তুতী-ই-হিন্দ" এবং "মালিকুশ শুয়ারা" উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। যদিও বাহ্যিকভাবে তাঁর অবস্থান ছিল একজন মহান দরবারী কবি ও সাহিত্যিকের, কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরীণ মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিল; তিনি ছিলেন একজন দরবেশ সুফি, যিনি নিজের জীবন তাঁর পীর ও মুরশিদ হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভালোবাসা ও খিদমতে উৎসর্গ করেছিলেন।

আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহির পিতা সাইফুদ্দীন মাহমুদ চীন ও বালখে বসবাস করতেন, কিন্তু মঙ্গোলদের আক্রমণের কারণে তিনি হিন্দুস্তানে হিজরত করতে বাধ্য হন। এটি ছিল সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের শাসনামল। সাইফুদ্দীন দিল্লি সালতানাতের চাকরিতে যোগ দেন। কিছুকাল সাধারণ দায়িত্ব পালনের পর, তাঁর যোগ্যতা দেখে তাঁকে পাতিয়ালি (উত্তরপ্রদেশ)-এর একটি ছোট জায়গির প্রদান করা হয়। কিছুকাল পর দিল্লি সালতানাতের এক বিখ্যাত হিন্দুস্তানি আমির ইমাদুল মুলকের সাথে তাঁর সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং পরবর্তীতে তাঁর কন্যা "দৌলত নাজ"-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই দম্পতির ঘরে ৬৫১ হিজরিতে (১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) পাতিয়ালিতে আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম হয়। এভাবে তিনি ছিলেন একজন মুহাজির তুর্কি পিতা এবং একজন নওমুসলিম শ্যামলা হিন্দুস্তানি মায়ের সন্তান। তাঁর নাম ছিল ইয়ামিনুদ্দীন মাহমুদ, কিন্তু তিনি তাঁর কাব্যিক ছদ্মনামেই খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যদিকে "আমির" ছিল তাঁর বংশগত উপাধি।

আমির সাইফুদ্দীন মাহমুদ একজন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন, তাই তিনি প্রায়ই যুদ্ধাভিযানে যেতেন। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব তাঁর মা দৌলত নাজ এবং নানা ইমাদুল মুলক গ্রহণ করেন। নানার বাড়িতে কবিতা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যেও কবিতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রাথমিক কবিতাগুলো তাঁর শিক্ষক খাজা আলাউদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহির উৎসাহে রচিত হয়েছিল। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশ বছর বয়সেই একটি দিওয়ান সংকলন করেছিলেন।

আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাঁর অনেক সেবা করতেন। তাঁর জীবনে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে, জীবিকার সন্ধানে দূর-দূরান্তের অঞ্চলে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘ সময় তাঁর মা থেকে দূরে থাকতে পারতেন না।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সেই যুগে সালতানাতে কবিদের চাকুরিতে রাখার সাধারণ প্রচলন ছিল, যা মধ্য এশিয়া ও ইরান থেকে এখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। শুধু বাদশাহই নন, বরং আমীর, শাহজাদা এবং জায়গিরদাররাও কবিদের দরবারী কর্মচারী হিসেবে রাখতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে 'কোল' (আলীগড়) গিয়ে পৌঁছান, যেখানকার জায়গিরদার ছিলেন কাশলু খান ওরফে মালিক ছাজ্জু। তিনি আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে চাকুরিতে নিযুক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী আমীর ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহির বেশিদিন বনিবনা হয়নি এবং তিনি কিছুকাল পর সুলতান বলবনের পুত্র বুগরা খানের সাথে যুক্ত হন এবং তাঁর সাথে বাংলাতেও গিয়ে অবস্থান করেন। কিন্তু সেখানে মন টেকেনি এবং ছয় মাস পর মায়ের সাথে দেখা করার অজুহাতে দিল্লি চলে আসেন এবং এরপর আর বাংলার দিকে মুখ করেননি।

এবার বলবনের বড় ছেলে মুহাম্মদ খান তাঁকে নিজের সাথে রেখে নিলেন এবং মুলতানে নিয়ে গেলেন। সেই সময়ে মুলতান পাঞ্জাব ছাড়াও সিন্ধুর রাজধানী ছিল। এখানে আমীর খসরু প্রায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন। মুহাম্মদ খান যুদ্ধ ও মজলিস উভয় ক্ষেত্রেই অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহির কদরদানির হক আদায় করে দিয়েছিলেন। মুলতান ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধুর কেন্দ্রীয় স্থান, যেখানে উলামা, সুফিয়া এবং কবিদের আধিক্য ছিল। আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি এখানে অনেক কিছু শেখার ও বোঝার সুযোগ পান। তিনি শাহজাদা মুহাম্মদ খানের প্রশংসায় এমন কাসিদা লিখেছিলেন যে, শাহজাদা খুশি হয়ে হাতির ওজনের সমান সম্পদ তাঁর ওপর উৎসর্গ করেছিলেন।

৬৮৩ হিজরি (১২৮৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে শাহজাদা মুহাম্মদ খান মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন এবং আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি বন্দি হন। তবে কিছুকাল পর এক মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে মুক্তি পেয়ে দিল্লি পৌঁছে যান। এবার আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমীর আলী সরজানদার (যার উপাধি ছিল হাতেম খান) এর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং যখন হাতেম খান অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত হয়ে গেলেন, তখন আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর সাথে দুই বছর অযোধ্যায় অবস্থান করেন। এর বেশি তিনি নিজের মায়ের থেকে আলাদা থাকতে পারেননি এবং পুনরায় দিল্লি চলে আসেন।

এটি ছিল সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদের আমল। আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্রই দিল্লি পৌঁছেছিলেন যে, সুলতান কিছু লেখার ফরমায়েশ করলেন এবং বিনিময়ে অনেক কিছু দেওয়ার ওয়াদা করলেন। আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্জনে বসে কয়েক মাসে "মসনবী কিরানুস সাদাইন" লিখে ফেললেন, যাতে তাঁর কাব্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। সুলতান কায়কোবাদ তাঁকে প্রচুর ইনাম ও ইকরাম প্রদানের পাশাপাশি "মালিকুশ শুয়ারা" খেতাবেও ভূষিত করেন। কিন্তু কায়কোবাদের সালতানাত বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, বরং পরিস্থিতি এমন হলো যে বলবনের পরিবারের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল এবং সুলতান জালালুদ্দিন খিলজি ৬৮৯ হিজরি (১২৯০ খ্রিস্টাব্দ) সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

মোদ্দাকথা, আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বাদশাহ, শাহজাদা এবং আমীরদের সাথে ছিলেন এবং নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লেখালেখিও চালিয়ে যেতেন। তিনি গজল বলতেন, মসনবী লিখতেন, কাসিদাও বলতেন এবং বাদশাহদের নসিহতও করতেন। তিনি অনেক ভাষা জানতেন। ফারসি ও তুর্কি ছাড়াও আরবি, হিন্দি, সংস্কৃত এবং পাঞ্জাবি ভাষাতেও পারদর্শী ছিলেন।

আমীর খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাদশাহদের সাথে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তা এবং গরিবদের প্রতি ভালোবাসা মিশে ছিল। তিনি লিখেছেন যে, তিনি দরবারী জীবন পছন্দ করতেন না, কিন্তু বাধ্য হয়ে তাঁকে সরকার ও দরবারের সাথে সম্পর্ক রাখতে হতো। সম্ভবত এটি ছাড়া তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে সেই স্বাধীনতা পেতেন না, যার কারণে তিনি সাহিত্যের এত বেশি সেবা করতে পেরেছেন।

দিল্লিতে আমির খসরু (রহ.)-এর দুনিয়া কেবল সরকারি দরবার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর হৃদয়ের জগত অন্য এক দরবারের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল আর সেই দরবারটি ছিল সুলতান জি খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর। তাঁর বয়স চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি অনুভব করছিলেন যে, তিনি জীবনের একটি মূল্যবান সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে রাজকীয় মাহফিল এবং আমিরদের মজলিসগুলো নিরর্থক মনে হতে লাগল এবং মুর্শিদের কদমে প্রকৃত প্রশান্তির অনুভূতি হতে লাগল। তিনি তাঁর পীরের সান্নিধ্যে এতটাই বিভোর হয়ে গেলেন যে, তাঁর দুনিয়াবি শান-শওকতের কোনো পরোয়া রইল না। যে খুশু-খুজু, হৃদয়ের ব্যথা এবং অন্তরের দহনের অবস্থা তিনি এখানে লাভ করেছিলেন, তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন তিনি রাতে তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হয়ে অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মাজিদের সাত পারা তিলাওয়াত করতেন। সেই সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর ওপর কান্নার এমন অবস্থা তৈরি হতো যে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি বেহাল হয়ে যেতেন। মুর্শিদকে এই অবস্থার কথা জানালে তিনি বললেন: “আলহামদুলিল্লাহ! এখন কিছু না কিছু প্রভাব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।”

একদিন মুর্শিদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন যে, হায়! আমার কবিতায় যদি এমন মাধুর্য আসত যা হবে অতুলনীয়। মুর্শিদ বললেন: “খাটের নিচে চিনি রাখা আছে, বের করো। তা নিজে খাও এবং উপস্থিতদের মাঝে বণ্টন করে দাও।” আমির খসরু (রহ.) তেমনই করলেন। এখন তাঁর কবিতার উৎস মস্তিষ্কের পরিবর্তে হৃদয় হয়ে গেল এবং এর প্রভাব বহুগুণ বেড়ে গেল। ভাষায় এমন মাধুর্য চলে এল যে, আজ সাতশ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও এর মিষ্টতায় কোনো কমতি আসেনি।

সেই সময় একদিকে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির ক্ষমতা তুঙ্গে ছিল এবং অন্যদিকে সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক বলয়ও অনেক বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়াদারি এবং দ্বীনদারির এই উভয় কেন্দ্রের মধ্যে একটি নীরব ও শীতল দ্বন্দ্ব চলতে থাকত। বাদশাহর কাছে এটি অপছন্দনীয় ছিল যে, একজন সুফি মানুষের ভক্তি ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হবেন। অন্যদিকে দরগাহে নিজামিয়ার ধরন ছিল বাদশাহদের থেকে অমুখাপেক্ষিতা ও নির্লিপ্ততার। এই উভয় দরবারের মাঝে আমির খসরু (রহ.) একটি সেতুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি দিনের বেলা বাদশাহর সামনে দাঁড়াতেন এবং সুযোগ বুঝে কালাম শুনিয়ে প্রশংসা কুড়াতেন। অন্যদিকে প্রতি রাতে সমস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মুর্শিদকে অবহিত করতেন, নতুন কালামও শোনাতেন এবং দোয়া নিতেন।

সুলতানুল মাশায়েখের সমস্ত মুরিদদের মধ্যে আমির খসরু (রহ.)-এর এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যখন চাইতেন অনুমতি ছাড়াই তাঁর নির্জন কক্ষে প্রবেশ করতে পারতেন। হযরত সুলতান জি (রহ.) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর সাথেই পরামর্শ করতেন। মুরিদগণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ আবেদন পেশ করতে চাইলে আমির খসরু (রহ.)-কে সুপারিশকারী বানিয়ে পাঠাতেন। একদিন হযরত সুলতান জি (রহ.) বললেন: “খসরু! আমি সবার ওপর বিরক্ত হই, কখনো নিজের ওপরও বিরক্ত হই, কিন্তু তোমার ওপর বিরক্ত হই না।”

আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলে আমির খসরু (রহ.) গদ্যে “খাজাইনুল ফুতুহ” লিখেছিলেন যা সেই সময়ের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। পাশাপাশি তিনি তাঁর মুর্শিদের মালফুজাত সংগ্রহ করছিলেন যা অনেক বছর পর “আফজালুল ফাওয়ায়েদ” নামে পেশ করেন। আলাউদ্দিন খিলজির পুত্র খিজির খান হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর ভক্ত ছিলেন এবং খানকাহে যাতায়াত করতেন। আমির খসরু (রহ.)-এর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তাঁর অনুরোধে আমির খসরু (রহ.) তাঁর প্রেমের কাহিনীও কাব্যবদ্ধ করেছিলেন যা “মসনবি”

“দেবল রানী খিজির খাঁ” নামে পরিচিত। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শেষ যুগে খিলজিদের শাসন পতনের শিকার হয়ে শেষ হয়ে যায় এবং ৭২০ হিজরিতে দিপালপুরের আমির গাজী মালিক “গিয়াসউদ্দিন তুঘলক” উপাধি ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি পূর্বের ন্যায় তাঁর দরবারের সাথে যুক্ত থাকেন।

৭২৫ হিজরিতে হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল হয়। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন শাহজাদা উলুগ খাঁ (সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক)-এর সাথে বাংলার অভিযান থেকে ফিরছিলেন। “তিরহুত” (মুজাফফরপুর জেলা, বিহার) অঞ্চলে থাকাকালীন তিনি তাঁর মুর্শিদের গুরুতর অসুস্থতার খবর পান। তিনি লস্কর ছেড়ে দ্রুত দিল্লির দিকে রওনা হন কিন্তু মুর্শিদের সাথে দেখা হওয়া ভাগ্যে ছিল না এবং তাঁর রহমাতুল্লাহি আলাইহি পৌঁছানোর পূর্বেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রচণ্ড শোকের কারণে আত্মহারা হয়ে পড়েন। মুখে কালি মেখে নিলেন, জামা ছিঁড়ে ফেললেন এবং অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বললেন:

জামা দারাঁ, চশমে চাকাঁ, খুনে দিল রওয়াঁ

তারপর বললেন: “হে লোকসকল! সুলতান জীর পর আমিও বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারব না।”

আমির খসরু দুঃখ ও শোকের প্রতিচ্ছবি হয়ে মুর্শিদের কবরের পাশে বসে রইলেন। ব্যথার তীব্রতা কখনো কখনো এই দোহা আকারে তাঁর মুখে চলে আসত:

গোরি সোয়ে সেজ পর, মুখ পর ডারো কেস
চল খসরু ঘর আপনে, সো সাঝ ভই চহু দেস

(আমার প্রিয়তম বিছানায় শুয়ে আছেন, মুখে চুল ছড়িয়ে দিয়ে। হে খসরু! এখন তুমিও নিজের ঘরে চলো কারণ চারদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।)

মুর্শিদের ইন্তেকালের মাত্র ছয় মাস পর আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই বিরহ ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় ১৮ শাওয়াল ৭২৫ হিজরি (১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন এবং তাঁর মুর্শিদের পদতলে সমাহিত হন। [১]

আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কবিতা:

আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রচুর কবিতা লিখেছেন, অনেক দিওয়ান সংকলন করেছেন এবং অনেক দীর্ঘ মসনবী লিখেছেন যার প্রতিটিই একটি পূর্ণাঙ্গ বই। তাঁর বইয়ের সংখ্যা অনেক বলা হয়। কেউ কেউ ৯৯টি বইয়ের কথা বলেছেন। মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৯২টি সংখ্যা লিখেছেন। জিয়াউদ্দিন বারানি লিখেছেন যে, আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি কবিতা ও গদ্যে একটি কুতুবখানা রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে যে বইগুলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাতে পাঁচটি দিওয়ান, পাঁচটি মসনবী এবং পাঁচটি মসনবী খামসা নিজামির জবাবে রয়েছে। তিনটি গদ্যের বই রয়েছে। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কবিতার সংখ্যাও হাজার হাজার।

তাঁর উর্দু কালামে অনেক মিশ্রণ রয়েছে। উর্দুতে তাঁর কহে মুকরানিয়াঁ, ধাঁধা, দোহা, দো সুখন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হলো তাঁর এই লোকজ কালাম যাতে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে।

---

[১] তারিখ-এ-ফেরেশতা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৪৭ থেকে ৫৪৮; সিয়ারুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা: ২৯৯ থেকে ৩০৩; আখবারুল আখইয়ার, পৃষ্ঠা: ২২০ থেকে ২২৩; হায়াতে খসরু, আল্লামা শিবলী নোমানী কর্তৃক।

হয়। তাঁর কিতাব ‘খালিক বারী’-ও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং দীর্ঘকাল ধরে মাদরাসাগুলোতে পড়ানো হচ্ছে। [১]

উর্দু ভাষার ভিত্তিতে খানকাহে নিজামী এবং আমির খসরুর ভূমিকা:

আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে উর্দু ভাষার জনকদের মধ্যে গণ্য করা হয়। সেই যুগে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে একটি মিশ্র ভাষা অস্তিত্ব লাভ করেছিল যাকে ‘খাড়ি বোলি’ বলা হতো। এই ভাষা ব্যাকরণ ও কাঠামোর দিক থেকে খাড়ি বোলি ছিল, কিন্তু এতে ফারসি ও আরবি শব্দও অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করেছিল। এই ভাষাই উত্তর ভারতে যোগাযোগের ভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল। [২]

সুফিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে চিশতিয়া সিলসিলার এই ঐতিহ্য ছিল যে, তাঁরা সাধারণ মানুষের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য তাদের ভাষাতেই কথা বলতেন। আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর মুর্শিদের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এছাড়া খানকাহে নিজামীতে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডজন ডজন ভাষায় কথা বলা মানুষ আসত; এই পরিস্থিতি আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এই খাড়ি বোলিকে আরও জনপ্রিয়, সহজ এবং একটি উন্নত সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মনোযোগী করে তোলে। মুর্শিদের উৎসাহ, দরগাহর পরিবেশ এবং পীর ভাইদের সহযোগিতায় আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ভাষাকে উন্নত করতে থাকেন। এর নমুনা তাঁর মিষ্টি কবিতা এবং শিশুদের জন্য লেখা ধাঁধাগুলোতে রয়েছে। বর্তমান উর্দুর কাছাকাছি কিছু বিখ্যাত ধাঁধা দেখুন:

- এক থাল মোতিওঁ সে ভরা, সব কে সর পর ঔন্ধা ধরা / চারোঁ ওর ওহ থাল ফিরে, মোতি উস সে এক না গিরে [৩]
- তর ওয়া কা পচ্ছমভা পনে ওয়া কে ইয়ুঁ / আমির খসরু ইয়ুঁ কহেঁ কে বীচ মেঁ লকড়ি কিউঁ [৪]
- বীসোঁ কা সর কাট লিয়া..... না মারা, না খুন কিয়া [৫]
- অন্দর চলন বাহর চলন, বীচ কলেজা ধড়কে..... আমির খসরু ইয়ুঁ কহেঁ, দো দো উঙ্গল সরকে [৬]

হিন্দভি খাড়ি বোলি এবং ফারসির চমৎকার সংমিশ্রণের একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা লক্ষ্য করুন যাকে উর্দুর প্রথম গজলও বলা হয়:

---

[১] হায়াতে খসরু, আল্লামা শিবলী নোমানী; আমির খসরু, সৈয়দ গোলাম সামনানী; আমির খসরু দেহলভী, প্রফেসর মমতাজ হোসেন; হামদর্দ নওনেহাল ডিসেম্বর ১৯৭৫, প্রবন্ধ ‘আমির খসরু আওর হাম’, মাসউদ আহমদ বরকাতি।

[২] খাড়ি বোলি বলতে সংস্কৃত বা আজকের আধুনিক হিন্দি ভাষাকে বোঝায় না। এটি মূলত একটি ‘স্থানীয় উপভাষা’ ছিল যা সেই সময়ে দিল্লি, মিরাট, অযোধ্যা এবং এর আশপাশের এলাকাগুলোতে বলা হতো। এটি আজকের উর্দু ও হিন্দি উভয়েরই ভাষাগত ভিত্তি। এই খাড়ি বোলিতে যখন ফারসি, আরবি ও তুর্কি ভাষার শব্দ অন্তর্ভুক্ত হলো, তখন এটি একটি নতুন রূপ ধারণ করল যাকে সেই সময়ে ‘হিন্দভি’ বলা হতো, যা পরবর্তীতে উর্দুর রূপে সামনে আসে।

[৩] (উত্তর: আকাশ ও তারা) চারোঁ ওর-এর অর্থ: চার দিক।

[৪] (উত্তর: রসুন) এই ধাঁধায় ‘ওয়া’ এর অর্থ ‘ওহ’ (সে/তা)। এটি খাড়ি বোলির শব্দ। পচ্ছমভা এর অর্থ ‘নরম’।

[৫] (উত্তর: নখ কাটার যন্ত্র)

[৬] (উত্তর: কাঁচি)

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

জিহাল-এ মিসকীন মাকুন তাগাফুল, দুরায়ে নয়ন বনায়ে বতিয়াঁ
কে তাব-এ হিজরাঁ নাদারাম আয় জান, না লেহু কাহে লাগায়ে ছাতিয়াঁ
(আমার দুঃখিত অবস্থার প্রতি অবহেলা করো না, চোখ মিলিয়ে কথা বলো। কারণ আমি বিচ্ছেদের কষ্ট সহ্য করতে পারছি না, হে প্রিয়! তুমি আমাকে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছ না কেন?)

শাবান-এ হিজরাঁ দরাজ চু যুলফ ও রোয-এ ওয়াসলাত চু উমর কোতাহ
সখী! পিয়া কো জো ম্যায় না দেখুঁ তো ক্যায়সে কাটুঁ আন্ধেরি রতিয়াঁ
(বিচ্ছেদের রাতগুলো তোমার অলকের মতো দীর্ঘ, আর মিলনের দিনটি জীবনের মতো সংক্ষিপ্ত। হে সখী! যদি আমি আমার প্রিয়কে না দেখি তবে এই অন্ধকার রাতগুলো কীভাবে কাটাব?)

ইয়াকায়েক আয দিল দো চশম-এ জাদু ব-সদ ফরেবম ব-বুরদ তসকীন
কিসে পড়ি হ্যায় জো জা সুনায়ে পিয়ারে পী কো হমারি বতিয়াঁ
(হঠাৎ তার জাদুময় দুই চোখ শত প্রতারণার মাধ্যমে আমার হৃদয়ের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। এখন কে আছে যে গিয়ে আমাদের প্রিয়কে আমাদের কথা শোনাবে?)

চু শম-এ সোযা চু যররা হ্যায়রাঁ য মেহর-এ আঁ মহ ব-কুশতম আখের
না নিন্দ নয়নঁ না অঙ্গ চৈনঁ না আপ আয়ে না ভেজে পতিয়াঁ
(আমি সেই চাঁদের মতো প্রিয়র অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত মোমবাতির মতো জ্বলে এবং ধূলিকণার মতো দিশেহারা হয়ে গেলাম। না চোখে ঘুম আছে, না শরীরে শান্তি। না সে নিজে আসে আর না কোনো বার্তা পাঠায়।)

ব-হক্ক-এ রোয-এ ওয়াসাল-এ দিলবর কে দাদ মা রা গরীব খুসরো
সপিত মন কে ওয়ারাঁ রাখুঁ জো জাকে পাওঁ পিয়া কি খতিয়াঁ
(প্রিয়র সাথে মিলনের দিনের দোহাই! এই নিঃস্ব খসরুর ফরিয়াদ যেন কবুল করা হয়। আমি আমার সাদা মন (ক্ষতবিক্ষত হৃদয়) তার পায়ে বিছিয়ে দেব, যদি আমি আমার প্রিয়র কদমে যাওয়ার সুযোগ পাই।)

এই গজলটিতে আমির খসরু রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুর্শিদ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা, বিচ্ছেদের দুঃখ এবং তাঁর দিদারের (সাক্ষাতের) আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করেছেন। মোদ্দাকথা, আমির খসরুর সাহিত্যিক প্রতিভা এবং সুফিবাদী অন্তর্দৃষ্টি এই গজল, কাওয়ালি এবং দোহায় ফারসি, আরবি, তুর্কি এবং হিন্দবিকে মিশ্রিত করে একটি নতুন ভাষার জন্ম দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা উর্দু নামে পরিচিত। [১]

---

[১] হায়াতে খসরু, আল্লামা শিবলী নোমানী; আমির খসরু, আহদ-ফন অওর শখসিয়াত; সুফি আমির খসরু; আমির খসরু ও ফর্দা-এ-তারিখ; নযর-এ-খসরু, পহেলিয়াঁ অওর কহে মুকরনিয়াঁ; আমির খসরুর পহেলিয়াঁ, আদিল আসির দেহলভী; খসরুর পহেলিয়াঁ, শাহীন জাফর আলভী।

শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগ-ই-দেহলি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

৬৭৩ হিজরি থেকে ৭৫৭ হিজরি

(১২৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি সাধারণত "চেরাগ-ই-দেহলি" উপাধিতে পরিচিত, চিশতিয়া সিলসিলার একজন মহান সুফি সাধক এবং হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খলিফা ও আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি ছিলেন। তাঁকে "চেরাগ-ই-দেহলি" উপাধি দেওয়া হয়েছিল কারণ তাঁর মুর্শিদের ইন্তেকালের পর তিনি দিল্লিতেই অবস্থান করেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে দিল্লিকে আলোকিত রাখেন, যখন তাঁর অন্যান্য সাথীরা ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন।

তাঁর জন্ম ৬৭৩ হিজরিতে (১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে) অযোধ্যায় হয়েছিল। তিনি একটি ধর্মপ্রাণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। যখন তাঁর বয়স নয় বছর, তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেন। তিনি কাজী মহিউদ্দিন কাশানি, মাওলানা আব্দুল করিম শেরওয়ানি এবং মাওলানা ইফতিখারুদ্দিন গিলানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং এরপর শিক্ষা ও পাঠদানে নিয়োজিত হন।

৪৩ বছর বয়সে মারিফাতে ইলাহিয়া অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। একজন কামেল মুর্শিদের সন্ধান তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে আসে। তিনি শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উপস্থিত হন এবং বায়আত হয়ে ইবাদত, রিয়াজত, আত্মশুদ্ধি ও জিকির-আজকারে মশগুল হয়ে যান। তিনি নিজেকে মুর্শিদের খেদমত, রিয়াজত ও প্রেমে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন। শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই মুরিদকে নিয়ে গর্ব করতেন।

হযরত চেরাগ-ই-দেহলি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুর্শিদের আরামের প্রতি সবরকম খেয়াল রাখতেন। একবার শীতের এক রাত ছিল। খানকাহে একজন মেহমান দরবেশ আসলেন; তিনি যখন অজু করতে গেলেন, তখন পেছন থেকে কেউ তাঁর গরম কাপড় (চাদর, জুব্বা ইত্যাদি) চুরি করে নিয়ে গেল। তিনি ফিরে এসে নিজের জায়গায় কাপড় না পেয়ে শোরগোল শুরু করলেন। শেখ নাসিরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের গরম আলখাল্লা খুলে তাঁকে পরিয়ে দিলেন যাতে তাঁর শোরগোলে মুর্শিদের আরামে ব্যাঘাত না ঘটে। পরে মুর্শিদ যখন এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁকে অনেক দোয়া দিলেন এবং সাথে নিজের বিশেষ পোশাকও দান করলেন।

শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বভাবগতভাবে মানুষের ভিড় এড়িয়ে চলতেন এবং একান্তে ইবাদত করতে পছন্দ করতেন। একবার...

আমির খসরু (রহ.)-এর মাধ্যমে তাঁর মুর্শিদের কাছে আবেদন পাঠানো হয়েছিল যে, তিনি কোনো পাহাড় বা জঙ্গলে গিয়ে নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করতে চান। মুর্শিদ উত্তর দিলেন: "তোমাকে সৃষ্টির মাঝেই থাকতে হবে—তাদের রূঢ়তা সহ্য করতে হবে।"

এমন মনে হয় যে, হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) তাঁর ইন্তেকালের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই নিজের ঈমানি দূরদর্শিতা দিয়ে অনাগত সময়ের আভাস পেয়েছিলেন এবং আন্দাজ করেছিলেন যে, এখন সুফিদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা প্রকাশ পাবে এবং নতুন সুলতান (মুহাম্মদ তুঘলক), যিনি ওই সময় সিংহাসনে আরোহণ করার মাত্র কয়েক মাস হয়েছিল, তাঁদের জনপ্রিয়তা ধ্বংস করার পেছনে লেগে যাবেন। এমন পরিস্থিতিতে এই মাশায়েখদের আসনে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকার জন্য এমন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, যার ধৈর্য ও সহনশীলতার শক্তি চরম পর্যায়ের হবে এবং যার মধ্যে সবরের গুণ প্রবল হবে যাতে হাজারো বিপদের তুফানও তাকে টলাতে না পারে। তাই হযরত নিজামুদ্দিন (রহ.) শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (রহ.)-এর আনুগত্য ও নিষ্ঠার পাশাপাশি সবর ও সহনশীলতার বিশেষ গুণটি বিবেচনা করে ইন্তেকালের পূর্বে দিল্লিতে চিশতিয়া সিলসিলার লাগাম তাঁর হাতে তুলে দেন এবং তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন এবং পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে, তোমাকে এই শহরেই থাকতে হবে এবং জুলুম সহ্য করতে হবে।

হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর খাজা নাসিরুদ্দিন (রহ.) তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর আসন গ্রহণ করেন এবং মুর্শিদের কাজ অব্যাহত রাখেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের দৌলতাবাদ স্থানান্তরের কারণে শহরের জৌলুস শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক খানকাহ ও মাদ্রাসা জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও হযরত নাসিরুদ্দিন "চিরাগ-ই-দেহলি" (দিল্লির প্রদীপ) হয়ে অন্ধকার পথগুলোকে আলোকিত করেন এবং সৃষ্টিজগতকে আল্লাহর দিকে সঠিক পথ দেখাতে থাকেন।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক তাঁর শাসনামলে অনেক উলামা ও মাশায়েখকে নিজের কাছে টেনে নেন এবং তারপর তাঁদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেন। এভাবে তিনি ওইসব দ্বীনি বুজুর্গদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চেয়েছিলেন যাদের জনপ্রিয়তা তিনি নিজের রাজনীতির জন্য হুমকি মনে করতেন। তিনি হযরত চিরাগ-ই-দেহলি (রহ.)-এর সাথেও একই ধরনের আচরণ করার চেষ্টা করেন।

তিনি শেখকে এক ভোজসভায় দাওয়াত করেন এবং রুপার পাত্রে খাবার পরিবেশন করান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত যদি খাবার গ্রহণ করেন তবে তিনি এই বলে তাঁকে অপমান করবেন যে, তিনি রুপার পাত্রে খাবার খেয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজ করেছেন। আর যদি তিনি খাবার খেতে অস্বীকার করেন, তবে তিনি এই বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন যে, তিনি বাদশাহর অবমাননা করেছেন।

হযরত যখন দস্তরখানে বসলেন এবং এই পরিস্থিতি দেখলেন, তখন তিনি একটি পাত্র থেকে সামান্য খাবার তুলে নিজের হাতের ওপর রাখলেন এবং তারপর সেখান থেকে সামান্য কিছু খেলেন। হযরতের এই প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দেখে বাদশাহ অবাক হয়ে গেলেন। এরপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি আপনাকে আর কোনো কষ্ট দেননি।

অনেক বছর পর সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এক নতুন চাল চাললেন এবং হযরতকে নির্দেশ পাঠালেন যে, আপনি আমার দরবারে "জামাদার" হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করুন। [১]

---

[১] জামাদার ওই কর্মকর্তাকে বলা হতো যিনি রাজদরবারে রাজকীয় পোশাক ও পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল বাদশাহর জন্য মূল্যবান ও আকর্ষণীয় পোশাকের ব্যবস্থা করা, সেগুলোর দেখাশোনা করা এবং বাদশাহর সামনে তা পেশ করা।

শেখ তা অস্বীকার করলেন। এতে বাদশাহ তাকে বন্দী করলেন। তখন শেখের তার মুর্শিদের কথা মনে পড়ল যে তোমাকে সৃষ্টির পক্ষ থেকে আসা কষ্ট সহ্য করতে হবে। তাই তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সেই পদটি গ্রহণ করে নিলেন।

এর কিছুদিন পর মুহাম্মদ তুঘলক এক সফরে বের হলেন, যার সমাপ্তি ঠাট্টার কাছে তার মৃত্যুর মাধ্যমে হলো। এই সফরেও শেখ চেরাগ দেহলভী (রহ.) বাদশাহর সাথে জামাদার হিসেবে ছিলেন। তাদের এই সাহচর্যের বরকত এই ছিল যে, বাদশাহর মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ তুঘলকের মতো ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উত্তরসূরি হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হলো। ঐতিহাসিক সিরাজ আফিফের মতে, শেখ এই সুযোগে ফিরোজ শাহর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করবেন। ফিরোজ শাহ তা ওয়াদা করলেন এবং শেখ দোয়া করলেন যে আল্লাহ তাকে দীর্ঘ শাসনকাল দান করুন। ফলে এই দোয়া কবুল হলো।

মোদ্দাকথা, এমন ধৈর্য ও সহনশীলতার বদৌলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে শেখের মাধ্যমে একটি মহান রাজনৈতিক খিদমত সম্পন্ন হলো এবং হিন্দুস্তান একটি যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির পরিবর্তে রহমত, দয়া ও গঠনমূলক উন্নতির এক পূর্ণাঙ্গ যুগ লাভ করল।

হযরত চেরাগ দেহলভী (রহ.) নিজের রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী বাকি জীবন রাজনৈতিক বিষয়াবলি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকলেন এবং নিজের সমস্ত মনোযোগ আধ্যাত্মিকতা, প্রচার এবং মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের ওপর নিবদ্ধ করলেন। মানুষ তাসাউফের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে শরীয়তের বিধান থেকে বিচ্যুত হচ্ছিল অথবা সেগুলোর অপব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিল। তিনি (রহ.) শরীয়তের অটল অনুসরণের ওপর জোর দিলেন এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে নিষেধ করলেন। তার মজলিসে বেশিরভাগ সময় কুরআন ও হাদীসের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হতো।

তিনি (রহ.) বলতেন: “মানুষ কুরআন ও হাদীস ছেড়ে দিয়েছে, এই কারণেই তারা খারাপ অবস্থায় ও পেরেশানিতে আছে।”

তিনি বলতেন: “মুরিদের জন্য তিন প্রকারের গোসল জরুরি: প্রথম, শরয়ী গোসল অর্থাৎ শরীরকে নাপাকি থেকে পবিত্র রাখা। দ্বিতীয়, তরিকতের গোসল অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব চিন্তা থেকে পবিত্র রাখা। তৃতীয়, হাকিকতের গোসল অর্থাৎ অন্তরে তওবা করে থাকা।”

তার একটি বাণী স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য: “ঈমানের চিন্তা করো, কারামতের পেছনে পড়ো না।”

তিনি (রহ.) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ওপর জোর দিতেন এবং এর উপকারিতা বর্ণনা করতেন। একবার বললেন: “তিলাওয়াতকারী চোখের রোগ থেকে নিরাপদ থাকে এবং তার দৃষ্টিশক্তি কম হয় না।”

শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলভী (রহ.) থেকে চিশতিয়া সিলসিলার সেই যুগের সূচনা হয় যাতে তাসাউফে ইলমি মেজাজের প্রাধান্য দেখা যায় এবং শরীয়ত সংরক্ষণের বিষয়টিকে তরিকতের কল্যাণের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হতে থাকে। এর আগে হযরত সুলতানুল মাশায়েখের (রহ.) ইন্তেকাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক যুগে সাধারণত খানকাহগুলোতে কাইফ, স্বাদ ও ভাবাবেগ প্রবল ছিল। হযরত চেরাগ দেহলভী এই প্রাচীন ধারা পরিবর্তন করে দিলেন। এই ব্যাপারে তিনি কারো নিন্দার পরোয়া করেননি।

একবার তিনি তার এক পীর-ভাইয়ের দাওয়াতে তার বাড়িতে গেলেন। সেখানে বাদ্যযন্ত্রের সাথে সামা শুরু হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে চলে আসলেন। মানুষ থামানোর চেষ্টা করলে তিনি বললেন: “এটি সুন্নাহ বিরোধী কাজ।” মানুষ বলতে লাগল: “আপনি কি সামা অস্বীকারকারী হয়ে গেছেন? আর নিজের পীরদের মাশরাব ছেড়ে দিয়েছেন?”

আপনি (রহ.) বললেন: “এটি তো কোনো প্রমাণ নয়। কুরআন মাজীদ ও হাদীস থেকে কোনো দলিল নিয়ে এসো।”

আপনি (রহ.) সামা-তে বাদ্যযন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বলতেন: “বাদ্যযন্ত্রের সাথে সামা জায়েজ নয়।”

যদি কেউ তরিকতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে অন্তত শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে তো থাকুক, অন্যথায় শরীয়তের বাইরে গিয়ে সে কোথায় যাবে।

হযরত চেরাগ দেহলভী (রহ.) যখন এমন সূফীদের দেখতেন যারা তাসাউফের আড়ালে শরীয়ত থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন এবং বলতেন: “আমি কিসের যোগ্য যে মাশায়েখের আসনে বসব। মানুষ একে শিশুদের খেলা বানিয়ে রেখেছে।”

কখনো কখনো অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে আক্ষেপের সাথে হাকীম সানায়ীর এই কবিতাটি পড়তেন:

মুসলমানগণ, ওহে মুসলমানগণ! ইসলাম, ইসলাম... এই ধর্মহীন রীতি থেকে অনুশোচনা, অনুশোচনা।

এরপর বলতেন: “হে মুসলমানগণ! শরীয়তের ওপর আমল করো। তোমরা যে পথ অবলম্বন করেছ, তা ধর্মহীনদের পথ। এ থেকে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না।”

আপনি (রহ.) নিজ যুগের অনেক বড় পণ্ডিত ও আলেম ছিলেন। আপনি (রহ.) তাসাউফের পাশাপাশি সর্বদা শিক্ষা ও পাঠদান অব্যাহত রেখেছিলেন। আপনি (রহ.) মুরীদদের সর্বদা শরীয়তের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ দিতেন, ইলম অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করতেন এবং বলতেন:

“একটি শরয়ী মাসআলার ওপর সততার সাথে চিন্তা-গবেষণা করা রিয়া ও অহংকারের ইবাদতসমূহের চেয়ে উত্তম।”

আপনার (রহ.) খলীফাদের মধ্যেও এই একই বৈশিষ্ট্য ছিল যাদের মধ্যে মাওলানা আহমদ থানেসরী, মাওলানা মুহাম্মদ খওয়াজগী এবং কাজী আব্দুল মুকতাদির (রহ.) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তুঘলক যুগ যথার্থই আধ্যাত্মিক ও ইলমী উভয় দিক থেকে হযরত চেরাগ দেহলভী (রহ.) এবং তাঁর খলীফাদের যুগ ছিল। এই মহান ব্যক্তিদের মেহনতের ফল এই হয়েছিল যে, পরবর্তীতে সেই সূফীগণই ধর্মীয় মহলে মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন যারা শরীয়ত ও তরিকতের সমন্বয়কারী ছিলেন।

শেখ চেরাগ দেহলভী যে কঠিন সময়ে এই মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তার আন্দাজ করা সহজ নয়। মুহাম্মদ তুঘলকের যুগে তাঁর সাথে যা কিছু ঘটেছে, তা আপনারা পড়েছেন। এরপর ফিরোজ শাহ তুঘলকের যুগে আপনার জন্য স্বস্তি ও আরামের দিন শুরু হয়েছিল কিন্তু তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রমাণিত হলো।

একদিন আপনি (রহ.) হুজরায় একাকী ইবাদত করছিলেন এবং কারো ভেতরে আসার অনুমতি ছিল না, এমন সময় তুরাবী নামক এক মজজুব প্রকৃতির মালং হঠাৎ হুজরার ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং আপনাকে ছুরি দিয়ে বেশ কয়েকটি আঘাত করল। আপনি (রহ.) উফ পর্যন্ত করলেন না। রক্ত প্রবাহিত হয়ে যখন হুজরার বাইরে আসতে লাগল, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা খাদেমরা বুঝতে পারল যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভেতরে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে তারা সেই মালংকে ধরে ফেলল। ততক্ষণে আপনি এগারোটি আঘাত পেয়েছিলেন। আপনি (রহ.) আক্রমণকারীকে অক্ষম মনে করে ক্ষমা করে দিলেন এবং নিজের খাদেমদের কঠোরভাবে বললেন যে, কেউ যেন তাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা না করে। এরপর সেই মালংকে পঞ্চাশটি আশরাফী ও একটি ঘোড়া দিয়ে দিলেন যাতে সে কোথাও দূরে চলে যায় এবং মানুষ তার থেকে প্রতিশোধ না নেয়। এটি ছিল ধৈর্য ও সহনশীলতার এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত যার উদাহরণ বিরল হবে।

যদিও সেই সময় মলম-পট্টির মাধ্যমে ক্ষত শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আপনি (রহ.) এখন এতটাই দুর্বল ও কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন যে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারেননি। তিন বছর পর শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং প্রতিশ্রুত সময় সামনে দেখা দিতে লাগল।

আপনার (রহ.) খাস খাদেম মাওলানা জয়নুদ্দিন আলী আরজ করলেন যে, আপনি আপনার কোনো উত্তরসূরি নিযুক্ত করে দিন যাতে দিল্লির খানকাহ-এ-নিজামিয়ার জৌলুস বজায় থাকে। কিন্তু আপনি (রহ.) সময়ের আবর্তনকে পরিবর্তিত হতে দেখছিলেন এবং বুঝে গিয়েছিলেন যে এখন দিল্লিতে চিশতিয়া সিলসিলার বড় মাশায়েখদের যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। পরবর্তী যুগ অন্য কারো। তাই বললেন:

“মৌলভী জয়নুদ্দিন! এখন তো মানুষের নিজের ঈমানের চিন্তা করা উচিত। সেই সুযোগ কোথায় যে মানুষ অন্যদের বোঝাও বহন করবে।”

শেষ মুহূর্তের পূর্বে অসিয়ত করলেন: “দাফনের সময় হযরত সুলতান জী (রহ.)-এর কুর্তা আমার সিনার ওপর রেখে দিও, আমার মুর্শিদের লাঠি আমার পাশে রেখো। তাঁর তসবিহ আমার আঙুলের সাথে জড়িয়ে দিও। তাঁর কাঠের পেয়ালা আমার মাথার নিচে রেখো। তাঁর খড়মও (কাঠের জুতো) আমার সাথেই দাফন করে দিও।”

শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ-এ-দহলি ১৮ রমজান ৭৫৭ হিজরি (১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন। এর সাথেই দিল্লির খানকাহ-এ-নিজামিয়া চিশতিয়ার নেতৃত্বের যুগ শেষ হলো। চিশতিয়া মাশায়েখদের মধ্যে যে তবাররুকাত হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) থেকে একের পর এক প্রতি যুগের সিলসিলার প্রধানদের কাছে পৌঁছে আসছিল, দিল্লির এই শেষ চিশতি চেরাগের সাথেই তা মাটির নিচে বিলীন হয়ে গেল।

আপনি (রহ.) সারাজীবন বিবাহ করেননি। আপনার আধ্যাত্মিক সন্তানরাই আপনার ওয়ারিশ হয়েছে। তাদের মধ্যে সৈয়দ বন্দা নেওয়াজ গেসু দরাজ (রহ.)-এর নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল, যিনি নিজের শায়খের দাফনের পর সেই খাটিয়ার রশিগুলো খুলে গলায় পরে নিয়েছিলেন যেটির ওপর তিনি শায়খকে গোসল দিয়েছিলেন। সাথে বললেন: “আমার জন্য তো নিজের শায়খের এই কুর্তাই যথেষ্ট।”

আপনার (রহ.) মাজার নতুন দিল্লির একটি এলাকায় অবস্থিত যা আপনার (রহ.) নামানুসারে “চেরাগ-এ-দহলি” নামেই পরিচিত। আপনার মাজার আজও জিয়ারতকারীদের জন্য একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে।

আপনার (রহ.) মালফুজাত আপনার এক মুরিদ শেখ আব্দুল হামিদ “খাইরুল মাজালিস” নামে সংকলন করেছেন যা চিশতিয়া সিলসিলার শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই মালফুজাতে আপনার শিক্ষা এবং নিজের মুর্শিদের কাছ থেকে অর্জিত জ্ঞানের নির্যাস বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬ থেকে ৫৭; সিয়ারুল আরেফিন উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৩৩, মুদ্রিত: কেন্দ্রীয় উর্দু বোর্ড, লাহোর; আখবারুল আখইয়ার, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, পৃষ্ঠা ১৮৫, ১৮৬; তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, সিরাজ আফিফ, পৃষ্ঠা ২৯; তাযকিরা-ই-আউলিয়া-ই-হিন্দ ও পাকিস্তান, মুফতি ওয়ালী হাসান টোঙ্কি, পৃষ্ঠা ১০১ থেকে ১০৯; সাওয়ানেহ হযরত নাসিরুদ্দিন চেরাগ-এ-দহলি, সাহেবজাদা সৈয়দ তমিজুদ্দিন নাসিরি।

মাওলানা ফখর উদ্দিন যররাদী রহ.

মাওলানা ফখর উদ্দিন যররাদী রহ. তাঁর সময়ের একজন প্রখ্যাত আলেম এবং শায়খে তরিকত ছিলেন। ইলমি কামালত এবং সত্যবাদিতার দিক থেকে তিনি তাঁর যুগে অনন্য ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল মূলত পাঞ্জাবের সামানা শহরে। তিনি শৈশব থেকেই ইলম অর্জন শুরু করেন এবং দিল্লিতে এসে মাওলানা ফখর উদ্দিন হানসাবী রহ.-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। কাজী কামাল উদ্দিন হানসাবী রহ. এবং শায়খ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী রহ. তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

মাওলানা যররাদী রহ. শুরুতে সুফিদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং বিশেষ করে সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর ওপর কঠোর সমালোচনা করতেন। শায়খ নাসির উদ্দিন রহ. যখন তাঁকে নিজের মুরশিদের সমালোচনা করতে দেখতেন, তখন তিনি ব্যথিত হতেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে সুলতান জি রহ.-এর মজলিসে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন, কিন্তু মাওলানা যররাদী রহ. তাতে রাজি হতেন না।

একদিন শায়খ নাসির উদ্দিন চেরাগে দেহলভী রহ. কোনোভাবে মাওলানা যররাদী রহ.-কে খানকাহে নিজামিয়ায় নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সুলতান জি রহ.-এর ইলমি কামালত এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে পারলেন না। ফলশ্রুতিতে তিনি হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহ.-এর ভক্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে আজকার, ওজাইফ এবং ইবাদত ও রিয়াজতে মশগুল হয়ে গেলেন। অবশেষে তিনি হযরত সুলতান জি রহ.-এর পক্ষ থেকে ইজাজত ও খিলাফত লাভের গৌরবও অর্জন করেন।

এরপর তিনি সারা জীবন তাঁর মুরশিদের খানকাহেই অবস্থান করেন এবং সেই সাথে তাঁর পাঠদান ও ইলমি কার্যক্রমও পুরোদমে চালিয়ে যান। শেষ জীবনে তিনি হজ পালন এবং হারামাইন শরিফাইনের রওজায়ে পাক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। ফেরার পথে তিনি বাগদাদ সফরও করেন এবং সেখানে অনেক মাশায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করে ইলমে হাদিসে পারদর্শিতা অর্জন করেন। হিন্দুস্তানে ফেরার পথে তাঁর সমুদ্রগামী জাহাজ ডুবে যায় এবং তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

মাওলানা যররাদী রহ. অত্যন্ত সত্যবাদী ও নির্ভীক মানুষ ছিলেন। আল্লাহর ব্যাপারে তিনি কারো নিন্দার পরোয়া করতেন না এবং জালেম সুলতানের সামনে সত্য কথা বলতে দ্বিধাবোধ করতেন না। যে সময় সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা করছিলেন, সেই দিনগুলোতে তিনি মাওলানা যররাদী রহ.-কে নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং বলতে লাগলেন:

“আমি চেঙ্গিস খানের বংশধরদের ধ্বংস করতে চাই। আপনি কি এই কাজে আমাকে সহযোগিতা করবেন?” [১]

মাওলানা বললেন: “ইনশাআল্লাহ তাআলা।” সুলতান বললেন: “এই শব্দটি সন্দেহ প্রকাশ করে।”

---

[১] আমরা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের এই অভিযানের অবস্থা আগেই লিখেছি যে, অগাধ অর্থ ব্যয় করার পরও এই অভিযান শুরু করা সম্ভব হয়নি এবং তা কেবল সৈন্য ছাউনিতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মাওলানা বললেন: “না, এটি ভবিষ্যতের কাজের জন্য বলা হয়।”

সুলতানের মুখ রাগে লাল হয়ে গেল কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বলতে লাগলেন: “আমাকে কিছু নসিহত করুন যাতে আমি তার ওপর আমল করতে পারি।”

মাওলানা বললেন: “নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করুন।” সুলতান না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করলেন: “কোন রাগ?”

মাওলানা উত্তর দিলেন: “হিংস্র পশুর মতো রাগ।”

এতে সুলতান আগের চেয়েও বেশি রাগান্বিত হলেন কিন্তু তিনি রাগ চেপে রাখলেন। মাওলানাকে বিদায় জানানোর সময় সুলতান মুদ্রার একটি থলি এবং একটি দামী পোশাক (খিলআত) পেশ করলেন। কুতুবুদ্দিন দাবীর নামক এক দরবারী দ্রুত এগিয়ে এসে মাওলানার জুতো নিজের বগলে চেপে ধরলেন, সেই উপহারগুলো নিজের হাতে নিলেন এবং মাওলানাকে বিদায় জানাতে চলে গেলেন। আসলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মাওলানার মতো নির্লোভ মানুষ কখনোই এই উপহারগুলো নিজে বহন করবেন না এবং সুলতান একে নিজের অপমান মনে করে তাঁকে বন্দি বা হত্যা করবেন।

যখন কুতুবুদ্দিন দাবীর মাওলানাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলেন, তখন সুলতান অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বললেন: “আজ তুমি তাঁকে আমার তলোয়ার থেকে বাঁচিয়ে দিলে কিন্তু নিজের জীবনকে বিপদে ফেললে।”

কুতুবুদ্দিন দাবীর বললেন: “তিনি আমার পীর (সুলতানুল মাশায়েখ)-এর খলিফা। তাঁর জুতো বহন করা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় এবং তাঁর আসবাবপত্র বহন করে আমি তাঁকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি।”

মোদ্দাকথা, সুলতানের খারাপ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও মাওলানা যারাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে গেলেন। আল্লাহ সেই দরবারীকেও হিফাজত করলেন এবং তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না। [১]

বলা হয় যে, আল্লামা যারাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাগ্মী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। শেখ সিরাজুদ্দিন উসমান ওধী, মাওলানা রুকনুদ্দিন, তাঁর ভাই সদরুদ্দিন ইন্দরপতী, মুহাম্মদ বিন মুবারক কিরমানী, তাঁর চাচা হুসাইন বিন মাহমুদ চিশতী এবং আরও অনেকে তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। মাওলানা যারাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেকগুলো কিতাবের লেখক ছিলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো ‘আল-উসমানিয়া’ যা ইলমে সরফ-এর ওপর রচিত এবং এটি শেখ সিরাজুদ্দিন উসমান রহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্য লেখা হয়েছিল। মাওলানার মৃত্যু ৭৪৮ হিজরিতে হয়েছিল। [২]

---

[১] সিয়ারুল আরিফীন-এ এই ধরণের একটি ঘটনা শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলভীর ব্যাপারেও লেখা হয়েছে। আমি এটি সিয়ারুল আউলিয়া থেকে উদ্ধৃত করেছি যা অধিকতর প্রাচীন উৎস।

[২] সিয়ারুল আউলিয়া: পৃ. ২৭২-২৭৪; নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃ. ১৮৫।

বুআলী শাহ কলন্দর পানিপতি রহ.

৬০৫ হিজরি থেকে ৭২৪ হিজরি

(১২০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

শেখ শরফুদ্দিন বুআলী কলন্দর রহ. উপমহাদেশের একজন কারামত সম্পন্ন বুজুর্গ ছিলেন। ৬০৫ হিজরিতে (১২০৯ খ্রিষ্টাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বংশধারা ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-এর সাথে গিয়ে মিলেছে। তিনি তাঁর কুনিয়াত 'বুআলী' (আবু আলী) নামেই প্রসিদ্ধ। [১]

তিনি একজন প্রাজ্ঞ আলেম ছিলেন। ত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি দরস ও তাদরিসে (শিক্ষাদান ও পাঠদান) মশগুল ছিলেন। তিনি দিওয়ানধারী একজন কবিও ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি দিল্লিতে আসেন এবং খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহ.-এর মাজারে হাজিরা দেন। এরপর তিনি দিল্লিতে দরস ও তাদরিসে মশগুল হয়ে যান এবং টানা বিশ বছর পর্যন্ত তাঁর দরস জারি থাকে। ষাট বছর বয়সে তাঁর ওপর জজবার (আধ্যাত্মিক উন্মাদনা) হালত সৃষ্টি হয় এবং তিনি দিল্লি ছেড়ে আউলিয়ায়ে কেরামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এই সফরে তিনি অনেক বুজুর্গানে দ্বীনের নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করেন, তাঁদের মধ্যে শেখ শামসুদ্দিন তাবরিজি রহ. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি শেখ কুতুবুদ্দিন আবহারি রহ.-এর খলিফা ছিলেন। [২]

তাঁরা ছাড়াও তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রহ. (মৃত্যু ৬৭২ হিজরি/১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) থেকেও ফয়েজ হাসিল করেন। এই উভয় বুজুর্গের পক্ষ থেকে তাঁকে খিরকায়ে খিলাফতও প্রদান করা হয়। এরপর তিনি হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন এবং পানিপতে অবস্থান করেন। তিনি একশ বছরেরও বেশি বয়স পেয়েছিলেন এবং ৭২৪ হিজরিতে (১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। বার্ধক্যে যখন তিনি মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিলেন, তখন তাঁর ওপর প্রায়শই জজবার প্রভাব প্রবল থাকত, তাই তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু উক্তি প্রকাশ পেয়েছে যা অনুসরণযোগ্য নয় বরং ব্যাখ্যার দাবি রাখে। একইভাবে কিছু বিষয় ভুলভাবে তাঁর দিকে নিসবত করা হয়েছে। তাঁর মাজার পানিপতে (হরিয়ানা রাজ্য, ভারত), যা মানুষের যাতায়াতের কেন্দ্রস্থল। [৩]

---

[১] এ ব্যাপারে রাফেজিরা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বর্ণনা প্রসিদ্ধ করে রেখেছে যা নিছক কিচ্ছা-কাহিনী, যেমন আপনি একটি নদীতে ডুবে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আলী রাযি. আপনাকে উদ্ধার করেন, এই নিসবতে আপনি বুআলী কুনিয়াত গ্রহণ করেন।

[২] শেখ কুতুবুদ্দিন আবহারি রহ. শেখ জিয়াউদ্দিন আবু নাজিব সোহরাওয়ার্দী রহ. থেকে খিলাফত পেয়েছিলেন।

[৩] তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ ও পাকিস্তান, হযরত মুফতি ওয়ালী হাসান টোংকি: পৃষ্ঠা ৭৭ থেকে ৮৪।

শাহ রুকন আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি

৬৪৯ হিজরি থেকে ৭৩৫ হিজরি (১২৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

শাহ রুকন উদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি, যিনি শাহ রুকন আলম উপাধিতে বিখ্যাত, পাঞ্জাবের সেই মহান আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত যাদের আলোচনা ব্যতীত এই অঞ্চলের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ৬৪৯ হিজরিতে (১২৫১ খ্রিষ্টাব্দে) মদিনাতুল আউলিয়া মুলতানে তাঁর জন্ম হয়। পিতা সদর উদ্দিন আরিফ রহমতুল্লাহি আলাইহি মুলতানের উলামা ও পরহেজগারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আর দাদা ছিলেন শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনিই তাঁর নাম "রুকন উদ্দিন" রেখেছিলেন। তাঁর মাতা হাফেজা ছিলেন এবং প্রতিদিন একটি কুরআন মাজিদ খতম করতেন। তিনি তাঁকে দুধ পান করানোর আগে সর্বদা অজু করতেন।

শেখ রুকন উদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতার নিকট থেকে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করেন, তবে তাঁর লালন-পালন তাঁর দাদার বিশেষ তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। তিনি তাঁদের উভয়কে এতটাই সম্মান করতেন যে কখনো চোখ তুলে তাকাতেন না এবং উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। ৬৬১ হিজরিতে যখন তাঁর বয়স এগারো বছর ছিল, তখন তাঁর দাদা হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন।

ইসলামি জ্ঞান সমাপ্ত করার পর তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভ করেন। তিনি তাহাজ্জুদ থেকে জাওয়াল পর্যন্ত জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। জিকিরে খফি ও জলি এবং মুরাকাবা ও মুহাসাবা তাঁর স্থায়ী রুটিন ছিল। ৩৬ বছর বয়সে তিনি পিতার নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ফয়েজ সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে চারদিক থেকে সৃষ্টিজগত মুলতানের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। সুলতানাতের বাদশাহ ও আমিরগণও তাঁর ভক্ত হয়ে যান।

দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলে তিনি দুইবার দিল্লি সফর করেন। সুলতান শাহী মর্যাদায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন। তাঁর পক্ষ থেকে পেশ করা হাদিয়া ও বিপুল অর্থ তিনি অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

আলাউদ্দিন খিলজির পর তাঁর পুত্র কুতুব উদ্দিন মুবারক শাহ খিলজি শাসক হন, যিনি একজন অযোগ্য ও চাটুকারপ্রিয় মানুষ ছিলেন। সেই সময়ে দিল্লিতে খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির ফয়েজ ব্যাপক ছিল। দরবারিরা কুতুব উদ্দিন খিলজিকে খাজা সাহেবের বিরুদ্ধে এই বলে উসকে দেয় যে, তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা আপনার ক্ষমতার জন্য হুমকি। দরবারিরা পরামর্শ দেয় যে, শাহ রুকন আলমকে মুলতান থেকে দিল্লিতে ডেকে আনা হোক; এভাবে দিল্লিতে দুটি খানকাহ মুখোমুখি হবে এবং তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য বিষয়টিকে এতটাই উসকে দেবে যে খাজা সাহেবের জন্য দিল্লি থেকে চলে যাওয়াই শ্রেয় মনে হবে।

সংক্ষেপে, বাদশাহ শাহ রুকন আলম রহমতুল্লাহি আলাইহিকে দিল্লি আসার দাওয়াত দেন। তিনি যখন তাঁর মুরিদদের নিয়ে দিল্লির নিকটবর্তী হন তখন...

খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুরিদদের নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাউজ-ই-আলাই পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা ও উষ্ণতার সাথে স্বাগত জানিয়েছিলেন। উভয় বুজুর্গের পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসা বাদশাহর সমস্ত আকাঙ্ক্ষার ওপর পানি ঢেলে দিয়েছিল। [১]

এরপর শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লি পৌঁছান, যেখানে বাদশাহ তাঁর লস্কর ও খাদেমদের নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, "সবার আগে আপনাকে কে অভ্যর্থনা জানিয়েছে?" তখন আপনার উত্তর ছিল: "এই শহরের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব।"

এভাবে আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রশংসা ও গুণগান করে হিংসুকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। এরপর শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি যতদিন দিল্লিতে অবস্থান করেছিলেন, তাঁর এবং খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে অত্যন্ত মহব্বতপূর্ণ বৈঠক হতো। এরপরও তাঁদের সম্পর্ক ছিল আদর্শস্থানীয়।

এই যুগেও শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি দুইবার দিল্লি সফর করেন এবং খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে স্মরণীয় সাক্ষাৎ হয়েছিল। শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন দিল্লি আসতেন, তখন তাঁকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে প্রাসাদে অবস্থানের প্রস্তাব দেওয়া হতো, কিন্তু আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের অধিকাংশ সময় খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে কাটাতে পছন্দ করতেন। উভয় বুজুর্গ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপচারিতায় মগ্ন থাকতেন। সাধারণত ফিকহি মাসআলা, তাসাউফ, সীরাতে নববী, পূর্বসূরিদের ঘটনাবলি এবং মাশায়েখদের বাণী নিয়ে আলোচনা হতো। তাঁরা একে অপরকে এমনভাবে সম্মান করতেন যেমন একজন মুরিদ তাঁর পীরকে করে থাকেন।

যখন আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাদশাহর সাথে দেখা করার জন্য পালকিতে চড়ে বের হতেন, তখন মানুষের ভিড় জমে যেত। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি পালকিটি কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখতেন। মানুষ তাদের ফরিয়াদ ও আবেদন চিরকুট আকারে আপনার পালকিতে দিয়ে দিত। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময় এই সমস্ত আবেদন তাঁর সামনে পেশ করতেন। বাদশাহ সমস্ত আবেদন পড়তেন এবং সেগুলোর ওপর তাঁর নির্দেশ লিখে দিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজন পূরণ না হতো, আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখান থেকে উঠতেন না।

খিলজি বংশের পর তুঘলক দরবারেও শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্মান ও মর্যাদা বজায় ছিল। এই বংশের প্রথম বাদশাহ সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (গাজী মালিক) যখন বাংলা অভিযান থেকে দিল্লির দিকে ফিরছিলেন, তখন সেই সময়ে শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। তিনি সুলতানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একটি মিছিলসহ দিল্লি থেকে সামনে আফগানপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। অবশেষে সুলতানের আগমন হলো, সাক্ষাৎ হলো এবং হযরত বাদশাহর সাথে দস্তরখানে বসে খাবার খেতে লাগলেন। এই সময় শায়খের কাশফ হলো যে, এই ঘরটি ভেঙে পড়বে। তাই তিনি সুলতানকে বললেন: "তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসুন।" সুলতান বললেন: "খাবার শেষ করে আসছি।" শায়খ বাইরে বেরিয়ে গেলেন, সুলতানের বের হতে দেরি হয়ে গেল। এরই মধ্যে ঘরের ছাদসহ ধপাস করে ভেঙে পড়ল এবং আঘাতের কারণে সুলতানের মৃত্যু হলো।

শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এরপর দিল্লিতে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনিও হযরত শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

---

[১] মনে রাখা প্রয়োজন যে, খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বয়সে শাহ রুকন-ই-আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে তেরো বছরের বড় ছিলেন।

সেই সময়ে সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। আপনি (রহ.) তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। এই সাক্ষাতের পর হযরত সুলতানুল মাশায়েখের ইন্তেকাল হয় এবং শাহ রুকন-ই-আলম (রহ.) তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। সেই সময় আপনি বলেছিলেন: "এত দীর্ঘ সময় দিল্লিতে অবস্থান করার রহস্য ছিল আল্লাহর এই ইচ্ছা যে, আমরা যেন সুলতানুল মাশায়েখের জানাজার নামাজের সৌভাগ্য লাভ করি।" এর পর আপনি পুনরায় মুলতানে ফিরে যান।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে মুলতানের গভর্নর কিশলু খান বিদ্রোহ করেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক বিশাল বাহিনী নিয়ে আসেন এবং এক ভয়াবহ যুদ্ধের পর তাকে পরাজিত করেন। মুলতানের মানুষ কিশলু খানকে পছন্দ করত এবং এই যুদ্ধে তারা তাঁর সমর্থক ছিল। তাই বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক কোনো অজুহাতে মুলতানে রক্তের নদী বইয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তখন শাহ রুকন-ই-আলম (রহ.) সেখানে উপস্থিত হলেন। নিজের ইলমি মর্যাদা ও মাশায়েখসুলভ শান-শওকতের পরোয়া না করে তিনি নিজের পাগড়ি খুলে একপাশে রেখে দিলেন এবং বাদশাহর সামনে সাধারণ ফরিয়াদীদের মতো নগ্ন মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ না বাদশাহর ক্রোধ প্রশমিত হলো, ততক্ষণ তিনি এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। এভাবে শাহ রুকন-ই-আলম (রহ.) অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও কৌশলের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করেন।

শাহ রুকন-ই-আলম (রহ.)-এর অধিকাংশ সময় জিকির ও রিয়াজত, অধ্যয়ন এবং ওয়াজ ও নসিহতে অতিবাহিত হতো। খাবারের পরিমাণ ছিল খুবই কম কিন্তু অত্যন্ত উন্নত মানের। এক পেয়ালা দুধে কিছু পুষ্টিকর শুকনো ফল মিশিয়ে নিতেন। আপনি (রহ.) সেটিই গ্রহণ করতেন। পরিবারের সদস্যদের কাছে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক অভিযোগ করলেন যে, হযরত খুব কম আহার করেন। চিকিৎসক সেই খাবার আনিয়ে তা থেকে কয়েক লোকমা গ্রহণ করার পর খাবারের শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারলেন। তিনি বললেন যে, এটিই যথেষ্ট।

আপনার (রহ.) দোয়া খুব দ্রুত কবুল হতো। সেই যুগে মঙ্গোলরা মধ্য এশিয়া থেকে বারবার হিন্দুস্তানে আক্রমণ করত। একবার মঙ্গোলদের একটি বাহিনী হঠাৎ মুলতানের কাছাকাছি চলে আসে। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল নগণ্য, তাই মানুষ অস্থির হয়ে দোয়ার আবেদন জানাল। আপনি মোরাকাবা (ধ্যানমগ্ন) অবস্থায় দোয়া করলেন এবং কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বললেন: "মঙ্গোলরা নদীর তীর পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে।" আপনার (রহ.) কথা সত্য প্রমাণিত হলো। মঙ্গোলরা সত্যিই ফিরে গিয়েছিল। মানুষ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আপনি (রহ.) বললেন: "আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা নাজিল করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন।"

আপনার প্রচেষ্টায় মুলতানের আশপাশের অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশেষ করে "জোইয়া রাজপুত"দের পুরো গোত্র আপনার (রহ.) হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়।

শাহ রুকন-ই-আলম (রহ.) জীবনের শেষ দিনগুলো নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে কাটিয়েছেন। মানুষের সাথে মেলামেশা ত্যাগ করেছিলেন। শুধুমাত্র জামাতের সাথে নামাজের জন্য হুজরা থেকে বের হতেন। এভাবে তিন মাস অতিবাহিত হলো। ৭ই জমাদিউল আউয়াল ৭৩৫ হিজরি (১৩ই জানুয়ারি ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ) মাগরিবের নামাজের পর নফল আদায়রত অবস্থায় সিজদাবনত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

আপনি (রহ.) নিঃসন্তান ছিলেন। তাই আপনার পর আপনার ভাই হযরত ইমাদুদ্দিন ইসমাইল (রহ.) আপনার স্থলাভিষিক্ত হন। আপনার (রহ.) খলিফাদের মধ্যে সৈয়দ জালালুদ্দিন বুখারি (রহ.) (মখদুম জাহানিয়া জাহান গশত) অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

আপনার রহমাতুল্লাহ-এর মাকবারা ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর এক চমৎকার নিদর্শন, যার উচ্চতা কমবেশি একশ ফুট। এই সুউচ্চ ভবনটি প্রাচীনকালে ত্রিশ মাইল দূর থেকে দেখা যেত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এটি সেই সময়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন যখন তিনি পাঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু দিল্লির কাছে হয়েছিল এবং দাফনও সেখানেই হয়েছিল। ফলে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক মাকবারার ভবনটি খানকাহ হিসেবে শাহ রুকন আলম রহমাতুল্লাহ-কে দিয়ে দেন। মৃত্যুর পূর্বে শাহ রুকন আলম রহমাতুল্লাহ এই আশঙ্কায় যে, পাছে এই ভবনটি বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে নির্মাণ করা হয়ে থাকে, এতে দাফন হতে অস্বীকার করেন এবং ওসিয়ত করেন যে আমাকে যেন আমার দাদা শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রহমাতুল্লাহ-এর পাশে দাফন করা হয়। ফলে তেমনই করা হয়েছিল।

কিছুকাল পর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক মুলতানে এলে তিনি হযরতের ওয়ারিশদের আশ্বস্ত করেন যে, এই ভবনের নির্মাণ বায়তুল মাল থেকে নয় বরং সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ব্যক্তিগত আয় থেকে করা হয়েছিল। ফলে মৃতদেহ সেখান থেকে সেই মাকবারায় স্থানান্তরিত করা হয়। কফিন কাঁধে বহনে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক স্বয়ং শরিক ছিলেন।

শাহ রুকন আলম রহমাতুল্লাহ-এর বাণীসমূহ আত্মশুদ্ধির জন্য মহৌষধ স্বরূপ। সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো:

- আত্মশুদ্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ না বান্দা আল্লাহর দরবারে আকুতি ও প্রার্থনা করে।
- যতক্ষণ আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত এবং সাহায্য না হয়, নফসের পবিত্রতা অর্জিত হয় না।
- অনুগ্রহ ও রহমত প্রকাশের লক্ষণ এই যে, বান্দার ওপর নিজের দোষত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। [১]

---

[১] তারিখ-ই ফিরিশতা, বোম্বে সংস্করণ: পৃ. ৭৭২ থেকে ৭৭৪; তাজকিরা-ই সুফিয়া-ই পাঞ্জাব, ইজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃ. ২৯০ থেকে ৩১৩; হাদিকাতুল আউলিয়া, সৈয়দ আবদুল কাদির ঠাট্টভী: পৃ. ২৫ থেকে ৩৯; তারিখ-ই মুবারক শাহী: পৃ. ১০০; আব-ই কাওসার, মুহাম্মদ ইকরাম: পৃ. ২৮৯; তারিখ-ই সোহরাওয়ার্দিয়া: পৃ. ১২০, ১২১।

https://t.me/BoierSomahar

লাল শাহবাজ কালান্দার রহমাতুল্লাহি আলাইহি

৫৩৮ হিজরি থেকে ৬৭৩ হিজরি

(১১৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)

মধ্য ভারতে যেভাবে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বদৌলতে ঈমান ও বিশ্বাসের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং আজমির শরীফ এক অনন্য পরিচিতি লাভ করেছিল, ঠিক তেমনি সিন্ধুর সেহওয়ান শরীফ লাল শাহবাজ কালান্দার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কারণে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল। লাল শাহবাজ কালান্দার রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৫৩৮ হিজরিতে (১১৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) আজারবাইজানের মারান্দ (মারওয়ান্দ) [১] শহরে সৈয়দ ইব্রাহিম কবির আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি নামক এক সুন্নি হানাফি বুজুর্গের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

নাম রাখা হয়েছিল মুহাম্মদ উসমান। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাত বছর বয়সে কুরআন মাজিদ হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর একজন স্থানীয় আলেম শেখ মনসুরের কাছে অন্যান্য ইসলামি জ্ঞান অর্জন শুরু করেন এবং খুব দ্রুতই তাতে দক্ষতা অর্জন করেন। আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরবি ও ফারসি উভয় ভাষার ওপর সমান দখল ছিল। আঠারো বছর বয়সে পিতা ইন্তেকাল করেন। দুই বছর পর মাতাও বিদায় নেন। এই শোক আপনাকে রহমাতুল্লাহি আলাইহি দুনিয়াত্যাগী করে তোলে, ফলে আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর ওলিদের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরে বেরিয়ে পড়েন।

আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরাক ও ইরানের অনেক ওলি-কেরাম থেকে উপকৃত হয়েছেন। সাবজাওয়ার পৌঁছে শেখ ইব্রাহিম ওয়ালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে বায়াত গ্রহণ করে সুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করেন। এক বছর পর শেখ আপনাকে খিরকা-এ-খিলাফত প্রদান করেন। এরপর আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হজের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং হজের আহকাম পালনের পর মদিনা মুনাওয়ারায় তাশরিফ নেন এবং সেখানে এগারো মাস অবস্থান করেন।

এর কিছুকাল পর লাল শাহবাজ কালান্দার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়, যখন তিনি নিজের পৈতৃক নিবাস মারওয়ান্দ ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ধারণা করা হয়, এটি সেই সময় ছিল যখন মঙ্গোলদের পঙ্গপাল সদৃশ বাহিনী ইসলামি বিশ্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ ৬১৭ হিজরির পরবর্তী সময়। আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি পৈতৃক এলাকা আজারবাইজানও মঙ্গোলদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। এরপর জর্জিয়ার খ্রিস্টানরা এই এলাকায় লুটতরাজ শুরু করে, যার ফলে এই অঞ্চলগুলো বারবার ধ্বংসের সম্মুখীন হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে এখান থেকে অসংখ্য মানুষ হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিল।

---

[১] কেউ কেউ একে মারওয়ান্দ লিখেছেন এবং কেউ কেউ একে “মারান্দ” বলেন। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন যে, মারান্দ তাবরিজ থেকে তিন দিনের দূরত্বের পথ। এখানে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন বান্দার মারান্দি, আবুল ওয়াফা খলিল বিন আহমদ মারান্দি (মৃত্যু ৬১২ হিজরি) এবং মুহাম্মদ বিন মুসা মারান্দির মতো মুহাদ্দিসগণ জন্মগ্রহণ করেছেন।

সম্ভবত এটি সেই সময় ছিল যখন লাল শাহবাজ কলন্দর রহমাতুল্লাহি আলাইহি সফরের প্রস্তুতি নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে রওনা হন। আপনি বলখ থেকে মাকরান এবং ওয়াদি-এ-পাঞ্জগুর হয়ে প্রবেশ করেন। এখানে একটি ময়দানে চিল্লাকাশি করেন। আপনার ইবাদত ও রিয়াযত দেখে প্রভাবিত হয়ে এখানকার হাজার হাজার স্থানীয় মাকরানি ও বেলুচ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুরিদ হয়ে যান। এই স্থানটি আজও "দশত-এ-শাহবাজ" নামে পরিচিত। পাসনিতে এক রাখাল (চরওয়াহা) আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মুরিদ হয়ে যায়। আপনি তাকে দ্বীনের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে তা মনপ্রাণ দিয়ে আমল করে আল্লাহর ওলিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মৃত্যুর পর তার মাজার তৈরি করা হয় যা আজও পাসনি বন্দরের টিলার অপর পাশে "গাদারিয়া লাল" নামে বিদ্যমান।

লাল শাহবাজ কলন্দর রহমাতুল্লাহি আলাইহি সিন্ধু হয়ে মুলতান পৌঁছান যেখানে হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওয়াজ ও নসিহতের চর্চা সর্বত্র ছিল। লাল শাহবাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ সময় তাঁর খিদমতে থাকেন এবং অনেক উপকৃত হন। তাঁর মাদরাসায় কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। এছাড়া কিছু দিন লাহোরেও অবস্থান করেন। এই সময়ে পাকপত্তনে হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি মারিফাত-এ-ইলাহির দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন, অন্যদিকে হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খলিফা সৈয়দ জালালুদ্দিন বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর যুগও ছিল। লাল শাহবাজ কলন্দর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই তিনজনের সমসাময়িক ছিলেন। এই চারজন বুজুর্গের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও হৃদ্যতা ছিল। অনেক তবলিগি সফরে এই চারজন একসাথে থাকতেন। তাঁদের দাওয়াতে এমন প্রভাব ছিল যে স্থানীয় মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে।

লাল শাহবাজ কলন্দর রহমাতুল্লাহি আলাইহি দাওয়াতি সফরে আজমির, জুনাগড় এবং গুজরাটেও পদার্পণ করেন যেখানে মানুষ অত্যন্ত প্রভাবিত হয় এবং অসংখ্য মানুষ ইসলামে দাখিল হয়। এই ভ্রমণের সময় আপনি বু আলি শাহ কলন্দর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। পরিশেষে আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সিন্ধুর দিকে মুখ করেন এবং ৬৩৯ হিজরিতে ওয়াদি-এ-মেহরানে পদার্পণ করেন।

যখন লাল শাহবাজ কলন্দর রহমাতুল্লাহি আলাইহি সিন্ধু পৌঁছান তখন তিনি স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু খুব দ্রুত আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সিন্ধি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং মাতৃভাষার মতো বলতে শুরু করেন। প্রথমে আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ঠাট্টার নিকটবর্তী "আরাই" নামক স্থানে এক মজজুব বুজুর্গের কাছে নিজের জন্য দোয়া করান। এরপর "সেহওয়ান"-এ এসে আস্তানা গাড়েন। আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর দাওয়াতে এখানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে দাখিল হতে থাকে। তাদের মধ্যে শত শত যুবক ইসলামি জ্ঞান অর্জনের আগ্রহী ছিল, তাই আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এখানে একটি মাদরাসাও কায়েম করেন যা "মাদরাসা ফিকহুল ইসলাম" নামে প্রসিদ্ধ হয়। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন বিজ্ঞ আলেম ও শিক্ষক ছিলেন, বিশেষ করে সরফ ও নাহুর প্রতি আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং এই বিষয়গুলোতে আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছু পুস্তিকাও রচনা করেন।

আপনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মেহনত ও প্রচেষ্টায় সেহওয়ান ইলম ও ওলামাদের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে দ্বীনি ইলম অন্বেষণকারীরা এখানে আসতে শুরু করে। একবার সেহওয়ান এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যখন মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো তখন তারা একত্রিত হয়ে আপনার কাছে ফরিয়াদ জানাল। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "তোমরা আল্লাহর দরবারে গুনাহ থেকে খাঁটি তওবা করো এবং তারপর আমার সাথে দোয়া করো।" মানুষ তৎক্ষণাৎ তওবা ও ইস্তিগফার করল। তখন আপনি হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। দোয়ার পর আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের হুজরায়...

প্রবেশও করেননি যে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

আপনাকে রহমতুল্লাহি আলাইহি ‘লাল’ এই জন্য বলা হয় যে, চেহারা অত্যন্ত লাল ও সাদা ছিল। ফলে চরম সৌন্দর্যের কারণে আপনাকে রহমতুল্লাহি আলাইহি ‘লাল’ (লাল ইয়াকুত) এর সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। কিছু লোক আপনাকে রহমতুল্লাহি আলাইহি ‘লাল শাহবাজ’ বলে এবং ‘লাল’ নামকরণের কারণ এই বর্ণনা করে যে, হযরত অধিকাংশ সময় লাল পোশাকে আবৃত থাকতেন, কারণ এটি মার্ভবাসীদের প্রাচীন অভ্যাস। শাহবাজ উপাধি আপনাকে মুরিদগণ আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহি আধ্যাত্মিক উচ্চ উড্ডয়নের কারণে দিয়েছিলেন। কলন্দর এই জন্য বলা হয় যে, আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি একজন সুফি ছিলেন। [১]

লাল শাহবাজ কলন্দর রহমতুল্লাহি আলাইহি চান্দ্র বর্ষ হিসেবে একশ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং অবশেষে সিন্ধুকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে ১৮ শাবান ৬৭৩ হিজরি (১২৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। আপনার কালাম মারিফতে ইলাহিয়া, ইশকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আখিরাতের চিন্তা এবং দুনিয়া ত্যাগের বার্তায় পরিপূর্ণ। আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকালের পর আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহি হাতে প্রশিক্ষিত হযরত আলী সারমাস্ত রহমতুল্লাহি আলাইহি আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহি স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে ফিরোজ শাহ তুঘলক আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহি মাজার নির্মাণ করান।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, কিছু লোক লাল শাহবাজ কলন্দর রহমতুল্লাহি আলাইহি-কে শিয়া, বাতেনি বা কারামতি ইত্যাদি বলে থাকে। এই কথা সঠিক নয়। এর স্বপক্ষে যে কবিতাগুলো পেশ করে লাল শাহবাজ রহমতুল্লাহি আলাইহি-র দিকে সম্বন্ধ করা হয়, সেগুলো প্রক্ষিপ্ত। লাল শাহবাজ কলন্দর রহমতুল্লাহি আলাইহি সুন্নি ও হানাফি ছিলেন। আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি সারা জীবন আহলে সুন্নাত উলামা ও সুফিদের সাথেই সম্পর্ক রেখেছেন এবং তাঁদের থেকেই উপকৃত হয়েছেন। আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহি নাম ‘উসমান’ হওয়াটাই আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহি আহলে সুন্নাত হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ, কারণ শিয়ারা এই নামকে ঘৃণা করে। আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি আপনার একটি নাতিয়া গজলের শেষে নিজের উল্লেখ করে বলেন:

উসমান চুঁ শুদ গুলামে নবী ও চাহার ইয়ার
উমিদাশ আয মাকারিমে আরাবি মুহাম্মাদ আস্ত

‘উসমান (লাল শাহবাজ) যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং চার ইয়ারের (অর্থাৎ খুলাফায়ে আরবা) গোলাম হয়ে গেল, তখন তার আশা আছে যে মুহাম্মাদ আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে করমের (অনুগ্রহের) আচরণ করবেন।’ [২]

---

[১] মূলত “সুফি” এবং “কলন্দর” সমার্থক, যেমন আরিফ, ওলিআল্লাহ ইত্যাদি শব্দগুলোও এই অর্থগুলোই প্রকাশ করে। কিন্তু আজকাল মানুষ “কলন্দর” তাকেই বলে যে মস্ত মালং হয়, শরীয়তের পাবন্দি থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরণের অদ্ভুত ও বিচিত্র কর্মকাণ্ড করে থাকে। ইলমি দিক থেকে এই প্রয়োগ সঠিক নয়।
[২] হাদিকাতুল আউলিয়া, সৈয়দ আব্দুল কাদির ঠাট্টভি থেকে: পৃষ্ঠা ৩৯ থেকে ৪৫; তারিখ-ই-সোহরাওয়ার্দিয়া, প্রফেসর মুহাম্মদ সাঈদ থেকে: পৃষ্ঠা ৯৭ থেকে ১০০।

শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহমাতুল্লাহি আলাইহি

৬৬১ হিজরি থেকে ৭৫৯ হিজরি

১২৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ

শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহ. ৬৬১ হিজরিতে (১২৬৩ খ্রি.) ভারতের "হরিয়ানা" রাজ্যের "হাসি" শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি আলেম ও ফাজেল পরিবারভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর সেই কয়েকজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে চিশতিয়া সিলসিলার নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন একজন নিভৃতচারী ওলী এবং নিভৃতচারী আলেম, পক্ষান্তরে তাঁর দাদা শেখ জামালুদ্দিন হাসি রহ. হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর রহ.-এর খলিফা ছিলেন।

তিনি জাহেরি ইলমে পূর্ণতা অর্জনের পর হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহ.-এর হাতে বায়াত হন এবং তাঁর খেদমতে বহু বছর অতিবাহিত করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মাকাম অর্জন করেন। সুলতানজি রহ. তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাঁর তাকওয়া, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করতেন।

হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ. তাঁর খলিফাদের খেলাফত প্রদান করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চিশতিয়া সিলসিলা ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহ. এবং শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ রহ.-কে সুলতানজি রহ. একই দিনে খেলাফত দিয়ে ধন্য করেছিলেন। এরপর তিনি শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহ.-কে তাঁর পৈতৃক এলাকা "হাসি"-তে গিয়ে কাজ করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে তাসাউফের বিখ্যাত কিতাব "আওয়ারিফুল মাআরিফ"-এর একটি কপিও প্রদান করেন এবং বলেন যে, "এটি তোমার দাদা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।" [১]

সংক্ষেপে, তিনি হাসি-তে চলে আসেন। একটি কোণে বসে জিকির ও ফিকিরের প্রদীপ জ্বালিয়ে মাখলুকাতকে ফয়েজ পৌঁছাতে শুরু করেন। তাঁর পিতা ইন্তেকালের সময় ওসিয়ত করেছিলেন যে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া যেন নিজের ইচ্ছায় কখনো এই শহর থেকে বের না হন। ফলে তিনি সেখানেই অবস্থান করে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে থাকেন। তিনি কখনো কোনো আমীর বা বাদশাহর দরবার বা প্রাসাদে যাননি। শুধুমাত্র জুমার নামাজের জন্য অথবা কবরস্থানে পিতা-মাতা ও দাদার কবর জিয়ারতের জন্য জনপদের বাইরে যেতেন।

তাঁর পীরভাই শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলভি রহ. এবং সেই যুগের অন্যান্য মাশায়েখদের মতো তাঁকেও তৎকালীন শাসকদের পক্ষ থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দিল্লির দরবারে তরিকত অস্বীকারকারীদের কোনো অভাব ছিল না, যারা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলককে মাশায়েখদের বিরুদ্ধে...

---

[১] আওয়ারিফুল মাআরিফ শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর রচনা। এই কিতাবটি প্রতিটি যুগে তাসাউফের পাঠ্যসূচির মর্যাদা পেয়েছে।

উস্কানি দিতে থাকল। সুলতানও তাদের কথা শুনে সুফিদের বিরুদ্ধে দিন দিন সাহসী হয়ে উঠছিলেন এবং প্রায়ই কোনো না কোনো বুজুর্গকে কষ্টে ফেলতেন। শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহমতুল্লাহি আলাইহিকেও হিংসুকরা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল এবং সুলতানের কাছে অভিযোগ করেছিল। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক আপনাকে অনেকবার পরীক্ষায় ফেলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি পাহাড়ের মতো নিজের জায়গায় অটল ছিলেন।

সুলতানের নিয়ম ছিল যে, তিনি শুরুতে আলেম ও মাশায়েখদের দান-দক্ষিণা ও উপহারের মাধ্যমে দুনিয়াদারির দিকে নিয়ে আসতেন এবং তারপর কোনো অজুহাত পেলেই তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাত্র বানানোর চেষ্টা করতেন। সেই অনুযায়ী, সুলতান প্রথমে দুটি গ্রামের জায়গির শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহমতুল্লাহি আলাইহির নামে করে দেন এবং দিল্লির সদরে জাহান কাজী কামালুদ্দিনের মাধ্যমে তা তাঁর কাছে পাঠান। আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি কাজী সদরে জাহানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করলেন কিন্তু জায়গির গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন: “আমাদের পূর্বসূরিদের পদ্ধতি এমন ছিল না।”

এভাবে সুলতানের এই কৌশল ব্যর্থ হলো এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, শেখ এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নন যিনি এভাবে ফাঁদে পা দেবেন।

কিছুকাল পর সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক কোনো এক সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে আসেন এবং ফেরার পথে হাঁসির কাছে অবস্থান করেন। প্রথা অনুযায়ী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে সাক্ষাৎ করলেন। এমন সময় কিছু হিংসুক বলল:

“সুলতানুল মাশায়েখের একজন খলিফাও এখানে থাকেন, কিন্তু তিনি সাক্ষাতের কষ্টটুকুও করেননি।”

সুলতান এটি শুনে একটি অজুহাত পেয়ে গেলেন। তিনি তাঁর একজন কঠোর মেজাজের কর্মকর্তাকে পাঠালেন যেন তাঁকে যেভাবেই হোক নিয়ে আসা হয়। কর্মকর্তা গিয়ে শেখকে এই বার্তা শোনালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “আমাকে সুলতানের কাছে যাওয়ার বা না যাওয়ার কোনো ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে কি না?”

কর্মকর্তা বলল: “কোনো ইখতিয়ার বা সুযোগ নেই। আদেশ দেওয়া হয়েছে যে আপনাকে যেভাবেই হোক নিয়ে যেতে হবে।”

শেখ বুঝে গেলেন যে এর অর্থ হলো গ্রেপ্তার। তিনি বললেন: “الحمد لله! (আলহামদুলিল্লাহ!) আমি নিজের ইচ্ছায় সুলতানের কাছে যাচ্ছি না।” পরিবারের সদস্যদের বললেন: “তোমাদের আল্লাহর সোপর্দ করছি।” এই বলে জায়নামাজ কাঁধে নিলেন, হাতে লাঠি নিলেন এবং পায়ে হেঁটে সেই কর্মকর্তার সাথে রওনা হলেন। আপনার ছেলে নূরুদ্দিনও আপনার সাথে ছিলেন।

সেই সময় ঘর, খানকাহ এবং মাদরাসায় খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তাই পথে নিজের পিতার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরের কাছে গিয়ে বললেন: “আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি নিজের ইচ্ছায় এখান থেকে যাচ্ছি না। দুঃখ শুধু এই যে, আমার সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর বান্দাদের কোনো অবলম্বন ছাড়াই রেখে যাচ্ছি।”

কবরস্থান থেকে বের হওয়ার পর এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো যার কাছে অনেক মুদ্রা ছিল। সে বলল: “এটি আপনার জন্য হাদিয়া।” আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি দোয়া করলেন এবং বললেন: “আমার ঘরে দিয়ে দাও। এই মুহূর্তে সেখানে প্রয়োজন আছে।”

পরিশেষে ‘হাঁসি’ থেকে চার মাইল দূরে ‘হিনসি’তে বাদশাহর তাঁবুতে পৌঁছালেন। সেখানকার শান-শওকত দেখে আপনার ছেলের মনে ভীতি কাজ করতে লাগল। আপনি তা বুঝতে পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ বললেন: “বাবা নূরুদ্দিন, الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ لِلّٰهِ”

এই বাক্যটি মহৌষধ হিসেবে কাজ করল। সাহেবের মন থেকে সমস্ত ভয় ও আতঙ্ক দূর হয়ে গেল। আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি আসার সাথে সাথেই সুলতানের ভাতিজা ফিরোজ শাহ তুঘলক অভ্যর্থনা জানালেন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নসিহত করলেন যে, বাদশাহর সাথে খুব নরমভাবে কথা বলবেন।

যখন মুহাম্মদ তুঘলক জানতে পারলেন যে আপনাকে নিয়ে আসা হয়েছে, তখন তিনি সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাথে সাথেই তীর-ধনুক তুলে নিয়ে লক্ষ্যভেদের মহড়া শুরু করলেন যাতে শেখ প্রভাবিত হয়ে যান। কিন্তু শেখ তাঁর মুমিনসুলভ শান নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সংকল্প ও নূরানিয়তে ভরপুর চেহারার দিকে নজর পড়তেই সুলতানের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে শেখের সাথে মুসাফাহা করলেন এবং বললেন: "আমার শুধু এই বিষয়ে দুঃখ যে, আপনার মতো বুজুর্গের শহরের পাশ দিয়ে এলাম অথচ সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত রইলাম।"

শেখ বললেন: "এই দরবেশের এত মর্যাদা নেই যে বাদশাহদের সাথে দেখা করবে। হ্যাঁ, নির্জন কোণে শাসক ও সাধারণ মানুষ সবার জন্য দোয়া করি।"

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক বলতেন: "আমি যে সুফির সাথেই মুসাফাহা করেছি, তাঁর হাতে কম্পন অবশ্যই অনুভব করেছি কিন্তু শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ারের সাথে মুসাফাহা করলাম তখন কম্পনের পরিবর্তে তাতে এক অদ্ভুত শক্তি পেলাম। আমি বুঝে গেলাম যে ইনি সত্যিই আল্লাহর অলি।"

সুলতান কিছুক্ষণ পর শেখকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বিদায় দিলেন এবং ফিরোজ শাহকে বললেন যে তাঁর প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করে দিতে।

ফিরোজ শাহ যখন সুলতানের এই নির্দেশ শেখকে জানালেন তখন তিনি فرمایا: "আমার মতো ফকিরের কাম্য হলো সেই নিজের পৈতৃক নির্জন কোণ।"

কিছুক্ষণ পর সুলতানের পক্ষ থেকে ফিরোজ শাহ তুঘলক এবং আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারনী রহমাতুল্লাহ এক লক্ষ তঙ্কা নিয়ে হাজির হলেন। শেখ গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। বাদশাহ জানতে পেরে বলে পাঠালেন যে পঞ্চাশ হাজার নিয়ে নিন। শেখ এতেও রাজি হলেন না। পরিমাণ কমতে কমতে দুই হাজার তঙ্কায় এসে পৌঁছাল। তখনও শেখ বলছিলেন: "সুবহানাল্লাহ! এই দরবেশের জন্য দুই সের খিচুড়ি আর এক পোয়া ঘি যথেষ্ট হয়। দুই হাজার নিয়ে কী করব।" যাই হোক, অনেক পিড়াপিড়িতে এই অর্থ সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

শেখ বাড়ি পৌঁছেই অধিকাংশ অর্থ তাঁর পীর ভাই হযরত চেরাগ দেহলভি রহমাতুল্লাহ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন যাতে নিজের কাজেও লাগান এবং হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহ ও হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ-এর মাজারসমূহের মেরামতের কাজও করিয়ে নেন। বাকি সমস্ত অর্থ গরিব ও মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন, নিজে কিছুই নিলেন না।

শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহমাতুল্লাহ সারা জীবন তাসাউফের প্রচার, দ্বীনের হেফাজত এবং তরিকতের পথের অন্বেষণকারীদের খেদমত করতে থাকলেন এবং হাজার হাজার মানুষকে ফয়েজ পৌঁছালেন। আপনি আল্লাহর স্মরণ এবং হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতে অনেক বেশি কাঁদতেন। আপনি রহমাতুল্লাহ মেজাজ, রুচি ও প্রকৃতিতে নিজের মুরশিদের খুব কাছাকাছি ছিলেন।

৭৫৯ হিজরি (১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে আপনি রহমাতুল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এবং হাসিতেই সমাহিত হলেন। আপনার দ্বীনি মেহনত ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব আজ পর্যন্ত হাসি এবং এর আশপাশের এলাকায় অনুভূত হয়। [১]

---

[১] সিয়ারুল আউলিয়া, আজ মীর খুর্দ সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক কিরমানি: পৃষ্ঠা ২৪৯ থেকে ২৫৬; আখবারুল আখইয়ার, আজ শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি: পৃষ্ঠা ১৭৯ থেকে ২০০।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অংশ ষষ্ঠ

সৈয়দ জালাল উদ্দিন সুরখ বুখারী রহ.

৫৯৫ হিজরী থেকে ৬৯০ হিজরী

(১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

পাঞ্জাবে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করতে এবং কুফর ও শিরকের অন্ধকার দূর করতে সৈয়দ জালাল উদ্দিন বুখারী রহ.-এর নাম অবিস্মরণীয়। তাঁর রহ. জন্ম মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত শহর বুখারায় ৫ জিলহজ ৫৯৫ হিজরীতে হয়েছিল। তাঁর রহ. প্রপিতামহ সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ বুখারী রহ. মধ্য এশিয়ার একজন সুফি বুজুর্গ ছিলেন। পিতা একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন যার কাছ থেকে তিনি রহ. প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর মধ্য এশিয়ার অন্যান্য প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখদের কাছ থেকে উপকৃত হন।

যখন চেঙ্গিস খান মধ্য এশিয়া আক্রমণ করেন, তখন তিনি রহ. নিজের পরিবারের সাথে হিজরত করে ইরাকে চলে যান। এরপর কিছু সময় হিজাজে মুকাদ্দাসে অতিবাহিত করেন। বাগদাদে তিনি রহ. হযরত শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ. (মৃত্যু ৬৩২ হিজরী)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং বায়াত গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর শেখ তাঁকে খিরকা-এ-খিলাফত প্রদান করেন। এরপর তিনি রহ. হিন্দুস্তান সফর করেন এবং পাঞ্জাবে এসে ‘ঝাং’-এ অবস্থান করেন। তাঁর রহ. পরিবারের কিছু বুজুর্গ এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তবে তিনি রহ. কিছুকাল পর ভাক্কার-এ চলে যান। তাঁর রহ. গায়ের রং যেহেতু লালচে ছিল, তাই তাঁকে রহ. ‘সুরখ বুখারী’ বলা হতে থাকে।

যদিও তিনি রহ. হযরত শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর কাছ থেকে খিরকা-এ-খিলাফত লাভ করেছিলেন, তবুও নিজেকে সংশোধনের যোগ্য মনে করতেন। তাই তিনি রহ. শেখ সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর প্রধান খলিফা হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রহ.-এর খিদমতে মুলতানে পৌঁছান এবং তাঁর হাতে পুনরায় বায়াত গ্রহণ করেন। আত্মিক সংশোধনের পাশাপাশি শেখের নির্দেশে তাঁর মাদরাসায় শিক্ষকতাও শুরু করেন। এভাবে ত্রিশ বছর তাঁর দ্বিতীয় শেখের খিদমত, শিক্ষা-দান এবং জিকির ও রিয়াজতে অতিবাহিত করেন এবং খিরকা-এ-খিলাফত লাভ করেন। হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ., হযরত লাল শাহবাজ কালান্দার রহ. এবং হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর রহ.-এর সময়কাল একই ছিল। এই তিন বুজুর্গ মাঝেমধ্যে সফর বা ধর্মীয় সমাবেশে একত্রিত হতেন এবং একসাথে জিকির ও রিয়াজত করতেন। সৈয়দ জালাল উদ্দিন বুখারী রহ.-ও তাঁদের সাথে থাকতেন।

নিজের দ্বিতীয় শেখের ইন্তেকালের পর তিনি রহ. উচ-এ চলে আসেন এবং এখানে একটি খানকাহ ও মাদরাসা কায়েম করে মানুষের...

ইসলামের শিক্ষা দিতে লাগলেন। আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহির ওয়াজ ও নসিহতে প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য মূর্তিপূজারী ইসলামে দীক্ষিত হন।

সৈয়দ জালাল উদ্দিন বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি সাধারণত গ্রীষ্মকালে পাঞ্জাবের দূরবর্তী এলাকাগুলোতে গিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। একইভাবে আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি সিন্ধু ও বেলুচিস্তানেও অনেক সফর করেছেন। আপনার প্রচেষ্টায় ডাহর, চান্ধার, সাম্মু, সুমরা, লাগারি, মজারি, ওয়ারান এবং আরও অনেক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং অবশেষে ৯৫ বছর বয়সে ১৯ জমাদিউল আউয়াল ৭৯০ হিজরি (২০ মে ১৩৮৪ খ্রি.) উচ-এ ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।

আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাসাউফ, আত্মশুদ্ধি এবং আউলিয়া আল্লাহর জীবনীর ওপর কিছু কিতাবও রচনা করেছেন, যার মধ্যে আখবারুল আখইয়ার, মাজহারে জালালি এবং সিয়ারুল আরিফিন প্রসিদ্ধ। আপনার রহমতুল্লাহি আলাইহির বংশধরদের মধ্যে জালাল উদ্দিন জাহানিয়া জাহানগাশত রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং সৈয়দ মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়ারি রহমতুল্লাহি আলাইহির মতো বুজুর্গগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। [১]

---

[১] তারিখ-ই-সোহরাওয়ার্দিয়া, প্রফেসর মুহাম্মদ সাঈদ: পৃষ্ঠা ৬০ থেকে ৬৫; তাজকিরা-ই-সুফিয়া-ই-পাঞ্জাব, এজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃষ্ঠা ১৭০ থেকে ১৭২।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

জালালুদ্দীন জাহানিয়ান জাহান গাশত রহমতুল্লাহ

৭০৭ হিজরি হতে ৭৮৫ হিজরি

(১৩০৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ)

সুহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার যে সকল বুজুর্গানে দীন উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের মধ্যে জালালুদ্দীন জাহানিয়ান জাহান গাশত রহমতুল্লাহ-এর নাম অত্যন্ত উজ্জ্বল।

ইসলামের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ২৩ রজব ৭০৭ হিজরি (১৮ জানুয়ারি ১৩০৮ খ্রিস্টাব্দ) পাঞ্জাবের "উচ" শহরে হয়েছিল। আপনার রহমতুল্লাহ পিতা ছিলেন শেখ আহমদ কবির রহমতুল্লাহ, যিনি আপনার নাম তাঁর পিতার নামানুসারে "জালালুদ্দীন" রেখেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ আপনাকে বুজুর্গি দান করলে আপনি "মাখদুম জাহানিয়ান জাহান গাশত" উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেন।

আপনি রহমতুল্লাহ ইসলামি উলুম ও ফুনুন সমাপ্ত করার পর আপনার শ্রদ্ধেয় পিতার নিকট বায়াত গ্রহণ করেন এবং সুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করে খিলাফতের খিরকা লাভ করেন। এরপর শাহ রুকন আলম মুলতানি রহমতুল্লাহ-এর সাথে ইসলাহি সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং বায়াতের অনুমতি (মাজায) প্রাপ্ত হন। অতঃপর আপনি রহমতুল্লাহ দিল্লি গমন করেন এবং শেখ নাসিরুদ্দীন চেরাগ দেহলভি রহমতুল্লাহ-এর সাথে মুরিদ হওয়ার সম্পর্ক দৃঢ় করেন এবং মাজায হন।

পরবর্তী বছরগুলোতে আপনি রহমতুল্লাহ মুসাফিরানা জিন্দেগি গ্রহণ করেন এবং আউলিয়া কেরামের নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করার জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে শুরু করেন। এই বিশ্ব ভ্রমণের (জাহান গাশতি) উদ্দেশ্য ছিল উলামা ও মাশায়েখদের থেকে উপকৃত হওয়া, পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারত করা, বুজুর্গদের মাজারসমূহে হাজিরা দেওয়া এবং ইসলামি বিশ্বে বরকতময় হিসেবে স্বীকৃত নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা।

এই সফরের সময়কাল ছিল চল্লিশ বছর। এই সময়ে আপনি রহমতুল্লাহ সাতবার হজ পালন করেন। দীর্ঘ সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে অতিবাহিত করেন। সেখানে চল্লিশবার চিল্লা পালন করেন এবং পরিশেষে একশ বার কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহে সওয়াব রেসানি করেন। দামেস্কের জামে উমউয়িতে পাঁচবার চিল্লা পালন করেন। লেবাননের একটি পাহাড়েও চিল্লা পালন করেন। তূর পাহাড়েও গিয়েছিলেন। আপনি যতটা ইসলামি দেশসমূহ ভ্রমণ করেছেন, তার উদাহরণ প্রাচীন মুহাদ্দিসগণ ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে আপনার রহমতুল্লাহ এই সফরসমূহ ছিল একটি কারামত, যার সাহস অন্য কেউ করতে পারত না।

আপনি রহমতুল্লাহ যে সকল দেশের যে সকল শহরে গিয়েছিলেন, সেগুলোর নাম হলো:

- হিন্দুস্তান: দিল্লি, মুলতান, কাশ্মীর, ভাক্কার, ঠাট্টা, সারানদ্বীপ (শ্রীলঙ্কা)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

- আফগানিস্তান: গজনী, হেরাত, চিশত (হেরাতের নিকটবর্তী), বলখ, বদখশান
- তুর্কিস্তান: তুরান, সমরকন্দ, বুখারা
- খোরাসান: তুস, নিশাপুর, হামাদান
- ইরান: শিরাজ, কেরমান, নাহাওয়ান্দ, রে (তেহরান), তাবরিজ
- আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া: গাঞ্জা, বারদা, ক্বাফ পর্বত
- এশিয়া মাইনর (বর্তমান তুরস্ক): কোনিয়া, ইস্তাম্বুল
- ইরাক: বাগদাদ, কুফা, বসরা, কারবালা, মাদায়েন কিসরা
- জাজিরাতুল আরব: আহসা, কাতিফ, ইয়েমেন, এডেন, মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা, খায়বার
- শাম: দামেস্ক, বাইতুল মুকাদ্দাস, লেবানন
- মিশর: সিনাই মরুভূমি, আলেকজান্দ্রিয়া
- বুহাইরা রুম: শাহরে রুম

এই সময়ে আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি সাত বছর মক্কা মুকাররমায় এবং দুই বছর মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। বাগদাদেও গিয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণ ধ্বংসের পর পুনরায় আবাদ হচ্ছিল এবং অনেক আলেম, ফকিহ ও বুজুর্গ সেখানে আবাদ হয়েছিলেন। আপনি কেরমানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সুফি সাধক ও পরহেজগার শাহজাদা শাহ শুজা কেরমানির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি কয়েক ডজন আল্লাহর ওলি এবং ইলমে রাসিখিন, মুহাদ্দিস ও ফকিহদের থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং অনেক মাশায়েখের কাছ থেকে বায়আতের অনুমতি লাভ করেছেন, যাদের মধ্যে শেখ আবদুল্লাহ ইয়াফায়ি, শেখ শরফুদ্দিন মাহমুদ শাহ তস্তারি, সৈয়দ আহমদ কবির রিফায়ি, শেখ আবদুল্লাহ মাতারি, শেখ আবু ইসহাক কাজরুনি, শেখ ইমামুদ্দিন, সৈয়দ হামিদ হাসানি, শেখ কিওয়ামুদ্দিন, শেখ আওহাদুদ্দিন হুসাইনি, শেখ নুরুদ্দিন, শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার এবং শেখ নাজমুদ্দিন সানআনি রহমতুল্লাহি আলাইহিম-এর মতো দ্বীনের বুজুর্গগণ উল্লেখযোগ্য। [১]

সংক্ষেপে, এই বিশ্ব ভ্রমণের পর আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজ দেশে ফিরে আসেন এবং "উচ"-এ অবস্থান করে মুরিদদের ঈমানি ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে মশগুল থাকেন।

হযরত মাখদুম রহমতুল্লাহি আলাইহি সাতজন বাদশাহর শাসনকাল দেখেছেন, যাদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি, সুলতান শিহাবুদ্দিন খিলজি, কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খিলজি, নাসিরুদ্দিন খসরু, গিয়াসুদ্দিন তুঘলক, মুহাম্মদ বিন তুঘলক এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমলে আপনাকে শায়খুল ইসলাম নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সেহওয়ান জেলার চল্লিশটি খানকাহর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। তবে আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি কিছুকাল পর এই পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আপনার অনেক বড় ভক্ত ছিলেন এবং আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহিও তাকে কদর করতেন। আপনি রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছর দিল্লি যেতেন এবং কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করতেন। যখন ফিরোজ শাহ সিন্ধুর রাজনৈতিক বিবাদ মেটাতে ঠাট্টায় আসেন, তখন হযরত মাখদুম রহমতুল্লাহি আলাইহি ফিরোজ শাহকে সাহায্য করেন এবং সিন্ধি প্রধান জাম জউনা ও জাম বানভিনার মধ্যে সমঝোতা স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

হযরত মাখদুম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খানকাহয় (উচ শরিফ) দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সত্যের সন্ধানীদের ভিড় লেগে থাকত। আপনার দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে পাঞ্জাব...

---

[১] আপনি আপনার এই সফরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধও করেছিলেন যা একটি সফরনামা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর উর্দু অনুবাদও সম্পন্ন হয়েছে।

খরাল ও নূন-এর মতো অনেক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। খরাল রাজপুতদের আদিপুরুষ হস্তিনাপুরের শাসক 'রাজা করণ' ছিলেন। তাঁর এক উত্তরসূরি 'ভোপা' নিজের এলাকা ছেড়ে 'উচ'-এ চলে আসেন। তাঁর ছেলের নাম ছিল 'খরাল'। এই পিতা ও পুত্র উভয়েই হযরত (মাখদুম জাহানিয়ান)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর এই গোত্রের বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং এই লোকেরা উচ থেকে রাভী নদীর উভয় তীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাঞ্জাবের মুসলিম জনবসতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

হযরত (মাখদুম জাহানিয়ান)-এর খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে আগতদের মধ্যে অমুসলিমরাও থাকত এবং তারা ইসলাম শিখত ও নওমুসলিম হতো। সালেকীন ছাড়াও উলামা ও ফুকাহাগণও উপস্থিত থাকতেন। হযরত মাখদুম সর্বদা শরীয়তের অনুসরণ এবং সুন্নাহর ইত্তিবার ওপর জোর দিতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তির কথা ও কাজে সুন্নাহর অনুসরণ নেই, সে কখনোই আল্লাহর ওলী হতে পারে না।

হযরত মাখদুম ৭৮ বছর বয়সে ঈদুল আযহার দিন ১০ই জিলহজ ৭৮৫ হিজরি (৩রা ফেব্রুয়ারি ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খলিফা ছিলেন যারা পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা, বিহার, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। [১]

সদরুদ্দিন সৈয়দ রাজেন কাত্তাল

শেখ সদরুদ্দিন রাজেন কাত্তাল ছিলেন হযরত মাখদুম জাহানিয়ান জাহান গাশত-এর ছোট ভাই। ২৬শে শাবান ৭৩০ হিজরি (১৩৩০ খ্রিস্টাব্দ) উচ-এ তাঁর জন্ম হয়। তিনি তাঁর পিতা বুজুর্গওয়ার সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী এবং তাঁর বড় ভাই মাখদুম জাহানিয়ান—উভয়ের কাছ থেকেই খেলাফত লাভ করেন। তিনি ইবাদত ও রিয়াজতে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং মাখলুক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতেন। তাঁর মেজাজে অনেক গাম্ভীর্য ছিল, খাদেমদের সংশোধনের জন্য তিনি তাদের ধমক দিতেন, তাই তাঁকে 'কাত্তাল' বলা হতো।

তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের সংশোধন অত্যন্ত মমতার সাথে করতেন। একবার এক বেনামাজি ব্যক্তি আরজ করল যে, তাকে যেন মাখদুম জাহানিয়ানের খাবারের কোনো উচ্ছিষ্ট টুকরো দেওয়া হয়। তিনি শর্ত দিলেন যে, আগে নামাজের পাবন্দি শুরু করো। সে যখন নামাজের পাবন্দি শুরু করল, তখন তিনি নিজের ওয়াদা পূরণ করলেন কিন্তু সাথে এও বললেন: "এশরাক, চাশত ইত্যাদিরও পাবন্দি শুরু করো, তবেই আমরা একসাথে খাবার খাব।" এভাবে তিনি একজন সাধারণ মানুষকে একনিষ্ঠ নামাজি ও তাহাজ্জুদগুজারে পরিণত করেন।

অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগ ছিল তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র, ফলে তিন লক্ষাধিক মানুষ তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাবলিগের জন্য তাঁর অনেক খলিফাকে গুজরাটে পাঠিয়েছিলেন যারা সেখানে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে সৈয়দ মুহাম্মদ খোদা বখশ এবং সৈয়দ আহমদ মাখদুম জাহান শাহ (যিনি চোপানে সমাহিত) সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তিনি ৯৭ বছর বয়সে ১৬ই জমাদিউল আখিরা ৮২৭ হিজরি (মে ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন এবং উচ-এ সমাহিত হন। [২]

---

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা, বোম্বে: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০৭ থেকে ৪০৮; সফরনামা হযরত মাখদুম জাহানিয়ান জাহান গাশত, অনুবাদ: খলিফা মনজুর আহমদ; মাখদুম জাহানিয়ান জাহান গাশত, লেখক: মুহাম্মদ আইয়ুব কাদরী, প্রকাশক: এইচ এম সাঈদ কোম্পানি করাচি; তাজকিরা সুফিয়া-ই-পাঞ্জাব, লেখক: ইজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃষ্ঠা ৩৭৭ থেকে ১৮২; আপ কো শারাহ-ই-মাখদুম আকরাম: পৃষ্ঠা ২৮৯।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা, বোম্বে: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮৪ থেকে ৪৮৫; আপ কো শারাহ: পৃষ্ঠা ৩৩২; আখবারুল আখইয়ার: পৃষ্ঠা ৩৩২; ইয়াদগার-ই-সোহরাওয়ার্দিয়া: পৃষ্ঠা ২২৯, ২৩০।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

দিল্লি সালতানাতের পতন যুগে প্রতিষ্ঠিত

উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলিম সালতানাতসমূহ

অষ্টম থেকে দশম হিজরি শতাব্দী

চতুর্দশ থেকে ষোড়শ খ্রিস্টীয় শতাব্দী

https://t.me/BoierSomahar

উপমহাদেশে একাধিক মুসলিম শাসন

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমল থেকেই হিন্দুস্তানের বিশাল মুসলিম সালতানাত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হতে শুরু করেছিল। তৈমুর লঙের আক্রমণের পর এই অরাজকতা আরও বৃদ্ধি পায়। যদিও কিছুকাল পর উত্তর ও মধ্য হিন্দুস্তান লোদী আফগানরা সামলে নিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা বজায় ছিল। কেবল আওরঙ্গজেব আলমগীরের আমল এই অরাজকতার ব্যতিক্রম ছিল, যে সময়ে প্রায় পুরো হিন্দুস্তান মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এখানে আমরা সংক্ষেপে হিন্দুস্তানের সেই গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম শাসনগুলোর একটি তালিকা পেশ করছি। এগুলোর মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত বাকি সবগুলোই দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছিল এবং কোনো না কোনো পর্যায়ে দীর্ঘকাল টিকে ছিল।

এই সালতানাত ও শাসনগুলো ছিল নিম্নরূপ:

ক্রমিক সালতানাত সময়কাল বিশেষ কথা

১ কাশ্মীর সালতানাত ৭৩৫ হি. হতে ৯৯৫ হি. (১৩৩৩ খ্রি. হতে ১৫৮৭ খ্রি.)

২ বাংলা সালতানাত ৫৯৯ হি. হতে ৯৮৪ হি. (১২০২ খ্রি. হতে ১৫৭৬ খ্রি.)

৩ জৌনপুর সালতানাত (শারকি রাজবংশ) ৭৯৬ হি. হতে ৯০৫ হি. (১৩৯৪ খ্রি. হতে ১৫০০ খ্রি.)

৪ মালব সালতানাত (ঘুরি ও খিলজি রাজবংশ) ৮০৪ হি. হতে ৯৩৭ হি. (১৪০১ খ্রি. হতে ১৫৩০ খ্রি.)

৫ গুজরাট সালতানাত ৭৯৯ হি. হতে ৯৮০ হি. (১৩৯৬ খ্রি. হতে ১৫৭২ খ্রি.)

৬ খানদেশ সালতানাত (ফারুকি রাজবংশ) ৮০১ হি. হতে ১০০৮ হি. (১৩৯৯ খ্রি. হতে ১৫৯৯ খ্রি.)

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দাক্ষিণাত্যের বাহমানি সালতানাত ..... ৭৪৮ হিজরি থেকে ৯৩৩ হিজরি (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ)

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাষ্ট্র

১. আদিল শাহী সরকার, বিজাপুর ..... ৮৯৫ হিজরি থেকে ১০৯৭ হিজরি (১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)
২. নিজাম শাহী সরকার, আহমদনগর ..... ৮৯৬ হিজরি থেকে ১০৪২ হিজরি (১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. কুতুব শাহী সরকার, তেলেঙ্গানা ..... ৯১৮ হিজরি থেকে ১০৯৮ হিজরি (১৫১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. ইমাদ শাহী সরকার, বেরার ..... ৮৮০ হিজরি থেকে ৯৭৯ হিজরি (১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. বারিদ শাহী সরকার, বিদার ..... ৯০২ হিজরি থেকে ১০২৮ হিজরি (১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

এই সরকারগুলোর প্রতিষ্ঠার ফলে অনেক ক্ষতি হয়েছে, সামগ্রিকভাবে ভারতের রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। বহিঃশত্রু বিজয়ের সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং এখন প্রতিটি রাষ্ট্র নিজের সীমানা রক্ষাকেই প্রথম অগ্রাধিকার দিতে শুরু করেছিল। অসংখ্য রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে এবং বাড়তে থাকে এবং প্রতিটি শক্তিশালী প্রতিবেশী দুর্বল প্রতিবেশীকে দমন করার চেষ্টা করতে থাকে।

তবে এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল। তা হলো দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসন অনেক সমস্যারও সৃষ্টি করেছিল। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে একটি ছোট মহাদেশের মতো এত বড় দেশে একদিকে যেমন বাদশাহদের জন্য দূরবর্তী প্রদেশগুলোকে নিজেদের সাথে বেঁধে রাখা একটি কঠিন কাজ ছিল, তেমনি অন্যদিকে প্রাদেশিক শাসকদের জন্য কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থাকা সহজ ছিল না। দিল্লির সুলতান এবং তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সন্দেহ, ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের ধারা থামার নামই নিত না। সাধারণত সুবাদারদের ঘন ঘন বদলি এত দ্রুত হতো যে তারা কোনো একটি অঞ্চলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারত না। অনেকের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে উঠতে পারত না এবং যেসব প্রতিনিধি কিছু করার আবেগ...

...থেকে পরিপূর্ণ ছিলেন, তারা কোনো একটি অঞ্চলের ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পেতেন না। তহজিব ও تمدن এবং ইলমি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও প্রদেশগুলোর গতি দ্রুত ছিল না, কারণ ইলম, আদব ও কবিতার কেন্দ্র তখন দিল্লিই ছিল এবং প্রত্যেক বড় আলেম ও সাহিত্যিক সেখানেই যেতেন।

যখন দিল্লির কেন্দ্রীয়তা শেষ হয়ে গেল, যার ফলে জৌনপুর, বাংলা, মালব, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের মতো মুসলিম সালতানাতগুলো অস্তিত্বে এল, তখন এই পুরনো বিবাদগুলো শেষ হয়ে গেল। প্রত্যেক সুবাদার নিজ নিজ অঞ্চলকে নিজের ঘর মনে করে তা সাজাতে, গোছাতে এবং সুন্দর করতে লেগে গেলেন। নতুন নতুন শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হলো এবং নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের গতি ত্বরান্বিত হলো। বড় বড় যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে গেল এবং লড়াইগুলো ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

যখন শক্তির কেন্দ্র দিল্লি থেকে সরে গেল, তখন প্রতিটি নতুন রাষ্ট্র নিজের আলাদা পরিচয় তৈরির দিকে মনোযোগ দিল। জৌনপুর, গুজরাট, মালব এবং দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোতে স্থানীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা হলো। উর্দু ও বাংলার মতো আঞ্চলিক ভাষাগুলোতে কবিতা ও গদ্য উন্নতি লাভ করল।

প্রতিটি নতুন সালতানাত নিজেদের শান-শওকত প্রদর্শনের জন্য চমৎকার সব ইমারত নির্মাণ করল। এতে হিন্দুস্তানি ইসলামি স্থাপত্যশৈলীতে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো। জৌনপুর সালতানাতকে তার অনন্য স্থাপত্যশৈলীর কারণে “প্রাচ্যের শিরাজ” বলা হতে লাগল। গুজরাট সালতানাত নিজস্ব শৈলীর মসজিদ ও মাকবারা নির্মাণ করল এবং দাক্ষিণাত্যের বাহমানি ও আদিল শাহী সালতানাতগুলোও অতুলনীয় স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন রেখে গেল।

এই যুগে উলামা ও সুফিয়ায়ে কেরাম কোনো একটি কেন্দ্রীয় দরবার বা দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলেন না। তারা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লেন, যেখানে তারা স্থানীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেন। এর ফলে সুফিবাদী শিক্ষা ও ইসলামি ইলম দ্রুত দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও বাংলার মতো দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল।

যদিও কেন্দ্রীয় সালতানাত ভেঙে যাওয়ায় সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু আঞ্চলিক রাজধানীগুলো যেমন জৌনপুর, আহমেদাবাদ, লখনৌতি এবং বিদার বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হলো, যেখানে স্থানীয় কারিগর ও ব্যবসায়ীরা উন্নতির নতুন সুযোগ পেলেন।

ইলমি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হলো। ভাষা, তহজিব ও تمدن এবং সংস্কৃতিকে পরিমার্জিত ও উন্নত করার সুযোগ সৃষ্টি হলো। এখন জ্ঞানী-গুণী ও সাহিত্যিকদের জন্যও উন্মুক্ত ময়দান তৈরি হলো। তাদের আর দিল্লি যাওয়ার প্রয়োজন রইল না, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আশেপাশে কদর করার মতো দরবার পেয়ে গেলেন। বিভিন্ন শহরের স্বতন্ত্র تمدن বিকশিত হয়ে সামনে এল, একইভাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলোও উন্নতি লাভ করল এবং সেগুলোর সেরা বাগ্মী ব্যক্তিরা সামনে এলেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এই সালতানাত ও হুকুমতগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং উত্থান-পতনের অবস্থা ও তাদের শাসকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করছি।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

(১) কাশ্মীর সালতানাত

৭৩৫ হিজরি থেকে ৯৯৭ হিজরি

(১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

কাশ্মীর যাকে ভূস্বর্গ বলা হয়, তা তার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাহাড়, বরফশীতল নদী এবং হ্রদগুলোর এক চমৎকার সংমিশ্রণে গঠিত। কাশ্মীরের ভূগোল মূলত হিমালয়ের পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত, যার মধ্যে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা এই উপত্যকাকে ভারতের সমতল অঞ্চল থেকে পৃথক করেছে এবং এটিই কাশ্মীরে প্রবেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক পথ।

উপত্যকার উত্তর ও পূর্বে অবস্থিত হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়াগুলো উত্তর দিক থেকে আসা প্রচণ্ড শীতল হাওয়া থেকে উপত্যকাকে রক্ষা করে। এই চূড়াগুলো বরফে ঢাকা দেখা যায়। এগুলোর ওপর অনেক বিশাল হিমবাহ (গ্লেসিয়ার) অবস্থিত। চীনের সীমান্তের কাছে কারাকোরাম পর্বতমালা অবস্থিত, যেখানে বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়াগুলো বিদ্যমান।

নদী এবং হ্রদ কাশ্মীরের সৌন্দর্যে নতুন মাত্রা যোগ করে। 'তাওয়াই' নদী জম্মুর কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়, অন্যদিকে ঝিলাম নদী উপত্যকার কেন্দ্রস্থলকে সিক্ত করে কাশ্মীরের রাজধানী 'শ্রীনগর'-এর পাশ দিয়ে বয়ে যায়। রাভি এবং চেনাব নদীও কাশ্মীরের ঝরনাধারা থেকে পানি সংগ্রহ করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। নীলম নদী কাশ্মীরের অত্যন্ত সুন্দর একটি নদী, যা মুজাফফরাবাদের কাছে ঝিলাম নদীর সাথে মিলিত হয়।

শ্রীনগরের পূর্বে প্রায় দশ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং পাঁচ কিলোমিটার প্রশস্ত ডাল লেক অবস্থিত, যা এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। যেখানে ভাসমান বজরা এবং শিকারা একে এক অনন্য পরিচিতি দান করে। এখন লেকের পশ্চিমেও বেশ...

https://t.me/BoierSomahar

বসতি স্থাপিত হয়েছে।

কাশ্মীর প্রাকৃতিকগতভাবে তিনটি অংশে বিভক্ত: ১. লাদাখ ২. জম্মু ৩. কাশ্মীর।

লাদাখ চীন এবং তিব্বত মালভূমির সাথে অবস্থিত এবং একে 'ক্ষুদ্র তিব্বত'ও বলা হয়। এটি বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল।

জম্মু তুলনামূলকভাবে নিচু এলাকায় এবং পাঞ্জাবের সীমান্তের সাথে লেগে আছে, তাই এর আবহাওয়া খুব বেশি ঠান্ডা নয়। একে কাশ্মীরের রাজাদের শীতকালীন রাজধানী বলা হয়। অন্যদিকে শ্রীনগরকে, যা অত্যন্ত শীতল স্থান, গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে গণ্য করা হয়। কাশ্মীর উপত্যকা চারদিক থেকে সুরক্ষিত এবং এতে প্রবেশের উন্মুক্ত পথ খুব কম। ভারতের দিক থেকে উপত্যকার কেন্দ্র শ্রীনগর পর্যন্ত আসার একমাত্র এবং প্রাচীন পথটি হলো যা পাঠানকোট থেকে উধমপুর পর্যন্ত আসে এবং সেখান থেকে জম্মু এবং তারপর শ্রীনগর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পাঞ্জাবের দিক থেকে শ্রীনগর পৌঁছানোর দুটি পথ পরিচিত: একটি পথ শিয়ালকোট থেকে জম্মু এবং তারপর শ্রীনগর পর্যন্ত পৌঁছায়। দ্বিতীয় পথটি মুরি পাহাড় থেকে মুজাফফরাবাদ এবং তারপর শ্রীনগর পর্যন্ত যায়।

কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস:

প্রায় তিনশ বছর খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাশ্মীরে বৌদ্ধ শাসক অশোকের শাসন ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য বাংলা থেকে দাক্ষিণাত্য এবং কাশ্মীর থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের মৃত্যুর পর কাশ্মীরে বৌদ্ধ শাসকদের শাসনের অবসান ঘটে এবং সেখানে স্থানীয় গোত্রগুলোর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হতে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে ব্রাহ্মণদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ধীরে ধীরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর ব্রাহ্মণদের ওয়াইহিন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় যা আফগানিস্তানের পূর্ব প্রদেশগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে গজনীর শাসক সবুক্তগিন ওয়াইহিন্দ সাম্রাজ্যের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করে এর শক্তি কমিয়ে দেন। এরপর তার উত্তরসূরি সুলতান মাহমুদ গজনভী ওয়াইহিন্দ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটান এবং পাঞ্জাবকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করার পর কাশ্মীরের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি এখানে দুবার আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু দুবারই তাকে 'লোহকোট' এর ব্যর্থ অবরোধ শেষে ফিরে যেতে হয়। মোদ্দাকথা, পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত হওয়ার কারণে কাশ্মীর দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলিম বিজয়ীদের নাগালের বাইরে ছিল।

কাশ্মীরে ইসলামের প্রচার-প্রসার মুসলিম সুফিয়ায়ে কেরামদের কাছে ঋণী, অন্যদিকে রাজনৈতিক ময়দানে আধিপত্যের কৃতিত্ব একজন মুসলিম আমিরের প্রাপ্য যাকে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা নিজের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে মন্ত্রিত্বের পদে পৌঁছেছিলেন। এই মুসলিম আমির ছিলেন 'শাহ মির্জা'। তার পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক ছিল খোরাসানের সাথে। ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অনুযায়ী শাহ মির্জার এলাকা ছিল সোয়াত। [১] সুতরাং সম্ভব যে এই পরিবারটি প্রথমে খোরাসান থেকে সোয়াতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

---

[১] ইসলাম কাশ্মীরে শাহ মির্জা কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল, যিনি সোয়াত থেকে আসা একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন, (দ্য ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ভলিউম ৩: তুর্কস অ্যান্ড আফগানস। ১২ "দ্য কিংডম অফ কাশ্মীর")

যখন তিনি কাশ্মীর যাচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজেও জানতেন না যে ভাগ্য তাঁর নসিবে কত বড় সৌভাগ্য লিখে রেখেছে। সেই সময় কাশ্মীরের মানুষ হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিল, অন্যদিকে চীনের সাথে সংযুক্ত এলাকা অর্থাৎ "লাদাখ" ইত্যাদির দিকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা বসবাস করত। মুসলিম জনসংখ্যার এখানে নাম-নিশানাও ছিল না। হ্যাঁ, কদাচিৎ কিছু যোগ্য ব্যক্তি মাঝেমধ্যে কোনো দরবারে চাকরি পেয়ে যেতেন। এমন পরিস্থিতিতে এখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটি অদ্ভুত বিষয় ছিল, যার প্রেক্ষাপট অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

সহদেব-এর শাসন

(৭০৭ হিজরি থেকে ৭২৩ হিজরি / ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

কাশ্মীরে শতাব্দীকাল ধরে হিন্দুদের বসবাস ছিল এবং তাদেরই বিভিন্ন রাজবংশ এখানে শাসন করে আসছিল। অষ্টম হিজরি শতকের শুরুতে এখানে রাজা "সহদেব"-এর শাসন ছিল, যিনি ৭০৭ হিজরিতে (১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি যদিও কট্টর হিন্দু ছিলেন, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রদর্শন করতেন না। ৭১৫ হিজরিতে শাহ মির্জা এখানে আসলে রাজা তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা চিনতে পেরে তাঁকে নিজের কাছে চাকরি দেন। এরপর বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী তিব্বতের এক রাজপুত্র "রিনচেন" নিজের চাচার জুলুম থেকে বাঁচতে কাশ্মীর পৌঁছান এবং তিনিও শাসনে একটি সম্মানজনক স্থান লাভ করেন।

সেই সময়ে কাশ্মীর ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। হিন্দুরাও কেবল নামমাত্র হিন্দু ছিল, নতুবা কিছু রীতিনীতি পালনের বাইরে তারা প্রকৃতপক্ষে ভোগবাদী হয়ে পড়েছিল এবং সব ধরণের নৈতিক মন্দ কাজে মারাত্মকভাবে লিপ্ত ছিল। নির্লজ্জতার সীমা এই ছিল যে, সেই যুগে বিবাহিত মহিলারা তাদের স্বামীদের সম্মতিতে দেহব্যবসা করত এবং তাদের স্বামীরা একে একটি লাভজনক ব্যবসা মনে করত। মোটকথা, বিশ্বাসগত ও নৈতিক অবক্ষয় চরমে ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে ৭২৩ হিজরির (১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দ) শুরুতে কাশ্মীর এক ঝড়ের সম্মুখীন হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, একজন মঙ্গোল রাজপুত্র জুলকদর খান মধ্য এশিয়া থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে এসে কাশ্মীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজা সহদেব মোকাবিলার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি পালিয়ে যান এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিশতওয়ারে আত্মগোপন করে থাকেন। [১]

মঙ্গোলদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে প্রধান সেনাপতি রামচন্দ্র, রাজপুত্র রিনচেন এবং শাহ মির্জাও এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়লেন। মঙ্গোলরা এখানে ব্যাপক লুটতরাজ চালায় এবং শরৎকাল পর্যন্ত এখানে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। শীতকাল আসলে মঙ্গোল রাজপুত্র ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সে দ্রুততম সময়ে ফেরার জন্য সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজছিল। কাশ্মীরি পথপ্রদর্শকরা প্রতিশোধ নিতে তাকে এমন এক পথ দেখিয়ে দেয় যা ছিল প্রাণঘাতী। সেই পথে চলতে গিয়ে এই পুরো বাহিনী বরফে চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

কাশ্মীর মুক্তি পেল ঠিকই কিন্তু দেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এমন অবস্থায় রিনচেন এবং শাহ মির্জা মিলে দেশ সামলান এবং এই ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন মুছে ফেলতে সচেষ্ট হন এবং সেই সাথে শাসনভার হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেনাপতি রামচন্দ্র তাদের...

---

[১] কিশতওয়ার কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব জেলা যা অত্যন্ত উঁচু এবং দুর্গম পাহাড়ে অবস্থিত।

বিপদ ছিল, তাই তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। [১]

সদরুদ্দিন রিঞ্চন, প্রথম মুসলিম শাসক

(৭২০ হিজরি থেকে ৭২৪ হিজরি / ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

মোদ্দাকথা, ৭২৪ হিজরিতে (১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ) রিঞ্চন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শাহ মির্জা উজির হিসেবে দেশের সেবা শুরু করেন। সহদেব, যিনি প্রয়োজনের সময় পালিয়ে গিয়েছিলেন, এখন পুনরায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু তিনি কোনো সাফল্য পাননি এবং কাশ্মীর ছেড়ে চলে যান। এরপর রিঞ্চন তার বিধবা স্ত্রী কোটা রানীকে বিয়ে করে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেন। কিছুকাল পর শাহ মির্জার উৎসাহে এবং একজন মুসলিম দাঈ হযরত বুলবুল শাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির দাওয়াতে রিঞ্চন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সদরুদ্দিন নামে পরিচিত হন। তার স্ত্রী কোটা রানীও মুসলিম হয়ে যান। তিনি শাসনের জন্য মাত্র দুই-আড়াই বছর সময় পেয়েছিলেন। ৭২৭ হিজরিতে রিঞ্চন ইন্তেকাল করেন। [২]

উদয়ন দেব

(৭২৭ হিজরি থেকে ৭৪৪ হিজরি / ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)

রিঞ্চন সদরুদ্দিনের মৃত্যুর সময় তার ছেলে হায়দার খান অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল, তাই শাসনকার্য কার্যত কোটা রানী নিজের হাতে তুলে নেন এবং সাবেক স্বামী সহদেবের ভাই উদয়ন দেবকে বিয়ে করে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসান। এটি ৭২৭ হিজরির ঘটনা। ৭৩১ হিজরিতে (১৩৩১ খ্রিষ্টাব্দ) মঙ্গোলরা আবারও কাশ্মীর আক্রমণ করে। উদয়ন দেবও তার ভাই সহদেবের মতো মোকাবিলার পরিবর্তে পলায়ন করাকে প্রাধান্য দেন। এমন পরিস্থিতিতে কোটা রানী ক্ষমতা হাতে নেন এবং শাহ মির্জাকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের নির্দেশ দেন। শাহ মির্জা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে মঙ্গোলদের মোকাবিলা করে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। এভাবে তার মান-মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। উদয়ন দেব শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসতে দেখে ফিরে আসেন এবং আগের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসেন, তবে শাহ মির্জাকে সমস্ত রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সর্বময় কর্তা বানিয়ে দেন অর্থাৎ শাসনভার কার্যত শাহ মির্জার হাতে সোপর্দ করেন। এছাড়া তার ছেলে জমশিদ ও আলী শেরকে (আলাউদ্দিন) “কামরাজ”-এ বড় জায়গিরও প্রদান করেন। ৭৪৪ হিজরিতে (১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দ) উদয়ন দেবের মৃত্যু হয়। [৩]

---

[১] মুকাম্মাল তারিখে কাশ্মীর, লেখক: মুহাম্মদ দ্বীন ফওক: পৃষ্ঠা ৩০২ থেকে ৩০৭

[২] মুকাম্মাল তারিখে কাশ্মীর, লেখক: মুহাম্মদ দ্বীন ফওক: পৃষ্ঠা ৩০৭ থেকে ৩১৩

[৩] মুকাম্মাল তারিখে কাশ্মীর, লেখক: মুহাম্মদ দ্বীন ফওক: পৃষ্ঠা ৩১৪ থেকে ৩১

https://t.me/BoierSomahar

কোটা রানী

উদয়ন দেবের মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলে “বোলা রতন” অত্যন্ত অল্পবয়সী ছিল এবং পাঞ্জা ভাট নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন। কোটা রানী তাঁর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই শিশুটি আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আসীন থাকবে এবং এর আড়ালে তিনি ক্ষমতা নিজের ভাইদের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু কোটা রানীর এই সিদ্ধান্তে কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অসন্তুষ্ট হলেন। শাহ মির্জা এই পরিস্থিতি দেখে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরদারদের সাথে পরামর্শ করে জনশক্তিকে নিজের সাথে নিলেন এবং কোটা রানীর এই ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে রানীর পক্ষ থেকে পাঞ্জা ভাট ময়দানে নামলেন। ওদিকে শাহ মির্জাও অগ্রসর হলেন। যুদ্ধে পাঞ্জা ভাট নিহত হন এবং এভাবেই কোটা রানীর পঞ্চাশ দিনের শাসনকাল সমাপ্ত হয়। [১]

---

[১] মুকাম্মাল তারিখ-ই-কাশ্মীর, লেখক: মুহাম্মদ দীন ফাউক: পৃষ্ঠা ৩১৭, ৩১৮

https://t.me/BoierSomahar

শাহ মির্জা শামসুদ্দিন (শাহ মীরি বংশ)

৭৪০ হিজরি থেকে ৭৪৮ হিজরি (১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

কোটা রানীর পর সকলের সর্বসম্মতিক্রমে শাহ মির্জা শামসুদ্দিন উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং নিজের বাদশাহীর ঘোষণা দেন। এটি ৭৪০ হিজরি (১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। সিংহাসনে আরোহণের পর শাহ মির্জা মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করেন। ধর্মীয় ভেদাভেদ ছাড়াই হিন্দু ও মুসলমানদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেন, ফলে তাঁর শাসনের ভিত্তি খুব দ্রুত সুদৃঢ় হয়ে যায়।

সুলতান দেশের পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেন, কৃষিকাজে উন্নতি ঘটান এবং সকল অবৈধ কর বিলুপ্ত করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, মানুষের কাছ থেকে উৎপাদনের মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ খাজনা হিসেবে নেওয়া হবে। শাহ মির্জা একজন ন্যায়পরায়ণ, দানশীল, জ্ঞানীদের প্রতি অনুরাগী এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দয়ালু শাসক হওয়ার প্রমাণ দেন। এই বুদ্ধিমান ও ধর্মপ্রাণ রাজনীতিবিদ রাস্তাঘাট মেরামত করান এবং দাঙ্গাবাজ ও ডাকাতদের কঠোরভাবে দমন করেন। এভাবে রাজ্যে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]

ক্যামব্রিজ হিস্ট্রিতে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ আছে:

“নতুন বাদশাহ তাঁর ক্ষমতা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সদিচ্ছার সাথে ব্যবহার করেছেন। কাশ্মীরের হিন্দু রাজারা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। তাঁদের প্রকাশ্য নীতি ছিল এই যে, প্রজাদের কাছে সাধারণ ডাল-রুটি ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়। কিন্তু নতুন বাদশাহর শাসন ন্যায়সঙ্গত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি অযৌক্তিক সরকারি খাজনা ও জুলুমমূলক কর বিলুপ্ত করেন এবং সরকারি খাজনার মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ বহাল রাখেন।” [২]

শাহ মির্জা বার্ধক্যের কারণে তিন বছর পাঁচ মাস শাসন করার পর ৭৪৭ হিজরিতে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র জমশীদের হাতে শাসনভার অর্পণ করেন এবং পরবর্তী বছর ৭৪৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সাধারণ মানুষ শাহ মির্জাকে ‘শাহ মীর’ বলে স্মরণ করত। সেই সূত্রেই পরবর্তীতে তাঁর বংশের সুলতানদের ‘শাহ মীরি সুলতান’ বলা হতে থাকে। [৩]

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬২; মুকাম্মাল তারিখে কাশ্মীর, মুহাম্মদ দীন ফওক প্রণীত: পৃষ্ঠা ৩১৮ থেকে ৩২৩

[২] দ্য ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ভলিউম ৩: পৃষ্ঠা ২৭৭

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬২; মুকাম্মাল তারিখে কাশ্মীর, মুহাম্মদ দীন ফওক প্রণীত: পৃষ্ঠা ৩১৮ থেকে ৩২৩

সুলতান জমশীদ

(৭৪৮ হিজরি থেকে ৭৪৯ হিজরি / ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান জমশীদ তার ভাই আলী শেরকে (আলাউদ্দিন) সালতানাতের নায়েব নিযুক্ত করে শাসন শুরু করেন, কিন্তু এক বছর পর আলী শের বিদ্রোহ করেন। ভাইদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং আলী শের বিজয়ী হয়ে বড় ভাইকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেন এবং নিজে সালতানাত গ্রহণ করেন। জমশীদের শাসনকাল ছিল ৭৪৮ হিজরি থেকে ৭৪৯ হিজরি (১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত।

সুলতান আলাউদ্দিন

(৭৪৯ হিজরি থেকে ৭৬১ হিজরি / ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ)

আলী শের আলাউদ্দিন উপাধি গ্রহণ করে প্রায় বারো বছর শাসন করেন। তিনি দেশের নৈতিক অবক্ষয় এবং বিশেষ করে অশ্লীলতা রোধে আইন প্রণয়ন করেন। সে সময় কাশ্মীরে মুসলমান খুব কম ছিল, অন্যদিকে নামমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং সব ধরণের অশ্লীলতায় লিপ্ত নারী-পুরুষের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং বিবাহিত মহিলারাও দেহব্যবসায় লিপ্ত ছিল। তিনি আদেশ দেন যে, যে নারী দেহব্যবসা করবে, সে স্বামীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এই নিষেধাজ্ঞার ভয়ে হাজার হাজার ব্যভিচারী নারী এই নোংরা কাজ ছেড়ে দেয়। [১]

শাহাবুদ্দিন শাহ কাশ্মীরী

(৭৬১ হিজরি থেকে ৭৮০ হিজরি / ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান আলাউদ্দিনের পর তার পুত্র সুলতান শাহাবুদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ রাজা, যোদ্ধা সৈনিক এবং মুজাহিদ, যিনি দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সাথে ১৮ বছর শাসন করেন। সুলতানের শাসনামলে আমীর কবীর সৈয়দ আলী হামদানী (রহ.) কাশ্মীরে আগমন করেন এবং এই অঞ্চলকে তার বরকত দ্বারা আলোকিত করেন। সৈয়দ সাহেব (রহ.) কাশ্মীরে আসার আগে তার একনিষ্ঠ অনুসারী সৈয়দ তাজউদ্দীন বায়হাকীর পুত্র সৈয়দ হাসান বায়হাকীকে কাশ্মীরে পাঠিয়েছিলেন যাতে সেখানকার পরিস্থিতির বিস্তারিত জানতে পারেন। এই কারণে সুলতান শাহাবুদ্দিনের সাথে সৈয়দ তাজউদ্দীন বায়হাকী এবং সৈয়দ হাসান বায়হাকীরও আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তিনি তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শুরু করেন। তিনি সৈয়দ হাসান বায়হাকীকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। [২] এই ন্যায়পরায়ণ, মুজাহিদ, নির্ভীক ও সাহসী রাজা অনেক দুর্গ ও এলাকা জয় করেন। তার সিংহাসনে আরোহণের প্রাথমিক যুগে দেশের...

---

[১] মুকাম্মাল তারিখে কাশ্মীর, মুহাম্মদ দীন ফওক রচিত, পৃষ্ঠা ৩২৪, ৩২৫।

[২] মনে রাখবেন যে, এই সৈয়দ হাসান বায়হাকী আলাদা এবং সুলতান জয়নুল আবেদিন বা তার বংশধরদের আমলে যে সৈয়দ হাসান বায়হাকীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি ভিন্ন এক ব্যক্তিত্ব।

ব্যবস্থাপনা উন্নত করার পর তিনি কাবুল জয়ের সংকল্প করলেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে বারামুলা ও হাজুর হয়ে অবশেষে কাবুলে পৌঁছালেন এবং কাবুলের শাসক আহমদ খানকে পরাজিত করে বন্দী করলেন। পরবর্তীতে সৈয়দ তাজউদ্দীন হামদানীর সুপারিশে তাকে কেবল মুক্তই করেননি বরং নিজের বোনকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে তাকে মুকুট ও সিংহাসনও ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি লঘমান, বদখশান, গজনী, ঘোর, হেরাত এবং কান্দাহারও জয় করেন এবং অবশেষে হিন্দুকুশ হয়ে ফিরে আসেন। পরবর্তী অভিযানে সুলতান শাহাবুদ্দীন "তিব্বত সগির" অর্থাৎ "লাদাখ"ও পদানত করেন। সেই সাথে গিলগিট এবং এর আশপাশের এলাকাকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আরও যুদ্ধে তিনি কোহিস্তান-এ-নমক থেকে মুলতান পর্যন্ত অধিকাংশ এলাকা জয় করেন এবং এরপর ৭৭৪ হিজরিতে (১৩৭২ খ্রিস্টাব্দে) পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে দিল্লি জয়ের জন্য বের হন। শতদ্রু নদীর তীরে দিল্লির বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। কাশ্মীরি বাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিল এমন সময় মীর সৈয়দ আলী হামদানী (রহ.) সুলতান শাহাবুদ্দীনকে যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধি করার নির্দেশ দেন। সুলতান একজন একনিষ্ঠ মুরিদের মতো পীরের নির্দেশ মেনে নিলেন। ফলে একটি চুক্তির মাধ্যমে সীমানা নির্ধারিত হলো এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেল। [১]

শাহাবুদ্দীন কাশ্মীরি ন্যায়বিচার, দয়া এবং সহনশীলতার দিক থেকে সেই যুগে নিজের উপমা নিজেই ছিলেন। তিনি অনেক এলাকা জয় করেছিলেন কিন্তু অধিকাংশ এলাকা পুনরায় পরাজিত শাসকদের ফিরিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি দুটি নতুন শহরও নির্মাণ করেন যাদের নাম ঝিলামপুর এবং শাহাবপুর রাখা হয়েছিল।

সুলতানের মৃত্যু ৭৮০ হিজরিতে হয়। মৃত্যুর আগে তিনি নিজের ভাই হিন্দালকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। [২]

কুতুবুদ্দীন শাহ কাশ্মীরি

(৭৮০ থেকে ৭৯৫ হিজরি / ১৩৭৮ থেকে ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

হিন্দাল কুতুবুদ্দীন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন আলেম, ফাজিল, নেককার, ন্যায়পরায়ণ এবং দানশীল বাদশাহ প্রমাণিত হন। তিনি "কুতুবুদ্দীনপুর" শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেখানে অন্যান্য ইমারতের সাথে একটি বিশাল মাদরাসাও নির্মাণ করেন।

তার সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বছর মীর সৈয়দ আলী হামদানী (রহ.) দ্বিতীয়বার কাশ্মীর সফরে আসেন। কুতুবুদ্দীন তার অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা করেন এবং খিদমতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। তিনি "কালী শোর" নামক একটি মন্দিরকে খানকাহে রূপান্তরিত করেন এবং সেখানে সৈয়দ সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করেন যেখানে তিনি মুরিদদের শিক্ষা দিতেন।

সৈয়দ সাহেব জানতে পারলেন যে কুতুবুদ্দীন দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করেছেন, তখন তিনি তাকে জানালেন যে এই কাজ শরীয়ত অনুযায়ী জায়েজ নয় এবং এটি ত্যাগ করা আবশ্যক। ফলে কুতুবুদ্দীন তৎক্ষণাৎ একজনকে তালাক দিয়ে দেন। সৈয়দ সাহেব (রহ.)...

---

[১] এই যুদ্ধের বিবরণ মুহাম্মদ দীন ফওক-এর তারিখ-এ-কাশ্মীর-এ রয়েছে। দিল্লির সুলতানদের ইতিহাসে এই যুদ্ধের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

[২] মুকাম্মাল তারিখ-এ-কাশ্মীর, মুহাম্মদ দীন ফওক, পৃষ্ঠা ৩৩০ থেকে ৩৩৭; নুজহাতুল খাওয়াতির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৬।

তিনি তার আনুগত্য ও খিদমতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজের টুপি দান করেন, যা তিনি সর্বদা তার মুকুটের নিচে পরিধান করতে শুরু করেন। [১]

সৈয়দ সাহেব (রহ.) ছয় মাস অবস্থানের পর ফিরে যান। ৭৮৫ হিজরিতে তিনি তৃতীয় ও শেষবারের মতো আগমন করেন এবং শীঘ্রই হারামাঈন যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই সফরেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং খতলানে তাকে দাফন করা হয়। [২]

কুতুবুদ্দিনের শাসনামল ছিল পনেরো বছর এবং তিনি ৭৯৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৩]

সিকান্দার বিন কুতুবুদ্দিন কাশ্মীরি

৭৯৬ হি. থেকে ৮২০ হি. (১৩৯৪ খ্রি. থেকে ১৪১৭ খ্রি.)

সিকান্দার বিন কুতুবুদ্দিন বিন শাহ মির্জা কাশ্মীরিও একজন মহান বাদশাহ ছিলেন। তিনি ৭৯৬ হিজরিতে তার পিতার পর শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি তার সেনাবাহিনী তিব্বতে সগির (ক্ষুদ্র তিব্বত) পর্যন্ত পাঠান এবং তা জয় করেন। এই বাদশাহর আলিমদের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা ও ভক্তি ছিল, তাই তার দরবার উলামা ও মাশায়েখদের দ্বারা মুখরিত থাকত।

তার সিংহাসন আরোহণের প্রথম বছর শাহ হামদান সৈয়দ আলী হামদানি (রহ.)-এর ২২ বছর বয়সী সাহেবজাদা মুহাম্মদ বিন আলী হামদানি (রহ.) কাশ্মীরে আগমন করেন। সিকান্দার শাহ তার কাছে বায়আত হন এবং দ্বীনি বিষয়ে দিকনির্দেশনা নিতে শুরু করেন। তিনি সাহেবজাদার জন্য শাহ হামদানের অবস্থানের স্থানে একটি বিশাল খানকাহ নির্মাণ করে দেন যা 'خانقاہِ معلیٰ' (খানকাহ-এ মুয়াল্লা) নামে পরিচিতি লাভ করে। সাহেবজাদার পরামর্শে তিনি মদ্যপান, জুয়া, ব্যভিচার, নাচ-গান এবং বাদ্যযন্ত্রের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সুলতান সিকান্দার এই আদেশও দেন যে, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে, সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, কোনো অবৈধ কর (ট্যাক্স) নেওয়া যাবে না।

সিকান্দার শাহ তাওহীদ প্রচারের জজবায় ভরপুর এবং এর জন্য সক্রিয় ছিলেন। তিনি একজন নওমুসলিম কাশ্মীরি পণ্ডিতকে নিজের উজির বানান, যার নাম ছিল সুহভাট। তার ইসলামি নাম রাখা হয় সাইফুদ্দীন। তার হিন্দু আত্মীয়-স্বজনরা তাকে তুচ্ছজ্ঞান করত এবং তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করত। এদিকে তিনিও জোশে চলে আসেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, তাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন অথবা মুসলিম বানিয়ে ছাড়বেন। তিনি বাদশাহকে সমমনা বানিয়ে দেশে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ মন্দির ও মূর্তিশালা ভেঙে ফেলেন এবং মূর্তিপূজা উচ্ছেদে নিজের পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। এসব মূর্তিশালার কোনো কোনোটি সম্পর্কে বলা হয় যে, সেগুলো দুই বা তিন হাজার বছরের পুরনো ছিল। এই কারণেই মানুষ বাদশাহকে 'সিকান্দার বুত-শিকান' (মূর্তি ধ্বংসকারী) উপাধি দেয়।

সিকান্দার শাহর আমলে তৈমুর লং দিল্লি বিজয়ের পর ফেরার পথে কোহিস্তান-এ শিবালিক হয়ে জম্মু পৌঁছান। সুলতান...

---

[১] সৈয়দ সাহেবের সাথে বা তার আগমনের পর কাশ্মীরে খোরাসান ও মধ্য এশিয়া থেকে বিপুল সংখ্যক সাদাত কিরাম (সৈয়দ বংশীয়রা) পৌঁছান এবং এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। বলা হয় যে, আমির তৈমুর কোনো এক সৈয়দজাদার ওপর রাগান্বিত হয়ে সমস্ত সাদাতকে হত্যার সংকল্প করেছিলেন, যার ফলে ভীত হয়ে সাদাত কিরাম কাশ্মীরে আসতে শুরু করেন। বর্তমানে কাশ্মীরে যে সাদাতরা বসবাস করেন, তাদের অধিকাংশই সেইসব ব্যক্তিদের বংশধর যারা ওই সময়ে এখানে এসেছিলেন। (মুকাম্মাল তারিখ-এ কাশ্মীর: পৃ. ৩৩৩)

[২] খতলান মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্র তাজিকিস্তানের একটি প্রদেশ, যেখানে সৈয়দ আলী হামদানির মাজার 'কুলাব' শহরের কাছে অবস্থিত।

[৩] মুকাম্মাল তারিখ-এ কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফওক: পৃ. ৩৩০ থেকে ৩৩৪, ৩৩৬; বজমে খাইরুল বাশার: পৃ. ১৯০

সিকান্দার বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেন এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং নিজের দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সুলতান সিকান্দারের শাসনকাল ছিল প্রায় চব্বিশ বছর এবং ৮২০ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। [১]

সুলতান আলী শাহ

(৮২০ হিজরি থেকে ৮২৬ হিজরি / ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪২৩ খ্রিস্টাব্দ)

সিকান্দার শাহের পুত্র আলী শাহ ছয় বছর শাসন করেন। এই সময়েও উজির সাইফ উদ্দিন (সুহাবাট) এর প্রভাব বজায় ছিল এবং হিন্দুদের ওপর এমন কঠোরতা চলতে থাকে যা আগে কখনো হয়নি। তাদের কপালে "তিলক" লাগানোও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। স্বামীদের মৃত্যুতে নারীদের পুড়িয়ে মারার প্রথা "সতীদাহ" নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সোনা ও রূপার মূর্তিগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং সেগুলো গলিয়ে মুদ্রা তৈরি করা হয়েছিল। এই আদেশগুলো লঙ্ঘনকারী হিন্দুদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং অনেকে এই কঠোরতায় ঘাবড়ে গিয়ে নিজেরাই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অনেক হিন্দু যারা এই কঠোরতা সহ্য করতে পারছিল না এবং দেশও ছাড়তে পারছিল না, তারা আত্মহত্যা করেছিল। কিছু হিন্দু এই কষ্ট থেকে বাঁচতে লোকদেখানোভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই ধারা চলছিল যখন ৮২৫ হিজরিতে উজির সাইফ উদ্দিনের মৃত্যু হয়। তিনি কুতুব উদ্দিন, সিকান্দার শাহ এবং আলী শাহ—এই তিন বাদশাহর উজির ছিলেন এবং এই পদে চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেন। যদি তার মেজাজে কঠোরতা না থাকত, তবে তিনি অত্যন্ত গুণী একজন ব্যক্তি হতেন।

যেহেতু কাশ্মীরের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখন বাদশাহর সাথে ছিল না, তাই সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি কমে গিয়েছিল। এর সুযোগ নিয়ে কাশগরের বাদশাহ "লাদাখ" ইত্যাদি নিজের দখলে নিয়ে নেন এবং আলী শাহ কিছুই করতে পারেননি।

সাইফ উদ্দিনের মৃত্যুর পর আলী শাহ তার ভাই শাহী খানকে উজির নিযুক্ত করেন। তিনি সাইফ উদ্দিনের বিপরীতে অত্যন্ত নম্রতা, দয়া ও প্রজ্ঞার সাথে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন এবং সাইফ উদ্দিনের কঠোরতার ক্ষতিপূরণ করতে শুরু করেন। এটি দেখে আলী শাহ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। তিনি ভাবলেন, শাসন করা আমার এই ভাইয়ের জন্যই শোভা পায়। ফলে তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে নিজে হজ্জ বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

কিন্তু জম্মু পৌঁছালে সেখানে তার শ্বশুর তাকে তিরস্কার করেন এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে প্ররোচিত করেন, যার ফলে আলী শাহ সৈন্য প্রস্তুত করে শাহী খানের সাথে যুদ্ধের জন্য ফিরে আসেন। শাহী খানও তার সেনাবাহিনী নিয়ে বের হন। উড়ি নামক স্থানে যুদ্ধ হয় যাতে জয়ী হয়ে আলী শাহ পুনরায় সিংহাসনে বসেন, অন্যদিকে শাহী খান পিছু হটে শিয়ালকোট পৌঁছান। সেখানে তিনি খোখর শাসক জসরতকে নিজের সাথে যুক্ত করেন। উভয়ের যৌথ আক্রমণের ফলে আলী শাহ পরাজিত হন এবং শাহী খান বাদশাহ হন। [২]

---

[১] মুকাম্মাল তারিখ-ই-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফাউক: পৃষ্ঠা ৩৩১ থেকে ৩৪১; নুযহাতুল খাওয়াতির: পৃষ্ঠা ২৩৬, ২৩৭

[২] মুকাম্মাল তারিখ-ই-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফাউক: পৃষ্ঠা ৩৪২ থেকে ৩৪৪

সুলতান জয়নুল আবেদিন

৮২৬ হিজরি হতে ৮৭৪ হিজরি

(১৪২৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৪৭০ খ্রিষ্টাব্দ)

শাহী খান জয়নুল আবেদিন উপাধি গ্রহণ করে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ন্যায়বিচার ও বদান্যতা প্রদর্শনে কোনো ত্রুটি রাখেননি। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি নিরপরাধ বা সামান্য অপরাধে বন্দীদের মুক্তি দেন। পূর্ববর্তী শাসনামলে যেসব অমুসলিমদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে আনেন। তাদের নিজ ধর্ম পালনের, প্রথা অনুযায়ী কপালে তিলক লাগানোর এবং 'সতী'দাহ প্রথার অনুমতি দেওয়া হয়। সুলতান হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করেন এবং তাদের মন জয়ের জন্য মুসলমানদের জন্য গরু জবাই করাও নিষিদ্ধ করেন। অবৈধ করসমূহ বিলুপ্ত করেন এবং সেসব অমুসলিমদের পুনরায় তাদের পুরনো ধর্মে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন যাদেরকে তার পিতার আমলে জোরপূর্বক মুসলমান করা হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের গুদামে মালামাল লুকিয়ে রাখা এবং মজুদদারি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন যাতে ব্যবসায়ীরা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে না পারে এবং কেউ কাউকে ধোঁকা দিতে না পারে।

৮২৬ হিজরিতে সুলতান তার ভাই মুহাম্মদ খানকে নিজের উজির নিযুক্ত করেন। এই বাদশাহর আমলে অনেক বিজয়ও অর্জিত হয়। ফলে তিব্বতকে পুরোপুরি জয় করে সেখানকার জনগণকে অনুগত করা হয়। একইভাবে তার মিত্র জসরত খোখরের সাহায্যে পাঞ্জাবেও নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং শতদ্রু নদী পর্যন্ত সমস্ত এলাকা জয় করে নেন। এই ইস্যুতে দিল্লি সালতানাতের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হয়, তবে শেষ পর্যন্ত শান্তি স্থাপিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পেশোয়ার থেকে সিরহিন্দ পর্যন্ত সমস্ত এলাকা সুলতান জয়নুল আবেদিনের সাম্রাজ্যভুক্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

সুলতানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত পবিত্র। বলা হয় যে, তিনি কখনো কোনো পরনারী বা কারো সম্পদের দিকে খিয়ানতের নজরে তাকাননি। সুলতান অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীদের ক্ষমা করে দিতেন এবং খুব কমই শাস্তি দিতেন। যদি কারো হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া জরুরি হতো, তবে তিনি এমন রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করতেন যাতে সেই ব্যক্তি অপমানিত বোধ না করে বা তাকে সরকারিভাবে শাস্তি পেতে না হয়। সুলতানের অভ্যাস ছিল যে, কোনো শহর জয় করার পর গনিমতের মাল নিজের সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। বিদ্রোহীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শাস্তি দিতেন এবং দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন।

https://t.me/BoierSomahar

তিনি কেবল হিন্দুদেরকে তাদের মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতিই দেননি, বরং অনেক মন্দিরের জন্য জায়গিরও ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি মন্দিরের সাথে একটি পাঠশালা (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) বাধ্যতামূলক করেছিলেন যাতে হিন্দু শিশুরাও লেখাপড়া করতে পারে।

সুলতানের অধিকাংশ সময় ব্যয় হতো রাষ্ট্রের পুনর্গঠন, কৃষির উন্নয়ন, খাল খনন, বৃক্ষরোপণ, সীমান্ত এলাকা শক্তিশালী করা এবং সেতু নির্মাণে। রাজ্যে এমন কোনো জমি অবশিষ্ট ছিল না যেখানে পানি পৌঁছাত না। কোনো অংশই বৃক্ষরোপণ, কৃষি বা উদ্যানপালন থেকে খালি ছিল না। সুলতান সর্বদা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের অত্যন্ত সম্মান করতেন, যার ফলে মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিতদের এক বিশাল সমাবেশ কাশ্মীরি দরবারে একত্রিত হয়েছিল।

এই পণ্ডিতগণ অনেক বই আরবি ও ফারসি থেকে হিন্দিতে এবং হিন্দি থেকে আরবি ও ফারসিতে অনুবাদ করেছিলেন। সুলতানের পার্থিব সম্পদের প্রতি কোনো মোহ ছিল না। তিনি সম্পদ সঞ্চয় করেননি এবং সোনা-রূপা দিয়ে কোষাগার পূর্ণ করে রাখেননি। সুলতানের মধ্যে সচ্চরিত্র, বিনয়, উচ্চতর দূরদর্শিতা, বাস্তবতা উপলব্ধি, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, জনগণের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা, উত্তম ব্যবস্থাপনা, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের প্রতি ভালোবাসার মতো গুণাবলি একত্রিত হয়েছিল। সুলতানের মৃত্যু ৮৭৮ হিজরি (১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ) এর শেষে হয়েছিল। তাঁর বয়স ছিল ৬৯ বছর। তাঁর শাসনকাল ছিল ৫২ বছর। তাঁর আমলে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই সুখী ছিল।

সুলতান জয়নুল আবেদিনকে ‘কাশ্মীরের বুডশাহ’ অর্থাৎ মহান সুলতান বলা হয়। সুলতানকে মুঘল সম্রাট আকবরের সাথেও তুলনা করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সুলতান তাঁর জ্ঞান, গুণ এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় আকবরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

তাঁর শাসনকালকে কাশ্মীরে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুলতান নতুন খাল খনন করিয়েছিলেন, সেতু নির্মাণ করেছিলেন এবং নতুন শহরও আবাদ করেছিলেন, যার মধ্যে জয়নগির, জয়নপুরা এবং জয়নকোটের মতো স্থানগুলো অন্তর্ভুক্ত। [১]

সুলতানের উত্তরসূরিরা এর বিপরীতে রাষ্ট্র পরিচালনার গুণাবলি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ফলে খুব শীঘ্রই সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

হায়দার খান

(৮৭৮ হিজরি থেকে ৮৮০ হিজরি / ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান জয়নুল আবেদিনের তিন ছেলে ছিল এবং তারা তিনজনই অযোগ্য ছিল। বড় ছেলে ছিল আধাম খান, যে সুলতানের দৃষ্টিতে একেবারেই অপদার্থ ছিল। দ্বিতীয়জন ছিল হাজি খান, যে সুলতানের প্রিয় ছিল। তৃতীয়জন ছিল বাহরাম খান, যার স্বভাব ছিল মুনাফিকসুলভ। এই তিনজন সুলতানের জীবদ্দশাতেই নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করেছিল এবং তাদের এই সংঘাত সুলতানের বার্ধক্যকে অত্যন্ত তিক্ত করে তুলেছিল। সুলতান জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুর পর তাদের দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়।

পরিশেষে হাজি খান বিজয়ী হয়ে সিংহাসনে বসেন এবং হায়দার খান উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ওপর কোনো...

---

[১] মুকাম্মাল তারিখ-ই-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফাউক, পৃষ্ঠা: ৩৪৪ থেকে ৩৬৩; নুযহাতুল খাওয়াতির, পৃষ্ঠা: ২৫০, ২৫১।

মনোযোগ দেয়নি এবং মদ্যপান ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। তাকে গাফেল দেখে আমীর ও সর্দাররাও উদাসীন হয়ে পড়ল। এভাবে শাসনব্যবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যেতে লাগল। এই অযোগ্য শাহজাদা এক বছরের কিছু বেশি সময় শাসন করতে পেরেছিল। একদিন প্রাসাদের ছাদে আমোদ-প্রমোদের আসর সাজিয়ে বসেছিল, এমতাবস্থায় মদের নেশায় টালমাটাল হয়ে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। [১]

হাসান শাহ

৮৮০ হিজরি থেকে ৮৯২ হিজরি (১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ)

এখন তার পুত্র হাসান শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে পদে পদে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগল। সে মদ্যপান, বিলাসিতা এবং গান-বাজনায় মগ্ন থাকল। এর পাশাপাশি আমীর, কর্মকর্তা এবং জনগণের ওপর জুলুম-অত্যাচার করাকেও সে কোনো দোষের মনে করত না। যার কাছ থেকে সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা বোধ করত, তাকেই কারাগারে নিক্ষেপ করত। যাই হোক, কোনোভাবে সে বারো বছর অতিবাহিত করল এবং অবশেষে মদ্যপানের কারণে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

তার শাসনামলে ৮৮৫ হিজরিতে (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ) শ্রীনগরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যার ফলে প্রায় অর্ধেক শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খানকাহে মুয়াল্লা এবং জামে মসজিদও পুড়ে যায়। এই বাদশাহর এই একটি নেক কাজ অন্তত স্মরণ রাখা হবে যে, সে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সেগুলো পুনরায় নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিল।

হাসান শাহের শেষ বছর ৮৯২ হিজরিতে (১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান হুসাইন মির্জার দূত শরফুদ্দিন ইরাকি কাশ্মীরে আসেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে নূর বখশি ফিরকার দাঈ ছিলেন। তিনিই এখানে নূর বখশি শিয়া আকিদার প্রচার শুরু করেন। [২]

---

[১] মুকাম্মাল তারিখ-এ-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফাউক: পৃষ্ঠা ৩৭২ থেকে ৩৭৪; নুযহাতুল খাওয়াতির: ৩, পৃষ্ঠা ২৫০, ২৫১

[২] মুকাম্মাল তারিখ-এ-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফাউক: পৃষ্ঠা ৩৭৫ থেকে ৩৭৮

শিয়া চক সর্দারদের উত্থান

মুহাম্মদ শাহ এবং ফতেহ শাহ

৮৯২ হিজরি থেকে ৯৪৪ হিজরি (১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)

৫২ বছরের রাজনৈতিক সংকট

হাসান শাহের পর সালতানাতের সবচেয়ে প্রভাবশালী আমির সৈয়দ হাসান বায়হাকীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাক্তন শাসকের অল্পবয়সী ছেলে মুহাম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসানো হয়। শাসনকার্য সৈয়দ হাসান বায়হাকী নিজের হাতে তুলে নেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা সফলভাবে চলতে পারেনি কারণ গত দুই শাসকের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের ফলে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার পরিবর্তে অবাধ্যতা ও মুনাফেকির বীজ বপন হয়েছিল এবং বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ভিন্ন ভিন্ন শাহজাদাদের সিংহাসনে বসানোর অজুহাতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ফলে সৈয়দ হাসান বায়হাকীকে বিরোধীরা হঠাৎ হত্যা করে। এরপর বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে যায় এবং চারদিকে আমিরদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাত দেখা দিতে থাকে।

মুহাম্মদ শাহ আড়াই বছরের কিছু বেশি সময় শাসন করার পর বিদ্রোহের কারণে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পরবর্তী বাদশাহ ফতেহ শাহ প্রায় তিন বছর সিংহাসনে আসীন থাকেন। ৮৯৮ হিজরিতে (১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) মুহাম্মদ শাহ তার অনুগতদের সাহায্যে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর তাদের অনুগতদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কখনো ফতেহ শাহ বিজয়ী হয়ে সিংহাসনে বসতেন, আবার কখনো মুহাম্মদ শাহ। ৮৯২ হিজরি থেকে ৯৪৫ হিজরি (১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মুহাম্মদ শাহ পাঁচবার এবং ফতেহ শাহ চারবার শাসক হন। প্রতিবারই তাদের অবস্থান পুতুলের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আসল যুদ্ধ ছিল সালতানাতের আমিরদের মধ্যে, যা রাজনৈতিকের চেয়ে এখন ধর্মীয় রূপ ধারণ করেছিল।

এর কারণ ছিল এই যে, সুলতান হাসান শাহের পর শরফুদ্দিন ইরাকি এখানে গোপনে নূর বখশি আকিদার প্রচার চালিয়ে অনেক মানুষকে নিজের সমমনা বানিয়ে ফেলেছিলেন এবং চক বংশের অনেক সর্দার এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই লোকেরা কাশ্মীরি সুলতানদের দরবারে উজির ও উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তারা বাদশাহদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করে নিজেদের শক্তি আরও বৃদ্ধি করেছিলেন এবং নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশ দখল করে নিয়েছিলেন।

কিছুকাল পর দরবারে তাদের আধিপত্য এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে বাদশাহদের মর্যাদা কেবল একটি দাবার ঘুঁটির মতো হয়ে গিয়েছিল এবং তারা চক আমিরদের পক্ষ থেকে ভাতা পেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে শুরু করেন।

চাক সরদার ‘কাজি চাক’ এই সময়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন। বাদশাহর সিংহাসন তার ইশারায় উল্টে যেত। আহলে সুন্নাতকে তো তিনি পরাজিত করেই ফেলেছিলেন, তিনি নিজের ক্ষমতার জন্য বিপদ অনুভব করে নিজের গোত্রের অনেক আমিরকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন এবং অনেককে নিজের রাজনৈতিক চালের শিকার বানিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছিলেন। [১]

শামস উদ্দিন, ইসমাইল শাহ, ইব্রাহিম শাহ সানি

(কাজি চাকের অধীনে শাসক)

৯৪৪ হিজরি থেকে ৯৪৭ হিজরি (১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ)

যখন ফাতাহ শাহ এবং মুহাম্মদ শাহের খেলা শেষ হলো, তখন শামস উদ্দিনকে ‘সুলতান’ বানিয়ে এগারো মাস পর্যন্ত সিংহাসনে বসানো হলো। এরপর দেড় বছর পর্যন্ত ইসমাইল শাহকে ডাকা হলো। এরপর তাকে সরিয়ে চার মাসের জন্য ইব্রাহিম শাহ সানিকে সিংহাসনে বসানো হলো।

এই যুগে কাজি চাক সবার ওপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই রাজনৈতিক ঝগড়া থেকে সুযোগ পেয়ে তিনি মুসলমানদের এবং হিন্দুদের জোরপূর্বক শিয়া বানানোর অভিযান শুরু করে দিলেন। এই উদ্দেশ্যে নূরবখশি দায়ী শরফ উদ্দিন ইরাকি ‘আল-আহওয়াত’ নামক একটি বই লিখেছিলেন যাতে এই ফেরকার বিশেষ আকিদাগুলোর প্রচার ছিল। সরকারি পর্যায়ে জনগণকে বাধ্য করা হয়েছিল যেন তারা এই বই অনুযায়ী আকিদা গ্রহণ করে।

অন্যদিকে কাজি চাকের প্রতি অসন্তুষ্ট আমিরদের একটি প্রতিনিধি দল, যার মধ্যে মালিক আবদাল মাগরে এবং চাক বংশের রেগি চাক অগ্রগণ্য ছিলেন, ৯৪৭ হিজরি (১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ) সালে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনের সাথে দেখা করতে রওনা হলেন। তারা ‘কাজি চাক’-এর ‘অত্যাচারের অভিযোগ’ নিয়ে হুমায়ুনের কাছে লাহোরে পৌঁছালেন এবং তার কাছে সাহায্য চাইলেন। হুমায়ুন সেই সময় স্বয়ং শের শাহ সুরির কাছে পরাজিত হয়ে লাহোরে নিজের পা জমানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি কাশ্মীরের ওপর দখলের প্রস্তাবটি পছন্দ করলেন এবং তিনি তার এক আমির মির্জা হায়দারকে কাশ্মীরে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একটি অপরিচিত পথে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ শ্রীনগর দখল করে নিলেন, যার ফলে কাজি চাক পালিয়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। [২]

নাজুক শাহ

(মির্জা হায়দার মুঘলের পৃষ্ঠপোষকতায় শাসন)

৯৪৭ হিজরি থেকে ৯৫৮ হিজরি (১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দ)

মির্জা হায়দার কাশ্মীরের শাসন ব্যবস্থা খুব ভালোভাবে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি কাশ্মীরের সিংহাসনে শাহী বংশের এক...

---

[১] মুকাম্মাল তারিখ-ই-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফওক, পৃষ্ঠা: ৪৭৮ থেকে ৪৭৯।

[২] মুকাম্মাল তারিখ-ই-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফওক, পৃষ্ঠা: ৪০৪ থেকে ৪০৬।

রাজপুত্র 'নাজুক শাহ'কে বসিয়ে রেখে দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি মুসলিম ও হিন্দু উভয়ের সাথেই এমন ন্যায়বিচার ও সদাচরণ করলেন যে মানুষ দীর্ঘকাল পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এদিকে কাজি চক দেখলেন যে হুমায়ুনকে শের শাহ সুরি হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং এখন পুরো হিন্দুস্তানে আফগানদের জয়জয়কার চলছে, তখন তিনি নিজের অত্যাচারী চেহারায় মজলুমের মুখোশ পরে শের শাহের দরবারে গেলেন এবং তাকে বিশ্বাস করালেন যে তার সাথে অনেক অন্যায় হচ্ছে এবং হুমায়ুনের প্রতিনিধিকে কাশ্মীরে শাসন করতে দেওয়া স্বয়ং আফগানদের জন্যই ধ্বংসাত্মক হবে। শের শাহ তাকে বিশ্বাস করে তাকে পূর্ণ সামরিক সহায়তা প্রদান করলেন, যা নিয়ে কাজি চক পরবর্তী দুই বছর কাশ্মীর দখলের চেষ্টায় লিপ্ত রইলেন। কিন্তু মির্জা হায়দার তার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রতিবারই তাকে পিছু হটতে বাধ্য করলেন। অবশেষে ৯৫১ হিজরিতে কাজি চক এভাবেই ব্যর্থতা ও আক্ষেপের মধ্যে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

মির্জা হায়দারের শাসন বেশ ভালোই চলছিল, কিন্তু এই সময়ে তিনি কাশ্মীরে শিয়া-সুন্নি বিরোধ দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভাবলেন যে যেহেতু শিয়াদের অস্তিত্বের আগে কাশ্মীরে সম্পূর্ণ শান্তি ছিল, তাই এর প্রতিকার হলো তাদের নির্মূল করে দেওয়া। ফলে তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে এক কঠোর অভিযান শুরু করলেন এবং তাদের সর্বোচ্চ দমনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এটি দেখে সাধারণ মানুষও, যারা শিয়াদের পূর্ববর্তী অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ছিল, ময়দানে নেমে এল এবং বিভিন্ন স্থানে শিয়াদের ওপর চড়াও হতে শুরু করল। শিয়াদের পক্ষ থেকেও বাড়াবাড়ি এবং মারপিটের ধারা শুরু হয়ে গেল।

মির্জা হায়দারের হয়তো ধারণা ছিল না যে সেই সময় পর্যন্ত কাশ্মীরে শিয়াদের প্রভাব কতটা বেড়ে গিয়েছিল। চক বংশের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যারা কাজি চকের জেদ ও শত্রুতার কারণে নতুন সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলেন, এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার এই কৌশল প্রথমে চরম বিশৃঙ্খলা এবং পরে তার চেয়েও বড় গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

মির্জা হায়দার অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিদ্রোহী চক সরদারদের মোকাবিলা করলেন, কিন্তু তিনি তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না এবং শেষ পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন। এটি ৮ জিলকদ ৯৫৭ হিজরি (১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [১]

ইসমাইল শাহ সানি, হাবিব শাহ

(দৌলত চক - গাজি চকের আধিপত্য)

৯৫৮ হিজরি থেকে ৯৬১ হিজরি (১৫৫১ খ্রি. থেকে ১৫৬১ খ্রি.)

মির্জা হায়দারের হত্যার পর চক বংশের দুই নতুন আমির: দৌলত চক এবং গাজি চক রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তারা শাহ মিরি বংশের ইসমাইল শাহ সানিকে ৯৫৮ হিজরিতে (১৫৫১ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে বসান এবং তিন বছর পর ৯৬০ হিজরিতে (১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এই সময়কালটি প্রকৃতপক্ষে দৌলত চকের শাসনের ছিল। তিনি শিয়া মতবাদের

---

[১] মুকাম্মাল তারিখ-ই-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফাউক: পৃষ্ঠা ৪০৫ থেকে ৪১৪।

প্রচার এবং জোরপূর্বক আধিপত্য বিস্তারে কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। জায়গায় জায়গায় ইমামবাড়া নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের ইমামদের ওপরও এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যে, তারা যেন জুমার খুতবায় বারো ইমামের নাম নেন।

দৌলত চকের শাসনামলে গাজী চক-কে দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তাই উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। একদিন দৌলত চক ডাল লেকের তীরে ভ্রমণ করছিলেন, তখন গাজী চক তাকে প্রতারণার মাধ্যমে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। এর পরপরই তিনি ইসমাইল শাহ সানির পরিবর্তে শাহ মিরি বংশের আরেক যুবক হাবিব শাহকে সিংহাসনে বসান, যিনি শেষ শাহ মিরি শাসক হিসেবে প্রমাণিত হন। তার কোনো গুরুত্বই ছিল না।

গাজী চক তার ভাই আলী চকের সাথে পরামর্শ করলেন যে, এখন শাহ মিরি বংশকে বের করে দেওয়া উচিত। ফলে ৯৬৮ হিজরি (১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ) সালে একদিন দুই ভাই সমস্ত দরবারীদের সাথে নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে একটি চাল চাললেন। যখন রাজদরবার বসল, তখন আলী চক হঠাৎ হাবিব শাহের মাথা থেকে মুকুট খুলে নিয়ে তার ভাই গাজী চকের মাথায় পরিয়ে দিলেন। চারদিক থেকে মোবারকবাদ ও অভিনন্দনের আওয়াজ উঠল। সেই সাথে হাবিব শাহকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো এবং গাজী চক সিংহাসনে আরোহণ করলেন। শাহ মিরি বংশের শাসনের ইতি ঘটল। [১]

---

[১] মুকাম্মাল তারিখ-এ-কাশ্মীর, মুহাম্মদ উদ্দিন ফওক: পৃষ্ঠা ৪৭৮ থেকে ৪৮৩।

https://t.me/BoierSomahar

কাশ্মীরে শাহ মিরি সুলতানদের প্রভাব

শাহ মিরি সুলতানগণ কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক, স্থাপত্যিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁরা নির্মাণশৈলী ও সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তাঁরা স্থানীয় কাশ্মীরি এবং ইসলামি স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে একটি অনন্য নির্মাণশৈলী প্রবর্তন করেন, যা আজও কাশ্মীরের পরিচয় বহন করে। এর কিছু ঝলক নিচে দেওয়া হলো:

- জামে মসজিদ শ্রীনগর: সুলতান সিকান্দারের শাসনামলে এই বিশাল মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়, যা পরবর্তীতে সুলতান জয়নুল আবেদিনের শাসনামলে সম্পন্ন হয়। এই মসজিদের কাঠের কাজ এবং এর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এর সরলতা ও মহিমার প্রমাণ।

- খানকাহ-এ-মুয়াল্লা: সৈয়দ আলী হামদানি (রহ.)-এর নামে নামাঙ্কিত এই খানকাহটি সুলতান সিকান্দারের নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল, যা নির্মাণশৈলীর একটি চমৎকার নিদর্শন। এর কাঠের কাজ এবং কাশ্মীরি ইসলামি শিল্পের সংমিশ্রণ দেখার মতো।

- নতুন হস্তশিল্প: শাহ মিরি সুলতানদের আমলে যখন বিখ্যাত সুফি সাধক সৈয়দ আলী হামদানি (রহ.) মধ্য এশিয়া থেকে এখানে আসেন, তখন তিনি এখানে তাসাউউফ প্রচারের পাশাপাশি সুলতানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাতে তাঁরা মধ্য এশিয়ার হস্তশিল্পের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে কাশ্মীরি সুলতানগণ স্থানীয় জনগণকে শাল বয়ন, কার্পেট তৈরি, কাঠের খোদাই এবং কাগজ তৈরির মতো শিল্প শিখিয়েছিলেন, যা কাশ্মীরের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

কাশ্মীরে ইসলামের প্রসার ছিল সম্পূর্ণভাবে দাওয়াতি এবং সুফিবাদী প্রচেষ্টার ফল, যা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। সুলতানগণ এখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। সুলতান জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন জ্ঞানানুরাগী ও প্রাজ্ঞ রাজা, যিনি সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষার বই ফারসিতে অনুবাদ করিয়েছিলেন এবং নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।

কাশ্মীরি সুলতানদের এই সেবার ফলে কাশ্মীরে ইসলাম শান্তিপূর্ণভাবে এবং মজবুত ভিত্তির ওপর ছড়িয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে কাশ্মীর জ্ঞান ও শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়, যার খ্যাতি উপমহাদেশ এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি ইসলামি প্রভাব গ্রহণ করে এক নতুন ও অনন্য পরিচয় লাভ করে। এভাবে দিল্লির সুলতানদের সমসাময়িক কাশ্মীরি সুলতানগণ দেশকে কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাই দান করেননি, বরং একে জ্ঞানগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যার উদাহরণ এই অঞ্চলে খুব কমই দেখা যায়।

চক বংশের শাসন

কাশ্মীরের ইতিহাসে চক বংশের শাসনকাল একটি সংক্ষিপ্ত এবং সংকীর্ণমনা যুগ হিসেবে স্মরণ করা হয়। এই বংশ শাহ মিরি বংশের পর কাশ্মীরে প্রায় ২৫ বছর শাসন করেছিল এবং মুঘলদের কাশ্মীর বিজয় পর্যন্ত এখানে ক্ষমতাসীন ছিল। চকরা মূলত "দর্দ গোত্র"ভুক্ত যোদ্ধা ছিল যারা গিলগিট-বালতিস্তান থেকে হিজরত করে কাশ্মীরে এসেছিল। তারা শাহ মিরি সুলতানদের সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছিল এবং নিজেদের সামরিক যোগ্যতার কারণে শক্তিশালী হতে থাকে। শেষ শাহ মিরি শাসকদের দুর্বলতা এবং গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে গাজি শাহ চক ক্ষমতা দখল করে নেন।

চক বংশের আমলে চারজন প্রধান শাসক এসেছিলেন: গাজি শাহ চক ছিলেন প্রথম শাসক যিনি আড়াই বছর শাসন করেছিলেন। দ্বিতীয় শাসক ছিলেন হুসাইন চক যিনি সাত বছর (১৫৬৩ খ্রি. থেকে ১৫৭০ খ্রি.) শাসন করেছিলেন। এরপর ইউসুফ শাহ চকও সাত বছর (১৫৭৯ খ্রি. থেকে ১৫৮৬ খ্রি.) পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সিংহাসন সামলে রেখেছিলেন। তিনি একজন শৌখিন ও বিলাসপ্রিয় মানুষ ছিলেন। শাসন পরিচালনা করা তার সাধ্যের বাইরে ছিল। তাকে একাধিকবার ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল।

শেষবার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের কাছে চলে যান এবং কাশ্মীরের সেই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য বিলাপ করেন যাতে তার নিজের হাতও কম ছিল না। এদিকে কাশ্মীরে ইয়াকুব শাহ চক শাসন শুরু করেছিলেন কিন্তু দেশের আহলে সুন্নাত তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ফলে কাশ্মীরের ওলামায়ে কেরামের একটি প্রতিনিধি দল আকবরের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে কাশ্মীরের জনগণের সাহায্যের জন্য দাওয়াত দেন।

আকবর দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীরকে নিজের সাম্রাজ্যের অংশ করার স্বপ্ন দেখছিলেন। ফলে তিনি কাশ্মীরের আহলে সুন্নাতকে সাহায্যের ঘোষণা দিয়ে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠান। যদিও ইয়াকুব শাহ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু তার দরবারী এবং সেনাবাহিনীর একটি অংশ তার সঙ্গ ত্যাগ করে। অবশেষে ৯৯৪ হিজরি (১৫৮৬ খ্রি.) সালে মুঘল সেনাপতি কাসিম খান কাশ্মীর দখল করে নেন। ইয়াকুব শাহ চক গ্রেফতার হন এবং এভাবে কাশ্মীরে চক বংশের শাসন ও কাশ্মীরের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অবসান ঘটে।

চক বংশের দ্রুত পতনের কারণ ছিল তাদের মধ্যে সহনশীলতা ছিল না এবং তারা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে লিপ্ত ছিল। তারা আহলে সুন্নাতের জন্য জমিন সংকীর্ণ করে দিয়েছিল যার ফলে মানুষ মুক্তির জন্য মুঘলদের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে চক সরদারদের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্যও কম ছিল না। এই কারণে তাদের শাসনের ভিত্তি ছিল দুর্বল।

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

কাশ্মীরের সুলতানদের তালিকা - শাহ মিরি রাজবংশ

নম্বর শাসক সময়কাল বিশেষ দ্রষ্টব্য

১ শামসুদ্দিন শাহ মির্জা ৭৪০ হিজরি থেকে ৭৪৩ হিজরি (১৩৩৯ খ্রি. থেকে ১৩৪২ খ্রি.) শাহ মিরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা

২ জামশিদ বিন শাহ মির্জা ৭৪৩ হিজরি থেকে ৭৪৪ হিজরি (১৩৪২ খ্রি. থেকে ১৩৪৩ খ্রি.)

৩ আলাউদ্দিন আলী শের বিন শাহ মির্জা ৭৪৪ হিজরি থেকে ৭৬১ হিজরি (১৩৪৩ খ্রি. থেকে ১৩৬০ খ্রি.)

৪ শিহাবুদ্দিন বিন শাহ মির্জা ৭৬১ হিজরি থেকে ৭৮০ হিজরি (১৩৬০ খ্রি. থেকে ১৩৭৮ খ্রি.) অনেক বড় বিজয়ী

৫ কুতুবুদ্দিন হিন্দাল বিন শাহ মির্জা ৭৮০ হিজরি থেকে ৭৯৫ হিজরি (১৩৭৮ খ্রি. থেকে ১৩৯৩ খ্রি.)

৬ সিকান্দার বুত-শিকান বিন কুতুবুদ্দিন ৭৯৬ হিজরি থেকে ৮২০ হিজরি (১৩৯৪ খ্রি. থেকে ১৪১৭ খ্রি.) বিজয়ী, মূর্তিপূজা নির্মূলের যুগ

৭ আলী শাহ ৮২০ হিজরি থেকে ৮২৬ হিজরি (১৪১৭ খ্রি. থেকে ১৪২৩ খ্রি.)

৮ জয়নুল আবেদিন (শাহী খান) ৮২৬ হিজরি থেকে ৮৭৮ হিজরি (১৪২৩ খ্রি. থেকে ১৪৭৪ খ্রি.) কাশ্মীরের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ

৯ হায়দার খান (হাজি খান) ৮৭৮ হিজরি থেকে ৮৮০ হিজরি (১৪৭৪ খ্রি. থেকে ১৪৭৫ খ্রি.) অযোগ্য, ভোগবিলাসী

১০ হাসান শাহ ৮৮০ হিজরি থেকে ৮৯২ হিজরি (১৪৭৫ খ্রি. থেকে ১৪৮৭ খ্রি.) অযোগ্য, ভোগবিলাসী

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

১১. মুহাম্মদ - প্রথম শাসনকাল ..... ৮৯২ হিজরি থেকে ৮৯৫ হিজরি (১৩৮৭ খ্রি. থেকে ১৩৯০ খ্রি.) ..... রাজনৈতিক সংকট

১২. ফাতাহ শাহ - প্রথম শাসনকাল ..... ৮৯৫ হিজরি থেকে ৮৯৮ হিজরি (১৩৯০ খ্রি. থেকে ১৩৯৩ খ্রি.) ..... রাজনৈতিক সংকট অব্যাহত

১৩. মুহাম্মদ - দ্বিতীয়বার ..... ৮৯৮ হিজরি থেকে ৯০৭ হিজরি (১৩৯৩ খ্রি. থেকে ১৫০১ খ্রি.) ..... আনুষ্ঠানিক শাসন; শিয়াদের উত্থান - চাকদের আধিপত্য

১৪. ফাতাহ শাহ - দ্বিতীয়বার ..... ৯০৭ হিজরি থেকে ৯২০ হিজরি (১৫০১ খ্রি. থেকে ১৫১৪ খ্রি.) ..... আনুষ্ঠানিক শাসন; শিয়াদের উত্থান - চাকদের আধিপত্য

১৫. মুহাম্মদ - তৃতীয়বার ..... ৯২০ হিজরি (১৫১৪ খ্রি.) ..... নামমাত্র শাসন

১৬. ফাতাহ শাহ - তৃতীয়বার ..... ৯২০ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি (১৫১৪ খ্রি. থেকে ১৫১৭ খ্রি.) ..... নামমাত্র শাসন

১৭. মুহাম্মদ - চতুর্থবার ..... ৯২৩ হিজরি থেকে ৯৩২ হিজরি (১৫১৭ খ্রি. থেকে ১৫২৭ খ্রি.) ..... নামমাত্র শাসন

১৮. ইব্রাহিম শাহ ..... ৯৩২ হিজরি থেকে ৯৩৬ হিজরি (১৫২৭ খ্রি. থেকে ১৫২৯ খ্রি.) ..... নামমাত্র শাসন

১৯. মুহাম্মদ - পঞ্চমবার ..... ৯৩৬ হিজরি থেকে ৯৪২ হিজরি (১৫২৯ খ্রি. থেকে ১৫৩৭ খ্রি.) ..... কাজী চাক-এর উত্থান

২০. শামসুদ্দিন ..... ৯৪২ হিজরি থেকে ৯৪৫ হিজরি (১৫৩৭ খ্রি. থেকে ১৫৩৮ খ্রি.) ..... কাজী চাক-এর পূর্ণ আধিপত্য

২১. ইসমাইল শাহ ..... ৯৪৫ হিজরি থেকে ৯৪৭ হিজরি (১৫৩৮ খ্রি. থেকে ১৫৪০ খ্রি.) ..... নামমাত্র শাসন

২২. ইব্রাহিম শাহ সানি ..... ৯৪৭ হিজরি (১৫৪০ খ্রি.) ..... চাকদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল

২৩. নাজুক শাহ ..... ৯৪৭ হিজরি থেকে ৯৫৮ হিজরি (১৫৪০ খ্রি. থেকে ১৫৫১ খ্রি.) ..... মুঘল শাহজাদা হায়দার মির্জার তত্ত্বাবধানে নামমাত্র শাসন চলতে থাকে।

https://t.me/BoierSomahar

উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস

২৪ | ইসমাইল শাহ সানি | ৯৫৮ হিজরি থেকে ৯৬০ হিজরি (১৫৫১ থেকে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) | দৌলত চকের আধিপত্য

২৫ | হাবিব শাহ | ৯৬০ হিজরি থেকে ৯৬১ হিজরি (১৫৫৩ থেকে ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ) | গাজী চকের আধিপত্য

চাক বংশ

১ | গাজী খান চাক | ৯৬১ হিজরি থেকে ৯৭০ হিজরি (১৫৫৪ থেকে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ) | চাক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা, গোঁড়া শিয়া।

২ | হোসেন শাহ চাক (নাসিরুদ্দিন) | ৯৭০ হিজরি থেকে ৯৭৮ হিজরি (১৫৬৩ থেকে ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) | -

৩ | আলী শাহ চাক (জহিরুদ্দিন) | ৯৭৮ হিজরি থেকে ৯৮৭ হিজরি (১৫৭০ থেকে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ) | তুলনামূলকভাবে মধ্যপন্থী মেজাজের।

৪ | ইউসুফ শাহ চাক (নাসিরুদ্দিন) | ৯৮৭ হিজরি থেকে ৯৮৮ হিজরি (১৫৭৯ থেকে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ) | বিলাসপ্রিয় মেজাজ - অযোগ্য।

৫ | সৈয়দ মুবারক খান বাইহাকি | ৯৮৮ হিজরি (১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ) | অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

৬ | লোহর চাক | ৯৮৮ হিজরি থেকে ৯৮৯ হিজরি (১৫৮০ থেকে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ) | -

৭ | ইউসুফ চাক - পুনরায় | ৯৮৯ হিজরি থেকে ৯৯৩ হিজরি (১৫৮১ থেকে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ) | -

৮ | ইয়াকুব | ৯৯৩ হিজরি থেকে ৯৯৪ হিজরি (১৫৮৫ থেকে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ) | চাকদের শেষ শাসক - অত্যন্ত গোঁড়া শিয়া। ১৭ জিলকদ ৯৯৪ হিজরিতে সরকারের পতন।

মাকুজ (উৎসসমূহ):

- মুকাম্মাল তারিখ-ই-কাশ্মীর, আজ দ্বীন মুহাম্মদ ফওক। * তারিখ-ই-ফেরেশতা, বোম্বে সংস্করণ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৩০ থেকে ৭০০, প্রবন্ধ দশম।
- নুজহাতুল খাওয়াতির, আজ হাকিম আব্দুল হাই লখনভি। * তারিখ-ই-মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবি, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠি): খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬২৩ থেকে ৬২৫।
- ইসলামি সালতানাতেঁ, ক্লিফোর্ড জেমস রডওয়ে (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)। * তারিখ-ই-হিন্দুস্তান (মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি): খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭২৭ থেকে ১৩৫৬।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

(২) সুলতানাত-ই-বাঙাল

৫৯৯ হিজরি থেকে ৯৮৪ হিজরি

(১২০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

বেঙ্গলের মুসলিম সালতানাত ছিল এমন এক দ্বীপের মতো যেখানে পানি, সবুজ প্রকৃতি এবং মুসলিম সভ্যতা একে অপরের সাথে মিশে গিয়েছিল। এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মুসলিম এবং স্থানীয় সভ্যতার রঙের এক এমন উপাখ্যান যা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের কোলে বিকশিত হয়েছিল।

এটি এমন এক ভূখণ্ড যার চিত্র হলো সমুদ্রের সাথে মিশে যাওয়া নদী, তাদের বুকে ভাসমান হাজার হাজার নৌকা, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের বিভিন্ন আভা এবং পটভূমিতে ছোট ছোট বন্দর যা গ্রামগুলোর সাথে মিশে আছে। চারদিকে ধানের ক্ষেতগুলো সবুজ সমুদ্রের মতো দুলতে থাকে এবং তাদের মাঝখান দিয়ে হাজার হাজার নদী ও নালা সাপের মতো এঁকেবেঁকে বয়ে যায়। বর্ষাকাল এলে পুরো দৃশ্যপট একটি ঝাপসা ছবির রূপ ধারণ করে এবং পানির এই প্রাচুর্যই এই ভূখণ্ডের আসল সম্পদ। বেঙ্গলের সমস্ত শহরের ভিত্তি কেবল শুষ্ক ভূমির ওপর ছিল না, বরং এই জলজালের কিনারে রাখা হয়েছিল, যেখান দিয়ে নৌকাগুলো জীবনের গান গেয়ে পার হতো।

এই নদীগুলো কেবল পানির পথ ছিল না, বরং বাণিজ্যের রাজপথ ছিল। বেঙ্গল সালতানাতের দরবার কেবল বাদশাহদের সিংহাসন দিয়ে সজ্জিত ছিল না, বরং এর শান-শওকতের রহস্য ছিল এর বাণিজ্যে। এখানকার মসলিন, যা এতই সূক্ষ্ম ও হালকা ছিল যে একে ভোরের কুয়াশা মনে করা হতো, সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের কাফেলা, চীনা জাহাজ এবং ইউরোপীয় বণিকরা এখানে আসত।

https://t.me/BoierSomahar

...এর বন্দরগুলোতে নোঙর ফেলত। মূল্যবান রেশম, মশলা এবং নীলের বিনিময়ে সোনা ও রূপার মুদ্রা আসত। বাংলা এমন একটি বাজারে পরিণত হয়েছিল যেখানে প্রতিটি ভাষা ও প্রতিটি বর্ণের মানুষ মিলিত হতো, এটি ছিল এমন এক "জাতিসমূহের স্বর্গ" যেখানে সম্পদের প্রাচুর্যের অনুভূতি চারদিকে ছড়িয়ে ছিল।

সালতানাতের সবচেয়ে সুন্দর রূপটি এর সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সংহতির মধ্যে দেখা যায়। এখানকার দরবার কেবল ফারসি ভাষার প্রতিধ্বনিই শুনত না, বরং স্থানীয় বাংলা ভাষাকেও সম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করত। এটি ছিল এমন এক মিলনস্থল যেখানে দুটি ভিন্ন ধারা মিলিত হচ্ছিল। একদিকে ছিল ফারসি কবিতার আনুষ্ঠানিক ঐতিহ্য, অন্যদিকে ছিল স্থানীয় সাহিত্য ও কবিতা এবং বাংলা গল্পের মাধুর্য।

মুসলিম কবিরা স্থানীয় ভাষায় এমন সব কবিতা ও কাহিনী লিখেছেন যাতে ইসলামি বিষয়বস্তুকে স্থানীয় রঙে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'ইউসুফ জুলেখা'র মতো কবিতাগুলো এর প্রমাণ যে কীভাবে একটি বিদেশি কাহিনী স্থানীয় মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল। শহরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল এবং সুফিদের খানকাহগুলোতে একত্ববাদ ও ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া হতো। এখানকার "গঙ্গা-যমুনা সংস্কৃতি" ছিল এমন এক ফসলের মতো যা বিভিন্ন ঋতুর মিলনে জন্মায় এবং এর সুবাস সবাইকে বিমোহিত করে। এটি ছিল এমন এক সমাজ যেখানে মুসলিম সালতানাতের কারণে মুসলমানরা প্রভাবশালী হলেও তারা কাউকে ধর্ম পরিবর্তনে কখনোই বাধ্য করত না এবং ইসলামি ন্যায়বিচারের পতাকা সমুন্নত রেখেছিল। এই কারণেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে জীবন অতিবাহিত করত।

এটি ছিল সেই সুন্দর বাংলার একটি চিত্র যা ৫৯৯ হিজরি (১২০২ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরির গোলাম মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি, যিনি বিহারের শাসক ছিলেন, জয় করেছিলেন। এরপর দিল্লির সুলতানদের পক্ষ থেকে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত হতে থাকে যারা দিল্লির সুলতানদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করত। তারা কর ও উপঢৌকন পাঠিয়ে তাদের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করত। অভ্যন্তরীণভাবে তারা প্রায় স্বায়ত্তশাসিত ছিল। তাদের এই স্বাধীনতার পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল:

- দীর্ঘ দূরত্বের কারণে দিল্লির সুলতানদের জন্য বাংলাকে অনুগত রাখা সর্বদা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে ছিল।
- বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি ছাড়া বাংলার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন ছিল।
- ইসলামি বিজয়ের শুরুতেই বিপুল সংখ্যক সেনাপতি ও অভিজাতরা এসে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল, যাদের মধ্যে খলজি, সুরি, আফগান এবং অন্যান্য বংশের লোক প্রচুর পরিমাণে ছিল।

এই অভিজাতদের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীগত ঐক্য ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তারা বাংলাকে তাদের নতুন স্বদেশ মনে করত। আর এই কারণেই এখানকার বিষয়ে তারা বহিরাগত হস্তক্ষেপ একেবারেই পছন্দ করত না। এই কারণেই তারা প্রায়ই বিদ্রোহ করত। তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য সাধারণত দিল্লির সুলতানরা বাংলার বিষয়ে শিথিলতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতেন এবং চরম প্রয়োজন ছাড়া হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতেন।

বাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্রসমূহ

শুরুতে মুসলমানরা “লখনৌতি” (গৌড়)-কে বাংলার রাজধানী বানিয়েছিল কারণ এটিই ছিল বখতিয়ার খলজির সামরিক কেন্দ্র এবং তাঁর বিজয়াভিযানের পরিধি ছিল মূলত এর আশেপাশেই।

সপ্তম হিজরি শতাব্দীর শুরুর দশকগুলোতে যখন প্রায় পুরো বাংলা জয় করা হয়েছিল, তখন রাজধানী বাংলার পূর্ব অংশের শহর সোনারগাঁও (সাতগাঁও)-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই সময়ে প্রশাসনিক কারণে কখনও কখনও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় একই সাথে আলাদা আলাদা সুবাদারও নিযুক্ত করা হতো।

খলজিদের শাসন

খলজি অফিসাররা ছিলেন বাংলায় শাসনকারী প্রথম মুসলিম সম্প্রদায় যারা স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বড় যোদ্ধা এবং সাহসী মানুষ। সপ্তম হিজরি শতাব্দীর (দ্বাদশ শতাব্দী ঈসায়ী) শুরু থেকে দুই দশক পর্যন্ত বাংলায় তাঁদেরই শাসন বজায় ছিল, যার মধ্যে নিম্নোক্ত শাসকগণ এসেছিলেন:

১. মালিক আল-গাজী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ..... ৬০০ হি. থেকে ৬০৩ হি. (১২০৩ খ্রি. থেকে ১২০৬ খ্রি.)

২. মালিক ইজ্জুদ্দিন আলী মর্দান (মুহাম্মদ শিরান) খলজি ..... ৬০৩ হি. থেকে ৬০৫ হি. (১২০৬ খ্রি. থেকে ১২০৮ খ্রি.)

৩. মালিক হুসামুদ্দিন ইওয়াজ বিন হুসাইন খলজি ..... ৬০৫ হি. থেকে ৬০৭ হি. (১২০৮ খ্রি. থেকে ১২১০ খ্রি.) প্রথম মেয়াদ

৪. মালিক রুকনুদ্দিন আলী মর্দান খলজি ..... ৬০৭ হি. থেকে ৬০৯ হি. (১২১০ খ্রি. থেকে ১২১২ খ্রি.)

৫. সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ বিন হুসাইন খলজি ..... ৬০৯ হি. থেকে ৬২৪ হি. (১২১২ খ্রি. থেকে ১২২৭ খ্রি.) দ্বিতীয় মেয়াদ

বাংলা - দিল্লি সালতানাতের অধীনে

৬২৪ হিজরিতে দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের সাথে বাংলার আমিরদের মতপার্থক্য দেখা দেয়, যার ফলে এখানে দিল্লির আক্রমণ ঘটে এবং বাংলার শাসক গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি দিল্লি সালতানাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর স্থলে ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরুদ্দিন শাসনভার গ্রহণ করেন। এখন বাংলা আবারও দিল্লি সালতানাতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

- মালিকুশ শারক নাসিরুদ্দিন মাহমুদ: ৬২৪ হি. থেকে ৬২৬ হি. (১২২৭ খ্রি. থেকে ১২২৯ খ্রি.)

নাসিরুদ্দিন মাত্র দুই বছর শাসন করতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর খলজিরা আবারও এখানে শাসনভার গ্রহণ করেন।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড

খিলজিদের স্বায়ত্তশাসন - পুনরায়

এখন খিলজিদের নিম্নোক্ত শাসকরা এখানে ক্ষমতাসীন হন:

- ১. আলাউদ্দিন দৌলত শাহ বিন মওদুদ খিলজি: ৬২৬ হিজরি থেকে ৬২৭ হিজরি (১২২৯ খ্রি. থেকে ১২৩০ খ্রি.)
- ২. মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন বলকা খিলজি: ৬২৭ হিজরি থেকে ৬২৮ হিজরি (১২৩০ খ্রি. থেকে ১২৩১ খ্রি.)

বেঙ্গল দিল্লি সালতানাতের অধীনে: পুনরায়

যখন শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ দিল্লিতে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এর সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দেন, তখন সেই সময়ে তিনি আবারও বাংলাকে পদানত করেন এবং এখানে পুনরায় দিল্লির আমিরদের নিয়োগ শুরু হয় এবং পরবর্তী কয়েক দশকে এখানে নিম্নোক্ত নবাবগণ ক্ষমতাসীন হন:

- ১. মালিক আলাউদ্দিন জানি | ৬২৯ হিজরি থেকে ৬৩০ হিজরি (১২৩২ খ্রি. থেকে ১২৩৩ খ্রি.)
- ২. মালিক সাইফ উদ্দিন আইবেক ইয়াগান তত | ৬৩০ হিজরি থেকে ৬৩৩ হিজরি (১২৩৩ খ্রি. থেকে ১২৩৬ খ্রি.)
- ৩. আওর খান আইবেক | ৬৩৩ হিজরি (১২৩৬ খ্রি.)
- ৪. ইজ্জুদ্দিন তুঘরিল তুগান খান | ৬৩৩ হিজরি থেকে ৬৪৩ হিজরি (১২৩৬ খ্রি. থেকে ১২৪৬ খ্রি.)
- ৫. তমর খান | ৬৪৫ হিজরি (১২৪৭ খ্রি.)
- ৬. মালিক জালাল উদ্দিন মাসুদ জানি | ৬৪৫ হিজরি থেকে ৬৪৯ হিজরি (১২৪৭ খ্রি. থেকে ১২৫১ খ্রি.)
- ৭. মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন ইউজবক | ৬৪৯ হিজরি থেকে ৬৫৫ হিজরি (১২৫১ খ্রি. থেকে ১২৫৭ খ্রি.)
- ৮. মালিক ইজ্জুদ্দিন বলবন | ৬৫৫ হিজরি থেকে ৬৫৭ হিজরি (১২৫৭ খ্রি. থেকে ১২৫৯ খ্রি.)
- ৯. মালিক তাজ উদ্দিন আরসালান খান | ৬৫৭ হিজরি থেকে ৬৬৩ হিজরি (১২৫৯ খ্রি. থেকে ১২৬৫ খ্রি.)
- ১০. আবুল কাসিম মুহাম্মদ তাতার খান | ৬৬৩ হিজরি থেকে ৬৬৬ হিজরি (১২৬৫ খ্রি. থেকে ১২৬৮ খ্রি.)
- ১১. শের খান | ৬৬৬ হিজরি থেকে ৬৭০ হিজরি (১২৬৮ খ্রি. থেকে ১২৭২ খ্রি.)
- ১২. আমিন খান আইবেকগিন | ৬৭১ হিজরি (১২৭২ খ্রি.)
- ১৩. মুগিস উদ্দিন তুঘরিল | ৬৭১ হিজরি থেকে ৬৮০ হিজরি (১২৭২ খ্রি. থেকে ১২৮১ খ্রি.)
- ১৪. নাসির উদ্দিন বুগরা খান বিন গিয়াস উদ্দিন বলবন | ৬৮০ হিজরি থেকে ৬৮৬ হিজরি (১২৮১ খ্রি. থেকে ১২৮৭ খ্রি.) নায়েব হিসেবে

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

বাংলায় বংশানুক্রমিক শাসন: বলবন শাহজাদাদের যুগ

৬৮৬ হিজরি (১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত নাসিরুদ্দিন বুগরা খান তার পিতা দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার শাসনভার পরিচালনা করেন। ৬৮৬ হিজরি (১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)-তে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের ইন্তেকালের পর বুগরা খান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলায় শাসন বংশানুক্রমিক হয়ে যায় এবং এই প্রদেশটি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে যার কেন্দ্র ছিল লখনৌতি। বুগরা খান সুলতান হিসেবে চার বছর শাসন করেন।

এখান থেকে বাংলায় বলবন শাহজাদাদের শাসনের যুগ শুরু হয়, যাতে নিম্নোক্ত শাসকগণ অতিবাহিত হয়েছেন:

১. সুলতান নাসিরুদ্দিন বুগরা খান: ৬৮৬ হিজরি থেকে ৬৯০ হিজরি (১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ)
২. সুলতান রুকনুদ্দিন কায়কাউস বিন বুগরা খান: ৬৯০ হিজরি থেকে ৬৯৯ হিজরি (১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ বিন বুগরা খান: ৬৯৯ হিজরি থেকে ৭২২ হিজরি (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ বিন বুগরা খান: ৭২২ হিজরি থেকে ৭২৪ হিজরি (১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

এরপর শাহজাদাদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ এই সালতানাতকে দুর্বল করে দেয়।

বাংলা তুঘলক সুলতানদের অধীনে

সুযোগ পেয়ে দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন এবং তার বাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে আসামের সিলেট জেলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দিল্লিতে পুনরায় মুদ্রা চালু করেন এবং বাংলাকে তিনটি রাজ্যে বিভক্ত করেন:

- পূর্ববঙ্গ: এর কেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও।
- পশ্চিমবঙ্গ: এর কেন্দ্র ছিল লখনৌতি।
- দক্ষিণবঙ্গ: এর কেন্দ্র ছিল সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম)।

প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা শাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল যাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

বা সোনারগাঁও:

১. গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ: বা সোনারগাঁও: ৭২৪ হিজরি থেকে ৭২৮ হিজরি (১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
২. বাহরাম খান: বা সোনারগাঁও: ৭২৮ হিজরি থেকে ৭৩৯ হিজরি (১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: বা সোনারগাঁও: ৭৩৯ হিজরি থেকে ৭৫০ হিজরি (১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. সুলতান ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ: সোনারগাঁও ..... ৭৫০ হিজরি থেকে ৭৫৩ হিজরি (১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ)

লখনৌতি:

১. কদর খান: লখনৌতি ..... ৭২৮ হিজরি থেকে ৭৩৭ হিজরি (১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)

২. মুখলিস: লখনৌতি ..... ৭৩৭ হিজরি থেকে ৭৪০ হিজরি (১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ: লখনৌতি ..... ৭৪৩ হিজরি (১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ: সাতগাঁও এবং লখনৌতি ..... ৭৪০ হিজরি থেকে ৭৪৩ হিজরি (১৩৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ)

সাতগাঁও:

১. আজম খান: সাতগাঁও ..... ৭২৪ হিজরি থেকে ৭২৮ হিজরি (১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

২. ইজ্জুদ্দিন ইয়াহইয়া: সাতগাঁও ..... ৭২৮ হিজরি থেকে ৭৩৯ হিজরি (১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ: সাতগাঁও ..... ৭৪০ হিজরি থেকে ৭৪৩ হিজরি (১৩৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ)

(মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি থেকে শুরু করে তুঘলক সুলতানদের আমল পর্যন্ত বাংলার সুবাদার এবং স্বাধীন শাসকদের ঘটনাবলি দিল্লির সুলতানদের অধীনে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই এখানে এরই ওপর নির্ভর করা হচ্ছে।)

বাংলার স্বায়ত্তশাসন

অষ্টম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন তুঘলক বংশের উত্থানের যুগ ছিল, তখন লখনৌতি এবং সোনারগাঁওয়ে বিদ্রোহ দেখা দেয় যা বারবার দমন করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। পূর্ব বাংলায় ফখরুদ্দিন মুবারক এবং পশ্চিম বাংলায় আলাউদ্দিন আলী নিজ নিজ সরকার গঠন করেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন

কিছুকাল পর পশ্চিম বাংলার শাসক হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (ভাঙ্গরা) পূর্ব বাংলাও দখল করে উভয় রাষ্ট্রকে এক করে দেন। বাংলার স্বায়ত্তশাসনের এই যুগটি কমবেশি আড়াই শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সময়ে ৮৫০ হিজরি (১৩৪৬ খ্রি.) পর্যন্ত ফিরোজাবাদ (পান্ডুয়া) রাজধানী ছিল। এরপর ৯৭২ হিজরি (১৫৬৩ খ্রি.) পর্যন্ত এই গৌরব লখনৌতির অধিকারে ছিল। এরপর তান্ডাকে রাজধানী করা হয়। কোনো কোনো সময় বিহার ও উড়িষ্যাও বাংলার শাসকদের অধীনে ছিল।

ইলিয়াস শাহী শাসকরা এই অঞ্চলের অনেক সেবা করেছেন। এখানে প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কাপড় ও খাদ্যদ্রব্যের শিল্পগুলো উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। ইলিয়াস শাহীরা এখানে ইসলাম প্রচারের জন্যও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, যার ফলে এখানকার নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে ইসলাম খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এখানকার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলিম হয়ে যায়।

নিচে এই বংশের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে:

হাজী ইলিয়াস, শামসুদ্দিন: ৭৪৩ হিজরি থেকে ৭৫৯ হিজরি

হাজী ইলিয়াস ওরফে সুলতান শামসুদ্দিনকে ‘ভাঙ্গরা’ও বলা হতো। ঐতিহাসিক ফেরেশতা বলেন যে, হাজী ইলিয়াসকে কেন ভাঙ্গরা বলা হতো তা জানা যায়নি। কেউ কেউ বলেন এর অর্থ ‘শ্যামবর্ণ’ এবং এই উপাধিটি লোকেরা এই বংশের গায়ের রঙের কারণে দিয়েছিল।

হাজী ইলিয়াসের যুগ ছিল বাংলার মুসলিম শাসনের প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের প্রথম যুগ। এই যুগটি শান্তি ও শৃঙ্খলার দিক থেকে অতুলনীয় ছিল। হাজী ইলিয়াস জাজনগর (উড়িষ্যা)-এর ওপরও আক্রমণ করেছিলেন যা বাংলার আনুগত্য থেকে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। হাজী ইলিয়াস সেখানে কর ধার্য করে এবং অনেক হাতি নিয়ে ফিরে আসেন।

দিল্লিতে তখন মুহাম্মদ তুঘলকের শাসন ছিল, যিনি দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট ইত্যাদির বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকতেন। এ কারণে তেরো বছর পর্যন্ত দিল্লির সরকার এ দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি।

এরপর ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন আসে, যিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্তিকামী শাসক। যদিও ৭৫৪ হিজরিতে ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলায় একটি আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তাতে হাজী ইলিয়াসের সরকারের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি এবং বিষয়টি শান্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে শেষ হয়। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক বজায় থাকে। হাজী ইলিয়াস ষোলো বছর কয়েক মাস শাসন করেন এবং এ দেশের রাজনৈতিক গতিধারাকে এক নতুন মোড় দান করেন।

সিকান্দার শাহ আউয়াল (৭৫৯ হি. হতে ৭৯২ হি.):

এই বংশে সিকান্দার শাহ আউয়াল (৭৫৯ হি. হতে ৭৯২ হি.) একজন অত্যন্ত জবরদস্ত ও শক্তিশালী বাদশাহ ছিলেন, যিনি ৩৩ বছর শাসন করেন। প্রথম রানীর গর্ভে তাঁর সতেরো জন পুত্র ছিল, অন্যদিকে দ্বিতীয় রানীর গর্ভে গিয়াসউদ্দিন আজম নামে এক পুত্র ছিল, যিনি অত্যন্ত যোগ্য ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। প্রথম রানী হিংসাবশত তাঁর বিরুদ্ধে পিতার কান ভারী করতে শুরু করেন যে, এই পুত্র বিদ্রোহ করতে চায়। সিকান্দার শাহ সন্দিহান হয়ে গিয়াসউদ্দিনকে বন্দি করার পরিকল্পনা করেন। তবে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন এবং পিতার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন। যুদ্ধে সুলতান সিকান্দার শাহ পরাজিত হন এবং হঠাৎ কোনো এক সৈনিকের হাতে নিহত হন, যার পর গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম (৭৯২ হি. হতে ৮১৩ হি.):

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম ছিলেন একজন মহান আলিম, ফাজিল ও সচ্চরিত্রবান বাদশাহ, যিনি ৭৯২ হি. হতে ৮১৩ হি. (১৩৯০ খ্রি. হতে ১৪১১ খ্রি.) পর্যন্ত শাসন করেন এবং নিজের ইনসাফ, জ্ঞানানুরাগ ও জনকল্যাণের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতেন না। একবার একটি মামলায় এক কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং কাজীর সাহসিকতার প্রশংসা করেন। সুলতান নিজে একজন কবি ও আলিম ছিলেন, তাই তিনি ইলম ও আদবের (জ্ঞান ও সাহিত্য) যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পারস্যের মহান কবি হাফিজ শিরাজি (রহ.)-এর সাথে সুলতানের পত্রালাপ সুবিদিত।

পনেরো শতক ঈসায়ীর শুরুতে সুলতান চীনের সাথে প্রাচীন কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করেন, যার ফলে চট্টগ্রাম বন্দর দূরপ্রাচ্যের সাথে বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সুলতান মিশরের শাসকদের সাথেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেখানে নিজের রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। এভাবে বাংলা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুলতানের শাসন এক হিন্দু রাজা গণেশের বিদ্রোহের কারণে শেষ হয়।

রাজা গণেশ (৮১৩ হি. হতে ৮১৭ হি.):

ইলিয়াস শাহীদের শাসন খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, বরং তা ছিল তার উন্নতির চরম শিখরে, এমন সময় হঠাৎ এর ধারাবাহিকতায় লেগে...

চতুর্দশ শতাব্দীর এক ফাটল সৃষ্টি হলো। বাংলা ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং এই কারণেই মুসলিম দরবারগুলোতে অনেক হিন্দু সর্দার উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমনটি দিল্লি সালতানাতেও একই পরিস্থিতি ছিল।

এখন যা ঘটল তা হলো, রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দু জমিদার, যিনি সালতানাতের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি এত বেশি প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন যে সমস্ত আমীরগণ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর প্রভু সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজমকে হত্যা করান এবং নিজে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা মুসলমানদের ওপর চরম অত্যাচার চালান, যার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার বিখ্যাত ওলী হযরত নূর কুতুব আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিমকে বাংলা আক্রমণের দাওয়াত দেন।

যখন সুলতান ইব্রাহিম তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে আসলেন, তখন রাজা গণেশ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি তাঁর পুত্র জিতমল ওরফে যদুকে হযরত নূর কুতুব আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে পাঠিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ফলে হযরত নূর কুতুব আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সুপারিশে সুলতান ইব্রাহিম অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৈন্য অভিযান ত্যাগ করেন।

যখন জৌনপুরের বাহিনী ফিরে গেল, তখন গণেশ পুনরায় জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত হলেন। এই সময়ে তাঁর পুত্র যদু হযরত নূর কুতুব আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যার কারণে রাজা গণেশ তাঁকে বন্দি করে রেখেছিলেন। মুসলমানদের ওপর এবং বিশেষ করে উলামা ও মাশায়েখদের ওপর গণেশের অত্যাচার অব্যাহত ছিল। পরিশেষে তাঁর পুত্র তাঁর অনুগতদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে সাথে নিলেন এবং কারাগার থেকে বেরিয়ে পিতাকে হত্যা করলেন এবং নিজে শাসনভার গ্রহণ করলেন। রাজা গণেশের শাসনকাল তিন বছর স্থায়ী ছিল।

নওমুসলিমদের শাসন

এখান থেকে বাংলার ইতিহাসের এক নতুন ও অদ্ভুত যুগ শুরু হয়, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে একটি হিন্দু পরিবারের একজন সদস্য মুসলিম শাসক হিসেবে দেশ ও জাতির সেবা করছেন।

জালালউদ্দিন (৮১৭ হিজরি হতে ৮৩৫ হিজরি):

গণেশের স্থলে তাঁর পুত্র জিতমল জালালউদ্দিন নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হযরত নূর কুতুব আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শাসনভার গ্রহণ করে অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন পরিচালনা করেন। ফেরেশতা লিখেছেন:

“সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি সালতানাতের আমীরদের একত্রিত করে বললেন: আমার কাছে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিচ্ছি। যদি তোমাদের এটি মঞ্জুর হয় তবে আমাকে বাদশাহ হিসেবে নির্বাচন করো, অন্যথায় আমার ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে দাও। সবাই বলল: ধর্ম আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতেই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ও খাদেম।”

মোদ্দাকথা, হিন্দু আমীরগণও তাঁর বাদশাহিতে কোনো আপত্তি করেননি। এভাবে তাঁর গৌরবময় শাসন শুরু হলো। তাঁর সময়ে মানুষ অত্যন্ত সচ্ছল হয়ে ওঠে। পান্ডুয়া শহর জনবহুল হওয়ার কারণে বড় শহরগুলোর মধ্যে গণ্য হতে শুরু করে। এই...

গৌড়কে নতুন করে আবাদ করলেন। সেখানে অনেক হাউজ, পুকুর ও সরাইখানা নির্মাণ করালেন। প্রচুর পরিমাণে মসজিদ নির্মাণ করালেন। দূর-দূরান্ত থেকে আলেমদের ডেকে এনে সেখানে বসতি স্থাপন করালেন। ইসলামের দাওয়াতের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিলেন, যার ফলে বাংলার অসংখ্য মানুষ মুসলমান হলো।

আহমদ শাহ (৮৩৫ হিজরি থেকে ৮৪৬ হিজরি):
জালালুদ্দিনের পর তার পুত্র আহমদ শাহ শাসক হন। তিনি এগারো বছর পর্যন্ত খুব ভালোভাবে শাসন করেন। তার আমলে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল।

ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরায় শাসন

পঁচিশ বছর পর ইলিয়াস শাহী বংশ তাদের সিংহাসন পুনরায় ফিরে পায় এবং নতুন শান-শওকতের সাথে শাসন শুরু করে।

নাসির শাহ (৮৪৬ হিজরি থেকে ৮৬২ হিজরি):
নতুন সরকার গঠনকারী ব্যক্তি ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের একজন সদস্য নাসির শাহ। ইলিয়াস শাহী বংশের এই হীরাটি লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে ছিল এবং চাষাবাদ করে জীবন অতিবাহিত করছিল। তার কখনো ভুলেও মনে আসেনি যে তিনি কখনো সিংহাসনের মালিক হবেন।

কিন্তু ভাগ্য তাকে রাজনীতির ময়দানে এনে দাঁড় করায় এবং আশ্চর্যজনকভাবে চারপাশ থেকে মানুষ তার চারপাশে সমবেত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি দেশের বাদশাহ হন। ভাঙ্গরা (ইলিয়াস শাহী) বংশের যে সকল লোক গত তিন দশকে যাযাবর হয়ে গিয়েছিল, তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা ফিরে আসে। তাদের মধ্য থেকে অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সেই সময়ে দিল্লির সুলতান এবং বাংলার মাঝখানে জৌনপুরের শার্কি সালতানাত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই বাংলার জন্য দিল্লি থেকে কোনো বিপদ ছিল না। নাসির শাহ ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ২৮ বছর শাসন করেন।

বারবাক শাহ বিন নাসির (৮৬২ হিজরি থেকে ৮৭৯ হিজরি):
নাসির শাহের পর তার পুত্র বারবাক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পনেরো বছর পর্যন্ত শান্তিতে শাসন করেন। সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তার রাজত্ব ছিল। তিনি বাংলার প্রথম বাদশাহ ছিলেন যিনি হাবশি বংশের শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের খোজা প্রহরী নিয়োগ করেছিলেন, যারা ধীরে ধীরে সালতানাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়।

ইউসুফ শাহ বিন বারবাক শাহ (৮৭৯ হিজরি থেকে ৮৮৬ হিজরি):
বারবাক শাহের পর তার পুত্র ইউসুফ শাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি অত্যন্ত আলেম ও ফাজেল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম রাখেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তার আমলে মদ্যপানসহ সকল শরীয়ত বিরোধী কাজের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তিনি এত বড় আলেম ও ফকিহ ছিলেন যে, মাঝে মাঝে কোনো কঠিন ফয়সালা করতে কাজীদের সমস্যা হলে এই বাদশাহ নিজেই তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং উপযুক্ত সমাধান বের করতেন। তিনি আলেম ও কাজীদের বলে রেখেছিলেন যে, সমস্ত ফয়সালায় হকের প্রতি লক্ষ্য রাখবে অন্যথায় আমার...

তোমাদের সাথে বনিবনা হবে না। সাত বছর শাসন করার পর ৮৮৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ফাতাহ শাহ (৮৮৬ হিজরি থেকে ৮৯২ হিজরি):

ইউসুফ শাহের পর সিকান্দার শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হন। ফলে আমীরগণ শীঘ্রই তার স্থলে ফাতাহ শাহের হাতে সিংহাসন অর্পণ করেন। ফাতাহ শাহের শাসনামলে হাবশীদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তারা রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলীতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাদের সরদার সুলতান শাহজাদা ৮৯২ হিজরিতে (১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) বিদ্রোহ করে সুলতান ফাতাহ শাহকে হত্যা করেন এবং ক্ষমতা দখল করে নেন।

হাবশীদের যুগ

সুলতান শাহজাদা বারবাক: কয়েক মাস

সুলতান শাহজাদা হাবশী সিংহাসন দখল করে বারবাক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সব ধরণের অযোগ্য ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের নিজের সাথে যুক্ত করেছিলেন, যার ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থা দিন দিন শোচনীয় হতে থাকে।

মালিক আন্দিল, সাইফুদ্দীন ফিরোজ (৮৯২ হিজরি থেকে ৮৯৫ হিজরি):

এটি দেখে মালিক আন্দিল নামক অপর এক হাবশী কর্মকর্তা দেশকে এই ফাসাদ থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তুতি নেন এবং সুলতান শাহজাদাকে হত্যা করেন। সুলতান শাহজাদার শাসনকাল মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছিল।

মালিক আন্দিল সাইফুদ্দীন ফিরোজ উপাধি গ্রহণ করে শাসন শুরু করেন। তিন বছর পর্যন্ত তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা এবং উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে এমন সব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন যে জনগণ তার ভক্ত হয়ে যায়। তিন বছর পর সাইফুদ্দীন ফিরোজ ইন্তেকাল করেন।

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বিন ফাতাহ খান (৮৯৫ হিজরি থেকে ৮৯৬ হিজরি):

আমীরগণ এবার ইলিয়াস শাহী বংশের নিহত বাদশাহ ফাতাহ খানের অল্পবয়স্ক পুত্র মাহমুদকে নাসিরুদ্দীন উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান এবং হাবশী খান নামক সবচেয়ে শক্তিশালী হাবশী কর্মকর্তা তার অভিভাবক নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র এক বছর পর হাবশী খান মাহমুদকে ক্ষমতাচ্যুত করেন যাতে তিনি নিজে বাদশাহ হতে পারেন।

মুজাফফর শাহ (বদর দিওয়ানা): কয়েক মাস

এমন সময় বদর দিওয়ানা নামক অপর এক হাবশী সরদার সামনে আসেন যিনি হাবশী খানকে হত্যা করেন এবং মুজাফফর শাহ উপাধি গ্রহণ করে বাদশাহ হয়ে বসেন। মুজাফফর শাহ অত্যন্ত নির্ভীক ও নির্দয় ব্যক্তি ছিলেন। তার শাসনামলে বড় বড় আমীর ও রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নির্বিচারে হত্যা করা হতে থাকে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত্ব ছিল। অবশেষে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকজন আমীরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে দেয়। এই আমীরদের মধ্যে সৈয়দ শরীফ মক্কী হুসাইনীর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। হাবশী বাদশাহ একটি কেল্লায়...

...অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। এখানে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে যাতে উভয় পক্ষের অন্তত বিশ হাজার লোক প্রাণ হারায়। অবশেষে হাবশি বাদশাহ মুজাফফর শাহ পরাজিত হন এবং তার দরবারীদেরসহ তাকে হত্যা করা হয়।

হুসাইনি বংশ

বদর দিওয়ানা হাবশির অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার রাজদরবারের এক বিশিষ্ট সদস্য সৈয়দ শরীফ মক্কি, যিনি হুসাইনি সাদাতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ময়দানে নেমে পটপরিবর্তন করে দেন এবং নতুন সরকার গঠনে সাফল্য অর্জন করেন। এরপর এই অভিযানে শরিক সকল আমিরের ঐকমত্যে তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন এবং আলাউদ্দিন হুসাইনি উপাধি ধারণ করেন।

সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসাইনি (৮৯৯ হিজরি থেকে ৯২৫ হিজরি):

সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসাইনি নতুন করে একটি সুসংগঠিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। হাবশিদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা হয়। বহিষ্কৃত হাবশিদের জৌনপুর ও দিল্লির সরকারগুলোও গ্রহণ করেনি। অবশেষে তারা গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে চলে যায়।

সৈয়দ হুসাইনির আমলে বিহারকেও বাংলার সাথে যুক্ত করা হয়। বাংলা এখন অত্যন্ত শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছিল। মধ্য ভারতে মুসলিম সরকারগুলোর মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। বাংলা দিল্লি থেকে বিমুখ আমিরদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। দিল্লির লোদি শাসকরা যখন জৌনপুরের শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করেন, তখন তিনিও বাংলায় আশ্রয় পান এবং জৌনপুরের সেনাবাহিনীও বাংলার সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

সৈয়দ আলাউদ্দিনের বুজুর্গানে দ্বীন বিশেষ করে হযরত নূর কুতুব আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহির দরগাহর প্রতি গভীর ভক্তি ছিল। প্রতি বছর খানকাহর সেবার জন্য একটি বড় অংকের অর্থ পাঠানো তার নিয়ম ছিল। সৈয়দ আলাউদ্দিন ২৭ বছর শাসন করেন। এটি ছিল বাংলার মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ। সৈয়দ আলাউদ্দিন অসুস্থ হয়ে ৯২৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

নসীব শাহ:

সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসাইনির পর তার পুত্র নসীব শাহ শাসনভার গ্রহণ করেন। তার একটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব হলো, অনেক ভাই থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে বন্দি করেননি, বরং তাদের সাথে আদর্শ আচরণ করেছেন এবং তাদের পদমর্যাদা ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

নসীব শাহর আমলে জহিরুদ্দিন বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তা শক্তিশালী করার পর বাংলা জয়েরও প্রস্তুতি নেন। কিন্তু নসীব শাহ অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে কাজ করে উপহার পাঠিয়ে বাবরকে সন্তুষ্ট করেন। ফলে বাবর বাংলা অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

বাবরের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরি হুমায়ুনও বাংলা দখলের প্রস্তুতি শুরু করেন। নসীব শাহ তা জানতে পেরে গুজরাটের বাদশাহ বাহাদুর শাহর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং অনেক মূল্যবান উপহার পেশ করে তাকে বন্ধু বানিয়ে নেন।

এই রাজনীতি সফল হতে থাকে যার কারণে হুমায়ুন কখনো বাংলার অভিযানে আবার কখনো গুজরাটের অভিযানে এবং বিহার ও অন্য কোনো এক স্থানেও পূর্ণাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

নসীব শাহ তার শেষ যুগে জনগণের ওপর অনেক কঠোরতা শুরু করেন। মানুষের বদদোয়া রঙ নিয়ে আসে এবং অবশেষে নসীব শাহ ৯৪৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী আমীররা তার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং তাকে হত্যা করে।

তার পর সালতানাতের একজন প্রভাবশালী আমীর মাহমুদ সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ নামে পরিচিত হন।

মুঘল ও আফগান সুরীদের শাসন

বাবরের কিছুকাল পর তার উত্তরসূরি হুমায়ুন ৯৪৪ হিজরিতে বাংলা জয় করেন এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ তার আনুগত্য স্বীকার করেন। দুই বছর পর শের শাহ সুরী বিহার ও বাংলা দখল করেন। তিনি বাংলাকে একটি অধীনস্থ প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে এখানে সুবাদার নিয়োগ করা শুরু করেন।

বাংলার তৃতীয়বার স্বায়ত্তশাসন

সুরীদের পর ৯৭১ হিজরিতে বাংলা পুনরায় স্বায়ত্তশাসিত হয় এবং এখানে কররানিরা তাদের স্বাধীন সরকার গঠন করে; তবে এর আগেই হুমায়ুন তার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার উত্তরসূরি আকবর একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই এখন বাংলা মুঘলদের চাপ থেকে নিরাপদ ছিল না।

মুঘলদের অধীনে বাংলা

অবশেষে জালালুদ্দিন আকবর ৯৮২ হিজরিতে বিহারের শাসক সুলাইমান কররানিকে তার অনুগত করেন এবং ৯৮৪ হিজরিতে (১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সফল হন। আওরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা মুঘলদের শাসনাধীন ছিল।

শের শাহ সুরী (আফগান) এবং তারপর মুঘলদের বাংলা শাসনের বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের অধীনে আসবে। তাই এখানে এইটুকুর ওপরই ক্ষান্ত করা হচ্ছে।

https://t.me/BoierSomahar

বাংলার সুলতানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান

খলজি ও ইলিয়াসি সুলতানগণ কেবল বাংলাকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাই প্রদান করেননি, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তবে এই দুই রাজবংশের সময়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল, তাই উভয়ের কৃতিত্বও ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।

খলজিদের কৃতিত্ব:

খলজিদের যুগ মূলত সামরিক বিজয় এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপনের ওপর নিবদ্ধ ছিল। খলজিদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল এই যে, তারা বাংলাকে একটি বিশাল বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করেছিলেন। নতুন শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপনের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

খলজি আমলের অধিকাংশ সময় সামরিক অভিযানে অতিবাহিত হয়েছিল, ফলে জ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা সম্ভব হয়নি। তবে তারা মুসলিম প্রভাব-প্রতিপত্তি সুসংহত করেন এবং বাংলায় ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেন।

এই যুগে বড় কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়নি, তবে তারা এই ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহসমূহ নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করেছিল।

ইলিয়াসি সুলতানদের যুগ:

ইলিয়াসি রাজবংশ বাংলাকে একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধ সালতানাতে পরিণত করেছিল। এই যুগ বাংলার ইতিহাসের “স্বর্ণযুগ” হিসেবে পরিচিত। ইলিয়াসি আমলে বাংলা বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং চীন, মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে এর ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাংলার মসলিন ও অন্যান্য বস্ত্রজাত পণ্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এই যুগে সোনা ও রুপার মুদ্রার প্রচলন সাধারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইলিয়াসি সুলতানগণ ছিলেন মহান স্থপতি। তারা রাজধানী “পাণ্ডুয়া”-তে অনেকগুলো স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন। আদিনা মসজিদ ছিল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাণ। এই মসজিদটি তার বিশাল কাঠামোর কারণে উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ ছিল। “লখনৌতি মাকবারা” (সমাধি)-ও এই যুগের স্থাপত্যশৈলীর একটি চমৎকার নিদর্শন, যা স্থানীয় ও ইসলামি স্থাপত্যরীতির এক সংমিশ্রণ।

ইলিয়াসি সুলতানগণ কেবল ফারসি নয়, বরং স্থানীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও চমৎকার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তারা এমন এক...

সংস্কৃতিকে বিকশিত করার পাশাপাশি ফারসি ও আরবি ঐতিহ্যের সাথে স্থানীয় বাঙালি সংস্কৃতির রঙও ছিল গভীর। মুসলমানরা বাংলা ভাষাকেও আপন করে নিয়েছিলেন এবং এর উন্নতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই যুগের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন:

শাহ মুহাম্মদ সগীর: তিনি বাংলার প্রাথমিক ও সবচেয়ে বিখ্যাত মুসলিম কবিদের একজন ছিলেন। তিনি ফারসি মসনভির আদলে বাংলায় তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য "ইউসুফ জুলেখা" লিখেছিলেন। এটি একটি ইসলামি বিষয়বস্তুকে স্থানীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্যে উপস্থাপন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

আলাওল: তিনি ষোড়শ শতাব্দীর একজন মহান কবি ছিলেন। তিনি ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং হিন্দুস্তানি ও ফারসি লোককাহিনী বাংলায় উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা হলো "পদ্মাবতী", যা মালিক মুহাম্মদ জায়সীর হিন্দি মসনভির বাংলা অনুবাদ।

দৌলত কাজী: তিনিও এই যুগের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় ফারসি ও হিন্দুস্তানি বিষয়বস্তু এবং শৈলীর এক চমৎকার সংমিশ্রণ পাওয়া যায়।

ফারসি সাহিত্য:
এই যুগে ফারসি ছিল বাংলার সরকারি ও দরবারি ভাষা। সমস্ত সরকারি রেকর্ড, ঐতিহাসিক নথিপত্র এবং সরকারি চিঠিপত্র ফারসিতেই হতো। এ ছাড়া অনেক আলেম ও কবি ফারসিতে কবিতা ও গদ্যও লিখেছিলেন। ফারসি সাহিত্য শাসকদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

মোটকথা, বাংলার সুলতানদের আমলে বাংলা জ্ঞান ও সাহিত্যের এমন একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যেখানে ফারসি, আরবি এবং স্থানীয় বাংলা ভাষা একে অপরের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং মুসলিম সাহিত্যিক ও কবিরা বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন।

বাংলার শাসকদের তালিকা

৫৯৯ হিজরি থেকে ৭৩৭ হিজরি

(১২০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)

ক্রমিক নং সুবাদার সময়কাল বাদশাহ বিশেষ ঘটনা

১ মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ৫৯৯ হিজরি থেকে ৬০২ হিজরি (১২০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরি বাংলা জয় করে সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তিব্বত অভিযানের চেষ্টা করেন।

৩ আলাউদ্দিন মাদান ৬০২ হিজরি থেকে ৬০৮ হিজরি (১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১১ খ্রিষ্টাব্দ) কুতুবুদ্দিন আইবেক, ইলতুতমিশ মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজিকে হত্যা করে শাসক হন। জালেম বাদশাহ হিসেবে প্রমাণিত হন।

৪ হুসামুদ্দিন ইওয়াজ (গিয়াসউদ্দিন খলজি) ৬০৮ হিজরি থেকে ৬২৩ হিজরি (১২১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ) ইলতুতমিশ সচ্চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। প্রচুর নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করিয়েছেন।

৫ শাহজাদা মাহমুদ নাসিরুদ্দিন ৬২৩ হিজরি থেকে ৬২৭ হিজরি (১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইলতুতমিশ

৬ আলাউদ্দিন জানি ৬২৭ হিজরি (১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইলতুতমিশ

৭ সাইফুদ্দিন আইবেক আমিন খান ৬২৭ হিজরি থেকে ৬৩১ হিজরি (১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) ইলতুতমিশ

৮ ইজ্জুদ্দিন তুঘরিল তুগান খান ৬৩১ হিজরি থেকে ৬৪২ হিজরি (১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) ইলতুতমিশ, রাজিয়া সুলতানা, বাহরাম শাহ, মাসুদ শাহ

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

৯ কামারুদ্দিন তামার খান কিরান ৬৩২ হিঃ থেকে ৬৪৩ হিঃ (১২৩৩ খ্রিঃ থেকে ১২৪৬ খ্রিঃ) মাসুদ শাহ

১০ ইখতিয়ারুদ্দিন (মুগীস উদ্দিন) ইউজবক ৬৪৩ হিঃ থেকে ৬৫৬ হিঃ (১২৪৬ খ্রিঃ থেকে ১২৫৮ খ্রিঃ) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

১১ জালালুদ্দিন মাসুদ মালিক জানি ৬৫৬ হিঃ থেকে ৬৫৭ হিঃ (১২৫৮ খ্রিঃ) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

১২ ইজ্জুদ্দিন বলবন ৬৫৭ হিঃ থেকে ৬৫৯ হিঃ (১২৫৮ খ্রিঃ থেকে ১২৬০ খ্রিঃ) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

১৩ মুহাম্মদ আরসালান তাতার খান শির খান ৬৫৯ হিঃ থেকে ৬৬৭ হিঃ (১২৬০ খ্রিঃ থেকে ১২৬৮ খ্রিঃ) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ, গিয়াসুদ্দিন বলবন

১৪ মুগীস উদ্দিন তুঘরিল ৬৬৭ হিঃ থেকে ৬৮১ হিঃ (১২৬৮ খ্রিঃ থেকে ১২৮২ খ্রিঃ) গিয়াসুদ্দিন বলবন

১৫ নাসিরুদ্দিন বুগরা খান ৬৮১ হিঃ থেকে ৬৯১ হিঃ (১২৮২ খ্রিঃ থেকে ১২৯১ খ্রিঃ) গিয়াসুদ্দিন বলবন, কায়কোবাদ, কায়ুমারস

১৬ রুকনুদ্দিন কায়কাউস ৬৯১ হিঃ থেকে ৭০২ হিঃ (১২৯১ খ্রিঃ থেকে ১৩০২ খ্রিঃ) জালালুদ্দিন খিলজি, আলাউদ্দিন খিলজি

১৭ শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ৭০২ হিঃ থেকে ৭১৮ হিঃ (১৩০২ খ্রিঃ থেকে ১৩১৮ খ্রিঃ) আলাউদ্দিন খিলজি

১৮ শিহাবুদ্দিন বুগরা শাহ (পশ্চিম বাংলা) ৭১৮ হিঃ থেকে ৭১৯ হিঃ (১৩১৮ খ্রিঃ থেকে ১৩১৯ খ্রিঃ) কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ

১৯ গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর (পূর্ব বাংলা) ৭১০ হিঃ থেকে ৭১৯ হিঃ (১৩১০ খ্রিঃ থেকে ১৩১৯ খ্রিঃ) আলাউদ্দিন খিলজি, কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-ইসলাম (অংশ ষষ্ঠ)

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

২০ গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর (সমগ্র বাংলা) ৭১৯ হি. থেকে ৭২৩ হি. (১৩১৯ খ্রি. থেকে ১৩২৩ খ্রি.) কুতুব উদ্দিন মুবারক শাহ, গিয়াস উদ্দিন তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক

২১ নাসির উদ্দিন (পশ্চিম বাংলা) ৭২৩ হি. থেকে ৭২৬ হি. (১৩২৩ খ্রি. থেকে ১৩২৫ খ্রি.) গিয়াস উদ্দিন ফিরোজ তুঘলক

২২ বাহাদুর বাহরাম শাহ (পূর্ব বাংলা) ৭২৫ হি. থেকে ৭৩১ হি. (১৩২৩ খ্রি. থেকে ১৩৩০ খ্রি.) মুহাম্মদ তুঘলক

২৩ বাহাদুর বাহরাম শাহ (সমগ্র বাংলা) ৭৩১ হি. থেকে ৭৩৯ হি. (১৩৩০ খ্রি. থেকে ১৩৩৮ খ্রি.) মুহাম্মদ তুঘলক

২৪ কদর খান (পশ্চিম বাংলা) ৭২৬ হি. থেকে ৭৪০ হি. (১৩২৫ খ্রি. থেকে ১৩৩৯ খ্রি.) মুহাম্মদ তুঘলক

২৫ ইজ্জুদ্দিন আজমুল মুলক (পূর্ব বাংলা) ৭২৪ হি. থেকে ৭৪০ হি. (১৩২৩ খ্রি. থেকে ১৩৩৯ খ্রি.) মুহাম্মদ তুঘলক

বাংলার সুলতানগণ

(৭৪০ হি. থেকে ৯৮৪ হি. / ১৩৩৯ খ্রি. থেকে ১৫৭৬ খ্রি.)

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ (পূর্ব বাংলা) ৭৪০ হি. থেকে ৭৫০ হি. (১৩৩৯ খ্রি. থেকে ১৩৪৯ খ্রি.) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ (পূর্ব বাংলা) ৭৫০ হি. থেকে ৭৫৩ হি. (১৩৪৯ খ্রি. থেকে ১৩৫২ খ্রি.)

৩ আলাউদ্দিন আলী শাহ (পশ্চিম বাংলা) ৭৪০ হি. থেকে ৭৪৬ হি. (১৩৩৯ খ্রি. থেকে ১৩৪৫ খ্রি.) এই সময়ে শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ বিদ্রোহ করে সক্রিয় ছিলেন

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ইলিয়াস শাহী রাজবংশ

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (পশ্চিমবঙ্গ) ৭৪০ হিজরি থেকে ৭৫৩ হিজরি (১৩৩৯ খ্রি. থেকে ১৩৫২ খ্রি.) ইলিয়াস শাহী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। সুবাদার হিসেবে শাসন।

দ্বিতীয় পর্যায় শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (পুরো বাংলা) ৭৫৩ হিজরি থেকে ৭৫৯ হিজরি (১৩৫২ খ্রি. থেকে ১৩৫৮ খ্রি.) সুলতান হিসেবে শাসন।

২ সিকান্দার শাহ প্রথম বিন ইলিয়াস ৭৫৯ হিজরি থেকে ৭৯২ হিজরি (১৩৫৮ খ্রি. থেকে ১৩৮৯ খ্রি.) শক্তিশালী শাসক।

৩ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিন সিকান্দার ৭৯২ হিজরি থেকে ৮১৩ হিজরি (১৩৯০ খ্রি. থেকে ১৪১১ খ্রি.) অত্যন্ত যোগ্য ও ধর্মপ্রাণ শাসক।

৪ সাইফউদ্দিন (শামসুদ্দিন) হামজা শাহ বিন আজম ৮১৩ হিজরি থেকে ৮১৬ হিজরি (১৪১১ খ্রি. থেকে ১৪১৩ খ্রি.) গণেশ গিয়াসউদ্দিন আজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের বিদ্রোহী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই শাহজাদাকে প্রতীকীভাবে সিংহাসনে বসান।

৫ শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ ৮১৬ হিজরি থেকে ৮১৭ হিজরি (১৪১৩ খ্রি. থেকে ১৪১৪ খ্রি.) ক্ষমতা কার্যত রাজা গণেশের হাতে ছিল।

গণেশের বংশধরদের শাসনকাল

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

৭ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ বিন রাজা গণেশ ৮১৭ হিজরি থেকে ৮৩৫ হিজরি (১৪১৪ খ্রি. থেকে ১৪৩২ খ্রি.) নওমুসলিম শাসক যিনি তাঁর পিতা গণেশকে তাঁর অত্যাচারের কারণে হত্যা করেন এবং মুসলমানদের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি দেন।

৮ শামসুদ্দিন আহমদ শাহ বিন মুহাম্মদ শাহ বিন গণেশ ৮৩৫ হিজরি থেকে ৮৩৬ হিজরি (১৪৩২ খ্রি. থেকে ১৪৩৩ খ্রি.)

https://t.me/BoierSomahar

ইলিয়াস শাহীদের পুনরায় ক্ষমতা লাভ

- ৯. নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ: ৮৩৭ হিজরি থেকে ৮৬৩ হিজরি (১৪৩২ থেকে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। ইলিয়াসি বংশের একজন অখ্যাত রত্ন, যিনি নিজের সাহস, কৌশল ও একাগ্রতার মাধ্যমে পুনরায় তার পূর্বপুরুষদের শাসনকে শান-শওকতের সাথে প্রতিষ্ঠা করেন।

- ১০. রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ: ৮৬৩ হিজরি থেকে ৮৭৯ হিজরি (১৪৫৯ থেকে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। পনেরো বছরের সমৃদ্ধির যুগ, হাবশী সৈন্যদের নিয়োগ।

- ১১. শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ: ৮৭৯ হিজরি থেকে ৮৮৬ হিজরি (১৪৭৪ থেকে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ)। বিদ্বান ও গুণী বাদশাহ, শরীয়ত বাস্তবায়নের স্বর্ণযুগ।

- ১২. সিকান্দার শাহ দ্বিতীয়: ৮৮৬ হিজরি (১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ)। সংক্ষিপ্ত সময় - অযোগ্য শাসক।

- ১৩. জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ বিন মাহমুদ আউয়াল: ৮৮৬ হিজরি থেকে ৮৯২ হিজরি (১৪৮১ থেকে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ)। হাবশীদের উত্থান - বিদ্রোহে নিহত।

হাবশীদের শাসন

- ১৪. সুলতান শাহজাদা বারবাক: ৮৯২ হিজরি (১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ)। হাবশী শাসক যে বিদ্রোহ করে ফতেহ শাহকে হত্যা করায় এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করে; কয়েক মাস শাসন করে।

- ১৫. সাইফুদ্দিন ফিরোজ (মালিক আন্দিল): ৮৯২ হিজরি থেকে ৮৯৫ হিজরি (১৪৮৭ থেকে ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ)। হাবশী শাসক যে বারবাককে হত্যা করে, অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ঈর্ষণীয় শাসন।

- ১৬. নাসিরুদ্দিন দ্বিতীয়, মাহমুদ শাহ বিন ফতেহ শাহ, ইলিয়াসি বংশ: ৮৯৫ হিজরি থেকে ৮৯৬ হিজরি (১৪৮৯ থেকে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ)। ইলিয়াসি বংশের একজন ব্যক্তি পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বছরের নামমাত্র শাসন।

- ১৭. মোজাফফর শাহ (বদর দেওয়ানা): ৮৯৬ হিজরি থেকে ৮৯৯ হিজরি (১৪৯০ থেকে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। হাবশী শাসক যে নাসিরুদ্দিন দ্বিতীয়কে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং স্বৈরাচারী শাসন শুরু করে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সৈয়দ হোসেন শাহের বংশ

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসাইনী (সৈয়দ শরীফ মক্কী) ৮৯৯ হিজরি থেকে ৯২৫ হিজরি (১৪৯৩ খ্রি. থেকে ১৫১৮ খ্রি.) হাবশীদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়বিচারপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২৭ বছর পর্যন্ত দেশকে সমানভাবে উন্নত করেন।

২ নাসির উদ্দিন নসীব শাহ বিন হুসাইনী ৯২৫ হিজরি থেকে ৯৩৯ হিজরি (১৫১৮ খ্রি. থেকে ১৫৩২ খ্রি.)

৩ আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ দ্বিতীয় বিন নসীব ৯৩৯ হিজরি (১৫৩২ খ্রি.)

৪ গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ ৯৩৯ হিজরি থেকে ৯৪৪ হিজরি (১৫৩২ খ্রি. থেকে ১৫৩৭ খ্রি.) দেশের কিছু অংশের ওপর তার শাসন ছিল।

৫ হুমায়ুনের বাংলা দখল ৯৪৪ হিজরি থেকে ৯৪৬ হিজরি (১৫৩৭ খ্রি. থেকে ১৫৩৯ খ্রি.)

আফগান সুরি বংশ

নম্বর শাসনকাল শাসক বিশেষ কথা

১ শের শাহ সুরি ৯৪৬ হিজরি থেকে ৯৫২ হিজরি (১৫৩৯ খ্রি. থেকে ১৫৪৫ খ্রি.) দুই বছর পর্যন্ত স্বাধীন শাসক হিসেবে ছিলেন। পরবর্তীতে বাদশাহ হয়ে এখানে সুবাদার নিযুক্ত করেন।

২ খিজির খান ৯৪৭ হিজরি থেকে ৯৫২ হিজরি (১৫৪০ খ্রি. থেকে ১৫৪৫ খ্রি.)

৩ মুহাম্মদ খান সুরি - শামস উদ্দিন মুহাম্মদ গাজী শাহ সুর ৯৫২ হিজরি থেকে ৯৬২ হিজরি (১৫৪৫ খ্রি. থেকে ১৫৫৫ খ্রি.)

৪ খিজির খান বাহাদুর শাহ ৯৬২ হিজরি থেকে ৯৬৮ হিজরি (১৫৫৫ খ্রি. থেকে ১৫৬০ খ্রি.)

https://t.me/BoierSomahar

গিয়াসুদ্দিন জালাল শাহ বিন মুহাম্মদ গাজী খান সুর | ৯৬৪ হি. থেকে ৯৭০ হি. (১৫৬০ খ্রি. থেকে ১৫৬৩ খ্রি.)

কররানী খানদান

(স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন)

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ সুলাইমান খান কররানী (বিহার ও বাংলার ওপর শাসন) ৯৭০ হি. থেকে ৯৮০ হি. (১৫৬৩ খ্রি. থেকে ১৫৭২ খ্রি.)

২ বায়েজিদ শাহ কররানী বিন সুলাইমান ৯৮০ হি. (১৫৭২ খ্রি.)

৩ দাউদ শাহ কররানী বিন সুলাইমান ৯৮০ হি. থেকে ৯৮৪ হি. (১৫৭২ খ্রি. থেকে ১৫৭৬ খ্রি.) বাংলার শেষ স্বাধীন বাদশাহ, মুঘলদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন

- তারীখে হিন্দুস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী): চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৩ থেকে ৪০৪
- তারীখে ফেরেশতা, তবাকাত-ই-আকবরী: (মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৮ থেকে ৫৯০, অষ্টম প্রবন্ধ
- রিয়াজুস সালাতীন (তারীখে শাহানে বাঙ্গাল), গোলাম হোসেন সলিম
- তারীখে মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবী, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠী): তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১৯ থেকে ৬২৩
- নুজহাতুল খাওয়াতির: হাকিম আব্দুল হাই হাসানী
- ইসলামী সালতানাতেঁ: ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

(৩) জৌনপুর শারকি সালতানাত

৭৯৬ হিজরি থেকে ৮৯৯ হিজরি

১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ

জৌনপুর বেনারসের উত্তরে বিহার ও আওধের মধ্যবর্তী স্থানে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরের ভিত্তি ফিরোজ শাহ তুঘলক ৭৬২ হিজরিতে (১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দ) স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর পূর্বসূরি সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আসল নাম (জৌনা) অনুসারে এর নামকরণ করেছিলেন। বাংলা ও দিল্লির মুসলিম সালতানাতগুলোর মাঝে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটি অত্যন্ত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। আলেম ও গুণীজনদের আনাগোনার কারণে একে 'শিরাজ-ই-মাশরিক' এবং 'শিরাজ-ই-হিন্দ' বলা হতো।

জৌনপুরের ময়দান: আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও মহিমা:

জৌনপুর হিন্দুস্তানের সবচেয়ে উর্বর ও প্রশস্ত সমতল অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এটি গোমতী নদীর তীরে গড়ে ওঠা একটি সমতল ও সবুজ শ্যামল এলাকা। এখানকার জমি অত্যন্ত উর্বর এবং এর ভৌগোলিক অবস্থান একে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও যাতায়াতের জন্য আদর্শ করে তুলেছিল। এখানে কোনো পাহাড়ি দুর্গ ছিল না, বরং একদিকে বিপুল সংখ্যক দক্ষ সৈন্য শহর রক্ষা করত, অন্যদিকে এর রাজনৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক শক্তি এবং এখানকার মাশায়েখদের আধ্যাত্মিক শক্তি একে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল।

জৌনপুরের মানচিত্র ছিল এমন এক শহরের যা নদীর তীরে বিস্তৃত ছিল এবং এখানকার স্থাপত্যশৈলী সমতল অঞ্চলের প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটাত। এখানকার মসজিদগুলো যেমন আতালা মসজিদে বড় বড় প্রবেশদ্বার এবং উঁচু মেহরাব রয়েছে, যা দূর থেকেই নজরে...

...চলে আসে। এই মসজিদগুলোতে মিনারের সংখ্যা কম রাখা হয়েছিল যা এর স্থাপত্যশৈলীকে দিল্লির শৈলী থেকে স্বতন্ত্র করেছিল। এখানকার ইমারতগুলোতে একটি গম্ভীর ও জ্ঞানতাত্ত্বিক গাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হতো। প্রকৃতপক্ষে জৌনপুর ছিল এমন একটি সালতানাত যার অস্তিত্ব ছিল জ্ঞান, সাহিত্য ও তামাদ্দুনিক উন্নতির বহিঃপ্রকাশ, এবং এর ভূমির উর্বরতা ছিল এর বুদ্ধিবৃত্তিক উর্বরতার প্রতিফলন। পরবর্তী পংক্তিগুলোতে এই সালতানাতের প্রতিষ্ঠা এবং উত্থান-পতনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পেশ করা হচ্ছে।

মালিক সরওয়ার

(৭৯৬ হিজরি হতে ৮০২ হিজরি / ১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৩৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)

জৌনপুর সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা মালিক সরওয়ার সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমলের একজন খোজা ছিলেন। পরবর্তীতে তাকে খোজাদের প্রধান বানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আরও পদোন্নতি দিয়ে তাকে 'দারোগা-ই-ফিলখানা' (হস্তিশালার তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে উন্নতি করে তিনি 'খাজা-ই-জাহান' উপাধিসহ এক উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আমীর হয়ে যান। সুলতান মাহমুদ শাহ তুঘলক দ্বিতীয়-এর আমলে তিনি ৭৯৬ হিজরিতে (১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) অযোধ্যা অভিযানের সময় পূর্ব ভারতে আসেন। অভিযানে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি বাদশাহর অল্পবয়সের সুযোগ নিয়ে জৌনপুরে নিজের স্বাধীন সরকার কায়েম করেন এবং বাদশাহর কাছ থেকে 'মালিকুশ শারক' উপাধি লাভ করেন। এভাবে মালিক সরওয়ার জৌনপুর ও অযোধ্যার প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসক হয়ে যান, যদিও এই স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ ছিল না বরং আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির আধিপত্য বজায় ছিল।

মালিক সরওয়ার একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি তার গভীর ভক্তি ছিল। জৌনপুরে তার শাসনকালে উলামা ও মাশায়েখদের জন্য পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল ছিল। এই সময়েই মাখদুম জাহানিয়া জাহান গাশত (রহ.) জৌনপুরে তাশরিফ আনলে মালিক সরওয়ার তার হাতে বায়আত হন। মালিক সরওয়ার সৈয়দ বংশের দুই ছেলে: মুবারক ও ইবরাহিমকে নিজের পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। এই দুজনেই একে একে এই সালতানাতের উত্তরাধিকারী হন। [১]

মুবারক শাহ

(৮০২ হিজরি হতে ৮০৫ হিজরি / ১৩৭৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দ)

৮০২ হিজরিতে (১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) মালিক সরওয়ারের মৃত্যু হয় এবং তার পালক পুত্র মুবারক শাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। সেই সময় দিল্লি সালতানাত তৈমুর লঙের আক্রমণে তছনছ হয়ে গিয়েছিল, তাই তার অধীনে থাকাকে নিরর্থক মনে করে মুবারক শাহ রাষ্ট্রকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাধীন ঘোষণা করেন এবং নিজের খুতবার সাথে বাদশাহি কায়েম করেন যা 'সালাতিনে শারকিয়া' নামে পরিচিত হয়।

মুবারক শাহ অত্যন্ত সুঠামদেহী ও উচ্চ সাহসী যুবক ছিলেন এবং যুদ্ধবিগ্রহের ভালো অভিজ্ঞতা রাখতেন। তার স্বাধীনতা ঘোষণার...

---

[১] শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৭৪ হতে ৯৩।

পরবর্তীতে দিল্লির সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ এবং তার নায়েব ইকবাল মাল্লু তাকে বশীভূত করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মুবারক শাহ তাদের কোথাও সফল হতে দেননি। [১] মুবারক শাহ প্রায় আড়াই বছর শাসন করতে পেরেছিলেন এবং ৮০৪ হিজরি (১৪০২ খ্রিস্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন। [২]

ইব্রাহিম শাহ শারকি

৮০৪ হিজরি থেকে ৮৪৪ হিজরি (১৪০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ)

মুবারক শাহের ভাই ইব্রাহিম শারকি সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে মহান প্রমাণিত হন। তিনি চল্লিশ বছর শাসন করেন এবং এই রাষ্ট্রকে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উন্নতির দিক থেকে চরম শিখরে পৌঁছে দেন। তিনি দীর্ঘদেহী, স্থূলকায় এবং শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। তিনি সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য উভয়েরই সংমিশ্রণ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন কুশলী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিমান, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল শাসক। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রজাদের খোঁজখবর নেওয়ার পুরনো ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

তার জ্ঞান ও সাহিত্যিক অনুরাগের কারণে জৌনপুরে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে এবং জৌনপুর ভারতের সেরা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হতে থাকে। ললিতকলার উন্নতি ঘটে এবং এখানে স্থাপত্যশৈলীর একটি অনন্য স্থানীয় ধারা জন্ম নেয়। এই দরবারে শায়খুল মাশায়েখ কাজী নাসিরুদ্দিন, কাজী নিজামুদ্দিন এবং কাজী শাহাবুদ্দিন দৌলতাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বদের একত্রে দেখা যেত।

অমুসলিমদের প্রতি সহনশীলতার প্রমাণ এখান থেকে পাওয়া যায় যে, নন্দলালকে সালতানাতের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছিল। মেহের আলী, রাসূল খান, সোহেল খান, তাতার খান, মালিক মুবারক, মালিক আলী গুজরাটি, মেহেরবান খান, মালিক কালু এবং শেখ চাঁদের মতো কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রায় সিং, ভোজ সিং, সাওয়ান্ত সিং এবং বাহন সিংকেও দেখা যেত।

ইব্রাহিম শারকির আমলে যখন উপমহাদেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তখন জৌনপুরে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী তৈরি হচ্ছিল। এই বাদশাহ শত শত হাতি এবং হাজার হাজার ঘোড়া কিনে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছিলেন। সৈন্যদের নতুন ইউনিফর্ম এবং উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত করেছিলেন এবং তাদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছিলেন। সেনাবাহিনীতে আফগান, মুঘল, তুর্কি এবং তাজিক জাতি ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে রাজপুত ছিল। তাদের সবার আলাদা আলাদা বাহিনী ছিল।

এই কারণেই সেই যুগে দিল্লি এবং জৌনপুর সালতানাতের মধ্যকার যুদ্ধে জৌনপুরের বাহিনী কখনো পরাজয়ের সম্মুখীন হয়নি। শুধু তাই নয়, ইব্রাহিম শারকি ৮০৯ হিজরি (১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে কনৌজও দখল করে নেন। তার শেষ বছরগুলোতে তিনি কাল্পি এবং গোয়ালিয়রকেও সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে জৌনপুর সালতানাত তার বিস্তৃতির শিখরে পৌঁছে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিশাল রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হতে থাকে।

---

[১] এই সংঘাতের বিবরণ তৈমুরি আক্রমণের পর অরাজক পরিস্থিতির বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে।

[২] শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৯৭ থেকে ১০০।

৮১০ হিজরিতে জৌনপুরের করদ রাজ্যের শাসক গণেশকে (যিনি 'তিরহুত'-এর রাজা ছিলেন) সীমান্তের এক কেল্লাদার মালিক আসলাম অন্যায়ভাবে হত্যা করেন। তার পুত্র রাজকুমার কীর্তি সিংহ ফরিয়াদ নিয়ে ইব্রাহিম শরকির কাছে আসেন। ইব্রাহিম শরকি তার সাহায্যের জন্য সৈন্য নিয়ে রণাঙ্গনে পৌঁছান এবং মালিক আসলামকে পরাজিত করে তিরহুতের কেল্লা পুনরায় রাজকুমারের হাতে তুলে দেন।

এই বছরই ইব্রাহিম শরকি বাংলার কিছু সীমান্তবর্তী কেল্লা দখল করেন যেখানে একজন হিন্দু রাজা শাসন করতেন। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার নাম রাখা হয় শাহাবুদ্দিন বায়াজীদ। এই ঘটনা থেকে ইব্রাহিম শরকির তাবলীগী ও দাওয়াতি জজবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইব্রাহিম শরকি তার শাসনামলে দুইবার দিল্লি আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। ফলে তিনি দিল্লির চিন্তা ছেড়ে জৌনপুরকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার দিকে মনোযোগ দেন। ৮৪৪ হিজরিতে (১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে) এই মহান ও নেকনাম বাদশাহর ইন্তেকাল হয়। [১]

মাহমুদ শাহ শরকি

(৮৪৪ হিজরি থেকে ৮৬১ হিজরি / ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

ইব্রাহিমের পর তার বড় ছেলে মাহমুদ শাহ সিংহাসনে বসেন। একদিকে মালবের খিলজি সুলতানদের সাথে তার যুদ্ধ চলতে থাকে, অন্যদিকে সেই সময় দিল্লিতে লোদি আফগানদের শাসন এক নতুন বিপদ হিসেবে সামনে আসে এবং শীঘ্রই জৌনপুর ও লোদিদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ শুরু হয় যা প্রকৃতপক্ষে নিরর্থক ছিল। এই যুদ্ধগুলোতে পাল্লা প্রায় সমান থাকত এবং কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে পুরোপুরি পরাজিত করতে পারেনি। তবে সামরিক ব্যয়ের অত্যধিক বৃদ্ধির কারণে জৌনপুর সালতানাত আগের মতো আর সমৃদ্ধ থাকল না এবং অলক্ষ্যে পতনের দিকে ধাবিত হতে লাগল।

সুলতান মাহমুদের স্ত্রী বিবি রাজির সম্পর্ক ছিল বেনারসের এক দরিদ্র সাদাত পরিবারের সাথে। এই সম্পর্ক কেবল দ্বীনি জজবার ভিত্তিতে হয়েছিল। রাজি বিবি অত্যন্ত নেককার, পরহেজগার ও বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন।

মাহমুদ শরকি তার পিতার মতো উলামা ও মাশায়েখদের খাদেম ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন এবং অসংখ্য স্মরণীয় ইমারত নির্মাণ করেন। তার স্ত্রীর পরামর্শে তিনি লাল দরওয়াজা মসজিদ ও নামাজগাহ সংলগ্ন মহল নির্মাণ করেন। এই মসজিদের সাথেই একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা ছিল এক অনন্য বিষয়। ৮৬১ হিজরিতে (১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে) মাহমুদ শাহের মৃত্যু হয়। [২]

---

[১] শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর, পৃষ্ঠা ৯৭ থেকে ১২০।

[২] শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর, পৃষ্ঠা ১৩৩ থেকে ১৩৭।

মুহাম্মদ শাহ

(৮৬১ হিজরি থেকে ৮৬২ হিজরি / ১৪৫৭ থেকে ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ)

এখন মাহমুদ শাহের পুত্র মুহাম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন স্থূলকায়, উগ্র মেজাজী এবং যোদ্ধা রাজপুত্র। এই সময়ে বাহলুল লোদীর সাথে যুদ্ধ চলছিল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ শাহের মাতা রাজি বিবি সন্ধির পরামর্শ দেন। ফলে যুদ্ধবিরতি ঘটে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে বাহলুলের শ্যালক কুতুব খান বন্দী হয়েছিলেন। বাহলুল লোদী তার স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তাকে মুক্ত করার জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন।

রাজি বিবির পূর্ণ চেষ্টা ছিল যাতে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যায়। তিনি বন্দী লোদী সরদার কুতুব খানকে খুব আরাম-আয়েশে রেখেছিলেন। সাত মাস পর যখন কুতুব খানকে মুক্তি দেওয়া হয়, তখন তিনি বিবি রাজির প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সন্ধির আলোচনা এগিয়ে নিয়ে আবারও যুদ্ধবিরতি সফল করেন।

অন্যদিকে মুহাম্মদ শাহ রাষ্ট্রীয় কাজে তার মায়ের হস্তক্ষেপে ক্রুদ্ধ ছিলেন। ফলে মা ও ছেলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই দুঃখ ও ক্রোধে মুহাম্মদ শাহ মায়ের অনুগত পুত্র অর্থাৎ তার ভাই শাহজাদা হাসানকে হত্যা করান এবং মাকে হুমকি দেন যে তিনি যেন তার বাকি ছেলেদের জন্যও ফাতেহা পাঠ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এখান থেকেই মুহাম্মদ শাহের পতন শুরু হয়। আমিররা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেন, এমনকি মাত্র পাঁচ মাস শাসন করার পর তিনি একটি বিদ্রোহে নিহত হন। [১]

হুসাইন শাহ শারকি

(৮৬২ হিজরি থেকে ৮৯৯ হিজরি / ১৪৫৮ থেকে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান হুসাইন শারকি ছিলেন শারকি সুলতানদের মধ্যে সর্বশেষ। ৮৮৩ হিজরিতে বাহলুল লোদীর সাথে তার সংঘাত শুরু হয় যা বেশ কয়েক বছর স্থায়ী ছিল। পরিশেষে বাহলুল লোদী সুলতান হুসাইনকে পরাজিত করে বিহারের দিকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। এভাবে জৌনপুর দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাহলুলের পর সিকান্দার লোদীর শাসনামলে হুসাইন শাহ পুনরায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন কিন্তু সিকান্দার তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। অবশেষে তিনি বাংলার শাসকের কাছে চলে যান এবং সেখানে আরাম-আয়েশে নির্জন জীবন অতিবাহিত করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। মোদ্দাকথা, ৮৯৯ হিজরিতে (১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে) জৌনপুরের শারকি সালতানাতের সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। [২]

এই যুদ্ধগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লোদী শাসকদের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

---

[১] শিরাজে হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ১৫২ থেকে ১৫৩

[২] শিরাজে হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ১৫৬ থেকে ১৭৭

https://t.me/BoierSomahar

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

“শিরাজ-ই-হিন্দ” জৌনপুরের ওপর এক নজর

শারকি সুলতানদের যুগে জৌনপুর ছিল পৃথিবীর এক জান্নাত সদৃশ। বিশেষ করে তৈমুরের দিল্লি আক্রমণের পর জৌনপুর উলামা, মাশায়েখ এবং জ্ঞানী-গুণীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই সুলতানদের মধ্যে ইব্রাহিম শারকি ইলম ও আদবের উচ্চ রুচি রাখতেন এবং যেখানেই কোনো প্রতিভার সন্ধান পেতেন, তাকে নিজের দরবারের শোভা বাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

শারকি সুলতানরা স্থাপত্য নির্মাণের অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন। তারা এই রাষ্ট্রকে মজবুত এবং অতুলনীয় ইমারত দিয়ে সাজিয়েছিলেন। তারা এমন সব বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেছেন যা আজও দর্শকদের বিস্মিত করে। জৌনপুরের জামে মসজিদ, মসজিদ লাল দরওয়াজা, মসজিদ খালিস মুখলিস এবং ঝাঞ্জরি মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন।

শহরের প্রতিরক্ষার জন্য নির্মিত শাহী কেল্লা এবং গোমতী নদীর ওপর শাহী পুল দেখলে প্রতিটি নির্মাণশৈলী ও কারুকার্য এক একটি মাস্টারপিস মনে হয়। শহরটি এতটাই জনবহুল ও ঘনবসতিপূর্ণ ছিল যে তার কোনো সীমা ছিল না। আস্তাবলগুলোতে লাখ লাখ ঘোড়া এবং শত শত হাতি রাখার জায়গা আলাদা ছিল। রুপার মুদ্রার এমন প্রচলন ছিল যে বাজারের দুই পাশের দোকানগুলো দিগন্ত পর্যন্ত ঝকঝক করত।

সেই যুগের হিন্দু কবি ও ঐতিহাসিক বিদ্যাপতি জৌনপুরের সৌন্দর্যের মানচিত্র এভাবে এঁকেছেন:

“জৌনপুর চোখের কাছে প্রিয়, দ্বীনের ভাণ্ডার ছিল। দেখতে সুন্দর এবং সমস্ত আরাম-আয়েশে ভরপুর ছিল। কুয়া এবং পুকুর ছিল প্রচুর। পাথরের মেঝে, ভেতরে ভেতরে পানি নিষ্কাশনের পথ, কৃষি, ফুল ও ফলে সুশোভিত আম ও জাম গাছের সারি, আকাশচুম্বী ও সুন্দর ঘরবাড়ি ছিল। পথে এমন সব গলি ছিল যেখানে বড় বড় ব্যক্তিরাও থমকে যেত... দুপুরের ভিড় দেখে মনে হতো দুনিয়ার সব পণ্য এখানেই বিক্রির জন্য চলে এসেছে। বাজারে মানুষের মাথা গিজগিজ করত... মানুষের আসা-যাওয়া দেখে মনে হতো এটি মানুষের এক সমুদ্র। দূর-দূরান্ত থেকে সওদাগররা এখানে আসত এবং চোখের পলকে সব বিক্রি হয়ে যেত। প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু না কিছু কেনাকাটা অবশ্যই করত।” [১]

এই রাষ্ট্রে জিনিসপত্রের দাম এত কম এবং কর্মচারীদের বেতন এত ভালো ছিল যে অবাক হতে হয়। এই রাষ্ট্রে রুপার সরকারি মুদ্রা প্রচলিত ছিল যাকে ‘টাকা’ বলা হতো। আজকের দিনের মূল্যের হিসেবে এর মান এক ডলারের চেয়েও কম (প্রায় অর্ধেক ডলার) ছিল। লক্ষ্য করুন যে, এত মূল্যে (অর্ধেক ডলারে) কী কী জিনিস কত পরিমাণে পাওয়া যেত:

- গম: এক মণ
- যব: পাঁচ মণ
- ছোলা: চার মণ
- ঘি: বিশ সের

[১] শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ২০ থেকে ৩০।

- ছাগলের মাংস: ৮ সের
- উন্নত মানের চাল: ৩ মণ
- জ্বালানি কাঠ: ৫০ মণ
- চিনি: ২০ সের
- গরুর মাংস: ২০ সের
- সরিষার তেল: ৩৫ সের

বেতনের হার ছিল এই যে, সাধারণত বাবুর্চির বেতন ১০ টাকা এবং স্থায়ী চাকর বা পরিচারিকার বেতন ৪০ টাকা হতো। [১]

জৌনপুরের শারকি সুলতানদের তালিকা

(৭৯৬ হিজরি থেকে ৮৯৯ হিজরি / ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ)

শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১. মালিক সারওয়ার খাজা জাহান ৭৯৬ হিজরি থেকে ৮০২ হিজরি (১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২. মুবারক শাহ ৮০২ হিজরি থেকে ৮০৪ হিজরি (১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪০২ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ববর্তী বাদশাহর পালিত পুত্র - পূর্ণ স্বাধীনতা

৩. ইব্রাহিম শাহ শারকি শামসুদ্দিন ৮০৪ হিজরি থেকে ৮৪৪ হিজরি (১৪০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ) মালিক সারওয়ারের পূর্ববর্তী বাদশাহর পালিত পুত্র - চরম উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগ

৪. মাহমুদ শাহ শারকি ৮৪৪ হিজরি থেকে ৮৬১ হিজরি (১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পতন - প্রতিবেশীদের সাথে বারবার যুদ্ধ

৫. মুহাম্মদ শাহ শারকি ৮৬১ হিজরি থেকে ৮৬৩ হিজরি (১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ)

৬. হুসাইন শাহ শারকি ৮৬৩ হিজরি থেকে ৮৯৯ হিজরি (১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ) বাহলুল লোদি এবং সিকান্দার লোদির সাথে যুদ্ধ এবং একের পর এক পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়া

---

[১] (শীরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর, পৃষ্ঠা ১৩২) দ্রষ্টব্য: এই সময়ের হিন্দুস্তানি মণ ছিল প্রায় ২৬ কিলোগ্রাম ওজনের।

সূত্র: শীরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর, লেখক: সৈয়দ ইকবাল আহমদ, প্রকাশক: শীরাজ-ই-হিন্দ পাবলিশিং হাউস জৌনপুর।

- নুজহাতুল খাওয়াতীর, হাকিম আব্দুল হাই হাসানি।
- তারিখ-ই-হিন্দুস্তান (মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি): চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৩ থেকে ৪১৪।
- তারিখ-ই-ফিরিশতা, (মুহাম্মদ কাসেম ফিরিশতা): দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯০ থেকে ৬০৩, অষ্টম প্রবন্ধ।
- তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ, আব্দুল মুনইম আন-নামির: পৃষ্ঠা ১৬২ থেকে ১৬৮।
- ইসলামি সালতানাতেন, সি. ই. বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)।
- তারিখ-ই-মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবি, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠি): তৃতীয় খণ্ড।

তারিখ উম্মাতে মুসলিমা (ষষ্ঠ খণ্ড)

(৪) মালওয়া সালতানাত

৮০৪ হিজরি থেকে ৯৩৭ হিজরি

(১৪০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

মালওয়া রাজ্য মধ্য ভারতের আগ্রা, দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাটের মাঝখানে অবস্থিত। এর দক্ষিণে নর্মদা নদী, উত্তরে চম্বল নদী, পশ্চিমে গুজরাট এবং পূর্বে বুন্দেলখণ্ড অবস্থিত। এখানে রাজপুতদের শাসন ছিল যারা ছিল অত্যন্ত যোদ্ধা। মালওয়ায় চিতোর এবং উজ্জয়িনী ছিল তাদের দুটি বড় কেন্দ্র। দিল্লির সুলতানগণ এখানে বহুবার সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। মালওয়া প্রথমবার আলাউদ্দিন খিলজি ৭০৫ হিজরিতে (১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে) জয় করেন। এরপর দীর্ঘকাল এখানাকার সুবাদারগণ দিল্লি থেকে নিযুক্ত হতেন।

মালওয়ার মালভূমি: সবুজ শ্যামলতা, প্রশান্তি এবং স্থিতিশীলতা:

মালওয়ার ভূমি কোনো সমতল অঞ্চল নয়, বরং এটি ভারতের কেন্দ্রে একটি সবুজ শ্যামল এবং উঁচু মালভূমি (Plateau)। এই অঞ্চলটি পাথুরে পাহাড়ের সারি এবং গভীর উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা একে প্রাকৃতিকভাবে একটি দুর্গে পরিণত করেছে। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং বৃষ্টির পর এই অঞ্চলটি তার সবুজের কারণে মনোরম দৃশ্য উপস্থাপন করে। মালওয়ার ভূমিতে প্রবাহিত নালা এবং নদীগুলো একে সবুজ ও সজীব রাখে।

এর রাজধানী মান্ডু এমন একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল যা চারপাশ থেকে গভীর উপত্যকা দ্বারা ঘেরা ছিল। এখানকার ভবনগুলো, যেমন জাহাজ মহল, এমন মনে হয় যেন সেগুলো পানির ওপর ভাসছে। মালওয়ার স্থাপত্যশৈলী এখানকার ঋতু দ্বারা প্রভাবিত, যেখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য বড় এবং শীতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানকার লাল এবং হলুদ পাথর...

https://t.me/BoierSomahar

...আছে, যা থেকে ভবনগুলোকে একটি উষ্ণ এবং মাটির রঙ দেয়। মালব এমন একটি সালতানাতের ধারণা পেশ করত যা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত, প্রকৃতির কাছাকাছি এবং নিজের অস্তিত্বে একটি স্থিরতা ও প্রশান্তির অধিকারী ছিল।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মালব সালতানাত, যা মধ্য ভারতে (বর্তমান মধ্যপ্রদেশ) প্রতিষ্ঠিত ছিল, দিল্লি সালতানাতের সমসাময়িক ছিল। এই সালতানাতের অস্তিত্ব ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার এক যুগের ফল। মালব সালতানাতের ভিত্তি ৮০৪ হিজরি (১৪০১ খ্রিস্টাব্দ) সালে স্থাপিত হয়েছিল এবং এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল দিল্লি সালতানাতের দুর্বলতা। ৮০১ হিজরি (১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে আমির তৈমুরের আক্রমণ দিল্লিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে মালবের সুবাদার দিলাওয়ার খান ঘুরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এভাবেই একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় যা তার দুটি শাসক রাজবংশ: ঘুরি এবং খিলজিদের আমলে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। মালব সালতানাত তার সংক্ষিপ্ত সময়ে স্থাপত্যকলা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল।

মালবের ঘুরি সুলতানগণ

তুঘলক রাজবংশের পতনের যুগে ঘুরি পরিবারের একজন আমির দিলাওয়ার খান মালবের সুবাদার ছিলেন। তৈমুরের আক্রমণের পর তিনি দিল্লির পলাতক সুলতান তুঘলক শাহ দ্বিতীয়কে নিজের কাছে আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। অবশেষে দিল্লি সালতানাতকে ক্ষমতাহীন দেখে ৮০৪ হিজরিতে তিনি মালবে নিজের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। দিলাওয়ার খান ছিলেন একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী শাসক। তিনি তুঘলক সালতানাতের দুর্বলতার সঠিক সময়ে সুযোগ গ্রহণ করেন এবং নিজের স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

দিলাওয়ার খান: ৮০৪ হিজরি থেকে ৮০৮ হিজরি (১৪০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দ)

দিলাওয়ার খান মালবের স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'ধার'-কে নিজের রাজধানী বানান, যার পর তিনি আশেপাশের এলাকাগুলোতেও নিজের ক্ষমতা সুসংহত করেন। তিনি একজন দক্ষ এবং সাহসী সামরিক কমান্ডার ছিলেন যার কারণে তিনি মালবে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে এবং তা শক্তিশালী করতে সফল হন।

কিছুকাল পর এই নবজাতক রাষ্ট্রের সাথে গুজরাট সালতানাতের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। গুজরাটের সুলতান মুজাফফর শাহ প্রথম যখন রাজ্যে আক্রমণ করেন, তখন দিলাওয়ার খান ধার দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তিনি সুলতানের সাথে সমঝোতা করে নেন এবং নিজের স্বাধীন মর্যাদা বজায় রাখেন। দিলাওয়ার খান খানদেশের শাসক নাসির খানের আমন্ত্রণে বুরহানপুর সফর করেন, যার ফলে উভয় সালতানাতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই ঘটনাগুলো তার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দেয়।

তিনি তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রচার করেন। তিনি একজন সহনশীল শাসক ছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। তার এই বৈশিষ্ট্যগুলোই তার শাসনের স্থায়িত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি গুজরাট ও খানদেশের মতো প্রতিবেশী শক্তিগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং যুদ্ধ এড়ানোর কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি সালতানাতকে সুসংহত করার দিকে বেশি মনোযোগ দেন। ৮০৮ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

হোশাং: ৮০৮ হিজরি থেকে ৮২৮ হিজরি (১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

দিলাওয়ার খানের পর তাঁর পুত্র আল্প খান ঘুরি "হোশাং" উপাধি নিয়ে শাসক হন। তিনি একজন সাহসী ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন যিনি মালবকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। তিনি "মান্ডু" (পান্ডু)-তে একটি শহর নির্মাণ করে সেটিকে রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করেন এবং একে চমৎকার দুর্গ ও অট্টালিকা দিয়ে সুশোভিত করেন। পাহাড়ে ঘেরা মালভূমির ওপর অবস্থিত এই শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় করা হয়েছিল। এর দুর্গ, প্রাসাদ ও মসজিদগুলো ছিল অত্যন্ত সুউচ্চ, মজবুত ও জাঁকজমকপূর্ণ। এই শহরটি তাঁর নামানুসারে "হোশাং আবাদ" নামে পরিচিত হয়। [১] মান্ডুর চমৎকার স্থাপত্যসমূহ হোশাং শাহের আমলেরই ফসল।

গুজরাটের শাসক জাফর খান ওরফে মুজাফফর শাহ হোশাং-এর পিতা দিলাওয়ার খানের পুরনো বন্ধু ছিলেন। হোশাং সম্পর্কে প্রচলিত ছিল যে, তিনিই তাঁর পিতাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। এই কারণে মুজাফফর শাহ মালব আক্রমণ করেন। হোশাং পিছু হটে একটি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং মুজাফফর শাহের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে হোশাংকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এক বছর পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি আরও বেশ কয়েক বছর শাসন করার পর ৮২৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ গজনি খান: ৮২৮ হিজরি থেকে ৮৩৯ হিজরি (১৪২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)

হোশাং-এর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ গজনি খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ৮৩৯ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র মাসুদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাসুদ খানের বয়স ছিল খুবই কম এবং তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনার জন্য অযোগ্য ছিলেন। এর সুযোগ নেন তাঁর উজির মাহমুদ খিলজি। তিনি দরবারে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং বিভিন্ন আমির ও সরদারদের নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। তিনি ধীরে ধীরে শাসনের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন এবং তরুণ মাসুদ খানকে কেবল নামমাত্র শাসক হিসেবে থাকতে দেন। মাসুদ খান একজন দুর্বল শাসক হওয়ায় তাঁর উজিরের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রতিহত করার কোনো চেষ্টা করেননি।

পরিস্থিতি তখন নাজুক হয়ে পড়ে যখন কিছু অনুগত আমির মাহমুদ খিলজির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। এরপর মাহমুদ খিলজি প্রকাশ্যে ক্ষমতা দখল করেন এবং মাসুদ খানকে বন্দি করে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন।

---

[১] এটি দিল্লি থেকে হায়দ্রাবাদগামী রেললাইনের ওপর অবস্থিত।

মালওয়ার খলজি সুলতানগণ

গজনী খানের পর মালওয়ার শাসনক্ষমতা তার বংশধরদের মধ্যে বেশিদিন টিকতে পারেনি এবং তার পুত্র মাসুদ খানের অল্প বয়স ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মাহমুদ খলজি একটি নতুন রাজবংশের শাসনের সূচনা করেন।

মাহমুদ খলজি: ৮৩৯ হিজরি থেকে ৮৭৩ হিজরি (১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দ)

মাহমুদ খলজি ছিলেন একজন মহান যোদ্ধা, অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক এবং বিজেতা। তিনি গুজরাট ও মেওয়ারের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সাথে অনেক যুদ্ধ করেন এবং মালওয়ার সীমানা বিস্তৃত করেন। যুদ্ধকৌশল এবং প্রশাসনিক যোগ্যতার কারণে তিনি তার সময়ের অন্যতম শক্তিশালী শাসকদের মধ্যে গণ্য হতেন। তার সময়কাল ছিল ভারতে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার। দিল্লি, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্য ছাড়াও আশেপাশের হিন্দু রাজাদের সাথে তার ক্রমাগত যুদ্ধ চলত।

একবার গুজরাটের শক্তিশালী সুলতান আহমদ শাহের সাথে তার এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়, যাতে উভয় পক্ষই সমানে সমান ছিল। এরপর গুজরাটি সেনাবাহিনীতে একটি মহামারি ছড়িয়ে পড়ে এবং আহমদ শাহকে ফিরে যেতে হয়। মাহমুদ খলজি গোয়ালিয়র দুর্গও আক্রমণ করেন এবং হিন্দুদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে তবেই ক্ষান্ত হন।

আগ্রা ও দিল্লির লোদি শাসকদের সাথে তার বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়েছিল, কখনো হার কখনো জিত। অবশেষে ৮৪৫ হিজরিতে (১৪৪১ খ্রিস্টাব্দ) স্বয়ং দিল্লির সাদাত শাসকরা সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে যুদ্ধ শেষ করেন।

৮৫৫ হিজরিতে (১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ) তিনি হিন্দু রাজা গঙ্গাদাসকে সাথে নিয়ে গুজরাটের সুলতান মুহাম্মদ শাহ বিন আহমদ শাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময়ে গুজরাটের শাহের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র কুতুব শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সংকটের মুহূর্তেও গুজরাটের সেনাবাহিনী দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করে এবং মাহমুদ খলজিকে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে হয়। ফেরার পথে হিন্দুরা তার বাহিনীকে মারাত্মকভাবে লুটতরাজ করে। মাহমুদ খলজি এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কুতুব শাহের সাথে এই বলে সন্ধি করেন যে, হিন্দুদের বিপদ সামনে রেখে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করা উচিত নয়।

এরপর দীর্ঘ সময় তিনি হিন্দুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ৮৬৬ হিজরিতে (১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ) তিনি আবারও মুসলিম রাষ্ট্র দাক্ষিণাত্যের অল্পবয়সী শাসক নিজাম শাহ বাহমানির বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এমন পরিস্থিতিতে গুজরাটের শাসক মাহমুদ শাহ দাক্ষিণাত্যকে সমর্থন করেন এবং চাপ সৃষ্টি করে খলজিকে ফিরে যেতে বাধ্য করেন।

মাহমুদ খলজি ৮৭৩ হিজরিতে (১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন। তার আমলে মালওয়া নির্মাণ ও উন্নয়নে তার শিখরে পৌঁছেছিল।

https://t.me/BoierSomahar

ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ভালো শব্দে স্মরণ করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। যদি তাঁর সেনাবাহিনীর কারণে নাগরিকদের কোনো আর্থিক ক্ষতি হতো, তবে তিনি অবশ্যই তাদের ক্ষতিপূরণ দিতেন। তাঁর শাসনামলে মালব রাজ্য চুরি ও ডাকাতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল।

গিয়াসউদ্দিন খিলজি: ৮৭৩ হিজরি থেকে ৯০৬ হিজরি (১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)

মাহমুদ খিলজির পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন খিলজি শাসক হন। তিনি তাঁর পিতার সাথে বিশ বছর যুদ্ধে কাটিয়েছিলেন, কিন্তু শাসক হওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি অধিকাংশ সময় জিকির, ইবাদত এবং আখেরাতের চিন্তায় ব্যয় করতেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। একবার তাঁর এক সঙ্গী তাঁকে খুশি করার জন্য অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ের সন্ধান করতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত এক ফকিরের মেয়েকে তাঁর পছন্দ হয়। ফলে তিনি ফকিরকে ধোঁকা দিয়ে সেই মেয়েকে দাসী হিসেবে বাদশাহর হেরেমের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফকির নিজের মেয়ের সন্ধানে রাজধানীতে পৌঁছান। তিনি দেখলেন যে শাহ গিয়াসউদ্দিনের মিছিল যাচ্ছে। ফকির বাদশাহর সওয়ারি থামিয়ে দিলেন এবং নিজের দুঃখের কথা শুনিয়ে বললেন: “হে বাদশাহ! এখন আমার সাথে ইনসাফ করুন।”

বাদশাহ তাঁর সওয়ারি থেকে নেমে পড়লেন এবং বললেন: “আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে যাব না যতক্ষণ না ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন। এমনকি এর কারণে যদি আমার ওপর হদ জারি হয় তবুও।”

অবশেষে ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিলেন যে, যদিও এভাবে মেয়েকে অপহরণ করা বৈধ ছিল না, কিন্তু যেহেতু বাদশাহ এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই তাঁর ওপর কোনো হদ জারি হতে পারে না। এদিকে মেয়ের বাবাও যখন দেখলেন যে তাঁর মেয়ে এমন এক ন্যায়পরায়ণ সুলতানের হেরেমে আছে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

একবার এক অভাবী গ্রামবাসী রাজধানীতে এলেন যাতে বাদশাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন, কিন্তু বাদশাহকে হাদিয়া দেওয়ার মতো তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। বাদশাহর এক সঙ্গী তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, এক মুষ্টি গম সাথে নিয়ে যাও এবং বলো যে আমি বাদশাহর সাথে দেখা করতে চাই তবে কেবল মসজিদেই দেখা করব।

গ্রামবাসী রাজপ্রাসাদে পৌঁছে নিজের এই দাবি পেশ করলেন। বাদশাহ তাঁর সাথে দেখা করতে মসজিদে এলেন। এবার গ্রামবাসী বলতে লাগলেন: “আপনাকে একটি হাদিয়া দিতে চাই, আপনার আঁচল পাতুন তবেই দেব।” অন্য কোনো অহংকারী বাদশাহ হলে এই কথার জন্য তাঁর শিরশ্ছেদ করে দিতেন, কিন্তু গিয়াসউদ্দিন কোনো দ্বিধা ছাড়াই আঁচল পেতে দিলেন এবং গ্রামবাসী তাতে এক মুষ্টি গম ঢেলে দিলেন। গিয়াসউদ্দিন অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বিনিময়ে তাঁকে ধন-সম্পদে মালামাল করে দিলেন।

গিয়াসউদ্দিনের শাসনামলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। কেবল একবার বাহলুল লোদি সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর সীমান্তে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু গিয়াসউদ্দিনের পাল্টা আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে বাহলুল পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। যখন গিয়াসউদ্দিন তাঁর পিছু ছাড়ছিলেন না, তখন বাহলুল উপহার পাঠিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করেন এবং সন্ধি করে ফিরে যান।

তাঁর অনেক দাসী কুরআন মাজিদের হাফেজা ছিলেন। তিনি যখনই নতুন পোশাক পরতেন, তখন প্রথমে দাসীদের দিয়ে খতম কুরআন করিয়ে পোশাকে দম করাতেন। দাসীদের বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান ও শিল্পকলা শেখানোর প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি কাউকে হাফেজা ও আলেমা বানাতেন, কাউকে...

যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়াতেন। কাউকে নিত্যনতুন খাবার তৈরির, কাউকে কারুকার্য, কাউকে চিত্রাঙ্কন এবং কাউকে পশু বশ করার কৌশল শেখাতেন। তাঁর নান্দনিক রুচি ছিল চরম পর্যায়ে। তাঁর হারেমে দশ হাজার দাসী ছিল কিন্তু তাঁর নান্দনিক রুচি পূর্ণ হতো না, তাই তিনি বলতেন: "আমার কাছে এদের কাউকেই সুন্দর মনে হয় না।"

গিয়াসউদ্দিন তাঁর সহচরদের বলতেন: "আমাকে দুনিয়ায় মগ্ন দেখলে আমাকে কাফন এনে সামনে রেখে দিও।"

ফলে সহচররা তাই করতেন এবং গিয়াসউদ্দিন জিকির ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। শেষ জীবনে তিনি বেশিরভাগ দিনরাত ইবাদতেই কাটাতেন এবং রাষ্ট্রীয় কাজের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

নাসিরুদ্দিন খলজি: ৯০৬ হিজরি থেকে ৯১৭ হিজরি (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১১ খ্রিস্টাব্দ)

গিয়াসউদ্দিনের রাজনীতি থেকে বিমুখতার কারণে তাঁর পুত্রদের মধ্যে: শুজাআত খান এবং নাসিরুদ্দিনের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। অবশেষে নাসিরুদ্দিন বিজয়ী হয়ে সিংহাসন দখল করেন এবং নিজের পিতা গিয়াসউদ্দিনকেও বন্দি করেন, কারণ তিনি শুজাআত খানকে সমর্থন করছিলেন। বন্দি অবস্থায়ই গিয়াসউদ্দিন ৯০১ হিজরিতে (১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। জনশ্রুতি আছে যে নাসিরুদ্দিন তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। এগারো বছর চার মাস শাসন করার পর নাসিরুদ্দিনও ৯১৭ হিজরিতে (১৫১১ খ্রিস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।

মাহমুদ সানি: ৯১৭ হিজরি থেকে ৯৪৩ হিজরি (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ)

তাঁর পর তাঁর পুত্র মাহমুদ সানি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাহমুদ সানি সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু রাজনীতি ও দূরদর্শিতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মেদিনী রায় নামক এক হিন্দু তাঁর ওপর পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তিনি তাঁর এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেন। এই মতভেদের কারণে রাজ্যে এমন অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় যে অন্য দুই সরদার মুহাফিজ খান এবং সাহেব খান তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান; ফলস্বরূপ মাহমুদ সানিকে সিংহাসনচ্যুত হতে হয়।

কিছুকাল পর মেদিনী রায় তাঁকে সাহায্য করেন এবং তাঁকে পুনরায় সিংহাসনে বসান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন তিনি তাঁকে পুতুল বানিয়ে নিজে মালব শাসন করছিলেন। মালবের মুসলমানরা এই পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে দিল্লি, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের মুসলিম আমিরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরা সৈন্যবাহিনী পাঠালেন কিন্তু সফল হতে পারলেন না। মেদিনী রায় এর পর সব দিক থেকে মাহমুদ সানির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। অতিষ্ঠ হয়ে মাহমুদ সানি রাজ্য থেকে পালিয়ে গুজরাট চলে যান এবং শাহ মুজাফফর হালিমের কাছে সাহায্য চান। তিনি সাহায্যের হক আদায় করেন এবং মালবের ওপর আক্রমণ করে হিন্দুদের পরাজিত করেন। এভাবে মাহমুদ সানি তৃতীয়বারের মতো সিংহাসনে বসেন।

এবার তিনি দৃঢ়তার সাথে শাসন করেন। হিন্দুরা তাঁকে সরানোর চেষ্টা করলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তাদের সাথে মোকাবিলা করেন। তাঁর সমস্ত সৈন্য মারা গেলেও তিনি পিছু হটেননি এবং জখম হয়েও ততক্ষণ পর্যন্ত লড়তে থাকেন যতক্ষণ না শরীরে লড়ার শক্তি অবশিষ্ট ছিল এবং তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান। তাঁর এই বীরত্ব দেখে হিন্দুরা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। তারা তাঁকে বন্দি করার পরিবর্তে তাঁর চিকিৎসা করায় এবং তাঁকে পুনরায় মালবের সিংহাসনে বসায়।

কিন্তু তিনি শাসনের স্বাদ উপভোগ করার খুব বেশি সুযোগ পাননি। গুজরাটে বাহাদুর শাহের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি মালব আক্রমণ করে একে গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। দ্বিতীয় মাহমুদ মুজাফফরবাদ দুর্গে অবস্থান নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বন্দি করা হয় এবং আহমেদাবাদ নিয়ে যাওয়ার পথে হত্যা করা হয়। এটি ৯৩৭ হিজরি (১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। দ্বিতীয় মাহমুদের মৃত্যুর মাধ্যমে মালবের স্বাধীন রাষ্ট্রের অবসান ঘটে। এরপর মুঘল সম্রাট আকবর ৯৬৯ হিজরি (১৫৬২ খ্রিস্টাব্দ) সালে মালব জয় করে একে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে মালবের স্বাধীন সালতানাতের সমাপ্তি ঘটে।

পতনের কারণ:

প্রথম মাহমুদ খিলজির পর তার উত্তরসূরিরা দুর্বল ছিলেন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ শুরু হয়ে যায়। এটি দরবারি ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতার লড়াইয়ের শিকারে পরিণত হয়। মালবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ এবং মেওয়ারের রানা ক্রমাগত আক্রমণ চালান। এসব আক্রমণ মালবের আর্থিক ও সামরিক শক্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এভাবে মালব সালতানাত পতনের দিকে ধাবিত হয় এবং গুজরাটের কাছে সামরিক পরাজয়ের পর তার স্বায়ত্তশাসন হারিয়ে ফেলে।

মালবের সুলতানদের কীর্তিসমূহ:

মালবের শাসকরা কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না, বরং তারা শিল্প ও জ্ঞানের বড় পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তারা মালবে স্থাপত্যশৈলীতে একটি অনন্য ও স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী ধারা প্রবর্তন করেন। এখানকার ভবনগুলোতে স্থানীয় হিন্দুস্তানি এবং ইসলামি স্থাপত্যরীতির এক চমৎকার সংমিশ্রণ দেখা যায়। মান্ডু শহরের জাহাজ মহল, হিন্দোলা মহল এবং জামে মসজিদ এই যুগের স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন। এই ভবনগুলোর সাধারণ সৌন্দর্য এবং মজবুত নির্মাণশৈলী আজও দেখার মতো।

জাহাজ মহল, যা ভারতের ঐতিহাসিক ভবনগুলোর মধ্যে এক অনন্য মর্যাদা রাখে, মালবের প্রাচীন শহর মান্ডুতে অবস্থিত। এই প্রাসাদকে 'জাহাজ মহল' বলা হয় কারণ এটি দুটি কৃত্রিম হ্রদ: মুঞ্জ তালাও এবং কাপুর তালাওয়ের মধ্যবর্তী একটি সরু ভূখণ্ডে নির্মিত হয়েছে। যখন এই হ্রদগুলোতে পানি থাকে, তখন প্রাসাদের প্রতিবিম্ব পানিতে পড়ে, যার ফলে মনে হয় যেন এটি একটি বিশাল জাহাজ যা পানিতে ভাসছে। এর গঠন ও আকৃতিও একটি জাহাজের মতো। মালবের সুলতান গিয়াসউদ্দিন খিলজি তার বিশাল হারেম হিসেবে এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই প্রাসাদটি আফগান, হিন্দুস্তানি এবং প্রাচীন ইরাকি স্থাপত্যরীতির এক চমৎকার সংমিশ্রণ। এতে সুন্দর বারান্দা, পুকুর, ফোয়ারা এবং বারোদারি (বারোটি দরজা বিশিষ্ট কক্ষ) রয়েছে। এই প্রাসাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ছিল এর আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রাসাদের ভেতরে বেশ কিছু পুকুর ও ফোয়ারা ছিল যেগুলোতে নিকটবর্তী হ্রদগুলো থেকে একটি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি আনা হতো। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচণ্ড গরমেও প্রাসাদটি শীতল থাকত।

মালবের দরবার ছিল উলামা, কবি এবং শিল্পীদের কেন্দ্র। দিল্লির রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেক দক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তি মালবে হিজরত করেন, যেখানে তারা শাসকদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এটি মালবকে জ্ঞান ও সাহিত্যের চারণভূমিতে পরিণত করে। সুলতান হোশাং-এর দরবারে মাওলানা মাসউদ একজন প্রখ্যাত কবি ও আলেম ছিলেন। তার কবিতা ফারসি ভাষার মাধুর্য,

সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতার এক চমৎকার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

সদরুদ্দিন আল-কাওয়ামি একজন ফকিহ ও আলেম ছিলেন। তিনি তাঁর আইনি দক্ষতা ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। দরবারে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল এবং তিনি মালওয়ার ইলমি মজলিসগুলোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। সৈয়দ নূরুদ্দিন মুবারক গজনভি (রহ.) একজন সুফি ও আলেম ছিলেন। তিনি গজনভি বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর ইলম ও তাকওয়ার কারণে মালওয়ার দরবারে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখা হতো। তিনি তাসাউফ ও ইসলামি উলুমের ওপর মূল্যবান কাজ করেছেন।

এই ব্যক্তিত্বগণ ছাড়াও আরও অনেক আলেম ও শিল্পী মালওয়ার সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন, যাদের কল্যাণে মান্ডু ও ধার ইলম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মালওয়ার সুলতানগণ স্থানীয় সংস্কৃতিগুলোকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং সেগুলোর সাথে সমন্বয় করে কাজ করেছিলেন, যার ফলে মালওয়ার একটি অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে উঠেছিল।

https://t.me/BoierSomahar

মালওয়ার সুলতানদের তালিকা

৮০৪ হি. থেকে ৯৩৭ হি.

(১৪০১ খ্রি. থেকে ১৫৩১ খ্রি.)

ঘোরি বংশের শাসন

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ মন্তব্য

১ দিলাওয়ার খান ঘোরি (ইমাদুল মুলক) ৮০৪ হি. থেকে ৮০৮ হি. (১৪০১ খ্রি. থেকে ১৪০৫ খ্রি.) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ আল্প খান (হুশাং ঘোরি) ৮০৮ হি. থেকে ৮২৮ হি. (১৪০৫ খ্রি. থেকে ১৪৩৫ খ্রি.) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক

৩ মুহাম্মদ গজনি খান ঘোরি ৮২৮ হি. থেকে ৮৩৯ হি. (১৪৩৫ খ্রি. থেকে ১৪৩৬ খ্রি.) শেষ শাসক

খিলজি বংশের শাসন

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ মন্তব্য

৪ মাহমুদ খিলজি ৮৩৯ হি. থেকে ৮৭৩ হি. (১৪৩৬ খ্রি. থেকে ১৪৬৯ খ্রি.) যোদ্ধা, খ্যাতিমান, জ্ঞানানুরাগী। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ: দাক্ষিণাত্য, গুজরাট এবং দিল্লির সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ। আব্বাসীয় খলিফা মুসতানজিদ-এর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

৫ গিয়াসউদ্দিন খিলজি বিন মাহমুদ খিলজি ৮৭৩ হি. থেকে ৯০৬ হি. (১৪৬৯ খ্রি. থেকে ১৫০০ খ্রি.) আরামপ্রিয়। শৌখিন মেজাজের।

৬ নাসিরুদ্দিন খিলজি বিন গিয়াস ৯০৬ হি. থেকে ৯১৬ হি. (১৫০০ খ্রি. থেকে ১৫১০ খ্রি.) পিতাকে বন্দি করে ক্ষমতা দখল করেন।

তারিখ-ই-উম্মাতে মুসলিমা

৭ মাহমুদ সানি খিলজি বিন নাসিরুদ্দিন খিলজি ৯১৬ হিজরি থেকে ৯৩৭ হিজরি (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ) দুইবার সিংহাসনচ্যুত হন। তৃতীয়বার ক্ষমতা লাভের পর বাহাদুর শাহ গুজরাটির সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং নিহত হন। পুরো শাসনকাল ছিল সংকটাপন্ন।

উৎসসমূহ:

- তারিখ হিন্দুস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভি): চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা ২৯০ থেকে ৩৬০
- তারিখ-ই-ফেরেশতা: (মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা) দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ৪৬১ থেকে ৫৪১, পঞ্চম প্রবন্ধ
- তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ: আব্দুল মুনিম আন-নামির: পৃষ্ঠা ১৬২ থেকে ১৬৮
- নুযহাতুল খাওয়াতির: হাকিম আব্দুল হাই হাসানি
- ইসলামি সালতানাতসমূহ: ক্লিফোর্ড ই. বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)
- তারিখ-ই-মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবি, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠি): তৃতীয় খণ্ড

https://t.me/BoierSomahar

(৫) গুজরাট সালতানাত

৭৯৩ হিজরি থেকে ৯৯১ হিজরি

১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ

ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত গুজরাট বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক সম্পর্কের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ছিল। সর্বপ্রথম পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদ গজনভি এখানে সোমনাথে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু এই প্রদেশটিকে ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সপ্তম হিজরি শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে আলাউদ্দিন খিলজি আনহিলওয়ারার হিন্দু শাসকদের পরাজিত করে গুজরাটকে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন।

গুজরাট: সমুদ্রের মতো বিশাল এবং উপকূলীয় আবহাওয়ার সমমনা:

মালব যদি একটি উঁচু ও স্থিতিশীল মালভূমি হতো এবং জৌনপুর একটি উর্বর সমতল অঞ্চল হতো, তবে গুজরাট সালতানাতের অস্তিত্ব সমুদ্রের বিশালতা এবং উপকূলীয় আবহাওয়ার মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই সালতানাতের মহিমা এর দীর্ঘ উপকূলীয় রেখা, গভীর সমুদ্রবন্দর এবং সামুদ্রিক পথ থেকে স্পষ্ট ছিল। গুজরাটের ভূখণ্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো এর সেই উপকূলীয় অঞ্চল যা আরব সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। এখানকার বাতাসে লবণের ঘ্রাণ মিশে ছিল এবং বালিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা সামুদ্রিক সফরের কাহিনী সমাহিত ছিল। খাম্বাত এবং সুরাটের মতো বন্দরগুলো ছিল এই সালতানাতের প্রাণকেন্দ্র, যেখান থেকে সমুদ্রগামী জাহাজগুলো পূর্ব ও পশ্চিমের দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলোর সাথে বাণিজ্য করত। এই বাণিজ্য কেবল সম্পদই আনত না, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং দক্ষতাকেও সাথে নিয়ে আসত। গুজরাটের ভূমি সর্বত্র একরকম ছিল না। একদিকে উপকূলের নিকটবর্তী উর্বর জমি ছিল, যেখানে ক্ষেত-খামার এবং শহর...

...আবাদ ছিল, অন্যদিকে উপদ্বীপ 'সৌরাষ্ট্র' এবং 'কচ্ছ'-এর শুষ্ক ও আধা-মরু অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চলটি একই সাথে সবুজ শ্যামল ও শুষ্কতার এক সংমিশ্রণ পেশ করত। এটি ছিল সেই গুজরাট যাকে জাফর খান (মুজাফফর শাহ) একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

মুজাফফর শাহ

(৭৯৩ হিজরি থেকে ৮১৩ হিজরি / ১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ)

প্রথমবারের মতো গুজরাটকে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদা জাফর খানই এনে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী, পরহেজগার, সাহসী এবং মুজাহিদ মানুষ। তিনি একটি রাজপুত পরিবারের হিন্দু ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তুঘলক যুগে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি কখনো গুজরাটে আবার কখনো দিল্লিতে থাকতেন। ৭৯৩ হিজরিতে (১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান ফিরোজ তুঘলক তাকে গুজরাট প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। সুলতান ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পর যখন দিল্লি সালতানাত দুর্বল হয়ে অরাজকতার শিকার হয়, তখন জাফর খান ৭৯৯ হিজরিতে গুজরাটের আধা-স্বাধীন শাসক হয়ে বসেন; তবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির নায়েব হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

সেই সময় তার শাসন পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী গুজরাটের একটি সংক্ষিপ্ত ভূখণ্ড পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, যার উপকূল ছিল সুরাটের বন্দর পর্যন্ত। এই অঞ্চলটি তিন দিক থেকে রাজপুত রাজা এবং ভিল জাতির অসভ্য যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তবে জাফর খান আশেপাশের এলাকায় বেশ কয়েকবার অভিযান চালান। তিনি 'ইদর' এবং 'দিউ' জয় করেন এবং 'ঝালোর'-এর ওপরও আক্রমণ করেন। এভাবে তিনি সতেরো বছর গুজরাটের সুবাদার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন।

তৈমুরি আক্রমণের পর যখন দিল্লি সালতানাত আরও দুর্বল হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তখন জাফর খান ৮১০ হিজরিতে "মুজাফফর শাহ" উপাধি গ্রহণ করে গুজরাটের বাদশাহ হিসেবে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর পর তিনি মাত্র তিন বছর বেঁচে ছিলেন। ৮১০ হিজরিতে তিনি মালবের ওপরও আক্রমণ করেন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। ৮১৩ হিজরিতে বিষক্রিয়ার কারণে তার মৃত্যু হয়। তার বংশধরদের মধ্যে প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত এই রাজত্ব চলেছিল।

আহমদ শাহ

(৮১৩ হিজরি থেকে ৮৪৫ হিজরি / ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ)

মুজাফফর শাহের পর তার নাতি আহমদ শাহ শাসক হন। তার অধিকাংশ সময় দাক্ষিণাত্য ও মালবের মুসলিম শাসকদের পাশাপাশি রাজপুতানার হিন্দু রাজাদের হাত থেকে এই নবজাতক সালতানাতকে রক্ষা করতে ব্যয় হয়। আহমদ শাহ নিজের নিষ্ঠা ও চমৎকার রাজনীতির মাধ্যমে এই সালতানাতকে সুসংহত করেন।

আহমেদাবাদ প্রতিষ্ঠা:

গুজরাটের নতুন স্বাধীন সালতানাতের জন্য একটি নতুন রাজধানীর প্রয়োজন ছিল। আহমদ শাহ আউয়াল (প্রথম) একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠার জন্য...

জন্য সেই জায়গাটি পছন্দ করলেন যা একজন হিন্দু রাজা “করণ দেব”-এর নামানুসারে “কর্ণাবতী” নামে পরিচিত ছিল। এই শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আহমদ নামের চারজন ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন: প্রথমত স্বয়ং বাদশাহ আহমদ শাহ আউয়াল। দ্বিতীয়ত শেখ আহমদ খাট্টু গঞ্জ বখশ, তৃতীয়ত মালিক আহমদ, চতুর্থত কাজী আহমদ। শেখ আহমদ খাট্টু স্বয়ং ফিতা হাতে নিয়ে শহরের সীমানা নির্ধারণ করেন। ৮ জিলকদ ৮১৩ হিজরি (১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই চারজন বিখ্যাত ব্যক্তির নামের সাথে মিল রেখে শহরের নামও আহমদাবাদ রাখা হয়।

সুলতান এখানে “ভদ্র দুর্গ” নির্মাণ করেন যা রাজপরিবারের বাসভবন এবং সামরিক ছাউনি ছিল। এর সাথেই অত্যন্ত চমৎকার জামে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন যা ৮২১ হিজরি (১৪২৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সম্পন্ন হয়। এটি স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। এর আগে গুজরাটে উলামা ও গুণীজনদের আবাসস্থল ছিল “পাটান”, কিন্তু এখন তার স্থান আহমদাবাদ দখল করে নেয়। শীঘ্রই আহমদাবাদ জ্ঞান ও গুণীজনদের আধিক্যের দিক থেকে দিল্লি, জৌনপুর এবং লাহোরের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হতে থাকে।

আহমদাবাদ জ্ঞান ও মারেফাতের কেন্দ্র হয়ে খুব দ্রুত পূর্বতন রাজধানী আনহিলওয়ারা (পাটান) থেকে অধিক জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে। মুঘলরাও একেই প্রদেশের রাজধানী হিসেবে বহাল রেখেছিল। আজও এটি গুজরাটের সবচেয়ে বড় এবং ভারতের সপ্তম বৃহত্তম শহর।

মুহাম্মদ শাহ বিন আহমদ শাহ

৮৪৫ হিজরি থেকে ৮৫৫ হিজরি (১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ)

আহমদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে মুহাম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন যোদ্ধা সৈনিকও ছিলেন। ৮৪৩ হিজরি (১৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে তিনি একজন হিন্দু শাসক রাও ইদারের রাজ্যে আক্রমণ করেন। রাজা নতি স্বীকার করে সন্ধি করেন এবং নিজের মেয়ের বিয়ে মুহাম্মদ শাহের সাথে দিয়ে দেন। এই বাদশাহকে তাঁর নম্র স্বভাব এবং দানশীলতার কারণে ‘জর বখশ’ এবং ‘করিম’ বলা হতো। তিনি দশ বছর শাসন করেন।

কুতুবুদ্দিন, আহমদ শাহ সানি

৮৫৫ হিজরি থেকে ৮৬২ হিজরি (১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)

কুতুবুদ্দিন তাঁর পিতা মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন বিজয়ী হিসেবে প্রমাণিত হন। তিনি মালওয়ার সুলতান মাহমুদ খিলজি আউয়ালকে ৮৫৫ হিজরি (১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ) সালের যুদ্ধে পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং গুজরাটের সীমানা আরও বিস্তৃত করেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হলো তিনি “কোহিস্তান আবু” জয় করে নিজের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন, যেখানে সৈন্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল।

মাহমুদ শাহ

৮৬২ হিজরি থেকে ৯১৭ হিজরি (১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দ)

কুতুবুদ্দিনের পর গুজরাটের মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে খ্যাতিমান এবং সফলতম শাসক মাহমুদ শাহ বেগড়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যিনি ৫৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁকে ‘মাহমুদ বেগড়া’ বলে স্মরণ করা হয়।

তিনি ছিলেন ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন আদর্শ শাসক। তিনি সর্বদা তাঁর প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলোর ওপর আক্রমণ এড়িয়ে চলতেন এবং নিজের মনোযোগ জিহাদের ওপর নিবদ্ধ রাখতেন। তিনি সৌরাষ্ট্র (কাঠিয়াওয়াড়) অঞ্চলে অবস্থিত জুনাগড়ের শক্তিশালী দুর্গবেষ্টিত শহরটি চার বছরের অভিযানের পর জয় করেন। তিনি এই শহরের নাম রাখেন মোস্তফাবাদ এবং দীর্ঘ সময় এখানে অবস্থান করে একে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আগের চেয়ে অধিক সুদৃঢ় ও সুন্দর করে গড়ে তোলেন। তিনি শহরের চারপাশে একটি সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করেন যা উপরকোট দুর্গ এবং পুরো শহরকে পরিবেষ্টন করে ছিল। উপরকোট দুর্গের একটি উঁচু অংশে তিনি একটি শাহী মসজিদও নির্মাণ করেন।

একইভাবে তিনি গুজরাটের পূর্বে অবস্থিত রাজপুতদের অপরাজেয় কেন্দ্র ‘চম্পানির’ জয় করেন এবং এর নাম মুহাম্মাদাবাদ রেখে একে নিজের রাজধানী বানান।

মালব ও খান্দেশের মুসলিম শাসকদের সাথেও তাঁর দ্বন্দ্ব চলছিল, কিন্তু তিনি বিরোধের ক্ষেত্রেও নীতিপরায়ণতা ও আভিজাত্যের পরিচয় দেন। যখন মালবের মাহমুদ খিলজি তাঁর প্রতিবেশী রাজ্য দাক্ষিণাত্যে সৈন্য পরিচালনা করেন, তখন সেখানকার অল্পবয়স্ক শাসক নিজাম শাহ বাহমানীর মা মাহমুদ শাহের কাছে ফরিয়াদ জানান। তিনি নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে মাহমুদ খিলজির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। মাহমুদ খিলজি এটি দেখে ফিরে যান। পরের বছর তিনি পুনরায় আক্রমণ করেন। মাহমুদ শাহ আবারও তাঁর পথ রোধ করেন এবং তাঁকে নিম্নোক্ত চিঠি লেখেন:

“এটি মানবতার পরিচায়ক নয় যে, তুমি একজন নাবালক ছেলের শাসন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে, আমি তার সালতানাত রক্ষার দায়িত্বশীল। যদি তুমি তার সীমান্তে প্রবেশ করো, তবে আমি তোমার সীমান্তে আক্রমণ করব। তোমার আশেপাশে কাফেরদের রাজ্য রয়েছে। তোমার অভিযানের জন্য সেগুলোই যথেষ্ট। জিহাদের মাধ্যমে তোমার মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।”

খিলজিদের সাথে এই তিক্ততা থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি মাহমুদ খিলজির মৃত্যুর সংবাদ পান, তখন তিনি তাঁর মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করেন। এমন পরিস্থিতিতে কেউ সুলতানকে পরামর্শ দিল যে, মাহমুদ খিলজির মৃত্যুর পর এখন তাঁর রাজ্যের ওপর আক্রমণের মোক্ষম সুযোগ। এর উত্তরে মাহমুদ শাহ বলেন: “এটি ভালো কথা নয় যে, তাঁর পরিবারের ওপর একসাথে দুটি বিপদ আসুক। একটি হলো তাঁর মৃত্যু, আর দ্বিতীয়টি হলো সীমান্ত লঙ্ঘন।”

মাহমুদ শাহ মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, বাগান তৈরি, কূপ খনন এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর আমলে গুজরাটের সমৃদ্ধির কারণে দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞানী ও দক্ষ ব্যক্তিরা দলে দলে এখানে আসছিলেন। তাঁদের কারণে শিল্প ও কারুশিল্পের এত উন্নতি হয়েছিল যে, গুজরাটের উৎপাদিত পণ্য, বিশেষ করে এখানকার কাপড় ইউরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

---

[১] ‘বেগড়া’ গুজরাটি দুটি শব্দের সমষ্টি: ‘বে’ অর্থ দুই, ‘গড়’ (গড়ো) অর্থ দুর্গ। বেগড়া শব্দের অর্থ হলো: দুই দুর্গের অধিকারী। যেহেতু এই বাদশাহ দুটি অপরাজেয় দুর্গ: জুনাগড় ও চম্পানির জয় করেছিলেন, তাই সাধারণ ভাষায় এই শব্দটি ‘বেগড়া’ হয়ে গেছে।

মাহমুদ শাহের শেষ বছরগুলোতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে সাত সমুদ্র পার থেকে আসা এক নতুন শক্তি জায়গা করে নেয়। এরা ছিল পর্তুগিজ। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কালিকট উপকূলে ভাস্কো দা গামার আগমনের পর তারা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। তারা উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করে গুজরাট ও মিশরের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটায়। তাদের আসল শক্তি ছিল তাদের নৌবহর, যার জোরে তারা ভারতের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলেও আক্রমণ শুরু করে।

মাহমুদ শাহ মালাবারের হিন্দু রাজা এবং মিশরের সুলতান কানসুহ আল-ঘুরির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধের পূর্ণ চেষ্টা করেন। মিশরের সুলতান মাহমুদ শাহের অনুরোধে আমির হোসেনের নেতৃত্বে একটি নৌবহর পাঠান, যার সাহায্যে মাহমুদ শাহ ৯১২ হিজরিতে (১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে) কালিকট নামক স্থানে পর্তুগিজদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

সম্ভব ছিল যে, এমন দুই-তিনটি পরাজয়ের পর উপমহাদেশ সম্পর্কে ইউরোপীয়দের সংকল্প চিরতরে বদলে যেত। কিন্তু পর্তুগিজরা গুজরাটের উত্তরে অবস্থিত দিউ দ্বীপের মাহমুদ শাহ বেগড়ার পক্ষ থেকে নিযুক্ত দুর্গাধিপতির সাথে গোপনে হাত মেলায়। (এক বর্ণনা অনুযায়ী এই দুর্গাধিপতি হিন্দু ছিল। দ্বিতীয় বর্ণনা হলো সে ছিল রুমি বংশোদ্ভূত)। সে ঠিক সময়ে মিশরীয় নৌবহরের রসদ বন্ধ করে দেয়। ফলে ৯১৩ হিজরির জিলকদ মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে) সংঘটিত দ্বিতীয় যুদ্ধে মিশরীয় ও গুজরাটি নৌবহর পরাজিত হয়। মিশরীয় নৌবহর ফিরে যায়। যার ফলে পর্তুগিজদের পা উপকূলে শক্ত হয়ে বসে। তারা বিজাপুরের আদিল শাহীদের কাছ থেকে 'গোয়া' ছিনিয়ে নেয়। যার পর মাহমুদ শাহকেও পর্তুগিজদের সাথে সন্ধি করতে হয়।

শেষ জীবনে মাহমুদ শাহ 'আনহিলওয়ারা' (পত্তন) যান এবং সেখানে ওলামা ও মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আউলিয়াদের মাজার জিয়ারত করেন। সেখানে তাফসির ও হাদিসের একটি মজলিসও অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি অনুদান ও সদকা-খয়রাতের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেন। মাহমুদ শাহ মৃত্যুর কিছুকাল আগে নিজের কবর খনন করান, তাতে বসে দোয়া করেন: "হে আল্লাহ! এটি আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল, একে আমার জন্য সহজ করে দিন এবং একে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন।" তারপর তিনি তা রূপা দিয়ে পূর্ণ করে সদকা করে দেন।

২ রমজান ৯১৭ হিজরি (নভেম্বর ১৫১১ খ্রিস্টাব্দ) সোমবার এই মহান বাদশাহর মৃত্যু হয়। তাঁর যুগে গুজরাট উচ্চপদস্থ আলেমদের আবাসস্থল ছিল। মিশরের ফকিহ জালালুদ্দিন বিন মুহাম্মদ আল-মালিকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কাছে আসেন, যিনি আল্লামা শামসুদ্দিন সাখাভি রহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাহমুদ শাহ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করেন এবং তাঁকে 'মালিকুল মুহাদ্দিসিন' উপাধি দেন। তিনি ৯৩৯ হিজরিতে (১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে) আহমেদাবাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর।

এই আলেমদের মধ্যে আল্লামা মাজদুদ্দিন মুহাম্মদ আল-ইজি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন, যাঁর কাছে মাহমুদ শাহ তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুজাফফর হালিম শাহের শিক্ষা ও দীক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যখন মুজাফফর হালিম শাহ বাদশাহ হলেন, তখন তিনি আল্লামাকে সালতানাতের নায়েব নিযুক্ত করেন। তিনি পনেরো বছর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যখন হুমায়ুন গুজরাট দখল করেন, তখন তিনি তাঁকে সাথে করে আগ্রায় নিয়ে যান। কিছুকাল পর তিনি আহমেদাবাদে ফিরে আসার অনুমতি পান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন ও সমাহিত হন।

এই আলেমদের মধ্যে আল্লামা আবুল কাসেম বিন আহমদ মক্কি রহমাতুল্লাহও ছিলেন, যিনি ইবনে ফাহদ উপনামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজের সাথে তাঁর পিতার স্বহস্তে লিখিত ফাতহুল বারীর একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলেন। মাহমুদ শাহ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করেন। কিছু আলেম মাহমুদ শাহের জন্য ইবনে খাল্লিকানের 'ওয়াফায়াতুল আইয়ান'-এর ফারসি অনুবাদ করেন যা 'মানজারুল ইনসান' নামে অভিহিত হয়।

সুলতানের বাগান করা এবং বৃক্ষরোপণের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সুলতান গুজরাটের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ফলদ বৃক্ষ যেমন: আম, ডালিম, ডুমুর এবং জামের বাগান তৈরি করান। তাঁর কিছু আমীর বিজাপুর এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য এলাকা থেকে ডুমুর ও বাঁশ গাছ আনিয়ে বাগান করা শুরু করেন।

মুজাফফর শাহ হালিম

৯১৭ হিজরি থেকে ৯৩২ হিজরি (১৫১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ)

মাহমুদ শাহের পুত্র ও উত্তরসূরি ছিলেন মুজাফফর শাহ দ্বিতীয়, যাঁকে তাঁর সচ্চরিত্রতা, ধৈর্য ও দয়ার কারণে "হালিম" বলা হতো। তিনি হাফেজে কুরআন এবং ফিকহ ও হাদিসে পারদর্শী ছিলেন। তিনি এমন কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে, যখনই মৃত্যুর কথা শুনতেন, কেঁদে ফেলতেন। হারামাইন শরীফাইনের বাসিন্দাদের জন্য পোশাক ও অন্যান্য উপহার পাঠাতেন। তিনি মক্কায় একটি মুসাফিরখানা, একটি মাদ্রাসা এবং পানির একটি সাবিল তৈরি করেছিলেন। গুজরাটের একটি জায়গির মক্কার জন্য ওয়াকফ ছিল। এর আয় সেখানকার ছাত্র, শিক্ষক এবং মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা হতো।

তিনি সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। অধিকাংশ সময় ওজু অবস্থায় থাকতেন, কখনো রাতে আবার কখনো দিনে ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য বের হতেন।

তাঁর খোদাভীতির এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য যে, ৯৩১ হিজরিতে (১৫২৫ খ্রিস্টাব্দ) বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মুজাফফর শাহ সালাতুল ইস্তিসকার জন্য বের হন। দোয়া করার সময় তিনি বলেন: "হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা। আমার সাধ্যের মধ্যে কিছুই নেই। যদি বৃষ্টির ফোঁটা আমার গুনাহের কারণে আটকে থাকে, তবে এই আমার কপাল তোমার কব্জায়। তুমি আমাদের সিক্ত করো হে আরহামুর রাহিমীন।" দোয়া শেষ হতে না হতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

তিনি শত্রুদের ক্ষমা করে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর রাজনীতি ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত। মালওয়ার খিলজি শাসকরা বহুবার গুজরাটের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন এবং এই সময়ে তারা নির্দ্বিধায় হিন্দুদের সাহায্য নিতেন। একবার হিন্দু ও খিলজিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। শাহ মুজাফফরকে তাঁর উপদেষ্টারা বললেন:

"এটি একটি ভালো সুযোগ যে আমরা হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মালওয়া দখল করে নিই।"

মুজাফফর এটি প্রত্যাখ্যান করে বললেন: "এটি কোনো পুরুষত্ব বা সাহসিকতা নয় যে আমরা খিলজির বিরুদ্ধে হিন্দুদের সাথে যোগ দেব। তার বিপদ ও ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে তার দেশ দখল করে নেব।"

মালওয়ার শাসক সুলতান মাহমুদ শাহ খিলজি দ্বিতীয়-এর বিরুদ্ধে হিন্দুরা আক্রমণ করলে তাঁর আহ্বানে মুজাফফর হালিম এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পৌঁছান। এই যুদ্ধে রক্তের নদী বয়ে যায় এবং শত্রুদের লাশের স্তূপ জমে যায়। মুজাফফর তলোয়ারের জোরে সেই...

কেল্লা পুনরুদ্ধার করা হলো যার ওপর হিন্দুরা দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। বিজয়ের পর যখন মাহমুদ খলজি সাথে নিয়ে কেল্লা পরিদর্শন করতে লাগলেন, তখন খলজি বললেন: "আল্লাহর শোকর, যিনি আপনার সাহসিকতার কারণে আমাকে এই দৃশ্য দেখালেন যার আকাঙ্ক্ষা আমি আমার শত্রুদের ব্যাপারে কতকাল ধরে করছিলাম। এখন দুনিয়াতে আমার আর কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা নেই। এই দেশের ওপর আপনারই অধিকার।"

মুজাফফর বললেন: "আমি আপনার রাজ্যে প্রথম কদম আল্লাহর পথে এবং দ্বিতীয় কদম আপনার সাহায্যের জন্য বাড়িয়েছিলাম। আল্লাহর শোকর যে বিজয় নসিব হয়েছে। আল্লাহ আপনার রাজ্য আপনার জন্য বরকতময় করুন।"

শাহ তার কিছু সৈন্য খলজির কাছে রেখে দিলেন এবং ওয়াদা করলেন যে তিনি সর্বদা তার রাজ্যের সাহায্য করতে থাকবেন।

বাহাদুর শাহ

৯৩২ হিজরি থেকে ৯৪৩ হিজরি (১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)

বাহাদুর শাহ এই বংশের শেষ মহান শাসক ছিলেন। এর আগে মুঘল শাসকরা কখনো গুজরাটের দিকে অগ্রসর হননি, কিন্তু বাহাদুর শাহের আমলে মুঘল সম্রাট নাসিরুদ্দিন হুমায়ুন নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিশাল এক বাহিনী নিয়ে গুজরাট আক্রমণ করেন। বাহাদুর শাহ পরাজিত হন এবং তিনি সুরাটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। হুমায়ুন রাজধানী চম্পানিরসহ পুরো গুজরাট দখল করে নেন। কিন্তু হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তনের পর বাহাদুর শাহ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শুধু গুজরাটই পুনরুদ্ধার করেননি, বরং মালবকেও নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করেন এবং তাদের ওপর বিজয় লাভ করেন।

তার আমলে পর্তুগিজরা আবারও ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করে। বাহাদুর শাহ যখন জানতে পারলেন যে পর্তুগিজ শাসক যুদ্ধজাহাজ নিয়ে দিউ দ্বীপ আক্রমণের জন্য আসছে, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তিনি যখন উপকূলে পৌঁছালেন, তখন পর্তুগিজ শাসক তাকে এই বার্তা পাঠাল যে, আমরা আপনাকে গুজরাটের শাসনভার পুনরায় ফিরে পাওয়ার মোবারকবাদ জানাতে আসছিলাম, কিন্তু এখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, তাই উপকূলে নামতে পারছি না; এমতাবস্থায় শাহ যদি নিজে এসে সাক্ষাতের সুযোগ দেন তবে তা হবে মহানুভবতা।

বাহাদুর শাহ নৌকায় চড়ে পর্তুগিজ কমান্ডারের সাথে দেখা করতে গেলেন এবং যুদ্ধজাহাজে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। যখন তিনি ফিরে আসছিলেন, তখন পর্তুগিজরা প্রতারণা করে তার নৌকায় আক্রমণ করে বসল। বাহাদুর শাহ দীর্ঘক্ষণ তার মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের নিয়ে আক্রমণকারীদের সাথে লড়াই করতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেন।

পতনের যুগ

বাহাদুর শাহের ইন্তেকালের পর গুজরাট সালতানাত পতনের শিকার হয় এবং এখানে দীর্ঘ সময় ধরে অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার যুগ চলতে থাকে। বাহাদুর শাহের কোনো সন্তান না থাকায় তার ইন্তেকালের পর সিংহাসনের দাবিদারদের এক দীর্ঘ সারি তৈরি হয়ে যায়। এই যুগে যেসব শাসক এসেছিলেন, তারা ছিলেন পুতুল মাত্র এবং প্রকৃত ক্ষমতা ছিল শক্তিশালী আমিরদের হাতে। এই সময়ে...

নিম্নোক্ত শাসকগণ এসেছিলেন:

মাহমুদ শাহ তৃতীয়: ৯৪৪ হিজরি থেকে ৯৬২ হিজরি (১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ): তিনি বাহাদুর শাহের ভাগ্নে ছিলেন যাকে শৈশবেই সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। তাঁর শাসনামলে সমস্ত ক্ষমতা আমীরদের হাতে ছিল, যারা নিজেদের ইচ্ছামতো শাসন পরিচালনা করতেন এবং সুলতানকে এক প্রকার বন্দী করে রেখেছিলেন। অবশেষে তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

আহমদ শাহ তৃতীয়: ৯৫২ হিজরি থেকে ৯৬৮ হিজরি (১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ): তাঁর শাসনামলও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের শিকার ছিল। তাঁর সময়ে আমীররা রাষ্ট্রকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন, যার ফলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

মুজাফফর শাহ তৃতীয়: ৯৬৮ হিজরি থেকে ৯৮০ হিজরি (১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দ): তিনি এই বংশের শেষ শাসক ছিলেন যার আমলে গুজরাট সালতানাত তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। এই সময়ে মুঘল সম্রাট আকবর গুজরাট আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

এই যুগের শক্তিশালী আমীরগণ: বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের জন্য আমীরদের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধে নিম্নোক্ত আমীরগণ উল্লেখযোগ্য ছিলেন:

- ইতেমাদ খান: তিনি একজন হাবশী নেতা এবং এই যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী আমীর ছিলেন। তিনি মাহমুদ শাহ তৃতীয়কে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর আমলে সালতানাত সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

- সৈয়দ মাহমুদ বুখারী: তিনি ইতেমাদ খানের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে বহু বছর ধরে ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে, যা সালতানাতের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়।

- তুঘরিল বেগ: এই শক্তিশালী আমীর ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে জোট গঠন করেন। এই আমীররা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকেন, যার ফলে সালতানাতের বিভিন্ন অংশ তাঁদের অধীনে চলে যায় এবং তাঁরা নিজেদের স্বাধীন শাসক মনে করতে শুরু করেন।

মুঘলদের দখল:

এমন পরিস্থিতিতে কিছু অভিজাত ব্যক্তি মুঘল সম্রাট আকবরকে, যিনি তখন উন্নতির শিখরে ছিলেন, গুজরাটে এসে শাসনভার গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। গুজরাটের সমৃদ্ধি এবং এর সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়া আকবরের নজরে ছিল। তাছাড়া, আমীরদের পারস্পরিক লড়াই এবং দুর্বল হতে থাকা সালতানাত একে একটি সহজ লক্ষ্যে পরিণত করেছিল। ফলে ৯৭৯ হিজরিতে (১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে) আকবর নিজেই এক বিশাল বাহিনী নিয়ে গুজরাটের দিকে অগ্রসর হন। সেই সময় আমীরগণ, বিশেষ করে ইতেমাদ খান, অনুভব করেন যে এখন তাঁরা মুঘলদের মোকাবিলা করতে পারবেন না। ইতেমাদ খান আমীরদের একটি দলের সাথে আকবরের সামনে আত্মসমর্পণ করেন এবং গুজরাট দখলে তাঁকে সাহায্য করেন। মুজাফফর শাহ তৃতীয় প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন।

অবশেষে ৯৮০ হিজরিতে (১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে) জালালুদ্দিন আকবর গুজরাট জয় করে এই বংশের শেষ শাসক মুজাফফর তৃতীয়কে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এভাবে গুজরাটের স্বাধীন সালতানাতের অবসান ঘটে।

মুজাফফর তৃতীয় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত গুজরাটের শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যান এবং কিছু ক্ষেত্রে সাময়িক সাফল্যও লাভ করেন।

...ও হয়েছিল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘলরা পুরোপুরি গুজরাটের মালিক হয়ে যায়।

গুজরাট সালতানাত: ইসলামী সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীক:

গুজরাট সালতানাত তার ভৌগোলিক গঠনের কারণে এমন একটি সালতানাত ছিল যা বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত ছিল এবং এর হৃদয় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সর্বদা চঞ্চল থাকত। বলা যেতে পারে যে, গুজরাটের মাটি এমন এক সালতানাতের জন্ম দিয়েছিল যা রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এবং ইসলামী সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

রাজধানী আহমেদাবাদের মানচিত্র এর ভূগোলের প্রতিফলন ঘটাত। এই শহরটি 'সবরমতী নদী'র তীরে অবস্থিত ছিল যা সমুদ্র থেকে আসা সমৃদ্ধিকে দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছে দিত। গুজরাটের শহরগুলোর পরিবেশ সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকত। সেখানে আলেম ও ফকিহদের প্রাচুর্য ছিল। জায়গায় জায়গায় মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কুতুবখানাগুলো বইয়ে ভরপুর ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে আসা বণিক, স্থানীয় কারিগর এবং সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনরা এখানে একে অপরের সাথে মিলিত হতেন, যার ফলে একটি প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির জন্ম হতো এবং তা ক্রমাগত উন্নতি লাভ করত।

স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে গুজরাটের সুলতানদের যুগ ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। গুজরাটের স্থাপত্যশৈলী মালওয়ার সাধারণ ইমারত এবং জৌনপুরের জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণশৈলী থেকে আলাদা। এগুলোতে জালির সূক্ষ্ম কাজ এবং পাথরের জটিল খোদাই লক্ষ্য করা যায়। এখানকার স্থাপত্যশৈলী ছিল ভারতীয় ও আরবীয় নির্মাণশৈলীর এক চমৎকার সংমিশ্রণ, যা কেবল গুজরাটের উপকূলীয় বাণিজ্যের কারণে আরবদের সাথে কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা সম্পর্কের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। একে 'ইন্দো-সারাসেনিক' বা 'ইন্দো-ইসলামিক' স্থাপত্যশৈলী বলা হয়।

গুজরাটের সুলতানরা বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ ইমারত নির্মাণের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে ঈর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। সুলতান আহমদ শাহ আউয়াল ৮২৭ হিজরি (১৪২৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আহমেদাবাদের জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। এই মসজিদটি তার অনন্য নির্মাণশৈলী, সুউচ্চ মিনার এবং সুন্দর জালির কাজের জন্য বিখ্যাত। এতে ২৬০টি স্তম্ভ রয়েছে যা সুন্দর খোদাইয়ের নমুনা পেশ করে। এই মসজিদটি গুজরাটি স্থাপত্য শিল্পের একটি মাস্টারপিস হিসেবেও গণ্য করা হয়।

একইভাবে সুলতান আহমদ শাহ আহমেদাবাদের প্রধান রাজপথে 'তিন দরজা' নামক একটি বিশাল খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার নির্মাণ করেছিলেন, যার খিলান এবং জালির কাজ সেই যুগের শিল্পীদের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

রানী সিপরির মসজিদ ও মাকবারাও স্থাপত্য শিল্পের এক বিরল নিদর্শন। এই মসজিদটি সুলতান মাহমুদ বেগাড়ার রানী সিপরির জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। এর চরম আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের কারণে একে 'আহমেদাবাদের অলঙ্কার' বলা হতো। এটি একটি ছোট মসজিদ কিন্তু এর সূক্ষ্ম খোদাই এবং সুষম গঠন একে বিশেষত্ব দান করেছে। এর সাথেই রানীর মাকবারাও অবস্থিত।

সুলতান কুতুবুদ্দিন (আহমদ শাহ সানি) স্থাপত্য নির্মাণের খুব অনুরাগী ছিলেন। তিনি একটি সুন্দর এবং অত্যন্ত বিশাল পুকুর...

নির্মাণ করেছিলেন যার মাঝখানে স্থলের ওপর একটি মনোরম বাগান ছিল যাকে নগিনা বাগ বলা হতো। তিনি আহমেদাবাদ শহরের মলিয়ারপুর নামক এলাকায় একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা মাটির নিচে অবস্থিত। এর আসল নাম মসজিদ কুতুবুদ্দিন কিন্তু সাধারণত একে কুয়া মসজিদ বলা হয়। কারণ এতে যাওয়ার পথটি সিঁড়িযুক্ত কুয়ার মতো এবং মসজিদটি ভূগর্ভস্থ কক্ষের মতো যার সাথে বাউলি (বড় কুয়া) বিদ্যমান রয়েছে যার পানি অজু ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হতো।

গুজরাটের সুলতানদের একটি নির্মাণশৈলীর কৃতিত্ব হলো সরখেজে শেখ আহমদ খাট্টু গঞ্জ বখশ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এক সুউচ্চ মাজার। ৮৩৯ হিজরি (১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে তাঁর ইন্তেকালের পর শীঘ্রই তাঁর মাকবারা (সমাধিসৌধ) নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় যা কুতুবুদ্দিন আহমদ শাহের শাসনামলে ৮৫৫ হিজরি (১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ) সালে সম্পন্ন হয়। মাজার সংলগ্ন শেখের খানকাহ এবং মসজিদও দেখার মতো। বলা হয় যে, হিন্দুস্তানে এর চেয়ে উন্নত পাথুরে স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যাবে। মোদ্দাকথা, গুজরাটের সুলতানগণ এমন সব ইমারত নির্মাণ করিয়েছিলেন যা স্থাপত্যশৈলীকে এক অনন্য পরিচিতি দান করেছে যাতে স্থানীয় কারুকার্য এবং ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর এক সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

গুজরাটের সুলতানদের তালিকা

৭৯৩ হি. থেকে ৯৯১ হি.

(১৩৯১ খ্রি. থেকে ১৫৮৩ খ্রি.)

নম্বর শাসক সময়কাল বিশেষ কথা

১ মুজাফফর শাহ (জাফর খান) ৭৯৩ হি. থেকে ৮১৩ হি. (১৩৯১ খ্রি. থেকে ১৪১০ খ্রি.) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। নেককার, দ্বীনদার।

২ আহমদ শাহ (ইবনে মুজাফফর শাহ) ৮১৩ হি. থেকে ৮৪৫ হি. (১৪১০ খ্রি. থেকে ১৪৪২ খ্রি.) আহমেদাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। জ্ঞানানুরাগী এবং ন্যায়পরায়ণ।

৩ মুহাম্মদ শাহ (ইবনে আহমদ শাহ) ৮৪৫ হি. থেকে ৮৫৫ হি. (১৪৪২ খ্রি. থেকে ১৪৫১ খ্রি.)

৪ কুতুবুদ্দিন আহমদ শাহ সানি (ইবনে মুহাম্মদ শাহ) ৮৫৫ হি. থেকে ৮৬২ হি. (১৪৫১ খ্রি. থেকে ১৪৫৮ খ্রি.)

৫ দাউদ বিন আহমদ শাহ সানি ৮৬২ হি. (১৪৫৮ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত সময়।

৬ মাহমুদ শাহ বেগড়া ৮৬২ হি. থেকে ৯১১ হি. (১৪৫৮ খ্রি. থেকে ১৫১১ খ্রি.) পঞ্চান্ন বছরের শাসনকাল, গুজরাটের স্বর্ণযুগ। সালতানাতের বিস্তার, নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ। পর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদের আগমন - পর্তুগিজদের সাথে যুদ্ধ।

৭ মুজাফফর হালিম বিন মাহমুদ শাহ ৯১১ হি. থেকে ৯৩২ হি. (১৫১১ খ্রি. থেকে ১৫২৬ খ্রি.) অত্যন্ত নেককার, মুত্তাকি, ন্যায়পরায়ণ, মুজাহিদ ও গাজী। হাফেজে কুরআন, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের পণ্ডিত।

৮ বাহাদুর শাহ বিন মুজাফফর হালিম ৯৩২ হি. থেকে ৯৪৩ হি. (১৫২৬ খ্রি. থেকে ১৫৩৭ খ্রি.) বাবর ও হুমায়ুনের সমসাময়িক। বিজ্ঞ পণ্ডিত। সালতানাতকে বিস্তৃত করেন। গুজরাটে হুমায়ুনের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে জিহাদে শহীদ হন।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

৯ মাহমুদ সওম ৯৪৩ হি. থেকে ৯৬১ হি. (১৫৩৭ থেকে ১৫৫৪ খ্রি.) মুঘল সালতানাতের করদরাজ্য

১০ আহমদ সওম ৯৬১ হি. থেকে ৯৬৮ হি. (১৫৫৪ থেকে ১৫৬১ খ্রি.) মুঘল সালতানাতের করদরাজ্য

১১ মুজাফফর সওম ৯৬৮ হি. থেকে ৯৮০ হি. (১৫৬১ থেকে ১৫৭৩ খ্রি.) মুঘল সালতানাতের করদরাজ্য

মুঘল হুকুমত ৯৮০ হি. থেকে ৯৯১ হি. (১৫৭৩ থেকে ১৫৮৩ খ্রি.)

মাখায:

- তারীখে হিন্দুস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী): চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা ১৩৫ থেকে ২৯০
- তারীখে ফেরেশতা, বোম্বাই: (মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা) দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ৩৫০ থেকে ৪৬০, চতুর্থ প্রবন্ধ
- তারীখে গুজরাট, শাহ আবু তুরাব ওয়ালী থেকে, অনুবাদ: শবিহ আহমদ, প্রকাশক: হিন্দুস্তানি পাবলিশার্স, এলাহাবাদ
- তারীখে মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবি, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠি): তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৫ থেকে ৭২৮
- তারীখুল ইসলাম ফিল হিন্দ: আব্দুল মুনইম আন-নামির: পৃষ্ঠা ১৫১ থেকে ১৬১
- নুযহাতুল খাওয়াতির: হাকিম আব্দুল হাই হাসানি
- ফুকাহায়ে গুজরাট আওর উনকি দ্বীনি খিদমাত, আব্দুল কাইয়ুম রাজকোটী থেকে
- ইসলামি সালতানাতেঁ, ক্লিফোর্ড এডমন্ড বোসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)
- শেখ আহমদ খাট্টু, প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম থেকে, ইতিহাস বিভাগ, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর

(৬) রিয়াসত-ই-খন্দেশ - বুরহানপুর

খন্দেশের ফারুকীদের সালতানাত

৭৭২ হিজরি থেকে ১০০৮ হিজরি

(১৩৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ)

খন্দেশ রাজ্য মালওয়া, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। একটি ঘন জঙ্গল একে গুজরাটের সীমান্ত থেকে পৃথক করত। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মালিক আহমদ রাজা, যার পিতা খাজা জাহান সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমলের আমিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই পরিবার হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর বংশধর হওয়ার দাবি করত এবং এই কারণে ফারুকী নামে পরিচিত ছিল। [১]

এই রাজ্যটি তাপ্তি নদীর উর্বর উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা বর্তমান উত্তর মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এর ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল এই যে, এটি দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাটের প্রবেশপথে অবস্থিত ছিল, যার ফলে একদিকে এটি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল এবং অন্যদিকে শক্তিশালী সালতানাতগুলোর মাঝে আটকা পড়ে একটি কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং এই কারণে এটি খুব বেশি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হতে পারেনি।

---

[১] গবেষকদের মতে এই বংশপরিচয় সঠিক নয়, কারণ এতে বলা হয়েছে যে এই পরিবার হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর পুত্র মুহাম্মদের বংশধর ছিল, অথচ তাঁর এই নামের কোনো পুত্র পরিচিত নয়। সুতরাং প্রবল ধারণা এই যে, এই বংশপরিচয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছিল কারণ খন্দেশ রাজ্যের সাথে দাক্ষিণাত্যের বাহমানী শিয়া শাসকদের যুদ্ধ চলত, তাই এই বংশপরিচয়ের মাধ্যমে দিল্লি, গুজরাট এবং মালওয়ার আহলে সুন্নাতদের সহানুভূতি অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল যাতে শক্তি বৃদ্ধি পায়। শাসকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জাল বংশলতিকা তৈরি করা একটি সাধারণ রীতি ছিল। এতে শিয়া, সুন্নি, মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই জড়িত ছিল।

https://t.me/BoierSomahar

মালিক রাজা

৭৭২ হি. থেকে ৮০১ হি. (১৩৭০ খ্রি. থেকে ১৩৭৯ খ্রি.)

মুহাম্মদ তুঘলকের পর ভাগ্যের বিড়ম্বনায় এই পরিবারটি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং খাজা জাহান ফারুকীর পুত্র মালিক আহমদ রাজা যাযাবর হয়ে যান। অনেক কষ্টে জঙ্গলে সরকারি ঘোড়া দেখাশোনার কাজ পান।

একদিন সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (৭৫২ হি. থেকে ৭৯০ হি.) শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে জঙ্গলের অনেক গভীরে চলে যান। তিনি ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে একটি গাছের নিচে বসেছিলেন, তখন মালিক রাজা তাকে দেখতে পান এবং বিনীতভাবে উপস্থিত হয়ে খাবার পরিবেশন করেন। বাদশাহ তার শিষ্টাচার ও সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দাক্ষিণাত্যের সীমান্তবর্তী জেলা খান্দেশের আমির বানিয়ে দেন এবং দুই হাজার সৈন্য তার অধীনে ন্যস্ত করেন। এটি ৭৭২ হিজরি (১৩৭১ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা।

মালিক রাজা খান্দেশের সুবাদার থাকাকালীন মালবের শাসক দিলাওয়ার খানের (৮০৪ হি. থেকে ৮০৮ হি.) সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাদের বন্ধুত্ব এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, মালিক রাজা তার পুত্র নাসির খানের বিয়ে দিলাওয়ারের কন্যার সাথে দেন এবং দিলাওয়ারের উত্তরাধিকারী হোশাং-এর বিয়ে মালিক রাজার কন্যার সাথে সম্পন্ন হয়।

মালিক রাজা তার প্রদেশের উন্নয়ন ও কৃষিকাজের প্রসারে যথেষ্ট মনোযোগ দেন। ২৯ বছর শাসন করার পর তিনি ৮০১ হিজরির শাবান মাসে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি উলামা ও সুফিদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি শায়খুল ইসলাম জয়নুদ্দীন দৌলতাবাদীর মুরিদ ছিলেন এবং তার কাছ থেকে খিলাফতের খিরকাও লাভ করেছিলেন। তার উত্তরসূরিদের মধ্যে এই খিরকা বংশপরম্পরায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

নাসির খান

৮০১ হি. থেকে ৮৪১ হি. (১৩৯৯ খ্রি. থেকে ১৪৩৭ খ্রি.)

মালিক রাজার পর তার পুত্র নাসির খান স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি গুজরাটের রাজপরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দিল্লির সুলতানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আসিরগড়ের অপরাজেয় দুর্গটি জয় করেন, যা একটি সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল। নাসির খানও উলামা ও মাশায়েখদের কদর করতেন। তিনি শায়খ জয়নুদ্দীন দৌলতাবাদীর নামে ‘জয়নপুর’ নামক একটি শহর আবাদ করেন। একইভাবে শায়খ বুরহানুদ্দীনের নামে তাপ্তি নদীর তীরে একটি নতুন শহর ‘বুরহানপুর’ গড়ে তোলেন এবং সেটিকে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেন। এই উভয় শহর খুব দ্রুতই অত্যন্ত জনবহুল হয়ে ওঠে।

নাসির খান চল্লিশ বছর ছয় মাস শাসন করেন। এই সময়ে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের বাহমানি শাহীদের সাথে রেষারেষি চলতে থাকে। পরিশেষে দাক্ষিণাত্যের সাথে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তাকে ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়। এই পরাজয়ের শোকে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং ৮৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন।

https://t.me/BoierSomahar

মীরাঁ আদিল খান আউয়াল

৮৪১ হিজরি থেকে ৮৪৫ হিজরি (১৪৩৭ থেকে ১৪৪১ খ্রিস্টাব্দ)

নাসির খানের পুত্র মীরাঁ আদিল তার স্থলাভিষিক্ত হন। গুজরাট সরকারের সাথে তার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। তিনি মাত্র তিন বছর শাসন করেন এবং শেষ পর্যন্ত এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হন।

মীরাঁ মুবারক খান আউয়াল

৮৪৫ হিজরি থেকে ৮৬১ হিজরি (১৪৪১ থেকে ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

এরপর মীরাঁ আদিলের পুত্র মুবারক খান খানদেশের শাসক হন। সামগ্রিকভাবে তিনি সতেরো বছর ছয় মাস শাসন করেন। তার শাসনামলের ঘটনাবলী অস্পষ্ট। বাহ্যত মনে হয় যে, এই সময়কালটি শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অতিবাহিত হয়েছে।

মীরাঁ আদিল খান সানি

৮৬১ হিজরি থেকে ৯০৯ হিজরি (১৪৫৭ থেকে ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ)

আদিল খান ফারুকী এই বংশের সবচেয়ে সফল ও মহান বাদশাহ ছিলেন। তিনি গোন্দওয়ারা ও গড়মন্ডলের রাজাদের পরাজিত করেন এবং তাদের কর দিতে বাধ্য করেন। তিনি আসির দুর্গের তুলনায় অধিক উচ্চতায় আসিরগড়ে একটি নতুন দুর্গ এবং 'মালিগড়' দুর্গ নির্মাণ করেন। তাপ্তি নদীর তীরে একটি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করে তিনি সেখানে চমৎকার সব অট্টালিকা তৈরি করেন এবং এরপর অধিকাংশ সময় সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। কিছু সময়ের জন্য গুজরাটের সুলতানদের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে, যার ফলে ৮৯৪ হিজরিতে গুজরাটি সেনাবাহিনী খানদেশ রাজ্য আক্রমণও করে। তবে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়।

বুরহানপুর থেকে এক মাইল দূরে একটি প্রশস্ত, সবুজ ও মনোরম ময়দান ছিল যাকে 'দৌলত ময়দান' বলা হতো। সেখানে খানদেশ বংশের সুলতানরা তীরন্দাজি করতেন। আদিল খান ৪৬ বছর ৮ মাস শাসন করার পর মৃত্যুবরণ করেন এবং এই ময়দানেই তাকে দাফন করা হয়।

দাউদ খান বিন মুবারক খান

৯০৯ হিজরি থেকে ৯১৬ হিজরি (১৫০৩ থেকে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ)

আদিল খানের পর তার ভাই দাউদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯০৯ হিজরিতে দাক্ষিণাত্যের নিজাম শাহীদের সাথে তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যার ফলে দাউদ খান মালবের সুলতান নাসিরুদ্দিন খিলজির সাহায্য নিতে বাধ্য হন। এভাবে দাউদ খান নিজের রাজ্য রক্ষা করেন কিন্তু এর বিনিময়ে খানদেশ রাজ্যে নাসিরুদ্দিন খিলজির নামে খুতবা পাঠ করতে বাধ্য হন।

দাউদ খান আট বছর দশ মাস শাসন করেন এবং ৯১৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আদিল খান তৃতীয়

৯১৬ হিজরি থেকে ৯২৬ হিজরি (১৫১০ খ্রি. থেকে ১৫২০ খ্রি.)

দাউদ খানের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, তাই আহমদনগরের শাসক নিজাম শাহ বাহরি এবং বেরারের শাসক ই'তিমাদুল মুলক এখানে নিজেদের পছন্দের শাসক আনার জন্য যোগসাজশ শুরু করেন। তবে গুজরাটের বাদশাহ মাহমুদ শাহ শাহজাদা আদিল খান বিন নাসির খানকে শাসনের জন্য মনোনীত করেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর ভাগ্নে। ফলে দাক্ষিণাত্য ও বেরারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং আদিল খান তৃতীয় সিংহাসনে বসতে সক্ষম হন। তিনি ১৯ বছর শাসন করেন এবং ১৬ রমজান ৯২৬ হিজরিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

মীরান মুহাম্মদ শাহ

৯২৬ হিজরি থেকে ৯৪৪ হিজরি (১৫২০ খ্রি. থেকে ১৫৩৫ খ্রি.)

আদিল খান তৃতীয়ের পর তাঁর পুত্র মীরান মুহাম্মদ ফারুকী, যিনি গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহের ভাগ্নে ছিলেন, সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহাদুর শাহের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল দৃষ্টান্তমূলক। ৯৩৭ হিজরিতে বাহাদুর শাহ যখন মালব জয় করতে বের হন, তখন মীরান মুহাম্মদও তাঁর সাথে ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও শান্তিকামী শাসক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহুবার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে রক্তক্ষয় হতে হতে থেমে গিয়েছিল। নিজাম শাহী এবং গুজরাটের সুলতানদের মধ্যে পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল। মীরান মুহাম্মদ শাহের প্রচেষ্টায় বুরহান নিজাম শাহ এবং বাহাদুর শাহ গুজরাটির মধ্যে শত্রুতা শেষ হয় এবং এই অঞ্চলে দীর্ঘ বছর যাবত শান্তি ও স্বস্তি বজায় থাকে।

হুমায়ুনের প্রচণ্ড আক্রমণের কারণে বাহাদুর শাহ গুজরাটিকে গুজরাট থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এরপর খানদেশও হুমায়ুনের আক্রমণের মুখে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ শের শাহ সুরির আক্রমণ হুমায়ুনকে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

সুযোগ পেয়ে বাহাদুর শাহ গুজরাট পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন এবং মীরান মুহাম্মদও মালব থেকে মুঘল কর্মকর্তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। এভাবে গুজরাট পুনরায় স্বাধীন হয় এবং বাহাদুর শাহের শাসন নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছুকাল পর বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে জিহাদে শহীদ হন। যেহেতু তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, তাই তাঁর উত্তরাধিকারীরা মীরান মুহাম্মদকে গুজরাটের বাদশাহ নির্বাচিত করেন এবং রাজমুকুট তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। এখন থেকে তাঁর নামের সাথে 'শাহ' যুক্ত হতে থাকে। ফারুকীদের মধ্যে তিনিই প্রথম শাসক যিনি এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

তবে মীরান মুহাম্মদের গুজরাটের সিংহাসনে বসা ভাগ্যে জোটেনি। তিনি রাজ্যাভিষেকের পর গুজরাট যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩ জিলকদ ৯৪৪ হিজরিতে প্রকৃত স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে যান।

মীরাঁ মুবারক শাহ দ্বিতীয়

৯৪৪ হি. থেকে ৯৭৪ হি. (১৫৩৫ খ্রি. থেকে ১৫৬৬ খ্রি.)

মীরাঁ মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্ররা অল্পবয়স্ক ছিল, তাই তাঁর ভাই মীরাঁ মুবারককে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি চেয়েছিলেন গুজরাটের লোকেরাও তাঁর বাদশাহি মেনে নিক, কিন্তু গুজরাটবাসী এর জন্য প্রস্তুত ছিল না।

কিছুকাল আগে বাহাদুর শাহ গুজরাটি তাঁর ভাতিজা শাহজাদা মাহমুদকে মীরাঁ মুহাম্মদ শাহের কারাগারে রেখেছিলেন। গুজরাটবাসীর চাপ এবং যুদ্ধের হুমকির মুখে মীরাঁ মুবারক অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে মুক্তি দেন এবং তিনি মুজাফফর শাহ তৃতীয় উপাধি নিয়ে গুজরাটের বাদশাহ হন।

মীরাঁ মুবারক এরপরও গুজরাটের বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত হননি, যার ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং মীরাঁ মুবারক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরবর্তীতে উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি হয়।

মীরাঁ মুবারক ৩২ বছর শাসন করার পর ৯৭৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

মীরাঁ মুহাম্মদ দ্বিতীয় বিন মুবারক

৯৭৪ হি. থেকে ৯৮৪ হি. (১৫৬৬ খ্রি. থেকে ১৫৭৬ খ্রি.)

মুবারকের পর তাঁর পুত্র মীরাঁ মুহাম্মদ সানি বাদশাহ হন। সেই সময়ে গুজরাটের উজির ছিলেন চেঙ্গিস খান নামক এক যোদ্ধা সরদার। তিনি খানদেশ প্রদেশ জয় করার জন্য আক্রমণ করেন। মীরাঁ মুহাম্মদ সানি বেরারের অধিপতি তুফাল খানকে নিজের সাহায্যের জন্য ডেকে চেঙ্গিস খানের আক্রমণ প্রতিহত করেন। [১]

পরাজয়ের পর চেঙ্গিস খানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, অন্যদিকে গুজরাটের বাদশাহ মুজাফফর শাহকে গুজরাটবাসী এই সন্দেহে অপছন্দ করত যে তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজপরিবারের সদস্য নন। ফলে গুজরাটের অনেক আমির মীরাঁ মুহাম্মদ সানিকে গুজরাট আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। মীরাঁ মুহাম্মদ সানি আগে থেকেই গুজরাট জয়ের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ফলে তিনি আক্রমণ চালিয়ে গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে যান, কিন্তু এখানে চেঙ্গিস খান সাত-আট হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

৯৮৪ হিজরিতে মীরাঁ মুহাম্মদ সানি অসুস্থ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

হাসান খান ফারুকী

মীরাঁ মুহাম্মদ সানির পর তাঁর নাবালক পুত্র হাসান খান ফারুকী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁকে শীঘ্রই ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

---

[১] মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেই সময়ে আহমদনগরের সেনাপতির নামও ছিল চেঙ্গিস খান। এই দুই চেঙ্গিস খান সমসাময়িক ছিলেন। সাধারণত ইতিহাসের ছাত্ররা তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

রাজা আলী খান বিন মুবারক

৯৮৪ হিজরি থেকে ১০০৫ হিজরি (১৫৭৬ খ্রি. থেকে ১৫৯৬ খ্রি.)

হাসান খান ফারুকীর অল্পবয়সের কারণে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা অচল ছিল, তাই তার চাচা রাজা আলী খান বিন মুবারক এগিয়ে আসেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। শরিয়তে হারাম বিষয়গুলো থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতেন। অধিকাংশ সময় হানাফি উলামা ও ফুকাহাদের সাহচর্যে থাকতেন। তিনি হাসান খানকে অপসারিত করে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মুঘল সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন। আকবরের করদরাজ্য হওয়ার কারণে তিনি নিজের নামের সাথে 'শাহ' উপাধি ব্যবহার করেননি।

১০০৪ হিজরিতে আকবরের নির্দেশে শাহজাদা মুরাদ এবং আব্দুর রহিম খান-ই-খানান দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য আসলে রাজা আলী খান তাদের সাহায্যের জন্য রওনা হন। যুদ্ধের সময় দাক্ষিণাত্যবাসীদের অগ্নিসংযোগের কারণে রাজা আলী খান দগ্ধ হন এবং সেই জখমের কারণেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ২১ বছর শাসন করেন। তার মৃত্যুর বছর ছিল ১০০৫ হিজরি।

বাহাদুর খান বিন রাজা আলী খান

১০০৫ হিজরি থেকে ১০০৮ হিজরি (১৫৯৬ খ্রি. থেকে ১৫৯৯ খ্রি.)

রাজা আলী খানের মৃত্যুর পর আকবর এবং আব্দুর রহিম খান-ই-খানান পরামর্শ করে তার পুত্র বাহাদুর খানকে খানদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু এই যুবক ছিলেন অনভিজ্ঞ। তিনি দিনরাত নাচ-গান এবং মদ্যপানে মগ্ন থাকতেন।

আকবর ৯৭৯ হিজরিতে (১৫৬২ খ্রি.) বুরহানপুর আক্রমণ করে তা জয় করেছিলেন, তবে আসিরগড় দুর্গ পদানত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে চার দশক পর ১০০৮ হিজরিতে (১৫৯৯ খ্রি.) ছয় মাসের অবরোধের পর এই দুর্গ বিজিত হয়, যার ফলে খানদেশ প্রদেশটি পুরোপুরি মুঘলদের দখলে চলে আসে।

খানদেশ রাজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য:

খানদেশ রাজ্যটি ছোট হলেও সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের একমাত্র পথ হিসেবে একে বিবেচনা করা হতো এবং একে 'বাব-ই-দাকান' (দাক্ষিণাত্যের প্রবেশদ্বার) বলা হতো।

শুরুতে এই রাজ্যের কেন্দ্র ছিল 'থালনার', যা মালিক রাজা খান ৭৭২ হিজরিতে (১৩৭০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি তাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। 'থালনার' ছাড়াও 'ধুলিয়া' এবং 'জলগাঁও' ছিল এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর। [১]

---

[১] 'থালনার' যখন রাজধানী থাকল না, তখন এর মর্যাদা আগের মতো রইল না। পরবর্তীতে এই শহরটি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। বলা হয় যে, এর কারণ ছিল বন্যার স্রোত। এরপর 'থালনার' একটি গ্রামের রূপে অবশিষ্ট থাকে, যার কাছে প্রাচীন দুর্গ ও শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে এই স্থানটি বুরহানপুর থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এর সবচেয়ে বড় শহর ছিল বুরহানপুর, যার ভিত্তি ৮০২ হিজরি (১৩৯৯ খ্রি.) সালে এই বংশের শাসক নাসির খান স্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এই শহরটিই এই রাজ্যের রাজধানী হিসেবে নির্ধারিত হয়। বুরহানপুরের জামে মসজিদ, বিবি কি মসজিদ এবং শাহী কেল্লার ধ্বংসাবশেষ এখানকার উচ্চমানের স্থাপত্যশৈলীর প্রমাণ। এই শহরটি বাণিজ্য ও বস্ত্রশিল্পের একটি বড় কেন্দ্র ছিল।

খানদেশ রাজ্যের আসিরগড় দুর্গ দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিশালী দুর্গগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। এটি বুরহানপুর থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে 'সাতপুরা' পর্বতমালায় অবস্থিত ছিল। এর ভিত্তি কোনো এক অজ্ঞাত রাজা স্থাপন করেছিলেন। তবে একে শক্তিশালী ও প্রশস্ত করে একটি দুর্দান্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহে পরিণত করার কাজ ফারুকী শাসকরা করেছিলেন। এই দুর্গটি দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিশালী দুর্গগুলোর মধ্যে একটি ছিল এবং এটি জয় করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা হতো।

বুরহানপুরের সুলতানগণ সুফিয়া-এ কেরামদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রাজ্যের নাম বুরহানপুরও একজন সুফি বুজুর্গের নামে রাখা হয়েছিল। এই যুগে বুরহানপুর স্থাপত্যশৈলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার সুলতানগণ সুন্দর সুন্দর মসজিদ, প্রাসাদ এবং জনহিতকর ভবন নির্মাণ করিয়েছিলেন, যার অনেকগুলো আজও বিদ্যমান। ভৌগোলিকভাবে খানদেশ উত্তর ভারতকে দক্ষিণ ভারতের সাথে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথে অবস্থিত ছিল। এটি রাজ্যটিকে একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল এবং এই অঞ্চলে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য সাধারণ হয়ে উঠেছিল।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

খানদেশ রাজ্যের শাসকদের তালিকা

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ তথ্য

১ মালিক রাজা ৭৭২ হি. হতে ৮০১ হি. (১৩৭০ খ্রি. হতে ১৩৯৯ খ্রি.) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ নাসির খান ৮০১ হি. হতে ৮৪১ হি. (১৩৯৯ খ্রি. হতে ১৪৩৭ খ্রি.) সালতানাতকে সুসংহত করেছেন - শক্তিশালী শাসক

৩ মীরান আদিল খান আউয়াল ৮৪১ হি. হতে ৮৪৪ হি. (১৪৩৭ খ্রি. হতে ১৪৪১ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত শাসনকাল

৪ মীরান মুবারক খান আউয়াল ৮৪৪ হি. হতে ৮৬১ হি. (১৪৪১ খ্রি. হতে ১৪৫৭ খ্রি.)

৫ আদিল খান দুয়াম ৮৬১ হি. হতে ৯০৯ হি. (১৪৫৭ খ্রি. হতে ১৫০৩ খ্রি.) সালতানাতের সবচেয়ে যোগ্য শাসক

৬ দাউদ খান ৯০৯ হি. হতে ৯১২ হি. (১৫০৩ খ্রি. হতে ১৫১০ খ্রি.) নিজাম শাহীদের সাথে সংঘাত

৭ আদিল খান সুয়াম ৯১২ হি. হতে ৯২৬ হি. (১৫১০ খ্রি. হতে ১৫২০ খ্রি.)

৮ মীরান মুহাম্মদ শাহ আউয়াল ৯২৬ হি. হতে ৯৪২ হি. (১৫২০ খ্রি. হতে ১৫৩৫ খ্রি.) ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ শাসক

৯ মীরান মুবারক দুয়াম ৯৪২ হি. হতে ৯৭৪ হি. (১৫৩৫ খ্রি. হতে ১৫৬৬ খ্রি.) গুজরাটের সাথে যুদ্ধে পরাজয় ও সন্ধি

https://t.me/BoierSomahar

১০ | মীরান মুহাম্মদ দ্বিতীয় | ৯৭৪হি. থেকে ৯৮৪হি. (১৫৬৬ থেকে ১৫৭৬খ্রি.) | গুজরাটে আক্রমণ এবং পরাজয়

১১ | রাজা আলী খান | ৯৮৪হি. থেকে ১০০৫হি. (১৫৭৬ থেকে ১৫৯৬খ্রি.) | মুঘল সম্রাট আকবরের করদ রাজ্যে পরিণত হন

১২ | বাহাদুর খান | ১০০৫হি. থেকে ১০০৯হি. (১৫৯৬ থেকে ১৫৯৯খ্রি.) | বিলাসপ্রিয় এবং অযোগ্য শাসক - রাজ্যের পতন

সূত্র:

- তারিখ-ই-হিন্দুস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী): চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা ৩৬ থেকে ৪০৩
- তারিখ-ই-ফেরেশতা, বোম্বাই: (মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা) দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ৫৪১ থেকে ৫৬৮, ষষ্ঠ প্রবন্ধ
- নুযহাতুল খাওয়াতির: হাকিম আব্দুল হাই হাসানী
- ইসলামী সালতানাতেঁ: ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)
- তারিখ-ই-মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবী, কাজী জয়নুল আবেদীন সাজ্জাদ মিরাঠী): তৃতীয় খণ্ড

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

(৭) সালতানাতে বাহমানিয়া - দাক্ষিণাত্য

৭৪৮ হিজরি থেকে ৯৩৪ হিজরি

(১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ)

দাক্ষিণাত্য ভারতের একটি দক্ষিণ রাজ্য যার বিজয়ের সূচনা সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির আমলে হয়েছিল। তিনি তাঁর দক্ষিণ অভিযানের সময় দাক্ষিণাত্যের কিছু এলাকা জয় করেছিলেন। ৬৯৩ হিজরি (১২৯৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি দেবগিরি ও এলচপুরকে একত্রিত করে কোহিস্তান (সাতপুরা)-এর দক্ষিণে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করেন।

দাক্ষিণাত্যের শিলা: কঠোরতা, বৈচিত্র্য এবং গাম্ভীর্য:
দাক্ষিণাত্য অঞ্চলটি একটি বিশাল এবং শুষ্ক মালভূমি যা গুজরাটের নিচ থেকে দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার ভূমি অসমতল ও পাথুরে এবং এতে লাভা দ্বারা গঠিত কালো মাটির প্রাচুর্য রয়েছে। এই অঞ্চলটি তার শুষ্ক ও চরম আবহাওয়ার জন্য পরিচিত, তবে এখানকার পাথর ও শিলাগুলোতে খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার লুকায়িত ছিল। এখানকার বড় নদী 'কৃষ্ণা' এবং 'গোদাবরী' তাদের প্রবাহের মাধ্যমে স্থানে স্থানে গভীর উপত্যকা তৈরি করে ভূমিকে উর্বর করে তুলেছে।

দাক্ষিণাত্যের সালতানাতগুলোর স্থাপত্য এই কঠোর ভূগোলেরই প্রতিফলন ঘটায়। তাদের দুর্গগুলো, যেমন দৌলতাবাদ দুর্গ, এমন সব শিলার ওপর নির্মিত ছিল যে সেগুলোকে পাহাড়েরই অংশ মনে হতো। তাদের নির্মাণশৈলীতে একটি সামরিক ও মজবুত ভাব ফুটে ওঠে। বিজাপুরের গোল গম্বুজের মতো স্মৃতিস্তম্ভগুলো এখানকার শাসকদের মহত্ত্ব এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য দেয়।

দাক্ষিণাত্য এমন একটি সালতানাতের ধারণা পেশ করে যা তার ভৌগোলিক কঠোরতা সত্ত্বেও একটি সামরিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক মিলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

https://t.me/BoierSomahar

গড়ে উঠেছিল, যেখানে ফারসি, তুর্কি এবং স্থানীয় সংস্কৃতিগুলো একসাথে বিকশিত হয়েছিল।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমলে দাক্ষিণাত্য:

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এই প্রদেশকে আরও বিস্তৃতি দান করেন। ৭২২ হিজরিতে (১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি তেলেঙ্গানা জয় করেন এবং দেবগিরির নাম পরিবর্তন করে দৌলতাবাদ রাখেন এবং একে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শেষ সময়ে যখন জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন দাক্ষিণাত্যই ছিল দিল্লি সালতানাত থেকে আলাদা হওয়া প্রথম রাষ্ট্র। এখানকার শাসকদের বাহমানি সুলতান বলা হতো।

১. আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ গাঙ্গুই: ৭৪৮ হিজরি থেকে ৭৫৯ হিজরি (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)

বাহমানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলাউদ্দিন হাসান। ঐতিহাসিক ফেরেশতার বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আমলে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দিল্লি আসেন এবং এখানে গাঙ্গু নামক এক হিন্দু সরকারি কর্মকর্তার অধীনে চাকর হন, যিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং শাহজাদা মুহাম্মদ তুঘলকের অধীনে কর্মরত ছিলেন। গাঙ্গু তাকে এক জোড়া বলদ দিয়ে শহরের উপকণ্ঠে ক্ষেতে লাঙল দেওয়ার কাজে লাগিয়ে দেন। একদিন হাসান লাঙল চালাচ্ছিলেন, তখন তার লাঙল কোনো ভারী জিনিসের সাথে ধাক্কা খায়। তিনি সেটি খনন করে দেখেন যে একটি গুপ্তধনের কলস। তিনি সেই গুপ্তধন হুবহু গাঙ্গুর সামনে পেশ করেন। গাঙ্গু তার সততায় অত্যন্ত বিস্মিত হন; তিনি এই ঘটনার কথা শাহজাদা মুহাম্মদ তুঘলককে জানান, শাহজাদা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে পুরো ঘটনা শোনান। সুলতান খুশি হয়ে হাসানকে তলব করেন এবং তাকে একশ সৈন্যের অফিসার নিযুক্ত করেন। হাসানের সৌভাগ্য দেখে গাঙ্গু তার কোষ্ঠী গণনা করান এবং জানতে পারেন যে এই ব্যক্তি একদিন রাজা হবেন। এর ওপর গাঙ্গু হাসানের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তিনি যদি কখনো রাজা হন তবে যেন গাঙ্গুর নামকে নিজের নামের অংশ বানান যাতে ইতিহাসে তার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকে। হাসান তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেন।

হাসান উন্নতি করতে করতে সেনাবাহিনীর বড় অফিসার হয়ে যান এবং 'জাফর খান' উপাধি লাভ করেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক যখন দাক্ষিণাত্যে আক্রমণ করেন, তখন তিনিও এই অভিযানে শরিক ছিলেন। তার কর্মদক্ষতা দেখে সুলতান তাকেই দাক্ষিণাত্য প্রদেশের গভর্নর বানিয়ে দেন।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা:

যখন সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন ৭৪৮ হিজরিতে (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) আলাউদ্দিন হাসান দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্র দৌলতাবাদে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজের উপাধি 'আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ' রাখেন। আজও হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের বাগ-ই-আমের জাদুঘরে একটি পাথর রয়েছে যাতে অন্যান্য আদব ও উপাধির সাথে তার নাম এভাবে লিপিবদ্ধ আছে:

"আলাউদ্দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মুজাফফর বাহমান শাহ আস-সুলতান হাসান"

এছাড়া তিনি নিজের নামের সাথে 'গাঙ্গুই' শব্দটিও যুক্ত করেছিলেন যা নিশ্চিতভাবেই 'গাঙ্গু'র দিকে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু 'বাহমান শাহ' এর সংযোজন একটি ঐতিহাসিক ভুল বোঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাকে দাক্ষিণাত্যের বাহমানি বংশীয় বলে গণ্য করা হচ্ছে, অথচ দরবারি ঐতিহাসিকরা তাকে প্রাচীন পারস্যের যোদ্ধা রুস্তমের পুত্র বাহমানের বংশধর বলে অভিহিত করেছেন। তবে এটি একটি ভুল দাবি,

আসলে অধিকাংশ দরবারী অনারব ঐতিহাসিকদের এই অভ্যাস ছিল যে, তারা তাদের প্রশংসিত ব্যক্তিকে কোনো না কোনোভাবে প্রাচীন ইরানি বাদশাহদের বংশধর হিসেবে প্রমাণ করে ছাড়তেন, যাতে তাদের জন্য জন্মগতভাবে সালতানাতের অধিকার সাব্যস্ত করা যায়।

তবে ঐতিহাসিক ফেরেশতা এখানে ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট করেছেন যে, আলাউদ্দিন হাসান কোনো উচ্চবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন না, বরং তুঘলক বংশের একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন, যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে।

'বাহমান' সম্পর্কে গবেষণালব্ধ কথা হলো, এই শব্দটি 'ব্রাহ্মণ' শব্দেরই অন্য একটি রূপ। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদের 'বাহমান' বলা হতো এবং এর বহুবচন 'বাহামনাহ' বলা হতো, যেমনটি তারিখ-ই-ফেরেশতায় উদ্ধৃত হয়েছে:

"দফতর বাদশাহান-ই-দাকান ওয়া নবিসান্দগি-ই-ওয়ালায়াত-ই-ইশান বে বাহামনাহ মারজু আস্ত"

(দাক্ষিণাত্যের বাদশাহদের দপ্তরের লেখালেখি ও ব্যবস্থাপনা ব্রাহ্মণদের ওপর ন্যস্ত ছিল।)

যেহেতু হাসানের শাসন যে অঞ্চলে ছিল সেখানে অধিকাংশ হিন্দু বসবাস করত এবং সরকারি কাজে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, তাই তাদের মন জয়ের জন্য হাসান নিজেকে 'বাহমান শাহ' নামে অভিহিত করেন, যেমনটি ইতিহাসে বিভিন্ন অঞ্চলের নিসবতে কাবুল শাহ, খাওয়ারজম শাহ এবং শিরওয়ান শাহ-এর মতো উপাধি বাদশাহদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল।

হাসান বাহমানীর রাজধানী এবং রাষ্ট্রের সীমানা:

হাসান দক্ষিণ ভারতের শহর 'গুলবার্গা' (আহসানাবাদ)-কে নিজের রাজধানী বানান। আট দশক পর্যন্ত এই শহরটি বাহমানীদের কেন্দ্র ছিল। আলাউদ্দিন হাসানের প্রতিষ্ঠিত এই সালতানাতটি ছিল একটি বর্গাকার মালভূমি, যার প্রতিটি বাহু তিনশ মাইল দীর্ঘ ছিল। এভাবে আয়তনে তা প্রায় মারাঠাদের দেশ মহারাষ্ট্রের সমান ছিল। এর কোনো প্রান্ত সমুদ্রের সাথে যুক্ত ছিল না। এর উত্তরে ছিল নর্মদা নদী ও 'বেরার' জেলা। পূর্বে ছিল গোন্ডওয়ানার জঙ্গল ও 'তেলেঙ্গানা' জেলা। পশ্চিমে ছিল পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ছিল কৃষ্ণা নদী। খানদেশ রাজ্যের মাধ্যমে এই সালতানাত অবশিষ্ট ভারতের সাথেও সংযুক্ত ছিল। সালতানাতের এই সীমানা পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের নিজাম রাষ্ট্র এবং বর্তমান বোম্বাইয়ের সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দাক্ষিণাত্যের এই স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ ভারতের দৃশ্যপট পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণ ভারতের দুটি হিন্দু রাষ্ট্র: ওয়ারঙ্গল এবং বিজয়নগরের বিপরীতে এখন তাদের সমকক্ষ একটি মুসলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী এক শতাব্দী পর্যন্ত এই মুসলিম রাষ্ট্রটি কোনো বড় বিরতি ছাড়াই তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের স্বায়ত্তশাসিত শাসকরা কৃষ্ণা নদীর ওপারে উত্তর দাক্ষিণাত্যের অর্ধাংশের ওপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখেন। তেলেঙ্গানা ও বিজয়নগরের রাজারা এই রাষ্ট্রকে কর প্রদান করতেন। দীর্ঘ দূরত্বের কারণে দিল্লির সুলতানরা এটি পুনরায় দখল করতে পারেননি। অবশেষে মুঘল আমলে এটি নতুন করে জয় করা হয়।

আলাউদ্দিন হাসানের উত্তরসূরিগণ:

আলাউদ্দিন হাসান বাহমানী এগারো বছর দুই মাস শাসন করার পর রবিউল আউয়াল ৭৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৬৭ বছর।

তাঁর পুত্র মুহাম্মদ শাহ এবং অন্যান্য পুত্র ও পৌত্রগণ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, যাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১. মুহাম্মদ শাহ বিন আলাউদ্দিন হাসান: ৭৫৯ হিজরি থেকে ৭৭৬ হিজরি (১৩৫৮ খ্রি. থেকে ১৩৭৫ খ্রি.):

তিনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী সৈনিক, উচ্চাভিলাষী শাসক এবং যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাজধানী গুলবারগায় একটি চমৎকার মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রতিবেশী মারাঠা হিন্দু রাষ্ট্র বিজয়নগরের বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি শপথ করেন যে, তিনি এই শত্রুদের কাছ থেকে কঠোর প্রতিশোধ নেবেন। ফলে তিনি বিজয়নগর আক্রমণ করেন এবং সেখানে অসংখ্য যোদ্ধাকে হত্যা করেন; অবশেষে বিজয়নগরের রাজা তাঁকে জিজিয়া দিতে বাধ্য হন।

তিনি খাঁটি সোনার মুদ্রা চালু করেছিলেন যাতে কোনো খাদ ছিল না। বিজয়নগর ও ওয়ারঙ্গলের রাজারা এটি দেখে নিজেদের পুঁজি রক্ষার জন্য হিন্দু স্বর্ণকারদের প্ররোচিত করেন যেন তারা বাহমানি রাজ্যের মুদ্রাগুলো নতুন করে গলিয়ে তাতে খাদ মিশিয়ে দেয়। মুহাম্মদ শাহ এই সংবাদ পেয়ে একে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হিসেবে গণ্য করে উভয় মারাঠা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে চার লক্ষ শত্রু নিহত হয় এবং সকল হিন্দু স্বর্ণকারকে প্রতারণায় অংশগ্রহণের অপরাধে হত্যা করা হয়।

মুহাম্মদ শাহ সরকারকে নতুন আঙ্গিকে সংগঠিত করেন যা আধুনিক শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। তিনি বিভিন্ন বিভাগের দক্ষ আমিরদের তাঁদের দক্ষতার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় অর্পণ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। একইভাবে তিনি সুবাদারদের নিজ নিজ এলাকায় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করেন যা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

তিনি সামরিক শক্তি এতটাই বৃদ্ধি করেছিলেন যে, তাঁর আগে বা পরে দাক্ষিণাত্যের কোনো শাসক তেমনটি অর্জন করতে পারেননি। তাঁর কাছে তিন হাজার যুদ্ধহস্তী ছিল, যেখানে তাঁর আগের বা পরের সুলতানদের হস্তী সংখ্যা কখনো দুই হাজারের বেশি হতে পারেনি।

২. মুজাহিদ শাহ (আলাউদ্দিন দ্বিতীয়) বিন মুহাম্মদ শাহ: ৭৭৬ হিজরি থেকে ৭৭৯ হিজরি (১৩৭৫ খ্রি. থেকে ১৩৭৮ খ্রি.):

মুজাহিদ শাহও একজন সাহসী শাসক ছিলেন। তিনি 'কোঙ্কন'-এর পাহাড়ি জেলাও জয় করেন এবং প্রতিবেশী রাজ্য খানদেশ ও গুজরাটের শাসকদের পরাজিত করেন। পরিশেষে বিজয়নগরের রাজা কিষাণ রায়ের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়, যেখানে রাজা ও তাঁর মিত্ররা ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে সমবেত হয়েছিল। হিন্দুস্তানে এর আগে কখনো এত বড় বাহিনী কোথাও সমবেত হয়নি; তবে মুজাহিদ শাহ শত্রুদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং তাদের সত্তর হাজার লোককে বন্দি করেন। মুজাহিদ শাহ এই যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন, এমন সময় তাঁর চাচা দাউদ পারিবারিক বিরোধের কারণে ষড়যন্ত্র করে ১৭ জিলহজ ৭৭৯ হিজরিতে তাঁকে হত্যা করান।

৩. দাউদ শাহ বিন আলাউদ্দিন হাসান: ৭৮০ হিজরি (১৩৭৮ খ্রি.):

দাউদ শাহের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। প্রাক্তন নিহত বাদশাহর সমর্থকরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং ঠিক এমন এক সময়ে যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন, তাঁকে হত্যা করে।

৪. মাহমুদ শাহ বিন আলাউদ্দিন হাসান: ৭৮০ হিজরি থেকে ৭৯৯ হিজরি (১৩৭৮ খ্রি. থেকে ১৩৯৭ খ্রি.):

তিনি দীর্ঘকাল শাসন করেন। তিনি একজন বড় আলেম, ফাজিল, কবি ও সাহিত্যিক, ক্যালিগ্রাফার এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফারসি ও আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর দরবার সাহিত্যিক, কবি এবং গুণীজনদের...

তিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি পারস্যের মহান কবি হাফিজ শিরাজীর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। মাহমুদ শাহ তাঁকে দাক্ষিণাত্যে ডাকার জন্য রাজকীয় নৌকা পাঠিয়েছিলেন। তিনি হরমুজ বন্দর থেকে তাতে আরোহণ করার সাথে সাথেই প্রতিকূল বাতাস বইতে শুরু করে। হাফিজ শিরাজী তা দেখে নৌকা থেকে নেমে যান এবং একটি গজল লিখে পাঠান, যাতে মাহমুদ শাহ খুশি হয়ে তাঁকে পাঁচ হাজার আশরাফি উপহার হিসেবে পাঠান।

মাহমুদ শাহ প্রজাদের অবস্থার পূর্ণ খবর রাখতেন। এতিম, বিধবা, প্রতিবন্ধী, আলেম এবং ছাত্রদের জন্য তিনি সরকারি ভাতা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি বিশ বছর শাসন করার পর ২১ রজব ৭৯৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৫. গিয়াস উদ্দিন: ৭৯৯ হিজরি (২৮ এপ্রিল ১৩৯৭ খ্রি. থেকে ১৪ জুন ১৩৯৭ খ্রি.):

সুলতান মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের যুগ শুরু হয়, যাতে বিদ্রোহ, হত্যাকাণ্ড এবং ফাসাদ সৃষ্টি হয়। প্রথমে সুলতান মাহমুদ শাহের বড় ছেলে গিয়াস উদ্দিন সতেরো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনি দুই মাসও পূর্ণ করতে পারেননি। কারণ তাঘালচিন নামক এক ঘনিষ্ঠ তুর্কি গোলাম তাকে নিজের সুন্দরী কন্যার প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে ফেলেছিল। এরপর সে অন্যান্য আমিরদের সাহায্যে একদিন কোনো এক বাহানায় বাদশাহকে নিজের বাড়িতে দাওয়াতে ডাকে এবং সেখানে তাকে বন্দি করে অন্ধ করে দেয়।

৬. শামস উদ্দিন ৭৯৯ হিজরি (৮ জুন ১৩৯৭ খ্রি. থেকে ১৫ নভেম্বর ১৩৯৭ খ্রি.):

তাঘালচিন সুলতান মাহমুদ শাহের দ্বিতীয় পুত্র পনেরো বছর বয়সী শামস উদ্দিনকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। শামস উদ্দিন প্রতিটি কাজ তারই ইচ্ছানুযায়ী করতে থাকেন। সিংহাসন ও মুকুটকে এভাবে জিম্মি হতে দেখে প্রাক্তন বাদশাহ দাউদ শাহের পুত্র শাহজাদা ফিরোজ রুখে দাঁড়ান এবং তার চারপাশে একটি দল একত্রিত হয়। এই দলটি তাঘালচিনকে গ্রেপ্তার করে অন্ধ শাহজাদা গিয়াস উদ্দিনের হাতে সোপর্দ করে, যিনি তলোয়ারের আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করেন। শামস উদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করে মক্কা মোয়াজ্জমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৭. তাজ উদ্দিন ফিরোজ শাহ বিন দাউদ শাহ: ৮০০ হিজরি থেকে ৮২৫ হিজরি (১৩৯৭ খ্রি. থেকে ১৪২২ খ্রি.):

তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কায়েম করেন। তিনি শেখ ফজলুল্লাহ শিরাজীর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সাহিত্য ও যুক্তিশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। সরকারি দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি সপ্তাহে তিন দিন মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন এবং শারহুল মাকাসিদ, তাহরিরে উকলিদাস এবং আল-মুতাওয়াল-এর মতো কঠিন কিতাবসমূহ পড়াতেন। অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছে। দৌলতাবাদ সংলগ্ন বালাঘাটে তিনি একটি বিশাল মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পঁচিশ বছর শাসন করেন। তাঁর যুগ বাহমানি সুলতানদের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। তাঁর শাসনামলে তৈমুর দিল্লি আক্রমণ করেন। ফিরোজ শাহ এই সুযোগে তাঁকে মূল্যবান উপহার সামগ্রীসহ চমৎকার ভাষায় লিখিত একটি পত্র পাঠান যাতে তৈমুরের প্রশংসা ও গুণগান ছিল। তৈমুর এই অভ্যর্থনায় অত্যন্ত খুশি হন।

কিন্তু এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও ফিরোজ শাহ মদ, নারী এবং নাচ-গানের অনুরাগী ছিলেন। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা এই যে, শেখ ফজলুল্লাহ শিরাজী তাকে মুতআ বিবাহের বৈধতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিলেন, ফলে তিনি ভোগ-বিলাসে আরও বেশি মগ্ন হয়ে পড়েন। এমনকি মদ্যপান ও বিলাসিতার কারণে তার স্বাস্থ্য ও সুনাম নষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে তার ভাই আহমদ শাহ তার সিংহাসন উল্টে দেন, কিছুদিন পর ফিরোজ শাহ...

...মৃত্যু হলো।

আহমদ শাহ আউয়াল বিন দাউদ শাহ: ৮২৫ হিজরি থেকে ৮৩৮ হিজরি (১৪২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দ): আহমদ শাহ বাহমানি তার ভাইয়ের শাসনকালে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন এবং ৮৩০ হিজরিতে (১৫২৫ খ্রিস্টাব্দ) ওয়ারাঙ্গল জয় করে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে বিজয়নগর কখনোই পদানত করা সম্ভব হয়নি। আহমদ শাহ বাহমানি রাজ্যের মধ্যবর্তী জেলা "বিদর"-এ একটি নতুন শহর "আহমদাবাদ" নির্মাণ করেন এবং একে রাজধানী বানান। তিনি গুজরাট ও মালওয়ার মুসলিম শাসকদের সাথেও যুদ্ধ করেন। তিনি মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ৮৩৮ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

আলাউদ্দিন আহমদ শাহ সানি: ৮৩৮ হিজরি থেকে ৮৬২ হিজরি (১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ): তার আমলে মালওয়ার সমসাময়িক বাদশাহ মাহমুদ খিলজি দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করেন, তবে আলাউদ্দিন সফল প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজের রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখেন। এদিকে দাক্ষিণাত্যে বাইরে থেকে আসা শিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শিয়া-সুন্নি বিবাদ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আলাউদ্দিন কঠোরভাবে এই ফিতনা দমন করেন, যাতে ফাসাদের কারণ হওয়া অনেক বহিরাগত শিয়া নিহত হয়। আলাউদ্দিনের বিজয়নগর ও কোঙ্কনের প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্যগুলোর সাথেও যুদ্ধ হয় যাতে তিনি বিজয় লাভ করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং প্রজাদের ফরিয়াদ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। একবার তিনি জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন একজন ব্যবসায়ী দাঁড়িয়ে গেলেন যিনি বাদশাহর উজিরদের কাছে কিছু ঘোড়া বিক্রি করেছিলেন কিন্তু তখনো মূল্য পাননি। ব্যবসায়ী চিৎকার করে বললেন: "আল্লাহর কসম, না তুমি ন্যায়পরায়ণ, না তুমি শরীফ। না তুমি ধৈর্যশীল, না তুমি দয়ালু। তুমি মিথ্যাবাদী।" বাদশাহ এটি শুনে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তার উজিরদের ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, ব্যবসায়ীকে মূল্য পরিশোধ করালেন এবং নিজের ঘরে চলে গেলেন। এরপর তাকে আর কেউ বাইরে বের হতে দেখেনি, এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত।

আলাউদ্দিন হুমায়ুন শাহ: ৮৬২ হিজরি থেকে ৮৬৫ হিজরি (১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ): এরপর তার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার পিতার বিপরীত জালেম ও স্বৈরাচারী ছিলেন। তিনি অনেক মানুষের অন্যায় রক্তপাত করেন। নিজের উজির, অফিসার, সৈন্য এবং তাদের স্ত্রীদেরও রেহাই দেননি এবং গাদ্দারির সন্দেহে তাদের মধ্য থেকে অনেক নিরপরাধকে হত্যা করান। তার ভয় এমন ছিল যে, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ঘর থেকে দরবারে যাওয়ার সময় পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে বের হতেন। অবশেষে এই জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং তিনি নিহত হন।

নিজাম শাহ বিন হুমায়ুন শাহ: ৮৬৫ হিজরি থেকে ৮৬৭ হিজরি (১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দ): এখন নিহত বাদশাহর আট বছর বয়সী পুত্র নিজাম শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র দুই বছর শাসন করেন।

মুহাম্মদ শাহ সানি বিন হুমায়ুন শাহ: ৮৬৭ হিজরি থেকে ৮৮৭ হিজরি (১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দ): মুহাম্মদ শাহ দশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হওয়া পর্যন্ত তিনি তার মায়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সেই সময় রাজ্যের উজিরের দায়িত্ব ছিল খাজা ইমাদউদ্দিন মাহমুদ গিলানির কাছে, যিনি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সুযোগ্য ছাত্র...

ছিলেন। চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রেও তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁর ব্যবসা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁকে সাধারণত মাহমুদ গাওয়ান, শাহ সওদাগরান এবং খাজা জাহান বলা হতো। কিন্তু অগাধ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি সবকিছু নেক কাজে ব্যয় করে দিতেন এবং নিজের কাছে কিছুই রাখতেন না। তিনি আহমেদাবাদে একটি বিশাল জ্ঞানকেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন যাতে মসজিদ, মাদ্রাসা, কুতুবখানা, অধ্যয়ন কক্ষ এবং নির্জন কক্ষও ছিল। দাক্ষিণাত্যে তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নির্মাণশৈলীর কীর্তিগুলো চিরকাল অম্লান থাকবে।

এদিকে বাদশাহকে অল্পবয়স্ক দেখে আশেপাশের মারাঠা রাজ্যগুলো দাক্ষিণাত্যের ওপর আক্রমণ চালায়, কিন্তু খাজা মাহমুদ গিলানি জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলে শত্রুদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন।

কয়েক বছর পর মুহাম্মদ শাহ যখন যুবক হলেন, তখন তিনি সালতানাতের বিষয়াবলি নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান প্রমাণিত হলেন। তিনি শত্রু হিন্দু রাজ্যগুলোর সাথে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়েন এবং সর্বদা বিজয়ী হন। তিনি রাজ্যকে ‘কাশি’ এবং ‘গোয়া’ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি ৮৭৫ হিজরিতে (১৪৭১ খ্রি.) উড়িষ্যায় সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ‘কাঞ্চিপুরম’ দখল করে নেন। দক্ষিণে তিনি ‘বেলগাঁও’-এর রাজার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এভাবে এই রাজ্য সমুদ্র উপকূল বরাবর বাড়তে বাড়তে মহীশূরের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

মুহাম্মদ শাহ শাসনকার্য খুব সুসংগঠিত রেখেছিলেন। তাঁর কাছে এক হাজার তুর্কি গোলাম ছিল যারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু অনেক গুণের পাশাপাশি তিনি প্রচুর মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, যার ফলে যৌবনেই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলো বিকল হতে শুরু করে এবং স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, ৮৮৬ হিজরিতে তিনি হিংসুকদের প্ররোচনায় পড়ে বিচক্ষণ উজির খাজা মাহমুদ গিলানিকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। খাজাকে যখন বাদশাহর দরবারে তলব করা হলো, তখন কিছু সঙ্গী পরামর্শ দিলেন যে, এমন অবস্থায় বাদশাহর কাছে উপস্থিত না হওয়াই ভালো, কিন্তু খাজা জবাবে এই কবিতাটি পড়লেন:

চুঁ শহীদ-এ ইশক দর দুনিয়া ও উকবা সুরখরুস্ত... খুশ দমে বাশাদ কে মারা কুশতা জাঁ ময়দাঁ বরন্দ
(যেহেতু প্রেমের শহীদ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল... কতই না আনন্দের মুহূর্ত হবে যখন আমাকে এই ময়দান থেকে শহীদ করে নিয়ে যাওয়া হবে।)

অবশেষে খাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। তাঁর বয়স ছিল ৭৮ বছর। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, তাঁর মৃত্যু দাক্ষিণাত্য সালতানাতের পতনের লক্ষণ ছিল।

খাজার হত্যার পর বাদশাহ তীব্র অনুতপ্ত হলেন, কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল। কিছুকাল পর মুহাম্মদ শাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যান। মুমূর্ষু অবস্থায় যখন জ্ঞান ফিরত, তখন তিনি বলতেন: “খাজা আধ্যাত্মিকভাবে আমাকে মেরে ফেলছেন।” শেষ অবস্থায় তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর।

৩. মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় বিন মুহাম্মদ শাহ দ্বিতীয়: ৮৮৭ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি (১৪৮২ খ্রি. থেকে ১৫১৮ খ্রি.): তাঁর সিংহাসন আরোহণও অল্প বয়সে হয়েছিল, যার ফলে সালতানাতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং খুব দ্রুত সালতানাত পতনের শিকার হয়। বিদরের এক তুর্কি আমির কাসিম বারিদির পুত্র, যিনি আমির বারিদ নামে পরিচিত ছিলেন, সেই সময়ে রাজধানীর সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। বাদশাহ তাঁর হাতের পুতুল ছিলেন এবং ভোগবিলাস ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ ছিল না। অবশেষে ৪ জিলহজ ৯২৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এই পুতুল রাজা ৩৭ বছর পর্যন্ত নামমাত্র শাসন করেন যার ফলে প্রদেশগুলো স্বাধীন হতে থাকে। শাসন ব্যবস্থায় চারটি পক্ষ: দাক্ষিণাত্যবাসী, মুঘল, তুর্কি এবং হাবশি আগে থেকেই জড়িত ছিল কিন্তু রাজার ভয়ে দমে থাকত। কিন্তু পুতুল রাজত্বের কারণে তাদের মধ্যে কোনো ভয় বা লজ্জা ছিল না। ফলে তাদের প্রত্যেকে স্বাধীন হয়ে একেকটি প্রদেশের মালিক হতে থাকে। দুই দশক পর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, রাজধানী একটি ছোট সালতানাত হিসেবে মাঝখানে ছিল যার চারদিকে চারটি বড় বড় স্বাধীন সালতানাত ছিল যেগুলোর মধ্যে প্রতিদিন যুদ্ধ বিগ্রহ চলত।

১৪. আহমদ শাহ তৃতীয় বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয়: ৯২৩ হিজরি থেকে ৯২৬ হিজরি (১৫১৮ খ্রি. থেকে ১৫২০ খ্রি.): আমির বারিদ মৃত রাজার ছেলে আহমদ শাহকে সিংহাসনে বসান এবং তার জন্য অপর্যাপ্ত বেতন নির্ধারণ করেন যাতে তিনি মুখাপেক্ষী থাকেন। অবশ্য মদ্যপানের সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে তাকে পৌঁছে দিতেন। দুর্ভাগা সিংহাসন আরোহীও পরিস্থিতির সাথে আপস করে কখনো পানপাত্র হাত থেকে ছাড়েননি। একবার তার খরচে খুব টান পড়লে তিনি বাহমানি রাজাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মুকুট যা চার লক্ষ আশরাফি মূল্যের ছিল, কোনো দ্বিধা ছাড়াই টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দেন। আমির বারিদ জানতে পেরে মুকুটের সন্ধানে আকাশ-পাতাল এক করে ফেলেন এবং তদন্ত ও অনুসন্ধানের নামে ডজন ডজন মানুষকে হত্যা করান কিন্তু মুকুটের একটি কণাও উদ্ধার হয়নি। দুই বছর এক মাস সিংহাসনে থাকার পর আহমদ শাহ বিষক্রিয়ায় মারা যান।

১৫. আলাউদ্দিন শাহ তৃতীয় বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয়: ৯২৬ হিজরি থেকে ৯২৯ হিজরি (১৫২০ খ্রি. থেকে ১৫২৩ খ্রি.): এবার আমির বারিদ এক শাহজাদা আলাউদ্দিন শাহ তৃতীয়কে সিংহাসনে বসান। এই শাহজাদা বুদ্ধিমান ছিলেন এবং জানতেন যে মদ এই সালতানাতের ধ্বংসের কারণ। ফলে তিনি মদ্যপান থেকে বিরত থাকেন এবং আমির বারিদের স্বৈরাচারের জাল ছিন্ন করার চিন্তা করতে থাকেন। আমির বারিদ তার সংকল্প বুঝতে পেরে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে নিক্ষেপ করেন। কিছুকাল পর তিনি ইন্তেকাল করেন। শাসনের মেয়াদ ছিল মাত্র দুই বছর তিন মাস।

১৬. ওয়ালিউল্লাহ শাহ বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয়: ৯২৯ হিজরি থেকে ৯৩২ হিজরি (১৫২৩ খ্রি. থেকে ১৫২৬ খ্রি.): আমির বারিদ এবার ওয়ালিউল্লাহ শাহর গলায় নামমাত্র শাসনের ফাঁস পরান কিন্তু তাকে অনবরত নজরবন্দি করে রাখেন। অন্ন-বস্ত্র ছাড়া তিনি আর কিছুই পেতেন না। শেষ তিন বছর পর আমির বারিদ তার স্ত্রীকে নিজের হাতিয়ার বানিয়ে তাকে হত্যা করান।

১৭. কলিমুল্লাহ শাহ বিন ওয়ালিউল্লাহ শাহ: ৯৩২ থেকে ৯৩৩ হিজরি (১৫২৬ খ্রি. থেকে ১৫২৭ খ্রি.): এবার ওয়ালিউল্লাহর ছেলে কলিমুল্লাহকে সিংহাসনে বসানো হয়। কলিমুল্লাহ বাহমানির সময়ে এই সালতানাত স্বায়ত্তশাসিত আমিরদের সামনে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। এই সময়েই মুঘল বিজেতা বাবর হিন্দুস্তানে এসে দিল্লি জয় করেছিলেন। কলিমুল্লাহ তাকে একটি পত্র পাঠান যার সারমর্ম ছিল এই:

“তকদিরের ফয়সালা বা তদ্বিরের ত্রুটির কারণে আমাদের প্রাচীন খাদেমরা দাক্ষিণাত্যের আশপাশের জেলাগুলো দখল করে নিয়েছে এবং আপনার এই অনুগতকে বন্দি করে রেখেছে। আপনি যদি এদিকে তশরিফ আনেন তবে বান্দা এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবে এবং সালতানাতের জেলাগুলো: দৌলতাবাদ ও বেরার হুজুরের নামে করে দেওয়া হবে।”

কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত ভারতে বাবরের পা পুরোপুরি জমেনি এবং গুজরাট ও মালব রাজ্যগুলো মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই বাবর তাকে সাহায্য করতে পারেননি। অবশেষে কলিমুল্লাহ পালিয়ে গিয়ে আহমদনগরের শাসকের কাছে আশ্রয় নেন এবং ৯৪৩ হিজরি (১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

দাক্ষিণাত্য সালতানাতের উত্থান ও পতনের ওপর এক নজর:

দাক্ষিণাত্য রাজ্য দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল। অধিকন্তু, সমুদ্রপথের সুবিধার কারণে তারা সহজেই উসমানীয় তুর্কিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে নিজেদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহের আমলে দাক্ষিণাত্য ও উসমানীয় সালতানাতের সম্পর্ক তুঙ্গে ছিল। এই কারণে কেবল তুর্কি আমিরদের দাক্ষিণাত্যে প্রচুর যাতায়াতই ছিল না, বরং তারা এখানে বসতি স্থাপন করে এই সরকারের অংশও হতে থাকেন। পাশাপাশি দাক্ষিণাত্য রাজ্য পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাজ্যগুলোকেও জয় করতে থাকে।

এই বিজয়গুলো বাহমানি সালতানাতকে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক খ্যাতি এনে দেয়। দাক্ষিণাত্যের দরবার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার স্থাপত্যশৈলী নিজস্ব এক পরিচয় তৈরি করে নেয়। এই সালতানাত সামরিক ও প্রশাসনিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ একটি সরকারি কাঠামো তৈরি করেছিল যার বৈচিত্র্যময় বিভাগগুলো পরিচালনার জন্য আরবি, তুর্কি, ফারসি এবং অন্যান্য জাতির আলেম ও গুণীজনরা দাক্ষিণাত্যের দরবারের সাথে যুক্ত হতে থাকেন।

কিন্তু সরকারি বিভাগগুলোতে এই বিদেশিদের আধিক্য পরবর্তীতে স্থানীয় আমিরদের অসন্তুষ্ট করে এবং উত্তেজনার এই পরিবেশ দাক্ষিণাত্যের জন্য প্রশাসনিক সমস্যা তৈরি করে দেয়। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার রেখাগুলো গভীর হতে শুরু করে। এর আগে দাক্ষিণাত্য সালতানাত অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণে প্রশাসনিক উন্নতির জন্য একে একাধিক প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। যখন কেন্দ্রে দুর্বলতা দেখা দিল, তখন প্রাদেশিক শাসকরা নিজ নিজ স্থানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল। আলাউদ্দিন শাহ সানির আমলে দাক্ষিণাত্য সালতানাত দুর্বল ও বিভক্ত হতে শুরু করে। প্রদেশগুলো আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে বাহমানি বংশ প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। এভাবে দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্রীয় শাসনের অবসানের ফলে সালতানাত পাঁচটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায় যাদের শাসকরা বাহমানি রাজ্যের প্রাক্তন আমিররাই ছিলেন।

স্থাপত্য কীর্তি:

বাহমানি সালতানাত দাক্ষিণাত্যে প্রায় দুই শতাব্দী (১৩৪৭ খ্রি. থেকে ১৫২৭ খ্রি.) পর্যন্ত শাসন করে এবং নিজেদের পেছনে স্থাপত্যশৈলীর অনেক চমৎকার নিদর্শন রেখে যায়। তাদের ইমারতগুলোতে ফারসি, তুর্কি এবং ভারতীয় স্থাপত্যরীতির এক সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। এই বংশের প্রথম শাসক আলাউদ্দিন বাহমান শাহ ৭৪৮ হিজরি (১৩৪৭ খ্রি.) সালে গুলবারগাকে নিজের রাজধানী বানান এবং এখানে একটি চমৎকার দুর্গ নির্মাণ করান। এই দুর্গটি তার মজবুত দেয়াল, বড় দরজা এবং বুরুজগুলোর জন্য বিখ্যাত ছিল। বাহমানি সুলতানদের গুলবারগা জামে মসজিদও স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন যা (১৩৬৭ খ্রি.) সালে সুলতান মুহাম্মদ শাহ আউয়াল নির্মাণ করিয়েছিলেন। এতে নামাজ...

এর কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণ খোলা নয় বরং সম্পূর্ণভাবে ঢাকা। এর বড় গম্বুজ এবং মেহরাবগুলো ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর এক চমৎকার নিদর্শন। গুলবারগায় বাহমানি সুলতানদের অনেকগুলো মাকবারা রয়েছে, যার মধ্যে সুলতান ফিরোজ শাহ বাহমানির মাকবারা উল্লেখযোগ্য। এই মাকবারাগুলো তাদের উঁচু গম্বুজ এবং সুন্দর জালি কাজের জন্য বিখ্যাত।

বিদর দুর্গও একটি দর্শনীয় ইমারত। যখন বাহমানি রাজধানী গুলবারগা থেকে বিদরে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন এখানে একটি নতুন ও মজবুত দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে রাজকীয় প্রাসাদ, মসজিদ এবং অন্যান্য ভবন অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্গের ভেতরে নির্মিত জামে মসজিদ বিদর তার সাধারণ অথচ সুন্দর কাঠামোর জন্য পরিচিত। এতে ফারসি এবং স্থানীয় স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সুলতান মুহাম্মদ শাহ তৃতীয়-এর বিখ্যাত উজির মাহমুদ গাওয়ান ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে বিদরে একটি বিশাল মাদ্রাসা নির্মাণ করান। এই মাদ্রাসাটি তার বিশাল ভবন, সুন্দর টাইলস এবং ফারসি স্থাপত্যশৈলীর জন্য বিখ্যাত ছিল এবং সেই যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বড় কেন্দ্র ছিল।

শিক্ষাগত জৌলুস:

বাহমানি যুগে জ্ঞান ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাহমানি সুলতানরা নিজেরাও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং তারা তাদের দরবারে কবি, সাহিত্যিক ও ওলামাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তি ও কবি হলেন:

- খাজা মাহমুদ গাওয়ান গিলানি: তিনি বাহমানি সালতানাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিভাবান উজির ছিলেন। তিনি একজন আলেম, সাহিত্যিক এবং ফারসির বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি বিদরে একটি বিশাল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং যুক্তিবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি নিজেও অনেক জ্ঞানগর্ভ ও সাহিত্যিক রচনা রেখে গেছেন।

- ফজলুল্লাহ ইনজু: তিনি বাহমানি যুগের একজন বিশিষ্ট কবি ও লেখক ছিলেন। তার বইগুলোর মধ্যে 'দস্তুরুল কাতিব' ফারসি গদ্যের একটি চমৎকার নিদর্শন, যা সেই যুগের ইতিহাস, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

- নাজিরি: তিনি একজন সুফি কবি ছিলেন যিনি ফারসিতে মসনবি ও গজল লিখেছেন যাতে তাসাউফ ও প্রেমের বিষয়গুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নাজিরিকে এই যুগের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে স্মরণ করা হয়।

- সিরাজ দাক্কানি: সিরাজ দাক্কানিও একজন প্রখ্যাত দাক্কানি কবি ছিলেন যিনি বাহমানি সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তার কবিতায় স্থানীয় ভাষা ও বাগধারার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।

এই ব্যক্তিত্বরা ছাড়াও আরও অনেক প্রখ্যাত আলেম ও লেখক বাহমানি সালতানাতের যুগে জ্ঞান ও সাহিত্যের সেবা করেছেন, যার ফলে দাক্ষিণাত্যে এক অনন্য সভ্যতা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

দাক্কানি সমাজ ও সংস্কৃতি:

বাহমানি সুলতানদের যুগ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল যেখানে কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাই আসেনি বরং একটি অনন্য সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থাও জন্ম নিয়েছিল। বাহমানি যুগে সমাজ দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল:

দকনি: এরা ছিল স্থানীয় মুসলমান যারা দাক্ষিণাত্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং এখানকার সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করেছিল।

আফাকি (পরদেশি): এরা ছিল সেই সব লোক যারা পারস্য, তুর্কিস্তান এবং আরব থেকে হিজরত করে এসেছিল। এরা দরবারি ও সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার জন্য ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলত, যার ফলে প্রায়ই রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিত। তবে এই দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল।

এই যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সংস্কৃতির চমৎকার সংমিশ্রণ। ফারসি, তুর্কি এবং আরবি সংস্কৃতি স্থানীয় দকনি ও মারাঠি সংস্কৃতির সাথে মিশে এক নতুন সভ্যতাকে বিকশিত করেছিল। ফারসি এবং স্থানীয় উপভাষাগুলোর মিলনে 'দকনি' নামে একটি নতুন ভাষার জন্ম হয়, যা সাধারণ মানুষের ভাষায় পরিণত হয়। এই ভাষায় কবিতা ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই কাজ হয়েছে। এই যুগে সুফিয়া-এ-কেরাম, বিশেষ করে খাজা বান্দা নেওয়াজ গেসুদরাজ (রহ.)-এর মতো মহান ব্যক্তিরা ধর্মের প্রচারের পাশাপাশি নৈতিকতা, সাম্য ও সহনশীলতাকে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁদের শিক্ষা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে ইসলামের কাছাকাছি আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বাহমানি সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা বেশ শক্তিশালী ছিল। রাষ্ট্রকে 'আতরাফ' অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসককে 'তরফদার' বলা হতো। মুহাম্মদ শাহ আউয়াল এবং পরবর্তীতে উজির মাহমুদ গাওয়ানের মতো শক্তিশালী শাসকদের আমলে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। রাস্তাঘাট নিরাপদ ছিল এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। যখন সুলতানরা দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং আফাকি ও দকনি আমিরদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলো, তখন শান্তি ও নিরাপত্তার পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেল। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এবং লুটতরাজ সাধারণ হয়ে উঠল, যা শেষ পর্যন্ত বাহমানি সালতানাতের পতনের পথ প্রশস্ত করল। সারকথা হলো, বাহমানি যুগের সমাজ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে একটি প্রগতিশীল সমাজ ছিল, কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমাহ

দাক্ষিণাত্যের বাহমানি সুলতানদের তালিকা

৭৪৮ হিজরি থেকে ৯৩৩ হিজরি

(১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১ আলাউদ্দিন হাসান বাহমানি গাঙ্গুই ওরফে জাফর খান ৭৪৮ হিজরি থেকে ৭৫৯ হিজরি (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ মুহাম্মদ শাহ বিন আলাউদ্দিন হাসান বাহমানি ৭৫৯ হিজরি থেকে ৭৭৬ হিজরি (১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) যোদ্ধা, হিন্দুদের সাথে যুদ্ধ করে রাজ্য বিস্তার করেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিহত হয়।

৩ মুজাহিদ শাহ (আলাউদ্দিন দ্বিতীয়) বিন মুহাম্মদ শাহ ৭৭৬ হিজরি থেকে ৭৮০ হিজরি (১৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) তাকে তার চাচা দাউদ হত্যা করেন।

৪ দাউদ শাহ বিন আলাউদ্দিন হাসান ৭৮০ হিজরি (১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) সংক্ষিপ্ত শাসনকাল

৫ মাহমুদ শাহ বিন আলাউদ্দিন হাসান ৭৮০ হিজরি থেকে ৭৯৯ হিজরি (১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) সাহিত্যিক ও কবি, জ্ঞানানুরাগী

৬ গিয়াসউদ্দিন ৭৯৯ হিজরি (১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) সংক্ষিপ্ত সময়

৭ শামসুদ্দিন ৭৯৯ হিজরি (১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) সংক্ষিপ্ত সময়

৮ তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ বিন দাউদ শাহ ৮০০ হিজরি থেকে ৮২৫ হিজরি (১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪২২ খ্রিষ্টাব্দ) পঁচিশ বছর শাসন। স্বর্ণযুগ। শেষ দিকে বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে অসহায় হয়ে পড়েন।

৯ আহমদ শাহ প্রথম বিন দাউদ শাহ ৮২৫ হিজরি থেকে ৮৩৮ হিজরি (১৪২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ। হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

১০ আলাউদ্দিন আহমদ শাহ দ্বিতীয় বিন আহমদ শাহ প্রথম ৮৩৮ হিজরি থেকে ৮৬২ হিজরি (১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) দাক্ষিণাত্যে বাইরে থেকে আসা শিয়াদের আধিক্য। শিয়া-সুন্নি বিবাদ। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সাথে যুদ্ধ।

১১ আলাউদ্দিন হুমায়ুন শাহ বিন আহমদ শাহ দ্বিতীয় ৮৬২ হিজরি থেকে ৮৬৫ হিজরি (১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৬১ খ্রিষ্টাব্দ) জালেম ও স্বৈরাচারী

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

১২ | নিজাম শাহ বিন হুমায়ুন শাহ | ৮৬৫ হি. থেকে ৮৬৭ হি. (১৪৬১ খ্রি. থেকে ১৪৬৩ খ্রি.) | অল্প বয়স; মালওয়ার খিলজি সুলতানের আক্রমণ; গুজরাটের সাথে মৈত্রী।

১৩ | মুহাম্মদ শাহ দ্বিতীয় বিন হুমায়ুন শাহ | ৮৬৭ হি. থেকে ৮৮৭ হি. (১৪৬৩ খ্রি. থেকে ১৪৮২ খ্রি.) | দশ বছর বয়সে সিংহাসন আরোহণ। বহু বছর উজির-ই আজম মাহমুদ গাওয়ান (হাফিজ ইবনে হাজারের ছাত্র)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সাহসী, বুদ্ধিমান। সালতানাতকে কোঙ্কন, কাঞ্চি এবং গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ২৯ বছর বয়সে মৃত্যু।

১৪ | মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় বিন মুহাম্মদ শাহ দ্বিতীয় | ৮৮৭ হি. থেকে ৯২৩ হি. (১৪৮২ খ্রি. থেকে ১৫১৮ খ্রি.) | অল্প বয়সে সিংহাসন আরোহণ। সালতানাতে বিশৃঙ্খলা।

১৫ | আহমদ শাহ তৃতীয় বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় | ৯২৩ হি. থেকে ৯২৬ হি. (১৫১৮ খ্রি. থেকে ১৫২০ খ্রি.) | নামমাত্র শাসক।

- | আলাউদ্দিন শাহ বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় | ৯২৬ হি. থেকে ৯২৯ হি. (১৫২০ খ্রি. থেকে ১৫২৩ খ্রি.) | নামমাত্র শাসক।

১৬ | ওয়ালিউল্লাহ শাহ বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় | ৯২৯ হি. থেকে ৯৩২ হি. (১৫২৩ খ্রি. থেকে ১৫২৬ খ্রি.) | নামমাত্র শাসক।

১৭ | কলিমুল্লাহ শাহ বিন ওয়ালিউল্লাহ শাহ | ৯৩২ হি. থেকে ৯৩৩ হি. (১৫২৬ খ্রি. থেকে ১৫২৭ খ্রি.) | নামমাত্র শাসক।

উৎসসমূহ:

- তারিখ-ই হিন্দুস্তান (মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি): চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা ৩১৩ থেকে ৫০৮।
- তারিখ-ই ফিরিশতা ফারসি: (মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা) দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ৩২৭ থেকে ৫০৮, তাবা আঞ্জুমান আসার ও মাফাখির ফারহাঙ্গি।
- তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ আব্দুল মুনইম আন-নামর: ১২৯ থেকে ১৪৭।
- নুজহাতুল খাওয়াতির: হাকিম আব্দুল হাই হাসানি।
- ইসলামী সালতানাত: ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)।
- তারিখ-ই দাক্ষিণাত্য ফারসি, এজ ডেপুটি আব্দুল আলিম নসরুল্লাহ, মুদ্রিত নওল কিশোর।
- তারিখ-ই মিল্লাত (মুফতি ইন্তিজামুল্লাহ শাহাবি, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠি): তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৮ থেকে ৬৩৩।
- তাজকিরা-ই সালাতিন-ই দাক্ষিণাত্য - মৌলভি আব্দুল জব্বার খান, প্রকাশক মতবা রহমানি হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য।
- তারিখ-ই সালাতিন-ই বাহমানি মানজুম, ইসমাইল বেরারি, প্রকাশক আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু দিল্লি।

(৮) দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য

দাক্ষিণাত্য সালতানাত নিম্নলিখিত পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল:

- আদিল শাহী শাসন - বিজাপুর: ৮৯৫ হিজরি থেকে ১০৯৬ হিজরি (১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)
- নিজাম শাহী শাসন - আহমদনগর: ৮৯৬ হিজরি থেকে ১০৩৩ হিজরি (১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)
- কুতুব শাহী শাসন - গোলকুন্ডা: ৯১৮ হিজরি থেকে ১০৯৮ হিজরি (১৫১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)
- ইমাদ শাহী শাসন - বেরার: ৮৮০ হিজরি থেকে ৯৮২ হিজরি (১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)
- বারীদ শাহী শাসন - বিদার: ৮৯৩ হিজরি থেকে ১০২৮ হিজরি (১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

(প্রথম) আদিল শাহী হুকুমত - বিজাপুর

৮৯৫ হিজরি থেকে ১০৯৬ হিজরি

(১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ)

বিজাপুর রাজ্যটিও বাহমানি সুলতানদের পতনের ফলে পৃথক হয়েছিল। এই রাজ্যের কেন্দ্র ছিল "বিজাপুর"। এটি দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রথম রাজ্য ছিল যেখানে শাসকরা শিয়া ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

ইউসুফ আদিল শাহ: ৮৯৫ হিজরি থেকে ৯১৫ হিজরি (১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ):

এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইউসুফ আদিল শাহ। ঐতিহাসিক ফেরেশতা এই রাজদরবারেরই একজন সভাসদ ছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, ইউসুফ আদিল শাহ ছিলেন ইস্তাম্বুলের একজন উসমানীয় রাজপুত্র, যিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে প্রাণ বাঁচাতে দাক্ষিণাত্যে চলে এসেছিলেন; তবে এই বর্ণনা সঠিক বলে মনে হয় না। যাই হোক, এটি প্রমাণিত যে তিনি একজন তুর্কি ছিলেন। তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে আসেন, তখন সালতানাতের উজির খাজা মাহমুদ গাওয়ান গিলানি স্বদেশী হওয়ার খাতিরে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। সুলতান মুহাম্মদ শাহ বাহমানির দরবারে এই নবাগত কর্মকর্তা অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেন এবং তাঁকে প্রথমে একশ, তারপর পাঁচশ এবং পরে এক হাজার সৈন্যের কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তাঁকে আদিল খান উপাধিতেও ভূষিত করা হয়েছিল। উন্নতি করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি বিজাপুরের শাসক নিযুক্ত হন।

সুলতান মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর সালতানাতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লে তিনি পুরস্কার ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেক মুঘল ও তুর্কি সৈন্যকে রাজধানী আহমদাবাদ (বিদর) থেকে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং ৮৯৫ হিজরিতে বিদ্রোহ করে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু পাঁচ-ছয় হাজার সৈন্য তাঁর সাথে ছিল, তাই তিনি বাহমানি সালতানাতের অন্যান্য আমিরদের কাছ থেকে অনেক দুর্গ ছিনিয়ে নেন এবং ভীমা নদী থেকে বিজাপুর পর্যন্ত এবং কৃষ্ণা নদী থেকে রায়চুর পর্যন্ত এলাকা জয় করে নেন।

বাহমানি রাজধানীতে আমির কাসিম বারীদই কার্যত শাসক ছিলেন, যিনি ইউসুফ আদিল শাহের উত্থান সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি হিন্দু রাজ্যগুলোকে আদিল শাহের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে প্ররোচিত করেন। ফলে ৮৯৮ হিজরিতে বিজয়নগরের রাজা আক্রমণ করেন, তবে ইউসুফ আদিল শাহ আট হাজার সৈন্য নিয়ে রাজাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ৯০১ হিজরিতে (১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে) দস্তুর দীনার নামক একজন হাবশি খোজা, যিনি কয়েকটি সীমান্ত দুর্গের ওয়ালি (গভর্নর) ছিলেন, স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে বিদ্রোহ করেন। বিপদ আঁচ করতে পেরে আমির কাসিম বারীদ এবং ইউসুফ আদিল শাহ একত্রিত হন এবং তাঁকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। এভাবেই ইউসুফ আদিল শাহের যুগ...

শাসনকাল কখনো প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্যগুলোর সাথে আবার কখনো বাহমানি আমিরদের সাথে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে। যা-ই হোক, তিনি নিজ অঞ্চলের পূর্ণ প্রতিরক্ষা করেছিলেন।

যখন তাঁর শাসন সুসংহত হলো, তখন ৯০৮ হিজরি (১৫০২ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি ইসনা আশারি মাযহাব গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং আযানে "আশহাদু আন্না আলিয়ান ওয়ালিউল্লাহ" শব্দগুলো বৃদ্ধি করেন। সেই সময়ে ইরানে শাহ ইসমাইল সাফাভির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার ফলে ইউসুফ আদিল শাহের অবস্থান আরও মজবুত হয়। যেহেতু দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ মানুষ আহলে সুন্নাত ছিল এবং ইউসুফ আদিল শাহের অধিকাংশ আমিরও হানাফি সুন্নি ছিলেন, তাই ইউসুফ আদিল শাহ সতর্কতাবশত খুলাফায়ে সালাসার প্রতি কোনো কটূক্তি করার সুযোগ দেননি এবং আহলে সুন্নাতকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিজয়নগরের রাজার ব্রাহ্মণ গোয়েন্দারা সবসময় সুযোগের সন্ধানে থাকত, তাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম দিকে কোনো বিদ্রোহ হয়নি এবং কেউ যদি এর প্রস্তুতি নিত তবে তাকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করা হতো। অন্যদিকে বাদশাহর সন্তুষ্টি এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধির আশায় ধীরে ধীরে অনেক আমির ইসনা আশারি মাযহাব গ্রহণ করে নেন। এভাবে দাক্ষিণাত্যে তাশাইয়ু-এর শিকড় গভীর হয়।

ইউসুফ আদিল শাহ ২০ বছর ২ মাস শাসন করার পর ৯১৫ হিজরি সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর বাহিনীতে মারাঠাদের প্রচুর পরিমাণে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তাদের বারো হাজার যোদ্ধার একটি আলাদা বাহিনী গঠন করেছিলেন। মারাঠাদের যুদ্ধের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা প্রায়ই অতর্কিত নৈশ হামলা এবং লুটতরাজের মাধ্যমে শত্রুকে নাজেহাল করে দিত। ইউসুফ আদিল শাহ অনেকবার মারাঠাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিরোধীদের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিলেন।

ইসমাইল আদিল শাহ: ৯১৫ হিজরি থেকে ৯৪১ হিজরি (১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ):

ইউসুফ আদিল শাহের পুত্র ইসমাইল সিংহাসনে আরোহণের সময় অল্পবয়স্ক ছিলেন, তাই সালতানাতের দায়িত্ব আমির কামাল খান গ্রহণ করেন। তিনি জুমুআ ও ঈদের খুতবায় খুলাফায়ে আরবাআর নাম পুনরায় জারি করেন এবং তাশাইয়ু-এর রীতিনীতি বন্ধ করে দেন। কিছুকাল পর হাবশি ও দাক্ষিণাত্যবাসীরা মিলে ইসমাইলকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে এবং ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করে, কিন্তু ইসমাইলের মা এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যান। যার ফলে কামাল খান নিহত হন। এই ঘটনার পর হাবশি ও দাক্ষিণাত্যবাসীদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং মারাঠা, রাজপুত ও আফগানদের ওপর আস্থা রাখা শুরু হয়।

৯২৭ হিজরিতে কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়নগরের রাজার সাথে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের আগে থেকেই ব্যূহ বিন্যাস করা হয়েছিল এবং প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। ইসমাইল শাহ সেই সময় আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছিলেন এবং মদ্যপানের আসর জমিয়ে নর্তকীদের নাচ দেখছিলেন। এরপর যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন এবং তাঁর অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল।

তবে ইসমাইল শাহ এই পরাজয়ের পর নিজেকে সামলে নেন এবং বাহমানি সালতানাতের রাজধানী আহমদাবাদের দিকে মনোযোগ দেন। এই সময়ে শেষ বাহমানি বাদশাহ কলিমুল্লাহ শাহও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন এবং আমির বারীদ সিংহাসন দখল করেছিলেন। ইসমাইল...

শাহ তাকে দমনের জন্য আহমেদাবাদের দিকে যাত্রা করলেন। আমির বারিদ ঘাবড়ে গিয়ে কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না, তিনিও সৈন্য নিয়ে বের হলেন এবং পথে শিবির স্থাপন করলেন। দুঃখ ভোলার জন্য তিনি তার সঙ্গীদের সাথে প্রচুর মদ্যপান করলেন।

ইসমাইল শাহের গোয়েন্দারা যখন তাকে এই পরিস্থিতির কথা জানাল, তখন আসাদ খান লারি পাঁচজন অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্য নিয়ে শবে খুন (রাতের অতর্কিত হামলা) করার জন্য পাঠালেন। এই সৈন্যরা যখন শত্রুর শিবিরে পৌঁছাল, তখন সেখানে সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। আমির বারিদের শিবিরের বাইরে মদের পাত্রগুলো পড়ে ছিল এবং পাহারাদাররা মত্ত ও অচেতন অবস্থায় ছিল। আমির বারিদের শিবিরের অবস্থা আরও খারাপ ছিল; তিনি পালঙ্কে অঘোরে ঘুমাচ্ছিলেন এবং তার চারপাশে মদের পাত্রগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। গায়ক, নর্তকী এবং বাদ্যযন্ত্রীরা নিজ নিজ জায়গায় লুটিয়ে পড়ে ছিল। কারও কোনো হুঁশ ছিল না। এটি দেখে আসাদ খান শবে খুন করার পরিবর্তে আমির বারিদের পালঙ্কটিই উঠিয়ে নিলেন এবং নিজের বাহিনীর দিকে রওনা হলেন। পথে যখন আমির বারিদের জ্ঞান ফিরল, তখন তিনি ভাবলেন যে তাকে জিনেরা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন।

আসাদ খান তাকে বললেন: “এগুলো জিন নয়, শত্রুর সৈন্য।” তারপর তাকে তিরস্কার করে বললেন: “শত্রু তোমার মাথার ওপর ছিল। তোমার এই বয়স এবং এই অবস্থা—এমন সময়ে এত বেশি মদ্যপান করার কী যৌক্তিকতা আছে?”

অবশেষে আমির বারিদকে ইসমাইল আদিল শাহের দরবারে পেশ করা হলো। তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং কিছু দুর্গ হস্তান্তর করে প্রাণ ভিক্ষা পেলেন। এই আমির বারিদ সেই চতুর ও ধূর্ত ব্যক্তি ছিলেন যিনি চারজন বাহমানি সুলতানকে হাতের আঙুলে নাচিয়েছিলেন এবং নিজেকে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করতেন। কিন্তু ইতিহাসে তার এই গাফিলতি এবং আত্মবিস্মৃতির ঘটনাটি অনন্য ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে, শত্রুর সৈন্যরা তাকে শিবির থেকে তুলে নিয়ে গেল অথচ তিনি টেরই পেলেন না।

৯৪১ হিজরি সফর মাসে ইসমাইল আদিল শাহের মৃত্যু হয়।

মলু আদিল শাহ: ৯৪১ হিজরি (১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ):

তিনি সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই মদ্যপান, যৌবন এবং নাচ-গানের মজলিসে মগ্ন হয়ে গেলেন এবং নিরপরাধ মানুষের জান-মালের ওপর জুলুম করতে শুরু করলেন। অবশেষে আসাদ খান লারি তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে অন্ধ করে দিলেন এবং তার ভাই ইব্রাহিমকে সিংহাসনে বসালেন।

ইব্রাহিম আদিল শাহ: ৯৪১ হিজরি থেকে ৯৬৫ হিজরি (১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

ইব্রাহিম আদিল শাহ ছিলেন সঠিক আকিদাবিশ্বাসী, সাহসী এবং বুদ্ধিমান যুবক। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে তার বাপ-দাদার ইতনা আশারিয়া মাযহাব ত্যাগ করে সুন্নি হানাফি হওয়ার ঘোষণা দেন। খুতবায় বারো ইমামের নাম নেওয়া বন্ধ করে দেন। শিয়া সৈন্যরা তাদের মাথায় বারো ইমামের নামের তাবিজ বাঁধত। তিনি সেটির ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। মোটকথা, এই বাদশাহ শিয়াদের সমস্ত রীতিনীতি ও নিদর্শন ত্যাগ করেন এবং আহলে সুন্নাতের রীতিনীতি চালু করেন।

তার শাসনামলে মারাঠারা উন্নতি লাভ করে যারা তার দাদার সময় থেকে সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু এখন তারা দাপ্তরিক কাজেও আধিপত্য বিস্তার করে। এর আগে সালতানাতের দাপ্তরিক ব্যবস্থা ফারসি ও আরবি ভাষায় ছিল এবং তারা এই ভাষাগুলোতে পারদর্শী ছিল।

দাপ্তরিক পদে ছিলেন। ইব্রাহিম আদিল শাহ এই ভেবে এসব কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করে দিলেন যে অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই মারাঠা যাদের জন্য আরবি ও ফারসি বোঝা কঠিন। ফলে তিনি দাপ্তরিক ব্যবস্থা মারাঠি ভাষায় স্থানান্তরিত করলেন এবং মারাঠাদেরই দপ্তরের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা প্রায় পরাজিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন মারাঠাদের রূপে এক নতুন শক্তি সংগঠিত হতে শুরু করল যা পরবর্তীতে হিন্দুস্তানের ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

এই সময়েই বিজয়নগরের প্রাচীন হিন্দু সালতানাতের পতন ঘটে। যদিও মুসলমানরা এর রাজধানী জয় করতে পারেনি কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এই সালতানাতের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল।

ইব্রাহিম আদিল শাহ ২৩ বছর কয়েক মাস শাসন করেন। শেষ জীবনে তিনি মাথাব্যথা, অর্শ এবং পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে ৯৬৫ হিজরি (১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আলী আদিল শাহ: ৯৬৫ হিজরি থেকে ৯৮৭ হিজরি (১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ):

আলী আদিল শাহ তার পিতার বিপরীতে পুনরায় শিয়া ধর্ম গ্রহণ করেন এবং শিয়া রীতিনীতির প্রচার শুরু করেন। তার সময়ে বিজয়নগরের রাজা রাম রাজের কারণে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলিম সালতানাতগুলো বিপদ অনুভব করতে শুরু করেছিল। অবশেষে ৯৭২ হিজরি (১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে আলী আদিল শাহ হোসেন নিজাম শাহ বাহরি (আহমদ নগরের শাসক), ইব্রাহিম কুতুব শাহ (গোলকুণ্ডার শাসক) এবং আলী বারিদ (বিদরের শাসক)-এর সাথে মিলে রাম রাজের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করেন। জমাদিউল আউয়াল মাসে এই চারজন বাদশাহ বিজাপুরের উপকণ্ঠে একত্রিত হন এবং ২০শে জমাদিউল আউয়াল তারা বিজয়নগরের দিকে যাত্রা করেন।

রাম রাজ সত্তর হাজার অশ্বারোহী, এক লক্ষ পদাতিক এবং পাঁচশ হাতি নিয়ে মোকাবিলায় বের হলেন। দাক্ষিণাত্যের বাহিনী তালীকোট নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল যার কারণে এই যুদ্ধ “তালীকোটের যুদ্ধ” নামে পরিচিত, যদিও মূল যুদ্ধক্ষেত্র তালীকোট থেকে বিশ মাইল দূরে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে ছিল। এখানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে রাম রাজ নিহত হন এবং অসংখ্য হিন্দু সৈন্য মারা যায়। বিজয়নগর শহর যা সাতটি আকাশচুম্বী প্রাচীরে ঘেরা ছিল এবং যা জয় করা অসম্ভব মনে করা হতো, বিজয়ীদের ঘোড়ার খুরের নিচে পিষ্ট হলো এবং এর শান-শওকত একটি উপকথায় পরিণত হলো। এই যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোকে নতুন জীবন দান করল এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজত্ব দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের সামনে আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। রাম রাজের ভাই ভেঙ্কটাদ্রি, যিনি এরপর সিংহাসনে বসেন, বিজয়নগর পুনরুদ্ধার করার সামর্থ্য রাখতেন না এবং তিনি ‘পেনুকোন্ডা’কে তার নতুন রাজধানী বানান।

আলী আদিল শাহের স্ত্রী চাঁদ বিবি আহমদ নগরের রাজকুমারী এবং হোসেন নিজাম শাহ বাহরির কন্যা ছিলেন। তিনি রাজনীতি ও সামরিক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন এবং এই নামেই ইতিহাসে বিখ্যাত। আলী আদিল শাহ জালালুদ্দিন আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তার দরবারে দুইবার আকবরের দূত এসেছিলেন।

আলী আদিল শাহ সমকামিতার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ৯৮৭ হিজরি (১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে মুর্তজা নিজাম শাহ দাক্ষিণাত্যের সুন্নি রাজ্য বিদরের সাবেক রাজধানী আহমদাবাদের ওপর আক্রমণ করেন। সেখানকার শাসক আলী বারিদ আলী আদিল শাহের কাছে সাহায্য চাইলেন। এই কামুক...

...সাহায্যের জন্য এই শর্ত আরোপ করলেন যে, আলী বারীদ তার প্রাসাদের অমুক দুই খোজাকে নজরানা হিসেবে পেশ করবে। আলী বারীদ বাধ্য হয়ে শর্ত মেনে নিলেন এবং আলী আদিল শাহের সহায়তার কারণে আহমদনগরের ওপর নিজাম শাহীদের আক্রমণ ব্যর্থ হলো। এরপর ৯৮৮ হিজরিতে আলী বারীদ শর্ত অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত দুই খোজাকে আলী আদিল শাহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আলী আদিল শাহ তাদের মাধ্যমে লালসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করলে সেই আত্মমর্যাদাশীল খোজারা তাকে হত্যা করে।

আলী আদিল শাহ পুত্রসন্তানহীন ছিলেন, তাই তিনি তার ভাই তাহমাস্পের পুত্র ইব্রাহিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন।

ইব্রাহিম আদিল শাহ দ্বিতীয়: ৯৮৮ হিজরি (১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)

ইব্রাহিম আদিল শাহ দ্বিতীয় অনায়াসেই সিংহাসন লাভ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন, তাই রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তার চাচি চাঁদ বিবি প্রভাবশালী ছিলেন। ৯৯৫ হিজরিতে বাদশাহ প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি নিজের হাতে তুলে নেন। এই যুগে 'এক এক' [১] নামক যুদ্ধরীতি সীমিত করে দেওয়া হয় কারণ এর ফলে জনগণের মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানুষের একে অপরকে হত্যা করা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এই সালতানাতে নয়জন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন সিকান্দার আদিল শাহ। আকবরের শাসনামলে এই রাষ্ট্র মুঘল সরকারের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। অবশেষে আওরঙ্গজেব আলমগীর ১০৯৬ হিজরিতে (১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) একে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

বিজাপুর সালতানাতের স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক দিক:

আদিল শাহী সালতানাত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে স্থাপত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। এই শাসকরা বিজাপুরকে শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের এক বিশাল কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন, যার প্রতিফলন আজও সেখানকার ইমারতগুলোতে দেখা যায়। আদিল শাহী সুলতানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব স্থাপত্যশৈলীতে। তাদের ইমারতগুলোতে ফারসি, তুর্কি এবং স্থানীয় দাক্ষিণাত্য স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এই যুগে নির্মিত বিশেষ কিছু ইমারতের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

গোল গম্বুজ: বিজাপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত ইমারত হলো গোল গম্বুজ যা সুলতান মুহাম্মদ আদিল শাহের সমাধি। এর গম্বুজটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্তম্ভহীন গম্বুজ যা তার নির্মাণশৈলী এবং প্রতিধ্বনিময় বারান্দার জন্য বিখ্যাত। এই বারান্দার এক প্রান্তে ফিসফিস করে কথা বললেও অন্য প্রান্তে তা পরিষ্কার শোনা যায়।

ইব্রাহিম রওজা: এটি ইব্রাহিম আদিল শাহ দ্বিতীয় নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটি একটি মসজিদ ও সমাধির সমষ্টি এবং এর চমৎকার খোদাই ও সূক্ষ্ম কারুকাজের কারণে একে 'দাক্ষিণাত্যের তাজমহল' বলা হয়।

জামে মসজিদ বিজাপুর: এই বিশাল মসজিদটি আলী আদিল শাহ প্রথম নির্মাণ করেছিলেন। এর বিশাল প্রাঙ্গণ এবং সূক্ষ্ম মেহরাবগুলো তাদের সরলতা ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া মেহতার মহল, গগন মহল এবং সাত তলা প্রাসাদের মতো অসংখ্য প্রাসাদ ও অন্যান্য ইমারত বিজাপুরকে একটি চমৎকার শহরে পরিণত করেছিল।

---

[১] 'এক এক' (ডুয়েল) বলতে দুই ব্যক্তির এমন লড়াইকে বোঝায় যা একজনের পরাজয় বা মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

সাংস্কৃতিক কীর্তিসমূহ:

আদিল শাহী শাসকরা শিল্প ও সাহিত্যের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আদিল শাহী দরবারকে সাহিত্য, কবিতা এবং চিত্রশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হতো। ইব্রাহিম আদিল শাহ সানিকে বিভিন্ন শিল্পে দক্ষতার কারণে 'জগত গুরু' (সারা বিশ্বের শিক্ষক) উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিজেও একজন লেখক ছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'কিতাবে নওরস' সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত।

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

শাসকদের তালিকা

ক্রমিক নং শাসক সময়কাল বিশেষ তথ্য

১ ইউসুফ আদিল শাহ ৮৯৫ হিজরি থেকে ৯১৫ হিজরি (১৪৯০ খ্রি. থেকে ১৫০৯ খ্রি.) ইতনা আশারি মতবাদ গ্রহণ করেন

২ ইসমাইল আদিল শাহ ৯১৫ হিজরি থেকে ৯৪১ হিজরি (১৫০৯ খ্রি. থেকে ১৫৩৪ খ্রি.) বিজয়নগরের সাথে যুদ্ধে পরাজয়

৩ মালু আদিল শাহ ৯৪১ হিজরি (১৫৩৪ খ্রি.) ভোগবিলাসী এবং অযোগ্য

৪ ইব্রাহিম আদিল শাহ ৯৪১ হিজরি থেকে ৯৬৫ হিজরি (১৫৩৫ খ্রি. থেকে ১৫৫৭ খ্রি.) শিয়া মতবাদ ত্যাগ, সুন্নি হওয়ার ঘোষণা, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচক্ষণ শাসক

৫ আলী আদিল শাহ ৯৬৫ হিজরি থেকে ৯৮৮ হিজরি (১৫৫৭ খ্রি. থেকে ১৫৭৯ খ্রি.) শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন, বিজয়নগর বিজয়

৬ দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ ৯৮৮ হিজরি (১৫৭৯ খ্রি.) সম্রাট আকবরের কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন

৭ মুহাম্মদ আদিল শাহ ১০৩৬ হিজরি থেকে ১০৬৭ হিজরি (১৬২৭ খ্রি. থেকে ১৬৫৬ খ্রি.) মুঘলদের করদ রাজ্য

৮ আলী আদিল শাহ ১০৬৭ হিজরি থেকে ১০৮৩ হিজরি (১৬৫৬ খ্রি. থেকে ১৬৭২ খ্রি.) মুঘলদের করদ রাজ্য

৯ সিকান্দার আদিল শাহ ১০৮৩ হিজরি থেকে ১০৯৬ হিজরি (১৬৭২ খ্রি. থেকে ১৬৮৫ খ্রি.) আওরঙ্গজেব আলমগীরের আক্রমণে রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়

- তারিখে হিন্দুস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী): চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা ৫০৮ থেকে ৫৮০
- তারিখে ফিরিশতা, ওয়াহবি: (মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা) দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ২ থেকে ১৯১, তৃতীয় প্রবন্ধ
- নুজহাতুল খাওয়াতীর: হাকিম আব্দুল হাই আল-হাসানী
- তারিখে দাক্ষিণাত্য ফার্সি, ডেপুটি আব্দুল আলিম নাসরুল্লাহ কর্তৃক, নওল কিশোর থেকে মুদ্রিত
- তারিখে মিল্লাত (মুফতি ইন্তিজামুল্লাহ শাহাবী, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠী): তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৯
- ইসলামি সালতানাত: ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)
- দাক্ষিণাত্য সাহিত্যের ইতিহাস, ডক্টর মহিউদ্দিন জোর কর্তৃক, প্রকাশক: উর্দু একাডেমি সিন্ধু

(দ্বিতীয়) নিজাম শাহী হুকুমত - আহমদনগর

৮৯৬ হিজরি থেকে ১০৪২ হিজরি

(১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)

দাক্ষিণাত্যের বাহমানি সালতানাতের পতনের ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল "নিজাম শাহী", যার কেন্দ্র ছিল "আহমদনগর"। এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো:

আহমদ নিজামুল মুলক বাহরি: ৮৯৬ হিজরি থেকে ৯১৪ হিজরি (১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দ)

নিজাম শাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ নিজামুল মুলক বাহরি একটি হিন্দু পরিবার "ভৈরু" এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর পিতামাতা হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দাপ্তরিক কাজে দক্ষতার কারণে তিনি সুলতান আহমদ শাহ বাহমানির দরবারে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ধীরে ধীরে উজিরের পদে পৌঁছান। ৮৯৬ হিজরিতে (১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি বিদ্রোহ করেন এবং সুলতান মাহমুদ বাহমানির বাহিনীকে পরাজিত করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি তাঁর পারিবারিক পরিচয় "ভৈরু" পরিবর্তন করে "বাহরি" রাখেন এবং নিজাম শাহ বাহরি উপাধি নিয়ে শাসন করতে শুরু করেন। ৯০০ হিজরিতে তিনি দৌলতাবাদের কাছে আহমদনগর নামে একটি নতুন শহর গড়ে তোলেন এবং সেটিকে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেন। এই রাষ্ট্রটি পরবর্তীতে ইমাদ শাহীদের ওপর বিজয়ী হয়। এভাবে "বেরার" নিজাম শাহী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৯১৪ হিজরিতে (১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দ) নিজাম শাহের মৃত্যু হয়।

নিজাম শাহ তলোয়ার চালনার খুব শৌখিন ছিলেন, যার ফলে সেই যুগে ঘরে ঘরে মানুষকে তলোয়ার চালনার অনুশীলন করতে দেখা যেত। পুরো দাক্ষিণাত্যে জায়গায় জায়গায় তলোয়ার চালনার আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কিছুদিন পর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ তলোয়ারবাজ দাবি করত এবং দম্ভোক্তি করত। যখন মানুষের মধ্যে কোনো বিবাদ দেখা দিত এবং তারা নিজাম শাহের কাছে বিচার নিয়ে আসত, তখন তিনি নিজের শখ মেটানোর জন্য তাদের বলতেন যে, আমার সামনে তলোয়ার যুদ্ধ করো; যে তার প্রতিপক্ষকে আগে আঘাত করতে পারবে, ফয়সালা তার পক্ষেই হবে।

বিচার পাওয়ার এই পদ্ধতিটি উগ্র মেজাজের লোকদের মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, প্রতিদিন প্রচুর মানুষ বাদশাহর সামনে এসে লড়াই করত এবং প্রতিদিন সেখান থেকে অনেক লাশ সরানো হতো। যখন রক্তপাত অনেক বেড়ে গেল, তখন নিজাম শাহ এই মজলিস বন্ধ করে দিলেন।

এবং এই ধরণের লড়াইয়ের জন্য একটি বিশেষ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল যাকে "সিয়াহ চবুতরা" বলা হতো। পারস্পরিক বিরোধ মেটানোর এই লড়াই "এক-এক" নামে পরিচিতি লাভ করে এবং পুরো দাক্ষিণাত্যে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিটি ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয় ছিল। এতে উভয় পক্ষ ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেত যতক্ষণ না তাদের একজন পরাজিত বা নিহত হতো। একে "ডুয়েল" বলা হতো। উপমহাদেশে এটি প্রথমবার আহমদনগরে শুরু হয় এবং এরপর পুরো দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এর নেতিবাচক প্রভাব এই হয়েছিল যে, দাক্ষিণাত্যের মানুষ কেবল তরবারি চালনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ঘোড়সওয়ারি, নেজাবাজি এবং তীরন্দাজি থেকে তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। নিঃসন্দেহে তরবারি চালনার শিল্পে তারা এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে উপমহাদেশে তাদের কোনো সমকক্ষ ছিল না, তবে এই দক্ষতা ছিল কেবল কৌশলগত দিক থেকে এবং তাও আখড়াগুলোর সীমাবদ্ধতার মধ্যে। এই কারণেই গলি-মহল্লার এই সিংহদের যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো হতো, তখন তারা খুব দ্রুত পরাজিত হতো।

বুরহান বিন নিজাম শাহ: ৯১৩ হিজরি থেকে ৯৬১ হিজরি (১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ):

নিজাম শাহের পর তার পুত্র বুরহান শাহ সাত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এটি ছিল তার শিক্ষার সময়। তিনি এতটাই মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে দশ বছর বয়সে নাহু-এর কঠিন কিতাব কাফিয়া পড়তেন। ৯২৮ হিজরিতে যখন বুরহান শাহ যুবক হয়েছিলেন, তখন শাহ তাহির নামক এক শিয়া পীর আহমদনগরে আসেন এবং মাহদাবিয়া ফেরকার খণ্ডনে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কয়েক বছরের মধ্যে তার মর্যাদা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, বুরহান শাহ তাকে নিজের উপদেষ্টা বানিয়ে নেন এবং বিশেষ অভিযানগুলোতে তার ওপর আস্থা রাখতে শুরু করেন, এমনকি নিজের মেয়ের বিয়েও তার পরিবারে দেন।

এই শাহ তাহিরের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ৯৪৪ হিজরিতে বুরহান শাহ ইতনা আশারি মতবাদ গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রের সরকারি ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এই কারণেই তাকে "মুরুজ্জে মাজহাবে ইতনা আশারি" হিসেবে স্মরণ করা হয়। তিনি জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবা থেকে খুলাফায়ে সালাসা-এর নাম বাদ দিয়ে দেন এবং পতাকার রঙ এই বলে সবুজ করে দেন যে, বারো ইমামের পতাকাসমূহও সবুজ ছিল। এমনকি তিনি খুলাফায়ে রাশেদিন এবং তাদের অনুসারীদের গালিগালাজ ও অভিশাপ দেওয়ার জন্য সরকারি বেতনে তাবাররাই নিয়োগ করেন, যারা মসজিদ, বাজার এবং গলি-মহল্লায় সাহাবায়ে কেরামের অবমাননা করত।

এই অবস্থা দেখে উলামায়ে কেরাম এবং কিছু সামরিক কর্মকর্তা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তারা মোল্লা পীর মুহাম্মদ উস্তাদের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন: "বাদশাহকে শাহ তাহিরই পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব প্রথমে তাকে হত্যা করা হোক এবং বুরহান শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার ভাই আব্দুল কাদিরকে সিংহাসনে বসানো হোক।" অবশেষে মোল্লা পীর মুহাম্মদ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে বের হলেন এবং কেল্লা অবরোধ করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুরহান নিজাম শাহের অনুগতরা জয়ী হলো এবং মোল্লা পীর মুহাম্মদ গ্রেপ্তার হলেন।

বুরহান নিজাম শাহ আহলে সুন্নাতের জন্য নির্ধারিত ভাতাসমূহও শিয়াদের নামে করে দেন এবং চারপাশ থেকে রাফেজিদের একত্রিত করে আহমদনগরে পুনর্বাসিত করেন। বিজাপুরের শিয়া শাসক ইউসুফ আদিল শাহ এবং ইসমাইল আদিল শাহ তো রাফয প্রচারের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কবরে চলে গিয়েছিলেন, কারণ তারা সুন্নি আমিরদের বিদ্রোহের ভয়ে ভীত থাকতেন, কিন্তু বুরহান নিজাম শাহ সেই...

সবকিছু করে দেখালেন যার স্বপ্ন উপমহাদেশের রাফেজি ইমামগণ দীর্ঘকাল ধরে দেখে আসছিলেন।

বুরহান নিজাম শাহ ৪৮ বছর শাসন করেন এবং ৯৬১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

হুসাইন বিন বুরহান: ৯৬১ হিজরি থেকে ৯৭২ হিজরি (১৫৫৩ খ্রি. থেকে ১৫৬৫ খ্রি.):

বুরহান শাহের উত্তরসূরি হুসাইন শাহ ত্রিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও ইসনা আশারি ছিলেন। অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে শাসন পরিচালনা করেন। পর্তুগিজরা তাকে কর প্রদান করত। ৯৭২ হিজরিতে (১৫৬৫ খ্রি.) তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সুলতানদের সাথে মিলে বিজয়নগরের রাজা রাম রাজের বিরুদ্ধে তালীকোটের বিখ্যাত যুদ্ধে লড়েন এবং বিজয় লাভ করেন। এগারো বছর শাসন করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুরতাজা বিন হুসাইন: ৯৭২ হিজরি থেকে ৯৯৬ হিজরি (১৫৬৫ খ্রি. থেকে ১৫৮৮ খ্রি.):

তার আমলে ইসনা আশারি মতবাদ চরম শিখরে পৌঁছে যায়। তার শাসনামলে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় এবং তাদের শক্তিশালী দুর্গ "রেওয়া ডান্ডা" (রেকান্ডা) অবরোধ করা হয়, কিন্তু পর্তুগিজদের শক্তি খর্ব করা সম্ভব হয়নি এবং অবরোধ ব্যর্থ হয়। ৯৮২ হিজরিতে (১৫৭৪ খ্রি.) মুরতাজা নিজাম শাহ তার সেনাপতি চেঙ্গিজ খানের মাধ্যমে প্রতিবেশী ইমাদ শাহী রাজবংশের সালতানাত "বেরার" জয় করেন। এই বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কারণে চেঙ্গিজ খান অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভীত হয়ে মুরতাজা শাহ কিছুকাল পর তাকে হত্যা করান।

মুরতাজা নিজাম শাহ পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং অনুশোচনার কারণে তিনি নির্জনবাস গ্রহণ করেন। এক-দুজন বিশেষ ভৃত্য ছাড়া তার কাছে কেউ থাকত না। সালতানাতের আমিরদের আবেদনপত্র তার কাছে আসত এবং তিনি জবাবে ফরমান লিখে পাঠিয়ে দিতেন। কিছুদিন পর নির্জনবাসের প্রতি তার এমন আসক্তি তৈরি হয় যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নির্জনতা থেকে বের হননি। ষোলো বছর পর্যন্ত তিনি এভাবেই নির্জনবাসী ছিলেন, তবে তার শাসন ব্যবস্থায় কোনো বিঘ্ন ঘটেনি কারণ তার প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন।

তবে শেষ পর্যন্ত তার পুত্র মিরান হুসাইন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাকে হাম্মামখানায় (গোসলখানায়) বন্দি করে তাপমাত্রা এতটাই বাড়িয়ে দেন যে পিতার দম বন্ধ হয়ে যায়। তার শাসনের মেয়াদ ছিল চব্বিশ বছর পাঁচ মাস।

মিরান হুসাইন বিন মুরতাজা: ৯৯৬ হিজরি থেকে ৯৯৭ হিজরি (১৫৮৮ খ্রি.):

মিরান হুসাইন ষোলো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বেপরোয়া এবং অবিবেচক বালক ছিলেন। সিংহাসনে বসার পরপরই তিনি তার অযোগ্য বন্ধুদের বড় বড় পদে বসিয়ে দেন। নিজে বখাটেদের সাথে আহমদনগরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতেন এবং যাকে খুশি তলোয়ার বা তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাতেন। অবশেষে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় যার ফলে তিনি নিহত হন।

ইসমাইল বিন বুরহান বিন হুসাইন: ৯৯৭ হিজরি থেকে ৯৯৯ হিজরি (১৫৮৮ খ্রি. থেকে ১৫৯০ খ্রি.):

এখন মুরতাজা শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ইসমাইল বিন বুরহানকে, যে অল্পবয়সী ছিল, সিংহাসনে বসানো হলো। শাসনকার্য একজন আমির মির্জা খানের...

হাতে ছিল। সরকারের ওপর প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের প্রভাবে এই অল্পবয়সী বাদশাহ মাহদবী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, যার অনুসারীরা সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীকে মাহদী মওউদ মনে করত। এরই ভিত্তিতে ইসমাইল সিংহাসনে আরোহণ করে ইসনা আশারি মাযহাবের রীতিনীতি বন্ধ করে দেন। এই সময়ে হিন্দুস্তানের অধিকাংশ অংশে জালালুদ্দিন আকবরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ইসমাইলের পিতা বুরহান নিজাম শাহ তাকে সমর্থন দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তার ছেলেকে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে বসেন। এই টানাপোড়েনের ফলে ইসমাইল গ্রেফতার হয়ে সিংহাসনচ্যুত হন।

বুরহান দ্বিতীয়: ৯৯৯ হিজরি থেকে ১০০৩ হিজরি (১৫৯০ খ্রি. থেকে ১৫৯৪ খ্রি.):

বুরহান নিজাম শাহ দ্বিতীয় সিংহাসনে আরোহণের পর আবারও ইসনা আশারি রীতিনীতি চালু করেন এবং মাহদবী মতবাদের অনুসারীদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেন। তিনি অত্যন্ত খবীস প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ১০০১ হিজরিতে (১৫৯২ খ্রি.) তিনি পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে লোক দেখানো যুদ্ধের জন্য বাহাদুর খান গিলানির নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের সুন্নি সৈন্যদের পর্তুগিজদের কেন্দ্র "রেভদন্ডা"-তে আক্রমণের জন্য পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল যাতে সুন্নি সৈন্যরা বেশি পরিমাণে নিহত হয়। বাস্তবেও তাই ঘটে এবং এই যুদ্ধে প্রায় দশ-বারো হাজার সৈন্য নিহত হয়। বুরহান শাহ এই পরাজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

কামাসক্তির চরম পর্যায়ে তিনি এই আদেশ জারি করেছিলেন যে, যেখানেই কোনো সুন্দরী নারী পাওয়া যাবে, তাকে যেন তার শয়নকক্ষে পৌঁছে দেওয়া হয়, চাই সে বিবাহিত হোক না কেন। এই অশুভ আদেশের আওতা থেকে দরবারীরাও নিরাপদ ছিল না। একবার তিনি শুনলেন যে তার ঘনিষ্ঠ আমির শুজাআত খান হাবশীর স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী। তিনি সেই নারীকে ডেকে পাঠালেন। শুজাআত খানকে যখন আদেশ পৌঁছানো হলো, তখন তিনি তার স্ত্রীকে দুর্গের একটি অন্ধকার কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখলেন, কিন্তু বাদশাহর কর্মচারীরা তাকে খুঁজে বের করে জোরপূর্বক আহমদনগরে বাদশাহর কাছে নিয়ে গেল। বাদশাহ যখন তাকে দেখলেন, তখন তার চেহারা বিশেষ পছন্দ হলো না। কর্মচারীদের বললেন তাকে ফেরত দিয়ে আসতে। কিন্তু এদিকে শুজাআত খান অপমানের জ্বালায় খঞ্জর দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

অবশেষে মজলুমদের বদদোয়ার কারণে বুরহান দ্বিতীয় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শাবান ১০০৩ হিজরিতে (১৫৯৪ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্রাহিম বিন বুরহান শাহ: ১০০৩ হিজরি থেকে ১০০৪ হিজরি (১৫৯৪ খ্রি.):

বুরহান শাহের পর তার পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তার সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই প্রাসাদে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চার মাস পর সালতানাতের আতাবাক মিয়াঁ মঞ্জু তাকে অপসারিত করে আহমদ শাহ নামক এক বারো বছরের ছেলেকে এই মনে করে সিংহাসনে বসান যে সে নিজাম শাহী বংশের সন্তান।

আহমদ দ্বিতীয়: ১০০৪ হিজরি (১৫৯৪ খ্রি.):

আহমদ শাহ সিংহাসনে আরোহণের পর তার বংশ পরিচয় নিয়ে তদন্ত করা হয় এবং জানা যায় যে রাজবংশের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে কয়েকদিন পরই তাকে অপসারিত করা হয়।

বাহাদুর শাহ: ১০০৪ হিজরি (১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

তাঁর স্থলে ইব্রাহিম শাহের পুত্র বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসানো হয়। তবে আহমদনগর সালতানাত দ্রুত পতনের দিকে যাচ্ছিল। একে রক্ষা করার জন্য শাহজাদী চাঁদ বিবি বিনতে হুসাইন নিজাম শাহ (যিনি ৯৭৪ হিজরিতে বিজাপুরের শাসক আলী আদিল শাহের সাথে বিবাহের পর থেকে বিজাপুরের রানী হিসেবে চলে আসছিলেন), নিজের ভূমিকা পালন করছিলেন।

বিবি চাঁদ সুলতান: ১০০৪ হিজরি থেকে ১০০৯ হিজরি (১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)

মুঘল সম্রাট জালালুদ্দিন আকবর নিজাম শাহীদের নিজের অধীনস্থ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু চাঁদ বিবি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। এই পরিস্থিতি দেখে আকবর দাক্ষিণাত্যে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাঁর নির্দেশে শাহজাদা মুরাদ ও আব্দুর রহিম খান-ই-খানান এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আহমদনগর অবরোধের জন্য এসে পৌঁছান। চাঁদ বিবি এই সময়ে "চাঁদ সুলতান" উপাধি গ্রহণ করে সালতানাতের বিষয়াবলী নিজের হাতে তুলে নেন এবং অবরুদ্ধ বাহিনীকে এমন বীরত্বের সাথে পরিচালনা করেন যে আকবরের বাহিনী অবাক হয়ে যায়। পরিশেষে মুঘল বাহিনী চাঁদ বিবির সাথে সন্ধি করে আহমদনগর তাঁর হাতেই ন্যস্ত করে এবং শুধুমাত্র "বেরার" অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়।

চাঁদ বিবি বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বহাল রাখেন এবং মুঘলদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিগুলো মেনে চলছিলেন কিন্তু সালতানাতের কিছু আমীর তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে মুঘলদের সাথে আঁতাতের অপবাদ দিতে থাকেন। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, সেই আমীররা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে মুঘলদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন। যুদ্ধের সময় দাক্ষিণাত্যের সৈন্যরা চাঁদ বিবিকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে হত্যা করে। এদিকে মুঘল বাহিনী শহরের প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। বাহাদুর শাহকে বন্দী করা হয়।

মুর্তজা সানি বিন শাহ কুলি বিন বুরহান আউয়াল: ১০০৯ হিজরি থেকে ১০১৯ হিজরি (১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ)

বাহাদুর শাহের পর মুর্তজা সানি বিন শাহ কুলি বিন বুরহান আউয়ালকে সিংহাসনে বসানো হয় কিন্তু সালতানাতে মালিক আম্বর হাবশী নামক এক মনসবদারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মালিক আম্বর হাবশী:

কিছুকাল পর কার্যত রাজবংশের শাসন শেষ হয়ে যায় এবং আম্বর হাবশীই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। মালিক আম্বর হাবশী বাহিনীকে বিশেষভাবে গেরিলা যুদ্ধের (গেরিলা যুদ্ধ) প্রশিক্ষণ দিতেন। যেহেতু বাহিনীতে বেশিরভাগই মারাঠা ছিল, তাই তারা এই যুদ্ধ পদ্ধতিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে মারাঠা সর্দার শিবাজী এই যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে মুঘল সম্রাটদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ান।

আকবর নিজাম শাহীদের পরাজিত অবশ্যই করেছিলেন কিন্তু তাদের কাছে কিছু এলাকা তবুও অবশিষ্ট ছিল এবং নামমাত্র নিজাম শাহী রাষ্ট্র ১০৪২ হিজরি (১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত কোনো না কোনো রূপে টিকে ছিল। অবশেষে শাহজাহান এর সমাপ্তি ঘটান।

নিজাম শাহী শাসনব্যবস্থার ওপর এক নজর

নিজাম শাহীরা দেড়শ বছর শাসন করেছিল। সরকারি ধর্ম ছিল ইতনা আশারি, তবে প্রজাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সুন্নি। নিজাম শাহী শাসকরা আহমদনগরকে তাদের রাজধানী বানিয়েছিলেন এবং একে শক্তিশালী দুর্গ ও সুন্দর দালানকোঠা দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন। তারা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে স্থাপত্যকলা ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে বিকশিত করেছিলেন। যদিও মুঘল এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্য রাজ্যের আক্রমণের কারণে এই সালতানাত খুব বেশি স্থিতিশীল থাকতে পারেনি, তবুও এটি তার সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছিল।

নিজাম শাহী সুলতানদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হলো:

- আহমদনগর দুর্গ: "আহমদনগর দুর্গ" ছিল নিজাম শাহী সালতানাতের কেন্দ্র। এটি শক্তিশালী প্রাচীর, বড় দরজা এবং বুরুজ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে এটি রক্ষা করা যায়, তবে বর্তমানে এটি ভালো অবস্থায় নেই।

- বাগ-ই-রওজা: এটি আহমদনগরে অবস্থিত একটি মাকবারা যা সুলতান আহমদ নিজাম শাহ আউয়ালের। এর নির্মাণশৈলী সাধারণ কিন্তু সুন্দর এবং এটি নিজাম শাহী স্থাপত্যকলার প্রাথমিক নিদর্শন।

- ফারাহ বখশ মহল: এই প্রাসাদটি ছিল নিজাম শাহী সুলতানদের আবাসস্থল। এটি ছিল একটি বিশাল ও প্রশস্ত ভবন যা এর সুন্দর বিন্যাস এবং মনোরম বাগানের জন্য বিখ্যাত ছিল।

সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অর্জনসমূহ:

নিজাম শাহী যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক উন্নতি লাভ করেছিল, বিশেষ করে স্থানীয় দাক্ষিণাত্য ভাষা এবং এর সাহিত্যের প্রসার ঘটেছিল। নিজাম শাহী শাসকরা ফারসির পাশাপাশি দাক্ষিণাত্য উর্দু ভাষাকেও সরকারি ও দরবারি ভাষা হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এর ফলে স্থানীয় ভাষায় কবিতা ও গদ্যের উন্নতি ঘটে এবং একটি নতুন সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সূচনা হয়। যদিও নিজাম শাহী যুগে জ্ঞান ও সাহিত্যের খুব বেশি প্রসার ঘটেনি, তবে কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি ও কবি এই যুগকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, যেমন হাসান শওকি ছিলেন এই যুগের একজন বিশিষ্ট কবি, যার সম্পর্ক ছিল আহমদনগরের সাথে। তিনি তার কবিতায় স্থানীয় রঙ ও বিষয়বস্তুকে স্থান দিয়েছিলেন।

সামগ্রিকভাবে, নিজাম শাহী সালতানাত তার সংক্ষিপ্ত ও অস্থির সময়ে দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যে অবদান রেখেছিল এবং একটি অনন্য পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

শাসকদের তালিকা

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ তথ্য

১ আহমদ নিজামুল মুলক বাহরি ৮৯৬ হিজরি থেকে ৯১৪ হিজরি (১৪৯১ থেকে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ বুরহান নিজাম শাহ ৯১৪ হিজরি থেকে ৯৬১ হিজরি (১৫০৯ থেকে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) শিয়া হয়ে শিয়া মতবাদকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন

৩ হুসাইন বিন বুরহান নিজাম ৯৬১ হিজরি থেকে ৯৭২ হিজরি (১৫৫৩ থেকে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ইসনা আশারিয়া মতবাদ প্রচার করেন

৪ মুর্তজা বিন হুসাইন ৯৭২ হিজরি থেকে ৯৯৬ হিজরি (১৫৬৫ থেকে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ) ইসনা আশারিয়া মতবাদের প্রসার - পর্তুগিজদের সাথে যুদ্ধ

৫ মিরান হুসাইন ৯৯৬ হিজরি থেকে ৯৯৭ হিজরি (১৫৮৮ থেকে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ) অযোগ্য - সংক্ষিপ্ত সময়কাল

৬ ইসমাইল বিন বুরহান ৯৯৭ হিজরি থেকে ৯৯৯ হিজরি (১৫৮৮ থেকে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ) অল্পবয়স্ক শাসক, সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর হাতে বাইয়াত হয়ে মাহদাবিয়াত গ্রহণ করেন। শিয়া মতবাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা।

৭ দ্বিতীয় বুরহান ৯৯৯ হিজরি থেকে ১০০৩ হিজরি (১৫৯০ থেকে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ) শিয়া মতবাদের পুনরায় প্রসার - পর্তুগিজদের সাথে যুদ্ধ - অত্যন্ত ভোগবিলাসী

৮ ইব্রাহিম বিন বুরহান শাহ ১০০৩ হিজরি থেকে ১০০৪ হিজরি (১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের চরম শিখর

৯ দ্বিতীয় আহমদ ১০০৪ হিজরি (১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ) দুর্বল শাসক

১০ বাহাদুর শাহ বিন ইব্রাহিম ১০০৪ হিজরি (১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ) দুর্বল শাসক

১১ চাঁদ বিবি ১০০৪ হিজরি থেকে ১০০৯ হিজরি সাহসী নারী - তত্ত্বাবধায়ক শাসক

১২ দ্বিতীয় মুর্তজা ১০০৯ হিজরি থেকে ১০১৯ হিজরি (১৯১০ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) দুর্বল শাসক

https://t.me/BoierSomahar

১৩. বুরহান নিজাম শাহ তৃতীয় | ১০১৯ হিজরি থেকে ১০৪১ হিজরি (১৬১০ থেকে ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দ) | গেরিলা যুদ্ধের বিশেষজ্ঞ মালিক আম্বর হাবশীর অধীনে ছিলেন।

১৪. হুসাইন নিজাম শাহ দ্বিতীয় | ১০৪১ হিজরি থেকে ১০৪৩ হিজরি (১৬৩১ থেকে ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ) | কার্যত মালিক আম্বর হাবশী শাসক ছিলেন।

১৫. মুর্তজা নিজাম শাহ তৃতীয় | ১০৪৩ হিজরি থেকে ১০৪৬ হিজরি (১৬৩৩ থেকে ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ) | শাহজাহানের বাহিনী রাজ্যটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

উৎসসমূহ:

- তারিখ-ই-হিন্দুস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী): চতুর্থ খণ্ড: ৬৬৬ থেকে ৫৮১
- তারিখ-ই-ফেরেশতা, বোম্বে: (মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮০ থেকে ৩২৭, তৃতীয় প্রবন্ধ
- নুজহাতুল খাওয়াত্বির: হাকিম আব্দুল হাই হাসানী
- তারিখ-ই-দাক্ষিণাত্য ফারসি, এডিপি আব্দুল আলিম নসরুল্লাহ, লখনউ থেকে প্রকাশিত
- ইসলামি সালতানাত: ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)
- তারিখ-ই-মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবি, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠী): তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৩ থেকে ৬৩৬

(তৃতীয়) কুতুব শাহী হুকুমত—গোলকোন্ডা (তেলেঙ্গানা)

৯১৮ হি. থেকে ১০৯৮ হি.

(১৫১২ খ্রি. থেকে ১৬৮৭ খ্রি.)

দাক্ষিণাত্যের এই রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল গোলকোন্ডার "কুতুব শাহী" রাজ্য, যা ওয়ারাঙ্গালের ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠেছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত একজন সামরিক কর্মকর্তা সুলতান কুলি কুতুবুল মুলক। একবার তিনি সুলতান মাহমুদ বাহমানীর ওপর ঘাতক আক্রমণকারীদের অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করেছিলেন। এই সেবার পুরস্কার হিসেবে তিনি অনেক সম্মান লাভ করেন এবং অবশেষে তাকে তেলেঙ্গানার (গোলকোন্ডা) শাসক নিযুক্ত করা হয়।

সুলতান কুলি কুতুবুল মুলক: ৯১৮ হি. থেকে ৯৫০ হি. (১৫১২ খ্রি. থেকে ১৫৪৩ খ্রি.):

কুলি উনিশ বছর বাহমানী রাজ্যের অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সেবা করেছিলেন, কিন্তু ৯১৮ হিজরিতে তিনি বিদ্রোহ করে গোলকোন্ডার স্বাধীন শাসক হয়ে বসেন। তিনি ছিলেন একজন কট্টর ইসনা আশারি। তিনি শপথ করেছিলেন যে, যদি তিনি রাজত্ব পান তবে তিনি ইসনা আশারি মাযহাব প্রচারে কোনো ত্রুটি রাখবেন না। ফলে তিনি তার এই সংকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেন।

তিনি ওয়ারাঙ্গাল থেকে রাজামুন্দ্রি পর্যন্ত মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রায় সত্তরটি দুর্গ জয় করেন। যখন তার শাসন এলাকা অনেক বিস্তৃত হয়ে গেল, তখন তিনি গোলকোন্ডার কাছে "মুহাম্মাদাবাদ" নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন এবং একে নিজের রাজধানী বানান।

তিনি সামগ্রিকভাবে ষাট বছর শাসন করেন। ষোল বছর তেলেঙ্গানায় বাহমানী বাদশাহদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং চুয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। একশ বছরেরও বেশি বয়স পেয়েছিলেন। অবশেষে ২রা জমাদিউল আখিরা ৯৫০ হিজরিতে গোলকোন্ডার কেল্লাদার মাহমুদ হামদানীর এক ঘাতক হামলায় তিনি নিহত হন।

জমশীদ কুলি কুতুব শাহ: ৯৫০ হি. থেকে ৯৫৭ হি. (১৫৪৩ খ্রি. থেকে ১৫৫০ খ্রি.):

তিনি কিছুকাল প্রতিবেশী দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ এবং হিন্দু রাজাদের সাথে যুদ্ধে অতিবাহিত করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নির্জনে বসে ভোগবিলাস এবং মদ্যপানে মগ্ন হয়ে পড়েন এবং নিজের স্বাস্থ্যও নষ্ট করে ফেলেন।

সাত বছর শাসন করে মৃত্যুবরণ করেন।

সুবহান কুলি কুতুব শাহ: ৯৫৭ হিজরি (১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ)

সুবহান কুলি সাত বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন, তখন রাষ্ট্রীয় কার্যাদি আমির আইনুল মুলকের হাতে ছিল। এই অবস্থা দেখে জামশেদের ভাই ইব্রাহিম বিদ্রোহ করেন এবং সুবহান কুলিকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেন।

ইব্রাহিম কুলি কুতুব শাহ: ৯৫৭ হিজরি থেকে ৯৮৮ হিজরি (১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ):

ইব্রাহিম একজন চতুর শাসক হিসেবে প্রমাণিত হন। তিনি তালীকোটের যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সুলতানদের সাথে মিলে অংশগ্রহণ করেন এবং রাম রাজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। পরবর্তীতে দাক্ষিণাত্যের শাসকদের সাথেই তার যুদ্ধ চলতে থাকে। তিনিও ইসনা আশারি ছিলেন। তার মেজাজে জুলুম ও সহিংসতা মিশে ছিল। সামান্য বিষয়ে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং মানুষের প্রাণ নেওয়া তার অভ্যাস ছিল। যাদের ওপর তিনি রাগান্বিত হতেন, তাদের পায়ের আঙুলে চাবুক মেরে নখ উপড়ে ফেলতেন এবং বলতেন যে, এই নখগুলো একটি পাত্রে ভরে আমার সামনে নিয়ে এসো যাতে আমি তৃপ্তি পাই। ইব্রাহিম কুতুব শাহ ৩১ বছর শাসন করেন এবং ৫১ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ: ৯৮৮ হিজরি (১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ):

ইব্রাহিমের পর তার তৃতীয় পুত্র মুহাম্মদ কুলি শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার প্রেমিকার নাম ছিল “ভাগমতী”, যার নামে তিনি রাজধানী থেকে পনের মাইল দূরে মুসা নদীর তীরে একটি নতুন শহর “ভাগনগর” পত্তন করেন এবং সেটিকে রাজধানী বানান। পরবর্তীতে এর নাম হয় “হায়দ্রাবাদ”। তিন দশকের মধ্যে এই শহরটি বেশ জনবহুল হয়ে ওঠে। আগ্রা এবং লাহোর থেকেও মানুষ এসে এখানে বসবাস শুরু করে। মুহাম্মদ কুলির পরেও এই বংশে অনেক শাসক আসেন। সামগ্রিকভাবে এই বংশে দশজন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন। এরপরও নামমাত্র শাসন আওরঙ্গজেব আলমগীরের সময় পর্যন্ত কায়েম ছিল। বিজাপুরের আদিল শাহী এবং আহমদনগরের নিজাম শাহীদের সাথে গোলকুণ্ডার প্রায়ই সংঘর্ষ চলত।

কুতুব শাহী সালতানাতের নির্মাণ ও সাংস্কৃতিক কীর্তিসমূহ:

কুতুব শাহী সালতানাত দাক্ষিণাত্যে ইসনা আশারি মতবাদের প্রচার করে। এছাড়া স্থাপত্যকলা, সভ্যতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ফারসি, তুর্কি এবং স্থানীয় দাক্ষিণাত্যের সভ্যতার সংমিশ্রণে এক অনন্য সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল হায়দ্রাবাদ শহর। মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ একজন স্থাপত্য বিশেষজ্ঞও ছিলেন, যিনি হায়দ্রাবাদ শহরকে একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার অধীনে নির্মাণ করেন। হায়দ্রাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণ মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহের স্মরণীয় কীর্তি। তিনি তার পুরনো রাজধানী গোলকুণ্ডা থেকে বেরিয়ে (১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে) এই শহরটি পত্তন করেন এবং এর নাম দেন “ভাগনগর”। পরবর্তীতে একে হযরত আলী (রা.)-এর দিকে নিসবত করে “হায়দ্রাবাদ” বলা হতে থাকে। এর মৌলিক কাঠামো অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়, কিন্তু এর গুরুত্বপূর্ণ ইমারতসমূহ, যেমন মক্কা মসজিদ, এর নির্মাণ কাজ কয়েক দশক ধরে চলতে থাকে। হায়দ্রাবাদকে মুসা নদীর তীরে একটি তুলনামূলক উঁচু ও উন্মুক্ত স্থানে পত্তন করা হয়েছে।

যাতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও গরমের সমস্যা সৃষ্টি না হয়। শহরের কেন্দ্রে চারমিনার নির্মাণ করা হয়েছিল যেখান থেকে চারটি প্রধান সড়ক চার দিকে চলে গিয়েছিল। এভাবে শহরটিকে একটি সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ দেওয়া হয়েছিল, যার ভিত্তি ছিল পারস্য ও দাক্ষিণাত্য নির্মাণশৈলীর ওপর। পানি সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল প্রথম ভারতীয় শহর যা একটি সুসংগঠিত ও বর্গাকার আকারে গড়ে তোলা হয়েছিল। এর পথগুলো ছিল সোজা এবং চকে গিয়ে শেষ হতো। যেহেতু এই শহরটি মুসি নদীর তীরে এবং বিজাপুর ও গোলকুন্ডার মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল, তাই এটি খুব দ্রুত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কুতুব শাহীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারত নিম্নরূপ:

চারমিনার: এই মিনার হায়দ্রাবাদের প্রতীক এবং সবচেয়ে বিখ্যাত ইমারত যা মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ ৯৯৯ হিজরি (১৫৯১ খ্রিস্টাব্দ) সালে একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের স্মরণে নির্মাণ করেছিলেন। এটি একটি অনন্য নির্মাণশৈলী; চারটি সুউচ্চ মিনার এবং সেগুলোর ছাদে একটি মসজিদ রয়েছে যার জন্য এটি বিখ্যাত।

গোলকুন্ডা দুর্গ: এটি কুতুব শাহী সালতানাতের প্রাথমিক রাজধানী এবং একটি অপরাজেয় দুর্গ ছিল যা প্রাচীনকালে একটি পাহাড়ের ওপর নির্মিত হয়েছিল। এর ভিত্তি কাকতীয় রাজবংশের রাজারা স্থাপন করেছিলেন। এরপর বিভিন্ন হিন্দু রাজাদের সাথে সাথে সময়ের ব্যবধানে এর সম্প্রসারণ ঘটে। বাহমানি সুলতানদের অধীনে আসার পর এর মেরামত ও সম্প্রসারণ করা হয়। তবে এর বর্তমান রূপ ও মজবুত করার কৃতিত্ব কুতুব শাহী শাসকদের। বিশেষ করে কুলি কুতুব শাহ একে মজবুত করেন এবং এর ভেতরে ইমারত, মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করান। এই দুর্গের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং শব্দ ব্যবস্থা (Acoustic system) সেই যুগের কারিগরি দক্ষতার প্রমাণ।

কুতুব শাহী গম্বুজসমূহ: গোলকুন্ডা দুর্গের কাছে অবস্থিত এই মাকবারাগুলো কুতুব শাহী শাসকদের মাজার। এই সুন্দর মাকবারাগুলো পারস্য ও ভারতীয় নির্মাণশৈলীর সংমিশ্রণের এক চমৎকার উদাহরণ।

মক্কা মসজিদ: এটি হায়দ্রাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ইমারত। এর ভিত্তি মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ স্থাপন করেছিলেন, যিনি কুতুব শাহীদের পঞ্চম শাসক এবং হায়দ্রাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই মসজিদটি প্রায় ৮০ বছরে সম্পন্ন হয়েছিল এবং এর সমাপ্তি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে হয়েছিল। এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর নির্মাণে মক্কা মুয়াজ্জমার মাটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই এর নাম মক্কা মসজিদ রাখা হয়েছে। এটি দাক্ষিণাত্যে ইসলামি নির্মাণশৈলীর একটি মহান ও জাঁকজমকপূর্ণ নিদর্শন। এখানে এক সময়ে দশ হাজার মানুষ সালাত আদায় করতে পারেন।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা:

কুতুব শাহী আমলে দাক্ষিণাত্য উর্দুর ব্যাপক প্রসার ঘটে। এটি ছিল প্রথম যুগ যখন দাক্ষিণাত্য উর্দু একটি আনুষ্ঠানিক ও সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে। এই যুগের সংস্কৃতি ছিল পারস্য, তুর্কি এবং স্থানীয় তেলেগু সংস্কৃতির এক সুন্দর সংমিশ্রণ। এখানকার শাসকরা পারস্য ও ভারতীয় সভ্যতাকে একত্রিত করে একটি নতুন সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি করেছিলেন। কুতুব শাহী দরবার ছিল জ্ঞান ও সাহিত্যের কেন্দ্র, যার সাথে অনেক নামী-দামী আলেম ও কবি যুক্ত ছিলেন। মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ উর্দুর প্রথম সাহেবে দিওয়ান কবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর কালামে ধর্মীয় ভক্তি, সামাজিক জীবন, প্রকৃতি এবং স্থানীয় উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মোল্লা ওয়াজহি এই যুগের একজন মহান কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর মসনবী ‘কুতুব মুস্তারি’ এবং গদ্যের বই ‘সব রস’ দাক্ষিণাত্য (দকনি) সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। সৈয়দ মাহমুদও এই যুগের একজন সুফি কবি ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় সুফিবাদ ও প্রেমের বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

শাসকদের তালিকা

- ১. সুলতান কুলি কুতুবুল মুলক | ৯১৮ হিজরি থেকে ৯৫০ হিজরি (১৫১২ খ্রি. থেকে ১৫৪৩ খ্রি.) | ইসনা আশারি, সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা, দীর্ঘ শাসনকাল।
- ২. জমশিদ কুলি কুতুব শাহ | ৯৫০ হিজরি থেকে ৯৫৭ হিজরি (১৫৪৩ খ্রি. থেকে ১৫৫০ খ্রি.) | ভোগবিলাসী, অযোগ্য।
- ৩. সুবহান কুলি কুতুব শাহ | ৯৫৭ হিজরি (১৫৫০ খ্রি.) | সংক্ষিপ্ত শাসনকাল।
- ৪. ইব্রাহিম কুলি কুতুব শাহ | ৯৫৭ হিজরি থেকে ৯৮৮ হিজরি (১৫৫০ খ্রি. থেকে ১৫৮০ খ্রি.) | ইসনা আশারি, সাহসী, আলেম, বিজয়নগর বিজয়।
- ৫. মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ | ৯৮৮ হিজরি থেকে ১০২০ হিজরি (১৫৮০ খ্রি. থেকে ১৬১১ খ্রি.) | চারুকলা অনুরাগী ও পারদর্শী।
- ৬. সুলতান মুহাম্মদ কুতুব শাহ | ১০২০ হিজরি থেকে ১০৩৫ হিজরি (১৬১১ খ্রি. থেকে ১৬২৬ খ্রি.) | জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী।
- ৭. আবদুল্লাহ কুতুব শাহ | ১০৩৫ হিজরি থেকে ১০৮৩ হিজরি (১৬২৬ খ্রি. থেকে ১৬৭২ খ্রি.) | দীর্ঘ শাসনকাল, কবিতায় পারদর্শিতা, শাহজাহান তাকে পরাজিত করেন।
- ৮. আবুল হাসান কুতুব শাহ | ১০৮৩ হিজরি থেকে ১০৯৮ হিজরি (১৬৭২ খ্রি. থেকে ১৬৮৭ খ্রি.) | শেষ শাসক। আওরঙ্গজেব আলমগীর রাজ্যটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উৎস:

- তারিখ-ই-হিন্দুস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী): চতুর্থ খণ্ড: ৭৬০ থেকে ৭৯৬।
- তারিখ-ই-ফিরিশতা, মধ্যযুগ: (মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা) দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ৩২৮ থেকে ৩৪২, তৃতীয় প্রবন্ধ।
- তারিখ-ই-মামলাকাত (মুফতি ইন্তিজামুল্লাহ শাহাবি, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠি): তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৮।
- নুযহাতুল খাওয়াতির: হাকিম আব্দুল হাই আল-হাসানি।
- নিগাহি বে তারিখ-ই-হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য, মুজতবা কারামি কর্তৃক, তেহরান থেকে প্রকাশিত।
- তারিখ-ই-দাক্ষিণাত্য ফারসি, ডেপুটি আব্দুল হালিম কাসরুল্লাহ কর্তৃক, নাওয়াল কিশোর থেকে প্রকাশিত।
- ইসলামী সালতানাতসমূহ, ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)।
- তারিখ-ই-কুতুব শাহী, সৈয়দ বুরহানুদ্দিন আহমদ কর্তৃক, প্রকাশক শারকি বুরহানিয়া হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য।

তারেখে উম্মতে মুসলিমা

(চতুর্থ) ইমাদ শাহী হুকুমত — বেরার

৮৯৫ হিজরি থেকে ৯৮২ হিজরি

(১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ)

ইমাদ শাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠা বাহমানী সালতানাতের পতনের পর কার্যকর হয় এবং এটি "বেরার"-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রথম রাষ্ট্র, যেখানে দাক্ষিণাত্যের সিপাহসালার ফাতহুল্লাহ ইমাদুল মুলক ৮৯৫ হিজরি (১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ) সালে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন যা খানদেশ এবং আহমদনগরের পূর্বে বিস্তৃত ছিল। এই সালতানাত তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের জন্য টিকে ছিল এবং এতে মাত্র চারজন শাসক শাসন করেছিলেন।

ইমাদুল মুলক: ৮৯৫ হিজরি থেকে ৯১০ হিজরি (১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ): তিনি ছিলেন এই সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মূলত বিজয়নগরের একজন হিন্দু গোলাম ছিলেন যাকে বাহমানী সালতানাত যুদ্ধে বন্দী করেছিল। তিনি নিজের যোগ্যতার বলে একজন সাধারণ কর্মচারী থেকে বেরারের সুবাদারের পদে পৌঁছে যান। এবং পরবর্তীতে বাহমানী সালতানাতের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অচলপুরকে নিজের রাজধানী বানান এবং গাউইলগড় ও নরনালার দুর্গগুলোকে শক্তিশালী করেন।

আলাউদ্দিন ইমাদ শাহ: ৯১০ হিজরি থেকে ৯৩৫ হিজরি (১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ): ইমাদুল মুলকের পর তার পুত্র আলাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন এই বংশের প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের নামের সাথে শাহ যুক্ত করেছিলেন। তিনিই কাভিল (গাউইল) দুর্গটিকে নিজের রাজধানী বানান। তার শাসনকাল ছিল আহমদনগর এবং বিজাপুরের সাথে যুদ্ধের সময়। তাকে নিজের সালতানাত রক্ষার জন্য অনেকবার গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তার আমলে নিজাম শাহী রাষ্ট্রের শাসক বুরহান শাহ শিয়া ধর্ম গ্রহণ করার পর আশেপাশের দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করেন। এই সময়ে তিনি ইমাদ শাহীদের দুটি দুর্গ: মাহুর এবং রামগির (রায় নগর) ছিনিয়ে নেন, যার ফলে আলাউদ্দিন ইমাদ শাহ খানদেশের শাসক মিরান মুহাম্মদ খানকে সাথে নিয়ে বুরহান নিজাম শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন কিন্তু অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইমাদ শাহ এবং মিরান মুহাম্মদ খান পরাজিত হন এবং বুরহান নিজাম শাহ বিজয়ী থাকেন। বেরার এবং আহমদনগরের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের ধারা অব্যাহত ছিল যখন আলাউদ্দিন ইমাদ শাহের মৃত্যু হয়।

দরিয়া ইমাদ শাহ: ৯৩৫ হিজরি থেকে ৯৬৯ হিজরি (১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দ): দরিয়া ইমাদ শাহ তার পিতার পর শাসনভার গ্রহণ করেন। তার...

সময়কালটি তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল এবং তিনি অন্যান্য দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের সাথে সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন।

বুরহান ইমাদ শাহ: ৯৭০ হিজরি থেকে ৯৮২ হিজরি (১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ): দরিয়া ইমাদ শাহের পুত্র বুরহান শাহ ছিলেন এই বংশের শেষ শাসক। তার অল্প বয়সের কারণে তার উজির তুফাল খান ক্ষমতার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তার স্বৈরাচারী শাসন এই ছোট সালতানাতকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল।

তুফাল খান: ৯৮২ হিজরি (১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ): অবশেষে তুফাল খান বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রের বিষয়াবলি নিজের হাতে তুলে নেন এবং বুরহান ইমাদ শাহকে বন্দি করে নিজে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই পরিস্থিতি আহমাদনগরের নিজাম শাহী শাসক মুর্তজা নিজাম শাহকে বেরার আক্রমণ করার অজুহাত তৈরি করে দেয়। ফলে তিনি ৯৮২ হিজরিতে (১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) আক্রমণ করে এই সালতানাতের অবসান ঘটান। এই রাষ্ট্রটি এক শতাব্দীও পূর্ণ করতে পারেনি। এটি ছিল দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সালতানাতের মধ্যে প্রথম সালতানাত যার পতন ঘটেছিল।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মতে মুসলিমা

ইমাদ শাহী শাসকদের তালিকা, বেরার

নম্বর শাসক সময়কাল বিশেষ তথ্য

১ ফাতহুল্লাহ ইমাদুল মুলক ৮৯৫ হি. থেকে ৯১০ হি. (১৪৮৫ খ্রি. থেকে ১৫০৪ খ্রি.) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ আলাউদ্দিন ইমাদ শাহ ৯১০ হি. থেকে ৯৩৫ হি. (১৫০৪ খ্রি. থেকে ১৫২৯ খ্রি.) আহমাদনগর ও বিজাপুরের সাথে যুদ্ধসমূহ

৩ দরিয়া ইমাদ শাহ ৯৩৭ হি. থেকে ৯৭০ হি. (১৫২৯ খ্রি. থেকে ১৫৬২ খ্রি.) শান্তিপূর্ণ যুগ

৪ বুরহান ইমাদ শাহ ৯৭০ হি. থেকে ৯৮২ হি. (১৫৬২ খ্রি. থেকে ১৫৭৪ খ্রি.) অল্পবয়স্ক পুতুল রাজা

৫ তুফাল খান ৯৮২ হি. (১৫৭৪ খ্রি.) শেষ শাসক

তথ্যসূত্র:

- তারিখ-ই-হিন্দোস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী), চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯ থেকে ৭৫৩
- তারিখ-ই-ফিরিশতা, মোল্লা মাসিহি (মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩২ থেকে ৩৩৬, তৃতীয় প্রবন্ধ
- নুযহাতুল খাওয়াতির, হাকীম আব্দুল হাই আল-হাসানী
- তারিখ-ই-দাক্ষিণাত্য, ক্বারী মাযুনি আব্দুল হালিম নাসরুল্লাহ, নওল কিশোর থেকে মুদ্রিত
- ইসলামী সালতানাতসমূহ, ক্লিফোর্ড ই. ডব্লিউ. বসওয়ার্থ (অনুবাদ: নীলম জাওয়াদ)
- তারিখ-ই-মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শিহাবী, কাজী জয়নুল আবেদীন সাজ্জাদ মিরাঠী), তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৬ থেকে ৬৩৭

https://t.me/BoierSomahar

(পঞ্চম) বারিদ শাহী হুকুমত - বিদার

৮৯২ হি. থেকে ১০২৮ হি.

(১৪৮৯ খ্রি. থেকে ১৬১৯ খ্রি.)

বাহমানি শাসনের শেষ দিনগুলোতে বারিদি বংশের আমিরগণ সালতানাতের রাজধানী 'বিদারে' সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। বাহমানি সালতানাতের শেষ চারজন শাসক ছিলেন নামমাত্র সুলতান এবং প্রজাসাধারণ ও সেনাবাহিনীর ওপর উজির-এ-সালতানাত আমির কাসিম বারিদের শাসন চলত। বাহমানি বংশের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের মূল রাজধানী 'বিদারে' বারিদি বংশের এই ছোট শাসনটিই অবশিষ্ট থেকে যায়। দাক্ষিণাত্যের প্রতিবেশী শিয়া রাষ্ট্রগুলোর বিপরীতে এটি ছিল একটি কট্টর সুন্নি রাষ্ট্র।

কাসিম বারিদ: ৮৯২ হি. থেকে ৯১০ হি. (১৪৮৯ খ্রি. থেকে ১৫০৪ খ্রি.):

দাক্ষিণাত্যের বাহমানি সালতানাতের উজির কাসিম বারিদ বংশগতভাবে ছিলেন একজন জর্জীয় তুর্কি গোলাম, যাকে মুহাম্মদ শাহ বাহমানি ক্রয় করেছিলেন। তিনি জ্ঞান-গুণ এবং কৌশল ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি উচ্চ পদে আসীন হন।

তিনি মারাঠাদের সাথে অনেক যুদ্ধ করেন এবং বড় বড় বিজয় অর্জনের মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করেন। তিনিই মারাঠাদের সবচেয়ে বড় সর্দার সাম্ভাজিকে পরাজিত করে হত্যা করেন এবং পরে তার মেয়ের সাথে নিজের ছেলে আমির আলী বারিদের বিয়ে দেন। এই সম্পর্কের কারণে চারশ মারাঠা সর্দার বারিদি পরিবারের অনুগত হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এই সর্দারদের কারণেই এই শাসন দীর্ঘকাল সুসংহত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাহমুদ শাহ বাহমানির আমলে আমির কাসিম বারিদ কার্যত সমস্ত বিষয়ের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যান। তিনি বিজিত অঞ্চলগুলোতে নিজের নামে খুতবা পাঠ করাতে শুরু করেন। বেচারা বাদশাহ মাহমুদ শাহের কাছে কেবল রাজধানী আহমদাবাদ অবশিষ্ট ছিল। এভাবে এই চতুর আমির বাদশাহর জীবদ্দশাতেই বারো বছর রাজত্ব করেন। ৯০১ হিজরিতে আমির কাসিম বারিদ মৃত্যুবরণ করেন।

আমির বারিদ: ৯১০ হি. থেকে ৯৪৮ হি. (১৫০৪ খ্রি. থেকে ১৫৪২ খ্রি.):

এখন তার ছেলে আমির বারিদ তার মসনদে বসেন এবং হুবহু পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাহমানি পরিবারকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখেন। তার আমলেই মাহমুদ শাহ বাহমানি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে যারা সিংহাসনে আরোহণ করেন তারাও আমির বারিদের কাছে দমিত ছিলেন।

https://t.me/BoierSomahar

এমনকি শেষ বাহমানি বাদশাহ কলিমুল্লাহ পালিয়ে গিয়ে আহমদনগরের নিজাম শাহীদের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

আমির বারিদ এবং আদিল শাহীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। এই কারণে যখন আদিল শাহীরা বিদার দখল করল, তখন তারা তা আমির বারিদের হাতে তুলে দিল। গুজরাটের বাদশাহ বাহাদুর শাহ যখন দাক্ষিণাত্য জয় করতে এলেন, তখন ইসমাইল আদিল শাহের অনুরোধে আমির বারিদ নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে বিজাপুরে তাঁর কাছে পৌঁছান এবং সেখানকার সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে গুজরাটের বাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। আমির বারিদ ৪৫ বছর শাসন করেন এবং দৌলতাবাদের কাছে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর অপব্যয়ের এই ঘটনাটি বিখ্যাত যে, একবার শীতকালে তিনি মদ্যপ অবস্থায় মাতাল ছিলেন, তখন শিয়ালের ডাক শোনা গেল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে এক সহচর বললেন: “শীতে মারা যাচ্ছে, তাই চিৎকার করছে।” আমির বারিদ পরদিন সকালে আদেশ দিলেন যে, জঙ্গলে তিন-চার হাজার লেপ বিছিয়ে দেওয়া হোক যাতে শিয়ালগুলো সেখানে আরাম করতে পারে।

আলী বারিদ শাহ: ৯৪৮ হিজরি থেকে ৯৮৮ হিজরি (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ):

আমির বারিদের পর তাঁর পুত্র আলী বারিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সুলতানদের অনুকরণে নিজের নামের সাথে ‘শাহ’ উপাধি যোগ করেন এবং আলী বারিদ শাহ নামে পরিচিত হন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো তিনিও সুন্নি ছিলেন।

একবার শিয়া শাসক বুরহান নিজাম শাহ তাঁর ইসনা আশারি পীর শাহ তাহিরকে দূত হিসেবে তাঁর কাছে পাঠালে তিনি ইসনা আশারি আকিদার ওপর কঠোর আপত্তি উত্থাপন করেন। শাহ তাহির ফিরে গিয়ে বুরহান নিজাম শাহকে খবর দিলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বিদার আক্রমণ করেন এবং এর বেশ কিছু দুর্গ দখল করে নেন।

৯৮৭ হিজরিতে (১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ) মুর্তজা নিজাম শাহ দাক্ষিণাত্যের এই সুন্নি রাষ্ট্রটিকে পুরোপুরি পরাভূত করার জন্য এর প্রাক্তন রাজধানী আহমদাবাদের ওপর আক্রমণ চালান। যেহেতু বারিদদের সাথে আদিল শাহীদের সম্পর্ক ভালো ছিল, তাই আলী বারিদ আলী আদিল শাহের সাহায্য নিয়ে নিজাম শাহীদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। ৯৯০ হিজরিতে (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ) আলী বারিদ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল ৪৫ বছর।

ইব্রাহিম বারিদ: ৯৮৮ হিজরি থেকে ৯৯৫ হিজরি (১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ):

আলী বারিদের বড় ছেলে ইব্রাহিম বারিদ সিংহাসনে বসেন এবং সাত বছর শাসন করেন।

কাসিম বারিদ সানি: ৯৯৫ হিজরি থেকে ১০০০ হিজরি (১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দ):

এরপর কাসিম বারিদ সানি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিন বছর শাসন করেন।

ইবনে কাসিম বারিদ: ১০০০ হিজরি থেকে ১০১০ হিজরি (১৫৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দ):

এই বালক চার বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাসনকার্য আমিরদের হাতে ছিল। ইতিহাসে তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই।

মির্জা আলী বারীদ: ১০১০ হিজরি থেকে ১০১৭ হিজরি (১৬০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ):

বারীদ শাহী বংশের একজন চতুর ব্যক্তি মির্জা আলী বারীদ, ইবনে কাসিম বারীদের অল্প বয়সের সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ করেন। নিরুপায় শিশুটি পালিয়ে কুতুব শাহীদের কাছে আশ্রয় নেয় এবং মির্জা আলী বারীদ সিংহাসনে বসেন।

আমীর বারীদ সানি: ১০১৭ হিজরি থেকে ১০২৮ হিজরি (১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দ):

মির্জা আলী বারীদের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০২৮ হিজরিতে (১৬১৯ খ্রিস্টাব্দ) বিজাপুরের আদিল শাহীরা তার এলাকাকে নিজেদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এভাবে এই বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে।

বারীদ শাহী এবং ইমাদ শাহী আমিরগণ আহলে সুন্নাত ছিলেন, যেখানে বিজাপুরের আদিল শাহী, গোলকুণ্ডার কুতুব শাহী এবং আহমদনগরের নিজাম শাহীরা কট্টর শিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। তারা গুজরাটের সুন্নি রাজ্য এবং সুন্নি মুঘলদের পক্ষ থেকে বিপদের সম্মুখীন হতেন, যা থেকে বাঁচতে তারা সেই সময়ের উদীয়মান শক্তি অর্থাৎ ইরানের সফভী শিয়া বাদশাহদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি মনে করতেন। এটিই ছিল তাদের শিয়া হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ধর্মীয় মতপার্থক্যও দাক্ষিণাত্যের এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে কখনো সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে দেয়নি।

বারীদ শাহী এবং ইমাদ শাহী আমিরদের পরাজয়ের পর পুরো দাক্ষিণাত্য শিয়া মতবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অবশিষ্ট শিয়া রাজ্যগুলোর মধ্যেও ক্রমাগত কলহ চলতে থাকে এবং চরম তিক্ততার পরিবেশ বজায় থাকে। এই দিক থেকে দাক্ষিণাত্যের এই ইতিহাস ষড়যন্ত্র, ধূর্ততা এবং লড়াই-ঝগড়ায় পরিপূর্ণ, যা পড়ে মানুষ অত্যন্ত বিরক্ত হয়।

বিভেদভিত্তিক এই রাজনীতির প্রভাব হিন্দু ও মারাঠাদের ঐক্য ও সংহতির রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। আঠারো শতকে মারাঠাদের এই শক্তিই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এক বিরাট হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

বিদর সালতানাতের ওপর এক নজর:

দাক্ষিণাত্যের বারীদ শাহী সালতানাত, যা বাহমানী সালতানাতের পতনের পর অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যদিও তা তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল, কিন্তু এটি উপমহাদেশের ইতিহাসে কিছু স্মরণীয় চিহ্ন রেখে গেছে। এই বংশের শাসকরা তাদের ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তারা কেবল মুসলমানদেরই নয়, বরং হিন্দু প্রজাদেরও সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করতেন না। তারা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব অর্জন করেন। বারীদ শাহী স্থাপত্যশৈলী ছিল বাহমানী ও ফারসি স্থাপত্যশৈলীর এক চমৎকার সংমিশ্রণ। এই বংশের শাসকরা বিদর শহরে অনেক সুন্দর সুন্দর ইমারত, মসজিদ, মাকবারা এবং বাগান নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিম্নরূপ:

- বারীদ শাহী মাকবারা: এই মাকবারাগুলো, যা বিদরের উপকণ্ঠে অবস্থিত, তাদের বিশেষ গম্বুজ এবং ফারসি ধাঁচের অলঙ্করণের জন্য পরিচিত। বিশেষ করে আলী বারীদ শাহের মাকবারাটি তার চমৎকার পাথর খোদাই এবং নকশার কারণে অনন্য।

রঙ্গীন মহল: আলী বারিদ শাহের যুগে নির্মিত এই মহলটি তার চমৎকার টাইলস এবং কাঠের কাজের জন্য বিখ্যাত।

কালী মসজিদ: বিদরে অবস্থিত এই মসজিদটি বারিদ শাহী যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন, যাতে স্থানীয় দাক্ষিণাত্য এবং পারস্য স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। একে 'কালী মসজিদ' বলা হয় কারণ এর নির্মাণে কালো রঙের পাথর (basalt) ব্যবহার করা হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে এই পাথর আরও গাঢ় হয়ে গেছে, যার ফলে এই মসজিদটি কালো দেখায়। এটি বারিদ শাহী যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারত এবং বিদরের ঐতিহাসিক দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। এর গঠন সাধারণ কিন্তু সুন্দর এবং এটি এই যুগের স্থাপত্যশৈলীর একটি অনন্য উদাহরণ।

বিদর দুর্গের প্রাচীর ও ফটক: বারিদ শাহী শাসকরা বিদর দুর্গের মেরামত ও সম্প্রসারণ করেছিলেন, যার ফলে এই শহর আরও সুরক্ষিত হয়েছিল।

সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব:

বারিদ শাহী শাসকরা ফারসি ও দাক্ষিণাত্য (দাকনি) ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, যার ফলে বিদর জ্ঞান ও সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই যুগে ফারসি ভাষা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল এবং অনেক আলেম ও কবি ফারসি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বারিদ শাহী যুগে দাকনি ভাষাও উন্নতি লাভ করেছিল। এটি সেই সময় ছিল যখন উর্দু তার প্রাথমিক রূপে দাক্ষিণাত্যে কবিতা ও গদ্যের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল।

এই যুগে বিদরে শিল্পকলা ও হস্তশিল্পের উন্নতি হয়েছিল। বিশেষ করে বিদরি কাজ (Bideri work) যা দস্তা, তামা ও রূপার সংমিশ্রণে তৈরি পাত্র ও অলঙ্কারের ওপর খোদাই করার শিল্প, তা বারিদ শাহী যুগের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক পরিচয়।

https://t.me/BoierSomahar

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

শাসকদের তালিকা

নাম শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ কাসেম বারিদ ৮৯৭ হি. থেকে ৯১০ হি. (১৪৮৯ খ্রি. থেকে ১৫০৪ খ্রি.) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ আমির বারিদ ৯১০ হি. থেকে ৯৪৮ হি. (১৫০৪ খ্রি. থেকে ১৫৪২ খ্রি.) গুজরাট সালতানাতের সাথে যুদ্ধ

৩ আলী বারিদ শাহ ৯৪৮ হি. থেকে ৯৯০ হি. (১৫৪২ খ্রি. থেকে ১৫৮০ খ্রি.) কুতুবশাহী - নিজামশাহীদের সাথে যুদ্ধ

৪ ইব্রাহিম বারিদ ৯৯০ হি. থেকে ৯৯৫ হি. (১৫৮০ খ্রি. থেকে ১৫৮৭ খ্রি.) দুর্বল শাসক

৫ কাসেম বারিদ সানি ৯৯৫ হি. থেকে ১০০০ হি. (১৫৮৭ খ্রি. থেকে ১৫৯২ খ্রি.) দুর্বল শাসক

৬ ইবনে কাসেম বারিদ - কমবয়স্ক ১০০০ হি. থেকে ১০১০ হি. (১৫৯২ খ্রি. থেকে ১৬০১ খ্রি.) দুর্বল শাসক

৭ মির্জা আলী বারিদ ১০১০ হি. থেকে ১০১৭ হি. (১৬০১ খ্রি. থেকে ১৬০৮ খ্রি.) দুর্বল শাসক

৮ আমির বারিদ সানি ১০১৭ হি. থেকে ১০২৮ হি. (১৬০৮ খ্রি. থেকে ১৬১৯ খ্রি.) শেষ শাসক

উৎসসমূহ:

- তারিখ-ই-হিন্দুস্তান (মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী): চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৬ থেকে ৫৬৭
- তারিখ-ই-ফেরেশতা, বোম্বে: (মুহাম্মদ কাসেম ফেরেশতা) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬ থেকে ৩৩৯, তৃতীয় প্রবন্ধ
- নুজহাতুল খাওয়াতির: হাকিম আব্দুল হাই হাসানি
- তারিখ-ই-দাক্ষিণাত্য ফার্সি, এডিপি আব্দুল আলিম নসরুল্লাহ, লখনউ থেকে প্রকাশিত
- ইসলামি সালতানাত: ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়ার্থ (অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ)
- তারিখ-ই-মিল্লাত (মুফতি ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবি, কাজী জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ মিরাঠি): তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩, ৬৩৮

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুঘল শাসনের পূর্বে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সক্রিয়

প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ

৮৭০

https://t.me/BoierSomahar

দিল্লির পতনের পর ভারতের অন্যান্য শহরের উলামা ও মাশায়েখ

দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক দেড়শ বছরে আমরা মুলতান থেকে বাংলা পর্যন্ত উলামাদের চেয়ে মাশায়েখদের প্রভাব অনেক বেশি দেখতে পাই। যদি আমরা এই যুগের সবচেয়ে নামী দশজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন করি, তবে তাদের মধ্যে নয়জনই হবেন তারা যারা খানকাহ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তারা পীর-মুরিদির মাধ্যমে দ্বীন প্রচার ও মাখলুকের (সৃষ্টির) প্রশিক্ষণের কাজ করেছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই মাশায়েখ ও সুফিয়ায়ে কেরাম দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব বুঝতেন, বরং তাদের মধ্যে অনেকেই দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য সফর করেছিলেন এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ইলম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তারপর যখন তারা বছরের পর বছর মাশায়েখদের পদতলে বসেছিলেন, তখন তারা সমতল ভূমির মতো বিনয়ী হয়ে গিয়েছিলেন এবং বিতর্ক, বিবাদ এবং বিচার বিভাগীয় সরকারি পদের পরিবর্তে মসজিদ ও খানকাহগুলোকে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে জনগণের মধ্যে দ্বীনি আবেগ, মারেফাতে ইলাহিয়া এবং খাশিয়াত ও ইনাবত সৃষ্টি করাকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর এই পথে তাদের ফয়েজ লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে, ফলে দ্বীনের ইমামত ও নেতৃত্বে তাদের নামই বেশি সমুন্নত হয়েছে। নিঃসন্দেহে তাদের খিদমত এর যোগ্য ছিল এবং এই ব্যক্তিবর্গ সমগ্র উম্মত বিশেষ করে উপমহাদেশবাসীর পক্ষ থেকে সর্বদা প্রশংসার দাবিদার থাকবেন।

উপমহাদেশের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীন প্রচারের এই বিভাজন ও বিন্যাসই নির্ধারিত ছিল। প্রথম দেড়-দুই শতাব্দীতে এখানে মহব্বতে ইলাহিয়া, ইশকে রাসূল এবং খিদমতে খালকের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের প্রয়োজন বেশি ছিল। তাই খোদায়ী ইচ্ছায় এই ভূখণ্ডকে এই কাজের উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীবাহিনী অর্থাৎ সুফিয়ায়ে কেরাম দান করা হয়েছিল। তাদের পরিশ্রমের উদাহরণ ছিল বৃষ্টির মতো যা চারদিকে বর্ষিত হতে থাকে।

কিন্তু বৃষ্টির পানি যতই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হোক না কেন, তা সংরক্ষণ করতে এবং দীর্ঘকাল তা থেকে উপকৃত হতে বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। এই কাজটি আল্লাহ তাআলা উলামায়ে রাসিখীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা এবং মুতাকাল্লিমীনদের দিয়ে করিয়েছেন যারা দিল্লি সালতানাতের পতনের পর সামনে আসতে শুরু করেন। ফলে আমরা এই যুগে বড় বড় নামী উলামাদের ময়দানে সক্রিয় দেখতে পাই, যাদের মধ্যে হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ., হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.-এর মতো ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা উপমহাদেশে ইসলামকে বিশুদ্ধ রূপে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করেছেন। এই ব্যক্তিবর্গ তাসাউফের বাড়াবাড়ি থেকে সৃষ্ট বিদআত নির্মূল করেছেন এবং দ্বীনকে তার মূল উৎস ও আধার থেকে শেখার ওপর কেবল জোরই দেননি বরং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে...

এর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ইলমি ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন এবং অসংখ্য ছাত্র এবং হাদিস, ফিকহ ও তাফসিরের ওপর ডজন ডজন গ্রন্থও রেখে গেছেন।

তবে বর্তমানে আমরা সেই যুগের দিকে ফিরে যাই যাকে দিল্লি সালতানাতের উত্থানের যুগ বলা হয়। এই যুগে আমরা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের রূপে এমন একজন শাসককে দেখতে পাই, যিনি সুফিয়া ও মাশায়েখদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন এবং যখন তার শাসনকাল শেষ হলো, তখন একদিকে দিল্লি সালতানাত তার দেড়শ বছর পূর্ণ করছিল, অন্যদিকে দিল্লি প্রথম সারির মাশায়েখদের থেকে শূন্য দেখাচ্ছিল।

মুহাম্মদ তুঘলকের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে দিল্লিতে সুফিয়ায়ে কেরামের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেশি ছিল। বিশেষ করে দিল্লির খানকাহ-এ চিশতিয়া নিজামিয়া ছিল একটি আধ্যাত্মিক সালতানাতের কেন্দ্র, যার শাখাগুলো পুরো দেশে ছড়িয়ে ছিল। অধিকাংশ শাসক ও আমীরদের ওপরও তাদের প্রভাব ছিল। অধিকাংশ সুলতান ও শাহজাদারা তাদের অনুসারী না হলেও তাদের বুজুর্গির ব্যাপারে অবশ্যই বিশ্বাসী ছিলেন এবং তারা যতটা তাদের দোয়ার প্রত্যাশী থাকতেন, তার চেয়ে বেশি তাদের বদদোয়া বরং মনের অসন্তুষ্টিকেও ভয় পেতেন এবং এই কারণেই তাদের যথাসম্ভব খেদমত করার চেষ্টা করতেন। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ. এর মর্যাদা এতই উচ্চ ছিল যে, যেসব বাদশাহ তার ভক্ত ছিলেন না, তারাও প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতে পারতেন না। সুতরাং সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির যুগে এর উদাহরণ অতিবাহিত হয়েছে। এই ঘটনাটিও আমরা উল্লেখ করেছি যে, কিছু শাসক হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহ. এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু হযরত তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যার পর বাদশাহও নিজের ইচ্ছার ওপর জেদ করা সমীচীন মনে করেননি।

কিন্তু মুহাম্মদ তুঘলকের ধর্মীয় ঝোঁকের মধ্যে সম্ভবত মাশায়েখ ও সুফিয়াদের আদব ও সম্মান অনেক কম ছিল। তিনি যদি কোথাও কোনো সুফি বা বুজুর্গের সম্মান ও মর্যাদাও প্রদর্শন করতেন, তবে সাধারণত তার পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকর থাকত।

সেই সময় উপমহাদেশে সুফিয়ায়ে কেরামের দুটি কেন্দ্র সবচেয়ে বড় ছিল: একটি মুলতানে হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ. এর খানকাহ। দ্বিতীয়টি দিল্লিতে হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহ. এর দরবার। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহ. মুহাম্মদ তুঘলকের সিংহাসন আরোহণের কয়েক মাস পর ইন্তেকাল করেন এবং এখন পেছনে এমন কোনো বুজুর্গ ছিলেন না যারা প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তার সমকক্ষ হতেন। ফলে দিল্লিতে খানকাহ-এ চিশতিয়ার সোনালী যুগের সমাপ্তি ঘটেছিল।

এই সময়েই মুহাম্মদ তুঘলক দৌলতাবাদকে বিকল্প রাজধানী ঘোষণা করে দিল্লির আমীর-ওমরাহ এবং উলামা ও মাশায়েখদেরও সেখানে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দেন। সাধারণ জনগণেরও একটি বিশাল অংশকে স্থানান্তরে বাধ্য করা হয়েছিল। যদিও দিল্লির বিভিন্ন অংশে জনবসতি অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু বিপুল সংখ্যক উলামা ও মাশায়েখদের স্থানান্তরের কারণে দিল্লির ধর্মীয় জৌলুস ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

কয়েক বছর পর মুহাম্মদ তুঘলক পুনরায় দিল্লিতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং অনেক মানুষও দৌলতাবাদ থেকে ফিরে আসে, কিন্তু এই শহরের যে ক্ষতি হওয়ার ছিল, তা হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে মুহাম্মদ তুঘলক সুফিয়াদের অদৃশ্য সালতানাতে ফাটল ধরাতে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। তিনি বড়...

সুপরিকল্পিতভাবে এই ব্যক্তিদের জনপ্রিয়তা ও বিস্তৃত বলয়কে সংকুচিত করার এবং তাদের সংহতিকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করা হয়।

এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেক মাশায়েখ, উলামা ও বুজুর্গানে দ্বীনকে এমন সব সরকারি দায়িত্ব অর্পণ করেন যা তাদের মর্যাদা, মেজাজ ও রুচির পরিপন্থী ছিল। যারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, অভিজ্ঞতার অভাবে তারা সাধারণত ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারতেন না এবং যারা অস্বীকার করতেন তারাও রোষানলে পড়তেন। যাই হোক, সুলতান তাদের শাস্তি দিতেন, বন্দি করতেন এবং কখনো কখনো হত্যা করতেও দ্বিধা করতেন না। শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (রহ.)-এর খানকাহকে তিনি এভাবে নিয়ন্ত্রণে আনেন যে, দরগাহর সাজ্জাদানশীন শেখ হুদকে শুরুতে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়, কিন্তু কয়েক বছর পর দুর্নীতির অভিযোগে তার সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে দেওয়া হয় এবং পরে বিদ্রোহের অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করা হয়।

দিল্লির নিজামিয়া খানকাহর গদিনশীন শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ-এ-দেহলি (রহ.)-কে তিনি বিভিন্ন অজুহাতে উত্যক্ত করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের ব্যক্তিগত সেবায় নিয়োজিত করে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেন। সুলতানুল মাশায়েখ (রহ.)-এর অন্যান্য প্রভাবশালী খলিফাদেরও তিনি কোণঠাসা করতে কোনো কসুর করেননি। শেখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার (রহ.)-কে হাসি থেকে গ্রেপ্তার করে নিজের দরবারে তলব করেন। এটি ভিন্ন কথা যে, তিনি তার মুমিনসুলভ শান দেখে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তাকে কোনো কষ্ট দিতে পারেননি। [১]

অন্যান্য উলামা ও মাশায়েখের সাথে তিনি যা করেছেন তা এক আলাদা কাহিনী। সিন্ধুর দুই ফকিহকে সরকারি দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং পরে সামান্য একটি কথার কারণে তাদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। কোটালের সুফি বুজুর্গ শেখ সালেহ শামসুদ্দিনকে শুধুমাত্র এই কারণে যে তিনি বাদশাহর সাথে দেখা করতে আসেননি, একটি অজুহাতে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এরপর তার সাহেবজাদাদের একটি বাক্যের অজুহাতে হত্যা করা হয়। দিল্লির সবচেয়ে বড় খতিবকে জহরত বা মণি-মুক্তার তত্ত্বাবধায়ক বানানো হয় এবং পরে কিছু জহরত চুরির অপবাদে তাকে হত্যা করা হয়। [২]

মুহাম্মদ তুঘলকের ভুল কর্মকৌশল কেবল তাসাউফ ও দাওয়াতে ইসলামের ওপরই আঘাত হানেনি, বরং এটি দিল্লির সালতানাতকেও রাজনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। ফলে এই সালতানাত ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় পর্যন্ত কোনোমতে তার শান-শওকত বজায় রাখতে পারলেও তার পর দেশজুড়ে অরাজকতার (তাওয়ায়েফুল মুলুকি) যুগ শুরু হয়। শীঘ্রই তুঘলক বংশ পতনের শিকার হয়ে দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যায় এবং দিল্লির রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেষ হয়ে যায়। যেটুকু বাকি ছিল, তৈমুরের আক্রমণ তা পুরোপুরি শেষ করে দেয়। ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদা মুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যাদের পরিচয় গত পৃষ্ঠাগুলোতে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির রাজনৈতিক পতনের সাথে সাথে উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের অবস্থানও তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। চিশতিয়া নিজামিয়া খানকাহর শৃঙ্খলা ভেঙে যায়।

অন্যদিকে এর একটি ইতিবাচক দিক ছিল এই যে, জায়গায় জায়গায় দ্বীনি মারকাজ বা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতে ইসলামের কাজ ত্বরান্বিত হয়। তাসাউফের কেন্দ্রগুলো কেবল দিল্লি, মুলতান, আজুধান ও পাকপত্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং জায়গায় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

---

[১] সিয়ারুল আরিফিন: পৃ. ২৩০; সিয়ারুল আউলিয়া: আমির খুর্দ: ২৫৩ থেকে ২৫৬।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: পৃ. ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৩।

এর পেছনে হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহ.-এর মতো দ্বীনের বুজুর্গদের দূরদর্শিতা কাজ করছিল, যারা দেয়ালের লিখন পড়ে ফেলেছিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেই নিজেদের খলিফাদের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে সেখানকার আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তাদের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। এই একই কাজ তাঁর উত্তরসূরি হযরত চেরাগে দেহলভী রহ. করেছিলেন। একইভাবে হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ.-এর সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার অনেক মাশায়েখও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এভাবে যে নেয়ামত লাভের জন্য আগে মানুষ শত শত মাইল সফর করত, এখন তা তাদের হাতের নাগালে আসতে শুরু করল এবং উপকার প্রদান ও গ্রহণের গতি বহুগুণ বেড়ে গেল।

পরবর্তী পংক্তিগুলোতে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে এমন সব উলামা, মাশায়েখ এবং ইসলামি দাওয়াতী কেন্দ্রগুলোর কথা উল্লেখ করছি, যারা দিল্লি সালতানাতের পতন থেকে শুরু করে মুঘল শাসনের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত বাংলা, কাশ্মীর, জৌনপুর, মালব, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যে সক্রিয় ছিলেন এবং যাদের উপযোগিতা সবাই স্বীকার করেছেন এবং আজ পর্যন্ত তাদের ফয়েজ কোনো না কোনোভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তবে প্রতিটি অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজের ভূমিকা হিসেবে আমরা এর প্রাথমিক যুগগুলোরও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অবশ্যই করব, যাতে জানা যায় যে সেখানে ইসলামের প্রথম পদচিহ্ন কীভাবে অঙ্কিত হয়েছিল এবং দিল্লি সালতানাতের পতন পর্যন্ত সেখানে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ কতটুকু হয়েছিল। আর যখন সেখানে স্থায়ী ও স্বাধীন মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন দ্বীন প্রচার ও দ্বীন সংরক্ষণের শাখাগুলো কীভাবে এগিয়ে গেল এবং কেন সেখানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামি প্রভাব গভীরতর হতে থাকল।

এখানে আমরা একটি মৌলিক কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বিভিন্ন অঞ্চলে সুফিয়ায়ে কেরামের আগমন কখনো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে হতো, আবার কখনো মুরিদ ও ভক্তদের একটি জামাতের সাথে সফর হতো। প্রথম ক্ষেত্রে সাধারণত কেবল দাওয়াতের কাজই করা হতো, এর বাইরে কিছু সম্ভবও ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুরিদদের জিহাদের জন্যও প্রস্তুত রাখা হতো। কারণ যেসব অঞ্চলে মাশায়েখদের এই জামাতগুলো যেত, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল খুবই কম এবং অমুসলিমদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। অনেক অমুসলিম শাসক, যারা স্থানীয় মুসলমানদের ওপরও জুলুম করত, তারা এভাবে ইসলামের দাওয়াতকে বিকশিত হতে দেখতে পারত না। ফলে তারা তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করত এবং কখনো কখনো যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যেত। সুতরাং তাদের জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচতে এবং অনিবার্য পরিস্থিতিতে নিজেদের সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য সুফিয়ায়ে কেরামের কাফেলাগুলো মুজাহিদদের রূপ ধারণ করত। এ ধরনের যুদ্ধে স্বল্প সংখ্যা নিয়েও অনেক ক্ষেত্রে এই মুজাহিদ সুফিরা অনেক এলাকা জয় করেছেন। কখনো এমনও হয়েছে যে, প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা এই সুফিদের নিজেদের বাহিনীর সাথে নিয়ে কুফর, শিরক এবং জুলুম-অত্যাচার নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন, আবার কখনো মাশায়েখরা নিজেরাই কোনো নিকটবর্তী মুসলিম শাসককে জিহাদের দাওয়াত দিতে বাধ্য হয়েছেন। এ ধরনের অভিযানে শত শত দ্বীনের বুজুর্গ শাহাদাত বরণ করেছেন, যাদের মধ্যে কয়েক ডজন মাজার আজও বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে দাওয়াত ও জিহাদের শিক্ষা দিচ্ছে।

https://t.me/BoierSomahar

কাশ্মীরের মাশায়েখ

উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কাশ্মীরে ইসলামের আগমন বেশ দেরিতে হয়েছে, যদিও উত্তর ভারতের কাশ্মীরের সীমান্তে অবস্থিত পাঞ্জাব ও পশতুন অঞ্চলগুলোতে প্রথম হিজরি শতাব্দীতেই ইসলামের প্রচার ঘটেছিল। সুলতান মাহমুদ গজনভি এবং পরবর্তীতে শাহাবুদ্দিন ঘুরি কাশ্মীরের কিছু সীমান্ত এলাকা জয় করেছিলেন, কিন্তু এখানকার দুর্গম পাহাড়ি পথ এবং আবহাওয়ার তীব্রতা প্রতিটি বিজয়ীকে তাদের সৈন্যবাহিনী সীমিত করতে বাধ্য করত। এই কারণে কাশ্মীর কোনো মুসলিম বাদশাহর আক্রমণের মাধ্যমে বিজিত হয়নি, বরং এখানে ইসলামের প্রচার মূলত সেই সব দাঈ ও বুজুর্গদের অবদান যাদের সুফিয়া-এ-কেরাম বলা হয়। দ্বিতীয়ত, এখানে ইসলামের প্রসারের কৃতিত্ব সেই সব স্থানীয় শাসকদের প্রাপ্য যারা এখানে ইসলামের ন্যায়বিচারপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন।

কাশ্মীরে ইসলামের প্রচারকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি:

- প্রথম পর্যায়: ইসলামের সূচনা এবং ইসলামী সমাজ গঠন।

এই প্রথম পর্যায়টি অষ্টম হিজরি (চতুর্দশ খ্রিস্টীয়) শতাব্দীর সাথে সম্পর্কিত। এই শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এখানে একটি হিন্দু রাজবংশের শাসন ছিল, যার রাজা 'সুহাদেব' অত্যন্ত পরিচিত ও বিখ্যাত ছিলেন। ৭১৫ হিজরিতে (১৩১৫ খ্রিস্টাব্দ) একজন অত্যন্ত যোগ্য মুসলিম অফিসার 'শাহ মির্জা' (শাহ মীর) কাশ্মীরে এসে রাজা সুহাদেবের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি অনেক উন্নতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং ইসলামের একজন দাঈ। তাঁর দৃষ্টান্ত ছিল সেই সব দাঈদের মতো যারা মঙ্গোল শাসকদের দরবারে কাজ করেছিলেন এবং সুযোগ বুঝে সেখানে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন।

এর কিছুকাল পর তিব্বতি বংশোদ্ভূত এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী একজন নির্বাসিত রাজপুত্র 'রিঞ্চন' কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি মনে মনে সর্বদা অস্থিরতা অনুভব করতেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অন্যদিকে প্রজাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু। রিঞ্চন তাঁর অস্থিরতা দূর করার জন্য শাহ মির্জা (শাহ মীর)-এর সাহায্য নিতে শুরু করেন।

এটি সেই সময় ছিল যখন কাশ্মীরে প্রথম সুফি বুজুর্গ হযরত বুলবুল শাহ (রহ.)-এর আগমন ঘটে, যিনি সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার একজন মহান বুজুর্গ এবং শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রহ.)-এর খলিফা ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল শরফুদ্দিন আবদুর রহমান। তাঁর আগমন ৭২৩ হিজরি (১৩২৩ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঘটনা। তিনি এখানে শ্রীনগরের ডাল লেকের তীরে অবস্থান গ্রহণ করেন।

এদিকে রাজা শাহ মির্জার কাছ থেকে ইসলামের গুণাবলী শোনার পর মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, কিন্তু মনে কিছুটা দ্বিধাও ছিল। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সকালে প্রথম যে ব্যক্তিকে আমার কাছে পবিত্র ও সম্মানিত মনে হবে, আমি তারই ধর্ম গ্রহণ করব।

পরের দিন সকালে যখন তিনি বাইরে বের হলেন এবং পশ্চিম দিকে তাকালেন, তখন হ্রদের তীরে একজন ফেরেশতাসুলভ বুজুর্গকে সালাত আদায় করতে দেখলেন। এই বুজুর্গ ছিলেন হযরত বুলবুল শাহ রহমাতুল্লাহ। রাজা তাঁকে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন এবং পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে গিয়ে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হলেন।

রাজা এখন সুলতান সদরুদ্দিন উপাধি গ্রহণ করলেন। এরপর সুলতানের পরিবার-পরিজন এবং দরবারের আমীরগণও তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ বিপুল সংখ্যায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে, যাদের মোট সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না। বুলবুল শাহ রহমাতুল্লাহ-এর নির্দেশনায় সুলতান সদরুদ্দিন এখানে একটি জামে মসজিদ এবং তার সাথে একটি বড় খানকাহ নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা আজও লঙ্গর বাবা বুলবুল শাহ নামে বিদ্যমান। ৭২৬ হিজরি (১৩২৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে হযরত বুলবুল শাহ রহমাতুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। ৭২৮ হিজরি (১৩২৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান সদরুদ্দিনও ইন্তেকাল করেন। এই সময়ের মধ্যে শাহ মির্জা সালতানাতে ওয়াকিল-ই-মুতলাক (সুলতানের প্রতিনিধি) পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন।

৭৪৪ হিজরি (১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে কাশ্মীরের রাজপরিবারে পারস্পরিক বিরোধ বৃদ্ধি পায় এবং দেশ বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক সংকটের শিকার হয়। এমন পরিস্থিতিতে শাহ মির্জা নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন এবং শামসুদ্দিন শাহ নামে নিজের সালতানাত ঘোষণা করেন।

শাহ মির্জা প্রায় সাড়ে তিন বছর শাসন করেন। তাঁর এই কৃতিত্ব অত্যন্ত মহান ছিল যে, তিনি কাশ্মীরে রাজনৈতিকভাবে ইসলামের ন্যায়বিচারপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কার্যকর করেছিলেন। এরপর তাঁর বংশ আড়াইশ বছর এখানে শাসন করতে থাকে। [১]

দ্বিতীয় যুগ: সুফিবাদী দাওয়াতের উত্থান

এই সময়ে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার জন্য বহু আলেম ও মাশায়েখ সংগ্রামরত ছিলেন। যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম হলো হযরত আমীর-ই-কবীর সৈয়দ আলী হামদানি রহমাতুল্লাহ। আপনাকে কাশ্মীরে ইসলামের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। আপনি ১৩ রজব ৭১৪ হিজরি (১৩১৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে ইরানের হামদান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল বিশ্বজুড়ে পর্যটন করেন এবং শত শত আউলিয়া আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আপনার সম্পর্ক ছিল সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার শাখা “কুবরাভিয়া”-এর সাথে। আপনি যখন কাশ্মীর সফরের ইচ্ছা করলেন, তখন আপনার খলিফা মীর সৈয়দ হোসেন সামনানি রহমাতুল্লাহ-কে এখানে পাঠিয়ে পরিস্থিতি অবগত হন এবং এরপর এদিকে যাত্রা করেন।

৭৭১ হিজরি (১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে আপনি সাতশ সৈয়দ, সুফি এবং দক্ষ কারিগর মুরিদদের একটি বিশাল কাফেলার সাথে কাশ্মীরে আগমন করেন। কাশ্মীরের শাহ সুলতান কুতুবুদ্দিন আপনার ভক্ত হয়ে যান এবং সম্মান প্রদর্শনে কোনো ত্রুটি করেননি। তাঁর কিছু কাজ শরীয়ত বিরোধী ছিল, যেমন তিনি একই সাথে দুই বোনকে বিবাহ করেছিলেন এবং হিন্দুদের মতো পোশাকও...

---

[১] আব-ই-কাউসার: পৃষ্ঠা ৩৭৪ থেকে ৩৭৭।

পরিধান করতেন। আপনার বোঝানোর পর তিনি শরীয়ত বিরোধী এই কাজগুলো ছেড়ে দেন।

আপনি মহল্লা আলাউদ্দিনপুরায় অবস্থান করেন, হ্রদের তীরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন যেখানে আপনার খানকাহ আজও বিদ্যমান। সেই সময়ে কাশ্মীরের শাহ এবং দিল্লির সুলতানের মধ্যে বিরোধ চলছিল এবং যুদ্ধের উপক্রম হয়েছিল। আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উভয়ের মধ্যে শান্তির আলোচনা করেন এবং এই যুদ্ধ থামিয়ে দেন। আপনি আপনার খুতবা এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে নেন। কমপক্ষে ৩৭ হাজার অমুসলিম আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আপনার জীবন সফর এবং তাবলিগের মধ্যে অতিবাহিত হতো, তাই কোনো স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন না, ফলে কাশ্মীরেও চল্লিশ দিন অবস্থান করে ফিরে যান। দীর্ঘ সময় পর পুনরায় আগমন করেন এবং একইভাবে কাশ্মীরবাসীদের ধন্য করেন। তৃতীয় এবং শেষ আগমন ৭৮৬ হিজরিতে (১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) হয়েছিল।

আপনি এখানে কেবল আধ্যাত্মিকতার তাবলিগই করেননি বরং মানুষকে শাল বয়ন, গালিচা বয়ন এবং কাগজ তৈরির মতো নতুন নতুন শিল্পও শিখিয়েছেন। এতে কাশ্মীরিদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং তারা ইসলামের নিকটবর্তী হয়। আপনি শরীয়তের আইন এবং সুন্নাহ অনুসরণের ওপর খুব জোর দেন, যার ফলে কাশ্মীরে খাঁটি ইসলাম একটি সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে।

আপনি অনেক চমৎকার কিতাবও লিখেছেন যেমন: মাজমাউল আহাদিস, শারহু আসমাইল হুসনা, শারহু ফুসুসিল হিকাম এবং মিরআতুত তায়িবীন। আপনার একটি রচনা 'জখিরাতুল মুলুক' ইসলামী রাজনীতি এবং শাসকদের সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত।

আপনার মৃত্যু ৭৮৬ হিজরিতে (১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) হয় এবং তুর্কিস্তানের খতলান শহরে দাফন করা হয়। আপনি আপনার খলিফা সৈয়দ হুসাইন সিমনানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছাড়াও আরও অনেক সঙ্গীকে এখানেই রেখে গিয়েছিলেন যাদের মধ্যে একজন শেখ সুলাইমান কাশ্মীরিও ছিলেন যিনি একজন হিন্দু অফিসার ছিলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করে কুরআন মাজিদও মুখস্থ করেছিলেন কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণের কারণে তার আত্মীয়-স্বজনরা তাকে অনেক কষ্ট দিতে শুরু করেছিল, যাতে তিনি অত্যন্ত অতিষ্ঠ ছিলেন। যখন সৈয়দ আলী হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাশ্মীর যাচ্ছিলেন তখন পথে শেখ সুলাইমান খিদমতে হাজির হন এবং তারপর তার হাত ধরে সফরসঙ্গী হয়ে যান এবং হযরতের সাথেই কাশ্মীর চলে আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

সৈয়দ আলী হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর এই ব্যক্তিবর্গ এখানে দাওয়াতের কাজ করতে থাকেন এবং এভাবে আপনার খানকাহ কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। আপনার একজন খলিফা মুহাম্মদ কাজিম ওরফে সৈয়দ কাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও এখানে কাজ করতে থাকেন। তিনি 'লতাপুর' নামক জনপদে তাবলিগ করে অনেক মানুষকে ইসলামে দাখিল করেন। [১]

তৃতীয় যুগ: সুদৃঢ়করণ এবং প্রসারের সময়কাল:

সৈয়দ আলী হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিরে যাওয়ার দুই বছর পর তার সাহেবজাদা সৈয়দ মুহাম্মদ হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অনেক সুফি ও মুরিদদের সাথে কাশ্মীর পাঠিয়ে দেন। এই কাফেলা ৭৯৬ হিজরিতে এখানে পৌঁছায়। সুলতান সিকান্দার শাহ যাকে বুত-শিকান উপাধিতে স্মরণ করা হয়—

---

[১] আব-এ-কাউসার: পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৯৭

...হয়ে যায়, সাহেবজাদার মুরিদ হয়ে গেল। আপনার নির্দেশনায় সে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এখানে বাদ্যযন্ত্রের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। নহবত ও দামামাও এখন কেবল সুলতানের দরজায় বাজানো হতো। সৈয়দ মুহাম্মদ হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি উচ্চপর্যায়ের আলেম ছিলেন। সুলতান সিকান্দারের অনুরোধে আপনি অনেক কিতাব রচনা করেন। একটি রিসালা 'শরহে মানতিক' মাত্র এক রাতে সম্পন্ন করেন।

৭৯৯ হিজরি (১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে আপনি কাশ্মীরবাসীদের বিদায় জানান, বিদায় নেওয়ার সময় সিকান্দার শাহকে ইসলামের প্রচার অব্যাহত রাখার তাকিদ দেন। আপনি কাশ্মীর থেকে হজের উদ্দেশ্যে রওনা হন। হজ সম্পন্ন করে 'খাতলান'-এ চলে যান এবং সেখানেই ইন্তেকাল করে নিজের সম্মানিত পিতার পাশে সমাহিত হন।

সিকান্দার শাহের দরবারে উজির পদে সুহভাট নামক একজন হিন্দু নিযুক্ত ছিল। সৈয়দ মুহাম্মদ হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির দাওয়াতে এই উজির মুসলমান হয়ে যান এবং সাইফউদ্দিন নামে পরিচিত হন। তিনি ইসলামের একজন অত্যন্ত উৎসাহী দায়ীতে পরিণত হন। যেহেতু কট্টর হিন্দুরা তার ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল, তাই এর প্রতিক্রিয়ায় তিনিও নিজের ক্ষমতা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি 'মূর্তিপূজা' নির্মূলের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং অধিকাংশ মন্দির ও মূর্তি ভেঙে ফেলেন। যেহেতু এই সবকিছু সিকান্দারের শাসনামলে ঘটছিল, তাই সেই সূত্রে সিকান্দার 'বুতশিকান' (মূর্তি ধ্বংসকারী) উপাধি লাভ করেন। উজির সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন, যাতে বিধবা নারী স্বামীর লাশের সাথে পুড়ে মারা যেত। যে সকল হিন্দু এই প্রথার ওপর অটল ছিল, উজির তাদের কাশ্মীর থেকে নির্বাসিত করেন।

সিকান্দারের মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলতান আলী শাহ সিংহাসনে আরোহণ করলে এই উজিরই তার সহযোগী হিসেবে থাকেন এবং সেই আইনগুলো তার আমলেও জারি থাকে। চার বছর পর সুলতান আলী এবং তার ছোট ভাই শাদী খানের মধ্যে ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শাদী খান শিয়ালকোট ও লাহোরের খোখরদের থেকে সাহায্য নিয়ে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করেন। জাসরাত খোখর এই বিষয়ে মূল ভূমিকা পালন করেন এবং তার সমর্থন শাদী খানের পাল্লাকে এতটাই ভারী করে দেয় যে, সুলতান আলী পাঁচ বছর শাসনের পর ভাইয়ের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

এভাবে ৮২৬ হিজরি (১৪২৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে শাদী খান 'সুলতান জয়নুল আবেদিন' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হিন্দুদের সাথে সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আদেশগুলো প্রত্যাহার করে নেন। নির্বাসিত হিন্দুদের ফিরিয়ে আনেন। সতীদাহ প্রথার অনুমতি দেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সুলতান সিকান্দারের আমলে লোকদেখানোভাবে মুসলমান হয়েছিল। তাদের পুনরায় নিজেদের পুরনো ধর্মে ফিরে যেতে বাধা দেওয়া হয়নি।

মুসলিম উলামা, মাশায়েখ এবং দায়ীরা এই যুগেও দ্বীনের দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় এই যুগে বারামুল্লা ও ঝিলামের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী রাজপুতদের দুটি বড় গোত্র মুসলমান হয়।

সৈয়দ আলী হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, তার পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তাদের খলিফাদের প্রচেষ্টায় এখন কাশ্মীরের স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর ওলিদের একটি জামাত তৈরি হয়েছিল, যারা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এই...

মানুষ অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন, সৃষ্টির সেবা করতেন, অসুস্থদের ঝাড়ফুঁক করতেন, অভাবীদের জন্য দোয়া করতেন এবং সত্যের সন্ধানীদের পথপ্রদর্শন করতেন। হিন্দুরা তাঁদের 'মুসলিম ঋষি' এবং মুসলমানরা 'বাবা' বলত। তাঁদের মধ্যে শেখ নূরুদ্দীন রহ. অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ৭৭৯ হিজরিতে (১৩৭৭ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৩ বছর বয়সে সুলতান জয়নুল আবেদিনের শাসনামলে ৮৫২ হিজরিতে (১৪৩৮ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন। হিন্দুরা তাঁকে 'নন্দ ঋষি' বলত। [১]

শিয়া মতবাদের উত্থান, চাকদের আধিপত্য এবং আহলে সুন্নাতের জন্য সমস্যা:

সুলতান জয়নুল আবেদিন ৫২ বছর শাসন করার পর ৮৭৭ হিজরিতে (১৪৭২ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন। এরপর কাশ্মীরে বিশুদ্ধ দ্বীনের জন্য বিপদ দিন দিন বাড়তে থাকে। ৮৯২ হিজরিতে (১৩৮৭ খ্রি.) ইরাক থেকে শামসুদ্দীন ইরাকি নামক এক শিয়া দাঈ কাশ্মীরে আসেন। তিনি ইসমাইলি শিয়া ফেরকার দাঈ মীর নূরবখশের মুরিদ ছিলেন। নূরবখশ নিজের ধর্মে কিছু পরিবর্তন এনে মাহদী হওয়ার দাবি করেছিলেন। এভাবে তিনি শিয়াদের মধ্যে 'নূরবখশী ফেরকা'র ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

শামসুদ্দীন ইরাকি খোরাসানের শাসক হুসাইন মির্জার দূত হয়ে কাশ্মীরে এসেছিলেন। এখানে তিনি তাকিয়ার পথ অবলম্বন করেন এবং বাবা ইসমাইল ওলীর আশ্রয় নিয়ে গোপনে তাঁর পীরের উদ্ভাবিত আকিদা প্রচার করতে শুরু করেন। তবে আট বছরের চেষ্টার পরও বিশেষ কোনো সাফল্য পাননি। অবশ্য তিনি একদল উৎসাহী অনুসারী তৈরি করেছিলেন, যাদেরকে এই কাজে লাগিয়ে তিনি ফিরে যান। ইতিমধ্যে খোরাসানের শাহ হুসাইন মির্জা তাঁর ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে জানতে পারেন, ফলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দেন।

তিনি সুলতান মুহাম্মদ শাহের আমলে পুনরায় কাশ্মীরে আসেন। এবার ভাগ্য তাঁর সহায় হয় এবং দরবারের অনেক আমীর, বিশেষ করে চাক পরিবারের প্রধানরা তাঁর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁর মুরিদ হন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেন। তবে সেই সময় একজন সুন্নি আমীর সৈয়দ মুহাম্মদ বাইহাকীর উত্থানের যুগ ছিল, যাঁর প্রচেষ্টায় শামসুদ্দীন ইরাকিকে কাশ্মীর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু শীঘ্রই সৈয়দ মুহাম্মদ বাইহাকীকে হত্যা করা হয় এবং শামসুদ্দীন ইরাকি পুনরায় কাশ্মীরে প্রবেশ করে চাক আমীরদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ণ শক্তিতে নিজের আকিদা প্রচার করতে শুরু করেন। সুলতান ফাতাহ শাহের আমলে চাকদের পূর্ণ সহযোগিতার কারণে শিয়া মতবাদ অনেক বেশি বিস্তার লাভ করে এবং নূরবখশী ফেরকায় অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য মানুষ নূরবখশকে মাহদী আখেরুজ্জামান মানতে শুরু করে। শামসুদ্দীন ইরাকি কেবল মুসলমানদের মধ্যেই তাঁর দাওয়াত প্রচার করেননি, বরং হিন্দুদের মাঝেও অত্যন্ত তৎপরতার সাথে দাওয়াত দেন এবং হাজার হাজার হিন্দু তাঁর অনুসারী হয়ে যায়।

পরবর্তী বছরগুলোতে একদিকে চাকরা রাজনৈতিক উত্থান লাভ করতে থাকে এবং অন্যদিকে নূরবখশী ধর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চাকরা অত্যন্ত চতুরতার সাথে কাজ করে কাশ্মীরের সুলতানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। সেই সাথে তারা নূরবখশী ধর্মের দাঈদের জন্য জায়গির ওয়াকফ করে দেয় এবং স্থানে স্থানে ধর্মীয় কেন্দ্র স্থাপন করে। এভাবে কিছু...

---

[১] আব-ই-কাউসার: পৃ. ৩৭৯ থেকে ৩৮১।

কয়েক দশকের মধ্যে এখানে শিয়াদের সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তারা আহলে সুন্নাতের জন্য একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শিয়ারা তাকিয়া বর্জন করে প্রকাশ্যে তাদের সেই সব রসম-রেওয়াজ ও আকিদা প্রকাশ করতে শুরু করে যা মুসলমানদের জন্য মনঃকষ্ট ও উত্তেজনার কারণ ছিল। এখন স্থানে স্থানে শিয়া-সুন্নি উত্তেজনার ঘটনা ঘটতে থাকে। জায়গায় জায়গায় ঝগড়া এবং কিছু স্থানে গৃহযুদ্ধের উপক্রম হতে শুরু করে। সালতানাতে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা ও ঘৃণা স্থান করে নেয় এবং সরকার রাজনৈতিক সংকটের শিকার হয়।

অনেক স্বার্থান্বেষী রাজকীয় আমীর, বিশেষ করে চক সর্দাররা এই সুযোগকে গনিমত মনে করে এবং এমন অবাধ্য ও লাগামহীন হয়ে পড়ে যে সুলতানরা কেবল নামমাত্র সুলতান হিসেবে থেকে যান। তাদের কাছে কোনো সৈন্য বা বাহিনী ছিল না।

অবশেষে ৯৬১ হিজরি (১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালে চক সর্দার "আলী চক" দরবারে সবার সামনে সুলতানের মাথা থেকে রাজমুকুট খুলে তার ভাই গাজী চকের মাথায় পরিয়ে দেন। সুলতানের এত শক্তি ছিল না যে তিনি প্রতিরোধ করতে পারতেন। তাকে বন্দি করা হয়। [১]

কাশ্মীরের সুন্নি সুলতানরা দুইশ এগারো বছর শাসন করার পর বিদায় নেন এবং চক সর্দারদের শাসনামলে আহলে সুন্নাতের ওপর দিন দিন জুলুম-নির্যাতন বাড়তে থাকে। অবশেষে বাবা দাউদ খাকি রহ. এবং শেখ ইয়াকুব সরফি রহ.-এর মতো স্থানীয় বুজুর্গদের একটি প্রতিনিধি দল মুঘল সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের কাছে ফরিয়াদ নিয়ে যান, যার পর মুঘলরা ৯৯৪ হিজরি (১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সৈন্য অভিযান চালিয়ে কাশ্মীরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। [২]

কাশ্মীরের কয়েকজন প্রখ্যাত উলামা ও মাশায়েখ

মাওলানা জামালুদ্দিন কাশ্মীরি রহ.:

তিনি ফিকহ, হাদিস, উসুলে ফিকহ এবং আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আপনি আমীর কবীর সৈয়দ আলী হামদানি রহ.-এর সাহচর্যে কাশ্মীরে আগমন করেন এবং তাঁর নির্দেশে এখানেই বসবাস শুরু করেন যাতে সুলতান কুতুবুদ্দিন শাহ মির্জা কাশ্মীরিকে শিক্ষা দিতে পারেন। আপনি নিজেকে দরস ও ইরশাদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। আপনার কবর কাশ্মীর শহরে বেহাত (ঝিলাম) নদীর তীরে প্রসিদ্ধ। [৩]

শেখ হেলালুদ্দিন কাশ্মীরি নকশবন্দি রহ.:

শেখ হেলালুদ্দিন কাশ্মীরি রহ. অত্যন্ত মুত্তাকি, শরিয়তপন্থী এবং আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। আপনি কুবরাভিয়া সিলসিলার শিক্ষা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন আলী হামদানি রহ. থেকে অর্জন করেন এবং নকশবন্দিয়া সিলসিলায় শেখ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারি রহ. থেকে ফয়েজ লাভ করেন। আপনি সুলতান জয়নুল আবেদিন কাশ্মীরির শাসনামলে কাশ্মীরে আসেন এবং হেদায়েত ও পথপ্রদর্শনের কাজ শুরু করেন। অনেক মানুষ আপনার থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন। ৮৬২ হিজরিতে কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। [৪]

---

[১] মুকাম্মাল তারিখে কাশ্মীর, লেখক: মুহাম্মদ উদ্দিন ফওক: পৃ. ৩১৯ থেকে ৩২১

[২] নুজহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃ. ২৪৩

[৩] আবে কাওসার: পৃ. ৩৮২, ৩৮৩

[৪] নুজহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃ. ২৮৬

শেখ মুহাম্মদ বিন হাসান বাইহাকী রহ.:

শেখ মুহাম্মদ বিন হাসান বাইহাকী কাশ্মীরি রহ., যিনি 'আল-আমিন' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি উচ্চপর্যায়ের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনি আপনার পিতা এবং শেখ হিলালুদ্দিন কাশ্মীরি রহ.-এর নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় নির্জনবাস, ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত করেন। সুলতান যয়নুল আবেদিন কাশ্মীরি শহরের বাইরে তাঁর জন্য একটি চমৎকার খানকাহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ৮৮৯ হিজরিতে আপনি ইসলামবিদ্বেষীদের হাতে শহীদ হন [১]।

শেখ মনসুর বিন মুহাম্মদ কাশ্মীরি রহ.:

শেখ মনসুর বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ কাশ্মীরি রহ. চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী এবং একজন প্রখ্যাত হাকীম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আল-কিফায়াতুল মুজাহিদীয়া' স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং আর্দ্রতা (রুতুবাত) বিষয়ক একটি চমৎকার কিতাব, যা তিনি সুলতান যয়নুল আবেদিন কাশ্মীরির জন্য রচনা করেছিলেন। এটি দুটি অধ্যায় সম্বলিত এবং প্রতিটি অধ্যায়ে অনেকগুলো অংশ রয়েছে। এর একটি পাণ্ডুলিপি লন্ডনের কুতুবখানায় বিদ্যমান রয়েছে [২]।

শেখ নূরুদ্দিন কাশ্মীরি নকশবন্দী রহ.:

শেখ নূরুদ্দিন কাশ্মীরি রহ. ইলম ও মারেফাতের সূর্য ছিলেন। আপনার জন্ম ৭৫৭ হিজরিতে হয়েছিল। আপনি সৈয়দ মুহাম্মদ বিন আলী হামাদানী রহ.-এর নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। আপনি শেখ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রহ. থেকেও ফয়েজ হাসিল করেন। কাশ্মীরে আপনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ৮৩২ হিজরিতে আপনার ইন্তেকাল হয় [৩]।

শেখ দাউদ বিন হাসান কাশ্মীরি রহ.:

তিনি একজন মহান আলেম ও বুজুর্গ ছিলেন। তিনি ইলম ও তাসাউফের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনার জন্ম ও লালন-পালন কাশ্মীরে হয়েছিল। আপনি শেখ নাসিরুদ্দিন নাসিরীর নিকট কিছু দরসি কিতাব পড়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর মধ্যে তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ)-এর সংশয় দেখা দিলে আপনি পৃথক হয়ে যান এবং শেখ রযিউদ্দিন কাশ্মীরি রহ.-এর শাগরেদি গ্রহণ করে তাঁর নিকট বাকি সমস্ত দরসি কিতাব অধ্যয়ন করেন। আপনি মাওলানা আফজাল কাশ্মীরির নিকট থেকেও ইলম অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর আপনি শেখ হামযাহর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর সাথে অবস্থান করেন। আপনি শেখ আহমদ হুসাইনী কিরমানী, শেখ ইসমাইল হুসাইনী এবং শেখ মুহাম্মদ কাদেরী রহ. থেকেও ফয়েজ হাসিল করেন। আপনি একজন মহান গ্রন্থকার ছিলেন। আপনার রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে 'আল-আকিদাতুল জালালিয়া', 'আর-রিসালাতুল আলিয়া', 'উয়িরদুল মুরিদীন' এবং এর শারহ 'দস্তুরুল সালিকীন' উল্লেখযোগ্য।

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭১

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৩

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৬

https://t.me/BoierSomahar

অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মৃত্যু ৯৯৪ হিজরিতে হয়েছিল। [১]

মাওলানা রযীউদ্দীন কাশ্মীরী রহ.

মাওলানা রযীউদ্দীন হুসাইনী কাশ্মীরী রহ. কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি শেখ নাসিরুদ্দীন কাশ্মীরী রহ. এবং অন্যান্য ওলামাদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন, অতঃপর মির্জা হায়দার বিন মুহাম্মদ হুসাইন গোরগানীর শাসনকালে শ্রীনগরের কুতুবউদ্দীন পুরা মহল্লার একটি মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পাঠদান করেন।

শেখ দাদ বিন হাসান, শামসুদ্দীন পাল এবং শেখ ইয়াকুব বিন হাসান সরফী রহ. সহ অনেক ওলামায়ে কেরাম তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁর ইনশা, কবিতা এবং ক্যালিগ্রাফিতে দক্ষতা ছিল। তিনি সাতটি ভিন্ন শৈলীতে ক্যালিগ্রাফি করতেন। তাঁর বেশ কিছু রচনা রয়েছে। তাঁর মৃত্যু ৯৫৬ হিজরিতে হয়েছিল। [২]

মোল্লা শঙ্গরফ আল-কানায়ী রহ.

মোল্লা শঙ্গরফ কানায়ী কাশ্মীরী রহ.-এর জন্ম ও লালন-পালন কাশ্মীরে হয়েছে। নিজ দেশের শিক্ষকদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভের পর হজ্জের সফর করেন। সেখানে শেখ শাহাবুদ্দীন আহমদ বিন হাজার হাইতামী মক্কী রহ.-এর নিকট ইলমে হাদীস শেখেন এবং কাশ্মীরে ফিরে এসে পাঠদান শুরু করেন। তাঁকে মোল্লা শঙ্গরফ বলা হতো কারণ তিনি শঙ্গরফের কালি পছন্দ করতেন এবং তা দিয়েই লিখতেন। [৩]

শেখ হামজা মখদুম রহ., সুলতানুল আরেফীন

শেখ হামজা মখদুম রহ. কাশ্মীরের একজন মহান সূফী সাধক ছিলেন যাঁকে সুলতানুল আরেফীনও বলা হয়। ৯০০ হিজরিতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি শ্রীনগরের মাদরাসা দারুশ শিফায় সরফ, নাহু, তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং হাদীসসহ সমস্ত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। ৯৩৩ হিজরিতে হযরত মখদুম জাহানিয়া জাহান গশত রহ.-এর সাহেবজাদা পীর জালালুদ্দীন রহ. কাশ্মীরে আগমন করলে তিনি তাঁর নিকট বায়আত হন এবং ছয় মাস তাঁর সান্নিধ্যে মুজাহাদা ও রিয়াযতের পর খিলাফত লাভ করেন। তিনি কোহে মারানের এক কোণে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকেন। তাঁর ফয়েজ অত্যন্ত ব্যাপক হয়েছিল।

তাঁর মসজিদ নির্মাণের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল, ফলে বিভিন্ন মহল্লা, কসবা এবং গ্রামগুলোতে তিনি ডজন ডজন মসজিদ নির্মাণ করান। তিনি ২৪ সফর ৯৮৪ হিজরিতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এবং কোহে মারানের দক্ষিণ কোণে সমাহিত হন। তাঁর খলীফাদের মধ্যে বাবা দাউদ খাকী রহ. সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছেন। [৪]

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৭

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩০

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫১

[৪] আউলিয়ায়ে কাশ্মীর, পীরজাদা মুহাম্মদ হুসাইন তাইয়্যেব লাহোরী কর্তৃক: পৃষ্ঠা ২৫ থেকে ৩০, প্রকাশক: নাযীর সন্স লাহোর

https://t.me/BoierSomahar

শেখ ইয়াকুব সরফী কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

কাশ্মীরের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের জন্ম ৯০৮ হিজরি (১৫০২ খ্রিস্টাব্দ) সালে এবং মৃত্যু ১০০৩ হিজরি (১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে হয়েছিল। তিনি একজন মহান আলেম, গবেষক, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক এবং কবি ছিলেন। তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উস্তাদও ছিলেন।

তিনি সাত বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন এবং আট বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন। এরপর ইলমসমূহে এমন দক্ষতা অর্জন করেন যে, তাঁর একজন উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ আনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (যিনি মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্র ছিলেন) তাঁকে 'জামী-এ-সানি' উপাধি দেন। আলেম হওয়ার পর তিনি সুলুক ও ইহসানের দিকে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে খাজা হাসান আসিমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং পরে শেখ কামালুদ্দিন হুসাইনি খোয়ারিজমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর হাতে বায়াত হয়ে তাকওয়া ও মারেফাতের উচ্চ মকামে পৌঁছান এবং খেলাফত লাভ করেন।

কিছুকাল পর তাঁর দ্বিতীয় মুর্শিদের আদেশে তিনি সমরকন্দ এবং তারপর ইরান সফর করেন। সেই সময়ে ইরানে ইসনা আশারি শিয়াদের সফভী সালতানাত চরম শিখরে ছিল। এর পৃষ্ঠপোষকতায় আহলে সুন্নাতের ওপর কঠোরতা করা হচ্ছিল। অসংখ্য আলেমকে শহীদ করা হয়েছিল। তিনি এই সফরে সফভী শাসক তাহমাস্পের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে বুঝিয়ে সুন্নি আলেমদের সাধারণ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করান। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও নসিহতের তাহমাস্পের ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে সে সুন্নি আলেমদের ওপর কঠোরতা বন্ধ করে দেয়।

এই সফরেই তিনি আল্লামা ইবনে হাজার মক্কি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, যিনি তাঁকে সেই জুব্বা দান করেন যা হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে সম্পর্কিত। এই সফরেই বাগদাদে শেখ সেলিম চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর কাছ থেকে খেলাফতের খিরকা লাভ করেন। দীর্ঘ সফরের পর তিনি কাশ্মীরে ফিরে আসেন। সেই সময়ে কাশ্মীরে সুন্নি-শিয়া দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে ছিল এবং চক বংশের শাসকরা আহলে সুন্নাতকে দমন করতে ব্যস্ত ছিল।

এই পরিস্থিতিতে তিনি কাশ্মীরের আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মুঘল সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের দরবারে পৌঁছান এবং কাশ্মীরিদের ফরিয়াদ শোনান। এভাবে মুঘল সম্রাট কাশ্মীর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখানে সেনাবাহিনী পাঠান, যা কাশ্মীরকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং কাশ্মীরের শাসক ইয়াকুব খান চক, যে একজন কট্টর শিয়া ছিল, গ্রেফতার হয়। এভাবে কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসে।

কিছুকাল পর তিনি পুনরায় হারামাইন সফর করেন এবং ফেরার পথে হাদিস ও তাফসিরের কিতাবের এক বিশাল ভাণ্ডার সাথে নিয়ে আসেন।

তিনি অনেক কিতাব লিখেছেন যার মধ্যে কয়েকটি হলো:

- মানাসিকে হজ
- শরহে সহিহ বুখারি
- হাশিয়া-এ-তাওজিহ ওয়া তালউইহ
- তাফসির পারা তাবারাকাল্লাজি ও পারা আম্মা
- মাগাজিউন নবুওয়াত
- মাকামাতে মুর্শিদ

এ ছাড়া কাব্য ও সাহিত্যে তাঁর কয়েকটি কিতাব হলো: রিসালা বার জওয়াবে পাঞ্জ গঞ্জে খামসা নিজামী, ওয়ামিক আজরা, লায়লা মজনু।

তাঁর মৃত্যু ১২ জিলকদ ১০০৩ হিজরি (২০ জুলাই ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে হয়েছিল [১]।

---

[১] আউলিয়ায়ে কাশ্মীর, পীরজাদা মুহাম্মদ হোসেন তৈয়ব লাহোরি, পৃষ্ঠা: ৩৮-৪১, প্রকাশক: নাজির সন্স লাহোর।

বাবা দাউদ খাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

বাবা দাউদ খাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাশ্মীরের একজন বড় আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন। জন্ম ৯০৮ হিজরি (১৫২১ খ্রিষ্টাব্দ) শ্রীনগরে। নাম দাউদ, আর 'খাকি' ছিল তাঁর تخلص। বাবা দাউদ খাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি শৈশবেই মা-বাবার ছায়া থেকে বঞ্চিত হন। একটু বড় হলে স্থানীয় মাদরাসায় ভর্তি হন এবং পূর্ণ একাগ্রতা ও পরিশ্রমের সাথে পড়াশোনা শুরু করেন। আপনি প্রখ্যাত আলেমদের নিকট ফিকহ, হাদিস ও তাফসির শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ক্যালিগ্রাফিতেও উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করেন এবং কাব্যচর্চাও শুরু করেন। এভাবে যৌবনেই আপনি একজন প্রাজ্ঞ আলেম, শ্রেষ্ঠ কবি এবং চমৎকার ক্যালিগ্রাফার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং আপনাকে 'মোল্লা দৌলত খাকি' বলা হতে থাকে। সুলতান আলী শাহ তাঁর খ্যাতি শুনে প্রথমে তাঁকে নিজের ছেলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন, এরপর উজির-ই-তালীম বানান এবং আরও পদোন্নতি দিয়ে কাযিউল কুযযাত পদে আসীন করেন। এভাবে আপনি একজন সম্মানিত ও সচ্ছল জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। কিন্তু কিছুকাল পর যখন তিনি শেখ হামজা মাখদুমি রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বায়আত হলেন, তখন দুনিয়াবিমুখ ও ফকিরি জীবন বেছে নিলেন। মুর্শিদ কিছুকাল পর তাঁকে খলিফা বানিয়ে দেন।

আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাশ্মীরের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে ইসলামের প্রচার এবং বিদআত বিশেষ করে শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। একইভাবে আপনি আধ্যাত্মিক ও ঈমানি শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। আপনার মুরিদ এত বেশি ছিল যে তাদের একটি আলাদা সিলসিলার মর্যাদা দেওয়া হয় যাকে 'খাকি' বলা হয়।

যখন কাশ্মীরে কট্টর শিয়া শাসকদের জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন শেখ ইয়াকুব সরফি রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে বাবা দাউদ খাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও মুঘল দরবারে যান এবং জালালুদ্দিন আকবরকে কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

আপনি অনেক কিতাব লিখেছেন যেমন: বির্দুল মুরিদিন, দাস্তুরুল সালেকিন, কাসিদা জালালিয়া এবং কাসিদা লামিয়া।

শেষ জীবনে আপনি পূর্ণ নির্জনতা অবলম্বন করেন, সবসময় জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তবে সেই দিনগুলোতে আপনি মুলতান সফর করেন যাতে সেখানকার মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। ফেরার পথে শরীর খারাপ হয় এবং ৯৯৪ হিজরি (১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) আপনি ইন্তেকাল করেন। শ্রীনগরে কোহে মারানে শেখ হামজা মাখদুমি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। [১]

কাশ্মীরে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত আলেম ও মাশায়েখদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছিল যাদের অবদান কখনো ভোলা সম্ভব নয়। তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে চরম জুলুম-অত্যাচারের শিকার হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরের জনগণ দ্বীন-ই-মুদিনের সাথে সেভাবেই যুক্ত আছে যেমন আগে ছিল। ব্রাহ্মণ সাম্রাজ্যের অত্যাচার তাদের ঈমানি তেজকে কমাতে পারেনি বরং আরও বৃদ্ধি করেছে। সেই দিন দূরে নয় যখন কাশ্মীরি জনগণ জুলুম ও শোষণের শিকল ভেঙে বিশ্ব দরবারে এক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

---

[১] আউলিয়ায়ে কাশ্মীর, পীরজাদা মুহাম্মদ হোসেন তৈয়ব লাহোরি, পৃষ্ঠা: ৩৩০ থেকে ৩৩৪, প্রকাশক: নজির সন্স লাহোর।

বিহার ও বাংলার উলামা ও মাশায়েখ

শেখ জালাল তাবরিজি রহ.: মৃ. ৬৪১ হি. (১২৪৪ খ্রি.)

বাংলায় সর্বপ্রথম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু করেন শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজি রহ. (মৃ. ৬৪১ হি.), যিনি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর খলিফা ছিলেন। তিনি শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার রহ.-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার রহ. থেকেও উপকৃত হয়েছিলেন। যখন আপনি দিল্লিতে পৌঁছালেন, তখন আপনার আগমনের খবর আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ শহরের বাইরে নিজে দেখা করতে আসেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে অভ্যর্থনা জানান।

দিল্লি থেকে আপনি বদায়ূঁতে পৌঁছালেন। চেহারা এমন নূরানি ছিল যে, সেখানে এক ডাকাত তাঁকে দেখে বলতে লাগল: “মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও থাকে।” এই বলে সে কালিমা পাঠ করল এবং তার নাম রাখা হলো আলী।

সেই সময়ে পশ্চিম বাংলায় ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানে ইসলামের দাওয়াতের কাজ তখনও প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। ফলে আপনি সেখানেই গমন করলেন। সেখানে “বন্দর দেওমহল” নামে একটি স্থান ছিল যেখানে একটি প্রাচীন ও চমৎকার মূর্তিপূজার মন্দির ছিল। আপনি সেখানেই অবস্থান করলেন এবং দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে শিরকের মন্দ দিক এবং তাওহিদের হাকিকত বুঝালেন। এভাবে অনেক মূর্তিপূজারী কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। মন্দিরে রাখা মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলা হলো এবং সেই স্থানটিকেই আপনি নিজের খানকাহ বানিয়ে নিলেন। আপনার মৃত্যু ৬৪১ হিজরিতে হয়েছিল। [১]

মাওলানা শরাফউদ্দিন আবু তাওয়ামা রহ.:

মাওলানা শরাফউদ্দিন আবু তাওয়ামা রহ. ছিলেন শেখ শরাফউদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরী রহ.-এর উস্তাদ, প্রথম মুর্শিদ এবং শ্বশুর। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের আমলে তিনি দিল্লির বিশিষ্ট আলেম হিসেবে গণ্য হতেন। তাফসির, হাদিস ও ফিকহ ছাড়াও গণিত, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং আরও অনেক শাস্ত্রের সমন্বয়কারী ছিলেন। হিংসুকদের হিংসা ও নির্যাতনের কারণে অবশেষে সুলতান বলবনের আমলে দিল্লি ছেড়ে বাংলায় চলে আসেন। যদিও তিনি আল্লাহর ওলি ছিলেন, তবে তাসাউফের চেয়ে তাঁর মনোযোগ ইলমের প্রতি বেশি ছিল, তাই তাঁর দরস বা পাঠদানের মজলিস খুব বিখ্যাত হয়ে ওঠে যেখান থেকে বিপুল সংখ্যক আলেম তৈরি হন। মাওলানার মৃত্যু ৭০০ হিজরিতে (১৩০০ খ্রি.) হয়েছিল। [২]

---

[১] ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ: পৃ. ৩৬০, ৩৫৯; আপ-ই-কাওসার: পৃ. ২৯৯ থেকে ৩০৩; তারিখ-ই-সোহরাওয়ার্দিয়া: পৃ. ৭৯ থেকে ৮১; তাজকিরা-ই-সুফিয়া-ই-বেঙ্গল, কুদ্দুসী রচিত: পৃ. ১১৩ থেকে ১৩৯, প্রকাশক: কেন্দ্রীয় উর্দু বোর্ড, করাচি।

[২] নুজহাতুল খাওয়াতীর: পৃ. ১০২; সুফিয়া-ই-বেঙ্গল: কুদ্দুসী রচিত: পৃ. ২৪১ থেকে ২৪৫।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

শেখ শরফুদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৬৬১ হিজরি থেকে ৭৮২ হিজরি / ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দ)

শেখ শরফুদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সম্পর্ক সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার ফেরদৌসী শাখার সাথে ছিল। আপনাকে 'মাখদুমুল মুলক' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। যদিও আপনার সম্পর্ক বিহারের সাথে ছিল এবং সেখানেই অবস্থান ও বসবাস ছিল, তবুও আপনার শিক্ষা ও রচনাবলি কেবল বিহার নয় বরং পুরো হিন্দুস্তানের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটে গভীর প্রভাব ফেলেছে। আপনার জন্ম ৬৬১ হিজরিতে (১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) বিহারের 'মানেরে' [১] হয়েছিল।

আপনার পিতা শেখ ইয়াহইয়া মানেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও একজন উচ্চমর্যাদার আলেম ও সুফি ছিলেন। আপনার নানা শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মুরিদ ও মাজাজ ছিলেন।

আপনি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় মক্তবে শুরু করেন। কিছুকাল পর দিল্লির বিখ্যাত আলেম শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লি থেকে সোনারগাঁও (বর্তমান বাংলাদেশ) যাওয়ার পথে মানেরে অবস্থান করেন। শরফুদ্দিন আহমদ তাঁর দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হন যে, পিতার অনুমতি নিয়ে মাওলানা আবু তাওয়ামার সাথে সোনারগাঁও চলে যান এবং দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থান করে তাফসির, হাদিস ও ফিকহের শিক্ষা অর্জন করেন। এছাড়াও সোনারগাঁওয়ে থাকাকালীন তিনি যুক্তিবিদ্যা, গণিত, দর্শন ও অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অর্জন করেন, পাশাপাশি তাসাউফের কিতাবও অধ্যয়ন করেন। আপনি বিভিন্ন ফিকহি ও দার্শনিক চিন্তাধারার গভীর অধ্যয়ন করেন এবং একজন উচ্চস্তরের আলেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। শিক্ষা চলাকালীন ওস্তাদের কন্যার সাথে বিবাহ হয় এবং তিন কন্যা ও তিন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু শাহজাকিউদ্দিন নামক এক পুত্র ব্যতীত সকল সন্তান শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীও সেখানে ইন্তেকাল করেন। আপনি শিক্ষা সমাপ্ত করে পুত্র শাহজাকিউদ্দিনকে নিয়ে মানেরে ফিরে আসেন।

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মারিফাতে ইলাহির তৃষ্ণা জাগ্রত হলো। প্রথমে নিজের ওস্তাদ আবু তাওয়ামা রহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে রুজু করলেন কিন্তু তিনি দিল্লি যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। چنانچہ সেখানে সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার এক বুজুর্গ শেখ নাজিবুদ্দিন ফেরদৌসী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। چنانچہ আপনি শেখ নাজিবুদ্দিন ফেরদৌসী রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং মুজাহাদা ও রিয়াজতে মশগুল হয়ে অবশেষে মাজাজ ও বায়াত প্রাপ্ত হলেন।

এরপর স্বদেশে ফিরে আসেন কিন্তু শীঘ্রই আপনার ওপর জজবা প্রবল হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘকাল লোকালয় থেকে দূরে 'রাজগির'-এর জঙ্গলে ইবাদত করতে থাকেন যেখানে এক সময় গৌতম বুদ্ধের আবাস ছিল এবং যা মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। মানুষ আপনার খিদমতে উপস্থিত হতে শুরু করে এবং শীঘ্রই দূর-দূরান্ত পর্যন্ত খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আপনাকে 'মাখদুম' বলা হতে থাকে এবং এই স্থানটি আপনার নামে আজও 'মাখদুম কুন্ড' নামে পরিচিত।

দীর্ঘকাল পর ভক্তদের অনুরোধে কেবল জুমার দিন শহরে এসে ওয়াজ ও নসিহতের মজলিস অলঙ্কৃত করতে...

---

[১] এখানে পাঠকদের মনে রাখা উচিত যে, মানের-এর 'মীম' বর্ণের ওপর জবর রয়েছে, যখন কি অনেকে একে পেশ বা যের দিয়ে পড়ে থাকেন যা ভুল।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের যুগে আপনার খ্যাতি তুঙ্গে ছিল। সুলতান আপনার জন্য একটি খানকাহ নির্মাণ করে দেন এবং এর ব্যয়ের জন্য একটি জায়গিরও ওয়াকফ করে দেন। আপনি বাকি জীবন এই খানকাহতেই অতিবাহিত করেন। জিকির ও ইবাদত ছাড়াও বেশিরভাগ সময় ওয়াজ ও নসিহতে ব্যয় করতেন।

এর পাশাপাশি আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছেন তা হলো লেখালেখি ও সংকলনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং একটি বিশাল লিখিত ভাণ্ডার রেখে গেছেন। এর আগে হিন্দুস্তানের মাশায়েখদের এই দিকে মনোযোগ ছিল না। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) থেকে শুরু করে শাহ রুকন আলম (রহ.) পর্যন্ত আমাদের কোনো বুজুর্গের কোনো সংকলন নজরে আসে না। অবশ্য কিছু মাশায়েখ যেমন হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (রহ.) এবং খাজা নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলভী (রহ.)-এর মুরিদগণ তাঁদের মালফুজাত সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু যে মর্যাদা কোনো শায়খের নিজস্ব সংকলনের থাকে, তা মালফুজাতের হতে পারে না। چنانچہ গজনভি সুলতানদের থেকে শুরু করে তুঘলক পর্যন্ত হিন্দুস্তানে তাসাউফ অধ্যয়নের জন্য মাত্র দুটি কিতাবই সহজলভ্য ছিল অর্থাৎ এক হযরত আলী হাজবেরি (রহ.)-এর 'কাশফুল মাহজুব' এবং দ্বিতীয়টি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.)-এর 'আওয়ারিফুল মাআরিফ'। এই স্থবিরতা শেখ শরফুদ্দিন আহমদ (রহ.) ভেঙেছেন এবং অসংখ্য রিসালা ও কিতাব লিখে মাশায়েখদের একটি নতুন ধারা উপহার দিয়েছেন, যার পর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এই বিষয়ে চমৎকার সব সংকলন সামনে আসতে থাকে।

আপনার সবচেয়ে বিখ্যাত সংকলন হলো 'মাকতুবাত-ই সাদি', যাতে আপনি তাসাউফ, আকাইদ, আখলাক ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে চিঠিপত্র আকারে ছোট ছোট রিসালা লিখেছেন। আপনার মালফুজাতেরও কিছু সংকলন রয়েছে। এ ছাড়া 'মাকতুবাত-ই দো সাদি' এবং 'মাআদানুল মাআনি' ও আরও কিছু রিসালা আপনার স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছে।

আপনার লিখনশৈলী অত্যন্ত পরিশীলিত, হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাবশালী। অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ঢঙে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্থানে স্থানে ঘটনা ও উদাহরণের মাধ্যমে সূক্ষ্ম রহস্যগুলো বুঝানো হয়েছে। কোথাও কোথাও কৌতুক ও গল্পের মাধ্যমে সজীবতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

দিল্লি ও বাংলার শাসকগণ আপনার অত্যন্ত কদরদান ছিলেন। বিশেষ করে বাংলার শাহ গিয়াসউদ্দিন [১] আপনার ভক্ত ছিলেন। আপনি হজ পালনের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন যা সেই যুগের মাশায়েখদের মধ্যে খুব কমই নসিব হতো। আপনি চট্টগ্রাম উপকূল থেকে সমুদ্র জাহাজে চড়ে পবিত্র সফরে রওনা হন এবং ফিরে আসেন। এই সফরে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আপনাকে সম্ভাব্য সব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার নির্দেশ জারি করে আপনার থেকে অনেক দোয়া নিয়েছিলেন।

শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরী (রহ.) অত্যন্ত দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। ১১২ বছর জীবিত থেকে ৭৮২ হিজরি (১৩৮১ খ্রি.) সালে ইন্তেকাল করেন। বিহারে নিজের পৈতৃক শহর 'মানের'-এ সমাহিত হন, যেখানে আপনার মাজার আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিয়ারতগাহ। [২]

---

[১] গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর ১৩১০ থেকে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কখনো পূর্ব এবং কখনো পশ্চিম বাংলার সুবাহদার ছিলেন। এরপর বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কিন্তু ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সেনাবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। কয়েক মাস পর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাকে পুনরায় বাংলার সুবাহদারি অর্পণ করেন কিন্তু তিনি আবার বিদ্রোহ করেন এবং অবশেষে ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন।

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৩; আব-ই কাওসার: পৃষ্ঠা ৩৩৬ থেকে ৩৪০; তজকিরায়ে মাখদুম জাহান, মাওলানা সানাউল্লাহ মানেরী; জামে মানেরিয়া বিহার।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

শেখ সিরাজুদ্দিন উসমান আওধি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৭৫৮ হিজরি (১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ)
শেখ সিরাজুদ্দিন উসমান রহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্পর্ক ছিল বাংলার রাজধানী লখনৌতির সাথে। আপনাকে সাধারণত "আখি সিরাজ আওধি" বলে স্মরণ করা হয়। আপনি বাল্যকালেই দিল্লিতে এসে সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে যুক্ত হয়েছিলেন। বছরে একবার মায়ের সাথে দেখা করতে লখনৌতি যেতেন। বছরের বাকি সময় খানকাহ নিজামিয়ায় কাটত। ইলম ও ফন (জ্ঞান-বিজ্ঞান)-এর দিকে মনোযোগ ছিল না, তবে মুর্শিদের খিদমত এবং জিকির ও ইবাদত খুব বেশি করতেন, যার ফলে কলবে সাফি (পরিচ্ছন্ন অন্তর) খুব দ্রুত আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।

হযরত সুলতান জি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কিছু প্রশিক্ষিত মুরিদকে খিলাফত দিতে লাগলেন, তখন কেউ এই যুবকের নামও পেশ করল। সুলতান জি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "এই কাজে প্রথম স্তর হলো ইলম (জ্ঞান), আর সে ইলম থেকে বঞ্চিত।" তিনি আরও বললেন: "মূর্খ সুফি শয়তানের হাতের খেলনা হয়ে যায়।"

সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইচ্ছা বুঝতে পেরে তাঁর মুরিদ আল্লামা ফখরুদ্দিন জারাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "আমি তাকে ছয় মাসে আলেম বানিয়ে দেব।" সুতরাং এই যুবককে আলেম বানানোর দায়িত্ব নিয়ে খুব মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে তাকে পড়াতে লাগলেন এবং তার জন্য ইলমে সরফ-এর একটি সহজ কিতাবও লিখলেন যার নাম রাখলেন "উসমানিয়া"।

তাঁর উস্তাদদের মধ্যে শেখ রুকনুদ্দিন অন্দরপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন, যাঁর কাছে তিনি নাহু শাস্ত্রে ইবনে হাজিব-এর 'কাফিয়া' ও 'আল-মুফাসসাল' এবং ফিকহ শাস্ত্রে 'মাজমাউল বাহরাইন'-এর মতো কিতাবসমূহ পড়েছেন। পরিশেষে যখন যথেষ্ট ইলম অর্জন করলেন, তখন সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে খিলাফত দান করলেন এবং "আয়না-এ হিন্দ" উপাধিতে ভূষিত করলেন। শীঘ্রই হযরত সুলতান জি রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল হয়ে গেল।

শেখ সিরাজ উসমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি শিক্ষা চালিয়ে গেলেন এবং হযরত সুলতান জি রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের তিন বছর পর শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। এরপরও আরও আত্মশুদ্ধির জন্য সেই একই খানকাহতে হযরত চেরাগ দেহলভি রহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে যুক্ত হলেন। পরিশেষে তাঁর থেকেও খিলাফতের খিরকা লাভ করলেন এবং তাঁর নির্দেশে লখনৌতি গিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন। আপনার জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পেল যে বাংলার বাদশাহ পর্যন্ত আপনার মুরিদ হয়ে গেলেন। দীর্ঘ সময় সেখানে কাজ করলেন এবং অবশেষে ৭৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করে লখনৌতিতেই সমাহিত হলেন। মাজার শরিফ আজ পর্যন্ত মানুষের মিলনস্থল। কিছু ব্যক্তির মতে দরসে নিজামিতে অন্তর্ভুক্ত নাহু শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মূল পাঠ "হিদায়াতুন নাহু" শেখ সিরাজুদ্দিন উসমান রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত। ওয়াল্লাহু আলাম [১]

শেখ علاء الحق (আলাউল হক) পান্ডবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৮০০ হিজরি (১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ)
আপনি শেখ সিরাজুদ্দিন উসমান রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফায়ে মাজাজ এবং উত্তরসূরি ছিলেন। আপনার জন্ম "পান্ডুয়া"-তে হয়েছিল যা পশ্চিম বাংলার লখনৌতি থেকে উত্তর-পূর্বে ৩৭ কিলোমিটার দূরে মালদহ জেলার একটি ঐতিহাসিক জনপদ।

আপনি একটি বিত্তশালী পরিবারের সদস্য ছিলেন। পিতা লখনৌতির অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তাই আপনার কাছে ধন-সম্পদের...

---

[১] তারিখ-ই ফিরিশতা: ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৫, ৪৭৭; আখবারুল আখইয়ার: পৃষ্ঠা ১৯৬, ১৯৭; তাজকিরা-এ সুফিয়া-এ বেঙ্গল: পৃষ্ঠা ১৯৩ থেকে ২১৮; নুযহাতুল খাওয়াতির: ২, পৃষ্ঠা ১৭৩।

প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু যখন আপনি শেখ সিরাজ উসমান (রহ.)-এর মুরিদ হলেন, তখন সবকিছু আল্লাহর পথে দিয়ে দিয়ে ফকিরি অবলম্বন করলেন। নিজের মুরশিদের এমন খিদমত করেছেন যা কোনো গোলামও তার মনিবের জন্য করতে পারে না।

যখন আপনি খিলাফত লাভ করলেন এবং মানুষকে দীনের দিকে ডাকার সিলসিলা শুরু করলেন, তখন হক তাআলার পক্ষ থেকে এমন প্রাচুর্যের বিষয় ঘটল যে দুনিয়া অবাক হয়ে গেল। আপনার খানকায় শত শত মানুষ আসত। লঙ্গরখানা সবসময় চালু থাকত। প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা খরচ হতো যা আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণ হতো। যেহেতু আপনার পিতা অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তাই বাদশাহর মনে কুধারণা জন্মাল যে, হয়তো তিনি সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে খানকায় ব্যয় করছেন। তিনি পূর্ণ তদন্ত করালেন কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হলো না। তা সত্ত্বেও বাদশাহ শেখ আলাউল হক (রহ.)-কে আদেশ দিলেন যেন তিনি সোনারগাঁওয়ে স্থানান্তরিত হন। শেখ সেখানে চলে গেলেন কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে সিলসিলা একইভাবে জারি রাখলেন। শেখ খাদেমদের আদেশ দিলেন যে লঙ্গরখানার খরচ আগের চেয়ে দ্বিগুণ করে দাও। তবুও কখনো কোনো অভাব দেখা দেয়নি। অবশেষে বাদশাহর সন্দেহ দূর হলো এবং দুই বছর পর নির্বাসনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো।

আপনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু দুনিয়াবি কাজে কারো সাথে জড়ানোকে আপনি সময়ের অপচয় মনে করে উপেক্ষা করতেন এবং সেই সময়গুলো সবসময় কাজে আসে এমন সওয়াবের কাজে ব্যয় করতেন। আপনার দুটি পৈতৃক বাগান ছিল যেখান থেকে অনেক বার্ষিক আয় হতো কিন্তু সেগুলোর ওপর এক ব্যক্তি দখলদার ছিল। আপনি কখনো সেই বাগানগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করেননি।

হিন্দুস্তানে তৈমুরি আক্রমণের এক বছর আগে ৮০০ হিজরি (১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন এবং ‘পান্ডুয়া’য় দাফন করা হয় যেখানে মাজার মোবারক আপনার দাওয়াত ও কুরবানির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। [১]

আপনার সবচেয়ে বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি (রহ.), যাঁর অবস্থা জৌনপুরের মাশায়েখদের অধীনে সামনে আসছে। বাংলায় আপনার সিলসিলা আপনার সাহেবজাদা নূরুল হক কুতুব আলম (রহ.)-এর মাধ্যমে ছড়িয়েছে।

হযরত নূরুল হক কুতুব আলম (রহ.):

পরবর্তী যুগে শেখ আলাউল হক পান্ডুভী-র সাহেবজাদা এবং উত্তরসূরি হযরত নূরুল হক কুতুব আলম (রহ.)-কে বাংলায় আধ্যাত্মিক ফয়েজ বিতরণ এবং ইসলাম প্রচার করতে দেখা যায়।

শৈশব থেকেই তিনি তাঁর পিতা শেখ আলাউল হক (রহ.)-এর কাছে বায়আত ছিলেন এবং একজন সাধারণ মুরিদ বরং গোলামের মতো তাঁর খানকায় সমস্ত খিদমত আঞ্জাম দিতেন। দরবেশদের কাপড় ধুতেন। তাঁদের জন্য পানি গরম করতেন। আট বছর পর্যন্ত তিনি খানকার রান্নাঘরের জন্য কাঠ কেটে আনতেন। একদিন পিতা বললেন: “নূরুল হক! যে জায়গায় মহিলারা কুয়া থেকে পানি তোলে, সেখানে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। মহিলাদের পা পিছলে যায় এবং পাত্র ভেঙে যায়। তুমি তাদের পানি তুলে দিও।” ফলে নূরুল হক কাঠ কাটার পাশাপাশি চার বছর পর্যন্ত এই খিদমতও আঞ্জাম দেন। আপনি কুয়া থেকে বালতি টানতেন।

---

[১] আখবারুল আখইয়ার: পৃ. ৩০৯, ৩১০; তজকিরায়ে সুফিয়ায়ে বেঙ্গল, ইজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃ. ২৬৫ থেকে ৩১৫।

পানি ঢেলে একটি চৌবাচ্চা পূর্ণ করে দিতেন এবং সেখান থেকে মহিলারা পানি ভরে নিয়ে যেত।

হযরত আলাউল হক রহ.-এর পরিবার নেতৃত্ব ও আভিজাত্যে বিশিষ্ট ছিল। তাঁর বড় ছেলে শেখ আজম সরকারি পদে পদোন্নতি পেতে পেতে সালতানাতের উজির হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছোট ভাই নূরুল হককে নিজের কাছে ডেকে কোনো পদ দিতে চেয়েছিলেন, কয়েকবার এ ব্যাপারে জেদও করেছিলেন কিন্তু নূরুল হক হেসে বলতেন: "খানকাহর জন্য কাঠ বয়ে আনা আমার কাছে উজির হওয়ার চেয়ে উত্তম।"

পরিশেষে শেখ আলাউল হক রহ. অনেক প্রশিক্ষণ ও পরিমার্জনের পর তাঁর এই যোগ্য সন্তানকে খিলাফত দান করেন এবং খানকাহর গদিনশীন হওয়ার অসিয়তও তাঁর জন্যই করেন।

কিন্তু নূরুল হকের মধ্যে বিনয় এত বেশি ছিল যে, পিতার জীবদ্দশায় তো বটেই, তাঁর ইন্তেকালের পরেও কখনো তাঁর আসনে বসেননি। তিনি বলতেন: "এখানে বসার অধিকার তারই আছে, যে এর ওপর বসে ডানেও তাকাবে না, বামেও তাকাবে না।"

এই বিনয়ের বদৌলতে আপনার পক্ষ থেকে ফয়েজের এমন ঝরনাধারা জারি হলো যে, এক বিশাল জগত উপকৃত হতে লাগল। রহমত, বরকত ও সম্মানের দরজা আপনার জন্য খুলে গেল। আপনার কাছে বায়আত হওয়ার জন্য পুরো হিন্দুস্তান থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। মুরিদদের মুখে আপনার জন্য কুতুব-এ-আলম এবং কুতুব-এ-নূর-এ-আলম এর মতো উপাধি জারি হয়ে গেল। কিন্তু জনপ্রিয়তার এই চরম শিখরে পৌঁছেও হযরত কখনো অহংকার বা আত্মমুগ্ধতায় লিপ্ত হননি, বরং লিল্লাহিয়াত, খশিয়ত এবং খুশু বৃদ্ধি পেতে থাকল।

একবার কোনো এক স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে ভক্তদের ভিড় দেখে এত কাঁদলেন যে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ ফিরলে নিজের খাস খাদেম শেখ হুসামুদ্দিনকে বলতে লাগলেন: "আজ এত মানুষ আমাদের মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করছে, কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন কী হবে? আল্লাহ না করুন যে, সেখানে আমাদের মাথা এই মানুষদের সামনেই পদদলিত হতে থাকে।"

আপনি অনেক মহান খলিফা ছাড়াও মাকতুবাত এবং কিতাব আকারে একটি ইলমি সম্পদ রেখে গেছেন।

আপনার জীবনে এমন দুটি সুযোগ এসেছিল যখন আপনাকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল: প্রথম সুযোগটি তখন আসে যখন সিকান্দার শাহ আউয়াল (৭৫৯ হিজরি থেকে ৭৯৩ হিজরি)-এর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম নিজ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। গিয়াসউদ্দিন আজম হযরত নূরুল হক রহ.-এর সহপাঠী, বড় আলেম, ফাজিল এবং নেককার চরিত্রের রাজপুত্র ছিলেন এবং হযরতের সাথে তাঁর শৈশব থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ফলে এই সুযোগে হযরত নূরুল হক কুতুব-এ-আলম রহ. তাঁকে সমর্থন করেন এবং তাঁকে ক্ষমতায় বসাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দ্বিতীয় সুযোগটি তখন আসে যখন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল 'দিনাজপুর'-এর বয়োবৃদ্ধ হিন্দু জমিদার 'গণেশ', যে সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিল। সে সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করায় এবং নিজের তত্ত্বাবধানে একে একে দুই জন পুতুল রাজাকে সিংহাসনে বসায়, কিন্তু পরিশেষে সে নিজেই সিংহাসন দখল করে নেয় এবং জুলুম-অত্যাচারের বাজার গরম করে দেয়। সে অনেক আলেম ও মাশায়েখকে হত্যা করায়। বুজুর্গদের একটি দলকে নৌকায় বসিয়ে ডুবিয়ে দেয় এবং বাংলা থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে।

হযরত নূরুল হক কুতুব আলম (রহ.) এই পরিস্থিতি দেখে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি জৌনপুরের বাদশাহ সুলতান ইব্রাহিম শরকিকে বাংলার মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ডাকলেন। তাঁর পত্রের বিষয়বস্তু ছিল:

"গণেশ নামক এক কাফের শাসক এই দেশের ওপর চড়াও হয়েছে এবং জুলুম ও রক্তপাতকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করেছে। সে অধিকাংশ উলামা ও মাশায়েখকে হত্যা করেছে এবং এখন অবশিষ্ট ইসলামপন্থীদের শেষ করার চিন্তায় আছে। আমি আশা করি যে, আপনি এখানে এসে মুসলমানদের এই জালেমের হাত থেকে মুক্তি দেবেন।"

হযরত আলাউল হক পান্ডবী (রহ.)-এর খলিফা সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানী (রহ.) জৌনপুরে ছিলেন এবং অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সুলতান ইব্রাহিম শরকি এই বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন:

"যদি আপনি হযরত কুতুব আলম (রহ.)-এর সাহায্যে এই পরিবারের লোকদের এই জুলুম থেকে মুক্তি দেন, তবে এটি একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি হবে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি বাংলাকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্তি দেন। আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নেবেন না।"

কাজী শাহাবুদ্দিন দৌলতাবাদীও একই পরামর্শ দিলেন এবং বললেন যে, এই জুলুমের অবসানের সাথে সাথে একটি বড় সাম্রাজ্যও অর্জিত হবে। ফলে সুলতান ইব্রাহিম জৌনপুর থেকে এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হলেন। গণেশ এই খবর শুনে ভীত হয়ে পড়ল এবং হযরত কুতুব আলম (রহ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করল যেন তিনি জৌনপুরের সুলতানকে সামরিক অভিযান থেকে বিরত রাখেন। আপনি বললেন: "আমি একজন জালেমের জন্য একজন মুসলমান বাদশাহর কাছে কীভাবে সুপারিশ করতে পারি? হ্যাঁ, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তবে ভিন্ন কথা।"

গণেশ ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো কিন্তু তার স্ত্রী বাধা হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে গণেশ হযরতকে বলল: "আমার পরিবর্তে আমার ছেলে জিতমল ওরফে 'যদু'কে মুসলমান করে দিন যাতে সে বাদশাহ হতে পারে। আমি সিংহাসন ত্যাগ করব।"

আপনি এটি কবুল করলেন। 'যদু' ইসলামে দীক্ষিত হলো এবং তার নাম রাখা হলো জালালুদ্দিন। গণেশ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এরপর হযরত কুতুব আলম বাদশাহর কাছে বার্তা পাঠালেন যেন তিনি সামরিক অভিযান বন্ধ করেন।

সুলতান ইব্রাহিম শরকি অত্যন্ত বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কাজী দৌলতাবাদীকে হযরতের কাছে পাঠালেন। তিনি গিয়ে আরজ করলেন: "হযরত! আপনি নিজেই সামরিক অভিযানের দাওয়াত দিয়েছিলেন আর এখন যখন বাহিনী চলে এসেছে, তখন আপনি তা থামাতে চাচ্ছেন।"

হযরত কুতুব আলম (রহ.) বললেন: "হ্যাঁ, সেই সময় একজন কাফের বাদশাহ শাসক ছিল কিন্তু এখন সে তার ছেলেকে বাদশাহ বানিয়েছে যে মুসলমান হয়ে গেছে। একজন মুসলমান বাদশাহর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান কীভাবে জায়েজ হতে পারে?"

কাজী সাহেব নিরুত্তর হয়ে ফিরে এলেন এবং বাদশাহকে পুরো ঘটনা শোনালেন কিন্তু বাদশাহর অসন্তুষ্টি দূর হলো না। হযরত নূরুল হক (রহ.) সম্পর্কে তাঁর মন পরিষ্কার ছিল না, তাই তিনি তাঁর সাথে দেখা করা এবং তাঁর দ্বীনদারি ও ইলমি গভীরতা যাচাই করা জরুরি মনে করলেন। তিনি কাজী দৌলতাবাদীকে সাথে নিয়ে হযরতের কাছে এলেন। এই বৈঠকে কাজী সাহেব পরীক্ষা স্বরূপ হযরত নূর আলম (রহ.)-কে কিছু কঠিন প্রশ্ন করলেন যার হযরত অত্যন্ত চমৎকার উত্তর দিলেন।

পরিশেষে কাজী শাহাবুদ্দিন বিস্মিত হয়ে সুলতান ইব্রাহিম খলজির সাথে ফিরে গেলেন। হযরত নূর আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের চলে যাওয়ার পর বললেন: “দরবেশদের অবজ্ঞা করা এবং তাদের পরীক্ষা করার ফলাফল ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়।”

ফিরে আসার কিছু দিন পর সুলতান ইব্রাহিম শারকি এবং কাজী দৌলত آبادی একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

সুলতান ইব্রাহিমের মৃত্যুর সংবাদে গণেশ খুশি হলো যে বিপদ কেটে গেছে। সে তার ছেলেকে সরিয়ে নিজে সিংহাসন দখল করে নিল এবং ছেলেকে প্ররোচিত করতে লাগল যেন সে পুনরায় হিন্দু হয়ে যায়। সে ছেলেকে ধর্মে ফিরিয়ে আনার অনুষ্ঠান করাল, অর্থাৎ সোনার বড় বড় কয়েকটি গরু তৈরি করাল এবং ছেলেকে সেগুলোর ভেতর দিয়ে অতিক্রম করাল। এরপর সেই সোনা পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। কিন্তু ছেলেটি হযরত নূর আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকতে মনেপ্রাণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে পরিষ্কার বলে দিল যে সে মুসলমানই থাকবে।

গণেশ তাকে বন্দি করল এবং নিজে বাংলার ওপর চেপে বসল। এই সময়কাল মুসলমানদের জন্য এবং বিশেষ করে হযরত নূর আলম রহমাতুল্লাহি আলাইহির পরিবারের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। যখন গণেশের জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন একদিন নূর আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার আরজ করলেন: “হযরত! আপনার মতো ওলী থাকা সত্ত্বেও কেন এই জুলুম হচ্ছে?”

হযরত রাগান্বিত হলেন, বললেন: “এই জুলুম ততক্ষণ শেষ হবে না যতক্ষণ না তোমার রক্ত ঝরবে।”

কিছুকাল পর গণেশ হযরত নূর আলমের অনুসারীদের ওপর ঘেরাও শক্ত করল এবং কষ্ট বাড়িয়ে দিতে থাকল, এমনকি তাদের সম্পত্তি, সম্পদ, ঘরবাড়ি সবকিছু লুট করে তাদের নিঃস্ব করে দিল। এরপর তার জুলুমের হাত হযরতের সন্তানদের পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং সে শেখ আনোয়ার ও শেখ জাহিদকে গ্রেপ্তার করে সোনারগাঁওয়ে বন্দি করল।

শত্রুরা রটিয়ে দিয়েছিল যে এই পরিবারের একটি পৈতৃক ধনভাণ্ডার মাটির নিচে পুঁতে রাখা আছে। ফলে রাজা গণেশ কর্মচারীদের আদেশ দিল যে এই দুজনের ওপর নির্যাতন চালিয়ে সেই ধনভাণ্ডারের সন্ধান বের করো এবং তারপর তাদের হত্যা করো। এভাবে দুজনের ওপর এত বেশি নির্যাতন করা হলো যে শেখ আনোয়ার তা সহ্য করতে না পেরে শহীদ হয়ে গেলেন। শেখ জাহিদও মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন, সেই অবস্থায় তার মুখ থেকে বের হলো:

“অমুক জায়গায় একটি ডেকচি পোঁতা আছে। গিয়ে বের করে নাও।”

গণেশের কর্মচারীরা সেখানে খনন করলে একটি ডেকচি বেরিয়ে এল কিন্তু তাতে ছিল মাত্র একটি আশরাফি। তারা ফিরে এসে জানাল যে মাত্র একটি আশরাফি পাওয়া গেছে। শেখ জাহিদ বললেন: “বাকিগুলো হয়তো কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।”

এই সময়ে গণেশের নওমুসলিম পুত্র জালালুদ্দিন, যিনি এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন, দীর্ঘকাল ধরে সুযোগ খুঁজছিলেন যেন তার জালেম পিতাকে হত্যা করতে পারেন। যেদিন শেখ আনোয়ার শহীদ হলেন, সেদিনই জালালুদ্দিন সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং তার কয়েকজন অনুগত ব্যক্তির সাহায্যে মুক্তি পেয়ে পিতাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিজে সিংহাসনে বসলেন। তিনি যে মুসলমান তা স্পষ্ট করে ‘সুলতান জালালুদ্দিন আবুল মুজাফফর মুহাম্মদ শাহ’ নামে শাসন শুরু করলেন।

এখানে প্রফেসর আর্নল্ড একটি বর্ণনা যোগ করেছেন যা থেকে এই নওমুসলিম শাহজাদার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও জনপ্রিয়তা প্রকাশ পায়। আর্নল্ড লিখেছেন:

“তিনি তার সাম্রাজ্যের সকল সর্দারদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের জানালেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তারা যদি তার সিংহাসন আরোহণে সম্মত না হয়, তবে তিনি তার ভাইয়ের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করবেন। এ কথা শুনে সর্দাররা বলল যে, তিনি যে ধর্মই গ্রহণ করুন না কেন, আমরা তাকে আগের মতোই আমাদের বাদশাহ হিসেবে মেনে নেব। ফলে রাজা কয়েকজন ইসলামি আলেমকে তলব করলেন যাতে তারা তার ইসলাম গ্রহণের সাক্ষী হতে পারেন। রাজা নিজের নাম পরিবর্তন করে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ রাখলেন এবং তার শাসনামলে আরও অনেক হিন্দু মুসলমান হলেন।” [১]

তিনি একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও নেককার বাদশাহ হিসেবে প্রমাণিত হলেন। তিনি হযরত নূর আলম রহ.-এর শহর পান্ডুয়ার জন্য (তার) পুত্র শেখ জাহিদকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে মুক্ত করে সোনারগাঁও থেকে ফিরিয়ে আনলেন। নওমুসলিম জালালুদ্দিনের সিংহাসন আরোহণের কয়েক মাস পর ৮১৮ হিজরি (১৪১৫ খ্রি.) সালে হযরত নূর কুতুব আলম রহ.-এর ইন্তেকাল হয়। তবে তিনি বাংলাকে কুফর ও শিরকের জুলুমবাজ শাসন থেকে মুক্তি দেওয়ার মহান কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তাকে তার খানকাহ ‘শশ হাজারি দরগাহ’-এ তার পিতার পাশে দাফন করা হয়। নওমুসলিম জালালুদ্দিন ৮১৭ হিজরি থেকে ৮৩৫ হিজরি (১৪১৪ খ্রি. থেকে ১৪৩২ খ্রি.) পর্যন্ত শাসন করেন এবং ইসলামের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেন। তিনি কুতুব আলমের খানকাহরও অনেক খিদমত করেন। তিনি তার সন্তানদের অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং প্রায়ই জিয়ারতের জন্য শেখ জাহিদ রহ.-এর খিদমতে উপস্থিত হতেন। [২]

শেখ নূরুল হক কুতুব আলম রহ.-এর সাহেবজাদাগণ:

হযরত নূর আলম রহ.-এর ইন্তেকালের পর তার সিলসিলা তার সাহেবজাদাগণ: শেখ রিফকাতুদ্দিন রহ. এবং শেখ জাহিদ রহ.-এর মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। শেখ রিফকাতুদ্দিন রহ. তার পিতার সমমনা ছিলেন। বিনয় ও নম্রতায় তার দৃষ্টান্ত মেলা ভার ছিল। শেখ জাহিদ রহ. সম্পর্কে হযরত নূর আলম রহ. বলেছিলেন: তার নেক আমলের চর্চা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ফলে তেমনই হয়েছে। শেখ জাহিদ রহ. ৮৬০ হিজরি (১৪৫৫ খ্রি.) সালে ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে আগত বাংলার বাদশাহগণ যেমন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (৮৯৯ হিজরি থেকে ৯২৫ হিজরি) এই খানকাহ এবং এর সাথে সংযুক্ত মাদরাসার খিদমত করতে থাকেন এবং বাদশাহরা এগুলোর জন্য অনেক গ্রাম ওয়াকফ করেন। [৩]

শেখ নূরুল হক কুতুব আলম রহ.-এর খলিফাগণ:

শেখ নূর কুতুব আলম রহ.-এর অনেক খলিফা ছিলেন যারা বাংলা ছাড়াও হিন্দুস্তানের অনেক অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে শেখ রাজেন এবং শেখ আকমল রহ. প্রসিদ্ধ। আপনার সবচেয়ে বিখ্যাত খলিফা ছিলেন হুসামুদ্দিন মানিকপুরী রহ.। তিনি এক আলেম ও ফাজিল পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার ফয়েজ তার খানকাহর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল যা মানিকপুরে (উত্তরপ্রদেশ) অবস্থিত ছিল।

---

[১] দাওয়াত-ই-ইসলাম, প্রেচিং অফ ইসলাম-এর অনুবাদ: পৃ. ২৭৬, প্রকাশিত: ওয়াকফ বিভাগ, পাঞ্জাব।

[২] আখবারুল আখইয়ার: পৃ. ৩০৯, ৩১০; তাজকিরায়ে সুফিয়ায়ে বাঙ্গাল, লেখক: এজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃ. ৩৮৫ থেকে ৪১১।

[৩] তাজকিরায়ে সুফিয়ায়ে বাঙ্গাল, লেখক: এজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃ. ৪৩১ থেকে ৪৩৪।

শেখ হুসামুদ্দিন রহ. গ্রন্থকার বুজুর্গ ছিলেন। আনিসুল আশিকিন তাসাউফ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত কিতাব। তাঁর মালফুজাতও রফিক আল-আরিফিন শিরোনামে সংকলন করা হয়েছিল। [১]

পূর্ববঙ্গের গাজী সুফিয়ায়ে কেরাম

পশ্চিম বঙ্গে ইসলামের পদচারণা সুদৃঢ় হয়েছিল কিন্তু পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) তখনও পথ পরিষ্কার হয়নি এবং সুলতানদের হাতে সেখানে বিজয়ের কাজ অসম্পূর্ণ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গের বেশ কয়েকজন সুফিয়ায়ে কেরাম জিহাদি আন্দোলন শুরু করেন এবং নিজেদের মুরিদদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে পূর্ববঙ্গে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেন, বঙ্গের সুলতানদের সাহস যোগান এবং সুযোগ বুঝে তাঁদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। এভাবে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বিজয় পদচুম্বন করতে থাকে। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নামটি হলো হযরত শেখ জালাল সিলেটি রহ.-এর।

হযরত শেখ জালাল সিলেটি রহ.: মৃত্যু ৭৪৭ হিজরি (১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দ)

হযরত শেখ জালাল সিলেটি রহ. বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে মূল ভূমিকা পালন করেন। জন্ম তারিখ কোথাও উল্লেখ নেই। আপনি সৈয়দ জালালুদ্দিন সুরখ বুখারি রহ.-এর দৌহিত্র এবং সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর ভাগ্নে ছিলেন। আপনার জন্মের পূর্বেই আপনার পিতা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-তে শহীদ হয়েছিলেন। যখন আপনার বয়স তিন মাস ছিল তখন আপনার মাতাও ইন্তেকাল করেন।

আপনার লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষা আপনার নানা সৈয়দ জালালুদ্দিন সুরখ বুখারি রহ.-এর ঘরে সম্পন্ন হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র (আপনার মামা) সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে ইলম ও ফন শিক্ষা করেন। তাঁর কাছেই বায়আত হয়ে ইবাদত ও রিয়াজতে মশগুল থাকেন এবং তাজকিয়া ও সুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করেন এবং পরিশেষে খলিফায়ে মাজাজ হন।

সেই সময় বঙ্গের পশ্চিম অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যায় কম ছিল এবং সেখানে পুরোপুরিভাবে ইসলামি শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিছু অঞ্চলে হিন্দু রাজাদের প্রাচীন শাসন কায়েম ছিল। তাঁদের রাজধানীগুলোতে বসবাসরত মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী জুলুমের শিকার ছিল এবং ইসলাম প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল।

এই পরিস্থিতিতে মুর্শিদ আপনাকে সেখানে জিহাদ এবং ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন এবং আপনাকে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে বলেন যে, সেই স্থানে অবস্থান করবে যেখানকার মাটি এই মাটির রঙ ও ঘ্রাণের সাথে মিলে যাবে। তলোয়ার কঠোর প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করবে।

এটি অষ্টম হিজরি শতাব্দী (চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দ)-এর শুরুর দিকের কথা যখন শেখ জালাল রহ. তাঁর সাতশ সঙ্গীর সাথে বঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতের পর আপনি সিলেট অঞ্চলে পৌঁছে যান যেখানকার মাটি আপনার...

---

[১] তাজকিরায়ে সুফিয়ায়ে বেঙ্গল, লেখক: এজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃষ্ঠা ৪১৩ থেকে ৪১৮।

...শেখ প্রদত্ত মাটির সদৃশ ছিল। ফলে আপনি সেখানেই অবস্থান করলেন।

সেই সময়ে সিলেটে 'গৌড় গোবিন্দ' নামক এক জালেম রাজার শাসন ছিল। সে এর কিছুকাল আগেই পশ্চিম বাংলার মুসলিম বাদশাহ শামসুদ্দিন শাহের ভাগ্নে সুলতান সিকান্দারকে পরাজিত করে চারদিকে নিজের ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। যখন শামসুদ্দিন শাহ জানতে পারলেন যে, একজন মহান মুসলিম সুফি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এখানে এসেছেন, তখন তিনি সুলতান সিকান্দারকে আপনার খিদমতে পাঠালেন যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য দোয়া করতে বলেন।

শাহ জালাল রহ. এই আবেদনের জবাবে মুমিনসুলভ উদ্দীপনার সাথে বললেন: "আমরা দোয়াও করব এবং মুসলমানদের ফৌজে শামিল হয়ে জিহাদও করব।"

ফলে ৭০৩ হিজরিতে (১৩০৩ খ্রি.) সিলেটের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে আল্লাহর ওলিদের এই কাফেলাও জান বাজি রেখে শরিক হয়েছিল। মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয় এবং রাজা গৌড় গোবিন্দের শাসনের অবসান ঘটে। সুলতান শামসুদ্দিনের কর্মকর্তারা সিলেটের প্রশাসনিক দায়িত্ব শেখ জালাল রহ.-এর ওপর ন্যস্ত করে ফিরে যান। শেখ রহ. তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দুই বছর পর্যন্ত এই অঞ্চলের সর্বোত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেন এবং এখানে ইসলামের দাওয়াতের কাজও অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যান।

দুই বছর পর আপনি প্রশাসনিক দায়িত্ব অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে সঁপে দেন এবং নিজেকে পূর্ণাঙ্গভাবে শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত করেন। আপনার সঙ্গীরা পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন যাতে মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে পারেন।

শেখ জালাল রহ. ৭৪৭ হিজরিতে (১৩৪৬ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন এবং সিলেটেই তাঁকে দাফন করা হয়। আপনার মাজার ও খানকায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ জিয়ারতকারী আসেন। সিলেট শহরকে প্রায়ই "শাহ জালালের শহর" বলা হয়। [১]

শেখ সফিউদ্দিন রহ.:

এঁদের মধ্যেই কলন্দরিয়া সিলসিলার শেখ সফিউদ্দিন রহ. ছিলেন যিনি জিহাদের ডাক নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হুগলির হিন্দু শাসক "পাণ্ডু" গো-জবাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এবং এই নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেছিল। এটি দেখে শেখ সফিউদ্দিন রহ. দিল্লির সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেখান থেকে একটি সেনাদল রওনা হয় যাকে পানিপথের বুজুর্গ শাহ বু আলি কলন্দর রহ. দোয়া দিয়ে ধন্য করেছিলেন। পরিশেষে শেখ সফিউদ্দিন রহ.-এর অনুপ্রেরণায় পরিচালিত এই অভিযানের ফলে এই অঞ্চল ইসলামের অধীনে চলে আসে। [২]

পীর রাহি রহ.:

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট অঞ্চলে পীর রাহি রহ. নামক একজন বুজুর্গ ছিলেন, যিনি প্রয়োজন দেখা দিলে নিকটস্থ মুসলিম শাসকদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে ডেকে এনেছিলেন এবং এই অঞ্চল ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে। [৩]

---

[১] তারিখ-ই-শহর-ই-সোহরাওয়ার্দীয়া, প্রফেসর মুহাম্মদ সাঈদ: পৃ. ৮৮৫ থেকে ৮৮৮; তজকিরা-ই-সুফিয়া-ই-বেঙ্গল, এজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃ. ১৪১ থেকে ১৫৩।

[২] তজকিরা-ই-সুফিয়া-ই-বেঙ্গল, এজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃ. ৪৩৭ থেকে ৪৩৯।

[৩] আব-ই-কাওসার, মুহাম্মদ আকরাম: পৃ. ৩২১।

জাফর খান শহীদ:

এই দরবেশ ও আউলিয়াগণ কেবল মৌখিকভাবে জিহাদের উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তাদের মধ্যে অনেকেই স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অনেকেই শাহাদাতের সুধা পান করেছেন। আজ বাংলার এমন কোনো স্থান নেই যেখানে এই শহীদ আউলিয়াদের মাজারসমূহ তাদের আত্মত্যাগ ও কুরবানীর সাক্ষ্য দিচ্ছে না। এমনই একজন মুজাহিদ ছিলেন জাফর খান।

সেই দিনগুলোতে হুগলির রাজা 'ভূদেব' এক মুসলমানকে আকিকার জন্য গরু জবাই করার অপরাধে হত্যা করেছিলেন। জাফর খান যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি তার ভাগ্নে সূফী শাহের সাথে দাওয়াত ও জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তাদের দাওয়াতে 'রাজা মান' নামক এক হিন্দু শাসক ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে 'ভূদেব' যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, ফলে জাফর খান তার বিরুদ্ধে জিহাদ করেন এবং যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে তার এক পুত্র আগওয়ান খান 'ভূদেব'কে পরাজিত করে কেবল এই অঞ্চলই জয় করেননি, বরং রাজার মেয়েকে বিবাহ করে এখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। [১]

বাবা আদম শহীদ:

ঢাকা বিভাগের মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুরের কাছে একটি বড় জনপদে বাবা আদম শহীদের মাজার অবস্থিত। [২] তিনি মক্কা মোয়াজ্জামায় অবস্থান করতেন এবং জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। বিক্রমপুরের কোনো এক হাজী তাকে সেখানে গিয়ে জানালেন যে, সেখানকার রাজা গরু জবাইকারী মুসলমানদের ওপর জুলুম ও অত্যাচার চালাচ্ছে। বাবা আদম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি শুনে ঈমানী জোশে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং মুজাহিদদের একটি দল নিয়ে সেদিকে রওনা হলেন। বাংলায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে এটি সাত হাজার মানুষের এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হলো। এই লোকেরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করল এবং গরু জবাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল। রাজা এটি দেখে আক্রমণ করল কিন্তু প্রশিক্ষিত শত শত মুজাহিদীনের প্রতিরোধের মুখে তার কোনো কৌশলই কাজে আসেনি। তবে এই সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বাবা আদম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বন্দী হন এবং তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়। এরপর রাজার শাসন আর বেশিদিন টেকেনি। তিনি পরাজয় মেনে নিয়ে নিজের পরিবারসহ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বাবা আদম রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার ৮৮৮ হিজরিতে (১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে) একজন মুসলিম বাদশাহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। [৩]

শাহ ইসমাইল গাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

কাঁটাদুয়ারে শাহ ইসমাইল গাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজারও জিহাদের এক কাহিনী শোনায়। তিনিও মক্কা মোয়াজ্জামা থেকে তাবলীগী ও জিহাদী উদ্দেশ্যে বাংলায় এসেছিলেন। সেই সময়ে এখানে বন্যায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলত। শাহ সাহেবের পরামর্শে বাংলার শাসক রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (৮৬৪ হিজরি থেকে ৮৭৮ হিজরি) নদীর ওপর একটি বাঁধ নির্মাণ করান, যার ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। সুলতান তার এই কৃতিত্বে খুশি হয়ে তাকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

---

[১] তাজকিরায়ে সুফিয়ায়ে বেঙ্গল, ইজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃষ্ঠা ২৫২, ২৫৪।

[২] বলা হয় যে, রাজা লক্ষ্মণ সেন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের পর তার রাজধানী 'নদিয়া' থেকে পিছু হটে এখানে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন।

[৩] তাজকিরায়ে সুফিয়ায়ে বেঙ্গল, ইজাজুল হক কুদ্দুসী: পৃষ্ঠা ৫০, ৫১।

শাহ সাহেব এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এক যুদ্ধে উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করে বিশাল এলাকা পদানত করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে কামরূপের (আসাম) শাসককে পরাজিত করে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। এই বিজয়াভিযানগুলোর পর সুলতান বিজিত অঞ্চলগুলোর শাসনভার শাহ ইসমাইল গাজীর হাতেই অর্পণ করেন।

সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা 'ভাণ্ডারাই রায়' শাহ সাহেবের বিজয় ও সম্মান দেখে ঈর্ষান্বিত ছিল। সে সুলতানের কান ভারী করতে শুরু করল যে, শাহ সাহেব নিজের স্বাধীন সালতানাত কায়েম করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সুলতান নির্বুদ্ধিতা ও জুলুমের পরিচয় দিয়ে নিজের এই মহান হিতৈষীকে শহীদ করে দেন। এটি ৮৭৯ হিজরি (১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা।

তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেহকে দুই টুকরো করে দেওয়া হয়েছিল, যা পৃথক পৃথক স্থানে দাফন করা হয়। এই কারণেই রংপুরে শাহ ইসমাইল গাজী রহ.-এর তিনটি মাজার রয়েছে। [১]

---

[১] তাজকিরায়ে সুফিয়ায়ে বাঙ্গাল, ইজাজুল হক কুদ্দুসী প্রণীত: পৃষ্ঠা ৫৫৩ থেকে ৫৫৫।

https://t.me/BoierSomahar

জৌনপুরের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ

জৌনপুর উলামা, মাশায়েখ এবং ইলম ও তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি বাগান ছিল, যেখানে চারদিকে আধ্যাত্মিক ও ঈমানি বসন্তের দৃশ্য দেখা যেত। এই বাগানের কয়েকটি মনোমুগ্ধকর ও সুগন্ধি ফুলের একটি ঝলক পেশ করা হলো:

সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি:
সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন মহান সুফি বুজুর্গ, প্রচারক এবং চিশতিয়া সিলসিলার শাখা 'আশরাফিয়া'-র প্রতিষ্ঠাতা। আপনি একজন শাহজাদা হিসেবে দুনিয়াবি জীবন ত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং নিজের অতুলনীয় কোরবানি ও শিক্ষার কারণে 'সুলতানুল আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানি' নামে প্রসিদ্ধ হন। আপনার জন্ম ৭০৮ হিজরি (১৩০৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে ইরানের 'সেমনান' শহরে হয়েছিল [১]।

আপনার পিতা সুলতান ইবরাহিম নূরবখশ সেমনানের শাসক ছিলেন। এভাবে আপনার লালন-পালন রাজপরিবারে হয়েছিল এবং রাজকীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী আপনাকে দুনিয়াবি ইলম ও শিল্পকলার সর্বোত্তম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আপনি যখন বড় হলেন, তখন আপনার পিতা আপনাকে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন, কিন্তু শৈশব থেকেই আপনার মন দুনিয়াবি শান-শওকতের প্রতি বিমুখ ছিল এবং আপনার মনোযোগ ছিল আধ্যাত্মিকতার দিকে। একদিন আপনি নিজের মুকুট ও সিংহাসন ভাইদের হাতে সঁপে দিয়ে দরবেশির পথ শেখার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

আপনি একজন সত্য মুর্শিদের সন্ধানে বাগদাদ, মক্কা ও মদিনার মতো পবিত্র স্থানগুলো সফর করেন এবং পরিশেষে হিন্দুস্তানে পৌঁছান। এখানেও বিভিন্ন সুফি বুজুর্গদের খানকাহগুলোতে সময় কাটান। আপনি কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারকারী প্রখ্যাত সুফি বুজুর্গ সৈয়দ আলী হামদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র সফরসঙ্গীও ছিলেন।

অবশেষে সৌভাগ্য আপনাকে বাংলায় নিয়ে আসে যেখানে শেখ আলাউল হক পাণ্ডবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র জিয়ারত নসিব হয় এবং আপনার মন বলে ওঠে যে এটাই আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। ফলে আপনি তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করেন এবং বেশ কয়েক বছর অত্যন্ত কঠোর রিয়াজত ও খিদমতে অতিবাহিত করেন। আপনার মহব্বত, ইখলাস ও আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে আপনার মুর্শিদ আপনাকে খিলাফত দান করেন এবং হিন্দুস্তানে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। শেখ আলাউল হক পাণ্ডবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে খিলাফত লাভের পর আপনি জৌনপুরের নিকটবর্তী 'কিছোছা' কসবা বা জনপদকে নিজের আবাসস্থল বানান।

---

[১] 'সেমনান' উত্তর ইরানের একটি জেলা এবং একটি শহর।

সেখান থেকেই নিজের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচার করেন। [১]

এখানে আপনার সিলসিলা এতটাই বিস্তার লাভ করে যে, তা চিশতিয়া সিলসিলার একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয়, যা 'সিলসিলা আশরাফিয়া চিশতিয়া' নামে পরিচিত। আপনি ৯৭ বছর দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং ৮০৮ হিজরি (১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইহকাল ত্যাগ করে 'কাছোছা শরীফ'-এ সমাহিত হন। আপনার জীবন একজন রাজপুত্র থেকে দরবেশ এবং পরবর্তীতে একজন আধ্যাত্মিক নেতা হওয়ার শিক্ষণীয় উপাখ্যান। [২]

কাজী শাহাবুদ্দিন দৌলত آبادی রহমাতুল্লাহি আলাইহি: মৃত্যু ৮৩৯ হিজরি (১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত কাজী শাহাবুদ্দিন দৌলত آبادی রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সময়ে জৌনপুরের শারকি সালতানাতের সবচেয়ে বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। আপনি দিল্লিতে হযরত কাজী আব্দুল মুক্তাদির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মাওলানা খওয়াজগি দেহলভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। আপনি একই সাথে ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, নাহবি, লুগাভি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। কাজী আব্দুল মুক্তাদির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: "তাঁর রক্ত-মাংস সবই জ্ঞানে ভরপুর।" [৩]

যখন তৈমুর গুরগান দিল্লি আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন হযরত খাজা গেসুদরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি স্বপ্ন দেখেন এবং এর ব্যাখ্যা দেন যে, শীঘ্রই এই শহরের ওপর ধ্বংস নেমে আসবে। তিনি এই স্বপ্নের কথা সুফিদের জানিয়ে দেন। ফলে কাজী দৌলত آبادی রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর উস্তাদ মাওলানা খওয়াজগি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে দিল্লি থেকে বেরিয়ে পড়েন। মাওলানা খওয়াজগি রহমাতুল্লাহি আলাইহি কালপিতে চলে যান, আর আপনি জৌনপুরে অবস্থান গ্রহণ করেন।

এখানে সুলতান ইব্রাহিম শারকির শাসন ছিল, যিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু এবং আলেমদের অত্যন্ত কদরকারী ছিলেন। তিনি আপনার আগমনকে সৌভাগ্য মনে করেন। একটি সুউচ্চ প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করে দরবারে বিশিষ্ট স্থান দান করেন এবং সালতানাতের কাজীউল কুজাত পদে অধিষ্ঠিত করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি আপনার পরামর্শও গ্রহণ করতেন।

আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ খওয়াজগি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন, যিনি শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাজায ছিলেন। এছাড়া জৌনপুরে আপনি হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট থেকেও ফয়েজ লাভ করেন।

আপনি আপনার রচনাবলির কারণে হিন্দুস্তান ও বহির্বিশ্বেও সুপরিচিত ছিলেন। আপনি ইলমে নাহু-তে আল-ইরশাদ ও হাওয়াশিয়ে কাফিয়া, অলঙ্কারশাস্ত্রে বাদিউল বয়ান, তাফসিরে বাহরে মাওয়াজ, উসুলে ফিকহে শরহে বজদভি, সাহিত্যে শরহে কাসিদা বানাত সুয়াদ এবং ইতিহাসে মানাকিবুল সাদাত রচনা করেন। আপনার সবচেয়ে বড় ইলমি কীর্তি হলো 'ফাতাওয়া ইব্রাহিম শাহী'। এটি সেই ফতোয়াগুলোর সংকলন যা সালতানাতের কাজীউল কুজাত হিসেবে আপনি এবং আপনার অধীনস্থ কাজীরা দিয়েছিলেন।

আপনার মৃত্যু ৮৩৯ হিজরি (১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) হয় এবং জৌনপুরে সমাহিত করা হয়। [৩]

---

[১] কাছোছা ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের আম্বেদকর নগর জেলায় অবস্থিত।

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩৭; তারিখ-ই-শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৩৯৬ থেকে ৩৯৯।

[৩] তারিখ-ই-শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৬০০ থেকে ৬০৩।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মখদুম খাজা আবুল ফাতাহ সোনপুরী:

আপনার জন্ম ৭৭২ হিজরিতে দিল্লিতে হয়েছিল। আপনি প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির কান্দি রহ.-এর নাতি ছিলেন। তাঁরই মতো আলেম, সুফি এবং প্রজ্ঞাবান ছিলেন। যখন আমির তৈমুর ৮০১ হিজরিতে দিল্লি ধ্বংস করেন, তখন আপনি জৌনপুর চলে আসেন। শুরুতে কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কোনো ঘর বা ছাদ ছাড়াই সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেন এবং পরিস্থিতির উন্নতি হয়। আপনার ফয়েজ অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। আপনি অত্যন্ত জাকের-শাগেল এবং ইবাদতগুজার ছিলেন। সারাজীবন দরস ও তাদরীসে মগ্ন ছিলেন। ৮৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মাজার জৌনপুরের "জমিন সিপাহ" মহল্লায় অবস্থিত। [১]

খাজা ঈসা তাজউদ্দীন জৌনপুরী চিশতী রহ.:

আপনি কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী রহ.-এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। কাজী সাহেব রহ. শরহে উসুলে বাজদাওয়ী আপনার জন্যই রচনা করেছিলেন। ইলম অর্জনের পর আপনি তাসাউফ এবং জুহদ ও রিয়াজতের দিকে মনোনিবেশ করে শেখ ফাতহুল্লাহ রহ.-এর মুরিদ হন এবং সুলুক ও ইহসানে উচ্চ মাকাম লাভ করেন। আপনি এতই নিমগ্নতা ও একাগ্রতার সাথে ইবাদতে মশগুল হতেন যে সারা দুনিয়া ভুলে যেতেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত এভাবেই নির্জনে ইবাদত করতে থাকেন। সুলতান ইব্রাহিম শরকী আপনার ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি আশরাফি ও পোশাক হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আপনি তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। সুলতান মাহমুদ শরকীও আপনার মুরিদ ছিলেন। তিনি আপনার থেকে অনুমতি নিয়ে আপনার নির্জন ইবাদতখানার কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন যা সুলতান হোসেন শরকী সম্পন্ন করেন। ৮৪০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [২]

মোল্লা খাজা উসমান সালেহ রহ.:

আপনি দিল্লির প্রখ্যাত আলেম এবং মখদুম জাহানিয়া জাহান গশত রহ.-এর খলিফা ছিলেন। সুলতান ইব্রাহিম শরকীর আহ্বানে জৌনপুর চলে আসেন এবং এখানে দরসের মজলিস কায়েম করেন। অত্যন্ত ভালো লেখক ছিলেন। বালাগাত শাস্ত্রে "শরহে তালখিস" এবং উসুলে ফিকহ শাস্ত্রে "শরহে মিনার" আপনার মূল্যবান রচনা। আপনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। ১১৪ বছর জীবিত থেকে ৮৪৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৩]

কাজী নিজামুদ্দীন কায়কালানী রহ.:

আপনার পূর্বপুরুষগণ আরব দেশ থেকে এসেছিলেন এবং গুজরাটে বসবাস শুরু করেছিলেন। আপনার জন্ম এবং শিক্ষা-দীক্ষা এখানেই হয়েছিল। ফিকহ, তাফসির এবং হাদিসে আপনার সুখ্যাতি শুনে সুলতান ইব্রাহিম শরকী আপনাকে নিজের কাছে ডেকে নেন।

---

[১] তারিখ-ই-শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৬০৩ থেকে ৬০৫

[২] তারিখ-ই-শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৬০৫ থেকে ৬০৭

[৩] তারিখ-ই-শিরাজ-ই-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৬০৭, ৬০৮

https://t.me/BoierSomahar

আপনি জৌনপুরের কাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন। আপনি কাজী শিহাব উদ্দিন দৌলতবাদীর সমসাময়িক ছিলেন। আপনার মোহর ব্যতীত কাজী দৌলতবাদী রহ. কোনো ফতোয়ায় স্বাক্ষর করতেন না। ফাতাওয়ায়ে ইব্রাহিম শাহী সংকলনে অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সাথে আপনিও শরিক ছিলেন। মৃত্যু ৮৭৫ হিজরিতে হয়েছে। [১]

শেখ ওয়াজিহ উদ্দিন আশরাফ ওরফে শেখ ফরিদ রহ.:

আপনি ফারুকী বংশোদ্ভূত ছিলেন। আপনার পূর্বপুরুষগণ আরব থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। আপনি ইলমসমূহে পারদর্শিতা অর্জনের পর খাজা মুবারক বেনারসি রহ. (যিনি হযরত ঈসা তাজ জৌনপুরী রহ.-এর খলিফা ছিলেন) থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভ করেন।

একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপনি দেশভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন এবং এই সময়ে বহুবার হজ পালন করেন। পরিশেষে আপনার শায়খের নির্দেশে ভ্রমণ ত্যাগ করেন এবং জৌনপুরে অবস্থান গ্রহণ করেন। আপনি সুলতান ইব্রাহিম শরকীর উপদেষ্টা হিসেবেও ছিলেন। তবে কিছুকাল পর নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং বাকি জীবন আল্লাহ আল্লাহ করে কাটিয়ে দেন। [২]

মাখদুম রুকন উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ.:

আপনি হযরত খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী রহ.-এর বংশধর ছিলেন। আপনার পিতা খাজা সদর উদ্দিন রহ. হিন্দুস্তানে এসে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। এখানেই রুকন উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ. জাহেরি ইলমসমূহ অর্জন করেন।

আমির তৈমুরের আক্রমণের পর আপনি দিল্লি ত্যাগ করে জৌনপুরে চলে আসেন। এখানে বাবা তাজ উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ. থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভ করেন। আপনি ছিলেন সম্পূর্ণ দুনিয়াত্যাগী। যা কিছু ধন-সম্পদ থাকত তা অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। বলা হয় যে, প্রতিদিন আপনার কাছে হাদিয়া হিসেবে এক লক্ষ তনকা পর্যন্ত আসত, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। বহুবার আপনি আপনার ঘরকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকেও খালি করে দিয়েছেন।

একবার এক ফকির এসে আওয়াজ দিল: বাবা শুনেছি আপনি আল্লাহর পথে পুরো ঘর বিলিয়ে দিয়েছেন। কিছু বাকি থাকলে আমাকে দিন।

আপনি জজবা অবস্থায় নিজের পুত্র শেখ জালালের হাত ধরে তাকে সঁপে দিলেন এবং বললেন: 'আর কিছু নেই। একে বিক্রি করে কিছু হাসিল করে নাও।' যখন এই সংবাদ সুলতান ইব্রাহিম শরকীর উজির-এ-সালতানাত কাজী ইমাদুল মুলকের কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি দৌড়ে এলেন এবং কয়েকশ মুদ্রা দিয়ে সেই ফকিরের কাছ থেকে শেখ জালালকে ফিরিয়ে আনলেন এবং এরপর হযরতের অনুমতি নিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ে তার সাথে করিয়ে দিলেন।

আপনার মৃত্যু ৮৭৪ হিজরিতে হয়েছে। আপনার মাজার জৌনপুরে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। [৩]

মাখদুম শেখ মুহাম্মদ রহ.:

আপনি ফারুকী বংশোদ্ভূত ছিলেন। আপনার পিতার নাম ছিল মাখদুম খিজির, যিনি শাহ রুকন আলম রহ.-এর খলিফায়ে মাজাজ ছিলেন। আপনার...

---

[১] তারিখ-এ-শিরাজ-এ-হিন্দ জৌনপুর, পৃ: ৬০৮, ৬০৯

[২] তারিখ-এ-শিরাজ-এ-হিন্দ জৌনপুর, পৃ: ৬০৯, ৬১০

[৩] তারিখ-এ-শিরাজ-এ-হিন্দ জৌনপুর, পৃ: ৬১০ থেকে ৬১৩

https://t.me/BoierSomahar

জন্ম এবং শিক্ষা ও লালন-পালন দিল্লিতে হয়েছে। নিজ পিতার নিকট বায়আত হন এবং খিলাফত লাভ করেন।

তৈমুরী আক্রমণের পর জৌনপুর তাশরিফ আনলে তিনি রিক্তহস্ত ছিলেন। স্ত্রী-সন্তানসহ একটি গাছের নিচে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। সেই বছর বর্ষা মৌসুমে একদমই বৃষ্টি হয়নি। অনাবৃষ্টির কারণে সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। সুলতান ইব্রাহিম শরকী শহরের শায়খুল মাশায়েখ কাজী নাসিরুদ্দিন রহ.-এর কাছে অনাবৃষ্টির কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন:

“আল্লাহর বন্ধু একটি গাছের নিচে জীবন অতিবাহিত করছেন, এমতাবস্থায় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হওয়া কেন সহ্য করবে?”

পরিশেষে বাদশাহ লজ্জিত হয়ে নিজেই সন্ধানে বের হলেন এবং শায়খ মুহাম্মদ রহ.-কে পরিবার-পরিজনসহ একটি গাছের নিচে দেখতে পেলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের জন্য একটি ছাপরা সদৃশ অস্থায়ী ঘর তৈরি করে দিলেন এবং তাদের সেখানে স্থানান্তরিত করলেন। এর পরপরই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

আপনি দীর্ঘ সময় ধরে জৌনপুরকে আপনার ইলমি ও রুহানি আলোয় আলোকিত করেছেন এবং অবশেষে ৮১৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [১]

খাজা হামজা চিশতী রহ.:

খাজা হামজা চিশতী রহ.-এর বংশীয় সম্পর্ক ছিল হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ.-এর সাথে। আপনি যৌবনে একজন বড় যোদ্ধা সৈনিক এবং শক্তিশালী পালোয়ান ছিলেন, সরকারি দেহরক্ষী ছিলেন এবং প্রাসাদে পাহারা দিতেন। একদিন মনে হলো যে, আমি অন্যদের হেফাজত করি, নফস ও শয়তান থেকে নিজের হেফাজতের চিন্তা কেন করি না? এই চিন্তা দিল ও দেমাগে এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, সবকিছু ছেড়ে আজমির শরীফের খানকাহে গিয়ে পৌঁছালেন এবং বিভিন্ন মাশায়েখের সান্নিধ্যে থাকতে লাগলেন। পরিশেষে হযরত খাজা গেসু দরাজ রহ.-এর মুরিদ হলেন এবং অনুমতি ও খিলাফত লাভ করেন। জৌনপুরে আপনার ফয়েজ অনেক ছড়িয়ে পড়েছিল।

৫ রবিউল আউয়াল ৮৯৫ হিজরিতে আপনার ইন্তেকাল হয়। যেহেতু আপনি শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, তাই হিন্দুস্তানি পালোয়ানদের মাঝে আপনার প্রতি আন্তরিক মহব্বত এবং অসাধারণ ভক্তি প্রচলিত রয়েছে। [২]

পরিশেষে জৌনপুরের এই উলামা ও মাশায়েখগণ এই অঞ্চলকে ইলমি, ঈমানি এবং রুহানি দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সজীব করে তুলেছিলেন। এই ধারা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং আজও জৌনপুরের পরিবেশে সেই ঈমানি উষ্ণতার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১] তারিখ শিরাজ-এ-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৬১৩ থেকে ৬১৫

[২] তারিখ শিরাজ-এ-হিন্দ জৌনপুর: পৃষ্ঠা ৬৩৩, ৬৩৪

মালওয়ার প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ

মালওয়ায় ইসলামের প্রচার মূলত সুফি-সাধকদের শান্তিপূর্ণ দাওয়াত এবং স্থানীয় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে হয়েছে। এটি কোনো আকস্মিক অভিযানের ফল ছিল না, বরং একটি ধারাবাহিক দাওয়াতি ও সামাজিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া ছিল। মালওয়ায় সুফি-সাধকদের আগমন সালতানাত প্রতিষ্ঠার আগেই শুরু হয়েছিল। এই বুজুর্গরা তাঁদের নৈতিক শিক্ষা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করেছিলেন। চিশতিয়া সিলসিলার একজন বিখ্যাত বুজুর্গ শেখ কামাল উদ্দিন মালভী রহ., যিনি হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর খলিফা ছিলেন, তাঁকে বিশেষভাবে মালওয়ায় পাঠানো হয়েছিল। তিনি 'ধার'-এ নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেন, যেখানে তাঁর হাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ছাড়া শেখ আবদুল্লাহ শাত্তারি রহ.-এর মতো অন্যান্য বুজুর্গরা এই অঞ্চলে ইসলামি শিক্ষা প্রচার করেন। এই বুজুর্গরা আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য এবং মানবপ্রেমের বার্তা দিয়েছিলেন, যা বিশেষ করে সামাজিক উঁচু-নিচুর ভেদাভেদে জর্জরিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

মালওয়া সালতানাত প্রতিষ্ঠা এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে। অর্থাৎ যখন দিলাওয়ার খান ঘুরি মালওয়ায় স্বাধীন সালতানাত কায়েম করেন, তখন তিনি এবং তাঁর পরবর্তী শাসকরা ইসলামের প্রচার ও উলামা-সুফিদের পৃষ্ঠপোষকতাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন। হোশাং শাহ এবং মাহমুদ খিলজির মতো সুলতানরা মসজিদ, খানকাহ এবং মাদ্রাসা নির্মাণ করেন, যা ইসলামি জ্ঞান ও শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মান্ডুর জামে মসজিদ এবং অন্যান্য চমৎকার স্থাপত্য এই যুগের ইসলামি সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে ওঠে। মালওয়ার দরবার জ্ঞান ও সাহিত্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে উলামায়ে কেরাম এসে বসবাস শুরু করেন এবং তাঁরা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের শিকড় মজবুত করেন। এভাবে সুফি-সাধকদের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং শাসকদের আর্থিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতার সমন্বয়ে মালওয়ায় ইসলাম কেবল ছড়িয়ে পড়েনি বরং একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিচয়ও লাভ করেছে। নিচে আমরা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করছি যাঁদের মালওয়ায় ইসলামি প্রভাব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শেখ কামাল উদ্দিন মালভী রহ.:

তিনি তাঁর সময়ের একজন আরিফ ও ফকিহ ছিলেন এবং বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর রহ.-এর প্রপৌত্র ছিলেন। আপনি হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ. থেকে ফয়েজ হাসিল করেন এবং দীর্ঘ সময় তাঁর খেদমতে থাকেন। এরপর তাঁর নির্দেশে নিজের পৈতৃক খানকাহ আজোধন (পাকপত্তন) ছেড়ে মালওয়ায় চলে আসেন এবং 'ধার'-এ বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। আপনার হাতে...

অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। আপনার কবরের ওপর খিলজি বাদশাহদের নির্মিত একটি চমৎকার ইমারত বিদ্যমান রয়েছে। [১]

শেখ সালামুল্লাহ মান্ডবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

আপনি মালওয়ার একজন প্রখ্যাত আলেম এবং তাসাউফের শায়খ ছিলেন। ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং আরবি সাহিত্যে আপনার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। মালওয়ার বাদশাহ মাহমুদ শাহ খিলজি আপনাকে 'সায়্যিদুল উলামা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বাদশাহর দৃষ্টিতে আপনি অত্যন্ত সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। [২]

শেখ ফাযেল হাকীম শিহাবুদ্দিন কিরমানি:

আপনি আপনার সময়ের প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনি মাহমুদ শাহ খিলজির শাসনামলে জৌনপুর থেকে মান্ডুতে আগমন করেন। ইতিহাসের ওপর আপনার গভীর দৃষ্টি ছিল। আপনি মাহমুদ শাহের জন্য মালওয়ার ইতিহাসের ওপর একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম 'তারীখে মাহমুদ শাহী'। [৩]

শেখ আবদুল্লাহ শাত্তারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

তিনি তাঁর সময়ের ইমামুল আউলিয়া এবং আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর বংশপরম্পরা হযরত শেখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে গিয়ে মিলেছে। সোহরাওয়ার্দীয়া সিলসিলার শাত্তারিয়া শাখা আপনার মাধ্যমেই প্রসার লাভ করে। আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি শাত্তারিয়া সিলসিলার শিক্ষা শেখ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে এবং কাদেরিয়া সিলসিলার শিক্ষা শেখ আব্দুল ওয়াহহাব কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে গ্রহণ করেন।

এরপর আপনি হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং বিভিন্ন জনপদ ভ্রমণ করে অবশেষে মান্ডুতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আপনার মুরিদদের সংখ্যা ছিল অনেক, যাদের মধ্যে প্রখ্যাত আমীর, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনি সুফি-সাধকদের এক বিশাল কাফেলার সাথে সফর করতেন যার শান-শওকত ছিল বাদশাহদের মতো। সাথে তাবু, ডেরা এবং নাকাড়াও (দামামা) থাকত। যখন কোনো শহর বা গ্রামে পৌঁছাতেন, তখন বাদশাহদের মতো নাকাড়া বাজানোর নির্দেশ দিতেন এবং শহরের বাইরের ময়দানে তাবু স্থাপন করতেন। এরপর স্থানীয় শায়খ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং ওয়াজ ও নসিহতের মজলিস কায়েম করতেন। মালওয়ার প্রখ্যাত সুলতান গিয়াসুদ্দিন খিলজি আপনার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। আপনি তাঁর জন্য শাত্তারিয়া সিলসিলার জিকির, আশগাল ও মোরাকাবার ওপর একটি রিসালা (পুস্তিকা) লিখেছিলেন। ৮৩২ হিজরিতে [ইন্তেকাল] হয়। আপনার পবিত্র মাজার মান্ডু শহরের কেল্লার ভেতরে অবস্থিত। [৪]

শেখ আহমদ বিন নেয়ামতুল্লাহ চান্দেরিভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

আপনি অত্যন্ত নেককার ও যোগ্য আলেম এবং সুফি ছিলেন। আপনার জন্ম ও লালন-পালন মালওয়ার চান্দেরি শহরে হয়েছিল। ইলম ও

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯১, ১৯২

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫৩

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫৫

[৪] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫৮

...ফজলে ভূষিত হলেন এবং মর্যাদা ও সম্মান এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, মালওয়ার শাসক কাদির শাহ আপনাকে উজ্জয়িনীতে ডেকে নিয়ে সেখানকার "শাইখুল ইসলাম" নিযুক্ত করেন। আপনার মৃত্যু ৯২০ হিজরিতে উজ্জয়িনীতে হয় এবং আপনাকে সেখানেই দাফন করা হয়। [১]

শেখ আল্লাহ দাদ বিন হামিদ মান্ডবী:

তিনি তাঁর সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মালওয়ার সুলতান গিয়াসউদ্দিন খিলজির দরবারী ছিলেন। আপনি সৈয়দ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ জৌনপুরীর মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁর দাবির সত্যায়ন করেন এবং তাঁর অনুসরণ করে তাঁর সাথে গুজরাটে হিজরত করেন। আপনার রচনাবলির মধ্যে একটি নুকতাহীন (বিন্দুহীন) কাব্যগ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। [২]

শেখ বুরহানউদ্দিন গুজরাটি রহ.:

শেখ বুরহানউদ্দিন গুজরাটি রহ. একজন হানাফি ফকিহ ছিলেন এবং সেই সাথে শাত্তারিয়া সিলসিলার মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনার জন্ম ও লালন-পালন আহমেদাবাদে হয়, যেখানে আপনি আপনার সময়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর আপনি শেখ সদরুদ্দিন মুহাম্মদ বারোদভি রহ.-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে ৯৮২ হিজরিতে গোয়ালিয়র সফর করেন। পরবর্তীতে তাঁরই সাথে মালওয়ায় আগমন করেন এবং এখানে মান্ডুতে বসবাস শুরু করেন। আপনার সময়ের প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মদ বিন হাসান মান্ডবী এখানেই আপনার কাছে নাহু (ব্যাকরণ) ও আরবি পড়েছেন। যখন শেখ জিয়াউল্লাহ বিন মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়রি মালওয়ায় আসেন, তখন আপনি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এরপর তাঁরই সাহচর্যে ৯৮৫ হিজরিতে আজমির শরিফ সফর করেন এবং সেখানেই আপনার মৃত্যু হয়। [৩]

শেখ মিয়াঁ নজ্জু গুজরাটি রহ.:

শেখ মিয়াঁ নজ্জু রহ. অত্যন্ত বড় মাপের ফকিহ এবং ইবাদতগুজার ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। জন্ম গুজরাটের পত্তন শহরে এবং লালন-পালন মালওয়ার মান্ডু শহরে হয়। আপনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বুরহানপুর এবং এরপর গুজরাটে যান এবং আপনার সময়ের প্রখ্যাত শিক্ষকদের কাছে পাঠ্যবইসমূহ পড়েন। এরপর শেখ আহমদ বিন জাফর শিরাজি রহ. এবং শেখ সদরুদ্দিন জাকির বারোদভি রহ. থেকে তাসাউফের ফয়েজ হাসিল করেন এবং দীর্ঘ সময় তাঁদের খিদমতে থাকেন, এমনকি বড় মাশায়েখদের স্তরে পৌঁছে যান। আপনি ব্যবসার মাধ্যমে আপনার জীবিকা নির্বাহ করতেন। আপনার মৃত্যু ৯৮৫ হিজরিতে মান্ডু শহরে হয়। [৪]

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০৮

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১১

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১৮

[৪] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৭

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

গুজরাটের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ

গুজরাটে ইসলামের বাণী প্রথম হিজরি শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের সাথে পৌঁছে গিয়েছিল। এখানে কিছুকাল উমাইয়া প্রতিনিধিরা শাসন করেছিলেন কিন্তু মুসলিম শাসন এখানে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। দীর্ঘকাল পর সুলতান মাহমুদ গজনভি সোমনাথ (কাঠিয়াওয়াড়) জয় করেন এবং মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেন, কিন্তু এই আক্রমণ একটি ঝড়ের মতো এসে চলে গিয়েছিল এবং এখানে ইসলামের চিহ্নগুলো স্থায়ী হতে পারেনি এবং সোলাঙ্কি বংশের ভীমদেব পুনরায় তার পূর্বের শান-শওকতের সাথে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন যা তার বংশধরদের মধ্যে চলতে থাকে, এমনকি শাহাবুদ্দিন ঘুরির আক্রমণও তাতে কোনো কম্পন সৃষ্টি করতে পারেনি।

তবে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের থেকে শুরু করে গজনভি ও ঘুরি সুলতানদের আমল পর্যন্ত গুজরাটের উপকূলে এবং কিছু অভ্যন্তরীণ এলাকাতেও ছোট ছোট মুসলিম জনবসতি অবশ্যই ছিল, বিশেষ করে ভরুচ, রান্দের, সুরাট এবং খাম্বাতে। এই জনবসতিগুলো মূলত সেই আরব বণিকদের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল যারা ভারতের উপকূলে বাণিজ্য করতে আসত এবং এখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের জন্য ঘরবাড়ি এবং বাণিজ্যিক পণ্য রাখা ও বিক্রির জন্য গুদাম ও দোকানের ব্যবস্থা করে নিত। অনেক অমুসলিমও তাদের চরিত্র ও দাওয়াত দেখে ইসলাম গ্রহণ করে এই ক্ষুদ্র মুসলিম সমাজের অংশ হয়ে যেত।

এই যুগে কিছু নামহীন বুজুর্গ খাঁটি দ্বীনি দাওয়াতের নিয়তে এখানে আসতেন এবং দ্বীন-ই-মুবীনের সেচকার্যের চেষ্টা করতেন। এখানকার হিন্দু রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ নরম মেজাজের ছিলেন যারা এমন দরবেশদের সম্মান করতেন এবং তাদের কাজে বাধা দিতেন না, কিন্তু অধিকাংশ ছিল গোঁড়া ও চরমপন্থী যারা সব উপায়ে তাদের থামানোর চেষ্টা করত।

রায়হান বাওয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

এই প্রাচীন দাঈদের মধ্যে বাগদাদের একজন সুফি বুজুর্গ রায়হান বাওয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন। তিনি মূলত মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ২৯২ হিজরি (৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে তিনি তার ভাই আহমদ বাওয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং চল্লিশজন দরবেশের সাথে গুজরাটের শহর 'ভরুচ'-এ পৌঁছান। তাদের দাওয়াতের এমন প্রভাব পড়ে যে ভরুচের রাজকুমার 'রায় করণ' ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার নাম রাখা হয় মালিক মুহাম্মদ। তিনি ইসলামের দাঈ হয়ে যান এবং তার তাবলিগের মাধ্যমে তার বোন ভাগ দেবী এবং অনেক হিন্দু ইসলামে প্রবেশ করেন।

তবে মালিক মুহাম্মদ (রায় করণ)-এর পিতা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি রায়হান বাওয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন...

চেষ্টা করেন। এর ফলে রাজা এবং মালিক মুহাম্মদের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় যাতে মালিক মুহাম্মদ তাঁর বোন এবং অনেক নওমুসলিম গুজরাটিসহ শহীদ হন। মনে হয় এই বিজয় রাজার জন্য কোনো দুর্ঘটনার চেয়ে কম ছিল না, তাই তিনি রায়হান বাওয়াদুল্লাহর সাথে নম্র আচরণ করেন এবং তাঁদেরকে এই এলাকায় থাকার অনুমতি দেন। ফলে রায়হান বাওয়াদুল্লাহ শহরের বাইরে একটি মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন। তাঁর মৃত্যু সেখানেই হয় এবং সেখানেই একটি মেলায় তাঁর মাজার অবস্থিত। [১]

কারামতিদের প্রচেষ্টা:

এই যুগে এখানে কারামতিরা (ইসমাইলি শিয়া) গোপনে নিজেদের ধর্ম প্রচার শুরু করে এবং কিছু স্থানে আহলে সুন্নাতের চেয়ে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে সিন্ধু থেকে গুজরাট পর্যন্ত ইসমাইলি শিয়াদের একটি গোপন কিন্তু সুসংগঠিত দাওয়াহ ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

ইসমাইলি দাঈদের পদ্ধতি ছিল এই যে, তারা প্রতিটি স্থানের পরিবেশ অনুযায়ী নিজেদের খাপ খাইয়ে নিত, ফলে তারা এখানে হিন্দু নাম ধারণ করত এবং কিছু হিন্দু আকিদা গ্রহণ করতেও কোনো দ্বিধাবোধ করত না। এই কারণেই মুসলিম দাঈদের তুলনায় কারামতি দাঈদের খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি এবং তারা হিন্দুদের একটি বড় অংশকে নিজেদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে সফল হয়, এমনকি সুলতান মাহমুদ গজনভীর আগে কিছু ইসমাইলি দাঈ মুলতানের শক্তিশালী কেন্দ্র এবং এর আশেপাশে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। [২]

যদিও সুলতান মাহমুদ গজনভী কারামতিদের কাছ থেকে তাদের কেন্দ্র মুলতান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের শিকড় এতই মজবুত ছিল যে গজনভী সুলতানরা দুর্বল হতেই তারা পুনরায় মুলতানে আধিপত্য বিস্তার করে। তবে সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরি যখন তাদের মুলতান থেকে বিতাড়িত করেন, তখন তাদের নাম-নিশানাও বাকি থাকল না এবং তারা গুজরাট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। তবে তাদের ফিদায়ী গোষ্ঠী কয়েক বছর পর পর নিজেদের কোনো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করত। ফলে শাহাবুদ্দিন ঘুরি তাদেরই হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। সুলতান ইলতুতমিশের ওপরও ইসমাইলি ফিদায়ীরা হামলা করেছিল যা সফল হয়নি। তবুও তাদের সাহস এতটুকু ছিল যে রাজিয়া সুলতানের যুগে তারা দিল্লি দখলের চেষ্টা করেছিল যা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়।

এটি সেই সময় ছিল যখন দিল্লিতে সিলসিলা-এ-চিশতিয়া এবং মুলতান ও উচে সিলসিলা-এ-সোহরাওয়ার্দিয়ার খানকাহগুলোতে বসে থাকা বুজুর্গানে দ্বীন এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য চিন্তিত ছিলেন। ফলে কয়েক দশকের মধ্যেই তাঁদের ফয়েজ হিন্দুস্তানের এই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশেও পৌঁছাতে শুরু করে। তবে এতে প্রথম হযরত সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর খলিফা আজাল হযরত শেখ হুসামুদ্দিন রহ. কাজ করেন।

---

[১] আব-এ-কাউসার: পৃ. ৩৩ থেকে ৩৩৬

[২] দাওয়াত-এ-ইসলাম, লেখক আর্নল্ড: পৃ. ২৭৩

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

শেখ উসমান বিন দাউদ, ওরফে হুসামুদ্দিন মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

শেখ হুসামুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্ম তারিখ উল্লেখ নেই। সম্ভবত তিনি সপ্তম হিজরি শতাব্দীর (দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দী) মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মভূমি ছিল মুলতান। তিনি দিল্লিতে পৌঁছান এবং দীর্ঘকাল সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খিদমতে অবস্থান করেন। নিজের মুর্শিদের জীবদ্দশাতেই তিনি হজ সফরের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যখন তিনি হজ থেকে ফিরে এলেন, তখন মুর্শিদ তাঁকে বললেন যে, রওজা আতহার যিয়ারতের খাঁটি নিয়তে আরও একবার হিজাজে মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নাও। ফলে তিনি এই নির্দেশ পালন করেন এবং হিজাজের দ্বিতীয় সফর করেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ ঘটনা হযরত সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনীর অনুষঙ্গে পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি তাঁর শায়খের খিদমত, মহব্বত, আনুগত্য এবং মেজাজ বোঝার ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

তিনি ৬৯৫ হিজরিতে গুজরাটের প্রধান শহর "পত্তন"-এ পৌঁছেছিলেন। এটি সেই বছর ছিল যখন সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির জামাতা আলী (আলাউদ্দিন খিলজি) দেবগিরি (দৌলতাবাদ) জয় করেছিলেন, কিন্তু তখনও গুজরাট দিল্লি সালতানাতের অধীনে আসেনি।

যখন শেখ হুসামুদ্দিন মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এখানে আসেন এবং গুজরাটের রাজধানী পত্তন (আনহিলওয়ারা)-এ অবস্থান করেন, তখন তাঁর সামনে নিশ্চিতভাবেই অগণিত সমস্যা ছিল। এটা স্পষ্ট যে তিনি এখানে কেবল ইবাদত ও রিয়াযতের জন্য আসেননি, বরং তাঁর সামনে তাবলীগী ও দাওয়াতের এক বিশাল ময়দান ছিল। কিন্তু আফসোস যে তাঁর কর্মকাণ্ডের কোনো বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষিত নেই।

যা-ই হোক, তাঁর আগমনের কয়েক বছর পর ৬৯৯ হিজরিতে আলাউদ্দিন খিলজি গুজরাট জয় করে একে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এভাবে অন্যান্য উলামা ও দায়ীদের জন্য এখানে আসার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

৭২৫ হিজরিতে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক দিল্লির সালতানাত গ্রহণ করেন এবং দেবগিরিকে "দৌলতাবাদ" নাম দিয়ে শীঘ্রই সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক বিশাল সংখ্যাসহ এখানে চলে আসেন। এই পদক্ষেপের ফলে যদিও আল্লাহর সৃষ্টি (মানুষ) বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তবে এর একটি উপকারিতা এই হয়েছিল যে, দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের ধারা অত্যন্ত মজবুতভাবে শুরু হয় এবং সেই সাথে পাঞ্জাব ও দোয়াবের উলামা ও মাশায়েখগণ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের শহরগুলোতে এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন। এই ঢেউয়ের মধ্যেই শেখ হুসামুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পরিবারের সুফি ও উলামাগণও এখানে একে একে আসতে থাকেন। তাছাড়া উচ ও মুলতানের মাশায়েখগণ এই নতুন ময়দানের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। ফলে উচ-এর এক বুজুর্গ শেখ জামাল উচি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও ৭৩০ হিজরিতে পত্তনে তাশরিফ আনেন এবং পনেরো বছর বীরত্বের সাথে কাজ করার পর ৭৪৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

একইভাবে শেখ হুসামুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ভাগ্নে শেখ সদরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও তাঁর মা এবং পরিবার-পরিজনসহ এদিকে যাত্রা করেন, প্রথমে যোধপুরের নাগোর জনপদে অবস্থান করেন এবং দাওয়াতের কাজ করেন। আপনার অবস্থানের ফলে এই অঞ্চলে ইসলামের এমন পরিচয় ঘটে যে শাসক পরিবারের লোকেরাও ইসলামে দাখিল হন। তাঁদের মধ্য থেকেই এক রাজার মেয়ের সাথে আপনার বিবাহও হয়। পরবর্তীতে শেখ হুসামুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁদেরকে তাঁর বোনসহ পত্তনে ডেকে নেন।

শেখ হুসামুদ্দিন রহ.-এর ইন্তেকালের সাত বছর আগে ৭৩০ হিজরিতে তাঁর ভাতিজা সৈয়দ হুসাইন খং সওয়ার রহ.-ও পাটানে আগমন করেন এবং একইভাবে খানকাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে মশগুল হয়ে যান। এভাবে শেখ হুসামুদ্দিন রহ. তাঁর ভাগ্নে ও ভাতিজার রূপে দুইজন শ্রেষ্ঠ সহযোগী ও নায়েব (প্রতিনিধি) পেয়ে যান। শেখ হুসামুদ্দিন রহ. ৪১ বছর পর্যন্ত এখানে তাওহিদের আকিদা ও মারেফতে ইলাহিয়ার পয়গাম দিতে থাকেন এবং অবশেষে ১৮ জিলকদ ৭৩৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [১]

কাজী আব্দুল মুকতাদির শুরাইহি কিন্দি রহ.:

এই যুগের বিশিষ্ট বুজুর্গদের মধ্যে কাজী আব্দুল মুকতাদির শুরাইহি কিন্দি রহ.-ও ছিলেন। তিনি একজন ফকিহ ও সুফি বুজুর্গ ছিলেন যিনি আরব বিশ্বে তাঁর নাতিয়া কাসিদা "লামিয়াতুল আজম"-এর কারণে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর জন্ম ৭০২ হিজরিতে থানেসরে এবং লালন-পালন দিল্লিতে হয়। শায়খুল ইসলাম ফরিদউদ্দিন আওধি রহ. এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শেখ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আওধি রহ.-এর নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। হাদিস, আদব (সাহিত্য), রচনাশৈলী এবং কবিতায় পূর্ণতা অর্জন করেন।

দিল্লির মাশায়েখদের মসনদে তখন সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ. সমাসীন ছিলেন। আপনি তাঁর থেকেও প্রচুর ফয়েজ হাসিল করেন। আপনি সেই দশজন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে সুলতানুল মাশায়েখ রহ. ৭৩৪ হিজরিতে বায়াত ও ইরশাদের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। ৭২৫ হিজরিতে সুলতান জি-র ইন্তেকাল হলে আপনি তাঁর খ্ুফা শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগে দিল্লি রহ.-এর নিকট বায়াত হন এবং তাঁর খেলাফত লাভেও ধন্য হন।

আপনার দরসের মজলিসও প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ছাত্রদের মধ্যে কাজী শাহাবুদ্দিন দৌলতাবাদ রহ.-এর মতো কর্মঠ ও যোগ্য ব্যক্তি তৈরি হন। যখন সুলতান মুহাম্মদ শাহ তুঘলক লোকদের দৌলতাবাদে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন, তখন আপনি গুজরাটের দিকে হিজরত করেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। এভাবে আপনি চিশতিয়া সিলসিলার সেই প্রাথমিক বুজুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা গুজরাটকে নিজেদের নূর দ্বারা আলোকিত করেছিলেন। ৭৯২ হিজরিতে আপনি গুজরাটেই ইন্তেকাল করেন। [২]

সৈয়দ হুসাইন খং সওয়ার রহ. এবং আরও কিছু মাশায়েখ:

শেখ হুসামুদ্দিনের ভাতিজা সৈয়দ হুসাইন খং সওয়ার রহ. গুজরাটে তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য দীর্ঘ সময় পেয়েছিলেন। তিনি ৬৮ বছর পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে মশগুল থেকে ৭৯৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

এটি সেই সময় ছিল যখন গুজরাটের একজন নওমুসলিম এবং অত্যন্ত যোগ্য কর্মকর্তা জাফর খানকে ফিরোজ শাহ তুঘলকের পক্ষ থেকে এই প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করা হয়। জাফর খান ৭৯৩ হিজরিতে (১৩৯১ খ্রি.) শাসক হিসেবে এখানে আসেন। তিনি নিজের সাথে অনেক উলামা ও সুফিয়াদেরও নিয়ে এসেছিলেন যাতে এখানে একটি সভ্য ও শিক্ষিত ইসলামি সমাজ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। ৮০১ হিজরিতে তৈমুরি আক্রমণে দিল্লির অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু জাফর খান তবুও প্রায় নয় বছর পর্যন্ত দিল্লির প্রতি আনুগত্যের ধারা বজায় রাখেন। যা-ই হোক, ৮১০ হিজরিতে তিনি "মুজাফফর শাহ"

---

[১] আব-এ-কাওসার: পৃ. ৩৩১ থেকে ৩৩৩; নুজহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃ. ১৭৩।

[২] নুজহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃ. ১৭১ থেকে ১৭৪।

...উপাধি নিয়ে স্বাধীন বাদশাহ হলেন এবং এভাবে গুজরাটে প্রথম স্বাধীন মুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো।

প্রায় এই সময়েই উচ-এর সোহরাওয়ার্দী বুজুর্গ সৈয়দ রাজন কত্তাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৮২৭ হিজরি), যিনি মখদুম জাহানিয়া জাহান গশত রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ভাই ছিলেন, তিনি তাঁর খলিফা সৈয়দ মুহাম্মদ খোদা বখশ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং সৈয়দ আহমদ মখদুম জাহান শাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে এখানে পাঠিয়েছিলেন, যারা পত্তনে এসে হিদায়াত ও সঠিক পথের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। [১]

শেখ আহমদ বিন আবদুল্লাহ খাট্টু, গঞ্জ বখশ রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

শেখ আহমদ বিন আবদুল্লাহ খাট্টু রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপমহাদেশের সেই বিখ্যাত মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের মাধ্যমে গুজরাটে ইসলামের আলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর জন্ম ৭৩৭ হিজরিতে দিল্লিতে হয়। তিনি তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন যখন একদিন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায় যা তাঁকে উড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে যায়। তিনি একটি কাফেলার কাছে গিয়ে পড়েন। কাফেলার লোকেরা তাঁকে অভিভাবকহীন মনে করে তুলে নেয় এবং নিজেদের সাথে ডিডওয়ানা [২] (রাজস্থান) নিয়ে যায়। সেখানে নজীব নাসসাজ নামক এক ব্যক্তি কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর লালন-পালন করতে থাকেন।

এই সময়ে বাবা ইসহাক মাগরিবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নামক এক প্রবাসী বুজুর্গ হিন্দুস্তানে এসে আজমিরে অবস্থান করছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। বাবা ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জিয়ারত লাভ করেন এবং হযরত খাজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে নির্দেশ দেন যে তিনি যেন খাট্টু [৩] জনপদে গিয়ে বসবাস করেন।

ফলে বাবা ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে চলে যান। তিনি বয়োবৃদ্ধ এবং অবিবাহিত ছিলেন। মনে খেয়াল এলো কোনো শিশুকে নিয়ে লালন-পালন করি। এক বন্ধু শেখ সদরুদ্দিনের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শেখ সদরুদ্দিন কিছুদিন পর ডিডওয়ানা গেলে জানতে পারলেন যে নজীব নাসসাজ নামক এক ব্যক্তির কাছে একটি অভিভাবকহীন শিশু আছে। ফলে সেই শিশুকে সংগ্রহ করে বাবা ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট সোপর্দ করা হলো, যিনি এই শিশুকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করলেন।

যখন শেখ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তেরো বছর বয়সে পদার্পণ করলেন, তখন বাবা ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর বড় ভাই মালিক নাসিরুদ্দিন তাঁকে চিনে ফেললেন এবং বাবা ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে বললেন যে আমাদের এই ভাইকে কালো ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শেখ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পিতামাতাও তখন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কিন্তু শেখ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাবাজির সঙ্গ ত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন।

দিল্লিতে তাঁর অবস্থান বেশ কয়েক বছর মসজিদ খান জাহানের হুজরায় ছিল। সম্ভবত শেখ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সময়ে বিভিন্ন উস্তাদদের নিকট শিক্ষা অর্জন করতে থাকেন। সেই দিনগুলোতে শেখ মখদুম জাহানিয়া জাহান গশত রহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লি তাশরিফ আনেন এবং বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলকসহ উমারা, নবাব এবং অন্যান্য বায়আত গ্রহণকারীদের ভিড় জমলে বাবা ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তরুণ শেখ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি...

---

[১] আব-এ-কাউসার: পৃষ্ঠা ৩৩০ থেকে ৩৩৩।

[২] ডিডওয়ানা রাজস্থানের একটি শহর যা দিল্লি থেকে প্রায় চারশ কিলোমিটার দূরে।

[৩] খাট্টু রাজস্থানের সিকার জেলায় অবস্থিত। একে খাট্টু শ্যাম জি-ও বলা হয়। আজমির থেকে এর দূরত্ব ১৪৬ কিলোমিটার, ডিডওয়ানা থেকে ১১২ কিলোমিটার এবং দিল্লি থেকে ২৭০ কিলোমিটার।

তিনি বললেন: “তাঁর কাছেই বায়আত হও। তোমার এই বাবু তো কেবল একজন মিসকিন দরবেশ।”

কিন্তু শেখ আহমদ রহ. বললেন: “বাবু জি! আমার মা-বাবাও আপনি এবং পীর ও মুরশিদও আপনি।”

বাবা ইসহাক রহ. তাঁর ইখলাস ও আনুগত্যে এতই খুশি হলেন যে, তাঁর কপালে চুমু খেয়ে বললেন: “এমন এক সময় আসবে যখন বড় বড় বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহগণ বিনীতভাবে তোমার কাছে হাজির হয়ে দোয়ার দরখাস্ত করবে।”

দিল্লিতে সাত বছর কাটিয়ে এই পীর ও মুরিদ উভয়েই খাট্টু-তে ফিরে আসেন, যেখানে কিছুকাল পর ৭৭৬ হিজরিতে বাবা ইসহাক রহ.-এর ইন্তেকাল হয়। ইন্তেকালের আগে তিনি তাঁর টুপিটি এই মুখলিস মুরিদকে পরিয়ে দিয়ে ইজাজত ও খিলাফত দান করেন। [১]

বাবা ইসহাক মাগরিবী রহ.-এর ইন্তেকালের পর শেখ আহমদ রহ.-এর মন দুনিয়া থেকে একেবারে উঠে যায় এবং তিনি বারো বছর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এদিক-সেদিক সফর করতে থাকেন। বারো বছর পর (৮৮৭ হিজরিতে) দিল্লিতে এসে পুনরায় অবস্থান করেন। বাবা ইসহাক রহ.-এর পালক পুত্র হওয়ার সুবাদে মানুষ তাঁকে চিনত। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও তাঁকে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। ‘খাট্টু’-এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে আপনাকে ‘খাট্টুয়ী’ বলা হতে থাকে। পরে এই ‘খাট্টু’ শব্দটি নামের অংশ হয়ে যায়।

কিছুকাল পর আপনি দিল্লি থেকে গুজরাট গিয়ে জাহাজে করে হিজাজে চলে যান, হজ আদায় করেন এবং রওজা আতহার জিয়ারত করেন। [২]

ফেরার পথে তিনি সিন্ধুর ঠাট্টায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এরপর উচ-এ পৌঁছান। ততদিনে মখদুম জাহানিয়া জাহান গশত রহ. ইন্তেকাল করেছিলেন। তবে তাঁর ছোট ভাই শেখ সদরুদ্দিন রাজন কাত্তাল রহ. জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং বলেন: “আল্লাহর কাছে আপনার মর্তবা অনেক উঁচু।”

আপনি পুনরায় দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং কয়েক বছর অবস্থান করেন। সেই সময়ে বাংলার কুতুব নূর আলম রহ.-এর এক মুরিদ দিল্লি হয়ে বাংলায় ফিরে গেলে হযরত নূর আলম রহ. তাকে জিজ্ঞেস করেন: “তুমি কি দিল্লিতে শেখ আহমদ খাট্টুর সাথে দেখা করেছ?”

সে না-সূচক উত্তর দিলে হযরত কুতুব আলম বললেন: “তাহলে তোমার দিল্লি যাওয়াই বৃথা গেল।”

দিল্লির বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক সেই সময়ে স্বয়ং হযরত শেখ আহমদ খাট্টু রহ.-এর জিয়ারত ও দোয়ার দরখাস্তের জন্য আসতেন, এমনকি তাঁর মৃত্যু হয় এবং দিল্লির ওপর দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার ঝড়ের পর আমীর তৈমুর এক অনিবার্য ভাগ্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তৈমুর দিল্লি থেকে যাদের বন্দি করেছিলেন, তাদের মধ্যে শেখ খাট্টু রহ.-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরে যখন তৈমুরের কাছে আপনার মর্তবা প্রকাশ পেল, তখন সে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আচরণ করল। আপনার সুপারিশে সে বাকি বন্দিদেরও মুক্তি দিল। এরপর সে আপনাকে নিজের সাথে সমরকন্দে নিয়ে গেল। আপনি সেখানে কিছুদিন থেকে পুনরায় দিল্লিতে ফিরে আসেন। কিন্তু হাসিখুশি সেই শহর এখন জনশূন্য। আপনার মন টিকল না এবং দিল্লি ছেড়ে গুজরাটে চলে গেলেন।

---

[১] বাবা ইসহাকের মাজার আজও ‘খাট্টু’-তে বিদ্যমান। নুযহাতুল খাওয়াতির-এর লেখকের মতে বাবা ইসহাক মাগরিবীর জন্ম ৬৬০ হিজরিতে। সেই হিসেবে তাঁর বয়স ১১৬ বছর হয়। (নুযহাতুল খাওয়াতির: ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫)

[২] হজের এই সফর আনুমানিক ৯০১ হিজরির কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল, অর্থাৎ তখন আপনার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি।

আপনি ৮০২ হিজরিতে গুজরাটে পৌঁছান। সে সময় জাফর খান সেখানকার শাসক ছিলেন। তিনি বহু বছর দিল্লিতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং আপনাকে খুব ভালোভাবেই চিনতেন, তাই সম্মান ও শ্রদ্ধায় কোনো ত্রুটি করেননি এবং গুজরাটে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুরোধ জানান। আপনি শহরগুলো ছেড়ে 'সরখেজ' নামক জনপদে বসবাস পছন্দ করেন। সে সময় আপনার বয়স ছিল ৬৫ বছর।

আপনি সরখেজে একটি মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে শুরু করেন। মানুষের এমন ভিড় হতো যে সবসময় লঙ্গরখানা চালু থাকত। জাফর খান এই সময়ে বাদশাহ হয়ে 'মুজাফফর শাহ' নামে পরিচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর সুলতান আহমদ আউয়ালও আপনার ভক্ত ও সেবক ছিলেন। তিনি ৮১৩ হিজরিতে সরখেজ থেকে তিন মাইল দূরে আহমেদাবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, তখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য অন্যান্য বুজুর্গদের সাথে আপনাকেও ডেকে পাঠান। [১]

আপনি ৪৭ বছর গুজরাটে অবস্থান করে ঈমান ও একিনের দাওয়াত প্রচার করেন এবং ৮৫৩ হিজরিতে (১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

কুতুব আলম সৈয়দ বুরহান উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

মখদুম জাহানিয়া জাহান গশত রহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি সৈয়দ বুরহান উদ্দিন (বিন সৈয়দ নাসির উদ্দিন) উচ থেকে আহমেদাবাদে আসেন এবং কুতুব আলম উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। তিনি ৭৯০ হিজরিতে (১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন।

আপনার বয়স যখন এগারো বছর, তখন আপনার সম্মানিত পিতা নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। এটি ৮০১ হিজরির ঘটনা। আপনার শিক্ষা ও লালন-পালনের দায়িত্ব আপনার পিতার চাচা সৈয়দ রাজেন কাত্তাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের কাঁধে তুলে নেন। আপনার বয়স যখন মাত্র বারো বছর, তখন তিনি আপনাকে জ্ঞান অর্জনের জন্য গুজরাটে পাঠিয়ে দেন এবং সেই সাথে বলেন যে, গুজরাটবাসীর পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব এখন তোমার। সেখানে মানুষের কাছে হকের পয়গাম পৌঁছানো এবং তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা।

ফলশ্রুতিতে ৮০২ হিজরিতে (১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) আপনি আপনার মায়ের সাথে পাটানে আগমন করেন, যা সে সময় গুজরাটের রাজধানী ছিল। সেখানে হযরত শেখ রুকন উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহির মেহমান হন, যিনি বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি ছিলেন।

আপনি পাটানের একটি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে হযরত মাওলানা আলী শের রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে বিভিন্ন জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এছাড়া আপনি হযরত সৈয়দ গেসু দরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও সাক্ষাৎ করেন, যিনি দাক্ষিণাত্য থেকে গুজরাটের মাশায়েখদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। পরবর্তীতে আপনি হযরত শেখ আহমদ খাট্টু রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং খিলাফত লাভ করেন।

যখন আহমেদাবাদ নির্মিত হয়ে রাজধানীতে পরিণত হলো, তখন আপনি পাটান থেকে সেখানে স্থানান্তরিত হন। জাফর খান, যিনি পরবর্তীতে মুজাফফর শাহ উপাধিতে গুজরাটের প্রথম সুলতান হন, তিনি হযরতের দাদা হযরত মখদুম জাহানিয়া জাহান গশত রহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরিদ ছিলেন, তাই তিনি আপনাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। আপনার প্রথম বিবাহ তাঁর কন্যার সাথে এবং দ্বিতীয় বিবাহ সালতানাতের উজির আমিন উদ্দিন খুদাওয়ান্দ খানের কন্যার সাথে হয়। এছাড়া আরও দুটি বিবাহ করেন এবং প্রচুর সন্তানসন্ততি হয়। হযরতের খানকাহ গুজরাটের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কেন্দ্রে পরিণত হয়, এই শ্রেণিতে আমির, উজির এবং কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

---

[১] শেখ আহমদ খাট্টু, প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম, ইতিহাস বিভাগ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাহোর।

আপনার মৃত্যু ৮ জিলহজ ৮৭৫ হিজরিতে হয়েছিল। আহমেদাবাদের নিকটবর্তী 'বটওয়া'-তে সমাহিত হন। সুলতান মাহমুদ বেগড়া মাজারের ওপর একটি চমৎকার মাকবারা নির্মাণ করিয়েছিলেন যা সাধারণ মানুষের মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে। হযরতের অনেক খলিফা ছিলেন যাদের মধ্যে হযরত শাহ আলম, হযরত সৈয়দ আহমেদ শাহ পীর, হযরত শাহ সাদিক, হযরত শাহ সেলিম, হযরত শাহ রাজু, হযরত মাখদুম শেখ সালেহ, হযরত শাহ জাহিদ এবং হযরত শেখ আব্দুল লতিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। [১]

শেখ আব্দুল লতিফ গুজরাটি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: মৃত্যু ৯৮৯ হিজরি (১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ)

ইনি সেই বুজুর্গ যাঁর অনুসারীরা গুজরাট থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং তাঁকে 'দাউল শাহ' বলে স্মরণ করা হয়। আপনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র এবং উচ্চপর্যায়ের ফকিহ ছিলেন। গুজরাটের মহান বাদশাহ মাহমুদ বিন মুহাম্মদ বেগড়া আপনার ভক্ত ছিলেন। আপনার বরকতময় সাহচর্যের কারণে তিনি অনর্থক কাজ থেকে বিরত হয়েছিলেন এবং নেককার ও মুত্তাকি হয়ে গিয়েছিলেন।

আপনি অত্যন্ত সাহেব-এ-কাশফ ও কারামত বুজুর্গ ছিলেন এবং 'দাওয়ার মুলক' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই উপাধিই সাধারণ মানুষের মুখে 'দাউল শাহ' হয়ে গিয়েছে। আপনার হাতে অনেক হিন্দু মুসলমান হয়েছিলেন এবং একইভাবে অনেক কারামতি ও ইসমাইলিও তওবা করে খাঁটি দ্বীনের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন।

সুলতানের পক্ষ থেকে আপনাকে সামরিক অভিযানেও পাঠানো হতো। এমনই এক অভিযানে আপনাকে গ্রাসিয়া গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল এবং সেই অভিযানেই আপনি শহীদ হন। আপনার কবরের ওপর একটি অত্যন্ত চমৎকার মাজার রয়েছে। [২]

মেমন ইসলামের নতুন দায়ী:

এটিই সেই সময় ছিল যখন মেমন জাতির মধ্যে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, যারা তাদের বাণিজ্যিক দক্ষতার কারণে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত। মেমন জাতির মূল সম্পর্ক সিন্ধুর 'লোহানা' গোত্রের সাথে, যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিল। ৮২৪ হিজরিতে (১৪২১ খ্রিস্টাব্দ) হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধরদের মধ্য থেকে একজন বুজুর্গ সৈয়দ ইউসুফ উদ্দিন কাদরি জিলানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরাক থেকে সিন্ধুতে আগমন করেন এবং ঠাট্টাকে, যা সেই সময় সিন্ধুর রাজধানী ছিল, নিজের দাওয়াতি কার্যক্রমের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

আপনার তাবলিগ, উচ্চ নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা লোহানা জাতির নেতা এবং সাধারণ মানুষ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল। লোহানা জাতির দুইজন ব্যক্তি: হংস রাজ এবং সুন্দর জি সর্বপ্রথম মুসলমান হন যাদের আদম জি এবং তাজ মুহাম্মদ নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল। এরপর খুব শীঘ্রই লোহানা জাতির সাতশ পরিবার সৈয়দ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। সৈয়দ ইউসুফ উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই নওমুসলিম জাতিকে অমুসলিম লোহানা গোত্র থেকে আলাদা করার জন্য 'মুমিন' উপাধি দিয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে এই শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'মেমন' হয়ে যায়। এভাবে এই জাতি তাদের নতুন ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে পরিচিতি লাভ করে। সৈয়দ ইউসুফ উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছুকাল পর ইরাকে ফিরে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন, তবে তাঁর উত্তরসূরিরা তাঁর দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখেন।

---

[১] আব-এ-কাউসার: পৃ. ৩৩০ থেকে ৩৩৩; মাশায়েখ-এ-আহমেদাবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ মাতালা রচিত: পৃ. ২৩৬ থেকে ২৪২

[২] আব-এ-কাউসার: পৃ. ৩৩৬; নুজহাতুল খাওয়াতির: ৩/ পৃ. ২৫৭

ইসলাম গ্রহণ করার পর, মেমনদের তাদের পূর্ববর্তী স্বজাতীয়দের পক্ষ থেকে সমস্যা ও বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তারা সিন্ধু থেকে হিজরত করে গুজরাটের অঞ্চলসমূহ: কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র [১], সুরাট এবং কাথিয়াওয়াড় ইত্যাদিতে বসবাস শুরু করেন যেখানে লোহানা গোত্রের অন্যান্য শাখাগুলো আবাদ ছিল।

এখানে মেমন জাতি দাওয়াতের কাজ করলে লোহানা গোত্র বিপুল সংখ্যায় মুসলমান হয়, এমনকি কাথিয়াওয়াড়ের রাজা স্বয়ং সৈয়দ ইউসুফ উদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ-এর উত্তরসূরিদের দাওয়াত দেন যাতে তারা তার রাজধানীর শহর 'মুন্দ্রা'-কে নিজেদের কেন্দ্র বানায়।

সময়ের সাথে সাথে মেমন জাতির বাণিজ্যিক দক্ষতায় আরও উন্নতি ঘটে এবং এই লোকেরা সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। মেমন জাতির ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ফলে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে এক বুদ্ধিমান, শান্তিকামী এবং দৃঢ় বিশ্বাসী জাতির মূল্যবান সংযোজন ঘটে যার জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের কথা সারা বিশ্ব স্বীকার করে। [২]

---

[১] সুরাট এবং সৌরাষ্ট্র আলাদা আলাদা স্থান। সুরাট গুজরাটের একটি উপকূলীয় বন্দর ও শহরের নাম, অন্যদিকে সৌরাষ্ট্র গুজরাটের সেই পশ্চিমাঞ্চলকে বলা হয় যা একটি উপদ্বীপ, যার মধ্যে অনেক জেলা ও শহর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন রাজকোট, জামনগর, ভাবনগর এবং পোরবন্দর।

[২] দাওয়াত-এ-ইসলাম, আর্নল্ড: পৃষ্ঠা ২৭২; আপ-এ-কাওসার: পৃষ্ঠা ৩৩৭, ৩৩৮।

https://t.me/BoierSomahar

গুজরাটের প্রখ্যাত উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসগণ

ইসলামের দাওয়াতদানকারী, সুফি ও মাশায়েখদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করার পর আমরা সংক্ষেপে এই যুগের কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলেম, ফকিহ ও মুহাদ্দিসের পরিচয় তুলে ধরছি যাদের ফয়েজ গুজরাটে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল:

•

শেখ কামাল উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি: মৃত্যু ৭৫৬ হিজরি (১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দ)
তিনি হযরত শেখ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চেরাগ-ই-দেহলি রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা ও ভাগ্নে ছিলেন। ইলমে হাদিস, ফিকহ ও উসুলে ফিকহ শাস্ত্রে তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে অনন্য ছিলেন।

•

শেখ রাজি উদ্দিন উসমান গঞ্জে ইলম রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৭৭০ হিজরি (১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ)
তিনি ইলম ও ফজিলতে অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন এবং এই কারণেই ‘গঞ্জে ইলম’ উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হযরত মাখদুম জাহানিয়া জাহান গশত রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর একটি ফতোয়াকে সমর্থন করে একটি লেখা লিখেছিলেন, যা থেকে তাঁর ইলমি শান বা পাণ্ডিত্যের মর্যাদা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

•

মাওলানা ইয়াকুব পাটনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৭৯৮ হিজরি (১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ)
তিনি অত্যন্ত নেককার, ফকিহ এবং আধ্যাত্মিক স্তরের অধিকারী বুজুর্গ ছিলেন। তিনি খোরাসানের বাদশাহদের বংশধর ছিলেন, ইলম অর্জনের জন্য দেশ ত্যাগ করেন এবং পাটনে এসে বসবাস শুরু করেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন।

•

কাজী ইসমাইল ইসফাহানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৮৬৫ হিজরি (১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ)
শৈশবে তিনি তাঁর পিতার সাথে ইসফাহান থেকে হিজরত করে গুজরাটে এসেছিলেন। তিনি উচ্চতর ইলমি মাকাম লাভ করেন। প্রথমে তিনি ভরুচের কাজী ছিলেন, এরপর সুলতান মাহমুদ সানির আমলে আহমেদাবাদের কাজী নিযুক্ত হন এবং আহমেদাবাদেই ইন্তেকাল করেন।

•

শেখ উসমান হুসাইনি গুজরাটি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৮৬৩ হিজরি (১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ)
তিনি অনেক বড় আলেম ও প্রথিতযশা ফকিহ ছিলেন। তিনি আহমেদাবাদের উসমানপুর মহল্লায় একটি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার কুতুবখানা ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। সুলতান মাহমুদ বিন মুহাম্মদের কিতাবসমূহও এই কুতুবখানায় সংরক্ষিত থাকত।

https://t.me/BoierSomahar

কাজী ইমাদউদ্দীন গুজরাটি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৮৮৯ হিজরি (১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ)

তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম, ফকিহ এবং মুজাহিদ ছিলেন। বরোদায় কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতান মাহমুদ শাহ সানি তাকে জিহাদের জন্য একটি বাহিনীর সাথে পাঠিয়েছিলেন। এই অভিযানে তিনি শাহাদাতের নিয়ামত লাভে ধন্য হন।

শেখ গাউসউদ্দীন গুজরাটি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৮৯৫ হিজরি (১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ)

তিনি অনেক বড় মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং সেই সাথে আল্লাহর ওলি ও নেক চরিত্রের অধিকারী বুজুর্গ ছিলেন। ইসলামের খেদমতের জন্য বাগদাদ থেকে এসেছিলেন এবং আহমেদাবাদে বসবাস শুরু করেছিলেন। আহমেদাবাদে তিনি একটি বিশাল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শেখ বাহাউদ্দীন গুজরাটি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৯১২ হিজরি (১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ)

আপনি হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। আহমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানেই লালিত-পালিত হন এবং ইলম অর্জন করেন। তিনি অত্যন্ত নেককার ও দক্ষ ফকিহ ছিলেন, বুরহানপুরে আপনার খানকাহ ছিল। সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

কাজী সদরউদ্দীন লাহোরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৯৯০ হিজরি (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ)

তিনি বড় গবেষক এবং প্রচুর অধ্যয়নকারী আলেম ছিলেন, আলেমদের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকি এবং অধিক ক্রন্দনকারী মানুষ ছিলেন। শাহ তৈমুর তাকে ভরুচের কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানেই ইন্তেকাল হয়।

সৈয়দ শেখ আব্দুল্লাহ হাদরামি সুম আহমেদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৯৯০ হিজরি (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ)

তিনি একজন আরব আলেম ছিলেন যিনি বিভিন্ন দেশে অসংখ্য আলেমের নিকট থেকে ইলম অর্জন করার পর আহমেদাবাদে চলে এসেছিলেন। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, তাসাউফ, ফারায়েজ এবং গণিতশাস্ত্রে তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে অনন্য ছিলেন। আহমেদাবাদে ৩২ বছর অবস্থান করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল হয়।

শেখ আব্দুল মালিক গুজরাটি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৯৯০ হিজরি (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ)

আহমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআনের হাফেজ এবং বিভিন্ন ইলমের অধিকারী ছিলেন। এই শহরের শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে তিনি গণ্য হতেন। সহীহ বুখারী শরীফ শব্দে ও অর্থে তার মুখস্থ ছিল।

শেখ মুহাম্মদ বিন তাহের পাটনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৯৮৬ হিজরি (১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ)

শেখ তাহের পাটনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি গুজরাটের ইতিহাসের অন্যতম প্রখ্যাত আলেমদের মধ্যে গণ্য হন। আপনার পিতা ও দাদা পাটনের বড় ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনার প্রাথমিক শিক্ষা ঘরেই সম্পন্ন হয়। পাটন তখন আলেম ও গুণীজনদের কেন্দ্র ছিল। ফলে আপনি সেখানে বড় বড় আলেমদের নিকট থেকে মানকুলাত ও মাকুলাত সম্পন্ন করেন। পনেরো বছর বয়সেই আপনি পাঠ্যক্রমের পড়াশোনা শেষ করেছিলেন। এর পর আপনি হারামাঈন শরীফাইনে গমন করেন এবং সেখানে আরবের প্রখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ যেমন শেখ আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বকরি, আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি মক্কি, শেখ আলী বিন মুহাম্মদ মুহাদ্দিস ইরাকি এবং শেখ জারুল্লাহ মক্কি শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমদের নিকট থেকে হাদিসের ইলম অর্জন করেন।

করেছেন। এ ছাড়াও তিনি শেখ আলী মুত্তাকী রহ.-এর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর মুরিদও হন। এভাবে ইলমি ও রূহানি ফয়েজে সিক্ত হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। আপনার হাদিসের দরসের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং আপনাকে রঈসুল মুহাদ্দিসীন ও মালিকুল মুহাদ্দিসীন বলা হতে থাকে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দরস ও তাদরীসে মশগুল ছিলেন। তাসনীফ ও তালীফের মুবারক ধারাও অব্যাহত ছিল।

আপনি জাতির মধ্যে প্রচলিত বিদআত ও খুরাফাত নির্মূল এবং বাতিল ফিরকাগুলোর প্রতারণা ও বিভ্রান্তি স্পষ্ট করার ক্ষেত্রেও অনেক কাজ করেছেন এবং আহলে সুন্নাতের মাসলাককে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আপনি একটি দ্বীনি মাদরাসাও কায়েম করেছিলেন, যেখানে আপনি নিজেই হাদিসের দরস দিতেন। আপনার শাগরিদদের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ, কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ শাগরিদের নাম নিচে দেওয়া হলো:

- শেখ জিয়াউদ্দীন বিন শেখ মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়রী
- শেখ দাউদ বিন শেখ হাসান
- শেখ মুহাম্মদ শাত্তারী
- শেখ জিউন সূরতী
- শেখ আব্দুল হাদী আহমাদাবাদী
- শেখ ফরীদ কাসিব পত্তনী
- শেখ আব্দুল নবী
- শেখ হুসাইন সূরতী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

হাদিস শাস্ত্রে আপনার পূর্ণ দক্ষতা ছিল। আরবি অভিধান ও আরবি সাহিত্যেও পূর্ণ পারদর্শিতা নসিব হয়েছিল। আপনি হাদিসের কঠিন শব্দ ও অভিধানের একটি জামে অভিধান 'মাজমাউল বিহারিল আনোয়ার' সংকলন করেন, যা হাদিসের ব্যাখ্যাকারীদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। আপনার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-মুগনী' আসমাউর রিজাল সংক্রান্ত। আপনি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং মিশকাত শরীফের ওপর অত্যন্ত মূল্যবান হাশিয়াও লিখেছেন। 'তাযকিরাতুল মাওযুআত'-এর মাধ্যমে আপনি জাল হাদিসগুলো চিহ্নিত করেছেন। আপনার ফতোয়ার সংকলন চার খণ্ডে ছিল যা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আপনি হাদিস, আসমাউর রিজাল, লুগাত, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আকাইদ এবং তাসাউফ বিষয়ে প্রায় ৮০টি কিতাব লিখেছেন।

সেই সময়ে গুজরাটে মাহদাবিয়াতের দাবিদার সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর ফিতনা চরম পর্যায়ে ছিল। গুজরাট ছিল এই ফিরকার সমর্থকদের কেন্দ্র। আল্লামা তাহের পত্তনী রহ. এই ফিরকার খণ্ডন এবং এর অনুসারীদের সংশোধনের জন্য সম্ভবপর সব ধরনের চেষ্টা করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে, যতক্ষণ না নিজের জাতিকে বিদআত ও গোমরাহি থেকে মুক্তি দেব, ততক্ষণ নিজের মাথায় পাগড়ি বাঁধব না। কিছুকাল পর আপনি এই ফিরকার কর্মকাণ্ড প্রকাশ করার নিয়তে আগ্রা যাচ্ছিলেন, তখন বিরোধীদের একটি দল পিছু ধাওয়া করে উজ্জয়িনী ও সারঙ্গপুরের মধ্যবর্তী স্থানে আপনাকে শহীদ করে দেয়। এটি ৯৮৬ হিজরি (১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। আপনার সঙ্গীরা লাশ ফিরিয়ে আনেন এবং পত্তনে দাফন করেন। আল্লামা তাহের পত্তনী রহ.-এর জীবন ও শাহাদাত মানুষকে সর্বদা ইখলাস, প্রচেষ্টা, সত্যবাদিতা এবং কোরবানির শিক্ষা মনে করিয়ে দেবে।

গুজরাটের এই নামী উলামা, ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসীনদের অবস্থা নিচের কিতাবগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে:

- নুযহাতুল খাওয়াতির: হাকীম আব্দুল হাই হাসানী রহ. কর্তৃক।
- মাশায়েখে আহমাদাবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ মুতালা রহ. কর্তৃক।
- ফুকাহা-এ-গুজরাত আওর উনকি দ্বীনি খিদমাত: আব্দুল কাইয়ুম রাজকোটি, জামিয়া ইসলামিয়া তালীমুদ্দীন ঢাবেল, গুজরাট।
- আল্লামা মুহাম্মদ বিন তাহের পত্তনী হায়াত ও খিদমাত, প্রবন্ধ: হাফীযুর রহমান কর্তৃক, প্রকাশিত 'ফিকর ও নজর' সাময়িকী, ইসলামাবাদ, খণ্ড: ৫, সংখ্যা: ১-২।

দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ

দক্ষিণ ভারতে সর্বপ্রথম আগমনকারী কাফেলাগুলো ছিল নামহীন উৎসর্গিত প্রাণ ব্যক্তিদের, যারা একই সাথে ওলী এবং মুজাহিদ ছিলেন এবং তাদের অধিকাংশই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে শহীদ হয়েছেন। ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে তাদের অবস্থা খুব কম এবং কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাদের সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য তাদের কবরের ফলক ও মাজারের শিলালিপি, অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শন এবং স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই মহান ব্যক্তিদের আগমন শাহাবুদ্দিন ঘোরীর আক্রমণের পর সপ্তম হিজরী শতাব্দীর শুরুতে আরম্ভ হয়েছিল। তাদের অবস্থা বোঝার জন্য প্রথমে দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা সংক্ষেপে বোঝা জরুরি।

দক্ষিণ ভারত একটি বিশাল ভূখণ্ড যা উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে সংকুচিত হয়ে ত্রিকোণ আকার ধারণ করেছে এবং শেষে একেবারে উপদ্বীপে পরিণত হয়েছে। একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- একটি হলো চরম দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকা যা সমুদ্রের সাথে বা তার কাছাকাছি এবং সেখানে মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী সরকার কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।
- দ্বিতীয় অংশটি হলো যাকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বলা হয় এবং যা চরম দক্ষিণ ভারতের উত্তরে এবং বিন্ধ্যাচল পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ বলা হতো এবং এখানে পরবর্তীতে মুসলমানদের বিভিন্ন রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ও বিলুপ্ত হতে থাকে, এমনকি মুঘলদের পতনের যুগে হায়দ্রাবাদ সালতানাতের রূপে এটি ইন্দো-মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে প্রমাণিত হয়।

উপকূলীয় অঞ্চলের গাজী আউলিয়া

আমরা প্রথমে দক্ষিণ ভারতের সেই অঞ্চলগুলোতে ইসলাম প্রচারকারীদের কথা উল্লেখ করছি যারা উপকূলের কাছাকাছি ছিলেন।

সৈয়দ মাজহার ওয়ালী রহমতুল্লাহি আলাইহি

এই অঞ্চলগুলোতে ইসলামের প্রাথমিক প্রচারকারীদের মধ্যে ত্রিচিনোপল্লীর সৈয়দ মাজহার ওয়ালী রহমতুল্লাহি আলাইহির নাম তালিকার শীর্ষে রয়েছে, যিনি ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষভাগে এখানে এসেছিলেন এবং ৬২২ হিজরী (১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন। আপনার আসল নাম ছিল মাজহার উদ্দিন। প্রায় ৯০০ মুরিদসহ তিনি হিজাজে গিয়েছিলেন এবং হজ্জের সৌভাগ্য অর্জনের পর ইসলামের দাওয়াতের জযবা নিয়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রা করেন।

https://t.me/BoierSomahar

আপনি সব থেকে আগে “মল ঘাট”-এর উপকূলে অবতরণ করেন এবং সেখানে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন। সেই সময়ে এখানকার শাসক “দসাসরাওইয়ু” নামক এক হিন্দু ছিল। সে এক বৃদ্ধার ছেলেকে কোনো কারণে হত্যা করতে চেয়েছিল। বৃদ্ধা ফরিয়াদ করতে করতে আপনার কাছে এল। আপনি তার ছেলেকে আশ্রয় দিলেন। এর ফলে রাজার সাথে আপনার যুদ্ধ হলো, যাতে আপনার সঙ্গীরা রাজার বাহিনীকে পরাজিত করল।

এর পর আপনি তিরুচিরাপল্লীতে স্থানান্তরিত হলেন এবং সেখানে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করলেন। এই এলাকা থেকে “মাদুরা” পর্যন্ত বহু মানুষ আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আপনি সেখানেই ৬২২ হিজরি (১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। সেখানকার মানুষ আজও আপনাকে “নাথার ওয়ালী” নামে স্মরণ করে। আপনার মাজার “তিরুচিরাপল্লী”-র একটি বিখ্যাত জিয়ারতগাহ। [১] [২]

সৈয়দ ইব্রাহিম শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

সৈয়দ নাথার রহমাতুল্লাহি আলাইহির উত্তরসূরি সৈয়দ ইব্রাহিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৫৫৮ হিজরিতে (১১৬২ খ্রিষ্টাব্দে) মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। আপনি শরীয়ত ও তরিকতের এক মহান বুজুর্গ ছিলেন। আপনিও দ্বীনের দাওয়াত এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নিয়তে দক্ষিণ ভারতে আসেন এবং পান্ড্য শাসকদের সাথে জিহাদ করে কিছু এলাকা জয় করেন এবং প্রায় বারো বছর এই এলাকায় শাসন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থানীয় রাজা বিজয়ী হলো এবং আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হলেন। [৩]

বাবা ফখরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

সৈয়দ নাথার ওয়ালী রহমাতুল্লাহি আলাইহির আরেকজন উত্তরসূরি ছিলেন বাবা ফখরুদ্দিন কাদেরী সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর পিতা সিস্তানের শাসক ছিলেন কিন্তু তিনি দুনিয়া ত্যাগ করে ফকিরি গ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাবে চলে আসেন। এখানে বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে ছিলেন, কিন্তু ঐশী ইচ্ছায় আপনার জন্য দাক্ষিণাত্যে খেদমত নির্ধারিত ছিল, তাই কিছুকাল পর দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রা করেন এবং অবশেষে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছান।

এখানে আপনি সৈয়দ নাথার ওয়ালী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজ হাসিল করেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এই এলাকায় ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। একটি মন্দিরের পণ্ডিতের সাথে আপনার বিতর্কও হয় যাতে আপনি বিজয়ী হন। এখানে “দুদিকালা” (নাদাফ) গোত্রের বহু মানুষ আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বাবা ফখরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯৩ হিজরিতে (১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন এবং মাদ্রাজ-এর জেলা “অনন্তপুর”-এর শহর “পেনুকোন্ডা”-তে সমাহিত হন। আপনার মাজার সুলতান টিপু নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর খরচের জন্য বারো হাজার বার্ষিক জায়গির নির্ধারণ করা হয়েছিল। [৪]

---

[১] আব-এ-কাউসার: পৃষ্ঠা ৩৫৭ থেকে ৩৬০।

[২] এই মাজারের জন্য একজন হিন্দু রানি মীনাক্ষী এবং আরকোটের নবাব মুহাম্মদ আলী জায়গির ওয়াকফ করেছিলেন। আপনার মাজারের প্রাঙ্গণে নবাব মুহাম্মদ আলী এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দা সাহেবও সমাহিত আছেন। মাজারের গম্বুজ চন্দা সাহেব নির্মাণ করিয়েছিলেন।

[৩] আব-এ-কাউসার: পৃষ্ঠা ৩৫৭ থেকে ৩৬০।

[৪] আব-এ-কাউসার: পৃষ্ঠা ৩৫৭ থেকে ৩৬০।

সৈয়দ আব্দুল কাদির ওলী নাগোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

এই দাঈদের মধ্যে দশম হিজরি শতাব্দীর সৈয়দ আব্দুল কাদির ওলী নাগোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন, যিনি উত্তর ভারতের মানিকপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন করেন।

হজ্জের পর মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা হয়ে দক্ষিণ ভারতে আসেন। তিরুচিরাপল্লীতে সৈয়দ মাজহার ওলী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার জিয়ারত করেন এবং "তাঞ্জোর" অঞ্চলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আপনি "তারাম"-এ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এরপর নাগোর [১]-এ অবস্থান করেন, যা একটি বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

এখানে নিকটবর্তী "ধনা শ্রী" নামক গ্রামের মুখিয়া ও বাসিন্দারা আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৯৭৮ হিজরি (১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) সালে আপনার মৃত্যু হয়। "তাঞ্জোর"-এর রাজা আপনার ভক্ত ছিলেন। আপনার মাজারের মিনারগুলো তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। [২]

খাজা আলাউদ্দিন হুসাইনী চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

এই বুজুর্গও এই অঞ্চলে মারেফাতে ইলাহিয়ার দরস দিতে থাকেন। এই অঞ্চলেরই "ধক্কম কোটা" নামক জনপদে তাঁর মাজার রয়েছে। "তাঞ্জোর"-এর রাজা তাঁর প্রতিও ভক্তি প্রদর্শন করে মাজারের গম্বুজ এবং এর কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। [৩]

দাক্ষিণাত্যের গাজী আউলিয়া

এখন আমরা দক্ষিণ ভারতের সেই অঞ্চলগুলোতে ইসলাম প্রচারের কথা উল্লেখ করছি যা উপকূল থেকে দূরে এবং দাক্ষিণাত্য সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিশাল অঞ্চলে অনেক বুজুর্গ উত্তর ভারত বা উপকূলীয় বন্দরগুলোর মাধ্যমে এসেছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

হাজী রুমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

এই বুজুর্গদের মধ্যে একজন "হাজী রুমী বিজাপুরী" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বংশগতভাবে রুমী ছিলেন এবং এখানে সেই সময়ে তাবলীগের জন্য এসেছিলেন যখন এখানে হিন্দুদের শাসন ছিল। আপনি ৫৩২ হিজরি (১১৩৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন।

সূফী সারমাস্ত রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

অন্য একজন বুজুর্গ সূফী সারমাস্ত রহমাতুল্লাহি আলাইহি (যাঁকে আসাদুল আউলিয়াও বলা হতো) দরবেশদের একটি কাফেলার সাথে আরব থেকে দাক্ষিণাত্যে আসেন এবং "সকর শাহপুর" (হায়দ্রাবাদ রাজ্য)-এ অবস্থান করেন। স্থানীয় রাজা তাঁদের আগমনকে অপছন্দনীয় মনে করে...

---

[১] এখানে নাগোর বলতে রাজস্থানের নাগোর বোঝানো হয়নি।

[২] আব-ই-কাউসার: পৃষ্ঠা ৩৫৭ থেকে ৩৬০।

[৩] আব-ই-কাউসার: পৃষ্ঠা ৩৫৭ থেকে ৩৬০।

ঘোষণা করা হলো যে এই কাফেলার কাছে কোনো খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা যাবে না। পরিশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হলো যাতে রাজা পরাজিত ও নিহত হলেন। শহরবাসীরা সন্ধি করে আপনাকে তাবলিগের অনুমতি দিল। দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে দ্বীন-ই-মুবীনের আলো ছড়াতে থাকলেন। এই সময়ে আপনি আপনার এক মুরিদকে, যাকে 'শেখ শহীদ' উপাধিতে স্মরণ করা হয়, চারজন মুজাহিদের সাথে বিজাপুরের 'তালিকোট' জনপদে পাঠালেন। সেখানকার হিন্দুরা দাওয়াত কবুল করেনি এবং তাদের ওপর আক্রমণ করল। ফলে এই পাঁচজন মুসলমান সেখানেই শহীদ হলেন। এটি ৬৭৭ হিজরীর ঘটনা। দশ বছর পর হযরত সূফী সরমস্ত রহমতুল্লাহি আলাইহি ১৬ সফর ৬৮০ হিজরী (১২৮১ খ্রিষ্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন এবং 'সাগর শাহপুর'-এ দাফন করা হয়। [১]

সৈয়দ হুসামুদ্দিন তেগ বরহনা রহমতুল্লাহি আলাইহি:

সৈয়দ হুসামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি গুলবারগার প্রাথমিক সূফীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সম্ভবত তিনি দাস বংশের শাসনামলে এখানে এসেছিলেন। হাতে খাপমুক্ত তলোয়ার রাখতেন, এজন্য তাঁকে 'তেগ বরহনা' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ৬৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনিও ঐ সকল মুজাহিদ সূফীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা জিহাদের প্রতীক হিসেবে সাথে তলোয়ার রাখতেন। [২]

বাবা শরফুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি - বাবা শাহাবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি:

ঐ সময়েই ইরাক থেকে একজন মহান বুজুর্গ বাবা শরফুদ্দিন ইরাকি [৩] (যিনি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খলিফা ছিলেন) উত্তর ভারতের পথ ধরে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন এবং বর্তমান হায়দ্রাবাদ শহর থেকে চার মাইল পশ্চিমে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থান করে ইবাদত-রিয়াজত এবং দাওয়াত ও হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর ভাই বাবা শাহাবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-ও তাঁর সাথে ছিলেন। এই বুজুর্গদের উত্তম চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতায় হিন্দুরাও প্রভাবিত হয়ে তাঁদের অত্যন্ত সম্মান করতে শুরু করে। বাবা শরফুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি ৬৮৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। চার বছর পর তাঁর ভাই বাবা শাহাবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-ও ইন্তেকাল করেন। উভয়ের মাজারই প্রসিদ্ধ। [৪]

পীর জমনা বিজাপুরী:

পীর জমনা রহমতুল্লাহি আলাইহি সেই প্রাচীন যুগে বিজাপুরে আগমন করেন যখন এখানে হিন্দুদের শাসন ছিল। তবে তাঁর জীবদ্দশাতেই দিল্লির সালতানাতের বাহিনী দাক্ষিণাত্য জয় করে নিয়েছিল। পীর জমনা রহমতুল্লাহি আলাইহি ৭০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। [৫]

---

[১] আব-ই-কাউসার, পৃ. ৩৬০ থেকে ৩৬২।

[২] আব-ই-কাউসার, পৃ. ৩৬০ থেকে ৩৬২।

[৩] মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই শরফুদ্দিন ইরাকি সেই শিয়া দাঈ নন যিনি কাশ্মীরে গিয়ে নূরবখশী মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

[৪] আব-ই-কাউসার, পৃ. ৩৬০ থেকে ৩৬২।

[৫] আব-ই-কাউসার, পৃ. ৩৬০ থেকে ৩৬২।

সৈয়দ আলী শহীদ:

তিনি একজন মুজাহিদ ছিলেন যিনি দাক্ষিণাত্যে ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার সময়ে এসেছিলেন, যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ৭০৫ হিজরিতে শহীদ হন। এর চেয়ে বেশি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। [১]

পীর মা'বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

"বিজাপুর"-এর বুজুর্গ "পীর মা'বারী খন্দায়িত" রহমাতুল্লাহি আলাইহিও সেই সকল বুজুর্গদের একজন ছিলেন যারা প্রাথমিক যুগে এখানে পদার্পণ করেছিলেন। তিনি বংশগতভাবে আরব ছিলেন এবং মা'বার (করমন্ডল) থেকে দাক্ষিণাত্যে এসেছিলেন, তাই তাঁকে মা'বারী বলা হতো। তাঁর দাক্ষিণাত্যে আগমন ৭০৪ হিজরি (১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালে হয়েছিল। সেই সময় আলাউদ্দিন খিলজির হাতে দাক্ষিণাত্য দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছিল। সম্ভবত এই বিজয়ের খবর শুনেই এই বুজুর্গ এখানে ইসলামের বীজ বপন করার জন্য এসেছিলেন। পীর মা'বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি "বিজাপুর"-কে নিজের মেহনতের কেন্দ্র বানিয়ে কাজ করেছিলেন এবং অনেক মানুষকে ইসলামে দাখিল করেছিলেন। [২]

অন্যান্য কয়েকজন মাশায়েখ:

এর পরবর্তী কয়েক দশকে উত্তর ভারত থেকে চিশতিয়া সিলসিলার অনেক বুজুর্গ দৌলতাবাদ এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শহর ও জনপদে এসেছিলেন, ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং সুযোগ বুঝে জিহাদও করেন যাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

- শাহ বদরুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৭৪১ হিজরিতে কোকন জেলার "পারেন্ডা" দুর্গের কাছে জিহাদে শহীদ হন।

- শাহ খুররম কাত্তাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি: তিনি "খানদেশ"-এ কাজ করেছেন এবং ৭৪৩ হিজরিতে এরান্ডোল (খানদেশ)-এ ইন্তেকাল করেন।

- শাহ ওয়ালী ওরফে শাহ ওয়ারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি: তিনি শাহ খুররম কাত্তালের সাথীদের মধ্যে ছিলেন। ৭৪৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর মুম্বাই (বোম্বে) জেলার একটি জনপদ "কোপাল"-এ অবস্থিত। এই জনপদটি খানদেশ রাজ্যের অংশ ছিল।

- শেখ সালাহউদ্দিন ওরফে শেখ মালান চিশতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: তিনি "পুনা"-তে কাজ করেছেন এবং ৭৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

- শেখ সিরাজউদ্দিন জুনাইদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি: দীর্ঘ সময় গুলবারগায় অবস্থান করেন। সুলতান আলাউদ্দিন গাঙ্গু বাহমানী তাঁর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। ৭৮১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৩]

---

[১] আব-এ-কাউসার: পৃ. ৩৬২ থেকে ৩৬৬

[২] আব-এ-কাউসার: পৃ. ৩৬২ থেকে ৩৬৬

[৩] আব-এ-কাউসার: পৃ. ৩৬৪, ৩৬৫; নুযহাতুল খাওয়াতির: পৃ. ১০২, ১

দাক্ষিণাত্যের পরবর্তী যুগের নামকরা মাশায়েখগণ

এখন আমরা দাক্ষিণাত্যের পরবর্তী যুগের এমন মাশায়েখদের কথা উল্লেখ করছি যারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যাদের অবস্থা কিতাবসমূহের মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলনামূলকভাবে বেশি সংরক্ষিত অবস্থায় এবং অধিক বিস্তারিতভাবে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ সেই সময়েই দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন যখন মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি ছেড়ে দৌলতাবাদকে নতুন রাজনৈতিক কেন্দ্র বানিয়েছিলেন। [১] কেউ কেউ এমন আছেন যারা তৈমুরের দিল্লি আক্রমণের পর হিজরত করে দাক্ষিণাত্যে এসেছিলেন।

শেখ মুনতাখাব উদ্দিন হানসভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

শেখ মুনতাখাব উদ্দিন হানসভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে স্থানীয় লোকদের কাছে সাধারণত “জর জরী জর বখশ” বলা হয়। তিনি শেখ জামাল উদ্দিন হানসভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র ভাগ্নে এবং বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ-এ-শকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র মুরিদ ছিলেন। ৬৭৫ হিজরিতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি দিল্লিতে আসেন এবং বিজ্ঞ আলেমদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। এরপর সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র কাছে বায়াত হয়ে খেলাফত লাভ করেন।

মুর্শিদ তাঁকে মুরিদদের একটি বড় জামাতের সাথে সেই সময় দাক্ষিণাত্যে পাঠান যখন এখানে হিন্দুদের শাসন ছিল। তিনি দেবগিরি (দৌলতাবাদ)-এর নিকটবর্তী পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করেন, কারণ তখন এখানে মসজিদের কোনো নাম-নিশানা ছিল না। শুরুতে তাঁকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু তিনি উচ্চ সাহসিকতার সাথে ইসলামের দাওয়াতে মগ্ন থাকেন। এরই মধ্যে আলাউদ্দিন খিলজি দেবগিরি জয় করে নেন এবং তাঁর জন্য কাজ তুলনামূলক সহজ হয়ে যায়। তাঁর হাতে অনেক মূর্তিপূজারী মুসলমান হন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে ৭ই রবিউল আউয়াল ৭০৯ হিজরি (১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। সেখানে তাঁর মাজার প্রসিদ্ধ। [২]

শেখ বুরহান উদ্দিন গরিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

শেখ মুনতাখাব উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র ইন্তেকালের কয়েক বছর পর সুলতানুল মাশায়েখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ভাই শেখ বুরহান উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে দৌলতাবাদ যাওয়ার নির্দেশ দেন। [৩]

---

[১] যদিও মুহাম্মদ তুঘলক কয়েক বছর পর দিল্লিতে ফিরে গিয়েছিলেন, তবে দৌলতাবাদ এবং দক্ষিণ ভারতের জৌলুস বাড়তেই থাকে।

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৪

[৩] এই দুই ভাইয়ের মাজার পাশাপাশি অবস্থিত। এই স্থানটি খুলদাবাদ নামে পরিচিত, যেখানে সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগীর, নিজামুল মুলক আসাফ জাহ, আমির হাসান দেহলভি এবং মীর গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামীর মাজারও রয়েছে।

শেখ বুরহান উদ্দিন গরীব রহমাতুল্লাহি আলাইহি

শেখ বুরহান উদ্দিন গরীব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আসল নাম ছিল মুহাম্মদ বিন মাহমুদ। বুরহান উদ্দিন ছিল তাঁর লকব। তিনি ৬৫৪ হিজরিতে হাসিতে জন্মগ্রহণ করেন। উলুম ও ফুনুন (জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা)-এ পূর্ণতা অর্জনের পর ৬৯৩ হিজরিতে তিনি হযরত সুলতান জী-এর তত্ত্বাবধানে আসেন এবং মুজাযে বায়আত হন। মুর্শিদের জীবদ্দশায় তিনি দিল্লিতেই অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন দ্বীনের অনেক বড় আলেম, মুহাদ্দিস ও ফকিহ।

সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল মুহাম্মদ তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাস আগে হয়েছিল এবং তিনি দৌলতাবাদকে নতুন রাজধানী করার ঘোষণা দেননি, তবে সেখানে নির্মাণ কাজ চলছিল। সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ঈমানি দূরদর্শিতা দিয়ে সময়ের চাহিদা বুঝে নিয়েছিলেন। তাই তিনি শেখ বুরহান উদ্দিন গরীব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [১]

শেখ বুরহান উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বয়স তখন একাত্তর (৭১) বছর ছিল। তিনি পালকিতে চড়ে এমন শান-শওকতের সাথে সফর করেন যে, সাতশ মুরিদ তাঁর সাথে ছিলেন। এই ঘটনা দাক্ষিণাত্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে এতটাই প্রসিদ্ধ হয়েছিল যে, একে ‘পালকির আগমন’ বলে স্মরণ করা হয়। শেখ বুরহান উদ্দিন দাক্ষিণাত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। রাজপরিবার শেষ পর্যন্ত আপনাকে শ্রদ্ধা করত। ‘বুরহানপুর’ নামক বিখ্যাত শহরটি আপনার এক ভক্ত বাদশাহ আপনার নামেই আবাদ করেছিলেন। [২]

শেখ আইন উদ্দিন বিজাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

আপনি ৭০৬ হিজরিতে দিল্লির নিকটবর্তী নূহ নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লিতেই শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেন। এরপর গুজরাট হয়ে দৌলতাবাদে আসেন এবং এখানে আরও শিক্ষা অর্জন করতে থাকেন। ৭৩০ হিজরিতে শিক্ষা সমাপ্ত করে আইনাবাদে স্থানান্তরিত হন। আপনি গ্রন্থ রচনা, সংকলন এবং দাওয়াত ও ইরশাদের কাজে নিমগ্ন থাকেন। আপনার ইলমি কামালিয়াতের কারণে আপনাকে ‘গঞ্জ-এ-উলুম’ (জ্ঞানের ভাণ্ডার) বলা হতো।

আপনি ৭৭২ হিজরিতে বিজাপুরে আসেন এবং এখানেও শিক্ষা-দীক্ষা ও গ্রন্থ রচনার কাজ চালিয়ে যান। আপনি প্রায় একশ ত্রিশটি কিতাব ও রিসালা লিখেছেন, যার মধ্যে ‘তওরুল আবরার’, ‘মুলহাকাত-এ-তবকাতে নাসিরি’ এবং ‘রিসালাতুল আনসাব’ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যের শাসকরা আপনার অনেক বড় কদরদান ছিলেন। আপনি যখন দাক্ষিণাত্যের প্রথম বাদশাহ সুলতান আলাউদ্দিন হাসান বাহমানীর দরবারে যেতেন, তখন বাদশাহ সিংহাসন থেকে উঠে কয়েক কদম এগিয়ে এসে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। ৭৯৫ হিজরিতে আপনার ইন্তেকাল হয়। উজির-এ-সালতানাত খাজা মাহমুদ গাওয়ান আপনার মাজারে গম্বুজ নির্মাণ করিয়েছিলেন যা আজও বিদ্যমান। [৩]

সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইনী বন্দা নেওয়াজ গেসুদরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

গুলবার্গা শহরকে প্রকৃতপক্ষে তাসাউফ ও মারেফাতে ইলাহিয়ার কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন হযরত খাজা গেসুদরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আপনার নাম ছিল মুহাম্মদ। আপনি ছিলেন হুসাইনী সৈয়দ। ৭২১ হিজরিতে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। চার-পাঁচ বছর বয়সে আপনার পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ (ওরফ

---

[১] ধারণা করা হয় যে, শেখ বুরহান উদ্দিন গরীবের দৌলতাবাদে যাত্রা সেই সময়ে হয়েছিল যখন সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক মানুষকে সেখানে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সফরের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেছিলেন।

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০২।

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৩; আপ-এ-কাউসার, পৃষ্ঠা ৩৬৫, ৩৬৬।

https://t.me/BoierSomahar

শাহ রাজু কত্তাল (তার পিতা) তার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে দৌলতাবাদে চলে গিয়েছিলেন কারণ সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের এমনই নির্দেশ ছিল। খাজা গেসুদরাজ (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা তার শ্রদ্ধেয় পিতার নিকট থেকেই অর্জন করেন। তার বয়স যখন দশ বছর তখন তার পিতা ইন্তেকাল করেন। কিছুকাল তিনি তার মামা সৈয়দ ইব্রাহিমের নিকট অবস্থান করেন, যিনি সালতানাতে বড় পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে মালিকুল উমারা নামে পরিচিত ছিলেন। পাঁচ বছর পর তার মা ও মামার মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয় এবং তার মা তাকে নিয়ে দিল্লিতে চলে আসেন।

দিল্লিতে তিনি কাজী আব্দুল মুকতাদির থানেসারি (রহ.)-এর মতো আলেমদের নিকট থেকে বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এরপর আধ্যাত্মিক ফয়েজ হাসিলের জন্য হযরত চেরাগ দেহলভি (রহ.)-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। হযরত চেরাগ দেহলভি (রহ.) ৭৫৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে খাজা গেসুদরাজ (রহ.)-কে খেলাফত দান করেন।

এরপর তিনি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় দিল্লিতেই অবস্থান করেন, কিন্তু ৮০১ হিজরিতে তৈমুরি আক্রমণের ফলে দিল্লি ধ্বংস হওয়ার পর তিনি দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন। গোয়ালিয়র, চান্দেরি এবং বরোদা হয়ে তিনি খাম্বাত পৌঁছান। গুজরাটে কিছুকাল অতিবাহিত করে তিনি দৌলতাবাদে তশরিফ আনেন। এখান থেকে তিনি গুলবার্গা (কর্ণাটক) অভিমুখে যাত্রা করেন, যা সেই সময় বাহমানি সুলতানদের রাজধানী ছিল।

গুলবার্গের শাসকরা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তিনি গুলবার্গাতেই বসবাস শুরু করেন। দাক্ষিণাত্যে মারেফাতের মজলিস জমে ওঠে এবং আল্লাহর সৃষ্টি চারদিক থেকে তার কাছে সমবেত হতে থাকে। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দুই দশক ধরে তার থেকে উপকৃত হন। তিনি একশ চার বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। জ্ঞান ও মারেফাতের আলোয় দাক্ষিণাত্যকে আলোকিত করার পর ৮২৫ হিজরিতে (১৪২২ খ্রি.) তিনি ইন্তেকাল করেন। গুলবার্গাতেই তার মাজার অবস্থিত যা বাহমানি সুলতান আহমদ শাহ আউয়াল নির্মাণ করেছিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তার বড় প্রভাব ছিল। হিন্দু পণ্ডিত ও যোগীদের সাথে তার বিতর্ক হতো এবং তিনি সর্বদা তাদের নিরুত্তর করে দিতেন। সাধারণত হিন্দু ধর্মীয় নেতারা পরাজয় স্বীকার না করে কোনো না কোনো বাহানা করে সটকে পড়তেন। এমন কিছু বিতর্কের উল্লেখ তার 'মালফুজাত'-এ পাওয়া যায়।

তিনি তাসাউফ ও ত্যাগের জগতের সুলতান হওয়ার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য ও রচনার জগতেরও সম্রাট ছিলেন। হিন্দুস্তানের চিশতিয়া সুফিদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের দিকে মনোযোগ দেন। তার পূর্বে চিশতিয়া বুজুর্গদের শিক্ষা কেবল 'মালফুজাত' আকারেই পাওয়া যায়। হযরত গেসুদরাজ (রহ.)-এর যুগে আমরা এই পরিবর্তন দেখতে পাই যে মাশায়েখগণ গ্রন্থ রচনার দিকে মনোনিবেশ করছেন। সেই সময়েই শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরী (রহ.) কলম ধরেছিলেন। অন্যদিকে বাংলায় নূর কুতুব আলম (রহ.) এবং কাশ্মীরে মীর সৈয়দ আলী হামদানি (রহ.)-ও কিছু রিসালা লিখছিলেন।

যাই হোক, চিশতিয়া সিলসিলায় হযরত সৈয়দ গেসুদরাজ (রহ.)-ই প্রথম প্রচুর পরিমাণে কিতাব ও রিসালা রচনা করেন। তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আধ্যাত্মিক তাফসির লেখেন। তিনি শরাহ রচনার ধারা শুরু করেন; তিনি ফুসুসুল হিকাম, ফিকহুল আকবর এবং আওয়ারেফুল মাআরিফ-এর শরাহ রচনা করেন। আদাবুল মুরিদিন এবং আসমাউল আসরারও তার বিখ্যাত কিতাব যা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একজন ভালো কবিও ছিলেন।

...এবং আপনার ফারসি দিওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। আপনার পত্রাবলি এবং মালফুজাতও মুদ্রণের মাধ্যমে সুশোভিত হয়েছে। [১]

মাওলানা শামসুদ্দিন খুরাসানি ধারাসুনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

মাওলানা শামসুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন বড় শায়খ, আলেম এবং ফকিহ ছিলেন। আপনার জন্ম খুরাসানে হয়েছিল। যখন বয়স আঠারো বছর হলো তখন আপনার পিতার ইন্তেকাল হয়। আপনি নিজের দেশ থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তানে চলে আসেন। ইলম অর্জন করে আপনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এখানে সরকারি দপ্তরে কাজ করেন।

এরপর আপনি দিল্লিতে সুলতানুল মাশায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পৌঁছান এবং তাঁর থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভ করেন। এরপর আপনি হিজাজ সফর করেন, হজ পালন করেন, রওজা-এ-আতহার জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন।

এখন আপনি দাক্ষিণাত্যের ধারাসুন অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে নিজের ফয়েজ ছড়াতে থাকেন। আপনি উচ্চ আধ্যাত্মিক মাকাম ও কারামতের অধিকারী ছিলেন। আপনার ইন্তেকাল ৭৩০ হিজরিতে হয়। মাজার "ধারাসুন"-এই অবস্থিত। [২]

কাজি ইব্রাহিম বিন ফাতহুল্লাহ মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

কাজি ইব্রাহিম মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্পর্ক ঘুরি গোত্রের সাথে ছিল। তিনি ফিকহ, উসুলে ফিকহ এবং আরবি ভাষার বিশিষ্ট আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেন। প্রখ্যাত আলেমদের নিকট থেকে ইলম শিক্ষা করে দক্ষিণ ভারতে চলে আসেন।

আপনি দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান علاؤ الدين (আলাউদ্দিন) বাহমানির যুগে "বিদর" শহরে এসে অবস্থান করেন এবং সুলতানের নৈকট্য লাভ করেন। যখন সুলতান ইন্তেকাল করেন তখন আপনি তাঁর দুই পুত্র: নিজাম শাহ এবং মুহাম্মদ শাহ-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন।

মুহাম্মদ শাহ-এর যুগে আপনাকে বিদর শহরের কাজি নিযুক্ত করা হয় এবং এভাবে আপনি দাক্ষিণাত্যের সবচেয়ে বড় কাজি হয়ে যান। আপনি জুহদ, ইবাদত, পরহেজগারি এবং শরিয়তের পাবন্দির সাথে একটি সুখী জীবন অতিবাহিত করেন। আপনার ইন্তেকাল ৭ই জমাদিউল আখিরা ৮৬৫ হিজরিতে বিদরে হয় এবং আপনি সেখানেই সমাহিত হন। আপনি বেশ কিছু কিতাবও রচনা করেছেন, যার মধ্যে আরবিতে লেখা "মাআরিফুল উলুম"-ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে বিভিন্ন ইলম ও ফনের (বিদ্যা) সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। আপনার যোগ্য ও গুণী সন্তানদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হন। [৩]

মোদ্দাকথা, এঁরা ছিলেন সেই সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁদের ঈমানি তেজ, ইলমি দক্ষতা, নিরবচ্ছিন্ন মেহনত এবং শেষ রাতের রোনাজারির কারণে হিমালয়ের চূড়া থেকে গুজরাটের বন্দরসমূহ এবং দাক্ষিণাত্যের জনপদ পর্যন্ত দ্বীন-এ-মুবিনের প্রচার-প্রসার হয়েছে এবং কয়েক শতাব্দীতে ইসলাম এই অঞ্চলের রূহ ও দেহের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, ইনশাআল্লাহ এই অঞ্চল থেকে একে মুছে ফেলা কখনোই সম্ভব হবে না।

---

[১] আব-এ-কাউসার: পৃ. ৩৬৬ থেকে ৩৭১; হায়াতে বান্দা নেওয়াজ, আজ আহমদ ইদ্রিস কাদরি

[২] নুজহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ২, পৃ. ১৬৫, ১৬৬

[৩] নুজহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৩, পৃ. ২২৭

সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরী এবং মহদভী ফেরকা

মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় সত্তর বছর আগে মুসলিম হিন্দুস্তান রাজনৈতিকভাবে আগের মতো শক্তিশালী ছিল না এবং সেখানে দিল্লির লোদিদের শাসনের পাশাপাশি পূর্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আলাদা আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে মুসলিম হিন্দুস্তান সামগ্রিকভাবে নির্মাণ ও উন্নতির ক্ষেত্রে বিশ্বের বড় বড় সালতানাতগুলোর চেয়ে এগিয়ে ছিল। তাহজিব ও তামাদ্দুনের বৈচিত্র্যে এটি একটি ঈর্ষণীয় অবস্থানে ছিল। দেশের কোনো প্রকার বাহ্যিক বিপদের আশঙ্কা ছিল না। চারদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতি ছিল। শিল্প-কারখানা, অর্থনীতি ও বাণিজ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে এটি ছিল যেন এক পার্থিব জান্নাত।

ইতিহাস বলে যে, দুনিয়াতে যখনই কোনো বড় সালতানাত পার্থিব উন্নতির এমন উচ্চ শিখরে পৌঁছায়, তখন তাতে অনেক আত্মিক ব্যাধি জন্ম নিতে শুরু করে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাধি হলো ধন-সম্পদ ও পদের মোহ। এর পাশাপাশি ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য মানুষকে লালসার সাগরে ডুবিয়ে দেয়। যদিও এই লালসা চরিতার্থ করার উপায়গুলো বৈধও হয়, তবুও সেগুলোতে নিমগ্নতা ও মগ্নতা কোনো জাতির পতনের জন্য যথেষ্ট হয়। কারণ এর ফলে জাতির মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ মনোবল বিলুপ্ত হয়ে যায়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত এবং ইসলামী আন্দালুস এর স্পষ্ট উদাহরণ।

এখানেও পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা, মানসিক প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা এবং উদাসীনতা মুসলমানদেরকে, যারা এই দেশের শাসক ছিল, আরাম-আয়েশের দিকে ধাবিত করেছিল এবং তাদের একটি বড় অংশ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। বাকি সাধারণ মানুষের মধ্যেও বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রবণতা বাড়ছিল। যদিও দেশ আল্লাহওয়ালাদের থেকে শূন্য ছিল না, মাদরাসা ও মক্তব স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, জিহাদের জজবাও শেষ হয়নি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কল্যাণ ও ইসলামের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এখানে রাজনৈতিক পদাধিকারী এবং সম্পদের মালিকদের মধ্যে দুনিয়াপূজারী ও স্বার্থপরদের একটি বড় দল তৈরি হয়েছিল। এই লোকেরা ধন-সম্পদ, জায়গির, সরকারি খেতাব ও সম্মান এবং লালসা ও কামনা পূরণের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিল এবং ইসলামী শিক্ষা, শরীয়তের মূল্যবোধ ও মানবতার তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব ছিল না।

যখন কোনো সমাজ এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন কিছু অস্থির ও সংবেদনশীল আত্মা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শাসক শ্রেণীর কথা ও কাজের বৈপরীত্যের দৃশ্য তাদের বিচলিত করে এবং দেশ ও জাতির সংস্কারের আবেগ তাদেরকে চিন্তিত ও ব্যথিত করে তোলে। এই অবস্থা তাদেরকে নিত্যনতুন চিন্তা ও পরিকল্পনার দিকে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কিছু লোক ইবাদত ও রিয়াযত, মেধা ও প্রজ্ঞা, ত্যাগ ও কোরবানি এবং নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার যোগ্যতার দিক থেকে অসাধারণ হয়ে থাকেন এবং তারা নিজেদের পরিকল্পনাকে...

ব্যবহারিক রূপ দিতে শুরু করেন। তারপর যদি আল্লাহ তাআলার তাওফিক সাথে থাকে, তবে তারা মিল্লাতের জন্য অনেক বড় কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ান।

কিন্তু কখনো কখনো এমনও হয় যে, এ ধরনের কোনো ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমস্ত গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও মেজাজের ভারসাম্য থাকে না, ফলে তিনি চরমভাবে কোনো এক দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিশেষ করে যখন কোনো দ্বীনি আন্দোলনে রাজনৈতিক রঙ এবং বিপ্লবী সংকল্পও যুক্ত হয়, তখন বিরোধীদের ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে।

সাধারণত বিজয় ও সফলতা তারই পদচুম্বন করে, যে এই ময়দানে শরয়ি ও নৈতিক দিক থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে ভারসাম্য বজায় রাখে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি মাঝেমধ্যে চরমপন্থার শিকার হয়, অথবা তার চেয়েও বড় কথা—নিজের মেজাজের উগ্রতার কাছে বন্দী হয়ে পড়ে, সে তার সমস্ত গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়। যদিও এ ধরনের ব্যক্তিত্ব বাহ্যিকভাবে এক বিশাল জনতাকে নিজের সাথে নিয়ে নেয় এবং হাজার হাজার অস্থির আত্মা তার সাথে সুর মেলায়, কিন্তু এই লোকদের অস্বাভাবিক ভক্তির কারণে আন্দোলনের প্রধান এক বিশেষ ধরনের "পবিত্রতা" লাভ করেন। কখনো কখনো এমনও হয় যে, আন্দোলনের প্রধান এই "কৃত্রিম পবিত্রতার" পরিবেশ বাহ্যিকভাবে পূর্ণ ইখলাসের সাথে কিন্তু ভেতরে চরম ধূর্ততার সাথে তৈরি করেন। এই পরিস্থিতি তখন আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যখন আন্দোলনের প্রধান ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানে সামান্য জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ হিসেবে জাহির করেন। এভাবে তাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরয়ি দলিল (হুজ্জাত) হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। এরপর প্রায়ই দেখা যায় যে, এ ধরনের নেতার ইসলামি দাওয়াত ঘরের ভেতরে একটি অত্যন্ত লাভজনক অর্থনৈতিক ব্যবসায় পরিণত হয় এবং একটি সীমিত গণ্ডির (তা লাখো মানুষের হলেও) বাইরে আর এগোতে পারে না। অনেক খানকাহ ও আধ্যাত্মিক গদি এর উদাহরণ।

কিন্তু এর চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি তখন তৈরি হয় যখন আন্দোলনের প্রধান সংস্কারমূলক দাওয়াতের ছদ্মবেশে এক ধরনের বিদ্রোহী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে যান এবং অন্যদের সমালোচনা করে করে নিজের মুরিদদের উদ্দীপনা ও উত্তেজনা এতটাই বাড়িয়ে দেন যে, তারা কারো কথা শোনা তো দূরের কথা, কাউকে অবশিষ্ট দেখাও সহ্য করতে পারে না এবং চরমপন্থার শিকার হয়ে শুধু বিভিন্ন সরকারের সাথে প্রকাশ্য মোকাবিলায় লিপ্ত হয় না, বরং বিভিন্ন শ্রেণীকে (উলামা, মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী, শিল্প ও পেশাজীবী ইত্যাদি) নিজের প্রতিপক্ষ মনে করতে শুরু করে। এই ভিত্তিতে এ ধরনের আন্দোলনগুলো তাদের কর্মীদের দৃঢ় বিশ্বাস ও ইখলাস, বিনয় ও অনুশোচনা, ইবাদত ও সাধনা এবং আত্মত্যাগ ও কুরবানির শিক্ষা দিতে দিতে তাদের বাকি উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবে আন্দোলনের প্রধান কখনো কখনো নিজের জীবদ্দশাতেই উম্মতের জন্য (সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে) একটি নতুন ফিতনার দরজা খুলে দিয়ে যান, যা কয়েক দশক এমনকি কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সীমাহীন ক্ষতির কারণ হতে থাকে।

এ ধরনের আন্দোলনগুলো তখন আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন তারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পায় না। এমন অবস্থায় তারা বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে সংশয়ের অদেখা পথে পথভ্রষ্ট হতে থাকে। আন্দোলনের প্রতিটি নতুন নেতৃত্ব পূর্ববর্তীদের চেয়েও বেশি চরমপন্থী হয়ে ওঠে। তারা বাড়াবাড়ি (গুলু) ও চরমপন্থার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা কলুষিত সমাজকে সংশোধন...

করতে একেবারে ব্যর্থই থাকে না বরং শুধু বিভ্রান্তিকর এবং রাজনৈতিক দিক থেকে আরও বেশি বিপজ্জনক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হয়ে পড়ে, বরং বিশ্বাস ও মতাদর্শকেও অনেক সময় ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। কারণ এর নেতৃত্বকে এমন মনে হয় যে, যে ইসলামের ওপর সে আমল করছে, তাকে পরিবর্তন না করে সে তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে না। এমন আন্দোলনের কর্ণধাররা পুরনো মতাদর্শে কখনও আংশিক আবার কখনও মৌলিক পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, যার ফলে আন্দোলনে একটি নতুন ফেরকা এবং কখনও কখনও একটি নতুন দ্বীনের রূপ ধারণ করে। আমরা ইতিহাসের এই সমস্ত পর্যায়গুলোতে শুধু প্রাচীন রাওয়াফিজ, মুতাজিলা এবং নাওয়াসিবের উত্থান ও বিকাশই দেখতে পাই না, বরং বর্তমান যুগের খারেজি এবং অন্যান্য বিদআতি ফেরকাগুলোর মধ্যেও উল্লিখিত ধারাবাহিকতা স্পষ্টভাবে নজরে আসে। এই সবই সংস্কার এবং প্রকৃত ইসলামী দাওয়াতের নামে অস্তিত্বে এসেছে এবং উম্মতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর আবির্ভাব:

অতঃপর যখন হিন্দুস্তান বাহ্যিকভাবে সম্পদশালী, সুখী ও শান্ত ছিল, তখন এর ইসলামী কাঠামোর ভেতরেই ভাঙাগড়ার এক প্রক্রিয়া চলছিল। ইসলামী সমাজের আকিদা এবং বাহ্যিক জীবনের মধ্যে পূর্ণ মিল না দেখে কিছু অস্থির আত্মা মোড় নিল এবং কিছু করার জন্য কোমর বাঁধল। তাদেরই একজন বুজুর্গ ছিলেন সৈয়দ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, যাকে সাধারণত সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরী বলা হয়। নবম ও দশম হিজরি শতাব্দীতে সম্ভবত অন্য কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর এমন প্রভাব ফেলেননি। কত সুলতান, ধনকুবের এবং বড় বড় অভিজাত ব্যক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত ও অনুরক্ত হয়েছিলেন। হাজার হাজার মানুষ তার দাওয়াতের কারণে দুনিয়াবি ভোগবিলাস ত্যাগ করে তার অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। গুজরাটে তার এমন কেন্দ্র ছিল যা মুরিদদের ভিড়ে পূর্ণ থাকত যারা নিজেদের শহর ছেড়ে তার সান্নিধ্যে চলে এসেছিল।

সৈয়দ মুহাম্মদের জন্ম ৮৪৭ হিজরিতে জৌনপুরে হয়েছিল, যা সেই সময় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল এবং একে পূর্বের সালতানাত বলা হতো। কিন্তু এই সময়টি ছিল এই মহান সালতানাতের পতনের সময়। সৈয়দ মুহাম্মদের চোখের সামনেই এখানকার শেষ সুলতান হোসেন শাহকে লোদি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদি একের পর এক পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেন, যার ফলে ৮৯৯ হিজরিতে (১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে) এই সালতানাত বিলুপ্ত হয়ে যায়। জৌনপুরের অন্যান্য মানুষের মতো সৈয়দ মুহাম্মদের জন্যও সম্ভবত এই ঘটনাটি জীবনের সবচেয়ে গভীর ক্ষত ছিল।

সৈয়দ মুহাম্মদের শিক্ষা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হলো যে, তিনি শৈশবেই কুরআন মাজিদ হিফজ করেছিলেন। যেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার দক্ষতার প্রশ্ন, 'নুজহাতুল খাওয়াতির'-এর লেখক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দরস ও তাদরীসের (শিক্ষাদান) সাথে যুক্ত ছিলেন, এমনকি ইলমি মহলে তাকে 'আসাদুল উলামা' বলা হতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, তার অবস্থার বর্ণনায় আমরা এটি খুঁজে পাই না যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে (তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি) তার উস্তাদ কারা ছিলেন? তিনি কী পড়াতেন? ইলমের কোন শাখায় তার বিশেষ দক্ষতা ছিল? তার ইলমি যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে তার কোনো রচনার নামও পাওয়া যায়নি।

সেই যুগের কোনো নিরপেক্ষ আলেমের পক্ষ থেকে তার ইলমি মাকাম বা অবস্থানের কোনো সত্যায়ন পাওয়া যায়নি। একইভাবে আধ্যাত্মিক সিলসিলার ক্ষেত্রেও সেই যুগের নামকরা আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে তার ফয়েজ হাসিলের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

https://t.me/BoierSomahar

পারল না। শুধু এটুকুই জানা যায় যে, তিনি বলখ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত একজন সুফি বুজুর্গ শেখ দানিয়াল বিন হাসান উমরির কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং শেখ তাকে নিজের খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। (এই শেখও অজ্ঞাতপরিচয় ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই।)

যখন সৈয়দ মুহাম্মদের চারপাশে অনুগতদের একটি বলয় তৈরি হলো, তখন তিনি নিজের পরিবার-পরিজন ও মুরিদদের নিয়ে জৌনপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং মরুচারিতা শুরু করলেন। বন-জঙ্গল, পাহাড় ও গুহায় জীবন কাটাতে লাগলেন এবং নির্জনে থেকে কঠোরতম মুজাহাদা ও আওরাদের চর্চা শুরু করলেন। একটি পুরো জামাতের সাথে বনে বনে ঘুরে বেড়ানো ছিল এক অদ্ভুত ও অসাধারণ মুজাহাদা, যার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া তাঁর জীবন ছিল সরলতা ও যুহদ-এর বাস্তব নমুনা। সফর ও অবস্থানে পানাহারের প্রতিটি বস্তু সকল মুরিদদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হতো। স্বয়ং তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য কোনো বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এমন চরিত্রে প্রতিটি মানুষই প্রভাবিত হতো। তিনি দুনিয়ার সাজসজ্জার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে মুনকারাত বর্জন, দরবেশপনা এবং ফকর ও যুহদ-এর দাওয়াত দিতেন। তাঁর দাওয়াত পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ছিল:

- দুনিয়া ত্যাগ
- সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্নতা
- স্বদেশ ত্যাগ
- শেখের সান্নিধ্য
- সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির [১]

মেহেদী হওয়ার দাবি এবং তার প্রতিক্রিয়া:

সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুর সালতানাতের পতনে অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। তিনি এই ঘটনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, দুনিয়ার সমাপ্তি, মাহদীর আবির্ভাব এবং ঈসা (আ.)-এর অবতরণের সময় এখন নিকটবর্তী। এই দুঃখ ও শোকের অবস্থায় একদিন তাঁর ওপর এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, তাঁর মনে হলো যেন আকাশ থেকে তাঁকে 'মাহদী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। [২]

ফলে তিনি মাহদী হওয়ার দাবি করে বসলেন। সম্ভবত ইলমি গভীরতার অভাবের কারণে এই গুরুতর ভুলটি সংঘটিত হয়েছিল। যেখানেই এই খবর ছড়িয়ে পড়ল, সেখানে প্রশ্ন ও সন্দেহ-সংশয় ছড়িয়ে পড়া অনিবার্য ছিল। সৈয়দ মুহাম্মদও সম্ভবত সময়ের পরিস্থিতি বুঝে নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পুনরায় এই দাবির পুনরাবৃত্তি করেননি।

তিনি মালব রাজ্যের 'চান্দেরি' শহরে গেলে তাঁর ওয়াজের ব্যাপক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। জিকির ও ইবাদত এবং মুজাহাদা ও রিয়াজত এবং যুহদ ও কানায়াত-এর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক চর্চা হতে লাগল। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী দাবির কারণে শহরের উলামায়ে কেরাম তাঁর বিরোধিতা শুরু করেন, যার ফলে তিনি এই শহর ছেড়ে মালবের রাজধানী 'মান্ডু'-তে চলে যান। সেখানে তাঁর এমন শোরগোল পড়ে গেল যে, রাজ্যের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন শাহ খিলজিও তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন।

এরপর তিনি গুজরাট রাজ্যে চলে আসেন এবং চম্পানিরে ওয়াজের মজলিস কায়েম করতে শুরু করেন। তাঁর ওয়াজগুলোতে তরিকতের পাশাপাশি শরিয়তের ওপর অবিচল থাকার তাগিদও থাকত। এখানেও এক বিশাল সৃষ্টি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল। সুলতান মাহমুদ শাহ বেগড়াও তাঁর মজলিসে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, কিন্তু স্থানীয় উলামায়ে কেরাম সৈয়দ মুহাম্মদের ওপর কঠোর আপত্তি জানিয়ে তাঁকে এই পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখেন।

এখন সৈয়দ মুহাম্মদ বুরহানপুর ও দৌলতাবাদ হয়ে আহমদনগর চলে এলেন। এখানকার শাসক নিজাম শাহও তাঁর অনেক

---

[১] নুজহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১৭, ৩১৮

[২] তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, মাওলানা জাকাউল্লাহ দেহলভি: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫৯

খাতির-যত্ন করা হলো। সামনে এগিয়ে আহমেদাবাদ পৌঁছালে মোল্লা জিয়া এবং কাজী আলাউদ্দিনের মতো নামী-দামী আলেমগণ তাঁর অনুসারী হয়ে গেলেন।

তাঁর বাগ্মিতা ছিল অদ্ভুত এবং ব্যক্তিত্বে ছিল ব্যাপক প্রভাব। তাঁর খুতবা শোনার জন্য শত শত মানুষ জমা হতো এবং বায়আত হয়ে তাঁর কাফেলার অংশ হয়ে যেত। তিনি যখন দাক্ষিণাত্যের 'গুলবার্গা' অঞ্চলে গেলেন, তখন সেখানে এক বিশাল জনসমুদ্র তাঁর কাছে বায়আত হওয়ার জন্য ভেঙে পড়ল, কয়েকশ মানুষ মুরিদ হয়ে তাঁর কাফেলায় শামিল হয়ে গেল। তাঁর খ্যাতি পুরো হিন্দুস্তানে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিছুকাল পর তিনি হিজাজে মুকাদ্দাসের সংকল্প করলেন এবং মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে ৯০১ হিজরিতে দ্বিতীয়বার মাহদী হওয়ার দাবি করলেন এবং সেই সাথে এও বললেন: "যে আমার অনুসরণ করবে, সে মুমিন।" তাঁর মুরিদদের মধ্যে শেখ নিজাম এবং কাজী আলাউদ্দিনের মতো ব্যক্তিরা শামিল হয়ে গিয়েছিলেন যারা সর্বপ্রথম এই দাবির সত্যায়ন করেছিলেন।

এরপর তিনি পুনরায় হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন এবং গুজরাটে অবস্থান করেন। এখানে তাঁর প্রতি মানুষের ঝোঁক এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তা বর্ণনাতীত। ৯০৩ হিজরিতে তিনি এক মজলিসে প্রকাশ্যে নিজের মাহদী হওয়ার ঘোষণা দেন।

শাহ মাহমুদ বেগড়া এই খবরের সত্যায়ন করার পর আলেমদের ফতোয়া অনুযায়ী তাঁকে দেশান্তর করে দেন। তিনি বিভিন্ন শহর ও জনপদ হয়ে পাটান পৌঁছান। প্রতিটি স্থানেই মানুষ তাঁর চারপাশে জমা হতে থাকে। পাটান থেকে কিছু দূরে এক মজলিসে তিনি চতুর্থবার মাহদী হওয়ার দাবি করেন এবং সেই সাথে এও বলেন: "যে মানবে না সে কাফের।" [১]

দ্বীনি আলেমগণ এটি দেখে তাঁকে সেখান থেকেও চলে যেতে বাধ্য করেন। সিন্ধু পৌঁছালে এক বিখ্যাত আলেম শেখ সদরুদ্দিন সিন্ধি তাঁর সাথে মুনাজারা করেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হয়ে নিজের অনুসারীসহ তাঁর মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। [২]

সিন্ধুর কিছু শহরে তাঁর চারপাশে এত মানুষ জমা হয়েছিল যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সিন্ধুর ওয়ালি এই অবস্থা দেখে তাঁকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু কিছু দরবারী মাঝখানে পড়ে সুপারিশ করেন এবং অবশেষে তাঁকে আফগানিস্তানের দিকে দেশান্তর করে দেওয়া হয়। ওই সময় তাঁর কাফেলায় আটশ জন লোক ছিল।

কান্দাহার পৌঁছালে সেখানেও এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শহরের হাশেম মির্জা শাহ বেগ জামে মসজিদে তাঁর ওয়াজের ব্যবস্থা করেন। সৈয়দ মুহাম্মদ ওয়াজের সময় নিজেও কাঁদলেন এবং উপস্থিতদেরও কাঁদালেন। ওয়াজের প্রভাবে হাশেমও তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন।

কিন্তু যখন তাঁর কাফেলা সামনে এগিয়ে চলল, তখন 'ফারাহ'-এর হাশেম জুলনুন তাঁদের আটকে দিলেন এবং খোরাসানের সুলতান শাহ হোসেনকে পত্র পাঠিয়ে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এটি সমাধানের অনুরোধ জানান। সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরী তাঁর সাথীদের নিয়ে সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। নয় মাস এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কেটে গেল এবং অবশেষে ওই স্থানেই সৈয়দ মুহাম্মদের ইন্তেকাল হয়। এটি ৯১০ হিজরি (১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা।

এরপর তাঁর খলিফাগণ তাঁর দাওয়াত নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং হিন্দুস্তান থেকে খোরাসান পর্যন্ত নিজেদের মতাদর্শ...

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৭ থেকে ৩৪৯

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫৬

ছড়াতে লাগলেন। নুযহাতুল খাওয়াতির-এর লেখক বলেন যে, এই লোকেরা সমস্ত বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতোই, তবে পার্থক্য হলো তারা সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীকে মাহদী মনে করে এবং এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে। [১]

এই আন্দোলনের প্রভাব:

সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে চিন্তা করলে এটি না মেনে উপায় নেই যে, এর ফলে উপমহাদেশে ইসলামের আসল রূপ সংশোধিত হওয়ার পরিবর্তে আরও বিগড়ে গেছে। সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরী যে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন, তা তো সংঘটিত হয়নি বরং একটি নতুন ফিতনার দরজা অবশ্যই খুলে গেছে। (লেখক তাকে মুখলিস এবং নেক নিয়ত সম্পন্ন মনে করেই এ কথা বলছেন। ওয়াল্লাহু আলাম।)

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সৈয়দ মুহাম্মদ যদি মুখলিস হয়ে থাকেন, তবে কোন জিনিসটি এত বড় বিপর্যয়ের কারণ হলো? এ বিষয়ে আরজ এই যে, অধিক যিকির-আযকার ও কঠোর সুফিবাদী রিয়াযতের কারণে অনেক সময় সুফিদের কাশফ ও ইলহাম হয়ে থাকে এবং এমন কিছু ইশারা পাওয়া যায় যার অর্থ বুঝতে ভুলও হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় আবশ্যক:

- প্রথমত, নিজের কাশফ বা রুইয়া (স্বপ্ন) বোঝার ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনাকে সামনে রাখা।
- দ্বিতীয়ত, সেই সময়ের বিজ্ঞ আলেমদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করা।

কিন্তু সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরী এমনটি করেননি বরং কাশফ বা স্বপ্নগুলোকে নিজের জন্য 'মাহদী' হওয়ার চূড়ান্ত সুসংবাদ মনে করেছেন এবং তাতে অটল থেকেছেন। এরপর তিনি নিজেকে মাহদী হিসেবে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তার থেকে আরও কিছু দাবিও প্রকাশ পেয়েছে যা শরীয়ত ও বিবেক বিরোধী ছিল, যার ভিত্তি ছিল মুকাশাফাত ও রুইয়া (স্বপ্ন)।

ফলে সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর এই দাবিগুলো উম্মাহর জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে অনেক নামকরা আলেম সৈয়দ মুহাম্মদের দাবির খণ্ডনে বই লিখেছেন, যাদের মধ্যে 'কানযুল উম্মাল'-এর লেখক শেখ সৈয়দ আলী মুত্তাকী রহমাতুল্লাহ (মৃত্যু ৯৭৫ হিজরি) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [২]

অন্যদিকে কিছু আলেম, যারা নিজেরা সঠিক আকিদার অধিকারী ছিলেন, তারা সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীকে বুজুর্গদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। সিন্ধুর শাসক জাম নিযামুদ্দিনের আমলে যেখানে সিন্ধুর অনেক আলেম সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীকে তাকফির করেছিলেন, সেখানে শেখ মুহাম্মদ লাজি তার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। [৩]

সমর্থনকারীরা জৌনপুরীর দাবিগুলোর কোনো ব্যাখ্যা বা যুক্তি পেশ করতেন, যেমন- হযরতের মুকাশাফাত ও রুইয়া সত্য ছিল কিন্তু তিনি সেগুলোর ইশারা সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। অথবা তিনি যখন এমন দাবি করেছিলেন তখন তিনি সজ্ঞানে ছিলেন না বরং ওয়াজদ বা জযবার হালতে এমনটি হয়েছিল।

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪১৯, ৪২০

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৮৯

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪২০

অন্যদিকে তারা ছিল সেই চরমপন্থী মুরিদ যারা সৈয়দ মুহাম্মদের মাহদী হওয়ার সত্যায়নকে তাদের মতাদর্শের একটি অপরিহার্য অংশ বানিয়ে নিয়েছিল। একইভাবে অন্যান্য দাবিগুলোকেও ওহীর মতো অক্ষরে অক্ষরে নিজেদের ঈমান হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং সেগুলোর প্রচারকে নিজেদের মিশনে পরিণত করেছিল। তাদের মধ্যে কিছু উচ্চপদস্থ আলেমও ছিলেন। মালওয়ার সুলতান গিয়াসউদ্দিন খিলজীর দরবারী আলেম শেখ আল্লাহদাদ বিন হামিদ মান্ডবীও সেই আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা রাজদরবার ত্যাগ করে জৌনপুরীর খানকাহে (গুজরাট) এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি সৈয়দ মুহাম্মদের মাহদী হওয়ার প্রমাণের ওপর একটি কিতাবও লিখেছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই শেখ বুরহানউদ্দিন কালপবী (মৃত্যু ৯৭০ হিজরি) এর মতো আলেমগণ এই সিলসিলায় দাখিল হন। [১]

তাদের মধ্যে শেখ আব্দুল মালিক সাজাওয়ান্দীও ছিলেন যিনি সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর খলিফাদের মুরিদ ছিলেন। তিনিও সৈয়দ মুহাম্মদের মাহদী হওয়ার প্রমাণের ওপর একটি কিতাব লিখেছিলেন। [২]

নুযহাতুল খাওয়াতির-এর লেখক আবু রাজা আব্দুর রহমান শাহজাহানপুরীর কিতাব 'আল-হিদায়াতুল মাহদাবিয়্যাহ' থেকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন:
"জৌনপুরী তার সাথীদের কখনোই এই চরমপন্থা থেকে নিষেধ করেননি। তিনি তার পিতা-মাতার নাম পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ ও আমিনা রেখেছিলেন এবং মানুষের মধ্যে তা প্রচার করেছিলেন।"

এরপর উক্ত সূত্রের বরাতেই এই ফেরকার আকিদাগুলো উদ্ধৃত করে লিখেছেন:

- জৌনপুরী হলেন মাহদী মাওউদ।
- তিনি খুলাফায়ে রাশেদীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
- তিনি হযরত আদম, হযরত ইব্রাহিম, হযরত মুসা এবং হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।
- সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর মাকাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমান, যদিও শরীয়তের বিষয়ে সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীনের অনুসারী। (নাউযুবিল্লাহ)
- কামেল মুসলমান মাত্র দুইজনই ছিলেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরী। বাকি আম্বিয়ায়ে কেরামও ঈমানের দিক থেকে অপূর্ণ ছিলেন।
- জৌনপুরীর বাণীর ব্যাখ্যা (তাবিল) করা হারাম।
- যদি সৈয়দ মুহাম্মদের কথা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হয়, তবে তার কথারই গুরুত্ব হবে, কুরআন ও সুন্নাহর নয়।
- যে ব্যক্তি ঘুমে বা জাগরণে আনওয়ারে ইলাহিয়া প্রত্যক্ষ না করে, সে মুসলমানই নয়।
- মুমিনের জন্য নিজ দেশ থেকে হিজরত করা এবং হিজরতের পর সোহবতে সালেহীন (এই ফেরকার কেন্দ্রে অবস্থান করা) ওয়াজিব।
- জৌনপুরী আল্লাহর কিছু গুণাবলীতেও অংশীদার। (নাউযুবিল্লাহ মিন হাযিহিল খুরাফাত) [৩]

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১৪, ৩১৮

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৭৯

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪১৯, ৪২০

কথার সারসংক্ষেপ এই যে, সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর বিষয়টি বাগদাদের মনসুর হাল্লাজ বা আফগানিস্তানের পীর রওশনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, অনেক গুণাবলি, কামালত এবং কীর্তি থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক শব্দাবলির দিকে তাকালে তা বিভ্রান্তিকর। এ ধরনের ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের সাধারণত দুটি মত হয়ে থাকে, অর্থাৎ:

- কিছু আলেম নরম মনোভাব পোষণ করে তাদের কথার তাবিল করে তাদের মুমিন ও সালেহ বলে অভিহিত করেন।
- পক্ষান্তরে কিছু আলেম তাবিলের সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে তাদের দ্বল ও মুদ্বিল্ল হিসেবে গণ্য করেন।

সুতরাং এখানেও তেমনই হয়েছে। তার বিভ্রান্তিকর ঘোষণাগুলো সম্পর্কে কিছু আলেম এই তাবিল করতে থাকেন যে, এ সবকিছু তার থেকে গালবা-এ-হাল অবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে কেউ কেউ তাকে বিদআতি ও বিভ্রান্ত এবং কেউ কেউ কাফের বলতে থাকেন। তৃতীয় পক্ষ ছিল তার চরমপন্থী ও অতিভক্তিপরায়ণ সঙ্গী ও খলিফারা, যারা তার শাতহিয়াতকে হুবহু ঈমান সাব্যস্ত করে একটি নতুন ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা হয়ে যান। এই লোকেরা অবশিষ্ট উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হতে থাকে। এটি একটি স্বতন্ত্র ফেরকা বরং ইসলামের বিপরীতে একটি আলাদা দ্বীন হয়ে দাঁড়ায়। [১]

সৈয়দ মুহাম্মদের উত্তরসূরিগণ:

মুঘল আমল শুরু হলে সৈয়দ মুহাম্মদ জৌনপুরীর মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু তার খলিফারা স্থানে স্থানে 'মাহদাবিয়াত'-এর ঝাণ্ডা ওড়াচ্ছিলেন এবং এই ফিতনার ঝড় ইসলামের প্রকৃত রূপকে বিকৃত করছিল। এই ওয়ারিশদের মধ্যে নিজেদের মতাদর্শের দাওয়াতের জোয়ার ছিল। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা বড় বড় সুলতান ও আমিরদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজেদের মতাদর্শ পূর্ণ শক্তিতে প্রচার করেন এবং এর পরিণামে পদ থেকে অপসারিত হন এবং কেউ কেউ কঠোর শাস্তিও ভোগ করেন।

ভাক্কারের প্রখ্যাত আলেম কাজী কাজন সিন্ধি (মৃত্যু ৯৫৮ হিজরি) তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন যারা এই সিলসিলায় দাখিল হওয়ার কারণে সন্দেহভাজন সাব্যস্ত হন এবং পদ থেকে বরখাস্ত হন। [২]

গুজরাটের নেহরওয়ালা (পাটান) জেলায় সৈয়দ শরীফ খাওয়ান্দমীরের ইলম ও ফজিলতের ব্যাপক খ্যাতি ছিল। মুহাম্মদ জৌনপুরী এখানে আসলে খাওয়ান্দমীর মুরিদ হয়ে সফরসঙ্গী হন এবং দূর-দূরান্তের সফরে সাথে থাকেন। শায়খের মৃত্যুর পর জীবন মাহদাবিয়াতের দাওয়াতে ব্যয় করেন এবং নিজের শায়খের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে পরিচিত হন। পরিশেষে গুজরাটের শাহ মুজাফফর শাহ হালিম গুজরাটি ৯৩০ হিজরিতে এই ফিতনা দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠান। খাওয়ান্দমীর তার যোদ্ধা মুরিদদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় নিহত হন। [৩]

তাদের মধ্যেই শায়খ আলা বিন হাসান বায়ানবী (শায়খ আলাই) ছিলেন যিনি সুলতান সেলিম শাহ সুরির আমলে নিজের বিশেষ চিন্তা ও মতাদর্শ প্রচারের অপরাধে গ্রেপ্তার ও নিহত হন এবং তার লাশ হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করা হয়। [৪]

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪১৯

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫৬

[৩] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭৯

[৪] নুযহাতুল খাওয়াতির: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৮৩

https://t.me/BoierSomahar

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা

মৃত্যুর ধ্যান (মোরাকাবায়ে মউত)

খাজা আজিজুল হাসান মাজজুব রহ. হতে

তুমি দাসত্বের জন্য, মনে রেখো ..... মস্তক অবনত করার জন্য, মনে রেখো

নতুবা পরে লজ্জা পেতে হবে, মনে রেখো ..... জীবন মাত্র কয়েক দিনের, মনে রেখো

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

তুমি যদি পদমর্যাদাও পাও তাতে কী ..... সোনা-রূপার ভাণ্ডারও যদি হাতে আসে তাতে কী

বিশাল প্রাসাদও যদি বানাও তাতে কী ..... নিজের দাপটও যদি দেখাও তাতে কী

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

কায়সার, সেকান্দার ও জমশেদ চলে গেছে ..... জাল, সোহরাব ও রুস্তম চলে গেছে

কেমন কেমন বাঘ ও সিংহ চলে গেছে ..... সবাই নিজেদের শৌর্য-বীর্য দেখিয়ে চলে গেছে

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

কেমন কেমন ঘর উজাড় করেছে মৃত্যু ..... কতজনের খেলা নষ্ট করেছে মৃত্যু

হাতির মতো দেহধারীদের আছাড় দিয়েছে মৃত্যু ..... দীর্ঘদেহীদের কবরে গেড়েছে মৃত্যু

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

হে অসতর্ক! প্রস্থান হতে চলেছে ..... আর কতকাল এই গাফিলতি? ভোর হতে চলেছে

পাথেয় গুছিয়ে নাও, সফর হতে চলেছে ..... প্রতিটি মানুষ শেষ হতে চলেছে

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

নফস ও শয়তান বগলে খঞ্জর নিয়ে আছে..... আক্রমণ হতে চলেছে, হে গাফেল সতর্ক হও

দ্বীন ও ঈমানে যেন বিঘ্ন না ঘটে..... ফিরে এসো, হ্যাঁ ফিরে এসো, হে পাপাচারী

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

হঠাৎ যদি মাথার ওপর মৃত্যু এসে পড়ে..... তবে কোথায় তুমি আর কোথায় আমলের জগত

এই অমূল্য সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে..... আর ফিরে পাবে না এই অপূরণীয় জীবন

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

হে গাফেল, পরকালের কোনো চিন্তা তোমার নেই..... দুনিয়া সবসময় ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়

কয়েক দিনের এই জীবন কিছুই নয়..... কিছুই নয়, এর কোনো ভরসা নেই, কিছুই নয়

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

দুনিয়ার এই ভোগ-বিলাস কয়েক দিনের..... পানপাত্র ও সুরা-পাত্রের এই আবর্তন কয়েক দিনের

এই নশ্বর পৃথিবীতে থাকা কয়েক দিনের..... এখন তো পরকালের কাজ করে নাও কয়েক দিন

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

নশ্বর পৃথিবীর বিলাসিতা তুচ্ছ..... চিরস্থায়ী সুখের সামনে তা তুচ্ছ

মিটে যাওয়া আনন্দ তুচ্ছ..... কয়েক দিনের এই জীবন তুচ্ছ

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

বরফের মতো আয়ু কমে যাচ্ছে..... নীরবে, ধীরে ধীরে, প্রতি মুহূর্তে

নিশ্বাস হলো পরকালের পথের এক যাত্রী..... হঠাৎ একদিন তা থেমে যাবে

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

এখান থেকে তোমাকে একদিন চলে যেতে হবে..... কবরে হবে তোমার ঠিকানা একদিন

আল্লাহকে মুখ দেখাতে হবে একদিন..... এখন আর একটি দিনও গাফলতে হারিও না!

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

একদিন মরতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে!

সবাই ধ্বংসের গলির পথিক ..... প্রত্যেকেই ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে

সবদিকে ধ্বংসের নদী প্রবাহিত হচ্ছে ..... প্রতিটি জিনিস থেকে ধ্বংসের ঘ্রাণ আসছে

একদিন মরতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

দুনিয়ার এই বসন্ত মাত্র কয়েক দিনের ..... হে গাফেল, এর সাথে কক্ষনো মন লাগিও না

নিজের জীবন এভাবে উদাসীনতায় কাটিও না ..... হুঁশিয়ার হে উদাসীনতায় মগ্ন! হুঁশিয়ার

একদিন মরতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

আখেরাতের চিন্তা অবশ্যই করতে হবে ..... যেমন কর্ম তেমন ফল অবশ্যই পেতে হবে

এই জীবন একদিন অবশ্যই কেটে যাবে ..... কবরে লাশ অবশ্যই নামাতে হবে

একদিন মরতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে!

যা আসার তা কার মাধ্যমে এড়ানো যাবে? ..... প্রাণ তো যাওয়ারই, তা চলেই যাবে

রগ রগ থেকে রুহ বের করে নেওয়া হবে ..... তোমার ওপর একদিন মাটি ঢেলে দেওয়া হবে

একদিন মরতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে!

বহমান জীবনের ঘোড়া দ্রুতগামী ..... সব চিন্তা ছেড়ে দাও, মাওলার সাথে সম্পর্ক গড়ো

গম থেকে গম জন্মায় আর যব থেকে যব ..... কর্মফল সম্পর্কে উদাসীন হয়ো না

একদিন মরতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

বিশ্বের এই মজলিসে ধ্বংসের রাজত্ব চলছে ..... এটি শিক্ষা গ্রহণের জায়গা, চিন্তার স্থান

তুমি গাফেল, তোমার এ কেমন আচরণ ..... আর মাত্র কয়েক দিনের জীবন বাকি আছে

একদিন মরতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আছে

কঠিন কঠিন রোগব্যাধি তুমি সহ্য করেছ ..... চিকিৎসক তোমাকে শক্ত প্রাণও বলেছে

কী হয়েছে যদি আরও কয়েক দিন বেঁচে থাকতে ..... এক পৃথিবী ধ্বংসের বন্যায় ভেসে গেছে

https://t.me/BoierSomahar

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

তোমার দখলে লক্ষ লক্ষ সোনা-রূপা থাকুক... তোমার শিয়রে লক্ষ লক্ষ চিকিৎসক থাকুক

তুমি লক্ষ দুর্গের ভেতরে লুকিয়ে থাকো না কেন... মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো পথ নেই।

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

তোমার এই শক্তি বা ক্ষমতা কাজে আসবে না... আর না এই দীর্ঘ আশা কাজে আসবে

মৃত্যুর সময়ে কিছুই কাজে আসবে না... হ্যাঁ, তবে নেক আমল কাজে আসবে।

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

হে গাফেল! বিলাসিতা করো না, আরাম করো না... সম্পদ অর্জন করো না, নাম কামিও না

দুনিয়াতে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর জিকির করো... যে কাজের জন্য তুমি এসেছ, সেই কাজ করো।

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

এই আকাশের নিচে অবাধ্যতা শোভা পায় না... দেখ! তোমাকে মাটির নিচে যেতে হবে

যখন তোমাকে একদিন নিশ্চিতভাবে মরতে হবে... তবে এদিক-সেদিকের চিন্তা ছেড়ে দ্বীনের চিন্তা করো।

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

তোমার এই অস্তিত্ব গাফেল হওয়ার জন্য নয়... দেখ! জান্নাত এত সস্তা নয়

দুনিয়া একটি পথ মাত্র, এটি স্থায়ী বসতি নয়... এটি বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের জায়গা নয়।

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

ধন-সম্পদ বাড়ানো বৃথা... প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করা বৃথা

দুনিয়ার সাথে মন লাগানো বৃথা... পথকে ঘর বানানো বৃথা।

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

বিলাসিতার জন্য মানুষ নয়... মনে রেখো তুমি বান্দা, মেহমান নও

গাফেলতি ও মত্ততা তোমার জন্য শোভনীয় নয়... যদি তুমি নির্বোধ না হও তবে বন্দেগি করো।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

বাহ্যিক সৌন্দর্যের মোহে যদি তুমি পড়ো ..... নশ্বর এই পৃথিবীর কাছে ধোঁকা খাবে

এটি একটি চিত্রিত সাপ, দংশন করবে ..... গাফেল থেকো না, মনে রেখো অনুতপ্ত হবে

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

শত শত মানুষকে নিজ হাতে মাটির নিচে দাফন করেছ ..... তবুও মৃত্যুর ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস নেই

তোমার চেয়ে বড় গাফেল আর কেউ নেই ..... এই অভিশপ্ত নফসের জন্য কিছু শিক্ষা প্রয়োজন

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

নিজেকে এভাবে বেকার রেখো না ..... আখেরাতের জন্য প্রস্তুত রাখো

গায়রুল্লাহ থেকে অন্তরকে বিমুখ রাখো ..... সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণে রাখো

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

মৃত্যুকে কখনো ঘাতক মনে করো না ..... মৃত্যুকে জীবনের সারবস্তু হিসেবে জানো

জ্ঞানীরা মৃত্যুকে প্রিয় মনে করেন ..... হে গাফেল, সর্বদা মৃত্যুকে মনে রেখো

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

তুমি এই শিক্ষণীয় স্থানেও মগ্ন হয়ে আছো ..... যদিও এটি দারুল মিহান (পরীক্ষার ঘর), বাইতুল হুজন (দুঃখের আলয়)

তোমার এই চলন জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে ..... গাফেলতি ছাড়ো, পরিণামদর্শী হও

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

এটি তোমার গাফেলতি, বড় নির্বুদ্ধিতা ..... মৃত্যু মাথার ওপর দাঁড়িয়ে হাসছে

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে চোখের সামনে রাখো ..... এই কঠিন মঞ্জিল সামনে আসতে চলেছে

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে

যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

তুমি পতঙ্গের মতো দুনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছ ..... যদিও পরিণামে তোমাকে পুড়তে হবে

আবার এই দাবি যে আমরা বুদ্ধিমান ..... এটাই কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়?

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে
যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

হায়! তুমি দুনিয়ার পাগল হয়ে আছো
আর পরকালের কোনো পরোয়া করছো না
তুমি বুদ্ধি থেকে কতটা বিমুখ
অথচ নিজেকে অনেক জ্ঞানী মনে করো

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে
যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহে পড়ো না
নেক আমল দিয়ে নিজের আসল ঘর সাজাও
তারপর সেখানে কেবল প্রশান্তির বাঁশি বাজাও
নিশ্চয়ই সে মহা সাফল্য লাভ করেছে যে মুক্তি পেয়েছে

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে
যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

পথভ্রষ্টদের এই চাকচিক্য আর এই চালচলন
দেখে কক্ষনো পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না
তাদের সঙ্গ ছাড়ো, নিজের হাত ঝেড়ে ফেলো
ভুলেও তাদের কাছে যেও না

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে
যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

তোমার এই বিভোর অবস্থা আর এই বয়স
হুঁশে এসো, এখন আর গাফিলতির দিন নয়
এখন তো কেবল প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিন গণনা করো
কোমর বাঁধো, সামনে কঠিন গন্তব্য

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে
যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

বার্ধক্যে তুমি গাফিলতি করো না
জীবনের এখন আর কোনো ভরসা নেই
কণ্ঠনালীতে মৃত্যুর খঞ্জরের ধার
এখন নিজেকে মৃতদের তালিকায় গণ্য করো

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যু আছে
যা করার করে নাও, অবশেষে মৃত্যু আছে

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব

মরহুম আকবর এলাহাবাদী

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরে মেলা বসে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব।

ফুল, কুঁড়ি ও সরু গাছ ফুটতে থাকবে

সুগন্ধি গোলাপ ও বেলি ফুল থাকবে।

অনেক পীর ও মুরিদ থাকবে

বড় বড় ওরস হবে, হট্টগোল থাকবে।

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরে মেলা বসে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব।

যদি সামিয়ানা টাঙানো হয় তাতে আমাদের কী

যদি গান-বাজনা চলতে থাকে তাতে আমাদের কী।

যদি কফি হাউজ তৈরি হয় তাতে আমাদের কী

যদি কফি হাউজ খোলা হয় তাতে আমাদের কী।

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরে মেলা বসে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব।

যদি বন্ধু-বান্ধবরা আসে তাতে আমাদের কী

আপন-পর সবাই জমা হলে তাতে আমাদের কী।

কেউ যদি কাঁদে, চোখের জল ফেলে তাতে আমাদের কী

আমরা তো মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকব তাতে আমাদের কী।

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরে মেলা বসে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব।

ভাই-বোন সবাই এসে কাঁদবে

আত্মীয়-স্বজনরা শোকে কাতর হবে।

আমাদের চোখের জলে ডুবিয়ে দেবে

আমরা তো বেখবর হয়ে ঘুমিয়ে থাকব।

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরের ওপর মেলা বসে থাকে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব

কেউ যদি আমাদের জন্য শোক করে তবে তাতে কী? ..... যদি কারও চোখ অশ্রুসিক্ত হয় তবে তাতে কী?

হাশর পর্যন্ত কেউ যদি মাতম করে তবে তাতে কী? ..... যখন আমরা সামনে থাকব না তখন তাতে কী?

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরের ওপর মেলা বসে থাকে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব

ধনীরা থাকলে ফুলও থাকবে ..... অনেক বুলবুলি আসবে, ফুলও থাকবে

যদি কাওয়ালি হয়, তবে শোরগোলও হবে ..... অনেক ধুমধাম হবে, অনেক শোরগোলও হবে

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরের ওপর মেলা বসে থাকে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব

কেউ ফুলের চাদর চড়াতে থাকবে ..... কেউ কবরে প্রদীপ জ্বালাতে থাকবে

দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক যখন ছিন্ন হয়ে যাবে ..... না কোনো সম্পর্ক থাকবে, না কোনো আত্মীয়তা থাকবে

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরের ওপর মেলা বসে থাকে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব

সুন্দরীদের আস্তানাগুলোও গুলজার হবে ..... রইস ও আমিরদের দরবার বসবে

তামাশাকারীদের ভিড়ে বাজারগুলো পূর্ণ থাকবে ..... আমাদের জন্য এসবই হবে অর্থহীন

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরের ওপর মেলা বসে থাকে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব

আগ্রার তাজগঞ্জ যেমন এক আশ্চর্য ..... আমাদের কবরও যদি এমন রওজা হয়

দুনিয়া এসে এসে যার জিয়ারত করবে ..... সবকিছুই হোক, কিন্তু এটা তো বলবেন—

আমাদের কী আসে যায় যদি কবরের ওপর মেলা বসে থাকে

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব

কিতাবিয়াত

ষষ্ঠ খণ্ড

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

বইয়ের নাম ও লেখক ..... ক্রমিক নং

(বর্ণমালা 'আলিফ')

আপ-ই-কাওসার (উর্দু) - শেখ মুহাম্মদ ইকরাম ১

আসারুস সানাদিদ (উর্দু) - স্যার সৈয়দ আহমদ খান ২

আয়না-ই-তারিখ-ই-হিন্দ, হিন্দুস্তান কি তারিখ (উর্দু) - প্রফেসর বি. এন. বর্মা ৩

আখবারুল আখইয়ার (উর্দু অনুবাদ) - শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি (অনুবাদক: মাওলানা সুবহান মাহমুদ, মাওলানা মুহাম্মদ ফাজিল) ৪

ইসলাম কা হিন্দুস্তানি তাহজিব পার আসর (উর্দু অনুবাদ) - ডক্টর তারা চাঁদ (উর্দু অনুবাদ: আজম আলী হাশমি) ৫

ইসলামি সালতানাতেঁ (উর্দু অনুবাদ) - ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়ার্থ (উর্দু অনুবাদ: ইয়াসির জাওয়াদ) ৬

ইসলামি উলুম কা ইরতিকা, আহদে সুলতানাত কে হিন্দুস্তান মেঁ (উর্দু) - প্রফেসর জাফরুল ইসলাম ইসলাহি ৭

ইসলামি ফান-এ-তামির হিন্দুস্তান মেঁ (উর্দু অনুবাদ) - জেমস ফার্গুসন (উর্দু অনুবাদ: সৈয়দ হাশমি ফরিদাবাদী) ৮

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (আরবি) - হাফেজ ইবনে কাসির দামেশকি ৯

আল-কামিল ফিত তারিখ (আরবি) - আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি ১০

আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম (আরবি) - আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনুল জাওজি ১১

ইমাম সাগানি (উর্দু) - ডক্টর আব্দুল হালিম চিশতি ১২

আমির খসরু আওর মেঁ (উর্দু) - মাসউদ আহমদ বরকাতি ১৩

আমির খসরু (উর্দু) - ডক্টর ওয়াহিদ মির্জা ১৪

আমির খসরু (উর্দু) - সৈয়দ গোলাম সামনানি ১৫

আমির খসরু দেহলভি (উর্দু) - প্রফেসর মমতাজ হোসেন ১৬

আমির খসরু কি পহেলিয়াঁ (উর্দু) - আদিল আসির দেহলভি ১৭

আমির খসরু, আহদ, ফান আওর শখসিয়াত (উর্দু) - আরশ মালসিয়ানি ১৮

আমির খসরু: ফারদ আওর তারিখ (উর্দু) - ডক্টর মঈনুদ্দিন আকিল ১৯

আউলিয়া-ই-কাশ্মীর (উর্দু) - পীরজাদা মুহাম্মদ তৈয়ব হোসেন নকশবন্দি কাশ্মীরি লাহোরি ২০

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

{ হরফে আলিফ }

১৯৭৩ খ্রি. ১ ইদারা-এ-সাকাফাত-এ-ইসলামিয়া, লাহোর, মাতবা নকূশ প্রেস ২০০৬ খ্রি.

১৮৯৮ খ্রি. ১ নামী প্রেস, কানপুর, হিন্দুস্তান ১৯০৪ খ্রি.

•

১ প্রসাদ এন্ড ব্রাদার্স, আগ্রা ১৯৩৩ খ্রি.

১০৫২ হি. (১৬৪২ খ্রি.) ১ আকবর বুক সেলার্স, লাহোর ২০০৪ খ্রি.

•

১ সওলত পাবলিক লাইব্রেরি, রামপুর, ভারত ১৯৬৬ খ্রি.

২০১৫ খ্রি. ১ নিগারিশাত পাবলিশার্স, লাহোর ২০০৭ খ্রি.

•

১ ডায়মন্ড প্রিন্টার্স, দিল্লি ২০১২ খ্রি.

লেখকের মৃত্যু: ১৮৮৬ খ্রি.

অনুবাদকের মৃত্যু: ১৯৬২ খ্রি. ১ জামিয়া ওসমানিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৯৩২ খ্রি.

৭৭৫ খ্রি. ২০ দার হিজর, মিশর ১৪২৪ হি. মোতাবেক ২০০৩ খ্রি.

৬৩০ হি. ১০ দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত

•

৫৯৭ হি. ১৯ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯২ খ্রি.

২০২০ খ্রি. ১ এই প্রবন্ধটি মাসিক মাআরিফ (দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়)-এর ৮৩তম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

•

২০১৭ খ্রি. ১ হামদর্দ নওনিহাল-এ প্রকাশিত ডিসেম্বর ১৯৭৫ খ্রি.

•

১ এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লি ২০০৭ খ্রি.

•

১ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি ১৯৮৫ খ্রি.

•

১ ন্যাশনাল কমিটি ফর ৭০০ ইয়ার্স সেলিব্রেশন অফ আমির খসরু ১৯৭৬ খ্রি.

•

১ মালিক বুক ডিপো, দিল্লি ২০০৯ খ্রি.

১৯৭৯ খ্রি. ১ মাকতাবা জামিয়া, জামিয়া নগর, দিল্লি

•

•

১ আবুল কালাম আজাদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, করাচি ১৯৯৭ খ্রি.

•

১ নাযীর পাবলিশার্স, লাহোর ১৯৮৮ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

{হরফ ব}

উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি (উর্দু অনুবাদ) - প্রফেসর আজিজ আহমদ (উর্দু অনুবাদ: ডক্টর জামিল জালবি) ২১

বজমে মামলুকিয়া (উর্দু) - সৈয়দ সাবাহুদ্দিন আব্দুর রহমান ২২

বাহরাইচ - একটি ঐতিহাসিক শহর (উর্দু) - জুনাইদ আহমদ নূর ২৩

{হরফ ত}

তাজুল মাআসির (ফারসি) - তাজউদ্দীন হাসান নিজামী ২৪

তারিখ-ই-ইবনে খালদুন (আরবি) - আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন ২৫

তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ (আরবি) - শেখ আব্দুল মুনইম আন-নামির ২৬

তারিখুল ইসলাম (আরবি) - হাফেজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি ২৭

তারিখ-ই-বাইহাকি (ফারসি) - আবুল ফজল মুহাম্মদ হোসেন বাইহাকি প্রমুখ ২৮

তারিখ-ই-পাক ও হিন্দ (উর্দু) - প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ২৯

তারিখ-ই-তামাদ্দুন-ই-হিন্দ (উর্দু) - মুহাম্মদ মুজিব ৩০

তারিখ-ই-দাওয়াত ও আজিমত (উর্দু) - মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী ৩১

তারিখ-ই-দাক্ষিণাত্য (ফারসি) - ডেপুটি আব্দুল আলিম নসরুল্লাহ ৩২

তারিখ-ই-দাউদি (হিন্দুস্তানের আফগান সুলতানগণ) উর্দু অনুবাদ - লেখক: খাজা আব্দুল্লাহ, উর্দু অনুবাদ: মুহাম্মদ আসেম আজমি ৩৩

তারিখ-ই-সালাতিন-ই-শরকিয়া ও সুফিয়া-ই-জৌনপুর (উর্দু) - সৈয়দ ইকবাল আহমদ জৌনপুরী ৩৪

তারিখ-ই-সোহরাওয়ার্দিয়া (উর্দু) - প্রফেসর মুহাম্মদ সাঈদ ৩৫

তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি - নতুন সংস্করণ) - মুহাম্মদ কাসেম ফিরিশতা ৩৬

তারিখ-ই-ফিরিশতা (ফারসি - পুরাতন সংস্করণ) - মুহাম্মদ কাসেম ফিরিশতা ৩৭

তারিখ-ই-ফিরিশতা (উর্দু অনুবাদ) - অনুবাদ: মুশফিক খাজা ৩৮

তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (ফারসি) - জিয়াউদ্দীন বারানি ৩৯

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মৃত্যুর বছর | খণ্ডসমূহ | প্রকাশক | প্রকাশের বছর

{বর্ণ ব}

- মৃত্যুর বছর: লেখকের মৃত্যু: ১৯৭৮ খ্রি., অনুবাদকের মৃত্যু: ২০১৯ খ্রি. | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: ইদারা-ই-সাকাফাত-ই-ইসলামিয়া, লাহোর | প্রকাশের বছর: ১৯৯৭ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: ১৯৮৭ খ্রি. | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: মাতবা-ই-মাআরিফ, আজমগড় | প্রকাশের বছর: ১৯৫৩ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: — | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: জাবিয়া প্রিন্ট, নিউ দিল্লি | প্রকাশের বছর: ২০১৯ খ্রি.

{বর্ণ ত}

- মৃত্যুর বছর: সপ্তম হিজরি শতাব্দী | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: মারকাজ-ই-তেহকিকাত-ই-ফারসি, ইরান | প্রকাশের বছর: ২০০৮ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: ৮০৮ হিজরি | খণ্ডসমূহ: ৮ | প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত | প্রকাশের বছর: ১৯৮৮ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: ১৯৯১ খ্রি. | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: দারুল আহদ আল-জাদিদ, মিশর | প্রকাশের বছর: ১৯৫৯ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: ৭৩৮ হিজরি | খণ্ডসমূহ: ৫২ | প্রকাশক: দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত | প্রকাশের বছর: ১৯৯৩ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: ৪৭০ হিজরি (১০৭৭ খ্রি.) | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: দানিশগাহ-ই-ফিরদৌসি, মাশহাদ, ইরান | প্রকাশের বছর: ১৩৮৩ হিজরি
- মৃত্যুর বছর: — | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: কুরেশি ব্রাদার্স, উর্দু বাজার, লাহোর | প্রকাশের বছর: ১৯৭৯ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: — | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: কওমি কাউন্সিল বারায়ে ফারোগ-ই-উর্দু জবান, নয়াদিল্লি | প্রকাশের বছর: ১৯৯৯ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: ১৯৯৯ খ্রি. | খণ্ডসমূহ: ৭ | প্রকাশক: মজলিস-ই-নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, করাচি | প্রকাশের বছর: ১৯৯০ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: — | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: মাতবা নাভাল কিশোর | প্রকাশের বছর: ১২৯৪ হিজরি
- মৃত্যুর বছর: ষোড়শ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে সরদার দাউদ খান করানির আদেশে লেখা হয়েছে। | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: (১) ভারত অফসেট প্রেস, দিল্লি, (২) ট্যাক্স এজ পাবলিশিং কোম্পানি, লাহোর | প্রকাশের বছর: (১) ২০০৪ খ্রি., (২) ২০১৯ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: — | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: শিরাজ-ই-হিন্দ পাবলিশিং হাউস, জৌনপুর | প্রকাশের বছর: ১৯৮৮ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: — | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: গিলানি প্রিন্টার্স, রবসন রোড, করাচি | প্রকাশের বছর: ২০০০ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: ১৬২০ খ্রি. | খণ্ডসমূহ: ৩ | প্রকাশক: আঞ্জুমান-ই-আসার-ও-মাফাখির-ই-ফারহাঙ্গি, ইরান | প্রকাশের বছর: —
- মৃত্যুর বছর: — | খণ্ডসমূহ: ২ | প্রকাশক: মেজর জেনারেল জন ব্রিগস, গভর্নমেন্ট কলেজ প্রেস, বোম্বে | প্রকাশের বছর: ১৮৩১ খ্রি.
- মৃত্যুর বছর: অনুবাদকের মৃত্যু: ২০০৫ খ্রি. | খণ্ডসমূহ: ৪ | প্রকাশক: আল-মিজান নাশিরান-ও-তাজিরান-ই-কুতুব, লাহোর | প্রকাশের বছর: —
- মৃত্যুর বছর: ১৩৫৭ হিজরি | খণ্ডসমূহ: ১ | প্রকাশক: ক্যাপ্টেন উইলিয়াম নাসাউ লিস-এর তত্ত্বাবধানে, কলকাতা | প্রকাশের বছর: ১৮৬২ খ্রি.

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

তারিখ গুজরাট (উর্দু অনুবাদ) - লেখক: শাহ আবু তুরাব ওয়ালী, উর্দু অনুবাদ: শবিহ আহমদ ৪০

তারিখ মুবারক শাহী (ফারসি) - ইয়াহইয়া বিন আহমদ সিরহিন্দি ৪১

তারিখ হিন্দ (উর্দু অনুবাদ) - থাপার রোমিলা (রোমিলা থাপার), ইংরেজি থেকে ফারসি অনুবাদ: হুমায়ুন সানআতি জাদা ৪২

তারিখ হিন্দুস্তান (উর্দু) - মৌলভী জাকাল্লাহ দেহলভী ৪৩

তারিখ হিন্দুস্তান, প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিকদের লেখা (উর্দু) - বৈজনাথ পুরী ৪৪

তাজকিরা আউলিয়া-এ-হিন্দ ও পাকিস্তান (উর্দু) - মুফতী ওয়ালী হাসান টোঙ্কি ৪৫

তাজকিরা মাখদুম জাহান (উর্দু) - মাওলানা নাসির মুনিরী ৪৬

তাজকিরা সুফিয়া-এ-বেঙ্গল (উর্দু) - ইজাজুল হক কুদ্দুসী ৪৭

তাজকিরা সুফিয়া-এ-পাঞ্জাব (উর্দু) - ইজাজুল হক কুদ্দুসী ৪৮

তাকভীম তারিখি (উর্দু) - মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাশেমী ৪৯

তাহযীব রওয়াদারি, উপমহাদেশীয় ভারতের ইতিহাসের একটি অধ্যয়ন (উর্দু) - সৈয়দ উসমান শের ৫০

তারিখ সালাতীন বাহমানিয়া, পদ্য (উর্দু) - সুহাইল বেরারি ৫১

তারিখ কুতুব শাহী (ফারসি) - সৈয়দ বুরহানুদ্দীন আহমদ ৫২

তারিখ দাক্ষিণাত্য (উর্দু) - সৈয়দ হাশেমী ফরীদাবাদী ৫৩

জামে তারিখ হিন্দ (উর্দু) - (১) মুহাম্মদ হাবীব (২) খলীক আহমদ নিজামী ৫৪

তারিখ দাওলাত আল সেলজুক (আরবি) - ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ আল-ইসফাহানী ৫৫

তারিখ দাক্ষিণাত্য (উর্দু) - সৈয়দ হাশেমী ফরীদাবাদী ৫৬

তারিখ মিল্লাত (উর্দু) - (১) মুফতী ইন্তেজামুল্লাহ শাহাবী (২) কাজী জয়নুল আবেদীন সাজ্জাদ মিরাঠী ৫৭

তারিখ মাশায়েখ চিশত (উর্দু) - হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া মুহাজির মাদানী ৫৮

তাজকিরা সালাতীন দাক্ষিণাত্য - মৌলভী আব্দুল জব্বার খান ৫৯

তারিখ শিরাজ-এ-হিন্দ জৌনপুর (উর্দু) - সৈয়দ ইকবাল আহমদ জৌনপুরী ৬০

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

১০০৩ হিজরি (১৫৯২ খ্রি.) ১ হিন্দুস্তানি পাবলিশিং হাউস, এলাহাবাদ, ভারত ১৯০৯ খ্রি.

পনেরো শতক ঈসায়ী ১ এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল ১৯৩১ খ্রি.

১ মারকাজ-ই-তাহকিকাত-ই-রায়ানাহ, ইসফাহান - ইরান ১৯৬৬ খ্রি.

১৯১০ খ্রি. ১০ মাতবা ইনস্টিটিউট, আলীগড় ১৯১৫ খ্রি.

১৯৬৬ খ্রি. ১ মাতবা নাওয়াল কিশোর ১৯৩৭ খ্রি.

১৯৯৫ খ্রি. ১ আল-জমিয়ত প্রেস, দিল্লি - ওসমানিয়া বুক ডিপো, হায়দ্রাবাদ ১৯৮০ খ্রি.

১ মুনিরি পাবলিশার্স, দিল্লি ১৩৩২ হিজরি

১৯৮৬ খ্রি. ১ মারকাজি উর্দু বোর্ড, লাহোর ১৯৬৩ খ্রি.

১৯৮৬ খ্রি. ১ সালমান একাডেমি, করাচি সংকলন: ১৯৬২ খ্রি. প্রকাশনা: ১৯৯৬ খ্রি.

১ ইদারা-ই-তাহকিকাত-ই-ইসলামি, ইসলামাবাদ ১৯৮৭ খ্রি.

১ বুক কর্নার, ঝিলাম, পাকিস্তান

১ আঞ্জুমান-ই-তারাক্কি-ই-উর্দু, দিল্লি ১৯৩১ খ্রি.

১ মাতবা বুরহানিয়া, হায়দ্রাবাদ ১৮৮৮ খ্রি.

১ আজম প্রেস, হায়দ্রাবাদ ১৩৩৬ হিজরি

(১) ১৯৭৬ খ্রি. (২) ১৯৯৭ খ্রি. ১ ১৯৮৪ খ্রি. কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরোগ-ই-উর্দু, দিল্লি

সপ্তম হিজরি শতাব্দী ১ শারকাতু মাতবা আল-কুতুব আল-আরাবিয়া ১৯০০ খ্রি.

১৯৬২ খ্রি. ১ আজম প্রেস, চারমিনার, হায়দ্রাবাদ ১৩৩৬ হিজরি

(১) ১৯৭৬ খ্রি. (২) ১৯৯১ খ্রি. ৩ ইদারা ইসলামিয়াত, লাহোর ১৯৯১ খ্রি.

১৪০২ হিজরি (১৯৮২ খ্রি.) ১ মাকতাবা আশ-শাইখ, বাহাদুরবাদ, করাচি ২০১০ খ্রি.

মাতবা রহমানিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৯১০ খ্রি.

১ শিরাজ-ই-হিন্দ পাবলিশিং হাউস, জৌনপুর ১৯৬৩ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... কিতাবের নাম ..... লেখক

{বর্ণ: জিম}

জামে' তারীখে হিন্দ (উর্দু) - (১) মুহাম্মদ হাবীব, (২) খালিক আহমদ নিজামী ৬১

জাওয়ামিউল কালিম (ফারসি থেকে উর্দু অনুবাদ) - "সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর হুসাইনী" ইবনে খাজা গেসুদরাজ রহমাতুল্লাহ, উর্দু অনুবাদ: প্রফেসর মঈনুদ্দিন দরদায়ী ৬২

{বর্ণ: হা}

হাদিকাতুল আউলিয়া (সিন্ধি) - সৈয়দ আব্দুল কাদির তাত্ত্বী ৬৩

হায়াতে খসরু (উর্দু) - "আল্লামা শিবলী নোমানী" ৬৪

{বর্ণ: খা}

খাজাইনুল ফুতুহ (উর্দু অনুবাদ) - আমির খসরু ৬৫

খসরু কি পহেলিয়াঁ - শাহীন জাফর আলভী ৬৬

{বর্ণ: দাল}

দাওয়াতে ইসলাম (উর্দু অনুবাদ) - টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড (অনুবাদ: শেখ এনায়েত উল্লাহ) ৬৭

দাকানি আদব কি তারিখ (উর্দু) - ডক্টর মহিউদ্দিন জোর ৬৮

দিল্লি কে আসার-এ-কাদিমা (উর্দু) - ডক্টর খালিক আনজুম ৬৯

{বর্ণ: রা}

রেহলা ইবনে বতুতা (তুহফাতুন নুজ্জার ফি গারাইবিল আমসার ওয়া আজাইবিল আসফার) - আবু আব্দুল্লাহ ইবনে বতুতা ৭০

রেহলা ইবনে বতুতা (আরবি) - আবু আব্দুল্লাহ ইবনে বতুতা ৭১

রওজাতুস সাফা, চতুর্থ খণ্ড (আরবি অনুবাদ) - লেখক: মুহাম্মদ বিন খাওয়ান্দ শাহ (ফারসি থেকে আরবি অনুবাদ: আহমদ আব্দুল কাদির শাযলী) ৭২

রিয়াজুস সালাতীন, তারীখে বাঙ্গালা (ফারসি) - গোলাম হোসেন সলীম ৭৩

{বর্ণ: যা}

জাইনুল আখবার (ফারসি থেকে আরবি অনুবাদ) - আবু সাঈদ আব্দুল হাই গারদিযী (আরবি অনুবাদ: আফাফ আস-সাইয়িদ যায়দান) ৭৪

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

{হরফ জিম (ج)}

(১) ১৯২১ খ্রি. (২) ১৯৯৭ খ্রি. ১ কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরোগে উর্দু, দিল্লি ১৯৮৪ খ্রি.

{হরফ হা (ح)}

নবম হিজরি শতাব্দী ১ নাফিস একাডেমি করাচি ১৯৮০ খ্রি.

১০১৬ হিজরির পর ১ সিন্ধি আদবি বোর্ড, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু ১৯৬৭ খ্রি.

১৯১৩ খ্রি. ১ দায়েরায়ে আদবিয়া লখনউ ১৯২২ খ্রি.

{হরফ খা (خ)}

২৭৫ (১৩২৫ হিজরি) ১ ন্যাশনাল বুক একাডেমি, পাকিস্তান ১৯৬৬ খ্রি.

১ জাফর বুক ডিপো লখনউ ১৯৫৬ খ্রি.

{হরফ দাল (د)}

১৯৩০ খ্রি. ১ মহকুমা আওকাফ, পাঞ্জাব

১৯৬২ খ্রি. ১ উর্দু একাডেমি, সিন্ধু ১৯৭০ খ্রি.

১ মিনহাজ শুকর প্রিন্টার্স, লাহোর ১৯৮৯ খ্রি.

{হরফ রা (ر)}

৭৭৯ হিজরি ২ দারুল শারক আল-আরাবি

৭৭৯ হিজরি ৫ একাডেমি আল-মামলাকাতুল মাগরিবিয়া, রাবাত ১৪১৭ হিজরি

৯০৩ হিজরি ১ আদ-দারুল মিসরিয়া লিল কিতাব ১৯৮৮ খ্রি.

১৮১৭ খ্রি. ১ এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল ১৭৮৭ খ্রি.

{হরফ যা (ز)}

৩৮৩ হিজরি ১ আল-মজলিসুল আলা লিস-সাকাফাহ, মিসর ২০০২ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

বইয়ের নাম ও লেখক ..... ক্রমিক নং

{হরফ স}

সফরনামা ইবনে বতুতা (আরবি থেকে উর্দু অনুবাদ) - অনুবাদক: রইস আহমদ জাফরি ৭৫

সুলতান মাহমুদ গজনভি (উর্দু) - মুবিন রশিদ ৭৬

সালতানাত-ই-দেহলি কা নিজাম-ই-হুকুমত (উর্দু) - ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি ৭৭

সওয়ানেহ চেরাগ দেহলি, হযরত শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ রহ. - সৈয়দ তমিজ উদ্দিন মাহমুদ নাসিরি ৭৮

সিয়ারুল আউলিয়া (উর্দু অনুবাদ) - লেখক: মীর খুর্দ সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক কিরমানি (ফারসি থেকে উর্দু অনুবাদ: গোলাম আহমদ বিরিয়ান) ৭৯

সিয়ারুল আরিফিন (উর্দু অনুবাদ) - হামিদ বিন ফজলুল্লাহ জামালি (উর্দু অনুবাদ: মুহাম্মদ আইয়ুব কাদরি) ৮০

সিয়ারু আলামিন নুবালা (আরবি) - হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি রহ. ৮১

সিরাতুস সুলতান জালালুদ্দিন মানকাবরতি (আরবি) - শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আন-নাসাউয়ি রহ. ৮২

সিরাত হযরত সখি সরওয়ার রহ. (উর্দু) - মুহাম্মদ হাসিব আল-কাদরি ৮৩

{হরফ সোয়াদ}

সুবহুল আশা ফি সিনাআতিল ইনশা (আরবি) - আহমদ বিন আলি আল-কালকাশান্দি রহ. ৮৪

সুফি আমির খসরু রহ. (উর্দু) - সৈয়দ সাবাহ উদ্দিন আবদুর রহমান ৮৫

{হরফ তোয়া}

তাবাকাত-ই-আকবরি, আরবি (আল-মুসলিমুন ফিল হিন্দ) - নিজামুদ্দিন আহমদ বখশ হারুয়ি (ফারসি থেকে আরবি অনুবাদ: আহমদ আবদুল কাদির শাযলি) ৮৬

তাবাকাত-ই-নাসিরি (ফারসি) - কাজি মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি রহ. ৮৭

{হরফ জোয়া}

জাফরনামা (ফারসি) - নিজামুদ্দিন শামি ৮৮

জাফরনামা (ফারসি) - শরফুদ্দিন আলি ইয়াজদি ৮৯

{হরফ আইন}

আজায়িবুল মাকদুর ফি আহওয়ালি তৈমুর (আরবি) - আবু মুহাম্মদ ইবনে আরবশাহ ৯০

আল্লামা মুহাম্মদ বিন তাহের পাটনি (উর্দু) - হাফিজুর রহমান ৯১

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

{হরফ স}

১৯৬৮ খ্রি. ১ নাফিস একাডেমি, উর্দু বাজার, করাচি ১৯৮৬ খ্রি.

১ ইলম ও ইরফান পাবলিশার্স, লাহোর ২০০৬ খ্রি.

১৯৮১ খ্রি. ১ করাচি ইউনিভার্সিটি প্রেস

১ জাভিয়া পাবলিশার্স, লাহোর ২০১৩ খ্রি.

৭৭০ হিজরি ১ আল-কিতাব, গঞ্জ বখশ রোড, লাহোর ১৯৭৮ খ্রি.

৯৩২ হিজরি / ১৯৮৩ খ্রি. ১ কেন্দ্রীয় উর্দু বোর্ড, লাহোর ১৯৬৬ খ্রি.

৭৩৮ হিজরি ২৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৯৮৫ খ্রি.

৬৩২ হিজরি ১ দারুল ফিকর আল-আরাবি, বৈরুত ১৯৫২ খ্রি.

১ আকবর বুক সেলার্স

{হরফ স}

৮২১ হিজরি ১৫ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৮৭ খ্রি.

১৯৮৭ খ্রি. ১ দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমি, আজমগড় ২০০৯ খ্রি.

{হরফ ত}

১৫৯৩ খ্রি. ৩ আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল কিতাব ১৯৯৫ খ্রি.

২৫৮ হিজরি ২ আঞ্জুমান-ই-তারীখ আফগানিস্তান, কাবুল ১৩৪৩ হিজরি

{হরফ জ}

১ সায়মান-ই-নশর-ই-কিতাব, ইনতিশারাত-ই-বামদাদ, ইরান ১৩৬৩ হিজরি

১৩৫২ হিজরি ১ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, কলকাতা ১৮৮৮ খ্রি.

{হরফ আইন}

৮৫৩ হিজরি ১ কলকাতা ১৮১৭ খ্রি.

১ প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল: ফিকর ও নজর, ইসলামাবাদ, খণ্ড: ৫৭, সংখ্যা: ১-২

https://t.me/BoierSomahar

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

বইয়ের নাম ও লেখক ..... ক্রমিক নং

ইসলামী যুগের হিন্দুস্তানে সমাজ, অর্থনীতি ও শাসনের সমস্যাসমূহ (উর্দু) - প্রফেসর জাফরুল ইসলাম ইসলাহী ৯২

{বর্ণ ফে}

ফুতুহুস সালাতিন (ফারসি) - আব্দুল মালিক ইসামী ৯৩
ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী (ফারসি) - সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক, গবেষণা: প্রফেসর শেখ আব্দুর রশিদ - মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড় ৯৪
গুজরাটের ফকিহগণ এবং তাদের দ্বীনি খিদমত (উর্দু) - মুফতি আব্দুল কাইয়ুম রাজকোটি ৯৫
ফাওয়ায়িদুল ফুয়াদ (ফারসি) - খাজা মীর হাসান আলা সিজজি ৯৬

{বর্ণ কাফ}

প্রাচীন হিন্দুস্তানের ইতিহাস (উর্দু অনুবাদ) - রমা শঙ্কর ত্রিপাঠী (উর্দু অনুবাদ: সৈয়দ সাখি হাসান নকভি) ৯৭

{বর্ণ লাম}

লুবাবুল আলবাব (ফারসি) - মুহাম্মদ আউফি ৯৮

{বর্ণ মিম}

মসনবী কিরানুস সা'দাইন (ফারসি) মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাইল মিরাঠির ভূমিকা ও সৈয়দ হাসান বার্নি বি.এ-এর মুখবন্ধসহ - আমির খসরু ৯৯
মসনবী দেওয়াল রানী ও খিজির খান (ফারসি) - আমির খসরু ১০০
মুখতাসার তারিখে হিন্দ (উর্দু) - সৈয়দ আবু জাফর নদভী ১০১
মাখদুম জাহানিয়া জাহান গশত (উর্দু) - প্রফেসর মুহাম্মদ আইয়ুব কাদরী ১০২
মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার (আরবি) - আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-আদভী আল-উমরী ১০৩
হিন্দুস্তানে মুসলিম সংস্কৃতি (উর্দু) - আব্দুল মজিদ সালিক ১০৪
মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল (আরবি) - ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ১০৫
মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন (আরবি) - আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন ১০৬
মুকাম্মাল তারিখে কাশ্মীর - মুহাম্মদ উদ্দিন ফাউক ১০৭
মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ (উর্দু অনুবাদ: ডক্টর আলিম আশরাফ খান) - মোল্লা আব্দুল কাদির বাদাউনি ১০৮

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

১ ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন, নয়াদিল্লি ২০০৯ খ্রি.

{বর্ণ ফ}

১৩৫০ হিজরীর পর ১ ইউনিভার্সিটি অফ মাদ্রাজ ১৯৩৮ খ্রি.

লেখক: ৭৯৭ হিজরী ১ ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড় ১৯৬৫ খ্রি.

১ জামিয়া ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন, ডাভেল, গুজরাট ২০১০ খ্রি.

৭৩৬ হিজরী ১ মাতবা নওল কিশোর ১৩১২ হিজরী

{বর্ণ ক্ব}

২০১৯ খ্রি. ১ কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরোগ-এ-উর্দু, দিল্লি ১৯৯৮ খ্রি.

{বর্ণ ল}

৬৩৯ হিজরী (১২৪২ খ্রি.) ২ লিডেন প্রেস, ব্রিল, হল্যান্ড ১৯০৬ খ্রি.

{বর্ণ ম}

৭২৫ হিজরী ১ মাতবা ইনস্টিটিউট, আলীগড় ১৯১৭ খ্রি.

৭২৫ হিজরী ১ মাতবা ইনস্টিটিউট, আলীগড় ১৯১৭ খ্রি.

১৯৫৮ খ্রি. ১ মাতবা মাআরিফ, আজমগড় ১৯৩৮ খ্রি.

১৯৮৩ খ্রি. ১ এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচি ১৯৮৫ খ্রি.

৭৩৯ হিজরী ২৭ আল-মাজমাউস সাকাফি, আবুধাবি ১৪২৩ হিজরী

১৯৫৯ খ্রি. ১ ইদারা-এ-সাকাফাত-এ-পাকিস্তান, ইসলামাবাদ ১৯৫৭ খ্রি.

২২১ হিজরী ৪৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ২০০১ খ্রি.

৮০৮ হিজরী ১ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৯৮৮ খ্রি.

১৯৩৫ খ্রি. ১ আলী মুহাম্মদ অ্যান্ড সন্স, শ্রীনগর

১৬১৫ খ্রি. ৩ কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরোগ-এ-উর্দু, দিল্লি ২০০৮ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-এ-উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

১০৯ ..... মনম তৈমুর জাহান কুশা (ফারসি) ..... মার্সেল ব্রুন ফরাসি (ফারসিতে অনুবাদ: জবিহুল্লাহ মনসুরি)

{বর্ণ ন}

১১০ ..... নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক (আরবি) ..... মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আশ-শরিফ আল-ইদ্রিসি আল-মালিকি

১১১ ..... নুজহাতুল খাওয়াতির (আরবি) ..... হাকিম আব্দুল হাই আল-হাসানি

১১২ ..... নাফাহাতুল উনস (ফারসি থেকে উর্দু অনুবাদ) ..... মোল্লা আব্দুর রহমান জামি (উর্দু অনুবাদ: হাফেজ সৈয়দ আহমদ আলী চিশতি নিজামি)

১১৩ ..... নিগাহে ব-তারিখ-এ-হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য (ফারসি) ..... মুজতবা করমি

১১৪ ..... নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব (আরবি) ..... শিহাবুদ্দিন আন-নুওয়াইরি

১১৫ ..... নজর-এ-খসরু, পহেলিঁয়া অউর কহে মুকরানিয়া ..... শানুল হক হক্কি

{বর্ণ হ}

১১৬ ..... হিন্দ-ইসলামি তহাযীব কা ইরতিকা ..... ইমাদুল হাসান আজাদ ফারুকি

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

•

১ কুতুবখানা মুস্তাওফী, তেহরান ১৩৬৩ হিজরী

(বর্ণ: নুন)

৫৬০ হিজরী ২ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৯ হিজরী

১৩১৪ হিজরী ৮ দার ইবনে হাযম, বৈরুত ১৪২০ হিজরী (১৯৯৯ খ্রি.)

৮৯৮ হিজরী ১ শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর ২০০২ খ্রি.

•

১ মুয়াসসাসা চাপ ওয়া ইনতিশারাত উমুর খারিজা, তেহরান ১৩৭৩ হিজরী

৭৩৩ হিজরী ৩৩ দারুল ওয়াসায়েক আল-কুতুব আল-কাওমিয়া, কায়রো ১৪২৩ হিজরী

২০০৫ খ্রি. ১ রয়্যাল বুক কোম্পানি, করাচি ১৯৮৪ খ্রি.

(বর্ণ: হে)

•

১ মাকতাবা জামিয়া লিমিটেড, নয়াদিল্লি ১৯৮৫ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যু খণ্ড প্রকাশক প্রকাশিত

১৯৩১ এক হাস্কেল হাউস পাবলিশার্স লিমিটেড, নিউ ইয়র্ক ১৯১২

২০ নভেম্বর ১৮৫৯ দুই মারে আলবেমারলে স্ট্রিট, লন্ডন। ১৮৭৪

৩ অক্টোবর ১৯৩৭ ছয় কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৩৭

৯৫৮

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

নং বইয়ের নাম লেখক

১ মিডিয়াভাল ইন্ডিয়া আন্ডার মোহাম্মাদান রুল স্ট্যানলি লেন-পুল

২ দ্য হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া দ্য মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন

৩ দ্য ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া র‍্যাপসন জে.ই

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

(খণ্ডটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে)

প্রচেষ্টায়

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মাদাজিল্লাহু

পরিচালক, ইদারা উলূমুল কুরআন, হাসান আবদাল,

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত।

https://t.me/BoierSomahar

আল মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক A-1, গুলিস্তান-ই-জোহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

almanhalpublisher@gmail.com

almanhalpublisher@hotmail.com

www.almanhalpublisher.com

https://t.me/BoierSomahar

আল মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলশান-ই-জাওহার, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

almanhalpublisher@gmail.com

almanhalpublisher@hotmail.com

www.almanhalpublisher.com

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমার সাতটি অংশ এক নজরে

১

- ইতিহাসের মূলনীতি
- পূর্ববর্তী নবীগণ আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের সমসাময়িক সাম্রাজ্যসমূহ
- ইসলামপূর্ব বিশ্বের অবস্থা
- সীরাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- খিলাফতে রাশেদার যুগ
- বিজয়াভিযানের যুগ
- খিলাফতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে খিলাফতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত
- উম্মাহাতুল মুমিনীন
- আশারায়ে মুবাশশারা এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি
- ইতিহাসের শিক্ষা

২

- ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ যাচাই ও পর্যালোচনার মূলনীতি
- শাহাদাতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু
- মতপার্থক্য ও বিবাদের যুগ
- খিলাফতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু
- জঙ্গে জামাল
- জঙ্গে সিফফীন
- খিলাফতে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু
- খিলাফতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
- ইয়াজিদের শাসনকাল
- হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংগ্রাম
- কারবালা ও হাররার বিয়োগান্তক ঘটনা
- খিলাফত ও শাহাদাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু
- ফিতনার যুগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা
- প্রথম হিজরি শতাব্দীতে উম্মাহর ইলমি ও নৈতিক তরবিয়ত প্রদানকারী প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ীগণের পরিচিতি
- গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন

৩

- বনু উমাইয়া খিলাফত
- বনু আব্বাস খিলাফত
- আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ
- আইম্মায়ে আরবা এবং মহান মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকগণের অবদান
- বিভিন্ন ফিরকা বা উপদলের সূচনা ও উদ্ভবের ইতিহাস
- বাতিল ফিরকাসমূহের শাসনকাল
- গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন

৪

- সিকিলির ইতিহাস
- ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ
- আতাবক আমীরগণ
- আইয়ুবী শাসকগণ
- খওয়ারেজম শাহী সালতানাত
- তাতারীদের আক্রমণ
- মিশরের আব্বাসীয় খিলাফত
- মামলুক সুলতানগণ
- তাতারীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসার
- উসমানীয় সালতানাত: প্রতিষ্ঠা থেকে উত্থানকাল পর্যন্ত

৫

- উসমানীয় খিলাফত: প্রথম খলিফা সুলতান সেলিম আউয়াল থেকে শেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ পর্যন্ত
- ইসলামী আন্দালুস: প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকে গ্রানাডার পতন পর্যন্ত
- উপমহাদেশের ইতিহাস: সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মুসলিম শাসন

৬

- দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী সালতানাতসমূহ: গজনভী সালতানাত
- ঘুরী সালতানাত
- দাস বংশ
- খিলজি
- তুঘলক
- লোদী
- সাদাত
- মুঘল সাম্রাজ্য: প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত
- মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের ইলমি, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক অবদান

৭

- বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের ইতিহাস
- দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে ভারত বিভাগ পর্যন্ত
- সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ
- আধুনিক মুসলিম বিশ্ব
- অমুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর উত্থান ও পতন
- মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ

দোকান নম্বর ১-৩, ইসলামেশন জামেশ্রো রোড
বিপরীতে: জামে মাজিদ নূরী টাউন, করাচি
০৩১১-৩১৩৫৩১৪
www.almanhalpublisher.com
almanhalpublisher@gmail.com
admin@almanhalpublisher.com

https://t.me/BoierSomahar